

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

[illegible]

[illegible]



[illegible]

বিবধি প্রসঙ্গ

[illegible]



১. প্রথম শ্রেণী  
 ২. দ্বিতীয় শ্রেণী  
 ৩. তৃতীয় শ্রেণী  
 ৪. চতুর্থ শ্রেণী  
 ৫. পঞ্চম শ্রেণী  
 ৬. ষষ্ঠ শ্রেণী  
 ৭. সপ্তম শ্রেণী  
 ৮. অষ্টম শ্রেণী  
 ৯. নবম শ্রেণী  
 ১০. দশম শ্রেণী

|         |     |                          |
|---------|-----|--------------------------|
| क्र.सं. | २५५ | श्रीमती श्री. बाबा. बाबा |
| क्र.सं. | २५६ | श्री. बाबा. बाबा         |
| क्र.सं. | २५७ | श्री. बाबा. बाबा         |
| क्र.सं. | २५८ | श्री. बाबा. बाबा         |
| क्र.सं. | २५९ | श्री. बाबा. बाबा         |
| क्र.सं. | २६० | श्री. बाबा. बाबा         |

३६०१ ॥

१. अन्तर्गत विषय-संबंधित विवरण  
 २. अन्तर्गत विषय-संबंधित विवरण  
 ३. अन्तर्गत विषय-संबंधित विवरण  
 ४. अन्तर्गत विषय-संबंधित विवरण  
 ५. अन्तर्गत विषय-संबंधित विवरण  
 ६. अन्तर्गत विषय-संबंधित विवरण  
 ७. अन्तर्गत विषय-संबंधित विवरण  
 ८. अन्तर्गत विषय-संबंधित विवरण  
 ९. अन्तर्गत विषय-संबंधित विवरण  
 १०. अन्तर्गत विषय-संबंधित विवरण

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିତ୍ର

[illegible]

新 文 學 社

[illegible]



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

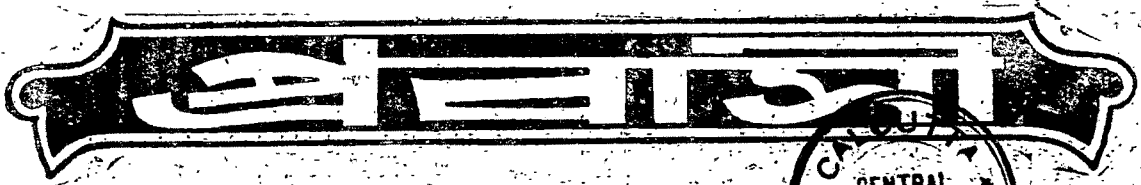
হিমালয়ের একটি অঞ্চল  
নিকোলাস বোয়েরিক





P30148





“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্  
নায়মাত্মা বলহীনেন লভাঃ”



৪৮শ ভাগ }  
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৫৫

১ম সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ

### নব বর্ষ

বিষয় বড়লোকটি যখন সমস্ত ভারত আচ্ছন্ন সেই সময়ে আসিয়াছিল: ১৩৫৪। পঞ্জাবে ও পূর্ববঙ্গে তখন সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভের আগুন জ্বলিয়াছে, বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে প্রতি-  
স্থিতির মনোহ্রস্তি কোথাও বাড়িতেছে, কোথাও বা তাহাকে সংযত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কলিকাতার তখন চতুর্দিকে গুজরাটের এবং সুহ রাবর্দী মজীসভা-অনীত পাঠান পুলিশের অত্যাচার ও অনাচারের শ্রোত বহিতেছে এবং তাহারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার বাঙালীর যুবশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে সশস্ত্র অভিযান চালাইতেছে। সমস্ত দেশের অবসন্ন মনপ্রাণ তখন শুধুমাত্র স্বাধীনতা লাভের আশায় উৎসুক হইয়া আছে। বাহিরের জগতে এক মহাযুদ্ধের চিত্র আশ্রয় নিবিবার পূর্বেই আর এক মহাযুদ্ধের পূর্বাভাসরূপে শক্তিগুঞ্জ ছুই ভাগে বিভক্ত হইবার উত্তোগ করিতেছে।

বর্ষারম্ভ হইবার কিছুদিন পরেই ভারতের আকাশে স্বাধীনতার আলো দেখা দিল। কিন্তু লোকের মন দেশ বিভাগ ও আত্মীয়রিচ্ছেদজনিত বিষাদে আচ্ছন্ন হওয়ার আশঙ্কায় শ্রোত বহিয়াও বহিল না। তাহার পর পঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে জলিয়া উঠিল সাম্প্রদায়িক-হিংসার দাবানল যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোকের ধনময়প্রাণ জলিয়া পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইল। এক কোটির উপর লোক বাস্তবছাড়া, বিহারা হইয়া দলে দলে আশ্রয়ের আশায় চলিল। পূর্ব রাষ্ট্রের মুখে। দাবানলের আগুন দিল্লীতে ও যুক্তপ্রদেশে পড়িল কিন্তু মহাস্বাক্ষীর প্রয়াসের ফলে এবং ঐ অঞ্চলের কংগ্রেসকর্মীদের চেষ্টায় তাহা নিবিয়া গেল। অল্প দিকেই দেশের শান্তির চেষ্টা ও প্রতিহিংসা নিরোধের জন্ত হিন্দুর অত্যাচারের সংবাদদানের অনিচ্ছাকে হৃদয়লতা ভাবিয়া রাখার উচ্চতম অধিকারী বর্গ হলেবলে কাম্বীর অধিকার করার জন্ত অযুত সংখ্যায় পাঠান উপজাতি ও পঞ্জাবী প্রাক্তন সৈন্যকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া পাঠাইলেন সেখানে লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের অভিযান চালাইতে। ভারত-

রাষ্ট্র বিষয় বাধাবিঘ্নের মধ্যে কাম্বীর রক্ষার জন্ত সৈন্য ও বিমানবাহিনী পাঠাইতে বাধ্য হইল, আরম্ভ হইল বিনা ঘোষণায় কাম্বীর যুদ্ধ। ঘরের যুদ্ধ এইরূপে আরম্ভ হইল এবং বাহিরেও যুদ্ধের আশঙ্কা ক্রমেই ঘনীভূত হইতে থাকিল। সারা জগৎ যেন আতঙ্কে ক্রমেই অভিভূত হইতে লাগিল। ভারতের বাহিরে চীনেও সমরানল জলিয়া উঠিল এবং কেলিঙ্গনে প্রবল আরব-ইহুদী সংঘর্ষ চলিতে থাকিল। ভারত-রাষ্ট্রের পশ্চিম সীমান্তস্থিত আতঙ্কের ছায়া গিয়া পড়িল পূর্ব সীমান্তের পারে, সেদিকেও আতঙ্কীভূত উদ্ধান্তর শ্রোত ক্রমেই ক্ষীণধারায় সীমান্তের এপারে বহিয়া আসিতে লাগিল।

কি নিদারুণ ছবিপাকের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল ১৩৫৪ সাল অথচ ইহাই আমাদের স্বাধীনতার প্রথম বৎসর।

আজ ১৩৫৫ সাল আসিয়া দাঁড়াইয়াছে আমাদের সম্মুখে। কিন্তু আজ “নবীন বরষে নূতন হরষে” গান গাহিবার কবিও নাই, তাঁহার প্রিয়তম “শিশু” মোহনদাস কর্মচাঁদ গান্ধীও নাই আশার বাণী শুনাইতে আর্ও ও দুঃখক্লিষ্ট জনগণকে। ঘরে-বাহিরে, চতুর্দিকে, আজ যেন নৈরাশ্র-বাদেরই জয়, দুর্দৈবের আশঙ্কায় সকলেরই মন চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত। একপ বিপরীত অবস্থার মধ্যে বর্ষকালের শুভ ভবিষ্যদ্বাণী করে এমন-দৈবজ্ঞ কে আছে কোথায়? সকলেই শুনাইতেছেন আসন্ন বিপদের কথা, চারিদিকেই শোনা যায় ফোড় ও রোষের চীৎকার, অভিযোগ-অনুযোগে ছাইয়া গিয়াছে দেশ; অভাব ও কষ্টে জর্জরিত লোকের মন আজ বড়বতই অবসন্ন ও ব্যস্তপ্রস্তু। দেশের পরিস্থিতি যখন এইরূপ তখন উদ্ধারের পথ দেখাইবে কে, আসন্ন দুর্ভোগের মুখে এইশাস্তিকর যোগযজ্ঞের হোতা উদ্ভাতা কেবা আছে কোথায়?

১৩৫৫ সালের পথ অতি দুর্গম সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের নেতৃবর্গের মধ্যে যদি কিছুমান পৌরুষ থাকে, তবে সে পথে আমরা নিশ্চয়ই পার, পাইতে পারিব। দেড় শত বৎসরের নিদারুণ দমন লুণ্ঠন উৎপীড়ন সত্ত্বেও যে দেশে স্বাধীনতার আলো নিবে নাই, এই সেদিনও যেখানে দেশের শতসংখ্য



সন্তান বিদেশীর শাসন-উৎপীড়নের মধ্য দিয়া, স্বাভাবিক কামনার, স্বাধীনতা-মুক্তির অনলে সর্বদা আহুতি দিয়াছে, এই কয় মাসের মধ্যে সে দেশের সমস্ত বীৰ্য ও সহিষ্ণুতা শেষ হইয়া গিয়াছে ইহা অবিস্মৃত। স্বাধীনতা বিনামূল্যে পাওয়া যায় না ইহা তো ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। আমরা দেড়শত বৎসরের দাসত্বের ফলে ছুলিয়াছি যে স্বাধীনতার মূল্যদান করিতে হয় পৌরুষে। যদি আমরা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চাই তবে আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে ধীর স্থির ভাবে, দুটচিতে, অনিমেব সতর্ক দৃষ্টিতে সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে, কেননা স্বাধীন জগতে ক্রীবত্বের স্থান নাই। নৈরাশ্রবাদের অর্থ “ছায়াভরচকিত মুঢ়ের” আর্জনাৎ, তাহাতে সর্বনাশেরই পথ খুলিয়া যায়। আমাদের এখন স্বরণ রাখিতে হইবে সূর্য অতীতের পিতৃপিতামহগণের গৌরবময় বীরত্বের কথা, শোণিত-তপনের কথা।

আজ-প্রবন্ধনার দিন চলিয়া গিয়াছে। মুখে বলিব বেদান্তের মায়াবাদের কথা, কাজের বেলায় প্রতিদিন প্রতিফলনে চলিব বাস্তববাদের পথে, সকাল সন্ধ্যা আওড়াইব গীতার জলন্ত ক্ষাত্র-ধর্মের শ্লোক, বিপদের সম্মুখে দিব চরম ক্রীবত্বের পরিচয় এবং তাহার ফলে বিপদ আরও ঘনীভূত হইলে অতের উপর দোষারোপ করিয়া, তর্জনে গর্জনে নিজের অপদার্থতা ঢাকিবার চেষ্টা করিব এবং শেষে “সর্বনাশ সংগপন্ন” হইলে সব কিছু ছাড়িয়া, পলায়ন করিয়া, কপাল চাপড়াইয়া, অদৃষ্টের দোষ দিয়া ঈহুনী গাহিব, এই কি আজকার দিনে মনুষ্যত্বের নিদর্শন? যদি পৌরুষ থাকে, ১৩৫৫ সালেই ভাগ্যচক্র ফিরিবে, নহিলে নয়।

সর্বশেষে বাংলার কথা। লিখিবার সময় শোনা যাইতেছে যে বাংলার মন্ত্রীসভা ভাদ্রিয়ার জন্ম ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন ধুরন্ধর আবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহাদের এই চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল স্বার্থ সম্পর্কিত। যদি দেশের মঙ্গলামঙ্গল ইহাদের উদ্দেশ্য হইত তবে তাহার পরিচয় আমরা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার কার্যকালেই পাইতাম বা অনুরূপে, দেশের মঙ্গলের জন্ম মন্ত্রীসভার কার্যকলার দোষগুণ ইহারা সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেন। সেইরূপ কোনও কিছু অভিযোগের অভাবে এবং ঐ মহাশয় ব্যক্তিদিগের মনোবৃত্তির পরিচয় থাকায় আমরা বলিতে বাধ্য যে দেশের এইরূপ ছদ্মবীর্যের মধ্যে ইহাদের একরূপ স্বার্থাঘেষণ অতিশয় নিন্দনীয়। ইহারা আগে প্রকাশে বলুন যে মন্ত্রীসভায় প্রবেশ করিয়া দেশের কি উপকার ইহারা করিতে চাহেন এবং অতীতে ইহারা দেশের নামে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া কি করিয়াছেন যে দেশের লোক ইহাদের হাতে শাসনের ভার ছাড়িয়া দিবে। কংগ্রেসের নাম লইয়াই তো কলিকাতা করপোরেশনকে ক্রমে চোরপোরেশনে পরিণত করা হইয়াছে, শেষে কি বি.পি.সি.সি “বঙ্গীয় প্রাদেশিক চোর-চক্র” পরিণত হইবে? পূর্ববঙ্গ ভুবাইয়া কি ইহাদের আশ মেটে নাই?

## ভারতরাত্রি ও পাকিস্থান রাষ্ট্রসমস্যা

১৩৫৫ সালের ২রা বৈশাখ হইতে ৫ই বৈশাখ পর্যন্ত ভারতরাত্রি ও পাকিস্থানরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ কলিকাতায় একটি সম্মেলনে বাগবিতণ্ডার নিয়ুক্ত ছিলেন। এই বাগবিতণ্ডার বিবরণ যাহা দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই আমরা নানা আলোচনার প্রস্তুত হইতে পারিতাম। কিন্তু যে সিদ্ধান্তসমূহ এই সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে তাহা সোমবার, ৬ই বৈশাখ, ঘোষণা করা হইয়াছে। তাহার ফলে সংস্কার-বিমুক্ত মন লইয়া এই বিষয়গুলির বিচার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সেইজন্য প্রথমেই এই সংস্কার-গুলির গতিপ্রকৃতির আভাস দিতে হয়। কারণ এই সংস্কার-রাজিই বর্তমান হিন্দু-মুসলমানের সমস্তা সৃষ্টি করিয়া ভারত-বর্ষকে বিভক্ত করিয়াছে। এই বিভাগের ফলে যে মনো-মালিণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এই সংস্কাররাজির বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

আমরা গত চল্লিশ বৎসরের ঘটনাবলীর নিরিখে এই মনোমালিণ্ডের বিচার করিব। তাহার পূর্বের ঘটনা বর্তমান আলোচনার বাহিরে রাখিতে চাই। এই চল্লিশ বৎসরের প্রাকালে আমরা বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাক্ষাৎ পাই। এই আন্দোলনের স্বরূপে হিন্দু-মুসলমান সমস্ত বাঙালী ইহার বিপক্ষে ছিল। সেই একাধিতা বৈধি দিন টেকে নাই। ঢাকা নগরীকে রাজধানী করিয়া পূর্ববঙ্গে একটি মুসলিম প্রদেশের প্রতিষ্ঠা করিবেন—বড়লাট কার্জন এই প্রেলোভন দেখাইয়া নবাব সলিমুল্লা প্রমুখ মুসলমান সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর নেতৃবর্গের সহায়তা লাভ করিতে সমর্থ হন। ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে এই যে ভাদন-বেধা দিল তাহা আর জোড়া লাগিল না। ১৯১৬ সালের লক্ষৌ প্যাক্ট, ১৯১৯-২১ সালের খেলাফৎ আন্দোলনে হিন্দুর সহযোগিতা, রামসে. ম্যাক-ডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা সম্পর্কে কংগ্রেসের “না গ্রহণ না বর্জন” নীতি, সবই ব্যর্থ হইয়াছে। ইহাতেই শেষ হয় নাই। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ-প্রবর্তিত যে দানবীয় রূপ আমরা কলিকাতা নগরীর বুকে ও তাণ্ডবলীলা নোয়াখালিতে দেখিলাম, এই অভিজ্ঞতার পর ইহা বিশ্বাস করা কইয়া পড়িল যে হিন্দু মুসলমান আবার প্রতিবেশীরূপে করিতে পারিবে। বিহার প্রদেশে ১৯৪৬ সালে মুসলিম উপর অনুরূপ দানবীয় অত্যাচার চলিল। ১৯৪৭ সালে মাসে পঞ্জাবের হিন্দু-শিখ সম্প্রদায়কে সেই অভিজ্ঞতা করিতে হইল। তাহার পর ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ভারত-বিভাগের ঘোষণার অন্তর্দিন পরে পশ্চিম পঞ্জাব ও পূর্ব পঞ্জাব ঘটনা ভারতবর্ষের বুকে এমন রক্তরেখা টানিয়া দিয়াছে যে, তাহা গাছীজীর বুকের রক্তেও ধুইয়া যাইবে কিনা সন্দেহ।

১৯৫৫ সালের বৈশাখ মাসের এই চারিটি দিন এই মণ্ডাস্তিক ইতিহাসের মোড় ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ও পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কয়েকজনকে এই চেষ্টার জন্ত আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। ফলাফল নিরপেক্ষ হইয়া এই চেষ্টাকে গান্ধীজী-প্রবর্তিত কর্মের অঙ্গ বলিয়া আমরা মনে করি। পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লওয়া একটা অস্বাভাবিক কার্য নয়, এর জন্ত খুনাখুনি করিতে গেলে যে অবস্থা দাঁড়ায় তাহাই গান্ধীজী প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের এই নৈতিক অবনতির বেদনায় তাঁহার বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছাও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। প্রতিবেশীর মধ্যে যে আত্মীয়তা ও মৌহাদ্দ্য স্বাভাবিক তাহাই গান্ধীজী ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন। বর্তমান সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিলে তিনি আমাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন। এই কথা ভাবিয়াই আমরা ভারত-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের নেতা ক্রীষ্ণীশচন্দ্র নিয়োগী যে অহরোধ করিয়াছেন—“চুক্তিনামার সর্ভাবলী সম্পর্কে বুঝ সমালোচনা না করিতে”—তাহা মানিয়া লইলাম। এই সর্ভগুলি কি ভাবে প্রতিপালিত হয় তাহার পরীক্ষার সময় আমরা দিব। “পাকিস্থান” রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের নেতা জনাব গুলাম মহম্মদ “হৃদয় অহুস্কান করিয়া মনস্থির করিতে” অহরোধ জানাইয়াছেন। এই সম্পর্কে আমরা বলিতে চাই যে “হৃদয়” দিয়া ভারতবর্ষের বিভাগ আমরা সমর্থন করি না ও করিতে পারিব না। বর্তমানে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা আপদধর্ম বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। সেইজন্ত একটা সর্ভ সম্বন্ধে আমাদের মনে দ্বিধার ভাব রহিয়া গেল :

“পাকিস্থান ও ভারতের কিম্বা ইহাদের অংশসমূহের একীকরণের কোনরূপ প্রচারকার্য নিরুৎসাহ করা হইবে। অংশসমূহের মধ্যে একপক্ষে পূর্ব্ব বঙ্গ এবং অপর পক্ষে পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, কুচবিহার কিম্বা ত্রিপুরা রাজ্যও ধরা হইবে।”

অর্থাৎ লার্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়া যে আঁচড় কাটিয়া দিয়াছেন তাহা চিরকালের জন্ত মানিয়া লইতে হইবে। এরূপ দাবি মাহুযের জ্ঞানবিদ্যাসের আশা-আবেগের স্বাভাবিক পরিণতির বিরুদ্ধ ধর্ম। আমরা মনে করি “পাকিস্থান” রাষ্ট্র যখন ভারতরাষ্ট্র হইতে রাজনীতিক অর্থে ভিন্ন ধর্মী তখন বহুতা বা শত্রুতা সম্বন্ধে অপরাপর রাষ্ট্রের মতই ক্ষেত্রে কর্ম বিষয়িতে এই নীতি অহুসায়ে তাহা স্থির হইবে। আমরা মনে করি না ভারত-রাষ্ট্রের মুসলমান অধিবাসী এত শীঘ্র তাঁহাদের “পাকিস্থানী” মনোভাব বদলাইয়া ফেলিতে পারিয়াছে। আমরা মনে করি না যে “পাকিস্থান”বাসী হিন্দু ও শিখ এত শীঘ্র তাঁহাদের রাজনীতিক বিশ্বাস বদলাইয়া ফেলিতে পারিবে। এই ছই রাষ্ট্রের এই ছই বিরুদ্ধ মনোভাবের

অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই ছনিয়ার সফটময় পথে চলিতে আরম্ভ করা উচিত। কলিকাতা সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ এই বিরুদ্ধ ভাবধরের মধ্যে একটা সেতু নির্মাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে মাত্র, তাহাদের পক্ষে এর বেশী সার্থকতা দাবী করা বিচারসহ হইবে না। যে হিংসার স্রোত ও অপমানের স্রোত ছই রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবাহিত তাহা সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করা রাজনীতিক কৌশলের কার্য। সেই কৌশল ছই রাষ্ট্রের আছে কিনা তাহা অদূর ভবিষ্যতে পরীক্ষিত হইবে।

### চুক্তিনামার বিস্তারিত বিবরণ

চুক্তিনামার সর্ভাবলীর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

যেহেতু উভয় ডোমিনিয়নের গবর্ণমেন্টস্বয় স্বীকার করিতেছেন যে, সংখ্যালঘুদের ব্যাপকভাবে বাস্তব্যাগ কোন ডোমিনিয়নেরই স্বার্থের পরিপোষক নহে, তাঁহারা বাস্তব্যাগকে নিরুৎসাহ করার জন্ত ও বাস্তব্যাগ বন্ধ করিবার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টির জন্ত সম্ভবপর সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, তাঁহারা বাস্তব্যাগদিগকে তাঁহাদের পৈতৃক বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে যত দূর সম্ভব উৎসাহ ও সুযোগসুবিধা দিবেন, সেই হেতু ছই ডোমিনিয়ন নিম্নোক্ত বিষয়গুলি মানিয়া লইতেছেন :—

১ম ধারা

১। সংখ্যালঘুগণ যে ডোমিনিয়নে বাস করে তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার এবং তাহাদের সুবিচার পাওয়ার ও নাগরিক অধিকার রক্ষার নিশ্চিত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সেই ডোমিনিয়নের গবর্ণমেন্টের উপর নির্ভর করে।

২। ভারতে ও পাকিস্থানে প্রত্যেক লোকের সমান অধিকার, সুযোগসুবিধা, বিশেষ অধিকার ও বাধ্যবাধকতা থাকিবে; সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা থাকিবে না; তাহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকার সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করা হইবে।

বিশেষ দৃষ্টব্য—“শিক্ষা বিষয়ক” অধিকার সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

৩। পাকিস্থান ও ভারতের কিম্বা ইহাদের অংশসমূহের একীকরণের কোনরূপ প্রচারকার্য নিরুৎসাহ করা হইবে। অংশসমূহের মধ্যে এক পক্ষে পূর্ব্ব বঙ্গ এবং অপরপক্ষে পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, কুচবিহার কিম্বা ত্রিপুরা রাজ্যও ধরা হইবে।

বিশেষ দৃষ্টব্য—প্রচারকার্য বলিতে এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানও বুঝাইবে।

৪। উভয় গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিতেছেন যে আরও ভাল আবহাওয়া সৃষ্টির জন্ত সংবাদপত্রসমূহের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক; সুতরাং উভয় গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিতেছেন



যে প্রত্যেক ডোমিনিয়নে সংবাদপত্রগুলি যাহাতে নিম্নোক্ত কাজসমূহ না করে তজ্জন্ত যেখানে সম্ভবপর হইবে সেখানে সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিয়া সর্ব প্রকার চেষ্টা করা হইবে—

(ক) অপর ডোমিনিয়নের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য। (খ) কোন ডোমিনিয়নের অধিবাসীদের কিম্বা তাহাদের কোন অংশের মধ্যে উত্তেজনা, ভয় কিম্বা আতঙ্কের সৃষ্টি হইতে পারে এরূপ সংবাদ অতিরঞ্জিত ভাবে প্রকাশ। (গ) এক ডোমিনিয়ন কর্তৃক অপর ডোমিনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সমর্থক অথবা দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এইরূপ অর্থবোধের কোন বিষয় প্রকাশ।

৫। উভয় ডোমিনিয়নে সংখ্যালঘুগণ তাহাদের প্রতি অত্যাচার বা অত্যাচার ব্যবহারের এক্কাহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ার অভিযোগ করিলে তৎসম্বন্ধে সম্বন্ধ তদন্ত হইবে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

৬। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলায় প্রাদেশিক সংখ্যালব্ধি বোর্ড থাকিবে এবং এই প্রাদেশিক বোর্ডের অধীনে জেলা সংখ্যালব্ধি বোর্ড থাকিবে। এই বোর্ডসমূহ সংখ্যালব্ধি সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করিবে, তাহাদের মন হইতে ভীতি দূর করিবে ও বিশ্বাসের ভাব জাগ্রত করিবে। এই বোর্ডসমূহ ক্ষিপ্ততার সহিত সংখ্যালব্ধিদের অভিযোগ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিবে এবং সন্তোষজনকভাবে ও ক্ষিপ্ততার সহিত তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা করিবে।

প্রাদেশিক সংখ্যালব্ধি বোর্ড পাঁচ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান সংখ্যালব্ধি সম্প্রদায়ের অন্ততঃ তিন জন সদস্য থাকিবেন, উহার প্রাদেশিক আইন সভার সংখ্যালব্ধি সম্প্রদায়সমূহের সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। অবশিষ্ট দুই জন প্রভাবপ্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হইবেন ও প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা মনোনীত হইবেন। জেলা সংখ্যালব্ধি বোর্ডের চেয়ারম্যান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রাদেশিক বোর্ডের চেয়ারম্যান এক জন মন্ত্রী প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

৭। উভয় ডোমিনিয়নের গবর্নেন্ট এবং উভয় ডোমিনিয়নের প্রদেশসমূহের গবর্নেন্ট তাহাদের কর্মচারীদের ভাল ভাবে জানাইয়া দিবেন যে, যদি কোন সরকারী কর্মচারী সংখ্যালব্ধি সম্প্রদায়ের লোকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার কার্যে কোন অবহেলা দেখান অথবা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন অথবা কর্তব্যের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব প্রদর্শন করেন তবে তাহাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে।

৮। একক অথবা দলবদ্ধভাবে যদি কেহ সংখ্যাল

সম্প্রদায়ের মনে ভীতির সঞ্চার করে তবে তাহার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

৯। উভয় ডোমিনিয়ন নিম্নলিখিত অভিযোগসমূহ দূর করিবার জন্ত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন :—

(ক) আমদানী ও রপ্তানি লাইসেন্স মঞ্জুর করা সম্পর্কিত বৈষম্য এবং রেল মাল প্রেরণের অগ্রাধিকার সম্পর্কে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ।

(খ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের বিরুদ্ধে অর্থনীতি, বয়স্কদের চেষ্টা অথবা তাহাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করার চেষ্টা বন্ধ করা।

উভয় ডোমিনিয়ন গবর্নেন্ট তাহাদের নিজ নিজ প্রদেশ-সমূহকে তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় এই নীতি অনুসারে কাজ করিতে বলিবেন।

যে সকল জেলা অথবা স্থান হইতে বহুসংখ্যক লোক চলিয়া গিয়াছে সেই সকল স্থানে বাস্তুভাগীদের সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের জন্ত বোর্ড গঠনের নিমিত্ত পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ গবর্নেন্ট আইন প্রণয়ন করিবেন। এই প্রকার বোর্ড গঠনের যদি দাবী করা হয় তবেই বোর্ড গঠিত হইবে। যদি সম্পত্তির মালিকগণ অস্বস্তি করেন তবেই বোর্ড সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করিবে। তাহাদের কার্য তত্ত্বাবধায়কের কার্যের স্থায় হইবে এবং এই সম্পত্তি হস্তান্তরের কোন ক্ষমতা তাহাদের থাকিবে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের লইয়া এই সকল বোর্ড গঠিত হইবে।

ঐষ্টব্য—যাহারা ১৯৪৭ সালের ১লা জুন অথবা তাহার পরে প্রদেশ ত্যাগ করিয়াছেন এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবার পর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদেরই আশ্রয়প্রার্থী বলা হইবে।

প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের জন্ত বিস্তৃত প্রস্তাব রচনার উদ্দেশ্যে উভয় গবর্নেন্ট অবিলম্বে অফিসারদের লইয়া একটি কমিটি গঠন করিবেন।

২য় ধারা

এই চুক্তি বাহাতে কার্য্যকরী হয় তৎসম্পর্কে সুনিশ্চিত হইবার জন্ত দুই ডোমিনিয়নের প্রতিনিধিগণ দুই মাসে অন্ততঃ একবার সম্মিলিত হইবেন। উক্ত বৈঠকে উপরোক্ত নীতি কোন ডোমিনিয়নে প্রতিপালিত না হওয়ার দৃষ্টান্ত থাকিলে উত্থাপন করা হইবে। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা সম্পর্কে জরুরী প্রয়োজনের আবশ্যকতা হেতু দুই প্রদেশের প্রধান মন্ত্রিগণ মাসে অন্ততঃ একবার উক্ত উদ্দেশ্যে মিলিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত দুই প্রদেশের চীফ সেক্রেটারীদ্বয় পনের দিনে একবার সম্মিলিত হইবেন। যখন আসাম, কুচবিহার ও জিপুরার সমস্ত আলোচিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে তখন পশ্চিম বঙ্গের চীফ সেক্রেটারী উক্ত অঞ্চলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতির ব্যবস্থা করিবেন।

৩য় ধারা

১। এই সম্মেলন অর্গে আর একটি আন্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্মেলন আহ্বান করিবার জন্ত সুপারিশ করিতেছেন। এই সম্মেলনে যে অপরাপর প্রদেশ (পূর্ব ও পশ্চিম পঞ্জাব এবং সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত) হইতে ব্যাপকভাবে বাস্তবতাগ্ৰহীত হইয়াছে অথবা বাস্তবতাগ্ৰহণের সম্ভাবনা আছে সেই সকল প্রদেশের প্রতিনিধিগণ উপরে উল্লিখিত প্রস্তাব অথবা নিম্নোক্ত পরিায় অপার উপযুক্ত প্রস্তাব গ্রহণের জন্ত সমবেত হইবেন :—

(ক) যে সকল শরণাগত এক ডোমিনিয়ন হইতে অপর ডোমিনিয়নে সাময়িকভাবে বা অস্থায়ীভাবে চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সম্পত্তি রক্ষা বা রক্ষা সম্পর্কে অপর ব্যবস্থা।

(খ) উপরোক্ত এলাকায় এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাহাতে সংখ্যালঘুগণ তাহাদের স্বার্থ ও অধিকার সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ বলিয়া আশ্বস্ত হইতে পারে এবং বাস্তবতাগ্ৰহণ বন্ধ হইতে পারে কিংবা বাস্তবতাগ্ৰহণকে পুনরায় তাহাদের বাড়ীঘরে প্রত্যাবর্তনে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে।

২। আরও জানা গিয়াছে যে, ইতিমধ্যে স্বীকৃত আর একটি পৃথক সম্মেলন পূর্ব ও পশ্চিম পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিশেষ সমস্তা সম্পর্কে বিবেচনার জন্ত অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ সম্মেলনের ব্যবস্থাও অর্গেণে করিবার জন্ত এই সম্মেলন সুপারিশ করিতেছেন।

৩। আর একটি আন্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্মেলনও অর্গেণে আহ্বান করিবার জন্ত সুপারিশ করা হইয়াছে। এই সম্মেলনে পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিয়া পূর্ব বাংলা হইতে আসামে যাইয়া মুসলমানদের বসবাস সম্পর্কে এবং উক্ত সম্মেলন হইবার সাপক্ষে ব্যবচ্ছেদের পূর্বে আসামে পূর্ব বাংলার বসবাসকারী মুসলমানদিগের সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন কিংবা ব্যাপকভাবে বাস্তবতাগ্ৰহণের সম্ভাবনা থাকিতে পারে এমন কিছু করা হইবে না বলিয়া উভয় পক্ষ সম্মত হইয়াছেন।

৪র্থ ধারা

আন্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্মেলনের নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়াছেন তৎসম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে এবং উভয় ডোমিনিয়ন এতৎসঙ্গে সংশ্লিষ্ট পক্ষে উল্লিখিত সংশোধন সহ উক্ত রিপোর্টের সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকরী করিবার জন্ত দুই ডোমিনিয়ন সম্মত হইয়াছেন। উক্ত কমিটির রিপোর্ট এই সঙ্গে দেওয়া হইল।

বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ

স্থিতিবস্থা চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়াতে উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে শুষ্ক নির্ধারণ ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং মাল চলাচল সম্পর্কে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধিনিষেধ আরোপ করিতে হইয়াছে। উল্লিখিত বিষয় সহ অত্যন্ত আরও বহু সমস্তা

পরীক্ষার জন্ত ভারত-পাকিস্তান সম্মেলন প্রারম্ভেই উভয় ডোমিনিয়নের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, কয়েকজন প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের কর্মচারী এবং বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি কমিটি নিয়োগ করেন। শুষ্ক নির্ধারণ ব্যবস্থা ও নানারূপ বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ার ফলে যে আর্থিক কষ্ট এবং যাত্রীদের বহু অন্তর্বিধা সৃষ্টি হইয়াছে ইহা উপলব্ধি করিয়া কমিটি যথাসম্ভব উহার কঠোরতা ইত্যাদি হ্রাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কমিটি ইহাও বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেন যে আর্থিক কষ্ট সৃষ্টি হওয়াতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নরনারী ব্যাপকভাবে বাস্তবতাগ্ৰহণ করিতেছেন, কাজেই এইরূপ অবস্থা চলিতে দেওয়া সমীচীন নহে। উভয় ডোমিনিয়নের স্বার্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কমিটি নূতন পরিস্থিতি অনুযায়ী সমস্তাগুলিকে যথাসম্ভব সহজ উপায়ে সমাধানের উদ্দেশ্যে কতক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কমিটির যে সমস্ত প্রস্তাব ডোমিনিয়ন ও প্রাদেশিক মন্ত্রী সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল।

১। মাল ও যাত্রী চলাচল সম্পর্কিত বিধিনিষেধ।

(ক) উভয় ডোমিনিয়নের যাত্রীদের সাধারণ বিছানাপত্র বলিতে কি বুঝাইবে তাহা উভয়পক্ষের শুষ্ক বিভাগীয় কতৃপক্ষ যুক্তবৈঠকে স্থির করিবেন।

(খ) বিছানাপত্র সম্পর্কিত বিধিনিষেধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিরক্তিকর আচরণ ও যাত্রীদের অযথা হয়রানির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(গ) শুষ্ক বিভাগ কতৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ যাত্রীদের বিছানাপত্র তল্লাসী করিতে পারিবে না।

(ঘ) নীতি হিসাবে গাত্রতল্লাসীর ব্যবস্থা যথাসম্ভব পরিহার করিতে হইবে। গোপনে কোন দ্রব্য লইয়া যাইতেছে এইরূপ সন্দেহ জন্মিবার সন্তোষজনক কারণ থাকিলে গাত্রতল্লাসী লওয়া হইবে। উল্লিখিতরূপ ক্ষেত্রে শুষ্ক বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে, ঘটনাস্থলে যে সিনিয়র অফিসার উপস্থিত থাকিবেন তাঁহার সমক্ষে গাত্রতল্লাসী লওয়া হইবে এবং তল্লাসীর সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। আইনের প্রয়োগ যাহাতে যথাযথভাবে হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখার জন্ত সংযোগরক্ষাকারী অফিসারকে সুযোগসুবিধা দিতে হইবে।

(ঙ) কোন কারণে মহিলাযাত্রীর গাত্রতল্লাসী লওয়া অপরিহার্য হইলে সামুদ্রিক শুষ্ক আইনের বিধান অনুসারে মহিলা অফিসার দ্বারা তল্লাসী করিতে হইবে।

(চ) যাত্রীদের ব্যক্তিগত দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে শুষ্ক বিভাগীয় বাঁধাধরা নিয়মের দায় হইতে অব্যাহতি অথবা কঠোরতা হ্রাসের উদ্দেশ্যে উভয় ডোমিনিয়ন স্ব স্ব টেরিফ সিডিউল এবং আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি পুনর্বিবেচনা করিবেন।

(ছ) যাত্রীদের সুসুবিধার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার



নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। 'খ' প্যাসেঞ্জারদের অথবা তল্লাসীর দায় এবং হয়রানি হইতে অব্যাহতি দানের জ্ঞ যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(জ) অহুমোদিত সরকারী কর্মচারী, অর্থাৎ পুলিশ অফিসার ব্যতীত অপর কেহ নিষিদ্ধ পণ্য অথবা গোপনে মাল আমদানী রপ্তানী চালাইতেছে কিংবা উক্ত কাঞ্চে লিপ্ত এরূপ সন্দেহজনক কোন ব্যক্তিকে সীমান্ত অতিক্রমকালে আটক করিতে পারিবেন না। উল্লিখিতরূপ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জ্ঞ নিকটবর্তী কাষ্টম-খাটিতে প্রেরণ করিতে হইবে। শুদ্ধ বিভাগীয় কর্মচারী ব্যতীত অপর কেহ তাহার জিনিষপত্র তল্লাসী করিতে পারিবে না। অহুমোদিত প্রত্যেক অফিসারকে যথারীতি 'ব্যাজ' ধারণ করিতে হইবে।

(ঝ) শুদ্ধ বিভাগ কর্তৃক অহুমোদিত প্রত্যেক কর্মচারীকে 'ব্যাজ' অথবা পরিচয়পত্র রাখিতে হইবে।

(ঞ) কোন যাত্রী কাষ্টমস সীমান্ত অতিক্রম করিলে পুনরায় তাহার গাত্র অথবা জিনিষপত্র তল্লাসী করা হইবে না।

#### ১। পণ্য ও অত্যাচ্ছদ্রব্য

পণ্য ও অত্যাচ্ছদ্রব্যাদির চলাচলের সুবিধার জ্ঞ কমিটি নিম্নোক্ত সুপারিশগুলি পেশ করেন,—

(ক) উভয় ডোমিনিয়নকে যথাসম্ভব পরস্পর নিকটবর্তী অঞ্চলে সমসংখ্যক কাষ্টমস পোষ্ট স্থাপন করিতে হইবে।

(খ) আর্থিক দিক বিবেচনা করিয়া উভয় ডোমিনিয়ন যথাসম্ভব আমদানী ও রপ্তানী শুদ্ধ ধার্যযোগ্য দ্রব্যের তালিকা হ্রাস করিবেন। সুনির্দিষ্ট কতক দ্রব্য ব্যতীত অপরগুলি শুদ্ধমুক্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ইহাতে পচনশীল দ্রব্যের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা দেখা দিয়াছে তাহা দূরীভূত হইবে।

(গ) উভয় ডোমিনিয়ন অসুস্থরূপে রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণসম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি পূর্ববিবেচনা করিবেন। উভয় ডোমিনিয়নে বর্তমান আমদানীর উপর কোনরূপ শুদ্ধধার্য নাই।

(ঘ) সীমান্তবাসী কোন কৃষক অপর ডোমিনিয়নে চাষ-আবাদ করিলে এবং উৎপন্ন শস্য নিয়ন্ত্রণ তালিকাজুস্ত থাকিলে শস্য সংগৃহীত হইবার পর একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তাহার নিজের ব্যবহারের জ্ঞ উক্ত শস্যের একটা অংশ গৃহে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে আইনের কড়াফি যথাসম্ভব হ্রাস করিতে হইবে।

#### ২। মাল চলাচল ব্যবস্থা

(১) অপর ডোমিনিয়নকে মাল চলাচলের সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ডোমিনিয়নকে আন্তর্জাতিক চুক্তির বিধান-বলী অনুযায়ী কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে; (২) চুক্তিবদ্ধ ভাবে চালানী মালের বহির্বিনিময় ব্যবস্থার দরুন পাওনা-কিস্তি-দেনা হইলে তাহা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথাক্রমে যে ডোমিনিয়ন হইতে মাল প্রেরিত হইয়াছে, কিস্তি যে

ডোমিনিয়নে প্রেরিত হইয়াছে তাহার উপর বর্তিবে, যে ডোমিনিয়নের ভিতর দিয়া ইহা চলাচল করিবে তাহার উপর নহে; (৩) অত্যাচ্ছদ্র প্রেরিত মাল চলাচলেও আভ্যন্তরীণ মাল চলাচল ব্যবস্থার অসুস্থরূপ সুযোগসুবিধা দিতে হইবে; (৪) উভয় ডোমিনিয়নের শুদ্ধ বিশেষজ্ঞগণ বৈঠকে মিলিত হইয়া ভৌগোলিক অবস্থান ও মাল চলাচলের সুবিধা অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে মাল চলাচলের যথাসম্ভব সহজ ও সরল পন্থা নির্ধারণ করিবেন। বিশেষ দ্রষ্টব্য :—উভয় ডোমিনিয়নের সীমান্তবর্তী খাটিসমূহ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে মাল চলাচল খাটি স্থাপনের আবশ্যিকতা এবং ইতিপূর্বে যে ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধেও পুনর্বিবেচনা করিতে হইবে; (৫) শুদ্ধ খাটিতে যে ডোমিনিয়ন হইতে মাল প্রেরিত হইয়াছে সেই ডোমিনিয়নের শুদ্ধ বিভাগীয় অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে। এই মাল অপর ডোমিনিয়ন হইতে আসিয়াছে এরূপ সন্দেহে ইহা অগ্রাহ্য করা চলিবে না; (৬) মাল চলাচলের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার জ্ঞ এবং যাহাতে কোনপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি না হয় তজ্জ্ঞ এক ডোমিনিয়নের অফিসার-দিগকে অপর ডোমিনিয়নের অফিসারদের সহিত সহযোগিতা করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ গ্রহণ করিতে হইবে; (৭) যদি কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় তাহা দূর করিবার জ্ঞ প্রত্যেক ডোমিনিয়নকে অপর ডোমিনিয়নে সর্বসম্মত ব্যবস্থানুযায়ী নির্ধারিত প্রধান প্রধান শুদ্ধ খাটিসমূহে ও মাল চলাচল পথের অত্যাচ্ছদ্র স্থানে বিশেষভাবে নির্ধারিত যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিসার নিয়োগ করিতে হইবে। এই সব অফিসারকে যাত্রী ও লটবহর চলাচল সংক্রান্ত অত্যাচ্ছদ্র কর্তব্যও সম্পাদন করিতে হইবে; (৮) যে সব ক্ষেত্রে শুদ্ধ সড়কের পথে কিংবা জলপথে অথবা অজ কোনপ্রকার যানবাহনের সাহায্যে সড়কের পথে ও জলপথে মাল চলাচলের ব্যবস্থা রহিয়াছে, সেই সব ক্ষেত্রে 'আউট এঞ্জেনী' প্রতিষ্ঠা করিয়া মাল চলাচলের প্রয়োজনীয় সুবিধা করিয়া দিতে হইবে।

#### ৩। যানবাহন

(ক) যানবাহনের উপর যে চাপ পড়িয়াছে তাহা লাঘব করিবার জ্ঞ উভয় ডোমিনিয়নের রেলওয়ে কর্তৃক কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক চুক্তির প্রয়োজন।

ট্রেনযোগে মাল প্রেরণ সম্পর্কে যে সমস্ত অসুবিধা দেখা দিয়াছে ঐগুলি দূর করিবার জ্ঞ পূর্ব অঞ্চলের তিনটি রেলওয়ে এবং পশ্চিম অঞ্চলের রেলওয়ে দুইটির প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটি কার্য্যনির্বাহক কমিটি গঠন করিতে হইবে। এই কমিটিকে (১) ওয়াগনগুলি যাতায়াতে বিলম্ব, (২) ওয়াগন বরাদ্দ ও ভাড়া নির্ধারণ সম্পর্কে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার এবং (৩) অগ্রাধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হইবে।

(খ) সমগ্রভাবে উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে ট্রেন ও মালগাড়ী চলাচল সংক্রান্ত বৃহত্তর বিষয়টি সম্পর্কে নীতি নির্ধারণকল্পে একটি আন্তঃ-ডোমিনিয়ন রেলওয়ে কার্যনির্বাহক কমিটি গঠনেরও সুপারিশ জানান যাইতেছে।

(৪) মেরামতের সুযোগ-সুবিধা

আমদানী এবং পুনরায় রপ্তানী সংক্রান্ত নিয়মানুযায়ী সাধারণতঃ যেরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, এক ডোমিনিয়ন হইতে অল্প ডোমিনিয়নে মেরামতের জন্য যন্ত্রপাতি প্রেরণ ও প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারেও তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে। কিন্তু শুষ্ক আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে যন্ত্রপাতি প্রেরিত হইয়া থাকিলে সে ক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়ম প্রয়োগের ব্যাপারে বিশেষ কড়াকড়ি অবলম্বন করা হইবে না এবং তিন মাস পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হইবে।

বিবিধ বিষয়

(ক) স্থিতিাবস্থা চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীদিগকে বিশেষ অনুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। এই অবস্থার প্রতীকারকল্পে বিদেশ হইতে আমদানী মালপত্র যাহাতে অল্প ডোমিনিয়নের ক্ষেতাদের অর্ডার অনুযায়ী সরবরাহ করা যায় তজ্জন্ত উভয় ডোমিনিয়নের কর্তৃপক্ষই রপ্তানীর লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে বিশেষ সহানুভূতির সহিত আবেদনপত্রগুলি সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন।

অন্তর্কর্ত্তী সময়ের জন্তই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। সাধারণতঃ ১৯৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্বে যে সমস্ত মালপত্র জাহাজযোগে প্রেরিত হইয়াছে এবং তজ্জন্ত মাস্তুলও প্রদত্ত হইয়াছে ঐ সকল ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে। এক ডোমিনিয়নের ব্যবসায়িক অল্প ডোমিনিয়নের বন্দরগুলির মারফত আমদানীর উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে কোনও মালপত্রের অর্ডার দিয়া থাকিলে সে ক্ষেত্রে স্থিতিাবস্থা চুক্তি অথবা স্বাভাবিক চালান ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে হইবে। যে সমস্ত ব্যক্তি এই ভাবে মালপত্র আমদানীর জন্য অর্ডার দিয়াছে এবং যথারীতি মালপত্রের মূল্য প্রদান করিয়াছে বা করিতে মনস্থ করিয়াছে তাহাদিগকে এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইবে না।

(খ) ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, কমিটির কলিকাতার এই বৈঠকে বাগিন্জা চুক্তির নির্দিষ্ট ধারা নির্ধারণ কল্পে আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষ এক্ষণে দুইটি ডোমিনিয়নে বিভক্ত হইয়াছে। যত দিন পর্য্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা ও নীতিসমূহ নির্ধারিত না হইতেছে তত দিনের জন্য দেশ বিভাগের পূর্বের সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থাদির বিচার করতঃ এক ডোমিনিয়ন যাহাতে অল্প ডোমিনিয়নের পক্ষে অত্যাবশ্যক জিনিষপত্র

সরবরাহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই এই কমিটির উদ্দেশ্য। স্থিতিাবস্থা চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় এবং শুষ্ক আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় অবস্থার আরও অবনতি ঘটয়াছে। তৎসম্পর্কেও এই কমিটিকে অবহিত হইতে হইবে। এই অবস্থার ফলে বিশেষভাবে পূর্বোক্তের সাধারণ লোক-জনের দৈনন্দিন জীবন হুমকিমুখ হইয়া উঠিয়াছে। মাছ, টাটকা ফলফুলারি, দুগ্ধ, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, শাকসব্জী এবং জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি প্রাত্যহিক প্রয়োজনের জিনিষপত্রের জন্য এক ডোমিনিয়নভুক্ত কোন কোনও অঞ্চলকে অল্প ডোমিনিয়নের সীমান্ত এলাকার উপর নির্ভর করিতে হয়।

(গ) বিভিন্ন গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিদের অভিমতাদি সম্পর্কে বিবেচনাক্ষেত্রে কমিটি টাটকা ফলফুলারি, শাকসব্জী, টাটকা দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, হাঁস মুরগী প্রভৃতি ও ডিম্ব, স্থানীয় মসলাপত্র, বাঁশ, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি দ্রব্যাদি এক ডোমিনিয়ন হইতে অল্প ডোমিনিয়নে চালানের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট কোনরূপ বাধানিষেধ আরোপ করিয়া থাকিলে তাহা প্রত্যাখ্যারের সুপারিশ জানাইতেছেন। ইহাদের উপর কোনরূপ শুষ্ক বাধ্য হইয়া থাকিলে তাহাও বাতিল করিতে হইবে।

পূর্ববঙ্গে সর্ষপ তৈল সরবরাহ সম্পর্কে আলোচনার জন্য ভারতীয় যন্ত্রপাতি একট বৈঠকের ব্যবস্থা করিতে সম্মত হইয়াছেন। আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যেই এই সভার অধিবেশন হইবে। তত দিন পর্য্যন্ত পাকিস্তান গবর্ণমেন্ট কোনরূপ শুষ্ক না লইয়া অবাধে পূর্বের স্থায় মৎস্য (টাটকা ও শুটকী) চালানের অনুমতি দিবেন।

(ঘ) কমিটির অভিমত এই যে, উভয় অঞ্চলের পারস্পরিক অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য উভয়তঃ অত্যাবশ্যক মালপত্র সরবরাহের উদ্দেশ্যে অদূর ভবিষ্যতে উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে এক বা একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে তদ্বারা উভয় ডোমিনিয়নেরই স্বার্থ রক্ষিত হইবে। এইরূপ চুক্তি সম্পাদিত ও কার্যো পরিণত হইলে বর্তমানে যে সমস্ত অঞ্চল একাধিক ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে পূর্বকালীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলা সম্ভবপর হইবে এবং উত্তরোত্তর আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে। এই বিষয়টি ও এতৎসংশ্লিষ্ট অত্যাশ বিষয়গুলি সম্পর্কে উভয় গবর্ণমেন্টের মধ্যে আলোচনার জন্য শীঘ্রই তারিখ নির্দিষ্ট করিতে হইবে। ইতিমধ্যে উভয় ডোমিনিয়নের পক্ষে অত্যাবশ্যক আন্তঃ-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কমিটি কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছেন।

(ঙ) ডাক তার ও টেলিকোনের হার :

ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, উপরোক্ত বিষয় এবং এক্সচেঞ্জের মারফত পোষ্ট কার্ড এবং অন্যান্য পত্রাদি প্রেরণের দরুন

বর্তমানে যেরূপ বিলম্ব ঘটতেছে উহা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে চিঠিপত্র চলাচল ব্যবহার জটিলতা হ্রাস করার প্রশ্ন উভয় ডোমিনিয়নের বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক অতি সত্বর পরীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। এই আলোচনার উদ্যোগ-আয়োজন ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে। স্তরের আওতায় পড়ে এরূপ পার্থক্যের বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন হইতে পারে।

(চ) অতীতে উভয় ডোমিনিয়নেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি সহ অগ্ন্যস্ত্র মালপত্র বে-আইনীভাবে আটক করা হইয়াছে। কমিটি স্বীকার করিতেছেন যে, বর্তমানে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অবিলম্বে এই ধরনের বে-আইনী আটক বন্ধ করার জন্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি উভয় গবর্ণমেন্টের আদেশ জারী করা প্রয়োজন। স্থিতিবস্থা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই যে সকল মাল চালান হইয়াছে সেগুলি মাঝ্মুলী নিয়মের বিশেষ কড়াকড়ি না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

#### সংযোগরক্ষা

কমিটি মনে করেন যে, ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং হয়রানি ও সর্বপ্রকার বিলম্বের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্ত উভয় ডোমিনিয়নের প্রত্যেক স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে সংযোগরক্ষা একান্ত আবশ্যিক। কাজের চাপ ও ধরণ বৃদ্ধিয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্পেশাল লিয়াজন অফিসার নিয়োগ ছাড়াও উভয় পক্ষের অন্তর্বিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ভারত ও পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের কর্মচারী-দিগকে পরস্পরের সহিত সংযোগ ও সদিচ্ছা রক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সার্থকভাবে কোন চুক্তি বা বিধি পালন করিতে হইলে সর্বস্তরের সরকারী কর্মচারীদের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করিতে হয়। উভয় ডোমিনিয়নের সর্বোচ্চ শাসনকর্তৃপক্ষকে তাহাদের অধীন সর্বস্তরের কর্মচারীদের মধ্যে এই মনোভাব জাগ্রত করিবার জন্ত প্রয়াসী হইতে হইবে।

#### পাকিস্থানে মাল চালান

কাষ্টমস কীকি দিয়া পূর্ব পাকিস্থানে বে-আইনী মাল চালান একটি বড় রকমের সমস্যার পরিণত হইয়াছে। রাণা-ঘাট এবং হিঙ্গলগঞ্জ এ বিষয়ে চূড়ান্ত কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। ২৪পরগণা জেলার হাসনাবাদ থানার এলাকাধীন হিঙ্গলগঞ্জ বাজারটি পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার সীমান্তে অবস্থিত। এই বাজার হইতে কিছু দিন যাবৎ লক্ষ লক্ষ টাকার দ্রব্য প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে নদীর অদূর তীরবর্তী পাকিস্থান অঞ্চলে বে-আইনী ভাবে চালান দেওয়া হইতেছে। এই কার্যে পাকিস্থানী চোরাকারবারীদের সহিত সরকারী কর্মচারিবৃন্দ ও স্থানীয় বাজার কমিটির বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ সহযোগিতা করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কংগ্রেস-সদস্যের সংখ্যাও কম নয়। হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জে ইছামতী ও কালিন্দী নদী

পূর্ববঙ্গের প্রধান প্রবেশপথ। সেই পথ দিয়া মাল সারা পূর্ববঙ্গে এমন কি আসাম পর্যন্ত চলাচল করে। গত ১লা মার্চ হইতে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে শুষ্কপ্রাচীর স্থাপিত হওয়ার পর হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জে আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুষ্ক ধার্যের জন্ত কয়েকজন কর্মচারী লইয়া ল্যাণ্ড কাষ্টমস আপিস খোলা হইয়াছে। কিন্তু বসিরহাট মহকুমার সর্বত্র ও হাসনাবাদ-হিঙ্গলগঞ্জে ল্যাণ্ড কাষ্টমসের কর্মচারীগণ, স্থানীয় পুলিশ, মহকুমা হাকিম ও কয়েকজন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সহযোগিতায় বা নিষ্ক্রিয়তায় প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ টাকার বস্ত্র, চিনি, সরিষার তৈল, দেশলাই প্রভৃতি অবাধে পাকিস্থানে চলিয়া যাইতেছে। এই বে-আইনী চালানের পিছনে একটি সম্ভবতঃ দল কার্য করিতেছে। ইহার যেরূপ চতুর, তেমনি দুঃসাহসী এবং তেমনি বিতশালী ও প্রতিষ্ঠাবান।

দৈনিক ভারতের নিজস্ব প্রতিনিধির বিবরণ হইতে অবস্থার শুষ্ক ধার্য খানিকটা উপলব্ধি করা যাইবে। উহার কতকাংশ এইরূপ :—

“কিন্তুপক্ষে এই সকল ব্যবসা চলিতেছে তাহার বিবরণ দিতে গেলে প্রথমেই পশ্চিম বঙ্গের সরবরাহ বিভাগ, দ্বিতীয় বসিরহাট মহকুমা হাকিম, তৃতীয় হিঙ্গলগঞ্জের ল্যাণ্ড কাষ্টম অফিসার, চতুর্থ হাসনাবাদের ল্যাণ্ড কাষ্টম অফিসার, ও দুই-এক জন ছাড়া হাসনাবাদের পুলিশকে ইহার জন্ত বিশেষ দায়ী করিতে হয়। ইহা ছাড়া হিঙ্গলগঞ্জের বাজার কমিটির প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী এবং হাসনাবাদ বাজার কমিটির সেক্রেটারী ও কয়েকজন সদস্যের কথা বলিতে হয়। এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হিঙ্গলগঞ্জ বাজার কমিটির প্রেসিডেন্ট এক জন চিকিৎসা ব্যবসায়ী কিন্তু এক্ষণে তাহা ত্যাগ করিয়া তিনি বস্ত্র কারবারীরূপে পরিণত হইয়াছেন। আর হাসনাবাদের বাজার কমিটির সেক্রেটারী এক জন হোটেলওয়ালার এবং অগ্ন্যস্ত্র সদস্যগণের মধ্যে উকিল প্রভৃতি আছেন। কিন্তু তাহারাও তাহাদের ব্যবসা ছাড়িয়া লক্ষ লক্ষ টাকা মালের চোরাই কারবার করিতেছে ও প্রচুর মুনাফা খাইতেছে।

প্রত্যহ ৫০।৬০ গাঁইট এবং সপ্তাহে প্রায় ৪ শত গাঁইট বস্ত্র হিঙ্গলগঞ্জে প্রেরিত হয় কিন্তু অল্পসন্ধান করিয়া দেখা যায় হিঙ্গলগঞ্জ তো দূরের কথা আশেপাশের ইউনিয়নে একখানি বস্ত্রও পাওয়া যাইবে না। কিন্তু এ পর্যন্ত যত বস্ত্র, চিনি ও সরিষার তৈল হিঙ্গলগঞ্জে পাঠানো হইয়াছে তাহাতে সে স্থান ও তাহার পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের লোকেরা দৈনিক দুইখানি নুতন বস্ত্র, এক সের চিনি ও এক সের সরিষার তৈল পাইতে পারে।

অল্পসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, পশ্চিম বঙ্গের সরবরাহ বিভাগের ১২নং শ্রী স্কুল ষ্ট্রীট হইতে ইছামত পারমিট ইঙ্গ করা হয় হাসনাবাদ ও অগ্ন্যস্ত্র স্থানে বস্ত্র লইয়া



যাইবার জন্ত। তাহাতে দেখিলাম যে দাণী চোরাকারবারীরা—যাহারা জেলে আছে তাহাদের নামেও এখনও পারমিট ইস্যু করা হইতেছে। সেই পারমিটের বলে কাপড় অবশেষে লরী ও রেলযোগে হাসনাবাদে আসে ও ল্যাণ্ড কাষ্টম, পুলিশ ও বাজার কমিটির সুপারিশে হিঙ্গলগঞ্জে বাইবে এই নামে নৌকায় উঠান হয় ও পাকিস্তানের দিকে পাড়ি দেয়। মাঝে মাঝে কাজ দেখানো হইতেছে মনে করিয়া যদি বা কখনও কোন নৌকা আটকানো হয় তো হিঙ্গলগঞ্জের ল্যাণ্ড কাষ্টম অফিসার আবার আগাইয়া আসিয়া নিজের দায়িত্বে তাহা ছাড়াইয়া লইয়া যান। পুলিশের যিনি সং কর্মচারী বলিয়া পরিচিত শুনিলাম তিনি প্রথমে এই সকল অনাচার বন্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং তাহাতে কিছু পরিমাণ সফলকামও হইয়া ছিলেন। কিন্তু বসিরহাটের মহকুমা হাকিমের নির্দেশে তিনি গত ১৩ই মার্চ হইতে কোন কিছু আর করিতে পারিতেছেন না। তাহার ফলে দেখা গেল যেখানে দৈনিক ৫৭ বেল বস্ত্র যাইত সেখানে এখন দৈনিক ২০০১০০০ বেল কাপড়ও চলিয়া যাইতেছে। অল্পরূপভাবে সরিষার তৈল ও চিনিও যায়। যাহারা আবার কাষ্টমকে ফাঁকি দিতে চায় তাহারা হাসনাবাদ বাজার কমিটির সাহায্যে রাত্রে অন্ধকারে মাল পরপারে চালান করে। বাজার কমিটির লোকেরা তাহাদের মাল খালাস ও নৌকা ভাড়া পর্যন্ত ঠিক করিয়া দেয়। দেখিলাম মার্টিন রেল এক জন কুলির সর্দার আমার সম্মুখে ১ খণ্ডায় ৫০ টাকা উপার্জন করিল।

হাসনাবাদের ল্যাণ্ড কাষ্টম অফিসারকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কি পদ্ধতিতে তিনি মাল ছাড়েন। তিনি একখানি রেলের রসিদ দেখাইলেন। তাহাতে দেখিলাম শুধু পারমিট নম্বর আছে কিন্তু স্থানের উল্লেখ নাই। জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন ইহাতেই হইবে এবং তিনি হিঙ্গলগঞ্জের জন্ত সরাসরি সেই মালের পারমিট ইস্যু করেন। আমি বলিলাম যে ইহাতেই যদি হইবে বলিলেন তবে পাকিস্তানে মাল পাঠানোর জন্ত আপনি কেন পারমিট ইস্যু করিতেছেন এবং সে বিষয়ে আপনার ক্ষমতা কতদূর? তিনি নিরুত্তর রহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম হিঙ্গলগঞ্জে কত বস্ত্র যায়। তিনি আমাকে একখানি হিঙ্গলগঞ্জ বাজার কমিটি কর্তৃক তৈয়ারী বস্ত্রব্যবসায়ীর লিষ্ট দেখাইলেন। তাহাতে দেখিলাম চোরাকারবারী বলিয়া শাস্তি প্রাপ্ত ব্যবসায়ী হইতে যাহারা কোনদিন ব্যবসা জানে না তাহাদের নাম পর্যন্ত এই তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে এবং রোজই আরও নাম আসিতেছে। সেই তালিকা হইতে দেখা গেল যে, সরকারীভাবেও সপ্তাহে ৪০০ বেল বস্ত্র হিঙ্গলগঞ্জে যায়।

হাসনাবাদ বাজার পাকিস্তানে চালান দেওয়ার জন্ত একটি বিরাট ব্যবসায় কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। রাতারাতি পানের দোকান, মুদির দোকান, বাসনের দোকান প্রভৃতি বজ্রের

দোকানে পরিণত হইয়াছে। এই বাজার ২৪ ঘণ্টার জন্ত খোলা থাকে এবং পাকিস্তানে চালানোর জন্ত বাজার কমিটির সুপারিশে অসংখ্য বস্ত্র বিক্রয় হয় এবং রাত্রে অন্ধকারে পাকিস্তানগামী নৌকায় চাপানো হয়।

সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী ব্রহ্মচারী ভোলা নাথও কালিন্দী ও ইছামতী নদী পথে সীমান্তের বে-আইনী চোরাকারবার সম্বন্ধে বহু তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। নদীপথ ভিন্ন রেলপথে এবং যশোর রোড ও কৃষ্ণনগর রোড দিয়াও প্রচুর মাল বে-আইনী ভাবে চালান যাইতেছে। রেলপথে কলিকাতা হইতে বনগ্রাম লাইনে বারাসত, মসলন্দপুর, গোবরভাঙ্গা প্রভৃতি প্রত্যেক স্টেশনে চোরাকারবারীদের এক একটা ঘাঁটি আছে। ইহারা সুযোগ বুঝিয়া যে কোন একটি ঘাঁটিতে মাল নামায় এবং গোপনে সুবিধা যত এক স্থান হইতে অপর স্থানে সরাইয়া অবশেষে পাকিস্তান এলাকায় লইয়া যায়। এই রাস্তার মধ্যে বারাসত স্টেশনে ও বারাসতের চাঁপাভাঙ্গার সংযোগস্থল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। এই সংযোগস্থল হইতে তিনটি রাস্তা তিন দিক দিয়া পাকিস্তানে গিয়া পড়িয়াছে। প্রথমটি যশোর রোড, দ্বিতীয়টি বসিরহাট ইটুগাঘাট রোড এবং তৃতীয়টি কৃষ্ণনগর রোড। এখানে পুলিশের কোন কড়া পাহারা নাই। চোরাকারবারীরা জানে যে একবার মাল লইয়া ভারতীয় ইউনিয়নের সীমানা পার হইতে পারিলেই তাহাদের আর কোন ভাবনা নাই।

ডায়মন্ডহারবার এবং রাণাঘাটেও একরূপ ঘাঁটি গড়িয়া উঠিতেছে। রাণাঘাটে তিনটি ট্রেন তল্লাসী করিয়া এক দিনে তিন লক্ষ টাকার কাপড় উদ্ধার হইয়াছে। মেলব্যাগে, ট্রেনের জলের ট্যাঙ্কে এবং ট্রেনের তলায় বাঁধা অবস্থায় বহু কাপড় পাওয়া গিয়াছে।

কাষ্টমস ফাঁকি দেওয়া গুরুতর অপরাধ। মুর্শিদাবাদ সীমান্তে বে-আইনী চালান বন্ধ করিবার জন্ত তথাকার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, রাত্রে কারফিউ জারী করিতেও তিনি দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নদীয়া এবং ২৪পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরয় এবং সংশ্লিষ্ট মহকুমা হাকিমেরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। উচ্চতর আধিকারীদের কথা না বলাই ভাল। কলিকাতা এই সব চালানোর মূল কেন্দ্র। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে চোরাকারবার বন্ধ করিবার ক্ষমতা পুলিশের নাই, কারণ পুরনো অর্ডিন্যান্স বাতিল হইয়া গিয়াছে এবং নূতন বিল আইনে পরিণত হয় নাই। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি ব্ল্যাক-মার্কেট বিল নামে একটি বিল ব্যবস্থা-পরিষদে আনিয়াছিলেন এবং নিরাপত্তা বিলের বিরুদ্ধে রিফ্রাভ প্রদর্শনের জন্ত এই বিল পাস হইতে এক দিন দেবী হওয়ার বলিয়াছিলেন যে

বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা চোরাকারবারীদের হইয়া বিল পাস হইতে দেয়ী করাইয়া দিয়াছে। বিলটি পাস হওয়ার পর প্রায় এক মাস তিনি প্রধানমন্ত্রীর গদীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু বিলটিতে গবর্ণরের সম্মতি তিনি লইতে পারেন নাই। বর্তমান মন্ত্রীসভাও তিন মাসের মধ্যে এই কাজটি করেন নাই।

সীমাস্থের চোরাকারবারে বাঙালী এবং মারোয়াড়ী ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। সরবরাহ বিভাগ এবং মন্ত্রীসভা এটা জানেন না ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মন্ত্রী বড়বাকারে মারোয়াড়ীদের নিকট সভায় অভিনন্দন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেখানে বলিয়া আসিয়াছেন যে কাপড়ের চোরাকারবার বন্ধ করিবার ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাই। মন্ত্রী মহাশয়ের দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ মারোয়াড়ীরা গ্রহণ করিয়াছে, বোম্বাই ও আমেদাবাদ হইতে গত কয়েক সপ্তাহে এত কাপড় আসিয়াছে যে পশ্চিম-বঙ্গে সাত মাস কাপড়ের বণ্য বহিয়া যাইতে পারিত। অথচ এদিককার লোকে কাপড় দেড় গুণ দাম দিলেও পাইতেছে না। ইহার ফল হইয়াছে এই যে ভারত-সরকার শুষ্ক ব্যবস্থা দূর না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গে কাপড়ের চালান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গের পাঁচ-ছয়টি বাটতে কড়া পাহারা বসাইলেই যে-আইনী কারবার বন্ধ হইয়া যায়, তৎসত্ত্বেও তাহা করা হইতেছে না ইহা মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী কাহারও পক্ষে স্খাণ্ডার বিষয় নহে।

### দার্জিলিং-কলিকাতা রেলওয়ে

র্যাডক্লিফ এওয়ার্ডে পশ্চিম বঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা ছইটিকে মূল ভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দার্জিলিং-কলিকাতা রেল লাইনটি এই দুই জেলার সহিত কলিকাতা এবং পশ্চিম বঙ্গের প্রধান যোগসূত্র। লালগোলা-মণিহারিবাট-কাটিহার হইয়া শিলিগুড়ি যাওয়ার একটা রেলপথ আছে বটে, কিন্তু এই লাইনে যাওয়া দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ এবং পথে অনেকবার ট্রেন ও গ্লিমার বদল করিতে হয়। অল্প সময়ে এবং শিলিগুড়িতে একবার মাত্র ট্রেন পরিবর্তন করিয়া আসিবার এই রেলপথটি ভ্রমণযোগ্য থাকা পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এই পথটির অধিকাংশ পূর্বে পাকিস্থানে গড়িলেও উহা ব্যবহারের দাবী পশ্চিম বঙ্গের কিছু কম নয়।

পাকিস্থানের অতি উৎসাহী লীগ চমুদের উপদ্রবে এবং তথাকার সরকারী কর্মচারীদের উপেক্ষা ও নিষ্ক্রিয়তায় দার্জিলিং-কলিকাতা রেলের ভ্রমণ অসুবিধাজনক এবং কখনো কখনো রীতিমত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। রেলযাত্রীদের উপর স্থানীয় লোকেরা যথেষ্ট উপদ্রব করিতেছে, কোন প্রতি-কার পাওয়া যাইতেছে না।

দার্জিলিং মেলে জৈনিক অমুখ ও প্রায় পঞ্চ বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁহার পত্নী ও কন্যা এবং এক জন ডাক্তারসহ কামরা রিজার্ভ করিয়া দার্জিলিং যাইতেছিলেন। পার্শ্বতীপুরের দুই স্টেশন আগে কামরার দরজা খুলিবার জন্ত বাহিরে কতকগুলি লোক চীৎকার এবং দরজার ধাক্কাধাক্কি শুরু করে। দরজা খোলা হয় না। পরের স্টেশনে আবার এই ব্যাপার; তবে এবার দরজার উপর আঘাত আরও সজোরে। গাড়ী ছাড়িবার সময় ইহারা পার্শ্বতীপুরে দেখিয়া লইবে বলিয়া শাসাইয়া যায়। পার্শ্বতীপুরে গাড়ী থামিলে ইহারা দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলে, তাঁহারা দরজা খুলিয়া দেন এবং একদল লোক কামরার চুকিয়া উপদ্রব শুরু করে। অমুখ লোক ডাক্তার সঙ্গে লইয়া গাড়ী রিজার্ভ করিয়া যাইতেছেন বলিলেও ইহারা কর্ণপাত করে না। পার্শ্বতীপুর বলিয়া রক্ষা, গোলমাল শুনিয়া রেল কর্মচারীরা আসিয়া বদমায়েস-দের নিবৃত্ত করেন। পথিপার্শ্বস্থ ছোট স্টেশনে দরজা খুলিলে কি অবস্থা হইত তাহা অস্বপ্নমান করা কঠিন নয় এবং তিনটি স্টেশনে একই দলের কার্য ও কথাবাণী হইতে বুঝা গিয়াছিল যে ইহারা এই ট্রেনেই ভ্রমণ করিতেছিল।

এই উপদ্রব নিবারণের সহজ উপায় আছে। দার্জিলিং মেলে, নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস প্রভৃতি যে-সব ট্রেন ভারতীয় ইউনিয়নের একাংশ হইতে অপরাংশে পাকিস্থানের উপর দিয়া যায় সেইগুলিতে কয়েকটি করিয়া প্রথম, দ্বিতীয়, ইন্টার ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী ইউনিয়নের দুই অংশের যাত্রীদের জন্ত রিজার্ভ রাখা যাইতে পারে। এই সব গাড়ীতে “শুধু ইউনিয়নের যাত্রীদের জন্ত” এইরূপ কোন লেখা থাকা উচিত এবং পাকিস্থানের মধ্যে এই যাত্রীদের মালপত্র টানাটানি এবং তাঁহাদের উপর অপর কোন উপদ্রব সাহায্যে না হয় তাহা দেখিবার জন্ত প্রত্যেক ট্রেনে উভয় ডোমিনিয়নের এক বা দুই জন করিয়া রেল ও পুলিশ কর্মচারী থাকা উচিত। কোন গাড়ীতে যাত্রীদের উপর উৎপাত হইতেছে কিনা ইহারা প্রত্যেক স্টেশনে নামিয়া তাহা দেখিবেন। পাকিস্থান ও ইউনিয়নের মধ্যে যাহারা যাওয়া আসা করিবার সময় স্টেশনে স্টেশনে অত্যাচার ভাবে লাঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হন তাঁহাদের হয়রানি ও ক্ষতি নিবারণের জন্ত পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারেন। ইউনিয়নের দুই অংশে মাল-চলাচল সম্বন্ধেও অল্পরূপ ব্যবস্থা করা যায় এই ভাবে যে এই সব মালগাড়ী শীলমোহর করা থাকিবে, পাকিস্থানে কেহ এগুলি খুলিতে পারিবে না।

### পশ্চিম বঙ্গের সামরিক শিক্ষা

পশ্চিম বঙ্গের তরুণদের সামরিক শিক্ষাদান বিষয়ে কর্তৃপক্ষের যে গড়িমসি প্রথম হইতে দেখা যাইতেছিল; তাহা কতকটা দূর হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। পশ্চিম বঙ্গ

এখন সীমান্ত প্রদেশ, সামরিক প্রস্তুতির দিক দিয়া এই প্রদেশ এখন আর উদাসীন থাকিতে পারে না, সীমান্তরক্ষী দল এবং দেশরক্ষী বাহিনী গঠনে যত বিলম্ব হইবে পশ্চিম বঙ্গ তথা নিখিল-ভারতের স্বাধীনতা ও স্বাভিত্তিকতা বিপন্ন হইবে একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। প্রাক্তন মন্ত্রীসভা এ বিষয়ে বিন্দু-মাত্র কর্ণপাত করা আবশ্যিক বোধ করেন নাই বরং এরূপ প্রস্তাবকে সন্দেহের চোখেই দেখিয়াছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের গবর্নমেন্ট এই মনোভাব হইতে মুক্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু যতটা তৎপর হওয়া উচিত এখনও ততটা হইতে পারেন নাই। তবে তাঁহার এদিকে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন এবং একজ্ঞ তাঁহার জ্ঞানবাদের পাত্র।

সীমান্ত রক্ষার জন্ত একটি জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের ও উহার সৈনিকদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের আয়োজন করা হইয়াছে। ডাঃ রায়ের গবর্নমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে সীমান্তের ৩০০টি গ্রামের প্রত্যেকটি হইতে ২০ জন করিয়া লোক লইয়া ৬৬০০ জনের একটি সীমান্ত রক্ষীবাহিনী গঠিত হইবে। বলা বাহুল্য, স্থানীয় লোক লইয়া গঠিত এরূপ বাহিনী অধিকতর কার্যকরী এবং স্বল্পতর ব্যয়সাধ্য হইবে।

বাঙালী সামরিক জাতি নহে এই কথা ইংরেজ আমাদের শিখাইয়া গিয়াছে এবং দুঃখের বিষয় বহু শিক্ষিত বাঙালী এই মিথ্যায় বিশ্বাস করিয়াছেন। ভারতীয় সমর বিভাগে বাঙালী রেজিমেন্ট গঠন এবং বাংলার পুলিশে বাঙালী কনেষ্টবল গ্রহণের জন্ত যে সব আন্দোলন বিচ্ছিন্ন ভাবে হইয়াছে তাহা বাংলার শিক্ষিত সমাজের সমর্থন কখনও পায় নাই। ফলে সমগ্র ভারতবাসীর মনে এমনই একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে বাঙালী ভীক, নিজের দেশ ও পরিবার রক্ষায় অক্ষম, আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার জন্ত ভিন্ন প্রদেশের সৈনিক ও বিহারী কনেষ্টবলের উপর অসহায় ভাবে নির্ভর করা ভিন্ন তাহার আর কোন উপায় নাই। অথচ এই অপবাদ সর্বত্র মিথ্যা। ইংরেজ আমলেই ক্লাইভের সৈন্যদল কয়েকটি বাঙালী হিন্দুর নানা সম্প্রদায় হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। ভিন্ন প্রদেশীয় সৈনিক ও বাঙালী সৈনিকে যে প্রভেদ বাঙালী রেজিমেন্ট এবং বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ও গোলন্দাজবাহিনী প্রভৃতিতে গত দুই যুদ্ধে স্পষ্টভাবে দেখা গিয়াছে ইংরেজ তাহা বহু আগেই ধরিতে পারিয়াছিল। ইহা পারিয়াছিল বলিয়াই তাহার ভারতবাসীকে সামরিক ও অসামরিক এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া বাঙালীকে শেখোক্ত পর্যায়ে উন্নত করিয়া তাহাকে সমর বিভাগে অপারাজ্য করিয়াছে এবং বাংলার নমঃশূদ্র, বাগদী প্রভৃতি সামরিক সম্প্রদায়গুলিকে অপরাধপ্রবণ জাতি আখ্যা দিয়া Criminal Tribes Act পাস করিয়া উহার বশে উহাদিগকে নিকটবর্তী থানার দারোগার ক্রীতদাস করিয়া রাখিয়াছে। বক্তৃতার খিলজীর আগমনের পূর্বে দেবপাল

জয় অভিযান করিয়াছিলেন, শশাঙ্কের সামরিক শক্তিও বড় কম ছিল না, ইহার পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সাহায্যে লড়িতেন, বাঙালী সৈনিক তাঁহাদের সৈন্যদলে ছিল না এরূপ কথাও হাস্যকর। আজও কাম্বীর রণাঙ্গনে অফিসারদের মধ্যে বাঙালী আছেন এবং তাঁহার উত্তম যোগ্যতার পরিচয় দিতেছেন কিন্তু সেখানে বাঙালী সৈনিক নাই। এটা বাঙালীর দোষ নয়, ইংরেজের নিকট হইতে যে মিথ্যা সামরিক তথ্য বর্তমান ভারত-সরকার উত্তরাধিকারস্বত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন উহাই তাহার জ্ঞান দায়ী। বাংলার নমঃশূদ্র, পোদ, ছলে, বাগদী প্রভৃতি শ্রেণী হইতে লোক সংগ্রহ করিলে বাংলায় বিরাট ও সবল সামরিক বাহিনী গড়িয়া উঠিতে পারে। বড় জলে বড় বড় নদীবক্ষে মাছ ধরায় ইহারাই বেশী দক্ষ। ইহা হইতে মনে হয় যে চাষবাসের শান্তি-পূর্ণ বৈচিত্র্যহীন জীবন অপেক্ষা বিপৎসমুদ্র উদ্গাদনাপূর্ণ জীবনের প্রতি ইহাদের আকর্ষণ বেশী। সৈনিক এবং নাবিক এই দুইটিই ইহাদের মধ্য হইতে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে। দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিংহ এবং ডাঃ রায়ের গবর্নমেন্ট বাংলায় সামরিক বাহিনী গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এখানে প্রথমই দশ হাজারের বাহিনী গঠনের আয়োজনও হইতেছে তন্মধ্যে ছয় হাজার ছাত্র ও চার হাজার বাহিরের যুবক লওয়ার কথা। আমাদের মনে হয় বাংলার এই সব স্বাভাবিক সামরিক জাতিগুলি হইতে সৈন্যবাহিনী রক্ষী বাহিনী ও লক্ষর গঠিত হইলে তাহাদের আয়ের নূতন পথ খুলিয়া যাইবে এবং দেশেরও মঙ্গল হইবে।

আমাদের দেশের যে কোন পরিকল্পনা রচিত হয় তাহাতে মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেদের সরকারী চাকুরীপ্রাপ্তিই প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠে। ইহাতে দেশের স্থায়ী কল্যাণ হইতে পারে না। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায় ডাঃ রায়ের গবর্নমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে বাঙালী তরুণদের নৌবহরের কাজ শিখাইবার জন্ত তিনটি নৌ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাদ্বারা সরকারী চাকুরীজীবী অফিসার-তৈরী হইবে এটা ঠিক, কিন্তু লক্ষর মিলিবে কোথায়? আজও কি ভারতীয় ইউনিয়নকে নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের লক্ষরদের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে? বাঙালী ব্যবসায়ী চাঁদসদাগর এবং আরও অনেক সদাগর সিংহল, ব্রহ্ম ও বোম্বাই উপকূলের সহিত বাণিজ্য করিয়াছেন, তাহাদের বিরাট সদাগরী নৌবহর বাঙালী নাবিক ও লক্ষরেরা চালাইয়াছে। বাঙালী নাবিকেরাই দুর্দান্ত পর্দুগীজ জলদস্যু-দের সহিত লড়াই করিয়া নৌবহর রক্ষা করিয়াছে এবং তাহা গন্তব্য স্থলে লইয়া গিয়াছে।

বাঙালীকে সামরিক জাতি হিসাবে গড়িয়া তুলিতে এবং এত লোককে শিক্ষা দিতে সময় লাগিবে। কিন্তু কাজ এখনই আরম্ভ হওয়া দরকার। আর একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ



দেওয়া দরকার। বাঙালীকে কাপুরুষ করিয়া তুলিবার আর মন্ত উপায় ছিল অস্ত্র আইনের কঠোরতা। অস্ত্র ধারণে ও অস্ত্র চালনায় বাঙালীকে দক্ষ এবং সাহসী করিয়া তোলা আবশ্যক। শিক্ষিত ও উপযুক্ত লোকদের অস্ত্রের লাইসেন্স বেশী করিয়া দিলে তবেই এই অযৌক্তিক ভীতি দূর হইবে। কর্তৃপক্ষের একটা ধারণা আছে যে অস্ত্রের লাইসেন্স বাড়াইলেই বুঝি বা দেশে ডাকাতির বান ডাকিবে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সমস্ত শস্ত্র ডাকাতি হয় বিনা লাইসেন্সের অস্ত্রের সাহায্যে। উপযুক্ত লোকদের অস্ত্র দিলে হঠাৎ একজন বা অল্প কয়েকজন লোক অস্ত্র বাহির করিয়া ডাকাতি বা ট্রেনে রাহাজানি করিতে সাহস পাইবে না।

### হায়দরাবাদে পাগলামি

প্রতিপক্ষের মতিগতি, প্রকৃতি না বুঝিলে তাহার সঙ্গে তর্ক করা যায় না বা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ ভাবে করিতে পারা যায় না। মুসলিম লীগের সঙ্গে তর্কে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা সেইজন্ম হারিয়া গিয়াছেন। মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল বলিয়া পরিচিত বাহারা আমাদের মধ্যে ছিলেন বা আছেন, তাঁহারা মুসলিম সমাজের ধ্যানধারণা, বিশ্বাস-অনুপ্রেরণা সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত পরিচয় দিতে পারেন নাই। চারি কোটি মুসলমান বাহারা কোন অবস্থায়ই “পাকিস্তান” রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে না, তাহারা পাকিস্তান আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছিল কেন, তাহার উত্তর জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ আজ পর্যন্ত দিতে পারিতেছেন না। সেইরূপ হায়দরাবাদ রাজ্যে যে পাগলামি চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ হুঃখ প্রকাশ করিতে পারেন, হাজি কাসিম রাজভী নিন্দা করিতে পারেন, নিজাম ওহমান আলী খানের নিকট শাস্ত হইবার জন্ম অনুরোধ-উপরোধ প্রেরণ করিতে পারেন। কিন্তু নিজাম বাহাদুরের ও তাঁহার চেলাচামুণ্ডাদের মতিগতি, প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত থাকিলে, জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ এইরূপ ভাবে কথা প্রম করিতেন না। নিজাম বাহাদুর ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষিত ইত্তেহাদ-উল-মুসলেমিন প্রতিষ্ঠান—মিলিত মুসলিম দল—কতকগুলি বিশ্বাস বা কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া চলিতেছেন। সেই বিশ্বাস বা কুসংস্কার যত দিন তাহাদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিবে, তত দিন দাক্ষিণাত্যে শান্তি আসিতে পারে না। এই কথাটা ভারতরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দকে বুঝিতে হইবে, এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ বাহারা নিজাম বাহাদুর ও তাঁহার অনুচর-বৃন্দের উদ্ভূত কার্যাবলীতে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছেন, তাহাদের এই বিশ্বাস বা কুসংস্কারের মূল কথা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তবেই তাঁহারা ভারতরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দকে সংপারামর্শ দিতে পারিবেন, এবং নিজামবাহাদুরের রোগের প্রকৃত চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

ভারতরাষ্ট্রের অধিকাংশ মুসলমান যে এই বিষয়ে মাথা ঘামাইতে চান না, তাহার প্রমাণ আছে; তাঁহারা তফাতে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে চান। এই মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে আচার্য্য কৃপালনীর প্রস্তাবের প্রতি-উত্তরে। গত ৩১শে চৈত্র “জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড” দিবসের বার্ষিকী উপলক্ষে দিল্লী নগরীতে এক সভা হয়, এবং আচার্য্য কৃপালনী একটি বক্তৃতা দেন। তাহার মধ্যে এই কথাগুলি ছিল : “ভারতীয় মুসলমানদের কর্তব্য দলে দলে হায়দরাবাদে গিয়া সেখানকার মুসলমানদের প্রধান প্রতিষ্ঠান ইত্তেহাদ উল মুসলেমিন কর্তৃক অনুষ্ঠিত অত্যাচার ও আতঙ্ক-সৃষ্টির প্রয়াস বন্ধ করা। তাহা না হইলে ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের আনুগত্যের শপথ অর্থহীন হইয়া পড়িবে।” এই কথায় কলিকাতার দুইখানি পাকিস্তানী দৈনিক—ইত্তেহাদ ও আজাদ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। এরূপ উপদেশ নাকি অপমানজনক। স্বাভাবিক বুদ্ধির লোকে মনে করিবে যে হায়দরাবাদ রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্ম আহ্বান না করিয়া কৃপালনীজী যে এই অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা মন্দের ভাল। কিন্তু উল্টা বুঝিলি রাম—পাকিস্তানী মনের এই বিকার কৃপালনীজীর সহপদশেও বাঁকা চোখে দেখিবে, হিন্দু মুসলমান পৃথক নেতৃগণ এই উদ্ভট তত্ত্বের ক্ষেপামি এত শীঘ্র ভোলা যায় না। হাজি কাসিম রাজভী যে কথা প্রচার করিতেছেন তাহা মুসলিম লীগ প্রচারিত তত্ত্বের রূপান্তর বলিয়াই কি পাকিস্তানী মুসলিমগণ ইহার গায়ে হাত দিতে চান না! নতুবা কৃপালনীজীর উপদেশ ত একটা কর্তব্য পালনের পথ বাহির করিয়া দিয়াছে, যে পথে চলিলে দাক্ষিণাত্যে শান্তি আসিবে। এই পথে ঠিক ভাবে চলিতে হইলে হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। হায়দরাবাদ রাজ্যের শাসকসম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে হায়দরাবাদ রাজ্যের শাসক (নিজাম বাহাদুর) ও তাঁহার সিংহাসন রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় প্রভু ও সাংস্কৃতিক অধিকারের প্রতিভূ ও ধারক মাত্র; সেই প্রভু ও অধিকার চিরকাল অটুট থাকিবে। এই প্রয়োজনেই শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের সময়ও নিজাম বাহাদুরের প্রভাব ও বিধিদ্ভূত অধিকার অব্যাহত রাখিতে হইবে। যুগ-যুগান্ত ধরিয়া রাজ্যের মুসলমানগণ যে অধিকার ও সুবিধা রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহা কোনরূপে ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না। প্রায় একশ বৎসর পূর্বে ১৯২৭ সনে যখন ইত্তেহাদ-উল-মুসলেমিন প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে তখন ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ইসলাম ধর্ম-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ মোলানা আবদুর কাদের সিদ্দিকির সভাপতিত্বে এক সভায় এই তত্ত্ব প্রচারিত হয়। এই একশ বৎসরে তাহা দানা বাঁধিয়া যে রাজনীতিক রূপ ধারণ করিয়াছে;

তাহা এই সমিতির নিম্নলিখিত ঘোষণায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

- (1) Monarchy must rule over Hyderabad and be sovereign. The ruler must be a descendant of the Asaf Jahi Dynasty only.
- (2) If any change in the constitutional governance of Hyderabad becomes inevitable, nothing which will prejudice the traditional political superiority of Muslims should be done.
- (3) Muslims must be in a majority both in the Local Self-Government bodies and in the Legislature.
- (5) Urdu must be the official language of the State.
- (6) The problem of State services being interlinked with the political and cultural superiority of the Muslims and their economic interest, division of the same in proportion to the population is out of the question.

হায়দরাবাদ রাজ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা শতকরা পনর-কুড়ি জনের বেশী নয় ; ১ কোটি-৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে ২৫-৩০ লক্ষ। রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়াইবার জন্ত শাসক সম্প্রদায়ের চেষ্টার অন্ত নাই। সুদূর দক্ষিণ আরব দেশ হইতে একদল লোক ত আজ্র দুই শত বৎসর হইতে “বাদশাহী জ্বাতের” পদ লাভ করিয়াছে ; হুনিয়ার অগণিত মুসলমান ভাগ্যদেবী হায়দরাবাদ রাজ্যে আশ্রয় পায় এবং “নবাবী” করে। এই দাবীদাওয়ার সঙ্গে রাজ্যের অধিকাংশ নরনারীর, ১ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের, কোন সম্মতি নাই। এই ১ কোটি ৩০ লক্ষের মধ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ লোক তেলুগু ভাষাভাষী ; ৪০ লক্ষ লোক মারাঠী ভাষাভাষী, এবং ২০-২৫ লক্ষ লোক কানাড়ী ভাষাভাষী। এই অবস্থায় উর্দু ভাষাকে রাজকীয় ভাষা করিবার মধ্যে একটা জোর-জবরদস্তি ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ; এবং, সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রাধান্যের জন্ত একটা মনোবিকারের পরিচয় পাওয়া যায় যাহার লজ্জাজনক প্রকাশ সচরাচর দেখা যায় না। এই মনোবিকারই হায়দরাবাদ রাজ্যে সংঘর্ষের মূল কারণ।

### ভারতরাত্ত্রের আয়ব্যয়ের এক দিক

ভারতরাত্ত্রের জনসমষ্টির বাৎসরিক আয় মোটামুটি ভাবে ধার্য হইয়াছে ৪,৫০০ কোটি টাকা। এই টাকা ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় ব্রিটিশ-ব্রিটিশ কোটি লোকের মধ্যে—প্রাসাদ-বাসী রাজা মহারাজা শেঠ ও পূর্ণকুটিরবাসী এই আয়ের অংশ লইয়া বিলাসিতা ও ক্ষুদ্রিকতার উপকরণ সংগ্রহ করে। কার ভাগে কি পড়ে তাহার হিসাবও একটা আছে। এই আয় হইতে রাত্ত্রের ক্রমবর্ধমান ব্যয়—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার ব্যয়—বহন করিতে হয়। একটিমাত্র খরচের বহন দেখিলে তৎসম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয় ছিল প্রায় ৫৪৮৫ কোটি টাকা ; অত্যাধিকারিত এই সামরিক ব্যয় কিছু কিছু চুকাইয়া দেওয়া হইত। মোট প্রায় ৬০ কোটি টাকা ছিল তখন কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ছিল প্রায় ১০৪৫ কোটি টাকা। আজ সেই আয় ও ব্যয় গিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার তিন গুণে।

সামরিক ব্যয় বাবদ ১৩৬ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে ১৯৪৮-৪৯ সনে। এই ব্যয় সংক্ষেপ করা যায় কিনা, তৎসম্বন্ধে কোন চেষ্টা হয় নাই।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কে যে আলোচনা হয়, সেই উপলক্ষে কোন কোন সদস্য অপব্যয় সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীশিব রাও তর্ক তুলেন যে সৈন্ত বিভাগের খাতে দেখান হইয়াছে বাস জমির জন্ত ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার একটা ব্যয়। আজ মোটর গাড়ীর ব্যবহারে এই বাসের জমির প্রয়োজন শেষ হইয়াছে বা তাহার প্রয়োজন কমিয়াছে ; এবং এই ব্যয়ের ব্যবস্থাও অবাস্তর হইয়া পড়িয়াছে। এই উদাহরণ হইতে সামরিক বিভাগের দরাজ হাতে ব্যয়ের একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

কেন্দ্রীয় অর্থসচিব শ্রীসমুখম চট্টোপাধ্যায় হাতে পাইয়াও ইহার প্রতিকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার নিজের বিভাগেই যুদ্ধের পূর্বে উচ্চপদের কর্মচারী সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৩ জন ; আজ তাহা ২৪৬ জন। বাণিজ্য বিভাগে ছিল ১১ জন, আজ তাহা ৯৫ জন। সর্দার প্যাটেল যে বিভাগের কর্তা, তাহাতে এরূপ বৃদ্ধি দেখা যায় না ; পূর্বে ছিল ৫৬ জন, আজ হইয়াছে ৬৫ জন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় এরূপ আলোচনা যদি শ্রীসমুখম চট্টোপাধ্যায় ব্যয়বাহুল্য সম্বন্ধে একটু সচেতন করে তবে আমরা করদাতারা তৃপ্তিলাভ করিব। বেশী দিন এরূপ অপব্যয় লোকে সহ্য করিবে না।

### ধনকুবের ও সরকারী ট্যাক্স

শ্রীসমুখম চট্টোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসচিব। তাঁহার সম্বন্ধে রাজনৈতিক মহলে একটা বিরূপ ধারণা আছে। সাম্য-বাদের যুগে তাঁহার মতন লক্ষপতিকের কেন্দ্রীয় অর্থসচিব করিবার জন্ত শ্রীজবাহরলাল নেহরু ও কংগ্রেসের অত্যাধিকার নেতৃবৃন্দ নিন্দাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু গত ১১ই চৈত্র কেন্দ্রীয় আইন-সভায় আয় ব্যয় সম্পর্কে নানা আলোচনার উত্তরে তিনি একটা হক কথা বলিয়াছেন।

“যে সংলোক নিজের দেয় ট্যাক্স ঠিক ঠিক ভাবে দেয়, সে কখনও ধনকুবের হইতে পারে না। আমাদের দেশে লোকে ধনকুবের হইতে পারে অসহুপায় অবলম্বন করিয়া। এই নৈতিক অবনতি একটা পৃথক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্ত আমাদের সকলের চিন্তা কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে।”

১৯৪৫ সনে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু আহমদনগর দুর্গ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন যে কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের রাত্তায়-রাত্তায় যে বাতিদানের ব্যবস্থা আছে সেই ভুলে বুলাইয়া দিলে ইহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আজ কুড়ি মাস তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা অল্প-বিস্তর লাভ করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে এই রক্ত-শোষণ শ্রেণীর কাহাকেও পণ্ডিতজীর মতামতসারে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। তাঁহার অর্থসচিব ইহাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সকলের পরিচিত করিয়া দিয়াছেন।

ভারতবাসীর শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইংরেজ বিশেষজ্ঞ  
দিল্লী হইতে ১লা বৈশাখে প্রেরিত নিম্নলিখিত সংবাদটি  
দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে :—

“গত আগষ্ট হইতে এ বৎসর (১৯৪৮ জন) মার্চ মাস  
পর্যন্ত ৪,৫০০ জন ইংরেজকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের  
(শিল্প) গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। ইহাদের  
মধ্যে অধিকাংশই ভারতবর্ষে এই সর্বপ্রথম পদাধিকার  
করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কারিগর, যান্ত্রিক এবং বাণিজ্য-  
শিল্পী রহিয়াছে।...

“ভারতবর্ষে বর্তমানে ৩১৫ জন বিশেষজ্ঞ, ১১৬৮ জন  
শ্রেষ্ঠ কারিগর এবং ৪,০৪৩ জন নিম্নস্তরের কারিগর  
প্রয়োজন।”

এই সংবাদ পড়িয়া যে কয়েকটি প্রশ্ন মনে উদয় হইল,  
তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। যে সব পুষ্টিপতি ও  
শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্তা এই ৪,৫০০ জন ইংরেজ আমদানী  
করিয়াছেন; তাহারা অধিকাংশই ভারতবাসী। হঠাৎ ইহাদের  
ইংরেজ-প্রীতি উত্থলিয়া উঠিল বলিয়া মনে করা কঠিন; ইহারা  
কি ভারতবর্ষে এই বিশেষজ্ঞদের মত লোক পাইলেন না  
বলিয়াই এই লোকদের নিযুক্ত করিয়াছেন? কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট  
নিশ্চয়ই এই সংবাদ রাখেন। এই সম্বন্ধে তাহাদেরও একটা  
দায়িত্ব আছে। কারণ সংবাদটির অল্প অংশে দুইটি মন্তব্য  
আছে, যাহা প্রশ্নবোধক—“যে সমস্ত ভারতবাসী কারিগর  
বিদেশে শিক্ষালাভ করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন,  
শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদিগকে কাজ না দিয়া ইউরোপীয়  
কারিগরদের নিয়োগ করিতেছে।”

“সরকারী মূল্য মনে করেন ভারতীয় শিল্পপতিরা যদি  
ভারতীয় কারিগরদের উপযুক্ত কাজ না দেন, তাহা হইলে  
বিদেশী কারিগরের উপর নির্ভর করার অভ্যাস কমিবে না।”

এই দুইটি মন্তব্য পড়িয়া মনে হয় যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের  
শিল্পবিভাগীয় মন্ত্রীর নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হওয়া প্রয়োজন।  
তাহার অমূল্যমতি ছাড়া কোন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না,  
এবং নানা শিল্পের নানা বিভাগে ভারতবাসীর নিয়োগ সম্বন্ধে  
নিশ্চয়ই একটা নিয়ম আছে। দিল্লী হইতে প্রেরিত সংবাদে  
এই সব কথা পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই। আর বেশী দিন  
দেশের লোকে ইহা সহ করিবে না যে, ভারতবর্ষে শিল্প-  
প্রতিষ্ঠা হইবে অথচ তাহার পরিচালনে ভারতবাসী যোগ্য  
পদ ও অবসর পাইবে না। “সরকারী মূল্য” কেবল হুঁশ করিয়া  
কর্তব্য শেষ করিতে পারিবেন না। শিল্পপতিদের কর্তব্য সম্বন্ধে  
সচেতন করিয়া রাখিতে হইবে। আজ যখন রাষ্ট্রের উপর  
শিল্পপতিদের নানা ভাবে নির্ভর করিতে হয়, তখন তাহারা  
রাষ্ট্রের নীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না।  
ভারতীয়-করণ ও জাতীয়-করণ আজ ভারতবর্ষের নীতি।

সেই নীতি রক্ষা করিতে হইলে দিল্লী হইতে প্রেরিত সংবাদ  
সম্বন্ধে আরও অল্পসন্ধান প্রয়োজন।

### মার্কিন মূল্যকে ‘সাজ সাজ’ রব

মার্কিন মূল্যকে “সাজ সাজ” রব উঠিয়াছে। স্বয়ং রাষ্ট্র-  
পতি ট্রুম্যান এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন দেখিতেছি।  
দেশের ব্যবস্থাপক সভার সেনেট ও কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশনে  
তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে সাময়িকভাবে দেশে সার্বজনীন  
বাধ্যতামূলক সাময়িক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে; দেশ-  
রক্ষা বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করিতে হইবে, এবং  
১৯ হইতে ২৫ বৎসর বয়সের স্ত্রী-পুরুষকে এই রক্ষা-  
বাহিনীতে যোগদান করিতে হইবে যদি তাহারা কোন কর্মে  
নিযুক্ত না থাকে। এই প্রস্তাব-ত্রয়ের স্বপক্ষে প্রেসিডেন্ট  
ট্রুম্যান এই যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন : “ইউরোপ  
খণ্ডের দেশসমূহ আজ বিধ্বস্ত ও দুর্বল। কম্যুনিজম তাহাদের  
উপর আক্রমণোত্তম। এই কম্যুনিজমের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে  
আজ আমাদের মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।  
এক কথায় ইহাকে বর্ণনা করা যায়—ইহা পুলিশ রাজ;  
রাষ্ট্রের দণ্ড সর্বদাই ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে দাবাইয়া রাখিতেছে  
এবং এক কল্পিত শ্রেণী-বিহীন রাষ্ট্রের নামে এক বিশেষ  
শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্ত ব্যবহৃত হইতেছে। এই বিপদে  
মার্কিন দেশের কর্তব্য স্পষ্ট—তাহাকে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে  
হইবে; সর্বদা তাহার ক্ষাত্র-শক্তি সুসজ্জিত ও সুসম্বল রাখিতে  
হইবে।” প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের এই বোষণার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে  
লোকের মনে আর কোন সন্দেহ নাই। তাহার প্রস্তুতি  
সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উদ্ভিষ্ট। যে কারণেই হউক এই  
ধারণা স্পষ্ট হইয়াছে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের নেতৃত্বে ছনিয়ার  
নানা দেশে ধ্বংসমূলক কার্য চলিতেছে; সোভিয়েট রাষ্ট্র  
তাহার আশ্রিত ও বশব্দ রাষ্ট্রগুলির সাহায্যে তাহার প্রভাব  
ইউরোপ খণ্ডে বিস্তার করিতে দৃঢ়সংকল্প। এই সংকল্পে  
বাধা দিতে, এবং এই কার্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই নেতৃত্ব  
গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ যদি কম্যুনিজমের প্রভাব  
প্রতিপত্তি এই ভাবে প্রসারিত করিতে দেওয়া হয় তবে  
ব্যক্তির স্বাধীনতা সর্ব দেশে ক্ষুণ্ণ হইবে।

বর্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্র ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র  
দুই পক্ষই পরস্পর পরস্পরকে দোষ দিতেছে। সোভিয়েট  
পক্ষীয়রা বলিতেছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্র ধনে-  
জনে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও সাময়িক শক্তির বলে আজ ছনিয়ার  
উপর প্রভুত্ব স্থাপন ও বিস্তার করিবার চরাশা পোষণ করে।  
যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে তাহাদের এরূপ কোন  
চরাকাজ্ঞা নাই, তাহারা শুধু সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিশ্বজয়ের  
অভিযানকে ঠেকাইয়া রাখিতে চায়। এই অভিযানের প্রকৃতি  
জার্মানীর অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। পটমড্যাম  
নামক বাগিনের উপনগরীতে ১৯৪৫ সনের মে মাসে যে চুক্তি  
সম্পাদিত হইয়াছিল সোভিয়েট রাষ্ট্র পদে পদে তাহা লঙ্ঘন  
করিয়াছে। জার্মানীর অর্থনৈতিক কাঠামো অটুট রাখিবার



প্রতিশ্রুতি তাহার মধ্যে অত্যন্ত—সেকসন ৩, বি ১৪ ধারামতে এইরূপ অঙ্গীকৃত হইয়াছিল। সোভিয়েট রাষ্ট্র পূর্ব জার্মানীতে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছে তাহার সঙ্গে আমেরিকা, ব্রিটিশ ও ফরাসী-অঙ্গীকৃত জার্মানীর সঙ্গে কোন সঙ্গতি নাই। সেকসন ৩, বি—১৫ (সি) ধারামতে সোভিয়েট রাষ্ট্র অঙ্গীকার করিয়াছিল যে “প্রত্যেক অধিকৃত অঞ্চল হইতে এরূপ ভাবে মালপত্র, শিল্প ও কৃষিকাজে ব্যবহার্য আদান প্রদান করিতে হইবে যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানী যথাসম্ভব কম করিতে হইবে।” সোভিয়েট রাষ্ট্র এই বিধান ভঙ্গ করিয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে হির হর যে জার্মানীর শিল্প-প্রস্তুতির কলকারখানা ক্ষতিপূরণ-ধরূপ বিক্রয়ী রাষ্ট্র-মণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইবে। জার্মানীর পূর্বাঞ্চল হইতে সোভিয়েট রাষ্ট্র অনেক কলকারখানা সরাইয়াছে যাহা এই নিয়ম বিরুদ্ধ।

এই অভিযোগের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাষ্ট্র উত্তোর গাইতেছে এবং দুই পক্ষের তর্কের ধূস্রজাল ভেদ করিয়া প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া কঠিন। সোভিয়েট রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্থান সংকীর্ণ, সেখানে একনায়কত্ব অপ্রতিহত। এই বিপদ আজ বিশ্বব্যাপী সমস্তায় পরিণত হইয়াছে, এবং আমাদের রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্ধারণকল্পে এই বিপদকে একেবারে তুচ্ছ করা যায় না। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু আজ এই রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার। তাহার বিভিন্ন বোবাণী পড়িয়া মনে হয় যে আমরা তফাতে দাঁড়াইয়া এই বিপদ সম্বন্ধে এক প্রকার উদাসীন থাকিতে পারিব। সোভিয়েট রাষ্ট্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব এই প্রকার মনোভাব সম্ভব কিনা তৎসম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিয়াছে। বলা হইতেছে যে আমাদের একপক্ষ অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। সে কোন্ পক্ষ? হঠাৎ শেষ মুহূর্তে তাহা স্থির করা কি সম্ভব? এবং বেশী দিন এই দ্বিধার ভাবের প্রশ্রয় দিলে কি আমাদের রাষ্ট্রের স্বার্থ হানি হইবে না? অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে বিশ্বজগৎ ১৯৩৮-’৩৯ সনের অবস্থায় ফিরিয়া যাইতেছে। সেই দুই বৎসরে চেকো-স্লোভাকিয়ার ভাগ্যবিড়ম্বনা আরম্ভ হইয়া দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। দশ বৎসর পরে সেই চেকো-স্লোভাকিয়ার ভাগ্য লইয়া আবার কৌতুক আরম্ভ হইয়াছে।

### কম্যুনিজমের শতবাষিকী

একশত বৎসর পূর্বে প্রায় এই মাসে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস কম্যুনিষ্ট প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। সেই প্রচারপত্রের মুখবন্ধে বিদ্রোহের আহ্বান ছিল।

“এক অশরীরী ক্ষোভ ইউরোপের আকাশ বাতাসে চঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে; সেই ক্ষোভ ভাষা পাইবার চেষ্টা করিতেছে এই প্রচারপত্রে; সেই ক্ষোভ সংহত হইতেছে

কম্যুনিষ্ট সংঘে। এই ক্ষোভ ও সংঘর্ষে ঝড়িয়া ফেলিবার জন্ম ইউরোপবর্ষের সব প্রাচীনপন্থী শক্তি সংঘবদ্ধ হইতেছে। রোমের পোপ, রাশিয়ার জার, অষ্ট্রিয়ার মেট্রারনিজ, ফ্রান্সের গিজো, ও জার্মানীর পুলিশ ও গোয়েন্দা, ফ্রান্সের উগ্র উদারনৈতিকগণ দল বাঁধিয়া প্রস্তুত হইতেছে।”

এক শত বৎসরের মধ্যে কম্যুনিষ্ট ভাব ও আদর্শ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জারের রাশিয়া আজ কম্যুনিষ্ট দলের শাসনব্যবস্থার দাপটে নূতন সাম্রাজ্যবাদের মূর্তি ধারণ করিয়াছে। এই দলের এক নূতন বিশ্বাসের ধারকরূপে যে দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছিল, এক শত বৎসর পূর্বেও তাহার মধ্যে মানুষের নৈতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি কোন শ্রদ্ধা ছিল না; ব্যষ্টির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে একটা আক্রোশের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কারণ যুগে যুগে এই ব্যষ্টি নিজেকে বঞ্চিত হইতে দিয়াছে এবং নিজে জনগণকে বঞ্চনা করিয়াছে। এই ব্যষ্টির নৈতিক বোধ-শক্তির উপর শ্রদ্ধা থাকিলে কম্যুনিজম এতটা নিষ্ঠুর হইতে পারিত না, নিষ্ঠুর হস্তে এরূপভাবে দুই কোটি লোককে ধ্বংস করিতে পারিত না যেমন করিয়াছিল ১৯১৭ সন হইতে ১৯২৭ সনের, এই দশ বৎসরের মধ্যে। এই নিষ্ঠুরতার পক্ষে এই যুক্তি দেওয়া হয় যে তার ফলে শত কোটি লোকের শরীর-মন মুক্ত হইয়াছে; এবং এই মুক্ত মানুষ এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করিতেছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে চলিয়াছে দংহারলীলা। কার্ল মার্কস বলিয়াছিলেন, “নিষ্ঠুরভাবে সকল সমাজব্যবস্থা ও চিন্তাপ্রণালীর দোষ উন্মোচন করিতে হইবে।” কিন্তু এই নিষ্ঠুরতার প্রতি উত্তরে যে আক্রোশের সৃষ্টি হয়, তাহা ত আজ লুকাইয়া রাখিবার উপায় নাই। কার্ল মার্কস এক শত বৎসর পূর্বে পোপ ও জারের বিরুদ্ধে তাহার লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। তাহার শিষ্যপ্রশিষ্যগোষ্ঠী আজ ব্যক্তিহত্যাতন্ত্রা ও ধনিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী করিতেছেন। এই ক্ষেত্রে তাহারা ত নূতন কোন পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। হিংসার প্রতিদানে হিংসাই বাড়িয়া চলিয়াছে। মানবপ্রকৃতি কম্যুনিজমের কল্যাণে ত কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন লাভ করিতে পারিল না।

### “উদ্বোধন” পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী

১৩০৫ সালের ১লা মাঘ স্বামী বিবেকানন্দ কল্পিত ও স্বামী ত্রিগুণাতীত সম্পাদিত এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। গত মাসে ইহার ৫০ বৎসর পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে একটি বিশেষ সংখ্যার আয়োজন করিয়া স্বামী সন্ধানন্দ বর্তমান যুগের পাঠকবর্গের নিকট প্কাশ বৎসর পূর্বের আশা-আকাঙ্ক্ষার একটা পরিচয় দিয়াছেন। বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ লেখকগণ এই বিশেষ সংখ্যায় তাহাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান ও অতীত যুগের অনেক সমস্যার কথা আলোচনা করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক পল্লীবাসী ব্রাহ্মণের দেহ অবলম্বন করিয়া ভারতের ভাগ্য-বিধাতা এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন, এই কথা জগদ্বিদিত। ফেরদা সভ্যতা সাধনার, শাসনের ও শোষণের চাপে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা তখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, ফেরদা ভাবধারায় যখন আমাদের পূর্বজগণ অকূলে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তখন দেশের স্বায়-মন নিশ্চেষ্ট ছিল বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। “ইয়ং বেঙ্গল” “ইয়ং বোম্বাই” নূতন উদ্ভাবনায় মাতিয়া উঠিয়াছিল সত্য কিন্তু সে সময়েও ভারতপন্থী, আত্মবিধানী লোক অপ্রতুল ছিলেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টায় যে “তত্ত্ববোধিনী” গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই উপনিষৎ সাধনার ধারকগণ তাঁহার প্রমাণ। শুনিয়াছি “তত্ত্ববোধিনী” পত্রিকা হিন্দি, উর্দু, তেলুগু, তামিল ও মরাঠি ভাষার মাধ্যমেও প্রচারিত হইত। এইরূপ প্রচারের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দেশে যে নবজাগরণের সূচনা হয়, তার মধ্যে আমরা পাই কেশবচন্দ্র সেনকে, বঙ্কিমচন্দ্রকে, সর সৈয়দ আহম্মদকে, আর্চ্যাসমাজের প্রবর্তক স্বামী দয়ানন্দকে, থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটিকে।

এই সময়েই পরমহংসদেব প্রায় অলক্ষ্যে ভারতবর্ষের নব সংগঠনে আসিয়া যোগদান করিলেন; এটনির পুত্র নরেন্দ্র নাথ নিলেন সন্ন্যাস কিন্তু ভারতবর্ষে করিলেন রক্তাঙ্গণের ক্ষাত্র ভাবের প্রবর্তন। ইহার প্রেরণা তিনি পাইয়াছিলেন কামারপুকুরের এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণের নিকটে।

“উদ্বোধন” পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় স্বর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা “পাঁচ মিশালীর” ভাঙার করিতে গিয়া পাঠকবর্গের এ বিষয়ে আশা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। যে সংস্কৃতি ও সাধনার তিনি ধারক উনবিংশ শতাব্দীর ভারত ইতিহাসে তাহার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। তুলনামূলক সমালোচনায় তাহা নির্ণীত হইতে পারে। এরূপ আলোচনার চেষ্টা বর্তমান সংখ্যায় আমরা খুব কমই পাইলাম। স্বামী বিবেকানন্দ যে শক্তির আধার ও কেন্দ্র ছিলেন, তাহার রূপ ও গতিপ্রকৃতি কতটা উনবিংশতীর ভাব-সংঘাতের সৃষ্টি, কতটা পরমহংসদেবের সঙ্গুণের ফল, তাহা না বুঝিলে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্ভব ও কর্মপ্রবাহের প্রকৃত মাহাত্ম্য নির্ণয় করা সহজ নয়।

আমাদের অতৃপ্তির কারণ বলিলাম। তৃপ্তি যাহা পাইয়াছি তাহাও বলা উচিত। “উদ্বোধনের” প্রথম সংখ্যায় বিবেকানন্দ যে প্রবন্ধ লিখেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া সম্পাদক মহাশয় আমাদের এক বিরাট পুরুষের সম্মুখীন করিয়াছেন; বাংলা ভাষা তাঁহার হাতে খড়্গের মতন খেলা করিয়াছিল, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের নিবেদিতা-চরিত-কথা সুলিখিত;

তাঁহার। এই আইরিশ তনয়ার ভারত-ভক্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন অনবদ্য ভাষায়। কিন্তু নিবেদিতার যোদ্ধাভাব এক বাংলা-দেশের বিপ্লব আন্দোলনে তাঁহার সহযোগিতার কথা আজও অমুজ্জ্বল রহিয়া গেল। “ভারতের মর্মবাণী” প্রবন্ধে যে আদর্শের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাই জগতের রক্ষার একমাত্র উপায়। নচিকৈতার উপাখ্যান একটা সাধনার ইতিহাস—ব্যক্তির নয়; একটা জাতির।

### সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

একজন চিন্তানায়ক ও সংগঠক মরজগৎ হইতে চলিয়া গেলেন। পরিণত বয়সে—৮৫ বৎসর বয়সে—তাঁহার তিরোধান হইল। গত পঁচিশ বৎসর তিনি কাশীবাস করিতেছিলেন, এবং কাশীতেই তাঁহার দেহরক্ষা হইল। বর্তমান যুগের কম বাঙালীই সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কর্মকথা জানেন। কারণ তিনি পলিটেশিয়ান ছিলেন না। তিনি ছিলেন সেইরূপ শ্রষ্টা বাহাদুরের কর্মফলে সমাজজীবনে যে নবজীবনের নানা শক্তির উদ্ভব হয়, যাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রনৈতিকগণ জনগণের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্তি দান করেন, তাদের দুর্গতিমোচনে চেষ্টা করেন। সতীশচন্দ্র সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যখন ভারতবর্ষের চিন্তাজগতে আত্মসম্মানবোধ ফুটাইয়া উঠিয়াছে, যখন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপুলনুকার, স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী ও আলীগড়ের সৈয়দ আহম্মদ নূতন চিন্তাধারা ও নূতন কর্মপ্রচেষ্টার প্রবর্তন করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য্য ব্রজেননাথ শীল প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন তিনি এবং ইঁহার। যে নব-ভারতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার সেবায় এই আজীবন ব্রহ্মচারী নীরবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক সমালোচনা করিবার সাহস সতীশচন্দ্রের ছিল এবং এই সমালোচনার যন্ত্র ছিল “ডন” (Dawn) নামক পত্রিকা। এই পত্রিকার সাহায্যে দেশের লোকের মধ্যে জাতীয়তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সঙ্কল্পে নির্দেশ থাকিত। সতীশচন্দ্রের কাজ অনেকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে, সেই যুগের ছাত্রসমাজে শ্রেষ্ঠ জনের মধ্যে আরম্ভ ছিল। তাঁহার শিষ্যরাই গবেষকরূপে ভারত ইতিহাসের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেককেই “জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ” সংগঠনে অগ্রণী ছিলেন। সেই পরিষদের নানা কল্পনার ভগ্নাংশ আমরা আজ দেখিতে পাই যাদবপুর বিজ্ঞান কলেজে। ১৯১২ সনের পরে সতীশচন্দ্র কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। যে আদর্শের প্রেরণায় তিনি ভাব, চিন্তা ও কর্মে সন্ন্যাসী ছিলেন, তাহা ফুটিবার আয়োজন তিনি দেখিয়া গেলেন। এই সাত্বনা তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তকে দীপ্ত করিয়াছিল।

## নঈ তালিম

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ্র

পশ্চিম বঙ্গ সরকার বহু আকাজিক শিক্ষা-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন; দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন রহিয়াছে ইহার পিছনে। রাজনৈতিক জীবনের নূতন পরিপ্রেক্ষিতে নূতন সমাজ ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে নূতন আদর্শ ও উদ্যমের প্রয়োজন। বহু দিনের শোষিত নিপীড়িত নবজাগ্রত দেশে জাতির জাগরণকে কল্যাণকর ধারায় প্রবাহিত করিতে, দেশকে অর্থো সম্পদে, জ্ঞানে গৌরবে মহিমাম্বিত করিয়া তুলিতে যোগ্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন আবশ্যক। লোকায়ত্ত গবর্ণমেন্ট জনগণের মঙ্গলের প্রতি অবহিত হইয়াছেন, ইহা এক বিপুল সম্ভাবনাময় নবযুগের সূচনা করিতেছে।

স্বাধীন পশ্চিম বাংলার প্রথম মন্ত্রিসভা অর্থাৎ ডাঃ ঘোষের মন্ত্রিসভা এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অচলায়তনে নাড়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁহার বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহার আয়োজন হিসাবে শিক্ষকের বনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা সুরু হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীকর্তৃক পরিকল্পিত বনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি মুসলিম লীগের শাসনকালে বাংলাদেশে গৃহীত হয় নাই। ভারতের কংগ্রেসশাসিত প্রদেশসমূহে ইহার পরীক্ষামূলক প্রবর্তন হইয়াছিল। তাহার ফলাফল দেখিয়া এই নূতন শিক্ষাপ্রণালীর দোষগুণ বিচার করিতে হইবে। বাংলাদেশে বনিয়াদী শিক্ষা সরকারীভাবে গৃহীত না হওয়ায় ইহার প্রতি এত দিন জনসাধারণের খুব বেশী কৌতূহল জাগ্রত হয় নাই। বর্তমানে যখন এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের আয়োজন হইতেছে তখন ইহার স্বরূপ কি এবং অত্যন্ত প্রদেশে ইহাতে কিরূপ স্বফল পাওয়া গিয়াছে তাহা জানা দরকার।

আমাদের বক্ষ্যা প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিকারকল্পে বনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভব। শিক্ষার এই বক্ষ্যাত্ম ও ব্যর্থতার প্রধান কারণ—ইহার মধ্যে দেশের পক্ষে কল্যাণকর—মাতৃষ্য তৈয়ার করার উপযোগী কোন বলিষ্ঠ আদর্শ নাই; দ্বিতীয় কারণ—অর্থভাবে প্রাথমিক শিক্ষা এতদিন নিদারুণভাবে অবহেলিত হইয়া আসিয়াছে। সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলভিত্তি যে প্রাথমিক শিক্ষার উপর এই পুরম সত্যটি উপেক্ষিত হওয়ায় শিক্ষা-ইমারতের বনিয়াদ কাঁচা গাঁথুনি দিয়া বালুর উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গম্বুজে খেত পাথরের উপর মীনা এবং চুনির কাজ করার প্রয়াস

চলিয়াছে। সার্থক শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান অন্তরায়—অর্থভাব ও আদর্শের অভাব। গান্ধীজী বাস্তব কর্মপ্রণালীর মধ্য দিয়া এই অভাব দুটি দূর করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। বনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ মহাত্মাজীর জীবন-দর্শনের সঙ্গে জড়িত। তিনি গড়িয়া তুলিতে চান সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে স্বাধীন, সবল স্বস্থ, কর্মক্ষম নাগরিকদের—যাহারা পারস্পরিক সহযোগিতায় শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ রচনা করিবে, নিজেদের স্থপ্ত শক্তির বিকাশ ঘটাইয়া জীবনকে শ্রীমণ্ডিত ও দেশকে সম্পদভূষিত করিবে। গান্ধীজীর সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আদর্শ এই নূতন শিক্ষার ভিতর দিয়া তিনি রূপায়িত করিয়া তুলিতে চাইয়াছেন।

বনিয়াদী শিক্ষা কর্মক্ষেত্রিক শিক্ষা, কোন শিল্পকাজের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা। ইহাকে প্রাথমিক শিক্ষা বলিলে ভুল করা হইবে। সাত বৎসরের জন্ত যে পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হইয়াছে তাহাতে ইতিহাস, ভূগোল, ব্যবহারিক গণিত, মাতৃভাষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান প্রবেশিকা-মানের বেশী ছাড়া কম হইবে না; ইংরেজীর পরিবর্তে ছাত্রগণ হিন্দী শিখিবে। শিক্ষাক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়, নিছক জ্ঞানবারিপরায়ী অপেক্ষা স্বচেতন সক্রিয় শিক্ষাগ্রহণকারী বিদ্যার্থী যে মনোবিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর উপর অধিকতর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত তাহা শিক্ষাবিদগণকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। শিশুকে বাস্তব জীবনের জন্ত প্রস্তুত করিয়া তোলা শিক্ষার উদ্দেশ্য; তাহার মানসিক বুদ্ধিগুলির পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি ও ব্যবহারিক কাজে পটুতা অর্জন করাও শিক্ষার অন্তর্গত। এদেশে শিক্ষিত-মহলে কার্যিক শ্রমকে অবজ্ঞা করিয়া মানসিক শ্রমকে উচ্চ স্থান দেওয়ার ফলে যে ভ্রান্ত ও অকল্যাণকর আত্মাভিমানের সৃষ্টি হইয়াছে গান্ধীজী তাহা মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিষয়ে নঈ তালিম তাঁহার সহায়ক।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিলে বনিয়াদী শিক্ষার স্বয়ং-সম্পূর্ণতার নীতিগ্রহণ পরিকল্পনা-রচয়িতার বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সার্জেট পরিকল্পনায় এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশের—ব্রিটেনের—শিক্ষা-কাঠামোর অঙ্কনকে যে শিক্ষাসৌধের পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা চিন্তায় স্বথকর হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সার্জেট-পরিকল্পনার

হিসাবমত বাংলাদেশের শিক্ষার বার্ষিক খরচ ধরা হইয়াছে ৫৭ কোটি টাকা, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৪০ কোটি। যেখানে শিক্ষার বাবদ ৩ কোটি টাকার কম খরচ হইতেছে সেখানে ৫৭ কোটি খরচ বরাদ্দ ধরিলে জনসাধারণের বা রাষ্ট্রের আয়ের পরিমাণ শুধু শিক্ষার জন্যই ১৯ গুণ বাড়াইতে হয়। ইহা ছাড়াও জাতিগঠনের, দেশরক্ষার, এবং দেশের ধন-সম্পদবৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় আরও কত বিষয়ে সরকারকে অবহিত হইতে হইবে। স্বর্গের অমৃতকল আর পারিজাত-মন্ডার কুসুমের জন্ত উর্দ্ধমুখে প্রতীক্ষা করিয়া না থাকিয়া মহাত্মাজী নিজের কুটিরসংলগ্ন ভূমিখণ্ডে দেশী কলঙ্কুলের আবাদ করার পক্ষপাতী। তিনি বলিয়াছেন : আমার মধ্যে ভাববিলানীর সঙ্গে একজন বাস্তববাদী মানুষও রহিয়াছে। নিজের জীবন-দর্শনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের কোটি কোটি বালকবালিকার প্রাথমিক শিক্ষা-সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ তিনি করিয়াছেন। অর্থাভাবে দক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা অচল থাকিবে ইহা তিনি মানিয়া লইতে রাজী নন।

গান্ধীজী প্রস্তাবিত মূলনীতি অবলম্বন করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদগণ যে শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম রচনা করিয়াছেন তাহা বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, মাজাজ, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে পরীক্ষা-মূলকভাবে গৃহীত হয় এবং শিক্ষকের শিক্ষণ ও ছাত্রদের নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান শুরু হয়। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের ফলে অর্থাৎ কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলে আমলাতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বনিয়াদী শিক্ষা সরকারের সহায়ত্বিত্ব ও সহায় পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হয়। কোন কোন স্থানে সরকার বনিয়াদী বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিলেও জনসাধারণ নিজেদের চেষ্টায় তাহা চালু রাখে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে অবস্থিত একটি রাজনৈতিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া বনিয়াদী শিক্ষার ভাগ্যে অল্পগ্রহ-নিগ্রহ, আদর-উপেক্ষা উভয়ই জুটিয়াছে। পরিকল্পনা-রচয়িতার ব্যক্তিগত প্রভাবের জন্য ইহার পক্ষে প্রথমে অল্পকূল পরিবেশ রচিত হইলেও নূতন শিক্ষা-প্রণালীকে নিজের প্রাণশক্তি ও গুণাবলীর উপর নির্ভর করিয়া অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে দিল্লীতে বনিয়াদী শিক্ষার দ্বিতীয় সম্মেলন অস্থিত হয়। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইহার উদ্বোধন করেন এবং সভাপতিত্ব করেন ডক্টর জাকির হোসেন। বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, কাশ্মীর এবং বেসরকারী বনিয়াদী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে এক শতের অধিক শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাবিদ এই সম্মেলনে যোগদান

করেন। তিন দিনব্যাপী অধিবেশন চলে; প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল—বনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্য, শিক্ষকাধ্যের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার সংযোগ সাধনের উপায় ও শিক্ষকের শিক্ষণ। নিম্নলিখিত মন্তব্যটি সম্মেলনে গৃহীত হয়,—

গবর্ণমেন্ট এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ও ব্যক্তিগত চেষ্টায় যে সকল বনিয়াদী বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে তাহাদের বিবরণীতে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে যে, ছাত্রদের সাধারণ স্বাস্থ্য, আচরণ এবং শিক্ষার উন্নতি আশাপ্রদ। বনিয়াদী শিক্ষালয়ের ছাত্রগণ অধিকতর কার্য-ক্ষম, প্রফুল্ল, আত্মনির্ভরশীল; তাহাদের আত্মপ্রকাশের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, সহযোগিতামূলক অভ্যাসে তাহারা অভ্যস্ত হইতেছে এবং সামাজিক কুসংস্কার ভাঙিয়া পড়িতেছে। নূতন আদর্শ এবং নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যে নূতন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে তাহার প্রথম অবস্থার অস্থবিধাগুলি বিবেচনা করিলে ভবিষ্যতে ইহা হইতে আরও অধিকতর সফল লাভের আশা করা যায়।

একটি বনিয়াদী শিক্ষা বিশেষজ্ঞ সমিতি বিহারে ২৭টি বনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্য পর্যবেক্ষণ করিয়া ছাত্রদের, নৈতিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নতির মাত্রা নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তাহাদের বিবরণ চিত্তাকর্ষক। বনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে যে সকল গুণের ক্ষুরণ আশা করা যায় বলিয়া তাহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে এই নূতন শিক্ষার স্বরূপ অনেকখানি বুঝা যাইবে।

বনিয়াদী শিক্ষার প্রথম ফল হইবে হস্তশিল্পে ছাত্রের নিপুণতা, তাহার ক্রিয়াকুশলতা বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয় ফল—উপর হইতে চাপানো শৃঙ্খলাবোধের পরিবর্তে কাজের মধ্য দিয়া শৃঙ্খলা-জ্ঞানের পরিপূর্ণতা; তৃতীয় ফল—বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ; চতুর্থ ফল—সপ্রতিভ ও সক্রিয় অভ্যাসগঠন। আলস্য পরিহার করিয়া ছাত্রগণ দৈহিক এবং মানসিক শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠিবে; পঞ্চম ফল—শৃঙ্খলভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাজ করিবার অভ্যাস; ষষ্ঠ ফল—কাজে আনন্দলাভ করিবার ক্ষমতা; সপ্তম ফল—কোতূহল জাগ্রত করা, অনুসন্ধিৎসা এবং পর্যবেক্ষণশক্তি বাড়ানো; অষ্টম ফল—ছাত্রদের সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা; নবম ফল—সহযোগিতা ও সেবার অল্পপ্রেরণা লাভ।

বিশেষজ্ঞ সমিতি বনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে উল্লিখিত গুণের অধিকাংশই দেখিতে পাইয়াছেন—কোনটি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, কোনটি সবে শুরু হইয়াছে। তাহাদের মতে দৈহিক পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খল সপ্রতিভ আচরণ ও কথাবার্তা বলা—এ সব বিষয়ে বনিয়াদী



বিদ্যালয়ের ছাত্র সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্র অপেক্ষা অনেক অগ্রসর।

পাটনা ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিহারের চম্পারণ জেলার বেতিয়া থানায় বনিয়াদী এবং সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অধীত বিহার তুলনা-মূলক পরীক্ষা গ্রহণ করেন। উভয়বিধ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ চার বৎসর কাল একই রকম পরিবেশে, শুধু ভিন্ন পদ্ধতিতে, শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। পরীক্ষার বিষয় ছিল সাহিত্য পাঠ, লিখন, গণিত, সামাজিক পাঠ, সাধারণ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান। পরীক্ষক তাঁহার বিবরণীর উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

“আমার পর্যবেক্ষণ হইতে ইহা স্পষ্ট হইয়াছে যে, একই অঞ্চলের ছাত্রগণ বনিয়াদী বিদ্যালয়ে চার বৎসরে বাহা শিক্ষা করিয়াছে তাহা সেখানকার সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অপেক্ষা অনেক বেশী। মৌখিক পাঠ, প্রাথমিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যনীতি ও সামাজিক পাঠ বিষয়ে এই অগ্রগতি আরও অধিকতর পরিষ্কৃত হইয়াছে।”

আগষ্ট আন্দোলনের পর কারাগারের বাহিরে আসিয়া গান্ধীজী বনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োগ-ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিলেন। বালক-বালিকা উভয়ের শিক্ষার জন্ত যে পরিকল্পনা তিনি করিয়াছিলেন তাহা শুধু শিশুর শিক্ষা-ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া শিশুর অশিক্ষিত পিতামাতাকে জ্ঞানালোক দানের দায়িত্বও তাহার উপর অর্পণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

“আমাদের বর্তমান সাক্ষ্যেই আমরা সন্দেহ থাকিব না। শিশুদিগের গৃহে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইবে; তাহাদের পিতামাতাকে শিক্ষিত করিতে হইবে। বনিয়াদী শিক্ষাকে প্রকৃতই সমগ্র জীবনের শিক্ষা হইতে হইবে। এখন ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদের মধ্যেই আমাদের এই শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়; নঈ তালিম বা নূতন শিক্ষার প্রয়োগ-ক্ষেত্র শিশুর মাতৃগর্ভ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনে প্রসারিত হইয়াছে।

এই নঈ তালিম অর্থের উপর নির্ভরশীল নয়। এ শিক্ষার খরচ শিক্ষা-প্রক্রিয়া হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে যতই বিরূপ সমালোচনা হোক না কেন আমি জানি যে, যে শিক্ষা আর্থিক দিক দিয়া স্বাবলম্বনশীল তাহাই সত্যকার শিক্ষা। এ আদর্শ নূতন এবং বৈপ্লবিক, কিন্তু ইহার জন্ত আমি লজ্জিত নই। তোমরা যদি কাজ করিতে পার, তোমরা যদি প্রমাণ করিতে পার যে, মনের বিকাশসাধনের ইহা সত্যকার পথ তাহা হইলে যাহারা আজ আমাদের বিরূপ করিতেছে তাহারাও একদিন

আমাদের প্রশংসায় মুগ্ধ হইবে, নঈ তালিম সার্বজনীনভাবে গৃহীত হইবে এবং যে সাত লক্ষ গ্রাম আমাদের ব্যাপক দারিদ্র্যের চিহ্নস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে তাহা আমাদের সমৃদ্ধির আকর হইয়া উঠিবে। এই সমৃদ্ধি বাহির হইতে আসিতে পারে না, ভিতরের দিক হইতে ইহা গড়িয়া তুলিতে হইবে। নঈ তালিমের ইহাই লক্ষ্য, ইহার কম কিছু নয়।”\*

আমাদের বর্তমান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছায়া নাই; কাজেই ইহা ছাত্রের ব্যক্তিবিকাশে বিশেষ সহায়তা করে না। গান্ধীজীর কথায় বলিতে গেলে—বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য, সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ; ‘ইহার আদর্শ হইল এমন এক নূতন পৃথিবী রচনা যেখানে জাতি বা বর্ণভেদ থাকিবে না, যাহা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও সহযোগিতাপূর্ণ এবং অহিংসা যার ভিত্তি।’

ভারতের রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে, স্বরাজ-সাধনার পথে গান্ধীজীর দান যেমন মহান, নবভারত রচনায় নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তোলার ব্যাপারেও তাঁহার চিন্তার আলোক তেমনি কল্যাণ-পথের নির্দেশ দিয়াছে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মহাত্মাজী পরিকল্পিত শিক্ষা-প্রণালীর মিল নাই, ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের শিক্ষাপ্রণালীও ইহার। অতীত আদর্শে গঠিত হয় নাই; কেননা জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, মানবের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতনতা গান্ধীজীর যেমন, অতীত রাষ্ট্রের কর্তব্যধারণের তেমন নয়। বিদেশী দ্রব্যমাত্রেরই শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্বদেশজাত জিনিষের অপকৃষ্টতাবোধ যাহাদের মজাগত হইয়া গিয়াছে তাহারা নবশিক্ষাপ্রণালীকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। বিদেশের চাকচিক্য ও আড়ম্বরে তাহাদের চক্ষু মুগ্ধ ও মন মোহগত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু ভারতের আদর্শ, ভারতের বৈশিষ্ট্য, ইহার ঐতিহ্য, ইহার সমস্ত স্বতন্ত্র। গান্ধীজীর শিক্ষা-ধারার আলোচনা-প্রসঙ্গে রোমী রোলী বলিয়াছেন,—

“নূতন ভারত গড়িয়া তুলিতে হইলে ভারতের মাল-মশলা হইতেই এক নূতন আত্মা গড়িয়া তুলিতে হইবে—যে আত্মা হইবে নিখাদ শক্তিময়। এই আত্মাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে চাই ত্যাগী ঋষিভূলা মানবের একটি বাহিনী—যেমনটি ছিল খ্রীষ্টের।”

নঈ তালিম বা বনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এক নূতন প্রাণবান সমাজ গড়িয়া তোলার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এ শিক্ষাপ্রণালী পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করিয়া যে ফল

লাভ করা গিয়াছে তাহাতে আরও ব্যাপক প্রয়োগে অধিকতর সফল আশা করা যায়। শিশুর উচ্চতর জ্ঞান লাভে এবং সুস্থ-মানসিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশে প্রতি-বন্ধক সৃষ্টি না করিয়া বনিয়াদী শিক্ষাকে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যেভাবে জুড়িয়া দিবার প্রস্তাব সার্জেস্ট-পরিকল্পনায় করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। নিম্ন ও উচ্চ বনিয়াদী শিক্ষাক্রমের দুই ভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার জন্ত ছাত্র নির্বাচন, সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে জীবন্ত আদর্শ সঞ্চার ও আন্তরিকতার সহিত ইহার অনুসরণ ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিবে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নষ্ট তালিমের ব্যবহারিক প্রয়োগের সফল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন,—

“আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে নষ্ট তালিম যুগান্তর আনয়ন করিতে সক্ষম। তবে ইহার নূতন পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সহিত আমাদের দেশে অধুনা প্রচলিত পুরাতন ভাবধারার সামঞ্জস্য বিধান করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য।”\*

জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রেই শ্রেয় ও প্রেয়কে লাভ করা সহজসাধ্য নয়। জাতীয় জীবনের শ্রেয়োলাভের সাধনা কঠিন হইলেও, দুঃসাধ্য হইলেও, দায়িত্ব পরিহার করিয়া সহজতর পথ বাছিয়া লইলে আমাদের মানসিক দুর্বলতা ও অব্যোধ্যতারই পরিচয় দেওয়া হইবে। যে পথ কল্যাণের পথ বলিয়া নির্ধারিত হয় তাহা দুস্তর হইলেও নিষ্ঠার সহিত অনুসরণীয়।

\*শিক্ষক—পৌষ, ১৩৫৪

## নব বর্ষের নবীন সূর্য্যোদয়

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

কৈশোরে আর যৌবনে যার গাহিয়াছি জয়গান,  
শুধু যার কথা ভাবিতে ভাবিতে ভরিয়া উঠেছে প্রাণ,  
জন্ম জন্ম দেশে দেশে যার করেছি অবেষণ,  
মন্দিরে যারে স্থাপন করিতে করেছি জীবনপণ;  
মঙ্গলঘট সাজায়ে রেখেছি; হয়ে অনন্তমনা  
করিয়াছি ধ্যান; হৃদয়-রঞ্জে জাঁকিয়াছি আলিপনা;  
যুগযুগান্ত কেটে গেছে, তবু তুমি সে আসিবে জানি,  
আশার বার্তা শুনেছি চিন্তে, শুনেছি আকাশবাণী,  
স্পর্শে তোমার সার্থক হবে আমার জন্মভূমি,  
তুমি আসিয়াছ, তবু ভাবি আজ, এ তুমি কি সেই তুমি?

তুমি স্বাধীনতা? তোমারি কীৰ্ত্তি ঘোষিছে কাব্যে গানে?  
দেখিতে তোমার স্বরূপ, শুধুই চেয়েছি প্রতীচী পানে।  
গণি শতাব্দী, বর্ষ ও মাস, পল-অল্পপল গণি,  
সারা-এসিয়ার নব-জাগরণে শুনি তব আগমনী।  
মহাসমরের মরণ-যজ্ঞে করি তব সন্ধান,  
পৃথিবীর মহা-ধ্বংসলীলায় শুনি তব আহ্বান।  
তুমি চিরদিন অধিষ্ঠিত কি বিশ্বের বেদনায়?  
সুখ-সন্ধানী যারা তারা বুঝি তোর নাহি দেখা পায়।  
জাগরে-স্বপনে জীবনে-মরণে বহেছি বিপুল ব্যথা,  
হে চির-এষিতা তুমি এলে আজ, তুমি সেই স্বাধীনতা?

এ কি রূপে তুমি দেখা দিলে আজ? কেন এ ছদ্মবেশ?  
কল্পনা কেন পেলো না মূর্ত্তি? স্বপ্নের এ কি শেষ?  
দিকে দিকে দিকে দাবানল-শিখা, বঙ্গ দ্বিখণ্ডিতা,  
কাম্বীর হ'ল ধ্বংস ত্রিহীন, পঙ্কাবে জলে চিতা।  
বিভীষিকা-ভরা পল্লী-নগরে উঠিছে আর্তনাদ,  
মাহুঘের তরে মাহুঘ পেতেছে মাহুঘ-মারার ফাঁদ।  
ছয় সহস্র বর্ষের কই সিঁদুর সভ্যতা?  
ক্রীড়া-তরবারি কে আফালিছে হায়জাবাদের হোথা?  
তোমারে লইয়া করে হানাহানি তোমারি পূজারীদল,  
তুমি এলে, তবু এলো না কো কেন শান্তি স্তম্ভল?

স্বরূপ হোক তবে নূতন এষণা, যাত্রা নূতন পথে;  
প্রাচীন অভীত মিলে যায় যেথা নবীন ভবিষ্যতে  
সেই নব যুগে, দীপ্ত তোমার দিব্য মূর্ত্তি ধরি'  
হে অভয়া এস; দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব দাও দেবী, দূর করি।  
হৃদয়ে হৃদয়ে অগ্নি আলাও, উজ্জ্বল তার শিখা  
দূর করে দিক্ বহুৎসবে সব গ্লানি বিভীষিকা।  
যে মায়ামজে ভুলালে সকলি, সে মন্ত্রে দাও ডাক,  
সেই আহ্বানে শঙ্কা এবং সংশয় ঘুচে যাক;  
সব মালিন্য মুছে যাক, আজ করুক জ্যোতির্ময়  
এ নব জীবনে নব-বর্ষের নবীন সূর্য্যোদয়।

সুনীতি করের বাড়ীর কাছে মোটর থামিয়ে প্রশান্ত গাড়ীর দুয়ার খুলতে না খুলতে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল বাড়ীর ভিতর থেকে। মেয়েটির চলার ভঙ্গি পরিচিত—অথচ পিছন ফিরে পথ চলাতে এর মুখ দেখা যাচ্ছে না। প্রশান্ত না নেমে জাইভারকে বললে, ওই মেয়েটির পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে চালাও গাড়ী। হন'দেবার দরকার নেই।

গাড়ী পাশে আসতেই মেয়েটি একটু সরে চাইলে সে দিকে। সন্দেহ ভঞ্জন হ'ল।

শুভা।

শুভা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হাসলে, কমরেড প্রশান্ত। ব্যাপার কি?

বলছি। আসবে গাড়ীতে?

শুভা বললে, নিশ্চয়। কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা—। বলতে বলতে গাড়ীর দরজা খুলে প্রশান্তর পাশে বসে পড়ে হাসলে, আর—তোমার গাড়ীখানা ছোট বটে—বসার ব্যবস্থা চমৎকার।

প্রশান্ত বললে, আমার খবর বোধ হচ্ছে কিছু কিছু জান।

কিছু না—সময় আমার এতই কম যে বহুরা কে কোথায় কেমন আছেন জানবার বা জানাবার ফুরসৎ পাই নে।

প্রশান্ত বললে, একটু সময় মানুষের হাতে থাকা ভাল নয় কি?

কি জানি। শুভা তার পানে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। পরে বললে, তুমি তো দেখছি ভালই আছ। আর তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে খানিকটা সময় বাড়তি না থাকলে মানুষ ভালই থাকতে পারে না।

প্রশান্ত'ওর কটাক্ষপাতকে এঁছের মধ্যে না এনে বগলে, ভাল থাকা প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার।

নিশ্চয়। শুভা কণ্ঠে জোর দিলে।

অথচ তোমাকে দেখলে তা মনে হয় না, শুভা।

জন্মগত অধিকার কিংবা জন্মান্তরগত স্মৃতি অর্থাৎ ভাগ্য সকলের তো সমান নয় কমরেড।

প্রশান্ত স্বরে জোর দিয়ে বললে, তুমি পরিহাস করলেও অস্বীকার করবে না যে চেষ্টার দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা মানুষ অবস্থার উন্নতি করতে পারে।

তা কেন করব—বাঃ রে। দৃষ্টান্ত দেখেও না বোঝে যারা—

যাই বল শুভা—ধন থাকাকাটা মানুষের অত্যা নয়, কাউকে বঞ্চিত বা লালিত না করে যে উপার্জন—

শুভা বললে, তোমার মোটরে বসে তোমার মুক্তি খণ্ডন করব এতটা নিশ্চয় নেই আমি।

প্রশান্ত বললে, এ ভাবে উপার্জনকে অত্যা বলবে তবু?

শুভা বললে, ব্যক্তিগত ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের বাদানুবাদ চলবে না কমরেড। তোমার ধন আছে ব্যাঙ্ক—দয়া আছে মনে—সবাইকে সুখী করে সুখী হতে চাও—বেশ তো। ব্যক্তিটা তুমি ভাল—তবু কতটুকু তুমি! তুমি পুঞ্জিবাদকে ভাল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গলাতে পারবে না—

তোমরাও চেষ্টা কর না কেন এই ভাবে।

কমরেড—তুমি বুদ্ধিমান হয়ে এমন প্রস্তাব করবে ভাবি নি। 'আপনি আচরি ধর্ম লোকেরে শিখায়'—সব কাজের এই হ'ল মূল নীতি। বড় খাঁটি কথা।

প্রশান্ত বললে, তা বলে—

শুভা বললে, তর্ক করব না—কমরেড। যে গুরুদশাই হ'কো টানতে টানতে ছাত্রদের তামাক সেবনের অপ-কারিতা সহজে বক্তৃতা দেন, তাঁর বক্তৃতাকে কি বলবে তুমি? কিছুই বলব না। তাঁর আচরণটা অভ্যাসগত কিন্তু অভিপ্রায়টি নিঃসন্দেহে মহৎ।

শুভা বললে, ছাত্ররা অল্প বুদ্ধি—আর অনুকরণপটু, আমাদের মত বুনো আর সাধু হলে—অবস্থা

প্রশান্ত বললে, চল, একটা ভাল রেইক্রেটে বসা যাক। এভাবে কথা কাটাকাটি করে তোমাকে বোঝাতে পারব না।

চল। কিন্তু পেটে কিছু পড়লেই মাথার গোলযোগ ধামবে—আশা করো না।

অভিজাত শ্রেণীর একটা রেইক্রেটে পর্দানশীন হয়ে বসলে হ'জনে। চা এল—আমুষদ্বিক এল এবং সেগুলির সন্ধ্যাবহারের জন্ত কাউকে অনুরোধ করতে হ'ল না। খাওয়া চলল অত্যন্ত সহজ ভাবে—আর সেই কারণেই আলাপের স্রোত আটকে গেল। মোটরের গতির তালে—পাশাপাশি বসে যে কথা সহজে বলা যেত—নিশ্চল চেয়ারে মুখোমুখি বসে তার স্বত্র কিছুতেই টানা গেল না। মনে হ'ল কথা শেষ হয়ে গেছে। দুই বিপরীত স্রোত এক জায়গায় মিলেছে—একটুখানির জন্ত—আবার তারা বিপরীত গতি নেবে। তাদের মিলনে যে শব্দ উঠছে তা প্রীতিসন্তোষণ নয়—পথের কথাও নয়—ওটা সংঘাতই। অনৈক্যজাত সংঘাত—শব্দটাকে প্রতিবাদ বলাই শোভন বা সঙ্গত।

খাওয়া শেষ হলে—অকস্মাৎ প্রশান্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। সিগারেট বার করে বললে, তোমার অনুবিধা হবে না তো?

শুভা বললে, আগে তো হয় নি—

প্রশান্তর রক্ত এই প্রত্যুত্তরে দ্রুত প্রবাহিত হ'ল। সিগারেট রেখে ও শুভার একখানি হাত চেপে ধরে কোমল কণ্ঠে বললে, আগের কথা সব তোমার মনে আছে ?

শুভা বললে, আছে কিছু কিছু।

আমি কি ভালবাসি—না বাসি—

কমরেড বড্ড আপসেট হয়ে গেছ। আগের কথা মনে থাকলেই ভাবাবেগে ভেসে যাওয়া চলবে না। হাত ছাড়াবার চেষ্টা মাত্রও করলে না।

ধরের আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। হাতের উত্তাপে ভাষা সঞ্চার করবার চেষ্টা করলে না প্রশান্ত। ধরা না-দেবার লীলায় তার প্রকাশ সহজ হয় সুন্দর হয়। বিনা বাধায় তাই বোধ হচ্ছে নিরুত্তাপ—বিস্বাদ। একটি নিশ্বাস মোচন করে ও শুভার হাতখানা ছেড়ে দিলে।

শুভা সহজ ভাবেই বললে, আরও কিছু অর্ডার দেবে—না বিল মিটিয়ে বেরিয়ে পড়বে ?

কি থাকে বল ? নিরুৎসুক ধরে প্রশান্ত প্রশ্ন করলে।

একটু হাওয়া—ক্যানের নয় প্রকৃতির। বলে শুভা হাসলে।

বিল মিটিয়ে বাইরে এল প্রশান্ত। বললে, তোমায় পৌঁছে দেব ঠিকানায় ?

মত্তবাদ। ট্রাম বাস যা হয় একটা পেয়ে যাব।

ও পিছন ফিরতেই প্রশান্ত নিজের নির্বুদ্ধিতাকে বার বার বিস্তার দিতে লাগল। শুভা তাকে কি ভাবলে ? নিবিড় সঙ্গ পাবার জন্ত ওর এই আকুল কামনাকে কি চাটুবাদ বলে উপেক্ষা করলে শুভা ? আর পাঁচ জনের মত সে-ও কি শুভার কাছে সাধারণ আলাপিত একজন। তাঁদের অন্তরঙ্গতায় কোন দিন কি অহুরাগ-সিক্ত কোতুলক ভেসে ওঠে নি ? নিকটে টানবার আয়োজনের মধ্যে ছিল দেহগত আকর্ষণ—স্থূল মাংস-কামনার আবেগ ?

না—সোজা উত্তর চায় সে। দলগত নীতি—বা সমাজ-গত বাধা...কিংবা ভালমন্দ মনে করা-করির সঙ্কোচ এসব একপাশে ঠেলে একটি মাত্র সহজ সোজা প্রশ্ন করবে ওঁকে—হৃদয়-দৌর্বল্য বা আবেগ-উচ্ছ্বাস যাই বলুক—একটি মাত্র প্রশ্ন করবে—ভালবাসি আমাকে ?

মোটরের জানালা দিয়ে পিছন দিকে চাইলে প্রশান্ত। শহরের রাজপথে মানুষের আর যানবাহনের টেউ খন হয়ে উঠছে—চেনা মানুষের কূলে দৃষ্টিকে ভেড়ানো হৃৎস্রাব্য বটে।

কয়েকখানা জরুরি চিঠির মধ্যে—একখানি এসেছে বাড়ি থেকে। উপার্জনের ভেলায় চড়ে আবার সে স্নেহ-নদীর উপকূলে এসে পৌঁছেছে। বাবা তুফীজাব অবলম্বন করে থাকলেও চোখের দৃষ্টিতে স্বস্তির ভাব—মা তো আনন্দে চোখের জল ফেলে ভগবানকে যথেষ্ট মত্তবাদ জানিয়েছেন।

সংসারের জোয়ালে পাকাপাকি ভাবে জুড়ে দেবার পরামর্শ ওঁরা বহুদিন থেকেই আঁটছেন—তবে লাখ কথায় নিধি মেলানোর যোগাযোগ সহজে তো আসে না। আজকের চিঠিটায় বিয়ের কথা নেই—আছে বিপত্তির কথা। কলকাতা-নোরাখালি-বিহারের প্রতিক্রিয়া ওদের এটিতেও সুর হয়েছিল। ভয়াবহ রকম কিছু ঘটে নি—তবে যে কোন যুদ্ধে কিছু বটাও বিচিত্র নয়। প্রতিবেশীরা পরস্পর সন্দেহাকুল হয়ে বিনিময় রাজিযাপন করতে আরম্ভ করেছে। ছই পাড়ার সীমানা থেকে যথাসম্ভব লোকজন ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছে। গরু ছাগল বাসন-কোসন—সঞ্চিত চাল ডাল আর মেয়েছেলে সরে যাচ্ছে পাড়ার ভিতরে। কোলাহল-যুঝিত বাড়িগুলি দিনে রাত্রিতে থাঁ-থাঁ করে। চুরি হবার ভয়ে রাত্রিতে ঘে-কেউ একজন বাড়ির লোক শূন্যবাড়িতে শুয়ে থাকে। দিনের বেলায় দেখা হলে এওকে শুধায়, আচ্ছা ভাই—কারা এসব করছে বলতে পারিস ?

ভাই মাথা চুলকুে বলে, নইলে কলিকাল আর বলেছে কেন।

কালের দোহাই দিয়ে আসল সমস্তা এড়ানো যায় না—রাত জেগে জেগে হু'পক্ষই বহুতর গুজব সংগ্রহ করে আর দিনে দিনে তা মনের অন্ধকারে মাকড়সার জালের মত লুতাতস্ত বিস্তার করে চলে। নানাবিধ মারাত্মক অস্ত্র—হাত-বোমা বর্শা এসিড রামদাও লাঠি তীর বহুক কি না সংগ্রহ করছে এরা। অগ্নিগর্ভ অরণি কাঠে সামান্য দ্বর্ঘণ মাত্রই দাবানল জ্বলে উঠে।

বাড়িটা ওদের প্রান্তদেশে—তাই এত কথা পড়ে জানিয়েছেন মা। প্রশান্ত যেন শীত এসে তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।

সেইদিন সন্ধ্যাকালেই প্রশান্ত বাড়ি রওনা হ'ল।

২২

বাহত গ্রামখানি আগেকার মতই আছে—মানুষের মুখে ভাসছে উদ্বেগ। বর্গীর হাঙ্গামার কথা কেউ বইয়ে পড়েছে—কেউবা গল্প শুনেছে—কেউ কেউ শোনেই নি—অথচ মনে হচ্ছে তেমনতর দুর্দিনই বুঝি সমাগত। তারা এসেছিল বাইরে থেকে...দিনের কার্যতালিকায় আর রাত্রির নিদ্রায় সর্বক্ষণ-ব্যাপী ব্যাঘাত দিতে পারে নি—এ হ'ল কি ? 'সমর্পে চ গৃহে বাস'র মত লাগছে গ্রামখানিকে।

পথের হু'জায়গায় দেখলে গরুর গাড়ীতে মাল বোঝাই হচ্ছে। ছেলেতে বুড়োতে টানাটানি করে ট্রাক খলে বোঝাই বাসন আরও কি সব জিনিস গলিপথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভিন্ন পাড়ায়—নিরাপদ স্থানে এও চোখে পড়ল। এই ভাবে পালিয়ে আত্মরক্ষা করবে সব ?



প্রশান্ত গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই পাড়ার যুবক ছেলেরা ছুটে এল। বললে, আপনি এলেন—তবু সাহস হ'ল আমাদের।

বৈঠকখানায় এসে বললে, এ পাড়ার চাঁদা বিশেষ কিছুই ওঠে নি—মালপত্তরও যোগাড় নেই। আপনি এসেছেন—ব্যবস্থা করে যান।

প্রশান্ত বললে, রিলিফ ফাণ্ড খুলছে নাকি।

রিলিফ ফাণ্ডই বটে। বলে কানের কাছে খুঁকে পড়ে ফিস্ ফিস্ করে কি বললে।

প্রশান্ত বলল, এই ভাবে বাঁচবে! হি।

কি করব—ম্যাজিস্ট্রেট বন্দুক জমা দেবার হুকুম দিয়েছেন, কেউ বাড়ি চড়াও হলে আত্মরক্ষা করব কি দিয়ে।

যাতে আত্মরক্ষার প্রয়োজন না হয় তেমন ব্যবস্থা কর নি কেন। হু'পক্ষ মিলে—

আজ্ঞে পিস কমিটি একটি আছে—তবে তাতে বিশ্বাস কারও নেই। লোক দেখানো কখনো বারোয়ারি তলায়, কখনো দরগা তলায় তার মিটিং বসে—বক্তৃতা হয় কিন্তু ঐ পর্যন্ত।

এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে হুম্ করে একটা পটুকা ফাটার শব্দ হ'ল। দক্ষিণ দিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে হুম্ হুম্ করে গোটা দুই শব্দ উঠল।

যুবকটি বললে, শুনেছেন তো—বোম্বার আওয়াজ। রাত ভোরই শুনবেন আওয়াজ।

সুতরাং এখানে শান্তির কথা বলা নিরর্থক। হু'পক্ষের এত আয়োজন—শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে না পৌঁছে কি নিরস্ত হবে। তাই মুখে হুম্ কি আর বিনয়—প্যাঁচ কষাকষির কৌশল ছাড়া কিছু নয়। গত মহাযুদ্ধের আগে এগুলি পোষাক বদল করে রাজনীতির ক্ষেত্র কর্ষণ করে নি কি।

প্রশান্ত বললে, ওবেলা কথা বলব তোমাদের সঙ্গে।

মায়ের পায়ে প্রণাম সেরে বাবাকে দেখতে গেল। তিনি বেশির ভাগ সময় শুয়েই কাটান। শরীরে মেদ বেড়েছে—মনটাও কেমন যেন বিক্ষিপ্ত। কোন কথার যোগসূত্র টেনে রাখতে পারেন না।

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছেন?

দুর্গামোহন ললাটে তর্জনী ঠেকিয়ে হাসলেন। বললেন, গাঁয়ের কথা শুনেছ সব?

শুনেছি। আপনি কি কলকাতায় যেতে চান?

কলকাতায়? কেন? সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন। না-না তোমার গর্ভধারিণীকে আর বোনটিকে নিয়ে যাও—আমি কোথাও যেতে পারব না।

আপনার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে?

কেন—ভগবান নেই। তিনি করবেন সব।

বলতে বলতে শব্দ করে হেসে উঠলেন, তোমরা বিশ্বাস কর না কিছুই—কিন্তু তিনিই সব করান—আমরা নিমিত্তমাত্র।

প্রশান্তর ইচ্ছা নয় গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বিত্তীষিকা বাড়ায়। সে আর কোন কথা বললে না এ সম্বন্ধে।

বিরাজমোহিনী বললেন—ওঁর ভয় বাড়ি ছাড়লেই এখানকার ইট কাঠ কিছুই থাকবে না। কিন্তু বাবা—আপনি বাঁচলে তবে তো বিষয়সম্পত্তি। মথুরার মাও তো যাব যাব করছে। উত্তুর পাড়ায় জিনিষপত্তর সব পাঠিয়ে দিয়েছে—চেপ্টা করছে একখানা বাড়ি ভাড়া নেবার। ওরা চলে গেলে পাড়ায় আর রইলই বা কে। কার ভরসায় থাকব বল?

মাকে আশ্বস্ত করে প্রশান্ত বললে—সব ঠিক হয়ে যাবে—ভেব না মা। ভয় করলেই ভয়।

মা বললেন—তুই এসেছিস—যা ভাল ব্যবস্থা হয়—কর।

জলযোগ করে সে বেরিয়ে পড়ল পাড়ায়। বহুক্ষণ ধরে এ পাড়া ও পাড়া ঘুরল—হিন্দু মুসলমান বহু লোকের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলাপ করলে। দুই দলই তীত-সন্ত্রস্ত। রাজনীতির জটিল বিষয় এরা বুঝতে চায় না—দলগত প্রীতি-বিদ্বেষও বিচলিত নয়। ব্যক্তিগত সুখদুঃখ—ব্যবসায়গত লাভক্ষতি বা সমাজগত হুর্নাতি অপবাদ এইটুকুতেই ওরা কান্দে—আনন্দ করে—উদ্বেজিত হয়। বহুকাল পাশাপাশি বাস করে—কখনও গালাগালি—কখনও মাথা ফাটাকাটি হয়ে গেছে—আবার একদিল হয়ে গলাগলি করার সুযোগও এসেছে অচিরে। ঝগড়াবিবাদের মধ্য দিয়ে যে ব্যবধান গড়ে ওঠে—তার তাৎপর্য বুঝা কঠিন নয়—কিন্তু এই আকস্মিক বিভেদ—এর মাথা মুণ্ড খুঁজে পাচ্ছে না কেউ। প্রায় সবাই বলছে—এমনটা হ'ল কেন বাবু?

প্রশান্ত মাতব্বর লোকদের কাছে গেল। এঁদের কেউ কেউ শান্তি কমিটিতে আছেন।

বললে—আপনারা এক কাজ করুন। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ছেড়ে দিন।

সবাই অবাক হয়ে বললেন—সে কি—গান্ধীজী পর্যন্ত বলেছেন—

প্রশান্ত হাসলে। বললে, আপদ বাড়িয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তিনি দেন নি। অস্ত্রশস্ত্র বাড়িয়ে যদি শান্তিরক্ষা চলতো তো এত বড় যুদ্ধটা হ'ত না।

মিছেই যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা। তার কথায় সায় দিলেন কেউ কেউ—কেউ বা বললেন—তুমি ছেলেমানুষ—কতটুকু জান জগতের। স্বয়ং ভগবান জীবজন্তুদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন—আর মানুষকে বলেছেন—কিছু করো না—পড়ে পড়ে মার খাও।

অন্য পক্ষেরও ঐ কথা। বললে—ওরা কলকাতা থেকে শুণ্ডা আনিয়েছে—সে দিন বাজারে দেখলাম ইয়া গালপাট্টা—মুখখানা চাকা—এদেশে কোন দিন দেখি নি ওদের—

দু'দলকে এক করে আলোচনা চালাবার চেষ্টাও ব্যর্থ হ'ল। ধারা রটনা করছেন রঙ কলিয়ে—তারা দু'রেই রইলেন—যারা এক জায়গায় মিললেন—তারা বললেন—ঠিক কথাই তো—এ ভাবে মানুষ বাস করতে পারে পাশাপাশি? মিটমাট করে ফেলাই উচিত।

কিন্তু মিটমাট করবে কে? কোন পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়ে কেউ এগিয়ে এলেন না। বললেন—ওরে বাবা, একলার কি সাধি আমার।

বুড়োরা বললে—ছেলেরা মানে না আমাদের।

ছেলেরা বললে—বুড়োদের মত উস্কানি দিতে দ্বিতীয় কেউ নেই—ওদের সরান আগে পিস কমিটি থেকে।

স্বতরাং ক'দিন চেষ্টা করেও গ্রামের অবস্থা উন্নত করা গেল না।

পুলিসের পাহারা বসেছে—একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারী হয়েছে—তবু ভয় আর সন্দেহ ঘুচেছে না মন থেকে।

নতুন ঠাকুরদার চণ্ডীমণ্ডপে আত্মকাল ভীড় বেশী। বুড়ো-বুড়ীরা দু'বেলা এসে সাধছে—চলুন রায় মশায়—দুর্গা ক্রীড়ার বলে বেরিয়ে পড়া যাক। ষা খরচপত্তর লাগে আমরা দেব। যে ক'টি দিন আছে, অশান্তি সহ্য হয় না—তবু মনের শান্তিতে ঠাকুরদেবতা দেখে বেড়ানো যাবে।

ঠাকুরদা হেসে বলেছেন—এমনি করেই পরীক্ষা করেন ভগবান। ভয় দেখিয়ে বলেন—ওরে আমি আছি, আছি। সম্পদে কে আর তাঁকে ডাকে বল।

প্রশান্তকে দেখে বললেন, কি দাছ শান্তির দৃতিয়ালী নিয়ে নাকি।

না দাছ—এ যুগের দৃতিয়ালী ভোল বদলেছে, সে কালের মন গলানো কথা মনের বাইরেই পড়ে থাকে।

দাছ বললেন—যা বলেছিস নাতি—লাখ কথার এক কথা। আমরা কেঁটাযাত্রা দেখে কেঁদে বুক ভাসিয়েছি—তোরা এক কথায় তা ডিসমিস করে রায় দিস—রাবিশ। আমাদের কালে মন ছিল বৃকে—তোদের মন উঠেছে মগজে। তোদের নিস্তার নেই।

প্রশান্ত বললে—তা তো দেখতেই পাচ্ছি দাছ। কিন্তু ফ্যাসাদ এই—এ কালে তোমরাও রয়েছ—আমরাও রয়েছি—মাঝখানে কোন বাঁধন নেই।

দাছ বললেন—বাঁধন দেবার চেষ্টা কর—

না দাছ, চেষ্টা করে ফল হবে না। জগতে বার বার যত অশান্তি দেখা দিয়েছে—তার কোনটাই তো চেষ্টার দ্বারা শেষ হ'ল না। যুদ্ধের কারণ সবাই জানে—যুদ্ধের ফল সবাই বোঝে—অথচ যথানিয়মে যুদ্ধে যোগও দিচ্ছে সকলে। কেন এমন হয়?

দাছ বললেন—তোদের রাজনীতিটি বুঝি না ভাই—

তবে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্ত বার বার যে যুদ্ধ হ'ল ত্রেভায়—দ্বাপরে—তার মূল কথা হ'ল দুষ্কৃতের বিনাশ। এক দুষ্কৃত বিনাশ হলে অত দুষ্কৃত যে জন্মেবে না এমন কথা নয়—তাই সম্ভবামি যুগে যুগে। এই হচ্ছে জগতের সৃষ্টিলালা।

তোমার সৃষ্টিলালাকে প্রণাম করি দাছ—

দাছ হাসলেন—তোমাদের কল্যাণ-বুদ্ধি দিয়েও এ অমঙ্গলকে ঠেকাতে পারছ না তো ভাই—

আমাদের চেষ্টাকে শেষ চেষ্টা মনে করো না দাছ—

দূর বোকা—তু মনে করলে তাঁর সৃষ্টির রইল কি? সৃষ্টিতত্ত্ব যত সোজা মনে করিস তা নয়।

প্রশান্ত বললে—সৃষ্টিতত্ত্ব আর এক দিন শুনব দাছ—আজ সময় কম।

দাছ হো হো করে হেসে উঠলেন—আচ্ছা, আচ্ছা। তবে ও তত্ত্ব শুনে বোকা যায় না ভাই—আর বুঝলেও শোনানো কঠিন।

মলয়ের মা ওর হাত দুটি ধরে কাঁদলেন, হাঁ বাবা তোমার সঙ্গে দেখা হয় না তার? বলবে তাকে—মাকে এত কষ্ট দিলে ভাল হয় কোন ছেলের। বুড়ো বয়সে জাত খোয়াতে পারি নি—এই হ'ল গিয়ে আমার দোষ।

ওঁকে আশ্বস্ত করে বাড়ি ফিরে এসে মাকে বললে, কোন ভয় নেই মা বাড়িতেই থাক। কলকাতা ত বেশি দূর নয়—খবর পেলেই আসব আমি।

গ্রাম আর সে গ্রাম নেই। পুরাতন বিধি-ব্যবস্থা মুছে যাচ্ছে—নতুন কিছু আশ্রয়ের মত অন্তত গড়ে ওঠে নি। ট্রানজিশন পিরিয়ড। কি ভীষণ এই অন্তর্বর্তী কাল।—সমাজ-অস্থগত মানুষগুলিকে জোর করে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে টেনে আনা হচ্ছে। কে টানছে? সুবিধাবাদীরা? মহাকাল? যুগ-ধর্ম? যে-ই টানুক—এর গতি রোধ করা যাবে না।—হুটি প্রধান শক্তি...শক্তিসঙ্কয়ের নেশায় পৃথিবীর দেশ মহাদেশের নাড়ীতে দিচ্ছে টান। অভয়—হুঙ্কার—স্বত্ত্বাধী আর পরমাণু-শক্তি এই নিয়ে চলেছে খেলা। ইউরোপ—ভূমধ্যসাগর মধ্য-প্রাচ্য—ভারতবর্ষ—দ্বীপময় ভারত, আরব জগৎ—চীন—জাপান—হুটি শক্তির অক্ষজীভার ছকে ছড়িয়ে আছে। খেলা চলেছে পুরোদমে। কিন্তু এই খেলাই যে শান্তির চূড়ান্ত ফলাফল প্রসব করবে—সে ভবিষ্যদ্বাণী করবে কে?—নতুন করে ভাঙ্গাগড়ার যুগে পুরাতন পৃথিবী পাক খাচ্ছে—বিদীর্ণ হচ্ছে ছিঁড়ে গুঁড়িয়ে ছিটিয়ে পুড়ে মহাব্যোমে। সূর্য টানছে পৃথিবীকে—পৃথিবী টানছে চন্দ্রকে—উপগ্রহে বেষ্টিত হয়ে গ্রহগুলি চাইছে শক্তিময় হতে। অবিভাজ্য অগ্নর অহঙ্কার চূর্ণ করেছে মানুষ—মানুষ আজ ধ্বংসের দেবতা। তবু সে শিব হতে পারে নি; সৃষ্টি সংহারের ভারকে জগৎকে স্থিত করে রাখবার চেষ্টাই হচ্ছে নতুন পৃথিবী তৈরির ইতিহাস—দাছর ভাষায় সৃষ্টিলালা।

আজকার মানুষ সেই লীলার রস আবাদ করতে পারছে কি ?

২৩

এক দিন সূচিরা বললে, কই বললে না ত কি ধরনের কাজ আরম্ভ করেছ তোমরা ?

মলয় বললে, বলার চেয়ে প্রত্যক্ষ দেখতে চাও কি ?

চাইব না কেন ।

সংসার ভেঙে দিতে হবে—ঐহিক দি টেণ্ট সূচিরা ।

সূচিরা বললে, ভাল করে না বললে বুঝব কি করে ।

মলয় বললে, কাগজ তো পড় আজকাল—রোজই ।

পৃথিবীর নানা দেশে নানা রকমের গোলমাল—তবু এমন কোন মহৎ চেষ্টার খবর পাও না কি যাতে করে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে ।

সূচিরা চোখ মুখ উম্বুল হয়ে উঠল । বললে, পাই সে খবর । কিন্তু সে কি সার্থক হবে ?

সন্দেহ রাখলে বিশ্বাস আনা কঠিন । এক জনের চেষ্টা—পাঁচ জনের চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হলেই কাজ সহজ হয়ে আসে । তুমি ত দেখি কাগজ হাতে পেলেই মহাত্মাজীর প্রার্থনার অর্থ-গুলি মন দিয়ে পড় ।

সূচিরা বললে, পড়ি এই কারণে—ওগুলিতে স্পষ্ট সত্যকে খুঁজে পাই ।

মলয় হেসে বললে, স্পষ্ট সত্য খুব কঠিন মনে হয় বুঝি ? আর খুব তিক্ত ?

সূচিরা বললে, মন আমাদের তৈরি নয় বলেই কঠিন ঠেকে ।

তারপর নোয়াখালিতে গিয়ে কাজ আরম্ভ করার দায়িত্ব ও বিপদ আছে—এও জান ত ।

সূচিরা বললে, জীবনে কোন পরীক্ষাই তো দিলাম না ; বইয়ে আর কাগজে লোকের দৃষ্টান্ত পড়ে—ভাল ভাল করলাম শুধু ।

মলয় বললে, সংসারের মায়ী কাটিয়েছ বুঝি—তাই ইচ্ছে হয়েছে মানুষের মাঝে গিয়ে দাঁড়াতে ।

দূর, সংসার ছাড়ব বললেই কি ছাড়া যায় । মহাত্মাজী তো সংসার ছাড়তে বলছেন না কোথাও । সত্য আর ভালবাসা এই মূলধন নিয়েই তো দাঁড়িয়েছেন পরীক্ষা দিতে ।

তবু তোমাদের সন্দেহ হয়—এ পরীক্ষা কি সফল হবে ? তা হয় ।

কেন হবে সন্দেহ । সত্য যদি জয়ী না হয় তার শক্তি কমে গেল এ ভাববেই বা কেন । কাজকে যথার্থ ভাবে পেতে হলে কাজকেই নিতে হবে বেছে । আর কাজের আনন্দ শক্তি—সে-ও তো কাজের মধ্যেই রইল । যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ

করেছিল বলে—তার মহৎ বাণীকেও যে হত্যা করা হয়েছিল এ ধারণা ভুল ।

সূচিরা বললে, সাধারণ মানুষ সাধারণ ফলাফলে লক্ষ্য রেখে কাজ করে । জীষ্টের মহৎ বাণী পৃথিবীতে ভেসে বেড়াচ্ছে, আশ্রয় পাচ্ছে না—এও তো দেখছি আমরা ।

মলয় বললে, তা হ'লে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভার কথাগুলি তোমার ভাল লাগে কেন ?

সূচিরা বললে, হয়তো একটা দেহের মধ্যে দুটো মানুষ বাস করে এইজন্তে । একটা মানুষ চায় সংসারের লাভ-ক্ষতির চুলচেরা বিচার করে তাতে জড়িয়ে থাকতে—আর একটা মানুষ সত্যের কর্তৃপাথরে ফেলে সেগুলিকে যাচাই করতে চায় ।

সংসারের লাভক্ষতির দিকটা কি সত্যের দিক নয় ?

সূচিরা হেসে বললে, আমি পণ্ডিতলোক নই—পাঁতি দিতে পারব না । বাস্তব দিককে অস্বীকার করে মঙ্গল চেষ্টা বেশী দূর এগোয় না—এই তো দেখি । ধর্ম নিয়ে যারা পাগলের মত হানাহানি কাটাকাটি করে—তাদের কাছে প্রকৃত ধর্মের ব্যাখ্যা করাই হ'ল বাস্তবকে ঘোলা চোখে দেখা ।

প্রকৃত ধর্মের ব্যাখ্যাটি কি ?

মলয়ের কথায় সূচিরা কৃত্রিম ক্রোধে মুখ ফিরিয়ে বললে, যাও—জানি না ।

মলয় হো হো করে হেসে উঠল । বললে, এই ত, এত অল্পে রাগ করলে মানুষের সেবা করবে কি করে ।

সূচিরা বললে, মানুষের সেবা করব—এত বড় অহঙ্কার আমার নেই ।

ইস—ক্রমশঃ বিনয়ে মুইয়ে পড়লে যে । সূচিরা রাগ করে পালাচ্ছে দেখে মলয় খপ করে ওর হাত ধরে বললে, ধরে নিলাম মানুষকে বাঁচিয়ে রাখাই হ'ল মানুষের ধর্ম—আপাতত সে ধর্ম পালনে তুমি অবহেলা করছ ।

সূচিরা একটু হেনে বললে, কিসে ?

মানুষ যাতে শান্তিতে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে—যাতে শান্তিতে বাস করতে পারে—যথাসময়ে স্নান আহার উপাসনা স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে পারে—এসব দেখা প্রত্যেক সং প্রতিবেশীর কর্তব্য নয় কি ?

তাতে কি ।

তাতেই তো সব—সকালের রোদ চড়েছে কতখানি এ দেখেও যে প্রতিবেশী স্বাস্থ্য পালনের নিয়ম না মেনে মনুষ্য ধর্মহীন হয়ে পড়ছে তাকে সচেতন করে দেওয়া যায় যদি—

সূচিরা বললে, থাম—আর ব্যাখ্যায় কাজ নেই...সামান্য ক্ষিদ্বে সহ করতে পারে না যারা তারা আবার সেবা করতে যায় কোন্ সাহসে ।

নিতান্তই দুঃসাহসে ।

হাসতে হাসতে সূচিরা ঠোঁড় জেলে ফেললে। খানিকটা হালুয়া আর চা করে মলয়ের সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে, চা খেয়ে চল বেড়িয়ে আসি।

আপত্তি নেই।

রুকটার বাইরে আসতেই প্রশান্তর সঙ্গে দেখা। প্রশান্ত হাত তুলে ওদের ডাক দিয়েছে।

বললে, তোমাদের খুঁজছিলাম—চল বাসায়।

সূচিরা বললে, আর কোটরে নয় ভাই—পার্ক বসা থাক।

কাছাকাছি একটা ছোট মত পার্ক ছিল—তিন জনে তারই মধ্যে প্রবেশ করলে। যুদ্ধ-পূর্ব যুগের শ্রী পার্কের কোথাও চোখে পড়ে না—একেই শ্রী বলতে কলকাতার পার্কের কোনটতেই 'নেই'। অবিচ্ছিন্ন শব্দ ও ধূলিধূমের মধ্যে প্রকৃতির নির্জনতা বা শ্রী খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। যুদ্ধোত্তর যুগে এগুলিকে যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা হিসাবে ধরে নিয়ে খানিকক্ষণ বক্তৃতা দেওয়া চলে। স্লিট ট্রেকের প্রয়োজন মিটে যেতেই সেগুলিকে কবর দেওয়া হয়েছে—তবে মাটিটাকে সমান করে দেবার বা সে মাটিতে ঘাস বুনবার কি মরসুমি ফুল ফোটাবার চেষ্টা কেউ করেন নি। বেকিগুলিও পান্না ভাঙা ও পিঠ ভাঙা অবস্থায় কোন রকমে খাড়া হয়ে আছে। তারই একটিতে তিন জন এসে বসলে।

প্রশান্ত বললে, তোমার বাড়ি যাওয়া উচিত মলু।

জ্যেষ্ঠিমার অবস্থা দেখলাম খুব খারাপ—তাকে দেখবার লোকেরও দরকার।

কেন, মেজ বউদি?

তিনি তো বাড়িতে নেই—মেজদা বাসা করে তাঁদের কলকাতায় এনেছেন। তা ছাড়া দেশের অবস্থাও ভাল নয়।

মলয় সূচিয়ার পানে ফিরে বললে, মা আমাদের কথা বললেন ঠাকুরপো? কি বললেন।

দেশের অবস্থা সংক্ষেপে জানিয়ে প্রশান্ত বললে, তোমার মা তাঁর আত্মীয়বাড়ি উঠবেন ঠিক করেছেন—কেবল বড় বউদির ব্যবস্থা—

সূচিরা বললে, আমরা যাব।

প্রশান্ত চলে গেলে মলয় বললে, যেক্ষণ আমরা বাড়ি ছাড়লাম চিরা—

সূচিরা বললে, এক একটি মুহূর্ত এত বড় হয়ে আসে যখন অল্প মুহূর্তের ঘটনাগুলি মুছে যায়। কেন আমরা বাড়ি ছেড়েছি সে কথা এখন থাক। একটি নোয়াবালিতে আমরা সবাই ভিড় করে নাই-বা গেলাম।

ঠিক বলেছ—আমার গ্রামেও তো যথেষ্ট কাজ রয়েছে। বলে সূচিয়ার হাত ধরে ও টানতে আরম্ভ করলে।

সূচিরা বললে, আঃ আস্তে—তোমাদের সঙ্গে আমরা দৌড়ে পারব কেন।

মলয় বললে, আমরা হাউই—তোমরা হচ্ছ তার বারুদ। ঠেলে দিয়েছ যখন তখন তাল রাখবে নাই-বা কেন।

আঃ তবু টানে। এটা পথ না।

মলয় হেসে বললে, আমরাও তো যাত্রী।

২৪

ব্যারাকে ফিরতেই দেখে—মেজদা তালা-লাগানো দোর-গোড়ায় পায়চারি করছেন। মেজদাকে দেখেই মলয়ের রুকটা ছাঁৎ করে উঠল। প্রশান্ত এই মাত্র চলে গেল, দেশের অবস্থা ভাল নয়—মেজদা কোন মন্দ খবর নিয়ে আসে নি তো!

মেজদা।

মেজদা ফিরে চাইলেন—মুখের ভাব তাঁর একটুও কোমল বোধ হচ্ছে না। কোন কথা না বলে প্রথর সন্ধানীর দৃষ্টি দিয়ে ওদের দু'জনকে বিধতে লাগলেন।

সূচিরা অস্বস্তি কাটিয়ে প্রথম এগিয়ে এল তাঁর দিকে—হেঁট হয়ে প্রণাম করলে তাঁকে। তারপর আঁচল থেকে চাবির গোছাটা হাতে নিয়ে...তালা খুলে ফেললে।

মলয় বললে, বস মেজদা।

মেজদা ঘরের চারদিকে সেই প্রথর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, এইটুকু ঘরে—আচ্ছা ঘরের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—এই নানান জাতের মধ্যে থাকিস কি করে?

মলয় সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, বসবে না?

মেজদা বললেন, 'কাজটা জরুরী বলেই এলাম নইলে—একটু থেমে' বললেন—তোমার বউদিকে কলকাতায় নিয়ে এসেছি—দেশের অবস্থা শুনেছ' বোধ হয়।

মলয় বললে, চা খাবে তো?

নাঃ—থাক। তাচ্ছিল্যভরে অমুরোধ ঠেলে পাতা বিছানার উপর বসলেন। বসে বললেন, মাকে এত সাধলাম, এলেন না। ভিটে কামড়ে পড়ে থেকে কি যে পরমার্থ লাভ করবেন তা উনিই জানেন। এখন বায়না ধরেছেন বৃন্দাবন পাঠিয়ে দাও। যত ছজুগের দল নাকি বলেছে—দাদার মত দেখতে এক জন সন্ন্যাসীকে—ওই কাশী মথুরার দিকে দেখা গেছে। বাস—আর যায় কোথায়।

তা মা যদি যেতে চানই—

যেতে চাইলেই তো পাঠানো সম্ভব নয়—রেশুর জোগাড় না হলে তীর্থধর্মই বল—আর বাপের শ্রাদ্ধ, মেয়ের বিয়েই বল কোনটাই হবার জো নেই। রুধির—রুধির, সব আগে চাই রুধির।

মলয় কথা কইলে না। সংসারে এতকাল ব্যবস্থা বা করবার উনিই করেছেন—কোথা থেকে কি করলে ভাল হয় সে উনিই জানেন ভাল। এ বিষয়ে তাঁর মতামতের কোন মূল্য নেই।

মেজদা বললেন, দাদা বিবাহী—তুমি উপার্জন কর না—  
সংসারের যত দায় আমার। একলা মানুষ নিজের ছেলেপিলে  
পরিবার দেখব—না জমিজমা দেখব, না—মা বউদিকে দেখব  
বল। অথচ মার একটা ব্যবস্থা করা দরকার—খুবই দরকার।  
তাই ঠিক করলাম পূর্ব মাঠের পাঁচ বিঘে জমি বিক্রী করে—  
মার ব্যবস্থা করে ফেলা যাক। তুমিও তো অংশীদার, তোমার  
মত চাই—বিক্রী কোবালার সহ চাই—তাই—

মলয় বললে, এ বিষয়ে আপনি যা ভাল বোঝেন করুন—  
সই সাবুদ যা দরকার করে দেব।

সুচিরা ছ' কাপ চা ও কিছু খাবার নামিয়ে দিলে ছ'জনের  
সামনে। মেজদার মুখের গাঙ্গীর্ষ্য মিলিয়ে গেছে—প্রসন্ন  
মুখে উনি হাত বাড়িয়ে একটি পেয়াল টেনে নিলেন—  
খাবারের প্লেট থেকেও কিছু খাবার নিলেন, চা খাওয়া শেষ  
করে বললেন, কাগজ পড় নিশ্চয়, খবর রাখ—তেভাগা  
ব্যবস্থায় আমাদের দফা রফা। জমির খাজনা টানতে হবে  
যোল আনা—ধরে আসবে না একটি আধলা। কিন্তু কীকি  
দেব বললেই তো কীকিতে ইচ্ছে করে পড়ে না কেউ। আইন  
ঠেকাবার ব্যবস্থা আমরাও জানি।

তারপর গলার স্বর নামিয়ে তিনি বললেন, সবাইকে জমি  
ছাড়িয়ে দিয়েছি—ওরা ষ্টাম্প কাগজে লিখে দেয় যে হাল  
বলদ জমির সার ইত্যাদি যাবতীয় খরচ মালিকের কাছ থেকে  
পেয়ে চাষ করছি, তবেই—ভাগে দেব জমি।

মলয় বললে, সবাই কি হাল বলদ লাঙল দিতে পারবে?

এই বুদ্ধি নিয়ে বাস করলেই জমি তোমার থাকবে। হাল  
বলদ দেবে না ঢেকে। ওরা লিখে দেয় ভাল—না দেয় পথ  
দেখুক গে। আয়প্রসাদে ক্ষীত হয়ে তিনি হেসে উঠলেন।

মলয় হঠাৎ উঠে ভিতরের দিকে গেল। সুচিরা ইতিমধ্যে  
তোলা উল্লুনে আঁচ দিয়েছে—কয়লার ধোঁয়ায় ছোট ধরটা  
গেছে ভরে। দাঁড়িয়ে থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসে।

সুচিরা বললে, মেজ বটঠাকুরকে খেয়ে যেতে বল না।

না—দাদা বাসায় গিয়েই খাবেন।

তা যাও—ওঁর সঙ্গে গল্প করগে—এখানে বড্ড ধোঁয়া।

তা হোক। একখানি পিড়ি পেতে মলয় বসে পড়লে  
সেইখানে। বললে, বাড়ি কালই যেতে চাও?

মানে—নিম্নে খাবার মালিক কে—

হাঁ—কালই চল। স্বরে জোর দিয়ে মলয় উঠে দাঁড়াল।

সুচিরা অবাক হয়ে ওর পানে চাইলে। বুঝলে ও মনে  
মনে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে—অবিস্তি ভোগ করছে।

মলয় এ ঘরে আসতেই মেজদা বললেন, কি বলিস—কাল  
কাগজগুলো এনে সইসাবুদের ল্যাটা চুকিয়ে ফেলি—কেমন?

মলয় বললে, মার সঙ্গে একটা পরামর্শ করা—

উফঃস্বরে হেসে উঠলেন তিনি। তবেই করেছ ব্যবস্থা!

উনি কি মানুষ আছেন—না বুদ্ধিবুদ্ধি—আর বলবেনই বা  
কি! টাকার দরকার তো বটেই—আর জমি না বেচলে—

মলয় তাড়াতাড়ি বললে, বেশ আপনি যা ভাল বোঝেন—

মেজদা খুসী মনে মাথা নাড়লেন। বললেন, এই এতটুকু  
বেলা থেকে মাথা দিয়েছি সংসারে। কিসে ভাল কিসে  
মন্দ সে হিসেব আমার যথেষ্ট আছে। একবার হয়েছিল  
কি জানিস—দশমীর দিন—

মলয় আর একবার উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরতা প্রকাশ করলে।  
মেজদা ইঙ্গিতটা বুঝে গল্পের জের আর টানলেন না। মলয়কে  
তিনি ভাল মতেই জানেন। দেখতেও পরম বিনয়ী—উঁচু  
গলায় কাউকে চড়া কথা বলে না কখনো—কিন্তু ওর অন্তরের  
কাঠিঙ্গ—তার মত অনমনীয় বস্তু আর দ্বিতীয় নাই। কোথা  
থেকে আঘাত লেগে ওরা মুহূর্তে অমন বদলে যায়—ওদের  
নীতির মাপকাঠিই বা কি—অজ্ঞান অপমান বোধ কোন্‌ তুচ্ছ  
কারণে উগ্র হয়ে ওঠে—এসব রহস্য আজও তিনি বুঝতে  
পারেন না। কাজি উণ্টে ঝড়টা দেখে হঠাৎ তিনি সচকিত  
হয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন, ইস্—রাত হয়ে গেল  
দেখ! দাদাহাদামা না থাকলেও বিশ্বাস নেই এখানকার  
অবহাওয়াকে। উঠি।

তিনি চলে যেতেই মলয় নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ  
করলে। সে কেন মেজদার সর্ভে রাজী হয়ে গেল! একি  
তার দুর্বলতা নয়। মনে স্বীকার করে যে নীতিকে মঙ্গলগ্রন্থ  
বলে—মুখে তাকেই করলে অস্বীকার। যে জমির ওপর  
জীবন ধারণ করে মানুষ—তার স্বপ্নে কেন সে স্বপ্নবান হবে  
না। যাদের উপার্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে—তাদের  
লোলুপ দৃষ্টি জমির উপস্থিতি নাই বা রইল। জমি কি তারই  
যে, খেয়ালখুসিমত হস্তান্তর করে দেওয়া চলবে।

এই বাড়ির ঘরে শুয়ে আকাশ দেখা যায় না—আকাশের  
নক্ষত্র তো ছল্লভ বস্তু। একটু কঁাকা—একটু হাওয়া—রাতের  
পৃথিবীর স্তম্ভিময় সামান্য দেহাংশ—এ না দেখতে পেলে  
আজ তার ঘুম আসবে না।

সুচিরা জিজ্ঞাসা করলে, শরীর খারাপ লাগছে কি?  
হাওয়া করব?

না।—স্বর গম্ভীর—ভাঙ্গা-ভাঙ্গা।

তবে অমন করছ কেন? অন্ধকারে সরে এসে সুচিরা  
ওর কপালের ওপর একখানি হাত রাখলে।

মলয়ের মনে হ'ল এর চেয়ে চমৎকার সাধুনা পৃথিবীতে  
নেই। নিশ্চয় পৃথিবীর নিঃসঙ্গ অন্ধকারে লক্ষ্যহীন হয়ে ও  
পরিভ্রমণ করছে। সৌধের অন্তরালে যে আকাশ হীরক-  
হ্রাতিতে অপরাপ হয়ে পৃথিবী পরিভ্রমণ করছে—তার সুরভি  
নিশ্বাস ওর উত্তপ্ত কপালে এসে লাগছে। চোখের পাতা  
ভারি হয়ে আসছে—ঘুম আসবে এই মুহূর্তে। (ক্রমশঃ)



# ক্যাপশীয় রঙ্গ-চিত্র

শ্রীকানাইলাল সাহা

ইউরোপে প্রস্তর-যুগ আরম্ভের সময় মধ্য-ইউরোপের অ্যারিগ-  
থাক নামক স্থানে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে, প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা  
বলেন, এর অনেক আগে আফ্রিকার টিউনিশিয়া প্রদেশের  
গ্যাক্সা বা ক্যাপশিয়া নামক স্থানে আর একটি স্বতন্ত্র  
সভ্যতার সৃষ্টি হয়। একে বলা হয় ক্যাপশিয়ান সভ্যতা। এর  
স্থিতিকাল প্রস্তর-যুগের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত।



১ নং চিত্র

এই সভ্যতার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ  
আছে। কোন কোন গবেষক বলেন : খৃষ্টের জন্মের প্রায়  
এগার হাজার বছর আগে এক দল ক্যাপশিয়ান অভিযাত্রী  
জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনে উপস্থিত হয়।  
ক্রমে তারা আধিপত্য স্থাপন করে স্পেনের পূর্ব দিকে। এই  
অভিযাত্রী দলই স্পেনে ক্যাপশিয়ান সভ্যতাবিস্তারের অগ্রদূত।

কোন কোন গবেষকের অনুমান : স্পেন অভিযানের  
পূর্বে আর এক দল ক্যাপশিয়ান বাসী বর্তমান সিসিলি দ্বীপের  
ওপর দিয়ে ইটালী দেশে চলে যায়। এই সময় দুটি সংকীর্ণ  
ভূমি-খণ্ড দ্বারা সিসিলি টিউনিশিয়া ও ইটালীর সঙ্গে সংযুক্ত  
ছিল। এই অভিযাত্রীদের দ্বারাই ক্যাপশিয়ান শিল্পের  
ধারাটুকু ইটালীতে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে এই শিল্পের ধারা  
গ্রিমাল্ডির (Grimaldi) শিল্পের সঙ্গে মিশে যাওয়ায়  
ক্যাপশিয়ান সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য লোপ পায়।

খৃষ্টের জন্মের সাত হাজার বৎসর পূর্বে যে সংকীর্ণ স্থলভাগ  
টিউনিশিয়া ও সিসিলিকে সংযুক্ত করে রেখেছিল তা সমুদ্র-  
গর্ভে বিলীন হওয়ায় ক্যাপশিয়ান বাসীদের ইটালী অভিযান  
বন্ধ হয়।

গবেষকগণ বলেন : অ্যারিগ থাকের অধিবাসীরা ফ্রান্সের  
দক্ষিণে পৌছুবার অল্পদিন পরেই ক্যাপশিয়ান বাসীরা  
জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনে হাজির হয়। কারো  
কারো মতে, অ্যারিগ নৈশীয় ও ক্যাপশীয় শিল্পের উদ্ভব একই  
উৎস ও মনোবৃত্তি থেকে। এই সময় ডাকিনী-বিজ্ঞার প্রচলন

ছিল। এই ডাকিনী-বিজ্ঞার করণ-কারণ থেকেই যে চিত্র-  
কলার উদ্ভব এ কথা বহু প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত স্বীকার করেন।  
গবেষকদের ধারণা, ক্যাপশিয়ান বাসীদের অভূত ধরণের  
ছবিগুলির সঙ্গে যাদু-বিজ্ঞার একটি অতি নিকট সম্বন্ধ আছে।

ক্যাপশিয়ার অধিবাসীদের চক্রমকি পাথরের তৈরি বহু  
লম্বা সরু সরু যন্ত্রপাতি ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরবর্তী  
টিউনিশিয়া প্রদেশ থেকে মরক্কো প্রদেশের  
পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ভূখণ্ডের মধ্যে পাওয়া  
গেছে। তারা উঁচু পাছাড়ের ঝোলানো  
পাথরের ওপর ছোট ছোট ছবি আঁকতে  
ভালবাসত এবং এ সম্বন্ধে তাদের আগ্রহও  
ছিল খুব বেশী। এই সব ছবিতে তাদের  
জীবনধারণের প্রণালী খুব স্পষ্টভাবেই  
অভিব্যক্ত। এই ধরণের যে সব ছবির সম্মান  
পাওয়া গেছে তার চরম উন্নতি হয়েছিল  
প্রস্তর-যুগের প্রথম দিকেই।

ক্যাপশিয়ান বাসীরাই সম্ভবতঃ রঙ্গ-চিত্রের প্রবর্তক। এদের

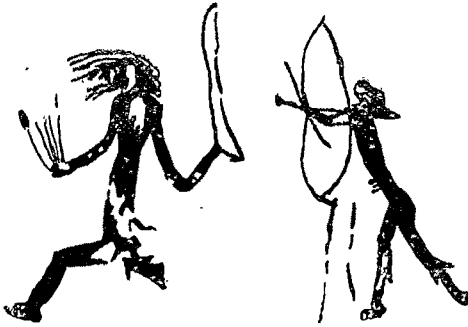


২ নং চিত্র

আঁকা মানুষের ছবিগুলি অত্যন্ত অদ্ভুত ধরণের ও কৌতুকপ্রদ। দেখে মনে হয়, কতকগুলি কাঠি জোড়া দিয়ে যেন মানুষের মূর্তি খাড়া করা হয়েছে (১নং চিত্র)। এইসব মূর্তির কোনটির মাথায় পালকের টুপি পরানো, কোনটির মাথায় আবার কয়েকটি পালক গোঁজা।

পুরুষদের ছবির অধিকাংশই নগ্ন, নীচের ও ওপরের হাতে তাগা-বালায় মত গহনা পরানো এবং কাঁধের ওপর ঝোলানো আছে একটি ঝালর-দেওয়া পোশাক। মেয়েদের ছবিগুলি কিন্তু নগ্ন নয়। গায়ে আঁট-সাঁট ঘাঘরা পরানো, কটিতে একটি কোমরবন্ধ এবং মাথায় লম্বা টুপি। এদের কোমর আঁকা হয়েছে পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী সরু করে (২নং চিত্র)।

ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের চিত্রকলার বিশেষত্ব, প্রত্যেকটি মূর্তি যেন জীবন্ত এবং প্রত্যেকটিতে অঙ্গ-চালনার ভঙ্গীটুকু পরিস্ফুট। এই অঙ্গভঙ্গী আবার অভিযুক্ত করা হয়েছে উদ্ভট



৩ নং চিত্র

ভাবে। পুরুষরা সব চলেছে লম্বা লম্বা পা ফেলে (৩ নং চিত্র)। এদের আঁকা, কয়েকটি শিকারের ছবিরও সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ছবিগুলিতে শিকার-রত তীরন্দাজদের ক্ষিপ্ততা খুব স্পষ্টভাবেই অভিযুক্ত (৪ নং চিত্র)।

পণ্ডিতেরা বলেন : এই যুগের শিকারী-শিল্পীরা নিজেদের গতির ক্ষিপ্ততা বাড়াবার উদ্দেশ্যেই ছবিতে গতি-ভঙ্গী ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করত। ছবিতে যে গতি-ভঙ্গী প্রকাশ করা হবে তার প্রত্যক্ষ ফলটুকু বর্তাবে শিল্পীর নিজেরই ওপর, এই ছিল তাদের ধারণা। এই ক্ষিপ্ত গতির প্রভাবেই তারা ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠবে সুদক্ষ শিকারী, এ ধারণাও যে তারা পোষণ করত তা কতকটা অনুমান করা যায়।

এই ছবিগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, এই যুগের শিল্পীদের শিল্পের প্রধান অঙ্গ ছিল গতি-ভঙ্গীর (Movement Speed) অভিযুক্তি। হুনিপুণ রেখাপাতে এই যুগের শিল্পীরা তাদের শিল্পগত বৈশিষ্ট্যটুকু এমন স্পষ্টভাবে রূপায়িত করেছে যে, বর্তমান শিল্পীদের চোখে তা সত্যিই বিস্ময়ের

বস্তু। শুধু আঙ্গিকের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে তাদের কৃতিত্বের প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

এই যুগের শিল্পীদের আঁকা কয়েকটি মানুষের ছবি থেকে সে যুগের পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবনধারার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। তাই এই ছবিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য খুবই বেশী।



৪ নং চিত্র

স্পেনের পূর্ব-ভাগে যে সব ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, সে যুগের গ্রী-পুরুষ উভয়েই পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করত। অনেক গবেষক তাই অনুমান করেন যে তাদের নগ্ন পুরুষের ছবিগুলি আঁকা হয়েছে চিত্রকলার উদ্ভবের প্রথম দিকে। এই সময় ডাকিনী-বিভার প্রভাব ছিল অত্যধিক। শিল্পী বোধ হয় এই ডাকিনী-বিভার কোন করণ-কারণের গোপন উদ্দেশ্য সাধনের জেতেই বাধ্য হয়েছে নগ্ন মূর্তি আঁকতে।

এই সময়ের শিল্পীদের আঁকা কয়েকটি শিকারের ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সব ছবিতে দেখা যায় পুরুষরা শিকার করছে দল বেঁধে (৫ নং চিত্র), আর মেয়েরা নৃত্যে মেতে উঠেছে (৬ নং চিত্র)।

প্রথম অবস্থায় ক্যাপশিয়ানরা শিকারের আশায় বনের ভেতর ঘুরে বেড়াত। এই সময় সাহারা প্রদেশ এখনকার মত শুষ্ক মরুভূমি ছিল না। এর পশ্চিম দিকটি ছিল শিকারের একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র। সিংহ, ভল্লুক, হায়েনা, জিরাফ, বুনো বাঁড়, হরিণ, জেব্রা, জলহস্তী, উটপাখী প্রভৃতি বহু জীবজন্তুর বিহার-ভূমি। ক্রমে সাহারা প্রদেশ যখন মরুভূমিতে পরিণত হতে লাগল এই সব জীবজন্তু তখন চলে গেল দক্ষিণ-আফ্রিকার অভিমুখে। একদল ক্যাপশিয়ানরা শিকারীও তাদের অনুসরণ করতে করতে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যায়। এই ভাবে তাদের রুপ্তির খানিকটা দক্ষিণ আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

কেউ কেউ বলেন : স্পেনের ক্যাপশিয়ান অভিযাত্রীরা পশু-শিকারের তত পক্ষপাতী ছিল না। ম্যাগডালেনিয়ার শিকারীদের অনুকরণে তারা ক্রমে মৎস্য-শিকারে অভ্যস্ত হয়। এই সময় তাদের রুচিরও কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। অবসরকালে তারা উঁচু পাছাড়ের চূড়ায় উঠে ছবি আঁকত। এই ছবি আঁকা ছিল তাদের অবসর বিনোদনের খেলা।

ক্যাপশিয়ানরা জীবজন্তুর ছবি আঁকা শুরু করে ম্যাগডালেনিয়ানরা তাদের প্রভাবে, গবেষকদের অভিমত এইরূপ। ক্রো-মাঞ্চে শিল্পীদের শিল্পের প্রতিকৃতির সঙ্গে



৫ নং চিত্র

জীবজন্তুর ছবি আঁকা রয়েছে দেখা যায়। এই সব ছবি পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন, এগুলি ক্যাপশিয়ান শিল্পীদেরই আঁকা। তাঁদের এই ধারণাটুকুর যথার্থ্য প্রমাণের সপক্ষে বলা যেতে পারে যে, মানুষের মূর্তি আঁকতে ক্যাপশিয়ান শিল্পীরাই ছিল সিদ্ধহস্ত। পূর্ব স্পেন বা দক্ষিণ ফ্রান্সে মনুয়ামূর্তি আঁকার প্রচলন হয় ক্যাপশিয়ানবাসীদের স্পেন-অভিযানের পর। আবার মনুয়ামূর্তিকে রেখাবদ্ধ করে অঙ্কনের প্রবৃত্তি এই ক্যাপশিয়ান শিল্পীরাই। তাই মনুয়ামূর্তিসহ শিকারের ছবিগুলি ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের আঁকা—তাঁদের এই মত সঠিক বলেই মনে হয়।

পূর্ব-স্পেনের ছবিগুলিতে একটি জিনিস-কিন্তু লক্ষ্য করবার আছে। উভয় সভ্যতার শিল্পীদের চিত্রকলা পাশাপাশি গড়ে উঠলেও প্রত্যেকেই কিন্তু নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রাখবার চেষ্টা করেছে।

ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের চিত্রকলাকে মোটামুটি ছয় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :—

(১) প্রথম অবস্থায় এরা ছোট ছোট মূর্তি আঁকত। এগুলির অঙ্কন-প্রণালী অতি সাধারণ, তাই এগুলিকে চিত্রকলার নিদর্শন হিসাবে না ধরে রেখাচিত্রের প্রাথমিক পদ্ধতি হিসাবে ধরে নেওয়াই ভাল।

(২) ক্রমে এরা অর্ন্ত্য হয়ে উঠল একরঙা রেখা-চিত্রে। এগুলিতে প্রকৃত চিত্রকলার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।

(৩) এর পরের অবস্থার ছবিগুলি বড় বড়। এগুলির অঙ্কন-প্রণালী আর একটি উন্নত ধরনের। এই ধারার রেখা-চিত্রগুলিতে তারা আলো-ছায়ার খেলা দেখাতে শুরু করে।

(৪) তার পর শুরু হয় একরঙা ছবিতে-আলো-ছায়ার খেলা। এই আঙ্গিকের ছবিগুলিতে ওদের শিল্পবোধের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

(৫) একরঙা ছবিগুলি ক্রমে একত্রে বোধ হওয়ায়

তারা দ্বিবর্ণ ও বহু বর্ণের ছবি আঁকতে শুরু করে। এই সময়ই তাদের চিত্রকলার চরম উন্নতি হয়।

(৬) শেষ অবস্থায় বিভিন্ন সভ্যতার, বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রভাবে ক্যাপশিয়ান চিত্রকলার অঙ্গহানি হয়। তাই ধীরে ধীরে ওদের চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য লোপ পেতে থাকে।

ক্যাপশিয়ান চিত্রকলার উৎকর্ষের কালের বিভিন্ন জায়গায় আঁকা ছবিগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এক এক জায়গার ছবির আঙ্গিক এক এক ধরনের। এই সব ছবির মধ্যে মানুষের ছবিগুলির বিভিন্ন ভঙ্গী লক্ষ্য করবার মত। অনেকে অনুমান করেন, বিভিন্ন ছবিতে রকমারি পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করার জন্মেই এই পার্থক্যটুকু ঘটেছে।



৬ নং চিত্র

এদের আঁকা রঙ-লেপা (silhouette) ছবিগুলিও আকর্ষণ-যোগ্য। এগুলির অঙ্কন-প্রণালী ম্যাগডালিয়ান শিল্পের মত হলেও ক্যাপশিয়ান শিল্পের বৈশিষ্ট্যটুকু সম্পূর্ণভাবে বজায় আছে।

ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের চলমান (chattel) শিল্পের কোন নমুনার সন্ধান পাওয়া না গেলেও অনেকের ধারণা, তারা এই জাতীয় শিল্পের সঙ্গেও পরিচিত ছিল। এদের চলমান শিল্পের নমুনাগুলি ম্যাগডালিয়ার শিল্পের নিদর্শনের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, সেগুলির শ্রেণী বিভাগ করা অত্যন্ত দুর্বল ব্যাপার।

পূর্ব-স্পেনে ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের আঁকা মণ্ডনশিল্পের নিদর্শন—পোশাক পরিহিত ছবিগুলির সঙ্গে মিশরবাসীদের অলঙ্করণ শিল্পের অনেকটা মিল দেখা যায়।

কারো কারো মতে উভয় অঞ্চলের শিল্পীরা হয়তো একই সময়ে এই আঙ্গিক উদ্ভাবন করে। কেউ আবার বলেন : মিশরবাসীরা তাদের ব্যবহার করা পোশাকগুলি অতি যত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছিল। ক্রমে ওদের মণ্ডন-শিল্পের (Decorative Art) আঙ্গিকটুকু আয়ত্ত করে নিজেদের চিত্রকলায় তা প্রতিফলিত করতে শুরু করে।

শেষের মুক্তিটাই সঠিক বলে মনে হয়। কারণ, গবেষণাগার প্রমাণ করেছেন, স্পেনের চিত্রকলার আবির্ভাব হয়েছিল নব্য প্রস্তর (Neolithic) যুগের অধিবাসীদের ইউরোপ অভিযানের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগে। মিশরে সভ্যতার আলো বিকীর্ণ হয় কিন্তু এর অনেক পরে।

## জলধর সেন

১৮৬০—১৯৩৯

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ; শৈশব-শিক্ষা : ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ (১২৬৬, ১ চৈত্র) নদীয়ার অন্তর্গত কুমারখালী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-পরিবারে জলধরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম— জলধর সেন। “আমার বয়স যখন তিন বছর,...সেই সময়ে আমার পিতার মৃত্যু হয়।...পিতার মৃত্যুর পর আমরা শুধু পিতৃহীন হলাম না, পথের ভিখারী হয়ে পড়লাম।”

জলধর শৈশবে স্থানীয় বঙ্গবিদ্যালয়ে বিজ্ঞা শিক্ষা করেন। হরিনাথ মজুমদার (কাশাল হরিনাথ) এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৭১ সনের ডিসেম্বর মাসে জলধর গোয়ালন্দ স্কুল হইতে মাইনর পরীক্ষা দিয়া বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৭৮ সনে তিনি কুমারখালী উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন ; পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ষাড্‌গ্রেড জুনিয়র স্কলারশিপ লাভ করেন। এই বৎসর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া সেকেন্ড গ্রেড স্কলারশিপ লাভ করিয়াছিলেন।

“গণিতের দিকে বিশেষ ঝোক ছিল বলিয়া জলধর ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হইবেন। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সেসন্‌ জুন মাসে আরম্ভ হইত, একজু ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার পর তিনি কয়েক মাস বাড়ীতেই বসিয়া ছিলেন। সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল হেরথচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় একই স্থানের অধিবাসী। তিনি সে সময় এম-এ পড়িতেছিলেন। জলধরের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রবেশের ইচ্ছা শুনিয়া তিনি জানান যে, গরীবের পক্ষে উহার ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব। তিনি জলধরকে জেনারেল লাইনেই প্রবেশ করিতে পরামর্শ দিলেন। বলিলেন ১০ টাকা স্কলারশিপ আছে, আর ৪৫ টাকা হলেই কলিকাতার খরচ চলিয়া যাইবে। কলিকাতায় গিয়া বিভাগাগর মহাশয়কে ধরিলে বিনা মাহিনায় তাঁহার কলেজে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।...”

কলিকাতায় আসিয়া জলধর এক পুরাতন বঙ্গুর বাসায় উঠেন এবং পরদিন প্রাতেই বিভাগাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। এই সাক্ষাতের বিবরণ তাঁহার মুখের কথায় যেরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহাই ছব্বছ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।...

বিভাগাগর বললেন—‘একজামিনের রেজাল্ট ত ডিসেম্বর মাসে বেরিয়েছে, তুই এই এপ্রিল মাস পর্যন্ত কি করছিলি?’ আমি তখন অল্প কথায় আমার বিলম্বের কারণ তাঁকে জানালাম, আর আমার ছরবছর কথাত বললাম। বিভাগাগর

মহাশয় নিম্নকৃত ভাবে আমার দিকে চেয়ে, আমার দুঃখ কষ্টের কাহিনী শুনলেন। তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—



পরিব্রাজক-বেশে জলধর সেন

‘তাই ত রে, আমার কলেজে ফাষ্ট ইয়ারে বোধ হয় স্থান নেই, সব ভ’রে গিয়েছে। দাঁড়া জিজ্ঞাসা করছি।’ এই বলে, অধিবাসীকে ডাকলেন। তিনি এলে বললেন—‘দেখ অধিবাসী, এ ছেলেটি তোমাদের দেশের, এর বাড়ী কুমারখালী। এ ফাষ্ট ইয়ারে ভর্তি হ’তে চায়। ভাল ছেলে হে, স্কলারশিপ পেয়েছে।’ অধিবাসী বললেন, ‘আর ছেলে নেবার উপায় নেই, সব ভর্তি হয়ে গিয়েছে।’ বিভাগাগর মহাশয় তখন আমার দিকে চেয়ে বললেন—‘শুনলি ত, এ বছর আর আমার কলেজে স্থান হবে না। এ বছরটা অল্প কলেজে ভর্তি হ, আসছে বছর তোকে সেকেন্ড ইয়ারে নেবো। মাইনে টাইনে কিছু দিতে হবে না।’ তার পরই একটু চুপ ক’রে থেকে বললেন—‘দ্যাখ তোমার কথা যা শুনলাম, তোমার খরচ চলবে



কি করে? এই ধর না কেন, জেনারেল এসেমরীতে যদি ভক্তি হ'তে পারিস, তা হলে তারা ৫ মাইনে নেবে,—



জলধর সেন

স্কলারশিপগুলাদের এক টাকা রেহাই দেয়। তা হলে আর তোর ৫ টাকা থাকলো, তাতে চলবে কি করে? এ কথার আমি আর কি উত্তর দেবো, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি তখন বললেন—‘মনে কিছু করিস না, এ বছর তোর কলেজের মাইনে আমি দেবো। তার পর, সেকেন্ড ইয়ারে ত এখানেই আসছিস। তাই যা, জেনারেল এসেমরীতে বোঁজ নে গিয়ে। শুনেছি তারা ভক্তি করে, তাদের বেশী ছেলে হয় নি। আজই সেইটে ঠিক করে, কাল সকালে আবার আমার এখানে আসিস—বুঝলি?’

আমি তখন কঁদে ফেলেছি। মাহুষের হৃদয়ে যে এত দয়া থাকতে পারে, এ আমি জানতাম না। আমার সেই অবস্থা দেখে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উঠে এসে, আমার মাথায় হাত দিয়ে, যে একটি কথা বলেছিলেন, সে কথা এখনও আমার মনে আছে। বললেন—‘ওরে পাগল, দারিদ্র্য অপরাধ নয়। আমিও তোর মত দরিদ্র ছিলাম। যা, কাল আসিস।’ (‘দয়ার সাগর ও দীন জলধর’: শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু।—‘জলধর-কথা’, ১৩৪১)

১৮৭৯ সনে জলধর জেনারেল এসেমরীজ ইনষ্টিটিউশনে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। ১৮৮০ সনের শেষে তিনি এল. এ. পরীক্ষা দিলেন বটে কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না।

**গোয়ালন্দে মাষ্টারি :** এল. এ. ফেল করিয়া জলধরকে চাকুরীতে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। ১৮৮১ সনে তিনি ২৫ বেতনে গোয়ালন্দ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার বড় দাদা (জ্যেষ্ঠতাতপুত্র) তখন গোয়ালন্দের কৌজদারী আদালতের পেশকার; তিনিই চেষ্টা করিয়া চাকুরীটি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

**বিবাহ :** গোয়ালন্দে মাষ্টারি করিবার সময় জলধরের বিবাহ হয় (ইং ১৮৮৫)। তিনি লিখিয়াছেন :—

“সেই যে ৮১ অব্দে ২৫ টাকা বেতনে মাষ্টারী আরম্ভ করেছিলাম, ৮৫ অব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত আমার সে মাইনে আর বাড়ি নি। ঐ সালের শেষ ভাগে স্কুলের কর্তৃপক্ষের শুভদৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তাঁরা আমার বেতন ৫ টাকা বাড়িয়ে দিলেন।... আমার এ বেতন বৃদ্ধির কারণ এই যে স্কুলের কর্তৃপক্ষরা নানাভাবেই জানতে পেরেছিলেন যে আমাদের দরিদ্র সংসারে আর একটি লোক বৃদ্ধি হয়েছে। সেই নবাগত লোকটির ধোঁরাকি বাবদ তাঁরা আমার ৫ বেতন বৃদ্ধি করে দেন। সে নবাগত আর কেহ নন—আমার স্ত্রী। সেই বৎসরের প্রথম ভাগে আমি বিবাহ করি।” (‘স্মৃতি-তর্পণ’: ‘ভারতবর্ষ’, মাঘ ১৩৪২)

**সাহিত্যানুরাগ :** শৈশব হইতেই মাতৃভাষার প্রতি জলধরের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। গোয়ালন্দে অবস্থিতকালে তিনি কাদাল হরিনাথের মাসিক ‘গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা’য় মাঝে মাঝে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ১২৮৮ সালের জ্যেষ্ঠ (জুন ১৮৮১) সংখ্যায় “পূর্ণচন্দ্র” নামে তাঁহার একটি সুলিখিত সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছি। উত্তরকালে জলধর সাংবাদিকের খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু সংবাদপত্র-সেবায় তাঁহার হাতে ঝড়ি হয়—সাপ্তাহিক ‘গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা’য়। গোয়ালন্দে মাষ্টারী-কালে তিনি বন্ধু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সহযোগে, কিছু দিন (বৈশাখ ১২৮৯—আশ্বিন ১২৯২) সাপ্তাহিক ‘গ্রামবার্তা’ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

**প্রবাস-যাত্রা :** ১৮৮৭ সন জলধরের জীবনে একান্ত দুর্বৎসর। এই বৎসর তাঁহাদের পরিবারে শোকের গভীর ছায়াপাত হইয়াছিল। তিনি “শোকসন্তপ্ত, অধীর চিত্তকে সংযত করিবার জন্ত জন্মভূমি ছাড়িয়া এক অনির্দিষ্ট দেশে যাত্রা” করিলেন। তাঁহার “স্মৃতি-তর্পণে” প্রকাশ :—

“পূর্ববর্তী ঘটনার [জাহ্নয়ারি ১৮৮৭] নয় মাস পরে এক দিন অপরাহ্নে গোলদীঘির ধারের ফুটপাথের উপর অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে আমার দেখা।... অশ্বিনীকুমার [দত্ত] সেই রাত্তার মধ্যেই আমাকে জড়িয়ে ধরে তিরস্কার করে বললেন, হাঁরে জলধর, এত নির্ভর তুই,—এই ন’ মাসের মধ্যে একটা খবরও দিলি নে। আমি শুদ্ধ মুখে বললাম—খবর তো কিছু নেই দাদা,—সব খবর শেষ হয়ে গিয়েছে।



সে কি, আমি শেষ বুঝতে পারছি নে। আমি বললাম—  
শুনবেন দাদা! আপনার সঙ্গে শেষ দেখার চার মাস পরে  
আমার একটি কথা-সম্ভান হয়। বার দিন পরেই সেটি মারা  
যায়। তার বার দিন পরেই আমার গৃহিণীও সেই পথে  
যান। তার তিন মাস পরে আমার মাতাঠাকুরাণীও চলে  
গিয়েছেন। এখন আমি হিমালয়যাত্রী।...

দুই মিনিট পরেই আত্মসম্বরণ করে অশ্বিনীকুমার ধীরে  
ধীরে বললেন—“জলধর, এ আনন্দের হাট সকলের ভাগ্যে  
বেশী দিন টিকে না। হিমালয়ে যাচ্ছ, যাও। দেখ, যদি শান্তি  
পাও।” (‘ভারতবর্ষ,’ মার্চ ১৩৪২)

নানা স্থান পর্যটন করিতে করিতে জলধর শেষে  
ডেরাডুনে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি লিখিয়াছেন :—

“তখনো আমি বদরিকাশ্রমের দিকে যাই নি। যাবার  
কল্পনাও মনে হয় নি। কালীকান্ত সেন নামে বরিশাল  
জেলাবাসী এক শিক্ষিত ভদ্রলোক ডেরাডুনে এক ইংরেজী  
স্কুল খুলেছিলেন। আমি ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের মধ্যে  
গিয়ে সর্বপ্রথম ডেরাডুনে এই মাষ্টারজীর আশ্রয়লাভ করি।

মাষ্টারজী আমাকে পেয়ে বসলেন। তিনি বললেন—  
হিমালয়ে বেড়াতে হয় বেড়াবেন, যখন যেখানে ইচ্ছা যাবেন—  
একটা আড্ডা তো দরকার। যখন আমার এখানে এসেছেন,  
হিমালয়-ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে এইখানে এসেই বিশ্রাম করবেন  
এবং সেই বিশ্রাম-সময়ে আমার স্কুলে ছেলেদের পড়াবেন।...

কি করি,—ভদ্রলোক খেতে দেবেন, কাপড় ছিড়ে গেলে  
কাপড় কিনে দেবেন, শীতবস্ত্র দেবেন—তার পরিবর্তে যখন  
ডেরাডুনে থাকব তখন তাঁর স্কুলের ছেলেদের অঙ্কশাস্ত্রে  
গাথা বানাব।” (‘ভারতবর্ষ,’ ফাল্গুন ১৩৪২)

১৮৯০ সনের ৬ই মে জলধর ডেরাডুন হইতে বদরিকাশ্রম  
যাত্রা করেন। হিমালয়-ভ্রমণ শেষ করিয়া কিছু দিন পরে  
পুনরায় ডেরাডুনে ফিরিয়া আসেন।

**মহিষাদলে মাষ্টারি :** মুসাকিরকে শেষ পর্য্যন্ত  
পুনরায় সংসারে বাসা বাঁধিতে হইল। দীনেন্দ্রকুমার রায়  
“সে কালের স্মৃতি” কথায় বলিয়াছেন :—

“কিছু দিন পরে জলধর বাবু দেশে প্রত্যাগমন করিলেন।  
তিনি কুমারখালী ফিরিলে শুনিতে পাইলাম, তিনি  
লোটা-কন্ডল সম্বল করিয়া তাপিত চিত্ত শীতল করিবার জন্ত  
হিমাচলের সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন,  
অনেক ছুগম-তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর  
আশ্রয়েও কালযাপন করিয়াছিলেন; অবশেষে তিনি কোন  
মহাজানী সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে,  
সেই সাধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের  
সময় হয় নাই; তাঁহার ভাগ্যে আছে—তাঁহাকে দীর্ঘকাল  
সংসারধর্ম করিতে হইবে, তিনি পূরা সংসারী হইবেন, তাঁহার

সংসারধর্মের সকলই বাকি; তিনি কিরূপে সাধুর শিষ্যত্ব  
গ্রহণ করিবেন? সাধু তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে  
আদেশ করিয়াছিলেন। এইজন্মই তাঁহার সন্ন্যাসী হওয়া  
হইল না, তাঁহাকে লোটা-কন্ডল ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিতে  
হইল।...

কুমারখালী প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সাহিত্যসাধনায়  
কাদালের সাহচর্য্য অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু সংসারী  
হইবার জন্ত আর তাঁহার আগ্রহ হইল না। কিন্তু কাজকর্ম না  
করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তিনি কষ্টকর মনে করিলেন।  
তিনি সংসারভ্যাগের পূর্বে মাষ্টারী করিতেন; কোথাও  
মাষ্টারী পাইলে আবার ছেলে পড়াইতে আরম্ভ করিবেন—  
বন্ধুগণের নিকট এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

এই সময় আমি মহিষাদলে আসিয়া স্কুলের শিক্ষকের  
খাতায় নাম লিখাইয়া শিক্ষকরূপে এল, এ, পরীক্ষা দিব—  
এইরূপ স্থির হইয়াছিল। এ কালের মত সে কালেও কেহ  
‘প্রাইভেট টিউটর’-রূপে এল, এ, বি, এ, পরীক্ষা দিতে পারিত  
না। মাষ্টারীর লেজুড় জুড়িবার প্রয়োজন হইত।

মহিষাদল স্কুলে তখন তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি ছিল।  
শিক্ষকের জন্ত কোন কোন ইংরেজী কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া  
হইল। কাকাই স্কুলের কর্তা; আমি তাঁহাকে বলিলাম,  
তৃতীয় শিক্ষকের গণিতে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন বলিয়া  
বিজ্ঞাপন দিতেছেন; জলধর বাবু গণিতে বিশেষজ্ঞ।  
আমি তাঁহাকে জানি, আপনারা ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেতনে  
তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর শিক্ষক পাইবেন না; এতদ্বির,  
আমি মাষ্টারী করিয়া এল, এ, দিব, অথচ আমি গণিতে এত  
কাঁচা যে, কোন গণিতজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্য ভিন্ন পরীক্ষায়  
উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। জলধর বাবু যদি দয়া করিয়া  
আমাদের বাসায় থাকেন, তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে  
সর্বদাই তাঁহার সাহায্য পাইতে পারি; তিনি চেষ্টা করিলে  
হয়ত গাধা পিটিয়া বোড়া করিতে পারিবেন।...আমার চেষ্টা  
সফল হইল। জলধর বাবু মহিষাদল স্কুলে চাকুরী করিতে  
আসিলেন। ম্যানেজারের বাসের অটালিকার কয়েক গজ  
পশ্চিমে ঘুং-প্রাচীর পরিবেষ্টিত একখানি খড়ের ঘর ছিল;  
সেই ঘরে আমি ও জলধর বাবু একত্র বাস করিতাম। আমি  
তাঁহার নিকট অঙ্ক শিখিতাম। সেই সময় হইতে তিনি  
আমার ‘মাষ্টার মশার’। আমি তাঁহার নিকট গণিতবিজ্ঞা  
শিখিতাম বটে, কিন্তু সে সময় আমাদের সাহিত্যালোচনারও  
বিরাম ছিল না।” (‘মাসিক বহুমতী,’ ভাদ্র ১৩৪০)

১৮৯১ কি ১৮৯২ সনে জলধর ৪০ বেতনে মহিষাদল  
রাজস্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহিষা-  
দলে থাকিতেই তাঁহার হিমালয়-ভ্রমণ-কাহিনী ‘ভারতী ও  
বালক,’ ‘ভারতী,’ ‘সাহিত্য’ ও ‘জন্মভূমি’তে ক্রমশঃ প্রকাশিত

হয়। এ বিষয়ে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ—১২৯৯ সালের মাঘ-সংখ্যা ‘ভারতী ও বালকে’ মুদ্রিত “টপকেম্বর ও গুচ্ছপাদি”। জলধর লিখিয়াছেন :—

“যখন আমি হিমালয়ের মধ্যে ছিলাম, সেই সময়ে আমার আর কিছুই সম্বল ছিল না, শুধু সম্বল ছিল কান্দাল হরিনাথের বাউলের গানের একখানি বই। আমার এক বন্ধু সেই বইখানির ছুরবস্থা দেখিয়া যখন ভাল করিয়া বাঁধাইয়া দেন, তখন তিনি তাহার সহিত কয়েক পৃষ্ঠা সাদা কাগজ জুড়িয়া দিয়াছিলেন। আমি সেই সাদা পৃষ্ঠাগুলিতে আমার ভ্রমণের কথা একটু-আধটুকু লিখিয়া রাখিতাম,—ওটা একটা খেয়াল-মাত্র; পরে যে কিছু করিব, একথা ভাবিয়া লিখিতাম না; সে অভিজ্ঞায় থাকিলে-যথাযথভাবে অনেক কথা লিখিয়া রাখিতে পারিতাম। যখন মহিষাদলে গেলাম, তখনও ঐ বইখানি আমার সঙ্গে ছিল,—মহিষাদলে এক দিন দীনেজবাবু আমার সেই গানের বইখানি দেখিতে পান এবং পেলিলে লেখা সেই কথাগুলিও পড়েন। সে সময়ে তিনি ‘ভারতী’তে প্রবন্ধাদি লিখিতেন এবং ‘ভারতী’-সম্পাদিকা মহাশয়ও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। দীনেজবাবু আমাকে ধরিয়া বসিলেন যে, আমার হিমালয়-ভ্রমণকথা ‘ভারতী’তে লিখিতে হইবে। আমি ত কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলাম। শৈশবকাল হইতে যদিও একটু আধটুকু লেখাপড়ার চর্চা করিতাম, কাগজপত্রেও সামান্য কিছু লিখিতাম; কিন্তু বাদ্ধালা দেশ ত্যাগের পর হইতে লেখাটা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।...কিন্তু দীনেজবাবু কিছুতেই ছাড়িলেন না, জোর করিয়া হিমালয়-ভ্রমণের প্রথম প্রস্তাব লিখিয়া লইলেন এবং নিজেই বিশেষ উত্তেজিত হইয়া ‘ভারতী’ পত্রে প্রেরণ করিলেন।...সম্পাদিকা মহাশয় আমাকে জানাইলেন যে, আমার হিমালয় ভ্রমণ পাঠকগণের ভাল লাগিয়াছে, এ সংবাদ তিনি পাইয়াছেন।...সে যাহাই হউক, আমি ‘ভারতী’তে লিখিতে লাগিলাম।...হিমালয়ের কথা তাহার পূর্বে কেহ বাদ্ধালায় হয়ত লেখেন নাই; তাই আমার লেখা যা তা-ই সকলে পড়িতে লাগিলেন। তখন আমার সেই প্রবাস পল্লী হইতেই শুনিতে লাগিলাম যে, ‘জলধর সেন’ নামে কোন ব্যক্তি নাই, ঠাকুরবাড়ীর কেহ ছদ্ম নামে হিমালয়-কাহিনী লিখিতেছেন।...আমি যখন ‘ভারতী’তে হিমালয়-ভ্রমণ লিখিতে আরম্ভ করি, তাহার কিছু দিন পূর্বে পুজনীয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ‘ইউরোপযাত্রীর পত্র’ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আমি হিমালয় লিখিবার সময় তাঁহারই অতুলনীয় লিখন-পদ্ধতি (style) অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছিলাম;...সে সময় হয়ত বা ঐ লিখন-পদ্ধতি দেখিয়াই অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন।...যাক সে কথা। আমি প্রায় দুই বৎসর ক্রমাগত লিখিয়া ‘ভারতী’ পত্রে আমার হিমালয়-ভ্রমণের

এক অংশ শেষ করিয়াছিলাম; তাহাই একত্র সংগ্রহ করিয়া পরে ‘হিমালয়’ ছাপাইয়াছিলাম।” (‘ভারতী-স্মৃতি’ : ‘ভারতী’, বৈশাখ ১৩২৩)

বিপত্তীক জলধরকে সংসারী করিবার জন্ত তাঁহার মহিষাদলের বন্ধুরা বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে ডায়মণ্ড-হারবারের সম্মিলিত উত্তি গ্রামের দত্ত-পরিবারে তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। দীনেজবাবু লিখিয়াছেন, “বিবাহের পর জলধর বাবু মহিষাদলে স্বতন্ত্র বাসা করিয়াছিলেন। সম্মানী দীর্ঘকাল পরে সংসারী হইলেন দেখিয়া আমি রাজসাহীতে চাকরি করিতে চলিলাম। সে বোধ হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা।” (‘মাসিক বহুমতী’, আশ্বিন ১৩৪০)

‘বঙ্গবাসী’ : প্রায় আট বৎসর মহিষাদলে কাটাইয়া জলধর সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে ‘সাহিত্য’-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির চেষ্টায় তিনি মাসিক ৩০ বেতনে ‘বঙ্গবাসী’ সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবেশ করিবার সুবিধা পাইলেন (ইং ১৮৯৯)। কিন্তু ‘বঙ্গবাসী’র মূলমন্ত্রের সহিত নিজকে খাপ খাওয়ান তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি “দেড় মাস সেবা করবার ভান করে অবশেষে অব্যাহতি লাভ” করিলেন। (‘ভারতবর্ষ’, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩)

‘বহুমতী’ : ১৮৯৬ সনের ৮ই আগষ্ট (২৫ আশ্বিন ১৩০৩) ‘বহুমতী’ সাপ্তাহিকরূপে জন্মলাভ করে। ১৮৯৯ সনের ২৭এপ্রিল (১৩০৬, ১৫ বৈশাখ) হইতে জলধর সহকারী সম্পাদক রূপে ‘বহুমতী’তে যোগদান করেন।\* কিছু দিন পরে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিদায় গ্রহণ করিলে জলধরই ‘বহুমতী’র সম্পাদক হন। তিনি লিখিয়াছেন :—

“১৩০৬ সালের...পূজা কেটে গেল। আমরা অবকাশান্তে এসে কার্যে যোগদান করলাম। সেই সময়েই অতর্কিতভাবে আমাদের নিরুপদ্রব শান্তির ব্যাঘাত উপস্থিত হ’ল, ‘বহুমতী’র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রবাবুর সহিত সম্পাদক পাঁচকড়ি বাবুর সংঘর্ষ উপস্থিত হ’ল।...এই সংঘর্ষের ফলে পাঁচকড়ি বাবু ‘বহুমতী’ থেকে বিদায় পেলেন এবং তাঁর স্থানে আমি সম্পাদক

\* দীনেজবাবুর রায় “জলধর-স্মৃতি-সম্বর্ধনা” নামে আলোচনায় (‘মাসিক বহুমতী’, ভাদ্র ১৩৪৩, পৃ. ৮৯৫) এই তারিখ দিয়াছেন। তারিখট ঠিক বলিয়াই মনে হয়। মনে রাখা দরকার, জলধরের ‘প্রবাস-চিত্র’ প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাসে, তখন তিনি কলিকাতায়। সমাজপতি যখন নিজ প্রেসে ‘প্রবাস-চিত্র’ ছাপিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তাঁহার পরামর্শে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে পুস্তকের প্রকাশক হইতে অনুরোধ করিবার জন্ত জলধর মহিষাদল হইতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন—এ কথা জলধর নিজেই বলিয়াছেন (‘ভারতবর্ষ’, বৈশাখ ১৩৪৩ খ্রষ্টাব্দ)। এই ঘটনার “তিন-চার মাস পরে” তিনি মহিষাদল ত্যাগ করিয়া ‘বঙ্গবাসী’তে যোগদান করেন এবং দেড় মাস পরে ‘বহুমতী’র সহকারী সম্পাদক হন।

নিযুক্ত হলাম।...অতবড় একখানা কাগজ আমি একলা কি করে চালাই।...আমার তখন মনে হ'ল সুহৃদর শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের কথা। তিনি তখন সুদূর বরোদায় শ্রীঅরবিন্দকে বাংলা ভাষা শিখাচ্ছিলেন। তাঁরা দুই জন ব্যতীত সেখানে আর বাঙালী ছিল না। দীনেন্দ্রবাবুর কাজ-কর্ম খুব কমই ছিল এবং অবসরও যথেষ্ট ছিল; কিন্তু তিনি বাঙালীর সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করতে না পেরে ইঁপিয়ে উঠেছিলেন, একথা আমি জানতাম। আমি তখন উপেন্দ্রবাবুর সন্মতি নিয়ে বরোদায় দীনেন্দ্রবাবুকে পত্র লিখলাম। তিনি সানন্দে আমার সহযোগী হ'তে সন্মত হলেন এবং দশ পনের দিনের মধ্যে কলিকাতায় এসে আমার পাশে বসে, তিনিও হাঁক ছাড়লেন—আমিও হাঁক ছাড়লাম।\* (‘ভারতবর্ষ,’ আষাঢ় ১৩৪৩) প্রায় আট বৎসর কাল জলধর যোগ্যতার সহিত ‘বসুমতী’র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ১৩১৩ সাল অন্তত মুক্তি দেওয়া দিল। জলধরের সংসারে রোদন-রোল উঠিল; তিনি একে একে কনিষ্ঠ সহোদর ও ভগিনীকে হারাইলেন। পুজার পরেই তাঁহার কথা ও পত্নী কলেরায় আক্রান্ত হইলেন। কথ্যটিকে বাঁচান গেল না। তিনি কলেরার কবল হইতে রুগ্ন পত্নীকে হিনাইয়া লইয়া উদ্ভ্রান্ত চিত্তে দেশে যাত্রা করিলেন। দীনেন্দ্রকুমার ‘বসুমতী’র কর্ণধার হইলেন।

► ‘সন্ধ্যা’ : তিন চার মাস দেশে কাটাইয়া অন্নচিন্তায় জলধরকে পুনরায় কলিকাতা ফিরিতে হইল। তিনি মাঝে মাঝে সকালবেলা ‘সন্ধ্যা’র চায়ের আড্ডায় জমায়েৎ হইতেন।

“সেই সময়ে একদিন [ব্রহ্মবাক্য] উপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বললেন—দেখুন জলধরবাবু, আপনার ত এখন কোন কাজ নেই। প্রত্যহ সকাল বেলা ‘সন্ধ্যা’ অফিসে আত্মন না কেন? মুড়ি বেগুনি আর চা খাবেন—আর ‘সন্ধ্যা’ কাগজের জন্ত এক কলম কি ছ’ কলম যা হয় লিখবেন। বাসায় ফিরে যাবার সময় আমি আপনাকে বেণী দিতে পারব না। ‘সন্ধ্যা’র সে শক্তি নেই। নগদ ছুটি করে টাকা দেব। আমি ভাবলাম—মন্দ কি? বসেই তো আছি, যে দিন আসবো চা যোগ তো হবেই, আর ‘সন্ধ্যা’ কাগজের এক কলম কি ছ’ কলম লিখতে আধ ঘণ্টার বেণী সময়ও লাগবে না। দক্ষিণ নগদ ছুটি টাকা—যথা লাভ।” (‘ভারতবর্ষ,’ শ্রাবণ ১৩৪৩) জলধর মাত্র কয়েক দিন ‘সন্ধ্যা’র সহিত যুক্ত ছিলেন।

● ‘হিতবাদী’ : এই সময়ে সংবাদ আসিল, ‘হিতবাদী’—

\* “১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের শীতের প্রারম্ভে, বোধ হয় পুজার কয়েক সপ্তাহ পর, আমি অরবিন্দকে বাংলা ভাষা শিখাইবার ভার লইয়া বরোদায় গাই।...আমি দুই বৎসরাধিক কাল তাঁহার সহবাসে যাপন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম।”—দীনেন্দ্রকুমার রায় : ‘অরবিন্দ-প্রসঙ্গ’ (মাঘ ১৩৩০), পৃ. ৩, ৮৪।

সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ আপান হইতে প্রত্যাগমন কালে জাহাজে দেহরক্ষা করিয়াছেন (৪ জুলাই ১৯০৭)। ‘হিতবাদী’র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ সেন সখারাম গণেশ দেউকরকে দিয়া জলধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

“উপেন দাদা কাজের লোক; ভূমিকা বা ভণিতা না করে তিনি সোজাখুজি ব’লে বসলেন, ‘দেখ জলধর, তোমাকে হিতবাদীর ভার নিতে হবে।’ আমি ত অবাক—এ কি প্রস্তাব। আমি বললাম, ‘আমার দ্বারা হবে না দাদা।’ তাই নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হলো। অবশেষে আমি বললাম, ‘আপনারা যদি সখারামের উপর সম্পূর্ণ ভার দেন, তা হলে আমি তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।’ উপেন দাদা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন ‘ভেবে দেখি। তুমি কাল একবার এসো।’ পরের দিন গেলাম। তিনি বললেন ‘তোমার প্রস্তাবেই সন্মত হলাম। আজ থেকেই কাজ আরম্ভ করে দাও।’ তাঁর আদেশে সেই দিন থেকেই আমি ‘হিতবাদী’র সেবক হলাম।” (‘ভারতবর্ষ,’ শ্রাবণ ১৩৪৩)

সুস্মৃতি কংগ্রেস-কালোপাহাড়ী কাণ্ডের পর রাজনীতিক মতামত লইয়া ‘হিতবাদী’র স্বত্বাধিকারিগণের সহিত সম্পাদকের বিরোধ বাধিল। তেজস্বী মরাঠা-সন্তান তিলকের বিরুদ্ধে কোন কিছু লিখিতে সন্মত না হইয়া চাকরি ত্যাগ করিয়া গেলেন। অতঃপর জলধরই ‘হিতবাদী’র সম্পাদক হন (ডিসেম্বর ১৯০৭)।

কিছু দিন পরে জলধর বুঝিলেন, তাঁহার পক্ষে বেশী দিন ‘হিতবাদী’র সহিত যুক্ত থাকা চলিবে না। তিনি লিখিয়াছেন :—

“হিতবাদীর পরম শুভাভিধানী বলতে আরম্ভ করলেন, হিতবাদীর সুর নরম হয়ে গিয়েছে। সে কথা শুনেও চূপ করে রইলাম। তার পরে অভিযোগ হ’তে লাগলো, আমি বিশারদের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করছি। যে বিশারদ দাদাকে আমি গুরুর মত ভক্তি করি, আমার দ্বারা তাঁর বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, এ অভিযোগ আমি সহ্য করতে পারলাম না—আমি তখন বিশারদ দাদার উদ্দেশে প্রণাম করে তাঁর হিতবাদীর সেবা হ’তে অবসর গ্রহণ করলাম।” (‘ভারতবর্ষ,’ শ্রাবণ ১৩৪৩)

সন্তোষের গৃহশিক্ষক ও দেওয়ান : জলধর-হিতবাদীর সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সন্তোষের জমিদার শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরীর ছেলেমেয়ের অভিভাবক ও শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন (ইং ১৯০৯)। তিনি দুই বৎসরাধিক কাল সন্তোষে ছিলেন; কিছু দিন দেওয়ানীও করিয়াছিলেন। কিন্তু ম্যালেরিয়ার উৎপাতে সে স্থান ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিল।

‘সুলভ সমাচার’ : সন্তোষে অবস্থানকালে ‘সুলভ সমাচার’ের সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিবার জন্ত জলধর

অমূল্য হন। নরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদকত্বে নবপরিচালিত দৈনিক ‘সুভাসচরিত্র’ ১৩১৮ সালের ১লা বৈশাখ (১৯১১, ১৪ এপ্রিল) ক্রীক রো হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা গবর্নমেন্টের সাহায্যপ্রাপ্ত পত্রিকা ছিল; গবর্নমেন্ট ইহার ২৫ হাজার খণ্ড নির্দিষ্ট মূল্যে (অর্দ্ধ আনা) ক্রয় করিয়া বাংলা দেশের জনসাধারণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। নরেন্দ্রনাথ ভাল বাংলা জানিতেন না, জলধরই তাঁহার নির্দেশমত পত্রিকার সকল কার্য নিরূপণ করিতে লাগিলেন।

পত্রিকা প্রকাশের পর চারি মাস যাইতে না যাইতেই নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় (জুলাই ১৯১১)। তখন গবর্নমেন্টের তরফ হইতে জলধরই বদ্ধিত বেতনে ‘সুভাসচরিত্র’র সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু গবর্নমেন্ট এক বৎসরের অধিক কাল পত্রিকাখানি জীবিত রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। এই বৎসর পৌষ মাসে দিল্লী-দরবারের ঘোষণায় বঙ্গবিভাগ রদ হইয়া গেল। দেশে আর অশান্তির কারণ নাই বিবেচনা করিয়া সরকার জানাইয়া দিলেন, ১৩১৮ সালের চৈত্র মাসের পর আর তাঁহার ‘সুভাসচরিত্র’র জন্ত অর্থ ব্যয় করিবেন না।

‘ভারতবর্ষ’ : অতঃপর জলধর ঘটনাটকে কেমন করিয়া ‘ভারতবর্ষ’র সহিত সংশ্লিষ্ট হন, সে কথা তাঁহার নিজের ভাষায় বর্ণনা করিতেছি :—

“‘সুভাসচরিত্র’ উঠে যাওয়ার সংবাদ পেয়েই আমার পরম হিতৈষী বন্ধু আমার পূর্ব মনিব সন্তোষের কবি-জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং যত দিন আর কোন সুবিধা না হয় তত দিন তাঁর প্যারাগন প্রেসের ভার নিতে বললেন। এখন যেখানে আমাদের ভারতবর্ষ-আফিস হয়েছে পূর্বে সেখানে ট্রাম কোম্পানীর আস্তাবল ছিল। সেই আস্তাবলের ঘরগুলি ভাড়া নিয়ে প্রমথবাবু প্যারাগন প্রেস করেছিলেন। আমি সেই প্রেসের ম্যানেজার ছলাম।

তখন ‘ভারতবর্ষ’ প্রচারের বিপুল আয়োজন চলছে। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাসূর্য যুগ্ম-সম্পাদক হয়েছেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের স্বাধিকারী শ্রীমান হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বললেন যে তিনি প্যারাগন প্রেসেই ‘ভারতবর্ষ’ ছাপতে চান। আমার আর তাতে আপত্তি কি। অতবড় একখানি কাগজ ছাপবার জন্ত যা কিছু ব্যবস্থা করতে হয় আমি তাই করতে লাগলাম। হরিদাসবাবু কিছু টাকা অগ্রিমও দিলেন। তখন ‘ভারতবর্ষ’র সঙ্গে আমার ঐক্যই সম্বন্ধ ছিল।

আমি চার পাঁচ ফর্মার মত কম্পোজ তুলে দিলাম। প্রথম ফর্মার পেজ সাজিয়ে যেদিন দ্বিজেন্দ্রলালের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম, সেই দিনই সেই ফর্মার প্রথম দেখতে দেখতেই অকস্মাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল অমরধামে চলে গেলেন।

তখন চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। ‘ভারতবর্ষ’র কর্ম-কর্তাগণ কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। অনেকের নাম প্রস্তাবিত হ’ল। অবশেষে হরিদাসবাবু আমাকেই দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রুত পদে জোর ক’রে বসিয়ে দিলেন।” (‘ভারতবর্ষ’, ভাদ্র ১৩৪৩)

১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে সূচনা হইতে সুদীর্ঘ ২৬ বৎসর কাল জলধর অতীব যোগ্যতার সহিত ‘ভারতবর্ষ’ পরিচালন করিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থাবলী : জলধরের রচিত ও সম্পাদিত পুস্তকের সংখ্যা বড় অল্প নহে। আমরা এই সকল গ্রন্থের একটি নির্ভরযোগ্য কালানুক্রমিক তালিকা সংকলন করিয়াছি; বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরির মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।—

১। প্রবাস-চিত্র (ভ্রমণ)। ১৫ বৈশাখ ১৩০৬, এপ্রিল ১৮৯৯। পৃ. ২০৮।

সূচী :—প্রবাস-যাত্রা, গুরুদ্বার, নানাপাণি, কলুঙ্গার যুদ্ধ, টপকেধর, শুদ্ধপাণি, চলভাগা-তীরে, সহস্রধারা, মুশৌরী, তিহরী, অতিপ্রকৃত কথা, উত্তর-কাশী।

২। চাহার দরবেশ (উর্দু উপন্যাস—“অনুবাদিত”)। ১৩০৬ সাল (১০ মার্চ ১৯০০)। পৃ. ৮০।

বহুমতী-কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

৩। হিমালয় (ভ্রমণ)। ১৩০৭ সাল (১৩ অক্টোবর ১৯০০)। পৃ. ৩৩৯।

দীনেশকুমার রায় লিখিত ভূমিকা সহ।

৪। নৈবেদ্য (গল্প)। ১ আশ্বিন ১৩০৭ (১৩ অক্টোবর ১৯০০)। পৃ. ১১৪।

সূচী :—অন্ধের কাহিনী, পাগল, প্রতীক্ষা, মা কোথায়?, অদৃষ্ট, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারিণী।

৫। পথিক (ভ্রমণ)। আশ্বিন ১৩০৮ (৬ অক্টোবর ১৯০১)। পৃ. ১৬১।

ইহাকে ‘প্রবাস-চিত্র’ ও ‘হিমালয়’র পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে।

৬। হিমাচল-বন্ধে (ভ্রমণ)। ১৩১১ সাল (২ সেপ্টেম্বর ১৯০৪)। পৃ. ৬০।

“প্রবাসচিত্র, হিমালয় ও পথিকে যাহা বলিতে পারি নাই, হিমাচল-বন্ধে তাহার কিছু বলিবার চেষ্টা করিলাম।” বহুমতী-কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

৭। ছোট কাকী ও অজ্ঞান গল্প। ১ (১০ অক্টোবর ১৯০৪)। পৃ. ১১৬।

সূচী :—ছোট কাকী, মোহ, ডিপুটি বাবু, প্রায়শ্চিত্ত, রমণী, সমাজ-চিত্র, কবি, মৃতের মৃত্যু, মামাবাবু। “শেষোক্ত গল্প ছুটি প্রিয় স্নহদ শ্রীযুক্ত দীনেশকুমার রায় মহাশয়ের রচনা।”



৮। নূতন, গিরী ও অজ্ঞাত গল্প। ১ আশ্বিন ১৩১৪ (১ অক্টোবর ১৯০৭)। পৃ. ১১৭।

সূচী :—নূতন গিরী, জুনিয়ার উকীল, কালো মেয়ে, মেয়ে লাথি, সুষমা, ক্ষুদ্রিরাম, রমাঠাকুর, রঘুনাথ।

৯। দুঃখিনী (উপভাস)। সম্ভাষ, ১৯০৯ (৩০ জুলাই)। পৃ. ৮৯।

“১৮৭৫ অব্দে মধ্য-ইংরাজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা প্রদানের পর আমি এইখানি এবং আর একখানি [২২ নং দ্রষ্টব্য] গল্পপুস্তক লিখি—তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর।”

১০। পুরাতন পঞ্জিকা (গল্প ও ভ্রমণ)। সম্ভাষ, ১৫ আশ্বিন ১৩১৬ (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৯)। পৃ. ১৩২।

সূচী : (ক্ষুদ্র গল্প)—শেফালিকার দুঃখ, বিবাহের ফর্দ, চিতার আগুন। (দেশ ভ্রমণ)—দেশ-ভ্রমণ। (শিকার কাহিনী)—শিকার-কাহিনী, ব্যাঙ্গ-শিকার, বাঘের ঘরে অতিথি। (হিমালয়ের স্মৃতি)—হিমালয়ের স্মৃতি, ত্রীনগর, তিহরীর পথে।

“এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত “হিমালয়ের স্মৃতি”র কিয়দংশ বঙ্গমতীর স্বত্বাধিকারী পূজনীয় ত্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুস্তকাকারে [“হিমাচল-বক্ষে”] প্রকাশিত করিয়া বঙ্গমতীর গ্রাহকগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।”

১১। বিমুদাদা (উপভাস)। ইং ১৯১১ (১৫ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ২২৪।

১২। হিমাদ্রি (ভ্রমণ)। ১৩১৮ সাল (২৩ নবেম্বর ১৯১১)। পৃ. ১৫৯।

সাধু ভাষায় লিখিত “হিমালয়ে”র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

১৩। আমার বর ও অজ্ঞাত গল্প। ফাল্গুন ১৩১৯ (৫ মার্চ ১৯১৩)। পৃ. ১৮৩।

সূচী : আমার বর, রাধারাগীর ইচ্ছা, পূজার তত্ত্ব, পূজার ভ্রমণ, পিতা-পুত্র, শিবনাথের অধিকার, কতাদায়, হরিনাথের পরাজয়, গল্পের মূল্য, মামা-বাবু, বাতাসী।

১৪। কাদ্ধাল হরিনাথ (জীবনী) : ১ম খণ্ড। ১৫ আশ্বিন ১৩২০ (২০ অক্টোবর ১৯১৩)। পৃ. ১৫৯।

২য় খণ্ড। জন্মোষ্টমী ১৩২১ (৩১ আগষ্ট ১৯১৪)। পৃ. ১৫২।

১৫। করিম সেখ (উপভাস)। ১০ আশ্বিন ১৩২৯ (২৪ অক্টোবর ১৯১৩)। পৃ. ৯৭।

১৬। আলান কোয়ার্টারমেন (অনূদিত উপভাস)। ইং ১৯১৪। পৃ. ১৪৭।

১৭। পরাগ মণ্ডল ও অজ্ঞাত গল্প। ভাদ্র ১৩২১ (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৪)। পৃ. ১৫৬।

সূচী : পরাগ মণ্ডল, শান্তিরাম, পয়লা বৈশাখ, রঘু পাগলা, আর এক দিন আগে, নসীবের লেখা, কোথায় আমরা যাই, জল—একটু জল, জ্যা কাম করবি নে?, না।

১৮। আমার যুরোপ-ভ্রমণ। ফাল্গুন ১৩২১ (১৮ এপ্রিল ১৯১৫)। পৃ. ৮২।

বর্ধমানাধিপতির Impressions অবলম্বনে লিখিত।

১৯। অভাগী (উপভাস) :

১ম খণ্ড। আশ্বিন ১৩২২ (৭ অক্টোবর ১৯১৫)। পৃ. ৩১১।

২য় খণ্ড। জন্মোষ্টমী ১৩২২ (২৭ আগষ্ট ১৯২২)। পৃ. ১৮৪।

৩য় খণ্ড। আশ্বিন ১৩৩৯ (২৭ অক্টোবর ১৯৩২)। পৃ. ১২২।

২০। আশীর্বাদ (গল্প)। ভাদ্র ১৩২৩ (১০ আগষ্ট ১৯১৬)। পৃ. ১৯২।

সূচী : আশীর্বাদ, অপমান, বেয়ারিং চিঠি, বিচার, ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত, দিগম্বর, “লেডকী মর গেরী,” কত দূরে, বিধবা, সতীর আসন, দীনের বন্ধু।

২১। দশদিন (ভ্রমণ)। ভাদ্র ১৩২৩ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৬)। পৃ. ১৫২।

২২। বড়বাড়ী (উপভাস)। আশ্বিন ১৩২৩ (২ অক্টোবর ১৯১৬)। পৃ. ১৭৯।

ইহা “মিত্রপরিবার” নামে ১৮৭৫ সনে রচিত।

২৩। এক পেয়লা চা (গল্প)। ১ আশ্বিন ১৩২৫ (৫ অক্টোবর ১৯১৮)। পৃ. ১৫২।

সূচী : এক পেয়লা চা, আমার মাষ্টারী, কুপের কথা, নিয়তি, সমাজ-চিত্র, মহোষধি, তুলসী।

২৪। হরিশ ভাণ্ডারী (উপভাস)। বৈশাখ ১৩২৬ (১৫ মে ১৯১৯)। পৃ. ১৪৫।

২৫। ঈশানী (উপভাস)। ইং ১৯১৯ (২১ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১৯৭।

২৬। পাগল (উপভাস)। ১ বৈশাখ ১৩২৭ (১ মে ১৯২০)। পৃ. ১৪২।

২৭। কাদ্ধালের ঠাকুর (গল্প)। ভাদ্র ১৩২৭ (১৯ আগষ্ট ১৯২০)। পৃ. ১১৭।

সূচী : কাদ্ধালের ঠাকুর, মহামায়ার মায়্য, কত দূর! আনন্দময়ী, মায়ের অভিমান।

২৮। চোখের জল (উপভাস)। ১ আশ্বিন ১৩২৭ (১২ সেপ্টেম্বর ১৯২০)। পৃ. ১৮০।

২৯। ষোল-আনি (উপভাস)। বসন্ত-পঞ্চমী ১৩২৭ (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২১)। পৃ. ১৫৭।

৩০। মায়ের নাম (গল্প)। ১ শ্রাবণ ১৩২৮ (২০ জুলাই ১৯২১)। পৃ. ১২৩।

সূচী : মায়ের নাম, মায়ের কোলে, উৎসর্গ, ছায়বাগিশের মন্ত্রদান, প্রায়শ্চিত্ত, প্রবাসের কথা, এবং, মোহিতের পরিণাম, বড়-দিদি, অন্তিম প্রার্থনা।

৩১। সোনার বাল্য (উপভাস)। ২৫ পৌষ ১৩২৮ (১ ফেব্রুয়ারি ১৯২২)। পৃ. ১৮৪।

৩২। দানপত্র (উপভাস)। ভাদ্র ১৩২৯ (২ সেপ্টেম্বর ১৯২২)। পৃ. ১২৩।

৩৩। জলধর গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড। শ্রাবণ ১৩৩০, জুলাই ১৯২৩। পৃ. ৬২৪।

সূচী : হিমাদ্রি, চোখের জল, প্রবাসচিত্র, পাগল, পুরাতন পঞ্জিকা, করিম সেখ, আশীর্বাদ।

২য় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ (১৪ মে ১৯২৫)। পৃ. ৫৮০।

সূচী : কাফাল হরিনাথ, ১ম-২য় খণ্ড ; এক পেয়ালা চা ; দশদিন ; ছুঃখিনি ; ষোল-আনি ; নৈবেদ্য।

৩৪। মুসাফির-মঞ্জিল (ভ্রমণ)। মাঘ ১৩৩০ (২৪ জানুয়ারি ১৯২৪)। পৃ. ১৩৬।

সূচী : বামড়া-দেবগড়, সাগর-সঙ্গমে, হিমাচল-পথে।

৩৫। পরশ-পাথর (উপভাস)। কার্তিক ১৩৩১, নবেম্বর ১৯২৪। পৃ. ১৫৬।

৩৬। ভবিতব্য (উপভাস)। ভাদ্র ১৩৩২, আগষ্ট ১৯২৫। পৃ. ১৫৪।

৩৭। দক্ষিণাপথ (ভ্রমণ)। অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ (১০ ডিসেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ২৫৫।

৩৮। তিন পুরুষ (উপভাস)। ? [ভাদ্র ১৩৩৪—আগষ্ট ১৯২৭]। পৃ. ১৪৪।

৩৯। বড় মাহুষ (গল্প)। আশ্বিন ১৩৩৬ (৯ অক্টোবর ১৯২৯)। পৃ. ১৮৫।

সূচী : বড়মাহুষ, স্মৃতি, কবি-ব্যাদি, অদৃষ্ট-লিপি, সন্ন্যাস, জাতিস্মর, গৃহিণীরোগ, অধঃপতন, ব্রাহ্মণ-ভোজন, রামলাল, গুরুগিরি, শেষ আদেশ।

৪০। মধ্যভারত (ভ্রমণ)। মাঘ ১৩৩৬ (১৯ জানুয়ারি ১৯৩০)। পৃ. ২০৪।

৪১। সেকালের কথা (চিত্র)। ১ আশ্বিন ১৩৩৭ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩০)। পৃ. ১১১।

সূচী : যমজয়ী চূড়ামণি দত্ত, সেকালের ভোজ, কেরোসিন তেল, আমার প্রথম চা-পান, সেকালের বাল্য-বিবাহ, লড মেয়ের অপঘাত মৃত্যু, -বিজ্ঞান-উৎসব, ভাতার-মারীর মাঠ, বালিকা-বিভাগ, সেকালের পাঠশালা, সেকালের ছাত্রশাসন, পাঠশালার ছাত্র ও তাহাদের শিক্ষা-প্রণালী।

৪২। উৎস (উপভাস)। আষাঢ় ১৩৩৯ (২০ জুলাই ১৯৩২)। পৃ. ১০৭।

শিশুপাঠ্য গ্রন্থ : জলধর যে-সকল শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার এই কয়খানির সম্মান আমরা পাইয়াছি :—

সীতা দেবী। ১ আশ্বিন ১৩১৮ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১১)। পৃ. ৭৬।

কিশোর (গল্প-সংগ্রহ)। ১৩২১ সাল, জানুয়ারি ১৯১৫। পৃ. ১৪২।

শিব-সীমন্তিনী। আশ্বিন ১৩৩১, অক্টোবর ১৯২৪। পৃ. ৯০।

সরল বাংলায় F. W. Bain-লিখিত *In the Great God's Hair*-এর গল্পাংশ।

মায়ের পূজা (গল্প-সংগ্রহ)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, মে ১৯২৭। পৃ. ১৪৬।

আত্মিকায় সিংহ শিকার। ইং ১৯২৯। পৃ. ১১৬।

রামচন্দ্র। ১ আশ্বিন ১৩৩৭, সেপ্টেম্বর ১৯৩০। পৃ. ১৫৪।

আইসক্রীম সন্দেশ। ? (১০ নবেম্বর ১৯৩৫)। পৃ. ১১১।

১৩২৯ সালে প্রকাশিত 'দানপত্র' জলধরের 'সাধী' নামে ১০ আনা মূল্যের একখানি পুস্তিকার বিজ্ঞাপন আছে। 'সন্দেশ' ও 'ফটিক' নামেও তাহার দুইখানি শিশুপাঠ্য পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

পাঠ্য পুস্তক : জলধর অনেকগুলি বিভাগ-পাঠ্য গ্রন্থেরও রচয়িতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বাংলা দ্বিতীয় পাঠ', 'প্রথম শিক্ষা', 'শিশুবোধ', 'নবীন ইতিহাস' ও 'বঙ্গ-গৌরব'-এর নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

সম্পাদিত গ্রন্থ : তিনি যে-সকল গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা :—

হরিনাথ গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ। ১৩০৮ সাল (৪ নবেম্বর ১৯০১)। পৃ. ২০২ (বহুমতী)।

জাতীয় উচ্ছ্বাস (স্বদেশী গান সংগ্রহ)। ? (৪ নবেম্বর ১৯০৫)। পৃ. ৭৫ + ৫ (বহুমতী)।

প্রথমনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী, ১ম-৩য় ভাগ। ১৩২২-২৩ সাল।

প্রতিভার সম্মান : জলধর দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধিকারী ছিলেন। বহু সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান—এমন কি রাজ-সরকারও তাহাকে সম্মানিত করিয়া গুণগ্রাহিতারই পরিচয় দিয়াছেন। ১৩৩৯ সালের ১২ই ভাদ্র রবিবার কলিকাতার রামমোহন লাইব্রেরি হলে প্রথম জলধর-সম্মেলনের আয়োজন হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। বাংলার সাহিত্যিকবৃন্দ ও রবি-বাসরের সদস্যগণের পক্ষ হইতে শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা যে অভিনন্দন পাঠ করেন তাহার শেষাংশ এইরূপ :—“তোমার দৃষ্টি সকলকে সমানভাবে নন্দিত করিয়াছে। তোমার প্রীতি অধ্যাতকে ধ্যাত এবং নবীনতাকে সম্বন্ধিত করিয়াছে। স্নেহ-বিতরণে তোমার কার্পণ্য নাই, দারিদ্র্যে তোমার কুষ্ঠা নাই, বিলাসে তোমার স্পৃহা নাই ; সম্মানে তোমার গর্ব নাই, সামাজিকতায় তোমার শৈথিল্য নাই, বাণীর সেবায় তোমার শ্রান্তি নাই। হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, সাহিত্যে ও সমাজে তাই তুমি স্রোতস্বরের অধিকারী।

হে তাত, আমরা তোমায় অভিনন্দন করি।" অত্যাশ্চর্য যে-সকল প্রতিষ্ঠান তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন তাহার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি :—  
সভাপতি... তৃতীয় বার্ষিক মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলন... ১৩২২  
সহ-সভাপতি... বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ... ১৩২৯-৩০, ১৩৪৩-৪৫  
'রায়-বাহাদুর' উপাধি... ১৩ জুন ১৯২৯

সাহিত্য-সংসদ সভাপতি... বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, রাধানগর  
... ৬-৭ বৈশাখ ১৩৩১  
ঐ ... প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন, ইন্দোর  
... পৌষ ১৩৩৫

সর্বসাধ্যক্ষ... 'রবি-বাসর'  
... ১৩৩৮  
বিশিষ্ট সদস্য... বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ  
... ১৩৪১  
নিখিল-বঙ্গ-জলধর-সম্বর্ধনা...  
... ২-৪ ভাদ্র ১৩৪১  
সম্বর্ধনা... বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ  
... ২৮ বৈশাখ ১৩৪২

মৃত্যু : ১৩৪৫ সালের ৮ই মাঘ সহস্রাব্দীকে হারাইয়া বৃদ্ধ জলধরের শরীর সেই যে ভাঙ্গিয়া পড়িল আর তাহা সুস্থ হইল না ; তিনি পরবর্তী ২৬এ চৈত্র ( ১৫ মার্চ ১৯৩৯ ), ৮০ বৎসর বয়সে, পত্নীর অঙ্গুগামী হন।

উপসংহার : ১৩৪১ সালের ভাদ্র মাসে অমূল্যত নিখিল-বঙ্গ-জলধর-সম্বর্ধনায় স্বদেশবাসীর পক্ষ হইতে কথা-শিল্পী শরণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরে তাঁহারই রচিত যে মান-পত্রখানি জলধরকে দেওয়া হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত করিয়া, বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি :—

## পঁচিশে বৈশাখ

শ্রী অমলেন্দু দত্ত

কবি জন্মতিথি এল চির অমলিন, ক্ষয়হীন,  
স্বপ্নভাঙা নিখরীণীসম তার উচ্ছলিত প্রাণ,  
কুয়াশার জ্বল ভেদি' বাজিবে যে আলোকের বীণ,  
সুখীল আকাশে আর কিশলয়ে রবে তার গান।

নূতনের মায়াদণ্ড এই দিন স্পর্শ দিবে গায়,  
পুরাতন দ্বারে আসি' ফিরে যাবে শুদ্ধ হতবাক—  
নূতন যৌবন আসি' প্রকৃতির পর্ণ-লতিকায়  
নৈবেদ্য সাজায়ে 'আনি' বাজাইবে মাসলিক শাখ।

ভারতের পূর্বাচলে এই দিনে দিগন্ত সীমায়  
তোমার উদয় কবি, নবরবি, তমিষা বিনাশি',  
প্রাচ্য ও প্রাচীণ মুক্ত আলোকের রশ্মি-প্রতিভায়  
চেতনার দোলা দিল প্রাণে প্রাণে নবরূপ আসি'।

ভারতের পূণ্যভূমি আজি মহা সিদ্ধ বক্ষসম  
উদ্বলিত স্বপ্ন ঝড়ে উন্মথিত পাশব বিদ্রোহে ;—  
হে মহা দিবস, তুমি মুছে দাও অজহীন তম,—  
প্রেমের অমৃত ভাণ্ডে চলে দাও সবারে স্নিঃশেষে।

পরম শ্রদ্ধাপদ—

রায় ত্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের  
করকমলে—

বরেণ্য বন্ধু,

তোমার দীর্ঘজীবনের একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনায় আমাদের মানস-লোকে তুমি পরমাত্মীয়ের আসন লাভ করিয়াছ।

তোমার অকলঙ্ক চরিত্র, নিষ্কলুষ অন্তর, শুভ্র সদাচার আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তোমার স্নেহে তোমার সৌজন্মে আমরা মুগ্ধ, আমাদের অকপট মনের ভক্তি-অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ কর।

বাণীর মন্দির-দ্বারে তুমি সকলকে দিয়াছ অব্যাহত পথ, কনিষ্ঠগণকে দিয়াছ আশা, দুর্বলকে দিয়াছ শক্তি, অখ্যাতকে দিয়াছ খ্যাতি, আশ্রয়প্রার্থীকে দিয়াছ আশ্রয়, শঙ্কাকুল কত আগন্তুক জনই না সাহিত্য-পুঞ্জার বেদী-মূলে তোমার ভরসা ও বিশ্বাসের মস্তে স্বকীয় সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছে।

সাহিত্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে তুমি আনন্দ বিতরণ করিতে। সে ব্রত তোমার সফল হইয়াছে। তোমার সৃষ্টি কাহাকেও আহত করে না, তোমার অন্তঃপ্রকৃতির মতই সে সৃষ্টি স্বচ্ছন্দ সুন্দর ও অনাড়ম্বর। তোমার দুঃখ-বেদনাভরা হৃদয় একান্ত সহৃদয় জগতের সকল দুঃখকে আপন করিয়াছে, তাই, ব্যথিত যে জন সে তোমারই সৃষ্টির মাঝে আপনার শান্তি ও সান্ত্বনার পথের সন্ধান পাইয়াছে।

হে নিরহঙ্কার বাণীর পুজারী, তুমি আজ বঙ্গের সম্রাট অভিনন্দন গ্রহণ কর। ইতি—তোমার স্বদেশবাসীর পক্ষ হইতে—শ্রীশরণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

## পঁচিশে বৈশাখ

আশ্রাফ সিদ্দিকী

বিজলী-চঞ্চল-গতি নিষ্করণ কালের পাখায়  
কতদিন এলো গেল কত শুভ শারদ শেফালী  
রচে গেছে ফুলহার। বসন্তের পেলব শাখায়  
পিকের জমিয় ধারা প্রাণপ্রাণ্ডে জ্বলেছে দেয়ালী।  
তবু ত শরণ নয়—নহে ফুল বসন্তের মাস।  
রুদ্র ও রৌদ্রের মাঝে অপরাপ একি সুরভী  
জীবন্ত যৌবনরসে সুসবুজ রক্তিম পলাশ  
আশা ও ভাষার পূর্ণ বিমুখর ছন্দধন দিন।

সুদূর পশ্চিম আর পূর্বের প্রতিপ্রাণ্ড দ্বারে  
শ্রদ্ধায় নোয়ায়ে শির শতলক্ষ কণ্ঠ দেয় ডাক,  
তোমাতে স্মরণ করি—হে রবীন্দ্র ! হৃদি নমস্কারে  
তোমাতে স্মরণ করি—হে সুন্দর ! পঁচিশে বৈশাখ !  
অভাব দারিদ্র্য আছে, পায়ে বাঁধা অজস্র শিকল  
তবুও উন্নত শির ; প্রাণে কোটে সহস্র কমল।

# শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সরকার

রবীন্দ্র-ভক্ত এলুমহাষ্ট্র সত্যই বলিয়াছেন—“Never was there a man with so many windows for so many winds as Tagore.” ইহার ভাষ্য এই, রবীন্দ্রনাথের ছায় বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জগতে তুলন। সেই প্রতিভার অসংখ্য মুক্ত রূপ—তাঁহার গড়া শান্তিনিকেতন। দেশের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি তাঁহার ভাল লাগে নাই, নিজ ছাত্রজীবনের বিদ্যাদময় অভিজ্ঞতা তাঁহাকে ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়াছিল। এই বিদ্রোহের ফলে শান্তিনিকেতনের সৃষ্টি।

কবিগুরু শিক্ষাগুরুর আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহার শিক্ষায়তনের আদর্শরূপ গ্রহণ করিলেন—আর্য্যাবর্তের পুরাতন ‘আশ্রম’ ও ‘তপোবন’। ইহাই শিক্ষাক্ষেত্রে ‘উটক’-আদর্শ। তাঁহার মতে প্রত্যেক শিক্ষায়তন প্রকৃতি-দেবীর ক্রোড়ে এমন স্থানে স্থাপিত হইবে, যেখানে প্রকৃতির রূপ ও মহিমা স্তব্ধ-সুখ। তিনি বলেন, আমাদের সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতার জন্য প্রকৃতির সহিত যোগসূত্র স্থাপন অপরিহার্য। জীবনের প্রারম্ভে মন ও চরিত্রকে গড়িয়া তুলিবার জন্য অহুকুল আবহাওয়া অতীব আবশ্যক। শুধু ব্রহ্মচর্য্য পালন নয়, তাহার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আত্মকূল্য থাকি। “বিরিচি প্রকৃতির অন্তরে আদিম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল, শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতি-সঞ্চার করে। জীবনের আরম্ভে অভ্যাসের দ্বারা অভিভূত হবার আগে কৃত্রিমতার জাল থেকে ছুটি পাবার জন্য ছেলেরা ছটফট করতে থাকে, সহজ প্রাণলীলার অধিকার তারা দাবি করে বয়স্কদের শাসন এড়িয়ে। আরণ্যক ঋষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের ছেলে, তাই কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন, এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হ’তে নিঃসৃত হ’য়ে প্রাণেই কল্পিত হচ্ছে। এ মহান শিশুর বাণী। বিশ্বপ্রাণের এই স্পন্দন লাগতে দাও—ছেলেদের দেহে মনে শহরের বোবা-কানা-মরা দেওয়াল-স্তম্বলোর বাইরে।”

শান্তিনিকেতনে শিক্ষাদানের প্রণালী অভিনব। এখানে রবীন্দ্রনাথ শিশু-মনকে রাঁধাধরার কঠিন বন্ধন হইতে, এবং শিক্ষকের পীড়ন হইতে মুক্ত করিয়া সহজভাবে প্রকৃতির সাহচর্য্যে বিচরণ করিবার সুযোগ দিয়া প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বহু কুফল হইতে শিশুদিগকে সময়ে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক শিশু-মনেই সমস্ত নূতন ঘটনা বা সত্য সাদর অভ্যর্থনা পায় এবং এইভাবে শিশুর অতি অল্প সময়ের মধ্যে নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। জ্ঞান অর্জন করিবার ক্ষেত্রে—প্রকৃতি তাহাদের এক প্রধান

সহায়, কবিগুরু ইহা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। শিশুমন যেন বহিঃপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির মিলন-তীর্থ।

“শিশুকাল হইতে কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া সঙ্গে সঙ্গে যথাপরিমাণে হৃদয়াকুরগুলি যখন অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনন্ত নীলাশ্বরের দিকে প্রথম মাথা তুলিয়া দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন জ্যোতিঃপূরের দ্বারদেশে আসিয়া বহিঃসংসারের সহিত তাহার নূতন পরিচয় হইতেছে, যখন নবীন বিশ্বয়, নবীন প্রীতি—, নবীন কৌতূহল চারিদিকে আপন শীর্ণ প্রসারণ করিতেছে, তখন যদি ভাবের সমীরণ এবং চিরানন্দলোক হইতে আলোক এবং আশীর্বাদধারা নিপতিত হয়, তবেই তাহার সমস্ত জীবন যথাকালে সফল, সরস এবং পরিণত হইতে পারে; কিন্তু সেই সময় যদি কেবল শুষ্ক ধূলি এবং তপ্ত বায়ুকা, কেবল নীরস ব্যাকরণ এবং বিদেশী অভিধান তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তবে পরে ঝুলধারায় বর্ণন হইলেও সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি আর তাহার জীবনের মধ্যে তেমন সহজভাবে প্রকাশ করিতে পারে না। আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হইয়া যায়।” ইউরোপীয় শিক্ষা-বিজ্ঞানীদের মত আমাদের শিক্ষাগুরুও বলিতেছেন—“প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বল, ভাবই বল, চরিত্রই বল নির্জীব ও নিফল হইতে থাকে, অতএব আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাশঙ্ক্য।”

সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রধান ত্রুটি এই যে, সেখানে প্রত্যহ নির্দিষ্ট ঋণীয় নির্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনা হয়। ইহার ফলে শিশুদের মনের স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহা সঙ্কুচিত হইয়া যায়—পাঠে তাহাদের মন আকৃষ্ট হয় কম। শৈশবকালেই এই জ্ঞানস্পৃহা সর্বাঙ্গপেক্ষা বলবতী থাকে—আর ঠিক এই সময়েই শিশুরা বিদ্যালয়ে আসিয়া পড়ে। বিদ্যালয়ের যান্ত্রিক পদ্ধতি তাহাদের কাছে প্রাণবান বলিয়া মনে হয় না, বরং উহা তাহাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। স্কুলের দেওয়ালগুলি তাহাদের নিকট মৃত মানুষের বোলাটে ও রক্তহীন চক্ষুরূপ প্রতীয়মান হয়। বহিঃবিশ্বের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যাওয়ার ফলেই বিদ্যালয়সমূহ শিশু-মনে ভীতির উদ্ভেক করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যের স্কুল ‘বেঙ্গল একাডেমি’ সম্বন্ধে বলিতেছেন—“ইহার ঘরগুলো নির্ময়, ইহার দেওয়ালগুলো পাহারাওয়ালার মত—ইহার মধ্যে বাড়ীর ভাব কিছুই নাই—ইহা খোপ ওয়ালার একটা বড় বাস। ছেলেদের যে ভালমন্দ

লাগা বলিয়া একটা খুব মন্ত জিনিষ আছে, বিদ্যালয় হইতে সেই চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত।”

আমাদের বিদ্যালয়ে যে তথাকথিত নিয়মাবলি প্রচলিত আছে তাহা শিশুমনের সতেজ ভাবকে নষ্ট করিয়া দেয়।

ডাইকট্ট ব্রাইস বলিয়াছেন—“Discipline has its worth, but it may imply some loss of individuality.”—

নিয়মাবলির মূল্য আছে, কিন্তু ইহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য খানিকটা নষ্ট করিয়া দেয়। শিশুর মন অসাড় এবং জড় হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহাদের এই মনোভাবের প্রতি দুঃপাত করা হয় না এবং পাঠের বড় তাহাদের উপর দিয়া বহিয়া যায়। বলপ্রয়োগে মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয়, ইহা একটা মন্ত বড় ভুল ধারণা।

মুক্ত বাতাসে, ছায়াচ্ছন্ন আশ্রয়স্থলে প্রাচীন ঋষিদের ছায় সৌম্যমুষ্টি ও প্রশান্তবদন রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপনা ভারতের এক গৌরবময় বিস্মৃত-প্রায় যুগের কথা আমাদের মনে করাইয়া দেয়। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ছাপ শিশুমনে যে চিত্র আঁকিয়া দেয়, তাহা সহজে মুছিয়া যায় না। “আত্মশক্তির-আবিষ্কারই শিক্ষার অত্যন্ত উদ্দেশ্য,” ইহা কবিগুরু পাঠদানের রীতি হইতে সম্যক উপলব্ধি হয়। কবি কীটসের ‘Autumn’ বা শেলির ‘Intellectual Beauty’ পড়াইতেছেন। সেখানে বয়স্ক শ্রোতাও গিয়া বসিতেন। তাঁহার ব্যাখ্যার দানস্রজ অজস্রধারে ঝড়িয়া পড়িয়া বালক ও বয়স্ক সকলের মন পূর্ণ করিয়া দিত। সকলেই প্রয়োজনের বেশী পাইত, এই উদ্ভূত অংশটাই মানুষের ঐশ্বর্য। তাঁহার নিয়ম ছিল প্রশ্ন করিয়া করিয়া ছাত্রছাত্রীদের যুগ দিয়া ঠিক শব্দটি বাহির করিয়া লইতেন—ইহাতে তাঁহার আন্তরিকতা অসংশয় ছিল না। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের ইঙ্গিত ধরিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে নিজেদের শক্তি আবিষ্কার করিত; রবীন্দ্র-চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য—লঘুতম কথাবার্তা হইতে মোচড় দিয়া রস আদায় করিবার ক্ষমতা, অভাবনীতির সঙ্গে তান রাখিয়া রস-সৃষ্টির শক্তি, শিশুমনের সঙ্গে সমস্ত্রঃ নিজেদের অনায়াসে স্থাপন।”\*

কবির মতে শিক্ষকগণ হইবেন একাধারে শিক্ষার্থীর বন্ধু এবং উপদেষ্টা। অধ্যাপনার সময় শিশুমনের গতির সহিত শিক্ষকের নিজ মনের গতির সংযোগসাধন করিতে হইবে। শিক্ষাদানকার্য যে একটা প্রাণবন্ত জিনিষ, উহা যে যান্ত্রিক-ভাবে সূক্ষ্ম হয় না—এই কথা যেন শিক্ষক সর্বদা স্মরণ রাখেন। এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া কবি তাঁহার ছাত্র-ছাত্রীগণের সহিত খেলায় মগ্ন হইতেন, অভিনয়ে ভূমিকা

এহণ করিতেন এবং নৃত্যে যোগদান করিতেন। তিনি গাহিয়াছেন—

“হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে,

ময়ূরের মতো নাচে রে,

হৃদয় নাচে রে।”

সত্যই উহাদের সহিত নৃত্যে তাঁহার হৃদয় ময়ূরের মত নাচিয়া উঠিত। তখন যে দৃশ্যের অবতারণা হইত তাহা অনির্বচনীয়, স্বর্গীয়। সেই নৃত্যের সঙ্গে যে সঙ্গীত গীত হয় এবং যে ব্যঙ্গনা ধ্বনিত হয়, তাহা অপূর্ণ। এ ধরণের নৃত্য একাধারে দেহ ও মনের পুষ্টিসাধন করে।

Dr. Laurin Zilliacus বলেন, রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতন প্রমাণ করাইয়া দেয়, মানুষের জীবনধারণ শুধু খাদ্যদ্রব্য আহরণ ও ভোজনের জ্ঞান নয়; জীবনের পরিপূর্ণতা সাধনের জ্ঞান আরো কিছু দরকার। একজ্ঞ এখানে মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় এবং এই উদ্দেশ্যেই এখানকার বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় কলাবিজ্ঞা, সঙ্গীত, জাতীয় উৎসব এবং আমোদ-প্রমোদের অবতারণা করা হইয়াছে। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে জীবনের প্রতি দিকের, প্রতি অংশের ত্রৈবিকসাধন। মনে হয়, আমাদের দেশের স্কুলগুলি হইতে প্রকৃতি ও ভগবান নির্বাসিত, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্বন্ধও বঞ্চিত; এরূপ অবস্থায় কবিগুরু তাঁহার বিদ্যায়তনে এই তিন সত্তার—প্রকৃতি, ভগবান ও মানুষ—একত্র সমাবেশের চেষ্টা করিলেন। মানব শিশু কুসুম-কোরক; তাহার পূর্ণ বিকাশের জন্মই এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা।

প্রকৃতির সহিত শান্তিনিকেতনের প্রাণ যে একস্বত্রে প্রথিত ইহার অত্যন্ত প্রমাণ—এখানকার ঋতু-উৎসবগুলি। বিভিন্ন ঋতুর আগমনে যে বৈচিত্র্যময় নব নব অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাহা অতুলনীয়। এক একটি ঋতু-পরিবর্তনের সহিত শিশুর হৃদয়ও স্পন্দিত হয়। যখন নবীন বর্ষার প্রথম বারিধারা আশ্রমে পরম আদরে শিশুদের কপোলে স্নেহচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেয়—সত্যই যখন “এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা, গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন ভরসা”—তখন তাহার বর্ষার আগমনে হঠাৎ ছুটি পাইয়া নববর্ষার তাই উদ্বেল হইয়া উঠে, আর তখন হয়ত আমাদের সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে হতভাগ্য ছাত্রগণ দরজা জানালা বন্ধ করিয়া গণিত-সাগর মত্তনে ব্যস্ত। এই হঠাৎ পাওয়া ছুটির মধুর স্মৃতি চিন্তাপটে চির দিনের জ্ঞান অঙ্কিত থাকে। শিশুমন তখন আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠে—“আজ আমাদের ছুটি রে ভাই, আজ আমাদের ছুটি।”

রবীন্দ্রনাথের সহিত ফরাসী দার্শনিক রুশোর অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। উভয়েই প্রকৃতির পূজারী। রবিন্সন ক্রুশোর



গল্প ছ'জনের কাছেই সম আদরণীয়। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়। রুশো অসামাজিক, আমাদের কবি ঠিক ইহার বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ বলেন, আমার ছাত্রেরা ধীরে ধীরে আমাদের প্রতিবাসীদের নানা রকমে সাহায্য করিতে এবং তাহাদের জীবনধারণ সহিত সর্বদা সম্বন্ধ রাখিয়া চলিতে শিখে। রবিন্দ্রনাথ ক্রুশোর গল্পে আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিলনের অভাবনীয় রূপ প্রকাশ পাইয়াছে একটা গল্পের মধ্যে—যেখানে মানুষ প্রকৃতির সহিত যুথোয়ুথী দাঁড়াইয়া তাহার সমস্ত গুণ রহস্য উদ্ঘাটিত করিতেছে, তাহার সহিত সহযোগিতা করিতেছে এবং তাহার সহায়তালভের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী যে আধুনিক, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই, কারণ তিনি তাঁহার শিক্ষায়তন হইতে শান্তিপ্রদানের বরকরোচিত প্রথা তুলিয়া দিয়া উহাকে প্রকৃত শিক্ষানিকেতনে পরিণত করিয়াছেন। অজ্ঞ বাঁহার শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী তাঁহাদিগের মধ্যে উৎসাহের ও উদ্বীপনার একান্ত অভাব রহিয়াছে, তাঁহারা শিক্ষার্থীকে শান্তি দিতে তৎপর, কিন্তু পাশে বসিয়া ক্রীতির দ্বারা তাহার সংশয় ঘুচাইয়া তাহার সহচর হইতে পারেন না। কবিগুরু মনে করেন, মনুষ্যত্বের নামে তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত যে, তাঁহারা জীবনে ভুল পথ বাছিয়া লইয়াছেন এবং অবিলম্বে তাঁহাদের শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া কারারক্ষীর কার্যভার গ্রহণ করা উচিত। সকল শিক্ষকই যেন মনে রাখেন যে, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও সহানুভূতি ক্লাসে এমন এক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে, যাহা শিক্ষাদানের কাজকে অনেকখানি সহজ করিয়া দেয়।

কবি অজ্ঞ বলিতেছেন—“আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিশুর গরজ-গুরুকে লাভ করা। শিক্ষক দোকানদার, বিজ্ঞান-দান তাঁহার ব্যবসায়। তিনি খরিদারের সন্ধানে ফেরেন। শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন ও বিভাবস্ত বিক্রয় করেন। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও অনেক শিক্ষক দেনা-পাওনার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উঠেন সে তাঁহাদের বিশেষ সাহায্যগুণে। তিনি এমন জিনিস দান করিতে বসেন যাহা পণ্যবস্তু নহে, যাহা মূল্যের অতীত, স্মরণ্য ছাত্রের নিকট ধর্মের বিধান, স্বভাবের নিয়মে তিনি ভক্তিগ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অমুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশী দিয়া আপন কর্তব্যকে মহিমাম্বিত করেন।”

কবিগুরুর ভাষা অননুকারণীয়; অতএব তাঁহার ভাষাতেই বলি, “যেখানে নিভৃত তপস্তা হয় সেইখানেই আমরা শিখিতে পারি, যেখানে গোপনে ত্যাগ, যেখানে একান্তে সাধনা সেই-

খানেই আমরা শক্তিলাভ করি; যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর, যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত, সেইখানেই ছাত্রগণ বিভ্রাৎকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়; বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন, অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত, ব্রহ্মচর্যের সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ, ধর্মশিক্ষা সেই-  
খানেই সরল ও স্বাভাবিক; আর যেখানে কেবল পুণ্ডি ও মাষ্টার, সেনেট ও সিন্ডিকেট, ইন্টার কোর্স ও কার্টের আসবাব সেখানে আজও আমরা যত বড় হইয়া উঠিয়াছি, কালও আমরা তত বড়ী হইয়াই বাহির হইব।”

মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত—এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতীদের সহিত একমত। মাতৃভাষা যেমন শিশুর জীবনধারণের জন্ত অপরিহার্য, সেইরূপ শিশুর জ্ঞানবুদ্ধিকল্পে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান অত্যাৱণ্ণক। মাতৃভাষা যদি শিক্ষার বাহন হয়, তবে চিন্তাকে ভাষায় ব্যক্ত করা অনেক সহজ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে। কবি বলিতেছেন—“শিক্ষা-সরস্বতীকে শান্তি পরালে আজও অনেক বাঙালী বিভ্রাৎ মানহানি কল্পনা করে। অথচ এটা জানা কথা যে, শান্তি পরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে আরাম পাবেন, খুঁজালা বুটজুতোয় পায়ে পায়ে রাধা পাবার কথা।”

কবিগুরুর শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য—শিশু-মনে অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি করা। বাল্যকাল হইতেই তাহাদের মস্তিষ্ক নানা রকম তথ্যে ভরপুর করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা সেগুলি কর্তৃত্ব করিয়া পরীক্ষার উত্তর-পত্র উত্তরাইয়া দিয়া আসে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেহ হয়ত চিত্রাঙ্কনে দক্ষ, কেহ বা নৃত্যে পটু, কাহারো সঙ্গীত লাগে ভাল, কেহ বা গাছপালার অমুরাগী; কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে এ সকল প্রবৃত্তি উৎসাহ পায় না। জানিতে চাওয়ার সঙ্গে জানিতে পাওয়ার যে যোগ আছে, সে যোগ ইহাদের বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ওরা কোনো দিন জানিতে চাহিতে শেখে নাই। শান্তিনিকেতনে পড়াশুনাকে ছাত্রজীবনের একমাত্র কর্তব্যরূপে না ধরিয়া একটা অংশরূপে গণ্য করা হয়; ফলে পড়ার প্রবৃত্তিটী অব্যাহত থাকে। ব্রতী বালকবালিকারূপে এবং অজ্ঞা নানা ভাবে তাহাদের মনে সম্ভবত্বভাবে কাজ করিবার প্রবৃত্তি বন্ধমূল হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ছেলে-মেয়ে ও শিক্ষকদের অনেকবার একত্রে বলিয়াছেন, “লোকহিত এবং স্বায়ত্তশাসনের যে দায়িত্ববোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবি করে থাকি, শান্তিনিকেতনের ছোট-সীমান্ন মধ্যে তারই একটা সম্পূর্ণ রূপ দিতে চাই। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সাধারণ হিতের অধীন করে তোলাবার চর্চা রাষ্ট্রীয় বহুভাষ্যকে দাঁড়িয়ে হতে পারে না,

তার জ্ঞান ক্ষেত্র তৈরি করতে হয়, সেই ক্ষেত্র আমাদের আশ্রম।”

যে জাতিগত ও শ্রেণীগত বিদ্বেষ এবং ঘৃণার বহিঃ আঙ্গ সমগ্র বিশ্বকে প্রজ্জ্বলিত করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে কবি উদাত্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া মৈত্রী ও মহামানবতার বাণী প্রচার পূর্বক শান্তিনিকেতনকে প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে পরিকল্পিত করিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন, “আমাদের দেশের বিজ্ঞান-নিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন-নিকেতন ক’রে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয় লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটেও চায় না। সত্য লাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই। যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথ্য করতে যার রূপগতা, সে দীনাত্মা। শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চলবে না, তার অতিথিশালা চাই—যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা ক’রে সে ধন্য হবে। শিক্ষা-ক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা।” শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনস্থল; সত্যই পূর্ব ও পশ্চিম এখানে হাত মিলাইয়াছে। ইহা মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভারতবর্ষের অশ্রুতম অবদান। সুরুলের ‘ত্রীনিকেতন’ বোলপুর আশ্রমের এক নূতন অঙ্গ। ত্রীনিকেতনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে আধুনিক কালে জীবিকা অর্জন করিবার জ্ঞান নানারূপ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। সুইটজারল্যান্ডের স্বাবলম্বী শিক্ষা-উপনিবেশগুলির ছাত্র এখানে স্বাবলম্বন ও শ্রমের মর্যাদা শিক্ষা দেওয়া হয়। ত্রীনিকেতনে যেন কবিগুরু বাসব জগতে নামিয়া আসিয়াছেন। ত্রীনিকেতনের হলকর্ষণ উৎসবে কবির উক্তি উল্লেখযোগ্য। “যখন মন্ত্র

মানুষকে অমানুষ করছে এবং সমাজকে ভেঙ্গে দিচ্ছে, তখন মাতৃস্বরূপা ধরিত্রীর নিকট আমাদের ধ্বংসের কথা স্বরণ করা উচিত। তিনি আমাদের জীবনধারণের উপাদান যোগাচ্ছেন। আমরাও তাঁর পুষ্টিসাধন করব। এই হলকর্ষণ উৎসব আমাদের কৃতজ্ঞতার প্রতীক। মানব-সন্তান ধরিত্রীরও সন্তান। মানুষের সুখ—পৃথিবী এবং মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বে ও সহযোগিতায়—সর্বপ্রাণী বিরোধিতায় নয়।”

রবীন্দ্রনাথ শান্তির বাতাবহ ও বিশ্বপ্রেমিক। তাঁহার চরিত্রের এই দুইটি গুণই প্রতিভাত হইয়াছে তাঁহার এই প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনে। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত ভাবে আমরা যতই ক্ষুদ্র হই না কেন এবং জগতের যে কোনো স্থানে বাস করি না কেন, সমষ্টিগত হিসাবে আমাদের ক্ষমতা আছে—সমগ্র মানবজাতির জ্ঞানে আলোকপাত করা।

শান্তিনিকেতন—তথা বিশ্বভারতী যে শুধু ভারতের গর্বের বস্তু তাহা নহে, ইহা সারা বিশ্বের এক অমূল্য সম্পদ। শিক্ষা যে কোনো ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে, তাহা যে-সর্বলোকের এবং সর্বকালের—এই আশ্রম লোকচক্ষুর সমক্ষে এই বিরাট সত্য উপস্থাপিত করিয়াছে। কবির আরক্ত কার্য্যে কত বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তিনি শিশুদের কত ভালবাসিতেন এবং তাহাদের শিক্ষা মধুর ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া পৃথিবীর রূপ পরিবর্তনে কিরূপ প্রয়াসী হইয়াছিলেন—তাহার মূর্ত প্রয়াস চিরতরে বিরাজমান থাকিয়া শিক্ষাগুরুর যশোগাথা ভবিষ্যৎশীর্ষগণের নিকট প্রচার করিবে। রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে বুঝিতে হইলে শুধু তাঁহার কাব্যের আলোচনা যথেষ্ট নয়, শান্তিনিকেতনকেও বুঝিতে হইবে; নচেৎ একদেশদর্শিতা হইবে।

## বর্ষ-সন্ধি

শ্রীমহাদেব রায়

লেখনীর মসী মুখে রূপ সজ্জা কি রচি তোমার।  
মানস-দর্পণে স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব তোমার উজ্জ্বল,  
এত রূপ এত সজ্জা হে মাধবী, অঙ্গে যে অপার,  
কি সমস্ত আবরণে আবরিয়াছিল হিমাকল।  
কান্তি তব জাগিয়াছে প্রতি অঙ্গে রেখায় রেখায়  
শিথিল অঞ্চলে যেন সকারিণী কাকী কোমলা,  
মাধুর্যের সুর শোভা ধরিয়াছে পল্লবে শাখায়,  
দিব্য আভরণ তব সর্ব অঙ্গে হে দিব্য কুন্তলা।

স্বর্ণ-কান্তি শাল শীর্ষে কাঞ্চন কুন্তল মনোহর,  
বসিতে দাঁড়ায়ে যেন আসন্ন বৈশাখ তপস্করে,  
পলাশে গৈরিক বাসে পতিভ্রতা পবিত্র স্তম্ভর  
আচরিছ তপস্করী শুচিতার বরমালা করে।  
নববর্ষ-সন্ধি-লগ্ন বাঁধে দৃঢ় গ্রন্থির বন্ধনে  
বাহিত বৈশাখে আজি সুপবিত্র তোমার অঞ্চলে  
এ বিশ্ব-বাসর মুগ্ধ বধু-বরে মধুর মিলনে,  
নব রবি-গীতি-রাগ নববর্ষে কমলের দলে।

# সিন্ধু সভ্যতার উৎপত্তি

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

সিন্ধু, পঞ্জাব ও বেলুচীস্থানের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত হইবার পরে সর জন মার্শাল মত প্রকাশ করিলেন যে সিন্ধুযুগের তাম্রযুগীয় সভ্যতা এক বৃহত্তর তাম্রযুগীয় সভ্যতার অংশমাত্র। এই বৃহত্তর সভ্যতা পশ্চিমে থেরালী ও দক্ষিণ ইটালী এবং পূর্বে হোনান ও চিহলি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে দক্ষিণ রুশিয়া (Tripolje I) পর্যন্ত ইহার বিস্তার দেখা যায়। সে যাহা হউক, মার্শালের বক্তব্যের অর্থ এই যে পূর্বে মাঞ্চুরিয়া হইতে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ ইউরোপ পর্যন্ত এই তাম্রযুগীয় সভ্যতা প্রসারিত ছিল। এই মতবাদের প্রধান ভিত্তি সেরামিকস (ceramics) বা পোড়া মাটির তৈজসপত্রের গঠনপ্রণালী, রঙের কাজ ও উহার উপরের নক্সা। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে এই মতবাদ ভিত্তিশূন্য নহে তাহা হইলে প্রথমই প্রশ্ন উঠে মাঞ্চুরিয়া হইতে দক্ষিণ ইটালী পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে তাম্রযুগীয় কৃষ্টির অভ্যুদয় কি সমসাময়িক না প্রত্যেক দেশে বা নিকটবর্তী কতকগুলি লইয়া গঠিত এক একটি অঞ্চলে এবং প্রত্যেক জাতি বা কতকগুলি জাতি যাহারা এক গোষ্ঠীভুক্ত বা সমগোষ্ঠীয় তাহাদের মধ্যে ইহার বিকাশ বিভিন্ন সময়ে ঘটিয়াছিল? অথবা মার্শাল যে ভাবে তাহার মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে এ প্রশ্নও উঠিতে পারে, এই কৃষ্টি কি একটি কেন্দ্র হইতে—মাঞ্চুরিয়া হইতে দক্ষিণ ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল? তারপরের জিজ্ঞাস্য, তাহা হইলে সেই কেন্দ্র কোথায়?

প্রাচীন প্রস্তরযুগ, নূতন প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জযুগ, ও লৌহযুগের কৃষ্টির সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজে যে সকল আলোচনা হইয়াছে—তাহা হইতে সভ্যতার বিকাশ সম্বন্ধে এক কেন্দ্র হইতে বিস্তৃতি বা বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে এক স্তরের কৃষ্টির সমসাময়িক বিকাশের ধারণা সমর্থিত হয় না। ইতিহাসও এ ধারণার সমর্থন করে না। সিন্ধু উপত্যকার তাম্রযুগের কাল খ্রীঃ পূঃ ৩২৫০ নির্দিষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন খ্রীঃ পূঃ ৫০০০ বৎসরে মিশরে তাম্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, দক্ষিণ মেশোপটেমিয়ায় খ্রীঃ পূঃ ৫০০০ বৎসরে, চীনে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসরে, সাইপ্রাসে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর পূর্বে তাম্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ইউরোপের প্রধান ভূভাগ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে আয়র্লও

ছাড়া অন্যত্র প্রকৃত প্রস্তাবে কোন তাম্রযুগ ছিল না। লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে বলা হয় খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীতে মধ্য ইউরোপে ইহার প্রচলন হয় কিন্তু ভারতবর্ষে সম্ভবত খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ বৎসরে লৌহের ব্যবহার জানা ছিল। দক্ষিণ-ভারতে লৌহের ব্যবহার আরও প্রাচীন। দক্ষিণ-ভারতে তাম্র বা ব্রোঞ্জযুগ ছিল না, প্রস্তরযুগ হইতে লৌহযুগের প্রবর্তন হয়। মিশরে ৪র্থ রাজবংশের আমলে (খ্রীঃ পূঃ ৩৭৩৩) লৌহের ব্যবহার হইত। গিজের পিরামিড হইতে লৌহ পাওয়া গিয়াছে, পঞ্চম বংশের আমলের (খ্রীঃ পূঃ ৩৫৬৬) আবুসিরের স্তূপ হইতে লৌহের কোদালী পাওয়া গিয়াছে। চীনে খ্রীঃ পূঃ ২৩৫৭, ক্রীটে খ্রীঃ পূঃ ১২০০, আসিরীয়ায় খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে লৌহের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। (Huxley Memorial Lecture for 1912; Journal of the Royal Anthropological Institute, XLII)।

সে যাহা হউক, মার্শালের মন্তব্য হইতে একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই যে একই প্রকারের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণযুক্ত তাম্রযুগীয় কৃষ্টি এশিয়ার পূর্ব সীমানা হইতে দক্ষিণ-ইউরোপ পর্যন্ত একই সময়ে বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রকৃত অবস্থা এই যে প্রাচীন ইতিহাস হইতে দেখা যায়, কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চল সভ্যতা বিকাশের কেন্দ্ররূপে পরিচিত হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্র হইতে সভ্যতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সভ্যতা বিকাশের এই সকল কেন্দ্রের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ ছিল। প্রত্যেক কেন্দ্রের এই সকল লক্ষণ তাহার প্রভাবিত অঞ্চলগুলিতে সংক্রামিত হইয়াছে। বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে দুই-একটি লক্ষণের সাদৃশ্য তাহাদের মধ্যে সম্পর্কের প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হইতে পারে না। বৈষয়িক ব্যাপারে, অর্থাৎ জীবন-যাত্রার স্থল প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যেমন যন্ত্রপাতি, অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ, কৃষিকার্যের পদ্ধতি, জলস্রবের ব্যবহার, বস্ত্রাদি বয়ন প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে অন্তরীকৃত সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। কারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজন সর্বত্র এক। প্রাচীন যুগের মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি এই সকল প্রয়োজন নিজেদের অবস্থানুযায়ী মোটামুটি মিটাইবার চেষ্টায় নিয়োজিত হইত। তারপর এই সকল বিভিন্ন কেন্দ্রে কোন নির্দিষ্ট স্তরের কৃষ্টির বিকাশ এক সময়ে ঘটিয়াছিল ইতিহাস এ কথা বলে না। তাম্রযুগীয় কৃষ্টির অভ্যুদয় যে

বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে লক্ষিত হয় সে সম্বন্ধে উপরে একজন পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, পরে এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক হইবে।

সভ্যতার বিকাশের ধারা সম্বন্ধে ইতিহাস এই প্রকার সাক্ষ্য দিলেও দেখা যায় যে সাধারণ মানুষের চিন্তার গতি খানিকটা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। একজন সাধারণ পূর্ব-পুরুষ বা একজন আদিম মানবের কল্পনা করা লোকের মজাগত হইয়া গিয়াছে। শুধু কবি কল্পনার আদম্ভ নহে, বহু বিষয়ের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া বহু শিক্ষিত লোকের চিন্তাধারা এই অবৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া চলে। গোড়ায় এই পুরাতন, বন্ধমূল অভ্যাসের দরুণ সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকের চিন্তাধারা এই অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কার্য করিয়াছে। একটি মাত্র কেন্দ্রে সভ্যতার উৎপত্তি হইয়া তাহা সমগ্র পৃথিবীতে প্রসারিত হইয়াছে এই কথা শুনিতে হাশ্বকর মনে হইলেও কার্যতঃ হাশ্বকর মনে করা হয় নাই। প্রাচীন সভ্যতা, প্রাচীন যুগের সামাজিক প্রথা, প্রাচীন যুগের বিশিষ্ট কোন চিন্তা বা ভাব-ধারার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে বসিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনুসন্ধান করিবার শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই পুরাতন, মজাগত অভ্যাস কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হন না। এই পুরাতন অভ্যাসের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার যখন আপনাদের অনুসন্ধানের ফল পুরাদস্তুর বৈজ্ঞানিক ঠাট বজায় রাখিয়া লোকের নিকট উপস্থিত করেন, পাণ্ডিত্যের প্রতিপত্তি ও মর্যাদার কবচে স্বরক্ষিত গবেষকের গবেষণা লোককে সহজে বিভ্রান্ত করিয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত সিন্ধুসভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই আলোচনার মধ্যে দেখা যাইবে।

সর জন মার্শালের -যে মন্তব্যের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে সেই মন্তব্যকে আলোচনার স্বতন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাহার সম্পূর্ণ বক্তব্য এইরূপ :

"A civilisation as widely diffused as the chalcolithic, with ramifications extending as far as Thessaly and Southern Italy, and as far east, perhaps, as the Chinese provinces of Honan and Chih-li could not have been homogeneous."

১৯২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রবৃত্তিবিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"I surmise that it (Mohenjo Daro and Harappa culture) will also be found to have formed part and parcel of a much wider sphere of culture which embraced not only South Mesopotamia and India, but probably Persia and a large part of Central Asia, and which may have extended as far west as the Mediterranean where the early Aegean civilisation presents certain somewhat similar features."

লক্ষ্য করিতে হইবে যে মার্শাল ভারতবর্ষ, দক্ষিণ মেশোপটেমিয়া, পারস্য ও মধ্য-এশিয়াকে এক বৃহত্তর কৃষ্টি

কেন্দ্রের (sphere of culture) বা অঞ্চলের মধ্যে ধরিতেছেন এবং বলিতেছেন যে এই কেন্দ্র-সম্ভবতঃ ভূমধ্য-সাগরীয় কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত প্রথম উক্তিই তিনি বলিতেছেন যে এই বহু বিস্তারিত সভ্যতার লক্ষণসমূহ সর্বত্র এক প্রকারের হওয়া সম্ভব নহে।

যে কৃষ্টিকেন্দ্র ভারতবর্ষ, দক্ষিণ মেশোপটেমিয়া, পারস্য ও মধ্য-এশিয়া লইয়া গঠিত তাহার সহিত ভূমধ্যসাগরীয় কেন্দ্রের সংযোগ—লক্ষ্য করিতে হইবে যে মার্শাল সংযোগের উপরে যান নাই—তাঁহার মতে প্রমাণিত হয়—(১) Ceramic wares এবং (২) Possible association of religious ideas। এই পোড়া মাটির তৈজসপত্রের এবং ধর্মভাব বা চিন্তার সাদৃশ্য বা সম্পর্কের প্রমাণের আলোচনা করা প্রয়োজন।

সেরামিকসের প্রমাণের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্বে মনে পড়ে এই বিষয়টি সম্বন্ধে ভারতীয় পণ্ডিত সমাজের বীতম্প্রহা। আরও মনে হয় স্বর্গীয় ননীগোপাল মজুমদারের সিন্ধুদেশে আততায়ীর হস্তে অকাল মৃত্যুর ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার কথা।

পট্টারির উপরে নক্সার বৈচিত্র্য এক একটি কৃষ্টি-কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক। এই নক্সা নানা প্রকারের দেখা যায়, যথা জ্যামিতিক নক্সা—সরল রেখা, ত্রিকোণ, বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত, পঞ্চকোণ, অষ্টকোণ। তারপর জাল, দড়ি, ফ্রোল, গাছ, পাতা, ফল, ফুল, মালা, বিভিন্ন প্রকারের পাখী ও জন্তু, মূর্তি প্রভৃতি। ইহা ছাড়া স্বস্তিকা, চক্র প্রভৃতি চিহ্ন পাত্রের গায়ে খোদাই বা অঙ্কিত করা হইয়াছে। নক্সার মত পট্টারির রঙও বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক। পশ্চিম সিন্ধুদেশের আম্রির কৃষ্টি প্রাক্-মোহেঞ্জোদারো যুগের এবং বেলুচী-স্থানের নালের (NaI) কৃষ্টির অপেক্ষা প্রাচীন বলা হইয়াছে। ইহার কারণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে আম্রির পট্টারি সাধারণতঃ এক রঙের (buff or light red) বা দুই রঙের (bichrome) এবং নক্সা জ্যামিতিক চিত্র। অবশ্য তিন রঙের পট্টারিও আম্রিতে কিছু পাওয়া গিয়াছে। মোহেঞ্জোদারোর পট্টারিতে উজ্জল লাল জমির উপর কাল রঙের নক্সা দেখা যায়। নক্সায় জ্যামিতিক চিত্রের সঙ্গে গাছ, পাতা, ফুল ও জীব-জন্তুর চিত্র। এই রঙের বৈশিষ্ট্যকে black-on-red technique বলা হয়। এই টেকনিক দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল মনে হয়। এই দুইটি টেকনিক বাতীত বেলুচীস্থানের নাল, হুনদার প্রভৃতি স্থাপে ও উত্তর বেলুচীস্থানের ওয়াজির নীমাস্তের দাবার কোট প্রভৃতি স্থাপে প্রাপ্ত পট্টারিতে দুইটি টেকনিক দেখা

যায়। নালের বহু রঙের বা Polychrome technique আম্রির টেকনিকের পরিণত অবস্থা বলিয়া মনে করা হয়। দাবারকোটের টেকনিক মোহেঞ্জোদারোর টেকনিকের সঙ্গে সম্পর্কিত বলা হইয়াছে। সিদ্ধুর ব্লক, লোহ্নজোদারোর পটারিতে ঐষং পরিবর্তিত রূপে মোহেঞ্জোদারোর টেকনিক অল্পস্বত হইয়াছে।

পঞ্জাব, সিদ্ধু ও বেলুচীস্থানের প্রাচীনযুগের স্তূপসমূহ হইতে প্রাপ্ত পটারি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মত মোটামুটি এই যে গঠন ও রঙের বৈশিষ্ট্য এবং নক্সা বা কারুকার্য হইতে একটি কৃষ্টিক্ষেত্রের পরিচয় পাওয়া যায় বাহার সহিত পশ্চিমে সিটান, হুসা ও দক্ষিণ মেশোপটেমিয়া, উত্তরে পশ্চিম তুর্কীস্থানের আনাউ-এর সংযোগের কিছু সূত্র পাওয়া যায়। বেলুচীস্থানের পেরিয়ানো গুণ্ডাই ও ঝোব উপত্যকার অগ্ণ্য স্তূপে প্রাপ্ত পটারির নক্সা ও গঠনে সিটানের পটারির সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। ঐ সকল স্তূপে প্রাপ্ত ভেসের গঠনে আনাউ-এর (deposits of culture II) ভেসের গঠনের সাদৃশ্য দেখা যায়। সিদ্ধুর আম্রি প্রভৃতি স্তূপের পটারির নক্সার কতকগুলির সঙ্গে মেশোপটেমিয়ার আল-উবাইদ, সামারা, পশ্চিম-পারশুর হুসা এবং টেপে মুসোয়ানির নক্সার মিল দেখা যায়। সিদ্ধুর ফিকে রঙের জ্যামিতিক নক্সার পটারির সঙ্গে পারশ্য, মেশোপটেমিয়া ও আনাউ-এর পটারির সঙ্গে যতটা মিল দেখা যায় মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার পটারির সঙ্গে ততটা মিল দেখা যায় না। সিদ্ধু সভ্যতার সঙ্গে বৈদেশিক সভ্যতার সংযোগের কথা যখন বলা হয় তখন সেরামিকসের এই সাক্ষ্য স্বরূপ রাখিতে হইবে। পঞ্জাব, সিদ্ধু ও বেলুচীস্থান লইয়া যে কৃষ্টি-ক্ষেত্র দেখা যায় সেই ক্ষেত্রের মধ্যেই প্রাক-সিদ্ধুযুগের, সিদ্ধুযুগের ও উত্তর-সিদ্ধুযুগের কৃষ্টির পরিচয় পটারির সাহায্যে ও স্তরবিন্যাসের প্রমাণের দ্বারা পাওয়া যায়। লোহ্নজোদারো ও মানছারের নিকটবর্তী স্তূপসমূহে যে পটারি পাওয়া গিয়াছে বিশেষজ্ঞের মতে তাহা মোহেঞ্জোদারোর পরবর্তীকালের। ব্লক প্রভৃতি স্তূপের উপরের স্তরগুলি হইতে ইন্দো-সামানীয় আমলের নক্সায়ুক্ত পটারি পাওয়া গিয়াছে।

এ সম্বন্ধে আরও দুই-একটি কথা বলা আবশ্যিক। ওয়াজিরস্থান ও উত্তর বেলুচীস্থানের কয়েকটি প্রাচীনযুগের স্তূপ হইতে প্রাপ্ত পটারি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সর অরেল ষ্টাইন বলিতেছেন,

"But so much is certain in view of the geographical position which these sites of the chalcolithic period in North Baluchistan occupy that they help us very usefully to link up the prehistoric civilisation now revealed in the

Lower Indus with that traced already before in Iran and easternmost Mesopotamia."

প্রাচীন যুগের স্তূপগুলির ভৌগোলিক অবস্থান যে এই সংযোগ নির্ণয়ের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে তাহার স্বীকৃতি পাওয়া যাইতেছে। ঝোব উপত্যকায় প্রাপ্ত পটারির নক্সা সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,

"The resemblance of motifs useu in the painted pottery to that from culture strata ascribed to the pre-Sumerian times in Mesopotamian sites and hence approximately dateable, is very striking indeed."

অর্থাৎ উত্তর বেলুচীস্থানের পটারির বয়স মেশোপটেমিয়ার স্তূপের যুগের পটারি অপেক্ষা প্রাচীন। এ motif বহু নক্সার সঙ্গে হোহানোর ইয়াং-শাও, সা-কুও-টান এবং কানহুর নক্সার সাদৃশ্যের কথা বলা হইয়াছে। হোহানোর এই ইয়াং-শাও কৃষ্টি নতুন প্রস্তরযুগের (late Neolithic age) এবং কানহুর চিত্রিত পটারি তাম্রযুগের বলিয়া অনুমান করা হয়। ইয়াং-শাও কৃষ্টির বয়স খ্রিঃ পূঃ ২৫০০-২০০০ বলা হয়। সর জন মার্শাল তাম্রযুগের কৃষ্টির বিস্তৃতি দক্ষিণ ইউরোপ পর্যন্ত দেখা যায় বলেন। একজন পণ্ডিত সিদ্ধু দেশের মানছার হ্রদের নিকটবর্তী ঝাঙ্গার স্তূপ হইতে প্রাপ্ত পটারির টেকনিকের (black ware with incised patterns) সঙ্গে ইউরোপের দানিউব অঞ্চলের "বেলবিকার" (bell-beaker) টেকনিকের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। বাঙ্গালোরের নিকটবর্তী পুতানহালিতে ঠিক এই টেকনিকের পটারি পাওয়া গিয়াছে। এই স্তূপের বয়স লৌহযুগের আরম্ভকাল বলিয়া মনে করা হয়। পশ্চিম বেলুচীস্থানের কলবার কুলী স্তূপের পটারিতে মিশরের পদ্ম নক্সা দেখা যায় বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে। মোহেঞ্জোদারোতে (D site) প্রাপ্ত একটি ভেস সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে—

"Which in beauty of form, intensity of feeling and vigour of execution is unsurpassed by the painted pottery recovered in Transcaspiia, Persia, Sumer or Baluchistan."

উপরে সেরামিকস সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে কয়েকটি তথ্য পাওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের সীমান্তের অর্থাৎ ইরান ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী কয়েকটি অঞ্চলের রঙের টেকনিকে (Pale ware) বৈদেশিক টেকনিকের সহিত সাদৃশ্য পাওয়া যায়। নক্সায় প্রধানতঃ জ্যামিতিক প্যাটার্নের টেকনিকে বিদেশের টেকনিকের মিল দেখা যায়। মোহেঞ্জোদারোর টেকনিক সিদ্ধু উপত্যকার নিজস্ব টেকনিক। জ্যামিতিক নক্সা, ডেউ, মালা, শিকল, জ্বাল, পাতা, ফুল, জীবজন্তুর মধ্যে মাছ প্রভৃতির নক্সাকে conventionalised pattern বলা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাচীনযুগের পটারির রং ও নক্সা



করিবার শিল্পীদিগের মধ্যে এই সকল নক্সা “বাধা গং” ছিল। সুতরাং এই সকল নক্সাকে বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক বলা যায় না। ইরান, মেসোপটেমিয়া ও আনাউ-এর পটারির সঙ্গে সিদ্ধ উপত্যকার পটারির যে সাদৃশ্য দেখা যায় তাহার প্রকৃত মূল্য এখন সহজে যাচাই করা যাইতে পারে। দেখা যাইবে যে অতি দুর্বল বনিয়াদের উপর বিরাত অট্টালিকা নির্মাণ করা হইয়াছে।

সেরামিকসের প্রমাণ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। এইবার মার্শালের ব্যবহৃত দ্বিতীয় প্রমাণের কথা বলা যাইতে পারে।

হরাপ্পা, মোহেঞ্জোদারো ও বেলুচীস্থানের বিভিন্ন স্থাপত্য হইতে বহু সংখ্যক পোড়ামাটির স্ত্রী মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সর জন মার্শাল, সর অরেল ষ্টাইন এবং অগ্র বহু পণ্ডিতের মতের এই স্ত্রী মূর্তিগুলি দেবী প্রতিমা বা representations of the Mother Goddess। এই সিদ্ধান্তে আসিতে যুক্তি প্রয়োগ যাহা করিবার তাহা মার্শালই করিয়াছেন, অপরাপর পণ্ডিতের নিকট এই সিদ্ধান্ত দাঁড়াইয়াছে স্বতঃসিদ্ধান্তের মত, অর্থাৎ প্রমাণপ্রয়োগনিরপেক্ষ। মার্শাল এই সিদ্ধান্তে আসিবার জন্ত যে সকল যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিলে তাহার প্রমাণকে evidence of analogy নাম দেওয়া যায়। এই evidence of analogy-কে আর একটু বিশদ করিলে দাঁড়ায় evidence of possible association of ideas, ইহার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। মার্শাল বলিতেছেন সিদ্ধ উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রী-মূর্তির অনুরূপ মূর্তি পারস্য হইতে ইজিয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে, বিশেষতঃ এলাম, মেসোপটেমিয়া, ট্রান্সকাস্পিয়া, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, সাইপ্রাস, জর্জিট, বলকান এবং মিশরে পাওয়া গিয়াছে। (M. I. C. vol. 1 p. 50) তারপর তিনি বলিতেছেন এই সকল মূর্তি সম্বন্ধে প্রচলিত মত এই যে they represent the Great Mother or Nature Goddess (M. I. C. vol. 1-p. 50) তদ্রূপের সিদ্ধ উপত্যকায় এবং বেলুচীস্থানে এই সকল মূর্তি পাওয়াতে মনে করা যায় যে এই কালট যতটা বিস্তৃত ছিল বলিয়া এ পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল প্রকৃতপ্রস্তাবে তদপেক্ষা বেশী বিস্তৃত ছিল। ইহাই evidence of possible association of ideas।

সিদ্ধ ধর্মের আলোচনার সময়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে; কারণ এই মতবাদের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। এখানে মার্শালের প্রচারিত এবং দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতসমাজে গৃহীত এই মতবাদ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে একটি কথা বলা আবশ্যক।

হিন্দু ধর্মের মধ্যে বহু অনার্য ভাব রহিয়াছে, আর্য

সভ্যতার উত্তরাধিকার দাবি করিলেও হিন্দুগণ অনার্যদের নিকট অনেক ধর্ম বিশ্বাস, দেবদেবী প্রভৃতি ধার করিয়াছে একথা বলিতে বিদেশী পণ্ডিতগণ বড় ভালবাসেন, দেশী পণ্ডিতগণও তাহাদের দেখাদেখি ভালবাসিয়া থাকেন। প্রাক-আর্যযুগের অধিবাসীদিগের নিকট, সম্ভবতঃ দ্রাবিড় ভাষাভাষী ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর নিকট হইতে হিন্দুরা স্ত্রী-দেবতার পূজা করিতে শিখিয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হয় হিন্দুদিগের তথাকথিত আর্যকৃষ্টি বার আনা অনার্য ভেজাল, দ্রাবিড়দিগের নিকট ধার করা। স্ত্রী-দেবতার পূজা অনার্য-দিগের জিনিস, ইহার উৎপত্তি ম্যাটিয়ারকাল-সমাজে। এই সমাজব্যবস্থা এককালে সমগ্র ভারতে প্রচলিত ছিল, এখনও দ্রাবিড়দিগের মধ্যে দেখা যায়। এইভাবে পুরাতন আর্য বনাম দ্রাবিড় মামলার জের স্বক্ষভাবে, নানাপ্রকারে টানিয়া চলা হইতেছে। স্ত্রী-দেবতার পূজা যে আর্যদিগের নিকট অপাংক্ত্য ছিল এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহ, প্রমাণ ব্যতিরেকেই নিঃসন্দেহ। সেজন্ত দেখা যায় যে ফারনেল ও ওপার্টের সাক্ষ্যের বলে মার্শাল বলিতেছেন,

“As a fact, there is no example of the ancient Aryans, whether in India or elsewhere, of having elevated a female deity to the supreme position occupied by the Mother-Goddesses.”

আর্যদিগের ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে এইরূপ অপঠিত জ্ঞানের বাহুল্যের পরিচয় পাওয়া যায় আর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের উক্তিতে,

“The sanctity of the cow is foreign to the Rigveda and appears far more suggestive of the religions of Asia Minor, Egypt and Crete than of Indo-European invaders.” (Hutton, Census Report, 1931, Vol. I, Part I, pp. 395, 396.)

যে দুইটি মত উদ্ধৃত করা হইল তাহার তুল্য অর্থার্থ উক্তি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

উপরে যাহা বলা হইল অবাস্তব হইলেও সতর্কতার প্রয়োজন কতখানি জানাইবার জন্ত তাহা বলা হইল।

মার্শাল যে প্রমাণের বলে সিদ্ধ ধর্মের সহিত সিদ্ধ উপত্যকা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত দেশগুলিতে প্রচলিত প্রাচীন যুগের ধর্মের সংযোগ দেখাইয়াছেন সেই evidence of analogy সম্বন্ধে এখানে অধিক আলোচনা স্থগিত রাখিয়া এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে উল্লিখিত দেশগুলিতে প্রাচীন যুগে প্রচলিত স্ত্রীদেবতার উপাসনার আলোচনা করিলে এবং

\* এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্ত লেখকের “Mother Goddess Worship in the Vedic Literature—Indian Culture vol VIII No 1 & 2 (1941 1942) দ্রষ্টব্য।

প্রাপ্ত জীমূর্ত্তিগুলির তুলনা করিলে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে analogy-র প্রমাণ দাঁড়াইতে পারে না। স্বতরাং সংযোগের কথা উঠে না।

কিন্তু যে প্রমাণের দ্বারা কিছু প্রমাণিত হয় না তাহাই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে এবং শুধু সংযোগ নহে পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নিকট সিদ্ধু-সভ্যতার প্রচুর ঋণের কথা পুনঃপুন বলা হইয়াছে। এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাউক।

পটারি এবং জীদেবতার উপাসনার প্রমাণের বর্লেন সিদ্ধু সভ্যতার সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার সংযোগ প্রমাণিত হয় এই মতবাদ প্রচারিত হইলে পণ্ডিতগণ সিদ্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদের গবেষণার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হইয়া সিদ্ধুবাসীদিগের জাতি, বৈষয়িক কৃষ্টি, ধর্ম, এক কথায় সমগ্র সিদ্ধু-সভ্যতা ও সিদ্ধু-সভ্যতার বাহকদিগকে সেই ক্ষেত্রের মধ্যে গ্রহণ করিল।

সিদ্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া পণ্ডিতগণের দৃষ্টি প্রথমে স্বভাবতই মেশোপটেমিয়ার উপর পড়িল। কারণ এশিয়ার এই অঞ্চলে মেশোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতা সমবিক প্রসিদ্ধ এবং ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজ বহুকাল এই সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মেশোপটেমিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানও এ সম্পর্কে উপেক্ষার বিষয় নহে। মেশোপটেমিয়ার সহিত সিদ্ধু-সভ্যতার প্রকৃত সংযোগস্থল কি প্রকারের পূর্বের এক প্ররন্ধে দেখা গিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই মত প্রচারিত ও অনেকটা গ্রাহ্য হইয়াছে যে ভূমধ্যসাগরীয় ও আর্মেনিয়েত গোষ্ঠীর লোক সমুদ্রপথে সিদ্ধু উপত্যকায় আসিয়া মেশোপটেমিয়ার সভ্যতাকেই ভারতবর্ষের মাটিতে ঢালিয়া সাজাইয়াছিল।

সিদ্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি মেশোপটেমিয়া হইতে এই মতবাদ প্রকৃতপ্রস্তাবে মেডিটারেনীয়ান থিওরীর একটি অংশ। মেডিটারেনীয়ান থিওরী অনুসারে সভ্যতার উৎপত্তি পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বলিতে যে সকল অঞ্চল বুঝায় তাহার মধ্যে ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলি এবং এশিয়া মাইনরের কথা এখানে সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

ঈজিয়ান সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনসমূহ আবিস্কৃত হইয়াছে এশিয়া-মাইনরের ট্রয়, গ্রীসের টিরিন্স (Tiryns) এবং ক্রীটের নোসাস ও ফেস্টাস (Knossus, Phaestus) হইতে। ঈজিয়ান সভ্যতাকে প্রাক-হেলেনিক, মাইসিনিয়ান বা মিনোয়ান সভ্যতাও বলা হয়। মিনোয়ান কর্তৃক ট্রয় হইতে যে সকল নিদর্শন উদ্ধার করা হইয়াছে সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ঐ সভ্যতার বয়স খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ বৎসর

বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ক্রীটে ঈভাসের ও অন্যান্য পণ্ডিতের প্রত্নতাত্ত্বিক অবিস্কার হইতে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসরের মধ্যে ক্রীট প্রস্তরযুগ হইতে ব্রোঞ্জ যুগে উপনীত হয় এবং অনুমান খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর পরে ক্রীটের ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে। [“The golden age of Crete lasted about a century” (B. C. 1500-1400)]। পণ্ডিতগণের হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে ঈজিয়ান সভ্যতার প্রকৃত অভ্যুদয় যে সময়ে ঘটে সেই সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৪০০) ইউরোপীয় আর্থবাদ অনুসারে বৈদিক আর্থগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ছিলেন। ঈজিয়ান সভ্যতার বয়সের যে হিসাব করা হইয়াছে সেই হিসাব অন্ততঃ আংশিকভাবে নির্ভরযোগ্য মনে করিলে তাম্রযুগের সিদ্ধু-সভ্যতার সহিত ঈজিয়ান সভ্যতার সংযোগ কল্পনা করা সম্ভব নহে। ক্রীটের সভ্যতার যখন স্বর্ণযুগ (খ্রীঃ পূঃ ১৫০০-১৪০০) মোহেজোদারো ও হরান্না তখন পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

তারপর এশিয়া-মাইনর। এশিয়া-মাইনরের গ্রীক নাম আনাতোলিয়া, তুর্কগণ এই নাম গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ফ্রিজিয়া, গ্যালিসিয়া, কাপাডোসিয়া এই অঞ্চলে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা ফ্রিজিয়ার নিকট বিশেষ ঋণী। রোমানগণ ফ্রিজিয়া হইতে কিবেলের (Cybele, Great Mother, Mother of the Gods) পূজাপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল। ফ্রিজিয়ানদিগের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তাহারা সম্ভবতঃ থ্রেসের ইলিরিয়ান গোষ্ঠীর একটি শাখা। ইতিহাসে ফ্রিজিয়ার অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে পশ্চিম এশিয়া-মাইনরের হালিস নদীর উপত্যকায় প্রাচীন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হিটাইট জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। এশিয়া-মাইনর হইতে তাহাদের রাজ্যের সীমা সিরিয়া ও মিশরের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। আনাতোলিয়ায় যে তাম্রযুগের সভ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা এই হিটাইট জাতির কীর্তি বলিয়া অনুমান করা হয়। খ্রীঃ পূঃ ৩য় সহস্রকের শেষের দিকে শক্তিশালী হইয়া তাহারা পূর্ব এশিয়া-মাইনর অধিকার করে এবং খ্রীঃ পূঃ ১২২৫ অব্দে হাম্মুরাবির বংশকে বাবিলোনের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করে।

হিটাইট ও ফ্রিজিয়ানদিগের ধর্ম সম্বন্ধে পরে সিদ্ধু ধর্মের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইবে, এখানে সিদ্ধু-সভ্যতার বাহকগণ ও তাহাদের জীদেবতার উপাসনা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের এই মতের সম্বন্ধে কিছু বলা হইতেছে।

কর্ণেল সেওয়েল ও ডাঃ গুহের অভিমত উল্লেখ করিয়া

ডাঃ হার্টন বলিতেছেন যে সিন্ধু-সভ্যতার অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে বেলুচীস্থান ও সিন্ধু-উপত্যকায় এবং সমগ্র উত্তর-ভারতে ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর জাতি উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। এই গোষ্ঠী পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে মেশোপটেমিয়া হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। তারপর এই মত পাওয়া যাইতেছে যে সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রী-মূর্তিগুলি Great Mother বা Nature goddess-এর প্রতিমূর্তি। এই দেবীর পূজা—

“Is believed to have originated in Anatolia (probably in Phrygia) and spread thence throughout most of Western Asia.”

মায়াসের মতে উহা আনাতোলিয়া বা সিরিয়া হইতে মেশোপটেমিয়ায় আসিয়াছিল। হার্টনের মতে—

“The religious history of pre-Vedic India was probably similar and parallel to that of eastern Mediterranean and of Asia Minor.”

মোটিমুট দেখা যাইতেছে যে মেডিটারেনিয়ান থিওরীর প্রচারকগণের মতে সিন্ধু জাতি ও সিন্ধুধর্ম পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। সিন্ধু জাতির মধ্যে যে আর্মেনয়েড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের কথা বলা হইয়াছে সেই গোষ্ঠী ঐ অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল অনুমান করা হইয়াছে (ডাঃ হার্টন)। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ইজিয়ান এলাকা ও আনাতোলিয়ার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইজিয়ান সভ্যতার সম্বন্ধে উপরে বলা হইয়াছে যে তাম্রযুগের সিন্ধু-সভ্যতা ও ব্রোঞ্জযুগের ইজিয়ান সভ্যতাকে সমসাময়িক বলিয়া মনে করা চলে না। প্রাচীনত্বের হিসাব করিলে এবং সংযোগ প্রমাণ করিবার মত তথ্য পাওয়া গেলে বরং অনুমান করিতে হয় যে সিন্ধু-কৃষ্টির প্রভাব ইজিয়ান এলাকায় প্রসারিত হইয়াছিল। তারপর পণ্ডিতগণ ইজিয়ান সভ্যতার বাহকদিগকে লম্বামুণ্ড ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর লোক বলিয়া মনে করেন না। অনুমান ঃ পূঃ ২৫০০ অব্দের মধ্যে এই অঞ্চলে একটি মিশ্র জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে প্রস্পেক্টরস্ বা আর্মেনয়েড মারিনাস (Prospectors or Armenoid Mariners)। আনাতোলিয়া সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মত এই যে নূতন প্রস্তরযুগের কাল হইতে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর লোক এই অঞ্চলের অধিবাসী। তাম্রযুগের হিটাইটগণ এই গোষ্ঠী। হিটাইটগণের পরে যে ইলিরিয়ান গোষ্ঠীর ফ্রিজিয়ানগণ এই অঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠে সেই ইলিরিয়ান গোষ্ঠী গোলমুণ্ড, লম্বামুণ্ড মেডিটারেনিয়ান নহে। হিটাইটগণ দক্ষিণ-সিরিয়ায় মিশরের সীমান্ত পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। ইহার পরে দেখা যাইবে যে তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাহা জানা যায় তাহাতে মেশোপটেমিয়ার প্রভাব

পরিস্ফুট। ডাঃ হেডনের মতে হিটাইটগণের মধ্যে প্রোটো-নর্তিক (অর্থাৎ আর্য) সংমিশ্রণ ছিল।

সিন্ধুজাতি ও সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি বাহাদের মতে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের অভিমত ও ইতিহাসের সাক্ষ্য তাহাদের সমর্থন করে না।

মিশরের প্রসঙ্গ এখানে উঠাইবার প্রয়োজন নাই। মিশর প্রাচীন সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র এবং প্রাচীন মিশরীয়গণ ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর হইলেও সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তির প্রসঙ্গে মিশরের উপর জোর দেওয়া হয় না।

সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তির প্রসঙ্গে মেশোপটেমিয়া ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল সম্বন্ধে বাহা বলা হইয়াছে ও যে সকল যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে অতি সংক্ষেপে তাহার কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু বাহা বলা হইয়াছে ও যে সকল যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার প্রকৃত মূল্য যাচাই করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। এই প্রকারের আলোচনার এখানে স্থানান্তর, তাহা ছাড়া ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কা আছে। কিন্তু একথা বুঝিবার ও বলিবার সময় হইয়াছে যে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে অপরের মুখে দুইটি মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট বা তিক্ত বাক্যে রুষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকা বাহারা আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে চাহে তাহাদের পক্ষে শোভা পায় না। ভারতীয়ের এবং বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। এজন্য লেখক ও পাঠক উভয় পক্ষকে শ্রমস্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইবে। এই আলোচনার সঙ্গে মানসিক ভাবের কোন সম্পর্ক নাই, এই আলোচনা হইবে তীক্ষ্ণ, সত্যানুসন্ধানী, বৈজ্ঞানিক আলোচনা।

সে বাহা হউক, সিন্ধু-সভ্যতার সহিত মেশোপটেমিয়ার বা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সংযোগ ছিল এবং সিন্ধু-সভ্যতা মাঞ্চুরিয়া হইতে দক্ষিণ ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত তাম্রযুগের কৃষ্টির অংশমাত্র বাহারা এইরূপ মনে করেন তাহাদের ব্যবহৃত দুইটি প্রধান যুক্তি, সেরামিক্সের থিওরী এবং Possible association of ideas-র থিওরী সংক্ষেপে পরীক্ষা করা হইয়াছে। সিন্ধু-সভ্যতার ও সিন্ধু জাতির উৎপত্তি বাহারা মেশোপটেমিয়া বা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বলেন তাহাদের অভিমতের ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই পরীক্ষা ও আলোচনার ফলে দেখা যায় যে একমাত্র সেরামিক্সের থিওরীর কিছু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রহিয়াছে। কিন্তু সেরামিক্স হইতে বাহা প্রমাণ হয় তাহা এইরূপ : পশ্চিম সিন্ধু ও বেলুচীস্থানের কয়েকটি স্থাপত্য হইতে তাম্রযুগের যে সকল পট্টা পাওয়া গিয়াছে তাহা মোহে-

জোদারো ও হরান্নার পটারি হইতে ভিন্ন এবং মোহেজো-দারো ও হরান্না যুগের পূর্ববর্তী। এই পটারির সহিত সিষ্টান, ইরানের বিভিন্ন অঞ্চল, দক্ষিণ মেশোপটেমিয়া এবং মধ্য-এশিয়ার আনাউতে প্রাপ্ত পটারির কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সাদৃশ্য আবার কয়েকটি conventionalised motifs বা অভ্যস্ত নক্সা ছাড়া অন্য কিছুতে নাই। তাহা হইলে এই পর্যন্ত বলা যায় যে ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিম সিন্ধু ও বেলুচীস্থান এবং ভারতবর্ষের বাহিরের এই অঞ্চলগুলির মধ্যে কোন প্রকার সংযোগ হয়ত ছিল অথবা সংযোগ থাকা সম্ভব। মেশোপটেমিয়ার বাহিরে সংযোগের অনুসন্ধান করা বাহুল্য, কারণ পশ্চিম এশিয়ায় মেশোপটেমিয়ার সভ্যতার তুল্য প্রাচীন ও সমৃদ্ধ আর কোন সভ্যতার পরিচয় জানা নাই। তারপর দক্ষিণ-মেশোপটেমিয়ার বা সূমেরীয় সভ্যতা ছিল বাবিলোনিয়, আসিরীয় এবং সাধারণভাবে সমগ্র পশ্চিম-এশিয়ার সভ্যতার ভিত্তি (সর জন মার্শাল)।

শুধু এই সংযোগ ছাড়া সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তির সম্বন্ধে কোন কথা উঠে না, মেশোপটেমিয়া সম্পর্কেও উঠে না। কারণ মেশোপটেমিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতা সিন্ধু-সভ্যতার কতকটা সমসাময়িক, পূর্ববর্তী নহে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে সূমেরীয় সভ্যতার কয়েকটি নিদর্শন মোহেজোদারোর উপরের স্তরগুলি হইতে পাওয়া গিয়াছে।

এখন ভারতবর্ষের মধ্যের ও ভারতবর্ষের বাহিরের যে দেশগুলির মধ্যে সংযোগ ছিল বলিয়া অনুমান করা যায় সেই সকল দেশ একটি কুষ্টি-কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই কুষ্টি-কেন্দ্রের পশ্চিম সীমানায় এলাম, সূমের এলাকা-উত্তর সীমানায় আনাউ এলাকা, দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় বেলুচীস্থান-সিন্ধু-পঞ্জাব এলাকা। মধ্যে সিষ্টান বা জাবুলীস্থান পশ্চিম এলাকা ও পূর্ব এলাকার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেছে।

দেখা প্রয়োজন এই সীমানার মধ্যে আর কোন কুষ্টি-কেন্দ্র আছে কি না।

সিন্ধু-সভ্যতাকে এশিয়া মাইনরের নিকট স্থানী প্রমাণ করিতে একদল পণ্ডিত এত ব্যস্ত হইয়াছেন যে সিন্ধু উপত্যকার নিকটতম মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন কুষ্টি-কেন্দ্রটি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই অথবা দৃষ্টিতে তাঁহারা আকৃষ্ট হইতে দেন নাই। মধ্য-এশিয়ার এই প্রাচীন কুষ্টি-

কেন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনার এখানে স্থানান্তর ঘটতেছে। এ সম্বন্ধে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের অভিমতের সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইতেছে।

পূর্বের এক প্রবন্ধে প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ডাঃ হেডনের একটি মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার মত এইরূপ :

“There is reason to believe that a great pre-historic civilisation spread from Central Asia to the plateau of Iran and to Syria and Egypt long before 4000 B.C., and the Sumerians who were a somewhat later branch of this Central Asian people, entered Mesopotamia before 5000 B.C.”

অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ সহস্রকের বহুপূর্বে মধ্য-এশিয়ায় একটি বড় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল এবং মধ্য-এশিয়া হইতে এই সভ্যতা ইরান, সিরিয়া ও মিশরে বিস্তৃত হইয়াছিল এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। সূমেরীয়গণ এই মধ্য-এশিয়ার জাতির শাখা এবং খ্রীঃ পূঃ ৫ম সহস্রকে তাহারা মেশোপটেমিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিল। ডাঃ হেডনের মতে এলামের সভ্যতার অভ্যুদয় খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বৎসরের ব্যাপার। বলা বাহুল্য, এই কাল নির্ণয় বেশীর ভাগ অনুমান মাত্র। আসল কথা এই যে তিনি সূমেরীয় এলামাইট সভ্যতাকে প্রাচীনতর মধ্য-এশিয়ার সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত করিতেছেন এবং প্রাচীনতম ভূমধ্য-সাগরীয় সভ্যতার উৎপত্তি এই মধ্য-এশিয়ার সভ্যতা হইতে এইরূপ বলিতেছেন। হোনানের ইয়াংশাও কুষ্টিতেও তিনি এই মধ্য-এশিয়ার সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করেন। বয়সের হিসাবে ফ্রিজিয়ান সভ্যতা খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৫০০, এশিয়া-মাইনরের সভ্যতা খ্রীঃ পূঃ ২৫০০-২০০০ ও ইয়াংশাও কুষ্টি খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৫০০ বৎসর বলিয়া অনুমান করা হয় একথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

মধ্য-এশিয়ার এই কুষ্টি-কেন্দ্র কোথায় ছিল এবং কোন গোষ্ঠীয় জাতি এই মধ্য-এশিয়ার সভ্যতার প্রবাহ দূর-দূরান্তরে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহার আলোচনা পরে হইবে।

মধ্য-এশিয়ার যে কুষ্টি-কেন্দ্র এলাম-সূমের এলাকার সহিত যুক্ত অতি নিকটবর্তী সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে তাহা যুক্ত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি কোথায় অনুসন্ধান করিতে হইলে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস, নীলনদ বা ভূমধ্যসাগর নহে, সিন্ধু ও অক্সাসের মধ্যবর্তী অঞ্চলে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

## স্বপ্ন-শিল্পী

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

[যে সকল প্রতিভাবান তরুণ ইংরেজ সাহিত্যিক প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮ খ্রিষ্টাব্দ) নিহত হন, অলিফ্যান্ট ডাউন (Oliphant Down) তাঁদেরই একজন। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর জীবনের অবসান হয়। বর্তমান একাধিকাবানি তাঁরই লেখা 'দি মেকার অব ড্রিম্‌স'-এর অঙ্গবাদ।]

কুশীলব : পিয়েরট, পিয়েরেটে, শিল্পী।

সন্ধ্যা। একটি পুরাতন কুটিরের অভ্যন্তরে বিবর্ণ ওক কাঠে নির্মিত একখানি কক্ষ। কোনও আলো জ্বালা হয় নি; কেবল পিছনের বড় বড় জানালার কাঁক দিয়ে চাঁদের আলো আসছে আর একটা চুল্লীতে গন্‌ গন্‌ করে আগুন জ্বলছে। জানালার পাশেই একটা দরজা—দরজা থেকে বাইরের একটা এবড়ো-খেঁবড়ো সড়ক নজরে পড়ে। চুল্লীর উল্টো দিকে একটা ছোট্ট খাবারের টেবিলের উপর সাজিয়ে-রাখা কাপ-ডিসগুলি আগুনের আভায়ে ঝিক্‌ঝিক্‌ করছে। ওক কাঠে তৈরি একটা উঁচু বসবার আসন যেন শীতের ভয়েই জানালা থেকে আড়াল করে চুল্লীর কাছে রাখা হয়েছে—আগুনে আসনের শিরানগুলি গরম করে তোলাই বুঝি উদ্দেশ্য। ঘরের মাঝখানে লাল কাপড়ের আচ্ছাদন দেওয়া একটা টেবিল; টেবিলের চারপাশে কয়েকখানি চেয়ার মুখোমুখি করে রাখা হয়েছে। চুল্লীর কাছে একটা কেংলী দেখা যাচ্ছে; মাথার উপরে চিম্বানীর গায়ে খোলানো আছে একটা লণ্ঠন। লণ্ঠনের শিখা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জানালার বাইরে ক্ষণিকের জ্বল একটি মূর্তি দেখা গেল, এবং পরক্ষণেই 'ক্লিক্‌' করে তালা খোলার শব্দ হ'ল। ঘরে ঢুকল পিয়েরেটে। সে-দরজার কাছে তার লম্বা কোটটা টাঙিয়ে রাখলে, তার পর শীতে কাঁপতে কাঁপতে চুল্লীর কাছে গিয়ে ক্ষণকাল আগুন পোহালে। তারপর লণ্ঠনের শিখাটি বাড়িয়ে দিয়ে কেংলীটা চুল্লীর উপর রাখলে এবং টেবিলে বসে ছ'জনের মত চা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জানালার খোলানো সজা পর্দাটা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে কি যেন দেখলে—তারপর হতাশ ভাবে আবার গৃহ-কার্যে মনোনিবেশ করলে। চায়ের পাঞ্জা সে ধীরে ধীরে এক, দুই, তিন চামচে চা ঢাললে। এমন সময়ে বাইরের পানে তার মনোযোগ আকৃষ্ট হ'ল। সে যেন কি শুনলে—তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—বাইরে থেকে কার গান ভেসে আসছে :—

“চাঁদের তরে মেয়ে, থাকিস না লো চেয়ে,  
চাঁদ পড়েছে ধরা তরুণাধার জালে,  
আলোয় গানে ভরা জ্যোৎস্নায় যায় ধেয়ে—  
ধবলীরে বিদায় জানায় সন্ধ্যাকালে।”

গানের ধ্বনি ক্রমেই কাছে এল এবং জানালার বাইরে একটা সাদা মোচাকার (conical) টুপী দেখা গেল। পিয়েরট ঘরে ঢুকল।

পিয়েরট—(টুপীটা পিয়েরেটের কাছে ছুড়ে ফেলে) উঃ! কি ঠাণ্ডা আজ—আমার পা দুটো যেন বরফ হয়ে গেছে।

পিয়েরেটে—এই নাও তোমার চাট জুতো—গরম করে রেখেছি। (পিয়েরেট হাঁটু গেড়ে বসে পিয়েরেটের জুতো হুলতে আরম্ভ করল।)

পিয়েরট—(গান)—

“চাঁদের তরে মেয়ে, থাকিস না লো চেয়ে,  
সে যে বাকিয়ে মুখ যাবে চলে জানি,  
আলোয় গানে ভরা জ্যোৎস্না দিল ছেয়ে  
লক্ষ কোটি তারায় তারায় আকাশখানি।”

...চা কি এখনো তৈরী হয়নি?

পিয়েরেটে—প্রায় হয়ে এসেছে। কেংলীর জলটা ফুটে উঠতেই যা দেবী।

পিয়েরট—বাজারে\* আজ কি ঠাণ্ডা! আমার গান মোটেই ভালো হয়েছে বলে মনে হয় না—ঠাণ্ডায় আমি গাইতেই পারি না।

পিয়েরেটে—তোমার অবস্থা দেখছি কেংলীটার মতই—সেও ঠাণ্ডায় গাইতে পারে না। ওহে কেংলী বাবাজী, দয়া করে একটু ভাড়াভাড়া করুন না।

পিয়েরট—হায়! কেংলীটা যদি ওর নিজের সুরের সঙ্গে প্রেমে পড়বার পথ চিনত।

পিয়েরেটে—মনে হয়, ও জানে। ওই শোন, পাখীর মত ও এবার গেয়ে উঠেছে। আমরা এই পাপিয়ার সুর-নির্যাস দিয়ে চা তৈরী করব। (চায়ের পাঞ্জা সে ফুটিত জল ঢালতে লাগল) এস।

পিয়েরট—(আগুনের দিকে চেয়ে) কি আশ্চর্য! ওর সৌন্দর্য ছিল, আকৃতিও ছিল, কিন্তু প্রশ্ন কি আছে?

পিয়েরেটে—(রুট কেটে কেটে মাখন মাখিয়ে টেবিলের

•• বিলাতে প্রামাণ্য নাট্যসম্প্রদায় হাটে-বাজারে গান গেয়ে বেড়ায়।



উপর রেখে) ওখানে বসে আঙনের সঙ্গে গজ গজ করার চেয়ে এখানে এসে খেয়ে দেয়ে একটু ভাজা হও দেখি।

পিয়েরটে—আমি ভাবছিলাম—।

পিয়েরটে—এস, এস, চা খাও। চুল্লীর কাছে বসলে তোমার ভাব কেবল ধোঁয়া হয়ে চিম্নী দিয়ে উড়তে থাকে।

পিয়েরটে—সারা দুনিয়াটাই একটা চিম্নী। হেঁড়া কাগজের মত একটা বাজে জিনিষ মানুষকে দাও, দেখবে তাতে আঙন ধরেছে—আন্দোলন শুরু হয়েছে; অর্থাৎ, আসল বস্তু যে ধোঁয়ার মতই মিলিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে কারও নজর নেই।

পিয়েরটে—মেকাজ ঠিক কর, পিয়ের। দেখ, রুটিতে আমি কেমন পুরু করে মাখন মাখিয়েছি।

পিয়েরটে—তোমার মেকাজ তো দেখছি সব সময়েই ঠিক থাকে।

পিয়েরটে—আমি যে সুখী হবার চেষ্টা করি।

পিয়েরটে—উঃ।

(পিয়েরটে টেবিলের কাছে সরে এসেছে। কিছুক্ষণ চূপচাপ কাটছে। পিয়েরটে ভাবপ্রবণ ভঙ্গীতে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে।)

পিয়েরটে—চা ঠিক হয়েছে ত?

পিয়েরটে—তা একরকম হয়েছে।

পিয়েরটে—এক রকম। দাও, আমি তোমাকে আবার নতুন করে তৈরী করে দি।

পিয়েরটে—না না, এই-ই ঠিক আছে। তুমি মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতে ওস্তাদ।

পিয়েরটে—বটে! পাগলা কুকুরটাকে বেঁধে রাখব নাকি?

পিয়েরটে—ভাল কথা, সেই মেয়েটির সঙ্গে আজ তোমার দেখা হয়েছিল?

পিয়েরটে—কোন মেয়েটি?

পিয়েরটে—সেই যে, ষোড়-দোড়ের মার্চের কাছে দাঁড়িয়েছিল। খাসা চেহারা—গলায় বড় বড় মালা জড়ান।

পিয়েরটে—না, আমি তাকে দেখি নি।

পিয়েরটে—কিন্তু আমি দেখেছি এবং সেও আমাকে দেখেছে। আমি হতক্ষণ গান গেয়েছি, ততক্ষণ সে আমার দিকে চেয়েছিল—হাততালি দিয়েছে ঘন ঘন। মেয়েদের যে এমন সুন্দর চেহারা আর এমন রসামুহুর্তি থাকা সম্ভব, তা বিশ্বাস করা সত্যিই বড় কঠিন।

পিয়েরটে—ও ছদ্মবেশী।

পিয়েরটে—কখনই নয়। আর হলেই বা, তুমি জানলে কি করে? তুমিও তো তাকে দেখ নি।

পিয়েরটে—বোধ হয় দেখেছি।

পিয়েরটে—দেখ, পিয়েরটে, ঈর্ষা করা তোমার উচিত নয়। যখন তুমি আর আমি এই গান শোনানোর ব্যবসা খুলি, তখন ঠিক হয়েছিল যে আমাদের সম্পর্ক থাকবে অংশীদারের মতই—তার বেশী নয়। আমি যদি বিয়ে করার উপযুক্ত কারও খোঁজ পাই, তবে তাকে বিয়ে করব। আর তোমাকে বিয়ে করতে চায়, এমন কারও সন্ধান পেলে তুমিও তাকে বিয়ে করতে পারবে।

পিয়েরটে—আমার একটুও ঈর্ষা হয়নি। কি বাজে বকুছ?

পিয়েরটে—(আত্মগত ভাবে গান)

টাদের তরে মেয়ে, থাকিস না লো চেয়ে,

তুষার-ধবল অধরে তার মেঘের ছায়া,

আলোয় গানে ভরা জ্যৈষ্ঠ দিল ছেয়ে

ছথের ছোঁয়ায় প্রভাত-পাখীর গানের মায়া।

পিয়েরটে—‘শো’ ভাঙার পর কি তুমি আর মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছিলে?

পিয়েরটে—না, সে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। যথেষ্ট চা খেলুম। এবার যাই, তাকে খোঁজবার চেষ্টা করি।

পিয়েরটে—তার চেয়ে এই চুল্লীটার পাশে এসে বস না। আমাকে এই মোজাগুলোর তালি দিতে সাহায্য করলেও তো পার।

পিয়েরটে—আমার কাছে বাগড়া দেবার চেষ্টা কর না। তালি দেওয়াই বটে। তালি দেওয়ার চেয়ে জীবনে দামী কাজ আরও কিছু আছে বলে আমার মনে হয়।

পিয়েরটে—আমার কিন্তু সন্দেহ আছে। ‘দুনিয়ার সর্বত্রই এক ধারা। প্রথমে আমরা হেঁড়া মোজা পায়ে দি, তারপর সেই মোজায় লাগাই তালি। তারাই হ’ল বুদ্ধিমান, যারা মোজার সদ্যবহার করতে জানে—সময় থাকতে যথা-সম্ভব তালি দিয়ে নেয়।

পিয়েরটে—ঠিক, ঠিক। তুমি আমাকে একটা-নতুন গানের ভাব জোগালে।

পিয়েরটে—গাইতে আরম্ভ কর তা হলে।

পিয়েরটে—কিন্তু গানটা আমি এখনও বাঁধতে পারি নি। তোমার কথা শুনে ভাবটা আমার মনে ঝিলিক দিয়েছে মাত্র।

(সে লাকিয়ে টেবিলের উপর উঠে অভিনেতার ভঙ্গীতে দাঁড়াল।)

জীবন হ’ল হেঁড়া স্তরের জট-পাকান গুলি,

তোমরা কি কেউ পার এ জট খুলতে?

মুখে কেবল অহর্নিশি অহঙ্কারের বুলি—

(সে এক মুহূর্ত্ত থামল, তারপর ভাড়াভাড়ি ছন্দ মেলাবার তাগিদে বলে উঠল) ‘মানুষ বলে জিগির চাহ ‘তুলতে’।...

এ অবিশ্বাসি গানের ছকমাত্র—আসলে গান নয়।

পিয়েরেটে—তুমি ‘শো’-তে এ গান গাইতে চাও নাকি ?

পিয়েরেট—(টেবিল থেকে লাফিয়ে নেমে) তোমার মধ্যে একটুও আবেগ নেই। শিল্পীদের গায়ের চামড়া হবে শিশুদের মতই পাতলা—যেন একটুতেই বেঁধে।

পিয়েরেটে—এখন ঘরে থাক পিয়ের, বাইরে যেয়ো না—বড় ঠাণ্ডা।

পিয়েরেট—তুমি বুঝি চাও যে আমি তোমার খুঁতখুঁতানি শুনি বসে বসে।

পিয়েরেটে—এইমাত্র না তুমি বললে যে, আমার মেজাজ সব সময়ে ঠিক থাকে।

পিয়েরেট—এই তো আবার আমার সঙ্গে খচ্ খচ্ আরম্ভ করলে।

পিয়েরেটে—অত্যা হ হয়েছে, পিয়ের। কিন্তু বাজারে আজ সত্যি বড় শীত পড়েছে। তার ওপর তোমার জুতো যা পাতলা।

পিয়েরেট—যতই বল না কেন, আমি ঘরে থাকব না। আমি সেই মেয়েটির খোঁজে যাচ্ছি। কে জানে, ও-ই হয়ত আমার স্বপ্নচারিণী।

পিয়েরেটে—তুমি কেবল আদর্শ মেয়েদের স্বপ্ন দেখে বেড়াও কেন ?

পিয়েরেট—তুমি কি কখনও আদর্শ পুরুষের স্বপ্ন দেখ না ?

পিয়েরেটে—না, আমি বাস্তববাদী হবার জগুই চেষ্টা করি।

পিয়েরেট—মেয়ে জাতটাই একেবারে কল্পনাশক্তিহীন। তারা নেহাতই মায়ের জাত। এই মা হবার ইচ্ছেটাই যখন জ্বরে মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে; তখন তারা বলে, ‘আমরা প্রেমে পড়েছি। অত্যন্ত জঘন্য আর নীচ এই মনোরক্তি। আমি এমন এক নারীকে চাই যাকে বেদীর উপর বসিয়ে তার দিকে চেয়ে থাকতে পারি আর প্রেম নিবেদন করতে পারি।

পিয়েরেটে—(ভাবগদগদ স্বরে)

পথে চেয়ে ‘পিয়ের’, থেকে নাকো চাঁদের, জ্বোছ নাতে তার একটি হৃদয় পড়ছে ঢলে, আলোয় ভরা গানে ওরা মধু জ্যোষ্ঠের থাকবে নাকো চিহ্ন কোনও দিন ফুরলে।

পিয়েরেট—না, আমি তোমাকে বোকাতে পারব না। যাক্ আমি চললাম। (বাইরে যেতে যেতে পিছন ফিরে সে বিজ্ঞপের স্বরে গাইতে লাগল) “চাঁদের তরে মেয়ে, থাকিস না লো চেয়ে।”

পিয়েরেটে—গানের ক্রমবিলীয়মান স্বর শুনতে লাগল। তারপর চুল্লীর কাছে গিয়ে আগুনটাকে বাড়িয়ে দিয়ে হাঁটু

গেড়ে বসল। একটি হারানো কবিতা তার মনে পড়ল। হাতোজ্জ্বল মূর্তির মত জ্বলন্ত কয়লাকে শুনিয়ে শুনিয়ে পিয়েরেটে আরম্ভ করতে লাগল।)

‘একটি আছে কুমারী এই বিশাল হুনিয়ায়—

আছে মিশে লোকের ভিড়ে নগরে হাটে,

কঁদে ওঠে পথিক যারা সে পথ দিয়ে যায়,

তৃপ্তিহীনা এই কুমারী ভবেরি নাটে।

গোলাপ-রাঙা অধরে তার উঠচে কঁপে সুর—

প্রকাশ তাহার হয় না যে হার মুখের বাণীতে,

চোখ ছুটি তার দুঃখমলিন, হৃদয় ভারাতুর,

দেয় না সাড়া এই মনোরম দিনের ধ্বনিতে।

ভাবসাগরের অতল তলে ঘুমে অচেতন

সেই কুমারীর মনের মাহুধ কিসের নেশাতে,

রাত্রি হ’ল মধুর আরো—জাগল শিহরণ

প্রিয়ার চোখে প্রিয়মুখের স্বপ্ন-চুম্বতে।

জানি, জানি, এমন পুরুষ আছেই হুনিয়ায়,—

যে পারে এ নারীর প্রাণে আগুন জ্বালাতে,

সে পুরুষের বোঁজ কে দেবে? বোঁজ যে নাই হয়,—

এই কুমারীর হৃদয় কে গো পারবে জুড়াতে?

প্রেমবিধুরা এই কুমারীর দেখা যদি পাও,

মিথ্যা তারে শুনায়ে না সাধুনা-বাণী,

নীরব থেকে অন্তরে তার গোপন রাখতে দাও

তৃপ্তিহীনার স্বপ্নরঙীন আলোখাখানি।’

(তার চোখে অক্ষ উপচে উঠল। দুই হাতে সে মুখ ঢাকিলে। কে যেন বীরে অথচ দৃঢ়ভাবে দরজার কড়া নাড়লে। পিয়েরেটে অবাক হয়ে তাকাল। দরজায় আবার আঘাত পড়ল।)

পিয়েরেটে—ভেতরে এস।

(দরজা যেন আপনা হতেই খুলে গেল। বাইরে দেখা গেল শিল্পীকে—চাঁদের আলোয় সে এসে দাঁড়াল। অদ্ভুতদর্শন ও স্নিগ্ধ চেহারা এই বৃদ্ধের। যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাকে মোটেই ছুঁকল দেখায় না। যাদের দেখে শিশুর দল আপনা থেকেই মজে যায়, এই বুড়ো তাদেরি অগ্রতম। তার পরনে নীল কাঁচের মত রঙীন একটা অদ্ভুত আকারের আলখাল্লা, তাতে রূপোর বোতাম আর বড় বড় পকেট—আলখাল্লাটিতে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। তার জুতোয় বড় বড় বগলেস পরানো, জুতোর হিলছোটো টকটকে লাল রঙের। তাকে দেখে বিভ্রালা শিল্পী বলে মনে হয় না—গৈরো চারণ বলেই ধারণা জন্মায়। কোনও কথা না বলে সে ঘরের মধ্যে এল এবং দরজাটা আপনা থেকে আবার বন্ধ হয়ে গেল।)

পিয়েরেটে—(ব্যস্তমস্ত হয়ে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে) ওঃ, ভারি অত্যা হ হয়ে গেছে আমার—কড়ানাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে দেওয়া উচিত ছিল।

শিল্পী—ঠিক আছে, ব্যস্ত হয়ে না। দরজা খোলায় আমি অভ্যস্ত; বিশেষতঃ, আমি যে সব দরজা খুলেছি তাদের অনেকের চেয়ে তোমার দরজা সহজেই খোলে। বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, এমন অনেকে আছে যারা ইচ্ছে করে দরজায় পেরেক মেরে রাখে—তাদের দরজার কড়া নেড়ে কোনও ফল নেই। ভাল কথা, আমি কে তা ভেবে বোধ হয় অবাক হচ্ছ?

পিয়েরেটে—আমি ভাবছি, তোমার বোধ হয় কিদে পেয়েছে।

শিল্পী—সেই পুরনো মেয়েলী ভাবনা। যাক, তোমাকে ধন্যবাদ। আমার কিদে পায় নি। আমি খাই কম—খুবই কম খাই। একটু হাসি অথবা একটুখানি হাতের ছোঁয়া পেলেই আমি দিন কাটয়ে দিতে পারি।

পিয়েরেটে—তুমি বসবে তো অন্ততঃ—এটাকে নিজের ঘর মনে করে একটু জিরিয়ে নাও।

শিল্পী—(কাঠাসনের কাছে এগিয়ে গিয়ে) আমি যেখানেই যাই, সেখানেই আমার নিজের ঘর বলে মনে করা আমার স্বভাব। বলতে কি, লোকে বলে আমার ছাড়া তোমরা নাকি ঘর বাঁধতে পার না। উল্লুনের পিঠে আমার পাছটো রাখতে পারি কি? এটাও আমার পুরনো অভ্যাস। আমি সব সময়ই এমনি রেখে থাকি।

পিয়েরেটে—এখানকার লোকেরা বলে—

‘না রাখলে পা উল্লুনের পিঠে

প্রণয় যে গো লাগে না মিঠে।’

শিল্পী—খাঁটি কথা। গৃহস্থালির গোপন যাদুও এই-ই। পিয়েরেটে, তুমি কাঁদছিলে।

পিয়েরেটে—বোধ হয় কাঁদছিলুম।

শিল্পী—মন খোলো। আমি সব জানি। সবই তো পিয়েরকে নিয়ে—নয় কি? তুমি তাকে ভালোবাস, অথচ সে তোমাকে এতটুকু গ্রাহ্য করে না। কি অভূত আয়গা এই পৃথিবী! আর তুমি তার জন্ত কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলছ।

পিয়েরেটে—না না, আমি বড় একটা কাঁদি না। কিন্তু আজ রাতে ওর আচরণ অস্বাভাবিক রকম খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছে, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি ওকে খুশী করার জন্ত।

শিল্পী—কি বললে? খুঁতখুঁতে।

পিয়েরেটে—অবিষ্টি, ওর তেমন দোষ নেই। যা শীত পড়েছে। তার ওপর কিছু দিন থেকে ‘শো’-তেও তেমন রোজগার হচ্ছে না। পিয়ের চায় কোনও দৈনিক কাগজে আমাদের সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখতে, এতে বিজ্ঞাপনের কাজ হবে। সম্পাদককে ফ্রি পাশে ‘শো’ দেখতে দেবার বন্দোবস্ত করবে, প্রবন্ধ ছাপান যাবে বলে তার ধারণা।

শিল্পী—তুমি কি মনে কর যে পিয়ের তোমার চোখের জলের উপযুক্ত পাণ্ড?

পিয়েরেটে—নিশ্চয়ই।

শিল্পী—মনে রেখ, নষ্ট করবার মত চোখের জল আমাদের নেই। যে সামান্য অশ্রু আমাদের আছে, তা দিয়ে কেবল হৃদয়কেই ভিজিয়ে রাখা যায়। এই অশ্রু যখন সব শুকিয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে, তখন হৃদয়ও যাবে শুকিয়ে।

পিয়েরেটে—পিয়ের অপূর্ণ মাহুশ। আমার মত তুমি তাকে জান না। সত্যি কথা যে সে সব সময়ই অদ্ভুত—সব সময়ই খিটখিট করে; কিন্তু তার কারণ, সে কারণও প্রেমে পড়ে নি। জানই তো, প্রেম পুরুষের জীবনে এক মন্ত পরিবর্তন ঘটায়।

শিল্পী—ঠিক কথা। কিন্তু প্রেম কি তোমার জীবনে কোনও পরিবর্তন এনেছে?

পিয়েরেটে—নিশ্চয়ই। আমি পিয়েরের চাট জুতো গরম করে রাখি, তাকে চা তৈরি করে দি, আর তার জন্ত কিছু করবার স্বেচ্ছা পেয়ে সর্বদা নিজেকে সুখী মনে করি। তাকে যদি ভাল না বাসতুম, তা হলে এ সব কাজে বিরক্তি আসত।

শিল্পী—তুমি কি ঠিক জানো যে এই হ’ল প্রকৃত প্রেম?

পিয়েরেটে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

শিল্পী—যখন তুমি পিয়েরের কথা ভাবো, তখন কি হুট ছোট খালি পায়ের আঙুরাঙ্ক শুনতে পাও? যখন সে কথা বলে, তুমি কি তোমার বুক আর মুখে ছাখানি ছোট গোলগাল হাতের ছোঁয়া পাও?

পিয়েরেটে—(উত্তেজিত ভাবে) হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক—ঠিক পাই।

শিল্পী—তা হলে তোমার প্রেম খাঁটিই বটে। কিন্তু পিয়েরের কথায় তোমার মনে এমন কাব্য জেগে ওঠে কেন?

পিয়েরেটে—কারণ—কারণ সে পিয়ের।

শিল্পী—কারণ সে পিয়ের! সেই পুরনো যুক্তি।

পিয়েরেটে—স্বীকার করি, সে একটু ভাবুবিলাসী। কিন্তু তার আত্মাই যে ঐ রকম। আমার স্থির ধারণা, চেষ্টা করলে বড় কাজও সে করতে পারে। তুমি কি তার হাসি দেখেছ? কি সুন্দর সে হাসি। যখন সে আমার দিকে তাকায় না, তখন আমিও মাঝে মাঝে অমনি করে হাসতে চেষ্টা করি—ওরকম হাসিতে আমাকে কেমন মানায়, তা জানতে ইচ্ছে করে। (চিন্তাকুল ভাবে) মাঝে মাঝে মনে হয়, অতের দিকে চেয়ে হাসির মাত্রা কমিয়ে আমার দিকে চেয়ে সে একটু বেশী হাসলে ভাল হ’ত।

শিল্পী—হঁ। তা হলে সে অতের দিকে চেয়েও হাসে?

পিয়েরেটে—এমন একটা দিন কদাচিৎ আসে যেদিন না সে ‘শো’ দেখানোর সময় একজন না একজন অপরাধ নারীর

দেখা পায়। আজও একজনের দেখা সে পেয়েছে—লক্ষ্য তার গড়ন, গোলাপী তার গাল। তারি সন্ধান সে এখন বেরিয়েছে। অবশ্য, মেয়েরা এর জন্ম দায়ী নয়—তারা ওর সঙ্গে প্রেমে না পড়ে থাকতে পারে না। (গর্ভিত ভাবে) আমার মনে হয় সবাই পিয়েরের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে।

শিল্পী—কিন্তু বরো, এই সব অপকৃপ নারীদের কেউ যদি তাকে বিয়ে করতে চায়?

পিয়েরেট—না না, তারা তা করবে না। অপকৃপ নারীরা কখনো গরীব গাইয়েকে বিয়ে করে না। আর পিয়ের যদি কোনও দিন বিয়ে করতে উত্তত হয় তা হলে আমার মনে হয়, আমি—আমি শূন্যে বিলীন হয়ে যাব। দূর ছাই, এসব আমি তোমায় বলছি কেন? মনে হচ্ছে, তুমি যেন আমার অনেক—অনেক দিনের চেনা। (পিয়েরেট সাদা টেবিল-রুখটা মুড়ে রাখছিল। শিল্পী আসন ছেড়ে তার দিকে এগিয়ে গেল।)

শিল্পী—(অত্যন্ত ধীরে ধীরে) বোধ হয়, তুমি আমাকে অনেক, অনেক দিন ধরেই চেনো।

(তার সুরে এমন যমতা আর আন্তরিকতা ফুটে উঠল যে, পিয়েরেট টেবিল-রুখের কথা ভুলে তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। শিল্পী পিয়েরেটের বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে মুহূর্তকাল হাসল। তারপর গালে জিভ দিয়ে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করে চুল্লীর দিকে এগিয়ে গেল।)

পিয়েরেট—(শিল্পীর কোটের পকেট থেকে একটা ছোট ধনুক টেনে বার করে) এটার দিকে চেয়ে দেখ দেখি।

শিল্পী—(চকিত হবার ভান করে) আহা-হা। ওটা তোমাকে দেখাবার ইচ্ছে আমার ছিল না। আমার মনেই ছিল না যে, ওটা আমার পকেটের বাইরে বুলছিল। এক কালে আমার খুব তীর ছোঁড়া অভ্যাস ছিল। আজকাল আর সুযোগ হয় না।

(শিল্পী পিয়েরেটের হাত থেকে ধনুকটা নিয়ে পকেটে রাখলে)

(দূরে পিয়েরেটের গান)

চাঁদের তরে মেয়ে, থাকিস না লো চেয়ে,  
চাঁদ ফেলেছে জাল যে তাহার সাগর-জলে,  
আলোর গানে ভরা যে যায় ধয়ে,  
বিশ্বরণে সুর সে শেখায় গোলাপ-দলে।

শিল্পী—(গানের সুর ক্রমেই কাছে আসতে শুনে ফিস্-ফিস্ করে) ও কে?

পিয়েরেট—পিয়ের।

(জানালায় বাইরে আবার মোচাকার হুপিটি দেখা গেল। পিয়েরেটের প্রবেশ।)

পিয়েরেট—না, কোথাও তার দেখা পেজুম না। (শিল্পীকে দেখে) তুমি কে?

শিল্পী—তোমার কাছে আমি অপরিচিত, কিন্তু পিয়েরেট আমাকে পলকেই চিনেছে।

পিয়েরেট—কোনও পুরনো অগ্নিশিখার মত বোধ হয়?

শিল্পী—সত্যিই আমি পুরনো অগ্নিশিখা। অনেকদিন ধরেই আমি ছুনিয়াটাকে আলোকিত করে রেখেছি। তবে তুমি আমার পুরনো বললেও ছুনিয়ার এমন অনেকে আছে যারা আমার বয়সের অস্থপাতে তরুণ বলেই মনে করে। বলতে পার—আমি কত দিন পৃথিবীতে বিচরণ করছি।

পিয়েরেট—(মেপে দেখবার ভঙ্গীতে হু' হাত ফাঁক করে) এই এত দিন।

শিল্পী—সারা দিন ধরে রক্ত দেখাবার ফলে তোমার শিরায় শিরায় রক্ত জমে গেছে।

পিয়েরেট—তোমার অভদ্র হওয়া অসঙ্গত, পিয়ের।

শিল্পী—(পিয়েরেটের সঙ্গে নিভৃত আলোচনা করার জন্য অবীর হয়ে) পিয়েরেট তোমার রাতের বাক্যের কথা হয়ে গেছে তো?

পিয়েরেট—ঠিক কথা। আমাকে এখনি ছুটতে হবে। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেল বলে। আমি কিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানে থাকবে তো?

শিল্পী—(তাকে ঠেলে ধরার বাইরে পাঠিয়ে) কথা দিতে পারি না, তবে চেষ্টা করব, চেষ্টা করব।

(পিয়েরেট বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ—শিল্পী সকোতুকে পিয়েরটকে দেখতে লাগল।)

শিল্পী—তারপর, বন্ধু পিয়ের? ব্যবসা তেমন জোর চলছে না, এ্যা।

পিয়েরেট—জোর। হাসি যদি ব্যবসা হয় তা হলে জোরই বলতে হবে, কিন্তু তাতে টাকা মেলে না। যা হোক, আজ একটা কাজের মতো কাজ করেছি, এক সম্পাদকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ছাপাবার বন্দোবস্তও করেছি। এতে টাকা আসবে। (গান)

‘আবার আসিযো রে বন্ধু, যখন তমাল বেরা কুটির মোরা গড়ব,  
আসিযো নাকো, বেলাশেষে যখন মোমাছিদের গুণব,  
যখন দীখির জলে ভেকের খেলায় মজব  
যখন শিশির ভেজা শশীর নাচন দেখব।’...

আমি এই গানখানি লিখেছি।

শিল্পী—পিয়ের, ছুনিয়ার সমস্ত ধনরত্ন পেলেও তুমি সখী হতে না।

পিয়েরেট—কি বলছ! হতুম না! ছুনিয়ার সমস্ত ধনরত্ন আমাকে দিয়ে দেখ, দেখ, আমি কি ভাবে ধরচ করি। প্রথমেই স্কল গড়ব, মানুষকে উঁচুদের জিনিষ বুঝতে দেখাব।

শিল্পী—তুমি কেবল যশ ঐশ্বর্য আর ফাঁকা আদর্শের স্বপ্ন দেখছ। ফলে, আসল বস্তু ফেলছ হারিয়ে। তুমি অতৃপ্ত—

কিন্তু কেন? কারণ, কি করে যে সুখী হতে হয়, তা তুমি জান না।

পিয়েরট—(আবৃত্তির সুরে)

জীবনটা যে পাগলা নদী,  
তার তীরে বসে বড়শী বাই;  
কে তুই বাঁধিস রে গান নারীর কেশে?  
এইখানে আজ আয় না ভাই।

(ব্যাক্যার ভঙ্গীতে) এই আর একখানি গান আমি বেঁধেছি। এটি হ'ল দ্বিতীয় চরণ। আমার মাধায় ভাব এমনি ছড়মুড় করেই এসে পড়ে। এছাড়া তৃতীয় চরণটিও বেঁধে গানটিকে শেষ করতে হবে।

শিল্পী—তুমি এমন একখানি গান লেখ না, যার শেষ নেই। অনন্তকাল ধরে থাকে বাড়ানো চলে।

পিয়েরট—দূর! এ অত্যন্ত নিরেট প্রস্তাব।

শিল্পী—নিরেট কিনা, তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কারণ, এই ধরনের গান গাইতে হ'লে শিল্পীকে সব সময়ে খুশী থাকতে হবে।

পিয়েরট। ব্যবসায়ে আর একটু জোয়ার না এলে আমার পক্ষে খুশী হবার উপায় নেই।

শিল্পী—আচ্ছা, তোমার আমার মধ্যে একটু বৈষয়িক আদান-প্রদানে কোনও আপত্তি আছে কি?

পিয়েরট—মোটাই না। তুমি কোন্ সিটের টিকিট কিনতে চাও? সামনের সিটগুলি ডেলভেট মোড়া—বার আনা করে টিকিট। এর পেছনে আছে কাঠের চেয়ার ছ'আনা করে। সব শেষের সিটগুলি ছ'আনা করে। তুমি নিশ্চয়ই বার আনারই একখানা নেবে। ক'খানা টিকিট চাও?

শিল্পী—তুমি বোধ হয় জান না, আমি কে?

পিয়েরট—জানা না জানায় কিছু এসে যায় না। সকলেই 'স্বাগতম'। তুমি যে দয়া করে শো দেখতে এসেছ, তার জন্ত আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শিল্পী—পিয়ের, আমি স্বপ্ন-শিল্পী।

পিয়েরট—কিসের শিল্পী?

শিল্পী—এই ক্লোজড পৃথিবীতে যে সব স্বপ্ন উড়ে বেড়ায়, আমি তা তৈরি করি।

পিয়েরট—দেখ, তুমি একটু জিরিয়ে নাও। মনে হচ্ছে, তুমি বড় নাটুকে হয়ে পড়েছ।

শিল্পী—পিয়ের, পিয়ের, তোমার উচ্চাভিলাষী মন আমার কাছে ধরা দেবে না, জানি। শিশুর মন, সাধারণ মানুষের মন এক নিমেষেই ধরা দেয়। আমি স্বপ্ন তৈরি করি—যে স্বপ্ন ছোট শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়ে মানুষের অন্তরে ঢুকে তাদের পুলকিত করে তোলে। শরৎকালে 'সোয়ালো' পাখীর দল কোথায় উড়ে চলে যায়, তা কি তুমি জানতে চাও নি কোনো

দিন? তারা যায় আমার কর্মশালায়।—সেখানে গিয়ে আমাদের জানায় কারা স্বপ্নের সন্ধান করছে, আর গত বসন্তে তারা যে স্বপ্নসন্তার নিয়ে গিয়েছিল তার বায়নাছাও দাখিল করে।

পিয়েরট—ধাক্কা, তুমি নিশ্চয়ই আমাদের এই আজগুবি কাহিনী বিশ্বাস করাতে চাও না।

শিল্পী—ফুল যখন ধরে পড়ে তখন কি তোমার খোঁজ নেবার ইচ্ছা জাগে নি কোনও দিন, কোথায় হারিয়ে যায় ফুলের রূপবৈচিত্র্য? খোঁজো নি কখনও শীতের দিনে কোথায় বাসা বাঁধে প্রজাপতির দল? আমার কারখানায় শীত খুব বেশী নয়।

পিয়েরট—আমি তোমার কর্মশালায় কথা আগে ভাবি নি।

শিল্পী—আমার কর্মশালা অনেকটা হারানো মালের আপিসের মত—ছানিয়ায় যে সব সুন্দর বস্তু আদর পায় না, তাদেরি ঠাই সেখানে। সেখানে বসেই আমি গড়ে তুলি আমার বিখ্যাত স্বপ্ন—সে স্বপ্নের নাম প্রেম।

পিয়েরট—বাঃ, বাঃ, বেশ বলছ তো তুমি।

শিল্পী—তুমি বুঝি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?

পিয়েরট—কিছু কিছু বিশ্বাস করছি বটে। কিন্তু এরকম স্বপ্ন বেশী দিন বাঁচে না। বাঁচে না, এ বাঁচতে পারে না। আকৃতি এর হয়তো আছে, কিন্তু প্রাণ নেই; অথবা প্রাণ যদি থাকে, তা হলে আকৃতি নেই। নাঃ, বিশ্বাস করতে আমি যথেষ্ট চেষ্টা করছি—কিন্তু এক ধোপেই যে রঙ উঠে যায়।

শিল্পী—তুমি কেবল নকল জিনিষই দেখেছ; দাঁড়াও, আগে আসল বস্তুটাও দেখ।

পিয়েরট—কিন্তু কোন্টা আসল, তা চিনব কি করে?

শিল্পী—ছুরি ছুরি লক্ষণ আছে। যেই তুমি আসল বস্তুটিকে পাবে, অমনি ওড়বার বেগ জাগবে তোমার কাঁধে—এ হ'ল প্রেম-বিচ্ছেদের পক্ষবিস্তার। এর পর তোমার ইচ্ছে হবে তারকাদের মধ্যে উড়ে যেতে, আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে বসতে, চাঁদকে গান শোনাতে। এর কারণ হচ্ছে, একটা বড় চাঁদকে ধিরে আমি আমার স্বপ্ন গড়ে তুলি। একটু একটু করে আমি সেই চাঁদকে গুঁড়ো করে ফেলি—ফের তাকে বড় হয়ে গড়ে উঠতে দি। চাঁদ যে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে তা বোধ হয় তুমি দেখেছ। এক পক্ষকালের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

পিয়েরট—ভারী মজা তো! আচ্ছা, সোয়ালো পাখীরাই কি তোমার সমস্ত স্বপ্ন বয়ে নিয়ে আসে?

শিল্পী—সব সময় নয়। আমার আরও দূত আছে। প্রতি রাতে ঘড়ীতে যেই চারটা বাজে, অমনি পাঞ্জির পাতা থেকে একটা দিন খসে পড়ে। সেই দিন ছুটে যায় অনেক আগের দিনের দেশে—আমার কর্মশালায়। আমি তার



ঠোটে লাগিয়ে দি' একটু টকটকে লাল রঙ, আর পরিয়ে দি তাকে সোনার জরী; তারপর বলি: “ফিরে যাও, হে ক্ষুদ্র গতকল্যা, যাও, হুনিয়ার গিয়ে স্থিতি হয়ে বাস করো।” কিন্তু আমার সেরা স্বপ্ন রাখি আজকের জন্ত। আমি শিশুদের কিনে আনি, তাদের গায়ে জড়িয়ে দি' স্বপ্ন-আঙরাখা, তারপর রাহাখরচ হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দি' অভিযানে সেই চিরাচরিত প্রথায়।

পিয়েরট—আমি আমার সারাজীবন স্বপ্ন দেখে চলেছি। কিন্তু সে সব স্বপ্ন নেহাতই আমার নিজের গড়া। মনে হয়, ঠিকমতো মালমশলা মেশাতে পারি নি।

শিল্পী—তুমি আসল মশলাটাই বাদ দিয়ে এসেছ। তোমার স্বপ্নে যে একটুখানি ছুঁখ মেশানো চাই-ই, নইলে মিশ্রির আধিক্যে মুখ ঝেঁরে আসবে। এ সত্যের খোঁজ আমিও অতি অল্প দিনই পেয়েছি। তাই ত ভোরবেলা যে শিশির মুক্তো গড়ে, আমি তারই কয়েকটি নিয়ে আমার স্বপ্নে ছিটিয়ে দি' অশ্রুর অঞ্জলি।

পিয়েরট—(পরমোন্মাদে) অশ্রুর অঞ্জলি! কি সুন্দর! সত্যি বলছি, একটা স্বপ্ন আমার একবার পরখ ক'রে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে—অবশ্য আমার নিজের গড়া স্বপ্ন নয়।

শিল্পী—অনেক স্বপ্ন আছে; কিন্তু তুমি সত্যি কি পরখ করতে চাও?

পিয়েরট—সত্যিই চাই, কিন্তু ইতস্ততঃ ছড়ানো স্বপ্নের খোঁজ কুরব কি করে?

শিল্পী—আমি এক সময় একটা স্বপ্ন গড়েছিলুম—সেটা ঠিক তোমারই উপযুক্ত। এই স্বপ্নটি আমি একটি শিশুর গায়ে জড়িয়ে দি'। সে আজ বিশ বছর আগের কথা। সেই শিশু আজ পূর্ণযৌবনা তরুণী—বড় বড় নীল চোখ তার—অপূর্ব তার কেশদাম।

পিয়েরট—বলো, বলো, তার কথা বলো;—শুনেও ভুপ্তি পাব।

শিল্পী—বলার চেয়েও বেশী করব। তাকে পৃথিবীতে পাঠাবার সময়ে দাবিনামাখানা আমার কাছেই রেখে দিয়েছিলুম—সেখানা এই—তোমাকে দিয়ে যাব।

পিয়েরট—ধন্যবাদ। কিন্তু, এ নিয়ে আমি কি করব?

শিল্পী—কেন! এর জোরে তুমি তাকে দাবি করতে পারবে। পড়ে দেখ, এতে তার চেহারার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে। ভাগ্যবান তুমি!

পিয়েরট—তার গাল দুটি কি গোলাপি? গলায় কি তার মালা?

শিল্পী—না।

পিয়েরট—তা হলে সে নয়। কোথায় তার সন্ধান পাব?

শিল্পী—তা তোমার নিজেকে খুঁজে নিতে হবে। এখন তোমার একমাত্র কাজ হচ্ছে খোঁজ।

পিয়েরট—আমি এখুনি খুঁজতে বেরব। (যেন খুঁজতে বেরতেই উত্তত হ'ল।)

শিল্পী—আমি হ'লে আজ রাতে বেরতুম না।

পিয়েরট—কিন্তু আমি যে শিগ'গীর তার সন্ধান চাই। আমার আগেই হয়তো অল্প কেউ তার খোঁজ পাবে।

শিল্পী—পিয়ের, কোন এক সময়ে একজন লোক ব্যাঙের ছাতা কুড়ুতে চেয়েছিল।

পিয়েরট—(রসভঙ্গের জন্ত বিরক্ত হয়ে) ব্যাঙের ছাতা!

শিল্পী—পাছে আর সবাই তার আগে ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়ে, এই ভয়ে সে রাত থাকতেই বেরিয়ে পড়েছিল। ভোর যখন হ'ল তখন সে কোথাও ব্যাঙের ছাতা দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে বাড়ীতে ফিরে এল। বাগান থেকে ফিরে সে দেখলে যে তার বাড়ীর দোরগোড়ায়ই এক প্রকাণ্ড ব্যাঙের ছাতা ফুটে আছে।...অভিজ্ঞের উপদেশ নাও, একটু অপেক্ষা করে যাও।

পিয়েরট—এই যদি তোমার উপদেশ হয়...। যাক, ব'ল তো, তোমার কি মনে হয়, যে, আমি তার সন্ধান পাব?

শিল্পী—আমি নিশ্চয় করে' তা বলতে পারি না। তুমি কি নিজেকে বোকা মনে কর?

পিয়েরট—তা, নিশ্চয়ই। তুমি এমন খোলাখুলিভাবে প্রশ্ন করো যে, আমি ভারি বিপদে পড়ি। কিন্তু আমাকে যদি একথা স্বীকার করতে হয়, অবশ্য গোপনে, অবশ্য... (সে ইতস্ততঃ করতে লাগল।)

(প্রসঙ্গ পরিবর্তনের ইচ্ছায়) ঠিক। ঠিক।

পিয়েরট—হাঁ, তবে আশ্বপ্রশংসা করছি বটে।

শিল্পী—যা বলেছ। এখানেই তো তোমার আসল বিপদ। যখন তুমি তারার পানে চেয়ে চেয়ে হাঁটো, তখন ছোট্ট জোনাকিটি তোমার পায়ের চাপে মারা পড়তে পারে তো? আমি তোমার গানের তৃতীয় চরণটি বেঁধে দি, কি বলো?

জীবনটারে ডাকে নারী,

মাঝি, তুই রাখিস তোর পেতে কান

নইলে, রাত্রি যখন যাবে চলে

তখন বইবে চোখে বান।

(শিল্পীর দরদমাখানো চিত্তহারা স্বর কিছু আগে পিয়েরটেকে যেমন বেঁধে রেখেছিল, পিয়েরটেকেও তেমনি আটকে রাখলে। তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে এমন সময় জানালার বাইরে একটি লাল-জামা দেখা গেল, বাজার ক'রে ঘরে ঢুকল পিয়েরটে।)

পিয়েরটে—ওঃ, তুমি আছ তা হলে। ভারি আনন্দ হ'ল আমার।

শিল্পী—কিন্তু আমাকে এবার যেতেই হবে। আমাকে অনেক ঘুরতে হয়।

পিয়েরেট—(দরজা আটকে দাঁড়িয়ে) না, এখনি তুমি চলে যেতে পারবে না।

শিল্পী—আমাকে জানালা দিয়ে উড়ে যেতে বাধ্য করো না—অত্যন্ত অগ্নীভিক্রম অবস্থায়ই মানুষ তা করে।

পিয়েরট—(বহুতর ভঙ্গীতে সকৌতুকে)—পিয়েরেট, আমাদের অতিথিকে সম্মান দেখাও। তুমি যার আদর-যত্ন করছ, সে যে কে, তা সামান্যই জানো। শ্রোতে ভেসে যাওয়া অসংখ্য মাছের মতো ছুনিয়ার যে সব স্বপ্ন ভাসছে, তারি স্রষ্টা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। উনি ঠর সেরা সৃষ্টির দাবিনামা আমাকে দিয়েছেন, এখন আমার খোঁজ করতেই যা দেরি। (নিতান্ত অন্তরঙ্গতার সুরে) আহা, যদি জানতুম, কোথায় গেলে খোঁজ পাওয়া যাবে।

শিল্পী—যাবার আগে আমি তোমাদের একটা শ্লোক শুনিতে যাই—

মেয়েরা সব এক একটা পাঠশালা গড়ি

মারুক্ বেত—জনম-বোকা পুরুষদেরে ধরি।

(সে অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথা নোয়ালে। তারপর নিঃশব্দে দ্রুত বেরিয়ে গেল।)

পিয়েরেট—(তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলে)। ইস্! কি তাড়াতাড়িই না চলে গেল। আর ত তাকে দেখা যায় না।

পিয়েরট—অবশেষে আমার আদর্শ জয়যুক্ত হতে চলেছে। একটি চমৎকার বিয়ের আয়োজন হবে;—রূপালী, ঝালর-দেওয়া সাদা জামা থাকবে গায়ে, হাতে থাকবে সোনার মুখ বাঁধানো একগাছি লম্বা ছড়ি। (গান)

তখন আরও যদি খেলি লুকাচুরি,

শিশির ভেজা ঘাসে তোমার চরণ ভিজে

হয়ত জাগবে কাঁপন,

তাই ত আমি ছালিয়ে দিয়ে বটের ঝুড়ি

উত্তাপে তার শুকিয়ে নিতে তুণে নিজে

করব রাগ্রিযাপন।

পিয়েরেট, আমি যেন সত্যিই লাভ করতে চলেছি পুরুষের শাস্ত্র অধিকার অর্থাৎ প্রেম।

পিয়েরেট—আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ শুভ কামনা করি।

পিয়েরট—(ফ্যাপাইবার উচ্ছ্বেসে গান)

আমরা দৌঁছে মিলব স্বপনে,

এই জেনেছি মনে মনে।

বর্ণা আমার গড়বে স্বপন,

স্বপ্ন তোমার গড়বে কানন,

আমার দেখা পাবে তুমি

বর্ণা যখন বইবে,

তোমার দেখা পাব যখন

কানন কথা কইবে।

পিয়েরেট—অনেক টাকা আর করতে হবে আমাদের, যাতে করে সে যা চায় তা তুমি তাকে দিতে পার। যতক্ষণ না আমার পা ভেঙে যাবে, ততক্ষণ আমি নাচব, আর লোকে বিন্মরে চীৎকার করে উঠবে—‘আহা, মেয়েটি যে নাচতে নাচতে মারাই পড়ল।’

পিয়েরট—ঠিক বলেছ তুমি। আমরা দু’জনে একত্রে শো দেখাব। আমাকে এখনি কাগজের জুত প্রবন্ধটা লিখে ফেলতে হবে। (সে দেওয়াল খুলে লেখবার উপকরণাদি বার করলে, তারপর টেবিলের সামনে বসে লিখতে আরম্ভ করলে।) “সম্প্রতি এই শহরে একটি ভ্রাম্যমাণ নাট্যসম্প্রদায় আসিয়াছে। তাহারা গীতিনাট্য ও প্রহসন অভিনয় করে। পিয়েরট তাহার অপূর্ণ নৃত্যগীত দ্বারা দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিতেছে এবং পিয়েরেটের পল্লীনৃত্যে সবাই পুলকিত হইতেছে। পিয়েরেট বিংশতিবর্ষীয় স্কন্দরী অভিনেত্রী। মিলনাস্তক নাটক অভিনয়ে অপূর্ণ তাহার দক্ষতা। তাহার কেশদাম....” কোন্ রঙ?

পিয়েরেট—স্কন্দর, পরিপূর্ণ স্কন্দর।

পিয়েরট—কি অদ্ভুত! নিত্য বাকে দেখছি, তার চুলের কি রঙ, তারও খোঁজ রাখি নে। যাক্। (আবার পড়তে লাগল) “তাহার কেশদাম স্কন্দর আর....” চোখ?

পিয়েরেট—নীল, পিয়ের।

পিয়েরট—“কেশদাম স্কন্দর আর চক্ষুস্কন্দর নীলবর্ণ।” স্কন্দর। নীল। আহা! না, নিশ্চয়ই এ সব বাজে।

পিয়েরেট—কি বাজে?

পিয়েরট—আমি একটা বিষয় চিন্তা করছিলাম। প্রায় সব মেয়েরই চুল স্কন্দর আর চোখ নীল।

পিয়েরেট—সত্যিই পিয়ের, আমরা, সবাই তো আর কিছু অপূর্ণ হতে পারি না।

পিয়েরট—তোমার কণ্ঠস্বর কি মধুর! না, আমি এর কিছু বুঝতে পারছি নে। নিশ্চয়ই এসব বাজে। (সে তার পকেট থেকে দাবিনামাখানা বার করে পড়তে লাগল।)

পিয়েরেট—কি সব বাজে? পিয়ের, আমাকে কি বলবে না?

পিয়েরট—পিয়েরেট, একটু আলোর নীচে গিয়ে দাঁড়াও।

পিয়েরেট—কেন? কি হয়েছে?

পিয়েরট—মনে হচ্ছে, হয় নি কিছু। (দাবিনামা পাঠ ও পিয়েরেটকে নিরীক্ষণ) “যে চোখ বলে, ‘আমি ভালবাসি,’ যে বাহুযুগল বলে, ‘আমি তোমাকে চাই,’ যে অধর বলে, ‘কেন দেবে না?...’ পিয়েরেট, একি সম্ভব? তুমি যে এত স্কন্দর তা তো আগে চেয়ে দেখিনি। তোমাকে

আর একটুও আগের মত মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, তোমার আসল মুখখানি যেন হারিয়ে ফেলেছে; গোলাপের পাপড়ি হিঁড়ে যেন তোমার নতুন মুখখানি তৈরি করা হয়েছে।

পিয়েরেটে—এসব কি, পিয়ের?

পিয়েরট—প্রেম। শেষ পর্যন্ত আমি খুঁজে পেয়েছি।

তুমি কি বুঝতে পারছ না?

‘বোকার মত ঘুরতে ছিলাম গোলকধাঁধার পিছে পিছে, প্রিয়ে, তোমার পাঠশালাতে পাঠ না নিলে জীবন হ’ত মিছে।’ ...ভাবলেও অবাক হই যে, রোজ তোমাকে দেখেছি, অথচ তোমাকে ঘিরে গড়ে ওঠে নি আমার কোনও স্বপ্ন—স্বপ্নই বটে। আঃ, সত্যিই এ সেই সুন্দর স্বপ্নমালার একটি। তাই তো মনে হচ্ছে, যেন ভোরের আলোয় আমার অন্তর ভরে উঠেছে।

পিয়েরেটে—আঃ, পিয়ের।

পিয়েরট—উঃ, আমার কাঁধে কি ওড়বার গতিবেগই না জেগেছে। আমি উড়ে যেতে চাই উড়ে—বহ উড়ে। তুমি কি চাও না আকাশের গায়ে হেলান দিতে? তারকাদের গান শোনাতে?

পিয়েরেটে—আমি যে বহ দিন ধরেই আমার প্রিয়তমের

অপেক্ষায় তাঁদের রাজ্যে বাস করছি। পিয়ের, আমাকে তোমার হাসি উপভোগ করতে দাও। এক চুমুতে তোমার হাসিটুকু চেলে দাও আমার মুখে।

(ছ’জনে পিছনে ছ’হাত বাড়িয়ে সামনে খুঁকে পড়ে পরস্পরের ঠোটে ঠোট আটকে রাখল)

পিয়েরেটে—(মাথা সরিয়ে নিয়ে পরম শান্তির নিশ্বাস ফেলে) ওঃ, কি সুখীই না আজ হয়েছি। আজই যদি সব-কিছুর অবসান হয়ে যেত।

পিয়েরট—এস, আমরা আগুনের কাছে বসে উত্তনের পিঠে পা রাখি। এর পর থেকে আমাদের জীবনে বিরাজ করুক চির শান্তি। (তারা আগুনের কাছে গিয়ে বসল। পিয়েরট মুহুঃ মুহুঃ গাইতে লাগল)

চাঁদের তরে মেয়ে, থাকিস না লো চেয়ে—

অনেক বৈকে পথ গেছে ঐ স্বর্গলোকে,  
আলোয় ভরা গানে ভরা জৈষ্ঠ আসে ধৈর্যে—  
চুম দিয়ে যায়, চুম দিয়ে যায় তোমার চোখে।

[চিম্নীর গায়ে ঝোলানো লঠনের তেল শেষ হয়ে গেছে; শিখাটা তখনো পুড়ছে লাল হয়ে, আর তারি আভা পড়েছে ছ’জনের মুখে। ধীরে ধীরে নেমে আসছে যবনিকা।]

## তিরুমঙ্গই আলোয়ার

### ত্রীনীগোপাল চক্রবর্তী

আলোয়ার অথবা মরমী (Mystic) বৈষ্ণবগণ খ্রীষ্টীয় সপ্তম এবং নবম শতকের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন। তামিল ভাষায় আলোয়ার শব্দের অর্থ—সেই সাধকস্বন্দ ধাঁহার ভগবৎপ্রেমের পূত মন্দাকিনীধারায় স্নাত হইয়া পরম পুরুষ সচ্চিদানন্দের স্বরূপ চিনিতে পারিয়া ধৃত হইয়াছেন। পাণ্ডিচ ভোগৈশ্বৰ্যে আকৃষ্ট ভ্রান্ত নরনারীকে মুক্তির পথ নির্দেশ করিয়া, অমৃতের আশ্বাদের সন্ধান দিয়া—ভক্তিরসাস্রক চারি হাজার থেবারম্ (তামিল শব্দ) ইহার রচনা করেন। উপনিষদ এবং গীতার সরল ভাষা রূপান্তরে এই সমস্ত থেবারমে স্থান পাইয়াছে। রাম কৃষ্ণ বিষ্ণু নারায়ণ নরসিংহ ইত্যাদি ভগবানের বিভিন্ন মূর্তির উদ্দেশে এই সমস্ত শোভা রচিত হইয়াছে। ভারতের এক শত আটটি বৈষ্ণব মন্দিরে উক্ত বিগ্রহগুলি প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ-ভারতে ত্রীরঙ্গম্ ত্রীবৈকুণ্ঠম্ ত্রিবিম্বিত্র তিরুঙ্গতি কৃষ্ণকোন্ম প্রভৃতি তীর্থ বৈষ্ণবগণের প্রধান উপাসনা-কেন্দ্র। বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ মতে ভগবান বিষ্ণু দ্বাদশ জন আলোয়ারের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হন।

আলোয়ারগণ প্রপত্তিমার্গের উপাসক ছিলেন। ব্রহ্মপদে পূর্ণ আত্মসমর্পণকে প্রপত্তি বা শরণাগতি বলে। প্রপত্তিমার্গের ছয়টি অংশ—(১) ‘আত্মকুল্যস্ত সংকল্পঃ’—ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্তই ব্রহ্মের অংশ, এই বিশ্বাসে অল্পপ্রাণিত সার্বজনীন শ্রদ্ধা ও প্রেম। (২) ‘প্রাতিকুল্যস্ত বর্জনম্’—হিংসা দ্বেষ পরনিন্দা প্রভৃতি ধর্ম-বিরুদ্ধ কার্যের বর্জন। (৩) ‘রক্ষিত্ব ইতি বিশ্বাসঃ’—ঈশ্বরই একমাত্র ত্রাণকর্তা বলিয়া ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস। (৪) ‘গোপ্ত্ব বরণ’—ভগবান পরম করুণাময় হইলেও প্রার্থনা ব্যতীত তাঁহার করুণাকণা লাভ করা যায় না—এই বিশ্বাস। (৫) ‘কার্পণ্যম্’—স্বীয় স্বাতন্ত্র্য ও অহংভাবের পরিপূর্ণ বর্জন। (৬) ‘আত্ম-নির্দোষঃ’—ব্রহ্মপদে আত্মসমর্পণ। এই সমস্ত আলোয়ারের অধ্যাত্মরাজ্যের ভাবধারা থেবারমগুলিতে প্রাণবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরম ভক্ত এবং মনীষী ত্রীনন্দ মুনি এই সমস্ত থেবারম সংগ্রহ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। এই প্রপত্তিমার্গ আচার্য রামানুজের বিশিষ্টা দ্বৈতবাদের জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির ভিতর দিয়া বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে চিৎলপুট জিলায় রামানুজ জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় চোলরাজ অধিরাজেন্দ্রের রাজত্বকাল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে রামানুজ খ্রীরঙ্গম মন্দিরে অবস্থান করিয়া স্বীয় ধর্মমত প্রচার করেন। পুণ্যতোয়া কাবেরী নদী দ্বিধাবিভক্ত হইয়া মেথলাঙ্গুপে মন্দিরটিকে বেষ্টিত করিয়া আছে। মন্দিরে খ্রীরঙ্গরাজ (বিশ্ব) অধিষ্ঠিত। বিগ্রহের আদিমূর্তি ক্ষীরোদসমুদ্রশায়ী ভগবান; অনন্তশয্যায় ইনি শয়ন করিয়া আছেন। বিগ্রহের নাভিমূল হইতে উৎপন্ন পদ্মে ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। ত্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী পদসেবায় নিরত। বিশ্বরূপ অপর একটি মূর্তি আছে—এই মূর্তিটি বিশেষ আড়ম্বরের সহিত নিত্য পূজিত হইয়া থাকে। আচার্য রামানুজের সাধনক্ষেত্র বলিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট খ্রীরঙ্গম অতি পবিত্র তীর্থস্থান। প্রতি বৈষ্ণবপর্ব উপলক্ষে সাধক এবং উপাসকগণ এখানে সমবেত হইয়া থাকেন। দক্ষিণাপথের সাধকপ্রবর তিরুমঙ্গাই আলোয়ার কতৃক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিরুমঙ্গাই আলোয়ার চোলদেশের অন্তর্গত থিরুক্কুরিয়ালোর নামক স্থানে এক শৈব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে ইনি শূদ্র ছিলেন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম নীল। তাঁহার পিতা এক জন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি যুদ্ধবিজ্ঞান সর্বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। সেই সময় ধর্মবিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। অস্বাভাবিক এবং সমর-কৌশলে তিনি বিশেষ নিপুণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। চোলরাজ তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করেন। তিনিও সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়া যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সন্তুষ্ট হইয়া চোলরাজ তাঁহাকে কিছু ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেন। কিছুদিন পরে তিনি চোলরাজের বিরুদ্ধে অগ্রদারণ করেন। মদগর্বে ক্ষীণ সেনাপতি নীল রাজ্যের সর্বত্র অবাধ লুণ্ঠনকার্যে ব্রতী হন। কিন্তু তিনি চোলরাজকে নিয়মিত কর প্রদান করিতেন।

এই সময় তিরুবলী নামক স্থানে কুমুদলী নামে এক ধর্ম-পরায়ণা কুমারী বাস করিতেন। তাঁহার জীবন-কাহিনী সর্বিশেষ কিছুই জানা যায় না। এক পরম বৈষ্ণব কতৃক তিনি লালিত পালিত হন। তিরুবলী মন্দিরে অধিষ্ঠিত বিগ্রহের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। এই মন্দিরে নারায়ণ-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। কুমুদলী অপরূপ সৌন্দর্যময়ী ছিলেন। রমণীকুলমুগ্ধমণি কুমুদলীর পাণিগ্রহণেচ্ছুক বহু রাজকুমার নিয়ত তাঁহার নিকট উপনীত হইতেন। কিন্তু কেহই এই কুমারীর হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইলেন না। সেনাপতি নীল শীঘ্রই তাঁহার অপার্থিব সৌন্দর্যের কথা শুনিতে পাইলেন। তাঁহার চিত্তচাক্ষু্য উপস্থিত হইল। এই কুমারীর প্রতি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে তাঁহার

হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অবিলম্বে তিনি কুমুদলীর পালক-পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তদীয় কন্যার পাণিপ্রার্থী হইলেন। পিতা কন্যার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক-যুবতী মুখোমুখি দাঁড়াইয়া—এই সময় ভগবান পুষ্পধরা অলঙ্কো-উভয়ের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তরুণী দেখিলেন—তাঁহার সম্মুখে একান্ত বাহিত দাঁড়াইয়া যুহু যুহু হাসিতেছেন। সে হাসিতে যেন স্বর্গীয় সুখমা বরিয়া পড়িতেছে। কুমারী আশ্চর্যম্বিত হইলেন। আর সেনাপতি নীল অস্থম্বব করিলেন যেন এক মহীয়সী দেবীমূর্তি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি যেন বাহজ্ঞান হারায়া ফেলিলেন। নয়ন ভরিয়া তিনি এ রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। সেনাপতি নীল দেখিলেন—কুমুদলীর দেহমুনা যৌবনের নিরুপম সৌন্দর্যে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। প্রেমের আবেশে তাঁহার মনপ্রাণ আত্ম উন্মুগ্ন হইয়া উঠিল, তিনি কুমুদলীর জন্ত পাগল হইয়া উঠিলেন। কুমুদলী বলিলেন—‘ভদ্র, একমাত্র পরম বৈষ্ণব ব্যতীত কেহ আমার পাণিগ্রহণ করতে পারবেন না। কারণ আমার সমস্ত দেহমন বিশ্ব-ভক্তকে সমর্পণ করে নারায়ণ-সেবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করাই আমার একমাত্র কাম্য।’ ‘দেবি, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।’—এই বলিয়া নীল তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কালবিলম্ব না করিয়া তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষা লইয়া তিনি প্রেমাস্পদার নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, ‘দেবি, আশা করি এবার তুমি আমাকে গ্রহণ করবে।’ কুমুদলী যুহু হাসিয়া উত্তর করিলেন—‘ভদ্র, আপনার এ বাহিক দীক্ষা কিছুই নয়। আপনি প্রতিদিন এক হাজার আট জন বৈষ্ণবকে আহার্য প্রদান করে তাদের সেবাপূজা করবেন এবং তাঁদের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ আমায় এনে দেবেন। এ ব্রত আপনাকে এক বছর ধরে পালন করতে হবে।’

—‘তথাস্তু।’

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর অতিবাহিত হইল। নীল কুমুদলীর নির্দেশ প্রতিপালন করিলেন। কুমুদলী সানন্দে নীলকে পতিরূপে বরণ করিলেন।

সেনাপতি নীলের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। প্রতিদিন বৈষ্ণবগণের সেবাপূজার ভিতর দিয়া তাঁহার মনপ্রাণ পরমপিতা জগদীশ্বরের দর্শনমানসে অশান্ত হইয়া উঠিল। নীল বুঝিতে পারিলেন তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য বৈষ্ণব-গণের পদরেণুগুণ্ড তুল্য নহে। তাই তিনি সাধনী পত্নীর পূর্ব-নির্দেশমত প্রতিদিন এক হাজার হরিভক্তের সেবাপূজায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। এইভাবে তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য নিঃশেষ হইয়া গেল। তিনি কপর্দকহীন হইয়া পড়িলেন। সর্বলের মধ্যে রহিল শুধু রাজকর বাবদ দেয় অর্থ। কিন্তু তিনি কি তাঁহার এই মহান ব্রত হইতে বিরত হইতে পারেন! বরং

নিজে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন তবু নরনারায়ণের সেবারত হইতে বিচ্যুত হইবেন না এই তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প। ভগবানে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়া তিনি রাজ্যের ব্যয় করিলেন।

প্রাপ্ত বটনার কয়েক মাস পর নীলের নিকট হইতে রাজ্য পাইতে বিলম্ব দেখিয়া চোলরাজ ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলেন। নীলের সেবারতের কথা অতিরঞ্জিত ভাবে রাজার নিকট পৌঁছিল। প্রথম হইতেই তিনি নীলের আচরণে মর্ম-জ্বালায় জ্বলিতেছিলেন। তাই কালবিলম্ব না করিয়া নীলকে বন্দী করিয়া আনিতে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। বীরের ছায় নীল রাজসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। নীলের কল্লার বাহিনীর নিকট রাজসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। দারুণ অপমানে চোলরাজ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া স্বয়ং এক বিরাট বাহিনী লইয়া নীলকে শাস্তি দিতে চলিলেন। নির্ভীক নীল রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। চোলরাজ তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইলেন, বলিলেন—

—‘কেন তুমি রাজ্য দেওয়া বন্ধ করেছ ?

—‘বৈষ্ণবগণের সেবায় ঐ অর্থ ব্যয় করেছি ; আমার মনে হয় এতে অর্থের সদ্যবহারই হয়েছে। রাজ্যকোষে অর্থ প্রেরণ করলে তা শুধু আপনার অত্যাগ্র ভোগের সামগ্রী সংগ্রহেই সাহায্য করত। জনসাধারণের কোন উপকারে আসত বলে মনে হয় না।’

—বেশ, তোমার উত্তরে আনন্দ লাভ করলাম। তোমার সমস্ত অপরাধ আমি ক্ষমা করতে রাজী আছি যদি তুমি পুনরায় সেনাপতির পদ গ্রহণ করে আমার অধীনে কাজ কর। কিন্তু যে পর্যন্ত না তুমি আমার প্রাপ্য রাজ্য দিচ্ছ—সে পর্যন্ত তুমি আমার বন্দী থাকবে।

নীল কারাগারে বন্দীজীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সত্যং শিবং হৃদয়মের পূজারী নীল। তিনি কি জীবনের ক্ষণিক ছুঃখকষ্টে ভ্রিয়মাণ হইয়া তাঁহার লক্ষ্য শ্রেয়কে ত্যাগ করিবেন ? তাহা হইলে তাঁহার জীবনের সাধনাই তো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া যাইবে। চিরহৃদয়কে লাভ করিবার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে, তাহা ক্ষুরধার দুর্গম—‘দুর্গং পথন্তং কবয়ো বদন্তি’। রুদ্ধ কারাগৃহে ভক্ত নীল আত্মল প্রাণে ভগবানের চরণে প্রাণের আকুতি নিবেদন করিতে লাগিলেন—‘প্রভো ! তোমার ভক্তগণের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ ভিন্ন অজ্ঞ খাণ্ড আমি স্পর্শ করি না। বৈষ্ণবদের অভুক্ত রেখে কোন্ প্রাণে আমি এখানে আহ্বার করব ! অনশনে বরং প্রাণত্যাগ করব তবু ব্রত ভঙ্গ করতে পারব না। দয়াময় প্রভো ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।’ ভক্তশ্রেষ্ঠ নীল অনশনে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এক দিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্নচ্ছলে

ভগবানের প্রত্যাশে পাইলেন। কাকীপুরের অন্তর্গত বেগ-বতী নদীগর্ভ হইতে ভগবান তাঁহাকে গুপ্তধন গ্রহণ করিতে বলিলেন। ভগবানের অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া তিনি আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাতে তিনি রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, কাকীপুর গিয়া তিনি রাজ্য পরিশোধ করিবেন। চোলরাজ তাঁহাকে সশস্ত্র রক্ষীবর্গের তত্ত্বাবধানে কাকী পাঠাইলেন। কাকীর বরদারাজ তাঁহার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সেখানে গুপ্তধন উদ্ধার করিয়া তিনি চোলরাজের রাজ্য হৃদে আসলে পরিশোধ করিলেন। এই অলৌকিক ব্যাপারে চোলরাজ ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন—সেনাপতি নীল সাধারণ ব্যক্তি নহেন। তিনি একজন মহাপুরুষ। ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা তাঁহার সমস্ত কার্যের পিছনে রহিয়াছে। তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, অল্পশোচনায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তোপায় হইয়া তিনি নীলের চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন এবং বারংবার ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেন। ভক্তপ্রবর নীল প্রদীপ হাতে তাঁহার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিলেন। চোলরাজ নীলকে রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন এবং তদীয় পুণ্য কৃত্যের জন্ত প্রভূত অর্থ রাজ্যকোষ হইতে প্রদান করিলেন।

নীল পুনরায় পূর্ণোত্তমে বৈষ্ণব সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। বৈষ্ণবগণের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বর্ধিত হইল। পুনরায় তিনি নিঃশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বৈষ্ণব-সেবা যাহাতে বন্ধ না হয় তজ্জন্ত কুমুদলী তাঁহাকে একান্ত ভাবে অনুরোধ করিলেন। নীল উপায়ান্তর না দেখিয়া ধনিক সম্প্রদায়ের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতে মনস্থ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি বিরাট সংঘ প্রতিষ্ঠা করিলেন। লুণ্ঠন করিয়া যে ধনরত্ন সংগৃহীত হইত তাহা হইতে তিনি এক কপর্দকও নিজের ভোগের জন্ত গ্রহণ করিতেন না। সমস্ত অর্থই তিনি ভক্তগণের সেবায় ব্যয় করিতেন।

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। এক দিন লক্ষ্মী আর নারায়ণ ছদ্মবেশে নীলের নিকট উপনীত হইলেন। বনপথে নীল সদলবলে উদ্গীৰ্ণ হইয়া পথচারীদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সহসা এক ধনিকের ছদ্মবেশে সস্ত্রীক নারায়ণ সেখানে উপস্থিত হইলেন। দম্যদল চারিদিক হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ছদ্মবেশী নারায়ণ তাঁহা-দিগকে জানাইলেন যে, তিনি তিরুবলীতে বাস করেন। তিনি জ্ঞাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি আরও বলিলেন—দম্যতা পাপ। ব্রাহ্মণের কথায় নীল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—‘ঠাকুরমশাই, আমরা যা করি সেটা মোটেই

দক্ষ্যবৃত্তি নহে; আমরা ধনীর ধনরত্ন লুণ্ঠন করি দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্ত। অক্ষরন্ত ধনরত্ন আপনার অধিকারে—তা শুধু আপনার এবং আপনার পরিবারবর্গের ভোগে ব্যয়িত হয়ে থাকে। সাধারণের কোনই উপকার হয় না। আপনার সঞ্চিত অর্থ জনসাধারণের উপকারে এলে তার সদ্যবহারই হবে। সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে সঙ্গে যা-কিছু আছে দিয়ে দিন।’ ছদ্মবেশী নারায়ণ তখন সমস্ত ধনরত্ন ও জীর গায়ের অলঙ্কাররাশি দক্ষ্যকরে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহার অমূল্য-বর্গের মধ্যে কেহই সতুল্য দ্রব্যের পোটলাটি উঠাইতে পারিল না। নীল সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু পোটলাটি একচুলও নড়িল না। ব্রাহ্মণ উহা মন্ত্রপূত করিয়াছেন; সুতরাং মন্ত্রটি শিখাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে যাইতে দেওয়া হইবে না বলিয়া নীল মত প্রকাশ করিলেন। ছদ্মবেশী নারায়ণ যুদ্ধ হাসিয়া নীলের কানে কানে বলিলেন—‘ও নমো নারায়ণায়।’ সঙ্গে সঙ্গে নীলের সমস্ত শরীরে এক অপরূপ পুলকশিহরণের সঞ্চার হইল। তিনি অভিভূতের ছায় পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—ও নমো নারায়ণায়। ভাবাবেশে তিনি বিহ্বল হইলেন।

এদিকে সমস্ত ধনরত্নসহ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী চক্ষুর নিমেষে অদৃষ্ট হইলেন। নীল দেখিতে পাইলেন সমস্ত বনভূমি আলোকিত করিয়া গরুড়-আরোহণে লক্ষ্মী-নারায়ণ আকাশ-পথে চলিয়াছেন। তখন তাঁহার বৃত্তিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহার চির আরাধ্য দেবতা নারায়ণ আজ তাঁহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছিলেন। অল্পশোচনার তাঁহার সমস্ত অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। ভক্তের মনোভাব ভগবানের অগোচর রহিল না। অকস্মাৎ নীলের কানে আকাশবাণী ভাসিয়া আসিল—‘প্রিয় ভক্ত তিরুমঙ্গই, তোমার কৃত কর্মের জন্ত অযথা নিজেকে দোষী করো না। তুমি শ্রীরঙ্গমে গিয়া দেব-দেউল নির্মাণ কর। সেখানে আমার মূর্তি স্থাপন করে সেবাপূজার ব্যবস্থা এবং আমার মহিমা সাধারণে প্রচার কর। তা হলেই তোমার জীবনের ব্রত উদ্ঘাটিত হবে।’ এই ঘটনার পর হইতেই নীলের জীবনে পুতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। শ্রীরঙ্গম মন্দির-নির্মাণ-কার্যে বহু অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু নীল তখন কপর্দকশূন্য। উপায়ান্তরবিহীন হইয়া তিনি নেপাণতমে অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দির আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করেন। মন্দিরের সুবর্ণ-নির্মিত বুদ্ধ-মূর্তি দ্বারা নীল আরক্ত কার্য সমাধা করেন।

তিরুমঙ্গই আলোয়ারের (নীল) কতিপয় কবিতার বিচ্ছিন্ন অংশ কাঞ্চীতে পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কবিতা হইতে অধ্যাপক কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার প্রমাণ করিয়াছেন, তিরুমঙ্গই

আলোয়ার খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীরঙ্গম মন্দির নির্মাণ এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-কার্য সুচারু ভাবে সম্পন্ন হইল। এই সময় পরম যোগী এবং সিদ্ধ নাম্মালোয়ার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীরঙ্গমে আগমন করেন। তিরুমঙ্গই আলোয়ার তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তিনি অশেষ মনোযোগের সহিত এই মরমী সিদ্ধপুরুষের ধর্ম-ব্যাখ্যান শ্রবণ করেন। অতঃপর তিরুমঙ্গই তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বহু তীর্থ-পরিভ্রমণ করেন। শৈবাচার্য্য শ্রীজ্ঞান সধ্বর তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। শৈবাচার্য্য তাঁহার অধ্যায়-সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হন। তিরুমঙ্গই আলোয়ার এক হাজার খেবারম্ (তামিল স্তোত্র) রচনা করেন। সমস্ত খেবারম্ তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীরঙ্গরাজের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এই খেবারম্গুলি ‘পেরিয়া থিরুমোলি’ নামে অভিহিত। বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ ‘দিব্য প্রবন্ধমে’ তাঁহার রচিত অধিকাংশ শব্দ স্থান পাইয়াছে। তাঁহার রচনায় বহু কিশ্বদন্তী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শব্দগুলি সহজ সরল অথচ ভাবমাধুর্য্যে অতুলনীয়। দাঙ্গ ভাবে তিনি ভগবানকে আরাধনা করিয়াছেন। নিজেই তিনি পরম পুরুষের পদে সম্পূর্ণ ভাবে উৎসৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন।

রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। সেই পার্থিব প্রেম ভগবৎ প্রেমে রূপায়িত হইয়া ভগবানকে পাইবার জন্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল। তাঁহার মতে ভগবদারাধনায় বাহ আড়ম্বর কিছুই নহে, একমাত্র ভগবানের নামই সার। সচ্চিদানন্দের করুণাকণা লাভ করিতে হইলে নির্মল-চিত্তে পরম পিতাকে স্মরণ মনন করাই যথেষ্ট। ভাগবতে ভক্তির নয় প্রকার লক্ষণের উল্লেখ আছে—শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পদসেবন অর্চনা বন্দনা দাঙ্গ সখ্য এবং আত্মনিবেদন। তিরুমঙ্গই আলোয়ার দাঙ্গ এবং আত্মনিবেদনের (আত্ম-নিষ্কপঃ) ভাবে উদ্ভূত হইয়া ভগবানের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রেম-ধর্মের কণা স্মরণ করিলে এমাসনের উক্তি মনে পড়ে—“When it breathes through man’s intellect, it is genius. When it breathes through his will, it is virtue. When it flows through his affection, it is love.”

তিরুমঙ্গই আলোয়ার এবং তদীয় সহধর্মিণী কুম্বল্লীর পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় নাই। কারণ প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী ইহাদের শেষ জীবন সম্বন্ধে নীরব। প্রাচীন ভারতের বিস্তৃতপ্রায় ধর্মগুরুদের জীবনের তথ্যসংগ্রহ বিষয়ে দেশবাসীর অবহিত হওয়া অত্যাবশ্যক।



# মুদ্রামূল্যাবনতি

শ্রীবিমলাকান্ত সরকার

কিছুকাল হইতে মুদ্রামূল্যাবনতির (Devaluation) কথা শোনা যাইতেছে। সম্প্রতি ক্রমশে মুদ্রামূল্যাবনতি হইয়াছে। ইংলণ্ডেও হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল এবং অনেক প্রধান দেশে যে ইহার আশঙ্কা একেবারে নাই তাহা বলা যায় না।

সাধারণতঃ দেশে যে টাকা চলিত থাকে তাহা কোনও ধাতুর সহিত জড়িত। এই ধাতুর মূল্যের বাহাতে বেশী হ্রাস বৃদ্ধি না হয় তাহা লক্ষ্য রাখিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'সোনা'র কথা ধরা যাক। ইহা অধিকাংশ দেশে চলিত মুদ্রা। সোনার মূল্য নানা কারণ বশতঃ (যেমন শিল্পাদির জন্ত নিয়মিত চাহিদা এবং আহরিত প্রভূত ভাণ্ডার হেতু) অপেক্ষাকৃত স্থির। সোনার মূল্য ধাতু হিসাবে অর্থাৎ ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন অনুসারে বাজারে যে রূপ কেনাবেচা হয়—মুদ্রা হিসাবেও সেইরূপ হইবার কথা। মুদ্রা তৈয়ারী করিতে অর্থাৎ ছাপ ইত্যাদি দিবার জন্ত যাহা খরচ হয় তাহার হিসাব কেবল ধরিয়া লইতে হয়। ইংলণ্ডে 'সভরেন' ১১৩০০১৬ গ্রেন সোনা দিয়া তৈয়ারী হইত; আমেরিকাতে 'ডলার' ২৩২২ গ্রেন সোনা দিয়া তৈয়ারী হইত। ঐ ঐ পরিমাণ সোনার মূল্য বাজারেও ঐ দরে চলিত হইবার কথা—কেবলমাত্র খরচার জন্ত 'Brassage' মূল্যের তফাৎ হইতে পারিত।

আমেরিকার বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আরডিং ফিশার ঠিক করিয়াছিলেন যে সাধারণতঃ—যেমন মুদ্রার পরিমাণ (ওজন) আমরা হ্রাস বৃদ্ধি করি না অপর পক্ষে জিনিষপত্রের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি সহিয়া যায় অর্থনৈতিক স্থৈর্যের (stability) জন্ত জিনিষপত্রের দাম মুদ্রার পরিমাণ অনুযায়ী কমি বেশী না হইয়া সেই পরিমাণে মুদ্রার ওজনের বেশী কমি করা দরকার। জিনিষপত্রের দাম সাধারণতঃ যদি শতকরা ১০% কমে তাহা হইলে মুদ্রার ওজন ১০% কমাইতে হইবে, জিনিষপত্রের দাম যদি ১০% বাড়ে তাহা হইলে মুদ্রার ওজনও সেই পরিমাণে বাড়াইতে হইবে। এক ক্ষেত্রে মুদ্রার সংখ্যা (Quantity) বাড়িবে, অপর ক্ষেত্রে তাহা কমিবে। ধরা যাক আমেরিকায় ১০% জিনিষপত্রের দাম কমিল তাহা হইলে পূর্বের আমেরিকার ডলার অনুসারে তাহার ওজন ২৩২২ গ্রেন কমাইতে হইত এবং মুদ্রার পরিমাণও সেই অনুসারে বাড়িত।

অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক সূত্রানুসারে উহাকেই মুদ্রামূল্যাবনতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু আর এক অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়। যখন দেশে মুদ্রাক্রীতি খুব হয়—মুদ্রার মূল্য খুবই কমিয়া যায়—তখন স্বর্ণমান (বা কোনও ধাতু মান) পুনঃ

প্রতিষ্ঠিত করা দরকার হইয়া থাকে। নতুবা কি বৈদেশিক বাণিজ্যে অথবা কি স্বদেশীয় চুক্তিমূলক বা অল্প রূপ আদান প্রদানে ভীষণ বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য ও স্বদেশীয়—সামাজিক সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার জন্ত স্বর্ণমান সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে মুদ্রামূল্যাবনতি দরকার হয়। ক্রমশে ও ইউরোপীয় কোনও কোনও দেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দেখা গেল সেখানকার মুদ্রার মূল্য খুবই কম হইয়া গিয়াছে। তখন বহুদেশে স্বর্ণের ওজন মুদ্রাতে সেই পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইল। সম্প্রতি ক্রমশে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্ত মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হইল এবং অবাধ স্বর্ণপ্রচলন ও স্বর্ণ মুদ্রণের ব্যবস্থার কথায় মনে হয় স্বর্ণমানও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে।

এইরূপ কেন করা হয় তাহার অন্তর্নিহিত অর্থ জানিতে হইলে মুদ্রার বিষয়ে অনেক কথা জানা দরকার। বহু প্রাচীন প্রথা অনুসারে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলনের বিষয় প্রথমেই বলা হইয়াছে। এই প্রথা ঠিক মত রাখিতে হইলে সকল রকমের মুদ্রার পরিমাণ নিয়মিত ও বিধিবদ্ধ করা দরকার। এখন প্রায় সকল দেশেই ব্যাঙ্কে যে সকল চলতি (Deposits) হিসাব থাকে এবং ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া 'নোট' (Notes) যাহা টাকা হিসাবে বাহির করা হয়—তাহাও মুদ্রারই রূপান্তর। নোট ভাঙাইয়া মুদ্রা সকল সময়ই পাওয়া যায়। যদি নোট প্রচুর পরিমাণে বাহির করা হয় তাহা হইলে সাধারণতঃ মোটামুটি হিসাব অনুসারে 'টাকার' সংখ্যা বেশী হইল স্ততরাং জিনিষের মূল্য বাড়িল। তাহা হইলে 'সোনা'র মূল্যও সেই অনুসারে বাড়িল। অর্থাৎ মুদ্রা হিসাবে 'সোনা'র মূল্যও 'জিনিষ' হিসাবে 'সোনা'র মূল্য তফাৎ হইল। 'জিনিষ' হিসাবে 'সোনা'র মূল্য বেশী হইলে যে সমস্ত মুদ্রা সোনার থাকিবে তাহা লোকে গলাইয়া ফেলিয়া 'জিনিষ' হিসাবে বিক্রয় করিয়া ফেলিবে অর্থাৎ তখন স্বর্ণমান আর থাকিবে না।\* সেইজন্ত এখন প্রায় সকল রকমের স্বর্ণমান বিধিবদ্ধ বা নিয়মিত হইয়া থাকে যাহাতে মুদ্রার মূল্য ও মুদ্রার ধাতুর মূল্য একই হয়। এই যে বিধিবদ্ধ মুদ্রামান তাহার উদ্দেশ্য কি—বৈজ্ঞানিকভাবে জানা দরকার। যদিও সাধারণতঃ—প্রতীয়মান হইতে না পারে, কিন্তু সামাজিক কল্যাণের জন্য মুদ্রামান বাহাতে দেশের (বাধিক) আর ঠিক-

\* দেশের জিনিষের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় আমদানী বেশী হওয়া সম্ভব এবং তাহার মূল্য দিবার জন্য 'সোনা' পাঠাইতে হওয়ায় দেশ হইতে 'সোনা' চলিয়া যাইতে পারে।

মত উপাদানে, বিভাজনে ও হিতসাধনে প্রয়োজিত হয় তাহা দেখা দরকার। এখন মনে হইতে পারে যে মুদ্রামানের দ্বারা তাহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

বিভূত ভাবে ইহার আলোচনা না করিয়া দুই-একটা উদাহরণ দ্বারা ইহার অর্থ সম্যক প্রকাশ করা যাইতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি নানাপ্রকারের হইতে পারে। সাধারণতঃ জিনিষের মূল্য যখন সাধারণ ভাবে বাড়িয়া যায় তখনই আমরা মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছে বলিয়া থাকি। যখন এইরূপ অবস্থা হয় তখন সাধারণতঃ দরিদ্র ও বৃত্তিভোগীদের ধন ধনীদেব নিকট ও কর্মীদের (active classes) নিকট পক্ষান্তরিত হইয়া থাকে। ধনীরা 'জিনিষ'-পত্র তৈয়ারী করাইয়া থাকেন, তাহার মূল্য বেশী হওয়ায় আরও প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী করিবার চেষ্টা ও ইচ্ছা হয়—এই 'জিনিষ'-পত্রগুলি (consumption articles), সাধারণ লোকে কিনিয়া থাকে, তাহাদের আয়, মাহিনা ইত্যাদি সেই পরিমাণে বাড়ে না, সুতরাং পূর্বাপেক্ষা আয়ের বেশী অংশ খরচ করিতে হয়; ফলে ধনীরা লাভবান হয় এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুদ্রামানের দ্বারা সামাজিক কল্যাণ যাহাতে সাধিত হয় সেইটাই সমাজের বেশী দেখা দরকার ইহাই এখনকার মত। যখন সমাজ-কল্যাণও সাধিত হয় এবং মুদ্রামূল্যের স্বৈর্য্যও থাকে তখন সকল দিকেই সুবিধা কিন্তু দুইটির মধ্যে কোন্টি পছন্দ করা উচিত এই লইয়া যখন সমস্তা উদ্ভূত হয় তখন মুদ্রামূল্যের স্বৈর্য্য অপেক্ষা সমাজ হিতসাধনই বেশী প্রয়োজনীয় ধরা হয়। এই রকম বিবেচনা করিবার নানারূপ ক্ষেত্র উপস্থিত হইতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আমরা যেরূপ স্বৈর্য্যের কথা বলিলাম ঐরূপই হইয়া থাকিত। কিন্তু ক্রমশঃ অধিকাংশ দেশেই মুদ্রাস্ফীতি বা অল্প নানাকারণ উপস্থিত হওয়ায় সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ মুদ্রামানের ক্ষেত্র তৈয়ারী হইল। সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ মুদ্রামান অনুসারে কোনও ধাতব মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণ 'কাগজ টাকা' (ব্যাঙ্ক-এর আমানত টাকা ও নোট প্রভৃতি) দ্বারা সমস্ত কার্যাদি হইয়া থাকে, অবশ্য 'মুদ্রার' নামটি পূর্বের স্থায় রাখিয়া দেওয়া হয় (Money of account)। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেট ব্রিটেনে ধাতবমুদ্রা রহিত করিয়া দেওয়া হয় কিন্তু 'মুদ্রার' নাম 'পাউন্ড-স্টার্লিং' রাখিয়া দেওয়া হইল। ১৯৩৫ সালে যে সমস্ত দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল তাহার স্বর্ণমুদ্রার মূল্য ঠিক রাখিবার চেষ্টায় দেখিলেন ১৯২৬ সালে জিনিষপত্রের বাহা দাম ছিল তাহা অপেক্ষা প্রায় শতকরা ৫ ভাগ জিনিষপত্রের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। মোটামুটি হিসাবে ধরা যায়—সম্ভবতঃ জিনিষপত্রের উপাদান খুব বেশী হইয়াছিল অপর পক্ষে উপার্জন বা ব্যক্তিগত

আয় সমষ্টি অথবা মুদ্রার পরিমাণ, সেইরূপ ভাবে বাড়ান সম্ভব হয় নাই। অপর পক্ষে গ্রেটব্রিটেন স্বর্ণমুদ্রার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করার কেবল 'কাগজ-টাকা'র দ্বারা ব্যবস্থা করায় সেখানে জিনিষপত্রের দাম বেশ বাড়িয়া গিয়াছিল। আমেরিকাতে ক্রমশঃ অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। সেখানেও দেখা গেল জিনিষপত্রের দাম কমিয়া যাইতেছে। 'সোনা'র দাম জিনিষ-হিসাবে যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে মুদ্রা হিসাবে তাহার চাহিদা বেশী হইবে, যথেষ্ট সরবরাহ হইলে মোটের উপর ঠিক অবস্থা হইয়া যাইবে। কিন্তু 'সোনা'র যদি যথেষ্ট সরবরাহ না হয়—এবং যে পরিমাণ 'টাকা' দরকার তাহা না পাওয়া যায়—তাহা হইলে আপনাপনি টাকার এই মূল্য নিরূপণ ব্যবস্থা বাতিল হইয়া যায়। সেখানেও (আমেরিকাতেও) ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে স্বর্ণমান ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল এবং 'কাগজ-টাকার' উপর নির্ভর করার জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া গেল। এইরূপ অবস্থা কিন্তু বেশী দিন রাখা হইল না—১৯৩৪ সালে একটি আইন করা হইল। এই আইন অনুসারে 'ডলার'-এর ওজন কমাইয়া দেওয়া হইল। পূর্বে ১ আউন্স সোনা ২৫ ডলার হইত, এই আইনে ৩৫ ডলার হইল; পূর্বে ১ ডলারে ২৫.৮ গ্রেন\* সোনা থাকিত, এখন সেখানে ১৫.২৩ গ্রেন সোনা দেওয়া হইল। 'মুদ্রার' মূল্য কমিল সোনার মূল্য বাড়িল। বাহিরের সাধারণ মূল্যের সহিত 'মুদ্রার' মূল্যের সামঞ্জস্য করা হইল। মুদ্রার ওজনের ও মূল্যের অবনতি হইল। সাধারণ স্বর্ণমান হইতে ইহা অনেকটা পৃথক। ইহাকে বলা হয় Gold value standard অথবা স্বর্ণমূল্যানুযায়ী মান।

ফ্রান্সে যে মুদ্রামূল্যাবনতি হইল তাহা জানিতে হইলে আরও কিছু বলিতে হইবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সুইডেনের অধ্যাপক ক্যাসেল আন্তর্জাতিক মুদ্রাবিনিময় দর সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য প্রকাশ করেন। ইহার পূর্বে এই দর সম্বন্ধে বিশেষ কঠিন কিছু সমস্তা ছিল না। ইংলেণ্ডে একটি 'সভারেন'-এ ১১৩.০০১৬ গ্রেন সোনা থাকিত; আমেরিকাতে একটি ডলারে ২৩.২২ গ্রেন সোনা থাকিত সুতরাং একটি ডলারের সহিত সভারেনের  $\frac{২৩.২২}{১১৩.০০}$  ১৬ বিনিময়মূল্য ছিল। অর্থাৎ ১ পাউন্ড স্টার্লিং-এ ৪.৮৬৬৫৬ 'ডলার' পাওয়া যাইত। সেই অনুসারে জিনিষ-পত্র দুই দেশে কেনাবেচা চলিত, কেবল সোনা পাঠাইবার খরচের জঙ্ক সামান্য দরের কম বেশী হইতে পারিত। বিধিবদ্ধ মুদ্রামান হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে স্বর্ণমুদ্রার সহিত দেশের চলিত মুদ্রার কোনও সম্বন্ধ না থাকিতে পারিত। এই বিধিবদ্ধ মুদ্রামান অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশের জিনিষপত্রের মূল্যের সহিত জড়িত থাকিত।

\* ২৩.২২ গ্রেন খাঁটি সোনার সমান।

ইহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইলে আরও সুবিধা হইবে। সাধারণ জিনিষপত্রের দাম কমিল না বাড়িল জানিবার নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে। এখন মোটের উপর Index number (weighted) অর্থাৎ শতকরা সাধারণ জিনিষপত্রের দরকার অনুসারে দাম কম-বেশী নিরূপণ উপায়টি ঠিক বলিয়া ধরা হয়। ডাল, চাল, আটা প্রভৃতি দ্রব্য সাধারণ লোকেরা ক্রয় করিয়া থাকে—এখন বিলাসদ্রব্যও অনেকে ক্রয় করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং বিলাসদ্রব্য যেখানে ১, অত্যন্ত দ্রব্য সেখানে ২ ধরা যাইতে পারে।

১৯২৬ সালে এইরূপ ভাবে ধরিয়া সাধারণ জিনিষপত্রের মূল্য ১০০ ধরা যাউক। ১৯৪৮ সালে এরূপ ভাবে দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করিয়া যদি দেখা যায় তাহা ১২৫ হইয়াছে তখন বলা যাইতে পারে সাধারণ দ্রব্যের মূল্য ২৫ ভাগ, অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা  $\frac{১}{৪}$  বাড়িয়াছে।

অধ্যাপক ক্যাসল বলেন যে দেশে-যেদ্রব্যের সাধারণ মূল্য বাড়িবে কমিবে পূর্বের তুলনামূলক বিদেশীয় মুদ্রা-বিনিময় হার সেইরূপ ভাবে কম-বেশী হইবে। ১৯১৪ সালে দ্রব্যের মূল্য যদি ১০০ ছিল ১৯২০ সালে আমেরিকায় তাহা

২২৬, গ্রেটব্রিটেনে ২৮২ এবং ১৯২৪ সালে আমেরিকায় তাহা ১৪৯ ও গ্রেট ব্রিটেনে তাহা ১৬৬ হইল। আমরা পূর্বে বলিয়াছি ১ পাউণ্ড ষ্টার্লিং সমান প্রায় ৪'৮৬...ডলার ছিল। এই নিয়ম অনুসারে তাহা হইলে ১৯২০ সালে ১ পাউণ্ড ষ্টার্লিং =  $৪'৮৬ \times ২২৬$  অর্থাৎ সম্ভবতঃ প্রায় ৩'৯...ডলার এবং ১৯২৪ সালে তাহা  $৪'৮৬ \times ১৬৬$  অর্থাৎ প্রায় সম্ভবতঃ ৪'৬৬...ডলার হইবে। অনেকে বলেন সাধারণতঃ এই নিয়মটিই প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে দেখা গিয়াছিল মুদ্রা-বিনিময় হার একটু তফাৎ হইয়াছিল। তাহার কারণ ধরা হয় যে অনেক ক্ষেত্রে অবাধ দ্রব্য-বিনিময় হয় না, quota system হইয়া থাকে এবং অবাধ দ্রব্য বহন করায় খরচ বেশী পড়িয়া যায়।

যেখানে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে সেখানে স্বর্ণ দ্বারা মুদ্রা বিনিময় হার মোটের উপর বহাল থাকে। ধরা যাউক, আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে বেশী মাল রপ্তানী হইল। তাহা হইলে আমেরিকাতে ইংলণ্ড হইতে বেশী “মূল্য” দিতে হইবে। ইংলণ্ডের মুদ্রা আমেরিকায় প্রচলিত নয়, সুতরাং স্বর্ণ পাঠাইতে হয়। যদি স্বর্ণ পাঠাইবার দরকার হয় তাহা হইলে ডলার পাউণ্ড হারে স্বর্ণ পাঠাইবার খরচ পর্যন্ত তফাৎ হইতে পারে।

| ১<br>জিনিষ বার্ষিক তুলনামূলক<br>খরচ সংখ্যা<br>(লক্ষ পাউণ্ড) | ২<br>সাধারণ<br>Index Number                    | Weighted Index Number<br>প্রয়োজন মত তুলনামূলক<br>শতৈকিক সংখ্যা                                          | মন্তব্য :—<br>সাধারণ শতৈকিক সংখ্যা<br>অনুসারে ১৯৪৮ সালে<br>প্রায় ৪ গুণ বাড়িল কিন্তু<br>প্রয়োজন ও সরবরাহমূলক<br>তুলনায় প্রায় ৫ গুণ<br>বাড়িল। দাম ইত্যাদি<br>এখানে প্রায়ই কাল্পনিক।<br>সুবিধার জন্য বাহাই<br>জিনিষের পাইকারী দর<br>অথবা জীবিকা নির্বাহের<br>জিনিষের শতৈকিক সংখ্যা<br>ধরা হয়। |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| গম ৬০ ৫                                                     | ১৯১৪ শতৈকিক ১৯৪৮ শতৈকিক<br>সংখ্যা সংখ্যা       | ১৯১৪এ মূল্য ১৯৪৮এ মূল্য ও<br>ও শতৈকিক প্রয়োজন অনু-<br>সংখ্যা (প্রয়ো- সারে শতৈকিক<br>জন অনুসারে) সংখ্যা |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| বালি ৩০ ৫                                                   | চাউল ৪ ১০০ ১৫ $\frac{১৫}{৪} \times ১০০$        | চাউল—                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| মাংস ১০০ ১০                                                 | (মণ) = ৩৭৫                                     | ৪ $\times$ ৪০ কোটি ১৫ $\times$ ৪৫                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ছক্ক প্রভৃতি ৬০ ৭২                                          | ডাল ৫ ১০০ ২০ ... ৪০০                           | মণ কোটি মণ                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ...                                                         | (মণ)                                           | = ১৬০ কোটি টাকা ১০০ $\times$ $\frac{৬৪৫}{১৬০}$                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ...                                                         | শতৈকিক                                         | ১০০ = ৪০৩                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| মোট ১০০                                                     | সংখ্যা = $\frac{২০০}{২} \dots = \frac{৭৭৫}{২}$ | ডাল—                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | ১৯১৪ = ১০০ ১৯৪৮ = ৩৮৭                          | ৫ $\times$ ৮ কোটি ২০ $\times$ ১২                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | মন্তব্য :—৩ নং কলামে                           | মণ কোটি মণ                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | শতৈকিক সংখ্যা $\frac{২০০}{২}$                  | = ৪০কোটি টাকা ১০০ $\times$ $\frac{২৪০}{৪০}$                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | = ১০০ না ধরিয়া                                | ১০০ = ৬০০                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | ১নং ‘কলামে’র নিয়ম অনুসারে                     | শতৈকিক সংখ্যা                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | ভাগ করা যায়।                                  | ১৯১৪ = $\frac{২০০}{২}$ ১৯৪৮ = $\frac{১০০৩}{২}$                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             |                                                | = ১০০ = ৫০০                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

১ পাউণ্ড ৪'৮৬ ডলার ছিল। 'ডলারের চাহিদার দরুন তাহা (পাউণ্ড) ৪'৬৭ ডলারে দাঁড়াইতে পারিত। তদপেক্ষা বেশী তফাৎ হইলে ইংলণ্ড হইতে "সোনা" পাঠাইবার ধরচ পোষাইয়া যাইত। যতক্ষণ পর্যন্ত "সোনা" পাঠান দরকার না হয় ব্যাঙ্কগুলি যোগান দিয়া থাকেন—সেইজন্ত মুদ্রা বিনিময় হার তফাৎ হয়। "সোনা" পাঠাইয়া দেনা পরিশোধ করিতে হইলে—মোটামুটি হিসাবে আমেরিকার জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যাইত এবং ক্রমশঃ রপ্তানী কমিয়া যাইত—অর্থাৎ তাহার ঋণী মুদ্রা বিনিময় হার বজায় থাকিত।

এখন বিধিবদ্ধ মুদ্রামানে এইরূপ স্বতঃই হার ঠিক করিবার কিছু উপায় রহিল না। সোনার অপব্যবহার দূর করিবার জন্ত অনেক দিন হইতে নানা উপায় উদ্ভাবন করা হইতেছিল। তাহার মধ্যে 'Gold exchange managment' একটি। ধরা যাইক ক দেশ খ দেশকে জিনিষপত্র বেশী পাঠাইতেছে। তাহা হইলে খ দেশ হইতে ক দেশে সোনা পাঠাইতে হইত। এই উপায়ে খ দেশ ক দেশে তাহার নানারূপ গবর্ণমেন্ট বা কোম্পানীর কাগজ (Securities) কিনিয়া রাখিয়া দিল। তাহাতে খ স্তর ইত্যাদি পাইতে লাগিল এবং ক দেশে জিনিষের মূল্যের দরুন সোনা না পাঠাইয়া ঐ কাগজ হস্তান্তরিত করিতে লাগিল। ক দেশ যদি তাহাতে আপত্তি না করে তাহা হইলে সোনা না পাঠাইয়া আমদানী-রপ্তানী করার কোনও আপত্তি থাকে না। অনেক দেশই যদি এইরূপ সোনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চায় তাহা হইলে সকলের আমদানী-রপ্তানীর ব্যবস্থা করার জন্ত একটি সর্বাধীনীয় ব্যাঙ্ক (International Bank)\* থাকা দরকার। তাহাতে স্ব স্ব দেশের নামে বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেন্টের কাগজ (Government Paper and Securities) কেনা থাকিলে স্বর্গমান না থাকিলেও আমদানী-রপ্তানীর মূল্য দেওয়ার অন্তর্বিধা হয় না। এইরূপ চেষ্টা আগে হইয়াছিল। কিন্তু কয়েকটি কারণে ইহা ভাঙিয়া যায়। বিশেষতঃ ১৯২৮ সালে ক্রাশ সোনা ছাড়া আর কিছু লইতে চায় নাই। সেইজন্ত ইহারই রূপান্তর আর একটি ব্যবস্থা করা হইল। 'Sterling Area' বলিয়া কয়েকটি দেশের সমষ্টিগত একটি বাণিজ্যস্থান ঠিক হইল। গ্রেট ব্রিটেনের সাম্রাজ্য

মধ্যে যতগুলি দেশ আছে সেইগুলি—কানাডা ছাড়া—এবং পোর্টগাল, নরওয়ে, সুইডেন, জাপান, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি কয়েকটি দেশ এই ব্যবস্থাতে যোগ দিল (১৯৩১)। পাউণ্ড-ষ্টার্লিং ঐ সময় স্বর্গমান বিবজ্জিত হইল এবং বিধিবদ্ধ মুদ্রামানে পর্যাবসিত হইল। অত্যাচ্ছ দেশগুলি যাহারা ইহার সহিত যোগ দিল তাহারও সোনার সহিত সম্পর্ক রাখিল না গ্রেট-ব্রিটেনে ষ্টার্লিং গবর্ণমেন্ট কাগজ ইত্যাদি কিনিয়া রাখিল এবং পরস্পরের আমদানী-রপ্তানীর দাম কাটাকাটি করিয়া ঐ কাগজ দিয়া শোধ করিতে আরম্ভ করিল।

এই রকম অবস্থাতেও যেরূপ মুদ্রা-বিনিময় হারের কথা বলা হইল সেইরূপ হার কার্যকরী হইতে পারে। ইহা স্বর্গমানের জায় স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ কোনও দেশের হার তাহার অনুকূল হইলে ক্রমশঃ সে দেশের দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়া যাইবে এবং ঐ হার আর অনুকূল না হইয়া প্রতিকূলগামী হইয়া পূর্বহারে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু যখন কোনও দেশের মুদ্রামূল্য খুবই কমিয়া যায় এবং তাহার বিনিময় হার ঠিক রাখিবার জন্ত যে কাগজ-টাকা বা সোনা রাখা দরকার তাহা না থাকে তখন এই বিনিময় হারের কোনও বাধ্যবাধকতা থাকে না এবং কপিধরজবিহীন পার্থক্যের মধ্যে যথেষ্ট ছুটিয়া চলে এবং কোনও মানাই মানে না। বলা বাহুল্য এ ক্ষেত্রে অন্তর্জাতীয় কাজকর্ম বা আমদানী রপ্তানী করা অতীব দুঃস্থ হইয়া দাঁড়ায়।

সুতরাং স্বর্গমান বা বিধিবদ্ধ স্বর্গমান স্থির করা ছাড়া গতান্তর থাকে না। স্বর্গমান ঠিক করিতে হইলে পুরানো দর ঠিক রাখার চেষ্টা রাখা হইয়া থাকে। গ্রেট ব্রিটেন ও অত্যাচ্ছ অনেক দেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সম্ভব হয় নাই। মুদ্রার মূল্য খুবই কমিয়া যাওয়ায় মাহিনা ও অত্যাচ্ছ চুক্তিমূলক দেনা খুবই বেশী দরে স্থির হইয়া গিয়াছিল। ধরা যাক ১৯১৪ সালে যে মজুর দৈনিক ১ শিলিং লইত ১৯২৬ সালে সে হয়ত ২ শিলিং পাইত। ১৯২৫ সালে যদি চেষ্টা করা যায় যে শিলিঙের মূল্য পূর্বের জায় হইবে তাহা হইলে মজুরকেও ১ শিলিং লইতে হইত। কিন্তু তাহা কি হঠাৎ সম্ভব? সুতরাং স্বর্গমানও বজায় রহিল, দেশের জিনিষপত্রের মূল্য ও মাহিনা ইত্যাদিও কমিল না, এইরূপ ব্যবস্থা মুদ্রামূল্যাবনতি দ্বারা করা হইয়া থাকে। মধ্য ইউরোপে মুদ্রামূল্যাবনতি অনেক দেশ করিয়াছিলেন। ইহাতে মুদ্রার পরিমাণ বাড়ান হইল না কিন্তু মুদ্রার ওজন যে পরিমাণে মুদ্রার মূল্য হ্রাস হইয়াছিল সেই পরিমাণে করা হইল। তাহা হইলে সোনার মূল্য বাহিরে অর্থাৎ ব্যবহার্য দ্রব্য হিসাবে খুবই বেশী হইয়া গিয়াছিল এখন মুদ্রা হিসাবেও বেশী হইয়া গেল এবং তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করার অন্তর্বিধা হইল। সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় হারও স্থিরীকৃত হইল, সেই

\* ১৯৪৭ সালের মার্চ মাস হইতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার (International Monetary Fund) নামে একটি প্রতিষ্ঠান কার্য আরম্ভ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কও (International Bank for Reconstruction and Development) গঠিত হইয়াছে। প্রথমটি 'টাকা' আগাম দেওয়া ইত্যাদি ব্যাঙ্কের জায় কতকগুলি কার্য করিতে পারিবে।

অনুসারে আমদানী রপ্তানী করায় কোনও বাধা রহিল না। বর্তমানে ফ্রাঙ্কের কথা ধরা যাউক, নূতন যে আইন হইল তাহাতে ২১৪.৪ ফ্রাঙ্ক এক ডলারের সমান ধরা হইয়াছে, আগে ১১৯ ফ্রাঙ্ক এক ডলারের সমান ধরা হইয়াছিল।\*

এখন প্রশ্ন হইতে পারে মুদ্রাস্ফীতির সময়ও মুদ্রামূল্যাবনতি করা হয় এবং মুদ্রাসঙ্কটের সময়ও (Deflation) মুদ্রামূল্যাবনতি করা হয়—তাহা কিরূপে সম্ভব? উত্তর হইতেছে যে মুদ্রাসঙ্কটের সময় যে মুদ্রার মূল্যের অবনতি করা হয় তাহা একটি আদর্শের জ্ঞাত। তখন সমাজের অবস্থার অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক সামঞ্জস্য

\* যদিও আগে বলা হইয়াছে যে সম্ভবতঃ স্বর্ণমানে কিরিয়া যাইবার জন্ত এইরূপ মুদ্রামূল্যাবনতির চেষ্টা করা হইয়াছে তথাপি আমার ধারণা বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময়ের হারের হ্রাসের জন্তও এইরূপ করা সম্ভব হইতে পারে। যেখানে কেবল বিধিবদ্ধ মুদ্রামান প্রচলিত সেখানে যদি কোনও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক থাকে অথবা পূর্বে কল্পিত ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে মুদ্রাবিনিময়ের হার সাধারণ মূল্যের আপেক্ষিক সঙ্কটের উপর নির্ভর করিতে পারে (relative price level) কিন্তু হার ঠিক রাখিবার জন্ত যথেষ্ট কাগজ-পত্র বা “টাকা” না থাকিলে চেষ্টা করা যথেষ্ট বিশেষতঃ মুদ্রামূল্য ক্রমশঃই কমিতে থাকিলে হার যে কোথায় দাঁড়াইবে কেহ বলিতে পারে না। যদি সাধারণ মূল্য (price level) কেবল বদলাইয়া না যায় তাহা হইলে মুদ্রাবিনিময় হারের কিছু ইতরবিশেষ (foreign exchange method) করিলেই মোটের উপর ঠিক হইয়া যায় কিন্তু যেখানে সাধারণ মূল্য কেবলই বদলাইয়া যাইতেছে সেখানে বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় হার আইন দ্বারা ঠিক করিয়া পরে

(equilibrium in social economy) অথবা দেশের আয়ের (বার্ষিক) উৎপাদন, বিভাজন ও হিতসাধনের যাহাতে সম্পূর্ণ উৎকর্ষ হয় তাহার জন্ত সৃষ্টি করা হয়। ইহাতে সোনার মূল্য বৃদ্ধি করা হয়, মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হয় এবং পরিমাণের উন্নতি করা হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় যে মুদ্রার মূল্যের অবনতি করা হয় তাহা সে রকম আদর্শানুযায়ী নহে। যাহা চলিতেছে তাহাই চলুক হঠাৎ সমস্ত গুলি পালট না হইয়া যায় তাহারই জন্ত। এক্ষেত্রে মুদ্রার সংখ্যা অথবা সাধারণ জিনিষপত্রের মূল্যের কোনও কমি বেশী করা হইল না।

সেই অনুসারে মুদ্রাসংখ্যার ব্যবস্থা ব্যাঙ্কের স্বেচ্ছা (Bank rate method) দ্বারা ঠিক করাই সুবিধা। সুতরাং অল্প দেশের মুদ্রার মূল্যের সহিত সঙ্কট রাখিয়া দেশের মুদ্রার মূল্য কমাইলেও তাহাকে মুদ্রামূল্যাবনতি বলা যাইতে পারে।

এই প্রবন্ধটি রচনা করিবার জন্ত নিম্নলিখিত পুস্তকাদির সাহায্য লওয়া হইয়াছে,—

- ক Keynes—Treatise on money.
- খ Bernstein—Money and the Economic System.
- গ Smith—Economics.
- ঘ Taussig—Principles of Economics, vol 1.
- ঙ League of Nations publication—International Currency Experience.
- চ Statesman, Eastern Economist প্রভৃতি সংবাদ-পত্রাদি।
- ছ Bowley—Elements of Statistics.
- জ S. K. Basu.—Recent Banking Developments.

## ভারতে রেশমশিল্প

### শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

গুটীপোকা নামে এক জাতীয় কীটের দেহনির্গত লাল হইতে রেশম পাওয়া যায়। ইহার নিশাচর ‘মথ’। এক একটি ‘মথ’ একবারে হাজার হাজার ডিম্ব প্রসব করে; দশ হইতে বার দিনের মধ্যে ডিম্ব ফাটিয়া শুয়াপোকা বাহির হয়। এই অবস্থায় ইহাদিগকে বলা হয় পলু। এই বাচ্চাগুলি বেজায় পেটুক এবং আস্থানেক ধরিয়ানানা প্রকার বৃক্ষের পাতা আহার করিয়া বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহারা তৎপর খাণ্ড বন্ধ করিয়া মুখ হইতে লাল নিঃসরণপূর্বক নিজ নিজ অঙ্গের চতুর্দিকে যে আবরণের সৃষ্টি করে তাহাকে বলা হয় গুটী। তিন-চারি দিনের মধ্যে এই গুটী একটি পাতি লেবুর আকার

প্রাপ্ত হয়। এই সময় উক্ত কীট গুটীর ভিতরে পলু হইতে পিউপা এবং পিউপা হইতে প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয় এবং গুটীর একটি দিক কাটিয়া বহির্গত হইয়া থাকে। একটি গুটী হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ২০০ হইতে ১,২০০ গজ দীর্ঘ রেশম-সূতা পাওয়া যাইতে পারে। কোন কোন প্রকার রেশম অবিচ্ছিন্ন নহে। উহা হইতে উপযুক্ত যন্ত্র-সাহায্যে তুলা, পাট প্রভৃতির ছায় পিঁজিয়া সূতা বাহির করা হয়।

রেশমশিল্পকে প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারেঃ—প্রথম অংশ হইল, রেশম-গুটী উৎপাদন করা। ডিম্ব হইতে সূত্রে ও সবল কীট উৎপাদনপূর্বক উপযুক্ত খাণ্ড-

দানে তাঁহাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া গুটী তৈয়ারী করা পর্যন্ত এই অংশের অন্তর্ভুক্ত। এই গুটীগুলি ক্রয় করিয়া গুটী হইতে সূতা বাহির করা, সূতাকাটা যন্ত্রসাহায্যে ধারাপ রেশম (অর্থাৎ যে রেশম অবিচ্ছিন্ন নহে) হইতে সূতাকাটা প্রভৃতি পদ্ধতিগুলি দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। পূর্বে অবশ্য অবিচ্ছিন্ন রেশম ব্যতীত অল্প জাতীয় রেশম বিশেষ কোন কাজে লাগান সম্ভব হইত না, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুলা, পাট প্রভৃতির স্থায় রেশম হইতে সূতা কাটিবার যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় এই ব্যবসায়ের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। রেশম-শিল্পের তৃতীয় অংশ হইল, সূতা হইতে বস্ত্রবয়ন ও অস্ত্রাচ্ছ ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি তৈয়ারী এবং আয়ুষ্মদিক কার্য্যাদি। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, রেশমশিল্পের এই তিনটি বিভিন্ন অংশ, একে অন্নের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পুরনো আমলে এই তিনটি অংশই কুটিরশিল্প হিসাবে একই শ্রেণীর লোকদ্বারা পরিচালিত হইত। রেশম ব্যবসায়ের প্রথম অংশকে বলা হয় সেরিকালচার (sericulture), প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের সম্মিলিত নাম কাঁচা রেশম শিল্প, এবং তিনটি অংশের একত্রিত নাম রেশম-শিল্প।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার কীট কর্তৃক চারি প্রকার রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে :—১। তুঁত রেশম—এক কথায় ইহাকেই রেশম বলা হয়। তুঁত গাছের পাতা খাইয়া এই জাতীয় কীট জীবন ধারণ করে; ২। এঁড়ি রেশম—এই কীটগুলি এরও গাছের পাতা খায়; ৩। মুগা রেশম—এই জাতীয় কীটের খাদ্য হইল শাম ও ছয়ালু গাছের পাতা ৪। তসর রেশম—এই কীট আসান, শাল, অর্জুন ও অস্ত্রাচ্ছ বৃক্ষের পাতা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে।

উপরোক্ত চারি প্রকার রেশমের মধ্যে প্রথম দুই প্রকারের কীটকে সেবায়ত্ন দ্বারা গৃহে প্রতিপালন করা যায়; কিন্তু অল্প দুই প্রকার রেশমকীট বনে জঙ্গলে স্বাধীনভাবে যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সূতরাং দেখা যাইতেছে, ইহার মাত্রার আয়ত্তের বাহিরে এবং এই উপায়ে রেশম যাহা পাওয়া যায় তাহা উন্নত ধরনের নহে। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার রেশম অবিচ্ছিন্ন সূতার আকারে পাওয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার রেশম হইতে যন্ত্রসাহায্যে সূতা কাটা হইয়া থাকে। জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, তুঁত রেশমই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রেশম এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইহার উৎপাদন ইত্যাদি নানা দিক দিয়া যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতিসাধন করাও সম্ভব হইয়াছে। কাজেই জগতের রেশমশিল্পের ব্যবসায়ক্ষেত্রে তুঁত রেশমই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে এবং রেশমশিল্প বলিতে এক কথায় আমরা তুঁত রেশম শিল্পই বুঝিয়া থাকি।

বিভিন্ন প্রকার রেশম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্নভাবে নিয়ে আলোচনা করা হইতেছে।

### তুঁত রেশম

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কম-বেশী তুঁত রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। তবে জাপানই এই শিল্পে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী; ১৯৩৪ সালে বিভিন্ন দেশ হইতে কাঁচা রেশম রপ্তানীর পরিমাণ নিম্নের তালিকা হইতে সুস্পষ্ট হইবে।

| দেশের নাম               | শতকরা পরিমাণ |
|-------------------------|--------------|
| জাপান                   | ৮২.৩         |
| চীন                     | ১১.০         |
| ইটালী                   | ৪.৯          |
| ফ্রান্স                 | ০.১          |
| স্পেন                   | ০.১          |
| তুরস্ক, সিরিয়া প্রভৃতি | ১.৬          |

এই বৎসর ভারতবর্ষে মোট ২,৫০০,০০০ পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা হইতে বিদেশে কিছু রপ্তানী হয় নাই। অথচ ১৮৬০ সালে শুধু বঙ্গদেশ হইতেই প্রায় ১,৬০০,০০০ পাউণ্ড কাঁচা রেশম বিদেশে গিয়াছিল; কিন্তু জগতের রেশমের বাজারে জাপানী রেশমের আবির্ভাবই হইল রেশমশিল্পে বাংলার চরম অবনতির কারণ। অতি অল্পদিনের মধ্যেই অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া জাপান রেশমশিল্প জগতের মধ্যে শীর্ষ স্থান লাভ করিয়াছে। ১৯২২ সনে জাপানে যে কাঁচা রেশম উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার দাম ছিল ১০০,০০০,০০০ ইয়েন (প্রায় ১১০ কোটি টাকা) এবং উৎপন্ন রেশমজাত দ্রব্যের মূল্য ছিল ২০০,০০০,০০০ ইয়েন (৩২.৫ কোটি টাকা)।

প্রগতিশীল এবং আধুনিক বিজ্ঞানে উন্নত কতকগুলি দেশ জাপান হইতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা রেশম ক্রয় করে বলিয়াই জাপান রেশমশিল্পে এতাদৃশ সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯৩৪ সনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জাপানে উৎপন্ন রেশমের প্রায় শতকরা ৮২ ভাগ ক্রয় করিয়াছে, ১৯২৯ সনে কিনিয়াছে শতকরা ৯৭ ভাগ। মাল ক্রয় করিবার পূর্বে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত যন্ত্রাদি সাহায্যে ইহার রেশমের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া থাকে, কাজেই জাপানকে উৎকৃষ্টতর রেশম সরবরাহের জন্য যত্ববান হইতে হয়। রেশমশিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারে নাই বলিয়াই বাংলাদেশ আজ রেশম-শিল্পের চরম অবনতি হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে মহীশূর, মাদ্রাজ, বাংলা, কাশ্মীর ও জম্মু এই কয়টি অঞ্চলই তুঁত রেশমশিল্পে অগ্রণী। পঞ্জাব এবং আসামেও অল্প পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত বিহার, বোম্বাই, রাজপুতানা এবং মধ্যপ্রদেশে রেশম-উৎপাদন প্রচেষ্টা চলিতেছে। এক সময় বাংলার ছাব্বিশটি জেলায়ই গুটীপোকার চাষ হইত কিন্তু ১৯৩০ সনের কাছাকাছি সময়ে মাত্র তিনটি জেলায় অল্প পরিমাণে রেশম উৎপাদন করা হইয়াছে। প্রথম



মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালে মহীশূর রাজ্যে ৫৫,০০০ একর জমিতে তুঁতগাছের চাষ হইত।

আসাম, ব্রহ্মদেশ, ছাম প্রভৃতি স্থানে অতীবহি প্রাচীন পদ্ধতিতে গৃহস্থেরা অল্প পরিমাণে গুটীপোকার চাষ করে এবং গুটী তৈয়ারী হইলে তাহা হইতে সূতা বাহির করিয়া দেশী তাঁতের সাহায্যে এক প্রকার মোটা বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। বাংলা, মহীশূর ও মালদ্বজে সূত্র সূতা কাটিবার যন্ত্রাদি প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, বাংলা তথা ভারতের রেশমী সূতা বা বস্ত্র জাপানের রেশমী সূতা ও কাপড় অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। জাপানে সরকারী পরীক্ষাগারে বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত রেশম-কীটের ডিম্ব সরকার-মনোনীত ব্যক্তিদের কাছে বিক্রয় করা হয়। কারণ রেশমশিল্পের সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে রেশম-কীটের সূত্র ও সবল ডিম্ব উৎপাদনের উপর। জাপানে সরকারী তত্ত্বাবধানে ডিম্ব হইতে মথ উৎপন্ন করা হয় এবং তাহা হইতে যে ডিম্ব পাওয়া যায় তাহাই সাধারণ লোকেরা ক্রয় করিতে পারে। যদি এই ডিম্বগুলি সরকারী পরীক্ষাগারে দোষযুক্ত বলিয়া অমনোনীত হয় তবে তাহা দ্বারা রেশম উৎপাদন করানো আইনসম্মত নহে। জাপানে সরকারী সাহায্য-নিরপেক্ষ ভাবে গুটী উৎপাদন আইন দ্বারা রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জাপান এবং ইটালীতেও বীজকীট উৎপাদন সরকারের তত্ত্বাবধানে হইয়া থাকে। কারণ উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ ডিম্ব হইতেই উৎকৃষ্ট রেশম আশা করা যায়।

গুটী তৈয়ারী হইলে কীটগুলি যথাসময়ে তাহা কাটিয়া বহির্গত হয়; কিন্তু ইহাতে অবিচ্ছিন্ন সূতা পাওয়া যায় না। সেইজন্য কীটগুলিকে, গুটী কাটিয়া বাহির হইবার পূর্বেই অর্থাৎ পিউপা অবস্থায় মারিয়া ফেলা হয়। এই প্রক্রিয়ার নিমিত্ত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রণালী প্রচলিত আছে। তবে বর্তমান কালে প্রায় সর্বত্রই সূর্যের উত্তাপ বা উত্তপ্ত বাষ্প-সাহায্যে দম বন্ধ করিয়া পিউপাগুলিকে ধ্বংস করা হয়। এই কার্য সম্পন্ন করিতে অর্ধ বর্গটী হইতে এক বর্গটী সময় লাগে। মৃত পিউপাগুলি দ্বারা রেশমগুটীর যাচাতে কোন ক্ষতি সাধিত না হয় তজ্জন্ত আট হইতে দশ বর্গটার মধ্যে মধ্যে গুটীসমূহকে উত্তমরূপে শুকাইয়া লইতে হয়। এর পর গুটীগুলিকে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত গুদাম ঘরে জমা করার পর বিভিন্ন ওজনের গুটীসমূহকে পৃথক করিয়া এক এক জায়গায় রাখা হয়। ইহাতে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ধরণের সূতার মধ্যে একটা মোটামুটি পার্থক্য সহজে বুঝা যায়। তৎপর 'রিলিং বেসিন' নামক পাত্রে গুটীগুলি ফুটাইয়া ত্রাশ দ্বারা ধৌতলাইয়া দিতে হয় এবং যে পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সূতা না পাওয়া যায় সেই পর্যন্ত রেশম বাদ দিতে হয়। সূতা জড়ান হইয়া গেলে সূতার গুণাগুণ লক্ষ্য করা অধিকতর সহজ; এক্ষণে জাপানে জড়ান সূতা

পুনরায় জড়াইয়া লওয়া অবশ্যকর্তব্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এখন নাটাই হইতে সূতা বাহির করিয়া অল্প পাক দিয়া ফেটিবদ্ধ করা হয়; প্রতি ফেটিতে প্রায় ২'৪ আউন্স রেশম থাকে, প্রতি বেলে রেশম থাকে ১৩০'৩ পাউন্ড।

ডিম্বের নিমিত্ত যে সমস্ত কীটকে প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হইতে দেওয়া হয় সেই সমস্ত কীটের গুটী, রেশম জড়াইবার সময়ে পরিত্যক্ত অংশ এবং ইঁদুর, পিপীলিকা, পরপিণ্ডোপ-জীবী কীটপতঙ্গাদি কর্তৃক নষ্ট গুটীর রেশমও নানা কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাংলাদেশে তকলী বা টাকুর সাহায্যে এই গুটীগুলি হইতে কিঞ্চিৎ মোটা সূতা তৈয়ারি হইয়া থাকে। এই সমস্ত রেশম হইতে যে বস্ত্র বয়ন করা হয় তাহা আমাদের কাছে মটকা নামে পরিচিত। কাশ্মীর, মহীশূর প্রভৃতি স্থান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উপরোক্ত প্রকারের রেশমগুটী বাংলা-দেশে আমদানী হইয়া থাকে। হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, বাংলাদেশে প্রায় ১৫,০০০ জন জীলোক এই জাতীয় রেশমগুটী হইতে সূতা কাটিয়া থাকে। মহীশূর স্পান্ সিন্ধ মিলস্ লিমিটেড ও জয়া স্পান্ সিন্ধ মিলস্ লিমিটেড যন্ত্রসাহায্যে পরিত্যক্ত রেশমগুটী হইতে সূতা তৈয়ারী করে।

দেখা যাইতেছে, রেশম-শিল্পের প্রথম অংশ বা সেরিকালচার চাষীদের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। তদ্ব্যতীত কাঁচা রেশমগুটীর মূল্য বিশেষ ভাবে উঠা-নামা করে বলিয়া চাষীদের পক্ষে অত্যাধিক কৃষির সঙ্গে রেশমের চাষ করা বিশেষ সুবিধাজনক। ভারতবর্ষের মত গ্রীষ্মপ্রধান সমতল দেশে বৎসরে সাত-আট বার পর্যন্ত রেশমের চাষ করা সম্ভব, কারণ তুঁতগাছ পাতা প্রচুর পরিমাণে থাকিলে একবারের মত রেশমের চাষ করিতে সময় লাগে মাত্র এক হইতে দেড় মাস। গুটী তৈয়ারী হইলে চাষীর সঙ্গে সঙ্গেই উহা বিক্রয় করিয়া দেয়, কাজেই উহার নগদ অর্থ লাভে বঞ্চিত হয় না। তবে শুধু রেশম-চাষের জন্যই রেশমচাষ অনেক দেশেই হইয়া থাকে। বাংলা-দেশে এমন পরিবারও ছিল যাহারা একই সময় প্রায় দুই হাজার পাউন্ড রেশমগুটী উৎপন্ন করিত। প্রমাণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রেশমশিল্পের চরম উন্নতির সময় বাংলাদেশে এইরূপ পরিবার ছিল প্রায় ছয় হাজার। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দেশে যদি গুটী হইতে সূতা বাহির করিবার উন্নত প্রণালীর প্রচলন ও ব্যাপক বন্দোবস্ত না থাকে তবে রেশমকীট ও গুটী উৎপন্ন করা লাভজনক নহে। বাংলার রেশমশিল্পের অবনতির ইহাও একটি কারণ।

রেশমকীটের চাষ করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তন্মধ্যে দেশের আবহাওয়া, কীটের শ্রেণীভেদ, কীটের খাদ্য, দেশের সরকারের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৭০ হইতে ৮০ ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তাপ সকল অবস্থায়ই কীটের পক্ষে বিশেষ অমুকুল। বায়ুমণ্ডলে

জলীয় বাষ্প হ্রাস প্রাপ্ত হইলে তুঁতগাছের পাতা শুষ্ক হইয়া যায়, ফলে কীটের পক্ষে আশাহরূপ খাদ্য পাওয়া কষ্টকর হইয়া ওঠে। অতঃপক্ষে জলীয় বাষ্পের আধিক্য হইলে কীটগুলি খুব মোটা হইয়া যায় এবং রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। সেইজন্য বর্ষা ঋতু কীটের পক্ষে অতি চুঃসময়। বাংলাদেশে অগ্রহায়ণ, কাশ্বিন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসই কীট-উৎপাদনের প্রশস্ত সময়।

রেশমগুটী সাধারণতঃ দুই প্রকার। এক প্রকার কীট বৎসরে একবার ডিম্ব প্রসব করে; ইহাদের বলা হয় ইউনিভোর্ট। দ্বিতীয় প্রকার কীট বৎসরে বহুবার ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে, ইহাদের মাল্টিভোর্ট বলা হয়। দক্ষিণ-চীন, ইন্দোচীন, থাই, আসাম, মালদ্বীপ, বাংলা এবং মহীশূরে মাল্টিভোর্ট কীটের চাষ হয়; কিন্তু জাপানে এবং আমাদের দেশের কাম্বীর, জম্মু, পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে ইউনিভোর্ট কীট উৎপন্ন হইয়া থাকে। একবার প্রসবকারী কীটের রেশম নানা দিক দিয়া বহুবার প্রসবকারী কীটের রেশম অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। আসাম, বাংলা প্রভৃতি স্থানে যে গুটী উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে রেশম থাকে এক হইতে দেড় গ্রেন, কিন্তু জাপানী রেশমের প্রতিট গুটী হইতে রেশম পাওয়া যায় প্রায় ৩ গ্রেনের উপর। তবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইউনিভোর্ট কীটের চাষ ভাল হয় না, হইলেও উহার ক্রমে ক্রমে মাল্টিভোর্ট কীটে পরিবর্তিত হইয়া যায়। আবার শীতপ্রধান দেশে মাল্টিভোর্ট কীটের চাষ করিতে গেলে উহার ইউনিভোর্ট কীটে পরিণত হয়। তবে বর্তমানকালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে এই অনুবিধা অনেকাংশে দূরীভূত হইয়াছে।

জাপানে প্রায় ৪০০ রকমের তুঁতগাছ আছে। উহার মধ্যে মাত্র নয় রকম তুঁতের পাতাই রেশমকীটের আহাৰ্য্য। তুঁত বিরাট আকারে বা ঝোপবদ্ধ অবস্থায় জন্মে। বাংলা, মহীশূর, মালদ্বীপে ঝোপ-আকারে এবং কাম্বীর, জম্মু ও পঞ্জাবে বড় তুঁতগাছ জন্মান হইয়া থাকে। জাপানের অমুকরণে বাংলাদেশে সম্প্রতি বড় ঝোপের আকারে তুঁতগাছ উৎপন্ন করা হইতেছে। ইহাতে খরচ অল্প হয় এবং সময়ও লাগে কম। এক একর জমিতে ৩০০ তুঁতগাছের বড় ঝোপ জন্মাইলে উহা হইতে বৎসরে ১২,০০০ হইতে ১৫,০০০ পাউণ্ড পাতা পাওয়া যায়; উক্ত পরিমাণ ছোট ঝোপ হইতে পাতা মেলে ২০,০০০ হইতে ২৪,০০০ পাউণ্ড। সেরিকালচারে সাফল্য লাভ দেশের সরকারের দায়িত্ববোধের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। জাপান এই বিষয়ে সর্বাগ্রগণ্য। বাংলা ও মহীশূর সরকার এই বিষয়ে জনসাধারণকে যে সাহায্য প্রদান করিতেছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।

রেশম গুটান হইলে উহা বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত গুদাম-ঘরে সঞ্চিত করিয়া রাখা দেশের সরকারের উচিত। কারণ

সাধারণ লোকের নিকট মাল্য খরিদ করিলে ক্রেতাদের প্রতারণিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী এবং ইহাতে ব্যবসায়ের হুনাম হইয়া থাকে, যাহা কোন ব্যবসায়ের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নহে। জাপানে ইয়াকোহামা ও কোবে বন্দরে এতাদৃশ গুদাম অবস্থিত। কলিকাতায়ও এইরূপ গুদামঘর আছে।

দেখা যাইতেছে, সকল দেশে কাঁচা রেশম উৎপন্ন করা সম্ভব নহে বটে, কিন্তু রেশমের চাহিদা সর্বত্রই কম-বেশী বর্তমান। সুতরাং সরকারের আত্মকূল্য লাভ করিলে উপযুক্ত গবেষণার ফলে আমাদের দেশেও রেশমশিল্পের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। জাপান রেশমশিল্পের বিভিন্ন সমস্তার সমাধানের নিমিত্ত গবেষণাদির যে-সকল ব্যবস্থা আছে তাহা অনুকরণীয়। ১৯২৯ সনে জাপানে শুধু রেশমচাষ শিক্ষা দিবার জন্ত ১৬টি স্কুল ও উচ্চতর শিক্ষার জন্ত অনেকগুলি কলেজ বর্তমান ছিল। এতদ্ব্যতীত অত্যন্ত শিক্ষার সঙ্গে ২২৫টি স্কুলে রেশমের চাষ শিক্ষা দেওয়া হইত। টোকিও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি যে গবেষণা-কার্য চালায় তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে যে পরিমাণ কাঁচা রেশম নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় তাহার পরিমাণ গড়ে প্রায় ৪০,০০,০০০ পাউণ্ড, অথচ দেশে উৎপন্ন হয় প্রায় ১,৫০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ২,৫০০,০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত। যে পরিমাণ রেশমজাত দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে আমদানী হয় তাহা ১৯৩৭-৩৮ সালে ছিল প্রায় ৩৬,৩৬৩,০০০ গজ। কাজেই একমাত্র দেশের প্রয়োজন মিটাইবার জন্তই ভারতে রেশমশিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নতির জন্ত মনোযোগী হওয়া উচিত। তবে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত রেশম ব্যবহারের জন্ত বর্তমান যুগে প্রাণিজ রেশম ব্যবহার কিয়ৎ পরিমাণে থর্ক হইয়াছে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে কিন্তু অজ্ঞাবধি কৃত্রিম উপায়ে রেশম উৎপাদনের যজ্ঞাদি স্থাপিত হয় নাই।

#### এঁড়ি-রেশম

আসাম ও বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলেই প্রধানতঃ এঁড়ি রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। এঁড়ি গাছের পাতা খাইয়া এই জাতীয় কীট জীবনধারণ করে বলিয়া এঁড়ি-রেশম এঁড়ি, এঁড়ি প্রভৃতি নামেই সমধিক প্রচলিত। এঁড়ি-রেশমের ব্যবসায় অজ্ঞাবধি কুটর-শিল্পের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে নাই। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই জাতীয় রেশম হইতে অবিচ্ছিন্ন সূতা পাওয়া যায় না। তবে তকলী বা চরকার সাহায্যে যে সূতা পাওয়া যায় তাহা পরিত্যক্ত তুঁত-রেশম হইতে প্রাপ্ত সূতা অপেক্ষা নিষ্কৃষ্টতর। এঁড়ি-রেশম চাষের প্রণালী অনেকটা তুঁত রেশম চাষেরই অমুরূপ।

বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গরিব চাষীরা অল্প পরিমাণে এঁড়ি-রেশমের চাষ করিয়া

থাকে। প্রচুর পরিমাণে রেশম-উৎপাদন প্রচেষ্টা অনেকখানি চলিয়াছে। তবে নানারকম অসুবিধার জন্ত তাহা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। একটি প্রধান কারণ হইল, রেশমশিল্পী উৎপাদনোযোগী যন্ত্রের অভাব। বিদেশী কোম্পানীগুলি গুটী ক্রয় করিবার নিমিত্ত যে মূল্য দিতে স্বীকৃত হয় তাহা অতিশয় নগণ্য। তবে এরূপ চাষের সঙ্গে অল্প পরিমাণে এঁড়ি-রেশম চাষ বেশ লাভজনক বলিয়াই মনে হয়। মাদ্রাজ প্রদেশের চিত্তুর জেলার মাত্র দুইটি গ্রামে ২৫০,০০০ হইতে ৩০০,০০০ একর ক্ষমিতে এরূপ চাষ হয়। এখানে আনুমানিক হিসাবে এঁড়ি রেশমের চাষ চলিয়াছিল, তবে উল্লেখযোগ্য কোন ফল লাভ হয় নাই। কিন্তু মনে হয়, বিশেষ বন্দোবস্ত করিলে এবং সরকারের সাহায্য লাভ করিলে এদেশের এঁড়ি-রেশম-শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কারণ পৃথিবীর অল্প কোন স্থানেই এই জাতীয় রেশমের চাষ হয় না।

#### মুগা-রেশম

অতি প্রাচীনকাল হইতেই আসামের বিভিন্ন জেলায় মুগা-রেশমের চাষ চলিয়া আসিতেছে। তবে কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলায়ই সর্বাপেক্ষা বেশী এবং বৎসরের সকল ঋতুতেই সুস্থভাবে মুগার চাষ হইয়া থাকে। গারো, কাছাড়ী, রাভা প্রভৃতি আসামের বিভিন্ন আদিম অধিবাসিগণই বিশেষভাবে মুগার কীট প্রতিপালন করিয়া থাকে। ডিব্রুগড়, কাটিয়া, শ্রীমঙ্গল, বাঁহির হইলেই সেগুলি শাম, ছায়াগাছে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উহার গাছের পাতা খাইয়া বাড়িতে থাকে। একটি গাছের পাতা শেষ হইলে উহাদের অল্প গাছে আনয়ন করা হয়। চারি হইতে ছয় সপ্তাহের মধ্যেই যখন কীট গুটী তৈয়ারী করিবার উপযুক্ত হয়, তখন উহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া একটু যত্ন লইলেই অল্প-কয়েক দিনের মধ্যে উহার গুটী তৈয়ার করে। গুটীমধ্যস্থিত পিউপাগুলি অগ্নির উত্তাপ দ্বারা মারিয়া ফেলিয়া গুটীগুলি রৌদ্রে শুকান হয়। তৎপূর্ব বিক্রয়ের নিমিত্ত পাঠানো হয়। পলাশবাড়ী এবং তৎপার্ববর্তী স্থানসমূহ মুগা দ্বারা বস্ত্রবয়নশিল্পে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এঁড়ি-রেশমের ছায় মুগার গুটী হইতেও সূতা বাহির করা এবং সূতা হইতে বস্ত্র তৈয়ার করার জন্ত কোন যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হয় না। বৎসরের সকল ঋতুতেই মুগার চাষ চলিতে পারে। মুগার গুটী বাহিরে রপ্তানী হয় না।

মুগার রং স্বর্ণাভ, কাজেই নানাপ্রকার মূল্যবান বস্ত্র বয়নের নিমিত্ত ইহার বিশেষ চাহিদা আছে। তবে মুগার চাষ বিশেষ শ্রমসাধ্য বলিয়া মুগার বস্ত্রাদি দুই মূল্য। কীটগুলি উজ্জ্বল স্থানে বৃক্ষের উপর বদ্ধিত হয়, সুতরাং বাছড়, পিপিলিকা প্রভৃতি তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিতে পারে। ঋতু-

বাদলেও অনেক কীট ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। চীন ও জাপানের কোন কোন অঞ্চলে জুয়ার ছায় এক প্রকার রেশমের চাষ হয়। প্রতি একরে জাপানে প্রায় ছয় হাজার হইতে দশ হাজার গুটী পাওয়া যায়। বিশেষ গবেষণা সহকারে কার্যে প্রয়ুক্ত হইলে আসামে প্রচুর পরিমাণে মুগা উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

#### তসর-রেশম

তসরের কীট মুগার কীট অপেক্ষা আহারে বিহারে অধিকতর যথেষ্টাচারী। রেশম উৎপাদন করিবার অব্যবহিত পূর্বে মুগার কীটকে গৃহে আনয়ন করিয়া যত্ন লওয়া যায়। কিন্তু তসর-কীটের বেলায় তাহা সম্ভব হয় না। ইহার নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে বৃক্ষের উপর বিচরণ করে, ইচ্ছানুযায়ী ভক্ষণ করে এবং সাধ্যানুসারে গুটী উৎপন্ন করে। ফলে রেশম হয় নিকৃষ্ট ধরণের। গুটী তৈয়ারী হইতে সময় লাগে এক হইতে দুই মাস। দশ বৎসর বয়স্ক কোন আশ্রয়-বৃক্ষ প্রায় ৫,০০০ কীটের আহাৰ্য্যের সংস্থান করিতে পারে। কীট ও গুটীগুলি সর্বদা পাহারা দিয়া রক্ষা করিতে হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে তসর-কীট শাল, আসান, অর্জুন প্রভৃতি গাছের পাতা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। এই সমস্ত বৃক্ষ ব্যতীতও সিঁচা, কালচেরী, তাল, ডুমুর, দেশীবাদাম, বহেড়া, মহুয়া, আম প্রভৃতি গাছের পাতাও ইহাদের খাদ্য।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তসর উৎপন্ন হয়। সিংভূম জেলাই তসরের প্রধান উৎপাদন-কেন্দ্র, তবে ছোটনাগপুর উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বাংলা, সংযুক্ত প্রদেশের নানাস্থানেও তসরের চাষ হইয়া থাকে। শুধু বিহারেই বৎসরে গড়ে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার তসর উৎপন্ন হয় এবং ইহার অধিকাংশই বাংলা ও মধ্যপ্রদেশে রপ্তানী হয়।

গুটী হইতে সূতা ও বস্ত্র প্রস্তুতপ্রণালী মুগা রেশমের ছায়ই সেকেলে ধরণের। পনের দিনে একটি জীলোক পাঁচ শত তসর-গুটী হইতে সূতা বাহির করিতে পারে। এই পরিমাণ সূতার ওজন হয় প্রায় ১ পাউণ্ড। অধিকাংশ সূতা ও বস্ত্র তৈয়ারী হয় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে।

পরিমাণের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, তসর-রেশমের পরেই তসরের স্থান। একমাত্র বিহার প্রদেশেই ৬০,০০০ লোক তসর-কীট উৎপাদনে নিযুক্ত আছে। তাহা ছাড়া সূতা বাহির করা, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি কাজেও বহু লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। তসর-কীট উৎপাদন-কার্য উপযুক্তভাবে পরিচালিত হইলে তসর-শিল্পেও ব্যবসায়গত উন্নতির প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

## এস নব-বৈশাখ

### শ্রীশ্রীরোজনাথ ভট্টাচার্য্য

নমো নমঃ বৈশাখ,  
রক্তেতে রঙ্গীন এস যুগবৈশাখ,  
তব অভিনন্দনে বাজে এই জয়শাখ,  
বন্দিগো বৈশাখ।  
দৈন্ত ও অনশন রচে দিল প্রাঙ্গণ,  
স্বজনিত পশ্চাৎ সমুখে ভাঙ্গন।  
ইকো তুমি শব্দে,  
ভাঙ্গনের পক্ষে  
ফোটে এই ছদ্ম  
স্বজনের পদ,  
গা'ক তব কীর্তি গো হিমালয় মৈনাক।  
এস নববৈশাখ।  
নাচো তুমি দুর্জয়, চমকাক বিহ্বাৎ,  
আনো কালবৈশাখী, ক্ষেপে যাক শিবদূত।  
বুড়ির ঝাপটা,  
দেখাও সে দাপটা  
থুলে যাক শিবজুট, ক্ষেপে যাক সাপটা।  
কড় কড় হানো বাক, আনো ভীম ঝঞ্ঝা,  
করো পাপ ধ্বংস, চাহে আছ মন যা।

ছফারি মহাকাল ডঙ্কাতে গর্জায়,  
শক্তি চারি দিক তার ভীমভূত্যে,  
নন্দী ও ভৃঙ্গীর ঘন ঘন মালদাট,  
করে হাড় ঠকমক ভূতপ্রতভূত্যে।  
ভারতের মানবের আজ বুঝি অস্তিম,  
বন্ বন্ বোরে তাই দুর্জট হস্ত,  
মহামহুবংশের ধ্বংসের মহাপাপ  
তাই নিয়ে স্বর্ঘ্য যে যাবে আজ অস্ত।  
পাপে ভরা সন্ধ্যায় এলে তুমি বিধে,  
রক্তেতে রঞ্জিত ধ্বংসের দৃশ্যে,  
এ ভারতবর্ষ,  
আজ তুমি করো,  
আনো তুমি বর্ষণ করুণার বর্ষা,  
শক্তি মা উদ্ধাম নয় আজি হর্ষা,  
করো তুমি শান্ত গো মা-কালীর খড়্গে,  
হোক রণরঙ্গিণী শ্রীজগদ্ধাত্রী,  
তব ক্রপাকলাগে ধ্বংসের সন্ধ্যায়  
আনো তুমি বৈশাখ চাঁদভরা রাত্রি।

## ইন্দোচীন

গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ জগতের বিভিন্ন দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদের তাড়বলীলা চলিয়াছে। তবে মাত্র পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে দুই-দুইটা মহাসমর সংঘটিত হইয়া যাওয়ার ফলে ইহা আজ পতনোন্মুখ, একথা ছোর করিয়া বলা চলে। সাম্রাজ্যবাদ পতনোন্মুখ হইলেও সাম্রাজ্যবাদীর আশাভরসা কিন্তু এখনও নির্মূল হয় নাই। তাই আজ, সত্ত্বগত দ্বিতীয় মহাসমরের পরেও, যখন জগতের বিভিন্ন অংশ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে চলিয়াছে এবং যুদ্ধজনিত বিরাট ক্ষয়ক্ষতির ফলে বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির বিষ-দাঁত একরূপ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই সময় ইন্দোনেশিয়ায় এবং ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদের শেষ পরীক্ষা চলিয়াছে। প্রথমোক্ত অঞ্চলে ওলন্দাজ ও শেষোক্ত ভূখণ্ডে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীর দল স্বাধীনতা-প্রচেষ্টাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে উত্তত। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে তথ্য ও সংবাদাদি বিদেশে প্রেরিত হইয়া বহির্জগতেও কতকটা ইহার স্পর্শে জনমত গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইন্দোচীনের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার কথা বাহিরে

অজ্ঞাত না থাকিলেও ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ আমরা পাইতেছি না। এই দুই দেশটিতে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীর দল আড়াই লক্ষ ফরাসী, নিগ্রো ও জার্মান সৈন্য লইয়া প্রচণ্ড ও নির্মম দমননীতি চালাইতেছে। ইন্দোচীন নামেই প্রকাশ—ইহার সঙ্গে ভারতবর্ষ এবং চীন উভয়েরই যোগাযোগ বিজ্ঞমান। বৃহত্তর ভারতে—অথত্রও যেমন এখানেও তেমনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার নিদর্শন রহিয়াছে। এশিয়াবাসী যখন পরাধীনতার নাগপাশ মুক্ত হইয়া স্বাধীনতার আবাদ গ্রহণ করিতে সবেমাত্র চলিয়াছে তখন এই অঞ্চলটিতে প্রচণ্ড দমননীতি চালাইয়া ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা অশেষ অদূরদর্শিতারই পরিচয় দিতেছে। প্রত্যেক এশিয়াবাসী ইন্দোচীনের মুক্তি-সংগ্রামে সহায়ত্বভূতিশীল। তবে নিরীহ ইন্দোচীনবাসীদের আত্মনাদ বাহিরে সেরূপ পৌঁছাইতেছে না। স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশেও যাহাতে তাহাদের সপক্ষে জনমত গঠিত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক।



## মুক্তিকামা ইন্দোচীন



ইন্দোচীনে পাহাড়ের উপর বৌদ্ধ শ্রমণদের একটি 'ওয়াট ফু' বা ধ্যানধারণার নিভৃত স্থান

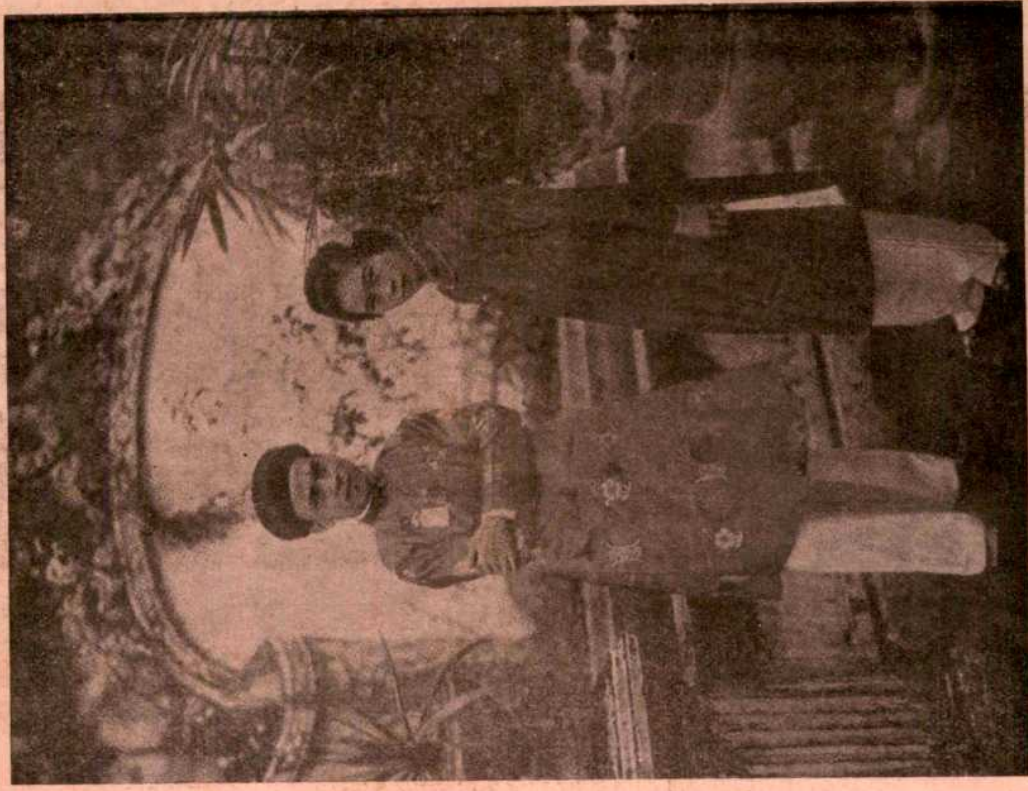


ঠাইকে'র একটি মন্দিরে একপ্রকার বাজু দ্বারা অপদেবতার তৃপ্তিবিধানেরত যাহুকরীগণ





আব্দের ভাটি গামী রাজপথের পাশে প্রস্তরনির্মিত প্রাচীনকালের একটি সপ্নমুগ্ধি



হয়ে নামক স্থানের একটি প্রমোদোভানে স্বামীসহ আনামী রাজকতা





চৈতন্যদেব

—ঐ অমূল্যগোপাল সেন

## ভারতীয় চিত্রকলায় রচনাশৈলী

শ্রীমানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা সময় ছিল যখন ভারতীয় চিত্রকলা বলতে বিশেষ ধরনে আঁকা ঐতিহাসিক ঘটনা বা পৌরাণিক কাহিনীর ছবিই বোঝাত—যেমন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, পরলোকগত সুরেন গাঙ্গুলী প্রমুখ শিল্পীদের আঁকা পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনীর ছবিগুলো জল-রঙের ‘ওয়াশ’-এর ছবি বা টেম্পারা রঙে মুখল বা রাজপুত ধরনে আঁকা ছবি। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রমোদিত দেহের গঠনভঙ্গী বা রাজপুত-মুখল চিত্রকলায় অল্পসংখ্য গঠনকৌশলই এঁরা যেনে চলতেন। ফলে মাঝে এমন একটা সময় এসেছিল যখন শুধু ঐ বিশেষ আঙ্গিকের পুনরাবৃত্তিই চলছিল। রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনে নতুনত্বের অভাবে ছবি গতানুগতিক হয়ে পড়ছিল—সর্বোপরি ছবি হয়ে উঠছিল প্রাণহীন—নীরস।

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ শুধু একটা নতুন আঙ্গিকই সৃষ্টি করেন নি—তিনি চিত্রকলায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কি করে এই ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি সৃষ্টি হ’ল—সে প্রশ্নে তিনি বলেছেন, ‘পুরাতন ছবিতে দেহলুম ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি, টেলে দিয়েছে সোনা রূপা সব। কিন্তু একটু জায়গায় কঁাকা, তা হচ্ছে ভাব, কোথাও কোন কাপণ্য নেই; কিন্তু ভাব দিতে পারে নি। মানুষ আঁকতে সবই যেন সাক্ষিয়ে সাক্ষিয়ে পুতুল বসিয়ে রেখেছে। আমি দেখলুম, এইবারে আমার পালা। ঐশ্বর্য্য পেলাম, কি করে তার ব্যবহার তা জানতুম, এবারে ছবিতে ভাব দিতে হবে। বাড়ী এসে বসে গেলুম ছবি

আঁকতে, আঁকলুম “সাক্ষাহানের মৃত্যু”।’ আজকের দিনে যখন বাংলার চিত্রশিল্পে নানাদেশীয় প্রভাব এসে পড়ছে এবং নানাবিধ রচনাশৈলীর পরীক্ষা চলছে তখন একথাগুলো বিশেষ করেই মনে রাখা দরকার—নইলে ছবির ভাব ক্ষুদ্র হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের মত অসামান্য প্রতিভাশালী শিল্পী বিরল। তাঁর রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনে যে দুর্লভ শিল্প-প্রতিভা এবং সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়—তার তুলনা খুব কমই মেলে। ভারতীয় চিত্রকলায় যে ধারা তিনি বইয়ে দিয়েছেন, নুতন নুতন পথে প্রবাহিত হয়ে তা নব নব রূপরসের সৃষ্টি করে চলেছে। ভারতীয় চিত্রশিল্পে দেখা দিয়েছে নুতন দৃষ্টিভঙ্গী, নুতন রচনাশৈলী এবং নুতন বিষয়বস্তু। শিল্পকলা তাতে প্রাণবন্ত হয়েই উঠেছে।

দৃষ্টিভঙ্গীর নুতনত্ব, রচনাশৈলীর অভিনবত্ব নন্দলালের শিল্পসৃষ্টিতে সর্বোপরি চোখে পড়ে। কোন বিশেষ শৈলীতে তিনি নিজে কে আবদ্ধ রাখেন নি—তাই দেখি তাঁর সাধনার পথ বৈচিত্র্যে ভরপুর। পৌরাণিক কাহিনীর অনবত্ত রূপায়ণ যেমন তাঁর ছবিতে দেখি, তেমনি দেখি আধুনিক কালের ছবিতে নুতন নুতন আঙ্গিক নিয়ে নব নব পরীক্ষা। তাঁর আঁকা “শিব”, “সতীর দেহত্যাগ” ইত্যাদি মহাভারতের ছবিগুলো ভারতীয় শিল্পের অতুলনীয় সৃষ্টি। শাস্তিনিকেতনের দৃষ্টাবলী, বড় এবং মাছের সাধারণ জীবনযাত্রার ছবিগুলিতে রচনাশৈলীর





গুরুশিষ্য

—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নূতন পথের সন্ধান তিনি দিয়েছেন। চৈতন্যের জন্ম, যুগ্মশিল্পের পাশাখেলা ইত্যাদি ছবিগুলো আর একরূপ আঙ্গিকে সার্থক সৃষ্টি।

যামিনী রায় প্রথম জীবনে পাশ্চাত্য রীতিতে ছবি আঁকিয়াতি অর্জন করেছিলেন; কিন্তু সে ধারা বর্জন করে ভারতীয় শিল্পে এক নূতন রচনাশৈলী তিনি প্রবর্তন করেছেন—রসিক-সমাজে তাঁর ছবির বিশেষ কদর হয়েছে। আমাদের দেশের আগেকার দিনের পটুয়ারা যে পট অঙ্কন করত, তাতে তুলির জোর ছিল এবং রং ও রেখার বাহ্যিক বর্জন করে ছবির এক সহজ কিন্তু সরস রূপ তারা সৃষ্টি করেছিল; কিন্তু অশিক্ষিত শিল্পীমনের ছাপ তাদের ছবিতে প্রকট থাকত। যামিনীবাবুর ছবিতে পটের ছাপ আছে, কিন্তু শিক্ষিত শিল্পীর তুলিকা

অল্প রং এবং সামান্য কয়েকটি বলিষ্ঠ রেখার বিজ্ঞাসে বিশিষ্ট এক রচনাশৈলী সৃষ্টি করেছে। প্রথম দৃষ্টিতে পট বলেই মনে হয়—কিন্তু যামিনীবাবুর ড্রয়িং অত্যন্ত জোরালো এবং ভাববাহক—পটচিত্রের সঙ্গে তাঁর ছবির পার্থক্য ওখানে। যামিনী বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করার সৌভাগ্য বর্তমান লেখকের হয়েছিল। ১৯৪১ সনে রবীন্দ্রনাথ বাকুড়ায় যান। সেই উপলক্ষে একটা কবিতা, স্বাস্থ্য ও শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। শিল্পবিভাগের ভার পড়ে আমার উপর। বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পীদের ছবি সেখানে প্রদর্শিত হয়েছিল। সেবারে ছবি সংগ্রহের জন্ত যামিনী বাবুর কাছে গিয়ে পটের পদ্ধতিতে আঁকা কিছু ছবি আমাদের প্রদর্শনীর জন্ত দিতে অহুরোধ করেছিলেন। সেই সময় ছবি সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁর মুখে শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। পটের ছবির সঙ্গে তাঁর ছবির প্রভেদ কোথায় তাও বুঝিয়ে বলেছিলেন। ছবির পটের অহুরোধই ছবি তিনি আঁকেন, এ রকম একটা ভুল ধারণা তখন আমার ছিল—মনে হয় এ রকম ভুল ধারণা অনেকেরই রয়েছে।

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও নিত্য নূতন ধরনের চিত্ররচনার সাধনায় নিমগ্ন। তাঁর বুদ্ধের ছবিগুলো এবং রামায়ণের ছবি রচনারীতির অভিনবত্বে বৈশি-

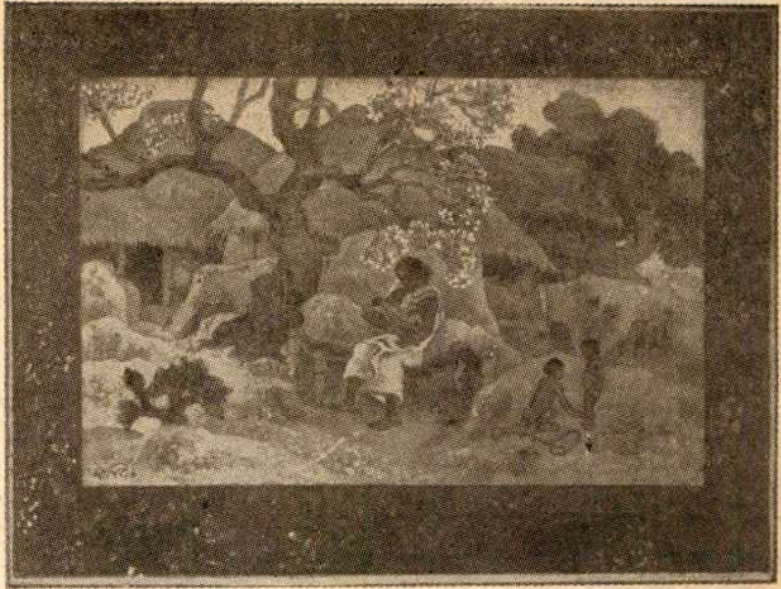
ষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করে। তাঁর আঁকা “সীতাল মৃত্যু”, “বাক্যর” এবং টেম্পারার রঙের দৃশ্যচিত্রের ছবিগুলিতেও ভারতীয় চিত্ররীতির গতানুগতিক ছাপ নেই। একই গভীর মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রেখে স্মৃতির রূপকে তিনি সজীব করে তোলেন নি। রচনাশৈলীর বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই তাঁর শিল্পসাধনা অগ্রসর হচ্ছে। সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিগুলিতে যদিও নূতনত্বের প্রবল ছাপ নেই, তবু ছবির প্রধান বস্তু যে রস, তা সেগুলোতে পূর্ণমাত্রায়ই বিজ্ঞমান। তাঁর আঁকা, “মা”, “যশোদা ও কৃষ্ণ”, “গুরুশিষ্য” ছবিগুলি অপূর্ণ সৃষ্টি। শান্তিনিকেতনের বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের চিত্রাবলীর রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তু নির্বাচন দুটোই তাঁর বৈশিষ্ট্যের ভোক্তক। শান্তিনিকেতনের দেওয়ালে আঁকা



এঁর ফ্রেসকোগুলি নয়নানন্দকর।  
তথাকথিত ভারত-শিল্পের গতানু-  
গতিক রচনারীতি এঁর ছবির মধ্যে  
নেই।

গগনেন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলায়  
এক নূতন ধারা সৃষ্টি করেছিলেন।  
ভারতীয় শিল্পে তিনিই কিউবিজমের  
প্রবর্তন করেন। রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে  
তাঁর দান সামান্য নয়।

নূতন নূতন পথ অবলম্বন করে  
গোপাল ঘোষ, শুভো ঠাকুর এঁরাও  
খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু উৎকর্ষ  
অভিনবত্বে এঁদের রচনা চোখ এবং  
বিশেষ করে মনকে মাঝে মাঝে  
পীড়াই দেয়। শৈলীর নূতনত্বই যখন  
শিল্পীর মনকে বেশী অধিকার করে  
ধাকে—তখন ছবিতে ভাবব্যঞ্জনা বা  
রস ক্ষুদ্র হয়। তবুও এঁদের ছবিতে  
বেখা ও রঙের সমাবেশ জোরাল;



মা ও ছেলে

—শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

তা ছাড়া মনে হয় নূতন নূতন পথ  
অনুসরণে যে সাহসের দরকার, তা  
এঁদের যথেষ্ট আছে।

নবীনতম শিল্পীদের মধ্যে অনেকে  
বাংলার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার  
ছবি একে খ্যাতি লাভ করেছেন।  
এঁদের রচনানীতিও গতানুগতিক  
নয়; এঁদের তুলিতেও জোর আছে,  
কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে এঁদের ছবিতে  
সুপরিষ্কৃতি। শ্রদ্ধেয় যামিনী রায় এ  
সম্বন্ধে বলেছিলেন, তোমাদের এই  
সব ছবিতে যখন ল্যাঙ্কশেপ আঁক,  
তখন গাছের গোলাকৃতি বা জমির  
উঁচুনিচু বোঝাতে যতটা আলোছায়ার  
ব্যবহার কর—সেই ছবিতেই মানুষ  
বা জীবজন্তুর বেলায় ততটা কর না;  
ফলে একই ছবির মধ্যে দু-ধরণের  
টেকনিক প্রয়োগ কর। পরিপ্রেক্ষিত  
দেখাবার বেলায় সামনের জিনিষ বড়  
করেই আঁক, দূরের জিনিষ ছোট  
করেই আঁক। কিন্তু সেই ছবিতেই  
সামনের জিনিষ ও দূরের জিনিষ প্রায়  
একই রকম ফিনিশ কর, মূখল বা  
রাজপুত ছবির মত। আর যে ধরণের  
ছবি তোমরা আঁক, তাতে ওয়াশ বা  
টেম্পারাতে ছবি না করে, তেলরঙে  
আঁকলে ছবি আরো ভাল হয়।



পাহাড়ী মেয়ে

—শ্রীধরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম



আচার্য্য নন্দলাল এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—তোমাদের “ছবি-গুলি অনেকটা কটোর মত হয়ে যাচ্ছে। ছবির রূপ আলাদা, আর ফটোর রূপ আলাদা। নেচার থেকেই আঁকবে, কিন্তু আঁকবে ছবির রূপ—শিল্পদৃষ্টিতে ছবি আঁকবে। আর কটোর মত হচ্ছে বলেই expressive (ভাবব্যঞ্জক) হচ্ছে না—ছবির প্রধান বস্তু যে রস, তোমাদের ছবিতে তার অভাব থেকে যাচ্ছে। expression বা ভাবব্যঞ্জনার অভাবে মাহুষ-গুলো যেন সাক্ষান পুতুলের মত মনে হয়।” উপদেশ দিয়ে-

ছিলেন (পৌরাণিক বিষয়) নিয়ে ছবি আঁকতে—তাতে ভাবব্যঞ্জনার দিকে আপনিই বেশী নজর পড়বে।\*

স্বাধীন ভারতে আমাদের জাতীয় জীবনের আজ সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা চলছে—চিত্রকলার ক্ষেত্রেও বাংলাকে গৌরব-মণ্ডিত করে তুলতে হবে নূতন ভাবধারা, নূতন বিষয়বস্তু এবং রচনাশৈলীর বৈচিত্র্যে।

\* এ সম্বন্ধে ১৩৫৩ সনের পৌষের প্রবাসীতে লেখকের “শিল্পপ্রসঙ্গে আচার্য্য নন্দলাল” নামক প্রবন্ধ প্রস্তব্য।

## মহিলা-শিল্পী শ্রীউষা সেনগুপ্তা

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

একথা সত্য যে, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি স্নকুমার শিল্পে কৃতিত্ব অর্জন করিবার জন্য উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক এবং



১নং চিত্র

শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। যথোচিত শিক্ষাদ্বারা পরিমার্জিত না হইলে সহজাত শক্তির আশাহরূপ বিকাশ হয় না এবং উৎসাহের অভাবে শিল্পীর সৃষ্টিপ্রেরণাও বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু ইহার বাতীক্রমও যে দেখা যায় তাহার প্রমাণ নিতান্ত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে মহিলা-শিল্পী শ্রীউষা সেনগুপ্তার দীর্ঘকালব্যাপী একাধ্র শিল্পসাধনা। এই মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের বধূ, স্নদূর মফস্বলে লোকচক্ষুর অন্তরালে বহুকাল যাবৎ শিল্প-কলার সাধনায় রত আছেন। কোন শিল্প-

বিভাগে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ তিনি পান নাই অথবা কোন শিল্পাচার্য্যের নিকটেও তাঁহার শিল্পশিক্ষার হাতে থড়ি হয় নাই। আপনাতঃ শিল্পী-মনের খেলালেই আজ দীর্ঘ কুড়ি বৎসর যাবৎ তিনি মাটি দিয়া মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া চলিয়াছেন। মাটির মূর্তি ভঙ্গুর, মাটির দেহের মত তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। তাঁহার গড়া অধিকাংশ মূর্তিরই চিরমাত্র আজ বিজ্ঞমান নাই; মাটির গড়া মূর্তি মাটিতেই বিলীন হইয়া গিয়াছে।

নিজের কাজকে কি ভাবে স্থায়ী করা যায়, সে বিষয়ে কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। মফস্বলে প্রস্তর ছত্রাপা, কাজেই পাথর দিয়া মূর্তি গড়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। নানারূপ পরীক্ষণ চলিল—শেষে তিনি ইট খোদাই করিয়া মূর্তি নির্মাণ শুরু করিলেন। ইহাতে তিনি কতদূর সাফল্যলাভ করিয়াছেন বর্তমান প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট ইষ্টকমূর্তিসমূহের প্রতিচ্ছবি তিনটিই তাহার প্রমাণ।

এই মহিলা-শিল্পীর জন্মস্থান কুমিল্লা। তাঁহার পিতা পর-লোকগত রজনীকান্ত দেব। তিনি কুমিল্লা বারের একজন শ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ এবং সংস্কৃত সাহিত্যে অধ্যয়ন ছিল বহুবিদ্যুত। তাঁহার প্রমুখ্যৎ দেব-দেবীর বর্ণনা ইত্যাদি শুনিয়া অতি শৈশবেই ত্রিমতী উষার মনে অক্ষুটভাবে রূপসৃষ্টির প্রেরণা জাগে। তাঁহার নিজের কথায়ই বলি—

“...কোন রকমে মাটি কটা দেই। তার পর হইতে গৃহ-কর্মের অবসরে দিন রাত কত কষ্ট করিয়াই যে চর্চ্চা রাখিয়াছি তাহা একমাত্র ভগবান জানেন। কুমিল্লায় দুই বার এগজিবিশন হয়, তাহাতে এবং কয়েকবার সরস্বতী পূজার মূর্তি গড়িবার সুযোগ পাই এবং এগজিবিশনে পুরস্কার লাভ করি। তখন রয়স মাত্র ১৬।১৭ ছিল। কুমিল্লার রাষ্ট্রনৈতিক নেতা শ্রীযুক্ত





২নং চিত্র

অখিল দত্তের বাড়ীতে আমার গড়া কয়েকটি মূর্তি ছিল। প্রসিদ্ধ নেতা অধ্যাপক রঙ্গ একবার কুমিল্লা আসিয়া মূর্তিগুলি দেখিয়া খুশী হন ও একটি মূর্তি মাঝাজে লইয়া যান।”

শিল্পী ত্রীসন্তোষ সেনগুপ্তের সহিত বিবাহের পর ত্রীমতী উষা ত্রিপুরা জেলার নাছিরনগর গ্রামে তাঁহার মামাস্বস্ত্রের বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান করেন। শহরের কোলাহল হইতে বহুদূরে



৩নং চিত্র

অবস্থিত এই ছায়ানিভৃত পল্লীগ্ৰামটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার শিল্পীমনকে মুগ্ধ করিল। গ্রামের উত্তর প্রান্তসীমা দিয়া প্রবহমান লক্ষ্মন নদী আর তাহার ওপারের মেদীর হাওরের দৃশ্য-সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। এখানকার প্রকৃতির নব নব রূপবৈচিত্র্য এই মহিলা-শিল্পীকে আত্মপ্রকাশের বেদনায় আবুল করিয়া তুলিল। মাটির কাজ কিছুদিনের জয় স্থগিত রাখিয়া তিনি শুরু করিলেন ছবি আঁকা—সেগুলি মুখ্যতঃ দৃশ্য-চিত্রাঙ্কন।

নাছিরনগরে কিছুকাল অবস্থান করিয়া তিনি স্বামীর সহিত তাঁহার কর্মস্থল ত্রিহটে চলিয়া যান, সম্প্রতি সেখানে যুক-বধির বিভাগলয়ে শিল্পকলার শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত আছেন। ইদানীং তিনি মাটির মূর্তিগুলিকে কি ভাবে দীর্ঘস্থায়ী করা যায় এবং মৃদুভূমিতে পাথরের বর্ণ (Character) কোটানো যায় সে সম্বন্ধে



ত্রিউষা সেনগুপ্তা

নানারূপ পরীক্ষা করিতেছেন। এই মহিলা-শিল্পীর পক্ষে পরম গৌরবের কথা এই যে, তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন।

বাংলাদেশে মহিলাদের মধ্যে ভাস্কর্য্য-শিল্পে কেহ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। ত্রিউষা সেনগুপ্তার সহজাত শিল্পপ্রতিভা এবং নিপুণ হস্তের পরিচয় তাঁহার ইট খোদাই মূর্তিগুলির প্রতিচ্ছবিতেই পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ ইটের গায়ে শিল্পরসমা ফুটাইয়া তুলিতে তিনি যে কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, উপযুক্ত সুযোগ পাইলে তাহার নিপুণ হস্ত-স্পর্শে পাষাণের কঠিন-গায়েও অপূর্ণ শিল্পমাধুরী বিকশিত হইয়া উঠিবে।

## সামঞ্জস্য

### ত্রিবিভূতিভূষণ গুপ্ত

নলিনী চৌধুরীর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এত বয়স বাঙালী বড় একটা পায় না। এই তার আশী চলছে। তবে ইদানীং তিনি একটু কাহিল হয়ে পড়েছেন। নানা প্রকার ছোট-খাটো ব্যাধি তাঁর লেগেই আছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় ছোট বড় কোন বিধিনিষেধই তিনি মেনে চলতে চান না। এই নিয়ে কিছুদিন যাবৎ তাঁর বড় এবং একমাত্র পুত্র সুধীরের সঙ্গে মতান্তর চলেছে। কলে সুধীর পিতাকে ছেড়ে দিয়ে জীকে নিয়ে পড়েছে।

সুধীরের জী শোভনা বললে, বৃদ্ধা বয়েসে অমন লোকের একটু হয়েই থাকে। তা নিয়ে রোজ রোজ কথা বাড়িয়ে লাভ কি।

সুধীর একটু উচ্চ কণ্ঠে বললে, যাকে ঝগাট পোহাতে হয় সে-ই তার মৰ্গ বোঝে। তুমি বুঝবে কি।

শোভনা হাসিমুখে জবাব দিলে, তা বটে। সকাল নটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত যাকে বাইরে বাইরে কাটাতে হয় ঝগাট পোহাবার মৰ্গ তারই বেশী বোঝার কথা।

কথাটা মিথ্যে নয়। সুধীর নীরব থাকে। তা ব'লে পিতার সম্বন্ধে সে মোটেই অমনোযোগী নয়। আপিসে যাবার পূর্বে সে রোজই সেদিনের ঔষধ থেকে আরম্ভ করে আহার-বিহারের একটা সুপরিকল্পিত রুটিন করে দিয়ে যায়। জীকে উপদেশ দেয় সেই অমুযায়ী কাজ করতে, বাপকে অমনয় করে সেই ভাবে চলতে। কিন্তু সুধীর বাড়ীর বাইরে পা বাড়াতোই নলিনী চৌধুরী পুত্রের সকল বিধিনিষেধ, অমনয়-বিনয় লঙ্ঘন করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন। সন্তর্পণে পা টিপে টিপে রান্নাঘরে এসে উপস্থিত হন। শোভনাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমার নিতাই এখনও বাজার থেকে কিনে আসে নি বুঝি মা? হতভাগা আজ বাজারহুত্ব কিনে আনবে দেখছি।

শোভনা হাসিমুখে প্রতিবাদ জানায়, সে ত অনেকক্ষণ ফিরে এসেছে। কিন্তু আপনি আবার এই রোগী হুর্দল শরীর নিয়ে উঠে এলেন কেন বাবা।

নলিনী বলেন, অসুখ মনে করলেই অসুখ মা, নইলে কি এমন হয়েছে। বরং দিন-রাত শুয়ে থেকে থেকে সর্কাক্ষে আমার বাত ধরে গেল।—কথা বলতে বলতে ততক্ষণে তিনি রান্নাঘরে প্রবেশ করেছেন। শোভনা একখানি আসন পেতে দিতেই তিনি নিঃশব্দে উপবেশন করলেন। তৃত্যকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজ কত করে মাছ নিয়ে এলে নিতাইবাবু। টুকরোট বেস পাকা রুই থেকেই এনেছ দেখছি।

নিতাই হাসিমুখে জবাব দেয়, আজ্ঞে, পাকা রুই সম্ভায় পাওয়া গেছে, কিন্তু সিদ্ধিমাছ পুরো চার টাকা সেয়ে আনতে হয়েছে।

শোভনা ধমক দিয়ে বলে, মাছের দাম নিয়ে তোমাকে মাথা ঝামাতে হবে না নিতাই। কাজ না থাকে ত যাও।

নিতাই একটু অপ্রস্তুতভাবে দ্রুত প্রস্থান করে।

নলিনী চৌধুরী আপন খেয়ালেই মাথা নেড়ে বলেন, নিতাই কিছু মিথ্যে বলে নি। দেশে যে পরিমাণ রোগের মরহুম পড়েছে তাতে রুই কাতলা ঝাবার লোকেরই যে অভাব মা।

নলিনী চৌধুরী ঝামতে পারলেন না। কোন দূর অতীতের স্মৃতি যেন অকস্মাৎ তাঁকে যুবর করে তুলেছে। তিনি বলে চললেন, 'সে দিনের কথা আজ তোমাদের কাছে গল্প বলেই মনে হবে। তোমাদের কেন, সময়েতে আমার নিজেরও ভুল হয়ে যায়।'—শোভনা চুপ করে থাকে। বৃদ্ধা খন্তরের কাছে তাঁর বাল্যকালের গল্প শোনা ওর প্রতিদিনের একটি নিয়মিত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। রোজই তাকে সেই একই কথা বৈধব্য সহকারে শুনতে হয়। লাগেও মন্দ নয়। তার একক নিঃসঙ্গ জীবনপথে বৃদ্ধ খন্তর ছোট একটি শিশুর মতই তার চেতনাকে মধুর ভাবে ঘিরে আছে।

নলিনী চৌধুরী পুনরায় বলেন, তোমাদের মহামূল্য সিদ্ধিমাছ আমাদের ছোটবেলায় পয়সায় এক ঝালুই পাওয়া যেত। চার আনার মাছ কিনলে একটা লোক দরকার হ'ত তা বয়ে নিয়ে আসতে। অল্প মাছেরও অভাব ছিল না। আর সে সব কি তোমাদের এই বরফ দেওয়া মাছ—এমনি চটাচটা পুঁটি মাছ ভাজা মুত্তর ডালের সঙ্গে আট দশ গুণা এক এক জনে আমরা খেয়ে ফেলতাম। সে মাছে তেলের দরকার হ'ত না মা। মাছের তেলই যথেষ্ট। মাছের তেমন স্বাদ যেন তুলেই গেছি।

নলিনী চৌধুরী ধামলেন। জিভের সাহায্যে ঠোট দুখানা বারকয়েক ভিজিয়ে নিয়ে পুনরায় সোৎসাহে আরম্ভ করলেন, সেদিনের কথা আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। মাছ-মাংসের চিরদিনই আমি ভক্ত। গ্রামের বাড়ীতে অন্ততঃ পাঁচ-ছ'গাছা কঁকা জাল সব সময়ের জন্য মজুত থাকত। কোনটা বজুরি ট্যাংড়া কঁাস, কোনটা পুটির কঁাস, কোনটা বা ভাসা মলাস্তির। মোটের উপর মাছের আকার বুঝে কঁাসের নাম। সবচেয়ে বড় কঁাসের জাল হ'ল রুই, কাতলা, বোয়াল ধরবার জন্য। সে যুগে ক'টা লোক আর মাছ কিনে খেত মা।



মাছের কথা বলতে গিয়ে স্বস্তি সহসা অত্মমনস্ক হয়ে পড়েন। মুদ্রিত নেত্রে চূপ করে বসে থাকেন। শোভনা কাকের কাঁকে কাঁকে খসুরের যুথের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে। একটা চোখ এবং একখানা কান তার সর্বদা সজাগ রয়েছে। আঁহা বুড়ো মানুষ। শিশুর মত অসহায়। ছোট ছেলেরই মত অকারণ অভিমানী।

শোভনা জিজ্ঞেস করে, তারপর বাবা?

নলিনী চোখ খোলেন। যুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, স্ত্রীর মার রান্নার খুব খ্যাতি ছিল। তোমাদের আজকালকার মত রান্না সে নয়। নিতান্তই সাধারণ রান্না। কিন্তু সে কি তুলবার কথা মা—আজও মুখে তা লেগে আছে।—বুদ্ধের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এর পরে কথার ধারা যে কোন্ পথে যাবে এ যেন সহজ সংস্কারবশেই শোভনা টের পায়। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেবার জন্তই সে একমুখ হেসে বলে, কেন বাবা আমরা বুঝি একেবারেই রাঁধতে শিখি নি?

নলিনী সহজ কণ্ঠেই জবাব দেন, সে কথা আর বলি কি করে মা। রাঁধ তোমরা ভালই। তার চেয়েও ভাল তোমাদের রান্নার নামগুলো। কালিয়া, কোণ্ডা অথবা কোয়ার্ণ নাম সে যুগে তাঁরা জানতেন না। কিন্তু একই ঝোলের রকমারি স্বাদের বুঝি তুলনা হয় না।

শোভনা প্রশ্ন করে, মা বুঝি খুব ভাল রান্না করতেন বাবা?

নলিনী উৎসাহিত হয়ে উঠেন। পরমুহুর্তেই চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা বেদনার ভাব ফুটে ওঠে। তিনি যুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, তাই ত সকলে বলত মা। ভালো রান্নার মূল রহস্যটি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। কোন্ মাছের সঙ্গে বেগুন আর বড়িভাজা দিলে, কোন্ মাছটি ঝোলের চেয়ে ভাতে কিংবা কোন্টি পাতুরি করলে মুখরোচক হবে একথা কেউ কোনদিন তাঁকে শিখিয়ে দেয় নি, অথচ সকলের রুচির সঙ্গে তাঁর রান্নার চমৎকার সময় ছিল।

শোভনা যুদ্ধকণ্ঠে বলে, চেষ্টা ত করি বাবা কিন্তু হয় না যে—

যুদ্ধ যেন সহসা অনেকখানি সজাগ হয়ে ওঠেন। না জেনে গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রকার আঘাত করে বসেন নি ত। তিনি বারকয়েক মাথা নেড়ে বলেন, কে বলে হয় না মা। এই যে সেদিনে তুমি পাব্‌দা মাছ বড়িভাজা আর ধনে শাক দিয়ে রেঁধেছিলে। বলি নি তোমায়, এমনটি বছরদিন খাই নি? স্ত্রীর মা চলে যাওয়ার পর এমন স্বাদ প্রায় তুলেই গিয়েছিলাম? তোমার ঐ সিঙ্গিমাছের ঝোলটাই যা আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

শোভনা যুদ্ধ কণ্ঠে বলে, কিন্তু ও ছাড়া যে আপনার আর কিছু সহ হয় না।

যুদ্ধ দীর্ঘ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন,—‘সহ হয় না তোমায় কে বললে মা? স্ত্রীর বুঝি এই সব তোমায় বুঝিয়েছে? মিথ্যে কথা, একেবারে ডাঙ্কা মিথ্যে কথা। এ কি তোমার আজকালকার ভেজাল খাওয়া শরীর যে একটুতেই ভেঙ্গে পড়বে? এই বুড়ো ছাড়ে এখনো কথা কয় মা। চেয়ে দেখ ত তুমি, এতখানি বয়েসেও একটা দাঁত পড়েছে আমার? জান, এখনও মাংস চিবিয়ে খেতে পারি আমি।

শোভনা বাধা দিয়ে বলে, খেতে পারা আর সহ হওয়া না হওয়া ত এক কথা নয় বাবা?

যুদ্ধ পুনরায় গরম হয়ে উঠলেন, এ তো তোমার কথা নয় মা। নিশ্চয় স্ত্রীর ডাক্তারও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে। আমার কি সহ হবে আর কি হবে না সে কথা বলে দেবে ডাক্তার। ওরা পাগল, একেবারে বড় পাগল। এই তোমায় আমি বলে রাখছি ও ডাক্তারের কোন বিধানই আমি আর মানব না। তুমি বরং তোমার খুঁড়োমশায়কে একটা খবর পাঠাও। শুনেছি তিনি বড় হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, তাঁকে দিয়েই চিকিৎসা করাব।

শোভনা আপত্তি জানায়, আমার কাকা হোমিওপ্যাথ নন বাবা—

যুদ্ধ মাথা নেড়ে বলেন, বয়স হলে এমন তুলভাষি একটু আধটু হয়েই থাকে। তিনি যে বড় কবরেজ সে কথাটা আমার মনেই ছিল না।

শোভনা হেসে বললে, এর দুয়ের কোনটাই তিনি নন বাবা। কাকাবাবু এলোপ্যাথ চিকিৎসক।

যুদ্ধ বলে উঠলেন, এ হতেই হবে। যেমন স্ত্রীর তেমনি তার ডাক্তার। মাথায় আমার কিছু আর রাখে নি। না খেতে দিয়ে দিয়ে মাথার ঘিলু একেবারে শুকিয়ে ফেলেছে।—তিনি একটু থেমে পুনরায় বললেন, তা বলে চিকিৎসকের যে নামই তোমরা দাও না কেন—মূলত সব চিকিৎসাই এক মা। শুধু নামেরই রকমফের।

শোভনার মুখে যুদ্ধ হাসি দেখা গেল, কিন্তু কোন প্রতিবাদ এল না। বরং কি ভাবে সিঙ্গিমাছ রান্না করবে খসুরকে সেই কথাটাই ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলে। এমনি ধারা কিছুদিন ধরে তাঁকে জিজ্ঞেস করে আসতে হচ্ছে। পরিষ্কার করে কথাটা শুধাতে তার আটকায়। মোট কথা ডাক্তার এবং স্বামীর অহুজায় ষড়যন্ত্র মুক্তি থাকলেও শোভনা কোনমতেই খসুরের পাতে শুধু মাত্র রুগীর পথ্য তুলে দিতে পারছে না। এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গেও তার বাদানুবাদ লেগেই আছে।

স্ত্রীর বলে, ব্যাধির চিকিৎসা দরকার।

শোভনা বলে, রোগ হার নিছক বাধক্য তাঁকে চিকিৎসার নামে উপোস করিয়ে মারতে আমি পারব না।

স্ত্রীর বিস্তর চোঁচামেচি করলেও প্রতিবাদের অভাবে তা

আপনি বন্ধ হয়ে যায়। এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় নরম হয়ে বলে, আচ্ছা এই করে যে তুমি বাবার কত বড় ক্ষতি করছ এ কথাটাও কি তুমি কিছুতেই বুঝবে না?

শোভনা বলে, কথাটা যেদিন বুঝব সেদিনে আর এত কথার দরকার হবে না। কিন্তু দোহাই তোমার, সব কথা না জেনে মিথ্যে গোল কর না।

সুধীরকে ধামতে হয়। কিন্তু কথাটা শোভনা ভুলতে পারে না। এবং পারেনা বলেই প্রতিদিন একবার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে জিজ্ঞেস করে। বৃদ্ধ সব খবর রাখেন না। রাখবার কথাও নয়। তাই প্রত্যহ তাঁকে রান্নাঘরে দেখা যায়। দেখা যায় খাণ্ড নিয়ে নানা প্রকার আলোচনা করতে, সিদ্ধি মাছের প্রতি তাঁর নির্দারুণ অনাসক্তির কথাটা প্রকাশ করতে।

শোভনার প্রশ্নে বৃদ্ধ যেন সজাগ হয়ে উঠেছেন, তুমি কি আজ আমার সিদ্ধিমাছ খাওয়াতে চাও?

পাকা রুই মাছের টুকরোটা তখনও সম্মুখেই পড়ে আছে। সেই দিকে চোখ পড়তে শোভনা যেন কেমন লজ্জিত হয়ে পড়ল। নব্বু কণ্ঠে বললে, আপনি যে সকাল-বেলা আপনার পেটের গোলমালের কথা বলছিলেন।

বৃদ্ধ বাধা দিয়ে বললেন, বলেছিলাম বৃদ্ধি। ভুল বলেছিলাম মা। আসলে গোলমাল আমার পেটের হয় নি, হয়েছে আমার মাথা। এক বলতে আর বলি। বুড়ো বয়সে চিন্তাশক্তির অবসাদ ঘটেছে।

শোভনার ঠোঁটের কোণে পুনরায় একটুখানি করুণ হাসি দেখা গেল। চোখ মুখ স্নেহ মমতার স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, অসহায় বৃদ্ধ। যত জ্বালা হয়েছে তার। মোটকথা স্বামীর রক্ততা এবং ডাক্তারের অসংখ্য বিধিনিষেধ এ দুয়ের কোনটাই সে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারছে না। অথচ খোলা মনে নিজের ইচ্ছামত চলতেও যেন কোথায় আটকাচ্ছে। পাশাপাশি ছ'রকমের ব্যবস্থা করতে সে পেরে উঠছে না। এই নিয়ে প্রতিদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাদপ্রতিবাদ হতে দেখা যায়। বৃদ্ধ স্বস্তুরকে স্নেহে এবং সেবার চতুর্দিক থেকে সে আচ্ছন্ন করেই রাখতে চায়। তার বুড়ুফু মাতৃহৃদয়ের কতকটা আকাঙ্ক্ষা অন্তত এই পঞ্চ ধরেই পূর্ণ হয়ে উঠবার সুযোগ পায়। সুধীর পরসী রোজগার করে। পরসী সে যথেষ্টই পায়। তার বাইরের একটা সমাজ আছে। তার মত স্বল্পপরিসর গভীর মধ্যে এক রোগজর্জরিত বৃদ্ধকে নিয়ে অষ্টপ্রহর পা গুণে গুণে চলতে হয় না, তাঁর সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগের সম্মুখীন হতেও হয় না। কাজেই সুধীরের পক্ষে উপদেশ দেওয়া সহজ হলেও তা পালন করা তার স্ত্রীর পক্ষে তেমন সহজে ঘটে উঠে না।

শোভনা নতমুখে বসে আছে। সেই দিকে ধানিকঙ্কণ

সঙ্গে চেয়ে দেখে বৃদ্ধ পুনরায় বলে ওঠেন, সুধীরের ডাক্তারের উপর আমার আর একতিল বিশ্বাস নেই। তুমি দেখে নিও মা তোমার বুড়োমশাই নিশ্চয় আমার কথায় সায় দেবেন।

অন্ধকার পথে চলতে চলতে সহসা শোভনা যেন একটুখানি আলোর সন্ধান পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠল। সাগ্রহে স্বস্তুরকে বললে, আমি আজই কাকাবাবুকে খবর পাঠাব বাবা।

বৃদ্ধ মুগ্ধতা কণ্ঠে বললেন, তাই পাঠিয়ে মা। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, সুধীরের ডাক্তার আমার না খেতে দিয়ে হৃদযন্ত্রের দফাটিও রক্ষা করে দিয়েছে।

শোভনার মুখে পুনরায় একটুখানি স্নান হাসি দেখা গেল। যে কথা বৃদ্ধ বার বার তাকে বোঝাতে প্রয়াস পাচ্ছেন, তা বিশ্বাস করতেই সে চায়, কিন্তু স্বস্তুরের সংশয় শোভনাকে বেদনা দেয়। স্বামীর যুক্তি এবং বর্তমান ডাক্তারের অল্পজ্ঞা সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তোলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শোভনাকে তার কাকাবাবুর নিকট খবর পাঠাতে হ'ল।

খেতে বসে আজ বার বার বৃদ্ধকে রান্নার তারিফ করতে শোনা গেল। এমন রান্না নাকি তিনি বহুদিন খান নি। এক কথায়—খাসা। রুই মাছের ঝোলটার উপরই যেন নজর তাঁর বেশী। পূর্ণ উৎসাহে পরম পরিতোষের সঙ্গে তিনি বার বার চেয়ে নিয়ে আহার করলেন। একমুখ হেসে শোভনাকে বললেন, একেই বলে রান্না, মা। যেমন হয়েছে ডুমুরের স্নজ্জা, তেমনি করেছ মুলোর খণ্ট। সবার সেবা রেখেছ মাছের ঝোলটি, তা বলে সোনা মুগের ডালও কারুর চেয়ে কম যায় না।

শোভনা বৃদ্ধের অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

বৃদ্ধ পুনশ্চ বললেন, তুমি এক দিনে আমার দশ দিনের পরমায়ু বাড়িয়ে দিয়েছ মা। যেমন সুধীর—তেমনি জুটেছে তার ঐ ডাক্তারটি। এরা আমার শরীরের ধাত জানে না। উণ্টো ব্যবস্থা দিয়ে আমার হয়রান করছে বৈ ত নয়।

বৃদ্ধ ধামলেন। কিছুক্ষণ অগমনক ভাবে বসে রইলেন। সুধীরের ডাক্তারের উপর তাঁর বাহিক যত বিরাগই থাক না কেন, অন্তরে তিনি তাঁর বার আনা ব্যবস্থাই স্বীকার করতেন, কিন্তু জীবন-সায়াকে নানাবিধ বিধিনিষেধ মেনে চলতে তিনি চান না। আজকের সংস্কার এবং অভ্যাস পদে পদে বাধা দেয়। পুত্র পিতাকে যতই নিয়ম মেনে চলতে বলে পুত্রবধুর কাছে বৃদ্ধের বায়না ততই বৃদ্ধি পায়। শোভনার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের দুর্বলতার স্থানে মোচড় দিয়ে কাঙালের মত ছ'হাত পেতে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে থাকেন। এই এক স্থানেই তাঁর যত কাঙালপনা, নইলে আজ এতখানি বয়সে তিনি নিজের

ইচ্ছাকেই বরাবর প্রাণাচ্ছ দিয়ে এসেছেন। কোথাও বিন্দুমাত্র এর অত্যাচার হবার উপায় ছিল না।

সুধীরের বয়স তখন বছর তিনেক হবে যখন তার মাতৃ-বিরোগ ঘটে। শুটকয়েক যুত সম্ভান প্রসব করার পর সুধীরই প্রথম টিকে গিয়েছিল কিন্তু সেই প্রথম টিকে যাওয়া সম্ভানই তাঁর শেষ সম্ভান। সেই থেকেই সুধীরের মা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে লাগলেন। সুধীর বাঁচল বটে, কিন্তু তার মাকে যেতে হল। যুহাটাকে অত্যন্ত গভীর ভাবে অনুভব করলেও নলিনী চৌধুরীর বাহ্যিক ব্যবহারে তার কোন প্রকাশ করার চোখে পড়ল না। শুধু পুনরায় বিয়ের তাগিদ এলে তিনি অত্যন্ত সহজ গলায় আত্মীয়-স্বজনকে বললেন, না—এবং সেই থেকেই পুত্রের সকল ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

শোভনার স্বহৃদে আহ্বানে বৃদ্ধের অসহনীয়তার ধোর কেটে গেল। তিনি বললেন, আমার কিছু বলছিলে মা?

শোভনা বললে, হ্যাঁ বাবা—কাকাবাবু এলে সব কথা আপনি নিজেই খুলে বলবেন কিন্তু।

বৃদ্ধ সোৎসাহে বলেন, নিশ্চয় বলব মা। আমার ভুল হয়ে গেলে তুমি স্মরণ করিয়ে দিও। আর সুধীরের ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনগুলো হাতের কাছে গুছিয়ে রেখ, তোমার কাকাবাবুর দরকার হতে পারে।

শোভনা প্রস্থান করলে।

বৃদ্ধ পুনরায় অসহনীয় হয়ে পড়েন। অতীতে তিনি যা কিছু ভাল বলে জেনেছেন তার এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটতে তিনি দেন নি। তাঁর মনের দৃঢ়তা আত্মচেতনার সঙ্গে পাশাপাশি কাজ করে গেছে। তাঁর সৈদিনের সে মনোবল আজ আর নেই, তার স্থানে এক ছনিবার হ্রস্বলতা তাঁকে পেয়ে বসেছে। নইলে তিনি...

পুনরায় তাঁর চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। পূত্রবধু দেখা দিয়েছে—সেই সঙ্গে তার ডাক্তার কাকাও।

বৃদ্ধ তাঁকে পরম সমাদরে আহ্বান করলেন, আসুন বেরাই মশাই। একটু থেমে তিনি যেন একটু অসুযোগ দিয়ে বললেন, এমনিতে আপনাদের ত আর দেখা পাওয়া যায় না—

প্রত্যুত্তরে হেসে ডাক্তার বলেন, ডাক্তারের আবির্ভাব যত কম হয় ততই মঙ্গল।

বৃদ্ধ খুব খানিক হেসে নিলেন এবং আরও ছ-চারটে বাক্য কথার পর তাঁকে আহ্বান করবার যথার্থ কারণ সবিস্তারে জানালেন।

ডাক্তার পরম গভীরভাবে বৃদ্ধের অভিযোগ এবং অসুযোগ-গুলি একের পর এক শুনে গেলেন। কখনও কৌতুকে তাঁর হৃৎচোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল, কখনও বা হাসিমুখে বৃদ্ধের কথায় সায় দিয়ে আলোচনার ধারাটাকে একটা সহজ পথে

নিরে আসছিলেন এবং নিতান্ত মনোযোগের সঙ্গে পূর্বের প্রেসক্রিপশনগুলি দেখে নিয়ে হাসিমুখে বললেন, আপনার কিছুই হয়নি ত! এতখানি বয়সে বুকে এমন একটু সন্ধিভাব থাকবেই—আর হৃৎশক্তি হ্রাস পাওয়াটাও নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। এতে ব্যস্ত হবার কিছুই নেই। ডায়েট একটু হালকা—অর্থাৎ যতটা সহ্য করতে পারেন তাই খাবেন। আর ওষুধ যা খাচ্ছেন তাতে আপত্তির কিছু নেই, তবে সেই সঙ্গে একটা এনজাস ইমালসন হলে ভাল হয়।

ডাক্তার উঠলেন, কিন্তু পুনরায় তাঁকে ফিরতে হল। শরীরটা কিছু খারাপ থাকায় সুধীর একটু শীঘ্রই ফিরে এসেছে। বাড়ীতে ডাক্তারের আবির্ভাব দেখে একটু যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার অবগত হয়ে সে আতঙ্ক কণ্ঠে খুড়খুড়কে প্রশ্ন করলে, কেমন দেখলেন?

স্বস্তরকে নিয়ে সুধীর তার নিজের ঘরে এসে বসেছে।

ডাক্তার বললেন, নতুন কিছুই নয়। যেমন চলছে চলুক। তবে একটা ইমালসনের ব্যবস্থা কর।—তিনি চলে গেলেন। কিন্তু সুধীর পুনরায় পিতার ঘরে আসতেই তিনি হৈ চৈ বাড়িয়ে দিলেন, আমি তখনই বলেছিলাম তোর ঐ ডাক্তার কিছু জানে না। এখন হল ত। তোর ডাক্তার শুধু চিনেছে সিদ্দিকাছ আর খানকুনি পিতার কোল। আর বোতল বোতল ওষুধ গেলানো। খেতে দিচ্ছ সিদ্দিকাছ, তার দ্বয়ে আবার হজমি আরক কেন? আর কখনও আমি তোর ডাক্তারের ওষুধ খাব মনে করেছি—কক্ষনো নয় এ আমি আজ তোকে সাক্ষাৎ জানিয়ে রাখছি।

সুধীর বিস্মিত চোখে চেয়ে রইল। শোভনার মুখে একটু যেন চাপা হাসি দেখা গেল। সুধীর বললে, এসব আপনি কি বলছেন বাবা। কাকাবাবুও যে একই ব্যবহার কথা বলে গেলেন।

বৃদ্ধ উত্তোজিত কণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন, বলে গেলেন। তুমি বললেই আমাকে তাই বিশ্বাস করতে হবে? হুমিনিটে তোমাকে তিনি সব কথা বলে গেলেন, আর হৃৎচোখ ধরে আমাদের যা বলেছেন সব মিথ্যে? শোন কথা মা, হতভাগা ছেলের কথা শোন—

শোভনার মুখে পুনরায় যেন চাপা হাসি দেখা গেল, কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। উত্তর দিলে সুধীর, আপনি মিথ্যে রাগ করছেন বাবা। সত্যি মিথ্যে একটা ফোন করেই না হয় একবার ভালভাবে জেনে নিন না।

বৃদ্ধ পুনরায় রেগে উঠলেন। বললেন, জানতে হয় তুমি নিজে জান গিয়ে। আমার যা বলবার তা তিনি নিজেই বলে গিয়েছেন।

সুধীরের সঙ্গে তার জীর একবার দৃষ্টি বিনিময় হতেই সে আর কথা না বাড়িয়ে অগ্রহণ করলে।

রুদ্ধ আর একবার স্বাক্ষর দিয়ে উঠেই পুত্রকে না দেখে  
থেকে গেলেন এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুত্রবধূকে উদ্দেশ্য  
করে বললেন, বুঝলে মা, সুধীর আমার তেমন ছেলে নয়—যত  
নষ্টের গোড়া তার ঐ ডাক্তার।

শোভনা হাসিমুখে প্রস্থান করলে।

প্রসন্নতা ভখনকার মত চাপা পড়ে গেলেও এইখানেই  
পূর্ণচ্ছেদ পড়ল না। দিন চলে যায়। রুদ্ধ ঔষধ সেবন  
একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছেন। শোভনা অল্পযোগ দেয়।  
রুদ্ধ হেসে বলেন, তোমার কাকাবাবুর ওষুধ যে বাজারে  
পাওয়া যাচ্ছে না মা।

শোভনা বললে, অল্প ওষুধ খেতে কাকাবাবু ত নিষেধ  
করেন নি বাবা।

রুদ্ধ বললেন, খেতেই হবে এমন কথাও তিনি বলেন নি ত  
মা।

শোভনা এই নিয়ে আর কথা বাড়াতে চায় না। নিঃশব্দে  
অল্পত্র প্রস্থান করে। কিন্তু বয়সের ধর্ম স্বভাবের গতিকে  
উপেক্ষা করে চলতে পারে না। এক সময় রুদ্ধকে শয্যাশায়ী  
হতে হ'ল। সুধীর তখন আপিসে। শোভনা আশঙ্কায় এতটুকু  
হয়ে গেছে। রুদ্ধের মতে এটা শুধু একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা।—  
যা সকলেরই হতে পারে। কিন্তু শোভনার মনে যথেষ্ট সংশয়  
দেখা দিয়েছে। একটি বেলার তাওবে রুদ্ধকে যেন একেবারে  
হুমড়ে ভেঙে ফেলেছে। ডাক্তারের কাছে খবর পাঠান  
হয়েছে, সেই সঙ্গে সুধীরকেও।

শোভনার অদৃষ্টে জটিল নিষ্ঠুর তিরস্কার। কোন প্রতিবাদই  
সে করলে না। তার মন নিয়ে ঘটনাটার বিচার ত ওরা  
করবে না। ওদের চুলচেরা হিসাবে ব্যতিক্রম ঘটেছে তাই  
ওরা অকরণ হয়ে উঠেছে। শোভনা শুধু নিঃশব্দে স্বপ্নের  
পরিচর্যা করে চলেছে।

রাত্রে একলা ঘরে জীকে পেয়ে সুধীর সহসা অগ্নিমুগ্ধ হয়ে  
উঠল, তোমার অজায় প্রশ্ন পেয়ে গেয়েই এমনটি ঘটেছে।

শোভনা শান্ত কণ্ঠে বললে, সে বিচার না হয় পরে করো  
কিন্তু দোহাই তোমার, একটু আস্তে কথা বল। বাবা এখন  
ভালই আছেন এবং জেগে আছেন।

সুধীর কিন্তু ধামতে পারলে না। সে তেমনি জ্বলন্ত কণ্ঠেই  
বলে চলল, এমন করেই ইদানীং তুমি আমার মুখ চাপা দিয়ে

আসছ। একটি বারও তোমরা কেউ আমার দিকটা ভেবে  
দেখছ না। সারাদিন পরিশ্রম করে এসে—

পুনরায় বাধা দিয়ে শোভনা বললে, তুমি কিছুতেই কি  
চুপ করবে না?

বারবার বাধা পেয়ে পেয়ে সুধীর যেন ক্ষেপে গেল, বলতে  
লাগল, চুপ করেই এতদিন ছিলাম, কিন্তু তোমরাই তা  
থাকতে দিচ্ছ না। তোমাদের আজ আমি পরিস্কার করেই  
জানিয়ে দিতে চাই যে এমনি খেয়ালখুশী মত যদি তোমরা  
চলতে চাও তা হলে বাবাকে আমি দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে  
দেব। নয়তো অল্প কোথাও...

পাশের ঘরে কোন কিছু পতনের শব্দে উভয়ে চমকে  
উঠল। শোভনা দ্রুত পদে সেই শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গেল।  
সুধীরও তাকে অনুসরণ করলে।

রুদ্ধ অধোরে ঘুমোচ্ছেন। কিছুক্ষণ পূর্বেও যে তিনি পুত্র  
এবং পুত্রবধূর বাদামুবাদ উৎকণ্ঠ হয়ে শুনছিলেন একথা বুঝবার  
উপায় নেই।

শোভনা একমুহুর্তেই ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে।  
খাটের পাশের টেবিলের উপরকার বড় ঔষধের শিশি দুটো  
যেখের গড়াগড়ি যাচ্ছে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে।

জী একবার স্বামীর মুখের প্রতি চোখ তুলে চাইলে, আর  
স্বামী জীর পানে নির্বাকভাবে তাকালে।

সুধীর নিম্ন কণ্ঠে বললে, তোমার হতভাগা মিনির কাজ...

শোভনা একবার কোন উত্তর দেওয়াও আবশ্যক বোধ  
করলে না। উবু হয়ে বসে কাঁচের টুকরোগুলো একস্থানে  
জড়ো করতে লাগল। চোখ দুটো কি জানি কেন তার  
স্বাপসা হয়ে গেছে।

\* \* \*

কয়েক দিনেই রুদ্ধ পুনরায় একটু সামলে নিয়েছেন।  
চিকিৎসক নির্দেশিত আহার্য্যই তিনি এখন গ্রহণ করছেন।  
তবে ইদানীং সিদ্ধিমাছের প্রতি তাঁর আসক্তিটা অতিমাত্রায়  
বৃদ্ধি পেয়েছে। পুত্রবধূকে ডেকে বলেন, মাছগুলোর চেহারাটাই  
যা বিদ্যুটে নইলে খেতে অতীব সুস্বাদু, মা। তিনি পরম  
পরিতোষের সঙ্গে আহারে মনোনিবেশ করেন।

শোভনার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, কিন্তু গোপনে সে দীর্ঘ-  
নিঃশ্বাস মোচন করে।

## বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

মধ্য-পশ্চিম

২১শে ডিসেম্বর শনিবার এগারটার শিকাগো হইতে ট্রেনে রওনা হইয়া দুইটার সময় লিঙ্কনের স্থতিবিজ্ঞিত প্রিংফিল্ড নগরে পৌঁছলাম। প্রিংফিল্ড ইলিনয় রাজ্যের রাজধানী। শিকাগো হইতে দূরত্ব ২০০ মাইল। ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে ট্রেন ছুটিতেছিল। পথে তিনটি স্টেশন, কান্সাকি, গিব্‌সন সিটি ও ক্রিষ্টন। রওনা হইবার সময় এবং প্রায় সারা রাত্তাই বরফ পড়িতেছিল। ট্রেনের দুই ধারে দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর। আগাগোড়া বরফে ঢাকা। প্রিংফিল্ড শিকাগোর দক্ষিণে। এখানে বরফ ছিল না। মাঝে মাঝে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছিল। ওয়েবস্টারের সহিত হোটেলে গিয়া উঠিলাম। আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে শহর সুসজ্জিত। হোটেলের লাউঞ্জে উত্তমরূপে সাজানো খ্রীষ্টমাস তরু। চারিদিকেই আনন্দ। পরের দিন বৃষ্টি কাটিয়া গেল। তারপর যে তিন দিন এখানে ছিলাম সে তিন দিন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছিল।

প্রিংফিল্ড এরাহাম লিঙ্কনের কর্মক্ষেত্র। তাঁর জন্ম হইয়াছিল কেণ্টাকি রাজ্যে। সাত বৎসর বয়সে তিনি ইণ্ডিয়ানা রাজ্যে আসিয়া কয়েক বৎসর বাস করেন। পরে যৌবনে ইলিনয় রাজ্যের সালেম গ্রামে আসেন। তিনি দরিদ্রের সন্তান। বেশী লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। সালেম গ্রামে প্রথম এক মুদির দোকানে কাজ করেন। পরে নিজের একটি দোকান করেন। কিন্তু সে দোকান লোকসান হইয়া উঠিয়া যায়। তখন কিছু আইন পড়িয়া প্রিংফিল্ডে আসিয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এখানে বেশ পসার হয়। পরে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়া এখান হইতে ওয়াশিংটন চলিয়া যান। যুক্তরাজ্য তখন অন্তর্ভুক্ত ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। তৎকালে আমেরিকায় দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। লিঙ্কন উহা রহিত করিয়া দেন। ইহাতে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি যুক্তরাজ্য হইতে আলাদা হইয়া পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে সঙ্কল্প করে। লিঙ্কন তাহাতে বাধা দেন। উভয় রাষ্ট্রে যুদ্ধ হয়। লিঙ্কন জয়ী হন। দেশের ঐক্য রক্ষা হয়। সে ঐক্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। এই ঐক্যের জন্মই আজ এরা এত বড়। এদেশের লোক লিঙ্কনকে খুব শ্রদ্ধা করে। গ্রহ-বিবাদের দিনে ইনিই এদের পথপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিজয়ী লিঙ্কন পরে গুপ্ত-হত্যাকার হস্তে নিহত হন।

পরদিন রবিবার। সুন্দর রৌদ্র উঠিয়াছে। সকালেই বাহির হইয়া পড়িলাম। ওয়েবস্টারকে সঙ্গী করিলাম। উভয়ে লিঙ্কনের সমাধি-মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ছলেট নামক একজন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ হইল।

কলিকাতা হইতে আগত দর্শকের সাক্ষাৎলাভে বৃদ্ধের কি উৎসাহ। আমি বলিলাম, আমেরিকা সঙ্কল্পে আমাদের অজ্ঞতা খুবই বেশী। গত বৃদ্ধের পূর্বে এদেশকে জানিবার কৌতূহলও বিশেষ ছিল না। তবে ওয়াশিংটন ও লিঙ্কনের কথা আমরা স্কুলপাঠ্য পুস্তকে পাঠ করিতাম। বৃদ্ধ ভারতবর্ষের সঙ্কল্পে আমাকে প্রশংসা করিলেন। গান্ধীজীর সঙ্কল্পে নানা কথা জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধ তন্ন করিয়া আমাকে সমাধিমন্দিরের সমস্ত দেখাইলেন। পরে এই সমাধিমন্দিরের প্রাণস্বরূপ এইচ, ডব্লিউ, ফে মহাশয়ের গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। ফে মহাশয়ের বয়স ৮৮। এই লোলচর্ম বৃদ্ধ লিঙ্কনের পরম ভক্ত। এই সমাধির পাথ্রেই বাস করেন। লিঙ্কনের স্থতি-বিজ্ঞিত হোট-বড় বহু জিনিস সংগ্রহ করিয়া যক্ষের ধনের মত আগলাইতেছেন। আমাকে একটি একটি করিয়া সব দেখাইলেন। তন্মধ্যে লিঙ্কনের একটি ছোট চেয়ার দেখিলাম। তিনি ইহাতে বসিয়া কাজ করিতেন। বৃদ্ধ আমাকে এই চেয়ারে বসাইবেনই। পুরাতন চেয়ার। বহু স্থিতি এর সঙ্গে বিজ্ঞিত। আমার আড়াই মণি বপুকে ইহার উপর স্থাপন করিতে কিছুতেই ভরসা পাইতেছিলাম না। বৃদ্ধ নয় নাছোড়বান্দা। তাঁহার বলিলেন, “আপনি বসুন। যে চেয়ারে লিঙ্কন বসিতেন সে চেয়ারে বসিলে আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইবে।” অগত্যা চেয়ারের উপর অতি সতর্পণে বসিতেই হইল। সহসা ফে মহাশয় বলিলেন, “আপনার পিতা যখন এদেশে আসিয়া-ছিলেন তখন আমি তাঁহার নিকট একটি স্বর্ণমুদ্রা ধীর করিয়াছিলাম। আজ আপনার হাত্রে তাহা প্রত্যর্পণ করিতেছি।”

আমি প্রথমে কথটির অর্থ বুঝি নাই। বলিলাম—আমার পিতা তো এদেশে আসেন নাই।

বৃদ্ধ হাসিয়া একটি স্বর্ণমণ্ডিত মুদ্রা পকেট হইতে বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। বলিলেন, “আপনার কয়টি সন্তান?” আমি বলিলাম, “তিনটি।” বৃদ্ধ তখন আরও দুইটি মুদ্রা আমাকে দিলেন। বলিলেন, “আমার কথা বলিয়া আপনার সন্তানগণকে এই মুদ্রাগুলি দিবেন। তারা যখন এখানে আসিবে তখন আমাকে স্মরণ করিবে। আমি তো তখন থাকিব না।” মুদ্রাগুলিতে লিঙ্কনের স্থতি-মুদ্রিত। লিঙ্কনের স্থতি-চিহ্নস্বরূপ এই গিল্টিংকরা মুদ্রাগুলি লিঙ্কন স্থতি-কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত ও প্রচারিত। বিশিষ্ট অতিথিগণকে স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ এইগুলি দেওয়া হয়। তখন বৃদ্ধ ছলেট আর একটি স্বর্ণমণ্ডিত মুদ্রা আমার হাতে দিলেন। আমি



ইহাদের হৃদয়স্পর্শী ব্যবহারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আমি বলিলাম, “তিনটি তো পাইয়াছি। আর কেন?” ছোট্ট মুদ্রাটি দেখাইয়া বলিলেন, “এটি স্প্রিংফিল্ড মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক নির্মিত ও প্রচারিত। সম্পূর্ণ অল্প ধরনের।” এই সহৃদয় উপহার প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা তখন আমার ছিল না। বলিলাম, “বেশ, এটি আমার ডাইপেন্স লইবে।” এখনও ঐ মুদ্রা চতুষ্টির মধ্যে আমি বুদ্ধদয়ের তথ্য স্প্রিংফিল্ড-বাসিগণের হৃদয়ের উত্তাপ অমুভব করি। বুদ্ধ কে-র সহৃদয় মুখখানি এখনও মুদ্রাগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ করি।

বৈকালে জনৈক সরকারী কর্মচারী হোটেলের আমার সঙ্গ দেখা করিতে আসিলেন। নাম হারল্ড ব্রাডশ। ফাইনাল ডিপার্টমেন্টের গবেষণা ও সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ। এখানে আমার কাজের কিরূপ প্রোগ্রাম হইবে প্রথমে সে সম্বন্ধে আলোচনা হইল। পরে ভ্রমলোকটি বলিলেন, “স্প্রিংফিল্ডে এসেছেন। চলুন এব্রাহাম লিঙ্কনের শ্রুতিচিহ্নগুলি আপনাকে দেখাইয়া লইয়া আসি। আমি এগুলি কয়েক বার দেখিয়াছি। কিন্তু যখনই যাই তখনই পুনরায় নূতন কিছু দেখিতে পাই।”

আমি বলিলাম, “আমি সকালে লিঙ্কনের সমাধিসম্মিলন দেখিয়া আসিয়াছি।”

ব্রাডশ বলিলেন, “তবে চলুন প্রথম লিঙ্কনের নিজ বাড়ী ও পরে সালেম গ্রামে যাওয়া যাইবে। তাঁহার নিজ বাড়ী খুব কাছে। সালেম গ্রাম ১৫ মাইল দূরে।”

অদূরস্থিত লিঙ্কনের নিজ বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। একটি মহিলা গৃহের রক্ষণকার্বে নিযুক্ত এবং আগন্তুকগণের প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিতেছেন। এটি ভিন্ন লিঙ্কনের দ্বিতীয় নিজ বাড়ী ছিল না। সরকার এই বাড়ীটি কিনিয়া লইয়া লিঙ্কনের সময় যেরূপ ছিল ঠিক সেই ভাবে রক্ষা করিতেছেন। বাড়ীটি ছোট, দোতলা, খুব সাদাসিধা। উপরে নীচে তিনটি করিয়া ঘর। ঘরগুলি বেশী বড় নয়। আসবাবপত্র খুব সামান্য। একটা বৈঠকখানা ঘর একটু সাজান। ব্রাডশ বলিলেন, এঘরটি সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়। যেন একটু বেশী সজ্জিত। লিঙ্কনের সাদাসিধা অভ্যাসের সঙ্গে এটা যেন খাপ খায় না। হয়তো বা প্রেসিডেন্ট হইবার পর বিশিষ্ট অতিথিদের বসাইবার জন্য ঘরটি সাজাইয়াছিলেন। লিঙ্কন-পত্নী যে স্থানে যে চেয়ারে বসিয়া জামা প্রভৃতি বুনিতেন, লিঙ্কন যেখানে বসিয়া কাজ করিতেন সব ঠিক-সেই ভাবে আছে। সবই খুব সাদাসিধা। সাজাইবার চেষ্টাও বিশেষ লক্ষিত হয় না।

তারপর সালেমের দিকে চলিলাম। সুন্দর রাস্তা। দু'ধারে দিগন্তবিস্তৃত শূন্য প্রান্তর। ভাঙা গাড়ী চালাইতেছেন; আমি পাশে বসিয়া। নানা বিষয়ে আলাপ চলিতেছে। এ দেশে লোকবসতির বিরলতা সর্বত্রই লক্ষ্য করিতেছি।

মাঠই বেশী। শুনিলাম ভুটাই এখানকার প্রধান ফসল। একটি ছোট বনাকীর্ণ পাহাড় দেখিলাম। তাহার নীচে একটি ছোট লোহার কারখানা। পাহাড়ের উপরে সালেম গ্রাম।

আসল গ্রামটি দুই মাইল দূরে ছিল। লিঙ্কনের সময় সেখানে বহু লোকের বাস ছিল। ক্রমশঃ গ্রামটি পরিত্যক্ত হয়। জনশূন্য গ্রামটিও নষ্ট হইয়া যায়। শুধু কাঠের ঘরগুলির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান থাকে।

১৯১৮ সনে আসল গ্রামের ধ্বংসাবশেষ লইয়া এই পাহাড়ের উপর গ্রামটিকে ঠিক পূর্বের মত পুনর্গঠিত করিতে আরম্ভ করা হয়। একটি স্থানীয় লিঙ্কন-সমিতি এই কাজ আরম্ভ করেন। পরে সরকার ইহার ভার লন। লিঙ্কনের সময় যেরূপ ছিল সরকার বাড়ীগুলিকে ঠিক সেইভাবে নির্মাণ করিয়া রক্ষা করিতেছেন। ছোট ছোট কাঠের ঘর; সামান্য বিছানা। বিছানার স্নরঞ্জামের মধ্যে কাঁথাই প্রধান। আসবাব নাই বলিলেই চলে। গ্রাম্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কয়েকটি দোকান। তাহার মালপত্র অতি সামান্য রকমের। কামারশালা, মুদির দোকান, ডাক্তারখানা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে। গ্রামটি আমাদের দেশের গ্রামেরই মত ছিল বলিয়া মনে হয়। ঘরগুলিও আমাদের দেশের গ্রামের সাধারণ লোকেদের ঘরের মত। সেদিন ভারতবর্ষের গ্রাম ও আমেরিকার গ্রামে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। আজ তাহাদের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য। একটি ছোট সংগ্রহশালা আছে। তার মধ্যে লিঙ্কনের ব্যবহৃত অনেক জিনিস রিড্যুমান। ব্রাডশ একটি শীল-করা পেট্রার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। লিঙ্কনের পুত্র এটি উপহার দেন। এর মধ্যে লিঙ্কনের বহু চিঠিপত্র আছে। পেট্রাটি দিব্যর সময় লিঙ্কনের পুত্র একটু সতর্ক করিয়া দেন যে ১৯৪৭ সনের অমুক মাসের পূর্বে এ পেট্রা যেন খোলা না হয়। তাই এতদিন ইহা বন্ধই আছে। ব্রাডশ বলিলেন, “আমি কয়েক বার এখানে আসিয়াছি। অথচ এই পেট্রাটি দেখি নাই।” ইহা খুলিবার দিন যে এত নিকটবর্তী তাহাও লক্ষ্য করি নাই। দেখুন, আমি ঠিকই বলিয়াছি যে, এখানে আমি যখনই আসি তখনই নূতন কিছু দেখি।

আমি—“আচ্ছা খুলিবার তারিখ সম্বন্ধে এইরূপ সতর্ক অর্থ কি?”

ব্রাডশ—“এই সমস্ত চিঠির মধ্যে পরিবারের অনেকের ব্যক্তিগত কথাবার্তা নিশ্চয়ই আছে। তাহাদের জীবিতকালে সেগুলির প্রকাশ হয়তো তাঁহারা পছন্দ করিবেন না। সেজন্যই এই সতর্ক।”

অন্ধা-বিনয় চিন্তে এই সব দেখিলাম। এই কাঠ-কুঁড়ির (লগ কেবিন) হইতেই লিঙ্কন হোয়াইট হাউস বা “সাদা



লক্ষ্য করিলাম। উইলার্ড আইস যুবক, সম্পূর্ণ অন্ধ। অথচ ইনি ট্যাক্স আইনে একজন বিশেষজ্ঞ। ইহাদের বিবিধ ট্যাক্স সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জ্ঞান আমার সঙ্গে-রেভিনিউ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ একটি বৈঠকে মিলিত হন। তাহাতে এই অন্ধ যুবকটির আইনজ্ঞান দেখিয়া বিশ্বয় বোধ করিয়াছিলাম।

২৫শে ডিসেম্বর বুধবার বড়দিন। বেলা এগারটায় রেল-যোগে স্প্রিংফিল্ড ত্যাগ করিলাম। দুটায় শিকাগো আসিয়া অল্প ট্রেনে রাত আটটার সময় ম্যাডিসন নগরে পৌঁছিলাম। ম্যাডিসন উইসকন্সিন স্টেটের রাজধানী। শিকাগো হইতে প্রায় ১৪০ মাইল উত্তরে। উইসকন্সিন রাজ্যের বৃহত্তম নগর মিলওয়াকি পথে পড়িল।

ম্যাডিসন ছোট শহর। জনসংখ্যা ৮৫০০০। উইসকন্সিন রাষ্ট্র কৃষিপ্রধান। পনির প্রস্তুত করিবার জ্ঞান বিখ্যাত। এই রাষ্ট্রে সহস্র স্বাভাবিক হ্রদ বিস্তৃত। গ্রীষ্মকালে মৎস্যশিকারে ও প্রমোদভ্রমণার্থে এখানে বিশ্বের লোকসমাগম হয়। ম্যাডিসন নগরটি এইরূপ দুইটি হ্রদের মধ্যস্থলে অবস্থিত। হ্রদ-দ্বয়ের নাম মেনোনা ও মেণ্ডোটা। মেণ্ডোটার আয়তন ২১ বর্গমাইল। মেনোনা তাহার অর্ধেক। মেনোনার অধূরে ক্যাপিটল এবং অগ্ৰাছ সরকারী ভবন। মেণ্ডোটার পারে উইসকন্সিন বিশ্ব-বিদ্যালয়। আমার হোটেলটি ছিল ক্যাপিটলের খুব কাছে। নাম হোটেল লোরেন। হ্রদ-দ্বয়ের কোনটির পারেই প্রশস্ত রাজপথ নাই। তবে প্রত্যেকটির তীরেই বসিবার ও ঘুরিবার স্থান আছে। মেণ্ডোটার পারে সীতারের ক্লাবও আছে। শীতে সব জায়গাই জনশূন্য; আশেপাশে শুধু শুষ্ক পাকার বরফ। কিন্তু দেশের এ হিমাবগ্ধিভ রূপ অতীব নয়নগ্রহণকর। বিশ্ব-বিদ্যালয়টির বেশ নাম আছে। কিছু ভারতীয় ছাত্র এখানে পড়িতেছে।

যে কয়দিন এখানে ছিলাম মেঘ বৃষ্টি ও বরফের খেলাই দেখিয়াছি। যে তাপে বরফ গলে সাধারণতঃ তাপ তার চেয়ে ১০।১৫ ডিগ্রি নীচে থাকে। কখনও আরও নীচে নামিয়া যায়। রোদ উঠিলে ঠাণ্ডা বেশী হয়। একটু ঠাণ্ডা কমিলেই মেঘ হয় এবং বৃষ্টি বা বরফ পড়ে। বরফ তো আর গলে না, কাজেই শীত বতাই প্রচণ্ড হয় ততই বরফের স্তূপ উঁচু হয়। রাস্তাগুলিকে কঠোরপটে চলনসই করিয়া রাখা হয়। প্রায়ই কুয়াশা ও ধোয়া হয়। ‘মোক’ (ধোয়া) এবং ফগ (কুয়াশা) কথা দুইটির সংমিশ্রণ করিয়া ইহার নামকরণ করিয়াছে ‘মগ’। এখানকার বাজেট-ডিরেক্টর ই সি. গিজেল আমাকে বলিলেন, “এবার তো বরফ কম।” অগ্ৰবার অন্ততঃ হুইট-সমান বরফ এ সময় হয়-ই। আর আপনি সেটপলে যাইতেছেন। সেখানে দেখিবেন কোমর-সমান বরফ।”

এই স্টেটে একটি প্ল্যানিং বোর্ড দেখিলাম। ১৯২৯ সন

হইতে বোর্ডটি আছে। এত আগে স্বতন্ত্র প্ল্যানিং বোর্ড অল্প কোন রাষ্ট্রেই গঠিত হয় নাই। কিন্তু ইহার উপর রাষ্ট্রীয় সরকারের নীতির খুব বেশী প্রভাব লক্ষ্য করিলাম না। স্থানীয় সরকারগুলির উপদেষ্টা হিসাবেই ইহার কাজ সমধিক।

২৭শে ডিসেম্বর সকালে ট্যাক্স বিভাগের কমিশনার এ. ই. ওয়েগনার মহাশয়ের আপিসে যাই। তাহার সেক্রেটারী আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, “বিশেষজ্ঞরূপী কার্যে ওয়েগনার মহাশয়ের মিনিট পাঁচেক দেবী হইবে। সেজ্ঞান তিনি খুব চুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি, আপনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন।”

সেক্রেটারী মহাশয় তখন নানা বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করিলেন। বলিলেন, “দু’দিন আগে আপনাকে পাইলে আমাদের খুব সাহায্য হইত।” আমি বলিলাম—“কি ব্যাপার বলুন দেখি।”

মহিলাটি বলিলেন, “আমার ছোট বোনের এক বন্ধু ভারতবর্ষে আছেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে একটি শাড়ী বড়দিনের উপহার-স্বরূপ আমার বোনকে পাঠাইয়াছেন। শাড়ীটি পরম মনোরম। কিন্তু আমরা কেহ পরিতে জানি না। ভদ্রলোক অবশ্য শাড়ী পরিবার নিয়ম সম্বন্ধে অনেকগুলি ফটো সহ-ছাপান উপদেশাবলী ভারতবর্ষ হইতে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও আমাদের ভুল হইতেছিল। পরে এক লাইব্রেরিতে গিয়া একখানি মাসিক পত্রিকা লইয়া আসি। তাহাতে শাড়ী পরিবার নিয়ম সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সহ একটি প্রবন্ধ ছিল। তাহা দেখিয়া আমরা দু’জনে মিলিয়া শেষে কৃতকার্য হই। কি সুন্দর শাড়ী। পরিবার পর আমার বোনকে অপূর্ব স্নানদী দেখাইতেছিল। আপনাদের দেশের মেয়েরা কি সর্বদা ঐরূপ শাড়ী পরেন?”

বলিতে বলিতে মহিলাটির কণ্ঠ গদগদ হইয়া উঠিল। অচিরাগত ওয়েগনার মহাশয়ের সহিত সরকারী কর-সংগ্রহ-বিষয়ক নানাবিধ আলোচনান্তে হোটেল ফিরিলাম।

২৮শে ডিসেম্বর শনিবার। বহুমতী হিমায়তা; প্রকৃতি ‘মগে’ আচ্ছন্ন। বিশেষ কাজ না থাকিলে কেহ বাহিরে আসে না। বেলা-দুটায় বিমানযোগে ম্যাডিসন ত্যাগ করিয়া বেলা চারটায় সেন্ট পল বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছিলাম। উপর হইতে শুধু তুমারায়ত বিস্তীর্ণ প্রান্তরই দৃষ্টিগোচর হইল। রচেষ্টার নামক একটি স্টেশনে বিমানটি নামিয়াছিল।

ম্যাডিসন হইতে সেন্ট-পল বিমানযোগে ২৩০ মাইল। ইহা আমেরিকার উত্তর সীমানাস্থ মিনেসোটা রাজ্যের রাজধানী। বিমানঘাঁটি হইতে মোটরযোগে হোটেল আসিতে এক ঘণ্টা লাগিল। শু’ড়ি শু’ড়ি বরফ পড়িতেছে। সর্বত্র বরফে ঢাকা। মিসিসিপি নদীর পাশ দিয়া আসিতেছি। নদীর জল জমিয়া গিয়াছে। নদীর নিকটেই আমার হোটেল। নাম হোটেল

লাউরী। নির্দিষ্ট ঘরে চুকিয়া দেখি ঘরের রেডিওটি খোলা রহিয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শী কতৃক একটি অগ্নিকাণ্ডের ধ্বংসলীলার সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। বুঝিলাম শহরে একটি খুব বড় এলিভেটরে আগুন লাগিয়াছে। দশ লক্ষ বৃশেল গম সহ এলিভেটারী পুড়িয়া যাইতেছে।

পর দিবস ১৯শে ডিসেম্বর রবিবার। আকাশ হইতে শেফালিকা ফুলের মত বরফ ঝরিতেছে। সর্বত্র শুপাকার বরফ। বিকালে বরফ পড়া বন্ধ হইল। বেশ রোদ উঠিল। কিন্তু ঠাণ্ডা খুব বেশী। পরিষ্কার আকাশে উজ্জ্বল সূর্য। সূর্যের দিকে তাকান যায় না। উজ্জ্বল সৌর্য মনকে বাহিরে টানে। কিন্তু বাহিরে আসিলেই ঠাণ্ডায় জমিয়া যাইতে হয়। রোদের কোনই তাপ নাই; বরফ গলাইবার ক্ষমতাও নাই। বিকালের দিকে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু রাস্তায় হাঁটা যায় না। পিচ্ছিল বরফের উপর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে যে-কোন সময় পা ফসকাইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। আপাদ-মস্তক নানাবিধ গরম কাপড়ে ঢাকা থাকিলেও নাক ও মুখের অনাবৃত অংশ যেন জমিয়া যায়। হোটেলের মধ্যে তাপ ৭০ বা ৭৫ ডিগ্রী। বাইরের তাপ শূন্যের উপরে কচিং উঠে। কখনও শূন্যের ১৭।১৮ ডিগ্রী নীচে নামিয়া যায়। বাহিরে আসিবামাত্র নাক-হইতে খানিকটা স্বচ্ছ জল গলিয়া পড়িল। কোর্টের উপর-তাহা জমিয়া শক্ত হইয়া গেল। ট্রামে প্রবেশ করিলে গলিয়া ঝরিয়া গেল। ট্রামের মধ্যে কেন্দ্রীয় তাপ ব্যবস্থা আছে। নচেৎ তাহার মধ্যে অধিকক্ষণ বসা সম্ভব হইত না। ট্রামে শহর দেখিতে দেখিতে চলিলাম।

সেন্ট পল ও মিনিয়াপলিস নামক শহর দুইটি পরস্পর-সংলগ্ন। কোথায় এক শহরের সীমানা শেষ হইয়া অল্প শহর আরম্ভ হইল তাহা বলিয়া না দিলে বুঝা সম্ভব নয়। ইহারা যমক-শহর নামে সুপরিচিত। গুরুত্ব, আকারে ও লোক-সংখ্যায় মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে শিকাগোর পরেই যমক-শহরের স্থান। শহরদ্বয় বাণিজ্যপ্রধান। লোকসংখ্যা আট লক্ষ। কাঁচা লোহা ও গম চালান দিবার কারবারই এখানকার বড় কারবার। আটা ও ময়দার বড় বড় কলও এখানে অনেক। মিনেসোটা রাজ্যের উত্তর প্রান্তে বড় বড় লোহ-খনি আছে। এ অঞ্চলে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। রাজ্যের উত্তর সীমানায় সুপিরিয়র হ্রদ। সুপিরিয়র হ্রদের তীরে ডুলুথ বন্দর। বন্দরটি যমক-শহর হইতে কিকিদ্দিক শত মাইল দূরে অবস্থিত। ওপারে কানাডা, রাজ্যের পোর্ট আর্থার নামক বন্দরে পৃথিবীর বৃহত্তম গমের আড়তসমূহ বিद्यমান। কানাডায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর সীমানায় সুপিরিয়র হ্রদ, মিসিসিপ্পি হ্রদ, ছরণ হ্রদ, ইরী হ্রদ, অণ্টেরিও হ্রদ-প্রভৃতি বড় বড় হ্রদ পর পর সাজান রহিয়াছে। এই হ্রদমালা স্থানে স্থানে খালদ্বারা সংযুক্ত হইয়া সেন্ট লরেন্স নদীর সঙ্গে মিলিত

হইয়াছে। সেন্ট লরেন্স মন্টিয়াল নগরের পাদদেশ দ্বীত করিয়া আটলান্টিকে পতিত হইতেছে। ডুলুথ ও পোর্ট আর্থার বন্দরদ্বয় হইতে এ অঞ্চলের বহু মালপত্র জলপথে দেশের ভিতরে ও আটলান্টিকের পথে দেশের বাহিরে রপ্তানি হয়। বন্দর হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নিউ ইয়র্কের পরেই ডুলুথের স্থান। এখান হইতে মিনেসোটার কাঁচা লোহা বিশ্ববিখ্যাত পিট্‌সবার্গের লোহার কারখানায় প্রেরিত হয়। যমক-শহরের যাবতীয় বাণিজ্যপ্রবাহ ডুলুথের পথেই যাতায়াত করে। যমক-শহর হইতে ডুলুথের দূরত্ব শতাধিক মাইল। ডুলুথে ও সেন্ট পল-মিনিয়াপলিসে বড় বড় ‘এলিভেটর’ আছে। এক একটি এলিভেটর লক্ষ লক্ষ গম চালান দেয়। ইহারা বস্তা ব্যবহার করে না। যন্ত্রসাহায্যে রাশি রাশি গম শুদাম, গাড়ী বা জাহাজে স্থানান্তরিত করে। ‘এলিভেটর’ের ব্যবহার যত বেশী হইবে পাটের চাহিদা তত কমিবে। এই হিসাবে ‘এলিভেটর’ পাটের প্রতিযোগী।

ট্রামে চলিতে চলিতে ছ’ধারে সুন্দর সৌধশ্রেণী দেখিতেছি। আমেরিকার সমস্ত শহরের মত এই যমক-শহরও সুসজ্জিত এবং সমান ও সমান্তরাল পথশ্রেণী দ্বারা বিভক্ত। রাস্তায় পথচারী নাই বলিলেই হয়। লোক ঘর হইতে বাহির হইয়া যত শীঘ্র পারে ট্রাম বা অটো যানে আরোহণ করে। রাস্তায়, প্রান্তরে, বাড়ীর ছাদে, গাড়ীর মটকায়, গাছের নগ্ন শাখায় শুধু বরফের স্তূপ। মিউনিসিপ্যালিটির বরফ-ঠেলা গাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গাড়ীগুলির সামনে বিরাট পাখা। সেই পাখা দিয়া রাস্তার মধ্যস্থলের বরফ স্তূপ ঠেলিয়া দিতেছে। তাহাতে রাস্তার পাশে পর্বত-প্রমাণ বরফ জমিতেছে। পরে বরফ-বাহী গাড়ী আসিয়া যন্ত্রসাহায্যে সেই বিরাট স্তূপকে উড়াইয়া গাড়ীর মধ্যে ফেলিতেছে, আর শহর হইতে দূরে লইয়া গিয়া সেই বরফরাশি রাখিয়া আসিতেছে। ট্রাম লাইনের পাশেই গত দিনকার অগ্নিদগ্ধ এলিভেটরটি দেখিলাম। বিরাট ‘এলিভেটর’। বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া সম্পূর্ণ ভস্মীভূত অবস্থায় ইহা পড়িয়া আছে। তখনও স্থানে স্থানে আগুন জলিতেছে। বরফ আগুনের মধ্যে পড়িয়া গলিতেছে। পাশে সরিয়াই আবার জমাটবদ্ধ হইয়া যাইতেছে। এইরূপে স্থানে স্থানে বহু জটাজুট সৃষ্টি হইয়াছে। নিকটেই মিসিসিপ্পি নদী। নদীর উপর সুদৃশ্য সেতু। তাহার উপর দিয়া ট্রাম লাইন গিয়াছে। নদীর জল জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। মার্চ পর্যন্ত এই বরফ বাড়িবে। তারপর যখন এই দিগন্তবিস্তৃত বরফরাশি গলিতে শুরু করিবে তখন মিসিসিপ্পি নদীর দক্ষিণাংশে বস্থা দেখা দিবে। এই বস্থা নিবারণ করাই টেনেসি উপত্যকা কতৃপক্ষের অত্যন্তম কর্তব্য। শহর ঘুরিয়া ফিরতি ট্রামে হোটেল আসিলাম। তখন এটা বাজিয়াছে। তাপ শূন্য ডিগ্রী। রাত্রে তাপ শূন্যের ১৩ ডিগ্রী নীচে নামিয়া গেল।

৩০শে ডিসেম্বর সোমবার সকালে মিনিয়াপলিসের মিউনিসিপ্যাল আপিসে গেলাম। সেখানে শিকাগোর ১৩১৯ নং বাড়ীর পাব্লিক এডমিনিষ্ট্রেশন সার্ভিসের কতিপয় বিশেষজ্ঞ কাজ করিতেছিলেন। নগরের শাসন-প্রণালীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধান মানসে মেয়র মহাশয় এই সমিতিতে নিযুক্ত করিয়াছেন। সমিতির বিশেষজ্ঞগণ শাসনযন্ত্রের সমস্ত অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতেছেন। ইহাদের প্রাথমিক রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করিয়া ইহাদের কর্মপদ্ধতি দেখিলাম। ইহাদের মধ্যে হেষ্টিংড নামক জনৈক ইঞ্জিনিয়ার যুবক আমাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিতেছিলেন। ইহাকে লইয়া নিকটস্থ একটি হোটেলের মধ্যস্থ-ভোজন সমাপন করিলাম। আপিসে ফিরিবার পথে দেখি বেশ রোদ উঠিয়াছে। পরিষ্কার নীলাকাশ। ধরণী রৌদ্রস্নাত। উজ্জ্বল জ্যোতির্মান্ব সূর্য। তাহার দিকে তাকান যায় না। কিন্তু রৌদ্রের একটুও তাপ নাই। বরফ গলাইতেও সে রোদ্র অসমর্থ। সূর্যের অব্যবহিত রূপ আমাদের কল্পনাতীত। আমি হেষ্টিংডকে বলিলাম, “আমাদের পুরাণে আছে যে এক অহুর সূর্য্যকে শাসন করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন যে পদ্মফুল ফুটাইতে যতটা তাপ প্রয়োজন তাঁর বেশী তাপ সূর্য্য প্রকটত করিতে পারিবেন না। কিন্তু এদেশে দেখিতেছি সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বলতা আছে, তাপ আদৌ নাই। সূর্য্যের আর এক রূপ দেখিয়াছি নবেম্বর মাসে লণ্ডনে। ষোঁয়াটে আকাশে নিম্নেজ সূর্য্য। সে সূর্য্য রোদ্র বিকিরণ করে না। চিত্রিত সূর্য্যের ছায় তাহার দিকে যতক্ষণ ইচ্ছা তাকাইয়া থাকা যায়। সূর্য্যের সে রূপ তবুও আমরা কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু এ রূপ ভাবিতেই পারি না। এ সূর্য্য আমাকে বহুবার বিভ্রান্ত করিয়াছে। বসে বসিয়া ভাবিয়াছি যে একটু রোদ পোহাইয়া আসি। বাহিরে আসিয়া হতাশ হইয়াছি।”

হেষ্টিংড আমাকে ক্যাপিটল ভবনে লইয়া গেলেন। সেখানে সকলের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়া তিনি স্বকার্যে ফিরিয়া গেলেন। সরকারী আপিসগুলির বেশীর ভাগ এই ভবনে অবস্থিত। কতকগুলি আপিস রাস্তার ওপারে আর

একটি বাড়ীতে। দুইটি বাড়ীর মধ্যে মাটির নীচে দিয়া সুড়ঙ্গ-পথ আছে। শীতের অত্যধিক প্রকোপের জন্ম এইরূপ ব্যবস্থা। এখানে ডিস্কল ও আর্লবার্গ নামক দুই জন কর্মচারী আমাকে যথাসম্ভব সহায়তা করেন। ডিস্কলের পদবী কমিশনার অব এডমিনিষ্ট্রেশন আর আর্লবার্গ তাহার সহকারী।

পরদিনের কর্মসূচী স্থির করিয়া বৈকালে হোটেল ফিরিলাম। ঐদিন বেশ রোদ ছিল। সকাল ন’টায় তাপ ছিল শূন্যের দশ ডিগ্রী নীচে। সর্বোচ্চ তাপ চার ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিয়াছিল। তখন বেলা ২টা। বৈকাল ৬টায় তাপ নামিয়া শূন্যে আসিল। রাত্রি ২টায় শূন্যের ষোল ডিগ্রী নীচে নামিয়া গেল।

বৈকালে হোটেল লাউঞ্জে বসিয়া আছি। লোকজন আসিতেছে, যাইতেছে। একটি বৃদ্ধ আমার পাশে আসিয়া বসিলেন। প্রশ্ন করিলেন—

“আপনি কোন্ দেশের লোক?”

আমি—“ভারতবর্ষের”

বৃদ্ধ—“ইংরেজ কি আপনাদিগকে বাধীনতা দানে কৃতকার্য হইবে?”

কথাটা কানে ঠেকিল। একটি ইংরেজী প্রবাদবাক্য আরম্ভ করিলাম—“ইচ্ছা থাকিলে উপায় হইবেই।”

বৃদ্ধ—“আমাদের ভারতবর্ষে কোন স্বার্থ নাই। কাজেই ওদেশের খবর বিশেষ রাখি না। চীনে আমাদের কিছু স্বার্থ আছে। কাজেই চীনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ উদ্বেগ আছে।”

আমি—আমরাও গত যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকার বিশেষ খবর রাখিতাম না। অবশ্য জর্জ ওয়াশিংটন ও এড্রাহাম লিঙ্কনের নাম অনেকেই জানিতেন।”

বৃদ্ধ মিনেসোটার হুলমালার সৌন্দর্য এবং আকর্ষণের কথা বলিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ উঠিয়া গেলে ভাবিলাম এমন কার্ট-খোটা কথাবাতা এদেশে তো কাহারও কাছে শুনি নাই। বৃদ্ধের কথার মধ্যে ঘৃণাও নাই, ঈর্ষিও নাই। ভারতবর্ষ ও ইংরেজ-শাসন সম্বন্ধে এখানে ওখানে হু-একটি কথা শুনিয়া তাহার মনে যেটুকু দাগ লাগিয়াছে তাহাই সরলভাবে প্রকাশ করিলেন মাত্র।

## বাসন্তী স্মৃত

বিশুদ্ধ দুর্জাত

টেলি—বাসন্তী বি

ফোন—বি, ৫৭৩৮

পো: বঙ্গ ৬৮৩৬ কলি:

বি, সুগারমার্কেটস্, একস্পোর্টারস্, ইম্পোর্টারস্ ও  
জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ারস্

প্রমথনাথ পাল এণ্ড সন্স

২সি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা—৭



## বাংলার বাচ

শ্রীশান্তি পাল

পৃথিবীর অত্যন্ত দেশের মত বাংলাদেশেও অরণ্যভীত কাল হইতে মানুষ জলকে জয় করিবার জন্ত নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে। সেই সুদূর অতীত হইতে জলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্ত মানুষ কত রকমের জলযান আবিষ্কার করিয়াছে ও করিতেছে তাহার সীমা-পরিসীমা নাই। নদীমাতৃক বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বাংলাদেশের মাঝিমাল্লারা আগেকার দিনে যে সেই সকল জলযানে আরোহণ করিয়া দেশ-বিদেশে যাতায়াত করিত এ তথ্য আমরা বহু প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে পাই।

সেকালের নাবিক বা মাঝি-মাল্লাদের ভিতর যে রীতিমত পাল্লা দেওয়া চলিত তাহার অনেক প্রমাণ পুথিপত্রে আমরা পাই। এই বাচখেলার ভিতর দিয়া বাংলাদেশের ভদ্র-ইতর নির্বিশেষে সকলেই শক্তিচর্চা বা শরীরচর্চা করিত। জন-সাধারণও ইহা হইতে প্রচুর আমোদ উপভোগ করিত। তাই এক সময়ে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে পাল-পার্কিং বাচ-উৎসব অনুষ্ঠিত হইত।

ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া গ্রামের বাচ-প্রতি-

যোগিতার বিবরণ হইতে পূর্ববঙ্গের বাচ সম্পর্কে অনেক কিছুর জানিতে পারি। ঐ অঞ্চলের বাচের বিশেষত্ব এই যে, এখানকার বৃহদাকারের বাচের নৌকাগুলিতে একসঙ্গে পঞ্চাশ-ষাট জন মাঝি বৈঠা হাতে শ্রেণীবদ্ধভাবে বসিয়া স্বচ্ছন্দে নৌকা বাহিতে পারে। সেই সকল বাচ নৌকার গলুই পনের হইতে কুড়ি হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। এখানে অনেক সময় নৌকার মালিকের নামানুসারে নৌকার নামকরণ হইয়া থাকে। যথা—শুধিয়ামধু, বৃধিয়ামধু, বাসের-নাও ইত্যাদি। কোটালীপাড়ার বাচ-প্রতিযোগিতায়ও বাংলার অত্যন্ত স্থানের ছায় এক এক বাচ-দৌড়ে সাধারণতঃ দশ-বারখানি নৌকা যোগদান করিত, কিন্তু বর্তমানে তাহার সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

কোটালীপাড়ায় সাধারণতঃ দুই প্রকার বাই-নৌকা বা বাচারী নৌকা ব্যবহৃত হয়। ইহার একটিকে প্রকৃত বাচারী ও অপরটিকে জেলে-বাচারী বলে। বাচ-বাচারী ও জেলে-বাচারীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, বাচ-বাচারীর গলুই কিঞ্চিৎ লম্বাটে ধরণের এবং ইহার গঠনসৌষ্ঠবও অপেক্ষাকৃত উচ্চত্বের।

## নেতাজীর অনুসরণে :-

বাংলার বিখ্যাত স্বত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাহার “শ্রী” মার্কী স্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিম্নপ্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ স্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকরাবুর বিশুদ্ধ স্বত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা স্বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

জেলে-বাচারীর গলুই ছোট এবং গঠনসৌষ্ঠব বাচ-বাচারীর তুলনায় অনেকাংশে হীন। বাচ-বাচারী অনেকটা ছিপের মত আকৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ দীর্ঘ ছাঁচের তৈয়ারী। জেলে-বাচারীর গঠনপ্রণালীর বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে ডরার দিকটা কিঞ্চিৎ ফাঁক থাকে। কারণ, এই নৌকাগুলি এমনভাবে তৈয়ারী যে, ইহাতে বাচখেলা ও মাল-বহন দুই কাজই সম্পন্ন হইতে পারে; অর্থাৎ বাচের সময় বাচখেলা এবং অল্প সময় মহাজনী নৌকার মত ব্যবহার করা চলে। বাচারীর গলুই অতিশয় লম্বা ধরণের হওয়ায় তাহা জেলে-বাচারীর মত জলপথে দৈনন্দিন খর-সংসারের কাজকর্ম চালাইবার উপযোগী নহে, তবে কোন কোন স্থানে-ঐ ধরণের নৌকায় ধান বোঝাই করিয়া আনিতে দেখা যায়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রকৃত বাচারী নৌকাগুলি সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ হইতে ষাট হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। এই 'হাতে'র মাপ কিন্তু সাধারণ হাতের মাপ হইতে কিঞ্চিৎ বেশী। ছোট আকারের বাচারী-অর্থাৎ জেলে-বাচারীগুলি সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে পনের হইতে কুড়ি হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। এই শ্রেণীর নৌকাগুলিকে সময় সময় বাচ-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেও দেখা যায়। বড়-নৌকাগুলিতে পঞ্চাশ-ষাট জন মাঝি আরোহণ করে। আরোহীদের ভিতর সকলেই

নৌকার দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধভাবে হাতবৈঠা লইয়া বসে। নৌকার মাঝখানে মালিক ও মোড়লশ্রেণীর পাঁচ-সাত জন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া থাকেন এবং টিকারা ও কঁাসরের তালে তালে নানাধরকার অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাচিয়া নাচিয়া ও মিছেদের রচিত গান গাইয়া মাঝি-মাল্লাদের উৎসাহিত করেন। রহং বাচারীর আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, বাচের সময় তাহাতে দুই জন-করিয়া মাঝি হাল ধরিয়া থাকে। গ্রামের ওস্তাদ ও পুরাতন মাঝিরাই এই হাল ধরার কার্যে নিযুক্ত হয়। কারণ বাচের সময় নিপুণতার সহিত হাল না ধরিতে পারিলে বিশেষ বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে।

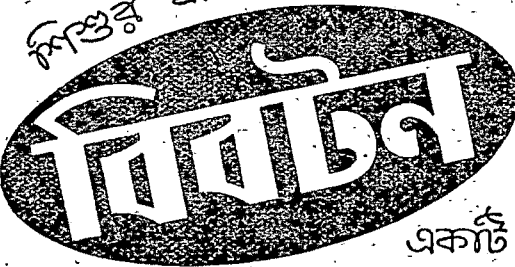
নদীবক্ষ বিস্তৃত হইলে বাচের সময় একসঙ্গে আট হইতে দশখানি নৌকা ছাড়া হয়। কিন্তু নদীর বুক অপরিসর হইলে তিন-চারিখানির বেশী একসঙ্গে ছাড়া হয় না। পূর্বে কোটালীপাড়ায় বহুস্থানে বাচ খেলা হইত। উৎসাহের অভাবে এবং নানারূপ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতায় ইদানীং অনেক স্থানে বাচের রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে। তবে এখনও বিশ্বকর্মা পূজা, শারদীয়া যজ্ঞপূজা, দশহরা অর্থাৎ বিজয়া দশমীর দিন এবং লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে চৌধুরীর হাট, ঘাঘর, বাহির শিমুল, রাধাগঞ্জ বুকুয়া, বিলবাঘিয়া প্রভৃতি স্থানে নামমাত্র বাচ-খেলা

## মায়ের কণ্ঠস্ব

শিশুপালনের সম্যক জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন শিশুদের দৈহিক সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অধিতীয়। ভিটামিন ডি, বি<sub>১</sub>, বি<sub>২</sub> সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দশমোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। বিবটন নিয়ন্ত্রিত রোগে বিশেষ উপকারী:—শিশুদের যকৃতের গীড়া, অজীর্ণতা, দুধ তোলা পেট ফাঁপা, কোটকাঠি, রক্তশূন্যতা, রক্ততা, ব্রুইটিস, রিকেটস ইত্যাদি।

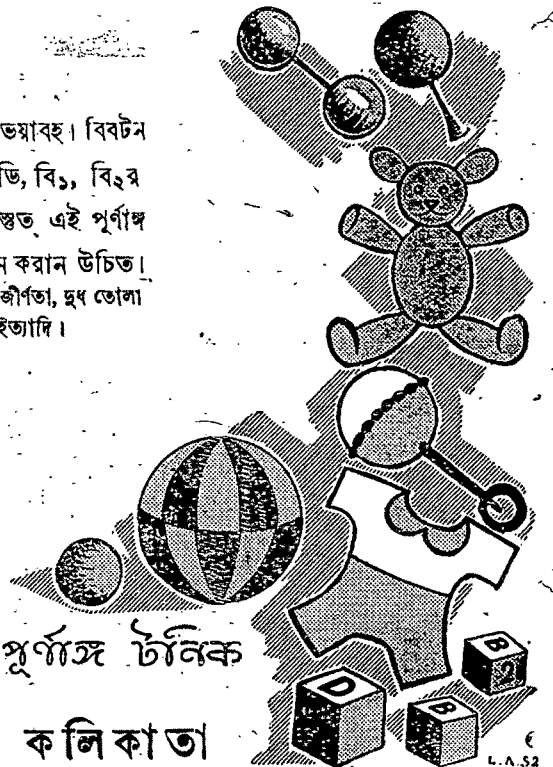


শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য



একটি পূর্ণাঙ্গ টনিক

নিষ্ঠার এন্টিসেপটিকস্ • কলিকাতা





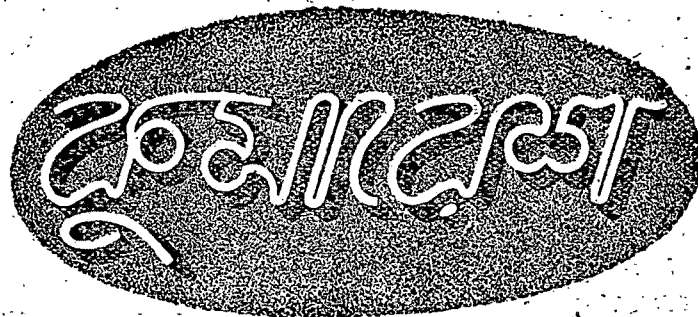
## “মধ্য দিনে যবে গান বন্ধ করে পাখী”

গ্রীষ্মের খরবোদ্ধে যখন পাখী পর্যন্ত তার গান বন্ধ করে, গাছপালা কালবৈশাখীর ক্ষণবর্ষণের প্রতীক্ষায় উর্দ্ধমুখে চেয়ে থাকে, মাঠের বুক ফেটে বেরিয়ে পৃথিবীর তপ্তশ্বাস—তখন মানুষের দেহেও লাগে তার দহনের জ্বালা।

গ্রীষ্মে মানুষের দেহের রসও শুকিয়ে আসে, তাই তার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়,—দেখা দেয় উদরাময়, কলেরা প্রভৃতি পীড়া ও মহামারী।

এ সময়ে আপনার দরকার **কুমালেন্স**। কারণ **কুমালেন্স** আপনার লিভারকে সর্বল করে, নতুন রক্তকণিকা গঠনে সাহায্য করে এবং সর্বোপরি আপনার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ায়।

**কুমালেন্স** লিভার ও পেটের যে কোন পীড়া নিশ্চিত আরোগ্য ত করেই সঙ্গে সঙ্গে যে কোন রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও দেয়।



দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ এন্ড কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ

সালকিরা :: হাওড়া

হইয়া থাকে। পূর্বে ঐ সকল গ্রামে রঙ্গস্থলে পঞ্চাশ-ষাটখানি নৌকার সমাবেশ হইত। এখন পাঁচ-সাতখানির বেশী হয় না। কোটালীপাড়ায় বাচ-নৌকা এক রকম নাই বলিলেই চলে। দশ-বার বৎসর পূর্বে সেখানে অশ্রুণ ছোটবড় চল্লিশ-পঞ্চাশখানি বাচ-নৌকা বা বাচারী একত্র দেখা যাইত। উৎসবক্ষেত্রেও যেরূপ জনসমাগম হইত এখন তাহার এক-অষ্টমাংশও হয় কিনা সন্দেহ। সবই যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। কোটালীপাড়ার এ বিষয়ে এমন অবনতি হইয়াছে যে এখন সারা গ্রাম চুড়িলে সাত-আটখানির বেশী জেলে-বাচারী পাওয়া যাইবে না।

বাচের সময় অত্যন্ত অঞ্চলের ছায় এখানেও মাঝির। নানাপ্রকার গান গাহিয়া থাকে। তন্মধ্যে ব্রজলীলা সহকারী গানেরই প্রচলন বেশী। বাচ-নৌকা যখন মালিকের ঘাট হইতে রঙ্গক্ষেত্রের দিকে রওনা হয়, যখন গ্রাম-বধূরা বরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তখন এই গানটি কঁাসার তালে তালে গীত হয়।

“কয় নীলমণি, ও জননী।

সাজাইয়া দাও গোষ্ঠে যাব আমি।

যাব গোঁচারণে রাখাল সনে

বলাই দাদা শিঙের দিচ্ছে ধনি।

দে মা! মোহন বাঁশী মোহন চুড়া

কটিতে মা বাঁধ পীতধরা—

দেও মা গায়ে নুপুর, হাতে বলয়

রাখালবেশে সাজিয়ে দেও তুমি

(শোন মা।) গাভী বৎস রাখালগণে

সবাই চেয়ে আছে আমার পানে

আমি না গেলে মা, গোঁচারণে—

ধেহুগণ খায় না তুণ-পানি।”

আড়তে অর্থাৎ রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া এবং দুই-তিন ফ্রেপ বাচ টানিবার পর বাচ-ক্ষেত্রের দুই ধার দিয়া নৌকা ধীরে ধীরে চালাইবার সময় তাহার। ক্লক-বিরহ-কাতরা শ্রীমতীর মর্মবেদনাভোতক গান গাহিয়া থাকে।

তারপর যখন বাচ খেলা শেষ হইয়া যায়, যখন গৃহাভিমুখে ফিরিবার জন্য মাঝিরা প্রস্তুত হয়, তখন এই গানটি গাহিতে থাকে—

“বেলা-গেল সন্ধ্যা হ'ল

কানাই এবার গৃহে ফিরে চল।

ওই দেখ গগনেতে নাহি আর বেলা

গোঁঠের খেলা খেলবে কত বল?



ক্যালকাটা  
কেমিক্যাল

## দুর্লভ নয় মোটেই—

তনুদেহের পেলব-কোমলতা ও লাবণ্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্য স্বয়ং প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কাম্য-বস্তু রূপের এই ঐশ্বর্য্য। প্রাক্‌বৈজ্ঞানিক যুগে নারীর পক্ষে এ সম্পদ দুর্লভ ছিল বটে, কিন্তু একালে ‘ক্যাল-কেমিকো’র সহজে প্রস্তুত প্রসাধনী দেহের সৌন্দর্য্যকে প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে।



তুহি না বিউটিফিক  
যে নুকা চম্পেট পাউডার  
লাবনী স্নো এবং ক্রীম

ডেকে বলে বলাই ও নীলমণি  
তোর লাগিয়া কাদিছে জননী  
চল রে সকাল সকাল গৃহতে যাই  
গোঠের খেলা সাক্ষ হ'ল।”

শেষে নৌকা মালিকের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলে, বাচ-  
খেলোয়াড়রা বাই-নৌকা হইতে নামিয়া গুরুজনদিগকে প্রণাম  
করিয়া তাঁহাদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করে। কোটালীপাড়ায়  
মাঝি-মাল্লাদের ভিতর এখনও পর্যন্ত এই প্রথা বজায় রহি-  
য়াছে। এখানকার বাচখেলায় যারা অগ্রণী তন্মধ্যে স্বর্ঘ্যকান্ত  
হাজরা, অধরচন্দ্র বাড়াই—প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-  
যোগ্য। মুসলমানদের কোন বাচারী-নৌকা কোটালীপাড়ায়  
আর বড় একটা দেখা যায় না। তাহারাই ছুই তিন বৎসর  
হইতে আর প্রতিযোগিতায় যোগদানও করে না।

মুশিদাবাদ বা অত্যাচ্ছ জেলায় বাচখেলার সময় ‘জারি’  
গান গাওয়া হয়।

ঢাকা অঞ্চলে বাচখেলার সময় যে সকল গান গাওয়া  
হয় তাহার একটি নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল। বাচ-খেলায়  
হারিয়া গেলে মাঝিরা এই ধরণের করুণরসায়ক গান গাহিয়া  
থাকে—

“নিমাই সন্ন্যাসের কথা মায় যেন শোনে না,  
আমি যাবো ঐ বুল্লাবনে, আমার মা যদি শোনে  
শুনলে পরে শরীরাগী বাঁচবে না প্রাণে।

আমি মায়ের একা পুত্রধন—

আমি বিহন মায়ের এ সংসার সং-সারের জীবন”।

আমার মায়েরে তোমরা করো সাঁত্থনা।”

খুলনা বরিশাল অঞ্চলে বাচের সময় যে ধরণের ‘জারি’  
গান গাওয়া হয় তাহারও সংকিঞ্চ নমুনা দিলাম। নৌকা  
ছাড়িবার পূর্বে মাঝিরা এই গান গাহিয়া থাকে—

“গুরুমান পথ চেন কেন বেড়াও ঘুরে

হাট করতে এসেছ বান্দা ভবের হাটুরে।

ভবের হাটে এসে বান্দা বেচ কেন খাও

আলিঙ্গি কর না বান্দা আল্লার নাম নাও।”

এইবার আমরা কলিকাতার উপকণ্ঠের পল্লী অঞ্চলের  
আধুনিক বাচের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই  
প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্বে আমরা বালি, উত্তরপাড়া,  
বরাহনগর, বেনিয়াটোলা, আহিরীটোলা, বাগবাজার প্রভৃতি  
অঞ্চলের বাচ-সংস্কার বিষয় মোটামুটিভাবে আলোচনা করি-  
য়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আড়িয়াদেহের প্রসিদ্ধ বাচ সম্পর্কে

## কৃত্তিবাস রচিত

# সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

স্বনামধন্য ব্রাহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

সুবিখ্যাত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকৃষ্ট

অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইল

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রসিদ্ধ অংশবর্তিত মূলগ্রন্থ অনুসারে ৫৮৬ পৃষ্ঠায় সুসম্পূর্ণ।  
ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের আঁকা রঙীন যৌলখানি এবং এক বর্ণের তেজস্বিনী শ্রেষ্ঠ ছবি  
আছে। রঙীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিত্রশালা হইতে সংগৃহীত ছবির অনুলিপি। অন্যান্য  
বহুবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্রাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রবি বর্মা, নন্দলাল বসু, সারদাচরণ উকীল,  
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুস্কর, অসিতকুমার হালদার, স্বরেন গঙ্গোপাধ্যায়,  
শৈলেন্দ্র দে প্রভৃতির স্বনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত।

জ্যাকটেটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইন্ডিং মূল্য ১০।০, প্যাকিং ও ডাকব্যয় ১।

প্রবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতে  
পাইবেন। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে না। গ্রাহক নম্বরসহ সত্বর

আবেদন করুন। এই স্বযোগ সর্বপ্রকার জুয়ালের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না।

প্রবাসী কার্যালয়—১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা



যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহা পাঠকদের গোচরীভূত করিতেছি। এখানে একটি কথা বলা দরকার। বাংলা-সাহিত্যে বাংলার বাচ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বড় একটা আলোচনা হয় নাই। ইহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস আজও পর্যন্ত রচিত হয় নাই।

১৮৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মাহেশ্বরের রথ উপলক্ষে আড়িয়াদহের পরলোকগত রায় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয় পান্সীতে করিয়া ত্রিরাশপুর বেড়াইতে যান। তথায় গিয়া তিনি চাপদানির জমিদারের সহিত মিলিত হইলে পর উভয় পক্ষের নৌকার মাঝিদের ভিতর এক ত্রীতি-প্রতিযোগিতার কথাবার্তা হয়। বলা বাহুল্য, তাঁহারা ইহা সমর্থন করেন এবং নিজ নিজ পক্ষের মাঝিমালাকে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহিত করেন। তাঁহারা এই ঘটনা হইতেই এখানে প্রতি বৎসর মাহেশ্বরের মেলায় আসিয়া প্রতিযোগিতার সূত্রপাত করেন। এই দুই ব্যক্তি মহা আড়ম্বরের সহিত নৌকা-প্রতিযোগিতা অর্থাৎ বাচখেলা চালাইতেন। প্রতিযোগিতায় জয়ী হইবার জন্ত উভয় পক্ষই প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া নিজ নিজ এলাকার শক্তিমানু মালা জাতীয় লোকদিগকে হাল ও দাঁড়ে নিযুক্ত করিতেন। কখনও কখনও জ্বিদের বশবর্তী হইয়া জমিদারদ্বয় নৌকা বাজি রাখিয়া খেলা চালাইতেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া আড়িয়াদহের স্বর্গত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রামস্থ ভদ্রযুবকদিগকে ঐ খেলায় তালিম দিতে লাগিলেন। তিনিও অল্প দিনের মধ্যে একটি নূতন দল গঠন করেন। কিছুদিন অভ্যাসের পর সেই নূতন দলের ভিতর কেহ হাল ধরায়, কেহ বা দাঁড় টানায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ইহাই আড়িয়াদহ বাচ-সম্প্রদায়ের কথা।

আড়িয়াদহ, বালি, উত্তরপাড়া, বরাহনগর, চাতরা প্রভৃতি স্থানে নদীবক্ষে যতবার বাচ খেলা হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আড়িয়াদহের যুবকেরা জয়ী হন। ১৯১০ সনে আড়িয়াদহ 'রোয়িং-ক্লাব' সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত হয়। আড়িয়াদহ রোয়িং-ক্লাবে দাঁড় টানায় ও হাল ধরায় যাহারা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতারণ ভট্টাচার্য্য, নৃত্যগোপাল ঘোষাল (হালী), দাশরথি কর, হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল রোয়িং এ্যাসোসিয়েশন'-এর সৃষ্টি হওয়ার পর 'লীগ' খেলা আরম্ভ হয়। আড়িয়াদহ ক্লাবের সভ্যরা বহুবার এই লীগ-প্রতিযোগিতায় জয়ী হন। উক্ত অস্থানের কিছুকাল পরেই 'ট্রফী' খেলাও শুরু হয়। ইহাতেও আড়িয়াদহ বহুবার জয়লাভ করে। ১৯৩৭-৩৮-৩৯

উপর্যুপরি এই তিন বৎসর লীগ ও ট্রফীতে জিতিয়া আড়িয়াদহ রেকর্ড সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়—এরূপ রেকর্ড ইতিপূর্বে আর কোন ক্লাব করিতে পারেন নাই। যাহারা চ্যাম্পিয়ানশিপ বা বিজয়ী বীর আখ্যা লাভ করিবার সময় দাঁড়ী ও হালী ছিলেন তাঁহাদের নাম—শ্রীযুক্ত তারাপদ কুণ্ডু (হালী); নিরঞ্জন দাস (সোয়ার) অনন্তদেব ঘোষাল, বলাইলাল ভট্টাচার্য্য, তারাপ্রসাদ চক্রবর্তী, কালীচরণ দাস, বৈজনাথ পাল, বলাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের দেশে পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে বাচখেলা সাধারণতঃ বৈঠার সাহায্যে সম্পন্ন হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বাঁধা-দাঁড়েও বাচখেলা হইয়া থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, পূর্ববঙ্গের বাচ-নৌকাগুলি আসলে ছিপ নৌকা। ইহার দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ-ষাট হাত পর্যন্ত। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ পল্লীসমূহে বাঁধা-দাঁড়ে বাচ-খেলা হইয়া থাকে। ইহাদের বাচ-নৌকা-গুলি অনেকটা পান্সীর আকারে নির্মিত। ইহাতে ছয়খানি দাঁড় থাকে। এই পদ্ধতিতে দাঁড় টানিবার সময়ও দেহের সমস্ত ভার ও শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে হয়। এই পদ্ধতিতে বিশেষ করিয়া কজি, বাহু, কাঁধ, কাঁট ও বুকের পেশীগুলি বেশী জিহ্মাশীল হয়।

বাচ-খেলায় জয়লাভ দাঁড় ক্ষেপণের কৌশলের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। হাত, বাহু, কাঁধ প্রভৃতি দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ চালনারও অনেক নিয়ম আছে। এসম্বন্ধে বিদেশী পদ্ধতি প্রশংসনীয় ও অনুকরণযোগ্য। দাঁড় ক্ষেপণ কিরূপে সূক্ষ্ম ভাবে করা যাইতে পারে—কেনন করিয়া নিরর্থক ক্লাস্তির হাত এড়ানো যাইতে পারে তাহা কিছুদিন দাঁড় চালনা অভ্যাস করিলে দাঁড়ীরা নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন। দাঁড় ক্ষেপণই হোক আর হাল ধরাই হোক, যতদূর সম্ভব সূক্ষ্ম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন দলের দাঁড়ীদের দাঁড়টানা-পদ্ধতি তাঁহাদের বিপক্ষদলের দাঁড়ীমাঝি অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও কেবল সামঞ্জস্যপূর্ণ দাঁড় ফেলার জন্ত তাঁহারা জয়ী হইয়াছেন। হাল ধরার উপরেও অনেকাংশে জয়-পরাজয় নির্ভর করে।

বাচখেলায় যে নিশ্চল আনন্দ উপভোগের সুযোগ পাওয়া যায়, তাহা একমাত্র সম্ভরণ ছাড়া আর কোন খেলায়ই পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। সকল দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামবিদের অভিমত এই যে, নৌচালনা একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। ইহা সম্ভরণ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। নদীবহুল বাংলা দেশে বাচ খেলার কদর যে হ্রাস পাইতেছে, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। এই নির্দোষ ক্রীড়ার অস্থান যাতে দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় সে বিষয়ে দেশহিতৈষী মাত্রেয়ই অবহিত হওয়া উচিত।

# পুস্তক - পাঠ্য

## ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অস্থান্য প্রসঙ্গ (প্রথম খণ্ড)

—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। পৃ. ৩২+২৫২ শ্রীভারতী পাবলিশার্স, ২০০, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। বোলখানি চিত্র সম্বলিত। মূল্য চারি টাকা আট আনা।

এই গ্রন্থখানি পুরাতন “অমৃত বাজার পত্রিকা”র ফাইল হইতে নির্বাচিত অংশের সম্বলন। বর্তমান “অমৃত বাজার পত্রিকা” একখানি স্থপরিচিত ইংরেজী দৈনিক পত্র। কিন্তু প্রথমে ইহা ছিল একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র। মুখ্যতঃ রাজনৈতিক সংবাদপত্র হইলেও ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভাষা, সাহিত্য ও দেশের উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত নানা সভা-সমিতি বিষয়ক বহু আলোচনাই হইতে হইত। অমৃত বাজার পত্রিকার প্রথম তিন বৎসরের বিভিন্ন সংখ্যায় এই সমুদয় বিষয়ে যে সকল আলোচনা ও মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতে সম্বলন করিয়া যোগেশবাবু এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই গ্রন্থ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।

প্রথম খণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা সংকলিত হইয়াছে :—(১) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা; (২) সিভিল সার্ভিসে ভারতবাসী; (৩) বিচার ও শাসন; (৪) সামলা-মর্কদ্দমা; (৫) রাজনৈতিক সভাসমিতি; (৬) হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা; (৭) জমিদার ও জমিদারী; (৮) জনসাধারণ ও মধ্যবিত্ত; (৯) কৃষি ও বাণিজ্য; (১০) মুসলমান সমাজ ও রাজনীতি; (১১) হিন্দুসমাজ সংস্কার; (১২) ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ; (১৩) কেশবচন্দ্র সেন। এই সমুদয় বিষয়ের আলোচনা পৃথকভাবে সংকলিত হইয়াছে, এবং প্রতি উক্ত অংশের শেষে পত্রিকার যে সংখ্যায় উহা বাহির হইয়াছিল তাহার তারিখ দেওয়া আছে। ইহা ব্যতীত পরিশিষ্টেও কতকগুলি বিষয় সংযোজিত হইয়াছে।

এইরূপ গ্রন্থ বাংলাদেশে সম্পূর্ণ নূতন না হইলেও খুব বেশী নাই। সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” নামক গ্রন্থে এই ধরনের আলোচনা বঙ্গসাহিত্যে প্রথম প্রবর্তন করেন। গ্রন্থকার কেন কেবলমাত্র অমৃত বাজার পত্রিকা হইতে সম্বলন করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন তাহা গ্রন্থের প্রথমেই “পূর্ববর্তী” নামক ভূমিকায় সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অমৃত বাজার পত্রিকার সাহায্য যে খুবই মূল্যবান গ্রন্থকার তাহা বিসন্দভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কবির নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন যে, “শিরিরকুমার ও তাহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশভক্তির পথপ্রদর্শক।” তৎকালে “সমাচার চন্দ্রিকা”ও লিখিয়াছেন যে, “নিরপেক্ষভাবে স্বাধীনতা প্রদর্শন ও দেশের প্রকৃত স্বাধীনতার চেষ্টা অমৃত বাজারের ছায়া কোন পত্রিকাই দেখা যায় না।” বস্তুতঃ ভারতবাসীর অবনতির মূলে যে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই যে উন্নতির একমাত্র উপায় নানা ভাবে তাহা প্রতিপন্ন করাই ছিল এই পত্রিকার মূল নীতি। আর সেকালে অমৃত বাজারই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল পত্রিকা। স্বতরাং গ্রন্থকার ষথার্থই বলিয়াছেন যে, “আমাদের সর্বপ্রকার শৃঙ্খলমুক্তির সম্ভাবনার কথা তখন কিরূপে বাঙালীর মনে উৎসারিত হয় ইহাতে তাহার সূত্র মিলিবে।”

এই শ্রেণীর গ্রন্থ ঐতিহাসিক উপাদানের সংগ্রহ হিসাবে যে বহু মূল্যবান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালীর—এমন কি উচ্চশিক্ষিত বাঙালীরও—জ্ঞান অতিশয় অল্প। এই যুগের যে ইতিহাস আমরা জানি তাহা প্রধানতঃ ইংরেজরাজের ইতিহাস। কিন্তু এই শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে যে সমুদয় গুরুতর পরিবর্তনের কালে আমরা মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগে উপনীত হইয়াছি তাহার ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই—এবং ইহার মূল কথাগুলিও অনেকের নিকট অজ্ঞাত। অথচ আমাদের জাতীয় জীবনের

বিবর্তন বুঝিতে হইলে ইহার সহিত সম্যক পরিচয় থাকা দরকার। সম্ভ্রান্তি আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি তাহার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিতে বা বুঝিতে হইলেও ইহার মূলসূত্র এই যুগই খুঁজিতে হইবে। কেবল অতীতের কথা নহে, ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় শক্তি কোন্ দিকে চালিত হইবার সম্ভাবনা বা হওয়া কর্তব্য তাহা নির্ধারণ করিতে হইলেও জাতীয় জীবনের এই গোড়ার কথা জানা আবশ্যক। স্বতরাং বঙ্গের তথা ভারতবর্ষের—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃত ইতিহাস বাহাতে আমরা জানিতে পারি তাহার জন্ত সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু বহু আয়াস স্বীকার করিয়া যে গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, এই প্রকার ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপকরণ হিসাবে তাহা চিরদিনই আদৃত হইবে। বস্তুতঃ এই প্রকার উপকরণ বহুল পরিমাণে সংগৃহীত না হইলে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভবপর হইবে না।

আলোচ্য গ্রন্থে যে সকল সম্বলন স্থান লাভ করিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা সম্ভব নহে। তবে ‘ভারতবর্ষের স্বাধীনতা’ শীর্ষক অধ্যায়ে যে সকল উক্তি ও মতবাদ সংগৃহীত হইয়াছে বর্তমানকালে তাহা পাঠ করিয়া অনেকেই আমাদের দেশে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে হইতেই রাজনৈতিক চিন্তার ধারা কোন্ পথে প্রবাহিত হইতেছিল তাহার সন্ধান পাইবেন। সিপাহী বিদ্রোহ (৪০ পৃঃ) ও ভারতে ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্ব (৪৫ পৃঃ) সম্বন্ধে ১৮৭০ সালে অমৃত বাজার পত্রিকায় যে সূচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল অতি আধুনিক কালের পূর্বে তাহার সম্ভাবনাও আমরা কল্পনা করি নাই। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট হিন্দুদিগকে জঘন্য করিবার জন্ত কিভাবে মুসলমানদের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কিছু আভাসও ১৮৭০ সালের পত্রিকায় পাওয়া যায় (১৭৪ পৃঃ)। সকলেই জানেন যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরও বহুদিন পর্যন্ত কেবল ছোটখাট শাসন-সংস্কারই ইহার প্রধান আবেদনের বিষয় ছিল। কিন্তু ১৮৭০ সালেই পত্রিকায় “ভারতবর্ষের স্বাধীন শাসন-প্রণালীর স্বরূপাত হিসাবে প্রতিনিধি সভা স্থাপনের প্রস্তাব অনেক যুক্তি তর্ক দিয়া সমর্থিত হইয়াছে” (৫৭ পৃঃ)। রাজনৈতিক সভা-সমিতি শীর্ষক অধ্যায়ে যে সমুদয় সম্বলন আছে তাহা হইতে আমরা সংঘবদ্ধভাবে রাজনৈতিক আলোচনার একটি সমসাময়িক চিত্র দেখিতে পাই। “হিন্দুসমাজ সংস্কার” অধ্যায়েও অনেক নূতন তথ্য আছে (১৮৩ পৃঃ)। আর অধিক দৃষ্টান্ত দেখাইবার প্রয়োজন নাই। এবাং বাহা বলিয়াছি আশা করি তাহা হইতেই আলোচ্য গ্রন্থের প্রকৃতি ও প্রয়োজন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভবপর হইবে। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি ও দ্বিতীয় খণ্ড বাহাতে শীঘ্রই প্রকাশিত হয় তাহার জন্ত গ্রন্থকারকে বিশেষ অনুরোধ করি।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

## গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

মহিলাদের লিখিত গল্পের জন্য তিনটি পুরস্কার ১৫, ১০ ও ৫।

মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে ছাত্রীদের লিখিত প্রবন্ধে দুইটি পুরস্কার ২০ ও ১৫।

১১০০ কথার ভিতরে বৈশাখের মধ্যে লেখা চাই।

ঠিকানা : ‘বঙ্গলক্ষ্মী’ (প্রতিযোগিতা)

২৩১, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলিকাতা।

### বাংলা সাময়িক-পত্র—(১৮৮৮-১৮৮৮)।

বন্দোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩১ আশাচর্য নারকুলার রোড, কলিকাতা, নতুন সংস্করণ, মাঘ ১৩৫৪-১। মূল্য পাঁচ টাকা।

এই অধুনা-প্রখ্যাত পুস্তক ১৩৪২ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। নাটক, নভেল ও কবিতায় পরিপ্লাবিত দেশে বার বৎসরের মধ্যে এই শ্রেণীর পুস্তকের দুইটি সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া নতুন সংস্করণের প্রকাশ অভাবনীয় না হইলেও ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত করিতেছে। কেবল স্বধীসমাজ নহে, সাধারণ পাঠকও যে ইহার সমাদর করিয়াছেন, তাহা আনন্দের বিষয়।

ইহার একটি কারণ, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলা সাময়িক-পত্রের প্রসারের যে ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে, তাহার সংযত, প্রামাণ্য ও ধারাবাহিক বৃত্তান্ত এই পুস্তকেই প্রথম বাঙালী পাঠকের গোচরে আনিয়াছে। ইহার পূর্বে এই বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তৎকালীন পত্রিকাগুলির পুরাতন ফাইলে যে ঐতিহাসিক উপাদান বিক্ষিপ্ত ও দুপ্রাপ্য অবস্থায় ছিল, উৎসাহী কন্ঠের অভাবে তাহার সম্পূর্ণ অনুসন্ধান হয় নাই। এরূপ অনুসন্ধানের জন্ত যে ধৈর্য, পরিশ্রম, ও যত্নের আবশ্যক তাহা এখনও বাংলাদেশে স্ফলভ নয়। ব্রজেননাথ শুধু অভিজ্ঞ ও সাবধানী গবেষক নহেন, তাঁহার অনুসরণ ও অধ্যবসায় অনন্তসাধারণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তিনি একাই একটি জীবনে যাহা হুস্পন্দ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে তাঁহার একনিষ্ঠ ঐতিহাসিক সাধনার প্রশংসা না করিয়া থাকায় না। দুপ্রাপ্য ও বহুমূল্য উপকরণ সংগ্রহ হিসাবে তাঁহার অস্বাভাবিক মিতভারী ও তথ্যবহুল বহু গ্রন্থের মত বর্তমান গ্রন্থও যথোপযোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পরিচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নতুন করিয়া পরিচয় দেওয়া বাহুল্যমাত্র।

বর্তমান সংস্করণের শুধু এইটুকু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক যে, ইহাতে অনেকগুলি নতুন পত্র-পত্রিকার বিবরণ সংযোজিত হইয়াছে। পূর্বে সংস্করণে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত সাময়িক-পত্রগুলির বিবরণ ছিল, এবার তাহা আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে—১৮৬৮ এপ্রিল পর্যন্ত।

শ্রীমুখীলকুমার দে

### জেলে ত্রিশ বছর—জীৱলোক্যনাথ চক্রবর্তী।

আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

এই পুস্তক ‘বাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার জন্ত প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন, বীরত্ব দেখাইয়াছেন, অত্যাচার-নির্ধাতন ভোগ করিয়াছেন, দেশবাসী বাঁহাদের নাম জানে না, সেই সব অজ্ঞাতনামা বীর দেশপ্রেমিকের উদ্দেশ্যে’ উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জীৱলোক্যনাথ চক্রবর্তী এইরূপ উৎসর্গ করিবার যোগ্যতম ব্যক্তি, কেননা তাঁহার জীবনের কাহিনী এরূপ স্ফলু

ও নিকাম দেশপ্রেমের অগ্নিতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আজিকার পেশাদারী দেশ-প্রেমের দিনে, যেখানে চতুর্দিকে বার্থায়েষী ভণ্ড তথাকথিত ‘ভাগিদগের’ চক্রান্তে দেশ ভুবিতে বসিয়াছে সেই বাংলাদেশে জীৱলোক্যবাবুর এই কারাকাহিনী প্রকাশ অতিশয় সমরোপযোগী হইয়াছে।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঁহারা প্রকৃতই জীবন-মরণ পণ করিয়া কোনও ফলের আশা না রাখিয়া সর্বস্ব আত্মত্যাগ দিয়াছিলেন, ‘বাঁহারা’ তাঁহাদেরই একজন। সেই কারণেই বোধ হয় এই পুস্তক এত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী হইয়াছে। ইহার প্রতিটি পরিচ্ছেদ পড়িলে আরও পড়িবার, আরও জানিবার ইচ্ছা বাড়ে। এই পুস্তক বাংলার পুস্তক-বলে সাধারণ পাঠকের জন্ত নির্দিষ্ট হইলে দেশের ছেলেমেয়েদের বিশেষ উপকার হইবে। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইবে আশা করি, কেননা বাংলার ও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রকৃত পরিচয় এইরূপ পুস্তকেই পাওয়া সম্ভব।

ক. চ.

### রবীন্দ্রকাব্যনিবন্ধ—শ্রীপ্রমথনাথ বিদ্যোৎপাদিন প্রিন্টার্স

এও পাবলিশার্স, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

এখানি আলোচনা-গ্রন্থ, কবির কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কবিতা ও কাব্যগুলির আলোচনা। ইহার পূর্বে ভিন্ন গ্রন্থে গ্রন্থকার ধারাবাহিকভাবে কবির অন্তর্জ-কাব্যের আলোচনা করিয়াছেন। ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ও মানসের উৎসমূল, পৌছিবাব চোঁটাই ‘রবীন্দ্রকাব্যনিবন্ধ’র একটামাত্র লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবনের কথা আমাদের আকর্ষণ করে। সেই আলোচনার যদি নতুন থাকে তাহা আমাদের আনন্দের কারণ হয়। গ্রন্থকার স্ফলক, বাল্য হইতেই তিনি কবির সংস্পর্শে আসিয়াছেন, এবং রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থে তিনি গভীরভাবে অবগাহন করিয়াছেন। তাহার রচনা সরস। আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার মন্তব্যগুলি অনেক সময় আমাদের চমৎকৃত করে।

কবির প্রথম সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ ১২৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইখানিতে সেই ‘বনকুল’ হইতে আরম্ভ করিয়া, ‘কবিকাহিনী’, ‘ভগ্নহৃদয়’ এবং ‘শৈশব সঙ্গীত’ পর্যন্ত কাব্যগুলির আলোচনা আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনার আলোচনার লেখক ‘জীবনস্মৃতি’ ও ‘ছেলেবেলা’র সাহায্য লইয়া তাঁহার বক্তব্য পরিষ্কৃত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে যে-সব প্রভাব পড়িয়াছে এই বইখানি অপরূপ গ্রন্থে সেইসব সূত্রের মূল বর্ণিত আছে। রবীন্দ্রকাব্যের পারিপার্শ্বিক নির্ণয় করিতে গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের উপর মহর্ষির প্রভাব, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অমৃত্যুর প্রভাব, এবং তাঁহার প্রাথমিক রচনার উপর বিহারীলাল ও হেমচন্দ্রের প্রভাবের কথা বলিয়াছেন। শেষোক্ত প্রভাব স্নেহালার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত

সুপরিচিত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীগোপালচন্দ্র রায় প্রণীত

## মহাত্মা গান্ধীর শান্তি-অভিযান

মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালি, বিহার, কলকাতা ও দিল্লীর ঐতিহাসিক শান্তি-অভিযানসমূহের এক সুবিস্তৃত আলোচনা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, এই সব অভিযান কাহিনী। পূর্ববাঙ্গলায় ও কলকাতায় শান্তি-অভিযানের সময় লেখক কিছুদিন মহাত্মা গান্ধীর নিকটে থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মহাত্মার এই মৈত্রী-অভিযান। তাই লেখকের সেই চোখে-দেখা অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে প্রতি ছত্রে ছত্রে। সুন্দর আর্ট পেপারে ছাপা, বহু চিত্র সুশোভিত। দাম নামমাত্র—এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—বঙ্গবাসী কার্যালয়

২৬, পটলভাঙ্গা স্ট্রীট, (হারিসন রোড ও আমহাট স্ট্রীটের সংযোগস্থল) কলকাতা।

## যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি

যুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষ এক অনিশ্চিত আর্থিক সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়েছে। ভারতবর্ষ একা নয়, অন্যান্য দেশেরও একধরনের সমস্যা সমাধান করবার দায়িত্ব এসেছে। এই যুদ্ধকালীন অর্থনীতি কেমন করে যুদ্ধোত্তর অর্থনীতিতে পরিণতি লাভ করতে পারে সে-সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই সমস্যার সমাধানকল্পে আজ পর্যন্ত যা-কিছু চেষ্টা হয়েছে 'যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি'র প্রকাশ-তাদের অন্যতম।

সূচী :

ভারতবর্ষ ও বিদেশের আর্থিক সম্ভাবনা।

সরকারী ব্যয়ের বিবর্তন।

ছাটাই ও নিয়োগ।

কর্মসংস্থান ও ব্যয়।

শিল্পকর্মে নিয়োগ ও অবস্থান্তর :

শিল্পকর্মে নিয়োগ ;

উৎপাদনকারী মাল তৈরীর

শিল্প কারখানার অবস্থান্তর ;

ব্যবহার্য মাল উৎপাদনকারী

শিল্পের অবস্থান্তর ;

অবস্থান্তরে সহায়তা।

দ্রবের স্তর ও বিনিময়ের হার।

মালমুক্তি নীতি।

অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ।

সিদ্ধান্ত।

একশো ষোলো পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

৥ দাম বারো আনা ॥

পূর্বাশা-প্রকাশিত অর্ডাচ্চ বই-এর

তালিকা সংগ্রহ করুন।

## বৌদ্ধধর্ম

পরম শ্রদ্ধেয়, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও মনন-শীলতার পরিচয় আধুনিক বাঙালী সমাজের কাছে আজ আর নতুন করে দেবার নেই। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তাঁর যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা, এতদিন পর্যন্ত তা প্রাচীন সাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ ছিলো। সম্প্রতি বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত তাঁর প্রবন্ধগুলিকে একত্র সংকলিত করা হচ্ছে এই গ্রন্থে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের প্রতি ধীর সামান্যমাত্রও শ্রদ্ধা আছে, এ-গ্রন্থ তাঁর কাছেই যে শুধু অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে তাই নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রত্যেকটি পাঠকই এ-গ্রন্থকে অপরিহার্য বলে গ্রহণ করবেন।

বিষয়সূচী : বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাহার গুরুত্ব ; নির্বাণ, নির্বাণ ক্রম রত্নম, কোথা হইতে আসিল ; হীনযান ও মহাযান ; মহাযান কোথা হইতে আসিল ; মহাজান, বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত ; বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল ; এখনও একটু আছে, উড়িয়ার জঙ্গলে ; জাতক ও অবদান ; দলাদলি ; মহাসাংগিক মত ; খেরবাদ ও মহাসাংগিক ; মানুষ ও রাজা।

বৈশাখ মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হবে।

প্রবোধচন্দ্র সেনের

## প্রবোধচন্দ্র সেনের

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের যে গৌরবময় অধ্যায় আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত হয়নি, একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সেন সেই অধ্যায়কেই প্রকাশ করেছেন এই গ্রন্থে। অক্লান্ত অনুসন্ধিৎসায়, ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটনে, যে-আন্তরিকতার পরিচয় লেখক এখানে দিয়েছেন, তা তাঁর মতো নিষ্ঠাপরায়ণ ঐতিহাসিকের পক্ষে স্বাভাবিক হলেও, পাঠকের পক্ষে বিস্ময়ের বিষয়। এই গ্রন্থে প্রবোধচন্দ্র সেনের সার্থক সত্যানুসন্ধানের পরিচয় মিলবে। দাম তিন টাকা ॥

লুই ফিশারের

## মহাজিজ্ঞাসা

লুই ফিশারের নাম আজ আর কোনো মহলের কাছেই অপরিচিত নয়, তেমনি অপরিচিত নয় তাঁর 'The Great Challenge' বইটির নাম। 'মহাজিজ্ঞাসা' তারই অনূদিত সংস্করণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক তথা সামাজিক বিবর্তন যে গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে আজ পর্যন্ত নানা-প্রকার আকাঁকা পথে এগিয়ে চলেছে তার ইতিহাস জানা প্রয়োজন আজ সকলেরই। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই ধরনের গ্রন্থ এখনও প্রচুর-ভাবে প্রচারিত হয়নি। লুই ফিশার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তা-ই আলোচনা করেছেন বলে বর্তমানকালে এ বই-এর প্রয়োজন অপরিহার্য। যন্ত্রস্থ ॥

প্রকাশক :

পূর্বাশা লিমিটেড—গি. ১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩

হইয়াছে। লেখক বলিতেছেন, তিন জন কবির প্রভাব রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তর্লৌকিক পর্যায় পৌঁছিয়াছে—বৈষ্ণব কবি, শেলি ও কালিদাস। ইহার সঙ্গে আছে উপনিষদের তত্ত্ব। দুই জাতীয় লেখক আছে—জাতীয় ও সর্বমানবীয়। রবীন্দ্রকাব্যে সর্বমানবীয় উপাদান অধিকতর। গ্রন্থকারের মতে, এইজন্যই বিদেশের পক্ষে তাঁহাকে বুঝিতে পারা বোধ করি এত সহজ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে সবচেয়ে বড় প্রভাব বিশ্বপ্রকৃতির। প্রকৃতি, মানুষ ও ভগবান এই তিন সত্তা মিলিয়া রবীন্দ্রনাথের জগতের সম্পূর্ণতা।

লেখক বলিতেছেন, আমাদের সৌভাগ্য—রবীন্দ্রনাথ এমন এক সময়ে জন্মিয়াছিলেন যখন বাঙালী-সমাজের ভিত্তিতে ফাটল প্রশস্ত হয় নাই, সমাজ ছিল অখণ্ড ও এক। কবির জীবন ও কাব্যের মূলে এই অখণ্ড বাঙালী-জীবন। “পরবর্তীকালে জন্মিলে তিনি মহৎ জাতীয় কবি মাত্র হইতে পারিতেন, কিন্তু মহত্তর সর্বজাতীয় কবি হইতেন—কি না সংশয়।” ‘বাস্তবিক-প্রতিভা’ গীতিনাট্য, ‘রক্তচণ্ড’ নাটক। রবীন্দ্রনাথ কাহিনী-কাব্য দিয়াই প্রথম রচনা আরম্ভ করেন। পরীক্ষা করিয়া কবি বুঝিলেন গিরিক বা খণ্ডকাব্যই তাঁহার শক্তির স্বার্থ বাহন। “সারা জীবন ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ যে আত্মকাহিনী লিখিয়া চলিয়াছেন কবিকাহিনী তাহার প্রথম ধাপ।” ‘শৈশবসঙ্গীতের কবিতাগুলির মধ্যে ভবিষ্যৎ রবীন্দ্র-কাব্যের মহত্বের সূচনা আছে। ‘রবীন্দ্রকাব্যনির্ধার’ অত্যন্ত সুখপাঠ্য। আলোচনা-সাহিত্যের অন্তর্গত এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রন্থখানি শুধু পাঠকের আনন্দ বিধান করিবে না; তাহার চিন্তাও উদ্বুদ্ধ করিবে।

### শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

**অলঙ্কারচন্দ্রিকা**—শ্রীশ্রীমাপদ চক্রবর্তী, এম-এ বিহারত্ন সাংখ্যভূষণ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৮ সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

বাংলা কাব্যে ছন্দের প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বিভিন্ন সাহিত্যতর্কিক পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াছেন—সাহিত্যের ধরপ ও নানা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও দেশী ও বিদেশী সমালোচকদের মতবাদ অবলম্বনে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাব্যের অত্যন্ত প্রধান অঙ্গ অলঙ্কার বাংলার সাহিত্যসমালোচকদের নিকট একরূপ উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে যে সামান্য আলোচনা হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র—বাংলা কাব্যের বিশ্লেষণের চেষ্টা তাহার মধ্যে নগণ্য। আলোচ্য গ্রন্থের দ্বারা বাংলাসাহিত্যের এই ত্রুটি অনেকাংশে বিদূরিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে উল্লিখিত অলঙ্কারগুলি ইহাতে

বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করা হইয়াছে এবং বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে উদাহরণ সংকলন করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে পাশ্চাত্য অলঙ্কারের সহিত আমাদের দেশের অলঙ্কারের তুলনা করা হইয়াছে। সংস্কৃতে অনুলিখিত কয়েকটি পাশ্চাত্য অলঙ্কারের বিবরণ পরিষ্টিতে দেওয়া হইয়াছে। তবে ইহাদের অনেকগুলিই ভারতীয় আদর্শ অনুসারে ঠিক অলঙ্কারের পর্যায়ে পড়ে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে—যে বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্বকে আমাদের দেশে অলঙ্কারের প্রাণ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে তাহাদের অভাব ইহাদের মধ্যেই অনুভূত হয়। ইহাদের কোন কোনটি সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের লক্ষণাবৃত্তি প্রকারভেদে মাত্র বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত অলঙ্কারের মধ্যে পর্যায়োক্ত ও পরিবাদের অনুসন্ধে বৈজ্ঞানিক আকর্ষণিক বলা যায় না। কোন কোন কাব্যংশের অলঙ্কার নিরূপণ বিষয়ে সন্দেহ ও মতানৈক্যের অবকাশ থাকা বিচিত্র নহে। বহুল আলোচনার ফলেই তাহাদের নিরাসন সম্ভবপর। আশা করি, বর্তমান গ্রন্থ বাংলার সাহিত্যিক সমাজকে সাহিত্যের আলঙ্কারিক বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ ও আকৃষ্ট করিবে।

### শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

**শ্রীচিন্তাভূত স্ববোধিনী**—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং ৪-এ, সাহানগর রোড, কালীঘাট—কলিকাতা হইতে শ্রীঅজিতকুমার জ্যোতিঃ শেখর কর্তৃক প্রকাশিত। ১৭০ পৃঃ। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্ডীশক্তি সাধনা সহায়ে অপূর্ব, মাতৃজাতির অক্ষয় গৌরব প্রকাশে অদ্বিতীয় এবং জাতীয় স্বাধীনতা সংগঠনের অতুল্য আদর্শ প্রকাশে অতুলনীয়। এই দুর্লভ স্তোত্রগ্রন্থের যত আলোচনা হয়, ততই মঙ্গল। আত্মশাস্ত্রাভিজ্ঞ ও সাধননিষ্ঠ বহু আচার্য এর বিস্তারিত টিকা-টিপ্পনী করেছেন। বাংলায় সাধক সত্যদেবের বিস্তারিত ব্যাখ্যার পর অধীনীকুমার চক্রবর্তীর পাঠ ও আলোচনা দেবীমহিমা প্রচারে বেশ কার্যকরী হয়েছিল। কিন্তু এর পর চণ্ডীর আলোচনা আশানুরূপ হয় নাই, অথচ দেশের সাম্প্রতিক অবস্থায়, এই দুর্দিনে এই গ্রন্থের আদর্শ গ্রহণ করা জাতির পক্ষে অবশ্যকর্তব্য। তত্ত্বস্বোধিনী ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্ত হলেও সুবোধ্য।

**গীতা ও গীতামৃত** (১ম ও ২য় খণ্ড)—শ্রীআন্তোভো ভট্টাচার্য সম্পাদিত। এ, বি, সঙ্গ এণ্ড কোং ৬, উইগসার হাউস, মিশন রো, কলিকাতা। ৪২ পৃঃ ও ১০০ পৃঃ মূল্য যথাক্রমে ৮০ ও ১০।

বিজ্ঞ সম্পাদক এই গ্রন্থের দুই খণ্ডে গীতার প্রথম অধ্যায় বিবাদযোগ্য এবং দ্বিতীয় অধ্যায় সংখ্যাবোধের সর্বল ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের জাতীয় জীবনে গীতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যত চেষ্টা হয় ততই মঙ্গল।

### শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

**কলকল্লোল**—শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী। ‘স্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী’। মূল্য এক টাকা আট আনা।

কবিতাগুলি সুবোধ্য ও সুন্দর। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার অনুবাদ ‘ইয়ারো সন্দর্শনে’ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হইয়াছে। ‘জয়তু স্বভাব’ ও ‘জগৎ হিন্দ’ কবিতা দুইটিতে উদীপনা ও বলিষ্ঠ স্বকীয়তার পরিচয় আছে। বইখানি প্রশংসার যোগ্য।

### শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

## মাতৃমন্দির

২৬-এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা

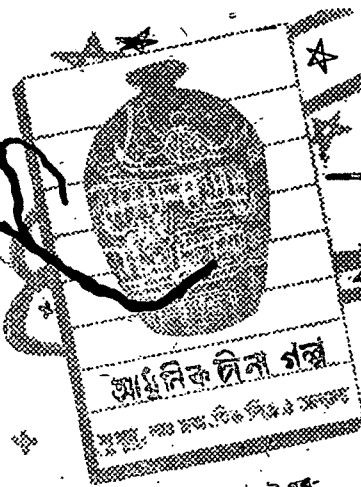
গর্ভাবস্থায়, নিরাপদে থাকা, প্রসব এবং

শিশু রক্ষার সুব্যবস্থা করা হয়।

মানদা দেবী, লেডী সুপারিন্টেন্ডেন্ট



নতুন থেকে শুরু করে অতি আধুনিক চীনা সাহিত্যিকদের  
এগারটি হুনিবাচিত গল্পের সংকলন। যে চেতনা চীনের  
সমাজ-জীবনকে বস্তুর মত উদ্বেল করে তুলেছে তারই  
নিখুঁত ও হৃদয়গ্রাহী প্রতিচ্ছবি। অনুবাদ করেছেন অমল  
দাশগুপ্ত। দাম—৩।



পোকার সাহিত্যচর্চির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই গল্প-  
সংকলন। এতেকটি গল্পে নীচতলার মানুষেরা  
এক অপর দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে মানুষের সামনে উন্মোচিত  
করে দিয়েছে নিজেদের। অনুবাদ করেছেন নীহার  
দাশগুপ্ত। দাম—৩।



নোভেল-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পর রূপ কথাসাহিত্যে এক  
নতুন পর্ব উদ্ঘাটিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক  
চেতনার দীপ্তিমান চাবীমজুর জনসাধারণের প্রাণস্পন্দনে সঞ্চারিত  
বাছাই-করা আটটি গল্পের সংকলন। অতি-দাম্পত্যিক যুদ্ধ  
গল্পগুলি এই সংগ্রহে বান দেওয়া হয়েছে। দাম—২।



রূপ কথাসাহিত্য নবী জোমিকের দশটি গল্পের  
সংকলন। বাংলার চাবী মজুর ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনের  
দুখে কষ্ট ও সংগ্রামের বাস্তব প্রতিকলনে প্রতিটি গল্প রসাতীর্ণ  
ও নিখুঁত। দৃষ্টান্ত, তাত্ত্বিক ও আবহমানে গল্পগুলি সম্পূর্ণ নতুন  
পথের নির্দেশ দেবে। দাম—২।

## নতুন সাহিত্য

নতুন ভাবধারায় সমৃদ্ধ ত্রৈমাসিক  
বামপন্থী সংকলন। আধুনিক  
শক্তিশালী তরুণ লেখকদের  
নিষ্ঠা ও বলিষ্ঠ প্রবন্ধ, কবিতা,  
গল্প এবং শিল্প ও সাহিত্য  
সমালোচনার অপূর্ব সমাবেশ।  
দ্বিতীয় সংখ্যা এক টাকা।

## বাংলা কাব্য সাহিত্যে

—উল্লেখযোগ্য বই—

### ছাউপত্র

সুভাস্ত ভট্টাচার্য

সুভাস্ত ভট্টাচার্য নতুন যুগের সার্থক  
কবি। তাঁর প্রতিটি কবিতা কোটি  
কোটি মানুষের বলিষ্ঠ আশার  
নিষ্ঠা বোধ। দাম ১।

### সন্দীপের চর

বিষ্ণু দে

নতুন বাংলা কবিতাকে আত্মসম্মানের  
অস্থিরতা থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে  
হৃদয় নিদেশ দিয়েছেন যে সব  
কবি তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু দে নিঃসন্দেহে  
অগ্রণী। 'সন্দীপের চর' তাঁর সার্থক  
কবি-কর্মের স্বাক্ষর। দাম ২।

### রবীন্দ্রনামা

প্রভাত বসু সম্পাদিত

পঁয়তাল্লিশজন প্রবীণ ও নবীন কবির  
নানানভাবে ও নানা ছন্দে রচিত 'কবি-  
প্রশস্তি'র সংকলন। দাম ১।

Get your Art work,  
Illustrations, Cover  
Designs, Advertisement  
Lay-outs and Cinema  
Slides done by us.  
Moderate charges for  
Brilliant and Novel  
Ideas.

Studio Dept.  
International Publishing  
House Ltd.

ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ১৬.

## দেশ-বিদেশের কথা

### শ্রীমতী হুহাসিনী সেন

নাগপুর চাশনাল কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপিকা শ্রীমতী হুহাসিনী সেন বর্তমান বৎসরে নাগপুর ইউনিভার্সিটি কোর্টের একজন সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। বাঙালী মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করিলেন। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট-সভাদের মধ্যে ইনি সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ।

শ্রীমতী হুহাসিনী ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজীতে এম-এ ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে চাশনাল কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপিকারূপে যোগদান করেন। অধ্যাপনাকার্য্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ইহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীআদরিণী সেন এম-এ ও নাগপুরের এস বি সিটি কলেজের একজন অধ্যাপিকা।

### শরদিন্দু দাশগুপ্ত

ফিল্ড লেফটেন্যান্ট শরদিন্দু দাশগুপ্ত ১৯২০ ইংরেজীর ১০ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রায় বাহাদুর গিরিশচন্দ্র দাশগুপ্ত হাওড়ার সবডিভিসনাল ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁহাদের আদি নিবাস ত্রিপুরা। শরদিন্দু দাশগুপ্ত প্রথমে হাওড়া জিলা স্কুলে ও পরে প্রেসিডেন্সি ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে আই-এসসি পাস করিয়া ১৯৩৮ সালে তিনি শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। এই সময় হইতে বিমান-চালনা শিক্ষার জন্য তিনি অতিমাত্রায় আগ্রহাবিত হইয়া উঠেন। তিনি যখন বৃত্তিতে পারিলেন এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা তাঁহার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হওয়ার পথে অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে তখন তিনি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাড়িয়া সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন



শরদিন্দু দাশগুপ্ত

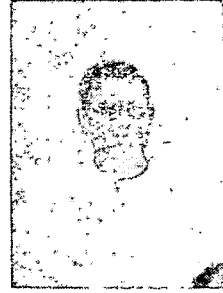
এবং অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল ফ্লাইং-ক্লাবে বিমান-চালনা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে বাংলা সরকার বাঙালী যুবকদের বিমান চালনায় উৎসাহিত করিবার জন্য বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। শরদিন্দু দাশগুপ্ত সর্বপ্রথম এই বৃত্তি লাভ করেন। এইবার দমদমে অধিকতর উৎসাহের সহিত তিনি বিমান-চালনা শিক্ষা করিতে থাকেন। ১৯৪১ সনে তিনি আই, এ, এফ, ডি, আর-এ ক্যাডেট অফিসাররূপে যোগ দেন। এই সময় তিনি বিমান চালনা শিক্ষার জন্য মাতার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখেন তাহা হইতে তাঁহার দেশপ্রীতি, জাতি ও সমাজের প্রতি কর্তব্য-বোধ, পৌরুষ, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি নানা সঙ্গুলের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৪৩-৪৪ সনে তিনি প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধে যান। সৈনিক জীবনে লেফটেন্যান্ট গুপ্তকে অনেকবার নির্ধাতিতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সংগ্রাম করিতে হয়। গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে ১৯৪৬ সনে ফাইটাস লিডার ট্রেনিংয়ের জন্য বিদেশে পাঠান। ১৯৪৭ সনের জুন মাসে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৪৭-৮ সনে কাশ্মীর রণক্ষেত্রে তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ২২শে মার্চ যখন তিনি তাঁহার বিমান চালাইতে চালাইয়া নিযুক্ত ছিলেন তখন নিহত হন।

লেফটেন্যান্ট দাশগুপ্ত সদাহাস্তময়, কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বী ও চরিত্রবাহুবক ছিলেন। কিশোর বয়স হইতেই অখচাকনা, খেলাধুলা ও সিকার ইত্যাদি পুরুষোচিত ব্যায়াম ও ক্রীড়াদিতে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। তাঁহার গোপন দান যথেষ্ট ছিল এবং তিনি প্রাণ ঢালিয়া দুর্গতের সেবা করিতেন।

### ডাঃ রাখালকৃষ্ণ মণ্ডল

কলিকাতা কর্পোরেশনের ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার ডাঃ রাখালকৃষ্ণ মণ্ডল, এম-এসসি, এম-বি, ডি. পি. এইচ, ডি. টি. এম, মহোদয় গত ১৬ই ফাল্গুন ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ডাঃ মণ্ডল মেদিনীপুর জেলার কাঁধি মহকুমার রামচক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি



ডাঃ রাখালকৃষ্ণ মণ্ডল

কলিকাতা কর্পোরেশনে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা এতই প্রবল ছিল যে দীর্ঘকাল চাকুরী করিয়াও নিয়মিত ছাত্ররূপে কলেজে যোগদান করিয়া ৪৫ বৎসর বয়সের পর ক্রমে ক্রমে এম-এসসি, ডি. পি. এইচ, ডি. টি. এম, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। - ম্যাকডোনাল্ড বাটোয়ারার হিন্দু-সমাজকে যখন বর্ণহিন্দু ও তপশীলভুক্ত জাতিরূপে বিভক্ত করা হয় এবং তাঁহার সম্প্রদায় পৌণ্ড ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়কে যখন তপশীল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়— তখন নিখিল বঙ্গ পৌণ্ড ক্ষত্রিয় সেবক সমিতির সম্পাদকরূপে তিনি ইহার প্রবল প্রতিবাদ করেন ও ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন স্বরূপ করেন। ইহা আচার্য্য প্রমুদচন্দ্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রবাসী পক্ষে রামানন্দবাবু দৃঢ়ভাবে তাঁহার মতবাদ সমর্থন করিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিয়াছিলেন। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্ত সংরক্ষিত উচ্চপদ লাভের সুযোগ হইলে তিনি যুগান্তের তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। জাতিগঠনমূলক ও জনহিতকর বহু কর্মপ্রচেষ্টার সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। সমস্ত কষ্টের মধ্যেও জ্ঞানচর্চা হইতে তিনি কখনও বিরত হন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মীনেন্দ্রনাথ বহুর সহযোগে তিনি *An Introduction to Anthropology* ও *Elements of Pre-history* নামে বৈজ্ঞানিক পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

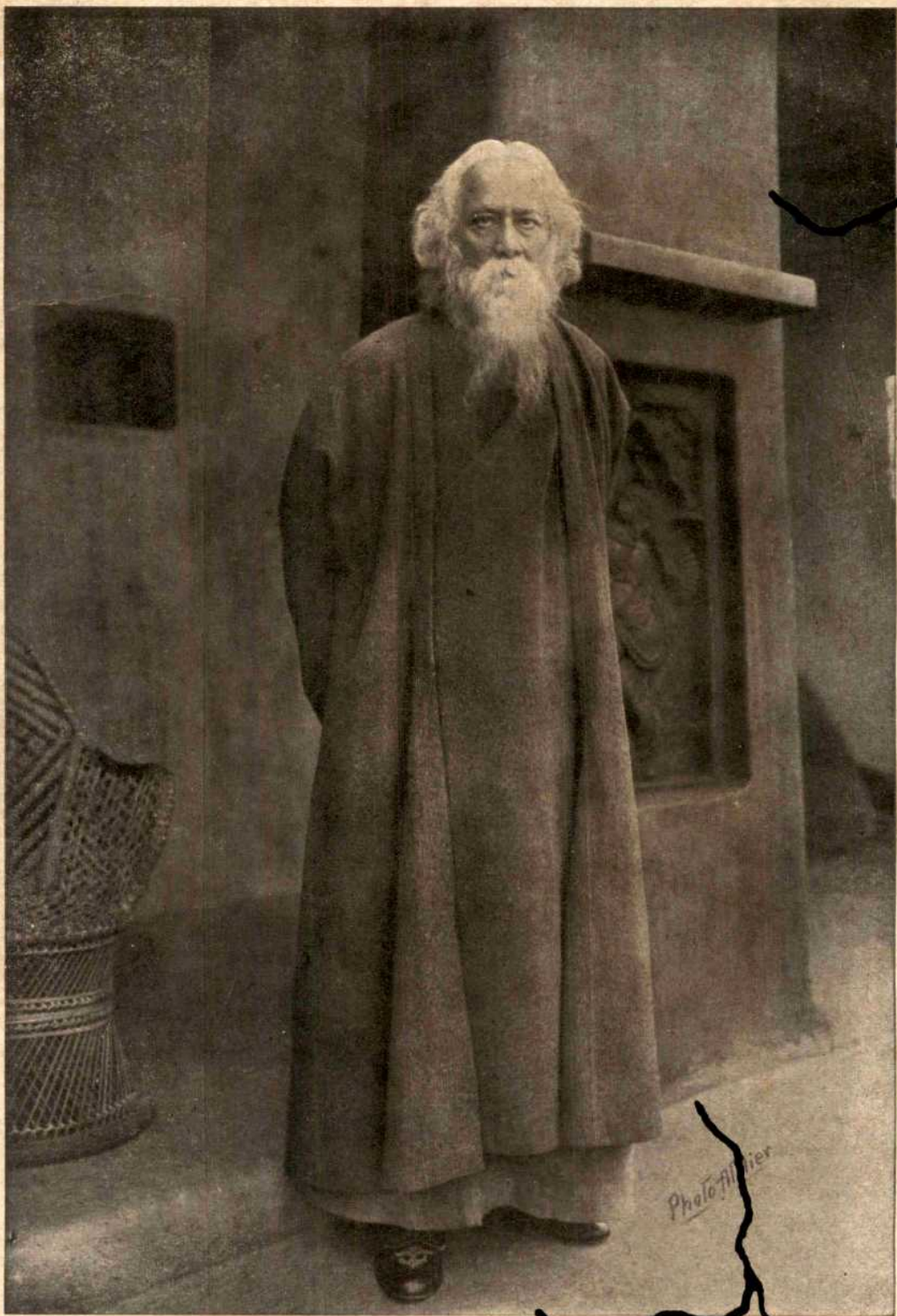


নায়িকা

(প্রাচীন রাজপুত চিত্র হইতে)

প্রবন্ধী প্রেস, কলিকাতা





রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# প্রবাস

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

৪৪৪ ভাগ  
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫

২য় সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ

### স্বাধীন পশ্চিম বাংলা ?

যে জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলনের ফলে আজ ভারত-বর্ষের চারি-পঞ্চমাংশ স্বাধীন ভারতে পরিণত হইয়াছে, তাহার জন্ম এবং পুষ্টি প্রথমে বাংলাদেশেই হয়। বাংলাদেশেই বঙ্গ-বিভাগের পরে বয়কট, সন্ত্রাসবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা পণ করিয়া যুদ্ধের আরম্ভ হয় এবং ভারতের স্বাধীনতার অভিযানে এদেশবাসী প্রথমে সফলকাম হয় এই বাংলাদেশেই ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গ রদ করিতে বাধ্য করিয়া। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে সর্ব্বদা পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে গিয়া বাংলা ও বাঙালী হিন্দু যেরূপ ত্যাগ ও কৃতি স্বীকার করিয়াছে, যেরূপ কারাবরণ ও আত্মবলিদান দিয়াছে, তাহার পরিমাণ সমস্ত ভারতের, বাংলা-বর্জিত অল্প অংশ সকলের, সমষ্টিগত আঁহুতি অপেক্ষাও অধিক। আজ স্বাধীনতা আসিয়াছে এবং জগতের নিয়মানুসারে আজ বাংলার অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে যাওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আজ বাংলার যে অংশ ভারতবর্ষে রহিয়াছে তাহা চরম দুর্দশাগ্রস্ত এবং ধ্বংসের পথে দ্রুত চলিয়াছে। কেন এরকম হইল সে কথা কি কেহ ভাবিয়াছেন?

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই শতাব্দীর গোড়াতেই বুঝিয়াছিল যে ভারতকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে হইলে বাঙালীর নরনাশ, বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুর ধ্বংস করিতেই হইবে। সেই জন্ত প্রথমে বাঙালীরই উপর দমননীতির প্রচণ্ড প্রয়োগ আরম্ভ হয়। বাঙালী তাহাতে দমে নাই, সর্ব্বশক্তি হইয়াও সে তাহার আদর্শ ছাড়ে নাই। চওনীতি প্রয়োগে কার্য্যসিদ্ধি হইল না দেখিয়া চতুর ইংরেজ অপর পথ গ্রহণ করিল। বাঙালীকে অন্ন মারিয়া তাহার সংগ্রামশক্তিকে ক্ষীণ করিবার পথ সে বাহির করিল। প্রথমে সে বাংলার গৃহবিবাদ লাগাইল মুসলমানের প্রতি কপট প্রেম নিবেদন করিয়া। এই প্রেমের স্বরূপ দেখা দিল বাঙালী হিন্দুকে তাহার জন্মগত অধিকার ও প্রাপ্য স্বার্থ হইতে সর্ব্বদা বিচলিত করিয়া মুসলমানকে তাহার ভাষা প্রাণের

সকল কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বাঙালী বহিস্কার করিয়া ভিন্ন প্রদেশীয়-দিগকে অত্যাধিক ভাবে অধিকার দান করিয়া তাহাদিগকে নিজের দলে টানিল। ভিন্ন প্রদেশীয় ধনলুপ্ত অভ্যাগতের দল পরম উৎসাহে বাঙালীর ধ্বংসসাধনে ইংরেজের সহায়তা করিতে লাগিয়া গেল। ইংরেজ বণিক বাঙালীর কারবার বন্ধ করিবার জন্ত মারোয়ারী, ভাটিয়া, গুজরাট, এবং উত্তর-প্রদেশীয়দিগকে ব্যবসায়ের সুবিধা দিল। ব্রিটিশ সরকার চাহুরীতে “Bengalis need not apply” “বাঙালীর আবেদন বুঝা” এই নীতি প্রকাশ্যে চালনা করিতে লাগিল। বাংলার ও বাঙালীর ঐশ্বর্য্য দেখিতে দেখিতে বিদেশী ও ভিন্ন প্রদেশীয়ের করায়ত্ত হইল, বাংলায় শোষণ সবচেয়ে চলিতে লাগিল। আজ বিদেশী শোষক অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী কিন্তু ভিন্ন প্রদেশীয় শোষক বাংলার হৃদয়ের শোণিত শোষণ করিতেছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাংলা আজ আগেকার চাইতেও অসহায় ও পরাধীন। বাঙালীর বুকের উপর বসিয়া ভিন্ন প্রদেশীয় চোরাকারবারী বাংলার রক্তমাংস ছিঁড়িয়া খাইতেছে। আজ ইংরেজ তাহাদিগকে সহায়তা করিতেছে না, তবে তাহাদের শোষণ বন্ধ করা যায় না কেন?

বাঙালীর সংঘবদ্ধ শক্তিকে বন্ধ করার জন্ত পূর্ববঙ্গকে কাটিয়া ছেদ করায় তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, অথচ পশ্চিমবঙ্গের সিংহভূম, মানভূম, সীতাল পরগণা এবং উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রার অংশ কাটিয়া যখন বিহারের কুক্ষিগত করা হইল তখন কংগ্রেসের হুঁচুরিট প্রস্তাবনা এবং সমালোচনা ভিন্ন আর কোন সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না। এইরূপই বা হইল কেন, একথাও বিবেচনা করার সময় আজ আসিয়াছে, কেননা আজ বাংলা চিরদিনের জন্ত তাহার ঘরবাড়ী ও ভাই-বোনের এক অংশকে হারাইতে বসিয়াছে।

এইরূপ অবস্থার কারণ বাংলা বলিতে ব্রিটিশ সরকার বুঝিত বিদ্রোহীর আবাসভূমি। বিদ্রোহীর উচ্ছেদ করার জন্ত সে বাঙালীর সর্ব্বদা মুসলমান ও ভিন্ন প্রদেশীয়ের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল এবং বাংলার যে অংশে খনিজ ও আরণ্যসম্পদ



সর্বাপেক্ষা অধিক সে অংশকে ভারতের পশ্চাৎপদতম প্রদেশের অঙ্গীভূত করে। কিন্তু ইংরেজের এ চেষ্টাও ব্যর্থ হইত যদি না কংগ্রেস মুসলমান ভোষণনীতির পথ লইত। কংগ্রেসের ধুরন্ধরদিগের ধারণা হইল সারা বাংলাদেশ যদি মুসলমানের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয় তবে মুসলমান খুসী হইবে এবং বাংলা শোষণ-কার্যে ব্যস্ত ভিন্ন প্রদেশীয়দিগেরও উপকার হইবে, সুতরাং বাংলাকে ধরচের খাতায় লেখাই যুক্তিযুক্ত। এই মত লইয়াই কংগ্রেসের এক মহারথী বলিয়াছিলেন, “what matter's if Bungal perishes” “বঙ্গাল উচ্ছেদে গেলেই বা কি এসে যায়”? বাংলার প্রতি এই বিষম বিশ্বাসঘাতকতার কোনও প্রতিবাদ কোন দিনই বাংলার কংগ্রেস হইতে হইল না, কেননা, তখন হইতেই বাংলার নেতার দল দলগত রাষ্ট্রনীতির অধঃপতনের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই নেতৃবর্গের আমলেই বাংলার চরম দুর্গতি হইল। ইঁহারা বাংলা বলিতে বুঝেন—ও বরা-বরই বুঝিয়াছেন—পূর্ববঙ্গ ও কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ইঁহাদের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত সদাশয় তিনিও অবহেলা মাত্র করিয়াছেন। অতেরা বিদেশী ও ভিন্ন প্রদেশীয়ের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর সর্বনাশে সহায়তাই করিয়াছেন।

আজ পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীন। যদি এই অভাগা আত্মবিস্মৃত প্রদেশকে বাঁচিয়া থাকিতে হয় তবে এই প্রদেশের শাসনভার ইঁহাদের উপর অপিত, পশ্চিমবঙ্গবাসীকে দৃঢ়তার সহিত স্থির কর্তে তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে যে বাংলার শোষণ আজই বন্ধ করিতে হইবে। যে তৎকালের দল এতদিন বাংলার সর্বনাশই করিয়া আসিয়াছে তাহাদিগকে বলিতে হইবে যে, সত্যতার সহিত চলিতে যদি তোমরা না চাও তবে তোমরা দূর হও বাংলাদেশ হইতে। পশ্চিম বাংলা পূর্ণ-আরতন ও স্বপ্রতিষ্ঠ না হইলে সমস্ত বাঙালী জাতির দাসত্ব অনিবার্য এটা আজ সকলের বুঝিবার সময় আসিয়াছে, এবং ইহাও সত্য যে পশ্চিম বাংলার প্রত্যেক অধিবাসী সচেতন না হইলে পতনের আর বিশেষ দেরী নাই।

### স্বাধীন বাংলার মন্ত্রীসভা

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রীসভা পাঁচ মাস গবর্নেন্ট পরিচালনার পর জাম্বুয়ারী মাসের শেষের দিকে ডাঃ বিধান রায় নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কার্যভার গ্রহণ করেন। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রীসভা চালনা, এবং কি অবস্থায় ডাঃ রায় গবর্নেন্ট হাতে পাইয়াছিলেন, তিন মাসে তিনি কি করিয়াছেন এবং কোন্ কোন্ কাজ বাকী আছে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৫ই আগষ্ট ডাঃ ঘোষের প্রথম কাজ ছিল উচ্চতম পদ-গুলিতে লোক নিয়োগের দ্বারা স্থায়ী শাসনযন্ত্র গঠন। তাঁহার নির্বাচিত লোকদের নামের তালিকা প্রকাশিত হইলে দেখা গেল যে জনসাধারণ ইঁহাদিগকে স্বদেশবিরাগী কাজের জন্ত

শান্তিলাভের যোগ্য বলিয়া মনে করিত তিনি বাহিয়া বাহিয়া তাহাদেরই অনেককে আনিয়া কয়েকটি উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমরা গত বৎসর শ্রাবণ মাসের ‘প্রবাসী’-তে আলোচনা করিয়াছি। যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যুদ্ধের সময় প্রাইস-কন্ট্রোলার থাকাকালে প্রচণ্ড দুর্নীতি পরায়ণতার অভিযোগে অপসারিত হইয়াছিলেন, নোয়াখালীর পৈশাচিক ঘটনাবলী ঘটবার পূর্বাঙ্কে দুই মাস জনকদের প্রস্ততির সংবাদ পাইয়া যে ব্যক্তি তথাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আসন শূন্য করিয়া নিজের চামড়া বাঁচাইবার জন্ত পলায়ন করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিকে ডাঃ ঘোষ বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার নির্বাচনের সময় এই ব্যক্তি সেই উপকারের ধন কতকটা শোধ করিয়াছে। কলিকাতার সহিত লেশমাত্র অভিজ্ঞতাবদ্ধিত এমন একটি লোককে তিনি পুলিশ-কমিশনার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন যিনি হিজলী বন্দীশালায় গুলি চালনায় দুই জন রাজবন্দীর মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্যমাত্র করিয়াই সমুদ্র ছিলেন। হেড কোয়ার্টার্সের ডেপুটি কমিশনারের পদে এমন একটি লোককে তিনি বসাইয়াছেন ইঁহার আমলে মোটর ভেহিকেল বিভাগটিতে দুর্নীতি সমানেই চতুর্দিকে ছড়াইতেছিল। এই দুই ব্যক্তির উপর কলিকাতা পুলিশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করিবার অবশ্যস্বাবী ফল ফলিয়াছে, পুলিশের সকল দক্ষতা ও সততা রসাতলে গিয়াছে, শহরবাসী হাড়ে হাড়ে উঁহার ফল ভুগিতেছে। কোন ব্যাপারেই বিনা “তদবিরে” পুলিশের সাহায্যলাভ আজকাল অসম্ভব।

ডাঃ ঘোষের আমলে রেশন অর্ডিনেঞ্চেরও বেশী কমাইয়া দেওয়া হয়। মফস্বল হইতে চাউল-সংগ্রহের সুবন্দোবস্ত তিনি করিতে পারেন নাই বলিয়া সংগ্রহকার্য একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার গবর্নেন্ট চাউল-সংগ্রহে অক্ষম হইয়া রেশন আধপেটারও কম করিয়া দিলে লোকে পুত্রকন্ডার ফ্রি-বস্ত্রের জন্ত বাহির হইতে অল্প পরিমাণে চাউল আনিবার চেষ্টা করিতে থাকিলে দলে দলে এই প্রকার বিপন্ন লোক ধরিয়া হাজতে ভরা হয়। লোককে সিভিল সাপ্লাইয়ের কাকর-মিশ্রিত পচা চাউল এবং সোপাষ্টোন ও তেঁতুলবীচির গুড়া মিশ্রিত আটা খাইতে বাধ্য করা হয়। গুটিকয়েক লোক আটায় ভেজাল দেওয়ার জন্ত ধরা পড়ে, ঢকানিনাদে ডাঃ ঘোষের ক্রুদ্ধ জাহির হয় কিন্তু তাঁহার আমলেই উঁহার মুক্তি লাভ করে।

চোরাকারবার দমনের নামে ইঁহা চৈ অনেক হয়, ডাঃ ঘোষ কড়া কড়া বক্তৃতাও অনেক দেন, কিন্তু একটিও বড় চোরাকারবারী না ধরিয়া যথারীতি চূর্ণপুট শ্রেণীরই চলিতে থাকে। একটি চোরাকারবার চিহ্ন ব্যবস্থা-পরিষদে পাস করা হইলেও তাহা কার্যকর হইতে পারেনি।

যাহার ফলে উহা আজও আইনে পরিণত হইতে পারে নাই। বিলের একটি বিধান ছিল যে হিন্দু যৌথ পরিবারের একজন চোরাকারবারে ধরা পড়িলে পরিবারস্থ সকলে গুণিত হইবে, এবং আর একটি ছিল এই যে সরাসরি বিচারে তিন বৎসর পর্যন্ত জেল হইবে। চোরাকারবার দমন কমিটি কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় গবর্ণমেন্টের মিলিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত; ভারত-শাসন আইন অনুসারে উহা ব্যবস্থা-পরিষদে উপাধনের পূর্বে ভারত-সরকারের অনুমতি লইতে হয় এবং বিলটি বড়লাটের সম্মতি লাভ করিয়া আইনে পরিণত হয়। বিলের খসড়া ভারত-সরকারের নিকট প্রেরিত হইলে তাঁহারা বলেন যে যৌথ পরিবারের একজনের অপরাধে সকলের শাস্তির বিধান তুলিয়া দেওয়া উচিত এবং সরাসরি বিচার করিলে শুধু জরিমানা এবং তিন বছর জেল দিতে হইলে সাধারণ বিচারের ব্যবস্থা করা উচিত। ডাঃ ঘোষ ভারত সরকারের এই সুপারিশ অগ্রাহ্য করিয়া পূর্বের আকারেই উহা পাস করাইয়া লয়েন এবং তাহার জন্তই বিলটি আইনে পরিণত হইতে পারে নাই।

ডাঃ ঘোষের আমলেই পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে বাস্তব-ত্যাগী লোক আসা আরম্ভ হয়। ডাঃ ঘোষ ইহাদের জন্ত কিছুই করিবেন না বলিয়া বন্ধপরিষদ হন এবং তাঁহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা করেন না। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে পণ্ডিত হুদয়নাথ কুঞ্জরু এ বিষয়ে পশ্চিম-বাংলা সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন জানিতে চাহিলে ভারত-সরকারের পুনর্দ্রষ্টব্য সচিব জবাব দেন যে কিছুই করা হয় নাই। ডাঃ ঘোষ এ বিষয়ে কি করিতে ইচ্ছা করেন ভারত-সরকার জানিতে চাহিলে তিনি এক কথায় জবাব দেন যে পূর্ববঙ্গ হইতে তিনি কাহারও আসার পক্ষপাতী নহেন, যদিও নিজের অভয় আশ্রম এবং মালিকানা আশ্রম তিনি সকলের আগে গুটাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিষেধ না শুনিয়া লোক আসিয়া পড়িলে তিনি কি করিবেন জানিতে চাহিলেও তিনি ঐ একই জবাব দেন যে তিনি আসিতে দিবেন না।

পশ্চিম বঙ্গের পাঁচ শত মাইলব্যাপী সীমান্ত রক্ষার আয়োজন করা একান্ত আবশ্যিক এবং অবিলম্বে তাহা দরকার ডাঃ ঘোষকে এই কথা বাহারা বলিয়াছিলেন তাঁহারা 'কমিউনাল' এবং 'ওয়ারমংগার' আখ্যা পাইয়াছিলেন। ডাঃ ঘোষ এ বিষয়ে একেবারে কিছু করেন নাই। দেশের যুবকেরা বাহাতে স্বাধীনতা রক্ষার উপযুক্ত হইতে পারে তাহার জন্ত তাহাদিগকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া দরকার—ডাঃ ঘোষ ইহাও বুঝিতে চাহেন নাই এবং তাহার জন্ত কিছুই করেন নাই। ফলে ইহাদেরই মধ্যে যেকটি উচ্ছৃঙ্খল দল ডাকাতি ইত্যাদি করিতে আরম্ভ করে তাহা এ প্রদেশের ভাল সামরিক উপাদান

কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে ও টাকায় লীগ-গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বনিয়াদী শিক্ষাদানের উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির জন্ত সার্জেন্ট পরিদর্শনা অনুসারে দুইটি ট্রেনিং কলেজ বাংলায় স্থাপিত হইয়া ছিল। উহার অধ্যাপকগণ দেশে ও বিদেশে উপযুক্ত শিক্ষা-লাভের পর অধ্যাপনাকার্য আরম্ভ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে-ছিলেন। ডাঃ ঘোষ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই কলেজ দুইটি তুলিয়া দেন এবং বলেন যে তিনি বাংলায় ওয়ার্দ্-পরিদর্শনা অনুসারে বনিয়াদী শিক্ষা আরম্ভ করিবেন। কলেজ দুইটিতে প্রায় ২০ জন অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে ছয় জনকে বাছিয়া লইয়া ওয়ার্দ্ প্রেরণ করা হয়। এই বাছাই কার্য করেন ডাঃ ঘোষের ভগিনী এবং অভয় আশ্রমের একজন শিক্ষয়িত্রী। এই ছয় জন এম-এ, এম-এসসি, বি-ট অধ্যাপকের সঙ্গে উহাদের সমকক্ষ এবং সমান বেতনে নিযুক্ত হইবার জন্ত অভয় আশ্রমের দুই জন নন-ম্যাট্রিক শিক্ষকেও পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কেননা অভয় আশ্রমের বিদগ্ধ চূড়ামণিদিগের মতে মুড়ি-মুড়কীর একই দর।

ডাঃ ঘোষ যখন কার্যভার গ্রহণ করেন তখনও কলিকাতা দ্বারকায় স্পেন্সর তদন্ত কমিশন কাজ করিতেছে এবং উহার প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই কমিশনের রিপোর্ট ভাবী ইতিহাস-রচয়িতার নিকট একটি অতি মূল্যবান উপাদান হইত ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। মুসলিম তোষণের জন্ত ডাঃ ঘোষ তদন্ত বন্ধ করিয়া দেন। সরকারের টাকায় যে পর্যন্ত তদন্ত হইয়াছে তাহার ফলাফল জানিবার জন্ত কমিশনকে একটা 'ইন্টারিম রিপোর্ট' দিতে বলা উচিত ছিল কিন্তু ডাঃ ঘোষ তাহাও করিলেন না।

### ডাঃ বিধান রায়ের তিন মাসের কার্যকাল

জানুয়ারীর শেষের দিকে ডাঃ বিধান রায় মন্ত্রীসভা গঠন করিলেন। ডাঃ ঘোষ যে সব অযোগ্য এবং স্বদেশদ্রোহী কার্যের কলঙ্কবিশিষ্ট লোককে উচ্চপদে বসাইয়া গিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদিগকে অপসারিত করিলেন না হয়ত এই কারণে যে এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলে প্রত্যেক মন্ত্রীসভাই কার্যভার গ্রহণ করিয়া স্থায়ী শাসনযন্ত্রের উচ্চতম পদে লোক বদলের রীতি অবলম্বন করিবে। আমেরিকায় এই প্রথা ছিল এবং ইহা যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হওয়ায় এখন একেবারে উঠিয়া গিয়াছে।

ডাঃ রায়ের মন্ত্রীসভা রেশন বাড়াইয়াছেন এবং অল্প পরিমাণে নিজের বা পরিবারের প্রয়োজনে বাহির হইতে চাউল আনিতে অথবা লোককে হয়রান করা বন্ধ করিয়াছেন। সংগ্রহকার্য এখন ভাল চলিতেছে।

ডাঃ ঘোষের আমলে ভারত-সরকার আয়কর এবং পার্ট-শুদ্ধির যে ভাগ নিমায়ার এওয়ার্ড অনুসারে বাংলা দেশ পায়,

তাহার পরিবর্তন সাধন করেন এবং পশ্চিম বঙ্গের ভাগ অতিশয় অত্যন্ত ভাবে কমাইয়া দেন। ডাঃ ঘোষের অর্থসচিব এই অত্যাচারের প্রতিকারের চেষ্টা করেন নাই যাহার ফলে পশ্চিম বাংলা ভারত-সরকারের নিকট তাহার জায়া পাওনা বার্ষিক প্রায় তিন কোটি টাকা কম বঞ্চিত হয়। ডাঃ রায়ের অর্থসচিব কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত দরবার করিয়া ইহার অনেকটা প্রতিকার করিয়া আনিয়াছেন।

পূর্ববঙ্গের বাস্তবায়ী সমিতি রায় গবর্নেন্ট হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। একটি পুনর্বাসতি বোর্ড গঠিত হইয়াছে, এই কার্যের জন্ত একজন কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বাস্তবায়ী সর্বস্বান্ত লোকদের দেওয়ার জন্ত আট কোটি টাকা আদায় হইয়াছে এবং ধরবাজী তৈরির জন্ত মালমসলা ও ঋণ দান শুরু হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ছাত্রদের বাসের ও সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইতেছে। পতিত জমি দখল করিয়া বাস্তবায়ীদের উহা সম্ভার বিলি করিবার জন্ত আইন হইতেছে।

সীমান্ত রক্ষার জন্ত একটি সীমান্তরক্ষী দল গঠিত হইয়াছে। সীমান্তের গ্রাম হইতে বলিষ্ঠ লোক লইয়া ফৌজ তৈরির কাজ আরম্ভ হইয়াছে। অফিসার ট্রেনিং পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। সামরিক শিক্ষাদানের আয়োজনও শুরু হইয়াছে। অফিসারের অভাব অতিশয় তীব্র বলিয়া এখনও ব্যাপকভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতেছে না। অফিসার ট্রেনিং-এর উপরেই বেশী খোঁক দেওয়া হইতেছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন দুর্নীতির একটি বিরাট আগার ইহা সর্বজনবিদিত। কর্পোরেশনের নুতন নির্বাচনের ভোটার তালিকা এমন ভাবে প্রস্তুত হইতেছিল যাহাতে বর্তমান মতলবী এবং দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের হাতেই আরও তিন বৎসরের জন্ত কর্পোরেশন থাকিয়া যাইত। নির্বাচক-তালিকার ক্রটিশূন্যতার উপর নির্বাচনের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ডাঃ রায়ের গবর্নেন্ট কর্পোরেশন ভাঙিয়া দিয়া একজন এডমিনিষ্ট্রেটরের উপর উহার পরিচালনভার দিয়াছেন এবং নির্বাচক-তালিকা প্রস্তুত করিবার দায়িত্বও তাহার উপর অর্পণ করিয়াছেন। কর্পোরেশনের দুর্নীতির কারণ অসুস্থদান এবং উহা নিবারণের উপায় নির্ধারণের জন্ত একটি তদন্ত কমিটিও গঠিত হইয়াছে এবং উহার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু কাজ বিশেষ অগ্রসর এখনও হয় নাই।

রাণাঘাট এবং হিজুলগঞ্জ দিয়া পাকিস্থানে বেআইনি মাল চালানোর চোরাকারবার প্রচণ্ডভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। কাপড় বিনিয়ন্ত্রণের পর এই চোরাকারবার উদ্ধাম হইয়া উঠিয়াছিল। স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা পর্যন্ত এই চোরাই চালানোর কারবারে হুঁপস লাভ করিবার জন্ত নাতিয়া উঠিয়াছিলেন। এই পাপ এখন অনেকটা সংযত হইয়া

আসিয়াছে। কিন্তু এই পাপের মূলে এখনও ঠিকমত আঘাত পড়ে নাই।

গত মার্চ মাসের দিকে পূর্ববঙ্গ হইতে লোক আশ্রয় অত্যধিক বাড়িয়া উঠে। সেখানে নানা প্রকার উদ্ভাব বিশেষতঃ রেল যথেষ্ট তন্নাসী বাস্তবায়নের কারণ হইয়া উঠে। গত মাসে আন্ড-ডোমিনিয়ন সম্মেলনে সকল বিষয় আলোচিত হইয়া পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গের প্রধানমন্ত্রীদের এবং চীফ সেক্রেটারীদের মধ্যে মাঝে মাঝে বৈঠকের ব্যবস্থা হয়। ইহাতে অনেকটা সুরক্ষা হইয়াছে। বাস্তবায়ণ অনেক কমিয়া আসিয়াছে, এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুর মনের অশান্তি অল্প কিছু কমিয়াছে।

ডাঃ রায়ের সম্মুখে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন দুর্নীতি নিবারণ। দেশে দুর্নীতি একেবারে অব্যাহত এবং উদ্ধাম হইয়া উঠিয়াছে এবং সমাজের সকল স্তরে উহা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাপড় বিনিয়ন্ত্রণের পর কাপড় লইয়া মিলমালিক এবং ব্যবসায়ীদের চূড়ান্ত কারসাজি চলিতেছে; কাপড় এখন দ্বিগুণ মূল্য ভিন্ন পাওয়া যায় না। এই অবস্থার প্রতিকার না হইলে এবং দুর্নীতি দমনের ব্যবস্থা না হইলে লোকে ডাঃ রায়ের অনেক সংকাজ সত্ত্বেও তাহার উপর সম্পূর্ণ আস্থাহীন হইয়া পড়িবে। সরকারী কর্মচারীদের উচ্চতম অধিকারীবর্গ নিজেরা হয় দুর্নীতিপরায়ণ নতুবা দুর্নীতির জন্ত দুর্নীতির পরোক্ষ প্ররোচনা। উভয়েরই সমান ফল ফলিতেছে। সং ও দক্ষ কর্মচারী পুরস্কৃত হইবে ও প্রমোশন পাইবে এবং অসং ও অযোগ্য লোকেরা নিন্দিত হইবে ও তাহাদের প্রমোশন বন্ধ থাকিবে, শাসনযন্ত্র দক্ষ ও কর্মক্ষম রাখিবার ইহাই মূল নীতি; পৃথিবীর সকলদেশে এই নীতি অক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে, আমাদের দেশে লীগ আমলে সাম্প্রদায়িক কারণে ইহার কিছু ব্যতিক্রম হইলেও তখন পর্যন্ত মোটামুটি ভাবে এই নীতি রক্ষিত হইয়াছে। সুপরিচিত অযোগ্য এবং দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের প্রমোশন দেওয়া এবং যাহারা যোগ্যতা দেখাইয়াছে ও ইংরেজ-লীগ আমলে পর্যন্ত দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই তাহাদের প্রমোশন বন্ধ রাখার নীতি ডাঃ ঘোষ প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। ডাঃ রায় উহা এখনও পরিবর্তন করেন নাই, বরং উহারই জের টানিয়া চলিতেছেন। প্রধানতঃ এই কারণেই সরকারী শাসনযন্ত্র কর্মক্ষম ও লোকের আস্থাভাজন না হইয়া তাহার বিপরীত পথে চলিতেছে এবং ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

### কাপড়

ডাঃ বিধান রায়ের গবর্নেন্টের সম্মুখে শোচনীয় ব্যর্থতা কাপড়ের নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতা। প্রধানতঃ এই কারণে তাহার কার্যে অসুস্থদান হইয়া অর্জন করিতে

গবন্মেণ্ট এই লুপ্ত বন্ধ করিতে অগ্রসর হইবেন। এই বক্তৃতার শিক্ষা এই—যে যায় লঙ্ঘ্য সেই হয় রাক্ষস।

তার পর এক মাস অতীত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্ট আবার শুষ্ক বোর্ডের হাতে কাপড়ের ব্যবসায়ের লাভালাভের হিসাবনিকাশের ভার দিয়াছেন; তাঁহারা বলিয়াছেন যে আগামী তিন মাস তাঁহারা সজাগ দৃষ্টি দিয়া দেখিবেন যে কাপড়ের ব্যবসায়ীরা তাহাদের লোভ সংযত করে কিনা। এই তিন মাসে কয় শত কোটি টাকা তাহাদের হাতে অত্যাশ্রয় লাভরূপে যাইবে, তাহার হিসাব তাঁহারা দেখিয়াছেন কি? তাঁহারা বলিতেছেন যখন কাপড়ের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হয়, তাহার পূর্বে কাপড়ের কলওয়াল ও ব্যবসায়ীরা সকলে ধীকার করিয়াছিল যে দেশের লোকে ভাষ্য মূল্যে বাহাতে কাপড় পায় সেই ব্যবস্থা তাহারা করিবে। এই প্রতিজ্ঞা তাহারা ভঙ্গ করিয়াছে—এই অভিযোগও কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্ট করিয়াছেন। এই অভিযোগের বিচার হয় নাই। চোরাকারবারীরা আরও তিন মাস সময় পাইল আমাদের শোষণ করিবার। এই সুযোগ তাহাদের দেওয়া হইল কেন, তৎসম্বন্ধে কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্ট নিরুত্তর, এবং প্রিন্সিপাল সেন মহাশয় ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে গবন্মেণ্টের করণীয় কিছু নাই। কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টের নিষ্ক্রিয়তা এইরূপ অপদার্থ লোকের পরিপোষক। যাহারা চোরের সাম্রাজ্যে, তাহাদের দোরগোড়ায় নিত্য চোরাকারবারীর লীলাখেলা দেখিতেছে, তাহাদের পক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা আর কতদিন সম্ভব হইবে তাহা বলিতে পারি না। “গণমত ও লোকমত” এই দায়িত্ব, চোরাকারবার বন্ধ করিবার দায়িত্ব, লইতে প্রস্তুত আছে কি? তখন প্রিন্সিপাল সেন মহাশয়ের মত মন্ত্রীবরের প্রয়োজন হইবে না, প্রয়োজন থাকিবে না।

### চোরাকারবারীর কৌশল

এক দিকে ব্যবসায়ীর সীমাহীন লোভ, অল্প দিকে অফুরন্ত অভাব দেশের জী-পুরুষকে চোরাকারবারীর সহায়ক করিয়াছে। এই ঘৃণ্য ব্যবসায় চলিতে পারিত না যদি সমাজের গণমন তজ্জনিত নৈতিক অবনতি সম্বন্ধে সজাগ থাকিত। আমরা অনেক সময় ভাবি যে চোরাকারবারী ও তাহাদের সহায়কেরা যত সব কৌশল অবলম্বন করিতেছে, যে বুদ্ধিবৃত্তি এই কৌশল উদ্ভাবনে নিযুক্ত আছে, তাহা সংপথে চলিলে, দেশের গঠনমূলক কার্যে নিয়োজিত হইলে কি অসাধ্যসাধন না করিতে পারিত। আজ আমাদের নিকট নানাবিধ কৌশলের যে বিবরণ পৌঁছিতেছে, তাহাতে সমাজের দুর্ব্যবহার কথা ভাবিয়া আমরা স্তম্ভিত হইতেছি। এতৎসম্বন্ধে কতকগুলির নিদর্শন দিলে দেশের আপামর জনসাধারণ বুঝিতে পারিবেন এই পাপ কত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। অস্বত-

সহরে, শিখমন্ডের গীঠস্থানে, পর্য্যন্ত এই পাপ দেখা দিয়াছে। এক দিন দেখা গেল এক বিবাহের বরযাত্রী রাস্তা দিয়া চলিতেছে। ঘোড়ার উপর, উটের উপর লোক আছে, একটা ঘোরাওকরা ডুলিও চলিতেছে, চার জন তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। হঠাৎ পুলিশের কেমন খেয়াল হইল, তাহারা ডুলি আটক করিয়া দেখিবার দাবি করিল। আত্মপ্রথার সম্মানস্বার্থে ভয়ঙ্কর আপত্তি উঠিল, পুলিশ জ্বলিল না। ডুলি অহুসস্থান করিয়া দেখিল কয়েক মণ গম তাহাতে আছে। এই ত গেল পশ্চিম সীমান্তের কথা। পূর্ব সীমান্তে ত্রিচৈতল্য দেবের লীলাস্থল নদীয়া জেলায় ইহা অপেক্ষা কৌশলী লোক ধর্ম্মের, বৈষ্ণব ধর্ম্মের, আচরণে বা আশ্রয়ে, কি করিয়া চোরাকারবার চালাইতেছে তাহা বর্ণনা করিতেছি। চৌদ্দ মাদলের এক সংকীর্ণনের দল চলিতেছে। ত্রিখোলের ধর্ম্মের সম্প্রদায় স্ত্রীয়া পুলিশের কেমন সন্দেহ হইল, তাহারা সংকীর্ণনের দলকে আটকাইল; খোলের চামড়া একদিকে ধুলিয়া দেখিল ঠাসা কাপড় তাহার মধ্যে। ধর্ম্মের অহুষ্ঠানে যাহারা খোলের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাঁহারা ইহার এই অপব্যবহারের কল্পনা করিতে পারিলে কি হইত জানি না। আর একটা কৌশলের বর্ণনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে আমাদের নৈতিক অবনতি কোথায় গিয়া নামিয়াছে। কলিকাতার হারিসন রোডের একটি বাড়ীতে এক দিন বিপ্রহরে আসিয়া হাজির হইলেন চারটি মহিলা—এক জন প্রৌঢ়া, তিন জন যুবতী। এক জনের কোলে ৮।১০ মাসের ছেলে। সঙ্গে ২৭।২৮ বৎসরের একটি যুবক, ৮।১০ বৎসরের একটি বালক। তৎক্ষণাৎ জল চাহিলেন এবং শিশুটির জন্য একটু দুধ চাহিলেন। নীচের বারাণ্ডায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বাড়ীর মেয়েরা উপরে গেলে পর এই আগন্তকেরা যাহা আরম্ভ করিলেন তাহা লজ্জাজনক। তিনটি মহিলা একে একে পুটুলি হইতে কোরা কাপড় ও শাড়ী নিজেদের কোমরে ও বুকে যখন জড়াইতে লাগিলেন তখন শালীনতা রক্ষিত হয় নাই। বাড়ীর লোকে টের পাইয়া ভৎসনা করিলে যুবকটি চম্পট দিল; মেয়ে চারিজন সমস্ত গুছাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। এই অবস্থা কেন হইল, তাহা বুঝিতে বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন হয় না। ৫।৭ বৎসর পূর্বে এইরূপ অবনতি কল্পনা করা কঠিন ছিল। আজ অভাবে স্বভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে; ভায়া-অত্যাশ্রয় বিচারের বোধ নিস্প্রভ হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ আমলে নৈতিক অবনতি সম্বন্ধে শাসকগোষ্ঠীর স্বাভাবিক মনোভাব ছিল আমাদের পরিহাস করিয়া নিজের দায়িত্ব এড়াইয়া যাওয়া। আজ বাধীন ভারতে এই অধোগতি চূড়ান্ত ভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বাধীন ভারতের শাসন ব্যবস্থার আর যাহা লক্ষ্য করিয়াছেন তাহারা কি কেবল বক্তৃতা করিয়া কর্তব্যোবশেয় করিবেন? না, সমাজ-জীবনের চিরন্তন

পারিতেছে না। কাপড়ের চোরাবাজারের মূলে মিলমালিকদের এবং বড় ব্যবসায়ীদের কারসাজি দিবালোকের আয়-সুস্পষ্ট। কাপড় বিনিয়ন্ত্রণের সময় বেঙ্গল টেক্সটাইল এসোসিয়েশনের হাতে ৬৫ হাজার গাইট কাপড় ছিল; তন্মধ্যে ১০ হাজার গাইট পাকিস্থানের প্রাপ্য ছিল। পাকিস্থান টাকা দিতে পারে নাই বলিয়া কাপড় লইতে পারে নাই, এখন লইবার ব্যবস্থা করিতেছে। এতদ্ব্যতীত বাংলার মিলগুলিতে মাসিক ৭০০০ গাইট কাপড় তৈরি হয়; সুতরাং বিনিয়ন্ত্রণের পর পাঁচ মাসে আরও ৩৫ হাজার গাইট কাপড় বাংলাতেই তৈরি হইয়াছে। পাঁচ মাসে কলিকাতায় ৯০ হাজার গাইট কাপড় জমা হইয়াছে তথাপি লোকে কাপড় পাইতেছে না। উপরন্তু এই সময়ের মধ্যেই আরও প্রায় ৪৫ হাজার গাইট কাপড় বোম্বাই হইতে আমদানী হয়। পশ্চিম বঙ্গের মাসিক কাপড়ের চাহিদা খুব বাড়িয়া ধরিলেও ১৩ হাজার গাইটের বেশী নহে, সেই হিসাবে আট মাস বাজার ভাসাইয়া দেওয়ার মত কাপড় কলিকাতায় মজুত ছিল।

মিলমালিকেরা দেশের লোকের স্বদেশী মনোভাবের সুযোগ লইয়া তাহাদের নিকট নিকট কাপড় অধিক মূল্যে বেচিয়া আজ এই সমুদ্র অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছেন কিন্তু সমুদ্রের শিখরে উঠিবামাত্র তাঁহারা ক্ষেতাসাধারণের সহিত জঘন্ততম জুয়াচুরী করিতেও দ্বিধা করেন নাই। কাপড়ে যে পরিমাণ খুঁতা দেওয়ার কথা তাহা দেওয়া হয় না বলিয়া আজকালকার কাপড় জালি এবং নরম হয়; ঠাস বুনা নিবন্ধ হইয়াছে বলিয়া কাপড় টেকসই মোটেই হয় না। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ছাড়া উপাদানে পর্য্যন্ত এই প্রকার জুয়াচুরি আরম্ভ হইয়াছে। উপরোক্ত হিসাবের সওয়া লক্ষ গাইট কাপড়ের কম গাইট কলিকাতায় আছে তাহা জানা কঠিন। তবে এটা দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় কাপড় চীনদেশ হইতে আরব পর্য্যন্ত সর্বত্র বিক্রয় হইতেছে। পাকিস্থান বন্দরসমূহ হইতেই হয়ত এই ব্যবসায় চলিতেছে। কয়েক দিন আগের এক সংবাদে দেখা গিয়াছিল যে বিনিয়ন্ত্রণের পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে মিলমালিকেরা ৩০ কোটি টাকার বেশী অতিরিক্ত লাভ করিয়াছেন। ছাপা দাম অপেক্ষা গাইট পিছু হাজার টাকা করিয়া মিলমালিকেরা আদায় করিতেছে ইহা সর্বজনবিদিত কথা এবং এই হিসাবে একমাত্র কলিকাতাতেই ৯০ হাজার গাইটে হাজার টাকা গাইট হিসাবে নয় কোটি টাকার খেলা হইয়া গিয়াছে। পাইকারেরা খুঁচরা বিক্রেতাদের নিকট হইতেও অল্পমূল্যে টাকা আদায় করিয়াছেন। কাপড়ের ব্যাপারে ডাঃ রায়ের গবর্ণমেন্টের অসহায়তা দেশের লোকে ভাল চোখে দেখিতে পারিতেছে না। এই অক্ষমতাকে তাহারা বিশ্বাস্যকর না ভাবিয়া ‘রহস্যজনক মনে করিতেছেন’ চোরা-কারবার আর্ডিনান্স প্রস্তুত হইতেছে দুই সপ্তাহ আগের এই

প্রতিশ্রুতি আজিও কার্যে পরিণত না হওয়ায় দেশবাসীর এই বিশ্বাসই বহুমূল্য হইতেছে যে কাপড়ের চোরাকারবারের ব্যাপারে রাষ্ট্র-মন্ত্রীসভা বণিক সম্প্রদায়ের হাতের পুতুল মাত্র।

### কৌপীনবস্ত্র হইবার সম্ভাবনা

অনেক দেশের মন্ত্রীবর্গের অনেক বক্তৃতা আমাদের পড়িতে হয় ও সমালোচনা করিতে হয়। ভারতরাষ্ট্র ও পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলীর নানা বক্তৃতা আমরা পড়িয়াছি ও সমালোচনা করিয়াছি। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের সরবরাহ সচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বৈশাখ মাসের ২ তারিখে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা আমাদের এক অদ্ভুত মনোভাবের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছে, এবং ভাবিতেছি এক জন মন্ত্রী নিজের অক্ষমতার কাহিনী ও নিজের বিভাগের অযোগ্যতার পরিচয় এমন করিয়া দিতে গেলেন কেন, এবং তার পর তিনি কোন্ সাহসে মন্ত্রী-পদট আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারেন। সেন মহাশয়কে ধন্যবাদ যে তিনি এমন সাফ জবাব দিতে পারিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গে “বস্ত্রের সফট কংগ্রেসের ছুন’ম আনিয়া দিয়াছে।” এই ছুন’ম নিবারণের জন্ত তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। কারণ তিনি নাকি বুঝিতে পারিয়াছেন যে “এই ছুন’ম নিবারণ পুলিশের কাজ নহে, এনফোর্সমেন্ট বিভাগের কাজ নহে।” প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায় এই দায়িত্বহীনতা সম্বন্ধে কি বলেন? তাঁহাদের সরবরাহ-মন্ত্রী তি-খরচায় এই কর্তব্য পালন করিবার উপযুক্ত পাত্রকে দেখাইয়া দিয়াছেন। কংগ্রেসের “ছুন’ম” নিবারণের কাজ কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর নয়; কংগ্রেসী মন্ত্রীর নয়। সেই কাজ “গণমত ও লোকমতের।” গণমত ও লোকমত দুই-তিনটি উপায়ে এই কর্তব্য পালন করিতে পারে। প্রথম, কাপড়চোপড় না কিনিয়া পূর্ববঙ্গের উপকার করিয়া; দ্বিতীয়, কৌপীনবস্ত্র হইবার চেষ্টা করিয়া; তৃতীয়, চোরাকারবারীকে ঠেঙ্গাইয়া ও বন্দাদি লুণ্ঠপাট করিয়া। এই তিন উপায় সম্বন্ধে ডাঃ রায়ের মন্ত্রী-সভার মতামত কি তাহা জানিতে পারিলে আমরা গণমত ও লোকমত গঠনে সাহায্য করিতে পারি।

সেন মহাশয়ের বক্তৃতার স্থান, কাল ও পাত্রের মধ্যে সুসঙ্গতি আছে। তিনি কালোবাজার ও মুনাফাকারীর কেন্দ্রস্থল কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে বক্তৃতা দিয়াছেন; কালোবাজারী ও মুনাফাখোরকে বলিয়া দিয়াছেন—তোমাদের কার্যকলাপ দমন করিবার জন্ত সরকারের কোন শক্তি নাই; সুতরাং তোমরা নির্ভয়ে এই সমাজ-বিধ্বংসী কাজ চালাইয়া যাইতে পার। কোন্ সময় তিনি এই বক্তৃতা দিলেন? যখন লোকমত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, কাপড়ের বাজারের অনাচারে যখন নিজের হাতে শাস্তি না দিয়া আশা করিতেছে যে



সততা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবেন? সে শিক্ষা অক্ষর পরিচয়ের উপর নির্ভর করে না; বনিয়াদি শিক্ষার উপর নির্ভর করে না; সে শিক্ষার জ্ঞত বিরাট দালানকোঠার প্রয়োজন হয় না। সে দায় তাঁহারা স্বীকার করিবেন কি?

### পাকিস্থানে চিনির দর বাইশ টাকা

চিনি বিনিয়োগের পর চিনির মিলমালিকেরা ভারত-সরকারকে বলিয়াছিলেন যে মণকরা ৩৫৮০ আনা দরের কমে তাঁহারা চিনি বিক্রয় করিতে পারিবেন না। ইহার কমে তাঁহাদের পড়তা পড়িবে না। ভারত-সরকার ঐ হিসাবই শিরোধার্য করিয়া চিনির দর ৩৫৮০ বাঁধিয়া দিয়াছেন। ভারতীয় ইউনিয়নে চিনি এখন এক টাকা সের দরে বিক্ৰাইতেছে। অথচ পাকিস্থানে এই মিলমালিকেরাই চিনি বিক্রয় করিতে চাহিয়াছেন পাইকারী ২২ টাকা দরে। নিজের দেশে বেশী দাম লইয়া বিদেশে সস্তায় মাল বেচাকে বলে ডাঙ্গি, সভ্যজগতের বাণিজ্যে ইহা গুরুতর অপরাধ। ভারতীয় চিনির মিলমালিকেরা এই খোর অজায় কার্য্য করিয়াও পার পাইয়া যাইতেছেন কাহাদের মুক্কটীয়ানার জোরে দেশবাসী তাহা জানিতে পারিলে ভাল হয়। অতদিকে যদি ইহা ডাঙ্গি না হয় তবে বলিতে হইবে যে তাঁহারা অতি অসংভাবে ২২ দরের পরিবর্তে ৩৫৮০ ধার্য্য করিয়া দেশবাসীকে ঠকাইতেছেন।

### বাংলার পশ্চিম সীমা

বাংলাদেশের যে অংশটি ইংরেজ, গবর্নেন্ট ১৯১১ সালে বিহারে জুড়িয়া দিয়াছিল তাহা ফেরত পাওয়ার আশা ক্রমশঃই যেন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। দীর্ঘকাল যাবৎ ইহা লইয়া আন্দোলন চলিতেছে, বাংলার ভাব্য দাবি মুখে স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিবার কথা উঠিলেই কংগ্রেসের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ বড় বড় কথা বলিয়া সমস্তা চাপা দিবার চেষ্টা করেন। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি কংগ্রেসে গৃহীত হইয়াছে কিন্তু একমাত্র বাংলার বেলায়ই ঐ নীতি প্রয়োগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরূপ মনোভাব দেখা যায়। অল্প ও কর্ণটিক ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের যে দাবি তুলিয়াছে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে এবং মাদ্রাজ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ ভাঙিয়া নুতন ভাবে গড়িবার আয়োজন হইতেছে। সৌরাষ্ট্র, মণ্ড, বিদ্য ও হিমাচল প্রদেশ নুতন করিয়া গঠনের বেলায়ও এই দাবি স্বীকৃত হইয়াছে।

বাংলার দাবি উপেক্ষিত হওয়ার জ্ঞত বাঙালী নেতাদের ক্রটিও উপেক্ষণীয় নহে। বিহার বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিকে হিন্দীভাষীতে পরিণত করিয়া পাকপাকি ভাবে বিহারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ার জ্ঞত গত দশ বৎসর যাবৎ যে প্রবল

চেষ্টা করিতেছে বাংলা কংগ্রেস তাহার বিরোধিতার কোন আয়োজন করে নাই। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেস-সভাপতি হওয়ার পর বাংলাভাষী অঞ্চল বাংলায় ফিরিবার আশা অতিশয় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। বিহারী নেতারা এত দিনের মধ্যে ঐ সব এলাকা হিন্দীভাষীতে পরিণত করিতে না পারার জ্ঞত কংগ্রেস-সভাপতি কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছেন। বিহার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রকাশে বলিয়াছেন যে বিনা যুদ্ধে বিহার বাংলাকে এক ইঞ্চি মাটি ছাড়িবে না। বিহারের দৈনিক পত্র 'সার্চলাইট' বাঙালী অঞ্চল বাংলায় ফিরিয়া আসার আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় মন্তব্য করিয়াছে। জামসেদপুরে বাঙালী সভা লাঠি চালাইয়া ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। মানভূমে বাঙালী সম্মেলন পুলিশ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মানভূম সিংছুমে যাহারা এই আন্দোলন চালাইতেছেন পুলিশ তাঁহাদের পিছনে লাগিয়াছে। বিহারের পুলিশের ডি-আই-জি স্থানীয় পুলিশের নিকট বাঙালী আন্দোলনকারীদের নাম ধাম ও কার্য্যকলাপের রিপোর্ট চাহিয়াছেন। বিহার মন্ত্রীসভা এ বিষয়ে প্রবল উৎসাহী এবং বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইহার সমর্থক ও উৎসাহদাতা।

যেখানে কংগ্রেস-সভাপতির মনোভাব এইরূপ সেখানে বাংলার তরফ হইতে ইহা লইয়া প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা ত হয়ই নাই, বরং ইনি বাংলায় আসিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সমস্তা আলোচনা ও উহা সমাধানের জ্ঞত যতটা চাপ দেওয়া হইতে পারে তাহাও করা হয় নাই। কয়েক দিন আগে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন একমাত্র নববঙ্গ সমিতি এই বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে গিয়াছিলেন, প্রাদেশিক কংগ্রেস বা অথাত নেতৃবৃন্দ যান নাই। আমরা বার বার বলিয়াছি যে যতই দিন যাইতেছে বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চল ফিরিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা ও সুযোগ ততই কমিয়া আসিতেছে। নুতন রাষ্ট্রবিধির খসড়াতে প্রাদেশিক সীমানা পরিবর্তনের জ্ঞত যে ধারা সংযোজিত হইয়াছে তাহা পাস হইলে ঐ এলাকা ফেরত পাওয়ার উপায় আর থাকিবে না। ধারাটির বিধান এই যে, প্রাদেশিক সীমা পরিবর্তন করিতে হইলে যার এলাকা কমিবে সেই প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতি প্রয়োজন হইবে। বলা বাহুল্য, বিহার উহা কখনও দিবে না।

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং ত্রীপুরেন্দ্রমোহন ঘোষ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। কয়েকজন কংগ্রেস কর্ম্মী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাংলাভাষী অঞ্চল ফিরাইয়া আনিবার আন্দোলনে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ডাঃ ঘোষ সাক্ষ্য জবাব দিয়াছেন যে উহা হইবার নহে, কারণ ওয়ার্কিং কমিটির

মত নাই। ওয়ার্কিং কমিটির মত যে নাই, তাহা ভাল করিয়াই জানা ও বুঝা গিয়াছে কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির ২০ জন সদস্যের মত নাই বলিয়া একটা প্রদেশ ও জাতি তাহার জায়া দাবি ছাড়িয়া দিবে কেন? বিশেষতঃ যেখানে এই মত না থাকা অত্যন্ত, অযৌক্তিক এবং কংগ্রেসের গৃহীত নীতি ও প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ বিরোধী। শ্রীমুরেরুমোহন ঘোষ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য না হইলেও প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে যথেষ্ট জোর খাটাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনিও তাহা করেন নাই। কেন করেন নাই তাহা বুঝা খুব কঠিন নহে। ইঁহার দুই জনেই পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন এবং তাহার জন্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র উদ্ভব করিতেছেন। চোরাংগলি দিয়া ষাঁহাদের মনসদে আসিতে হইবে তাঁহারা কংগ্রেস সভাপতি এবং কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ডের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিরোধ অর্জন করিতে পারেন না। সুতরাং দেশ চুলায় যাউক, মানুষ স্থানান্তরে গাঙ্গাঙ্গাদি করিয়া কলেরা, বসন্ত ও প্রঙ্গে লাখে লাখে উজাড় হউক, তাহাতে ইঁহাদের আসিয়া যায় না, প্রধান মন্ত্রিত্ব করায়ত্ত করিয়া আশ্রিত পোষণ ও ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ ইঁহাদের পাইলেই হইল। কিছুদিন আগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে কিন্তু উহা এতই আন্তরিকতাহীন যে কাহারও দৃষ্টি পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

বাংলাভাষী অঞ্চল ফেরত আনার আন্দোলনে বর্তমান বিভাগের নেতাদের উপেক্ষা এবং উদাসীনতাও কম নয়। শ্রীমুরেরুমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীনিহুঞ্জ-বিহারী মাইতি প্রভৃতিও দলের কোলে ঝোল টানায় এত ব্যস্ত যে পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙালী জাতির অস্তিত্বের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এই আন্দোলনে মন দিতে চাহিতেছেন না।

আগামী জুন মাসে রাষ্ট্রবিধির খসড়া গণপরিষদে গৃহীত হইবে। এখনও যদি দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন না হয় এবং গণপরিষদের বাঙালী সদস্যেরা যদি পূর্ববৎ নীরব থাকেন তবে বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদ প্রস্তাব পাস করিয়া যাহাতে এই দাবি গণপরিষদে পেশ করে তাহার জন্য কোন কোন সংবাদপত্র অনুরোধ করিয়াছিল। দেখা যাইতেছে তাহা করা হয় নাই। আমরা আশা করিয়াছিলাম শ্রীমুরেরুমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্ল সেন, শ্রীমুকুন্দর দত্ত, শ্রীনিহুঞ্জ বিহারী মাইতি, শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, শ্রীকমলকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের সদস্যেরা অন্ততঃ ইহা করিবেন, কিন্তু তাঁহারাও কেহই ইহাতে অগ্রসর হন নাই। গণপরিষদ অল্প, কর্ণাটক প্রভৃতির দাবি পূর্ণ করিবার জন্য একটি সীমানা কমিশন গঠন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে এবং ইহাও শোনা যাইতেছে

যে বাংলার পশ্চিম সীমা পুনর্গঠনের কোন কথা উহাতে থাকিবে না। নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে এই সমস্যা উত্থাপন করা একান্ত উচিত ছিল, কিন্তু তাহাও করা হয় নাই। কংগ্রেস-সভাপতি এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যেখানে বাংলার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভাবে সচেষ্ট সেখানে ভারতের সকল প্রদেশের জুয়াছুই ও আদর্শবাদী লোকদের সকল ব্যাপার জানাইয়া নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিতে এবং গণপরিষদে তাঁহাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করা উচিত ছিল এইজন্য যে তাহা না করিলে মুষ্টিমেয় বাঙালী সদস্যকে ফুৎকারে উড়িয়া যাইতে হইবে, বিশেষতঃ তাঁহাদেরও নিজস্ব যোগ্যতা, কর্মশক্তি ও বাগ্মিতার যেখানে একান্তই অভাব রহিয়াছে। এই সমস্যা এখন সাধারণ আন্দোলনের অতীত হইয়া পড়িয়াছে। কংগ্রেস সভাপতি এবং বিহার গবর্নেন্ট যেখানে প্রত্যাশার বিরুদ্ধে, সেখানে শুধু কলিকাতায় সভা-সমিতিতে কোন ফল হইবে না। অধিকতর সক্রিয় আন্দোলন আরম্ভ করা দরকার। প্রয়োজন হইলে বাঙালীকে সত্যাপ্রদে পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইতে হইবে। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে সময় একেবারেই নাই। আগামী জুন মাসে রাষ্ট্রবিধি পাস হওয়ার আগে যাহা করিবার তাহা করিতেই হইবে।

### রাজসাহীর চর লইয়া বিরোধ

পদ্মার একটি খাসমহল চরে রাজসাহীর কয়েকজন মুসলমান হান কাটিতে আসিলে মুর্শিদাবাদ পুলিশ তাহাদের বাধা দেয় এবং পাঁচটা আক্রমণে বিব্রত হইয়া গুলি চালায়। গত ২৫শে এপ্রিল এই ঘটনা ঘটে। ২০শে মে ঢাকা হইতে প্রকাশিত পূর্ববঙ্গ গবর্নেন্টের এক ইত্তাহারে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া মুর্শিদাবাদ পুলিশের কার্যে নিন্দা করা হইয়াছে এই কারণে যে, চরটি রাজসাহী খাসমহলের অধীন, সুতরাং মুর্শিদাবাদ পুলিশের সেখানে যাওয়ার কোন অধিকার ছিল না।

আমাদের বিশ্বাস ঢাকা গবর্নেন্টের এই ইত্তাহারে গলদ আছে। চর সরন্দাজপুরের দখল লইয়া যখন গোলযোগ হয় তখন ইহাই স্থির হইয়াছিল যে, যে-চর যে-জেলার চৌকিদারীর অধীন, সেই চর সেই জেলার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। পদ্মার এমন কয়েকটি চর আছে যাহা চৌকিদারী হিসাবে এক জেলা এবং কালেক্টরী হিসাবে অপর জেলার অধীন। এই নীতি অনুসারে চর সরন্দাজপুরের কালেক্টরী মুর্শিদাবাদ কিন্তু চৌকি রাজসাহী বলিয়া উহা রাজসাহীর অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকা ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপে কাজ চলিবে বলিয়া স্থির হয়। এখন অকস্মাৎ ঢাকা গবর্নেন্ট উপরোক্ত চরটির চৌকি মুর্শিদাবাদ এবং কালেক্টরী রাজসাহী

হওয়া উহা নিজেদের বলিয়া দাবি করিতেছেন কোন্ মুক্তিতে? ২৫শে এপ্রিল রাজসাহী হইতে কতকগুলি লোক এ চরে ধান কাটিতে আসে। এই সময় সেখানে জলি ধান নামে এক প্রকার ধান হয়। মুর্শিদাবাদ পুলিশ সংবাদ পাইয়া উহাদিগকে বাধা দেয় এবং নিজেরা আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার জন্ত গুলি চালায়। ইহাতে জনহ্রয়েক নিহত হয় ও কয়েকজন আহত হয় এবং অনধিকারপ্রবেশকারীরা পলায়ন করে। পরদিন পূর্ববঙ্গের একদল পাকিস্তানী পুলিশ চরটির বিপরীত দিকে রাজসাহীর অন্তর্গত মোক্তারপুরে আসিয়া ছাউনি ফেলে। ইহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক পঞ্জাবী পুলিশ ছিল। ইহারা আসিয়াই স্থানীয় হিন্দুদের উপর বেপরোয়া মারপিট আরম্ভ করে। তিন দিন ধরিয়া এই ব্যাপার চলে। স্থানীয় মুসলমানেরা ইহাতে অসন্তুষ্ট হয় এবং হিন্দুদের নানাপ্রকার সাহায্য করে কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস পায় না। সংবাদ পাইয়া রাজসাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট সেখানে যান। পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের রাজসাহীর সদস্য ত্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীও ঘটনা-স্থলে গিয়া তদন্ত আরম্ভ করেন। একা রাত্ৰ্য বাহির হওয়া তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নহে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে তদন্তের জন্ত ঘরের বাহির হইতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি কর্তব্যকার্যে অবহেলা করেন নাই। ইহার আগমন-সংবাদ পাইয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাঁহাকে ক্যাম্পে লইয়া যান। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া এই মর্মে ঘোষণা করেন যে কোন পুলিশ কাহারও উপর অত্যাচার করিলে তাহা সহ করা হইবে না, উহাদিগকে শাস্তি পাইতে হইবে। ইহাদের কর্তব্যপারায়ণতা এবং ত্রীপ্রভাস লাহিড়ীর নির্ভীকতা দেখিয়া অবশেষে স্থানীয় হিন্দুরা আশ্বস্ত হয় এবং ঘর হইতে বাহির হইতে সাহস পায়। বলা বাহুল্য, প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানেরা ইহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। ইহাদের একজন রাজসাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যের নিন্দা করিয়া ‘ইত্তেহাদ’ পত্রে এক চিঠি প্রকাশ করিয়াছে। তবে ইহাও এখন দ্রষ্টব্য যে হিন্দুনেতা যদি কেহ সাহসের সহিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, তবে পূর্ববঙ্গ সরকার এখন তাহার প্রতিকার করিতে চেষ্টা হইতেছেন।

### সুন্দরবনের কথা

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যখন পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি বাংলার ক্ষাভ-শক্তি উজ্জীবিত করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। মুখে অহিংসার কথা উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি এই সম্বন্ধে যে কোন কর্তব্য আছে, তাহাও বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেইজন্য দেশের পুলিশ পাহারার উপরে যে তাঁর কোন দায়িত্ব আছে, সেই বোধ তাঁর মধ্যে

দেখিতে পাই নাই। ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব-সীমান্ত—পশ্চিম বঙ্গের সীমান্ত রক্ষা সম্বন্ধে সেই মজীসভার যে বিশেষ একটা দায়িত্ব আছে তার কোনরূপ প্রমাণ আমরা ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের আমলে দেখিতে পাই নাই। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবিষয়ে একটু সজাগ হইয়াছেন; তিনি পূর্বের নিশ্চেষ্টতা ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব ও উত্তর অঞ্চলের গ্রামবাসীদের দেশ-রক্ষায় আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া আমরা আনন্দিত। কিন্তু তাঁর মজীসভাও যে এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন এবং সীমান্তের সমস্ত অলি-গলির সন্ধান পাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের মনে এখনও সন্দেহ আছে। সেইরূপ সন্দেহ না থাকিলে সুন্দরবন প্রজা-মঙ্গল সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক ব্রজচাঁদী ভোলানাথ কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর নিকট ছুটিতেন না সুন্দরবনের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্ত। এই কথা অধীকার করিবার উপায় নাই—আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণতঃ রাশিয়ার শিল্প-বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে যতটা খবর রাখেন, ততটা খবর নিজেদের দেশের সম্বন্ধে রাখেন না। এই অজ্ঞানতার জন্তই আজ ব্রজচাঁদী ভোলানাথ সুন্দরবন সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহা আমাদের নিকট নূতন ঠেকিবে। সুন্দরবন বাঘের রাজ্য এই কথাই মাত্র আমরা শুনিয়াছি; কিন্তু এই কথা আমরা জানি না যে এক সময়ে সুন্দরবন বড়িয়া অঞ্চল ছিল, তার ভগ্নাবশেষ এখনও বিস্তারিত। বাঘরগঞ্জ, বুলনা, ২৪-পরগণা জেলার দক্ষিণ অংশ লইয়া এই অঞ্চল বিস্তৃত। দেশ-বিভাগের ফলে আজ বাঘরগঞ্জ ও বুলনার সুন্দরবন অঞ্চল ভারতরাষ্ট্রের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আজ ২৪-পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার সমগ্র অংশ লইয়া পশ্চিম বঙ্গের সুন্দরবন গঠিত। এই বিভাগের কল্যাণে এই অঞ্চল ভারতরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং ইহার সামরিক গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহার অর্থনীতিক সম্ভাবনা প্রচুর। ব্রজচাঁদী ভোলানাথের কথা উদ্ধৃত করিয়া এই বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

“এই বিরাট কৃষিযোগ্য উর্বরা জমি-খণ্ড পূর্ব-বঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের বসতি স্থাপনযোগ্য, এবং জালানি কাঠ, কাঠ, মধু, ছত্র, মৎস্য প্রভৃতি এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

“জমি বিশেষ উর্বরা হওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চলে লোক-বসতি অত্যন্ত বিরল। এখানে প্রতি একরে (৩ বিঘার) ৩০-৪০ মণ ধান উৎপন্ন হয়।...এখানে বহু জমি অনাবাদী পড়িয়া আছে। আর যেটুকুও বা আবাদ হয়, তাহাও সেই সনাতন পদ্ধতিতে।...যদি উপযুক্ত পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করা যায়, তবে সুন্দরবন দেশের খাদ্য-ভাণ্ডারে পরিণত হইতে পারে।”

পশ্চিম বঙ্গের মজ্জিমণ্ডলীর এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া কার্যে অগ্রসর হওয়া একান্ত কর্তব্য। এই অঞ্চলের অর্থনীতিক উন্নতিবিধানের জন্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ববঙ্গের অত্যাচারিত হিন্দু সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ যখন পশ্চিম বঙ্গে বসতি স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প, যখন তাহাদের জন্ত, তাহাদের বাসস্থান, চাষ-আবাদের জন্ত, স্থানের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। ব্রহ্মচারী ভোলানাথ সেইরূপ স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের চর অঞ্চলে যে সব লোক পদ্মা মেঘনার জলরাশির মধ্য হইতে সোনা ফলাইতেছিল, তাহাদের পক্ষে সুন্দরবন উপযোগী হইবে—পশ্চিমবঙ্গের নদীবিরল বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর জেলা হইতে অধিকতর উপযোগী হইবে। এই কথা বিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টকে সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নতি ও সংগঠনের জন্ত বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের কল্যাণে পশ্চিমবঙ্গের পরিধি অনেক কমিয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সমুদ্রকূল হইতে জমির উদ্ধার করিয়া নিজের আয়তন বাড়াইতে হইবে; দামোদর, ময়ূরাক্ষী, গঙ্গার বঁতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া অসুর্ব্রের জমিকে উর্ব্বর করিতে হইবে; অনাবাদী জমিকে আবাদ করিতে হইবে, ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট জনগণকে রোগশূন্য করিতে হইবে। এই পরিকল্পনা-মধ্যে সুন্দরবনের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সেই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ব্রহ্মচারী ভোলানাথ প্রকৃত উপকারের সম্ভাবনা দেখাইয়া দিয়াছেন। তজ্জন্ত তিনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন।

তিনি আর্থিক উন্নতির উপায় নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব-দক্ষিণ সীমান্ত রক্ষার উপায় সম্বন্ধেও ব্যাকুল হইয়া তিনি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের প্রধান মন্ত্রীর নিকট ছুটিয়া গিয়াছেন। যে কাজে পশ্চিমবঙ্গের মজ্জিমণ্ডলী অবহেলা করিয়াছিলেন তাহা তিনি করিয়াছেন, এবং সুন্দরবনের সমস্ত আটঘাট সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকায়, তার অলি-গলির সন্ধান জাত থাকায় তিনি যে সব ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন, এই অঞ্চলের সামরিক ও অর্থনীতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে যে সব প্রস্তাব তিনি করিতে পারিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসানীয়। এই প্রস্তাবগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১) এই অঞ্চল রক্ষার জন্ত আঞ্চলিক সেনাবাহিনী নিয়োগ করিতে হইবে।

(২) বসিরহাট ও হাসনাবাদের নিকট দিয়া প্রত্যহ নদীপথে লক্ষ লক্ষ টাকার কাপড়, চিনি, সরিষার তৈল প্রভৃতি গোপনে পূর্বপাকিস্থানে চালান যাইতেছে। সুতরাং ইচ্ছামতী ও কালিন্দী নদী দিয়া মাল চলাচল বন্ধ করিয়া সীমান্ত-অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্ত মাল প্রেরণের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহাতে গোপনে মাল

চালান বন্ধ হয়, তাহার জন্ত ব্যাপক তত্ত্বাসীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৩) অবিলম্বেই কলিকাতা হইতে হাসনাবাদ হইয়া হিঙ্গুলগঞ্জ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক রেলগাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে। (৪) কলিকাতা, বসিরহাট, হাসনাবাদ এবং হিঙ্গুলগঞ্জের মধ্যে টেলিফোনের সংযোগসাধন করিতে হইবে। (৫) কলিকাতা, বসিরহাট, ইটিঙাখাট পথের উন্নতিসাধন করিতে হইবে। (৬) কয়েকটি পাকা রাস্তা তৈয়ার করিয়া সমগ্র অঞ্চলের গমনাগমন সহজসাধ্য করিতে হইবে। (৭) অবিলম্বেই হিঙ্গুলগঞ্জে একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে।

যে সব সন্ধান ব্রহ্মচারী ভোলানাথ দিয়াছেন, তাহা অমুসরণ করিতে পারিলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিক ও সামরিক ব্যবস্থার উন্নতি হইবে; পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের লইয়া যে সমস্তার সৃষ্টি তাহার কণ্ঠস্থ সমাধান হইবে। এই দুইটি বিষয় ভাবিয়া আমরা ভাঃ বিধানচক্র রায়ের মজ্জিমণ্ডলীকে কর্তব্যকর্মে আহ্বান করিতেছি। তাঁহার সুন্দরবনে গমন করিয়া সর-জমিনে বর্তমান অবস্থার ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করুন। এই জ্ঞান হইতে কর্মের প্রেরণা আসিবে। সুন্দরবন পশ্চিমবঙ্গে ঋণভাণ্ডারে পরিণত হইবে; পূর্ব-দক্ষিণ সীমান্ত রক্ষায় তাহার অধিবাসী জলেস্থলে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

### কেন দেশত্যাগ করে ?

“বরিশাল হিতৈষী” সাপ্তাহিক পত্রিকা আজ পঞ্চান্ন বৎসর হইতে দেশসেবা করিতেছে। অধিনীকুমারের হাতে-গড়া মাহুষ ঐহুগীমোহন সেন প্রায় ত্রিশ বৎসর এই পত্রিকার সম্পাদকরূপে ইংরেজ আমলে ও পাকিস্থানী আমলে নির্ভাক ভাবে নিজের কর্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন। শাসক-সম্প্রদায়ের জুকুট তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। আজ দেখিতেছি তাঁহারও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিবার উপক্রম হইয়াছে। এই বৈশাখের সংখ্যায় তিনি কেন পূর্ববঙ্গের হিন্দু দেশত্যাগ করে এবং তাহার আয়োজন করে এই প্রশ্নের সপক্ষে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন—“এই সব ঘটনা লইয়া কোন উচ্চস্তরের আলোচনা করাও চলে না, আর সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের মত ব্যক্তিদের নিকট বলাও চলে না।” বাস্তবিকই ঘটনাগুলি সামান্য, কিন্তু ইহা যে “তিলে তিলে তুমানল জ্বলিতেছে” তাহার পরিচায়ক তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

(১)

মোস্তাফাবাবু কাছারিতে গিয়াছেন, তাঁহার বুদ্ধা

পত্নী বাসায়। এক দল মুসলমান ছেলে-মেয়ে হাবেলীর বেড়া ভাঙিয়া লইতেছে—তিনি নিষেধ করিলেন—অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি শুনিলেন—এখন তিনি যদি স্বামী বাসায় ফিরিলে ক্রোধাক্ত হইয়া বলেন তুমি যখন সসন্মানে আমাকে এখানে রাখিতে পার না—তখন অত্যাচার লইয়া যাও—তাহা হইলে মোক্তার বাবুর মুখ থাকে কোথায়।

(২)

চকবাজারের দোকানদার। এক জন মুসলমান গেল্লির দাম জিজ্ঞাসা করিল। দাম বলা হইল—সে চলিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া আবার দাম জিজ্ঞাসা করিল—দোকানদার বলিল দাম তো একবার বলিয়াছি। সকোম্বে উত্তর হইল মশায় আমায় লুপ্তি পরা দেখিয়া বৃষ্টি তুচ্ছ করেন? সে বলিল আমরা জিনিষ বিক্রয় করিতে বসিয়াছি, কাছাকেও তুচ্ছ করি না, লুপ্তি পরিয়া আত্মক, আর উচ্চ পোষাক পরিয়া আত্মক। গর্জিয়া উঠিল খরিদার, কি মশায় আমায় ল্যাংট পরা বলেন। জুটিয়া গেল ৪০-৫০ জন বধর্মী। লোক আসিল—দোকান যায় যায়—হিন্দু দোকানদারগণ ভয়ে চূপ করিয়া রহিল।

(৩)

মোক্তার লাইব্রেরি—হিন্দু অধিক, মুসলমান কম, কিন্তু মুসলমান মোক্তার মহাশয়দের মধ্যে ২১৩ জন প্রত্যহ এমন অশ্লীল ভাষায় তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করেন যে তাহা কোনও মানুষ সহ্য করিতে পারে না। পুলিশ সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিবার ভয় দেখান হইল—উত্তর হইল—আমাদের গায় হাত দিলে বদলী করা বন্দনবনে।

(৪)

কড়া জামরুল খাইতে মুসলমান আসিয়াছে, বলা হইল বড় হইলে খাইও এখন নষ্ট কর কেন? কে শোনে কথা। একটি হিন্দু বালক একটু কড়া কথা বলিল, অমনি আসিল ৪০১৫০ জন। হিন্দু ক্ষমা চাহিল—তাহার পর শাস্ত। ইহারা কিন্তু চিরকালের প্রতিবেশী।

হিন্দুর জমি চাষ করিতে সাহায্য করিবে না, হিন্দুর জমির ফসল জোর করিয়া কাটিয়া লইবে—এরূপ অসহযোগের অভিজ্ঞতা ত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ আধিক ক্ষতি সহ্য করিয়া কত দিন লোক জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে, তাহার কথা ভাবিতে হয়। তাহার উপর পারিবারিক সম্মানের উপর হাত উঠাইতে যখন মুসলমান জনতার সংস্কারে বাধে না, তখন দেশত্যাগের সমস্ত আয়োজন

পূর্ণ হইয়া যায়। এই সব কথা সত্য; খ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় তাহা জানেন এবং স্বীকার করেন। তবুও গান্ধীজীর নিকট যে শিক্ষা তিনি পাইয়াছেন তাহা অহুসরণ করিয়া তিনি বলিতেছেন যে ধৈর্য দ্বারা মুসলমানের বিদ্বেষ ও লোভকে জয় করিতে হইবে; ইংরেজের আমলে অত্যাচার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার যে সাহস আমাদের ছিল, পাকিস্থানী আমলে তাহা হারাইবার কোন কারণ নাই। মুসলমানও মানুষ, তার সংবুদ্ধি, সংপ্রসুতি এখন আচ্ছন্ন হইয়া আছে; এই অবস্থায় সে মর্যাদাসিক্ত অপমান ও অত্যাচার করিতে পারে। তাহা সহ্য করিয়া উঠিতে পারিলে, তার সদ্‌বুদ্ধি ও সংপ্রসুতি জাগ্রত হইয়া উঠিবে। যে অত্যাচার সে করিয়াছে, তাহাতে সে লজ্জিত হইবে। গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় যে কার্য নোয়াখালিতে আরম্ভ হইয়াছে—এই বিশ্বাস ও ভরসার উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত; মানবপ্রকৃতির প্রতি প্রজ্ঞার উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত। খ্রীষ্টিয়ানোহন সেন মহাশয়ের মত বাহারা আজীবন দেশসেবা করিয়াছেন, তাহারা একথা বোঝেন না, এরূপ কথা বলিবার স্পর্শ আমাদের নাই। তিনি যে সব ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অন্তরূপ অপমান ও ক্ষতির কথাও হয়ত তিনি জানেন। তিনি যে কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাঁহার ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও সত্য—“কথার অতীত রিষাদ আমার, কথায় জানাব কত।” কিন্তু যুগে যুগে রাষ্ট্র বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়া মানবমন পরাজয় মানে নাই; মানব-প্রকৃতি অত্যাচার ও অপমানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। বাঙালী হিন্দু আবার সেই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইয়াছে। ভয় পাইলে চলিবে কেন? আবার সংগ্রাম করিতে হইবে।

### শুদ্ধ বিভাগে অবাঙালী

বাঙালীর নিজস্ব বেকার-সমস্যা যুদ্ধের পর অভিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ পাকিস্থানে যাওয়ার পর এই সমস্যা আরও তীব্র হইয়াছে। এই অবস্থায় বাংলা দেশের এবং বাংলায় অবস্থিত ভারত-সরকারের বিভাগগুলিতে অবাঙালী কর্মচারীর সংখ্যাবৃদ্ধি অস্বীকৃত হইতেছে। আশ্রয়-প্রার্থী সমস্যা সমাধানের নামে সম্প্রতি এখানে বহু পঞ্জাবী ও সিন্ধীকে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে ইহা অত্যাচার কথা। শুদ্ধ বিভাগ মাদ্রাজীর দ্বারা ভর্তি করা হইতেছে। দামোদর স্বামী বিহারী চুকাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। বাঙালীর প্রতি এই সব অন্যায়ের প্রতিকারের দায়িত্ব কাহার? আসামে রেলের বাঙালী কর্মচারীরা আসামীদের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাদের উপর নানাবিধ আক্রমণ, গৃহে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি চলিতেছে। ইহাদিগকে বাংলার ফিরাইয়া আনিয়া গোঁড়াটিতে পঞ্জাবী, সিন্ধী ও মাদ্রাজী পাঠাইয়া দেওয়া উচিত।



### নূতন পরিভাষা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারী কার্যে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দগুলির একটি বাংলা পরিভাষা সংকলন করিয়াছেন। উহা সহজবোধ্য হয় নাই, অনাবশ্যক কষ্ট করিয়া দুর্বোধ্য করিয়া তোলা হইয়াছে বলিয়াই যেন মনে হয়। প্রত্যেকটি সংবাদ-পত্র এই সংকলনের নিন্দা করিয়াছে। পরিভাষার প্রধান উদ্দেশ্য উহা সহজবোধ্য হওয়া চাই। সংকলয়িতারা এই দিকটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং সংস্কৃত, অভিধান মন্বন করিয়া কতকগুলি অতিশয় দুর্বল এবং অপরিচিত শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন। আরবী, ফারসী ও ইংরেজী বহু শব্দ বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে বাংলা ভাষার কোন ক্ষতি হয় নাই। পরিভাষা-রচয়িতারা উহা বাদ দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই। ইঞ্জিন পেশকার প্রভৃতি শব্দ তাঁহাদের রাখিতে হইয়াছে। বাংলা ভাষায় তদ্বৎ সমস্ত শব্দ বাদ দিয়া মিছক-তৎসম শব্দের সাহায্যে অভিধান প্রণয়ন আবশ্যক বা বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমরা মনে করি না। সংকলয়িতারা যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের শ্রম ব্যর্থ না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা নিতান্তই প্রয়োজন।

জনমভের নিকট নতি স্বীকারে কাহারও লজ্জিত হইবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। পরিভাষা-সংসদের সংকলনটিকে খসড়া হিসাবে গ্রহণ করিয়া জনমভের অঙ্কুলে উহা পুনর্বিবেচনা করিলে ভাল হইবে। পরিভাষা-সংসদের সদস্য মনোনয়নে একটি বড় ত্রুটি এই গোলযোগের মূল কারণ বলিয়া মনে হয়। বাংলা শব্দ চমকিত ও প্রস্তুত-করণে বাংলা সংবাদপত্রসমূহের দান অসামান্য, অথচ তাঁহাদের কোন প্রতিনিধি সংসদে গ্রহণ করা হয় নাই। আনন্দবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব বার্তা-সম্পাদক এবং ভারত-এর বর্তমান বার্তাসম্পাদক শ্রী অমূল্যচন্দ্র সেনের কৃতিত্ব এ বিষয়ে সর্বজনবিদিত। পরিভাষা-সংসদে ইহাকে মনোনীত করিয়া বর্তমান ত্রুটি সংশোধন করিলে ভাল হয়। বাংলা ভাষায় চিরস্থায়ী ভাবে যে সব নূতন শব্দ প্রবেশ করাইবার ব্যবস্থা হইতেছে তাহা তিন চার বার পরীক্ষিত হওয়া এবং সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া উচিত।

### হায়দরাবাদ সমস্যা

গত মাসের “প্রবাসী” পত্রিকায় হায়দরাবাদ রাজ্যের নিজাম বাহাদুর ও তাঁহার শাসক শ্রেণীর মতিগতির একটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া যখন এক মুঘল কর্মচারী দাক্ষিণাত্যে নিজের জন্য একটি রাজ্য স্থাপন করেন, তখন তিনি বা তাঁহার সাহায্যকারিগণ কেহই বোধ হয় কল্পনা করেন নাই যে এই রাজ্যে মুসলমানদের

রাজনীতিক প্রাধান্য (“traditional political superiority of Muslims”) রাষ্ট্রপরিচালনার একটি নীতি হইয়া দাঁড়াইবে। এ কথা তাঁহাদের পক্ষে ভাবা সম্ভব ছিল না। কারণ পুনর মারাঠা প্রাধান্য তখনও দাক্ষিণাত্যে ও উত্তর ভারতে অটুট ছিল এবং কেবল ইংরেজের সাহায্যেই নিজাম বাহাদুরের রাজ্য মারাঠা কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিল। গত ১৫০ শত বৎসর কেবল ইংরেজের প্রসাদেই হায়দরাবাদ রাজ্য টিকিয়া আছে এবং আজ যখন ভারত-বর্ষে গণরাজ্যের জয়যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে, তখন নিজাম রাজ্যের সঙ্গীর্ণ ব্যবস্থা টিকিতে পারে না। এই কথাটা নিজাম মীর ওসমান আলী খাঁ বুঝিতে পারেন নাই তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু গণরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইলে তাঁহার বংশের স্বার্থ সঙ্কুচিত হইবে—এবং এই বিধান গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সহজ নয়। সেইজন্য তিনি বহু দিন হইতে দাক্ষিণাত্যে মুসলমান-প্রাধান্যের জিগির উঠাইয়া, নিজের নিরঙ্কুশ অধিকার দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে অনেক সময়েই তাঁহাকে “মুলকের”—হায়দরাবাদে—বাহিরের লোকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। উত্তর-ভারতের মুসলমান ভাগ্যান্বেষী-গণ এই কাজে তাঁর দক্ষিণবস্তুর স্থান অধিকার করিয়া আছে। হুসেন বিলগ্রামী হইতে কাসিম রাজভী—এই পর্যায়ের লোক; বিগত ৭০ বৎসর ইহাদের পরামর্শেই হায়দরাবাদ রাজ্য চলিয়াছে। ইংরেজ তাঁর নিজের স্বার্থের হানি না করিয়া নিজাম বাহাদুরকে প্রত্যাশ দিয়াছে, ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান বলিয়া তাঁর অধিকার ইন্ধন জোগাইয়াছে এবং ভারতবর্ষের মুসলমান প্রধানগণ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ প্রত্যাশ পাইয়াই আজ কাসিম রাজভীর মতন লোকে চীৎকার করিতে সাঁহস পায় যে নিজাম বাহাদুর “মুসলিম-প্রাধান্যের প্রতীক” মাত্র; রাজ্যের আসল শাসনকর্তারা হইল ২৫-৩০ লক্ষ মুসলমান।

অবশ্য নিজাম বাহাদুরের প্রত্যাশ পাইয়াই কাসিম রাজভী এত দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, এবং এমন কথাও শুনিতে পাইতেছি যে রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা কাসিম রাজভীর হাতে চলিয়া গিয়াছে; মীর ওসমান আলী খাঁ তাঁর হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তিনি এমন উগ্র সাম্প্রদায়িক দলদ্বারা পরিবেষ্টিত যে, যদি ভারতরাজ্যের সঙ্গে সন্ধি করেন তবে তাহারা তাঁহাকে খুন করিতে পারে (“Who would probably murder him.”)। এই কথাটা লঙনের “নিউ স্টেটম্যান এণ্ড নেশন” পত্রিকার সম্পাদক মিঃ কিংসলি মার্টিন ছনিয়াকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কয়েক দিন হায়দরাবাদ রাজ্যে ঘুরিয়া এবং সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর প্রতি-নিধিবর্গের সহিত আলোচনা করিয়া, কাসিম রাজভীর নিজের বাজীতে তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিয়া তিনি বুঝিয়া-

ছেন যে, ইত্তেহাদ-উল-মুসলেমিন প্রতিষ্ঠানই রাজ্যের সর্ব্বেসর্কা ("It is the unofficial *Eltehad* rather than the comparatively small and ill-armed Hyderabad army, which is in control of the situation")।

হায়দরাবাদ রাজ্যের ক্ষুদ্র ও অল্পশস্ত্রে অ-সজ্জিত সৈনিক-দল ইত্তেহাদের অভুলীনির্দেশে চালিত হয়। এই কথার অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের চোখের সামনে দেখিয়াছি, দেখিয়াছি জনাব হুশেন সহিদ ছোরাওয়ার্দির আমলে কি করিয়া মুসলমান জনতা কলিকাতার উপর ১৯৪৬ সনের ১৬ই আগষ্ট তাণ্ডব 'নৃত্য' করিয়াছিল; কি করিয়া নোয়াখালি জিপুরায় অত্যাচার চালাইয়াছিল এবং ১৯৪৬ সনের ১৫ই আগষ্টের পর কি করিয়া পূর্ববঙ্গে মুসলীম শাস্তালা গার্ড খাজা নাজিমুদ্দিনের পক্ষে শাসনকার্য্য চালাইয়াছিল। হায়দরাবাদের ইত্তেহাদ-উল-মুসলেমিন বাংলাদেশের মুসলমান "জনতা" হইতে বেশী সংগঠিত। এই প্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিকসংস্কার সংখ্যায় ২ লক্ষ; তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র প্রচুর; এবং তারা রাজ্যে মুসলমান প্রাধান্ত রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ("A body of some 2,00,000 able-bodied Muslims... armed and ready to fight with any who threaten their power in Hyderabad.")।

এই অবস্থায় কি করা কর্তব্য। তৎসম্বন্ধে এই ইংরেজ সাংবাদিক আকারে ইঙ্গিতে অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন না যে কূটনীতি সফলকাম হইবে ("diplomacy can succeed")। ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারেরা আজ পর্য্যন্ত সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছেন। তারও একটা শেষ আছে। এই শেষের কথাই মিঃ কিংসলি মার্টিনের প্রবন্ধে পাওয়া যায়। একজন বাস্তববাদী বলিবে যে হায়দরাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তর ও বাহির হইতে যে চাপ পড়িতেছে—হায়দরাবাদের স্টেট কংগ্রেস হইতে, সমাজতন্ত্রবাদী ও কম্যুনিষ্ট দল হইতে—সেই দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে বা তার প্রথমে দিলে নিজাম বাহাদুরের সাধের সাজানো বাগান ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে। ("A realist might urge that instead of discouraging pressure from the Communist-Socialist elements and the State Congress, Delhi should turn a blind, if not a favourable eye upon all such activities, legal and illegal.")। এখানে বলা দরকার যে কম্যুনিষ্টদল এতদিন নামে বিরোধ করিয়া এখন প্রকাশ্যে রাজ্যভীর দলেই আসিয়াছে। আগামী দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই দেখা যাইবে বাতাস কোন্ দিকে বহিবে। বর্তমানে ভারত-রাষ্ট্র হইতে যে কথার ভুবড়ি উড়িতেছে, তাহা বন্ধ হইলেই প্রকৃত কাজ আরম্ভ হইবে। কথায় বড়ই শক্তিক্ষয় হইতেছে।

অস্ত্রের বনবনা না শুনাইয়াও কেবল মাত্র অর্থনৈতিক চাপেই ("economic pressure") হয়ত নিজাম বাহাদুরের কূট চাল ব্যর্থ করা যাইতে পারে। তবে আর বেশী দিন সময় দিলে তাহা সম্ভব হইবে না। তখন ভারত-সরকারকে বিপরীত অবস্থার মধ্যে অস্ত্র গ্রহণই করিতে হইবে।

### ইউরোপ মহাদেশের সমস্যা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও বিজয়ী দেশসমূহ ইউরোপ মহাদেশে শান্তি আনিতে পারিতেছেন না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধের সময়ে যেকোন একজোট ছিলেন, যুদ্ধের পরে সে মনোভাব উবিয়া গিয়াছে। এক দিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন অল্প দিকে এই ত্রি-শক্তি 'যুদ্ধং দেহি' রবে পায়তারা কষিতেছেন। দুই পক্ষই এখন পরাজিত জার্মানীকে লইয়া টানা-হেঁচকা করিতেছেন; জার্মানীর মনোভাব মোলায়েম করিয়া নিজ নিজ দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই অবস্থায় ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে জার্মানী ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলে, বর্তমানে যে লাখি-কোটি তাহার উপর পড়িতেছে তাহা সহ করিতে পারিলে অদূর ভবিষ্যতে সে যুদ্ধের মুখ দেখিতে পাইবে। ইউরোপের কেন্দ্র-স্থলে সে অবস্থিত; বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ কতদূর শক্তিদর হইতে পারে, জার্মান বৈজ্ঞানিকগণ তাহা বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। দুই পক্ষেই এখন তাঁদের আদর বাড়িয়াছে; দুই পক্ষই তাঁহাদের জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তি ব্যবহার করিবার জন্য ব্যগ্র। এইরূপ পট-ভূমিকায় ইউরোপের অবস্থার বিচার করিলে আমাদের বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, যে পক্ষ জার্মানীর সাহায্য লাভ করিতে পারিবে, সেই-ই বর্তমান রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিতে পারিবে। এইরূপ প্রতিযোগিতার একটা রূপান্তর দেখিতেছি পশ্চিম ইউরোপে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও লুক্সেমবুর্গ একটা দল বাঁধিয়াছে; অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে পরস্পর সাহায্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। প্রায় ৬৪০ কোটি টাকা সাহায্য প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে ইউরোপের ১৬টি দেশ মার্সাল-পরিকল্পনা অনুসারে। এই টাকা দিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যদি এই ১৬টি দেশকে নিজের পক্ষে টানিতে পারে, তবে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। অপর দিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে পূর্ব-ইউরোপের দেশসমূহ পূর্ব-জার্মানী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমেনিয়া পর্য্যন্ত একজোট হইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদেরও আর্থিক উন্নতির একটা পরিকল্পনা আছে, এবং সেই পরিকল্পনায় ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা হইতেছে। এই দুই বিরোধী রাষ্ট্রপুঞ্জের কার্য্যকলাপ বুঝিবার পক্ষে নিরপেক্ষ বিবরণ আমরা

পাইতেছি না। সম্প্রতি হল্যান্ডের হেগ নগরে মিঃ চার্লিসের নেতৃত্বে যে সভার অধিবেশন হইয়াছে তাহার ফলাফল না জানিয়াও ইহা বলা যায় যে ইহা বিরোধী পক্ষের তর্কবিতর্কের অবসান ঘটাইবে না। একটি “ইউরোপীয় পরামর্শ সমিতি” গঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের সনদ অনুসারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে “গণতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত ইউরোপীয় ইউনিয়নে ইউরোপের সকল জাতির সমান অধিকার থাকিবে।” এই “গণতান্ত্রিক” শব্দের সংজ্ঞা লইয়াই যত বিরোধ। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তাহার সহায়ক দেশসমূহ গণতান্ত্রিক উপায়ে শাসিত হইতেছে; এই কথা কি মিঃ চার্লিস স্বীকার করিবেন? পান্টা উত্তরে সোভিয়েট ইউনিয়ন বলিবে যে পশ্চিম-ইউরোপ ও আমেরিকা ত সাম্রাজ্যবাদী ভাবের পোষক, এবং সাম্রাজ্যবাদের কল্যাণে পরিপুষ্ট। এই অভিযোগের প্রমাণ হেগ নগরীর একটা সিদ্ধান্তের মধ্যেই পাওয়া যায়। “অধীন বা সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র দেশগুলির অর্থনীতিক, রাজনীতিক ও সামাজিক প্রকৃতি সর্ববিধ উন্নতিবিধানের জন্ত যে সম্মিলিত ইউরোপ গঠনের চেষ্টা চলিতেছে, তাহার মধ্যে জার্মানীরও স্থান থাকিবে।” এই প্রস্তাবের মধ্যে “অধীন” কথাটাই আমাদের মনে সন্দেহ জাগাইয়াছে। জার্মানী আজ “অধীন” দেশ; তাহার স্থান ব্রিটেন বা ফ্রান্সের সমান হইবে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। এই অসাম্য অত্যাচার “ক্ষুদ্র” দেশসমূহকেও গীড়িত করিবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের অধীনে জার্মানীর যে অংশ আছে, তাহা এই সম্মিলিত ইউরোপের মধ্যে স্থান পাইবে কি? বস্তুতঃ হেগ নগরীর সভার ফলে ইউরোপ মহাদেশের বিভাগ অটল হইয়া রহিল বলিয়া মনে হয়।

### প্যালেস্টাইন

পৃথিবীর নবতম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইল। দুই হাজার বৎসরের স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা “ইজরাইল” রাষ্ট্রের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ছয়টি আরব রাষ্ট্র—মিশর, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, ট্রান্সজর্ডিনিয়া ও সৌদি আরব—এই নব-জাত রাষ্ট্রের গলা টিপিয়া মারিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছে; তাহার পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিক হইতে “ইজরাইল”ের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। প্যালেস্টাইনের আরব অধিবাসীরা এখনও কোন ঘোষণা করে নাই; মনে হয় তাহার সমস্ত দেশের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা করিতেছে। এই ক্ষুদ্র প্যালেস্টাইনের ৬ লক্ষ ইহুদির বিরুদ্ধে ১৪ লক্ষ আরবের নহে। বিশ্বের দেড় কোটি ইহুদির বিরুদ্ধে সাত কোটি আরবের ইহা সংগ্রাম। কিন্তু এই অসামান্য যুদ্ধের ইহাই শেষ নয়। বিশ্বের মুসলমানগণ ইহাতে যোগদান করিতে পারে। তখন ব্যাপার কি দাঁড়ায়, তাহা এখন কল্পনা করা কঠিন। সম্মিলিত জাতির

যে প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের অবসানে গড়িয়া তোলা হইতেছে, তাহা প্যালেস্টাইনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল না। ব্রিটেন তাহার শাসনসময়েও প্যালেস্টাইনের আরব ও ইহুদির মধ্যে সম্প্রীতি আনিতে পারে নাই—যে কারণে পারে নাই ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে। আজ সে কথা ভাবিয়া ছুঃখ করিয়া লাভ নাই। কিন্তু আশঙ্কার কারণ আছে। মহাভারতে “অষ্ট বজ্র মিলন” বলিয়া একটা উপাখ্যান আছে। বিংশ শতাব্দীতে আবার সেই উপাখ্যানের পুনরুক্তি না হয়। ক্ষুদ্র প্যালেস্টাইনকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া আবার বিশ্ব-সংগ্রামের রণ-দামালা বাজিয়া উঠিতে পারে।

### রবীন্দ্র-জয়ন্তী

“সব চেয়ে ছুঃখ সে মানুষ আপন অন্তরালে,  
তার কোন পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।

সে অন্তরময়,

অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।”

২৫শে বৈশাখ এই কথাই বারে বারে মনে হইয়াছে। যে জ্যোতিষ্মান, “অন্তরময়” পুরুষ ৮৮ বৎসর পূর্বে ২৫শে বৈশাখ কলিকাতা নগরীর দেবেজনাথ ঠাকুরের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ৮০ বৎসর নানাভাবে পৃথিবীর জীবন সুন্দর ও মহীয়ান করিবার জন্ত সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তরের সঙ্গে মিশিয়া কি আমরা তাঁহার অন্তরের পরিচয় পাইয়াছিলাম? এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করে তাঁহার জন্মোৎসবের সার্থকতা, তাহার জন্ত সভাসমিতি করিয়া তাঁহার প্রশংসিত্বের আমাদের আয়োজন-উদ্যোগ। জানি মানুষ ব্রত-উপবাস করে কোন মহান আদর্শের প্রতি অমূল্য অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিবার জন্ত; সেই মানুষই আবার ব্রত-উপবাসের আয়োজন-উদ্যোগের মধ্যে নিজেই হারাইয়া ফেলে; মুখ্য যাহা ছিল তাহা হইয়া পড়ে গৌণ, বাহির অন্তরকে কোণঠাসা করিয়া ফেলে। আদর্শের ও অমূল্যতার এই বিবর্তন মানব-সমাজে স্বাভাবিক হইতে পারে। এইরূপ উৎসবের প্রয়োজন আছে; একদিনের জন্ত, কয়েক ঘণ্টার জন্ত, ক্ষণিকের জন্তও অন্তর্লোকের পরিচয় পাওয়ার সার্থকতা আছে। এই ক্ষণিকের দেখাই মানব-জীবনকে সহজ, সরল ও সরস করিবার চেষ্টা করে। আমাদের বর্তমান জীবনের সহস্র ব্যর্থতার মধ্যে সেইজন্ত ২৫শে বৈশাখ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ২৫শে বৈশাখের জন্ত শিক্ষিত বাঙালীর মন জানতঃ অজানতঃ অপেক্ষা করে সারা বৎসর ধরিয়া নিজের মনের নানা উচ্ছ্বাস, নানা ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্ত। সমাজ-জীবনের স্বাস্থ্যের জন্ত এইরূপ মুক্তির প্রয়োজন আছে। ৮০ বৎসর রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবীকে ভালবাসিয়া ইহাকে অন্তর্লোকের ভাবসুসমায় মগ্নিত করিতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্ত যেখানে ক্ষুদ্রতা, যেখানে ক্রোধ দেখিয়াছেন, সে স্থানকেই

মহীয়ান ও পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন। রাষ্ট্রের জীবনে, সমাজের জীবনে, জাতির জীবনে, বিশ্ব-মানবের জীবনে এই ক্ষুদ্রতার উপর তিনি হানিয়াছেন তাঁহার বক্তা; সমস্ত স্ফূর্ণতার উর্ধ্বে উঠিয়া তিনি শিবম্, শান্তম্, সুন্দরম্—আমাদের জীবনে, বর্তমান যুগের গ্রী-পুরুষের জীবনে এই জি-যুগের আবির্ভাবের জ্ঞাত অক্লান্ত সাধনা করিয়াছেন। এই সাধনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের রহস্য খুঁজিতে হইবে। তাঁহাকে “ভূত্যা-ভ্রমের” আবছায়ায় বদ্ধিত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গগুণে এই জীবনের সংকীর্ণ গতি তাঁহার মনকে সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই। রাজা রামমোহন রায়ের “ব্রাদার” তাঁহার পিতা; এই বিরাট পুরুষের জীবনাদর্শ সেই যুগের সকলের জীবন নানাভাবে প্রোচ্ছল করিয়া তুলিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে যে নব-জাগরণের স্বচনা হয়, সেই যুগসঙ্কীর্ণে আমাদের পূর্বজগৎকে কেহই তাহার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই; শত্রু ভাবেই হউক, মিত্র ভাবেই হউক, সকলেই সেই উজ্জ্বল অবগাহন করিয়া বর্তমান যুগোপযোগী শিক্ষা দীক্ষার কর্তব্য ও দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি “ইয়ং বেঙ্গল” “ইয়ং বোম্বাই”এর উদ্ভাবনার কথা—যখন গুরু ঋগ্বেদ ও হিন্দু ধর্মের রীতিনীতির প্রতি গুরু হাড় নিক্ষেপ করাই ছিল ইংরেজী শিক্ষিত মনে সর্বাধিক সহজ পরিচয়। কিন্তু “ইয়ং বেঙ্গল” “ইয়ং বোম্বাই”কে দিয়া সেই যুগকে বিচার করিলে চলিবে না। সে যুগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন, “বিজ্ঞানাগর” ছিলেন, অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন—যেমন ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, এবং সেই যুগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এই নরশ্রেষ্ঠরা।

সেই যুগের প্রান্তে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, এবং তাঁহার জীবনমুহুর্তে আমরা দেখিতে পাই ভারতীয় সমাজে এক আত্মবিশ্বাস ও সঙ্গমবোধের প্রত্যাবর্তন যাহা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমাদের রাষ্ট্রে করিয়াছে আত্মপ্রতিষ্ঠা, যাহা ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন এই আত্মবিশ্বাস ও আত্মোপলব্ধির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। সেই পরিচয় দিতে গিয়া তাঁহার মত অগ্রগীদের তপস্বী করিতে হইয়াছে। এই পরিচয়ের রেখা তাঁহার লেখায়, তাঁহার গানে, তাঁহার “শান্তিনিকেতন”, তাঁহার বিশ্ব-ভারতীতে দেদীপ্যমান হইয়া আছে। সেই পরিচয়ে জাতির মনকে উত্তর করিবার জ্ঞাত তাঁহাকে অনেক সময় “একলা” চলিতে হইয়াছে; তাঁহার ভাবের ভাবুকদের মধ্যে অনেকেই বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালাইয়া সংস্কারাবদ্ধ দেশবাসীকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে। নবযুগের প্রবর্তকবৃন্দের ইহাই গতি। সেইজন্তই রবীন্দ্রনাথের “একলা চলরে” গানটি গান্ধীজীর এত প্রিয় ছিল, এবং সেই যুগের “একলা” চলার

দলের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল বাল্যাবধি। রাজনারায়ণ বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নব-গোপাল মিত্র ইহাদের দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথের “জীবন-মুহুর্তে” নব ভাবের ধারকরূপে, নব ভাবের কবিরূপে, নব ভাবের ব্যাখ্যাতারূপে, কর্ণে ও রীতিতে এই ভাবকে রূপ দিবার কর্ম্মরূপে। এই জাগরণের পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাল্য, কৈশোর ও যৌবন কাটিয়াছিল; সেইজন্ত তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল স্বদেশের “দীক্ষা” গ্রহণ করা, স্বদেশ-সেবার জ্ঞাত গ্রহণ করা।

“বুঝিতে পারিহু এ জনং মাঝে

আমারো রয়েছে কাজ।

স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রভাতে  
করিলাম জোড়করে

এই লহ, মাতঃ, এ চির-জীবন

সঁপিহু তোমার তরে।”

১৮৮৮ সালের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, রবীন্দ্রনাথের “বহু”র উদ্দেশে লিখিত এক কবিতায় এই ব্রতের কথা শুনিতে পাই। তাঁরপর ৫৩ বৎসর তিনি বাঁচিয়া ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত দেশের উন্নতির চিন্তায় পরিপূর্ণ ছিল।

ইহাই তাঁহার এক রূপ। আর এক রূপ কবির, দার্শনিকের, সৌন্দর্যের উপাসকের, সৌন্দর্যের স্রষ্টার। সেই রূপ দেশ কাল পাণ্ডের সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করিয়া পরিব্যাপ্ত। সে রূপের আকর্ষণে দূর নিকটে আসিয়াছিল, পর আপনার হইয়াছিল। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে একজন ভারতীয় সাধক মৈত্রেয়ীর বাণী উচ্চারণ করিয়া দেশ-বিদেশের জিজ্ঞাসুদের ভারতীয় বিজ্ঞাপীঠে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁরপর ভারতবর্ষের ও বিশ্বের মধ্যস্থলের পড়িল এক যবনিকার অন্তরাল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রবীন্দ্রনাথ আপনার মহিমায় সেই অন্তরাল দূর করিলেন। বিশ্বের লোক প্রাচ্যের ঋষি সত্যজিটার আবার দর্শন পাইল। ১৮৩২ ও ১৮৯৩ সনে যে পরিচয় তাঁহার পাইয়াছিলেন সে পরিচয়ের রূপ দেখিলেন এক কবির মধ্যে তাঁহার গানে কবিতায় জীবনদর্শনে। ইহাই ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপ।

### কামাক্ষী নটরাজন

বোম্বাই নগরীর “ইন্ডিয়ান সোসাল রিফরমার” নামক ইংরেজী সাপ্তাহিকের সম্পাদক কামাক্ষী নটরাজন ৭৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার কর্মজীবন আরম্ভ হয় মাত্রাজের “হিন্দু” ও “স্বদেশমিত্রম” পত্রিকার সর্বপ্রথম সম্পাদক পি. সুব্রহ্মণ্য আয়ারের অধীনে। তাঁহার অগ্রপ্রাণনায় তিনি দেশের সর্বাদ্বীন সংস্কার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮৯৩ সনে “ইন্ডিয়ান সোসাল রিফরমার” পত্রিকার সংস্কে

আসিয়া তিনি আমাদের সমাজের নানা অনাচার ও অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদান করেন, এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই ব্রত নৈতিকভাবে পালন করিয়া গিয়াছেন। আজ এই বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ সমাজসেবকের তিরোধানে আমাদের সুখিব্যবসায় সময় আসিয়াছে তাঁহার। কি চাহিয়াছিলেন, কি করিয়াছিলেন, এবং কোথায় ব্যর্থ হইয়া। বর্তমান যুগের সমাজ সেবকদের হাতে তাঁহাদের অসম্পূর্ণ কাজ রাখিয়া গিয়াছেন। যখন জাতীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠা হয়, তখন একটা ভাব আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনকে আলোড়িত করিতেছিল যে যত দিন আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান যুগোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা না হইবে, যত দিন আমাদের সমাজের নানা অনাচার ও অসাম্যের প্রতিবিধান না হইবে তত দিন আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার আশা নাই, এবং ইংরেজের সাহায্যেই আমাদের এই সব দুর্বলতার কারণকে সমাজ-জীবন হইতে দূর করিতে হইবে। এই ভাবের মধ্যে একটা পর-নির্ভরতার ইঙ্গিত ছিল যাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক অংশকে ক্ষুব্ধ করিয়া গতানুগতিক সমাজ সংস্কার ও রাজ-নীতিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে উগ্র করিয়া তোলে। লোকমাত্র বালগঙ্গাধর টিলক ও আধ্যাত্মিকের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে এই বিদ্রোহের প্রতীক বলিয়া স্বীকার করা যায়। সেইজন্ম দেখিতে পাই বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র দেশে দুই পক্ষের তুমুল তর্ক-বিতর্ক। এই সময়েই কামাক্ষী নটরাজন তাঁহার সংবাদপত্রখানি লইয়া বোম্বাই নগরীতে চলিয়া আসেন, এবং নারায়ণ গণেশ চন্দ্রভারকর প্রভৃতি নেতৃবর্গের সাহায্যে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে তখন “সমাজ-সংস্কারক”-গণের নেতা ছিলেন; বোম্বাই হাইকোর্টের জজ হইয়াও তিনি কংগ্রেসের পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কামাক্ষী নটরাজন তাঁহার জীবনের বিশেষ ব্রত গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন ও জাতীয় জীবনের সক্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে “সমাজ-সংস্কারকেরা” ভাল রাখিয়া চলিতে পারিলেন না, এবং গান্ধীজী যখন কংগ্রেসের কর্তব্যের মধ্যে “সমাজ-সংস্কারের” নীতি ও প্রচেষ্টা ঢুকাইয়া দিলেন তখনও তাঁহাদের মনের বিরাগ ভাব দূর হইল না; তাঁহার গান্ধী-আন্দোলনের সঙ্গে মনে-প্রাণে সহ-মোগিতা করিতে পারিলেন না। কামাক্ষী নটরাজন এই সম্পর্কে একটা বিশিষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন, সমাজে তাঁহার মনোভাব অমুকূল না হইলেও তিনি তাঁহার বিরুদ্ধতার মধ্যেও একটা সংযত মনোভাবের পরিচয় দিয়া কংগ্রেস কর্মীদের উগ্রতার উপর শাস্তি-বারি সিদ্ধন করেন। এইজন্ম তিনি বিরোধী হইয়াও রাজনৈতিকবর্গের শ্রদ্ধা ও সম্মতি হারান নাই। তাঁহার তিরোধানে বোম্বাইয়ের শিক্ষিত সমাজ একজন বিশিষ্ট নেতা হারাইল।

## বীরেশ-লিঙ্গম পাণ্ডালু

অন্য দেশে একজন লোক-নেতা ও সমাজসেবকের জন্ম-তিথির শত-বার্ষিকী উৎসব চলিতেছে, যাহাকে অনেক সময় অন্য দেশের “বিভাসাগর” বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়। তাঁহার নাম বীরেশ-লিঙ্গম। এক শত বৎসর পূর্বে এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনি সামান্য বিভালাভ করেন এবং রাজমহেন্দ্রী শহরের কোন বিভালায়ে “পণ্ডিতের” পদ-যোগাড় করিতে পারেন। কিন্তু এই “পণ্ডিতের” মধ্যে এমন একটা সহজ মন ছিল যাহাতে তিনি সমাজের অত্যাচার ও অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারিলেন এবং এমন একটা প্রাণ ছিল যাহার প্রেরণায় তিনি নিজের সামান্য বিজ্ঞা ও সঙ্গতি লইয়া হিন্দু সমাজের গতানুগতিক আচারব্যবহারের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম করিয়া গেলেন। বাংলার “বিভাসাগরের” মত তিনি বালবিধবার প্রতি যে অবিচার চলিতেছিল তাহার প্রতিরোধকল্পে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন; তাঁহাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিলেন; তাঁহাদের বিবাহের আয়োজন করিলেন। অন্য দেশের ব্রাহ্মণ সমাজ এইজন্ম তাঁহার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। জাতিচ্যুত করিয়া বীরেশ-লিঙ্গমকে দমাইতে পারিলেন না। কারণ তিনি যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া অল্ল্যদের মধ্যে দাঁড়াইলেন; তাহাদের মানুষ্য করবার ব্রত গ্রহণ করিলেন। এই সব সংস্কারের জন্ত তিনি তেলুগু ভাষার এক নতুন রূপ দিলেন, তেলুগু সাহিত্যে নবশক্তির সঞ্চার করিলেন। অন্যদেশে সমাজসংস্কারক রূপে ও সাহিত্যিক রূপে আজও তিনি পূজিত হইতেছেন; তাঁহার বিপক্ষীদের বংশধরগণ আজ তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্ত অগ্রণী হইয়া আসিয়াছেন। ইতিহাসের এই প্রতিশোধ যুগে যুগে মানবসমাজকে সঞ্জীবিত করে। অত্যাচার ও অসাম্যের শাসন আপনার ভারে আপনি ভাঙিয়া পড়ে। তাই একজন সামান্য তেলুগু “পণ্ডিতের” জীবনকথা আজ অন্য দেশের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইতেছে এবং তাঁহার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে “বিভাসাগর”, শিবনাথ শাস্ত্রীর সমপংতিতে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর রায়লিঙ্গম রেড্ডি মহাশয় বলিয়াছেন যে যদিও বীরেশ-লিঙ্গম ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেন, তবু তাঁহার সংস্কার-চেষ্টার মধ্যে ধর্মের অনুপ্রেরণা ছিল না; যুক্তিবাদ ও সহজ, স্বাভাবিক মানবধর্ম, অভ্যাচারিতের প্রতি সমবেদনা, তাঁহাকে সংস্কারের দুর্গম পথে পরিচালিত করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয় দশকে আমাদের জাতীয় গৌরববোধ যখন জাগ্রত হইয়া উঠিল, তখন এই যুক্তিবাদ আমাদের মধ্যে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। আজ সেই মোহ কাটিয়াছে; যুক্তিবাদের প্রত্যাবর্তন আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে বীরেশ-লিঙ্গমের সমধর্মীর জন্মোৎসব আমাদের জীবনে একটি নতুন সাম্য আনিতে পারে।



## প্রেততত্ত্ব

### শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গ্রীক দার্শনিক সোক্রেতিসকে লক্ষ্য করিয়া সাধারণ ভাবে দর্শনের গবেষণাকে উপহাস করিবার জন্ত তদানীন্তন এক জন নাট্যকার একখানা নাটক লিখিয়াছিলেন। নাটকটি প্রকাশে অভিনীত হইয়াছিল এবং বলা বাহুল্য সাধারণ দর্শকেরা উহা উপভোগও করিয়াছিল। সোক্রেতিস অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন কি না, জানা নাই; তবে কথাটা নিশ্চয়ই তাঁহার কানে পৌছিয়াছিল। ইহাতে তিনি মনে একটু আঘাতও পাইয়াছিলেন মনে হয়। কারণ, পরে যখন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তিনি মৃত্যুদায়ী বিধবানের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং আত্মীয় ও বন্ধুরা তাঁহার শেষ বাণী শুনিবার জন্ত তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল, তখন তিনি মৃত্যুর পরে আত্মার গতির কথা অবতারণা করেন এবং বলেন, 'এখন যদি এ সব বিষয়ের আলোচনা করি, তাহা হইলে আশা করি কেহ আমাকে উপহাস করিবে না।'

নিশ্চিত মৃত্যুর আগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া সোক্রেতিস উহার কথা ভাবিয়াছিলেন, ইহাতে উপহাসের কিছু ত নাই-ই, বরং না ভাবিলেই বিশ্বয়ের বিষয় হইত। আর, এ কথাও ত ঠিক যে, মানুষের স্বাভাবিক জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরের কথা ভাবা দোষের ত নয়-ই, বরং উচিত। যাহা অতিক্রম করার কোন উপায় নাই, যাহা নিশ্চিত আসিবে, আসিবার সময় নিকট হইলে তাহার কথা না ভাবিলে চিন্তার দৈন্ত ও পঙ্কতাই বুঝায়। কালের রেখায় আমরাও সেই বিন্দুতে আসিয়া পৌছিয়াছি যেখান হইতে মৃত্যু আর খুব বেশী দূরে নয়। সুতরাং আমরাও সোক্রেতিসের যুক্তি অনুসারে কথাটা তুলিতে পারি। যাহারা কোনক্রমেই মৃত্যুর ছায়াও অনুভব করেন নাই অথবা যাহারা মৃত্যুর নামে ভয় অথবা লজ্জা অনুভব করেন, তাঁহারা এই আলোচনা বর্জন করিতে পারেন; কিন্তু রুষ্ঠ হইবার অথবা উপহাস করিবার অধিকার কাহারও নাই।

সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য জানি না; নানা কারণে কিছু কাল যাবৎ একাধিক প্রেত-তত্ত্বের গ্রন্থ আমাদের কাছে পড়িতে হইয়াছে। সেইজন্য বিষয়টির একটু আলোচনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। প্রেততত্ত্ব যাহাকে বলি, তাহা মৃত্যুর পর মৃতের কি গতি হয় এই প্রশ্নের একটা উত্তর। একটা উত্তর বলিতেছি এইজন্য যে, এই প্রশ্নের আরও উত্তর আছে। সরল ভাষায় প্রশ্নটা এই: দেহের যখন মৃত্যু হয়

তখন দেহের মধ্যে যে আত্মা আছে তাহার কি হয়? এই প্রশ্নে ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, আত্মা দেহ হইতে পৃথক একটা সত্তা। জীবনে দেহের সঙ্গে তাহার একটা সম্পর্ক দেখা যায়; কিন্তু দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও বিলয় হয় না; ইহার পরও তাহার একটা ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু এই ধরিয়া লওয়া জিনিসটি কি সত্য?

এইখানে প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, সত্যই কি আত্মা দেহ হইতে পৃথক? দৈহিক মৃত্যুর পর আত্মার আর কোন ভবিষ্যৎ নাই, ইহা কি কল্পনা করা যায় না? জলে বুদ্বুদ হয়, মিছরি দানা বাঁধে, তেল ও সলিতার সহযোগে আলো জলে; কিন্তু বুদ্বুদ ত আবার জলে মিশিয়া যায়; মিছরির দানাও জল পাইয়া গলিয়া যায়; আর তৈল বা বর্জিকা নিঃশেষ হইয়া গেলে আলোও নিবিয়া যায়। সেইরূপ দেহে যে সব রাসায়নিক পদার্থ আছে তাহাদের সমবেত জ্বিয়ার ফলে জলে ঢেউ কিংবা বুদ্বুদের মত দেহে আত্মার আবির্ভাব হয়। আলো দেখিয়া যেমন দীপের অস্তিত্ব আমরা জানি, তেমনি চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি দেখিয়া আত্মার অস্তিত্বও আমরা বুঝিয়া লই। আবার ঢেউ যেমন জলেই মিশিয়া যায় এবং জল ছাড়া যেমন ঢেউয়ের অস্তিত্ব নাই, তেমনি দেহের রাসায়নিক পদার্থসমূহের মিলনের বাহিরে আত্মার কোন সত্তা নাই; অগ্নি মৃত্যু নামক ঘটনা ঘটিলে সেই সব রাসায়নিক পদার্থের মধ্যেই আত্মা বিলীন হয়—জলে যেমন ঢেউ ঠিক তেমনি।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে কিন্তু আর প্রেততত্ত্ব থাকে না। সুতরাং আত্মাবান্ যাহারা তাঁহারা দেহ হইতে পৃথক আত্মা এবং দেহ ছাড়া আত্মার অস্তিত্ব এই উভয়ই মানিয়া লন। কিন্তু দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে কিনা ইহাও একটা বিচার্য বিষয়। অধিকন্তু দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে ইহা প্রমাণিত হইলেই কিংবা বিশ্বাস করিলেই প্রেততত্ত্ব নামক বিজ্ঞায় যাহা বলা হয় তাহা সমস্তই সত্য হয় না। আত্মার অস্তিত্বের প্রশ্ন এখানে তুলিতে চাই না; কারণ তাহাতে আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং জটিল হইয়া পড়িবে। আমরা বরং সাধারণ দর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ধরিয়া লইতে প্রস্তুত যে আত্মা আছে। কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেই প্রেততত্ত্বের সকল সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয় না। প্রেততত্ত্বিকেরা সাধারণত যাহা সত্য বলিয়া

বিশ্বাস করেন সেগুলি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইলেই প্রেততত্ত্ব অ-তত্ত্ব হইয়া পড়ে। ইহার উপর আত্মার অস্তিত্বও যদি সন্দেহ দেখা দেয়, তবে প্রেততত্ত্বের আর কিছুই থাকে না। বিচারে অগ্রসর হওয়ার আগে এই কথাটা আমাদের মনে রাখা উচিত। আত্মার অস্তিত্ব সাধারণত বিশ্বাসিত হইলেও সংশয়ের অতীত নয়। কিন্তু আত্মা সত্য, ইহা ধরিয়া লইয়াই আমরা দেখিতে চাই, প্রেততত্ত্বের সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় কিনা।

প্রেততত্ত্বের তত্ত্বসমূহ লইয়া এক বিরাট সাহিত্য রচিত হইয়াছে; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল ভাষায়ই প্রায় উহার শাস্ত্রাংশ মিলিবে এবং যে-কোন অল্পসন্ধিৎসু পাঠক সহজেই সেখানে প্রবেশ করিতে পারিবেন। সেইজন্ত কোন গ্রন্থ-বিশেষের উল্লেখ আমরা এখানে নিম্নয়োজন বোধ করি। এই তত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলিকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি :—১। প্রেত-আত্মা, ২। প্রেতের দেহ; এবং ৩। প্রেত-লোক।

১। প্রেত-আত্মা সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে উহা প্রেত হইয়াও নিজের ব্যক্তিত্ব রক্ষা করে; অর্থাৎ রামকমল মরিয়াও—তাহার আত্মা দেহবিমুক্ত হইলেও—রামকমলই থাকিয়া যায়। তাহার পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্ক পূর্বের মতই থাকিয়া যায়। এই সিদ্ধান্ত অল্পসারে দেহান্তর প্রাপ্তি অস্বীকৃত হয়। রামকমলের আত্মা যদি প্রেত হইয়া আবার নূতন দেহে প্রবেশ করে, তাহা হইলে আর আগের সব সম্পর্ক মনে রাখিবে কি করিয়া? তাহার নূতন দেহ মল্লয-দেহ না-ও হইতে পারে; গাছ কিংবা শামুকের দেহ হইলে বিষয়টি আরও জটিল হইয়া যায়। ●

দেহান্তরপ্রাপ্তি সকলেই মানেন এমন নয়, যারা মানেন তাঁরা অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অমরত্বও মানিতে বাধ্য। সেটি প্রেততত্ত্বিকেরাও মানেন। কিন্তু আত্মার অবিনাশিত্ব স্বীকার করা আর প্রেততত্ত্বের সব সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া এক বস্তু নয়। অমর আত্মার দেহ হইতে দেহান্তরে ভ্রমণ পাতঞ্জল দর্শন ইত্যাদি যে ভাবে বুঝিয়াছে তাহাতে ইচ্ছামত কোন প্রেতকে ডাকিয়া আনা কঠিন। কারণ রামকমলের আত্মা যদি একটি কচ্ছপের দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে মণ্ডলীতে উপবিষ্ট প্রেততত্ত্বিকেরা যখন রামকমলকে আহ্বান করিবেন তখন তাহার সেখানে উপস্থিত হওয়া খুবই সহজ—আদৌ সম্ভব—এরূপ মনে করিতে পারি না।

দেহান্তরপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জাতিস্মরণও স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ, পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতি আত্মা রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু যে-কোন দেহে অবস্থিত আত্মা

যে-কোন জন্মের বৃত্তান্ত মনে করিতে পারে, এমন নয়। জাতিস্মরণের ভাল দৃষ্টান্ত পাই বৌদ্ধ জাতক-গ্রন্থে; আর ইহার দার্শনিক আলোচনা মিলে যোগ-দর্শনে। সাধারণ ভাবে ইহাতে এই বুঝায় যে, অল্পকাল প্রতিবেশ পাইলে আত্মা তাহার অতীত মনে করিতে পারে। কিন্তু এ সমস্তই মাল্লবের দেহে অবস্থিত আত্মার পক্ষেই বেশী সম্ভব। মাল্লব-আত্মা পূর্ব পূর্ব জন্মের—মাল্লব এবং অমাল্লব জন্মের—অভিজ্ঞতা কম-বেশী স্মরণ করিতে পারে। অবশ্যই কাজটা এত সহজ নয় যে, যে কেহ তাহা পারে। আমি এবং আমার পাঠকগণ তাহা পারেন বলিয়া আমার মনে হয় না। ইহার জন্ত চেষ্টা ও সাধনা দরকার এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির একটা স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত তাহা সম্ভব হয় না। কিন্তু আত্মা যখন যে দেহে থাকে, তখন সে দেহের উপযুক্ত সংস্কার তাহার দেখা যায়; এগুলি আসে অল্পরূপ পূর্বজন্মের স্মৃতি হইতে। অর্থাৎ কচ্ছপের দেহে জন্ম গ্রহণ করিয়াই আত্মা পূর্বের কচ্ছপ-দেহের স্মৃতিজনিত সংস্কারগুলি আবার ফিরিয়া পায় এবং কচ্ছপের মত আচরণ করে। মল্লয-দেহে গেলেও আবার ঠিক তেমনই মাল্লবের মত ব্যবহার করিবে। এখানে ধরিয়া লওয়া হইতেছে আত্মার ‘সংসার’ অর্থাৎ দেহ হইতে দেহান্তরে ভ্রমণ অনাদি, অনেকবার বিভিন্ন দেহে সে ঘুরিয়া আসিয়াছে, স্মৃতির স্মৃতি সকলপ্রকার দেহেরই একটা স্মৃতি বা সংস্কার তাহার আছে। কোন একটা দেহে প্রবেশ করিলে সেই প্রকার দেহের উপযোগী সংস্কারগুলি তখন জাগ্রত হয়। কিন্তু মল্লয-দেহে প্রবেশ করিয়া পূর্বের কচ্ছপ, হস্তী ইত্যাদি জন্মের কথাও চেষ্টা করিয়া মনে করা যায়। এই শক্তিটারই সাধারণ নাম জাতিস্মরণ। নিয়ন্তরের দেহে অবস্থিত আত্মার পক্ষে জাতিস্মরণ হওয়া সম্ভব নয়। কচ্ছপ-দেহে বাস করিয়া পূর্বের ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ইত্যাদি জন্মের কিংবা গাধা, ঘোড়া জন্মের বৃত্তান্ত মনে করার শক্তি পাওয়া যায় না।

এই আলোচনায় আর অগ্রসর হইব না। শুধু এইমাত্র বলিব যে, জাতিস্মরণ এবং দেহান্তরপ্রাপ্তি—এই দুইটি প্রাচীন মতই আধুনিক প্রেততত্ত্বের বিরোধী। জাতিস্মরণ সত্য হইলে দেহান্তরপ্রাপ্তিও সত্য হয় এবং তাহা হইলে প্রেততত্ত্ব অসত্য হইয়া দাঁড়ায়। কারণ রামকমলের আত্মা যদি দেহ হইতে দেহান্তরে ঘুরিতে থাকে তবে তাহাকে ডাকিয়া আনা কঠিন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে কি এখন আর পাওয়া যাইবে? তিনি যদি হেলিসিকিতে এক জন কমুনিষ্ট নেতারূপে জন্ম লইয়া থাকেন, তবে আর কি করিয়া আসিবেন? আর আসিলেও কোন জীবনের অভিজ্ঞতা বলিবেন?

আরও একটি প্রাচীন মত আধুনিক প্রেততত্ত্বের বিরোধী; সেটি আত্মার মুক্তির ধারণা। বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে যে মুক্তির কথা বলা হইয়াছে, আত্মা যদি তাহা লাভ করে তবে সে ত পৃথক আত্মা থাকে না, ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। তখন আর তাহাকে ডাকিয়া আনা সম্ভব হয় কিরূপে? জলে ঢেউ মিলাইয়া গেলে আবার কি তাহাকে পাওয়া যায়? অথচ এক জন উগ্র প্রেত-তাত্ত্বিক সেদিন লিখিয়াছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রেত-লোকে কি একটা বড় কাজ করিতেছেন—রেড ক্রশ ইত্যাদি ধরণের। তাই যদি হয় তবে মুক্তি হয় কাহাদের?

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক প্রেততত্ত্ব 'সংসার' এবং 'মুক্তি' এই দুইটি প্রাচীন সিদ্ধান্তই অস্বীকার করে। সেমিটিক জাতিদের মধ্যে যে তিনটি ধর্ম আবির্ভূত হইয়াছে—ইহুদী খ্রীষ্টান ও ইসলাম—ইহাদের মতে আত্মার দেহান্তর-প্রাপ্তি নাই। মৃত্যু ঠিক স্থানান্তর গমনের মত। সেই নূতন জায়গায় আত্মা শান্তি অথবা পুরস্কারের প্রতীক্ষায় থাকে। বৈদান্তিক মুক্তিও তাহাদের নাই। সুতরাং তাহারা আত্মার সাড়া পাইলে এই জগতের আকর্ষণে আবার এদিকে আসিতে পারে। আধুনিক প্রেততত্ত্ব এই মতের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা শুধু আত্মার অবিনাশিত্বই স্বীকার করে; মুক্তি এবং পুনর্জন্ম স্বীকার সে করিতে পারে না।

প্রেততত্ত্ব আত্মার ধারণায় আরও একটি লক্ষ্য করার বস্তু এই যে, প্রেত-আত্মার স্মৃতির ক্ষয় হয় না। জীবনে আমরা অনেক জিনিষই ভুলিয়া যাই। কাহার নিকট প্রথম বর্ণ-পরিচয় লাভ হইয়াছিল, আমরা সকলেই বলিতে পারি কি? স্কুলে যেটুকু জ্যামিতি শিখিয়াছিলাম, তার সবটুকু এখন মনে নাই। সুতরাং জীবিতকালে আমাদের স্মৃতির হ্রাস হয়, ইহা অবিশ্বাস করার উপায় নাই। কিন্তু তাত্ত্বিকেরা প্রেত-আত্মার স্মৃতিটাকে অক্ষয় মনে করেন। বিভ্রাসাগর মহাশয়কে ডাকিয়া আনিলে এখনও আসিয়া বলিতে পারেন, মধুসূদনকে তিনি কত টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। দেহ হইতে বিচ্যুত হইলেই আত্মার সমস্ত শক্তির ক্ষয় রুদ্ধ হইয়া যায়, এই সিদ্ধান্তের পথে কি যুক্তি আছে? অথচ প্রেত-তাত্ত্বিকেরা কিন্তু তাহাই ভাবেন।

হয়ত শুনিব, হ্রাস-বৃদ্ধি হয় দেহের এবং দেহের সঙ্গে যত দিন সম্পৃক্ত থাকে ততদিন আত্মারও শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি উপলব্ধ হয়; কিন্তু দেহ-বিমুক্ত হইলেই আত্মার শক্তির আর ক্ষয়-বৃদ্ধি দেখা যায় না; তখন উহা তাহার সনাতন শক্তিতে বিকশিত থাকে। কথাটা আমরা উড়াইয়া দিতে চাই না। প্রাচীনকালে অনেকে উহা বিশ্বাস করিয়াছেন

এবং উহার সপক্ষে যুক্তিও দেখাইয়াছেন। কিন্তু আত্মার সনাতনত্ব বলিতে কি তাহার এ জীবনের সমস্ত সম্পর্কের স্মৃতি বুরায়? এখানকার পুত্রত্ব, পিতৃত্ব, দোকান-কর্মচারিত্ব, সবই কি সনাতন স্মৃতি? আর সনাতন প্রেত-আত্মা কি শুধু স্মৃতিই রক্ষা করে, নূতন জ্ঞান কিছু-অর্জন করে না? প্রেত-তাত্ত্বিকদের প্রেত-আত্মা সম্বন্ধে এই সব ধারণাও আলোচনা এত অস্পষ্ট এবং এত উচ্ছ্বাস-পরিপ্লুত যে উহা হইতে কোন বৈজ্ঞানিক সরল সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করা কঠিন। প্রাচীন একাধিক মতের বিরোধী বলিয়াই একথা বলিতেছি না। নূতন মত হিসাবেও প্রেততত্ত্বের আত্মার ধারণা স্বদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

(২) প্রেত-দেহ।—দেহস্থ আত্মা দেহ হইতে বিচ্যুত হইলেই প্রেত হয়। দেহটি মাটিতে পচে অথবা ভস্মে পরিণত হয়, আত্মার সহগামী হয় না, ইহা স্পষ্ট। সুতরাং সাধারণ প্রেত-তাত্ত্বিকেরা আত্মার কথাই বলা-কওয়া করেন, তাহার দেহের কথা নয়। এমন কি, প্রেত-আত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিবার সময়ও জীবিত কাহারও দেহকে অবশ্য করিয়া উহার সাহায্য লওয়ার কথাই সাধারণত শুনি; কারণ প্রেত-আত্মার নিজস্ব কোন দেহ নাই। প্রেত-আত্মা যখন লেখে কিংবা কথা কয় তখন এরূপ একটি অবশীকৃত দেহের হাত কিংবা মুখের সাহায্য লয়; ইহাই সাধারণ সিদ্ধান্ত।

কিন্তু ইদানী আমরা এক জন উগ্র প্রেত-তাত্ত্বিকের লেখা পড়িতেছিলাম, যিনি প্রেতের দেহেরও বর্ণনা করিয়াছেন; এমন কি তাহার ওজনের কথাও বলিয়াছেন; প্রেতের চোখ, দাঁত, মাথার খুলি ইত্যাদির বিবরণও বিস্তৃত ভাবেই দিয়াছেন। শুধু তাই নয়; প্রেতদের বস্ত্র-পরিধান এবং পরিধেয় বস্ত্রের উপাদান ইত্যাদির কথাও বাদ পড়ে নাই। প্রেতের আহারে কচি অরুচি এবং ছুধা চা পেঁয়াজ ইত্যাদি খাওয়ার কথাও বলা হইয়াছে। অর্থাৎ দেহ-তাত্ত্বিকের মতই তিনি আমাদেরিগকে প্রেত-দেহের তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত যে, প্রেতদের আহার করিবার মত মুখ আছে বটে, কিন্তু সে মুখে কথা কয় না, অন্তত আমরা এ পারের লোকেরা শুনিতে পারি এরূপ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারেন না। এদিকের লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয় অল্প উপায়ে। যথা, টেবিল চালন, শৈব লিখন ইত্যাদি।

এই প্রেতদেহ আহার করে, বস্ত্র পরিধান করে, গৃহ নির্মাণ করে এবং গৃহে বাস করে, এক স্থান হইতে অল্প স্থানে গমন করে এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু ইহার গতি অমাত্মিক; অতি ক্ষিপ্ত; এক

সেকেণ্ডে বারাকপুর হইতে দেশপ্রিয় পার্কে জবাহরলালের বক্তৃতা শুনিতে আসিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু তাহার কোন যানবাহনের প্রয়োজন হয় না। কেন না তাহার দেহের ওজন অতি সামান্য।

(৩) প্রেত-লোক।—প্রেতেরা যেখানে থাকে, তাহার বর্ণনা এতকাল কম-বেশী অস্পষ্টই ছিল। কিন্তু জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে এই প্রেত-লোকেরও এত প্রসূতি বিবরণ দিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ভারিলে বিম্বিত হইতে হয়। কোন পরিব্রাজকই তাহার দৃষ্ট, কোন নূতন দেশের এমন মনোরম বর্ণনা দিতে পারিবেন না। এই প্রেত-লোক এক দিকে নানা রকমের রাসগৃহ, খেলার মাঠ, সিনেমা ইত্যাদি যেমন রহিয়াছে, অপর দিকে তেমনই নৃত্য, ভূতস্থ ইত্যাদি আলোচনার জন্ত গবেষণাগারও রহিয়াছে। সভাসমিতিও সেখানে হয় এবং সমাজ-সেবার জন্ত বিবিধ প্রতিষ্ঠানও রহিয়াছে। এক কথায়, এ পৃথিবীর প্রায় সব কিছুই 'প্রেত' হইয়া 'প্রেত' পুরুষদের সঙ্গে সেখানে যায়।

আর একটি রহস্য এখানে অহুদ্যাটিত রহিয়া গিয়াছে; এই মনোরম প্রেত-ভুবনটি কোথায়? মঙ্গল কিংবা বৃহস্পতি গ্রহে নয়, কেন না প্রেতেরা সে সব জায়গায় বেড়াইতে যায়; সেই একই কারণে চন্দ্রেও নয়, সূর্য্যেও নয়। তবে কোথায়? এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর এখনও পাই নাই। হয়ত এই পৃথিবীরই কোন ছোট শহরের বড় গলিতে অথবা বড় শহরের ছোট-গলিতে হইবে।

প্রেত, প্রেত-দেহ এবং প্রেতলোক সম্বন্ধে এত সব চিত্তাকর্ষক তথ্য যে সব পুস্তকে পাওয়া যায়, তাহাদের নাম উল্লেখ করিলাম না দুই কারণে; প্রথমত ইহাদের বহুল প্রচার হোক, সমাজের স্বাস্থ্যের জন্ত তাহা আমরা কামনা করি না; দ্বিতীয়ত, গ্রন্থকারদিগকে তা খুব প্রশংসা করিতেছি না; সুতরাং নাম প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাদের বিরাগভাজন হইতে চাই না;—কোন জীবিত আত্মা অথবা প্রেতাত্মা আসিয়া স্বন্ধে চাপুক, ইহাও ইচ্ছা করি না।

প্রেত সম্বন্ধে এই সব বিপুল তথ্য কি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে? অথবা করা সম্ভব? যাহা বলা হইয়াছে তাহার পর প্রশ্নটা না তুলিলেও হইত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, সর. অলিভার লজের মত বৈজ্ঞানিকও প্রেততত্ত্বে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিকদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধার সহিত আমরা এইটুকু মাত্র নিবেদন করিতে চাই যে, বৈজ্ঞানিক সব সময়ই বৈজ্ঞানিক থাকেন না; চা-পানের সময় অথবা জীব সঙ্গের ঝগড়া করার সময় মাধ্যাকর্ষণ অথবা তাপ-বিকিরণ অথবা পরমাণু-বিচ্ছোরণের সব নিয়ম তিনি মনে রাখিয়া চলেন

এরূপ মনে করা কঠিন। তারপর বৈজ্ঞানিকও তা মানুষ; তাহারও স্বপ্ন-দৃষ্টি আছে, ভ্রান্তি-বিভ্রম সম্ভব; ভুলিয়া যাওয়া, ভুল দেখা প্রভৃতি তাহার পক্ষেও অসম্ভব নয়। কোন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন বলিয়াই কোন-কিছু স্বীকার করিয়া লওয়া বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাপদ্ধতি নয়। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা এইমাত্র বলিতে চাই যে, উহা দর্শন ও বিজ্ঞানের অনেক গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী; এবং সেইজন্তই উহা এখনও বিজ্ঞানের পরিধির বাহিরে।

বিজ্ঞান কি সবই জানে? চক্ষু, বুদ্ধি, উত্তর দিব—না। অতএব প্রেততত্ত্ব সত্য বলিলেও রীতিমত আপত্তি করিব। সুতরাং উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের মীমাংসার একমাত্র পথ—প্রমাণ। শুধু তর্ক দ্বারা তৈল পাত্রে থাকে না পাত্র তৈলে, এ প্রশ্নের মীমাংসাও কঠিন; পরীক্ষা দ্বারা সহজেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। তেমনই প্রেত আছে কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসায়ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্য লওয়া চলে। প্রেত দেখিতে এবং দেখাইতে পারিলে দর্শন-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত বদলাইয়া হইলেও এই সত্যটি গ্রহণ করিতে হয়। প্রেত-তাত্ত্বিকেরাও ইহাই দাবি করেন যে, প্রেত প্রত্যক্ষ করা যায়। তারপর তার মাথার খুলি, পরিধেয় বস্ত্র, বাস-ভবন, খেলার মাঠ ইত্যাদির সংবাদ প্রত্যক্ষীকৃত প্রেতের কাছ হইতেই সংগ্রহ করা চলে। এই সমস্ত প্রমাণিত হইয়া গেলে পর, বিজ্ঞানের কিংবা দর্শনের সঙ্গে প্রেততত্ত্বের যেখানে বিরোধ সেখানে দর্শন-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তেরই পুনর্বিচার প্রয়োজন। সুতরাং প্রেতের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ আছে কি না এবং কি প্রমাণ, তাহাই এখন আমাদের গকে ভাবিতে হয়।

প্রেতের আবির্ভাবই তাহার অস্তিত্বের বড় প্রমাণ। কোন কোন প্রেত কখনও কখনও এখানকার লোকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা এবং ভাব-বিনিময় হয়। ইহা সত্য হইলে প্রেতের অস্তিত্বে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই প্রকার প্রেত-প্রত্যক্ষ ঘটাইবার চেষ্টা হয় একাধিক প্রকারে।

(১) ব্যক্তি-বিশেষকে, বিশেষতঃ নারী-বিশেষকে অবশ্য করিয়া আহূত প্রেত দ্বারা তাহার দেহ আশ্রয় করান হয়। তারপর প্রেত ঐ অবশীকৃত দেহের মুখের সাহায্যে কথা বলে, প্রশ্নের উত্তর দেয়, নিজের ব্যক্তিত্বের পরিচয় ও প্রমাণ দেয়, প্রাচীন ঘটনা মনে করিয়া বলে, ইত্যাদি; অথবা ঐ দেহের হস্তদ্বারা লিখিয়া জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দেয়। এই এক উপায় যাহা দ্বারা প্রেতের অস্তিত্ব অনেক সময় প্রমাণ করা হয়। এইখানে কিন্তু প্রেতের নিজস্ব দেহের কথাটা চাপা পড়িয়াছে।

(২) অনেক সময় অন্ধকার ঘরে কয়েকজন মণ্ডলী করিয়া বসিয়া অনবরত প্রেত-বিশেষের চিন্তা করিতে থাকেন। তারপর তাহার আবির্ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায় কোন আকস্মিক শব্দ বা আলোক-ছটায় অথবা টেবিল বা চেয়ারের কম্পনে। তখন প্রেতাত্মাকে উদ্দেশ্য করিয়া নানা বকম প্রশ্ন করা হয়; ‘আপনি যদি অমুক-হন, তবে টেবিলটা দুই বার ঠক করিয়া শব্দ করুক’; শব্দ করিল এবং প্রেতটি কে বুঝা গেল। এইভাবে প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে আগত প্রেত যে কে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গেল। প্রেতের আবির্ভাব এই এক প্রকারেও ঘটান হইয়া থাকে; এবং ইহাও তাহার অস্তিত্বের একটা প্রমাণ।

(৩) স্বৈর-লিখন বলিয়া আর একটি উপায় অনেকে প্রয়োগ করেন। কোন এক ব্যক্তি—বর্তমান লেখকই মন্দ কি—হাতে কাগজ-কলম লইয়া নিবিষ্ট চিত্তে কোন এক জন প্রেতকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ইঠাৎ হয়ত হাত কাঁপিয়া উঠিবে এবং কাগজে দাগ পড়িতে থাকিবে। তখন হাতে প্রেত আশ্রয় করিয়াছে বুঝিতে হইবে এবং হাতের উপর কর্তৃত্ব একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। হাত তখন আপনি লিখিয়া যাইবে। মনে যে সব প্রশ্ন জাগিবে সে সবের উত্তর কাগজে আপনি লিখিত হইয়া যাইবে। আমি যখন লিখিতেছি না, তখন নিশ্চয়ই আমার হাত দিয়া অস্ত্রে লিখিয়া যাইতেছে। প্রেত-লোকের অনেক সংবাদ এই ভাবেও সংগৃহীত হইয়াছে।

(৪) সাধারণ লোকে যাকে ‘ভূত দেখা’ বলে, প্রেতের অস্তিত্বের ইহাও একটা প্রমাণ মনে করা হয়। হত্যাকারী নিহতের অথবা বিরহী প্রিয়জনের ছায়ামূর্তি অনেক সময় দেখে। সুতরাং যে মৃত সে একেবারে লুপ্ত হয় নাই; কোথাও কোনও প্রকারে আছে। ভূত-যে শিশু, বৃদ্ধ অনেকেই দেখে তাহা অস্বীকার করিব না; তবে, উহা প্রেতের অস্তিত্ব প্রমাণ করে কি না সে বিচার পৃথক।

এখানে একটা ভাবিবার বিষয় এই যে, নানা ভাবে যে প্রেতের আবির্ভাবের কথা আমরা শুনি, তাহা কিন্তু সকলের কাছেই হয় না। ভূতও সকলেই দেখে না। গুপ্তঘাতক হত্যাহতানে নিহতের ছায়ামূর্তি দেখিয়া ভয় পায়; এরূপ ঘটনা দুর্লভ নয়। কিন্তু মানুষ সর্বাপেক্ষা বেশী মানুষ-মারে যুদ্ধে; অথচ যুদ্ধে লিপ্ত সৈনিকেরা নিহত শত্রুর প্রেত-দেখে, এমনটি বড় বেশী শোনা যায় না। তাহা হইলে যুদ্ধই সম্ভব হইত না। প্রেত-ভয়ে ভীত সৈনিক লড়াইয়ের অযোগ্য। গুপ্তঘাতক ও সৈনিকের মধ্যে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া প্রভেদ অনেক। গুপ্তঘাতক হিংসা করে, কিন্তু ইহাও জানে যে সে অন্যায় করিতেছে; ধরা পড়িলে ইহলোকেই

শাস্তি পাইবে; না হইলে পরলোকে পাইবেই। এই ভয় তাহার মনকে দুর্বল করে। কিন্তু যুদ্ধে সৈনিকেরা জানে; তাহাদের কাজ প্রশংসনীয়; তাহাদের সাহসের অন্ধকের উৎস সেইখানে। সুতরাং তাহারা নির্ভয়ে লোক মারিয়া যায় এবং সেই জন্যে ভূতও দেখে না।

সাম্প্রদায়িক হত্যার কথাটাও এখানে মনে করা যাইতে পারে। এরূপ বলহে যখন এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের লোককে হত্যা করে, তখন নিহতের মনে কি কোন প্রতিহিংসা কিম্বা জিঘাংসা জাগে না? অথচ কখনও তাহাকে ভূত হইয়া ঘাতককে ভয় দেখাইতে শুনি নাই। এই সেদিন কলিকাতার বৃকে হাজার হাজার মৃতদেহ পড়িয়া রহিল; হত্যাকারীরা আরও মারিবার জন্য যুরিয়া বেড়াইল; কিন্তু কখনও ভূত দেখিয়া কেহ মরিয়া পড়িয়াছে বলিয়া ত শুনি নাই। ইহার কারণ, ঘাতকেরা নির্ভয়ে মারিয়াছে; সামান্য একটু পুলিশের ভয় ছাড়া, পাপবোধ তাহাদের ছিল না; বরং বেহেশতের অথবা স্বর্গের কল্পনা করিয়া অনেকে এই হত্যায় গর্ববোধ করিয়াছে, নিজের সমাজের অথবা সম্প্রদায়ের হিত করিতেছে মনে করিয়া আনন্দও পাইয়াছে। কাজেই ভূত দেখে নাই।

এই কথাটা ভ্রান্ত মনে করিবার কোন কারণ নাই। কাজেই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে, প্রেত-দর্শন দ্রষ্টার মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। শুধু ‘ভূত দেখা’ নয়, সকল প্রকার প্রেত-দর্শনই ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব এবং সহজ, সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। শোক-সন্তপ্ত পিতা প্রিয় পুত্রের ছায়ামূর্তি দেখে, পতি পত্নীর কিংবা পত্নী পতির প্রেতাত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে, ইহাই সাধারণতঃ দেখা যায়। স্বপ্নে মৃত প্রিয়জনকে এমন কি পরিচিত জনকে প্রায় সকলেই হয়ত দেখে। যাহাদের মন অত্যন্ত অভিভূত, অত্যন্ত শোকাবিষ্ট, তাহারা জাগ্রত অবস্থায় ও নিরালস্য এইরূপ প্রেত দর্শন করিতে পারে এবং অনেক সময় করেও। এই দেখাটা একটু অভ্যস্ত হইলেই—মনের আবেশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলেই, পরে অপরিচিত লোকের—হিটলার, মুসোলিনি কিংবা বিজাসাগর-রামকৃষ্ণের—প্রেতাত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনও সম্ভব হইয়া উঠে।

প্রেত-দর্শন দ্রষ্টার মানসিক অবস্থা বা গঠনের উপর নির্ভর করে, এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি এই যে প্রেত সকলে দেখে না এবং সকলকে দেখানও যায় না। হিমালয় পর্বত সকলেই দেখিতে পারে; পরমাণুর অস্তিত্ব কিংবা জ্যামিতির তত্ত্ব সকলেরই অধিগম্য। এই সব জ্ঞানের বেলায় এক বুদ্ধির অস্তিত্ব ছাড়া আর কোন বিশেষ মানসিক আবেশের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে সে কথা বলা



চলে না। ইহা এক বিশিষ্ট সীমাবদ্ধ শ্রেণীর লোকের জ্ঞান।

ভূত দেখা কিংবা প্রেতলোকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন আমরা অস্বীকার করিতেছি না। কাহারও কাহারও বেলায় এই সব ঘটে। কিন্তু দেখা, আর দৃষ্ট বস্তুর সত্যতা এক নয়। তাহা হইলে ভুল বলিয়া আর কিছু থাকিত না। প্রেতের সত্যতা ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রেততত্ত্ব যাহা বলে তাহা মানিয়া লওয়া কঠিন। আর প্রেত-দেহ এবং প্রেত-লোকের যে সব বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাকে উপন্যাসের পধ্যায়ে ফেলিলে যথেষ্ট সম্মান করা হয়। প্রেতের ব্যক্তিত্বের আলোচনা দর্শনের ধারায়ই হওয়া উচিত। প্রেত-তাত্ত্বিকদের মনে রাখা উচিত যে, ব্যক্তিত্বের সনাতনত্ব প্রমাণ করা খুব সহজ নয়। জড়-জগতে জড়পিণ্ড সমস্তই অসনাতন। কোন বৃক্ষদেহ বা ইমারত চিরস্থায়ী পদার্থ নয়। জড়-জগতে সনাতন পদার্থ পরমাণু—এখন পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ইলেকট্রন। আধ্যাত্মিক জগতেও বেদান্ত ইত্যাদি দর্শনের মতে একমাত্র ব্রহ্ম সত্য; ব্যক্তিত্ব উপাধি মাত্র; স্তবরাং রামকমল কিংবা রামহরি কেহই চিরস্থায়ী ব্যক্তি নন। অবশ্য বেদান্তের মত-ই সকলে গ্রহণ করিবেন এরূপ আশা করি না। তথাপি কোন ব্যক্তি ইহজীবনের সকল সম্পর্ক সঙ্গে লইয়া গিয়া পরলোকেও অনন্তকাল সেই ব্যক্তিই থাকিয়া যায়, ইহা ভাবাও সহজ নয়।

প্রেতে বিশ্বাস করিয়া অনেকে শোকে সান্ত্বনা পায়, সে কথা জানি। কিন্তু সান্ত্বনা দেয় বলিয়াই উহা সত্য, ইহা যুক্তিসিদ্ধ কথা নয়। সত্য বড় নিষ্ঠুর, বড় কঠোর। মায়ের বুক ফাটিয়া গেলেও মৃত সন্তান মৃতই থাকে। সে সন্তান কোথাও আছে ভাবিয়া মা যদি সান্ত্বনা পান তবে তাহা পাওয়ার অধিকার তাহার আছে। কিন্তু উহাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া প্রচার করার অধিকার মায়েরও নাই, অন্যেরও নাই।

জৈনদের ‘স্বাদ্‌বাদ’ প্রভৃতিতে একটা দার্শনিক মতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাহা সনাতন সত্য বলিয়া কিছু স্বীকারই করে না। এই মত অনুসারে সব পদার্থ সম্বন্ধেই ‘আছে’ এবং ‘নাই’ এই উভয় উক্তিই বিভিন্ন অবস্থায় এবং বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা চলে। যে যাহা বিশ্বাস করিয়া জীবনযাত্রায় সুবিধা পায়, অন্যের পক্ষে না হইলেও তাহার পক্ষে উহা সত্য; অন্ততঃ সে উহা সত্য মনে করিয়া চলিতে পারে। ঈশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া বাগানের ফুলের কুঁড়ি পর্যন্ত, প্রত্যেক জিনিসের পক্ষেই এই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য। এই মত অনুসারে অবশ্যই প্রেততত্ত্ব ‘সত্য’ হইতে পারে, এরূপ মনে করা চলে।

আমরা কোন প্রকার অবিনয় প্রকাশ করিতে চাই না; শুধু বলিতে চাই যে, প্রেততত্ত্ব ঠিক বিজ্ঞান নয়। ব্যবহারিক মূল্য ইহার যাহাই হউক না কেন, দর্শন-বিজ্ঞানের প্রমাণিত সিদ্ধান্তের মত সত্য ইহা নয়। এই কথা বলিয়া একবার এক জন তাত্ত্বিকের কাছে যথেষ্ট বকুনি খাইয়াছিলাম। তথাপি অসত্যকে সত্য মনে করিতে প্রস্তুত নই। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয়, প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া যারা শাস্তি পান তাঁদের সেই শাস্তি-প্রাপ্তির আমি বিদ্রোহিত চাই। অনেক অর্দ্ধ সত্য, অনেক কাল্পনিক সত্য, অনেক অপ্রমাণিত বিশ্বাস লইয়া মানুষের জীবন চলে। ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক, পুর, পরী, বেহেশত প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া মানব-জাতির আদিম নিবাস, সভ্যতার ভবিষ্যৎ প্রভৃতি অনেক বস্তুই ত আমরা কিছু জানি, কিছু জানি না। এক দিকে বিজ্ঞানের কঠোর সিদ্ধান্ত, অপর দিকে ফলিত জ্যোতিষের মণ্ডা, অশ্লেষার অপকারিতা এবং স্বস্ত্যয়ন ও গ্রহ-যাগের উপকারিতা প্রভৃতি অনেক মীমাংসিত এবং অমীমাংসিত সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাস লইয়াই ত আমরা জীবন চালাইয়া যাই। স্তবরাং প্রেততত্ত্বকেও এই সব বহু লৌকিক বিশ্বাসের একটি করিয়া লইতে আপত্তি করিব না।

কিন্তু যেখানে সত্যের প্রশ্ন উঠিবে, সেইখানেই মনে রাখিতে হইবে যে, সত্য প্রাপ্তির একটা পদ্ধতি মানুষ পাইয়াছে। সাধ্য-সাধ্যক, হেতু উদাহরণ ইত্যাদির সাহায্যে মানুষ বিচার করিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছে। এই চিন্তা পদ্ধতিকে বাদ দিয়া কোন আবিষ্কার হইতে পারে না। প্রেত সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

“যেয়ে প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে

অন্তীত্যেকে নামমন্তীতি চৈকে।...

দেবৈরজ্ঞাপি বিচিকিৎসিতং পুরা

ন হি সুবিজ্ঞেয়ং অনুরোধো ধর্মঃ। কঠোপনিষৎ।

‘প্রেতে বিচিকিৎসা’—প্রেত জানিবার আকাঙ্ক্ষা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু জিনিসটি খুব সহজে বিজ্ঞেয় নয়। এই সব সূক্ষ্ম বিষয় জানিবার পদ্ধতি প্রেত-তাত্ত্বিকেরা অধিগত করিয়াছেন, এ কথা বলিতে সাহস পাই না। সে পদ্ধতি জানিতেন বাদরায়ণ, বুদ্ধ অথবা সৌক্রেতিস, প্রেতো। সেই পদ্ধতি বর্জন করিয়া নূতন আবিষ্কারের গর্বে ক্ষীত হইয়া প্রেত-তাত্ত্বিকেরা যাহা প্রচার করেন, তাহা দুর্বল মনের উপজীব্য হইতে পারে; তাহার বেশী কিছু নয়। এইখানে আমরা আত্মার অমরত্ব, পরলোক ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতেছি না; শুধু প্রেততত্ত্ব যে অপ্রতিষ্ঠিত তাহাই বলিতেছি।

## গৃহহার

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম. এ.

বান্ধুদেবপুর গ্রামে তিরিশ বছর ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাস এবং এই হিন্দুপল্লী খ্রিস্টীয় অহিন্দুপল্লী। অহিন্দুরা চাষী, চাষ-আবাদ করিয়া তাহাদের এবং তাহাদের মনিব-মহাজনের পোষণ করিতেছে—সুধু আজ নয় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইহাদের পরম্পরের মধ্যে একটা নৈকট্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এমন বিশ্বাস গড়িয়া উঠিয়াছিল যে হিন্দু কেহ প্রবাসী হইলে বাড়ীর স্ত্রী ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়িত অহিন্দুর উপর।

অকস্মাৎ কলিকাতা ও নোয়াখালির অগ্নিতে পুরুষাভ্যুত্থানে সঞ্চিত এই বিশ্বাস ও নৈকট্য মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হইয়া গেল।

পূজার পরে বান্ধুদেবপুরে একটা আতঙ্ক দেখা গেল—

পাড়ার হরিখুড়ো সংবাদ আনিয়াছেন পল্লীতে পল্লীতে ব্রাহ্মণযোগে লাঠি-সড়কি খেলা হইতেছে এবং যে-কোন দিন যে-কোন সময়ে তাহারা প্রতিপক্ষের পাড়ায় পড়িয়া “নোয়াখালি” করিয়া দিবে। আরও কয়েকজন এ সংবাদ ঘূর্ণন করিল। অতএব আতঙ্কগ্রস্ত না হইয়া উপায় কি?

গ্রামে সংবলদেহ পুরুষাভ্যুত্থান মাত্র পনের জন, তাহারা সারাজীবন কলম চালাইয়াছে; লাঠি ধরিতে শেখে নাই। বেশীর ভাগ লোক বিদেশে থাকিয়া কিছু কিছু পাঠান, সেই অর্থ ও খামার জমির ফসলে এই লোকগুলির দিন চলে—তাই বিধবা, বধূ, বালক-বালিকাই গ্রামের বাসিন্দা। যাহারা উপার্জনক্ষম তাহারা বিদেশে। এই অরক্ষিত গ্রামকে কি করিয়া রক্ষা করা যায়।

চক্রবর্তী-বাড়ীর বৈঠকখানায় নিত্য বৈকালে আড্ডা বসিত; আজকালও বসে, কিন্তু জমে না। সেদিন কয়েকজন বসিয়া ছিলেন এমন সময় হরিখুড়ো লঠন হাতে করিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরেশবাবু শিক্ষিত লোক, গ্রামে জমিজায়গা দেখেন এবং ইচ্ছুক মাষ্টারী করেন, দীর্ঘ শীর্ণ চেহারা। স্পষ্টবাদী বলিয়া একটা অখ্যাতি আছে এবং তেজস্বী বলিয়া অখ্যাতিও আছে। চক্রবর্তী-বাড়ীতে কেবল তিনিই থাকেন।

হরিখুড়ো কহিলেন—দেখ সুরেশ, সবই ত শুনছ, এখন কি করা যায়। মান ইচ্ছত নেই-ই, ওরা ত মুখের উপরই যা-তা বলছে, এখন প্রাণটা বাঁচানোর উপায় কি?

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—দেখ। রমেশ, কি হয়েছে। যারা মুখ তুলে কথা কয় নি, তারা আমারই ঘাটে চান করতে করতে গ্রামের মেয়ে-বোনের কে কাকে নেবে সেই আলোচনা করে। আশ্বে নয়, শুনিয়ে শুনিয়ে বলে আর হাসে—

বোস মশায় বলিলেন—তোমাদের দালালটাও কারা নেবে এই নিয়ে ত সেদিন দক্ষিণ পাড়ায় ছুঁদলে মারামারির জোগাড়। শুনছি ছুঁচার দিনের মাঝেই আক্রমণ হবে—পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর পথ কি?

রমেশবাবু বলিলেন—কোথায় যাবেন? জমিজমা বেচে যা পাবেন তা দিয়ে না হয় ছুঁবছর গেল তারপর যে না খেয়েই মরবেন।

হরিখুড়ো বলিলেন—সেই ত ভাবনা—

না খেয়ে যদি মরতেই হয় তবে এখানেই মরুন না কেন? যতক্ষণ পারেন লড়বেন, মরতে মরতে মেয়েরা খড়ের রামাধারে আগুন দিয়ে লাকিয়ে পড়বে। আমি সেই বুদ্ধি করে রেখেছি, আর আপনারা যদি দাঁড়ান—

গাঙ্গুলী মশায় বলিলেন—ক্ষমতার মধ্যে ত কলম ছুঁতে মারা, বড়জোর ডিঙ্গনারী ফেলে মারতে হবে, তা নিয়ে হাজার হাজার লোককে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা—

বাধা দেওয়া ত নয়, মরা—কিন্তু শুনে নয়; লড়ে মরা—

এমনি আলোচনা মাঝে মাঝেই হয় সদরে এবং অন্দরে, কিন্তু কি করণীয় তাহা স্থির হয় না, কেবল দুর্ভাবনা ও আতঙ্কই বাড়িয়া চলে। রাত্রে কোথাও একটু শব্দ হইলে সকলে কান খাড়া করিয়া উঠিয়া বসে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ঘুচিয়া গিয়াছে—তবুও দিন যায়।

ছেলেপুলের মুখে হাসি নাই, গৃহবধূগণ ক্রীড়ন; সকলে যেন নিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষায় বসিয়া আছে এমনি একটা করুণ নিস্তব্ধতায় গ্রামখানি ছাইয়া গিয়াছে।

রমেশবাবু হাটে বাইতেছিলেন—

জটু সর্দার প্রশ্ন করিল—মাষ্টারবাবু আপনারা নাকি মারামারির জন্তে নমঃশূদ্র আনাচ্ছেন? সেটা কি ভাল হবে?

রমেশবাবু কহিলেন—তা নয়, আমরাই প্রস্তুত হচ্ছি। নমঃশূদ্ররা ত বলেছে যে, যে হিন্দুরা আমাদের জলস্পর্শ করে না, তাদের জন্তে আমরা চাঁদীভাইদের সঙ্গে বিবাদ করব না।

সর্দার হাসিয়া কহিল—আপনারা আর কি প্রস্তুত হবেন?

রমেশবাবু সংক্ষেপে কহিলেন—“মরবার জন্তে” এবং বুধা বাক্যব্যয় না করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি জানেন যাহারা তাঁহারই বৈঠকখানায় বসিয়া পরামর্শ করেন তাঁহারাই নিত্য পল্লবিত করিয়া সমস্ত কথা অপর পক্ষকে জানাইয়া দেন। তাঁহার প্রত্যেকে ভাবেন, এইরূপে সম্মতি রক্ষা করিলে

অন্তের যাহাই হোক অন্ততঃ তিনি এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইবেন  
কিন্তু জানেন না ছুধের পুঙ্খ ভলেই ভরিয়া গিয়াছে।

রাত্রে শুইতে গেলে পত্নী রমেশবাবুকে কহিলেন—শুনছ  
গো, কি সব বলাবলি হচ্ছে।

শুনছি।

আমার কথাই কি সব বলছে—

জানি। তোমার চেহারাটা একটু ভাল তাই ত  
আলোচনা হচ্ছে।

কিন্তু যদি এমন তেমন হয় তবে কি করব।

তেমন অবস্থা দেখলে রান্নাঘরে আগুন লাগিয়ে ঘরে বিল  
দেবে। খড়ের ঘরে আগুন দিলে আর তোমার নাগাল কেউ  
পাবে না—

পত্নী বলিলেন—মরতে ভয় নেই কিন্তু বুকী।

বুকীকে অসহায় পৃথিবীতে না ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে রাখাই  
যে ভাল।

পত্নী কেবল কহিলেন—ভিটে-বাড়ীর প্রজা তাব্রাই যখন  
এই সব কথা উচ্চারণ করে।

—সময় এসেছে তাই করে। আর তোমার হিমুরাও  
ত সে আলোচনায় যোগ দিয়ে হাসে। জগৎ উন্টে গেছে,  
আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে তাই—

কয়েক দিন পরে সন্ধ্যার সময়ে জনৈক জ্রীলোক সংবাদ  
আনিল যে আজ রাত্রেই শুভকার্য আরম্ভ হইবে এবং প্রথম  
গাঙ্গুলীবাড়ী থেকেই শুরু হইবে। পাঁচ-ছ শ' লোক উত্তর  
পাড়ায় জমা হইয়াছে।

প্রাস-কুন্ড গ্রামখানির মাঝে সহসা একটা বিক্ষল চাকলা  
দেখা দিল। সকলে রমেশবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া নিয়-  
কণ্ঠে পরামর্শ করিলেন। রমেশবাবু বলিলেন, মেয়েছেলেদের  
মুখুজ্যেবাড়ীর দোতলায় রেখে নিজেরা দরজায় দাঁড়ান, হাতে  
দা নিয়ে। যদি অবস্থা খারাপ হয় তবে কেরোসিন কাপড়ে  
দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেবে।

নিরুপায় অবস্থায় তাহাই ঠিক হইল। কয়েকজন লোক  
গ্রামের প্রবেশ-পথে পাহারায় রহিল। তাহারা সঙ্কত  
করিলেই সকলে প্রস্তুত হইয়া নিজ নিজ স্থানে রামদা হাতে  
দাঁড়াইয়া যাইবেন।

রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে। সকলে নির্বাক আগ্রহে  
উৎকর্ষ হইয়া বসিয়া আছে, দ্বিতলের ঘরে শিশুদের ক্রন্দনও  
ধামিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে উত্তর পাড়া হইতে লাঠি-  
খেলার সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ ধ্বনি শোনা যাইতেছে।

অকস্মাৎ একটা বৈ বৈ শব্দ,—মনে হয় অনেকগুলি লোক  
যেন চীৎকার করিয়া এই দিকেই আসিতেছে—কিন্তু দূরে।

সকলে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন এবং এক জনকে অন্ধকারে  
পাঠানো হইল সংবাদ লইতে। অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাকুল  
প্রতীক্ষিত আধঘণ্টা সময় চলিয়া গেল—বার্তাবহ সংবাদ  
আনিল,—কাহার গরু মার্ঠের পুঙ্খের কাদায় পড়িয়াছে,  
তাহাকেই উঠাইতে এই কলরব।

এমনি করিয়া সমগ্র রাত্রি চলিয়া গেল—স্বর্ঘ্যোদয়ে দেখা  
গেল জীতিব্যাকুল চাহনি লইয়া রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত লোক-  
গুলি গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে। গত রাত্রি যদিও কাটিয়াছে  
কিন্তু সমুখের রাত্রি কাটিবে এমন ভরসা নাই, কাজেই দৈনন্দিন  
সংসারযাত্রা যেন নিরর্থক হইয়া গিয়াছে।

পরদিন সন্ধ্যার সময় ছেলেরা আসিয়া বলিল—ঘাটের  
উপর লাঠিখেলা হইতেছিল সেখানে নাকি জোমান ছোকরারা  
গ্রামের দুইটি বয়স্ক কুমারীর নাম করিয়াই বলিয়াছে যে আজ  
রাত্রে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া তাহারা বিবাহ করিবে।

সে রাত্রিও একই ভাবে কাটিয়া গেল। সকালে রমেশ  
বাবু বলিলেন, এমনি ভাবে ক'দিন বাঁচবেন আপনারা, তার  
চেয়ে তাদের শুভকার্য শিগগির করতে বলে আসাই ভাল।

কিছুক্ষণ বাদেই এসব কথা অহিন্দু পল্লীতে প্রচারিত হইয়া  
গেল। রমেশবাবু ভিটাবাড়ীর প্রজার প্রেমের উত্তরে বলিলেন,  
হ্যাঁ, যত শীঘ্র হয় ততই ভাল, শুধু শুধু আর দণ্ডে কি হবে।  
প্রজারা মনে করিল,—রমেশবাবু তাহাদিগকে উপহাস  
করিয়াছেন।

এমনি করিয়া প্রায় ছ'মাস চলিয়া গেল—

জীবনযাত্রা চলিয়াছে যতের মত,—রাত্রির নীরবতায়  
কাহারও ঘুম নাই, দিনের আলোর কাহারও স্বস্তি নাই।  
আজ কুমারী কত্কা কাঁদিয়া মাকে জানায় যে কে একজন ঘাটের  
পথে তাহাকে গোপনে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে,—কাল  
বধু আসিয়া স্বামীকে জানায়, তাহাকে দেখিয়া উহার হাসিয়া  
কি বলাবলি করিয়াছে।

বীরে বীরে জীবনে গ্লানি অপমান ও অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা  
স্বপ্নীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। আপনার গৃহে, বাস্তবিক প্রাণ  
ইপাইয়া উঠিয়াছে। অথচ তাহার প্রতিকার নাই, নালিশ  
করিবার স্থান নাই।

গ্রামে জটলা আরম্ভ হইল—রমেশবাবু সমস্ত জমিজমা ধর-  
বাড়ী বিক্রয় করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। গাঙ্গুলী মশায় হাসিয়া  
বলিলেন, দেখ ভয়ে বাস্তবিক ছাড়লে। আমার অত ভয়  
নেই, করুক দেখি কি করে। বলা শব্দ কিন্তু করাটা সোজা  
নয়, বুঝলে হে—

আর এক জন বলিলেন—ভেবেছিলাম রমেশের মধ্যে কিছু

আছে, কিন্তু এখন দেখছি কাঁঠালের ভুতি, ভয়ে একেবারে  
তাঁজে গোবরে করে ফেলে দিলে। হিঃ—

জমিজমা কিছু বিক্রয় হইবার পরই প্রচার চলিল, ওসব  
এমনিই পাওয়া যাইবে, অতএব টাকা দিয়া আর কিনিবার  
প্রয়োজন নাই। জমি বিক্রয় হইল না—তখন অস্থাবর সম্পত্তি  
বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। টিনের ঘরও বিক্রয় হইয়া গেল—

সংবাদ শুনিয়া হরিখুড়ো আসিয়া বলিলেন, রমেশ,  
কাজটা কি ভাল করলে বাবা। এমন কিছু ত হয় নি।

—না খুড়ো,—কিছু হয় নি, মরি নি একথাও সত্যি কিন্তু  
বৈচেও নেই। মরাটাই বড় কথা নয়—মরার মত বাঁচা তার  
চেয়েও ঘোরার। আজ তিলে তিলে মরাছি এইটাই দুঃখ—  
জীবনে অপমান, লাঞ্ছনা, গ্লানি শুণীকৃত হয়ে উঠেছে—তাই  
বাঁচার মত বাঁচতে চাই—

—কোথায় যাবে ?

—গিয়েছিলাম জায়গা কিনতে, তারা হাসে। সেখানেও  
কোন সমবেদনা নেই, সহানুভূতি নেই—আমাদের এ দুঃখ  
তারা বোঝে না—হাসে, ব্যঙ্গ করে।

—তবুও যাবে।

—হ্যাঁ। আমি ভেসেছি খুড়ো, এদিকের বাঁধন ছিঁড়েছি,  
যদি ওদিকে কুল পাই ভাল, না হয় ভরা ডুববে। যারা মুখ  
তুলে কথা কইতে সাহস পায় নি, তারা আজ পদে পদে  
অপমান করে জীবনকে ছর্ব্বৎ করে তুলেছে। তারা দয়া  
করে বাঁচিয়ে রেখেছে তাই আছি—কারও দয়ার বেঁচে থাকা  
বাঁচার মত বাঁচা নয়, তাই বিদেশে ভিক্ষা করেও পারি ত  
বাঁচবো, এখানে আর নয়। স্বজাতি যদি আশ্রয় না দেয় তবে  
পশ্চাৎশের মরুভূমির লোকের মত না খেয়ে রাস্তায় মরব, কিন্তু  
দয়ার উপর বেঁচে থাকতে চাই নে—

—তুমি সত্যিই যাবে ?

—হ্যাঁ।

—তুমি লেখাপড়া জান, না হয় কিছু করে খাবে, কিন্তু  
আমরা।

—আপনারা কি করবেন সে পরামর্শ আমি কি দিতে  
পারি। তবে কেউ শুধু বেঁচে থেকেই খুশী, কেউ হয়ত তাকে  
মৃত্যুর চেয়েও দুঃখময় মনে করে। আমি এ বাঁচাকে মরাই  
মনে করি,—তাই বাঁচতে চাই—হরিখুড়ো চিন্তাধিত হইয়া  
প্রস্থান করিলেন।

দেখিতে দেখিতে রাষ্ট্র হইয়া গেল রমেশবাবু নেহাত  
ভীরা, তাই পলাইয়া যাইতেছেন। স্থল হইতে কেহ কেহ  
অস্বরোধ করিল থাকিতে,—আপনি চলে গেলে স্থল ভেঙে  
যাবে।

রমেশবাবু সংক্ষেপে বলিলেন, থাকলে আমিই ভেঙে

যাব। ভেবেছিলাম লেখাপড়াই মহৎ কাজ, তাই বালাবধি  
শিখেছি, কিন্তু আজ দেখছি তা বাঁচবার সবচেয়ে বড়  
অস্ত্রায়।

তথাপি ভাঁহার মনে কালোমেঘ সঞ্চিত হইয়া উঠিল।

প্রত্যেকটি গাছ, পুকুর, গৃহ কত যত্নে কত শ্রমে তিনি  
তৈরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। নারিকেল গাছে সবে ফল  
ধরিয়াছে; পুকুরের মাছগুলি বড় হইয়াছে, গাভী শীঘ্রই দুগ্ধবতী  
হইবে—এ সমস্ত ফেলিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া মনটা  
হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। ইহাদের প্রতি পত্রে, গ্রামের  
প্রতি ধূলিকণায় বালা-কৈশোর-যৌবনের কত স্মৃতি শিশিরের  
মত টলমল করিতেছে।

ভাবিয়া ভাবিয়া রমেশবাবুর চোখ জলে ভরিয়া আসে।

পুকুরপাড়ের নূতন ছইটি নারিকেল গাছ হইতেছিল—  
বাড়ীর গরুটি তাহার কচিপাতা খাইতেছিল। রমেশবাবুর  
মাতা পৈতৃক দালানের বারান্দায় বসিয়া দেখিতেছিলেন।  
রমেশবাবু চিরদিনের অভ্যাসমত গরুটিকে তাড়াইয়া দিলেন।  
মা কহিলেন, তাড়াস্ নি রমেশ, গাছে আর কি হবে, ওই  
থাক।

রমেশবাবু একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেলেন; গরুটি  
নির্বিকার ভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল। রমেশবাবু  
জানিতেন মায়ের এই কথা কয়েকটির মাঝে কি গভীর বেদনা  
রহিয়াছে। নারিকেল গাছ দুটিকে সমস্ত ধানের চিটা দিয়া  
তিনিই চাকিয়া দিয়াছিলেন।

মা মাঝে মাঝে বলেন—সত্যি চলে যেতে হবে রে  
রমেশ।

কথাটার অর্থ এই, যাহা কিছু প্রিয়, জীবনের সঞ্চিত ধন,  
স্মৃতির ভাণ্ডার সবকিছু পিছনে ফেলিয়া চলিয়াই যাইতে  
হইবে? রমেশবাবু বলেন—হ্যাঁ মা যেতেই হবে। এমনি  
ক'রে ত থাকা যায় না। এর চেয়ে মরাও ত ভাল।

সেদিন রাত্রে বাড়ীর চাকর একটি লোক ধরিয়া আনিল,  
লোকটি গোপনে বড়শী ফেলিয়া সের চারেক একটি রুই মাছ  
ধরিয়াছে। অরুণ এত দিন পরে কেন আজ সে লোকটি মাছ  
ধরিয়াছে তাহা রমেশবাবু জানিতেন তবুও প্রশ্ন করিলেন,—  
মাছ ধরলে কেন ?

—ইচ্ছে হ'ল তাই, যা করতে হয় করুন। তবে একটা  
কথা আজকাল দিন ভাল নয়,—কিসে কি হয় বলা যায় না।

অর্থ সুপরিষ্কার—জোর করিয়াই আমরা খাইব, আপত্তি  
করিলে হাদ্যাম হইবে। রমেশবাবু অল্প সময় হইলে, অনেক  
কিছু করিতেন, আজ শুধু বলিলেন—আমি চলে যাচ্ছি তা  
বোধ হয় শুনেছ, পুকুর বাগান সবই তোমরা খাবে, দিন যখন

এসেছে। তবে এত দিন একসঙ্গে বাস করেছি তাই বলি যে ক'দিন আছি সে ক'দিন না হয় একটু ধৈর্য ধরে থাকো।

হরিখুড়ো পরামর্শ দিলেন থানায় পাঠাইতে, কিন্তু রমেশবাবু কহিলেন—থানায় কার কাছে পাঠাব খুড়ো? উষ্টে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে—

আম জাম কাঁঠাল নারিকেল সবই পুঙ্করের মাছের মত ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইতে লাগিল, গ্রামস্থ সকলে শুধু পরামর্শই করেন, প্রতিকারের উপায় নাই।

গ্রামে বর্ষা আসিয়াছে।

রমেশবাবুর ঘরগুলি ও অস্থাবর খাট পালঙ্ক প্রভৃতি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। তিনিও যাইবার দিন স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। জেতার সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে, তাহার প্রস্থানের পরে তাহার ঘর ভাঙিয়া লইয়া যাইবে।

কিন্তু রমেশবাবু বিদায়ের কয়েক দিন পূর্বে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। অস্বাভাবিক জ্বর ৪৫ ডিগ্রী, বিরাম হয় না। তবুও তিনি লোক মারফত নৌকা স্থির করিয়া যাত্রা করিবেন ঠিক হইল।

বিদায়ের পূর্বে দিনে সকালে রমেশবাবু জরের উত্তাপে প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন—মাতা শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছেন। জেতার নিয়ন্ত্রণ লোক আসিয়া টিনের খরের চাল খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে—হাভুড়ির আধাতে টিনগুলি নির্ধ্বংস করিতেছে—কৃষ্ণ রমেশবাবুর প্রবল মাথার যন্ত্রণা, তাহাতে অতি নিকটে এই আওয়াজ তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। তিনি বলিলেন—কিসের শব্দ মা?

—টিনের খর ভাঙছে—

—আজই! উঃ আজ না ভাঙলেই কি নয়? এ ত সহ হয় না আর।

মাতার চোখে দশ বৎসর পূর্বের দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল। এই ঘর তুলিবার সময় রমেশ কি পরিশ্রমই না করিয়াছে! ঘর খিরিবার সমস্ত সরঞ্জাম প্রায় নিজে হাতেই তৈয়ার করিয়াছে, আগাগোড়া মিস্ত্রীর সঙ্গে থাকিয়া শেষে অসুস্থ হইয়া পড়ে। কাঠের বেড়ায় সে নিজে ছবি আঁকিয়াছিল। মাতা নীরবে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে চাহিয়া দেখিলেন, এক একখানা করিয়া টিন খুলিয়া পড়িতেছে—আর তাহার হৃদয় শূন্যতায় ভরিয়া উঠিতেছে।

অদূরে একঘেঁয়ে শব্দ হইতেছে ঠন্ ঠন্ বন্ বন্—

রমেশবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—উঃ মাথা গেল, ডাক ওদের, ডাক মা—একটা দিন কি ওরা মার্কানা করবে না?

মাতা তাহাদের ডাকাইলেন। জেতা বারান্দায় দাঁড়াইলে রমেশবাবু কহিলেন—আমার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছে

ভাই, তার উপর এই শব্দ ত আর সহ হয় না। তোমরা কাল ঘর ভেঙে নিয়ো—আজ থাক্—

—মিস্ত্রী ত রোজ রোজ মেলে না। তাদের পেরিয়েছি, কাজে লাগিয়ে বন্ধ করে রোজ মজুরী দেব, এ কেমন কথা। তারপর ঘর কেনাই ত ঠকা।

—জানি, মিস্ত্রীর দাম না হয় আমি দেব, আজ ক্ষমা কর—একটা দিন।

—এই হয়ে গেল—একটু সহ করে থাকুন না।

রমেশবাবু বিভ্রাট করিয়া কহিলেন, ওরে মূঢ় হৃদয়হীন, কেমন করে জানবি তোরা আমার পাঁজরা খুলে নিয়ে যাচ্ছিস—সে অল্পভূতি কি তোদের আছে।

রমেশবাবু চোখ বুজিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। কহিলেন, মা তুমি কোঁদো না। আর নয়—আর দুঃখ নেই—

মাতা অশ্রু মুছিয়া রমেশবাবুর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে শুধু কহিলেন, ঠাকুর মঙ্গল কর,—এত দিনের পুজো কি মিথ্যা হ'ল?

বিদায়ের দিন আসিয়া পড়িল, কিন্তু রমেশবাবুর জ্বর কমিল না।

পাড়ার লোকের সহায়তায় জিনিষপত্র নৌকায় ভর্তি হইল। নৌকা ছাড়িবার সময় আগতপ্রায়, কিন্তু তখনও উত্তাপ কমাইবার জন্য রমেশবাবুর মাথায় জল ঢালা চলিতেছে। তিনি আপাততঃ আট মাইল দূরে শহরের আশ্রয়-ভবনে উঠিবেন, পরে সুস্থ হইয়া গন্তব্যস্থলে যাইবেন—পশ্চিমবঙ্গে কোন শহরে বাসা লইয়াছেন।

রমেশবাবুকে ধরিয়া সকলে নৌকায় তুলিয়া দিল। তিনি পাড়ার সকলকে সম্ভাষণ করিয়া জী, পুত্র, কন্যাসহ নৌকায় উঠিলেন, মাতা উঠিয়া রমেশবাবুর মাথায় জল ঢালিতে লাগিলেন। প্রতিবেশী নরনারী অশ্রুচোখে দাঁড়াইয়া আছে। সঙ্কীর্ণ খালের ঘাটটি বিদায়ের মৌন বেদনায় ভিত্তিমিত। হরিখুড়ো সহসা আর্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, বাবা রমেশ সত্যিই চললে?—আমরা কি করব? কেমন করে থাকব? কেমন করই বা যাব? সব ফেলে—স্বপ্নের ঘর ভেঙে দিয়ে—

অর্দ্ধচৈতন্য রমেশবাবু জবাব দিলেন না, কিন্তু সমবেত নারীগণ কথাতায় যেন সহসা আহত হইয়া চোখে আঁচল চাপিয়া দিলেন। এই রমেশ, গ্রামের চিরপরিচিত রমেশ চিরদিনের মতন চলিয়া যাইতেছে। আর আসিবে না, আর দেখা হইবে না—

মাঝি কহিল, বাবু, নৌকা ছাড়ব?

রমেশবাবু জরের ঘোরে বলিলেন—এঁা।—মাঝি তাহার প্রশ্ন পুনরায় জানাইল।

রমেশবাবু কহিলেন, আমাকে একটু তুলে ধরো ত মা,



আমি দেখব, শেষবারের মত একবার দেখব। মা ও জীর  
কক্ষে ভর দিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন—বেদনাবিশ্বল অস্বাভাবিক  
দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন চিরপরিচিত, চিরপ্রিয়, একান্ত আপনার  
গৃহের প্রতি, যার আকর্ষণে দূর-দূরান্তর হইতে অহরহ ছুটিয়া  
আসিয়াছেন।

রমেশবাবুর চোখে পড়িল রিক্ত বাড়ীখানি। ঘর ভাঙিয়া  
লইয়া গিয়াছে, শূণ্য ভিটা কয়েকটি সাহারার মত খাঁ খাঁ  
করিতেছে বুকফাটা বেদনায়। ভিটার উপরে এখনও একক  
ছ-একটি খুঁটি দাঁড়াইয়া আছে পরিত্যক্ত স্মৃতিচিহ্নের মত।  
পৈতৃক ভবনের দরজায় যে তালা দিয়াছিলেন তাহা খররোদ্রে  
খিক্মিক করিতেছে।

রমেশবাবু 'উঃ'। বলিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার চোখের  
উৎসারিত অশ্রুতে উপাধানী নিষিক্ত করিয়া দিল।

মাতা চোখে আঁচল চাপিয়া কহিলেন, এ গ্রামে কি আর  
আসব না রমেশ?

—না মা, আর আসব না। এ লাজনার শেষ হয়েছে,  
এখন সামনে আরও কত আছে তাই দেখতে চলেছি।

রমেশবাবু অসহ্য যাতনায় সহসা ফুকারিয়া উঠিলেন—  
ছাড়, ছাড়, নৌকা ছাড় মাঝি—আর দেখতে চাই নে—

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল—সংকীর্ণ খালের তীরে স্রোত  
মুহূর্তে নৌকাখানিকে দিগন্তবিভূত জলধারার মধ্যে আনিয়া  
ফেলিল।

## আহ্বান

### শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

স্বাধীনতা এল ছয়ার-প্রান্তে, শুধাইছে শোন দেশাতুরাগ।  
সভয়ে হেরিহু—বিদেগী কুঠারে জননীরে মোর করিল ভাগ।  
নয়নে আমার অশ্রু ঝরিছে, এমন ঘটনা দেখে নি কেহ,  
দেশপ্রেমের যুক্তি বিনায়ে বিচার করিল মাতার স্নেহ।  
এ যুগকার্ত্তে লাখে লাখে লোক স্বদেশে বনিল বিদেগী ওই;  
লাখে লাখে লোক ভিটে-মাটি-হারি কিছু নয় তার।

ভিখারী বই;

লক্ষ লক্ষ শিশু ও বৃদ্ধ তরুণ এবং তরুণী কত  
বলি দেয় প্রাণ, বলি দেয় মান, তবুও মৃত্যু অসংযত।  
তবুও এখনো ফেরে নি চেতনা, অহমিকা-ভরা নৃত্য চলে,  
হে কবি, তোমার বিকাইবে গান ইহার গুণিত চরণ-তলে?

হে বীর-যাত্রী, যাত্রা-পথের হয় নি এখনো হয় নি শেষ,  
কুজাটিকায় বিরে আছে দিশি, শত ফণা মেলি ফুসিছে দ্বৈষ।  
তোমার আশায় পথ-পানে চায় নূতন দিনের নবীন উষা;  
তোমার ত্যাগের গরিমায় রচ জননী-দেহের পরম-ভূষা;  
তোমার বুকের রক্ত-অনলে হরু কর পুন যজ্ঞ-যাগ,  
দেউলে দেউলে জন্ম লভুক নূতন দিনের দেশাতুরাগ;  
তির্য্যক বাহা, ঘৃণ্য ক্লিন্ন, মালিন্য-ভরা যা-কিছু সব  
পুড়ে হোক ছাই, গুঁড়ে তোল ভাই ভ্রাতৃ-মিলন মহোৎসব।  
হে বীর সারথি, হোক আরম্ভ নূতন দিনের সে অভিযান,  
কবির বীণার তন্ত্রীতে তবে ধ্বনিত থাকুক সে আহ্বান।

ভ্রান্ত পথের পাছু তোমায় ভুলাইতে চায় তোমার পথ,  
জেনো জেনো তাহা দুগ্ধরতন; লজিলে তুমি যে পর্ত্ত,  
পার হয়ে এলে যে বাধা-বিঘ্ন, তুচ্ছ তাহার।

ইহার কাছে,

নিশাচর যত বিভীষিকা সম অবিরত তব মরণ যাচে।  
অমর পথের যাত্রী তুমি যে, জননী তোমার শরণ লয়,  
নয়নে তোমার নিক্ত শান্তি, কণ্ঠের বাণী অসংশয়;  
বক্ষে তোমার হৃদয় বল নির্ভীক আর অকুণ্ঠিত,  
ভাস্বর চির সত্য জ্যোতিতে, বিঘ্ন-বিপদে অকম্পিত;  
আন সাধে তব বরাভয় আর আন সখা আন মহাপ্রাণ,  
কবির বীণায় বাজুক আবার নূতন দিনের সে আহ্বান।

জাগ হৃদম হৃদম তেজে, এস হে নবীন হর্নিবার,  
মাতার কণ্ঠে বিজয়মালা পরাতে হবে যে পুনর্ব্বার।  
হৃগতি আজো হয় নাই দূর, হৃগম আজো রয়েছে পথ,  
অল ভেদিয়া আঁধারে ঘেরিয়া রয়েছে পড়িয়া ভবিষ্যৎ।  
তোমার বজ্র-গতি দিয়ে আজ বিদূরিত কর বিপদ যত;  
হুঃসাহসিক বীরত্ব দিয়ে উন্নত কর হৃদয় নত;  
তিমির নাশ গো বিঘ্ন-দহন অগ্নিতে দহি' এ মলিনতা,  
মানুষে আবার মানুষ করিতে চূর্ণিত কর পাশবিকতা;  
তোমাদের বৃকে ভগবান জাগি' হৃগতে করে পরিজ্ঞান,  
তাই ত কবির রক্তবীণায় ধ্বনিয়া ওঠে রে সে আহ্বান।

## শিল্প-স্বরাজ্যের সপক্ষে ও বিপক্ষে

ক্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়

“আর্ট ফর আর্টস সেক” মতবাদটি পুরাতন। এর বিরুদ্ধে এ যুগে প্রতিবাদ এসেছে নানা মূর্নির কণ্ঠ থেকে—বিশেষত, সমাজ-সচেতন লেখকদের তরফ থেকে। এঁদের বিচারে শিল্পের পক্ষে স্বরাজ্য থাকা সম্ভব নয়। শিল্প হ’ল সমাজের প্রতিকলন—মাহুষের মনের ছায়ায় সামাজিক চিন্তাধারা বহন করে নিয়ে যাওয়ার বাহন। সামাজিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত মানসলোকে বিচিত্র আলোড়নের সৃষ্টি করে। সেই আলোড়িত হৃদয়বাহিনীর প্রকাশই হ’ল শিল্প ও সাহিত্য। যুগের শিল্পে ও সাহিত্যেই যুগের মর্মবাণী সব থেকে বেশী কল্লোলিত হয়ে থাকে। শিল্প ও সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে তাই সুস্পষ্টভাবে সমাজের সঠিক প্রকৃতি জানা যায়। সমাজকে অবলম্বন করেই মাহুষের শিল্প; কাজেই শিল্পের স্বরাজ্য বা স্বাধীনতা থাকা সম্ভব নয়। “আর্ট ফর আর্টস সেক” তাই ভ্রান্ত; সত্য হ’ল “Art for something’s sake.”। এই মতবাদের প্রতিনিধি হিসাবে উক্তর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে চিহ্নিত করা চলতে পারে। কিছুদিন হ’ল তাঁর “সাহিত্যে প্রগতি” নামক বইখানি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগ থেকে প্রচুর নজির তুলে তিনি এ বইয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, “শিল্পের জন্ম শিল্প” মতবাদটি ভ্রমাত্মক ও অবৈজ্ঞানিক। তিনি শিল্পের সামাজিক ব্যাখ্যার সমর্থক। সাম্প্রতিক লেখকদের মধ্যে “সমাজ ও সাহিত্য”-প্রণেতা বিমল সিংহ, “সংস্কৃতির রূপান্তর”-লেখক গোপাল হালদার এবং “শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ” রচয়িতা বিনয় ঘোষকেও এই গোত্রান্তর্গত করা চলে। এঁরা সকলেই সমাজ-সচেতন লেখক ও শিল্পের সামাজিক ব্যাখ্যার সমর্থক।\* এ কালের অগ্রাঙ্ক লেখক-মহলেও এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বিপুল সাড়া ও সমর্থন পেয়েছে। সমস্ত বিষয়টি স্বভাবতই নূতন করে আলোচনার যোগ্য।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, নূতন মানেই সত্য আর পুরাতন মানেই মিথ্যা—এ কথা কোনো মতেই ঠিক নয়। লেখকের বিচারে “শিল্পের জন্ম শিল্প” তত্ত্বটি পুরাতন হলেও সত্য; তাই স্বীকার্য। শিল্প-স্বরাজ্যের মতবাদ প্রচার করলেই শিল্পে সামাজিক প্রভাবকে অস্বীকার করা হবে এমন কোন কথা নেই। সামাজিক প্রভাব শিল্পে নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু সে প্রভাব থাকা সত্ত্বেও শিল্প স্বরাজ্যপন্থী। “শিল্পের জন্ম শিল্প”—তত্ত্বের বিরুদ্ধপন্থীরা প্রথমেই ধরে নেন যে, এ তত্ত্বটি বুঝি

সামাজিক প্রভাবকে অস্বীকার করে; তাই চলে এর বিরুদ্ধে তাঁদের আক্রমণ ও সমালোচনা। কিন্তু সমালোচনাটা অনেকখানিই অপ্রাসঙ্গিক, যদিও এর মধ্যে জ্ঞাতব্য বস্তু আছে যথেষ্ট। সমালোচনাটি সার্থক বলে স্বীকৃত হবে কেবলমাত্র যদি প্রমাণ করা যায় যে, “শিল্প-স্বরাজ্যের” তত্ত্বটি সামাজিক প্রভাব বা বাণী-প্রচারের অংশকে অস্বীকার করে থাকে। অভিযোগটাই যেখানে সত্য নয়, সমালোচনাটা সেখানে কোন মতেই সার্থক হতে পারে না। বস্তুত, “শিল্প-স্বরাজ্যের” তত্ত্বটি সামাজিক প্রভাব বা বাণী-প্রচারের কোনটাই অস্বীকার করে না। তার মূল বক্তব্য আলাদা। এ কেবল বলে যে, সামাজিক প্রভাব শিল্পে আছে, বাণী-প্রচারও শিল্পে আছে, তবে সেগুলিই শিল্পের প্রাণ নয়। এই আলোকে “শিল্প-স্বরাজ্যের” বিরুদ্ধপন্থীদের নবপ্রচারিত “Art for something’s sake” তত্ত্বটি অনেকখানি সত্য হয়েও সমালোচনা হিসাবে অপ্রাসঙ্গিক ও বিভ্রান্তিকর।

এ কথা সত্য, শিল্প সমাজকে অবলম্বন করেই রচিত। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদিই শিল্পের আলোচ্য বিষয়-বস্তু। সমাজের প্রতিচ্ছবি বা প্রভাব শিল্পে ও সাহিত্যে থাকা কিছুমাত্র বিষ্ময়কর নয়—বরং খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এ কথা স্মরণ রেখেও বলা চলে যে, শিল্পের একটা আত্ম-স্বাতন্ত্র্য বা স্বরাজ্য থাকা সম্ভব, আর তা আছেও। বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, “শিল্প-স্বরাজ্যের” মতবাদটি এবং “Art for something’s sake” তত্ত্বটি আসলে পরস্পর-বিরোধী নয়। বাণী-প্রচার ও আদর্শ-প্রচার শিল্পে ও সাহিত্যে আছেই, তবে সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও দার্শনিকের বাণী-প্রচার ও আদর্শ-প্রচার থেকে এ বস্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মাহুষ, রাষ্ট্র, সমাজ, পৃথিবী, মন, চেতনা, বুদ্ধি, বোধি, আত্মা, ঈশ্বর, ইহলোক, পরলোক, ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ ইত্যাদির যে-কোনটাই হতে পারে শিল্পীর আলোচ্য বস্তু, দার্শনিকেরও আলোচ্য বস্তু। তবে এক ধরনের আলোচনা-প্রণালীতে গড়ে উঠে দর্শনশাস্ত্র, আর এক ধরনের আলোচনায় সৃষ্ট হয় শিল্প ও সাহিত্য। দার্শনিক সৃষ্টি করেন “বুদ্ধি”র (intellect) প্রেরণায়; শিল্পী সৃষ্টি করেন “বোধি”র (intuition) অনুপ্রেরণায়। এক জনের রচনার আবেদন থাকে মূলত বুদ্ধির কাছে, আর এক জনের মুখ্য আবেদন হৃদয়ের কাছে। এক জনের বাণী প্রচারিত হয় প্রত্যক্ষ ভাবে, আর এক জনের বাণী প্রচারিত হয় পরোক্ষ ভাবে। গান্ধী রচনা করেন “নন-ভায়োলেন্স ইন্ ওয়ার এণ্ড পিস্”, আর রল্‌গ্য সৃষ্টি করেন “জ’য়া ক্রিস্তফ্”। বাণী-প্রচার

\* বিনয় সরকারের বৈঠকে [দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৫, পৃঃ ১৫-২০]

আছে ছ'জনেরই রচনায়—দার্শনিকেরও, শিল্পীরও। তফাৎ শুধু প্রকাশভঙ্গীতে বা রচনাকৌশলে। দার্শনিকের নিকট প্রধান হ'ল আরোহ-পদ্ধতিতে আলোচনা ও অবরোহ-প্রণালীতে সিদ্ধান্ত প্রকাশ, আর শিল্পীর কাছে মুখ্য বস্তু হ'ল অবস্থা, ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি। বাণীপ্রচার বা দর্শন শিল্পীর সৃষ্টির মধ্যেও থাকে, তবে তা সর্বদাই প্রচ্ছন্ন ও গোপন। বিশ্ব-মৈত্রী ও মানুষের মুক্তির বাণী প্রচার করে' এক জন রচনা করেন দর্শন, সেখানে রচনা সৃষ্টি করেন “ক্ল্যারাবোল” জাতীয় উপন্যাস বা গল্প। শিল্পীর রচনায় বাণীটা অপ্রধান, প্রধান হ'ল অবস্থা, ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি। সৃষ্টির অংশের চেয়ে বাণী-প্রচারের অংশটা বড় হয়ে উঠলে রসের ব্যাধাত ঘটে, শিল্পের ইজ্ঞও যায় ক্ষুণ্ণ হয়ে। একারণেই “আনন্দমঠে”র বঙ্কিমের চেয়ে “কৃষ্ণকান্তের উইলে”র বঙ্কিম বা “পথের দাবী”র শরৎ চন্দ্রের অপেক্ষা “চরিত্রহীন”র শরৎচন্দ্র শিল্পজগতে অনেক উঁচু আসনে প্রতিষ্ঠিত। বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক দিন আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : “আমি সেখানেই আনন্দ পাই এবং সেখানেই আমি বঙ্কিমের কাছে ঋণী যেখানে মেসেজ দেব্‌ নি, যেখানে উনি আপনাতঃ সৃষ্টি করবার আনন্দকে রূপদান করেছেন। আনন্দময় সাহিত্য ভাষাকে প্রাণময় জগৎ করে তোলে, মেসেজের সে শক্তি নেই। এইজন্ত সাহিত্য-সংসারে আমরা তাঁদেরই নমস্কার করি যারা তাঁদের প্রতিভা থেকে সাহিত্যের ভিতর প্রাণের চিরন্তন স্রব চলে দিয়ে থাকেন।”\* অর্থাৎ কবির দৃষ্টিতে শিল্পের যথার্থ ঐশ্বর্য ‘মেসেজ’ বা দর্শনে নয়, প্রকাশ-ভঙ্গীতে। শিল্পের ঐশ্বর্য রসোদ্বোধনে বা রসসৃষ্টিতে। রসোত্তীর্ণ না হলে বাস্তব ঘটনার কোনও প্রতিকলনই শিল্পের আসরে জাতে ওঠে না। শিল্পের সামাজিক ব্যাখ্যার সমর্থক ও প্রচারকেরা এই মূল সত্যটি উপেক্ষা করেই যত গণ্ডগোল ও বিভ্রাট সৃষ্টি করেছেন। সমাজ-সংস্কারের জন্ত আদর্শ প্রচারের প্রয়োজন নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু সে কাজ ততটা শিল্পীর নয় যতটা সমাজ-সংস্কারকের। শিল্পীর কাজ আর সমাজ-সংস্কারকের কাজ অনেকখানি আলাদা। এক জনের কাজ সমস্তা উপাধান করা, আর এক জনের কাজ সমাধান করা। অতিমাত্রায় সমাজ-সচেতন হয়েও শরৎ চন্দ্র তাঁর উপন্যাসে ও গল্পে এই পার্থক্যটুকু কোন দিনই সজ্ঞানে বড় একটা লঙ্ঘন করতে চান নি। “শেষপ্রশ্নে” তিনি নরনারীর জীবনের অন্তহীন ব্যথা-বেদনার কথা ভুলেছেন, তাতে সমস্যাও আছে বিপুলভাবে, কিন্তু সমাধানের কোন প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত সেখানে নেই। সে কাজ যে অপরের তা তিনি চিরদিনই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছেন, আর সে মাত্রাবোধটুকু তাঁর সাহিত্যে রক্ষাও করেছেন যথেষ্ট†। সমাজকে আশ্রয়

করেই যখন মানুষের জীবন, তখন সমাজের ভাল-মন্দেও সঙ্গ শিল্পীরও যে কিছু-না-কিছু সংযোগ থাকবে তা তো স্বাভাবিক। সমাজের মঙ্গল-কামনাও সমাজ-সংস্কারকের মত শিল্পীরও অন্তরে থাকে, তবুও মোটের উপর ছ'জনের দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র। এক জনের দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ normative, আর এক জনের দৃষ্টিভঙ্গী Positive। এ কোন বিরোধ নয়, শুধু পার্থক্য। মোটের উপর এ কথা কোনমতেই অস্বীকার করবার জো নেই যে শিল্প স্রাজহীন বা আত্মস্বাতন্ত্র্যহীন।

শিল্পের স্রাজ বা স্বাতন্ত্র্য তবে কি বা কোথায়? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে শিল্পসৃষ্টির মূল রহস্যটুকু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধেভরা নিখিল জগৎ সব সময়ই আমাদের চেতনার দ্বারায় ক্রমাগত করে। তার সংস্পর্শে আমাদের মনে জাগে বিচিত্র আবেগের সাড়া। আমরা কখনও হাসি, কখনও কঁাদি, আবার কখনও বিষয়ে অভিভূত হই। বহির্জগতের নানা অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের মধ্যে আমরা সাধারণ মুহূর্তে জীবনযাপন করি অনেকটা “প্রবাসী”র মত। আমাদের “হৃদয়ের গবাক্ষগুলি সংখ্যায় অল্প, এবং বিস্তৃতিতেও সংকীর্ণ।” বিশ্বের চিরচঞ্চল প্রবাহের অনেক কিছুই আমাদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেয়। পৃথিবীর আহ্বানে আমাদের মন সাড়া দেয় বড় কম। শিল্পীর দৃষ্টি বিশাল ও চেতনা ব্যাপক। নিখিলের বিচিত্র স্রব, তার হাসি-শ্রু, বিষয়-বেদনা অধুরণিত হয়ে ওঠে তার বাঁশিতে। আমরা বহির্জগতের আমন্ত্রণে সাড়া দিই হৃদয়ের একটি অংশ থেকে, শিল্পী নাড়া দেয় সমস্ত অন্তর থেকে। আমাদের অল্পভূতি তাই ক্ষীণ ও দুর্বল; শিল্পীর উপলব্ধি সবল ও প্রাণের স্পর্শে উদ্দীপ্ত। এমন মুহূর্তে আমাদের জীবনে সুদূরলভ যখন সমস্ত সত্তা দিয়ে আমরা হৃদয়ের অল্পভূতিকে উপলব্ধি করি, কিন্তু শিল্পীর জীবনে এই অল্পপম মুহূর্ত গুলি আসে ঘন ঘন। আমরা উপলব্ধি করেও অল্পভূতিকে প্রকাশ করতে পারিনে, শিল্পীর প্রতিভাকে আশ্রয় করে সে পায় আনন্দময় প্রকাশ। আলোড়িত হৃদয়ের অল্পভূতি থেকেই সৃষ্ট হয় যাবতীয় উচ্চদের শিল্প। অবশ্য এ কথা সত্য নয় যে, কেবলমাত্র অল্পভূতির তীব্রতা থাকলেই শিল্পের জন্ম হবে। প্রকাশ ছাড়া শিল্প নেই। ‘নীরব কবি’ বা ‘mute Milton’

\* প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রণীত রবীন্দ্র-জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪৫।

† “আমার বইগুলির সঙ্গে যারা পরিচিত, তারাই জানে আমি কোন

দিন কোন স্থানেই নিজের ব্যক্তিগত অভিমত জোর করে কোথাও গুঁজে দেবার চেষ্টা করিনি। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি ব্যক্তি-বিশেষের জীবন-সমস্যায় আমি শুধু বেদনার বিবরণ, দুঃখের কাহিনী, অবিচারের মর্মান্তিক জ্বালার ইতিহাস, অভিজ্ঞতার পাতার উপরে পাতা কল্পনায় কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ করে গেছি—এইখানেই আমার সাহিত্য-রচনার সীমারেখা। জ্ঞানতঃ কোথাও একে লঙ্ঘন করতে আমি নিজেকে দিইনি, সেইজন্তেই লেখার মধ্যে আমার সমস্তা আছে, সমাধান নেই; প্রশ্ন আছে, তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এ আমার চিরদিনের বিশ্বাস যে সমাধানের দায়িত্ব কর্মীর, সাহিত্যিকের নয়”—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—“তরুণের বিদ্রোহ”, পৃ. ২-১।

শিল্প-জগৎ জানে না। এ হ'ল পরম্পরবিরোধী শব্দমাত্র। অস্কার ওয়াইল্ড টিকই লিখেছেন, "To the artist expression is the only mode under which he can conceive life at all. To him what is dumb is dead"\* অস্কার ওয়াইল্ডের এটুকুই এখানে মূল প্রতিপাদ্য যে, প্রকাশই হ'ল শিল্প। রবীন্দ্রনাথও "সাহিত্যের সামগ্রী" প্রবন্ধে এই মত সমর্থন করেছেন। তিনি লিখেছেন, "নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছাস, সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোন কোনও মহলে চলিত আছে। যে-কাঠ জলে নাই, তাহাকে আশ্বিন নাম দেওয়াও যেমন, যে-মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশের মতই নীরব হইয়া থাকে, তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ। প্রকাশই কবিত্ব, মনের তলার মধ্যে কি আছে বা না আছে, তাহা আলোচনা করিয়া বাহিরের লোকের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"†

হৃদয়ের অহুভূতি যে পর্যন্ত না শব্দে বা সুরে বা তুলিতে আত্মপ্রকাশ করে, সে পর্যন্ত শিল্পসৃষ্টি হয় না। তাই বলে আবার একথাও একেবারেই সত্য নয় যে, অহুভূতির প্রকাশ-মাত্রই শিল্প। রোক্তমান মাতার পুত্রশোকের যে বিলাপ-ধ্বনি, তার অহুভূতিও যেমন আন্তরিক, প্রকাশও তেমনই তীব্র, কিন্তু তবুও তো সে বস্তু শিল্পের পর্যায়ভুক্ত হয় না। বাস্তব ঘটনার নিছক প্রতিফলন বা ফটোগ্রাফ যেমন শিল্প বলে গ্রাহ্য হয় না, তেমনই অহুভূতির যাথার্থ্যটুকু অক্ষুণ্ণ রাখলেই প্রকাশটা শিল্পপদবাচ্য হয় না। প্রকৃতির বা সমাজের, ব্যক্তির বা সমষ্টির হুবহু প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করাতে ফটোগ্রাফি হতে পারে, কিন্তু ছবি হয় না। খবরের কাগজে দিনের পর দিন কত রোমহর্ষণ নির্ভূর সত্য প্রকাশিত হয় কিন্তু সে কি শিল্প বা সাহিত্য? এ প্রশ্নের উত্তর শরৎ চন্দ্র অতি চমৎকার ভাবে "সাহিত্যের রীতি ও নীতি" প্রবন্ধে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন : "সাহিত্য-সৃষ্টি অমুকরণের মধ্যে নাই। ভালরও না, মন্দেরও না। হৃদয়ের সত্যকার অহুভূতি আনন্দ ও বেদনার আলোড়নে অলঙ্কৃত বাক্যে বিকশিত হইয়া না উঠিলে সে সাহিত্যপদবাচ্য হয় না। বুদ্ধ কবির গীতাঞ্জলিও যত বড় কাব্যগ্রন্থ তাঁহার 'যৌবনের চিত্রাঙ্গদা'ও ঠিক তত বড়ই কাব্যসৃষ্টি, লাঞ্ছনার আঘাত ও গৌরবের মালা যেমন করিয়াই তাহার শিরে বর্ষিত হউক না। অথচ অহুভূতিহীন বাক্য যত অলঙ্কৃতই হউক ব্যর্থ। পতিতার অমুকরণও ব্যর্থ, গীতাঞ্জলির অমুকরণও ঠিক ততখানিই ব্যর্থ। দেশের সাহিত্যসম্পদ ইহাতে কণামাত্রও বর্ধিত হয় না"‡ শরৎ চন্দ্র এখানে এটুকুই বলতে চেয়েছেন যে, অমুকরণের

মধ্যে শিল্প নেই। শিল্প মাত্রই নূতন সৃষ্টি। এই সৃষ্টির জন্ম বাস্তব ঘটনা উপলক্ষ্য বা উপাদান মাত্র। রসোদ্বোধনই এর প্রাণ। প্রাণের গভীরতা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়ে মনের আবেগগুলি রসধন মূর্তি গ্রহণ করে। এতে যতি আছে, ছন্দ আছে। যতি আনে গতির ভেতর প্রয়োজন-মত বিরাম। ছন্দ দেয় ভাবকে অর্থের বন্ধন থেকে মুক্তি। এতে বাস্তব-অবাস্তবের সংমিশ্রণ আছে, ঘটনাপরম্পরার বিচ্যাসও আছে, কিন্তু সবকিছুর পশ্চাতে সক্রিয় রয়েছে শিল্পীর স্বজনীশক্তি। এই স্বজনীশক্তির উপরেই চরম-বিশ্লেষণে শিল্পের ঐশ্বর্য নির্ভরশীল। বাস্তব ঘটনা মানসলোকে সাড়া বা চাকল্য জাগাতে পারে, কিন্তু তাকে আশ্রয় করে অবস্থা, ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি করতে না পারলে, কোন প্রকাশ—যতই অলঙ্কৃত হোক না,—কখনও শিল্পের গোত্রান্তর্গত হয় না। বাস্তব ঘটনা ও সমাজের আবেষ্টনী থেকে শিল্পী প্রাণরস,—আনন্দ, বেদনা ও বিষম—গ্রহণ করে সত্য, তবে ছবছ প্রকাশ করার নাম শিল্প নয়। শিল্প অমুকরণের সামগ্রী নয়, এ বস্তু সৃষ্টি। মানুষের স্বজনীশক্তিকে বাস্তব ঘটনার দ্বারা পুরাপুরি বিশ্লেষণের প্রয়াস যতখানি ব্যর্থ, শিল্পের সামাজিক ব্যাখ্যাও ঠিক ততখানিই ব্যর্থ। মাটির রস না পেলে গাছ জন্মায় না সত্য, কিন্তু তাই বলে একথা আদৌ সত্য নয় যে, মাটির রস পেলেই বীজ মহীকর্মে বিকশিত হবে। বীজের মধ্যে থাকা চাই প্রাণ, আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা। এ বস্তুর অভাব থাকলে মাটি, আলো, বাতাস, জলের সকল উপাদানই হবে ব্যর্থ। শিল্প-সৃষ্টি সম্বন্ধেও এ কথাই প্রযোজ্য। মাটি থাকলেই যেমন বীজ গাছ হয়ে ওঠে না, তেমনি বাস্তব ঘটনার সংস্পর্শ থাকলেই শিল্প-সৃষ্টি হয় না। আবেষ্টনীর বিশ্লেষণ আর সেই আবেষ্টনীতে জাত বা সৃষ্ট ঐশ্বর্যগুলির জীবন-রহস্য-উদ্ঘাটন এক বস্তু নয়। দ্বিতীয়টির মর্মকথা বা স্বরূপ উদ্ঘাটনের পথে প্রথমটি সহায়ক হলেও যথেষ্ট নয়। মানুষের স্বজনীশক্তিকে এক মাত্র বহিজগতের ঘটনাপরম্পরা দিয়ে বিশ্লেষণের প্রয়াস একান্ত ভাবেই ব্যর্থ। সমাজকে অবলম্বন করে মানুষের মন ও তার স্বজনীশক্তি বিকশিত হলেও তার জয়যাত্রার সবটুকুই সামাজিক আবেষ্টনীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।\* মানুষের সৃষ্টিধর্মী মনই শিল্প ও সাহিত্যের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি বা উপাদান ('determining factor')।† মানুষের স্বজনীশক্তির যেমন একটা স্বাভাব্য আছে, তেমনি তার সৃষ্ট শিল্পেরও এক ধরণের স্বরাজ রয়েছে। অনেকে বলবেন, এ স্বরাজ আপেক্ষিক। আমরা বলব, চিরচঞ্চল জগতে তো সবকিছুই আপেক্ষিক। আপেক্ষিক হয়েও শিল্প স্বরাজপন্থী,—একথা অনস্বীকার্য সত্য।

\* De Profundis, p. 88

† সাহিত্য, পৃ. ১১

‡ স্বদেশ ও সাহিত্য, পৃ. ১০৭

\* লেখকের "ঐতিহাসিক আলোচনায় নূতন দৃষ্টি" (প্রবাসী, আধুনিক ১৩৫৩) প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

† S. Radhakrishnan : An Idealist View of (London, 1932, p. 183-).

# ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

১৮৬৩—১৯২৭

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

**বংশ-পরিচয় ; জন্ম :** ১২৬৯ সালের বিহুব-সংক্রান্তির দিন\* (১২ এপ্রিল ১৮৬৩) ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—গুরুচরণ ভট্টাচার্য্য শিরোমণি। ইঁহার খড়দহের বিখ্যাত গুরুবংশ ; উপাধি—বন্দ্যোপাধ্যায়।

**শিক্ষা :** ১৮৮১ সনে ক্ষীরোদপ্রসাদ বারাকপুর গবর্নেন্ট স্কুল হইতে এনট্রাল পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষাদানকালে তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর ছিল—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে ইঁহার উল্লেখ আছে। ১৮৮৩ সনে তিনি জেনারেল এসেমব্লীজ ইন্সটিটিউশন হইতে এফ. এ. পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৮৮ সনে ক্ষীরোদপ্রসাদ মেট্রোপলিটান কলেজ হইতে বি.এ. পরীক্ষা দিয়া পদার্থ ও রসায়ন-বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীতে, এবং পর-বৎসর (ইং ১৮৮৯) প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম. এ. পরীক্ষা দিয়া রসায়ন-বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

**অধ্যাপনা :** বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ জেনারেল এসেমব্লীজ ইন্সটিটিউশনে রসায়ন-বিভাগ (Physical Science and Chemistry-র) অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্যকাল ১৮৯২-১৯০৩ সন। অতঃপর তাঁহার জীবনের গতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়।

**সাহিত্য-ব্রত :** পঠদশা হইতেই বাংলা-সাহিত্যের প্রতি ক্ষীরোদপ্রসাদের অহুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় ; বি. এ. পরীক্ষাদানের তিন বৎসর পূর্বে (ইং ১৮৮৫) তিনি “রাজ-নৈতিক সম্রাসী” নামে একটি আখ্যায়িকা বংশঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি বাংলা নাট্য-সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁহার প্রথম নাট্যগ্রন্থ ‘ফুলশয্যা’ (মে ১৮৯৪) এমারেন্ড থিয়েটারে অভিনীত হয়। ‘জন্মভূমি’ লিখিয়াছিলেন, “এরূপ উচ্চ কবিত্বপূর্ণ বাঙ্গলা-নাটকের অভিনয় জাতীয় রঙ্গমঞ্চে অনেক দিন হয় নাই।” শেষ-পর্যন্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ কলেজের অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্য-সেবা—বিশেষতঃ নাট্য-সাহিত্যের চর্চায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত নাট্যগ্রন্থ—‘আলিবাবা,’ ‘প্রতাপ-আদিত্য,’ ‘চাঁদবিবি,’ ‘কিন্নরী,’ ‘নর-নারায়ণ’ প্রভৃতি বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতে সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়া অগণিত নর-নারীর আনন্দ বর্ধন করিয়াছে।

\* “বাঙ্গলা ভাষার লেখক” : ‘জন্মভূমি,’ আষাঢ় ১৩০৩, পৃ. ২১৩।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞানে বি. এ.—এম. এ. পাস এবং বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিলেও তাঁহার অজুত কাব্যাহুরাগ ছিল। রচনার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা ১৩১১ সালের ‘জাহ্নবী’ হইতে তাঁহার “দধীচির অস্থিদান” কবিতাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

( ১ )

পার হ'য়ে গেল স্বর্ঘ্য পশ্চিম আকাশ,  
জাহ্নবী কাঁদিল যুদ্ধস্বরে ;  
ভাঙ্গে ব্রত, যুদ্ধ ঋষি হইল নিরাশ—  
অতিথি এল না বুঝি ঘরে।

( ২ )

একটি মেঘের শিশু প্রশান্ত সাগরে  
মাথা তুলি স্থিরনেত্রে চায়,  
“এ দরিত্রে ঋষিরাজ দেখ দয়া করে  
ক্ষুধানলে বুক জ্বলে যায়।”

( ৩ )

“আর বাপ কি চাহিবি, তোরে দিব দান,”  
ডাকে ঋষি বাহু প্রসারিয়া ;  
বেদমন্ত্রে করে তার আবাহন গান  
ধ্যানে বসে নয়ন মুদ্রিয়া।

( ৪ )

পলকে প্রলয় এল যুগ এল পলে।  
কে কাঁদে রে সক্রমণ স্বরে ?  
“হান দাও হে ব্রাহ্মণ চরণকমলে  
অতিথি দাঁড়ায়ে তব ঘরে।”

( ৫ )

চেয়ে দেখে ঋষিরাজ অস্থিচর্ম্মসার  
উপবাসী মূর্ত্তি তপস্তার—  
কে অতিথি নতজাহ্নু দেবতা আকার  
সহস্র লোচনে বহে ধার ?

( ৬ )

“অম্বরের পদভরে কাঁপে জন্মভূমি  
পলায়িত দেবতাবাহিনী।  
ভিক্ষা আশে তব ঘরে আসিয়াছি আমি  
ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও মুনি।”

( ৭ )

“হে পুণ্য অতিথি এস, পাতহ অঞ্জলি  
ব্রত আজ করি উদযাপন।



বুক ছি'ড়ি হে ভিধারী লহ অস্থি তুলি  
ক্ষুধা তৃষ্ণা কর নিবারণ।"

( ৮ )

ক্ষুদ্র সে জলদশিষ্ঠ হইল বিপুল  
গগনে ছুটিয়া গেল ঝড় ;  
নিমেঘে দানবশক্তি হইল নিম্নল  
আকাশ করিল কড় কড়।

( ৯ )

ক্ষীর নীর মাতৃবক্ষে ঢালে জলধর,  
জননীর তৃষ্ণা গেল দূরে ;  
দধীচির জয়গান গাহিল অমর  
এ কি ভিক্ষা দিলে জননীরে।

কথাশিল্পী হিসাবেও ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া-  
ছিলেন। কিন্তু নাট্যকার বলিয়াই তিনি দেশবাসীর নিকট  
সামগ্রিক প্রসিদ্ধ।

**গ্রন্থাবলী :** অল্পাঙ্ককর্মী ক্ষীরোদপ্রসাদের সাহিত্য-  
সাধনা বিপুল এবং বহুধাবিস্তৃত। আমরা তাঁহার গ্রন্থাবলীর  
একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। তালিকায় বন্ধনী-  
মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত  
মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত :—

১। রাজনৈতিক সন্ন্যাসী (গল্প) :

১ম খণ্ড। (১ জুন ১৮৮৫)। পৃ. ৩২

২য় খণ্ড। (১৫ জুলাই ১৮৮৫)। পৃ. ৩২।

২। ফুল-শয্যা (দৃশ্যকাব্য)। ইং ১৮৯৪ (২ মে)।  
পৃ. ১৮৯।

৩। প্রেমাজুলি (পৌরাণিক নাটক)। ইং ১৮৯৬ (১৮  
জুলাই)। পৃ. ১৫৭

৪। কবি-কাননিকা (রঙ্গনাট্য)। ১৩০৩ সাল (ইং  
১৮৯৬)। পৃ. ১৯৬

৫। জালিবাঁবা (রঙ্গনাট্য)। ১৩০৪ সাল (ইং ১৮৯৭)।  
পৃ. ১১০

৬। প্রমোদরঞ্জন (রঙ্গনাট্য)। ১৩০৫ সাল (১২  
অক্টোবর ১৮৯৮)। পৃ. ১০২

৭। কুমারী (নাট্যকাব্য)। ১৩০৫ সাল (ইং ১৮৯৯)।  
পৃ. ৮০

৮। জুলিয়া (গীতিনাট্য)। ১৩০৬ সাল (২৪ জাম্বয়ারি  
১৯০০)। পৃ. ১৫২

৯। বক্রবাহন (নাট্যকাব্য)। ১৩০৬ সাল (২৫ ফেব্রুয়ারি  
১৯০০)। পৃ. ১১৯

১০। ক্রীমদত্তগবদলীতা। (২৪ এপ্রিল ১৯০০)। পৃ. ৯২

১১। সাবিজী (পৌরাণিক নাটক)। ১৩০৯ সাল (৪  
অক্টোবর ১৯০২)। পৃ. ১৩৪

১২। সপ্তম প্রতিমা (নাটক)। ১৩০৯ সাল (১৩ ডিসেম্বর  
১৯০২)। পৃ. ১৫১

১৩। বেদোরা (গীতিনাট্য)। ইং ১৯০৩ (১৩ জাম্বয়ারি)।  
পৃ. ১৪০

১৪। বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য (ঐতিহাসিক নাটক)।  
ভাদ্র ১৩১০ (২৯ আগষ্ট ১৯০৩)। পৃ. ১৪০

১৫। রঘুবীর (নাটক)। ১৩১০ সাল (১৮ ডিসেম্বর  
১৯০৩)। পৃ. ১৭৪

১৬। বন্দাবন-বিলাস (গীতিনাট্য)। ২২ পৌষ ১৩১০  
(৩১ জাম্বয়ারি ১৯০৪)। পৃ. ৮৪

১৭। রঞ্জাবতী (নাটক)। ১৩১১ সাল (৪ অক্টোবর  
১৯০৪)। পৃ. ১৮৬

১৮। নারায়ণী (উপন্যাস)। অগ্রহায়ণ ১৩১১ (ইং ১৯০৪)।  
পৃ. ৩৪৬

১৯। উলুপী (নাটক)। ১৩১৩ সাল (১৫ জুলাই ১৯০৬)।  
পৃ. ১৪০

২০। পদ্মিনী (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৩ সাল (১৫  
নবেম্বর ১৯০৬)। পৃ. ২০১+১

২১। পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৩  
সাল (৫ জাম্বয়ারি ১৯০৭)। পৃ. ২১৭

২২। রক্ষা ও রমণী (নাটক)। ১৩১৩ সাল (১০ জাম্বয়ারি  
১৯০৭)। পৃ. ৭৮

২৩। চাঁদবিবি (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (২৪ আগষ্ট  
১৯০৭)। পৃ. ১৮৮

২৪। নন্দকুমার (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৪ সাল (১  
ফেব্রুয়ারি ১৯০৮)। পৃ. ১৭৬

২৫। দাদা ও দিদি (রঙ্গনাট্য)। ১৩১৪ সাল (৮ ফেব্রুয়ারি  
১৯০৮)। পৃ. ৫৫

২৬। অশোক (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (২৫ জুন ১৯০৮)।  
পৃ. ১৬৪

২৭। বাসন্তী (গীতিনাট্য)। ১৩১৫ সাল (৫ জুলাই  
১৯০৮)। পৃ. ৪৮

২৮। বরণা (গীতিনাট্য)। ১৩১৫ সাল (১০ জুলাই  
১৯০৮)। পৃ. ১২৭

২৯। ভুতের বেগার (রঙ্গনাট্য)। ১০ পৌষ ১৩১৫ (২৮  
ডিসেম্বর ১৯০৮)। পৃ. ৫৫

৩০। দৌলতে ছনিয়া (নাটক)। ১৩১৫ সাল (১৫  
জাম্বয়ারি ১৯০৯)। পৃ. ১৩৫

৩১। বিরামকুঞ্জ (গল্প-সংগ্রহ)। ? (২০ আগষ্ট ১৯০৯)।  
পৃ. ১২৬

অতীঃ—কর্মফল, নিক্রাসিত, চিত্রদর্শন, "পো'দাদা," প্রায়শ্চিত্ত।

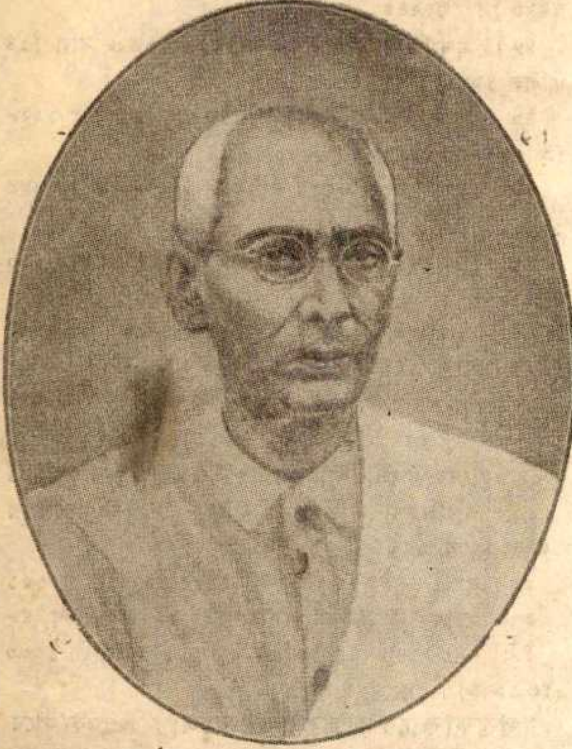
- ৩২। দুর্গা (পৌরাণিক আখ্যান)। ১৫ আশ্বিন ১৩১৬ (৯ অক্টোবর ১৯০৯)। পৃ. ১২৮
- ৩৩। বাঙ্গালার মসনদ (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৭ সাল (১৬ জুলাই ১৯১০)। পৃ. ১৫২
- ৩৪। গলিন (গীতিনাট্য)। ১৩১৭ সাল (২ মার্চ ১৯১১)। পৃ. ১০৭
- ৩৫। মিডিয়া (কল্পনামূলক নাটক)। ১৩১৯ সাল (১৪ জুলাই ১৯১২)। পৃ. ১১৭
- ৩৬। ঝাঁকাহান (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৯ সাল (২৫ জুলাই ১৯১২)। পৃ. ১৪০
- ৩৭। পুনরাগমন (সামাজিক উপজ্ঞাস)। ১৩১৯ সাল (৮ অক্টোবর ১৯১২)। পৃ. ৩৫৫
- ৩৮। ভীষ্ম (পৌরাণিক নাটক)। ১৩২০ সাল (১৫ জুন ১৯১৩)। পৃ. ২৩২
- ৩৯। রূপের ডালি (রঙ্গনাট্য)। ? (২৩ অক্টোবর ১৯১৩)। পৃ. ১৩১
- ৪০। নিয়তি (নাটিকা)। ১৩২০ সাল (৯ এপ্রিল ১৯১৪)। পৃ. ১১৫
- ৪১। আত্মবিষয় (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩২১ সাল (২০ জানুয়ারি ১৯১৫)। পৃ. ১৭১
- ৪২। বাদশাজাদী (কল্পনামূলক নাটক)। ১৩২২ সাল (৩১ ডিসেম্বর ১৯১৫)। পৃ. ১৫৬
- ৪৩। রামায়ণ (কল্পনামূলক নাটক)। ১৩২৩ সাল (৩০ জুলাই ১৯১৬)। পৃ. ২০৮
- ৪৪। বঙ্গ রাষ্ট্রের (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৭)। পৃ. ১৮৮
- ৪৫। কিশোরী (গীতি-নাট্য)। ? (১৭ আগষ্ট ১৯১৮)। পৃ. ১৩৯

- ৪৬। নিবেদিতা (উপজ্ঞাস)। ১১ মাঘ ১৩২৫ (৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯)। পৃ. ৪০১
- ৪৭। শুভামুখ (উপজ্ঞাস)। পৌষ ১৩২৬ (১২ জানুয়ারি ১৯২০)। পৃ. ২৪৬
- ৪৮। মন্দাকিনী (পৌরাণিক নাটক)। ১৩২৮ সাল (১৪ এপ্রিল ১৯২১)। পৃ. ১০০
- ৪৯। আলমগীর (ঐতিহাসিক নাটক)। অগ্রহায়ণ ১৩২৮ (৯ ডিসেম্বর ১৯২১)। পৃ. ২৬০
- ৫০। রত্নেশ্বরের মন্দিরে (নাটক)। ? (২৮ ডিসেম্বর ১৯২২)। পৃ. ১১২
- ৫১। বিদ্রূপ (ঐতিহাসিক নাটক)। ফাল্গুন ১৩২৯ (১০ মার্চ ১৯২৩)। পৃ. ১৫৭
- ৫২। শুভামুখ (উপজ্ঞাস)। শ্রাবণ ১৩৩০ (২৯ জুলাই ১৯২৩)। পৃ. ১০৯
- ৫৩। পতিতার সিদ্ধি (উপজ্ঞাস)। মাঘ ১৩৩০ (২০ মার্চ ১৯২৪)। পৃ. ৩২২
- ৫৪। চাঁদের আলো (উপজ্ঞাস)। ? (ইং ১৯২৪ ?)। পৃ. ১৯১
- ৫৫। গোলকুণ্ডা (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৫)। পৃ. ১৫৬
- ৫৬। জয়ন্তী (নাটক)। ? (২০ ডিসেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ১৫১
- ৫৭। রাধা-কৃষ্ণ (গীতিনাট্য)। ? (ইং ১৯২৬ ?)। পৃ. ৪৮
- ৫৮। নর-নারায়ণ (পৌরাণিক নাটক)। অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ (ইং ১৯২৬)। পৃ. ২০১

**পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা :** পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত ক্ষীরোদপ্রসাদের অনেক রচনা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এগুলি সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই শ্রেণীর কয়েকটি রচনার নির্দেশ দিতেছি :—

|        |               |     |                                |     |                            |
|--------|---------------|-----|--------------------------------|-----|----------------------------|
| ১৩০০ : | ১ম-৩য় সংখ্যা | ... | ‘চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান ও সমীরণ’ | ... | ইংলেণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্লব     |
| ১৩০১ : | শ্রাবণ        | ... | ‘জন্মভূমি’                     | ... | মিনতি (কবিতা)              |
|        | ভাদ্র         | ... | “                              | ... | জন্মভূমি (কবিতা)           |
| ১৩০২ : | বৈশাখ-আষাঢ়   | ... | ‘চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান ও সমীরণ’ | ... | শব্দ সংবাদ                 |
|        | ভাদ্র         | ... | ‘জন্মভূমি’                     | ... | নাটক                       |
| ১৩১১ : | কার্তিক       | ... | ‘জাহ্নবী’                      | ... | দধীচির অধিদান (কবিতা)      |
| ১৩১২ : | আশ্বিন        | ... | ‘ভারতী’                        | ... | নির্বাসিত (গল্প)           |
| ১৩১৩ : | বৈশাখ-ফাল্গুন | ... | “                              | ... | শিরী-ফরীদ (নাটিকা)         |
| ১৩১৪ : | আশ্বিন        | ... | ‘ছাত্র-সখা’                    | ... | উৎকলের গল্প                |
| ১৩১৫ : | জ্যৈষ্ঠ       | ... | ‘জাহ্নবী’                      | ... | মিলন (কবিতা)               |
| ১৩১৭ : | শ্রাবণ        | ... | ‘নাট্য-মন্দির’                 | ... | রঙ্গালয়ের উন্নতি ও অবনতি  |
| ১৩২০ : | কার্তিক       | ... | ‘ভারতবর্ষ’                     | ... | আমি ও তুমি (কবিতা)         |
| ১৩২২ : | আশ্বিন        | ... | ‘মাসিক বসুমতী’                 | ... | নিশীথের কথা—জামাপাখী (বধূ) |
| ১৩৩২ : | শারদীয়া      | ... | ‘বার্ষিক বসুমতী’               | ... | শক্তিপূজা (কবিতা)          |
| ১৩৩৩ : | “             | ... | “                              | ... | এক রাজি (উপজ্ঞাস)          |
| ১৩৩৪ : | “             | ... | “                              | ... | ফুলী (গল্প)                |
|        | শ্রাবণ-ভাদ্র  | ... | ‘উদ্বোধন’                      | ... | অভিরামের গীতি (কবিতা)      |

**মাসিকপত্র সম্পাদন :** ক্ষীরোদপ্রসাদ ১৩১৬ সালের বৈশাখ মাস হইতে 'অলৌকিক রহস্য' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার অনেক রচনা



ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ

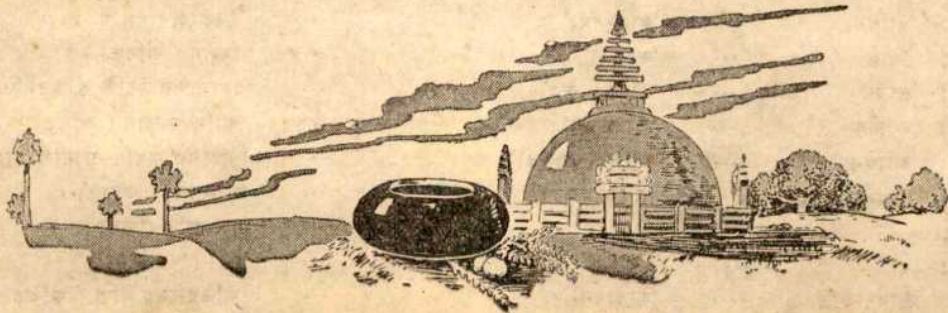
স্থান পাইয়াছিল। পত্রিকাখানি অনিয়মিত ভাবে ছয় বৎসর চলিয়াছিল। আমরা ইহার ৬ষ্ঠ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা (ভাদ্র ১৩২২) পর্য্যন্ত দেখিয়াছি।

**বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবা :** পরিষদের জন্মাবধি ক্ষীরোদপ্রসাদ ইহার সভ্য ছিলেন। ১৩১১-১২ সালে তিনি কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে এই প্রতিষ্ঠানের কার্য-পরিচালনায় সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। পরিষদের কোন কোন মাসিক অধিবেশনে তিনি প্রবন্ধাদিও পাঠ করিয়াছেন। রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৩০২

সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের মাসিক অধিবেশনে তাঁহার লিখিত "নাটকের ইতিবৃত্ত" প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল; ইহা পরবর্তী ভাদ্র মাসের 'জগদ্ধর্ম'তে প্রকাশিত হয়। ১৩২৫ ও ১৩৩০ সালে পরিষৎ তাঁহাকে অগ্রতম সহকারী সভাপতি পদে বরণ করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

**মৃত্যু :** ক্ষীরোদপ্রসাদ শেষ-জীবনে বাঁকুড়া সহরের সন্নিকটে বিক্কা গ্রামে গৃহনির্মাণ করিয়া তথায় মধ্যে মধ্যে নির্জন-বাস করিতেন। মৃত্যুর অল্প দিন পূর্বে অসুস্থ শরীর লইয়া তিনি বাঁকুড়ার পল্লী-কুটীরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় ১৯২৭ সনের ৪ঠা জুলাই (১৩৩৪, ১৮ আষাঢ়, রাত্রি ১১টা), ৫৫ বৎসর বয়সে, তাঁহার দেহান্তর ঘটয়াছে।

**ক্ষীরোদপ্রসাদ ও বাংলা-সাহিত্য :** ক্ষীরোদপ্রসাদ রসায়ন-বিজ্ঞানের ছাত্র এবং অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের সেবা তাঁহার ভাল লাগে নাই, তিনি সাহিত্যকেই মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, একটি মকদ্দমায় এজেঙ্কার দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, আমি ইংরেজী জানি না; এক সময় শিখিয়াছিলাম বটে কিন্তু অব্যবহারে তুলিয়া গিয়াছি। বস্তুতঃ তিনি যেভাবে বঙ্গ-ভারতীর সেবায় আয়নিয়োগ করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার অভ্যুজ্জি না হইতেও পারে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ক্ষীরোদপ্রসাদ বহু ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক নাটকের সাহায্যে বাংলাদেশের রসিক সমাজকে শুধু নয়, জনসাধারণকেও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের তিনিই রচয়িতা। তাঁহার শেষ রচনা 'নরনারায়ণ' নাটক সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে বিশিষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছে; ইহা বাংলা কাব্যসাহিত্যের গৌরবরূপে আজিও গণ্য হয়। তাঁহার অপূর্ণ কীর্তি 'আলিবা' রঙ্গনাট্য। তিনি যদি আর কিছু না রচনা করিতেন, এই রঙ্গনাট্যটিই তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখিত। 'আলিবা' চিরনৃতন ও চির-আনন্দদায়ক হইয়া আজিও এই শ্রেণীর নাট্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ স্থানে বিরাজ করিতেছে। গল্প-রচনাতেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল; তাঁহার 'নারায়ণী' ও 'গুহামধ্যে' উপভাস-রসিকদেরও যথেষ্ট আনন্দ দিয়াছিল।





# মস্কো আর্ট গ্যালারী

শ্রীরঞ্জিত সিংহ

সোভিয়েটের চিত্রকলা আজ এক নব-অরুণোদয়ের উজ্জ্বলতায় মহীয়ান। পুরাতনকে মুছে ফেলে সোভিয়েট আজ নবীনকে গ্রহণ করেছে। কি চিত্রশিল্পে, কি ভাস্কর্যে, কি কারুকার্যে, চার ও কার শিল্পের নানা ক্ষেত্রেই সোভিয়েট শিল্পীরা যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সোভিয়েটের মাটিতে এ প্রতিভার উন্মেষ হতে পেরেছে শুধু এইজন্ম যে সে দেশের শিল্পীরা গজদন্ত-প্রাসাদের অগ্রচূড়ায় বসে চিত্রাঙ্কন করেন নি— জনাকীর্ণ পারিপার্শ্বিক সমুদ্রে উদাসীন হয়ে আপনভোলা শিল্পী সেজে বসে থাকেন নি। সোভিয়েট শিল্পীদের নিজস্ব একটি ঐতিহ্য আছে—দেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে যে ঐতিহ্যের যোগ অবিস্মৃত। অথচ তাঁরা গতানুগতিকতায় আবদ্ধ নন—তাঁদের শিল্পীমন একই ধারায় অস্থবধিত নয়। সোভিয়েট শিল্পের বিভিন্ন ধারা আছে এবং তার এই বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের কারণ সোভিয়েট শিল্পের সঙ্গে মানুষের জীবনের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। সোভিয়েট শিল্পীরা প্রকৃতই জীবনশিল্পী।

এই বিষয়ে কিছুদিন আগে সোভিয়েটের একটি পত্রিকায় (Znamya) একজন লেখক লিখেছিলেন যে, আর্টিষ্ট কখনোই জীবনের কোন একটি বিশেষ গভীর ভেতর আবদ্ধ থাকতে পারে না। সে হবে মুক্তপক্ষ শিল্পী, কারণ জীবন একই কেন্দ্রে আবদ্ধ নয়—তার নব নব বিচিত্র ধারা আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, হুতরাং শিল্পের উদ্দেশ্য অথবা শিল্পীর সৃষ্টিকে কোন নির্দিষ্ট ছকের ভেতর টেনে আনা যায় না। উক্ত লেখক বলেছেন :

"Art is many sided, and both Mayakorsky with his voluntary participation in the world's social destiny and Pasternak with his thrush-like flute are necessary to it."

যে সমাজে চাষী-মজুর বাস করে শিল্পীরাও সেই সমাজের মানুষ। সোভিয়েটের শিল্প সমাজবিচ্ছিন্ন নয়, জনসাধারণের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বর্তমান। তাই তার চিত্রশিল্পে, ভাস্কর্যে, চারুশিল্পে সেই জনগণের জগতের উত্তাপ অনুভব করা যায়।

সম্প্রতি মস্কো আর্ট গ্যালারীতে যে চিত্র-প্রদর্শনী অহুষ্ঠিত হ'ল তার ছবি ও মূর্তিগুলি সোভিয়েট-শিল্পের এই আদর্শের কথাই মনে করিয়ে দেয়। প্রদর্শনীটি পৃথিবীর চিত্রশিল্পের ইতিহাসে একটি অরুণীয় ঘটনা বলে সোভিয়েট শিল্পীরা মনে করেন। উক্ত প্রদর্শনীর নাম ছিল "অল ইউনিয়ন এগজিবিশন অব পেট্টিংস স্কালপ চারস এণ্ড গ্রাফিক আর্ট"। এই প্রদর্শনীতে সোভিয়েটের সকল সুখ্যাত শিল্পীদের ছবি ও মূর্তি ইত্যাদির

সমাবেশ হয়েছিল। বীদের ছবি ও মূর্তি মস্কো আর্ট গ্যালারীর শোভাবর্দ্ধন করেছিল তাঁদের ভেতর Sergei Ierasimov, Yuri Pimenor, Vladimir Farorstoy, Ergeni Kibrik, Nikolai Tyrsa, Anna Ostroumova-cebdera



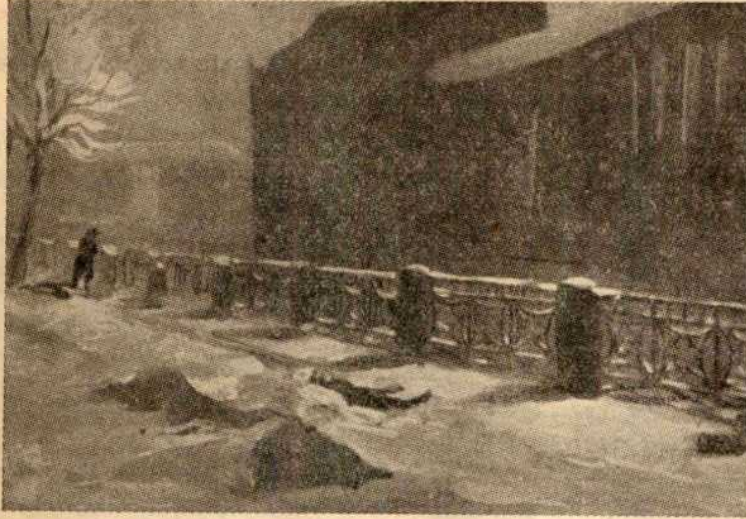
যুদ্ধকালীন সোভিয়েট কারখানায় কর্মরত একটি শ্রমিকের ছাত্র

প্রকৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রদর্শনীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস ছিল লোকশিল্পের ছবি-গুলি। বিভিন্ন রকমের চিত্রাঙ্কন কারুশিল্প, পটচিত্র ও তৈলচিত্র প্রকৃতি নানা বর্ণবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ চিত্রাবলী দেখে দর্শকগণ বিস্ময়বিমুদ হয়েছিল—সমগ্র সোভিয়েটে এই প্রদর্শনী বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করে।



মস্কো আর্ট গ্যালারীর আর একটি জিনিস বিশেষভাবে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সোভিয়েট যুদ্ধচিত্র যে

আর একটি বড় দিক আছে। এই সব গ্যালারীর ছবির ভেতর দিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে শিল্পীদের পরিচয় হয় এবং সেই সঙ্গে



১৯৪২ সালের শীতের লেনিনগ্রাড

সাধারণ চাষী-মজুর থেকে শুরু করে সৈনিক পর্যন্ত সকলের মনেই শিল্পাভি-রাগ জন্মাবার সুযোগ উপস্থিত হয়। মূল্য তার কম নয়। দেশের শিল্পের সঙ্গে যদি জনসাধারণের কোন যোগ না থাকে তা হলে সে শিল্পের সার্থকতা কতটুকু এ প্রশ্ন আজ অনেকের মনে জেগেছে।

রবীন্দ্রনাথের ‘রাশিয়ার চিঠি’তে এই আর্ট গ্যালারীর উল্লেখ আছে। সেখানে গিয়ে কবির মনে জেগেছিল বিগ্নয় এবং ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পের ব্যাপক প্রসার না হওয়ায় তিনি যে বেদনা অনুভব করেছিলেন সেটা তাঁর চিঠি পড়লেই বোঝা যায় :

“মস্কো শহরে ট্রেটিয়াকভ গ্যালারি নামে এক বিখ্যাত চিত্রভাণ্ডার আছে। সেখানে ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত

পৃথিবীর যে-কোন দেশের যুদ্ধচিত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার অব্যবহিত পরেই মস্কোর State Tretyakov Art Gallery-তে একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। তার নাম “Heroic Front and Rear”। উক্ত প্রদর্শনীতে যেসব যুদ্ধচিত্র ছিল তার ভেতর দিয়ে সোভিয়েটের সমগ্র যুদ্ধ-জীবনটি ফুটে উঠেছিল। লেনিনগ্রাড অব-রোধ থেকে শুরু করে জার্মান সৈনিকদের অত্যাচার ও দীর্ঘদিনের যুদ্ধকাহিনী সোভিয়েট শিল্পীরা এঁকেছিলেন সেই সব ছবিতে। তা ছাড়া বিপ্লবের ছবি ও জারের সময়কার বিভিন্ন ধরনের ছবিও ছিল। যুদ্ধচিত্রগুলির ভেতর নিম্নলিখিত কয়েকটি ছবির নাম বিশেষভাবে করা যেতে পারে—“১৯৪২ সালের লেনিনগ্রাড” “যুদ্ধ-রত কিশোর”, “১৯৪৩ সালের আক্রমণ”, “লেনিনগ্রাডের রাজপথ” ও “যুক্তি”।



মস্কোর এই ট্রেটিয়াকভ গ্যালারী সোভিয়েটের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র-শালা বলে প্রমাণিত হয়েছে। দেশের সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় এতে একত্র পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় এর

এক বৎসরের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ লোক ছবি দেখতে এসেছে। যত দর্শক আসতে চায় তাদের ধরানো শক্ত হয়ে উঠেছে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট শাসন প্রবর্তিত হবার পূর্বে যেসব দর্শক এই রকম গ্যালারিতে আসত তারা ধনী মানী জ্ঞানী দলের লোক এবং তারা যাদের এরা বলে bourgeoisie

বিজয়ী জার আইভানের শিডোনিয়ার প্রবেশ

অর্থাৎ পরশ্রমজীবী। এখন আসে অসংখ্য পরশ্রমজীবীর দল, যথা—রাজমিগ্রি, লোহার, মুদি, দাঁজি ইত্যাদি। আর



আসে সোভিয়েট সৈনিক, সেনানায়ক, ছাত্র ও চাষী সম্প্রদায়।'

এই বর্ণনা থেকেই বুঝতে পারা যায় সোভিয়েটের জন-সাধারণের সঙ্গে চিত্রকলার কি গভীর সংযোগ। সোভিয়েট রাষ্ট্র এক দিকে যেমন কৃষি ও যন্ত্রশিল্পের উন্নতিসাধন করে চলেছে, অন্য দিকে তেমনি প্রত্যেকটি মানুষের মনে জাগিয়ে তুলেছে সৌন্দর্য-পিপাসা। শুধু হাতুড়ি ও কান্ডোঁটাই জীবনে সবচেয়ে বড় জিনিস নয়, নিছক বেঁচে থাকার জীবনের চরম সার্থকতা নয়, এই পরম সত্য সোভিয়েট স্বীকার করে নিয়েছে। তাই দেখতে পাই, সোভিয়েটে চিত্রশিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি আশ্চর্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। সেটা সম্ভব হয়েছে, সোভিয়েটে শিল্পের প্রসার আছে বলে, সেখানকার প্রতিটি লোক দেশের শিল্প-সংস্কৃতিকে ভালবাসে বলে। তারাই এখন আর্টের উপজীব্য

এবং চিত্রকলার পটভূমিকায় কুটে ওঠে তাদেরই জীবন-কাহিনী। এইসব জনসাধারণ—সোভিয়েটের মাটির সঙ্গে যাদের নাড়ীর যোগ—তাদের সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন যে এদের জন্যই সোভিয়েট আর্টের উন্নতি সম্ভব হয়েছে, সেইজন্য সোভিয়েট শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রথম কাজ হবে এদের শিক্ষিত করে তোলা। লেনিন বলেছেন :

"They 'made' the revolution and defended its cause, shedding rivers of blood and making countless sacrifices. Truly, our workers and peasants deserve something better than circuses. They have earned the right to true and great art. That is why we place primary emphasis on the broadest public education and upbringing. It provides the soul for the growth of culture, providing of course, that the problem of bread has been solved. A truly new, great communist art which will create a form suitable to its content will grow on this soil. Along these lines our 'intellectuals' have to solve noble tasks of vast import."

## অমৃত-পিয়াসী

শ্রী আশুতোষ সান্যাল

কি যেন বেদনা বহি দ্বিবাশিষি বেড়াই কেবল !  
গভীর বিষাদ-স্কন্ধ হু হু করে দক্ষ চিত্তভল  
মরুসম ! ভাষাতীত ব্যাধা মোর,—বরুণ তাহার  
ছায়াময়, অর্ধকুট, অনির্দেশ্য সন্মুখে আমার  
ঘুরে সদা প্রেতসম। অস্তগুর্চ—অবিলম্বীয়  
কাব্যরসম যেন সে যন্ত্রণা অনির্কচনীষ !  
জনতার কোলাহলে থাকি তবু মনে হয়—একা,  
জীবন-মনের সাথী—কোথা তার নাহি পাই দেখা  
ধরাতলে। হাঃ রবে কঁাদে সদা অসহায় প্রাণ !  
কুমুদপেলব করি' গড়েছিলে যদি ভগবান,—  
এ অন্তর—তবে কেন সংসারের অগ্নিশিখামাঝে  
দিলে তারে ফেলি' ? কেন বৃকে মোর বাজে  
জীবনের এ লাঞ্ছনা ? হায় প্রভু, অমৃতের ক্ষুধা  
যে জন বহিয়া বৃকে অহর্নিশ ঘুরিছে বস্ত্রধা—  
গরল তাহারি লাগি' ? উর্দ্ধতম ভাবলোকে যার  
অভ্যচারী শৃঙ্খলের মত চিত্ত করিছে বিহার,  
হে নিষ্ঠুর, দুঃখময় বস্ত্রপুঞ্জমাঝে কেন তারে—  
নিশিত শায়ক হানি' আনিতেছ টানি' বারে বারে ?

আমি শুধু নাহি পালি জীবধর্ম শাস্ত্র প্রধায়,—  
দেহের পিঞ্জরে থাকি' দেহাতীতে সমগ্র সত্তায়  
করিয়াছি অহুভব। বিনাইয়া ছন্দের আকারে  
বলিতে চেয়েছি মোর মর্মবাণী শুধু বারে বারে  
মানুষের লাগি। হায়, বেদনাই তার পুরস্কার !  
অথবা কি হৃদয়ের অন্তর্লীন এই হাহাকার,  
ব্যাকুল বেদনা মোর তৃষিত এ নিঃসঙ্গ আশ্রয়—  
কবিত্বের চিরসাথী ? তিলে তিলে

বিতরি' স্মরণতি

ধূপ যথা মরে দহি' ঐক্যপ দহিবে কি কবি ?  
তার চেয়ে রাজপথে ধাবমান জনতার মত  
সংসার-পসরা শিরে, শত দুঃখ সহি' অবিরত  
হাস্তমুখে নিশিদিন বাঁচিবার উত্তম উল্লাসে  
পারিতাম যদি আমি দিনগুলি দিতে অনায়াসে  
কাটাইয়া,—তার পর অনাজাত বনপুষ্পসম  
সহসা পড়িত ঝরি' এক দিন এ জীবন মম—  
সেই ছিল ভাল। এ বেদনা ধুইয়া মুছিয়া  
সরল সজোবে মগ্ন হ'ত যদি ভাব-ক্লিষ্ট হিয়া !

# রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বরূপ ও তাহার ভাষ্যকার

শ্রীজীবনময় রায়

বাংলা সাহিত্য যেন পটুয়ার পটশালা হইতে রবীন্দ্রযুগে অকস্মাৎ বিশ্বশিল্পীর আমদারবারের মসনদে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইল। লোহারামের লোহবেষ্টনীতে বাঁধা সাহিত্যসেবকের লেখনী রবীন্দ্রপূর্বযুগে সাহিত্যসৃষ্টির কারখানায় সঙ্গীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ ছিল। পদে পদে তাহাকে সামাজিক আচারের আশুনে পুড়িয়া এবং সমালোচকের হাতুড়ির ঝায়ে তালতোবড়া হইয়া বাহির হইতে হইত। সাহিত্যিকের মানসীকল্পনা হৃদয়ের অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিত—হয় নিষেধের বোরখা পরিয়া আর না হয় ইতরজনের চিত্তহরণে অঙ্গ উল্লসিতী বারান্দার অল্লীল ভঙ্গিমায় রঞ্জিতী সাজিয়া।

রবীন্দ্রসাহিত্য আবির্ভূত হইল—জল-হুল-অন্তরীক্ষে আবাহ গতি রাজহংসবলাকার মুক্তির আবেগে, অনন্ত অন্তরীক্ষে স্বাভাবিক সমস্ত বলিষ্ঠ পক্ষ-বায়ুতরঙ্গে বিস্তার করিয়া দিয়া,—পরমানন্দময় মুক্তির বিচিত্র ছন্দলীলায় তরঙ্গিত ভঙ্গিতে। অকস্মাৎ এই হৃদয় আবির্ভাবের গতিবেগে চমকিত হইয়া অপ্রস্তুত মানুষের জন্তুচিত্ত গতাঃগতিকের শত্রুরূপে নবীন সাহিত্যের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল এবং রবীন্দ্রসাহিত্যকে একটা প্রহেলিকা বলিয়া তাহাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বৈষ্ণব বাড়লের বাংলাদেশে প্রহেলিকার মায়া উপেক্ষণীয় হইতে পারে নাই। অন্তরে অন্তরে সেই স্তম্ভরী-প্রহেলিকা রসগ্রাহী বাঙালী পাঠকের মনোহরণ করিতেছিল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর লাগিয়াছিল সেই অপ্রস্তুত, অশিক্ষিত, সংস্কারের গভীতে আবদ্ধ বাঙালী পাঠকের বিমুখ চিত্ত প্রসন্ন হইতে। আর আজ যখন সে হৃদয় দান করিয়া বসিল তখন রসপ্রবাহে তাহার চিত্তের সীমান্ত রেখার আর চিহ্নমাত্র রহিল না। কি বুঝিল এবং কি বুঝিল না তাহা অবাস্তব হইয়া গেল—রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূজামন্দিরে কাব্য-দেবতার পীঠস্থান অধিকার করিয়া বসিলেন।

পাঠকসাধারণ এবং তাঁহাদের পথপ্রদর্শক সমালোচকবর্গ পূর্বে রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে ছিল বিধেয়ে বিরূপ, এখন বলিল ‘আহা অপরাধ’। এক সময় ছিল মল্লবেশ, এখন আসিল ভাবাবেশ—‘ক’ বলিতে দশায় পড়ে। কোনটাতেই বুঝিবার বালাই রহিল না। বিবেচনা বা শত্রুতা এত সর্বনাশের নয়—রাবণের শত্রুতার পৃষ্ঠভূমিতেই রামের বিরাট স্বরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু ভাবাবেশ বড় সর্বনাশে ব্যাপার। তাহাতে যে দশায় পড়ে তাহারই যে স্তম্ভ সমাধি লাভ হয় তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে দেবতাও সমাধি পান; তাঁহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া বুঝিবার আর প্রয়োজনও থাকে না, অবস্থাও থাকে না। সেই নিরঙ্কুশ সমাধির হাত হইতে রক্ষা করিয়া

দেবতাকে তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টির সৌন্দর্যালোকের মধ্যে ‘রসো বৈ সঃ’ রূপে তাঁহার বিশ্বরচনার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন ঘটে। তখন সেই প্রয়োজনের তাগিদেই প্রয়োজন সাধনের যোগ্য মানুষ জাগিয়া উঠেন। ছোট বড় জাগতিক বা পারমাণবিক সকল ব্যাপারেই এই ‘সম্ভবামি যুগে যুগে’। তাই কালিদাসের কাব্য-সৌন্দর্য্য বুঝিবার তাগিদে মল্লিনাথের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরসসৌন্দর্য্য সম্ভোগের আকৃতি পাঠকসমাজের অন্তরে অবশ্যই জাগিয়াছে, তাহারই তাগিদে আজ রবীন্দ্র ভাষ্যকারগণের আবির্ভাব হইতেছে।

বিশ্বভারতী এই সকল ভাষা ও পরিচয় এত কিছু কিছু প্রকাশিত করিয়া বাংলাপাঠক সাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও কিছু চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যক্তিগত ভাবেও কেহ কেহ এই কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়া রবীন্দ্রকাব্যরহস্য উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হইয়াছেন। ইহারা সকলেই বঙ্গসাহিত্যসেবীগণের কৃতজ্ঞতাভাজন।

কিন্তু একটা কথা আমাদেরকে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদিচ রবীন্দ্রনাথ ষড়ৈশ্বর্য্যগুণে বিশ্বকবি, এবং সংস্কৃতি ও অভিব্যক্তির গৌরবে তিনি একান্তরূপে জাতীয় কবি; কিন্তু তদপেক্ষাও তাঁহার পরিবেশ, তাঁহার পরিবার, তাঁহার শিক্ষা ও প্রকৃতির সংমিশ্রণেই তিনি বিশিষ্ট; স্মরণ্য এই সকলের প্রত্যক্ষ পরিচয় রবীন্দ্রকাব্য পরিচয় লাভের প্রধান উপজীব্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রকৃত ভাষ্যকার হইতে গেলে তাহার প্রাণলোকে প্রবেশ করা আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথের কর্মবহুল জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান শান্তি-নিকেতন ব্রজবিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী। জীবনের অধিকাংশ কাল তিনি এই শান্তিনিকেতনেই অতিবাহিত করিয়াছেন, এবং তাঁহার সাধনার ও সৃষ্টির, তাঁহার জীবন ও কর্মের, তাঁহার দেহ মন আত্মার প্রতিটি কণা এই শান্তিনিকেতনের জলহুল অন্তরীক পরিপূর্ণ করিয়া সজ্জিত হইয়া আছে। বর্ণ-বৈচিত্র্যময় ঋতুপর্য্যায়ের লীলায় মহিমাযুক্ত এখানকার উদার আকাশ, তরলায়িত দিগন্তপ্রসারিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, নৃত্যঠমকিত শালবীথিকা, ছায়াময় আশ্রয়স্থল, আলোছায়ার ঝলরকাটা লীলায়িত আমলকী-বন, প্রহরীবেষ্টিত তালদীঘি, ছায়ালোক সম্পাতে রহস্যময় খোয়াইয়ের সর্পিণ অজ্ঞাততা, জনহীন প্রান্তরের অভিমুখে উধাও হইয়া যাওয়া ‘গ্রাম ছাড়া ঐ রাত্ণাঘাটের পথ’, সমস্তই রবীন্দ্রনাথের কাব্যরসমধুসুকারে রঞ্জিত রঞ্জিত ওতঃপ্রোত হইয়া আছে। ইহাদের সহিত অচ্ছেদ্য

যুতিতে বিকশিত সুদীর্ঘ পরিচ্ছদে সমারুত সমুন্নত দেহ একক রবীন্দ্রনাথের সঙ্করমান মূর্তি এই বিচিত্র সমাবেশের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে যেন চকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তপঃপ্রভাবে পুত এই তপোবনক্ষেত্রে, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিভাগলয়ে, ইহার প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক রস ও রূপের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাহারা বাস করেন নাই, রবীন্দ্রকাব্যরস-ধারার প্রাণলোকের উৎসটির পরিচয় তাঁহাদের নিকট মূলভ নয়। অবশ্য এমনও সম্ভব যে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও ধর্ম, তাঁহার গোষ্ঠী পরিচয়, তাঁহার শিক্ষা, কর্ম ও তাঁহার বিচিত্র রচনার সহিত বহু দিন যাবৎ পরিচিত হইতে হইতে আপন কল্পনা ও অনুপ্রেরণার আলোকে প্রতিভাবান রসগ্রাহী কেহ কেহ রবীন্দ্রকাব্যরসের অমৃত উৎসের সন্ধান লাভ করিয়াছেন, তবু তাঁহাদের চিত্তে শান্তিনিকেতন আশ্রম স্বরূপের সহিত ঘনিষ্ঠতাপ্রসূত রসসন্তোগের অভাবজনিত অতৃপ্তি রহিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে প্রকৃতি ও পরিবেশের সুধারস পান করিয়া আপনার কাব্য-প্রতিমায় প্রাণসঞ্চার করিয়াছিলেন, রবীন্দ্র-সনাথ সেই প্রকৃতি সন্তোগের প্রত্যক্ষ অনুভূতি না করিলে, তাঁহার প্রকৃত স্বরূপকে, তাঁহার ইতিহাস এমন কি কাব্য হইতেও সংগ্রহ করা দুঃসহ। হিমালয়কে যে প্রত্যক্ষ না করিয়াছে, অপ্রত্যক্ষ সহস্র পরিচয়েও হিমাচলের মহিমা তাহার নিকট অগোচর থাকিয়া যায়। সম্মানে মায়ের দেহের মধুর স্পর্শ ও মাতৃহৃৎ মাধুর্যরস যেমন করিয়া উপভোগ করিতে পায়, খেলার সাথী, মায়ের সহস্র সমাদর সত্ত্বেও, তেমন করিয়া মাকে পায় না। এই কারণেই শান্তিনিকেতন আশ্রমের শুভরসে-লালিত কাব্যরসিকের রচিত রবীন্দ্রপরিচয়-গ্রন্থ অস্তাঙ্গ গ্রন্থ হইতে রসে ও সংবেদনে স্বভাবতই স্বতন্ত্র ও অধিকতর মূল্যবান হওয়ার অধিকার দাবী করিতে পারে। চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব কবিতার অন্তরতম মাধুর্য উপলব্ধি করিতে হইলে রসানুভূতির গভীর লোকে প্রবেশ করিতে হয় এবং বৈষ্ণব সাধনার নিগূঢ় রসতত্ত্বের মধ্যে ঢুকলহারা হইয়া না ডুবিলে সে রসানুভূতির চরম উপলব্ধি হইতে পারে না। এত বড় উপমা না দিয়াও সামান্য একটি দৃষ্টান্ত যোগে আমার বক্তব্যটি সুপরিষ্কৃত হইবে। অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত, গভীর খাদ রেখায় চিত্রিত দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের মধ্যে উধাও হইয়া যাওয়া “গ্রাম ছাড়া ঐ রঙামাটির পথ”—পার্শ্বের অলিন্দে বসিয়া যে সেই পথের প্রেমে মাতে নাই সে শুধু কল্পনার দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিবে না, গৈরিক বসনমণ্ডিত সেই বাউল পথ কেন যে মন তুলায়! কোন অজানার আকর্ষণে কবির মন হাত বাড়াইয়া ঐ বিবাহ-পথের ধূলায় যাইয়া লুটাইয়া পড়িতে চায়! কোন সর্বস্বাধা মুক্তির লোভ দেখাইয়া কবিকে সে ডুলাইয়া ধরের বাহিরে টানিয়া আনে এবং কোন সর্বনাশের নেশায় মাতাল

করিয়া তাঁহার প্রাণ কাড়িয়া লইয়া সে “যায় যে কোন্ চুলায় রে!”

এইটুকু গৌরচন্দ্রিকা সাধিবার তাৎপর্য্য এ নয় যে আমি প্রমাণ করিতে বসিয়াছি যে শান্তিনিকেতনবাসী যে কেহই রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে যাহা কিছু লিখিবেন বাহিরের রবীন্দ্র-কাব্যরসিকদিগের ভাষা হইতে তাহা অবশ্যই উত্তম হইবে। কেননা যে কয়টি বিশেষ গুণ ও ক্ষমতা থাকিলে ভাষ্যকার হইবার যোগ্যতা লাভ করা যায়, সে কয়টি গুণ ও ক্ষমতার অভাব যাহার মধ্যে আছে, তিনি যদি শান্তিনিকেতনের মাটিতে জন্মিয়া চিরদিন রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বে জীবন অতিবাহিত করিয়াও থাকেন তথাপি রবীন্দ্র-ভাষ্যে তাঁহার অধিকার জন্মিতে পারে না। ঐতিহাসিক জগতে, তিনি হয়ত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, বহু চুল্লভ তথ্য বিতরণ করিয়া রবীন্দ্রজিজ্ঞাসুদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারেন কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য সাহিত্যের অন্তরমহলে প্রবেশের ছাড়পত্র তিনি পাইতে পারেন না। আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে রবীন্দ্রকাব্য সাহিত্যের রসপরিবেশনে সমগুণ ও সমান ক্ষমতা বিশিষ্ট উক্ত দুই জন কাব্যরসিকের মধ্যে আশ্রমলালিত-জনের ভাষাকেই আমরা অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিব।

কাব্যসমালোচকের প্রথম ও প্রধান গুণ হইল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্। যে বিষয় প্রকাশ করিতে যাই-তেছি তাহার সম্যক উপলব্ধি না করিলে তাহাকে পূর্ণরূপে জানা যায় না; এবং সম্পূর্ণ করিয়া না জানিলে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়া বলা সম্ভব নয়। সেইরূপ অবস্থায় বলিতে গেলে ব্যাখ্যান আবাস্তরূপে বাগাড়ম্বরে পূর্ণ হয় মাত্র। মনে রাখিতে হইবে, এই যে শ্রদ্ধার কথা বলিলাম, ইহা ব্যক্তির প্রতি নয় পরন্তু তাঁহার রচনার প্রতি—শ্রষ্টার প্রতি নহে, তাঁহার সৃষ্টির প্রতি। শ্রষ্টার মনোভাব যদি রচনার মূল্য নির্ণয়ে নিযুক্ত করা যায় তাহা হইলে সে রচনা শ্রষ্টার মূল্যেই বিকাইবে। অন্ধার ওয়াইল্ড মাহুঘটীর সন্ধানে আমার যাহা ধারণা তাহার দ্বারা যদি আমি ডি প্রোফাণ্ডিসের মূল্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে বলিতে হয় “চণ্ডালের হাতে দিয়া পোড়াও পুস্তকে; ভয়রাশি করি ফেল কণ্ঠনাশা জলে।”

সমালোচকের দ্বিতীয় গুণ, রসগ্রাহিতা অর্থাৎ রসবিচার। এই বিচারে সংযম একটি একান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষমতা। রসের সম্যক বিচার সম্ভবই হয় না, যদি ‘সংযতেন্দ্রিয়ঃ’ না হওয়া যায়। সামান্য কারণে যাহারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—সে ভাবেই হোক বা অভাবেই হোক—তাহারা রসবিচারের যোগ্য নহে।

তৃতীয় গুণ, ব্যাব্যিহ ও সূক্ষ্মতা। অর্থাৎ সহজে ও সূক্ষ্মরূপে রচনার মধ্যে প্রবেশের ক্ষমতা—কবি বা লেখকের চিত্তে যে

চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে ভাষার ইন্দিভিডুয়ালিটি তাহাকে আপন মানসে প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি।

চতুর্থ গুণ, মূল্য বোধ। যে দেশে মানুষকে ইশ্বরের আসনে বসানো হয় বা গাভীকে হত্যা করা হয় সে দেশে ইহার চর্চা অত্যাবশ্যক। অনুজ্ঞিত বিচারশক্তি ও মানসিক সংযম (discipline) ইহার প্রধান সহায়।

পঞ্চম গুণ, প্রকাশ ক্ষমতা। যাহা বুঝিলাম তাহা অস্তরের মনে নিঃসংশয়ে প্রকাশ করাইবার শক্তি। অর্থাৎ ক্রটি-বিচ্যুতি-মুক্ত চৌকস ও কালজীর ক্ষমতা যাহাকে বলা যায়। ইহার তিনটি অঙ্গ। এক, দ্বিধাহীন লক্ষ্যাভিমুখী বলিষ্ঠ ভাষা; যে ভাষা সোজা পাঠকের চিত্তে গিয়া প্রবেশ করে। যুক্তির অকাট্যতা অথচ পাঠকের মন সহজেই যাহা মানিয়া লয় এমন যুক্তি। অর্থাৎ অসম্ভবজনক ‘এডোতর্কের’ দ্বারা বাজিয়ায় করিবার অপচেষ্টা না-করা। তিন, অকপটতা বা সাধুতা sincerity। অর্থাৎ যাহা বুঝিব তাহা দ্বিধাহীন সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিবার সং বুদ্ধি ও সং সাহস। ষষ্ঠগুণ, ইহার সমালোচনা করিতে হইবে তাহার সমধর্মী মন। অজ্ঞা কখনই তাহাকে ভাষাকার ঠিকমত বুঝিবে না।

কেহ যদি রবীন্দ্রসাহিত্য এবং শান্তিনিকেতনের তাবৎ ঐশ্বর্যের মধ্যে ভুবিয়াও থাকেন এবং তাহার যদি এই সকল গুণ না থাকে, তাহা হইলে তিনি কোনো মতেই রবীন্দ্র-সাহিত্য ও জীবনের প্রকৃত ব্যাখ্যাতা হইতে পারেন না। এই সকল গুণ যিনি যে পরিমাণে অর্জন করিয়াছেন তিনি সেই পরিমাণেই কোনো মহান সাহিত্যিকের কাব্য ও জীবনের পরিচয় প্রকাশে সফলকাম হইবেন।

অবশ্য এই সকল গুণ ইহার মধ্যে বর্তমান তিনি আবার যদি কবির জীবন ও কর্মের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকেন তবে তিনিই হইবেন কবির কাব্য ও জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষাকার। অজিতকুমার চক্রবর্তী উক্ত উভয় ঐশ্বর্যেরই অধিকারী ছিলেন। এই হেতু তাহার “রবীন্দ্রনাথ” ও “কাব্যপরিক্রমা” রবীন্দ্রকাব্যরসায়ন পরিবেশনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন এবং রবীন্দ্রকাব্য পরিচয়ের যে পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন বাংলা সমালোচনাসাহিত্যে তখনকার যুগে তাহা অভিনব। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মূলসূত্রগুলি আবিষ্কার করিয়া তাহারই আলোকে রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত প্রেহেলিকার আবরণ উন্মোচন ও পাঠক সমাজে তাহার ভাবের রূপ প্রকাশ করিয়া ধরা ছিল এই পদ্ধতির স্বরূপ।

রবীন্দ্র-পরিচয় সাধনে অজিতকুমারই এই তত্ত্বপ্রকাশাত্মক সমালোচন-পদ্ধতির পথপ্রদর্শক এবং আপন অজ্ঞাতসারেই বাঙালীর রসগ্রাহী সমালোচক চিত্র আজ সহজেই এই পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকেন। তাহার “রবীন্দ্রনাথ” ও “কাব্য-

পরিক্রমা” হইতে অল্প কিছু চয়ন করিয়া দেবাইলে আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে।

কিন্তু যে যুগে, “চমৎকার” বা “অতি মন্দ,”—তাল দণ্ডে কেবল এই দুইটি মাত্র বাটবারা চাপাইয়া সাহিত্য বিচারের মাতব্বরী করিবার রেওয়াজ ছিল, সেই যুগে গভীর অনুগৃহীত, রসতত্ত্ব ও রসবোধে পরিপূর্ণ এ জাতীয় বিচার এক আশ্চর্য ব্যাপার বটে।

“রবীন্দ্রনাথ” গ্রন্থে অজিতকুমার বলিয়াছেন যে, বড় সাহিত্যিকের বা কবির সকল রচনার মধ্যে অভিব্যক্তির একটি অবিস্মিত সূত্র থাকে; সেই সূত্র তাহার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে বাঁধিয়া দেয়। তাহাই কবির কাব্য জীবনের মূল সূত্র। সেই মূল সূত্রটির প্রকাশের ব্যাকুলতায় কাব্যের সৃষ্টি। “যে জীবনকে পাওয়া যাইতেছে না অথচ দূর হইতে যাহার পরিচয় পাইতেছি” তাহারই অভিসারে কবির চিত্ত বাহির হইয়াছে এই অপরিচিত অথচ চিরপরিচিত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে এই বিশ্বঅভিসারযাত্রার ভ্রমণের ইতিহাস দেখিতে পাই। এমনি চলিতে চলিতে কবি ভারতবর্ষের ধর্মসাধনার পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। সে পথ সত্যের পথ, দেশাচারের দ্বারা তাহা সংকীর্ণ নয়। এইজন্য সকল দেশের সকল মানুষের অন্তরতম সত্যের সহিত তাহার নিবিড় আত্মীয়তা। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনা কোনো বাহিরের সংস্কারকে অবলম্বন করে নাই, তাহা সমস্ত জীবন হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। জীবনের সকল বিচিত্রতাকে পরিপূর্ণ একের মধ্যে পাইবার আকাঙ্ক্ষাই কবির কাব্যের প্রাণ। প্রযুক্তির পথকে তিনি রুদ্ধ করেন নাই; বিশ্ব-সংসারকে জানে, কর্মে, ভোগে সর্বত্র স্বীকার করিয়া তাহার জীবন ও কাব্য চরিতার্থ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা বার বার দেখিব যে তাহার প্রকৃতি প্রযুক্তির ক্ষুদ্র গভী অতিক্রম করিয়া তাহাকে বিশ্বের মধ্যে সমগ্রের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক অবস্থায় কাব্যের মধ্যে বিশ্বযাত্রার এই ব্যাকুল ক্রন্দন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল সূত্রটি হইল সর্বোচ্ছৃতি। সর্বমোবা-বিশুদ্ধি—সকলের মধ্যে প্রবেশ করিবার সাধনা—সমস্ত জলহল আকাশকে সমস্ত মনুষ্য সমাজকে আপনার চৈতন্তে অংগ পরিপূর্ণ করিয়া অমৃত্যব করিবার নামই হইল সর্বোচ্ছৃতি। রবীন্দ্রনাথ পরে তাহার নাম দিয়াছিলেন বিশ্ববোধ।

সন্ধ্যাসঙ্গীতেই কবি সর্বপ্রথমে নিজের সূর আবিষ্কার করিবার আনন্দ অমৃত্যব করেন। হৃদয়ের অমৃত্যুতির সহিত জীবনের অভিজ্ঞতার যখন সামঞ্জস্য সাধিত হয় নাই তখন নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থার যে অধীরতা তাহাই সন্ধ্যাসঙ্গীতে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রভাতসঙ্গীতে তাহার সমগ্র কাব্যজীবনের

ভাবটির ভূমিকা নিহিত হইয়া আছে। সীমার মধ্যে অসীমকে নিবিড়রূপে উপলব্ধি করিবার সাধনা জাগিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি—ছন্দ্যাবেগকে হ্রের অনির্বচনীয় ভাষায় ব্যক্ত করাই তাহার চিরজীবনের কাজ। সমস্ত বিশ্ব-স্পন্দনকে সমস্ত বস্তুজগৎকে হ্রের রূপান্তরিত একটি অপরাপ সঙ্গীতের মত করিয়া তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। অনভ্যন্ত পার্থকের নিকট রবীন্দ্রনাথের কবিতার অস্পষ্টতা এই হ্রের আবেগের জন্তই।

ভোগের সমস্ত ক্ষণিকতা ও ব্যর্থতাকে অতিক্রম করিয়া সৌন্দর্যের যে একটি অসীম মুক্ত রূপ আছে, মানবদেহে যে একটি প্রাণময় মনোময় অত্যাশ্রয় সৌন্দর্যের প্রকাশ আছে, তাহারই লোকাভিত রহস্যময় পরমবিষয়কর হ্রের “চিত্রাঙ্গদা”য় ফুটিয়াছে, বাহ্যিকরূপ এবং অন্তরের মাহুষ এ হ্রের হৃদয়ের রূপে। চিত্রাঙ্গদা কাব্যখানি সৌন্দর্য্যকে বাহিরের দিক হইতে ভোগের একটা মন্ত প্রতিবাদ। বাহ্য সৌন্দর্য্য কবির নিকট “একসীমাহীন অপরূপতা অনন্ত মহৎ।”

সৌন্দর্য্যের যে সম্পদ জীবনের নানা শুভ মুহূর্ত্তে একটি চিরপরিচিত অথচ অজানা সত্তার স্পর্শের ভিতর দিয়া ক্রমাগতই জীবনের ভিতরে সঞ্চিত হইয়াছে তাহাকে নিজের ভোগের গতি দিয়া রাখিতে গেলেই সে পলায়ন করে—সে যে বিধের, সে যে সকলের। “সোনার তরী”, “পরশ পাথর”, “বৈষ্ণব কবিতা” এসকলের মধ্যেই সেই একই তত্ত্বের প্রকাশ। অংশের মধ্যেই সম্পূর্ণতার তত্ত্ব নিহিত হইয়া আছে। শারীরিক সৌন্দর্য্য সেইজন্ত অনির্বচনীয়, মানবপ্রেম অনির্বচনীয়, কোথাও বিশ্বয়ের অন্ত নাই; কবির নিকট সমস্তই সেই রহস্য-ময়ের পূজা।

“জীবন দেবতা”র স্বরূপই হইতেছে বিশ্ববোধ। সমস্ত ভাস্কর্য্যের মধ্য দিয়া জীবনকে তিনি একটি অথচ তাৎপর্য্যের মধ্যে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছেন। তিনিই আমাদের উপস্থিতকে চিরন্তনের সঙ্গে, ব্যক্তিগত জিনিষকে বিশ্বের সঙ্গে, খণ্ডকে সম্পূর্ণের সঙ্গে মিলিত করিয়া পরিণামের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। জীবনকে ক্রমাগত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া জীবনের তাৎপর্য্যকে বিপুলতর করিতেছেন।

“উর্ধ্বশী” এবং “বিজয়িনী”তে সৌন্দর্য্যকে কবি সমস্ত মানবস্বপ্নের বিকার হইতে, সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গী সীমা হইতে দূরে, তাহার বিশুদ্ধতায়, তাহার অখণ্ডতায় উপলব্ধি করিবার তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য সমস্ত প্রয়োজনের বাহিরে আপনাতে আপনি বিকশিত একটি সম্পূর্ণ সত্তা। “উর্ধ্বশী” সমস্ত রূপের মধ্যে অপরূপের দৃষ্টি।

সোনার তরী, চিত্রা ও চৈতালীর এই মাধুর্য্য-রসপূর্ণ জীবনের সঙ্গে, কথা, কল্পনা, ক্ষণিকা প্রভৃতির পরবর্তী কাব্যের জীবনের যে বিচ্ছেদ তাহা এমন গুরুতর যে দুইটাকে

দুই জন স্বতন্ত্র লোকের জীবন বলিলেও অজ্ঞান হয় না। সোনার তরী ও চিত্রার জীবন হইতে বিদায় লইবার প্রধান কারণ এই যে, কেবলমাত্র শিল্পময় জীবনের অসম্পূর্ণতা কবিকে ভিতরে ভিতরে বেদনা দিতেছিল। একটা বৃহৎ কর্মক্ষেত্র, যে ক্ষেত্র কোন বার্থ ও সঙ্গীতের সীমায় আবদ্ধ নয়, যাহার নিকটে সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করিয়া মাহুষ মঙ্গলের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তেমনি একটি কর্মক্ষেত্র তাহার জীবনে একান্ত প্রয়োজন ছিল। সেই রকম একটি কর্মক্ষেত্র, একটি তপস্কার ক্ষেত্র তাহাকে নিজের চেষ্টায় রচনা করিয়া লইতে হইল। তাহারই উদার আমন্ত্রণে সমস্ত বিতর্ক-বিচার, সমস্ত বন্ধন ক্রন্দন, সমস্ত শ্রম জীবনের বিকার লাঞ্ছনাকে একেবারে দূরে অপসারিত করিয়া প্রাণ ছুটিয়া বাহির হইয়াছে। শক্তির সেই লীলাক্ষেত্রে মাহুষের বিরাট মুণ্ডিকে দেখিবার জন্ত কবির চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

অজিতকুমারের “রবীন্দ্রনাথ” হইতে কতকটা বিস্তৃতভাবে উপরোক্ত কথাগুলি চয়ন করিয়া তাহার গভীর প্রবেশ ও বলিষ্ঠ প্রকাশ ক্ষমতার সামান্য পরিচয় দিলাম। আজ যে আদর্শে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবনদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আমাদের পক্ষে সহজ হইয়াছে অজিতকুমারই সর্ব্বাঙ্গে সেই আদর্শে ও সেই পদ্ধতিতে রবীন্দ্রকাব্য বিচার করিয়া তাহার পথ সূচয় করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সৃষ্টিকে তাহার সমস্ত পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ করিয়া দেখাই সত্য করিয়া দেখা এবং সে দেখা অজিতকুমার প্রমুখ কয়েকজন যেমন করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন এমন আর কেহই নাই। সেই কারণেই অজিতকুমারের রবীন্দ্র-পরিচয় গ্রন্থ “রবীন্দ্রনাথ” ও “কাব্যপরিক্রমা” সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভের যোগ্য এবং রবীন্দ্রকাব্যরসিকজনের পক্ষে অপরিহার্য্য। কবির স্বয়ং তাহার নূতন সংস্করণের কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা-স্বরূপ অজিতকুমারের এই লেখাটিকে গ্রহণ করিয়া পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। ইহাতেও এই সমালোচনার মূল্য বড় অল্প গৌরব লাভ করে নাই।

কাব্যপরিক্রমায়—জীবন দেবতা, রাজা, ডাকঘর, জীবন-মুখি, ছিন্নপত্র, বর্ষসঙ্গীত, গীতাঞ্জলি ও গীতিমালা অবলম্বন করিয়া লেখক যে গভীর তত্ত্ব ও গভীরতর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দান করিয়াছেন তাহা অনন্ত।

জীবনদেবতা নিবন্ধে গ্রন্থকার কবিতার স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিতেছেন, “সে ভাবকে চায় না, অভাববীণকে চায়; নির্দিষ্ট তত্ত্বকে চায় না, অনির্বচনীয়কে চায়।” রবীন্দ্রনাথের কাব্য-চেতনার ইহাই প্রকৃত স্বরূপ। তাহাই বলিতে গিয়া এশ্রুয়োলজি হইতে সুর করিয়া একসংশ্রুতিমণ্ডল সাইকলজি এবং ডারউইন হইতে ফেকুনার পর্য্যন্ত সকলকেই তিনি সাক্ষী-রূপে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়াছেন। “জীবনদেবতার তত্ত্ব সম্যক



বুঝবার চেষ্টা না করিয়া অনেকে উহা নিতান্ত অলস কল্পনা-  
মাত্র মনে করেন।" এই কথা মনে হইবামাত্র লেখক বোধ  
করি বৈধা রক্ষা করিতে পারেন নাই। ব্যাপারটা যে অসঙ্গত  
ও অশোভন হইয়াছে অজিতকুমারের কাব্যরসিক অমু-  
ভূতিপ্রবণ চিত্ত তাহা অস্বস্তি করিয়াই ভূমিকায় লিখিয়াছেন,  
“রসাত্মক কাব্যের রসপ্রসঙ্গে এরূপ জটিল তত্ত্বের কচকচি  
অনেকের নিকট অগ্রীতিকর হইতে পারে। আশা করি  
তাহারা আমাকে দয়া করিয়া সহ করিবেন।” কিন্তু “সহ  
করিবার” এখন আর আবশ্যক হইবে না। এ বিষয় অজিত-  
কুমার স্বর্গে বসিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। ছাত্রেরা এখন  
জীবনদেবতার হাড়মজ্জা পর্যন্ত চিবায়া গলাধঃকরণ করিবে ;  
কেননা রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-  
তালিকাভুক্ত। অজিতকুমারের গ্রন্থ দুইখানি এতই উপাদেয়  
এবং রবীন্দ্রকাব্যরস-পরিচয়-সাধনে তাহার চিন্তা ও বাচনভঙ্গী  
এত অভিনব যে “তত্ত্বের কচকচি” তাহার মধ্যে সত্যই ধাপ-  
ছাড়া বলিয়া মনে হয়। তাই সেটুকু উল্লেখ না করিয়া  
পারিলাম না।

গীতাঞ্জলির সমালোচনার প্রতি আমি বিশেষভাবে  
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কেননা এইটিতে অজিত  
বাবুর বিশ্লেষণ ভঙ্গী পরিস্ফুট হইয়াছে। গীতাঞ্জলির মধ্যেই  
সাধক রবীন্দ্রনাথের সাধনার ধারার প্রথম পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া  
উঠিয়াছে। সেই সাধনারই তিনটি উপধারার ত্রিবেণীসঙ্গম  
এই গীতাঞ্জলি। সে তিনটি ধারা এই—

- (১) এই দুঃখ-আঘাতই তো সেই জীবনদেবতার স্পর্শ।
- (২) সকল অহংকার চোখের জলে ডুবায়া দিয়া তাহার চরণ-  
ধূলির তলে মাথা নত না করা পর্যন্ত আমাদের শান্তি নাই।

(৩) “সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে” তাহাকে  
প্রণাম না করিলে, প্রণাম সার্থক হইবে না। কেননা

তিনি গেছেন যেধায় মাটি ভেঙ্গে

করছে চাষা চাষ,

পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেধায় পথ

ধাটছে বারোমাস।

তিনি বলিতেছেন, “গীতাঞ্জলির এই সাধনার কবিতাগুলি  
কবিতাহিসাবে নিকৃষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহাই  
আশ্চর্য্য যে কবির সমস্ত স্বরূপটি কেমন সহজে কেমন অনায়াসে  
এই কাব্যের মধ্যে ধরা দিয়াছে। তিনি এই কাব্যে আপনাকে  
সম্পূর্ণ দান করিয়াছেন। এইখানেই গীতাঞ্জলির বিশেষত্ব।  
এই কারণেই এই কাব্যে মানুষের জীবনের মধ্যে কবির সাধনা  
গিয়া আঘাত করিতেছে।”

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বে থাকিয়াও  
রবীন্দ্রনাথের তখনকার দিনের লোকপ্রিয়-তম কবিতাগুলিকে  
“নিকৃষ্ট” বলার মত সংসাহস ও সাধুতা অজিত কুমারের ছিল।  
তাহার মত ও বিশ্লেষণ তিনি সুস্পষ্ট ধড়ু ভাষায় তাহার  
স্বাভাবিক সাধুবুদ্ধিতে অনায়াসেই ব্যক্ত করিয়াছেন। রবীন্দ্র-  
সমালোচক হিসাবে এইখানেই তাহার শ্রেষ্ঠতা জাঙ্ঘলামান।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের নামকরণ করিয়া রবীন্দ্রকাব্য-  
তীর্থ পরিক্রমণে গ্রন্থকারের ভক্তিরস পরিস্রুত তত্ত্বজ্ঞানী অমু-  
সন্ধিৎসু চিন্তের যে পরিচয়টি দিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থের  
সার্থক পরিচয়।

বিশ্বভারতী এই গ্রন্থকে পুনঃপ্রকাশিত করিয়া রবীন্দ্র-  
সাহিত্য পিপাসুজনের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন ; কেননা  
গ্রন্থ দুইখানি রবীন্দ্র-সাহিত্য স্বর্গোত্তানের সুবর্ণরূপিকা বিশেষ।

## অনুরাগীর দেশ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বিষয়বুদ্ধি যাদের প্রথর, যারা খুব সঙ্কল্পী

বাধানি তাদিকে—কিন্তু দূরেতে রহি।

নিকষ পাষণ পর্ত্তভূমি নিব্বরের ধারা নাই,

বস্ত হরিণ ত্যাগ করি সেই ঠাই।

সরোবর যার তলা ও বাঁধানো চারি পাশ ঘেরা শানে

ভীত মন মীন চাহিতে তাহার পানে।

কাঁধা যাদের খড়ি-ধরা ঠিক—হিসাবেই সব চলে

অহিসাবী নাহি যাই সে কঠিন স্থলে।

ছোট প্রজাপতি সুরভি-বিভোর তবু মন করে মানা

চুকিতে কিন্তু আভরের কারখানা।

মানুষ কেমনে নিতুল হবে করি সদা চিন্তন

বেসানি করি যে কড়ি নয়, লয়ে মন।

যাহা উড়েল, যাহা উচ্ছল, নিত্য-উচ্ছসিত

তাহাতেই মোর অন্তর হয় প্রীত।

বেহিসাবী যাহা, অকুণ্ঠিত যা, সতত বর্ধমান

আমি চাই সেই মহালক্ষ্মীর দান।

সংখ্যায় যাহা ধরা পড়ে নাক', কথা চেয়ে বেশী সুর

মোর কাছে শুধু তাই লাগে স্নমধুর।

অল্পে আমার তৃপ্তি নাহিক যদিও চাতক-ভাই

পিপাসা মিটাতে গোটা মেঘখানা চাই।

অপরিমিতের ইঙ্গিত যাতে তাই যে আমারে ডাকে

অকুরন্তের আভাস যাহাতে থাকে,

আমি পিনাকীর তৃতীয় আঁধির মেঘের দৃষ্টি চাই

সাধারণ যাহা তাতে অভিক্রটি নাই।

## শ্রেষ্ঠ সামরিক রসদ

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল-রায়

বিষ্ফোরক দ্রব্য সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে অনেক কথা মনে হয়। জিনিষগুলি কিসের তৈয়ারী? কে বা কাহারো এ ভীতিপ্রদ পদার্থের উদ্ভাবক? আজ অবস্থ বিষ্ফোরক-প্রস্তুতি, চালনা ব্যবহার—সবই নির্ভিয়ে সংসাধিত হইতেছে। রাসায়নিক সুস্থিরমত এগুলি তৈয়ার করিতেছেন, কারখানার কর্ম-গণ নির্ভয়ে ইহাদিগকে সাজাইয়া যথারীতি সর্বত্র প্রেরণ করিতেছেন। কেবলমাত্র কার্যক্ষেত্রে এইগুলি বিষ্ফোরণ সৃষ্টি করিতেছে।

বিষ্ফোরকগুলি সব সমান নয়। কোন কোনটি সামান্য সঞ্চালনে ভীষণ বিঘ্ন উৎপাদন করে। নাইট্রোজেন অ্যামোডাইড নামক বিষ্ফোরকটি সামান্য একটি পালকের আঘাতে দারুণ বিষ্ফোরণ সৃষ্টি করে। এ জাতীয় জিনিষ ঘাঁটাঘাঁটি করা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ইহাদের ব্যবহার কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। সাধারণ বিষ্ফোরক ও সমর-বিষ্ফোরক সামান্য ব্যতিক্রমে উত্তেজিত হয় না, এবং ইহাদের অস্ত্রায় কতকগুলি গুণও থাকে। নাইট্রো গ্লিসারিন একটি কমার্সিয়াল বা বাণিজ্যিক বিষ্ফোরক। কিন্তু ইহা আত্মবিদারণশীল ও অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। কমার্সিয়াল বিষ্ফোরকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় ডিনামাইট। ডিনামাইটের নাম আমরা সদা সর্বদা শুনিতে পাই। ইহা অনেক প্রকার। ৭৫ বৎসর পূর্বে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড নোবেল জিনিষটি আবিষ্কার করেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে নাইট্রো গ্লিসারিন। ইহার ব্যবহারে পার্থক্য শুধু এই যে কিসেলগার নামক একপ্রকার বালুজাতীয় পদার্থের মধ্যে এই তরল পদার্থটিকে আবদ্ধ রাখা হয়। এই ব্যবহার ফলে সামান্য নাড়াচাড়াজনিত বিষ্ফোরণের ভয় তিরোহিত হইয়াছে। নাইট্রো গ্লিসারিন ও এমোনিয়া নাইট্রেটের সমাবেশকে এমোনিয়া ডিনামাইট বলে। তৃতীয় প্রকার ডিনামাইটের নাম ব্লাস্টিং জিলাটিন। ইহা নাইট্রো গ্লিসারিনের মধ্যে নাইট্রো সেলুলোজের দ্রবণ। ইহাও নোবেলের আবিষ্কার। ইহার দুইটি উপাদানই বিষ্ফোরক-গুণসম্পন্ন হওয়ায় ব্লাস্টিং জিলাটিন অত্যন্ত তীব্র বিষ্ফোরক দ্রব্য।

বিষ্ফোরকের শক্তি পরীক্ষা হয় বিষ্ফোরণের মাত্রাদ্বারা। বিষ্ফোরণ সৃষ্টির জন্য সাধারণ ক্ষেত্রে অতি নিম্নস্তরের ডিনামাইট ব্যবহৃত হয়। কয়লা উত্তোলনে যে ডিনামাইট ব্যবহৃত হয় তাহার কাজ ধীরে ধীরে বিষ্ফোরণ সৃষ্টি করা, যাহাতে ক্রমশঃ কয়লাগুলি অসংলগ্ন হইয়া আসে এবং একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া না যায়। এমোনিয়া ডিনামাইটের বিষ্ফোরণ-তৎপত্তা নির্ভর করে এমোনিয়া নাইট্রেট-দানার আকারের

উপর। দানা যত ছোট হইবে বিষ্ফোরণ তত জোরাল হইবে।

ডিনামাইট হঠাৎ সামান্য কারণে ফাটে না। যথার্থ উপায়ে ব্যবহৃত হইলে ইহা অত্যন্ত নিরাপদ। প্রতি বৎসর গাড়ীভর্তি ২০০,০০০ টন ডিনামাইট সর্বত্র আনাগোনা করে। ইহাতে এ পর্যন্ত কোন বিপদ ঘটে নাই। উহাদের বিষ্ফোরণ ঘটাইবার জন্য তীব্র বারুদপূর্ণ আধারের (নাম ডিটোনেটর অথবা ব্লাস্টিং ক্যাপ) সাহায্য দরকার হয়। ডিটোনেটরকে প্রজ্জ্বলিত করিতে বিদ্যুৎই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান।

কমার্সিয়াল বিষ্ফোরক ও সামরিক বিষ্ফোরকের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সামরিক বিষ্ফোরককে বলে নিম্নলিখিত বিষ্ফোরক। কার্যক্ষেত্রে সর্বত্রই ইহাদের বিষ্ফোরণ ঠিকমত হইয়া থাকে। এগুলি তৈয়ারীও হয় নৈপুণ্যের সহিত। যাহার সামান্য ব্যতিক্রমে যুদ্ধের গতি বদলাইয়া যাইতে পারে তাহা কিরূপ ক্রটিশূন্য রাসায়নিক পদার্থ হওয়া উচিত—সকলেই ধারণা করিতে পারিবেন। এ সমস্ত সামরিক বিষ্ফোরক সম্পূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ, মিশ্রিত পদার্থ নহে। রসায়নী অভিশয় নিপুণতার সহিত এগুলি তৈয়ার করেন। টি. এন. টি এরূপ একটি জিনিষ। ইহা আল্ফাতরা হইতে সজ্জাত—নাম ট্রাইনাইট্রোটলুইন। সামরিক বিষ্ফোরকের কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন। ইহাদিগকে যে-কোন ভাবের নাড়াচাড়া সহ্য করিতে হইবে। যুদ্ধের প্রচণ্ডতার সময় নিয়মকানুন ও সতর্কতার দিকে দৃষ্টি রাখা কঠিন, কাজেই যদি সামান্য কারণে উহার বিষ্ফোরণ সৃষ্টি করে তবে শত্রুর চেয়ে সপক্ষেই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এক্ষণে টি. এন. টি ও এ জাতীয় অস্ত্রায় বিষ্ফোরক অত্যন্ত বিকারহীন। ইহাদিগকে সক্রিয় করিতে হইলে অস্ত্রায় বিষ্ফোরকের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। মার্কানী ফুলমিনেট, লেডএক্সাইড প্রভৃতি মধ্যবর্তী কাজ করিয়া থাকে।

সামরিক বিষ্ফোরক আবার দ্বিবিধ। এক প্রকার বারুদ গোলাগুলীকে বাজা দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়—ইহাদিগকে প্রচালক বা প্রপেলেন্ট বলে। অপর প্রকার বিষ্ফোরকের নাম উচ্চ বিষ্ফোরক বা বিদারণশীল বিষ্ফোরক। ইহার ভীষণ বিষ্ফোরণ উৎপাদন করে। কমার্সিয়াল বিষ্ফোরককেও বিদারণশীল বিষ্ফোরক বলা যায়। এই দ্বিতীয় প্রকার পদার্থের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে বড় বড় সেতু ও কঠিন পাথুনীকে ধ্বংস করা হয়। সাধারণতঃ গোলাগুলী উচ্চ বিষ্ফোরকে পূর্ণ থাকে। প্রপেলেন্ট ও উচ্চ বিষ্ফোরকের মধ্যে প্রভেদ নির্ভর

করে উহাদের বিদারিত হওয়ার গতিবেগের উপর। বিদারণ-শীল বিস্ফোরকগুলি প্রচণ্ড গতিতে ভগ্ন হইয়া যায় এবং সেক্ষেত্রে প্রায় ১০০০ মিটার গতিবেগ পাইয়া থাকে। ষাণ্ডা প্রদানকারী বিস্ফোরকগুলি ধীরে ধীরে ভগ্ন হয়—ইহার। যদি ক্রমশঃ সক্রিয় না হইত তবে কামান, বন্দুক প্রভৃতির শরীর প্রতি আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত। যত বড় গোলাগুলি তত ধীর আঘাত প্রয়োজন। এই ক্রমিক পর্যায় আবার প্রপেলেণ্ট বিস্ফোরকের কণাগুলির আকারের উপর নির্ভর করে। কাজেই দরকারমত আকারের অদলবদল নিত্য প্রয়োজন। ছোট ছোট বন্দুকে ভাল চূর্ণ ব্যবহার করিতে হয় এবং ১৬ ইঞ্চি কামানে বেশ একটু বড় টুকরা ব্যবহার করিলে ভাল হয়।

গান-পাউডার আমাদের বহু-পরিচিত প্রপেলেণ্ট। বর্তমান কালে যুদ্ধে ইহার ব্যবহার কম। অধুনা ধূমহীন চূর্ণের প্রচলন বেশী। গান-পাউডারের প্রধান দোষ ইহাতে ভীষণ ধ্বংস

উৎপন্ন হয়, যাহাতে শত্রুগণ অনায়াসে বিপক্ষের সন্ধান পাইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইহাদ্বারা বন্দুকের নল অতি সস্তর নষ্ট হয়। নাইট্রোসেলুলজ বিষ্তর ভাবে তৈয়ার হইলে ইহাকে ধূমহীন চূর্ণ বলে। ইহার অপর নাম গানকটন। চাপদ্বারা ইহাদিগকে ক্ষুদ্রায়তন করিয়া সাবমেরিন মাইন ও টারপেডো প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হয়।

কামানের গোলায় মধ্যে যে উচ্চ বিস্ফোরক দেওয়া হয় তাহা অত্যধিক আন্তবিদারণশীল না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বেশী বিদারণশীল হইলে উহার। কামানের মধ্যেই ফাটিয়া যাইবে, লক্ষ্য বস্তুকে ধায়ের করার ক্ষমতা ইহার থাকিবে না। এ দ্বিতীয় উচ্চ বিস্ফোরকগুলি প্রায়ই আলকাতরা হইতে সমুৎপন্ন। ইহাদের অপর একটির নাম পিক্রিক এসিড। শুনা যায়, গত মহাযুদ্ধে গোলাবারুদ হিসাবে ইহার খুব কদর ছিল। কিন্তু অনেক সময় ইহা গোলায় ধাতবপদার্থের সঙ্গে যুক্ত হইয়া মহা বিজ্ঞাত ঘটাইত। এই বিপদ হইতে টি. এন. টি. সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছে।

## রাষ্ট্রভাষা

শ্রীরেণু দাশগুপ্ত, এম-এ

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা লইয়া পূর্বেও বহু বিতর্কমূলক সমালোচনা হইয়া গিয়াছে, এখনও বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করিবার জন্ত বহু বৎসর যাবৎ প্রচেষ্টা চলিয়াছে। সমৃদ্ধি, বিস্তৃতি ও ব্যাপকতার দিক দিয়া বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্ত বাংলাদেশে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি মত প্রকাশ করিয়াছেন। যে-কোন একটি প্রাদেশিক ভাষা, তাহা যত সমৃদ্ধিশালী হোক, কিংবা যতদূর বিস্তৃতি-সম্পন্ন হোক, রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হইলে সমালোচনার স্থিতি হইবেই। প্রতিজ্ঞাশীল বা প্রাদেশিকতা মূলক মনোবৃত্তি যুক্তিতর্কের উপরে উঠিয়া কোন একটি প্রাদেশিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করিতে চাহিলে সমালোচনা, প্রতিবাদ এমন কি বিক্ষোভ প্রদর্শনে জনসাধারণ বিরত হইবে এমন মনে করিবার কারণ নাই। সম্ভবতঃ এই কারণেই উক্ত কৈলাস নাথ কাটজু সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করিবার জন্ত আহ্বান জানাইয়াছেন।

হিন্দী, বাংলা ও সংস্কৃত এই তিনটি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি থাকিলেও, তিনটির যে-কোনটিরই রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় রহিয়াছে। অন্ততঃ বর্তমান ভারতে অদূর ভবিষ্যতে এই তিনটি ভাষার একটিরও রাষ্ট্রভাষা হওয়া সম্ভব নয়।

প্রথমতঃ হিন্দীই ধরা যাক। হিন্দী এবং হিন্দুস্থানী ভাষার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে শুনিয়াছি। সে পার্থক্য কি এবং কত দূর তাহা আমাদের জানিবার কথা নহে। তবে হিন্দী ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইবার পক্ষে যতগুলি যুক্তি রহিয়াছে তাহার মধ্যে ইহাই প্রধান এবং একমাত্র যুক্তি এই যে, ভারত-বর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের লোকই হিন্দী অথবা হিন্দুস্থানী ভাষা অল্পবিস্তর বুঝিতে পারে ও উক্ত ভাষায় কথোপকথন করিতে পারে। কেবলমাত্র এই কারণেই হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার বিপক্ষেও যুক্তির অভাব নাই। ডাঃ বি এস মুঞ্জের মতে,

“হিন্দুস্থানী ভাষায় সাধারণ কথাবার্তা বা হাটবাজারের কাজ চলিতে পারে। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক, শিক্ষাসংক্রান্ত, ও বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে হিন্দুস্থানী ভাষার ভাঙারে যথার্থ শব্দের একান্ত অভাব।” (হিন্দুস্থান—১২ই পৌষ ১৩৫৪)

প্রত্যেক দেশেই অভিজাত, সংস্কৃতিসম্পন্ন ও শিক্ষিত শ্রেণীর একটি নিজস্ব ভাষা আছে। এই ভাষাও এই শিক্ষিত শ্রেণীর অন্ততম বৈশিষ্ট্য। যে ভাষাতে পণ্ডিতজনেরা, উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিরা কাজকর্ম পরিচালনা করেন, যে ভাষায় ইহার। কথোপকথন ও ভাবের আদান-প্রদান করিয়া থাকেন সেই

ভাষায় এমন একটি আভিজাত্যের সৃষ্টি হয়, যে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা সেই ভাষাতেই উৎসারিত হইয়া থাকে। ইহাকে যুক্তিহারা খণ্ডন করা যায় না। আভিজাত্য, সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা মানব-চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা। আমাদের দেশেও, কারণ যাহাই হোক, উচ্চ-শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ ও পণ্ডিতজনের নিত্যব্যবহার্য্য একটি ভাষা প্রচলিত হইয়াছে। যে সশ্রদ্ধ অধুরাগ এই ভাষার প্রতি আমাদের রহিয়াছে, সেই দিক হইতে বিচার করিলে সত্যকে স্বীকার করিয়া বলিতেই হইবে হিন্দি ভাষার প্রতি আমাদের সেই আভিজাত্যবোধজনিত শ্রদ্ধা নাই—যাহা রহিয়াছে ঐ বিদেশী ভাষা ইংরেজীর প্রতি। প্রায় দুই শত বৎসর ইংরেজ শাসনের ফলে যে অঞ্চল ভারত সৃষ্ট হইয়াছিল তাহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ স্থাপন এবং ভাবের আদান-প্রদানের ভাষারূপে ইংরেজী ভাষার অবদানের সুফল আমাদের জাতীয় জীবনে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং কয়েকটি মাত্র যুক্তি প্রদর্শনে ইংরেজী ভাষাকে বর্জন করিয়া সেই স্থলে হিন্দি ভাষাকে গ্রহণ করিতে অনেকেই বাধিবে। যদি হিন্দিই রাষ্ট্রভাষা হয়, যদি হিন্দিকেই ইংরেজীর স্থলাভিষিক্ত করিতে হয় এবং আন্তঃপ্রাদেশিক কথোপকথনের বাহনরূপে ধরিয়া লওয়া যায়, তবে এক প্রদেশের উচ্চশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে অত্র প্রদেশের অনুরূপ ব্যক্তির সহিত পত্রাদি বিনিময় অথবা আলাপাদি হিন্দিতে চালাইতে হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, একজন বাঙালী আই-সি-এস অথবা অধ্যাপক অথবা তদনুরূপ পদস্থ ব্যক্তিকে একটি মাস্ত্রাজী সমতুল্য, সমপদস্থ ব্যক্তির সহিত অতঃপর সম্বন্ধে ইংরেজী পরিহার করিয়া হিন্দিতে অনঙ্গল কথোপকথন ইত্যাদি চালাইতে হইবে। কিন্তু বাস্তবতার দিক হইতে ইহা সম্ভব নয়। বহু বৎসর পর্য্যন্তও ইহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। যত বড় উচ্চশিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিই হউন না কেন, বাঙালী বাঙালীর সহিত বাংলাতেই কথা বলিবেন, হিন্দুস্থানী হিন্দিতেই বলিবেন, মাস্ত্রাজী নিজ ভাষাতেই বলিবেন। কিন্তু ভিন্ন প্রদেশের লোকের সহিত ঐরূপ ব্যক্তিগণ কথা বলিবার কালে দূর ভবিষ্যতেও হিন্দি ব্যবহার করিতে সম্মত হইবেন এইরূপ মনে হয় না। এই বাংলাদেশেই এখনও অনেক ক্ষেত্রে লোককে হিন্দির সাহায্যে কথা বলিতে দেখা যায় কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর লোকের সহিত তাঁহারা হিন্দিতে কথা বলেন না। সুনিয়াছি এককালে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে বাংলাকে সম্বন্ধে পরিহার করিয়া দেশীয় ভাষারূপে ছেলেমেয়েদিগকে হিন্দি শিখান হইত। কিন্তু আভিজাত্যসূচক ভাষারূপে সে সমাজে চলিত ইংরেজী। এই সমাজের অস্তিত্ব আজও লোপ পায় নাই এবং অদূর ভবিষ্যতেও পাইবে বলিয়া মনে হয় না।

ইহার কাহারো তাহা বলিয়া দেওয়া আবশ্যক করে না। আজও ইহার ইংরেজী বর্জন করিবেন কিনা তাহাই বিবেচ্য।

অতঃপর বাংলা। বাংলার রাষ্ট্রভাষা হইবার পক্ষে যত যোগ্যতাই থাকুক না কেন, বাংলা কদাপি রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত হইতে পারিবে না—ইহা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি। বাংলা এবং বাঙালীকে বাংলার বাহিরে যে কেহ আমল দেয় না ইহা সুবিদিত ঘটনা। কারণ যাহাই থাক বাঙালী আজ সর্বভারতীয় ব্যাপারে স্থান হারাইতে বসিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বাঙালীর প্রতি প্রতিবেশী প্রদেশ আসামের আচরণের কথাই ধরা যাক। কেবলমাত্র বাঙালী বলিয়া ক্রীষ্ট এবারে গণভোটের সময় আসাম গবর্নমেন্টের নিকট হইতে যথোচিত সহায়তা লাভ করে নাই এমন কথাও শুনা গিয়াছে। পণ্ডিতেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে লিখিত এক-খানা ব্যক্তিগত পত্র হইতে এই সম্বন্ধে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

“I also told you about the position of Sylhet. A very snobby treatment was meted to this district. The Congress Ministry was there. They did nothing and saw the fun. There had always been a grudge. Things would have been different had Mr. Bardolai interested himself.”

ইহা ভিন্ন আসাম হইতে বাংলা ভাষাকে দূর করিবার প্রচেষ্টার অভাব নাই ইহাও সংবাদপত্রের খবর। অসমীয়ারা অনেকেই বাংলা জানেন, বহু শিক্ষিত অসমীয়া বাংলায় আসিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছেন বলিয়া উত্তমরূপে বাংলা ভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন। বাংলা ও অসমীয়া ভাষার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান, বৈসাদৃশ্য অধিক নহে। তথাপি বাংলা ঐ প্রতিবেশী প্রদেশেই অচল। আর আসামুজ্জ্বল হিমালয় সমগ্র দেশে বাংলাকে কেহ গ্রহণ করিবে ইহা অবাস্তব কল্পনা। অত্যাশ্রয় প্রদেশের অধিবাসীদের—ঈহারো বাংলা কিছুমাত্র জানেন না বাংলা ভাষার সহিত ঈহারদের ভাষার কোন সাদৃশ্য নাই, তাঁহাদিগকে বাংলা শিক্ষা করিতে ও রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা অসম্ভব তথা অসঙ্গত। সুতরাং বাংলার রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা থাকিলেও বাংলা সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারিবে না।

ইহার পর সংস্কৃত। হিন্দি অথবা বাংলা অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী অনেক বেশী। ইহার যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই সহজে উঠিতে পারে না। ইহা ভারতের প্রত্যেকটি প্রাদেশিক ভাষার জননী। প্রাচীনত্ব, সমৃদ্ধি, আভিজাত্য ও সম্পদে এই ভাষা পৃথিবীতে অতুলনীয়। ডাঃ বি, এস, মুন্সের মতে,

“বাসীন ভারতের রাষ্ট্রভাষার স্থান গ্রহণ করিতে পারে, এমন একটি মাতৃভাষা আছে, সে ভাষা সংস্কৃত।”

ইহা ভিন্ন সংস্কৃত যদি রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত হয় তবে

আপত্তি করিবার মত যুক্তি কোন প্রদেশই বিশেষ কিছু প্রদর্শন করিতে পারিবে না। সংস্কৃতের মর্যাদা ও মূল্য সার আন্তোষ বহু পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। একথা দেশবাসীর শ্রমণ থাকিতে পারে সার আন্তোষ এক সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি অত্যাশঙ্কক বিষয়গুলিকে অবশ্যপাঠ্য তালিকা হইতে বাদ দিয়াছিলেন বলিয়া সমালোচনার পাত্র হইয়াছিলেন। দেশে যে-কোন উপায়ে অধিকসংখ্যক লোকের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তার তাঁহার কাম্য ছিল বলিয়া শিক্ষার পথকে সকলের নিকট তিনি সুগম ও সহজ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাস, ভূগোলের ভায় অত্যাশঙ্কক বিষয় বাদ দিলেও তাঁহার আমলে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য ছিল। তথাপি একথা অস্বীকার করা যায় না প্রবেশিকা বা বি-এ পর্যাঙ্ক সংস্কৃত পড়িলেও তথাকথিত মৃত ভাষা বলিয়াই হোক কিংবা ইহাকে দৈনন্দিন জীবনে এত অব্যবহার্য্য করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়াই হোক, কাজকর্ম চালাইবার মত করিয়া সকলকে ইহাতে শিক্ষা দিয়া রাষ্ট্রভাষা রূপে চালানো শিক্ষা সহজসাধ্য বলিয়া মনে হয় না।

ইহা সকলেই জানেন আজও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংগ্রহের জন্ত সংস্কৃত হইতেই শব্দ সংগ্রহ করা হয়। ইহা দ্বারা সকল সময়ে না হইলেও সময় সময় চুন্নহ শব্দসমূহ সংগৃহীত হয় বলিয়া বাংলা ভাষার জটিলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দুষ্টান্ত-রূপ বলা যায়—“সেক্রেটারিয়েট” শব্দটির অনুবাদ করিয়া “সরকারী মহাকরণ” নামকরণ হইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ। এই স্থলে বহুপ্রচলিত “সেক্রেটারিয়েট” শব্দটির রূপ-প্রকাশের জন্ত ফারসি কিংবা আরবী এবং সংস্কৃত এই দুইটি ভাষার সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই ভাবে বহু ইংরেজী শব্দকে, যাহা বাংলার ভায়ই আমরা গ্রহণ করিয়া লইয়াছি, যাহা বৃত্তিতে ও বুঝিতে আমাদের কোন প্রকার বেগ পাইতে হয় না ও আমাদের মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত, তাকে প্রকাশের জন্ত বিদেশী শব্দগুলিকেই গ্রহণ করিলে ভাষার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে পারে। বিদেশী আরবী ফারসি শব্দও এইভাবে আমাদের ভাষায় মিশ্রিত হইয়াছে এবং ঐগুলিকে বর্জন করিবার জন্ত সংস্কৃত শব্দ সংগ্রহ করা হয় নাই—উহার কল্পনাও কেহ কখনও করেন নাই। ইংরেজী বর্জনের জন্ত সংস্কৃতের সহিত আরবী ফারসির সহায়তা লইয়া এবং সেই সঙ্গে দেশীয় ভাষা জুড়িয়া এক “মডার্ন উর্দু” ভাষা প্রবর্তনের প্রয়োজন কি?

এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—প্রায় দুই শত বৎসর ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরেজী ভাষার জটিলতা অন্তর্হিত হইয়াছে। অথও ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হিসাবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্থান প্রতিষ্ঠিত করিবার সহায়তা দ্বারা এই সমৃদ্ধিশালী বিদেশী ভাষা

আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করিয়া পারে নাই। কয়েক বৎসর পূর্বেও প্রবেশিকাতে বাংলাদেশে ইংরেজীই শিক্ষার বাহন ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন হইতে বাদ দেওয়ায় আমাদের দেশের ছাত্রগণের মেধা কিংবা কৃতিত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। ছুংখের সহিত স্বীকার করিতে হয় বাংলা ও বাঙালী মৃত দিন ইংরেজী ভাষার সহায়তায় শিক্ষালাভ করিয়াছিল সমগ্র ভারতের প্রতিযোগিতায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে সময় বাংলা ও বাঙালী অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। যে শিক্ষার বাহন ছিল ইংরেজী সেই শিক্ষাই বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আন্তোষ, রামানন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রহ্লাদচন্দ্র, সুভাষচন্দ্রের যুগ্ম করিয়াছিল। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হইবার পর সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, দর্শনে, সাংবাদিকতায়, রাজনীতিতে আর এইরূপ বিদগ্ধ কৃতী সন্তানের উৎপত্তি বাংলায় শীঘ্র হইবার সম্ভাবনার সূত্রপাত এখন পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই।

বিদেশী শাসকের ভাষা হিসাবে যাহারা ইংরেজী ভাষাকে বর্জন করিতে চাহেন তাঁহাদের যুক্তি সর্বথা সমর্থনযোগ্য। কিন্তু ইহা কেবলমাত্র বিদেশী শাসকেরই ভাষা ছিল কিনা তাহাই বিবেচ্য। বিদেশী শাসককুল ইংরেজী ভাষার সহায়তায় আমাদের দিয়া সাম্রাজ্য পরিচালনায় সম্পূর্ণ সহায়তা লাভ করিয়াছে ইহা নিতান্তই সত্য। শাসকের ইচ্ছায়ই হোক কিংবা অনিচ্ছায়ই হোক আমরা যে ইংরেজী শিক্ষার সহায়তায় প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হইয়াছি সে বিষয়ে মতবিরোধ থাকিতে পারে না। দুষ্টান্ত-রূপ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের উক্তি নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

“However wrongly English language made its way in our life, the fact remains that it has influenced our mental and educational outlook for the past 150 years. This state of affairs though harmful in some ways has also benefited us in many ways. We have to acknowledge it without reservation. The English language has been responsible for creating a bond of mental fellowship in all the educated Indians from Kashmir to Cape Comorin. It is connecting link between all the provincial governments, universities, legislative assemblies, public platforms and national organisations. Through English, India cultivated direct-intellectual relationship with Europe and America. Her voice reached the outer world without any intermediary. I do not feel slightest hesitation in saying that India's position and recognition in the international world are greatly due to our having recourse to English languages, written and spoken.”

(অমৃতবাজার পত্রিকা—২২শে ডিসেম্বর ১৯৪৭)। অমৃত

তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাও উদ্ধৃত করা গেল :—

“By Indian nationalism it is not meant that we should forget the English language and literature and that we should have nothing to do with Milton or Shakespeare.”

(অমৃতবাজার পত্রিকা—২২শে ডিসেম্বর ১৯৪৭)



ইংরেজী ভাষা সম্পূর্ণরূপে অথবা অংশতঃও বর্জন করিলে আমাদের দেশে একটি নূতন “ব্রাহ্মণ্যশ্রেণীর” উদ্ভব হইবে। কারণ কেবল বাংলায় নহে, সমগ্র ভারতবর্ষে এইরূপ এক-শ্রেণীর অভিভাবক আছেন যাহারা তাঁহাদের সম্মানসম্বন্ধিত-গণকে ইংরেজী ভাষা এমন কি ইংরেজী কায়দাও সর্বাঙ্গতঃ করণে শিক্ষা দিবেন। ইংরেজী ভাষার আভিজাত্য, ইহার আন্তর্জাতিক মর্যাদা এবং প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রেও বিদেশী শিক্ষা গ্রহণে ইহার উপযোগিতা ইত্যাদি কারণে ঐ সকল সম্পন্ন অভিভাবক শ্রেণী কেবলমাত্র নিজ মাতৃভাষা এবং রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দি ইত্যাদি সম্মানদিককে শিক্ষা দিয়াই বিরত ও সম্বৃত থাকিবেন না। এইরূপ অভিভাবকের সংখ্যা এদেশে নগণ্য নহে, এমন কি নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তিও এইরূপ অভিভাবকের শ্রেণীতেই পড়িবেন। আজও ইংরেজ পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে ভর্তির জন্য বহু অভিভাবক পাঁচ ছয় বৎসর পর্যন্ত “ওয়েস্ট-লিটে” ছেলেমেয়েদের নাম রাখিয়া অপেক্ষা করেন বলিয়া শুনিয়াছি। এইরূপ একটি শ্রেণী থাকার দরুন দেশীয় ভাষার সহায়তায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা ইংরেজী ভাষার সহায়তায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ লাভ করিবে; বিশেষতঃ আজ পৃথিবী ছোট হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধরে রাখিয়া, ধরে বসাইয়া “মাথুষ” না করিয়া “বাঙালী” করিয়া রাখিতে এবং থাকিতে অনেকাই চাহিবে না। এক শ্রেণীর লোক বহির্জগতের কাজ, বড় কাজ, আন্তঃপ্রাদেশিক কাজ যখন একচেটিয়া করিয়া লইবে, অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল অবস্থার লোকেরা সুযোগের অভাবে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও কেবলমাত্র দেশীয় রাষ্ট্রভাষায় শিক্ষিত হইয়া কাজকর্ম পরিচালনা করিতে অভ্যস্ত হওয়ায়, অসচ্ছল জাতীয় জীবনে ঐ নূতন “ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর” সৃষ্টি হইবে। সমাজগত অথবা শিক্ষাগত কোন ক্ষেত্রেই আর “ব্রাহ্মণ্যের” প্রয়োজন নাই।

একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ইংরেজী ভাষাকে আমরা পরিহার করিতে চাই বিদেশী শাসকের, তথা বিদেশী ভাষা বলিয়া। ইংরেজী ভাষাকে বিদেশী ভাষা বলার মধ্যে তুল রাখিয়াছে। ইংরেজী সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভাষা। ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাগোষ্ঠীকে সাতটি গুণ অথবা বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সংস্কৃতজ্ঞ ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ জার্মান পণ্ডিতগণ সে গুণকে ইণ্ডো-জার্মান গুণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; উহা ব্যাপক নহে মনে করিয়া অস্ফাট পান্ডিত্য পণ্ডিতগণ এই গুণকে ইণ্ডো-ইয়োরোপীয়ান (Indo-European) গুণ আখ্যা দিতে চাহিয়াছেন। Inflected language অথবা বিভক্তিয়ুক্ত ভাষা হিসাবে ইণ্ডো-ইয়োরোপীয়ান গুণের ইউরোপীয় ভাষা-সমূহের আদি জননী যে সংস্কৃত তাহা এক ভাষা হইতে ভাষার

রূপান্তর প্রদর্শন করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পণ্ডিতগণ প্রমাণিত করিয়াছেন। এই হিসাবে ইংরেজী ভাষা সূদূর অতীতে সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন একটি ভাষা; সুতরাং ইহা সম্পূর্ণরূপে বিদেশী ভাষা নহে। সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত যে-কোন দেশীয় ভাষা যে-কোন যুক্তির বলে যদি রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করিতে পারে, তবে দুই শত বৎসর ব্যাপী জাতীয় জীবনে অস্ফাট ভাবে বিকৃত, বিবিধ উন্নতির উৎস, সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত ইংরেজী ভাষার রাষ্ট্রভাষা থাকিতে আপত্তি কি? ডাঃ জামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাংলা ভাষাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যায় শিক্ষার বাহনরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংলার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। ইংরেজী সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত নীচে দেওয়া গেল :—

... “At the same time,” Dr. Mookerjee continued, “the place of English in our system of education must also be carefully decided. The decision must be taken, not from any political standpoint but purely in relation to needs of India’s national development and her international contacts. In fact, our universities must provide fuller facilities to our students for learning the *great language of the world* so that they may readily gather the highest treasure of thought in the dominion of letters and sciences.” (*Italics mine*).

(অমৃতবাজার পত্রিকা—২৬শে ডিসেম্বর ১৯৪৭)

আমরা বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। ছদ্মগুণ আমাদের প্রিয় সামগ্রী। এই ছদ্মগুণে একবার আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কেও “গোলামখানা” বলিয়া বয়কট করিয়াছিলাম। সেদিন উপলব্ধি না করিলেও পরে লোকে বুঝিতে পারিয়াছিল বিশ্ববিদ্যালয় বর্জন করিবার বস্তু নহে। এক দিন লোকে ইহাও বুঝিবে ইংরেজী ভাষা পরিবর্তনের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। মোলানা আজাদের মতে “Instead of small cooked up nationalism the world wants to build super-nationalism.” নন্দীম বিজয়ের পর বহুশত বৎসর পর্যায় ফরাসী ভাষা ও সভ্যতা ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে ওতপ্রোত ভাবে বিকৃত ছিল। শতবর্ষের যুদ্ধের ফলে স্বতন্ত্ররূপে ফরাসী সভ্যতা ও ভাষা ইংরেজ জাতীয় জীবন হইতে বিদূরিত হইয়াছিল। দূর ভবিষ্যতে হয়ত যুদ্ধ ছাড়াও এইরূপ প্রয়োজনের তাগিদ উপস্থিত হইবে তখন যাহা কিছু বিদেশী তাহা সমস্তই স্বতঃই বিদায় গ্রহণ করিবে। জবরদস্তি করিয়া, সংকীর্ণ জাতীয়তার দোহাই দিয়া, ছদ্মগুণে মাতিয়া এখনই ইংরেজী বর্জনের সময় আসে নাই। কারণ nationalism অপেক্ষা super-nationalismই আজ আমাদের তথা সমগ্র জগতের কাম্য।\*

\* লেখিকা এখানে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে যে-সব যুক্তি উপস্থাপন করিয়াছেন তাহা প্রাধান্যযোগ্য। তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে, কোন বিদেশী ভাষা বা মৃত ভাষা স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে না। দেশের কোন চলতি ভাষা—যে ভাষা অধিকাংশ লোকের নিকট সহজবোধ্য, রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্য। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, বর্তমানে যে ইংরেজী বর্জনের দ্বারা উদ্ভিষ্ট তাহাও অসমীচীন বলিয়া আমরা মনে করি।

—প্রবাসীর সম্পাদক।

# ভারতীয় চিত্রকলায় অবনীন্দ্রনাথের স্থান

শ্রীঅনিলকুমার আচার্য

সাহিত্য ও শিল্পকলার আমরা প্রত্যেকেই এক এক জন বড় সমর্থদার, যেমন সমর্থদার আমরা অভিনয়কলার ও রাজনীতির। আমরা আমাদের নিজস্ব মতবাদকেই প্রামাণ্য মনে করে অস্ত্রের মতামতকে চাই উড়িয়ে দিতে; আর তার ফলেই সৃষ্টি হয় যত বাদানুবাদের।

কিন্তু সাহিত্য বা চিত্রশিল্পের—শুধু সাহিত্য বা চিত্রশিল্প কেন—যে-কোন শিল্পেরই বিচারে একপন্থেরাচার চলেনা। আমাদের অত্যন্ত মানসিক বৃত্তিসমূহের মত রুচির উৎকর্ষও শিক্ষা আর অহুশীলন সাপেক্ষ। রুচি শিক্ষিত ও মার্জিত না হলে কলাশিল্পের বহুমুখী প্রকাশ ও আবেদন সম্পূর্ণরূপে হ্রদয়ঙ্গম করা প্রায় অসম্ভব।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতি আজও প্রধানতঃ পরীক্ষা পাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রাশীকৃত পাঠ্য পুস্তক মুখস্থ করে কোন রকমে একবার পরীক্ষাগৃহে উল্লীর্ণ করতে পারলেই হ'ল, কিন্তু জীবনের সঙ্গে আমাদের এই শিক্ষার সংযোগ কোথায়? কোথায় মানুষের সূক্ষ্মার বৃত্তি ও রুচিসমূহের বিকাশের ব্যবস্থা? প্রাচ্যবিজ্ঞার প্রতি অবজ্ঞা-পরায়ণ মেকলে-প্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষা থেকে আমরা অনেক কিছু লাভ করেছি সন্দেহ নেই; কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, ঐ শিক্ষাপদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছিল ইংরেজের বাণিজ্য-বিস্তার ও সাম্রাজ্য-পরিচালনার প্রয়োজনে। প্রকৃত শিক্ষার তাগিদ তার মধ্যে খুব কমই ছিল। পরিণামে আমরা যে পরিমাণে শিক্ষালাভ করলাম সে পরিমাণে বিজ্ঞা বা জ্ঞানলাভ আমাদের হ'ল না এবং যা-কিছু ভারতীয় তার প্রতি আমরা উপেক্ষা-পরায়ণ হয়ে উঠলাম।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নব জাতীয়তাবোধের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনজ্বরের এক ক্ষীণ প্রবাহ জাতির জীবনে দেখা দিলে এবং কালক্রমে বঙ্গভঙ্গ ও অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতির ভিতর দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রগতির সঙ্গে তা বর্তমানে বিরাট পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু আন্দোলনজ্বরের এই ধারা শুধু জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নি; আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও ভাষার প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধাবান করে তুলেছিল।

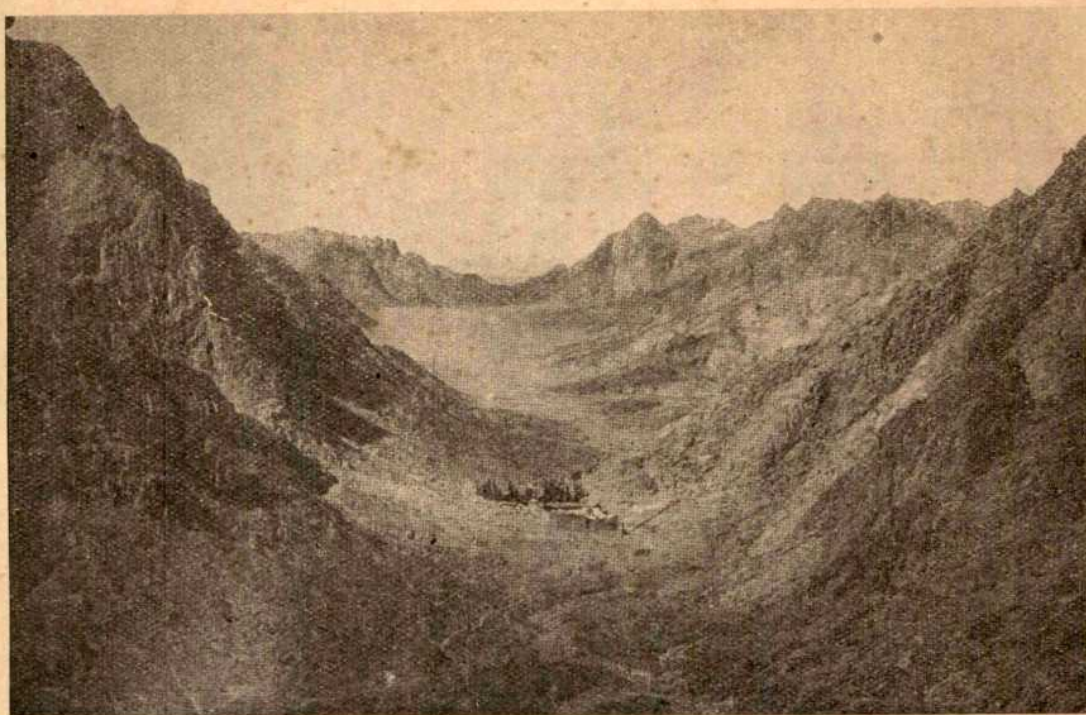
অত্যন্ত ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই জাতীয়তাবোধ যথেষ্ট বিকাশ লাভ করেছিল সত্য; কিন্তু চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে আমরা পরমুখাপেক্ষীই ছিলাম। বিজ্ঞাতীয় শিক্ষার কুফল আমাদের চিত্রশিল্পের উপরেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ফলে আমাদের দেশের চিত্রশিল্পীদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, ভারতবর্ষে কোনকালে সভ্যসমাজোচিত শিল্পমান ছিল না—ইউরোপই হ'ল চিত্রশিল্পের প্রকৃত বিকাশভূমি, আর খ্রীস্টীয় ও ইতালীয় চিত্রশিল্পই হ'ল কলানৈপুণ্য ও শিল্পমানে প্রকৃত রসোত্তীর্ণ। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমাদের চিত্রকলাবিদগণ ইউরোপীয় চিত্রশিল্পের আদর্শে ও পদ্ধতিতে চিত্ররচনায় মনোনিবেশ করলেন। জাতীয় জীবনের সহিত সংযোগবিহীন এই অহুকারিতার ফল সহজেই অহুমেষ।

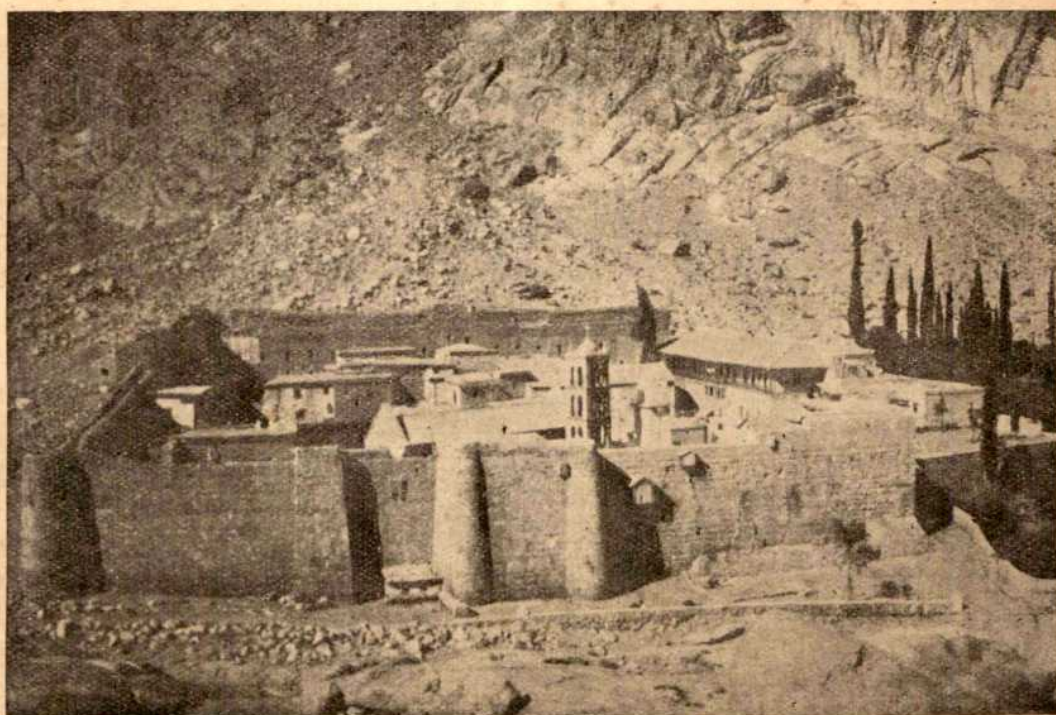
ইউরোপীয় চিত্রের ব্যর্থ অহুকারিতা যখন দেশের কচিকে এভাবে বিকৃত ও পঙ্ক করে তুলেছিল সেই যুগসন্ধিক্ষণে অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। নূতন মতবাদ, নূতন আদর্শ, বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী ও চিত্রের অভিনব উপকীর্ষা নিয়ে শিল্পীদের আসরে তিনি অবতীর্ণ হলেন। অতীতের গৌরবময় যুগে চিত্রকলা ও ভাষার মধ্য দিয়েও ভারতের বিশিষ্ট বাণীটি আত্মপ্রকাশ করেছিল—অল্প কথায় এটাই হ'ল অবনীন্দ্রনাথের মত।

তিনি প্রথমতঃ পামার ও গিলবার্ডের নিকট থেকে ইউরোপীয়, বিশেষ করে ইতালীয়, চিত্রবিজ্ঞায় শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। কিন্তু এক দিন ঠাকুরবাড়ীর বিরাট গ্রন্থাগারে পুরনো এক ইন্দো-পার্সিয়ান পাণ্ডুলিপির চমৎকার বর্ণ-সমারোহ তাঁর সমস্ত হৃদয়কে এক মুহূর্তে জয় করে নিলে; তিনি যেন এক নূতন শিল্পরাজ্যের সন্ধান পেলেন। সেটা ঊনবিংশ শতাব্দীর নবম দশকের ঘটনা। তারপর থেকে অবনীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে ভারতীয় চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির উন্নতিবিধানে স্বকীয় প্রতিভা নিয়োজিত করলেন। প্রথম প্রথম হয়ত প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত অবনীন্দ্রনাথের চিত্রগুলো অহুকারণের দোষযুক্ত হয় নি; কিন্তু দেশের নাড়ীর সহিত সংযোগবিহীন ইউরোপীয় চিত্রকলার প্রভাব থেকে মুক্ত করে তাকে আমাদের জাতীয় জীবনের গহ্বোত্তীর্ণ পুণ্য প্রবাহের সহিত মিলিত করার এই ছিল সর্বোচ্চ পন্থা। সৌভাগ্যক্রমে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ই বি জাভেলের (তিনি তখন গবর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন) সাহচর্যে অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কনে অসামান্য সফলতা লাভ করলেন। আজ অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রতিভা জগৎ-বিখ্যাত; শিল্পকলার ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। চিত্রকলায় জাতীয় ভাব-অভ্যুদয়ের যে পরীক্ষা ও আন্দোলন তিনি আরম্ভ করেছিলেন, তা সামান্য বীজ থেকে তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হয়ে আজ বিরাট মহাবীজের পরিণত। শিল্পীর এই নব ভাবভোতনায় অহুপ্রাণিত

প্যালেষ্টাইন সীমান্তের দৃশ্য



ওয়াডি এও ডেইর নামক পার্বত্য অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় মঠ—কনভেন্ট অব সেন্ট কাথারিন

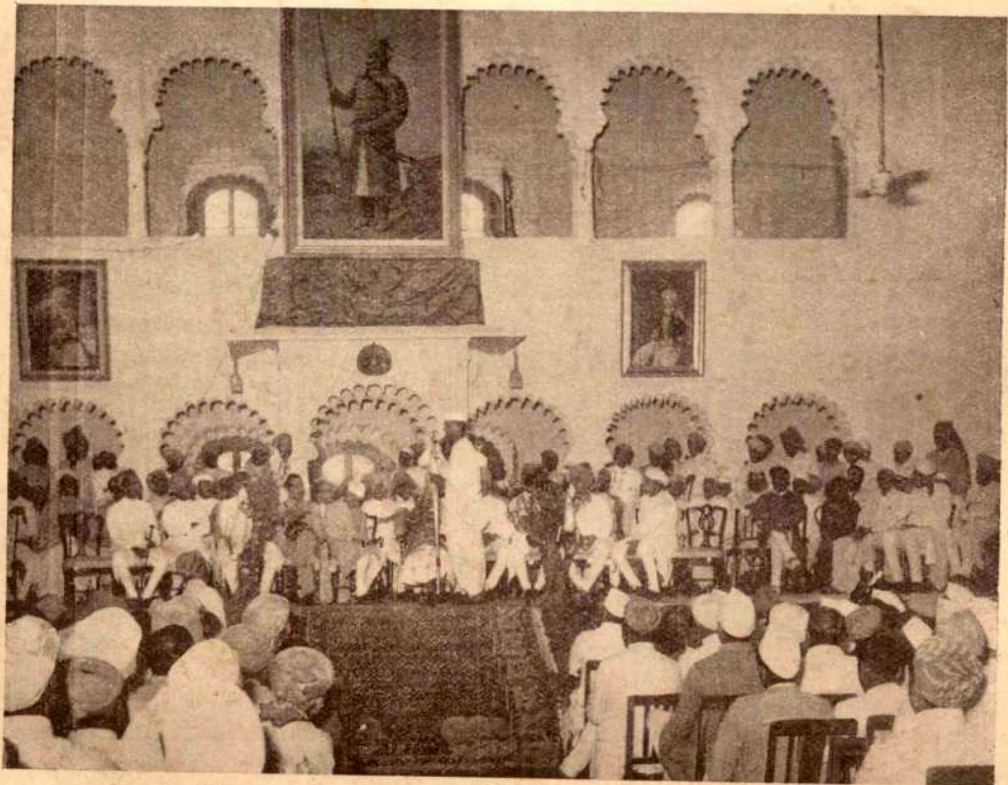


মাউন্ট সিনাইয়ের উপর প্রাকারবেষ্টিত কনভেন্ট অব সেন্ট কাথারিন





নিউইয়র্ক টাউন হলে আমেরিকার ইণ্ডিয়া লীগের উদ্বোধনে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিপুঞ্জ।



পুনর্গঠিত রাজস্থান ইউনিয়নের সভায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর উপস্থিতিতে উক্ত ইউনিয়নের প্রধান মন্ত্রী বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন

হয়ে নন্দলাল প্রমুখ কতিপয় শিল্পপ্রতিভাসম্পন্ন যুবক এগিয়ে এলেন অবনীন্দ্রনাথের শিল্পরূপ গ্রহণ করতে; আর সমগ্র ভারতে শিল্পরসস্রাব্য তিনি পূর্ণ সৌরবে অধিষ্ঠিত। ভারতের যে-কোন অংশে যে-কোন আঁট ছুঁলে আজও অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রশিদ্ধগণ শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী এবং তাদের সে পদাধিকার নিছক শিল্পপ্রতিভারই বলে।

অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত চিত্রগুলো আমাদের জাতীয় সম্পদ। তাঁর 'শাহজাহানের দেহভ্যাগ', 'অশোক-মহিষী', 'শাহজাহানের তাক নির্মাণের স্বপ্ন', 'কচ ও দেবযানী', 'ভারতমাতা', 'বুধ ও সুরভাতা', 'অভিসারিকা', 'পুকারিণী', 'নির্ঝাসিত যক্ষ', 'দেবদাসী', 'ওমর খৈয়ামের কুবাইয়াত', 'আলমগীর', 'মহাপ্রস্থান' প্রভৃতি চিত্রগুলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রসমূহের সমতুল্য। আজ দেশ স্বাধীন; আশা করা যায়, আমাদের জাতীয় গবর্ণমেন্ট জাতীয় মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রনিচয়কে যথাযোগ্য মর্যাদা দেবেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপকরূপে প্রবৃত্ত তাঁর

বহুতাবলী চিরকাল শিল্প ও সাহিত্যাহুরাগীদের অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত হয়ে থাকবে।

অবনীন্দ্রনাথের এক শিল্প বলেছিলেন,

"This orientation in the life of Abanindranath has effected what the Renaissance did for Europe. Abanindranath's works created an awakening to a new understanding of Art reflecting itself in all branches of national progress; in sculpture, architecture and literature as well."

এই উক্তির সত্যতা স্বয়ং সন্দেহের অবকাশ নেই। রাজ-নৈতিক নেতৃবৃন্দ জনমনের মোড় ফিরিয়েছেন স্বদেশের প্রতি, আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারের প্রতি; আর অবনীন্দ্রনাথ দেশমানসকে ফিরিয়েছেন বিদেশী সংস্কৃতির অসুকারিতা হতে দেশের অতীত গৌরবময় সংস্কৃতির সচেতনতা লাভের মধ্য দিয়ে দেশের শিল্প-সাধনার প্রতি, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতি। অথচ অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনা শুধু পুরাতনের জয়গানই নয়; জীবনের সহিত, দেশমানসের সহিত এর সংযোগ অবিচ্ছেদ্য।

## অরণ্য

### ত্রিপাৰ্থপ্রতিম দে

হে অরণ্য—আজো কেন নির্বাকুনিশ্চল !

কেন আজো পর্বতের অন্তরের ভাষা,

তার চিরবিরহের রক্ত অশ্রুজল

জীবনের অপরূপ আশা,

ভাস্কিয়া টানিয়া আনি' বাহির-আলোকে

মূর্ত করিছ না ;

কেন এই বিশ্ব হতে সহস্র বেদনারাশি,

পলে পলে তিলে তিলে অবিশ্রান্ত শোকে

আমাদের আত্মমাঝে উঠিছে উন্ডাসি

জাগিছে না স্মৃতি মূরছনা !

কেন এই অপমান-জর্জরিত ভারত-জীবন

মুহুমূর্ছ উঠিছে ঈদিয়া ;

বারে বারে, কেন তারে তুমি

অক্ষত আশার মাঝে

রাখ নি বাঁধিয়া ;

কীর্ত্তর করিতেছ হরন্ত স্বপন,—

কলঙ্কিত করিতেছ তার জয়ভূমি ;

টানিয়া নিভেছ নাকো শ্রেষ্ঠতম কাজে !

একটি আত্মার মাঝে যদিও বা হায়,

কোনো দিন কোনো ছুঁলে,

ব্যাকুল বাঁশরী তব দিয়েছিলে তুলে,

না জানাতে জগৎ-জনায়ে,

না জাগাতে মূর,

তুমি তারে নিয়েছ কাড়িয়া নিষ্ঠুর।

তোমার যে ভাষা আছে সে কি নয়

জীবনের চিরন্তন বিশ্বাস ;

সে কি নয় মাহুয়ের যুক্তিকার পূর্ণ পরিচয়।

সে কি শুধু ব্যর্থতায় পবনে পবনে

হুড়াইবে শুধু পরিহাস,

সে কি এই নীলোচ্ছল গগনে গগনে

উড়াবে না সোনার অকল,

মোছাবে না আমাদের হৃৎ-আঁখিজল।

ভাঙ্গ তুমি—ভাঙ্গ ভারতের

পর্বতের গোপন 'জিলায়,

ভাঙ্গ তুমি জরা-জীর্ণ যৌবনের

পরম বিলাস।

শাখা তব ছুঁড়ে ফেলে দাও—কীর্ণপত্র ভাসাও তেলায় ;

চলে যাক, যুছে যাক—ছুঁলে যেতে দাও

জীবনের শেষ-হওয়া রক্ত সাধনার।

আপনারে পূর্ণ করে দাও।

বসন্তে নুতন হয়ে জাগো তুমি

কণা কণা অনাদি বিশ্ব নিয়ে যুকে,

অনন্ত তমিষা হতে মোর জয়ভূমি

অথও আলোর ককে জাগুক উৎসকে।



# প্যালেষ্টাইনের সমস্যা

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

আরবের উত্তর-পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের উত্তর-পূর্ব তটে প্যালে-  
ষ্টাইন অবস্থিত। এই প্যালেষ্টাইনের প্রধান শহর জেরুজালেম।  
জেরুজালেমের নিকটে বেথেলহাম নামক গ্রামে যীশুখ্রীষ্ট



এই প্যালেষ্টাইনেই আসে। গত বিশ বৎসরে প্যালেষ্টাইনে  
ইহুদীদের সংখ্যা আশী হাজার হইতে ছয় লক্ষে পরিণত  
হইয়াছে। ইউরোপ হইতে আরও পাঁচ লক্ষ ইহুদী প্যালেষ্টাইনে  
চলিয়া আসিতে চায়।

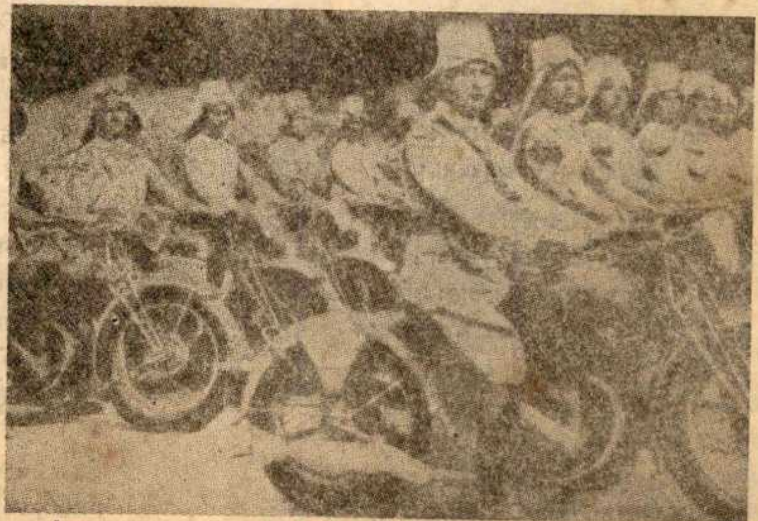
এই প্যালেষ্টাইনের মরুভূমিতে তাহার বহু শত্ৰুশ্রামল  
কৃষিকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। এই দুই হাজার বৎসরে আরবেরা  
কিছুই করিতে পারে নাই।

প্রথম ইউরোপীয় মহাসমরের পর প্যালেষ্টাইন ব্রিটিশের  
রক্ষণাবেক্ষণে আসে অর্থাৎ ব্রিটিশের mandated territory  
হয়। ব্রিটিশ বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া সে দেশ শাসন ও শোষণ  
করিয়া আসিতেছে।

সুইজারল্যান্ডের বাসল (Basle) শহরে অঙ্কিত বিশ্ব  
ইহুদী-কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি ডক্টর উয়েজম্যান  
তাহার অভিভাষণে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের  
দাবী করিয়াছেন। তিনি হার্টার মরিসনের প্রস্তাবিত স্বায়ত্ত-  
শাসিত যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।  
প্যালেষ্টাইনের উপর ম্যাণ্ডেটরী ক্ষমতা পরিত্যাগের পূর্বে  
ইহুদীদের জাতীয় আবাসকে জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া  
দেওয়া ব্রিটেনের কর্তব্য, ইহাই তাহার দাবী। ব্রিটেন এমন  
কি ব্রিটেন-আমেরিকা উভয়ে মিলিয়াও তাহার এই দাবী  
নিষ্পরোধে পূরণ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হইতেছে  
না। হিটলারের পতন হইলেও তাহার প্রচারিত ইহুদী-বিদ্বেষ

জ্ঞগ্রহণ করেন। দুই হাজার বৎসর পূর্বে ইহুদীদের পূর্ব-  
পুরুষরাই ছিল এই ভূমিখণ্ডের অধিবাসী ও অধিপতি।

ভাগ্যবিপর্যয়ে তারা পৃথিবীর নানা দেশে  
ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু অসহনীয়  
অত্যাচার সহ করিয়াও তাহারা তাহাদের  
প্রাচীন জন্মভূমির স্থিতি তুলিতে পারে  
নাই। তাহাদের এই আবাসভূমিতে  
তাহারা ফিরিয়া আসিবে এ আশা  
তাহারা কোন দিন ছাড়িতে পারে নাই।  
উয়েজম্যান নামে একজন ইহুদী বৈজ্ঞানিক  
গত প্রথম মহাযুদ্ধে একটি আসন্ন অভাব  
মিটাইতে ব্রিটেনকে সাহায্য করেন।  
তাহারই পুরস্কারস্বরূপ তিনি ফিলিস্তিনে  
'ইহুদীস্থান' গঠন করিবার দাবি করেন।  
১৯১৭ সালে ব্রিটেন এই দাবি স্বীকার  
করিয়া লন। সেই সময় হইতেই আরব-  
দের সহিত ইহুদীদের বিরোধের সৃষ্টি  
হয়। দ্বিতীয় মহাসমরের প্রারম্ভে হিটলার  
যখন ইহুদীদলন আরম্ভ করেন তখন  
তাহারা জার্মানী হইতে পলাইয়া প্রধানত



মোটরসাইকেল আরোহী মিশরীয় সৈন্যদলের প্যালেষ্টাইন

আক্রমণের তোড়জোড়



মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে পূর্ণ মাত্রায়ই বর্তমান আছে। প্যালে-  
ষ্টাইন সম্পর্কে তদন্তের জ্ঞান গঠিত ইঙ্গ-মার্কিন কমিটি তাঁহাদের  
রিপোর্টে স্বীকার করিয়াছিলেন যে উদাস্ত ইহুদীরা তাহাদের  
সম্পত্তি পুনরায় পাইবার চেষ্টা করিবার ফলে বিদ্রোহ সৃষ্টি

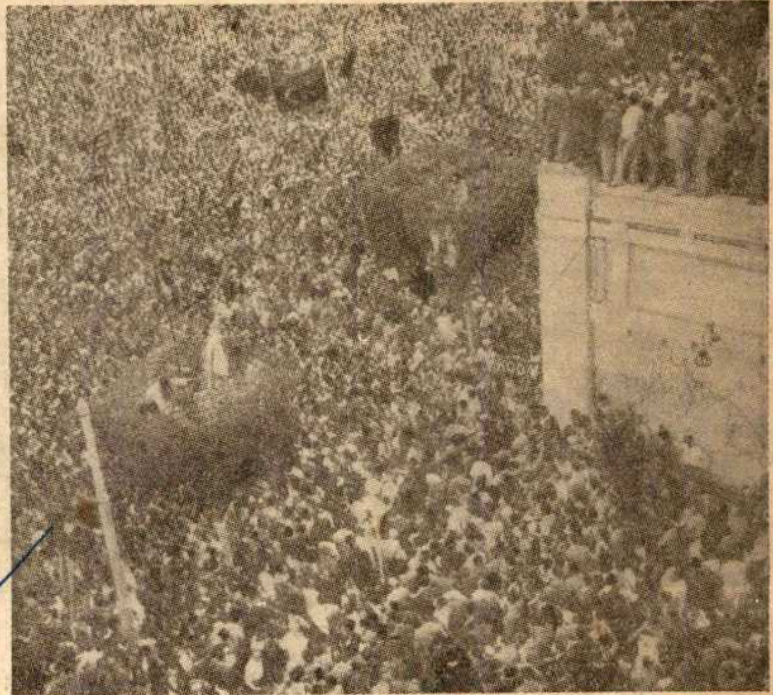
- হইতেছে এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে  
ইহুদী-বিদ্রোহ অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে।  
এই অবস্থার জ্ঞান ইহুদীরা বিশ্বাসী  
সকলের সহানুভূতি পাইবার যোগ্য।  
কিন্তু প্যালেষ্টাইন জনবিরল দেশ নয়।  
ইহুদীদের এখানে অধিকতর সংখ্যায়  
বসবাসে আরবদের সমুদয় ক্ষতি ও  
অসুবিধার সম্ভাবনা।

পরে প্যালেষ্টাইনকে ইহুদীদের বাস-  
ভূমিতে পরিণত করিবার প্রসঙ্গ লইয়া  
নিউইয়র্কে জাতিসংঘে আলোচনা আরম্ভ  
হয়। সংঘের পক্ষ হইতে সাতটি শক্তির  
প্রতিনিধি লইয়া একটি তথ্য সংগ্রহ  
কমিটি গঠন করা হয়। তাহাতে গত  
সেপ্টেম্বর মাসের অধিবেশনে এই কমিটির  
রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা হয়। ইঙ্গ-  
মার্কিন দল প্যালেষ্টাইনকে বিভক্ত  
করিয়া সেখানে পরোক্ষে ইঙ্গ-মার্কিন  
প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে চাহিয়া-  
ছিলেন। তাঁহারা জাতিসংঘের সেই  
অধিবেশনে তিনটি চাল চালিয়াছিলেন।  
প্রথম, প্যালেষ্টাইন সংক্রান্ত আলোচনা  
সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা হঠাৎ  
আরবদের জ্ঞান দরদী হইয়া উঠেন এবং ইহুদীদের বক্তব্য  
শুনিতো আপত্তি করেন। কোনরূপে একটি কমিটি খাড়া



লেবাননের বিরুদ্ধে অস্বারোহী সিরিয়ান সৈন্যদল  
করিয়া নিজেদের মনোমত রিপোর্ট গ্রহণ করা এবং  
কেন্দ্র মাসে প্যালেষ্টাইন বিভাগ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য

ছিল। ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ আসফ আলি এবং সোভিয়েট  
প্রতিনিধি মিঃ গ্রেমিকো এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া  
সফল হন। এইরূপে ইঙ্গ-মার্কিনের প্রথম চাল ব্যর্থ হয়।  
বিতীয়তঃ, তথ্যসংগ্রহ কমিটির আলোচ্য বিষয়ে প্যালেষ্টাইনে



আরবদিগকে যুদ্ধে আহ্বান

স্বাধীনতা সংক্রান্ত প্রশ্নটি বাদ দিবার জ্ঞান ইঙ্গ-মার্কিন দল জিদ  
করেন। মিঃ আসফ আলি ও মিঃ গ্রেমিকোর বিরোধিতা  
সত্ত্বেও তাবৈদার রাষ্ট্রগুলির ভোটের জোরে ইঙ্গ-মার্কিন দলের  
এই চাল সফল হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, ইঙ্গ-মার্কিন দল প্যালে-  
ষ্টাইনের ব্যাপার হইতে সোভিয়েট রাশিয়াকে দূরে রাখিবার  
জ্ঞান প্রস্তাব করেন যে, তথ্য সংগ্রহ কমিটিতে বৃহৎ পাঁচটি শক্তির  
কোন প্রতিনিধি থাকিবে না। রাশিয়াকে বাদ দিয়া তাহাদের  
তাবৈদার রাষ্ট্রগুলির মধ্য হইতে সাতটি রাষ্ট্র লইয়া কমিটি  
গঠন করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ব্রিটিশ ও মার্কিন প্রতী-  
নিধি কমিটিতে না থাকিলেও এই তাবৈদাররা যে তাহাদের  
ইচ্ছা অহুযায়ী কাজ করিবে তাহা নিশ্চিত। দুঃখের বিষয়, মিঃ  
আসফ আলি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-  
মার্কিন দলের উদ্দেশ্য অহুযায়ী সাতটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র লইয়াই কমিটি  
গঠিত হয়। এই কমিটির অধিকাংশ সদস্য প্যালেষ্টাইনকে  
ইহুদী রাষ্ট্র ও আরব রাষ্ট্রে বিভাগের প্রস্তাব সমর্থন করেন।

এই কমিটিতে সংখ্যালখিষ্টগণ প্যালেষ্টাইনকে একটি যুক্ত-  
রাষ্ট্রে পরিণত করার সুপারিশ করে। ইহুদীরা এই তদন্ত





রাজা আবদুল্লাহ রাজধানী আশ্রয়

কমিটির সংখ্যালব্ধি রিপোর্ট কিছু সংশোধন করা হইলে মানিয়া লইতে রাজী আছেন—একথা জানাইয়া দেন। কিন্তু আরবরা জানান যে তাহারা প্যালেষ্টাইন বিভাগ কিছুতেই মানিয়া লইবে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত করেন যে, জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত আরব ও ইহুদী উভয়পক্ষ মিলিয়া মানিয়া না লইলে ব্রিটেন ম্যাণ্ডেট পরিত্যাগ করিবে এবং প্যালেষ্টাইন হইতে ব্রিটিশ সৈন্ত সরাইয়া লইবে। ব্রিটিশ সৈন্ত সরাইয়া লইলেই পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রসমূহ হইতে প্যালেষ্টাইনে যাহাতে অভিযান চলে তাহার আয়োজন হয়। প্যালেষ্টাইন রক্ষার জন্ত দামাস্কাসের উপকণ্ঠে পয়তালিশ হাজার সৈন্তের এক বাহিনী গঠন করা হইয়াছে। ব্রিটিশ সৈন্ত প্যালেষ্টাইন পরিত্যাগ করিলে অনেক ব্রিটিশ অফিসার স্বেচ্ছাসৈনিকরূপে প্যালেষ্টাইনে থাকিয়া আরবদিগকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১১ই অক্টোবর এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া প্যালেষ্টাইন কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী প্যালেষ্টাইনকে আরব ও ইহুদী রাষ্ট্রে বিভক্ত করার এবং প্যালেষ্টাইনে ইহুদী গমনের পরিকল্পনার সমর্থন করেন। সম্মিলিত জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিবার জন্ত আন্তর্জাতিক পুলিশবাহিনী গঠনেরও প্রস্তাব করেন।

প্যালেষ্টাইনের এই আসন্ন বিপ্লবের জন্ত দায়ী ব্রিটিশ। তাহারা ইহুদী সেখানে লক্ষ লক্ষ ইহুদী আমদানী করিয়াছেন। আরব ও ইহুদী উভয় পক্ষকে বিবদমান করিয়া তুলিয়া ব্রিটিশ প্যালেষ্টাইন হইতে সরিয়া আসিতে চাহিতেছেন। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানে প্রবল বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে বিবদমান করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষকে ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তানে বিভাগ করিয়া ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার ভান করিয়াছে কে তাহা আমরা অবগত আছি। একই নীতি কি উভয় দেশেই প্রযুক্ত হয় নাই?

জাতিসংঘের পক্ষ হইতে এখন কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্ট অনুযায়ী প্যালেষ্টাইনকে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। জেরুজালেম স্বাধীন নগরী হইবে। সোভিয়েট রাশিয়াও প্যালেষ্টাইনকে বিভাগ করিবার প্রস্তাব সমর্থন করেন। রুশ প্রতিনিধি কমিটিতে বলেন যে, ইহুদীদিগকে প্যালেষ্টাইনে তাহাদের নিজেদের রাষ্ট্র গড়িয়া তোলার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় না। তাহার কারণ হয়ত ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেটের অধীনস্থ এই দেশে সোনা ফলে। সোনা ফলায় আরবেরা, তার রসদ জোগায় এক শ্রেণীর ইহুদী মারফত আমেরিকা, সেই সোনা পরিবেশিত হয় অল্প অল্প দেশের বাজারে। আরবেরা চাষের মালিক হইলেও শক্তের মালিক নয়। ব্রিটিশ





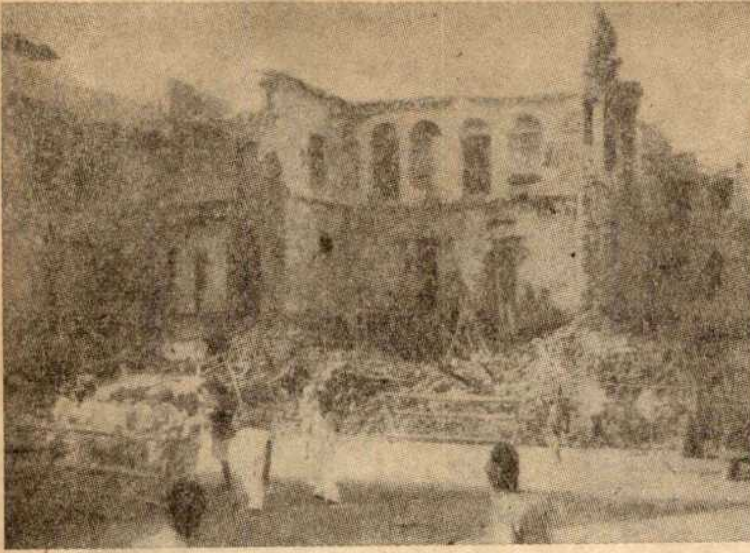
প্যালেস্টাইন বিভাগের প্রতিবাদে কার্যরো অপেরা হাউসের সম্মুখে সমবেত জনতা

এই প্যালেস্টাইন লইয়া বহু খেলা খেলিয়াছে। তাহার একবার আরবদের ভরসা দিয়াছে, একবার ইহুদীদের আশ্বাস দিয়াছে। এই ভাবে এই দুই জাতির মধ্যে বিদ্বেষ ও বিবাদ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। প্যালেস্টাইনে এই বিবাদে এক দিকে আরব ও ইহুদী এবং অপরদিকে ব্রিটেন ও আমেরিকা। ব্রিটেন ও আমেরিকা ছাড়া রাশিয়ার কোন স্বার্থ নাই। যে সোভিয়েট রাশিয়া প্রত্যেক জাতিকে আয়নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়াছে, সেই জাতিগুলিকে নিজ নিজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিবার সুযোগ দিয়াছে, তাহার পক্ষে এক জাতির ধ্বংস সমর্থন করা বা এক জাতির উপর আর এক জাতির অবাধ প্রভুত্ব স্বীকার করা সম্ভব নয়। তাই তাহার প্যালেস্টাইনে যেমন আরবদের অধিকার স্বীকার করিয়াছে, তেমনি ইহুদীদেরও অধিকার স্বীকার করিয়াছে। তবে সোভিয়েটের চেষ্টায় ব্যবস্থা হইয়াছে যে এই বিভাগ করিবার কাজ জাতিসভা সম্পন্ন করিবে; অন্তর্বর্তীকালে প্যালেস্টাইনে কর্তৃত্বও থাকিবে জাতিসভার, ব্রিটেনের নহে। ইহুদী ও আরব রাষ্ট্র যাহাতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হয়, সেজন্যও সোভিয়েট রাশিয়া সুস্পষ্ট দাবি করিয়াছে। ব্রিটেন প্যালেস্টাইনে তাহার ম্যানডেট ত্যাগ করিবে; অক্টোবর মাসের মধ্যে তাহার সমস্ত সৈন্য অপসারিত হইবে। কিন্তু আমেরিকা প্রস্তাব করিয়াছিল ১লা মে তারিখে উভয় রাষ্ট্রকেই স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে। অথবা প্রয়োজন হইলে জাতিসভা কমিশন স্বাধীনতার জন্য অল্প কোন তারিখ ধাৰ্য্য করিতে পারিবেন। কিন্তু এই তারিখ ১লা মেের পূর্বে অথবা ১লা

জুলাই-এর পর ধাৰ্য্য হইতে পারিবে না। কিন্তু প্রধান সমস্যা রহিয়াছে প্যালেস্টাইন বিভাগ কার্য্যকরী করার ভার নিরাপত্তা পরিষদের উপর অর্পণ সম্বন্ধে। এরূপ ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি। এদিকে প্যালেস্টাইন হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারিত হইবার পরই প্যালেস্টাইন আক্রমণের জন্য সিরিয়া, লেবানন, মিশর এবং ট্রান্সজর্ডনের সৈন্যবাহিনী প্যালেস্টাইন সীমান্তে সমবেত হইয়াছে বলিয়া আরব লীগের সেক্রেটারী-জেনারেল আবদুল রহমান আজম্ সংবাদ দিয়াছেন। ইরাক ও সৌদী আরবের সৈন্যবাহিনীও ইহাদের সহিত যোগদান করিয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। ব্রিটিশ সৈন্য অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী প্যালেস্টাইন রক্ষার ভার গ্রহণ না করে, তবে প্যালেস্টাইনে এক বিপুল রক্তক্ষয়কারী সংঘর্ষ ঘটবে। ইহুদী এজেন্সির একটি সৈন্য-বাহিনী আছে। উছা হাগানা নামে পরিচিত। ইরগুন, জুউই লিউমি নামে ইহুদীদের আর একটি প্রতিষ্ঠান আছে। প্যালেস্টাইনের বর্তমান বিদ্রোহে ইহারাই গরিলা যুদ্ধ করিতেছে। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব-উপকূলে একটি যুগ পরিবর্তনের সূচনা হইতেছে।

সম্মিলিত রাষ্ট্রসভার প্যালেস্টাইন কমিটির বৈঠকে পাকিস্থানের প্রতিনিধি দলের নেতা সর মহম্মদ জাফরজা খান ১১৫ মিনিট কাল ধরিয়া প্যালেস্টাইন বিভাগের বিপক্ষে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার মূল কথা ছিল যে প্রস্তাবিত প্যালেস্টাইন বিভাগ পরিকল্পনা বাস্তব ও ভৌগোলিক দিক দিয়া অসম্ভব। তিনি আরও বলেন যে, প্যালেস্টাইন বিভাগের ফলে দুইটি





প্যালেষ্টাইনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা-দিবসে ধ্বংসলীলার একটি দৃশ্য

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে না এবং সংঘর্ষ বন্ধ না হইয়া বরং বাড়িয়াই যাইবে। ভারত বিভাগের একজন মুখপাত্র হিসাবে সর মহম্মদ জাফরুল্লা খানের মুখে ইহা শোভা পায় কি ?

গত ২৯শে নবেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্যালেষ্টাইন বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন ৩৩টি রাষ্ট্র, বিপক্ষে ছিলেন ১৩টি। ১০টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত ছিলেন এবং ১টি রাষ্ট্র অস্থগিত ছিলেন। ভারত, পাকিস্তান এবং আরব রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ এই ভোট গ্রহণের পর একত্রে সভাগৃহ পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা বাহিরে যাইবার পূর্বে বলেন যে তাঁহারা এই মত মানিয়া লইবেন না এবং তাঁহাদের ইচ্ছামুযায়ী কর্তব্য করিতে পারিবেন।

ব্রিটেন এই প্রস্তাবে ভোট দেন নাই।

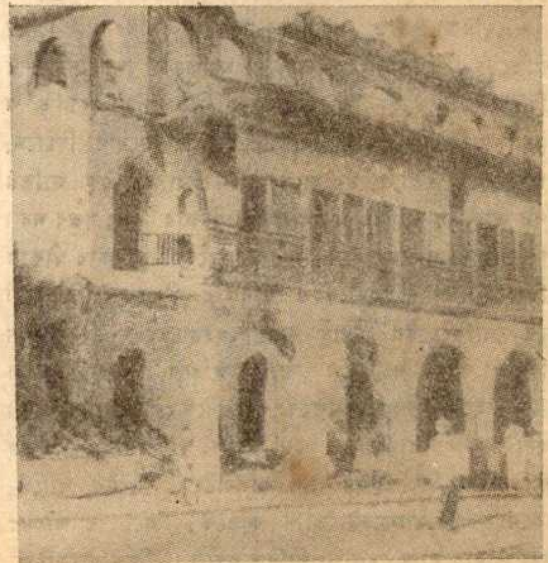
আরবের সাতটি রাষ্ট্র লইয়া একটি যুদ্ধ-সংসদ গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা কায়রোতে দশ দিন গোপন আলোচনার পর ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহারা এই প্যালেষ্টাইন বিভাগের বিরুদ্ধে যথাসম্ভব উপায় অবলম্বন করিবেন। এই প্যালেষ্টাইন বিভাগ তাঁহারা অস্তায় ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের সমবেত রাষ্ট্রসমূহ প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা অর্জনে ও একত্র থাকিতে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। এক দল আরব কর্মচারী ভারতবর্ষে আরববাসীদের ক্ষত অঙ্গশস্ত্র ক্রয় করিতে আসিয়াছেন এবং আর এক দল আরব এই উদ্দেশ্যে ইউরোপ রওনা হইয়াছেন।

এই বিভাগ-প্রস্তাবের পর হইতেই প্যালেষ্টাইনে খণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। জেরুজালেম হইতে ৯ই জানুয়ারী তারিখের

এক সংবাদে প্রকাশ যে, দুই সহস্র আরব সৈন্য প্যালেষ্টাইন আক্রমণ করিয়াছে। ব্রিটিশ ও ইহুদী সৈন্য তাহাদের বাধা দিতে সক্ষম হয় নাই। লেবাননের দিক হইতে ৮ই জানুয়ারী রাat্রে এক সহস্র আরব স্বেচ্ছাসৈনিক এই আক্রমণের স্ত্রপাত করে। সাফাদ ও তাইবেরিয়াস জেলায় যে বার হাজার ইহুদী বসবাস করিতেছে তাহাদের ধ্বংস করা এই আক্রমণের উদ্দেশ্য। ব্রিটিশ সৈন্য প্যালেষ্টাইন হইতে অপসারিত হইলে আরবেরা কিরূপ কৃতকার্য হইবে তাহা পরীক্ষা করাই এই আক্রমণের উদ্দেশ্য।

স্বস্তি-পরিষদে পুনরায় প্যালে-  
ষ্টাইন প্রসঙ্গের আলোচনা আরম্ভ

হয়। এবার তাঁহাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল প্যালেষ্টাইন সমস্তা বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপক্ষনক কিনা। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ সংসদ কর্তৃক নিয়োজিত প্যালেষ্টাইন কমিশন প্যালেষ্টাইন পরিদর্শনে গেলেন। এদিকে প্যালেষ্টাইনের ম্যাগেটধারী ইংলণ্ড বলিল যে সরকারী ভাবে সে



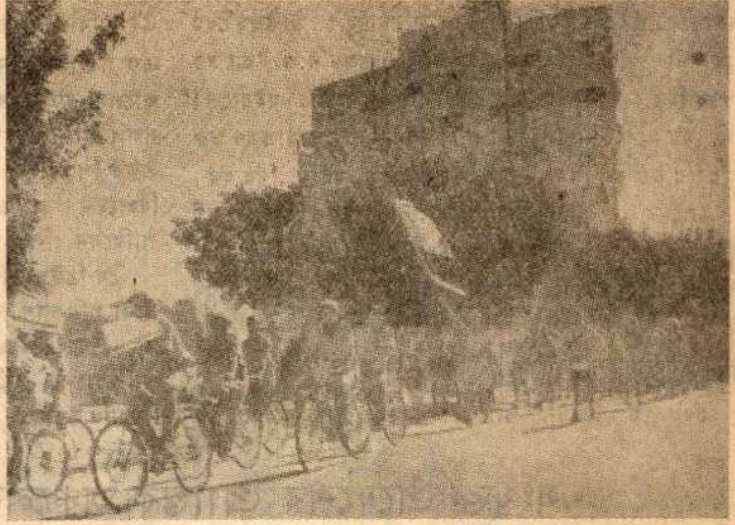
প্যালেষ্টাইনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা-দিবসে এডেনে অগ্নিকাণ্ড

প্যালেষ্টাইন কমিটির অধিবেশনে যোগ দিবে না। বৃহৎ পঞ্চ শক্তির মধ্যে চীন প্যালেষ্টাইন বিভাগের বিরোধী এবং ফ্রান্সেরও



সম্পূর্ণ উৎসাহ নাই। সুতরাং প্যালে-  
ষ্টাইন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার পড়িল  
আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার  
ওপর। ব্রিটিশের এই নিষ্করকার ভাবের  
জন্ম ইহুদীরা ব্রিটিশবিরোধী হইয়া  
উঠিল। ১৫ই মে ব্রিটিশ শাসনভার ত্যাগ  
করার পর যাহাতে প্যালেষ্টাইনে শান্তি  
বজায় রাখা সম্ভব হয় সেইজন্ম প্যালে-  
ষ্টাইন কমিশন এক স্থানীয় বাহিনী  
গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু  
ব্রিটেন বলে, আনুষ্ঠানিক ভাবে প্যালে-  
ষ্টাইন পরিত্যাগ করার পূর্বে সে সেখানে  
কোন বাহিনী গড়িয়া তোলার অধিকার  
দিতে পারে না।

প্যালেষ্টাইন সমস্যা যেমন স্বাভি-  
পরিষদকে বিভ্রান্ত ও বিচলিত করিয়া  
তুলিয়াছে আরব ও ইহুদী উভয় পক্ষে  
তেমন চলিয়াছে পূর্ণ রণসজ্জা। ১৫ই মে  
ব্রিটিশ শাসনভার পরিত্যাগ করিলে  
পরস্পর পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করিবার সম্পূর্ণ  
আয়োজন হই-  
তেছে। জেরুজালেমের পথে হত্যা ও  
লুণ্ঠাই প্রত্যাহই চলিতেছে। ইহুদীদের গোপন  
সৈন্যদল ব্রিটিশ বাহিনীকেও



তরুণ ইহুদীগণ পতাকা উত্তোলন পূর্বক স্বাভি পরিষদ কর্তৃক প্যালেষ্টাইন  
বিভাগের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করিতেছে

এবং যুবতীরাও এই আক্রমণে যোগ দিতেছে। এদিকে  
আরব সৈন্যদের অধিনায়ক করিবার জন্ম তাদের প্রধান  
সেনাপতি ফৌজি এল কৌকজি প্যালেষ্টাইনে আসিয়া  
উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি আরব সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত  
করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার অস্ত্রশস্ত্রের অভাব নাই এবং সমস্ত  
আরব-রাষ্ট্রই তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।  
এদিকে সমগ্র ইহুদী প্রতিষ্ঠান তেল আভিভে এক চুক্তিতে  
আবদ্ধ হইয়াছে যে তাহারা একনেতৃত্বে যুদ্ধ চালাইবে।  
শুনা যায়, তাহাদের প্রধান দল হাগানার নেতৃত্বে ৮০,০০০  
সুশিক্ষিত সৈন্য আছে। এদিকে ইজিপ্ট, সৌদি আরব, ইরাক,  
ট্রান্সজর্ডন এবং সিরিয়া প্যালেষ্টাইনের আরবগণকে সাহায্য  
করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। তাদের সম্মিলিত সৈন্যসংখ্যা  
২০০,০০০। কিন্তু তারা তেমন সুশিক্ষিত নয়। আরব  
লীগের সাতটি রাষ্ট্রের মধ্যে সপ্তম রাষ্ট্র ইয়েমেনে এখন গৃহযুদ্ধ  
চলিতেছে এবং তাহার সৈন্যসংখ্যাও উল্লেখযোগ্য নয়। সেইজন্ম  
তাহারা প্যালেষ্টাইনের এই আরব-ইহুদী যুদ্ধে সহায়তা  
করিতে পারিতেছে না।

গত ২৬শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, জাতিগুণ্যসংসদের  
রাজনীতিক কমিটিতে উচ্চতর আরব পরিষদের প্রতিনিধি  
বোষণা করেন যে, অজিগিরি সম্বন্ধে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত  
গৃহীত না হইলে ম্যাগেট শাসন অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আরবরা  
প্যালেষ্টাইনকে একটি অঞ্চল স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া বোষণা  
করিবে।

ইতিমধ্যে ট্রান্সজর্ডন-সরকার ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ  
বোষণা করিয়াছে এবং তাহার সৈন্যদল জেরুজালেমের পনর



যুদ্ধে যোগদানকারী ইহুদী যুবক-যুবতীগণ

আক্রমণ করিতেছে। তেল আভিভের ম্যানসিয়া নামক স্থানে  
বাড়ীর ছাদের ওপর থেকে অস্ত্রচালনায় সুশিক্ষিত ইহুদী যুবক



মাইল উত্তর-পূর্বে ও প্যালেষ্টাইন সীমান্ত হইতে পাঁচ মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত জেরিকো দখল করিয়াছে। ট্রান্সজর্ডনের রাজধানী আম্মান, সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্সজর্ডন ও ইরাকের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ১লা মের মধ্যে প্যালেষ্টাইনকে তিন দিক হইতে আক্রমণ শুরু করিবার জন্য চল্লিশ হাজার সৈন্য প্রেরিত হইবে স্থির হয়। ট্রান্সজর্ডনের ৬৫ বৎসর বয়স্ক রাজা আবদুল্লা ইবন হুসেন আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। তিনি বলিয়াছেন, ইহুদীরা যদি তাঁহার উপদেশ গ্রহণ না করে এবং আরব রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে বসবাস করিতে সম্মত না হয় তবে তিনি প্যালেষ্টাইন উদ্ধারের গৌরব অর্জন করিবেন।

১৫ই মে ব্রিটেন প্যালেষ্টাইন পরিত্যাগ করার পর

আরবরা যেন প্যালেষ্টাইনের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা পায় এই দাবি জানাইয়া রাজা আবদুল্লা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট এক পত্র দিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে জের-জালেম, নাজারেথ ও বেথলেহেম পবিত্রস্থান বলিয়া তিনি ঐ সকল স্থানের উপর কর্তৃত্ব চাহেন; অবশ্য ইহুদীদের জন্য একটি পিতৃভূমির ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া তিনি আশ্বাস দিয়াছেন। জাতিপুঞ্জসংসদ প্যালেষ্টাইনে শান্তি স্থাপন করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হইতেছে না।

যে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ১৯০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর এই রাজ্য পরিত্যাগ কালে পাকিস্থান সৃষ্টি করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ-বহি সৃষ্টি করেন, তাঁহার প্যালেষ্টাইনেও পাকিস্থানের সৃষ্টি করিয়া আরব ও ইহুদীদের মধ্যে ভীষণ সমরায়ি উদ্দীপিত করিয়াছেন।

## সংযুক্ত প্রদেশের প্রান্তিক অঞ্চলের লোকসঙ্গীত

শ্রীমাতা গুপ্ত

পুত্রের বিবাহে যে বিশেষ ধরনের সঙ্গীত প্রচলিত আছে তার কিছু পরিচয় ইতিপূর্বে ‘প্রবাসী’তে দেওয়া হয়েছে, এবার কস্তার বিবাহ-সঙ্গীতের কিছু নমুনা দেওয়া হবে। গানগুলির ভাষাগত পার্থক্য যাই থাক, পুত্রের বিবাহের প্রচলিত লোক-সঙ্গীতগুলির সঙ্গে এগুলি তুলনীয়। এগুলির মধ্যে ভাবগত ঐক্য ও সাদৃশ্য এত অধিক যে এগুলোকে প্রায় একই স্তরের গান বলা চলে। যে সামাজিক পরিবেশের পটভূমিকার উপর গানগুলি রচিত তা ভারতের সমস্ত প্রদেশেই এক।

এখানে প্রথমে একটি গানের পরিচয় দেওয়া হ'ল। জননী ফরমাস দিচ্ছেন কেমন ধর-বর চাই কস্তার জন্য।

লাড়ো কী অম্মা অরজ করে,

হো মেরা লায়ক সা

সমঝী চুঁড়িয়ে, কুলকী মেরী সমঝিন চুঁড়িয়ে।

চন্দ্রবদন সে লড়কা চুঁড়ো মেরে কান্হা কে উনহার।

কো তুম চুঁড়ো ভোঁড়ী হরত কে

বুরেলী সুরত কে,

মরুঙ্গী জহর বিষ খায়।

মরুঙ্গী আঁধা হতুরা খায়, তোরী সঁজোঁ ন হুঙ্গী পায়র।

কস্তার মা স্বামীকে বলছেন যে বৈবাহিক যেন সংলোক হন এবং বৈবাহিকা কুলবতী হন। তাঁদের মতন যুগ দেখে যেন জামাই খোঁজা হয়, দেখতে কুকের মত হওয়া চাই। যদি তা না করে তিনি কুশ্রী জামাই খোঁজেন তবে কস্তার মাতা কদাপি আর কস্তার পিতার শয্যায় চরণ রাখবেন না—বিশ বেয়ে আশ্রয়ত্যা করবেন।

শান্তিবিধান গুরুতর সম্মেহ নেই, কেবল বিষপানে আশ্রয়ত্যাই নয়, তার আগে স্বামীর শয্যার সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগও বটে।

নিম্নোক্ত গানটিতে আছে, কেমন বর চাই সে বিষয়ে কস্তার ফরমাস :—

পাঁচ পাণ্ডা বোল বাবুল উন ধর কস্তা না ওঁতরৈ

এক নিধনি হ জিন দেউ বাবুল, রহন দেউ কুঁজারী।

নিধনী জব তড়প বোলৈ অহুধ মেরে জিয়া কো সঠৈ।

এক হরকোতিয়া জিন দেউ বাবুল রহন দেউ কুঁজারী

হরকোতিয়া হর কোত আরৈ, মঁগে নও দস রোটয়।

ভরকে কঠোতা ছাঁছ মঁগে, অহুধ মেরে জিয়া কো সঠৈ।

এক জুআরিহি জিন দেউ বাবুল, রহন দেউ কুঁজারী

ইত্র হারে, দ্রব্য হারে কবছ কী বেরা হমে হারে,

লাজ তুমহেঁ আর হৈ।

এক পচে পণ্ডিত দেউ বাবুল জাঁসে মহা সুখ পায়হৈ

হাধ ধোতী বগল পোখী দেধি জগ সীস নবায় হৈ।

হে পিতা, পঞ্চপাণ্ডবকে স্মরণ কর, তাঁদের গৃহে কস্তা

জন্মায় নি। ( তাঁদের কৃপা ভিক্ষা কর, কারণ কস্তার জন্মদ্বারা পিতার হুঃখ বাড়বে )।

হে পিতা, নিধনের গৃহে আমার বিবাহ দিও না, তার চেয়ে কুমারী থাকাই ভাল। নিধন যখন কটুভাষায় কথা বলবে তখন তা কে সহ করতে পারে?

হলচালনা করে যে চাষা তার গৃহেও বিয়ে দিও না, তার চেয়ে আমি কুমারী থাকবো। যে হল চালনা করে ধরে ফিরে নয়-দশখান রুটি চাইবে, এক গামলা ভরা মাটী (মাখন তোলা বোল) চাইবে—এমনি অশিষ্ট। তার কটু কথা কে সহ করবে?

জুয়াবেলায় আসক্তকেও কস্তা দিও না। সে এটা ওটা সবই হারবে—এমন কি আমাকেও হয়ত বাজী রেখে হেরে আসবে, তাতে তোমার লজ্জার কারণ হবে।

পণ্ডিত দেখে আমায় দান কর, যেন খুব সুখে থাকতে পাই। পণ্ডিত বরের এক হাতে ধৃতী, বগলে বই—যাকে দেখে সমস্ত জগৎ শির অবনত করবে।

দরিদ্র স্বামীর উপর কন্ডার মন যে বিরূপ এ গানটিতে তাই প্রকাশ পেয়েছে। গানটির অন্তর্নিহিত অর্থ গভীর। নির্ধন অপেক্ষা মুখ তাঁর নিকট অধিকতর দরিদ্র বলে গণ্য। দরিদ্র স্বামীর উপর অবজ্ঞা প্রকাশ তিনি করেছেন বটে, কিন্তু তিনি গুণীর কদর বোঝেন। পণ্ডিত স্বামী ধনবান হতে হবে এমন দাবি তো কন্ডা করেন নি।

কন্ডার বিবাহে যে আনন্দ ও ছুঃখের ছুটি চিত্র পাশাপাশি থাকে তারই প্রকাশ হয়েছে নিম্নোক্ত গানটিতে। গানটিতে কন্ডার পিতামাতার সাংসারিক ক্ষতিরই বর্ণনা আছে। কন্ডা-বিদায়ের কারণ চিত্র নয়—কন্ডার বিবাহে নিঃশ্ব হয়ে পড়ার চিত্র। প্রথমে তো গৃহিণী জামাইয়ের নীল ষোড়া দেখে, বরযাত্রীর সঙ্গে হাতীর বহর দেখে পুলকিত হয়ে উঠেছেন এবং ভাবছেন একটির স্থলে দশটি কন্ডার জন্ম হোক তাঁর গৃহে। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তাঁর ভুল ভাঙছে, যখন ঘর হতে সর্ব্ব্ব বার করে বৈবাহিককে দিয়ে দিতে হচ্ছে। পণ-প্রথার শোচনীয় ফল ভারতের সকল প্রদেশের কন্ডাদের জীবনকেই অনেক ক্ষেত্রে অভিশপ্ত করে তোলে।

নীল নীল ষোড়ওয়া কুঁজার অসোয়ার রে  
কুরথতে উঠ গৈলী ধর রে।  
চন্দ্র ঝরোখাওন ঠাটী রে মাতা নীহারেলী  
বীয়া দশ আওর হোর রে।  
হথিয়া তো আবেলে অনতী সে গনতী রে,  
ষোড়বা জে অয়ে সো সাঠি  
মারে বরতিয়া কে কসমস রহীও ন সুঠে  
পাবন বেহ উবীরায় রে।  
হোত বিহান পরল সোরী সেহুর ;  
নও লাখ দাহেজ থোর রে  
ভীতরী কৈ গেড়ুয়া বহর দৈ ভরলী  
সতরু কে বীয়া জনী হোই হো।  
সমধী জে বৈঠলে লালী পালদ্বিয়া হো  
আপ প্রভু সথরী বিছাই রে,  
সমধী জে ছাঁটে লৈ লম্বী লম্বী বাতীয়া রে  
আপ প্রভু সীর মওয়াই রে।  
ঈ বীঅয়া মোরী অয়েরনী বয়েরনী  
ঈ বীঅয়া সজ্জ হমারি রে  
ঈ বীঅয়া মোর নগর লুটায়লী  
অওরী হরলী মোর গেয়ান রে।

নীল ষোড়ায় চড়ে বর আসছেন, ষোড়ার বরের ধূলি দেখে মনে হয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমি হয়ত এমনি অশ্রুধারের ধূলিতে আচ্ছন্ন হয়েছিল। চন্দ্রাকৃতি বাতায়নে দণ্ডায়মান হয়ে কন্ডার

জননী বরযাত্রী দেখছেন, প্রসন্ন হয়ে বলছেন আরো দশটি কন্ডার জন্ম হোক আমার গৃহে।

অগণিত হাতী, ষষ্টি শত ষোড়া, বরযাত্রীর সংখ্যা এত যে তাদের পদক্ষেপে যে পরিমাণ ধূলি উড়ছে তাতে পথই দেখা যায় না।

ভোর হতে না হতেই কন্ডার সীমন্তে সিন্দুর লেপন করা হ'ল। এবার সুর হ'ল দানের পালা—নয় লক্ষ মুদ্রা দানও যথেষ্ট বলে বিবেচিত হ'ল না। কন্ডার জননী ষটি-বাটিও বার করে দিলেন, তাঁর মুখ থেকে সখেদে বার হল 'শক্তরও যেন কন্ডা না হয়।'

বৈবাহিক বসেছেন লাল রঙের পালকে এবং কন্ডার পিতা বসেছেন চাটাই বিছিয়ে। বৈবাহিক লক্ষ্য চণ্ডা কথা বলছেন এবং কন্ডার পিতা মাথা নীচু করে বসে আছেন।

পুনরায় ফোভে জলে পুড়ে জমনী বলছেন, 'এ কন্ডা আমার শত্রু, এ কন্ডাই আমার পুরী লুণ্ঠন করে নিলে, আমার আনন্দ ও শুভবুদ্ধিকেও হরণ করে নিলে।'

এ গানটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও পণপ্রথার গীড়ন বাংলাদেশেরই অনুরূপ। এর ফলে কন্ডার পিতৃগৃহ শূন্য হয়ে যায়, কন্ডা হুঃখ পায় ও অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

পুত্রবধূর ভরণ-পোষণের ভারগ্রহণের পূর্বাঙ্কে পুত্রের পিতা বৈবাহিকের নিকট থেকে যথাসম্ভব ধন আহরণ করে নিয়ে যান, কন্ডাপণের মূলে নিহিত এই মনোবৃত্তি ভারতের সকল প্রদেশেরই কন্ডাদের অপমানের কারণ হয়ে আছে। পিতামাতার ছলালী পরগৃহে যাবার সময় পিতাকে নিঃশ্ব করে চলে যেতে বাধ্য হ'ল। যে কন্ডার পিতার নিকট থেকে আশাহুন্নপ অর্থ আদায় করা সম্ভবপর হয় না, যশুরগৃহে সে কন্ডার অদৃষ্টে জোটে অনাদর—অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস বটে।

কন্ডার প্রাণ চায় না পরগৃহে যাত্রা করতে, তিনি পিতার নিকট একটির পর একটি করণ প্রার্থনা করে চলেছেন—

বাবল তেরা সীকো কা ঘরওয়া রে, বাবল চিড়িয়া তোড় গর্দ  
বেটি অউর ছওয়ায় লুঙ্গা রী, লাভো ঘর যাও আপনে।  
বাবল তেরা চোকা জো সুনী রে, বাবল তেরা বীয়া বিনা  
বেটি বামনী লগায় লুঙ্গা রী, লাভো ঘর যাও আপনে।  
বাবল তেরা পানী জো ভিনকৈ রে, বাবল তেরা বীয়া বিনা  
বেটি কাহারিন লগা লুঙ্গা রী, লাভো ঘর যাও আপনে।  
বাবল মেরা ভোলী জো থটকা রে, বাবল তেরে মহল মে  
বেটি মো ইট খিচার দক্ষা রী, লাভো ঘর যাও আপনে।  
বাবল মেরা গুড়িয়া জো সুনী রে, পিতাজী তুমরী বেটি বিনা  
বেটি মেরা পোতী জো খেলেরী, লাভো ঘর যাও আপনে।

বিদায়কালে চিন্তিত কন্ডা বলছেন : “হে পিতা, তোমার গৃহের ছাদ পাখীতে নষ্ট করে দিয়েছে”—পিতা বলছেন, “তার জন্ত তুমি চিন্তা করো না মা, আবার ঘর ছাইয়ে নেব, তুমি তোমার নিজ গৃহে যাও।” কন্ডা বলছেন, “আমি চলে

গেলে তোমার রন্ধনশালা শূণ্য হয়ে যাবে—” পিতা উত্তর দিচ্ছেন, “তার জন্ত চিন্তা করো না, বামণী রেখে দেবো, সে রন্ধন করবে, তুমি তোমার নিজের গৃহে যাও।” কথা আবার বলছেন, “হে পিতা, তোমার কথার অল্পপস্থিতিতে স্নানের ঘর পরিত্যক্ত হবে না—ভেজাই থাকবে।”—উত্তর হ’ল, “কাহারিন রেখে দেওয়া হবে, সে-ই কাজ করবে।” এবার কথা বলছেন, “আমার ভুলী তোমার বাড়ীতে আটকে যাচ্ছে, কেমন করে যাই।” পিতা বলছেন, “হে কথা, দুখানা হুঁট খসিয়ে দিচ্ছি, তুমি তোমার নিজের ঘরে যাও।”

কথা বলছেন, “হে পিতা, তোমার কথা পরগৃহে গেলে তার খেলাঘর যে শূণ্য হয়ে যাবে।” পিতা উত্তরে বলছেন, “হে কথা, তার জন্ত তুমি ছঃখিত হয়ো না, আমার পৌত্রী খেলাঘরে খেলা করবে, তুমি তোমার নিজের ঘরে যাও।”

খসুরগৃহে যাত্রাকালীন কথার শক্তি হৃদয়ের একটি চিত্র নিয়োক্ত গানটিতে আছে।

পুরব পছোঁই মোরে বাবা কে বধরিয়া

পড় গৈ ইমলিয়া কে ছাঁহ

তেহী পর মোরে বাবা সোনওয়া সঙ্কলৈ

গটে লাগে সুর সোনার।

গটো সোনারা অঙ্গন গটো সোনারা কঙ্গন

দিকা গটো ভরি মাথ রে।

ইতনা পছিরি বেটি চোক জো বৈষ্ট

বেটি কৈ মন দলগীর।

কী তেরো বেটি সোনা খরাব ভা

কাহে তেরী মন দলগীর

কী তেরো বেটি রে দান দাহেজ ধোর

কীরে সুর বর ছোট।

নাহী মোর বাবারে দান দাহেজ ধোর

নাহী সুর বর ছোট।

সুনত হৌ মোর বাবা সাস দারুনিয়া

এহী সে মন দলগীর।

চার দিনা বেটি রাজাকে রজ্জই, চার দিনা ফৌজদারী

চার দিনা বেটি সাস হৈ দারুণ, আখির রাজ তুমহারী।

আমার পিতার গৃহের পশ্চাতে পূর্ব দিকে তেঁতুল গাছের ছায়ায় বসে স্ননিপুণ স্বর্ণকার গহনা গড়ছে, পিতা সোনা দিচ্ছেন। হে স্বর্ণকার গড়, সারা মাথা ঢাকা পড়ে এমন টকলী, সিঁধী গড়।

এগুলি পরেই কথা গিয়ে বসলেন—ভাঁর মন উদাস। পিতা জিজ্ঞাসা করছেন, ‘হে কথা, বর কি তোমার পছন্দ হয় নি, তোমায় যে যৌতুক দিচ্ছি তা কি যথেষ্ট নয়, তোমার অলঙ্কারের সোনা কি খারাপ? তুমি এমন নিরানন্দ কেন?’

কথা উত্তর দিচ্ছেন, “হে পিতা, দানসামগ্রী অল্প নয়, বরও সাধারণ নয়, কিন্তু স্তনতে পাই শাস্ত্রী নাকি বড়ই কঠোর প্রকৃতি, সেইজন্তই মন উদাস হয়েছে।”

পিতা উত্তর দিচ্ছেন “হে পুত্রী, রাজার রাজ্য চার দিনের,

ফৌজদারীও চারদিনের, কঠোরপ্রকৃতি শাস্ত্রীও চার দিনেরই—তারপরে তো তোমারই রাজ্য।”

এখানে সম্ভবতঃ ফৌজদারী মামলার কথা বলা হচ্ছে। ফৌজদারী মোকদ্দমা অবশ্য দেওয়ানী মোকদ্দমার মত দীর্ঘস্থায়ী হয় না, তবে রাজার রাজ্য যে খুব স্বল্পকালস্থায়ী হবেই এমন কোন কথা নেই। সুতরাং এই অসংলগ্ন উপমাগুলি কথার হৃদয়ে কতখানি সাধুনা বা আশার সঞ্চার করে তা বলা কঠিন। এই উক্তি কথার মনের উপর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার বর্ণনা কবি দেন নি।

নিম্নে শাস্ত্রীর বধুনির্ধাতনের একটি চিত্র দেওয়া হ’ল :—

এক হী ঘরওয়া কে বড়ীস দুআর হো

বড়ীসো দুআরওয়া পর মরিচ কে গাছ।

সের ভর মরিচ হো সান্ন সিলোটি ধরী দেই হো

মরিচ পিসতে হো সান্ন ধুপে আঠো অঙ্গ হো।

জেহ তোরা বহা রে ধুপল আঠো অঙ্গ হো

অপনা বাবা ঘরসে চেরিয়া বোলাউ।

হমরা বাবাজীকে কা করবু জোর হো

নাচেলা নচনিয়া রে, ভইয়া বকসলে ষোড়।

মোরা পিছু অরওয়া কইরওয়া হিত ভাইয়া হো

অইসনী লোলারী বহা নইহঁর পহঁচাও।

ঝররে ঝরোখা চটী অন্মা নিরখে হো

কস দেখে বেটিকে ডঙীয়া বলক আয়ে হো।

কিয়া বেটি চোরিখী রে, কিয়া বেটি চটনী হো

কিয়া বেটি দীহলু হো সান্নকে জবাব।

নাহী বেটি চোরগী হো নাহী বেটি চটনী হো

ইন বেটি দীহলী হো সান্নকে জবাব।

এক ভর অইলু হো বেটি দুই ভর জাহ হো

টকলে ওহারল বেটি সান্নর জাহ।

একটি বাড়ীর বত্রিশটি দ্বার এবং বত্রিশটি দ্বারেই লঙ্কার গাছ। এক সের লঙ্কা বাটতে বসে বধুর আট অঙ্গ অবশ হয়ে যায়—বধু সেকথা শাস্ত্রীকে বলছেন। শাস্ত্রী জবাব দিচ্ছেন, “তা হলে তোমার বাপের বাড়ী থেকে দাসী আন নি কেন?”

বধু রাগ করে বলছেন, “আমার পিতাকে কিছু বলেন নি কেন? ভাঁর ঘরে নাচওয়ালী নাচে এবং আমার ভাই তাকে ঘোড়া বকশিস দেন।”

মুখরা বধুকে পিতৃধনের গর্ব করতে দেখে শাস্ত্রী তাকে কাহার (পাকীবাহক) ডেকে পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

কথার মাতা কথাকে দেখামাত্র জিজ্ঞাসা করছেন—“কি করেছ, চুরি কিংবা খাবার জিনিষে লোভ না শাস্ত্রীর মুখের উপর কথা বলেছ?” কথা সত্য কথাই স্বীকার করলেন। তখন কথার জননী বলছেন, “যত শীঘ্র এসেছ তার চেয়েও দ্রুত স্বস্তরের ঘরে ফিরে যাও, কাপড়চোপড় বদলাবার আগেই ফিরে যাও।”

মাতাকর্তৃক তিরস্কতা, উভয়সঙ্গটে পতিতা কথার অবস্থা অবর্ণনীয়।



## আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ঘুমের মতই আবেশ—শিথিল রক্তির বুজটিকে দোলা দিচ্ছে।

বিপরীতমুখী বাতাস—রক্তের উষ্ণতাকে শীতল করে আনছে, তবু মাথার যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে। একে উপেক্ষা বলবে—

না! অধুনাগহীন অভিনয় বলবে? যে প্রশ্ন ইঙ্গিতে আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠল—তাকে অবসর-মুহুর্তের বিলাস বলে উড়িয়ে

দিলে শুভা। ভালবাসাটি হ'ল বিলাস। দুঃখভোগের মুহুর্তে দেহগত দাবিকে অস্বীকার করা স্বভাবকে অতিক্রম করার

হুশ্চেষ্টা ছাড়া আর কি। পৃথিবীতে লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে একটি মানুষ বিশেষ করে যখন আর একটি মানুষের সঙ্গ

কামনা করে পরস্পর এক হয়ে অপার আনন্দ লাভ করে—জগতের যাবতীয় বস্তু ব্যক্তি রুত্তি নীতি হিসাব পরিণাম সব

কিছুকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেরা করে নিরুদ্ধেশ যাত্রা—তখন সে জিনিসকে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি দিয়ে কিছু না বলে উড়িয়ে

দেওয়া চলে কি? হোক সে বিলাস—কি ভালবাসা কিংবা দেহগত আকর্ষণ কিংবা মহৎ অসং বাস্তব কল্পনা যে-

কোন রুত্তিরই প্রকাশ তাকে অস্বীকার করা মানেই নিজেকে অস্বীকার করা। একটি মানুষ বিশেষ করে একটি মুহুর্তে একটি

মানুষকেই চাইবে। বিস্তীর্ণ পৃথিবীর চিন্তা—খণ্ডিত এক গৃহকোণে আবদ্ধ হয় বলেই নয়—সোনালী ফসলে পৃথিবী

দিনেরাতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে; অঞ্চল মিলতে এসেও কত বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বাইরের বাধা—ভিতরের বাধা,

আইনের—অন্তরের কর্মের কত না বাধা। ছ ছ করে ছুরস্ত হাওয়া চলন্ত মোটরে আছাড় খেয়ে পড়ছে—আঁকাশ তারা-

সমেত ছুটে পালাচ্ছে ছ' পাশ দিয়ে। মাঠে নেমেছে অন্ধকার—দিক হয়েছে নিশ্চিহ্ন। এই দ্রুত ধাবমান পারিপার্শ্বিকে

হৃদয়গত দৌর্বল্যই শুধু নিঃশেষে মুছে যাচ্ছে না। যে মুখ ফিরিয়েছে—তার দিকেই টানছে প্রবল রুত্তি—কামনা কিংবা ভালবাসা। না—এ শুধু দুর্বলতা। একটি পথ আর একটি

পথকে ছুঁয়েছে কিন্তু মেশে নি তার মধ্যে। ছুটি সরল রেখা পাশাপাশিই তো চলে—বহুদূর চলেও তারা মেশার

স্বযোগ পায় না। তাদের পাশে সবুজ ঘাস মাথা তোলে—বিচিত্র বর্ণের ফুল শোভা বিস্তার করে—পাখীর কাকলিতে

উতলা হয় পথের ধূলা তবু তারা এক হবার স্বযোগ পায় না। একটি মানুষের মোহ—তত প্রবল হবেই বা কেন। হওয়া উচিত তো নয়।

গাভীবারান্দার কোলে মোটর থামল। বেরারা ছুটে এসে সেলাম জানালে—মিঞ্জির সাহেব ঠারতা হার।

ড্রয়িং-রুমে আলো জ্বলছে—পাখাও চলছে মনে হ'ল। যুহু কথার আওয়াজে বুঝলে—মিঞ্জি একা আসেন নি।

নমস্কার বিনিময়ের পর মিঞ্জিই পরিচয় করিয়ে দিলেন অপর ব্যক্তির সঙ্গে, আমার ভাইবুঁ মালতী মিঞ্জি—এইবার বি-এ দিচ্ছে।

প্রশান্ত শ্রীতি-সম্মতপূর্ণ হাসি ফুটিয়ে মেয়েটিকে অভ্যর্থনা করলে। বুন্ধিতে উজ্জ্বল দুই চোখে ওর হ্রীর প্রকাশ অপূর্ণপ

মনে হ'ল। বিভাপ্রকাশের ব্যাকুলতা অবিনয়ের নামান্তর—এ তো বহুক্ষেত্রে তাকে গীড়া দিয়েছে। শূন্যগর্ভ কলসীতে

যে কঁাকা আওয়াজ হয় তারই মত বাক আর রীতি-সম্বন্ধ নয় মালতী। অন্তত প্রথম দর্শনে তাই মনে হ'ল।

মিঞ্জি বললেন, এক ক'দিনে অনেক কিছু ঘটেছে। যে সন্ত দিয়ে শ্রমিকদের অসন্তোষ দূর করেছিলাম—তাও ওরা

মানছে না। আমি তখনই বলেছিলাম যে, 'মোর দে গেট—মোর দে ওয়াক্ট।' কেন এমনটা হ'ল।

ওটাই যে স্বভাব ওদের। দেখেন নি—ষ্টেশনের কোন কুলিকে তায় পাওয়ার বেশী দিলেও আয়ো কিছু পাওয়ার

দাবি সে করবেই। এও তেমনি। আজকাল নাকি ওদের ফেডারেশন না বড় ইউনিয়ন সারা ভারতের ছোট ছোট

ইউনিয়নগুলিকে এক করে রেখেছে। তারা যা নির্দেশ দেবে এরা তাই মানবে। দেশটিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন বানাতে

চায়।—ব্যঙ্গপূর্ণ হাসিতে কথাটা শেষ করলেন মিঞ্জি।

মালতী নম্রকণ্ঠে বললে, আলাদা আলাদা না থেকে এক হওয়াই কি ভাল নয়? এই তো আপনারাও এক

রয়েছেন।

মিঞ্জি বললেন, এক হওয়া ভাল নয় কে বলছে। কিন্তু যুক্তিহীন দাবি চাপিয়ে নিজেকে একতাকে প্রমাণ করার নাম

শক্তি প্রকাশ নয়।

মালতী হাসলে—বললে, এক হ'লেই যে শক্তি প্রকাশ পায়—এটা প্রকারান্তরে স্বীকার করলেন কাকা।

মিঞ্জি রাগ করে বললেন, তোমার ছেলেমানুষি পনা ঘুচল না মালতী। কবে কি বলেছিলাম—তাই ধরে বসে আছ।

মালতী হাসতে হাসতে বললে, কিন্তু ওরাও তো বলতে পারে দাবি আমাদের যুক্তিহীন নয়—আপনাদের যুক্তিটাই

হ'ল অত্যায্য জিদ।

প্রশান্ত বললে, তা বলতে পারে না—যেহেতু অত্যায্য জায়গার তুলনায়—ওরা ভালই মাইনে পায়। ছ' হ'বার ওদের

দাবি মিটিয়েছি আমরা।

মালতী বললে, বেশ তো আর এক বার মিটিয়ে দিন দাবি। জিনিসের দাম দিন দিন বাড়ছেই তো।

মিত্র বৈধব্যচ্যুত হয়ে বললেন, তারপর আমরা খোঁজার ঘাস কাটব, না? তোমার মত বুদ্ধি হলেই ফ্যাঙ্কট্রী চলবে?

মালতী হাসি দমন করে প্রশান্তুর দিকে চেয়ে বললে, এত হাঙ্গামার মধ্যে মানুষের না যাওয়াই ভাল নয় কি?

ওর এই ছেলেমানুষি মন্তব্যে প্রশান্ত হাসলে। তারপর হেঁতে করে বেয়ারা চা নিয়ে এল, সেই সঙ্গে তার আনুষঙ্গিক। শ্রমিক-প্রসঙ্গ ছেড়ে ওরা হালকা আলাপে নেমে এল। কোথায় চালের দর চড়ছে, কোথায় তেলের র‍্যাক মার্কেট কেঁপে উঠছে, কোথায় প্রধান মন্ত্রীর ফতোয়া জারির ফলে প্রদেশে প্রদেশে, দেশীয় রাজ্যে সম্পূর্ণ বাধীন হওয়ার আয়োজন চলছে—এসব আলোচনাও ক্রমশঃ এসে পড়ল। আজকালকার যে-কোন সভাতে—মজলিসে—উৎসব—ক্ষেত্রে পাঁচ জন এক হবার সুযোগ ঘটলেই অন্তর্ভুক্তি সরকার—লীগ ও কংগ্রেসের নীতি—রেশন আর র‍্যাক মার্কেট—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার কথা এসব নাকি উঠবেই।

আঁহারাদি সেরে তিন জনেই গাছোখান করলে। মিত্র চললেন আগে আগে—পিছনে গল্প করতে করতে চলল প্রশান্ত আর মালতী।

অত্যাঁচ কথার পর মালতী বললে, এই ধরনের জীবন আপনার কেমন লাগে?

প্রশান্ত প্রশ্ন-উত্তর ধোঁবে ওর পানে চেয়ে পাঁচটা প্রশ্ন করলে, আপনার কি মনে হয়?

মালতী মুখ নামিয়ে তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে, মন্দ কি। মুখে তার মুহু হাসি ফুটে উঠল।

প্রশান্ত বললে, আপনি হাসলেন যে।

এমনি—হাসিটা আমার রোগ।

প্রশান্ত বললে, আমি জানি—এ ধরনের জীবন আপনার মনোমত নয়।

কারণ?

কারণ—একটু আগে আপনিই তো বললেন—

মালতী শব্দ করে হেসে উঠল। বললে, ও হরি—আপনি বুঝি ভেবেছেন আমি শ্রমিক-হিতাকাজিক্ষী। ওদের কথা নিয়ে বড্ড ভাবি? না—না—না—মোটাই তা নয়—ওদের কথা এত কম জানি বলেই তো ওদের কোন দাবিই আমার কাছে অত্যাঁচ বলে বোধ হয় না।

আশ্চর্য্য!

আশ্চর্য্য! কেন? কেন?

মিত্র পিছন ফিরে বললেন, দশটা বাজে—কাল আলোচনা করো মালতী।

মালতী এগিয়ে এসে বললে, আচ্ছা কাকা—শ্রমিকদের ব্যাপার আমরা ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন?

মিত্র হেসে বললেন, তার দরকার কি—ওদের যে-কোন

দাবি তুমি সমর্থন কর—এই তো তুমি ওদের সম্বন্ধে পাকা ওয়াকিফখাল।

মালতী ঘাড় ফিরিয়ে প্রশান্তুর পানে চেয়ে হেসে বললে, কাল এসে তর্ক করব কিন্তু। নয়স্কার।

ভাঙ্গা টাঁদের অস্পষ্ট আলোয় ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রশান্ত ভাবলে—একটা পথ আর একটা পথকে বার বার ছুঁয়ে যাবার চেষ্টা করে—এইটাই কি পথের চরমতম ইঙ্গিত। চলবে—অথচ মিলবে না—যুদ্ধ হবে অথচ থামবে না—এই ইঙ্গিত দিয়ে মানুষ রচনা করেছে পথকে—না পথ নির্দেশ দিচ্ছে মানুষকে?

সকালেই মালতী এল। সবোচ্চ প্রশান্ত-বিছানা ছেড়ে হাতমুখ ধুয়েছে—প্রাতঃকালীন অনেকগুলি কাজ তার বাকি। মালতী বৈঠকখানায় ঢুকেই কলিং-বেলে ঘা দিয়ে পিয়ানোর সামনে টুলটার গিয়ে বসলে। তার পর ডালা তুলেই টুং টাং শুরুর করে দিলে। বিলাতী একটা গানের সুর ওর কণ্ঠ ছাড়িয়ে অল্প ধ্বনিতরঙ্গে যন্ত্রস্বরের মধ্যে আত্ম-বিসর্জন করলে। বেশ প্রসন্ন প্রাতঃকাল—মালতী অকারণে খুশী হয়ে উঠল।

অগত্যা সব কাজ না সেরেই প্রশান্তকে নেমে আসতে হ'ল। যুদ্ধ কর কপালে ঠেকেয়ে ও হাসলে, আশা করি নি—এত সকালে—

মালতী বাম হাতের মণিবন্ধ ঝঁৎ আন্দোলন করে বললে, বাংলা সময়টা সব চেয়ে আগিয়ে চলে—মানুষদের পিছিয়ে পড়লে ছুঁমি রটে। অবশ্য সময়ের আগে চলার অপবাদ ও সাধুবাদ কোনটিরই ভাগী হতে চাই না।

অপবাদ?

নয়? যে সময়ের আগে চলে—তাকে বুঝতে পারে খুব কম লোকে।

প্রশান্ত বললে, অবশ্য তাঁরা যদি বুঝবার সুযোগ দেন সাধারণকে—

মাথা নেড়ে হেসে উঠল মালতী। কি কথাই যে বলেন? সময়ের আগে চলেন যারা তাঁরা মোটেই সাধারণ নন তো সাধারণে বুঝবে কি করে। এর একটা সহজ পথ আছে—সে হচ্ছে অসাধারণ হওয়া।

প্রশান্ত বললে, বিধাতা সকলের বুদ্ধিবৃত্তিকে সমান করেন নি—প্রতিভাও দুর্লভ বস্তু। বাই হোক চা চলবে?

চলবে—কিন্তু কালকের তর্ক চলবে না।

কেন—আপনিই তো আশ্বাস দিয়ে গেলেন—

পরে ভাবলাম—তাতে লাভই বা কি? আপনার জীবন-যাপন-প্রণালী ভাল লাগে কি মন্দ লাগে—তা জেনে কারই বা লাভ-ক্ষতি।

তবে কাল জিজ্ঞাসা করলেন কেন ?

কৌতূহল ।...কাকার মুখে শুনলাম এখানকার কথা ।

এইসব শ্রমিক—এদের দাবি—ধর্মঘট—অশান্তি—আপনা—  
দের ক্ষমতা—জিদ—

কোনটা অস্বাভাবিক মনে হ'ল ?

কি জানি—ঘোরপ্যাচ অত বুঝি না । শুধু বুঝি আমরা যদি পেট ভরে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারি—এরাও তা পারবে না কেন ? ওরা কেন চাপ দেয়—কেন ভয় দেখায় ধর্মঘট করবার—কেন স্লোগান আউড়ে মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ করে—তা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন ।

জানি । কিন্তু দাবির একটা সীমা আছে । যে হাঁস সোনার ডিম দেয়—তাকে খুন করলেই অনেকগুলো ডিম এক সঙ্গে মেলে না—এ তো জানেন ?

মালতী বললে, জানি বৈকি—। তবে কথা হচ্ছে—সোনা জিনিষটাই মারাত্মক বলেই—লোভের সীমা নির্দেশ করে দেওয়া খুব কঠিন । আচ্ছা সোনা জিনিষটাকে খুব সন্তা করে দিয়ে পৃথিবীর সমস্তা সহজ করা যায় না ?

প্রশান্ত বললে, সোনার বদলে যে জিনিষই দিন—লোভ তাতে কমবে না ।...বিনিময়—প্রথা এককালে ছিল—তাতেও সামাজিক সমস্তা মেটে নি ।

মালতী বললে, ও সব তর্ক থাক—চলুন খানিক বেড়িয়ে আসি ।

কোথায় যাবেন ? এই কলোনিটি পেরুলেই তো বাঁশ-বাগান ।

মন্দ কি—লাল আর হলদে রঙের একই টাইপের বাড়ি দেখে দেখে এত পুরনো লাগছে ।—মালতী উঠে বারান্দায় এল ।

নতুন তৈরী শহরের আভিজাত্য নেই—একথা মনে মনে, স্বীকার করলে প্রশান্ত । সেই সঙ্গে তর্ক জমল মনে—আভিজাত্য না থাকলেই বা ক্ষতি কি । ইতিহাস বলে, পরষাপহরণ—সম্পদস্বপ্তির মূল সূত্রে নিহিত । মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিতে সংস্কৃতির পিপাসা রয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না । কিন্তু নিজেকে সব দিক দিয়ে সুন্দর করে তোলবার মাঝে পরকে গীড়ন করার অভিযোগ আসবেই বা কেন । মানুষ তো মুন্ডা নয় যে—যে ছাপ তার ছ-পিঠে ফুটে রয়েছে—তারই মূল্যে প্রত্যেকের গোত্র হবে তুল্যমূল্য । অসাধারণ বুদ্ধি—কর্মক্ষমতা—প্রতিভা—এসবের গোত্র সর্ব-সাধারণ হতে অনেকখানি উচ্চত । বাগানের বেড়ায় ছাঁটাই-করা গাছ—সে প্রকৃতির অলঙ্কার নয়—পৃথিবীর বিবর্তনবাদের সাক্ষ্যও নয় । যে সবার চেয়ে প্রাণশক্তিতে সতেজ, তার মূল্যও সাধারণের চেয়ে চড়া । কিন্তু সংস্কৃতির পিছনে সম্পদ স্বপ্তির তাগিদ থাকলেও—অপহরণের দৃষ্টি নেই । এক

একটা শহরের আভিজাত্য আছে বৈকি—যেমন দিল্লী, যেমন কাশী । বিবেকানন্দ একদিন বলেছিলেন, ইউরোপের শিক্ষা রাজনীতি—এশিয়ার শিক্ষা অধ্যাত্মবাদ । পৌরাণিক যুগের কাশী অগ্নিবীণা এই শেষের কথাটাকেই প্রমাণ করছে ।

চলতে চলতে ছ'জনের মধ্যে এমনি আলাপই চলল । মালতী হয়ত তর্কপট্ট নয়—সব কথাতেই অল্প যুক্তির ভারে ও বখতা স্বীকার করে । তাই বলে ও যে কিছুই জানে না এ কথাও সত্য নয় । নগরস্বপ্তির কথা থেকে ইতিহাসের অনেক নজির উদ্ধৃত করলে—ভাল মন্দ দুটি দিকের বিচারেই ওর দক্ষতা লক্ষ্য করা যায় । তবে উগ্র মতবাদ নিয়ে অপরকে আক্রমণ করার নেশা ওর নেই । প্রশান্তর ভালই লাগল । যে মূর্তি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে—তাকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করা যায়—কিন্তু যে মূর্তিকে সুসম্পূর্ণ করবার অবকাশ যথেষ্ট—তাকে নিজের কামনা অমুখ্যায়ী সার্থক করে তোলা সহজ ।

—ফিরবার মুখে প্রশান্ত বললে, বিকেল বেলা আসবেন এদিকে ?

মালতী বললে, আপনার কাজের ক্ষতি হবে না ?

না ।—তারি আনন্দ পাব তা হলে ।

বৈকালেও ছ'জনে বহুক্ষণ ধরে গল্প করলে । এ শহরে দেখবার কিছু নেই—পড়বার মত ভাল বই নেই, লাইব্রেরি, তাও নেই—। একথেকে কাজ—এক ধরনের কথাবার্তা । তাই মালতীর সঙ্গে প্রশান্তর মনকে সুস্থ করে তুললে । আশ্চর্যের কথা—সারাদিনটা শুভার কথা ওর একবারও মনে হয় নি । অথচ কাল সন্ধ্যাবেলায় মোটরে করে যখন ও ফিরছিল...

মালতী কিদায় নিয়ে চলে গেলে প্রশান্ত ওর কথাগুলি আর একবার ভাবতে বসল । ভাবতে ভাবতে দেখলে কোন মতবাদের ভার চাপিয়ে মালতী ওর চিন্তাকে বহুপথগামী করে নি । একটা স্বাভাবিক বা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হবার সুযোগও দেয় নি সে—অথচ মালতী যে বহু বিন্দু-প্রতিষ্ঠিত একটা নদীর মত লীলামাধুর্যে মন হরণ করে নিয়েছে তাও নয় । তার শিক্ষা—হ্রী অল্প তর্কেই এইগুলিই কি আনন্দের কারণ ? হবে । আজকের দিনটি তো আনন্দেই কাটল—আর সেজন্ত ধন্যবাদ মালতীকে ।

২৬

কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অনন্ত দৌবের বৈঠকখানায় জরুরি প্রামাণ্য চলছে । লক্ষী গ্লাস ওয়ার্ক—এনামেল ফ্যাক্টরী আর দুটো কটন মিলের শ্রমিক সবার একসঙ্গে ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছে । যুদ্ধোত্তর যুগে জীবন-

যাপনের মান অসম্ভব রকম উঁচু হয়েছে—নিত্য প্রয়োজনীয় অর্ধেক জিনিষ তো পাওয়াই যাচ্ছে না। রোগে চিরকালই মাহুম মরে—আজও মরছে, তবে মৃত্যুর হারটা বেশী। কারণ পুষ্টিকর খাবারের অভাব—আর খাতে ভেজাল তো আছেই। রোগের ওপর আছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। যাদের কাছে জীবনধারণই সব চেয়ে বড় ও কঠিন সমস্যা—তার কি করে রাজনীতির পক্ষে আকর্ষণ নিমজ্জিত হ'ল—, কিন্তু রাজনীতি তাদের বহু দূরে ও গভীরে টেনে নিয়ে গেছে। ধর্মের খোলসটিকে বাঁচাবার জন্ত তারা জীবন বিসর্জন দিচ্ছে—মাহুম হাসছে দূরে দাঁড়িয়ে। যাই হোক, রাজনীতি বা ধর্ম কোনটাই তাদের জীবন বিসর্জনের হেতু নয়—আসলে ঈর্ষা-ক্ষুদ্র হুর্দেল মনে আদিম বৃত্তিকে জাগিয়ে দিয়ে সাবধানীর দল নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে নেবার জন্ত এই খেলা খেলছে।

সর্বেশ্বর রায় বললেন, এ-ও তাদের খেলা। আমি বাজী রেখে বলতে পারি ওই দলকে মোটা রকম কিছু দিলে ধর্মবাদের নোটিশ তুলে নেবে।

কমল মিত্র বললেন, টাকার দরকার হলে—আবার নোটিশ দেবে ওরা। ওদের হাতের খেলনা হয়ে যদি ফ্যাক্টরী চালাতে হয়—তার চেয়ে ফ্যাক্টরী তুলে দেওয়া ভাল।

অনন্ত দোবে বললেন, বিজনেসম্যান কখনও বিজনেস তুলে দেবার কথা বলে না। কি লাভ রইল না, রইল, এই দেখা আমাদের ডিউটি।

সর্বেশ্বর বললেন, ডিউটি তো—কিন্তু ওদের চোখ রাঙানি সহ্যে পারবেন কি?

প্রশান্ত বললে, কতকগুলি সর্ভ আমরা ঠিক করে ফেলি—ওদের ফেডারেশন যদি সেগুলি মেনে নেয়—

সবগুলি যদি ওরা না মানে—

আমরাও বিবেচনা করে দেখব ওদের সব সর্ভ মেনে নেওয়া যায় কিনা। কিছু কাটছাঁট ছ'পক্ষকেই করতে হবে।

আপোষ-মনোভাব ওদের নেই। দেখেন নি—কলকাতা থেকে মেয়ে পুরুষ লীডার এসে মিটিং করে তাতিয়ে দিয়ে গেল কেমন। চলছে না—। আরে আমাদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্‌ লিভিংয়ের সঙ্গে তাদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্‌ লিভিং এক করলে হয় কখনও। যে রকম দাবির বছর কোন দিন বলে বসবে—একখানা মোটর না হলে আমাদের ভারি কষ্ট হচ্ছে। সর্বেশ্বর শ্রেষ্টের ভঙ্গিতে কথাগুলি তীক্ষ্ণ গলায় উদ্‌গীরণ করলেন।

সবাই হাসলেন—কিন্তু কথা না বাড়িয়ে ছ'পক্ষের সর্ভ-গুলিকে কাটছাঁট করে মোটামুটি আপোষের একটা ভিৎ খাড়া করলেন।

কমল মিত্র বললেন, এতেও মিটবে না—হাতে ছাড়বার

মত ও ছাড়বার মত ছ'একটা বিষয় ঠিক করে নিব।

যথা।

ওই ক্যাজুয়েল লিভটা উঠিয়ে—মোট কুড়ি দিন ছুটি বছরে দেওয়া যেতে পারে। ডাক্তারী সার্টিফিকেটে ধরুন এক মাস। হাফ পে'র কোর্সেচন রাখবেন না। আর জরুরি অবস্থা না হলে মাইনের হার দশ বছরের মধ্যে বাড়ানো চলবে না।

সর্বেশ্বর বললেন, বোনাসটা কি একদম বাদ দেওয়া যায় না?

প্রশান্ত বললে, না—পুজোর সময় একটা বোনাস দিতেই হবে—অতিরিক্ত লাভ হলে আর একটা—

না—না—না—মশায় আর আঁকারা দেবেন না। সর্বেশ্বর চীৎকার করে উঠলেন।

সভার শেষে পথ দিয়ে ভাবতে ভাবতে চলেছিল প্রশান্ত। এই দরকষাকষি ব্যাপারটা তার ভালই লাগে নি। এই দেওয়ার মধ্যে খ্রীতির প্রকাশ কই? দাবি মিটলে যারা কাজে আসবে তারাই কি নিরহঙ্কৃত মনে মনিবগোষ্ঠীকে শ্রদ্ধা দেখাতে পারবে কিংবা কাজে দিতে পারবে পূর্ণ মনোযোগ? এক পক্ষ আদায় করে নিয়ে উন্নত হবে—অন্য পক্ষও সেই অল্পপাতে তাদের পীড়ক বলে ঘৃণা করবে। মাহুমের মন সাধারণ অবস্থাকে অতিক্রম করে জয়পরাজয়কে মনে স্থান না দিয়ে নির্বিকার হতে পারে কি। শ্রমিকরা সর্ভ যা দিয়েছে তাও যথেষ্ট বাড়ানো—মালিকরা যা মেনে নিচ্ছেন তাও তাহা অংশের চেয়ে ন্যূন তো বটেই। কারও মধ্যে আন্তরিকতা নেই। একে আপোষ বলার চেয়ে ভাবী যুদ্ধের প্রস্তুতি বলাই ঠিক।

মোড় ফিরতেই মালতী এসে মিলল ওর সঙ্গে।

ইস—খুব ভাবতে ভাবতে চলেছেন দেখি? ব্যাপার কি?

নাঃ—এদিকে কোথায় গিছলেন?

মালতী বললে, কোথাও না। বাঃ রে, বাড়ীর দিকে চললেন যে—বেড়াতে যাবেন না?

আজ থাক।

উঁহু—আজ একটা আশ্চর্য্য জিনিস দেখাব আপনাকে।

উইচিবিটা আছে—প্রশান্তর হাত ধরে ও বিপরীত দিকে আকর্ষণ করলে।

অগত্যা মালতীর সঙ্গ নিতে হ'ল।

মালতী বললেন, আর কি—এবার তো ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল। উনিশ শো আটচল্লিশের তিরিশে জুন ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে যাবে। শোনেন নি আজ এটলির ঘোষণা রেডিওতে?

তাই নাকি?—ইন্টারিম গবর্ণমেন্টে লীগকে নিয়ে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে—তাই পণ্ডিত নেহেরু ব্যাপারট বিলতে



জানিয়েছিলেন। এ অবস্থা থাকলে তাঁরা লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়বেন এই ভয় দেখিয়েছিলেন।

তারই ফলে লর্ড ওয়াডেলকে সরিয়ে মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় করা হ'ল। উনি নাকি শেষ ভাইসরয়।

প্রশান্ত বললে, খোশ খবরের বুটোও ভাল।

বুটো? এমনি ঢাকঢোল পিটিয়ে মিথ্যা প্রচার করতে পারে কেউ? মালতী অকৃত্রিম বিষয়ে চেয়ে রইল প্রশান্তর পানে।

প্রশান্ত হাসলে। বললে, রাজনীতি আমরা বুঝি না—এটা যেমন ঠিক—ইংরেজী ভাষার ভাষাগুলিও তেমনি নানান জাতের। কোথায় ওঁর কাক রইল—সে কি তুমি আমি পারব ধরতে।

মালতী বললে, এত সোজা কথার মধ্যেও—

প্রশান্ত বললে, স্বাধীনতার মূল্য দিতে হয় একথা মান তো। বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা আসে—ইতিহাসে এ নজির মেলে না—অথচ আমরা পেয়ে যাচ্ছি—

মালতী বললে, জগতে ছোটো রক তৈরি হচ্ছে তারই সুযোগে আমরা—

আমার এখনও সন্দেহ আছে। ভারত ছাড়ব বললেই ভারত ছাড়া যায় না। সেদিন যেন পড়ছিলাম কে একজন লিখেছেন—সিদ্ধাপুরকে মালয় ষ্টেট থেকে আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে। ওখানে ব্রিটিশ নৌবাঁটি ক্যামের তো রইলই। আন্দামান নিকোবর দ্বীপগুলি থেকে সিলোন পর্য্যন্ত ওরা নিরাপত্তার একটা লম্বা লাইন টানছে—যেমন প্রশান্ত মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপে মার্কিনী আত্মরক্ষার ব্যবস্থা চলছে। ঈজিপ্ট হয়ে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত ব্রিটিশ এই লম্বা লাইন দৃঢ় করে রাখবে। ভারত ছেড়েও ভারতকে ছোঁরা দেখিয়ে বশে রাখবার ব্যবস্থা। তা ছাড়া ভেবে দেখ—দেশীর রাজ্যগুলি এখনও গণপরিষদে যোগ দিতে ভরসা পাচ্ছে না—ওরা নিজেরা স্বতন্ত্র থাকতে চায়—আর ব্রিটিশ সে সুযোগ ছাড়বে বলে বোধ হয় না।

মালতী বললে, হাঁ—ঘোষণায় এ কথাও বলা হয়েছে—ভারতের অনিচ্ছুক প্রদেশ বা অংশকে ছোঁর করে প্রধান অংশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে না। ব্রিটিশ যে-কোন প্রধান দলের হাতে ক্ষমতা দিয়ে যাবে—ভিন্ন ভিন্ন দলকেও ক্ষমতা দেওয়া আশ্চর্য নয়।

প্রশান্ত বললে, ভাষা রচনার মন্ত বড় একটি কাক এখানেই রয়েছে।

মালতী বললে, সত্যিকারের ক্ষমতা যদি নাই দেবে—তো এসব ঘোষণার মূল্য কি?

প্রশান্ত বললে, সত্যতা আর রাজনীতিতে অহি-নকুল সম্বন্ধ। ওর মূল্য আমরা বুঝতে পারব না।

মালতী বললে, সত্যি—এ সব কচকচি ভাল লাগে না। আত্মন একটু বস। যাক।

হু'জনে ঘাসের উপর বসলে। পিছনে বাঁশবন—বাতাসে হুয়ে-পড়া বাঁশ, থেকে কই কই শব্দ হচ্ছে, একটি ঘুঘু পাখী কোথায় আত্মগোপন করে মাঝে মাঝে সেই শব্দে হুয় সাধছে। সামনে ধূ-ধু করছে মাঠ। কুঠারের আঘাতে বহু গুল্ম ও বৃক্ষ ধরাশায়ী হয়েছে। শহর এগিয়ে আসছে। এখনও আকাশ রয়েছে নীল। মোটা চিমনির ধোঁয়া এদিককার আকাশকে ঢেকে দিতে পারে নি এখনও।

কালই আমি চলে যাচ্ছি। আকাশের পানে চোখ তুলে মালতী বললে।

কালই। কণাটি ধীর বিলম্বিত ধরে উচ্চারণ করলে প্রশান্ত।

হাঁ—তবে মাসখানেকের মধ্যেই হয়ত ফিরে আসব। আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে মালতী বললে।

প্রশান্ত উদাস দৃষ্টিকে প্রান্তরের পার থেকে টেনে আনলে না। সংক্ষেপে বললে, ভাল।

জায়গাটা আমার ভালই লেগেছে। কাল বলছিলাম না—সব শহরের বনেদিয়ানা থাকে না—আর বনেদিয়ানা না থাকলে মানুষকে টানতেও পারে না সে জায়গা।

হাঁ—আমি বলেছিলাম নাই বা থাকল বনেদিয়ানা। নতুন ভাবে সৃষ্টি করার মধ্যেই রয়েছে ভাল লাগার বস্তু।

আপনার কথাগুলি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম কাল। ভাবতে ভাবতে দেখলাম—এ ছিনিস আমারও তো ভাল লাগা উচিত। অল্প যুগকে যদি ভালবাসতে পারি ত নিজের যুগকে অবহেলা করব কেন?

কিন্তু ভালবাসা—আর ভাল লাগা উচিত ত এক নয় মালতী।

একই দৃষ্টিভঙ্গির একটুখানি তফাৎ শুধু। যেই মনে হ'ল উচিত অমনি—

হেসে উঠল প্রশান্ত, অমনি ভালবাসার ডিগ্রীতে হ-হ করে তাপ উঠে গেল।

মালতীও হেসে বললে, গেলই তো।

তারপর হু'জনেই বহুক্ষণ ধরে বিলম্বিত হাসির তালে তাল দিয়ে চলল। প্রশান্ত দেখলে—আকাশ অত্যন্ত নীল হয়ে উঠছে—মালতী দেখলে—পায়ের তলাকার ঘাসগুলি গাঢ় সবুজে রূপান্তরিত হ'ল।

প্রশান্ত আবেগভরে মালতীর একখানি হাত তুলে নিয়ে ডাকলে, মালতী।

এই ভাষা এই আবেগকম্পিত সম্বোধন সৃষ্টি-চৈতন্যের উন্মেষ হতে এই মুহূর্ত পর্য্যন্ত কোন নারীর কানে একটি ছাড়া অল্প কোন অর্থে প্রতিধ্বনিত হয় নি। এ সম্বোধন নয়—সম্পদ।

মালতী ডুব দিলে সেই সম্পদসাগরে।

২৭

নতুন শহরে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল অত্যন্ত দ্রুত। প্রশান্তর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—মিত্র আপত্তির হেতু খুঁজে পেলেন না। এ এক পক্ষে ভালই হ'ল। উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি ধরে যারা উচ্চ রাজপদের সামীপ্যে বিচরণ করেন তেমন বর অবশ্য সকলকারই কাম্য। কিন্তু যশ-সম্মানের অধিকারী হলেই সম্পদটা যথাপ্রাপ্য হিসাবে লাভ করা যায় না। ওখানে উত্তম কথাটির মূল্য দিয়েও ভাগ্য জিনিসটাকে নষ্টাং করা কঠিন। কমল মিত্র যখনই মুখে উত্তোগী পুরুষসিংহের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন, মনে মনে বলেন—ভাগ্যও সম্পদসৃষ্টির আর একটি গুণবিশেষ। মানুষের মত সম্পদেরও ছুটি চরণ—আর তাতেই তার সম্পূর্ণতা। মালতীর ভবিষ্যৎ এই মিলনে উজ্জ্বল বোধ হ'ল—এবং প্রসন্ন মনে তিনি স্ত্র্যোগের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে নতুন শহরের আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের সর্ব মিলে নি; ছ'পক্ষের অনমনীয় ইচ্ছা মনোমালিগকে স্তূড় করে তুলছে। হাতে-রাখা সর্বগুলির কিছু ছেড়েও মিলনের উপকূলে পৌঁছানো অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।

মিত্র মত প্রকাশ করেছেন, না হয় ছ'মাস বন্ধ রাখব ফ্যাক্টরী—ওদের অতায় জিদ তবু মানব না।

সর্বেষ্বর বলেছেন, আর কেন—বানপ্রস্থের সময় তো হ'ল—এবার খানকতক কোম্পানীর কাগজ কিনে কাশীবাগ করব ভাবছি।

অনন্ত দোবে কোন মন্তব্য করেন নি। ব্যবসাদারের শিরায় মজ্জায় ব্যবসার রক্ত বহমান—কোন রকমে লাখ-কতক নিয়ে মুখ ফিরানো তাঁর রীতি নয় বলেই শেষ পর্যন্ত হাল তিনি ছাড়েন নি।

প্রশান্তর অভিমত—ব্যবসা শুধু অর্থসঞ্চয়ের যন্ত্রবিশেষ নয়। সমাজ-ব্যবহাকে সুস্থ ও সবল করে রাখবার এ একটি অতি আবশ্যিক প্রথা। সেইজন্তই আপোষ-মীমাংসার পক্ষপাতী সে।

কিন্তু শ্রমিক-সম্মত আপোষ-মীমাংসায় রাজী হয় নি।

ব্যাপারটা সালিশীতে দেওয়ার কথা উঠেছে। মালিকরা সকলেই অবশ্য এ বিষয়ে একমত নন। তাঁদের অনেকের ধারণা এতে তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়বেন—তাঁদের মান-প্রতিপত্তির লাঘব হবে—মর্যাদার সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন না শ্রমিকদের সামনে। তবে প্রশান্তর যুক্তিতে যত না হোক, কালধর্মের প্রভাবটা তাঁরা অন্তরে অন্তরে স্বীকার করে সালিশী রফায় সম্মতি জানিয়েছেন। বাকি আছেন প্রশান্তর নিয়োগকর্তা চৌধুরী সায়েব। তাঁর অনুমতি নেবার জন্য প্রশান্ত আজ বৈকালেই কলকাতা রওনা হবে।

—মালতী এসে দাঁড়াল মোর্টরের সামনে। বললে, আমাদের পৌছে দেবেন শ্রামবাজারে?

—প্রশান্ত ছুয়ার খুলে বললে, এস।

ছ'জনে পাশাপাশি বসলে। প্রসাধিতা মালতীর মুহু দেহ-সৌরভে গাড়ীটা ভরে গেল—। গতির সঙ্গে ছ' পাশের দিগন্ত-লীন নীল আকাশ সরে সরে যাচ্ছে—নিম্নরূপ একটি অবসর ছ'জনকে ঘিরে বিভ্রত হয়ে রয়েছে—তবু ওরা ছ'জনে যেন দুই জগতের প্রাণী।

প্রশান্ত চিন্তার গভীরে ডুবে গেলেও মাঝে মাঝে অসদৃশ নিম্নরূপ মুহূর্তগুলি ওর চৈতন্যকে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। একটা কিছু বলা দরকার মালতীকে—অথচ সে কথাটি কি এই মুহূর্তে তা স্বরণে আসছে না।

অবশেষে মালতীই কথা বললে, কি যেন ভাবছেন? প্রাইকের কথা না কি?

হাঁ। মাথা নেড়ে স্বীকার করলে প্রশান্ত।

মালতী বললে, তা এতে ভাববার কি আছে, ওদের দাবি মিটিয়ে দিন না।

প্রশান্ত হাসলে—কোন কথা বললে না।

মালতী ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, সত্যি—এত সব অশান্তি কেন যে সাধ করে পোয়ায় মানুষ?

প্রশান্ত বললে, অনিচ্ছাতেও অশান্তি আসে—

মালতী সোজা হয়ে বসে বললে, না—সম্পূর্ণ ইচ্ছাতেই বলব। এই যে হাদ্গামা—

প্রশান্ত বললে, এমনি ধারাতেই জগৎ চলছে। হাদ্গামা কোথায় নেই। তুমি ইচ্ছা করলেও যেমন অনেক হাদ্গামা থেকে আলাদা থাকতে পার না তেমনি—

মালতী বললে, প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগ বুঝত—

ঠিক বলেছ। এমন কতকগুলি ঘটনা আছে—যা স্বার্থের সঙ্গে কায়মীভাবে জড়ানো—এমন কতকগুলি ব্যক্তি রয়েছে—যা তথাকথিত মান-সম্মানের দাবিতে বেশ উগ্র—এই সবই খোলা চোখ আর খোলা মন নিয়ে বিচার করতে দেয় না মানুষকে।

কেন—ওদের যদি চিনতেই পারি আমরা—

চিনতে পারি না বলেই তো মুশকিল। প্রশান্ত হাসলে।

মালতী কোন কথা কইলে না। বাইরের দৃষ্ট মোর্টরের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত—মনকে সেই তালে ছুটিয়ে দিলে হয়ত নিষ্কৃতি পাওয়া যায়—কিন্তু মন রয়েছে অতৃপ্ত। অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। অবশেষে ও বললে, কখন ফিরবেন?

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই। তারপর কেউই কথা বলবার চেষ্টা মাত্র করলে না।

প্রশান্তর কি জানি কেন মনে হচ্ছে মালতী সঙ্গে না এলেই ভাল হ'ত। একলা একলা যাবার মুখে আসন্ন সমস্তাগুলিকে ভাল করে ভেবে দেখবার অবকাশ পাওয়া যেত। মালতী

যে ধরনের তর্ক করে তাতে তর্কই করা যায়—মীমাংসায় পৌছানো সম্ভব নয়। কি লাভ ওই ধরনের কথা কাটাকাটি করে। শুধু কথার কৌশলে মানবীয় ব্যক্তিগতিক ব্যাখ্যা করলেও তার দোষ-ভাগ বর্জন করা যাবে না। তর্কের মধ্যে লড়াইয়ের মনোভাব—বিপরীত মত-সংঘাত মুহূর্তে ভেসে যায়, যদি দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে তা ধ্বনিত না হয়।—সহসা মনে হ'ল, মালতীর বদলে শুভা যদি তার সঙ্গে আসত? শুভা?—আজ সে শুভার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায় নি কি?...শ্রমিকদের দাবির পিছনে সম্বন্ধ যে শক্তি রয়েছে শুভারও অংশ রয়েছে তার পরিচালনায়। শুভা এই নূতন শহরের...মালিকদের নিশ্চয় জানে। তার...ওদের দাবি পূরণের অস্বীকৃতিতে ধৈর্যচাঁরের নমুনা দেখে মনে মনে নিশ্চয় হাসছে। মনের মধ্যে হু হু করে উঠল।

প্রান্তর পার হয়ে শহরে প্রবেশ করল মোটর।

মালতী বললে, মোড়ের মাথায় বাঁধবেন—নামব।

কেন—বাড়ীতে পৌঁছে দিই না?

দোকানে দরকার রয়েছে—তা ছাড়া ছ'এক জন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে যাব।

মোটর থেকে নেমে মালতী বললে, ঘণ্টাতিনেক পরে যখন ফিরবেন—আমাকে তুলে নেবেন কিন্তু।

আজই ফিরবেন?

ইচ্ছা তো আছে। নমস্কার। হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে মালতী এগিয়ে চলল।

আজকাল অন্তরঙ্গতার সুরোপে ওদের সামাজিক রীতিনীতি যথেষ্ট শিথিল হয়েছে। এতখানি একসঙ্গে এসে মাত্র তিন ঘণ্টার ব্যবধানে এই ভদ্রতাবোধ জাগল কেন তা বিস্ময়ের বিষয়। এ কি শহরের সনাতন বৃত্তি? বাড়ী আর মাহুধের বেড়া চোখের সঙ্গে মনকেও আড়াল করে রাখে? একাকী মানুষ অত্যন্ত সহজ; কিন্তু বহু মানুষ এক হলেও একাকী হতে পারে না, আর সেই কারণেই সভ্য আচার-ব্যবহারের বহু অলঙ্কার তার গায়ে চাপানো।

চৌধুরী হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন, কি খবর প্রশান্ত? বস—আগে এক কাপ চা খেয়ে তাজা হও—তার পর তোমার অভিযোগ শুনব। প্রশান্ত চায়ের কাপ টেনে নিয়ে বললে, আমি যে অভিযোগ করতে এসেছি—এ আপনি জানলেন কি করে?

চৌধুরী হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, যারা—লক্ষ্মীর সাধনায় পৃথিবীতে দাবার ছক পেতে বসে—তাদের কানকে সজাগ আর দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ রাখতেই হয়। এই দেখ—বলে মরকো চামড়া বাঁধানো একখানা ফাইল তুলে নিলেন বাঁ দিকের ট্রে থেকে। ফাইলের লাল ফিতে খুলতে খুলতে

বললেন, এই ফিতে দেখে যেন মনে করো না—এটা সরকারী দপ্তরখানার মতই মেজাজদার।

প্রশান্ত দ্বিধা হস্ত করে বললে, না—তা মনে করব না। জরুরি ব্যাপারে—

চৌধুরী বললেন, হাঁ—কোটি কোটি টাকার ব্যাপারে তা মনে করা অজায় হ'ত না—কিন্তু—এই দেখ। একখানা নীল রঙের পুরু লেফাফা তুলে নিয়ে প্রশান্তর দিকে এগিয়ে দিলেন।

প্রশান্ত চিঠিটা বার করে পড়বার উত্তোষ করতেই তিনি বললেন, চিঠি পড়বার আগে তোমার ব্যক্তিগত মতামতটা আজ জানতে চাই। চিঠি লিখেছেন সর্বেশ্বর—আর সকলের জবানীতে। ওঁরা জানাচ্ছেন—আয়ব্যয়ের হিসাব করে দেখা যায় শ্রমিকদের দাবি মেটাতে 'গেলে লাভের অঙ্কটা নাকি চূপসে যাবে। যা থাকবে তা ভুতের ব্যাগার খাটা মাত্র। তোমার মতটা নাকি দাবি মেটানোর দিকে—অবশ্য ছায়া দাবি। কিন্তু আমি জানতে চাই কাকে ছায়া দাবি বলবে তুমি?

প্রশান্ত বললে, বেশী মুনাফার লোভ না রেখে যথাসম্ভব ওদের দাবি মেটানো যায় যদি—

এই নিয়ে কবার মেটানো হবে ওদের দাবি?

তা বার তিনেক বোধ হয়।

কতটুকু সময়ের মধ্যে?

বছরখানেক।

প্রত্যেক ছ'মাস অন্তর ওরা যদি দাবি জানায়—তাকে ছায়া বলা যায়?

কিন্তু—

কিন্তু থাক। যুদ্ধের আগেকার জিনিসপত্রের দাম আজকের তুলনায় হয় তো পাঁচ ছ'শত কম। সেই অল্পপাতে যদি মজুরি দেওয়া যায়—ফ্যাক্টরীকে চাঙ্গা রাখা সম্ভব হয় কি?

হয় না স্বীকার করি। তবু যতটুকু সম্ভব—

সেই যতটুকু কে ঠিক করে দেবে প্রশান্ত। আমি মালিক আমি পারব—না তুমি মজুর তুমি পারবে? তোমরা প্রস্তাব করেছ কোন নিরপেক্ষ সালিশ নিযুক্ত হোক—সেখানে শ্রমিক আর মালিক প্রতিনিধি থাক—বেশ ভাল কথা। কিন্তু তার আগে একটা কথা ছ'পক্ষ থেকে ঠিক করে মেনে নেওয়া উচিত নয় কি?

কি কথা বলুন।

ধর—আর ছ'বার যে মজুরি বাড়িয়ে দিয়েছিল—তাতে উৎপাদন কিছু বেড়েছিল?

না—বরং—

বরং উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ—কিছু হাতে পেয়ে আরও কিছু পাবার আশায় ওরা মন দিয়ে কাজ

করে নি। সেটা ওদের দিক থেকে সৰ্ত্ত ভঙ্গ বলা যায় কি না ?

যায়। কিন্তু ..

কিন্তু নয়—ওরা সৰ্ত্ত ভঙ্গ করেছে। অভাবগ্রস্ত দেশে কম মাল উৎপন্ন করাটা—আইন থাকলে আর দেশ স্বাধীন হলে শান্তিভোগের কোঠায় পড়ত কিনা! আচ্ছা এসব না হয় ছেড়ে দিলাম। মালিকী মনোবৃত্তি নিয়ে নয়—সোজা জিজ্ঞাসা করছি ওদের দিক দেখে যতটা সুবিধা দেওয়া সম্ভব আমরা দেব—তার বিনিময়ে ওরা সন্তুষ্ট মনে কাজ করবে তো? জানতো—যে হাঁস রোজ একটি সোনার ডিম দিতে পারে—তাকে হত্যা করলে একসঙ্গে সে ঝুড়ি ঝুড়ি ডিম দিয়ে যায় না।

প্রশান্ত সোজা হয়ে বসল। বললে, আপনার কথা আমি বুঝেছি। এ প্রশ্নটা আমার মনেও জেগেছে।

এটা আমার প্রশ্ন নয়—যে দেশে শ্রমিক গবর্ণমেন্ট আছে—যাদের শক্তিশালী ইউনিয়ন আছে, তাঁদের কথা। তারা যেমন শ্রম দাবি করে তেমনি শ্রম শ্রম দেয়। শ্রম শ্রম দিতে পারে না যে শ্রমিক সে ইউনিয়নের সভ্য হতে পারে না। তাকে শান্তি দেয় ইউনিয়ন।

আমাদের দেশে তেমন—

তেমন নীতি নেই কারণ সঙ্ঘ-নেতার। দুর্বল। তাঁরা নেতাই থাকতে চান—শ্রমিকদের লোভের যোগান দিয়ে। ওদের লোভকে শ্রম পথে চালাতে শেখেন নি।

প্রশান্ত চুপ করে রইল—কি বলতে চান চৌধুরী? দাবি মেটানোর অহুকুলে ওর মত হয়ত—

চৌধুরী বললেন, খাবড়ে যেয়ো না হে। আমিও মাছুষ—মাছুষের দুঃখকষ্ট বুঝি। ওদের দাবি মেটানোর সপক্ষে মত দেব—তবে তথাকথিত শ্রমিক-নেতার হুমকিতে নয়। নিরপেক্ষ সালিশি বহুত—বার বার নয়, একবারেই ঠিক হোক চুক্তি। শ্রম্য দাম—শ্রম্য শ্রম। নিজির এদিক ওদিক হেলেই দায়িত্ব বহন করতে হবে।

প্রশান্ত বললে, নিজি নিয়ে বসলে সোনার ওজন ঠিক হতে পারে—মাছুষের অভাব—

পাকাপাকি কিছু করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। দ্রব্য-মূল্যের মান কমলে শ্রমমূল্য যে কমবে না এ কুয়ুক্তি অবশ্য মানব না—আবার দ্রব্যমূল্য আরও চড়ে যদি—

হাঁ—সেটা আমরা ঠিক করে নেব।

চৌধুরী হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, ঠিক হবে না হে—ঠিক হবে না। শ্রমিকের নেই মাথা—শ্রমিক-নেতার নেই দূরদৃষ্টি বা সাধুতা।

সকলকে একথা বলবেন না।

সকলকে বলব এ স্পর্ধা আমার নেই—কিন্তু বীদের সংস্পর্শে এসেছি—প্রমাণ অবশ্য দেব। বলে একটা হলদে চিরকুট বার করে দুটি আঙুলে ভুলে ধরে হাসলেন। এটা হ'ল যুদ্ধ-বিরতি পত্র। দশটি হাজার টাকা ঢাললে আপাতত এই বিরোধ মিটবে।

প্রশান্ত আরক্ত মুখে বললে এ নিশ্চয় খাঁটি শ্রমিক-নেতার প্রশ্রাব নয়—কোন জালিয়াত—

হাঁ—জালিয়াত। এরাই তো বু'ট গেড়ে বসেছে জনগণের মাথায়। বড় অস্ত্র এদের হাতে ধর্মঘট—এই অস্ত্র না থাকলে এদের প্রভুত্ব থাকত কোথায় প্রশান্ত।

প্রশান্ত বললে, যাই হোক—এদের কুকীর্তির কথা এদের সঙ্গে জানানো উচিত।

প্রমাণ কই।—এ কাগজে স্বাক্ষর নেই—হাতের লেখা সনাক্ত করা কঠিন—তবু এ মিথ্যা নয়।

আপনি নিশ্চয় এই টাকা দেবেন না।

কেন দেব না—? অধিকাংশ মালিকই কিন্তু এই ঘুষ দিতে রাজী হয়েছেন এবং অহুরোধ করেছেন আমাদের, যাতে আমি অরাজী না হই।

প্রশান্ত মাথা নামিয়ে বললে, আমি ঘৃণাকরেও যদি জানতাম—

চৌধুরী বললেন, টাকার অঙ্কটা শুনতে ভারী, কিন্তু দমে ভারী নয়। অর্থাৎ এ দিয়ে যদি বছরখানেক ঠেকিয়ে রাখতে পারা যায় আন্দোলনকে তো যথেষ্ট লাভ। এইবার চিঠিখানা পড়—লাভের হিসাব নিকাশ তাও ওতে আছে—দেখ। আমি আসছি। পাইপ ধরিয়ে চৌধুরী কক্ষান্তরে গেলেন।

ঘরের একশো ওয়াটের বিদ্যুৎ বাতিটা যেন নিবু নিবু হয়ে এল। পৃথিবী—পরিবর্তিত হচ্ছে এটা সত্য—কিন্তু অভাবনীয় এই দ্রুত পরিবর্তনে বা সরে যাচ্ছে পায়ের তলা থেকে—যা মিলিয়ে যাচ্ছে সামনে থেকে, তাকে মেনে নেওয়ার ফুরসটুকুও যে পাওয়া যাচ্ছে না। কে অসাধু? শ্রমিক-নেতা, না মালিক? না—যুদ্ধোত্তর এই পৃথিবী?

চৌধুরী ফিরে এসে বসলেন চেয়ারে। নতুন চুরটে অগ্নিসংযোগ করে সম্মিত মুখে তিনি প্রশান্তের পানে চাইলেন।

প্রশান্ত পাংশু মুখ ভুলে বললে, না-না আপনি এতে রাজী হবেন না। রাজী হবেন না—

চৌধুরী ধোয়া ছেড়ে বললেন—না, রাজী হই নি। তুমি শ্রমিক-নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে পার। সং ভাবে যা করা সম্ভব—শেষ পর্যন্ত আমার সমর্থন পাবে তুমি।

প্রশান্তের মুখে হাসি ফুটল।

ক্রমশঃ



# বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

মধ্য-পশ্চিম

পরদিন ৩১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার। সকাল আটটায় তাপ খুব নামিয়া গেল। তখন তাপ শূণ্যের ২২ ডিগ্রী নীচে। ১৯১৭ সনের পর নাকি এদেশে তাপ এত নীচে আর নামে নাই। তীব্র শীতের নানারূপ প্রতিক্রিয়ার কথা খবরের কাগজে পড়িলাম। শিশু অতিরিক্ত আবরণের চাপে দম বন্ধ হইয়া মরিয়া গিয়াছে। রেলগাড়ীর চাকা অতিরিক্ত শীতে ফাটিয়া গিয়াছে। ট্রেন চলাচল অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। টেলিফোন লাইন অকেজো হইয়া গিয়াছে। লোক ঠাণ্ডায় জমিয়া মরিয়া গিয়াছে। শীতের চোটে সতী পতি ছাড়িয়া আদালতে ডাইভোর্স-কেস আনিয়াছে। এক পত্নী নালিশ করিয়াছেন যে তাঁহার পায়ের বন্ধাদুর্ভ জমিয়া যাওয়া পর্যন্তও তিনি পতির সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু পরে আর থাকিতে পারিলেন না। পতিরও উষ্ণতর গৃহের ব্যবস্থা করিবার মত আর্থিক সংস্থান নাই। কাজেই বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রার্থনা করিতে হইতেছে।

বেলা ৯টার পর বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন তাপ শূণ্যের ১৮° ডিগ্রী নীচে। জমশঃ বেলা একটায় শূণ্যের ১° ডিগ্রী নীচে গিয়া আরো নামিতে সুরু করিল।

সেদিন ক্যাপিটল ভবনে বহু সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ হইল। এক দিনের মধ্যে অনেক কাজ শেষ করিতে হইল। সকলেরই ব্যবহার অমায়িক। আমাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবার জন্য তাহাদের আশ্রয় দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। আর্লবার্গ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু আলাপ করিলেন। তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। আমরা এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ভারতবর্ষে বসেতে ডাক্তারী করিতেন। তাঁহার খবরও অনেক দিন পাই না।

আমি—তাঁহার নাম একলাঙ। তিনি এখন রেনোতে ডাক্তারী করেন।

বার্গ (সবিশ্রমে)—আপনি কি করিয়া জানিলেন।

আমি—তাঁহার সঙ্গে আমার শিকাগোর এক হোটেলে সাক্ষাৎ হইয়াছে।

আচ্ছা, ইঙ্গ-ভারতীয় সমস্তার আসল স্বরূপটি কি?

আমি—এক কথায় সমস্তাটি হইল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সমস্তা। উভয় পক্ষ এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধমত পোষণ করেন।

বার্গ—ইংরেজ বোধ হয় আপনাদের সঙ্গে সামাজিকতার ক্ষেত্রেও খারাপ ব্যবহার করে। ব্রেজিলের একটি ভ্রমলোক কিছুদিন পূর্বে আমাদের এখানে আসিয়াছিলেন। যাইবার সময় তিনি আমাকে বলিলেন যে, আপনারা আমার সঙ্গে

যে রূপ সহৃদয় ব্যবহার করিলেন ব্রেজিলের আমেরিকানগণ যদি স্থানীয় অধিবাসিগণের সহিত অসুস্থ ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে ব্রেজিল আমেরিকার প্রতি অত্যাচারে ধারণা পোষণ করিত।

আমি—অবস্থা কথায় বলে স্নেহের পূর্বে গেলে ইংরেজের রূপান্তর হয়। কিন্তু সেটি মূল সমস্তা নয়, মূল সমস্তার অত্যন্ত বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র।

বার্গ—আপনাদের দেশে তো নানা মত, নানা রুচি।

আমি—ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ, প্রায় যুক্তরাষ্ট্রেরই মত। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেও বিভিন্নতা কম নয়। পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে রুচি, আচার, মত ও স্বার্থ বিভিন্ন। তথাপি এই আঞ্চলিক পার্থক্য এড্রাহাম লিঙ্কনের পর আর আপনাদের জাতীয় ঐক্যের বা স্বাধীনতার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় নাই।

বার্গ—আপনি ঠিক বলিয়াছেন।...দেখুন আমি জার্মান, কাল হেগ্গেড আসিয়াছিল, সে ক্যাঙিনেভিয়ান। বহু দেশের লোক আসিয়া এখানে এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছে। বাহ্যিক পার্থক্য লইয়া কেহ এখানে কলহ করে না।

আমি—পার্থক্য শক্তিবৃদ্ধিরই কারণ হইয়া থাকে যদি না রাজনৈতিক ছরভিসন্ধি তাহাকে অগ্র কার্ণে নিয়োগ করে। বিশেষত বহু দিনের পরাধীনতার ফলে এই সব পার্থক্যকে আশ্রয় করিয়া এক-একটি কায়েমী স্বার্থ শিকড় গাড়িয়া বসে। পরাধীনতা ও এই কায়েমী স্বার্থগুলিকে আমাদের যুগপৎ উৎপাটিত করিতে হইবে। অথচ সময়ও বেশী নাই। কাজেই বুঝিতেছেন আমাদের সমস্তা কি কঠিন। জর্জ ওয়াশিংটন ও এড্রাহাম লিঙ্কন যুগপৎ এই উভয় মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করাই আমাদের প্রয়োজন। সমস্তা যত কঠিনই হোক, আপনাদের ও সারা দুনিয়ার যখন শুভেচ্ছা রহিয়াছে তখন আমরা তাহার সমাধান করিবই।

ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে একটি বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইনি গান্ধীভক্ত। গান্ধীজীর অধিবাসবাদ সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিলেন। ম্যাক্ জে ইন্ডিনিয়ার। এখানকার খনিজ লোহের নমুনা দেখাইলেন। বলিলেন, “আপনাদের দেশের খনিতে অনেক বেশী লোহা আছে এবং আপনাদের দেশে লোহা, কয়লা ও চূনাপাথর খুব কাছাকাছি পাওয়া যায়।”

আমি যে রাষ্ট্রের অধিবাসী তাহার লোকসংখ্যা সম্বন্ধে কথা উঠিতে আমি বলিলাম—“উহা শুনিতে চাহিবেন না। শুনিতে হয়ত আপনাদের মাথা ঘুরিয়া যাইবে। বঙ্গদেশের

লোকসংখ্যা ছয় কোটি অর্থাৎ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যার অর্ধেক।”

আর ডি পাওয়ার্স এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার অব ট্যাক্সেশন। জার্মানীর আত্মসমর্পণের পর সেদেশের ট্যাক্স আদায়ের বিভাগগুলিকে পুনর্গঠন পূর্বক সক্রিয় করিয়া তুলিবার ভার দিয়া ইঁহাকে জার্মানীতে পাঠানো হইয়াছিল। সেখান হইতে সত্ত্ব ফিরিয়া আসিয়াছেন। বলিলেন—“জার্মানীতে দেখিয়াছি এক একটি জায়গায় এত লোক বাস করে যে আমরা ধারণা করিতে পারি না। আমি তো দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছি।”

আর এফ হাটফিল্ড সত্ত্ব জাপান হইতে ফিরিয়াছেন। জাপানের আত্মসমর্পণের পর তাঁহাকে জাপানের রাজ-পরিবারের বাজেট ঙিরেঙের করিয়া পাঠানো হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, আপনি কাল চলিয়া যাইবেন। এই আবহাওয়ায় আপনাকে আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলে শুধু কষ্টই দেওয়া হইবে। কারণ আমার বাড়ী শহরের বাহিরে। অত্ৰ রাত্রিতে নববর্ষ-উৎসব উপলক্ষে আমি সেন্টপল হোটেলের ক্যাসিনোতে একটি টেবিল রিজার্ভ করিয়াছি। সেন্টপল হোটেলের দূরত্ব আপনার হোটেল হইতে এক শত গজের অনধিক। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন কি?

আমি—কতক্ষণ আপনাদের উৎসব চলিবে?

হাটফিল্ড—নয়টায় শুরু হইয়া ভোর ছইটা-তিনটা পর্য্যন্ত চলিবে।

আমি—আমি বড় ঘুমকাতুরে। ঘণ্টাখানেক থাকিয়া চলিয়া আসিলে যদি দোষ না হয় তবে অবশ্যই যাইব।

হাটফিল্ড—আপনি যেরূপ স্তুবিধা মনে করেন তাহাতে কোনই আপত্তি হইবে না।

হোটলে ফিরিবার মুখে বার্গের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলাম। বার্গ বলিলেন, “আজ নববর্ষ-উৎসব, আমাদের উচিত আপনাকে নিমন্ত্রণ করা।”

আমি—হাটফিল্ড সেন্টপল হোটলে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

বার্গ—বেশ হইয়াছে। আমেরিকাবাসিগণ কিন্তু নববর্ষ উৎসবে প্রচুর মত্ত পান করে। আপনি কিছু মনে করিবেন না।

আমি—আমি যে মোটেই মত্ত পান করি না তাহাতে অত্ৰ সকলের অনুবিধা হইবে না তো?

বার্গ—কিছু না। আপনি কিন্তু আমাদের মাতাল মনে করিবেন না। এক দিনের অত্ৰ সকলেই এখানে একটু ছেলেমানুষী করে।

নৈশ ভোজন সমাপনান্তে রাত্রি নয়টায় সেন্টপল হোটেল অভিমুখে চলিলাম। হোটেলটি আমার হোটেলের খুব কাছে। হাটফিল্ড যাইতে দুই-তিন মিনিট মাত্র লাগিল। দারুণ শীতে

সব জমিয়া যাইতেছে। সর্বত্র শু পাকার বরফ। ভিতরে চুকিয়া ঈষত্তপ্ত বায়ু-সংস্পর্শে আরাম বোধ করিলাম। গলা-বন্ধ, কান-ঢাকনী ও ওড়ারকোটি রক্ষীর হেফাজতে রাখিয়া ক্যাসিনো-গৃহে প্রবেশ করিলাম। জিজ্ঞাসা করিতে হাটফিল্ডের টেবিলটি দেখাইয়া দিল। তখনও হাটফিল্ড-দম্পতি আসেন নাই। আমি একাকী বসিয়া কক্ষটির সজ্জা দেখিতেছি। প্রত্যেক চেয়ারের সঙ্গে একটি করিয়া বেগুন বাঁধা। বেগুনগুলি নানা রঙের। পত্ৰ পত্ৰ করিয়া উড়িতেছে। প্রত্যেক টেবিলে যতগুলি চেয়ার ততগুলি বাণিশ করা কাগজের টোপর। টোপরগুলিও নানা রঙের। ক্রমশঃ নরনারীর সমাগম হইতে লাগিল। প্রত্যেকের পকেটে একটি করিয়া ছেলেদের খেলনা হারমোনিয়াম বাঁশী। সবাই আসিয়া টোপর মাথায় দিয়া বসিয়া পড়িতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া ছেলেদের মত সোংসাছে বাঁশী বাজাইতেছেন। আর মাঝে মাঝে পানীয় পরিবেশকের নিকট পানীয় চাহিয়া লইয়া পান করিতেছেন। মনে হইল সবাই যেন বাল্যকালে ফিরিয়া গিয়াছেন।

কক্ষটি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। পার্শ্বে মঞ্চের উপর বাদকসম্প্রদায় বাজযন্ত্রসমূহ লইয়া প্রস্তুত। সামনে নৃত্য-প্রাঙ্গণ।

কিছুক্ষণ পরে হাটফিল্ড-দম্পতি প্রবেশ করিলেন। প্রাথমিক আলাপের পর হাটফিল্ড-গৃহিণী পানীয় ফরমাসেস করিলেন। আমি বলিলাম, “আমার পানীয় চাই না।” তিনি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “আজকার দিনে একটু?” আমি তখন কমলালেবুর রস চাহিলাম। আমি ছাড়া ইঁহাদের আরও দুই জন অতিথি ছিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওত্রলোকটি হ্যাটফিল্ডের সঙ্গে গত বৎসর জাপানে ছিলেন। সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী। ইঁহাদের সকলেরই বয়স চল্লিশের কম। মহিলাদ্বয়ের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। ক্রমে আলাপ জমিয়া উঠিল, হাটফিল্ড-গৃহিণী বলিলেন—আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়াছি। গান্ধী ও নেহেরুর কথাও কিছু কিছু পড়িয়াছি।

আমি—তবে তো আপনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানেন।

হাটফিল্ড গৃহিণী—আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্যসত্যই কিছু জানি না।

আমি—আমেরিকা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা ততোধিক। বর্তমানে অবশ্য এদেশের কথা জানিবার ইচ্ছাটা খুব বাড়িতেছে। পূর্বে ওয়াশিংটন ও লিঙ্কনের নাম ভিন্ন বিশেষ কিছু জানিতাম না।

হাটফিল্ড—এঁদের সম্বন্ধে আপনাদের কিরূপ ধারণা।

আমি—ইঁহাদের নিকট আমরা প্রেরণা লাভ করিয়াছি।

ওয়াশিংটন এদেশকে স্বাধীন করিয়াছেন। লিঙ্কন এ দেশকে একতাবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা ছেলেবেলায় লিঙ্কনের একটি জীবনী পড়ি, বইখানির নাম ‘কার্টহুটীর হইতে ‘সাদাবাড়ী’, আমি এবার সে কার্টহুটীর এবং ‘সাদাবাড়ী’ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

গান্ধীজী জওহরলাল ও রবীন্দ্রনাথ সহজে কথা উঠিল। হাট্‌ফিল্ড-গৃহিণী বলিলেন যে, একটি ইংরেজী কবিতা-সংগ্রহে তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা পড়িয়াছেন। হাট্‌ফিল্ড বলিলেন—নেহেরুকে আমরা সহজে বুঝিতে পারি, কিন্তু বর্তমান যুগে গান্ধীনীতি আমরা বুঝি না। এ যুগে কি অহিংসা বা কুটীর-শিল্প চলিতে পারে?

সহসা হাট্‌ফিল্ড-গৃহিণী বলিলেন—আচ্ছা, আপনি বলিয়াছেন যে আপনি স্বদেশেই শিক্ষালাভ করিয়াছেন। কিন্তু এগুপ ইংরেজী শিখিলেন কোথায়? আপনি শুধু দ্রুত এবং শুধু ইংরেজীই বলেন না, সমস্ত ইডিয়ম অতি সহজ ভাবে বলিয়া যান তাহা ইংরেজী ভাষার সহিত নিবিড় পরিচয় ভিন্ন সম্ভব নয়। তারপর আমরা উত্তরে লোক, খুব দ্রুত কথা বলি। আমাদের দেশের দক্ষিণী লোকেরা বলে, আমরা এত দ্রুত কথা বলি যে তাহারা সব সময় ধরিতে পারে না। কিন্তু আপনার ত কোন অসুবিধা হইতেছে না।

আমি—বিলাত ও আমেরিকার বাহিরে যে এগুপ ইংরেজী শেখা যায় তাহা শুনিয়া আপনি অবাক হইতেছেন। কিন্তু আমরা একটা বিদেশী ভাষা শিখিবার জন্ত কি পরিমাণ সময় ও শক্তি নষ্ট করি তাহা দেখিলে আপনি এর চেয়ে অনেক বেশী অবাক হইতেন। হাট্‌ফিল্ড-গৃহিণী তাঁহাদের বহুপত্রীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—ইনি খুব ধর্মশাস্ত্র চর্চা করেন।

বহুপত্রী—আপনাদের দেশে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি কিরূপ ধারণা।

আমি—আমাদের বিশ্বাস, ঈশ্বরের কাছে যাইবার পথ অসংখ্য। যে যে পথেই চলুক না কেন সে ঈশ্বরের নিকটেই পৌঁছবে। কাজেই অল্প পথাবলম্বীর সঙ্গে আমাদের কোন দ্বন্দ্ব তো নাইই, পরন্তু আমরা অল্প পথকে আমাদের নিজেদের পথের মতই শ্রদ্ধা ও মাঠ করি।

হাট্‌ফিল্ড—আচ্ছা, বৌদ্ধধর্মের সার কথা কি?

আমি—আমি এসব বিষয়ে বড়ই অজ্ঞ। তবে যতদূর জানি বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা কর্মফলে বিশ্বাসী। বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের বা ঈশ্বর-রূপার উপর জোর দেন না। তাঁহাদের মতে মানুষের স্বীয় কর্মফলই তার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করে।

হাট্‌ফিল্ড-গৃহিণী—আপনার কথা শুনিয়া আশ্চর্যজনক বৌদ্ধধর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল।

জাপানের কথা উঠিল। আমি হাট্‌ফিল্ডকে জিজ্ঞাসা

করিলাম—জাপানে ভাষার জন্ত বা সেখানকার কর্মপদ্ধতির নতনত্বের জন্ত আপনার কোন অসুবিধা হয় নাই?

হাট্‌ফিল্ড—বিশেষ কিছু নয়। রাজ-পরিবারে সবাই ইংরেজী জানিতেন। আর আমাকে জাপানে পাঠাইবার পূর্বে ছ’মাস ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছিল।

এখানে দেখিতেছি নতুন কাজে হাত দিবার পূর্বে সকলেই ট্রেনিং নেন, আর সমস্ত বিষয়েই গবেষণার ব্যবস্থা আছে।

আমরা বখন এইরূপ আলাপ করিতেছি তখন নৃত্যবাদ্য ও হারমোনিয়াম বাঁশীর উচ্চ ধ্বনিতে কক্ষটি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কলরব ক্রমে কোলাহলে পরিণত হইতেছে। বহু-পত্রীটি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি একবার কক্ষটির সর্বত্র ঘুরিয়া আসিলেন।

হাট্‌ফিল্ড-গৃহিণী—আপনাকে আমাদের গৃহে নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল। তাহা হইলে অনেক বিষয়ে আলাপ করা যাইত। আপনি কি কালই চলিয়া যাইবেন?

আমি—হ্যাঁ।

তখন কক্ষমধ্যে নরনারীর সম্মিলিত বলনৃত্যের ধুম পড়িয়াছে। তালে তালে স্তম্ভুর বাদ্য চলিতেছে। যাহারা নাচিতেছেন না তাহারা মাঝে মাঝে হারমোনিয়াম বাঁশী উচ্চৈশ্বরে বাজাইয়া এবং কখনও করতালির দ্বারা গৃহটিকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছেন। নানা রঙের বেলুন উড়িতেছে। নরনারীর মাথায় নানা রঙের টোপার। তখন রাত্রি ১১টা হইয়াছে। নববর্ষকে নাচিয়া গাহিয়া আনন্দ-কোলাহলের দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে হইবে। আমি দম্পতিদ্বয়ের নিকট বিদায় লইয়া তাঁহাদিগকে এই আনন্দোন্মত্ত জনতার মধ্যে নিজেদের বিলাইয়া দিবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়া চলিয়া আসিলাম। বাহিরে তখন তাপ শূন্যের ১২ ডিগ্রী নীচে। হিম-শীতল বায়ু বহিতেছে। চারিদিকে শুধু শুধু বরফ।

ছ’দিন পরে সংবাদপত্রে লণ্ডনের একটি ঘটনার এইরূপ বিবরণ পড়িলাম। একটি ভদ্রলোক নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে লণ্ডনের কোন হোটেলে একটি টেবিল রিজার্ভ করিবার জন্ত বহু প্রকারে চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হন। প্রত্যেক বারই জবাব পাইলেন যে, সমস্ত টেবিল রিজার্ভ হইয়া গিয়াছে—‘হাউস ফুল’। শেষে ভদ্রলোকটি একটি চাল চাଲিলেন। টেলিফোনযোগে হোটেলের কর্তৃপক্ষকে বলিলেন, “আমি পেশোয়ারের মহারাজের সেক্রেটারী। নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে মহারাজের জন্ত আপনার হোটেলে চারিটা আসনযুক্ত একটি টেবিল রিজার্ভ করিতে পারেন কি?” সঙ্গে সঙ্গে টেবিল রিজার্ভ হইয়া গেল। ভদ্রলোক নিজে পেশোয়ারের মহারাজ এই পরিচয় দিয়া বহুবান্ধব লইয়া সেই হোটেলের নববর্ষ উৎসবে যোগদান করিলেন। হোটেলের কর্তৃপক্ষ জানিলেন না যে, পেশোয়ারের মহারাজা বলিয়া কোন মহারাজা নাই।

## নিউইয়র্ক

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী। বেলা ১২টা ৫০ মিনিটে হোটেল ত্যাগ করিয়া সেন্টপল মিনিয়া-পলিসের বিমান-ঘাঁটিতে পৌঁছলাম। দেবিলাম এখানে পূর্ব এবং প্রাচ্য কথা দুইটি দ্বারা দুটি বিপরীত দিক সূচিত হইতেছে। প্রাচ্যদেশগামী বিমান পশ্চিমাভিমুখে রওনা হইয়া উত্তর মেরুর উপর দিয়া উড়িয়া আপানে পৌঁছবে। এ লাইনটি নূতন খুলিয়াছে। পূর্ব-দেশগামী বিমান পূর্বাভিমুখেই গিয়া নিউইয়র্ক পৌঁছবে। বিমান সাধারণ লোকের শুধু কালজ্ঞানেই বিভ্রাট ঘটায় নাই; দিক-জ্ঞানেও বিভ্রাট সৃষ্টি করিতেছে।

সেন্টপল হইতে নিউইয়র্ক বিমানপথে ১০৪৬ মাইল। সকালে বিমান নিউইয়র্ক ছাড়িয়া কোথাও না থামিয়া সেন্টপল পৌঁছবে। সেই বিমানই আবার বৈকালে সেন্টপল ছাড়িয়া সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক পৌঁছবে। বিমানটি বড় কনট্রোলেশন শ্রেণীর। ১০৪৬ মাইল পথ ৪ ঘণ্টায় যায়।

বিমানটি সেন্টপল ছাড়িয়া দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখী হইয়া মিল-ওয়াকীর উপর দিয়া উড়িয়া মিশিগ্যান হ্রদ পাড়ি দেয়। তারপর মিশিগ্যান, হুরন ও ইরী হ্রদ দ্বারা তিন দিকে পরিবেষ্টিত ভূমিখণ্ড অতিক্রম করিয়া ডেট্রয়েটের নিকট ইরী হ্রদ পাড়ি দিতে শুরু করে। মিল ওয়াকী হইতে ডেট্রয়েট সিধা পূর্ব দিকে। ডেট্রয়েটের নিকট হ্রদটি খুব সরু। ওপারেই ক্যানাডা এবং অদূরে টরোন্টো নগরী। বিমানটি ডেট্রয়েট হইতে একটু দক্ষিণে বাকিয়া ক্লিভল্যান্ডের নিকট ইরী হ্রদ অতিক্রম করে। সেখান হইতে নিউইয়র্ক সোজা পূর্বে। ক্লিভল্যান্ড ছাড়াইবার কিছু পরেই বাম দিকে অর্থাৎ উত্তরে নায়াগ্রা জলপ্রপাত। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে বিমানে বসিয়া সূর্য্যকরোজ্বল প্রপাতটি দেখা যায়।

সেদিন নিউইয়র্ক হইতে আসিতে বিমানটির প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব হইল। তিনটায় সেন্টপল ত্যাগ করিল। স্তিমিত দিবালোকে মিলওয়াকী অতিক্রম করিয়া মিশিগ্যান হ্রদের উপর দিয়া উড়িতেছি। নীচে সমুদ্রোপম হ্রদের শুভ্র-মেঘ-খচিত নীলাবুরাশি নির্বাণপ্রায় দিবালোকে অপূর্ব দেখাইতেছিল। ক্রমশঃ দশদিক অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। স্থির বিমানে বসিয়া তন্দ্ৰামগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে জানি না। সহসা তন্দ্ৰাভঙ্গ হইল। দেখি সামনে লেখা পড়িয়াছে “আসন-বন্ধ আটম্বা দিন। ধূমপান করিবেন না।” বড়িতে দেখিলাম তখনও সাতটা বাজে নাই। দ্রুত চলিয়া চার ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই নিউইয়র্ক পৌঁছিতেছি ভাবিয়া প্রফুল্লতা বোধ করিলাম। বিমান নামিতে শুরু করিল। সহসা ষ্ট্রুয়ার্ডেস আসিয়া ঘোষণা করিলেন যে, আমরা মিলওয়াকীতে অবতরণ করিতেছি। ক্যাপ্টেন আসিয়া বলিলেন, “আমরা ডেট্রয়েট পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। নিউইয়র্কে খুব বরফ

পড়িতেছে। হাওয়া আপিস কোন বিমানকেই সেদিকে অগ্রসর হইবার ইঙ্গিত দিতেছে না। ডেট্রয়েটে অবতরণ করিবার অনুমতিও পাই নাই। কাজেই মিলওয়াকীকে ফিরিতে হইয়াছে। আপনাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম বিমান-ঘাঁটিতে জানিতে পারিবেন।”

মিলওয়াকীতে নামিয়া কিছুক্ষণ ভাবী প্রোগ্রামের কোন আভাস মিলিল না। যাত্রীদল চঞ্চল। প্রায় ১ ঘণ্টা পরে ঘোষণা করা হইল, “যাহারা আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকিতে চান তাঁহাদের জন্ত শহরে হোটেলের ব্যবস্থা করা হইবে। আর যাহারা শিকাগো যাইতে চান তাঁহাদের বাসে করিয়া এক্ষুণি শিকাগো পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। সেখান হইতে কোম্পানীর স্থানীয় কর্মচারিগণ ট্রেনে বা অথ গ্লেনে যাত্রীদের নিউইয়র্ক পৌঁছিবার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিবেন।”

ওয়েবস্টার ও আমি অথ ২০।২২ জন যাত্রীসহ বাসে গিয়া উঠিলাম। মিশিগ্যান হ্রদের তীর দিয়া বাস দ্রুতবেগে সিধা দক্ষিণে চলিতেছে। সুন্দর মশ্ণ রাস্তা, সর্বত্র উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। দুই ঘণ্টার প্রায় ১০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিটে কোম্পানীর শিকাগো আপিসে পৌঁছিলাম। সেখানে যাহা খবর পাইলাম তাহা এইরূপ: আগামী কল্য দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সমস্ত বিমানের নিউইয়র্ক গমন বা নিউইয়র্ক ত্যাগ বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নিউইয়র্কের আকাশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই বিরতিকাল আরও বাড়াইয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে। যাত্রীগণের মধ্যে যাহারা বিমানেই বাকী পথটুকু যাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের জন্ত লাইন না থোলা পর্যন্ত হোটেলের স্থান সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইবে। রাত্রি ১১টা ১৫ মিনিটে নিউইয়র্ক-গামী একটি ট্রেন শিকাগো ত্যাগ করবে। ট্রেনটি ১৯ ঘণ্টার অর্ধাৎ পরদিন সন্ধ্যা ছটায় নিউইয়র্ক পৌঁছবে। শিকাগো হইতে ট্রেনে নিউইয়র্কের দূরত্ব প্রায় ১০০০ মাইল। সেই ট্রেনে কিরূপ স্থান আছে তাহার খবর লওয়া হইতেছে। যদি স্থান থাকে তবে যাহারা ট্রেনে যাইতে চান তাঁহাদিগকে টিকেট দিয়া ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে।”

কেহ কেহ অনির্দিষ্ট কালের জন্ত শিকাগোতেই থাকিয়া গেলেন। আমি ট্রেন ভ্রমণ পছন্দ করিলাম। সময় খুব কম। তাড়াতাড়ি কোম্পানীর একটি গাড়ী ধরিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, তখন ট্রেন ছাড়িবার পাঁচ মিনিট বাকী। বিমান কোম্পানী-প্রদত্ত চিঠির বদলে ষ্টেশনে টিকেট মিলিবার কথা। দেখি কাউন্টারে উহা লইয়া টিকেট বিক্রেতার সঙ্গে ওয়েবস্টারের বচসা উপস্থিত। আমি আগাইয়া গিয়া মধ্যস্থতা করিয়া টিকেট সংগ্রহপূর্বক ব্যাগ কাঁধে করিয়া দ্রুত ট্রেনের দিকে ছুটিলাম। হু' এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঠিক প্লাটফর্মে প্রবেশ করিয়া

লব্ধ ট্রেনের শেষ কামরায় উঠিয়া পড়িলাম। ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

ট্রেনে কেন্দ্রীয় তাপ-ব্যবস্থা আছে। ভিতর দিয়া এক গাড়ী হইতে অল্প গাড়ীতে যাইবার বন্দোবস্ত আছে। এখানে রেল কোম্পানী ও পুলম্যান কোম্পানী স্বতন্ত্র। রেল কোম্পানী কোচ অথবা পুলম্যানের টিকিট দেয়। কোচের টিকিটে আসন মিলে। কিন্তু পুলম্যানের টিকিটে কোন বার্থ বা আসন মিলে না। পুলম্যান কোম্পানীকে অতিরিক্ত মাঙ্গুল দিয়া বার্থ বা বেডরুম সংগ্রহ করিতে হয়। ওয়েবষ্টার ও আমি ব্যাগ বহন করিয়া আগাইয়া যাইতেছি। পথে পুলম্যান কোম্পানীর কর্মচারীর সাক্ষাৎ পাইলাম। কোন বার্থ খালি নাই। একটি বেডরুম বা শয়নকক্ষের ঠিকানা দিয়া আমাদেরকে সেখানে যাইতে বলিলেন। কোম্পানীর লোক তখন আমাদের ব্যাগ লইয়া সেই কক্ষে পৌছাইয়া দিয়া বিছানা প্রভৃতি পাতিয়া দিল। শয়নকক্ষে দুইটি বার্থ। একটি উপরে, একটি নীচে। আমি নীচে রহিলাম। ওয়েবষ্টার উপরের দিক দখল করিলেন। বিমান কোম্পানী আমাদের শুধু পুলম্যানের মাঙ্গুল ফেরত দিয়াছিলেন। শয়নকক্ষের অতিরিক্ত ভাড়া আমাদেরই দিতে হইল। শয়নকক্ষের নীচের বার্থকে দিনের বেলায় আরামদায়ক কোচরূপে ব্যবহার করা যায়।

রাতে ভালই ঘুম হইল। দিনে ক্রতগামী ট্রেনে বসিয়া হিমালয় পৃথিবীর অপূর্ব রূপ দেখিতেছি। আকাশে তখনও ঝড়ের আভাস। রোদ ওঠে নাই। প্রবল বায়ু বহিতেছে। মানুষ বাধা হইয়া ঘরের মধ্যে আটকা পড়িয়াছে। প্রকৃতি তাঁর সমস্ত শোভা গুটাইয়া লইয়াছেন। তাঁহার রিক্ত নিরাভরণ অঙ্গের উপর হিমরাশি শু পাকার হইয়া উঠিয়াছে। নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পরে সন্ধ্যা সাততায় ট্রেন নিউইয়র্ক পৌছিল। শহর তখনও বরফে ঢাকা।

নিউইয়র্ক শহর ছয়টি 'বরোতে' বিভক্ত। ম্যানহাটন, ব্রুকলিন, ব্রক্স, কুইন্স ও রিচমন্ড। এই পাঁচটি 'বরোর' মোট লোকসংখ্যা ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীতে ছিল ৭৭,৫৬,৬১১ জন। উপকণ্ঠে আরও ৫০ লক্ষ লোক বাস করে।

উপরোক্ত 'বরো'গুলির মধ্যে ম্যানহাটন 'বরোটি' সর্বশ্রেষ্ঠ। এটি সরু লম্বা একটা ফালির মত। দক্ষিণাংশ ক্রমশীর্ণায়মান হইয়া আটলান্টিক মহাসাগরে একটি সুস্বাদু শীর্ষে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পশ্চিমে হাডসন নদী, পূর্বে ইষ্ট নদী এবং উত্তর-পূর্বে হার্লেম নদী হাডসন ও ইষ্ট নদীদ্বয়কে সংযুক্ত করিয়া ম্যানহাটনকে একটি সম্পূর্ণ দ্বীপের আকৃতি প্রদান করিয়াছে। ইষ্ট ও হার্লেম নদীর ওপারেও নিউইয়র্ক শহর। হাডসনের ওপারে নিউ জার্সি শহর। তিনটি নদীরই উপরে সেতু ও নীচে সুড়ঙ্গপথ। ম্যানহাটন দৈর্ঘ্যে সাড়ে বারো মাইল। ইহার প্রশস্ততা যেখানে সব চেয়ে বেশী সেখানে আড়াই মাইল।

ম্যানহাটন 'বরো'টি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ১৪টি সমান্তরাল এভিনিউ এবং পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ২২০টি সমান্তরাল 'রাস্তা' দ্বারা বিভক্ত। হাডসন নদীতীরে রুডভেন্ট মোটর-রাস্তা। তারপর ১ম, ২য় করিয়া ইষ্ট নদীতীরস্থ ১২তম এভিনিউ পর্যন্ত সংখ্যা ১২টি এভিনিউ। ৩য় ও ৪র্থ এভিনিউর মধ্যে লেক্সিংটন এভিনিউ এবং ৪র্থ ও ৫ম এভিনিউর মধ্যে ম্যাডিসন এভিনিউ অবস্থিত। ৪র্থ এভিনিউর অপর নাম পার্ক এভিনিউ। সেইরূপ ৬ষ্ঠ এভিনিউর অপর নাম এভিনিউ অব দি আমেরিকাস্। ইহা ছাড়া ব্রডওয়ে নামক উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত একটি রাস্তা একটু বাঁকিয়া ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম এভিনিউকে কাটিয়া গিয়াছে। প্লীটগুলির নামকরণ দক্ষিণ হইতে আরম্ভ হইয়া ১ম, ২য় করিয়া পর পর উত্তর দিকে চলিয়াছে। শহরের মধ্যস্থলে কেন্দ্রীয় পার্ক। পার্কটি আয়তনে ৮৪০ একর; পূর্ব-পশ্চিমে ৫ম হইতে ৮ম এভিনিউ পর্যন্ত এবং উত্তর-দক্ষিণে ৫৯তম হইতে ১১০তম প্লীট পর্যন্ত বিস্তৃত।

শহরের নিম্নাংশে অর্থাৎ দক্ষিণাংশে টাকার বাজার। সারা দুনিয়ার বিরাট টাকার বাজার আজ এই স্থানে। বিশ্ব-বিখ্যাত ওয়াল স্ট্রীট এই অংশে অবস্থিত। 'অদূরে সিটি হল ও সিটি পার্ক। এই অংশটি আটলান্টিক উপকূল হইতে ২২তম প্লীট পর্যন্ত বিস্তৃত।

২৩তম প্লীট হইতে কেন্দ্রীয় পার্ক বা ৫৯তম প্লীট পর্যন্ত মধ্য ম্যানহাটন। এখানে বহু বড় বড় হোটেল; ব্যবসাকেন্দ্র এবং দোকান অবস্থিত। এখানকার রক্ষেলার কেন্দ্রটি একটি স্বতন্ত্র নগরবিশেষ। এই অঞ্চলে পঞ্চম এভিনিউর 'মিস', 'সাক্স' প্রভৃতি দোকানগুলিতে সূচ হইতে এরোপ্লেন পর্যন্ত যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ সর্বদা প্রস্তুত থাকে। প্রসিদ্ধ ওয়ালফ-ডক এন্টোরিয়া হোটেল; পৃথিবীর উচ্চতম বাড়ী এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, রফালয়বল টাইমস্ কোয়ার, ক্রীড়া-ভূমিযুক্ত ম্যাডিসন কোয়ার গার্ডেন প্রভৃতি এই অঞ্চলে অবস্থিত।

উত্তর ম্যানহাটন লোকবসতি-প্রধান। কলম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় এই অঞ্চলে অবস্থিত। ইষ্ট নদীর তীর দিয়া এখানকার সৌখীন লোকদের বসতি। এই অঞ্চলে পূর্ব ৯৪তম প্লীটে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সমিতির আশ্রম।

হাডসন ও ইষ্ট নদীতে জাহাজ-নৌদ্র করিবার বহু পায়ার বা বাট। বড় জাহাজগুলি হাডসন নদীতেই প্রবেশ করে।

আটলান্টিক হইতে হাডসন নদীর প্রবেশপথে পৃথিবীর বৃহত্তম মূর্তি অবস্থিত। ইহা 'স্বাধীনতার মূর্তি' নামে পরিচিত। উর্ধ্ব-বাহু স্বাধীনতা-দেবী আকাশে স্বাধীনতার মশাল সর্বদা জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। মঞ্চের ভূমি হইতে মশালের অগ্রভাগ পর্যন্ত মূর্তিটির উচ্চতা ৩০৫ ফুট। ইহার দক্ষিণ তর্জনীর দৈর্ঘ্য ৮ ফুট ও পরিধি ৫ ফুট। ক্রাজ ও আমেরিকার বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ উভয় জাতির যুক্তদানে



মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। সেদিন ফ্রান্সের দানই ছিল সমধিক। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করা হয়।

আমি যে হোটেলে উঠিলাম তাহার নাম হেনরী হাডসন হোটেল। ২৪ তলা হোটেলের ১৬ তলায় আমার ঘর। মধ্য-ম্যানহাটনে ৮ম ও ৯ম এভিনিউর মধ্যবর্তী অংশে পশ্চিম ৫৭তম স্ট্রীটে হোটেলটি অবস্থিত। স্ট্রীটগুলির ৫ম এভিনিউর পূর্বাংশ পূর্ব বলিয়া এবং পশ্চিমাংশ পশ্চিম বলিয়া অভিহিত হয়।

২রা জাহুয়ারী সন্ধ্যায় আমি নিউইয়র্ক পৌছাই। ৮ই জাহুয়ারী বুধবার প্রাতঃকালে আমাকে অটোয়া অভিযুক্ত রওনা হইতে হইবে। এর মধ্যে শনি ও রবিবার ছুটি। আপিস খোলা থাকিবে মাত্র তিন দিন; শুক্র, সোম ও মঙ্গলবার। এর মধ্যে অনেক কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে।

আমার নিউইয়র্কে অবস্থান কালে তাপ ২২° হইতে ৩৫° ডিগ্রী পর্যন্ত ওঠানামা করিতেছিল, ফলে এখানে বরফ পড়িলে তাহা গলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে চলাফেরার অসুবিধাই হয়। তবে এরা খুব দ্রুত বরফ সাফ করিয়া ফেলে। এই শহরের বরফ ফেলিবার ঘরচ বৎসরে দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা। বুধবার ও বুধস্পতিবার যে বরফ পড়িয়াছিল শুক্রবারের মধ্যেই তাহা সাফ করিয়া ফেলা হইল। পরবর্তী দিনগুলি ভালই কাটিল।

৩রা জাহুয়ারী শুক্রবার সকালে ট্যাক্সি লইয়া সিটি আপিসের দিকে চলিলাম। ট্যাক্সিওয়ালা আলাপ শুরু করিল। বলিল, “আমার ভাই যুদ্ধে গিয়াছিল। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে ছিল। ভারতবর্ষ বেশ ভাল দেশ। আমার ভাই সেখানে পরম আরামে ছিল। তার দুই-তিনটা বেয়ারা ছিল, ডাকিলেই ‘হজুর’ বলিয়া হাজির হইত।”

‘হজুর’ কথাটা হিন্দুস্থানীতে উচ্চারণ করিল। এদেশের লোক ব্যক্তিগত চাকর রাখিতে অভ্যস্ত নয়। কাজেই ব্যক্তিগত চাকরের কথায় এরা বেশ আমোদ অনুভব করে। আমি বলিলাম, “তুমি আমাদের ভাষায় একটু আঙুলি কথা কহিতে শিখিলে কিরূপে?”

“ভাইয়ের নিকট শুনিয়া শিখিয়াছি। আমি হিন্দুস্থানী ভাষার আরও কিছু কিছু কথা জানি। ‘যাও’, ‘বকশিশ’। কেমন, ঠিক বলি নাই? আমার ভাই বেশ হিন্দুস্থানী বলিতে পারে। তুমি যাইবে আমার বাড়ী? যে রাত্তর আমরা সিটি হলে যাইব সেখান থেকে একটু বাকিলেই আমাদের বাড়ী। আমার ভাই তোমার সঙ্গে হিন্দুস্থানীতে কথা বলিয়া খুবই খুশী হইবে।”

আমি বলিলাম, “আমিও খুশী হইতাম। কিন্তু সিটি আপিসে ঠিক এগারটায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করিবার কথা। আর তো সময় নাই।”

ট্যাক্সিওয়ালা দুঃখিত হইল। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তার কথা বলিবার উৎসাহ কমে না। বলিল, “তোমার দেশের ট্যাক্সিওয়ালারা বকশিশের জন্য বড় বিরক্ত করে, না? আমার ভাই একবার অল্পদূর গিয়া এক টাকা বকশিশ দিল। কিন্তু তোমার দেশের ট্যাক্সিওয়ালা আরও চায়। তখন আমার ভাই বলিল; ‘আচ্ছা টাকাটা ফেরত দাও। টাকাটা ফেরত নিয়া বলিল, ‘যাও’। ট্যাক্সিওয়ালা বেহুস বনিয়া চলিয়া গেল।” ‘যাও’ কথাটি সোৎসাহে হিন্দুস্থানীতে উচ্চারণ করিল। ইহাতে তাহার পরম পরিতোষ।

সিটি আপিসে নামিয়া ভাড়ার অতিরিক্ত বকশিশ বাবদ ৫০ সেন্ট দিবার মানসে একটা ডলার বাহির করিয়া উহাকে দিলাম। সে বলিল, “তোমার দেশের ট্যাক্সিওয়ালা কিন্তু কিছুই ফেরত দিত না। আমার কাছে কত ফেরত চাও?” আমি বলিলাম, “তুমি গোটা ডলারটাই লও।” আমি আপিসের দিকে চলিয়া গেলাম। সেও প্রফুল্ল চিত্তে অন্তর্হিত হইল।

সিটি আপিসে কণ্ট্রোলার লেজারাস জোসেফ ও সেক্রেটারী এডোয়ার্ড আর এন্ডার মহাশয়দ্বয়ের সহিত নগরীর বাজেট, কর-সংগ্রহ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলাপ করিয়া সোম ও মঙ্গলবারের প্রোগ্রাম স্থির করিয়া নগর-শাসন সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক ও কাগজপত্রাদি সঙ্গে লইয়া হোটেলে ফিরিলাম।

বৈকালে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অখিলানন্দের সহিত দেখা করিতে বার্কমায়ার হোটেলে গেলাম। অপ্রত্যাশিত রূপেই স্বামীজীর দর্শন মিলিয়াছিল। খ্রীষ্ট নলিনীরঞ্জন সরকার আমাকে স্বামীজীর নিকট একখানি পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। স্বামীজীর আশ্রম প্রতিভেঙ্গে আমেরিকার সফর তালিকার মধ্যে প্রতিভেলের স্থান ছিল না। কাজেই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে না ভবিয়াছিল। শিকাগোর স্বামী বিশ্বানন্দ আমাকে বলিয়াছিলেন যে স্বামীজী বুধস্পতিবার সন্ধ্যায় বঠনে বেদান্তের ক্লাস করিতে আসিবেন এবং তাঁহার বঠনের টেলিফোন নম্বরও আমাকে দিয়াছিলেন। বুধস্পতিবার সন্ধ্যায় বঠনে টেলিফোনযোগে স্বামীজীকে পাইতেই তিনি বলিলেন যে শুক্রবার কয়েক ঘণ্টার জন্য জনৈক মার্কিন শিষ্যার সহিত তিনি নিউইয়র্ক আসিতেছেন। এদেশের টেলিফোনের ক্ষিপ্ততা আমার বিশ্বয় উৎপাদন করিত। ট্রাক লাইনে দূরস্থিত বঠনের সংযোগ যুদ্ধভের মধ্যে পাইয়া গেলাম। কলিকাতায় ভবানীপুর হইতে আলিপুরের সংযোগ পাইতেও তদপেক্ষা বেশী সময় লাগে। স্বামীজী ও তাঁহার বর্ষায়নী মার্কিন শিষ্যার সহিত আলাপ করিয়া পরম আপ্যায়িত বোধ করিলাম। বেগুড় মঠের মর্মরমন্দির ইঁহাই শিষ্যাগণের দানে সম্ভব হইয়াছে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে কল্যাণী যখন শক্ত মুঠিতে ভ্যানিটি বাগটা ধরে বাস থেকে নামলেন তখন তাঁর মাথা বন্দবন্দ করে ঘুরছে। রাস্তার গ্যাসের আলো জ্বলবার আর বেশী দেরি নেই। আপিস-ফেরতারা জলযোগ সেরে ততক্ষণে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন। কল্যাণীর কিন্তু সরেমাত্র বাড়ী ফেরবার ফরসং হ'ল। তাদের ছুটি হয় সকলের শেষে। একটা মারোয়াড়ী স্থলে গান শেখান কল্যাণী। আসলে কিন্তু তাঁকে সপ্তাহের ছ'দিনই গান, ইংরেজী, অঙ্ক সকল বিষয়ই কিছু কিছু পড়াতে হয়। স্কুলটা প্রাইভেট, তাই এদের নিয়মকানুনও আলাদা—সেক্রেটারীর খেয়ালই এখানে নিয়ম। খুশি হয় কাজ কর—মজিতে না মেলে, সদর দরজাও একদিনই সবাইকে দেখিয়ে রেখেছেন—স্কুলের ভূঁড়িওয়াল মালিক রায়সুহরালা। ঘরের দশ পাঁচটা কাজ সেরে তবে যে বাড়ালী মেয়েদের স্কুলের কাছে বেরতে হয়। বুনঝুনিওয়াল। আগরওয়ালারা। টাকার গদীতে বসে সে অস্থবিশেষত্ব বুঝতে চান না।

কল্যাণীর পা যেন আর চলতে চায় না। গণেশচন্দ্র অভিহ্যর অনেকটা পথ হেঁটে তবে তাঁদের গলি। বাড়ী তখন নয় একটা অন্ধ খুপরি।

পাশেই গরম ফুলুরি ভাজা হচ্ছিল। আনা দুয়েকের কিনবেন কিনা তাই ভাবছিলেন কল্যাণী। টাকার অভাবে আজও রেশন আনা হয় নি, আটা ময়দার হাদ পর্য্যন্ত তুলে যেতে বসেছেন। জলখাবারের জন্ত রোজ-দু-পয়সার মুড়ি বরাদ্দ। এর বেশী খরচ করলে আর-বায়ের পার্থক্যটা একেবারেই সীমার বাইরে চলে যায়। তবু কেন জানি না—কল্যাণীর আজ একটু বেহিসেবী হতে ইচ্ছে হ'ল। তিনি দু-আনার ফুলুরি আর এক আনার গরম মুড়ি কিনলেন। ছোট্ট ছেলে দুটো এটা ওটা খাবার জন্তে ছরস্তুপনা করে বেড়ায়। অথচ এতগুলো প্রাণীর রোজ-দু-বেলা জলখাবারের ব্যবস্থা সব সময় করে উঠতে পারেন না কল্যাণী। অজ্ঞ কোন দিন হলে এই কয়েক আনা পয়সা অতিরিক্ত খরচের জন্ত কল্যাণীর মেজাজ সারা দিনেও শান্ত হ'ত না। কিন্তু আজ খাবার হাতে নিয়ে যেন তিনি গভীর বস্তি পেলেন—একটা দিন বৈত নয়।...কল-কাতার বুকে অকমাং হানাহানি বন্ধ হয়ে মিলনের উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে—রাস্তায় হিন্দু-মুসলমান জনতার অবিরাম স্রোত...মোড়ে মোড়ে, বাড়ীতে বাড়ীতে আসন্ন উৎসবের প্রস্তুতি... একটা দারুণ বিপর্য্যয়ের পর আকাশে বাতাসে আগত শুভ-স্বচনার সঙ্কেত।...কল্যাণী ক্লান্ত ভঙ্গীতে সামনের দিকে পা বাড়ালেন। পর-মুহুর্তেই মুখ ঘুরিয়ে এক আশ্চর্য্য কাণ্ড

করলেন তিনি। পাশের দোকানে বেশ বড় বড় 'গ্রেট ইষ্টার্নের' রুটী বিনা রুপনে একটু বেশী দামে বিক্রী হচ্ছিল। প্রায় ছৌ মেয়েই, নিজের অবস্থার কথাকে নিজের মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার সুযোগ না দিয়ে—দশ আনার দু-টুকরা রুটী কিনলেন কল্যাণী।

ততক্ষণে বাড়ীর সামনে এসে পড়েছেন কল্যাণী। তাঁর বুকে মুহুর্তের জন্ত দোলা দিয়ে উঠল—আনন্দে, প্রত্যাশায়। বীরেশ্বর হয়তো এসে পড়েছেন—স্বাধীনতা-উৎসবের আগে তাঁরা নিশ্চয়ই ছাড়া পাবেন। প্রথম কি বলে অভ্যর্থনা করবেন কল্যাণী। না, তিনি মুখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারবেন না। বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বীরেশ্বর জেলে গিয়েছিলেন—আজ দেশ স্বাধীন হতে চলেছে, বিদেশী সরকার দেশবাসীর দাবি মেনে নিয়েছে—আজ সে ব্রত সার্থক হয়েছে—এই বিপুল সার্থকতাকে তিনি চট্টল ভাবাবেগ দিয়ে খাটো করে দিতে পারবেন না। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভারছিলেন কল্যাণী। তিনি প্রথমেই নত হয়ে প্রণাম করে স্বামীর পায়ের ধুলো নেবেন। তাঁর অল্পপস্থিতিতে সংসারকে তিনি অনেক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আগলে রেখেছেন—এইটুকুই স্বামীর কাছে নিবেদন করবার মত তাঁর একমাত্র সম্বল। স্বামীর কঠিন ব্রতকে কল্যাণী জেলের বাইরে থেকেও এমনি ভাবে সার্থকতার দিকে এগিয়ে দিয়েছেন এইটুকুই তাঁর বড় সাহস।

বীথি সবেমাত্র প্রসাধন শেষ করে বাইরে যাচ্ছিল। মাকে আসতে দেখে হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল।

কল্যাণী বললেন, কোন চিঠিপত্র আসে নি?

বীথি জানত—বাবার মুক্তির জন্তে মা কয়েক দিন যাবৎ খুব উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। বললে—না, এরপর আর কোন খবর দেন নি। তবে খুব সম্ভব আজকেই বাবা ছাড়া পেরেছেন। বাড়ী খুঁজে বার করাও ত খুব সোজা কথা নয়।

দুই কোথায়? ছবি?

দুই ছবি ওরা সব নিশান নিয়ে ছাদে উঠেছে। আমি কিন্তু একবার কলেজে যাচ্ছি মা। ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।

মায়ের মেজাজ যাতে বিগড়ে না যায় সেজন্তে যথাসম্ভব মোলায়েম গলায় বললে বীথি।

সারাদিন লাফালাফি করেছে সুখ মিটলো না? আবার রাতে কেন?

একটা দিন বৈত নয়? কাল যে স্বাধীনতা-উৎসব।

আজ তারই মহড়া। তোমার কিছু ভাবতে হবে না মা, অরুণদা আমাকে গাড়ী করে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

এই বলে অহুমতির অপেক্ষা না করেই বীথি দ্রুতপদে অদৃষ্ট হ'ল।

ক্লান্তিতে কল্যাণীর চোখ জড়িয়ে আসছিল। বাইরে কোলাহল আর উৎসব—ধর শূন্য ও নির্জন—নিজের অন্তরেও একটা অন্তরীণ শূন্যতাবোধের হাহাকার অনুভব করলেন কল্যাণী।

চিরকালই এমন অবস্থা তাদের ছিল না। মধ্যবিত্ত পরিবারের ঠাট্টা-ঠমক্ বজায় রাখবার মত আর্থিক সংস্থান যাদের আছে তেমন পরিবারেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল। বীরেশ্বর মফস্বলের শহরে মাষ্টারী করতেন—তা ছাড়া বাড়ীতে জমিজমার আয়ও মন্দ ছিল না। বি-এল পাস করেও ওকালতী না করে মাষ্টারীর মত এমন নিরীহ পেশা গ্রহণ করার জন্তে আত্মীয়স্বজনরা বীরেশ্বরকে শ্লেষভরে বলতেন ‘মুখচোরা’। বীরেশ্বর এ সব ঠাট্টা-বিদ্রূপকে আমল দিতেন না। জীবনে যে আদর্শকে তিনি সত্য বলে জেনেছেন—তাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকার মত মনের জোর তাঁর ছিল।

মাঝে মাঝে কল্যাণী বলতেন, “লোকে বলে—ওকালতীতে হাত মেললেই টাকা। মুখ বেচেই যখন রোজগার করতে হবে, তখন মফস্বল স্কুলের মাষ্টারীর চেয়ে আদালতে পসার জমানোই ত চের ভাল।”

লোকের কথা নীরব হাসিতে উপেক্ষা করলেও কল্যাণীর এই যুক্তি তিরস্কার ও অভিমানের চাপা স্বরে বীরেশ্বরের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠত, বলতেন, “টাকার লোভ এড়ানো শক্ত জানি। কিন্তু টাকা রোজগারই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ত তা হলে এক কাঁড়ি টাকা খরচা করে লেখাপড়া না শিখলেও চলত। ভাল জিনিষ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্তে ছুনিয়ার অন্ততঃ কয়েক জন স্বার্থভোলা লোক থাকে চাই কল্যাণী।”

কল্যাণীর রুদ্ধ অভিমান উধলে উঠেছে। বললেন, “সবাই বলে এ তোমার নিজের ক্রটি ঢাকবার বাহানা। আদালতে সংগ্রাম করতে পারবে না বলেই ছেলেদের কানে মন্ত্র পড়াবার মত নিরাপদ কাজ বেছে নিয়েছ।”

“জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছেলেদের কানে সে মন্ত্রই যেন জোর গলায় উচ্চারণ করে যেতে পারি।” অকস্মাৎ যেন আগুনের ফুলকির মত জ্বলে উঠলেন বীরেশ্বর। একটু থেমে আবার বললেন, “মজেল ঠিকিয়ে আর আদালতে গলাবাজি করে টাকা রোজগার করার চাইতে মাষ্টারীটা কোন অংশেই সহজ নয়। মাইনে এতে কম—কিন্তু কাজটা ছোট নয়।”

কল্যাণী নীরবে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। আদর্শের গরিমায় বীরেশ্বর যেন আরও দীপ্ত, আরও সমুদ্র হয়ে

উঠেছেন। এ মূর্তি দেখলে বোঝা যায় না যে বীরেশ্বর একটা সাধারণ স্কুলের সামান্য বেতনের সেকেণ্ড মাষ্টার।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে বীরেশ্বর আপন অভ্যাস আদর্শকে যথাসম্ভব বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করতেন। বিলাতী কাপড় সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেই তিনি কর্তব্য শেষ করেন নি—অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীও যাতে যথাসম্ভব দেশী হয় সে দিকেও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এ নিয়ে জীব সঙ্গের তার প্রায়ই বচসা বাধত। বীরেশ্বর জাতীর চিনি বাড়ীতে আনতে নিষেধ করে দিলেন—তার বদলে এল দিশী লাল চিনি। পোর্সিলেনের কাপের বদলে এল দিশী গোদা গোদা পেয়াল। কিন্তু বীরেশ্বরের আদর্শনিষ্ঠা চরমে উঠল—যখন তিনি কেরোসিনের বদলে রেডীর তেলে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করলেন। কল্যাণী বহু দিন ধরে স্বামীর সব খেয়ালই নীরবে সহ্য করছিলেন। এবার তিনি যুথ খুললেন।

“এতই যদি স্বদেশীয়ানার সখ—তবে আর আইন বাঁচিয়ে ছ'বেলা স্কুলে আনাগোনা কেন?” বীরেশ্বরের একটা মস্ত গুণ—তিনি সহজে চটেন না, শাস্ত কঠে বললেন, “ভয় ত জেলের জন্তে নয় কল্যাণী। যুদ্ধের সময় একদল হাতিয়ার নিয়ে লড়তে যায় আর একদল পেছনে থেকে রসদ জোগায়—মালমশলা তৈরি করে। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে এও আমাদের অহিংস যুদ্ধ। এখানেও একদল আইন অমান্ত করে সরকারকে অচল করে দেবে, আর একদল নীরবে গঠনমূলক কাজ করে জাতকে গড়ে তুলবে। এ ছ'দলের লক্ষ্যে কোন প্রভেদ নেই।”

কল্যাণী এত বড় লক্ষ্য আর আদর্শের কথা বুঝতে চান না, বললেন, “লাল চিনি খেয়ে আর রেডীর তেলে আলো জ্বালেই ইংরেজ কাবু হয়ে রাজ্য তোমাদের হাতে তুলে দেবে—এত বড় বেকুব তারা নয়। সজীনের জোরেই এ দেশ তারা দখলে রাখবে। কেন শুধু শুধু এই হয়রানি বল ত? তোমার খুশি হয় তুমি পরো—ঐ কোমর-কাটা মোটা খন্দর—আমি আর গায়ে তুলতে পারব না।”

বীরেশ্বর চুপ করে থাকেন। তর্ক করে কোন লাভ নেই। বহু দিনের অভ্যাস জীবনযাপনের ধারাকে মাফম শুধু রক্ততা শুনেই বদলাতে পারে না। এটা কল্যাণীর দোষ নয়।

\* \* \*

বীরেশ্বর নিষ্ক্রিয় থাকতে পারলেন না। মহাত্মাজীর প্রেরণার প্রতিবাদে ভারতব্যাণী হরতাল ঘোষণা করা হ'ল। ছেলেরা স্কুল-গেটের রাস্তায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। মাষ্টারদের অবস্থা বাধা দেওয়া হ'ল না। হেড-মাষ্টার ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির। ছেলেদের এত জেদ তাঁর সহ হ'ল না। প্রথমে তিনি মাষ্টারদের নির্দেশ দিলেন—তাঁরা যেন

স্কুলে আসতে ইচ্ছুক ছেলেদের ভিতরে আসতে সাহায্য করেন। বীরেশ্বর এ অত্যাচার আদেশের তীব্র প্রতিবাদ করলেন।

“স্কুলে আমরা ছেলে পড়াতে এসেছি...জবরদস্তি করে ছেলেদের স্কুলে ডেকে আনার দায়িত্ব আমাদের নয়।”

অত্যাচারী মাষ্টাররা অবশ্য হেডমাষ্টারের মনস্তত্ত্বের জ্ঞে ছেলে ভাঙিয়ে আনতে গেটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাইরে জনতা তাদের দেখে টিটকারী দিলে...মাথা হেঁট করে মাষ্টাররা দাঁড়িয়ে রইলেন। হেডমাষ্টারের আদেশ অমান্য করার জ্ঞে বীরেশ্বরকে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বলা হল। কিন্তু অত্যাচারের কাছে নতিস্বীকার করবার পাত্র বীরেশ্বর নন।

কল্যাণীও এ ব্যাপারে বীরেশ্বরকে সমর্থন করলেন।

“মান-সম্মত খুইয়ে অমন চাকরীতে আমার কাজ নেই। কিন্তু চাকরী করতে গেছে বলে কি লোকগুলোর লজ্জাও নেই? ছেলেদের শিক্ষার ভার হাতে নিয়ে পুলিশের কাজ করতেও ওদের আপত্তি নেই।...হি, হি।”

বেদনা-গভীর গলায় বীরেশ্বর জবাব দেন, “গোলামী মানুষকে অমানুষ করে তোলে বলেই ত এদের কোন কিছুতেই লজ্জা নেই।”

‘ডিসিপলিন’ ভঙ্গ এবং আদেশ অমান্যের অপরাধে বীরেশ্বর কর্মচ্যুত হলেন।

বীরেশ্বর গ্রামে ফিরে গেলেন। দিন কয়েক প্রবল উৎসাহে জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার কাজ চলল। তিনি নিজেই শিক্ষার ভার নিলেন। স্কুলের ব্যয়নির্বাহের জ্ঞে মাথা-পিছু চাঁদা ধার্য করা হল। কিন্তু মানবানেক যেতে না যেতেই সকলের উৎসাহের শ্রোত ক্ষীণ হয়ে এল। ছাত্র-সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে শুরু হল। চাঁদার খাতায় আদায়ের কোঠায় শূন্যই রয়ে গেল। বীরেশ্বর অক্লান্ত ধৈর্য্যে তবু স্কুল চালু রাখলেন। ছেলেদের রুত্তির বন্দোবস্ত করে, কখনও বা অভিভাবকদের সাহায্য করে তিনি ছেলেদের স্কুলে রাখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু অধিকাংশ ছেলেই হুড় হুড় করে গোলামখানায় নাম লিখিয়ে ভবিষ্যতে চাকুরীর পথ খোলা রাখলে। এদিকে স্কুলের খরচ চালাতে বীরেশ্বরকে পৈতৃক সম্পত্তির মোটা অংশ বিক্রী করতে হল। কল্যাণী এতদিন চুপ করে ছিলেন। কিন্তু আর তিনি সহিতে পারলেন না, বললেন, “পরের ছেলেদের মানুষ করতে গিয়ে ত নিজের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ ভোবাতে বসেছে। এবার অন্ততঃ এদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা কর।”

“এখানে কি ওদের লেখাপড়া হচ্ছে না কল্যাণী?”

“যা হচ্ছে—তা ত দেখতেই পাচ্ছি। তোমার টাকা ভূমি যেমন খুশি ফুঁকে দাও, আমি বাধা দিতে যাব না। শুধু দু’হাট তোমার, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ এ ভাবে মাটি করো না।”

এর জবাবে উত্তেজিত হয়ে কোন কটুক্তি করলেন না বীরেশ্বর। এতবড় অহুযোগও তিনি শান্ত মনে গ্রহণ করলেন। শুধু তাঁর মুখে সংশয় ও বেদনার বন্ধিম রেখা ফুটে উঠল। তবে কি তাঁর আদর্শ মিথ্যা, তাঁর সাধনার পথ ভ্রান্ত? না, বীরেশ্বর ভুল করেন নি। একটা বিরাট অগ্নি-পরীক্ষার উত্তীর্ণ হতে হল এমনি বহু অহুযোগ আর গল্পনাকে বুক পেতে গ্রহণ করতে হবে।...

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বীরেশ্বর বললেন, “পরের ছেলেকে গোলামখানা ছাড়তে বলে—এখন নিজের ছেলেকে আমি সরকারী স্কুলে পাঠাতে পারব না। হুজুগে মেতে পথ করে যারা ছ’দিনের জ্ঞে দেশ উদ্ধার করে বাহবা কুড়োতে চায়—আমি সে দলের নই।” এই বলে প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন বীরেশ্বর। হঠাৎ পেছন ফিরে বললেন, “চাকুরী করবার বেলা খুব যে বলতে—আমি শুধু আড়াল থেকে ছেলেদের উসুকে দিচ্ছি—এখন দেখলে ত—উত্তেজনার মুখে জেলে যাওয়া যত সোজা—তিল তিল করে একটা আদর্শকে নিজের জীবনে সত্য করে তোলা ঠিক তত সহজ নয়।”

কল্যাণী চুপ করে রইলেন। বীরেশ্বরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। তবে বীরেশ্বরের কর্মে ও আদর্শে কোথাও কোন ফাঁকি ছিল না, তাই চমক ও চাঞ্চল্যহীন তাঁর এই অনাড়ম্বর কর্মদাধনা আর দশ জনের মত তাঁরও মনে সাড়া জাগাত না। উত্তেজনার যথেষ্ট খোরাক না পেয়ে বীরেশ্বরের স্কুলের ছাত্র-সংখ্যাও শেষ পর্যন্ত একটিতে অর্থাৎ কেবলমাত্র তাঁর ছোট ছেলে হুইতে এসে ঠেকল। স্কুল উঠে গেল। এদিকে বাড়ীর জমিজমাও প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল। সংসারের খরচ কুলোবার জ্ঞেই বাধ্য হয়ে বীরেশ্বরকে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হল।

কল্যাণী নিঃশ্বাস ছেড়ে মনে মনে কালীঘাটে পূজা মানত করলেন।

সরকারী চাকুরী পাওয়া আর বীরেশ্বরের পক্ষে সম্ভব ছিল না, আর সে ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। তাই কলকাতা এসে ভুলে-যাওয়া ওকালতি-বিড়াকেই ঝালিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন বীরেশ্বর। কিন্তু ওকালতিতে তাঁর পসার জমল না। আর ওকালতি করবার মন নিয়েও বীরেশ্বর কলকাতায় আসেন নি। মিথ্যা মামলা দেখলে তিনি মন্তেগদের মুখের পর বলে উঠতেন, “কেন বাপু, মিথ্যা মামলা সাজিয়ে আর একজনের সর্বনাশ করবার ফিকিরে আছ। তার চেয়ে আপোষে একটা ফয়সালা করে ফেল। উকীল মোস্তাফের হা হাওয়ার মত—ছ’হাতে ঢেলেও কুল পাবে না।”

এ ধরনের মন্তব্য শোনার পর মন্তেল আর তাঁর কাছ

ধৈর্যতেও সাহস পেত না। বীরেশ্বরের সেদিকে জ্ঞেপ ছিল না। দিন দুটাকা পেয়ে কোন রকম সংসারের খরচটা ফুলিয়ে গেলেই তিনি খুশী।...

কল্যাণী দেখলেন—স্বামীকে সংসারী করা কঠিন। এই ক'বছরে তাঁদের সংসার যে বেড়েছে সেদিকে লক্ষ্য ছিল না বীরেশ্বরের। বীথি ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ছে, ছুটুও বড় হয়েছে, কোলের মেয়ে ছবিও হাঁটতে শিখেছে—এদের মানুষ করার দায়িত্ব ও তার আনুষঙ্গিক খরচাও অনেক বেড়েছে। বীরেশ্বর নির্বিকার। বরং সন্ধ্যার পর তিনি নথিপত্র দেখা একদম ছেড়েই দিয়েছেন। অধিক রাত্রি পর্যন্ত রাজনীতি-চর্চাতেই কাটে। ইউরোপে যুদ্ধের অবস্থা এক গুরুত্ব-পূর্ণ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যশক্তিকে চূড়ান্ত আঘাত হানবার এই ত প্রেষ্ঠ সুযোগ—ভারতে বামপন্থী দলগুলিকে সংহত করে কংগ্রেসকে নিশ্চিত সংগ্রামের পথে টেনে নিয়ে যেতে হবে—তারই কর্মপদ্ধতি ও রাজনৈতিক পটভূমি-রচনা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা চলে বীরেশ্বরের বৈঠকখানায়। কোনো কোনো দিন আলোচনায় মত্ত হয়ে রাত্রে আর ভিতর-বাড়ীতে যান না বীরেশ্বর।

কল্যাণী বেশ বুঝতে পারেন—বীরেশ্বর কর্ত্তে ও চিন্তায় সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন কল্যাণী। অনিবার্যের হাতে নিঃসংশয়ে আত্মসমর্পণের জেতে মনে মনে নিজেকে তিনি তৈরি করে নিচ্ছেন। এই বলে মনকে তিনি প্রবোধ দিয়েছেন জার যাই হোক—স্বামী ত আর আড্ডা ইয়াকিঁতে সময় নষ্ট করছেন না বা কোন বদখেয়ালে জমিছন্দা ও সম্পত্তি যা ছিল—তা নষ্ট করছেন না।

অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে কল্যাণী সংসার কোন রকম চাপিয়ে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ কোথা থেকে এল দুর্ভাগ্য বড়—সব ওলটপালট হয়ে গেল। সে রাজির কথা মনে হলে আজও রোমাঞ্চে শিউরে ওঠেন কল্যাণী...

রাত গভীর হয়ে এসেছে। ছেলেমেয়েরা সব ঘুমিয়ে পড়ছে। কল্যাণী খাবার ঢাকা দিয়ে একখানা সস্তা গোর্য়েন্দা কাহিনীর পাতা ওলটাচ্ছেন। বীরেশ্বর আজকাল প্রায়ই অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরেন। তাঁর গতিবিধি, কথাবার্তায় যেন একটা অনাগত ঝড়ের আভাস ফুটে উঠেছে। কল্যাণী তার সবটুকু বুঝতে পারেন না—জিজ্ঞেস করলে বীরেশ্বর অবাস্তর প্রশ্ন তুলে তা চাপা দিতে চান।

কল্যাণীর চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। দরজা খোলার শব্দ শুনে তিনি চমকে উঠলেন।

“কে?” কল্যাণী সভয়ে প্রশ্ন করলেন।

“শিগগীর খাবার যা আছে—দাও। আমাকে একুণি বেরুতে হবে। হয়ত আমাদের এই শেষ দেখা কল্যাণী।”

স্বামীর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে শুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন কল্যাণী। তিনি কি এখনো হুৎপ দেচ্ছেন? উক-খুক চুল, অবিহত বসন—বীরেশ্বরের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।

“কোথায় যাবে তুমি?” চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললেন কল্যাণী। তিনি কি ভেগে আছেন?

বীরেশ্বর এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে দেয়ালে টাঙানো ত্রিরাশঙ্করের ফটোর পেছনের কুলুঙ্গী থেকে একটি পুঁটলী বের করলেন। ফটোর পেছনে যে গোপনীয় কিছু লুকানো আছে—তা এই প্রথম দেখলেন কল্যাণী। একটা ভয়ঙ্করের সঙ্কেত তিনি আগেই পেয়েছিলেন...আজ তার স্মৃতি দেখে কল্যাণীর মন অনিশ্চিত আশঙ্কায় মোচড় দিয়ে উঠল।

বীরেশ্বর পুঁটলীর ভেতর থেকে একটা রিভলবার বার করলেন।

“রিভলবার?” আতঙ্কে কল্যাণীর জিজ্ঞাসা প্রায় আত্ম-নাগের মত শুনালো।

“চুপ। রাত্তিরে দেয়ালের ও কান গজায়।”

“পুলিস যদি জানতে পারে?”

“জানতে পারে নয়—সন্ধান ওরা পেয়েছে। আজ শেষ রাত্রেই হয়ত বাড়ী ধ্বংস করবে। তার আগেই আমাকে পালাতে হবে।”

“কিন্তু বীথি, ছুটু, ছবি—এরা? তুমি চলে গেলে এদের কি হবে?”

“এদের দেখবার জন্তে রইলে তুমি আর উপরে রইলেন ভগবান। এখন নিজেদের কথা ভাববার সময় নয় কল্যাণী।—ব্রিটিশ শাসনকে আঘাত হানবার এই ত চরম সুযোগ—এমন সুযোগ হয়ত এক শতাব্দীতেও একটা জাতির জীবনে একাধিক বার আসে না। ভগবান আমাদের সহায়—আমরা সে সুযোগ পেয়েছি। জাপান আর জার্মানীর বোমা থেকে আমাদের আসল বিপদ নয়—আমাদের আসল শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যশক্তি...”

এই বলে চুপ করলেন বীরেশ্বর। শেষে বললেন—“আর দেরি নয়, রাত একটার মধ্যে আমাদের সবাইকে মিলতে হবে। দাও খাবার যা আছে...”

কল্যাণীর হাত চলছিল না। বিপদ যে এমন আকস্মিক ভাবে আসবে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি, কিন্তু স্বামীকে নিরস্ত্র করবার চেষ্টা বুঝা জেনে চুপ করে রইলেন। খন্দর-পরা কুলমাষ্টার, নীরব কর্মী বীরেশ্বরের সঙ্গে রিভলবার হাতে আগষ্ট বিপ্লবী বীরেশ্বরের কোন সাদৃশ্যই আজ যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সত্য-সাধক আজ সত্যের নগ্ন রূপ দেখতে পেয়েছেন, তাই তিনি নিশ্চয়—তাঁর চোখে আজ মোহ নেই, স্বপ্ন নেই—রণক্ষেত্রে ঠাঁড়িয়ে নিহত আঘাতে



সব অত্যাচারের মূলোচ্ছেদ করবার জন্ত আজ তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। স্বরূপ পাহাড়ের বুকে যে এমনি ধুমায়িত আগ্নেয়-গিরি লুকিয়েছিল—তা কে জানতো?

খাওয়া-দাওয়া সেরে বীরেশ্বর ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

“তুমি থাকতে আমার অভাব ওরা ভুলে যাবে” কল্যাণী। আর বীথির পড়াশুনোয় যেন বাধা না পড়ে। তোমার বাড়ে সংসারের দায়িত্ব চাপিয়ে যেতে আমার কিছুমাত্র ভাবনা হচ্ছে না। আমার ভার তোমারই ওপর ছিল। আর এ জন্তে দুঃখের ভার যদি একটু বাড়ে তাতে আক্ষেপের কিছু নেই। সকলের জন্তে দুঃখ পাবার স্বযোগ ক’জনের জী নেই বা-বটে?”

বীরেশ্বরের চলে যাবার সময় একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারলেন না কল্যাণী। আকস্মিক বিপর্যয়ে তিনি এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল না।

বীরেশ্বরের চোখে যে আশ্রয় দেখেছিলেন কল্যাণী সে আশ্রয় জলে উঠল সারা দেশের চোখে। জনতা ছেপে উঠেছে—তাদের চোখে অগ্নিজালা। সে আশ্রয়ে জলছে গ্রাম, মিলিটারী লরী—জলছে সরকারী আপিস আর থানা। গোটা দেশটা জুড়ে চলছে মুক্তিপাগল জনতার মরণপণ সংগ্রাম।

দিনকয়েক পরেই কল্যাণী খবর পেলেন—থানা পুড়িয়ে দেবার অপরাধে বীরেশ্বরের ওপর সাত বৎসরের জন্ত কারা-দণ্ডের আদেশ হয়েছে।

সংসারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এলে পড়ল তাঁর ওপর। বাড়ীতে এমন সম্পত্তি নেই যা বিক্রী করে সংসার চলে। অধুনা বীথি ও হুটুর পড়ার খরচ চালাতে হবে। যে বিশ্বাস বীরেশ্বর তাঁর ওপর গুস্ত করে গিয়েছেন তার অমর্যাদা হতে দেবেন না কল্যাণী। শেষ পর্যন্ত একটা মারোয়াড়ী জুলে গানের শিক্ষয়িত্রীর পদ জুটে গেল তাঁর। মাইনে ষাট টাকা। অন্ততঃ কলকাতায় থেকে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনাটা অব্যাহত থাকবে ভেবে কল্যাণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যুদ্ধের চাপে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। চাউল হুমুলা, কয়লা দুস্পাধ্য। কাপড় নেই, চিনি নেই—কল্যাণী হুঁচোখে অন্ধকার দেখলেন। দেশে কিরে যেতে পারেন—কিন্তু খাবেন কি? এখানে তবু ত মাসান্তে ষাট টাকা হাতে আসছে। বাধ্য হয়ে সকাল বিকাল দুটো টিউশনী নিলেন কল্যাণী।

আরও সন্তায় অপরিষর গলির একখানি ছোট ঘরে উঠে এলেন। সুর হ’ল তীব্র জীবন-সংগ্রাম। বীরেশ্বরের কারাবরণ পরিবারের আর্থিক দুর্দশার কারণ হলোও একটা মহৎ

আদর্শের জন্তে তিনি দুঃখের পথ বেছে নিয়েছেন—সেখানে কোন গলদ নেই, আত্মপ্রবঞ্চনা নেই—এই স্থির বিশ্বাসে বুক বেঁধে নিয়ে সংসারের বোঝা একাই বহন করতে লাগলেন কল্যাণী। “দেশের জন্তে দুঃখ পাওয়ার সৌভাগ্য তো সকলের ভাগ্যে ঘটে না”—হামীর এই উক্তি স্মরণ করে কল্যাণী তাঁর কটোর নীচে মাথা নোয়ালেন।

সকাল-সন্ধ্যা টিউশনী করে বাড়ীর দিকে নজর দেবার মোটেই সময় পান না কল্যাণী। এতে তাঁকার দিক থেকে খুব যে সচ্ছলতা এসেছে—তা নয়। তবু টায়টোয় মাসের খরচটা কুলিয়ে যায়। কল্যাণী ছেলেমেয়েদের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন না বলে তাদের দেখাচারিতা ক্রমশঃ বেড়ে চলে। বীথি আজ সিনেমায় যাচ্ছে, কাল মিটিঙে যাচ্ছে, পরশু হয়ত রিলিফের চাঁদা তুলতে বেরিয়েছে—কল্যাণী চুপ করে শুধু দেখেই যান। তিনি প্রতিবাদ করা এক রকম ছেড়েই দিয়েছেন। হুটুর দুর্দান্তপনা সীমা অতিক্রম করেছে। খাতাপত্র নিয়ে ঠিক সময়ে জুলে-যাবার জুতায় সে মাসের পনেরো দিনই পার্কে পার্কে ঘুরে বেড়ায়। অপরিণত বয়সে শাসনের লাগাম টিলে দিলে যা হয়, হুটুর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় নি। স্বাভাবিক নিয়মে বাজে খরচের জন্ত পয়সা না পেয়ে হুটু মার বাজা ভেঙে পয়সা চুরি করতে সুরু করলে। কল্যাণীর চোখে এবার সত্যই জল আসে। বীরেশ্বরের কটোর নীচে মাথা হুইয়ে তিনি বলেন, “আমার ওপর বিশ্বাস করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার ভার তুমি দিয়ে গিয়েছিলে। কিন্তু একা আমি ক’দিক সামলাই বল? আমারই চোখেই লায়নে ওরা এমনি ভাবে নষ্ট হচ্ছে—এর জন্তে তুমি আমার অপরাধ নিও না।”

কিন্তু দোষ কি শুধু হুটুর আর বীথির? না, তাদের অভাবের সংসারও এর জন্তে অনেকটা দায়ী।

কল্যাণী নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য না করে প্রাণপণে খেটে যাচ্ছেন। কিন্তু এর বেশী রোজগার করা তাঁর একার পক্ষে সম্ভব নয়। মেয়ের বিয়ে দিলে যদি কিছু সুরাহা হয়—তা বীথির যে রকম মতিগতি। আর ভাবতে চান না কল্যাণী। কাল তাদের জুলে স্বাধীনতা-উৎসব। ক’দিন থেকে তিনি খুবই যত্ন নিয়ে ‘রাঙা উঁচা রহে হামারা’ গানটি মেয়েদের শেখাচ্ছেন। এ ক’বছরে বাংলাদেশের উপর দিয়ে যুদ্ধ, ঝড়, বত্যা, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব—কত বিপর্যয় ঘটে গেল। হুঁয়োগের অমানিশার পর বহুপ্রাণিত অরুণোদয়কে স্বাগত জানাবার জন্তে সবাই সাধ্যমত উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত। সে আনন্দের কলশ্রোতে কল্যাণীও নিজের দৈনন্দিন কথার ভুলে গেলেন।

হুটু সকাল থেকে বায়না ধরেছে একটা সিন্ধুর জাতীয়

পতাকা কিনতে হবে। কল্যাণী তার হাতে চারটে পয়সা দিয়ে কাগজের নিশান কিনতে পাঠালেন। গরীবকে গরীবের মতই চলতে হবে। স্বাধীনতালাভের উচ্ছ্বাসে খুশী হয়ে যে ছোটো পয়সা বেশী খরচ করবে তেমন আর্থিক সঙ্কটটুকুও তাদের নেই।...

হঠাৎ হুটুর কলরবে ঘুম ভাঙলো কল্যাণীর।

“মা, বাবা এসেছেন—ওঠ...”

কল্যাণী স্থল থেকে ফিরে যেই বিছানায় একটুখানি গা এলিয়ে দিয়েছিলেন, অমনি ক্লান্তিতে তাঁর শরীর অবশ হয়ে এসেছিল—স্বামীর উপস্থিতিতে তিনি সচকিত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। হাতের ত্যানিটি ব্যাগ তখনো বিছানায় ছড়ানো—স্থলের কাপড় তখনো ছাড়েন নি। ছি ছি...বীরেশ্বর কি ভাববেন।...বীরেশ্বর বললেন, “কি অন্ধকার গলি তোমাদের। এক হাত দূরের লোক দেখা যায় না। নখর খুঁজে বের করতেই আমার আধ ঘণ্টা লাগল। বড় নোংরা বস্তী ত?”

বীরেশ্বর একটু থেমে আবার বললেন, “বীথিকে দেখছি নে যে—বীথি কোথায়?”

“বীথি কলেজে গেছে। কালকের উৎসবের কাজে সবাই ব্যস্ত। এফুনি হয়তো ফিরবে।”

কল্যাণী যেন কথা কইতে খুব জোর পাচ্ছেন না।

হুটু বর্ললে, “বাবা দেখবে এস, ছাদে আমরা কত বড় নিশান ভুলেছি।”

“তুমি পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছাদে বসগে—আমরা পরে আসছি।”

হুটু লাফাতে লাফাতে ছাদে উঠে গেল।

কল্যাণী জিজ্ঞেস করলেন, “শরীর কেমন আছে?”

বীরেশ্বর হেসে জবাব দিলেন, “ছেলের ভাত খেয়ে বরং মোটাই হয়েছি। কি বল?”

কল্যাণী সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বীরেশ্বরের পারের ধুলো নিলেন। এ সংস্কারটুকু তিনি আজও ছাড়তে পারেন নি।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বীরেশ্বর পতাকা অভিবাদন করে স্বাধীনতার রূপ সম্পর্কে অনেক আলোচনা করলেন। কল্যাণী তার কতক বুঝলেন—কতক বা বুঝলেন না। তাঁর মনে ‘বাঙা উঁচা রহে হামারা’ গানের সুরটা বার বার গুঞ্জরিত হয়ে উঠছিল।

\* \* \*

স্থলে খাবার জুড়ে খুব ভোরে উঠলেন কল্যাণী। বীরেশ্বর তখনও ঘুমিয়ে। স্বপ্নের একখানা নীল পাড়ের শাড়ী বের করে পরলেন কল্যাণী, বহু দিনের পুরণো শাড়ীখানা তিনি সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। এই একখানা ছাড়া আর সবই ত তাঁর

কন্ট্রোলের শাড়ী। ভাগ্যিস এখানা ছিল—তাই মুখরুকা হবে। একটা শতাব্দীর পাপচক্র থেকে অব্যাহতি পেয়ে জাতি আজ মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। এক ঝলক কচি রোদ এসে তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের সব কালো ঘুচিয়ে দিয়েছে।

কল্যাণীর কাছে এই সূর্য্যের আলো আজ নতুন আশ্বাস বহন করে আনল। ষ্টোভে জল চাপিয়ে কল্যাণী চায়ের সরঞ্জাম বার করলেন।

কালকের কেনা রুটি দুখানাই তাদের স্বাধীনতা-দিবসের জলখাবার। সাধারণত সকালে চা আর মুড়ি খেয়েই টিউশনীতে বেরিয়ে যান কল্যাণী। আজকের প্রাতরাশ একটু ভালই হবে। কিন্তু টিনের মুখ খুলে তিনি বেতুব বনে গেলেন। দু-দুখানা রুটিই বেবাক লোপাট হয়েছে—টিন শুষ্ক। কাজটা যে কার তা বুঝতেও দেয় হ’ল না কল্যাণীর।

কল্যাণী সকালের প্রসন্নতা ভুলে গিয়ে ‘হুটু’ বলে চীৎকার করে উঠলেন।

হুটু ছাদ থেকে নেমে এল।

“রুটি কে খেয়েছে? এক টুকরো রুটি কারো মুখে উঠে নি—এমন রাগুসে ক্ষুধা কার?”

হুটু মাথা নত করে নিজের অপরাধের মৌন স্বীকৃতি জানালে।

অল্প দিন হলে কষ্টার্জিত অর্থের এই অপব্যয়ের দরুন হুটুর পিঠের চামড়া অক্ষত থাকত না। সেদিন কল্যাণী আর কথা বাড়ালেন না। ছেলেগুলো এমনি ভাতে মরা—না হয় একদিন পেট ভরে রুটিই খেয়েছে। তার ত জোটে না—ছেলেদের তৃপ্তিতেই তার আনন্দ। শাপে বর হ’ল হুটুর। লিভার ধারাপ হবে বলে হুটুকে চা খেতে দেন না কল্যাণী। আজ এক কাপ চা দিয়ে বললেন, আর কোন দিন না জিজ্ঞেস করে খাবার জিনিষে হাত দেবে না। খাবার ত তোমাদের জুটেই। লক্ষ্মী ছেলে—এমনটি আর কথ খনো করো না।”

কল্যাণীর দেয়ী হয়ে যাচ্ছে। রোজ তিনি ‘বাসেই যান। এত সকালে ‘বাস পাবেন না বলে আজ তিনি রিক্সাতেই যাবেন। এর জুড়ে বাড়তি আট আনা খরচ হবে। তাদের টানাটানির সংসার—রিক্সা চড়ার নবাবী পোষায় না। কিন্তু আজ বাধ্য হয়েই তাকে রিক্সায় যেতে হবে।

ত্যানিটি ব্যাগ খুলে কল্যাণী মাথার হাত দিয়ে বসলেন। মাত্র দু-আনা পয়সা ব্যাগে পড়ে আছে। ওদিকে ঘরে আর পয়সা নেই যে আজকের প্রয়োজন মোটোতে পারেন। ঠিক সময়ে পৌঁছতে না পারলে সেক্রেটারী ভাঙা বাংলায় বাপান্ত করে ছাড়বে। তিনি না গেলে উৎসবই আরম্ভ হবে না। তাঁরই নির্দেশে ত মেরেরা ‘বাঙা উঁচা রহে হামারা’ গানটি গাইবে। পয়সা নিশ্চয় হুটুই সরিয়েছে। হুটুর চুরির

দোষ আশ্রয় নতুন নয়—কিন্তু এমন ভাবে যে সব পণ্ড করবে তা কে জানিত? ছেলেকে খুন করলেও আত্মকের এই জালা বৃষ্টি জুড়াবে না কল্যাণীর।...

“পয়সা কে নিয়েছে? শীগগির বের কর—নইলে মেরে খুন করে ফেলব।”

মুঠুর হাতে চায়ের কাপ কেঁপে উঠল। মায়ের রক্ত মূর্তি দেখে দোষ স্বীকারের সাহস তার রইল না।

কাঁদো কাঁদো সুরে বললে—আমি নিই নি মা।—ছম করে পিঠে কষে এক কিল মারলেন কল্যাণী। তবে কি পয়সা হাওয়ায় উবে গেছে? বজ্রাত ছেলে, শীগগির পয়সা বার কর বলছি—নইলে হাড় একটুও আশ্রয় থাকবে না।

মুঠু কেঁদে ফেলল, বললে—আমাদের কাগজের নিশান রেলিঙে লেগে ছিড়ে গেল। তাই ত আর একখানা সিন্ধের নিশান কিনে এনেছি।

তোমার গুপ্তীর পিণ্ডি এনেছ। হতভাগা ছেলে, এখন তোর জন্তে সব পণ্ড হ'ল?

একটু বাদে কল্যাণীর সখি ফিরে এল। ছেলের সঙ্গে পয়সা নিয়ে রাগারাগি করে সময় নষ্ট করলে, স্কুলে আজ কি আর তার মুখ থাকবে। এখনো সময় আছে বুঝে ছোঁরে পা চালালে তিনি হয়ত সাতটার আগে স্কুলে পৌঁছাতে পারবেন।

কিছু স্থির করতে না পেরে তিনি সিঁড়ির পথেই থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন।...

সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলেন বীরেশ্বর, পাশের ঘরে থেকে কল্যাণীর সব কথাই তিনি শুনছিলেন। এই কয়টি কথায় পরিবারের দারিদ্র্যের নয়চিহ্ন তাঁর কাছে পরিপূর্ণ ভাবে উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। দীর্ঘকাল পরে গৃহ-প্রত্যাগমনের পুলকোচ্ছ্বাস, নবলব্ধ স্বাধীনতার আনন্দ—সবকিছুই যেন তাঁর কাছে বিষাদ হয়ে গেল। এ কথাটাই শুধু তিনি ভাবতে লাগলেন—দেশে স্বাধীনতা এল বটে, কিন্তু দেশের প্রতি কর্তব্য করতে গিয়ে যে কয়টি প্রাণীর প্রতি তিনি নিদারুণ অবিচার করেছেন, যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তিনি তাদের অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘ কারাবাস বরণ করেছিলেন, তাদের রুগীর সংস্থান আজও হ'ল না। তিনি দেখলেন, স্বাধীনতার দিনেও আনন্দ করবার অধিকার নেই কল্যাণীর—রুগী আর তেরঙা নিশান ছোটোই একসঙ্গে কেনবার মত সামর্থ্য নেই তার—রুগী কিনতেই তাঁর সব পয়সা ফুরিয়ে যায়।

আপনা থেকেই বীরেশ্বরের হাত আমার পকেটে ঢুকল, কিন্তু পকেট একেবারে খালি। সিঁড়ির উপর স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। দীর্ঘকাল পরে একে অপরকে যেন নতুন ভাবে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

হঠাৎ কি মনে করে কল্যাণী ব্যাগের বাকী ছ'আনা পয়সা রুটির শূণ্য টিনের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর নিরীক্যে দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে গটগট করে নীচে নামতে লাগলেন।

## বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের কার্যাবলী

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

বঙ্গদেশস্থ সংস্কৃত চতুষ্পাঠীসমূহের তত্ত্বাবধান ও সংস্কৃত পরীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতি বাংলা-সরকার কর্তৃক স্থাপিত হয়। পূর্বে এ সমিতি কলিকাতা সংস্কৃত-সমিতি নামে পরিচিত ছিল। নানা বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও এই সমিতি স্থায়ী লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। বিশেষভাবে, ১৯৪৭ সালে কলিকাতার সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবতা ও তৎপরে ভারত ও বঙ্গ-বিভাগের ফলে সমিতিকে অভূতপূর্ব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ১৯৪৭ সালে সমিতির কার্যাবলীর সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলীর যোগসূত্র

পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যে যোগসূত্র এতদিন অক্ষুর ছিল, রাষ্ট্রবিভাগের ফলে তা' অল্পবিস্তর

শিথিল হতে বাধ্য। অবশ্য বলা নিস্প্রয়োজন যে, আমাদের পক্ষ থেকে পূর্ব বঙ্গ যত দূর সম্ভব অক্ষুর রাখার বিষয়ে চেষ্টার কোনও ক্রটি হবে না। সভা-সমিতি, সামাজিক অনুষ্ঠান, পরীক্ষাপ্রভৃতি ব্যাপদেশে তাঁদের সঙ্গে আমাদের পূর্ব মধুর সম্বন্ধ অক্ষুর থাকবে। যত দিন পর্যন্ত না পূর্ববঙ্গে পৃথক সরকারী পরীক্ষাসমিতি গঠিত হয়, তত দিন এ বৎসরের মত আমরা পূর্ব-পাকিস্থানে পরীক্ষা নিতে পারব—এ আশা করা যায়; এবং পাকিস্থানের পণ্ডিত মহাশয়েরা এ পরীক্ষার ফলে যা স্বত্তি পেতেন—যাতে পূর্ববঙ্গের সরকার সে স্বত্তি দিতে থাকেন—তারও বন্দোবস্ত আমরা করতে পারব, তারও আশা রাখি। পূর্ববঙ্গে সরকারী পরীক্ষা-সমিতি স্থাপিত হলেও যদি পাকিস্থাননিবাসী পণ্ডিতবর্গ আমাদের পরীক্ষার কেন্দ্র পাকিস্থানেও রাখতে চান—তা' হলে পূর্ববঙ্গীয়

সরকারকে তদ্বিষয়ে অমুমতি প্রদানে প্ররোদ্ধ করাও হয়ত অসম্ভব হইবে না। অবশ্য সে ক্ষেত্রে পণ্ডিতমণ্ডলী আমাদের পরীক্ষার উপরে নির্ভর করে বৃত্তিলাভে সমর্থ হইবেন; মনে হয় না। যাই হোক—পূর্ব-পাকিস্থানের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে এই নিবেদন করছি যে—বঙ্গীয়-সংস্কৃত-সমিতি তাদের সর্ববিধ বিষয়ে যথাসম্ভব সহায়তাদানে কদাপি কুষ্ঠিত হইবে না। দীর্ঘদীর্ঘকালের সংযোগচ্ছেদ ক্রটি বা দোষপ্রণোদিত নয়; কাজেই বাহ্যিক পরিস্থিতি যাহাই হউক, আন্তরিকতার তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটবে না। সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের পুজারী পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলী চিরকাল অচ্ছেদ্য জাতবন্ধনে আবদ্ধ থাকিবেন। দেশবিভাগের ফলে সরকারীভারে ও সাহায্যে পূর্ববং স্বদৃঢ় সংযোগ, সংরক্ষণ সম্ভবপর না হলেও বেসরকারী সহায় ব্যক্তিবৃন্দের সহায়তায় এ সংযোগ অব্যাহত রাখবার সর্ববিধ উপায় আমরা অবলম্বন করব।

বঙ্গ বিভাগের ফলে সমিতির ছাত্রসংখ্যা হ্রাস ও  
তৎপ্রতিকার

আমাদের ছাত্রসংখ্যা বঙ্গ বিভাগের ফলে যাতে হ্রাস না পায়, তার সর্ববিধ উপায় আমরা অবলম্বন করব। পূর্বেই বলেছি যে, পূর্ববঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলী যাতে পূর্ববঙ্গেই আমাদের পরীক্ষা পূর্ববং চালিয়ে নিতে পারেন, তজ্জন্ম আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টার কোনও ক্রটি থাকবে না। যদি পূর্ববঙ্গের সরকার পূর্ববঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের অমুমতিদানে কুষ্ঠিত হন, তা হলে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের সীমান্তপ্রদেশে পশ্চিম-বঙ্গভুক্ত মহকুমা শহর ও অগ্রাঞ্চ বিশেষ বিশেষ স্থলে আমরা পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করব। যাতে পূর্ববঙ্গের ছাত্রগণ অল্পায়াসে সে সকল কেন্দ্রে এসে পরীক্ষা দিতে পারেন। দূরবর্তী স্থাননিবাসী ছাত্রবৃন্দও যাতে পশ্চিমবঙ্গের নিকটতম স্থানে এবং প্রয়োজন হলে কলিকাতাতেও এসে পরীক্ষা দিতে পারেন—তজ্জন্ম প্রয়োজনমত আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করতেও আমরা সচেষ্ট থাকব।

সমিতির নূতন নূতন পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন

অত্য়দিকে—ভারতের সর্বত্র আমাদের পরীক্ষা যাতে গৃহীত হয় তজ্জন্ম সর্ববিধ উপায়াবলম্বনে আমরা ত্রুতী হয়েছি। ভারতের বহুস্থান থেকে ইতোমধ্যেই আমরা যথেষ্ট সাড়া পেয়েছি। এই বৎসর (১৯৪৮) দিল্লীতে নূতন পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, বিকানীর, মহীশূর, কোচিন, ত্রিবেঙ্গাম, পাতিয়ালা, সিমলা প্রভৃতি স্থানেও আমাদের পরীক্ষাকেন্দ্র অচিরে স্থাপিত হবে, আশা করি। বুদ্ধাবন, বারাগঙ্গী ও অগ্রাঞ্চ যে সব স্থলে তত্তৎস্থলের কতৃপক্ষ আমাদের পরীক্ষা গ্রহণের সুযোগপ্রদানে কুষ্ঠিত

ছিলেন, তাঁদেরও অমুমতি লাভের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করা হচ্ছে। স্বাধীন-ভারতে পূর্ণোত্তমে সংস্কৃতসেবার সর্ববিধ উপায় অবলম্বন করতে হবে। (এবং আমাদের বঙ্গদেশকে এ বিষয়ে অগ্রণী হতে হবে।) বঙ্গদেশের নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বিক্রমপুর, কোটালিপাড়ার মাধ্যমিকতায় সংস্কৃতশিক্ষার পসরা ভারতের প্রত্যেক নগরে, নগরে; গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করতে হবে—পূর্বের মত বঙ্গদেশকে সংস্কৃতজ্ঞান-কুশলতায় অগ্রণী এবং সংস্কৃতজ্ঞান সংপ্রসারণের প্রচেষ্টাতেও জীবন-পণ করতে হবে।

বিপন্ন পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তা-প্রচেষ্টা

দুঃস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তার নিমিত্ত আমরা যে বেসরকারী সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপিত করার মনস্থ করেছি—তার থেকে অচিরেই সাহায্য প্রদানের চেষ্টা আমরা করব। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গত্যাগী পশ্চিমবঙ্গে—আশ্রয়প্রার্থী বিপন্ন পণ্ডিতবর্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের অগ্রাঞ্চ দুঃস্থ পণ্ডিতবৃন্দ সাহায্যের জন্ত আমাদের নিকট আবেদন করলে আমরা এ সাহায্য-ভাণ্ডার থেকে যথা-সাধ্য সাহায্য প্রদান করব। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার থেকে তজ্জন্ম কত সাহায্য আমরা পাব, তা অনিশ্চিত। ভারত-সরকারের বিপন্নভ্রাণ ও পুনর্বসতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ত্রীমুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের সহিত সম্প্রতি আমরা দিল্লীতে সাক্ষাৎপূর্বক এ বিষয়ে বিশেষ প্রার্থনা জানিয়েছি এবং অবিলম্বে দুঃস্থ ও সাহায্যপ্রার্থী পণ্ডিতবর্গের নাম, ঠিকানা, গুণাবলী প্রভৃতি সংবলিত একটি বিস্তৃত বিবরণী তাঁর নিকট প্রেরণ করা হবে। প্রাদেশিক সরকারের নিকটও এ বিষয়ে সনির্বন্ধ আবেদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। ভরসা করি, আমরা ব্যর্থমনোরথ হব না।

সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রসারের নিমিত্ত সমিতির প্রচেষ্টা

বিগত ১৭ই অক্টোবর (১৯৪৭) তারিখে আমাদের সমিতির তত্ত্বাবধানে সমিতির সম্পাদকের সভাপতিত্বে এই সমিতির উন্নতিকল্পে সমিতির পণ্ডিতমণ্ডলী ও অগ্রাঞ্চ পণ্ডিতদের এক মহতী সভা হয়। এ সভায় সংস্কৃতসাহিত্যের প্রসারের পরিকল্পনার নিমিত্ত একটি সমিতি গঠিত হয়, এবং সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়—

১। দুঃস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তার নিমিত্ত একটি সহায়তা-ভাণ্ডার স্থাপন এবং মহামুভব ব্যক্তিবৃন্দের নিকট সাহায়তার নিমিত্ত আবেদন প্রেরণ

২। এ সমিতির পরীক্ষার উন্নতিবিধানের নিমিত্ত ..

(ক) প্রধান পরীক্ষকের পদস্থষ্টি, (খ) পূর্ববার উত্তরপত্র পরীক্ষার নিমিত্ত পারিশ্রমিক নির্ধারণ, (গ) উত্তরপত্র পরীক্ষার নিমিত্ত পারিশ্রমিকের হারবৃদ্ধি, (ঘ) সমিতির কেরানী-পদস্থষ্টি,

(ঙ) সমিতির পাঠ্যপুস্তক ও গবেষণাপুস্তকাদি মুদ্রণের নিমিত্ত একটি মুদ্রণালয় স্থাপন এবং একটি গ্রন্থন বিভাগ স্থাপন।

সমিতির কার্যনির্বাহক সভায় বিভিন্ন বিষয়ক প্রচেষ্টা

বিগত জুন মাস হইতে জাহ্নবীর পর্যন্ত আমাদের সভাপতি মাননীয় ডক্টর ত্রিযুত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে সমিতির কার্যকরী সভার তিন বার অধিবেশন হয়। সমিতির উন্নতিকল্পে বহুবিধ প্রস্তাব গৃহীত এবং সরকারের অনুমোদনের নিমিত্ত প্রেরণ করা হয়েছে। আমরা আশা করি, আমাদের সহায় জাতীয় সরকার অবিলম্বে আমাদের প্রস্তাবাবলী অনুমোদন করে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করবেন।

আমাদের মূল লক্ষ্য ও বর্তমান প্রয়োজনাবলী

আমাদের মূল লক্ষ্য আমাদের সংস্কৃতসমিতি এবং সংস্কৃত-কলেজের সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত-বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন। বর্তমানে আমরা পরীক্ষাগ্রহণ সমিতি মাত্র; কিন্তু আমরা চাই—সংস্কৃত-সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুযায়ী ও তুলনামূলক প্রাচ্যগবেষণাগার, সর্বস্বযোগসংবলিত গবেষণাবিভাগ, সর্বভারতীয় পরীক্ষাগ্রহণবিভাগ, গ্রন্থপ্রকাশবিভাগ প্রভৃতি সমন্বিত একটি পূর্ণায়ত্ত বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু স্বল্প সময়ে এ লক্ষ্যপূরণে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয় বলে আমরা সম্প্রতি নিম্নলিখিত বিষয়ে যত্নবান হয়েছি,—

বর্তমান সংস্কৃত কলেজের বহুল উন্নতি সাধন। টোল-বিভাগের অধ্যাপকদের অধ্যাপনার জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ, অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিমিত্ত একটি প্রথম শ্রেণীর ছাত্রাবাস-স্থাপন, ছাত্রদের রুত্তির হাররুদ্ধি, গবেষণাবিভাগ স্থাপন, গ্রন্থ-প্রকাশবিভাগ স্থাপন, কাব্য, জ্যোতিষ, পার্থিবব্যতিরিক্ত ব্যাকরণ, বেদ, মীমাংসা প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান নূতন অধ্যাপক-পদ স্থাপন, আয়ুর্বেদের নূতন অধ্যাপক-পদ স্থাপন, পালি ও প্রাকৃতের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা, পুথির লেখনকারী পণ্ডিতদের স্থায়ী পদ স্থাপন, অনুবাদবিভাগ স্থাপন, ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে পুঁথি সংগ্রহ, সংস্কৃত ও বাংলা পত্রিকা পরিচালনা-বিভাগ; সর্বোপরি সমিতির নিজস্ব মুদ্রণালয় স্থাপন, আয়ুর্বেদ ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞান, শিল্প, রাজনীতি, সামরিকবিজ্ঞান, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়েও পঠনপাঠন ও পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃতবিতর্কসভা স্থাপন, সংস্কৃত-নাট্য-ভিনয়ের দ্বারা সংস্কৃতের প্রতি জনসাধারণের অহুরাগ আকর্ষণ প্রভৃতি বিষয়েও আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। পুনরায় যাতে অন্ততঃ ২০০ শত ছাত্র প্রয়োজনীয়ত রুত্তিলাভপূর্বক সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে বিদ্যালয় করতে পারে, তজ্জন্ম ব্যবস্থাবলম্বন করা কৃতব্য। এতদ্বিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ সাধারণ শিক্ষক-

দের শিক্ষণপ্রণালী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেরূপ সংস্কৃতশিক্ষণ-প্রণালী শিক্ষার জ্ঞানও একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রয়োজন।

এই সকল কার্য প্রভূত শ্রম ও প্রচুর অর্থসাধ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা শ্রমবিমুখ নই, পরন্তু সংস্কৃতসাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের নিমিত্ত জীবন পণ করতেও সম্পূর্ণ উন্মুখ। অপর দিকে, দেশবাসী ও জাতীয় সরকার ও ভারতের শাস্ত্রতত্ত্ব ধারক ও বাহক দেবভাষা সংস্কৃতের জ্ঞান অর্থব্যয়ে পরানুগ্রহ হবেন না বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অতএব আমাদের আরও কার্য সাফল্যমণ্ডিত হবে নিঃসন্দেহ—“চরৈবেতি চরৈবেতি।”

সমিতির উন্নয়নকল্পে প্রারম্ভ কার্যাবলী

১। পণ্ডিতমণ্ডলীর নাম, ঠিকানা, গুণাবলী, রচিত পুস্তক ও প্রবন্ধ, বর্তমান ছাত্রসংখ্যা প্রভৃতি সংবলিত নামের বিস্তৃত তালিকা প্রণয়ন। পণ্ডিতমণ্ডলীর সর্ববিধ সহায়তাবিধান এবং গুণানুসারে যথাযথ কর্মলাভে সহায়তাপ্রদান প্রভৃতি নামের তালিকা প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য।

২। পণ্ডিতমণ্ডলীর লিখিত গ্রন্থাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। ইদৃশ দৃষ্টদেয় প্রণীত হয়েও পণ্ডিতমণ্ডলী যে অতাপি তাঁদের জ্ঞানের প্রজ্বলিত দীপশিখা অনির্বাপিত রাখতে সমর্থ হয়েছেন, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলী। আমাদের কৃতব্য—তাঁদের সমস্ত গ্রন্থপ্রকাশে সম্যক সহায়তা প্রদান। এ অবশ্যকৃতব্যে সমিতি নিশ্চয় মনোনিবেশ প্রদান করবে। ইতোমধ্যে যে সব গ্রন্থ বঙ্গীয় পণ্ডিতমণ্ডলী রচনা করেছেন, তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন প্রণীত জৈন ও হিন্দু, হরিদাস দাসের বৈষ্ণবসাহিত্যের ইতিহাস, গৌরানন্দর ভাগবতদর্শনচর্চা-প্রণীত পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ ভট্টাচার্য প্রণীত মিবার-প্রতাপ নাটক, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রণীত বেদবিভাগতত্ত্ব ও ব্রাহ্মণ, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী-রচিত ব্রহ্মদর্শন—১৯৪৭ সালে বা অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গীয় পণ্ডিত-গণ কর্তৃক রচিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শতাবধি গ্রন্থ আমরা গত জুন থেকে ডিসেম্বর এই ছয় মাসে সংগ্রহ করেছি। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থই সার-বহুল এবং উপাদেয়। উপযুক্ত প্রচারের অভাবে এসব গ্রন্থের অধিকাংশেরই সাধারণ গ্রন্থাগারে স্থান হয় না। সুতরাং ইদৃশ গ্রন্থের প্রকাশ, প্রচার, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ভার সমিতির গ্রহণ করা অবশ্যকর্তব্য। দৃষ্টদেয়ের নিষ্পীড়নে ওষ্ঠাগতপ্রাণ পণ্ডিতমণ্ডলীর ইদৃশ বিদ্যাবত্তা প্রকাশ যদি অদ্যাপি সম্ভবপর হয়, তা হলে সুযত্ন-পরিরক্ষিত পণ্ডিতসমাজ থেকে কত অজস্ররত্নাবলী আমরা প্রত্যাশা করতে পারি, তা চিন্তা করতেও হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে।

৩। সমিতির সংস্কৃত বাংলা পত্রিকা প্রকাশ। সমিতির তত্ত্বাবধানে পত্রিকা প্রকাশের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে।



৪। বেসরকারী সাহায্যভাণ্ডার স্থাপন। এ প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বেই আমাদের মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের দানের বিষয়ে উল্লেখ করেছি। আমাদের সমিতির কার্যকরী সভার সভ্য কুমার বাহাদুর ত্রিযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় মহাশয়ও ছাত্রমণ্ডলীর উৎসাহবর্ধনের নিমিত্ত পাঁচ শত টাকা দান করেছেন। এতদ্বির আমরা কয়েক সহস্র টাকার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি পেয়েছি এবং শীঘ্রই তা সংগৃহীত হবে।

এ প্রসঙ্গে যারা আমাদের অর্থসাহায্য করেছেন বা অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন; যারা অত্যাধ বহুবিধ বিষয়ে আমাদের অকাতরে সহায়তা প্রদানে অগ্রণী হয়েছেন; যারা আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও কল্যাণ কামনার অকুপণ ধারায় নিরন্তর সঞ্চিত করেছেন, তাঁদের সকলকে আমাদের প্রাণের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সকল শুভামুখ্যায়ী মর্মেণ্ডাখ শুভেচ্ছা ও শুভাশীর্বাদ নিরন্তর অক্ষয়ধারায় আমাদের উপর বর্ষিত হোক-ইহাই আমাদের চিরন্তনী কামনা।

#### উপসংহার

গৌড়দেশ চিরকাল সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রধান দেশ। সহস্র বৎসর পূর্বে তৎকালীন কবিশ্রীরা রাজশেখর আমাদের সম্বন্ধে বলেছিলেন,—“গৌড়াঃ সংস্কৃতস্থাঃ পরিচিতরুচয়ঃ”। বঙ্গবাসীর সম্বন্ধে রাজশেখরের প্রশংসা অত্যাধ সত্য। অদ্যাপি বঙ্গদেশে চতুষ্পাঠী ও পণ্ডিতসংখ্যা অত্যাধ প্রদেশ থেকে সমৃদ্ধ। এককালে এ বঙ্গদেশের ভারতমুকুটমণি মনীষীরা ভারতের সর্বত্র জ্ঞান বিতরণ করতেন এবং সমগ্র ভারতের অশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। সেই হতগৌরব পুনঃ অর্জনের জন্ত শুধু নয়, ভারতীয় কৃষ্টির সর্বদীপ উন্নতি-সাধনের নিমিত্ত আজ বঙ্গবাসী আমাদের প্রত্যেককে বঙ্গপরিকর হতে হবে। প্রয়োজন হলে আত্মত্যাগ প্রদানেও পশ্চাৎপদ হলে চলবে না। স্বাধীন-ভারতের সন্তানদের ভারতীয় সভ্যতার গৌরব অব্যাহত, অক্ষুর রাখবার জন্ত জীবন পণ করে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হতে হবে। “মন্ত্রের সাধন

কিংবা শরীর পাতন”—এই আমাদের মূলমন্ত্র। সংস্কৃতই আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের কৃষ্টির আধার, এবং তদ্বিষয়ক পূর্ণজ্ঞান সংস্কৃতির প্রকৃষ্ট জ্ঞানসাপেক্ষ। ভারতীয়দের ভারতীয়ই যদি জাতীয় সাধনার মৌলিক বস্তু হয়, তা হলে সংস্কৃতবিষয়ক জ্ঞানই সর্বপ্রথমে অর্জন করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষ ও সংস্কৃত প্রায় সমার্থক। তাই সংস্কৃতসেবীমাদেই নিরন্তর দেশমাতৃকাপদসেবী। তজ্জন্ত আজ ভারতীয় স্বাধীনতার কনকায়মান শারদ প্রভাতে আমরা সংস্কৃতির বিজয়যাত্রা ঘোষণা করি, দেশমাতৃকার চরণকমলে আমাদের ভক্তি-কমলার্থ্য প্রদান করি। ভগবান আমাদের অতীষ্ট লাভের সহায়ক হউন, সংস্কৃতির বিজয়গাথায় বিশ্বের দিগ্দিগন্ত মুখরিত হয়ে উঠুক, আমাদের ভারত-জননী পূর্বের হায় পুনরায় জ্ঞানের মুকুটমণি পরিহিতা হয়ে বিশ্বসভা আলোকিত করুন। ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর অক্ষয়কীর্তি জগতে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, ভারতের জ্ঞানরূপাণে জগদ্বাসী পুনরায় অমরত্বের সন্ধান প্রাপ্ত হোন, বিশ্বপতির মহামহিম দ্ব্যতি ভারতীয় জ্ঞানের অনন্ত জলধিতে প্রতিফলিত হয়ে বিভায়ে বিভায়ে জগতের দিগ্দিগন্ত উদ্ভাসিত করে তুলুক।

আমরাও অতর্কিত হয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে প্রব লক্ষ্যপথে অগ্রসর হই।

“চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাহুস্বহুধরম্।

পশু স্তম্ভ শ্রেমাণং যো ন তল্লয়তে চরন্ ॥

চরৈবেতি চরৈবেতি ॥

যে চলিতে থাকে সে-ই অস্বতত্ত্ব লাভ করে, সে-ই স্বাহু ফল আবাদন করে। চাহিয়া দেখ, সূর্যের কি আলোকসম্পদ—কারণ চলিতে চলিতে সে কদাপি তল্লাবিষ্ট হয় না। অতএব চলিতেই থাক, চলিতেই থাক।”\*

\* বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের ১৯৪৭ সালের বার্ষিক সমাবর্তনোৎসবে সম্পাদক-কর্তৃক প্রদত্ত সংস্কৃত বক্তৃতার সারাংশ।

## হাঙ্গেরিতে কৃষি-বিপ্লব

অধ্যাপক মুজাফ্ ফর আহমদ চৌধুরী

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যভাগে হাঙ্গেরিতে ভূমিব্যবস্থা-সংক্রান্ত আইন পাস হয় এবং তখন থেকেই হাঙ্গেরিতে আরম্ভ হয় কৃষি-বিপ্লব। যুগ যুগ ধরে হাঙ্গেরিতে বড়লোক, জমিদার শ্রেণী ও ধর্মযাজকগোষ্ঠী যে বিরাট ভূখণ্ড দখল ও ভোগ করেছিলেন, তাকে শত শত খণ্ডে বিভক্ত করা হয়; বিষয়টি বুঝি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ হলেও ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই ভূমি-সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করা হয়। আঠার মাসের মধ্যে ইউরোপের মধ্যযুগীয় সামন্ত-ব্যবস্থার একটা বিরাট-দুর্গকে ভেঙে

দেওয়া হয়। জমিদারী প্রথা অবসান হ'ল। ৪০ লক্ষ কৃষি শ্রমিক নতুন দিনের নব জীবনের স্বাদ পেল; যুগসঙ্কিত অত্যাচার ও অবিচারের হাত হতে মুক্তি পেল হাঙ্গেরির লক্ষ লক্ষ কৃষক।

হাঙ্গেরিতে কৃষি-অর্থনীতির ভিত্তিভূমির আয়তন পরিবর্তন সাধিত হ'ল। দেশে চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ প্রায় ১৩,৭৯৩,০০০ একর। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগেই ৪,৬৩৩,০০০ একরের বেশী, অর্থাৎ চাষের

উপযোগী জমির ৬ পুনর্বন্টন করা হয়। তা ছাড়া ৩,৩০০,০০০ একর জমি; এর বেশীর ভাগই হচ্ছে বন ও অনাবাদী জমি—হাঙ্গেরির ফ্যাসিষ্টদের হাতে থেকে কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রকর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়। এ জমির বেশীর ভাগ রাষ্ট্রের হাতে চলে আসে বা জনসাধারণের কাছে ব্যবহার করার জন্য রেখে দেওয়া হয়।

ভূমিব্যবস্থা সংস্কারের প্রধান উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে ৬,৪২,০০০ কৃষক, কৃষিশ্রমিক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকের মধ্যে জমি বন্টন করা হয়। এর পূর্বে এদের কোন জমি ছিল না বললেই হয়। হাঙ্গেরিতে প্রতি কৃষক পরিবারে মোটামুটি ভাবে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে রয়েছে। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে ৪০ লক্ষ কৃষকের জীবনে বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। হাঙ্গেরির লোকসংখ্যার অর্ধেকের বেশী এই ব্যবস্থার আওতায় পড়ে। যুগ যুগ ধরে সামন্ততান্ত্রিক শ্রেষ্ঠারিত্য উৎপীড়িত লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিক আর্থ-খানিকটা মুক্তির স্বাদ পেয়েছে, তাদের স্বপ্নসাধ বাস্তবে রূপায়িত করার অবকাশ হয়েছে। বড় বড় জমিদারের অত্যাচার থেকে তারা রেহাই পেয়েছে।

স্বভাবতঃ মনে জাগে, ভূমিব্যবস্থার এই বিরাট বিপ্লবের কারণ কি? এই বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। এমন কি হাঙ্গেরির বহুলোক, বড় বড় জমিদারদের মধ্যে অনেকে স্বীকার করেন যে এই ধরনের আমূল পরিবর্তন ও পুনর্বন্টনের প্রয়োজন অনেক আগে থেকেই ছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে থেকে অনেক বড় বড় ভূস্বামী ভূমি-সংস্কারের প্রতিটি প্রচেষ্টায় তুফল বাধা দেন, কিছুতেই জমির উপর নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছাড়বেন না, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার ১৯৪৫ সালে যে নীতি ও উদ্দেশ্য নিয়ে ভূমিব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হয়, তার কোন সমালোচনা না করে যে পদ্ধতিতে এ পরিবর্তন সাধিত হয়, তার তীব্র সমালোচনা করেন। আবার অনেক জমিদার সব দিক দিয়ে এই ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করেন।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে হাঙ্গেরির মোট ভূমির মালিকদের মধ্যে শতকরা ৫৫ ভাগের বেশী লোকের ১০৪৭ একর থেকে ৭ একর মাত্র জমি ছিল, এর অর্থ হচ্ছে যে হাঙ্গেরির ১,৩৫৮,০০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের হাতে ছিল ৫ই একর হতে ১১ একর জমি। এই পরিমাণ জমি জীবন ধারণের পক্ষে কিছুই নয়। তরুণের রয়েছে লক্ষ লক্ষ ভূমি-হীন কৃষি-শ্রমিক। তাদের মধ্যে অনেকেই বৎসরের অর্ধেক সময় বা তারও কম সময়ের জন্য কাজ পেত। ১৮৯৮ সালে ভূমিসংক্রান্ত ব্যাপারে এক আইন পাস করা হয়, কিন্তু ভূমিহীন কৃষকের উপর এত সব বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছিল যে এই আইন দেশে দাসত্ব আইন বলে পরিচিত

হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ দেখা দেয়। হাঙ্গেরিতে অনেক ধর্মঘট হয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পর্যাপ্ত দেশে বিরাট গণ-আন্দোলন ও গণজাগরণ হয়। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে হাঙ্গেরিতে যে বিপ্লব হয় তার মূলে রয়েছে উৎপীড়িত কৃষকদের বিরাট গণঅভ্যুত্থান।

কৃষকদের প্রধান দাবি ছিল জমিদারীর উৎখাত ও জমির পুনর্বন্টন। কবিট মাইকেল ক্যারোলি কর্তৃক পরিচালিত সরকার কৃষকদের এই গ্রাম্য দাবির প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি এক আদেশ জারি করলেন যে ২৮৪ একরের বেশী জমি কেউ দখলে রাখতে পারবে না। বাকী জমি সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে। ক্যারোলি নিজেই তাঁর একটা বিরাট জমিদারী ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ক্যারোলি সরকারের পক্ষে ছিল অনেক বাধাবিপত্তি। তার সরকার সে সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে পারেন নি। ক্যারোলি সরকারের অবসানের পর ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে হাঙ্গেরির বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা বেথাকুন রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। বেথাকুন সরকারও কৃষকদের আশী-আকাজ্জাক বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন নি। কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টন না করে বেথাকুন সরকার সমস্ত জমি ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে জাতীয়করণের এবং বলপ্রয়োগে সাম্যবাদ স্থাপনের চেষ্টা করেন। সাম্যবাদের মূলনীতি জাতীয়করণ, সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষিকার্য চালাবার প্রয়োজনীয়তা কৃষক-দিগকে না বুঝিয়ে, সাম্যবাদ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন বলে বেথাকুন-অকৃতকার্য হলেন।

ক্রমে ক্রমে হাঙ্গেরির কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা এসেছে এবং সেই চেতনাকে কার্যকরী করার ক্ষমতাও তারা অর্জন করেছে। ক্রমাগত গণ-আন্দোলনের ফলে তারা পেল ১৯২০ সালের কৃষি ও ভূমিব্যবস্থা-সংক্রান্ত আইন। অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় এই আইন তেমন কিছু নয়। এই আইনে ছিল বহুবিধ ত্রুটি ও বাধানিষেধ। তাহার ফলে আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। এই আইন প্রবর্তনের ফলে যদিও প্রায় ৪ লক্ষের মত ভূমিহীন কৃষক ২ই একর জমি পেয়েছিল (জীবনধারণের পক্ষে হাঙ্গেরিও কমপক্ষে ১২ই একর জমির আবশ্যক), বড় বড় জমিদারের আসন তাতে একটুও টলে নি। স্বর্ধী ও বেথলামের নেতৃত্বে বড় বড় জমিদার ও ভূস্বামী সব দিক দিয়ে নিজেদের প্রাণাঘাত বজায় রেখেছিল। ১৯৪০ সালে হাঙ্গেরির সরকারী মুখপত্রে এ সম্বন্ধে মাইকেল ক্যারিক এক বিরাট প্রবন্ধ লেখেন; তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে ১৯৩০ সালে ৪৫ লক্ষ কৃষকের মধ্যে ৩৫ লক্ষ কৃষকের কারও কারও ৭ একর, বা তার চেয়ে কম বা কারও জমিই ছিল না। দেশে প্রায় ৬ লক্ষ কৃষি ফার্ম ছিল, ১০ লক্ষ শ্রমিকের কোন জমিই ছিল না; এবং তা'দিকে কোন জমিই দেওয়া হয় নি,

২,৫০,০০০ দিন মজুরের জনপ্রতি ১'৪৭ একরেরও কম জমি ছিল, ১০ লক্ষ ছোট ছোট কৃষক পরিবারের ছিল মাত্র ১'৪৭ একর হতে ৭ একর পর্যন্ত। মাইকেল ক্যারিক আরো দেখিয়েছেন যে, সমগ্র কৃষকের মধ্যে ৬ অংশকে ভাড়াটে মজুর হিসেবে খাটানো হ'ত এবং আর ৬ অংশ সম্পূর্ণরূপে ভূমিহীন কৃষক। এক কথায় ১৯২০ সালের আইনে শতকরা ৬৬ জন কৃষকের কোন উপকারই হয় নি।

হাঙ্গেরির সমগ্র ভূখণ্ডের ৬ অংশের উপর ছিল বড় বড় জমিদার ও ধর্মযাজকদের একচেটিয়া আধিপত্য। এই প্রকার জমিদারীর সংখ্যা ছিল ৪ হাজার এবং তাদের দখলে ছিল ২,৫০০ একর জমি থেকে আরম্ভ করে আরো বেশী—হাঙ্গেরির বড় বড় জমিদারীর মধ্যে ২৫টি জমিদারীর উপর সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত মালিকানা। এদের সব চেয়ে বড় জমিদার হলেন হাঙ্গেরির যুবরাজ পল এটজার হেজী এবং তাঁর দখলে ছিল ২,৯৮,০০০ একর জমি, আর হাঙ্গেরির ক্যাথলিক কালচার ফাণ্ডের দখলে ছিল ৪৫,০০০ একর জমি, এই ২৫টি বড় বড় জমিদারীর মধ্যে ১৬ টির মালিক ছিলেন হাঙ্গেরির বড় লোকেরা এবং বাকী ৯টি ধর্মশালা ও ধর্মযাজকদের কবলে। এই হ'ল একদিকের ছবি, আর অন্ড দিকে রয়েছে গৃহহীন, বস্ত্রহীন, ভূমিহীন লক্ষ লক্ষ কৃষিমজুর।

হাঙ্গেরির কৃষকদের অবস্থা ছিল আমাদের দেশের কৃষকদের মত। অন্ন-বস্ত্র-গৃহ-শিক্ষা বিবজ্জিত কৃষক সর্বত্রই রয়েছে সমাজের নীচের তলায়। বৎসরে কৃষকরা, যখন কাজ পায়, তখন তাদের দৈনিক আয় হয় মাত্র বিশ সেন্ট। হাঙ্গেরির অর্ধেকের বেশী লোকের এই অবস্থা। স্পেনের অন্নহীন, অর্ধ-বুড়ু ও সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারে জর্জরিত কৃষকদের মত হাঙ্গেরির কৃষকশ্রেণীও মুক্তির জন্ত প্রাণপণ সংগ্রাম করেছিল; কিন্তু তাদের কথা কেউ কানে তোলে নি। ১৯৪৪ সালে লালফৌজের প্রচেষ্টায় হাঙ্গেরিতে আসে সমাজ-বিপ্লব। সঙ্গে সঙ্গে রচিত হ'ল সামন্ততন্ত্রের সমাধি, হাঙ্গেরির ৮৫ লক্ষ জনগণের কেউ আজ উৎখাত অত্যাচারী জমিদারের কথা স্মরণ করে না।

১৯৪৫ সালে ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে যে আইন প্রণীত হয়, তাতে রয়েছে : (ক) গড়পড়তা প্রতি ফারমে ১৪২ একরের বেশী জমি রাখা যাবে না, (খ) নাগরিকদের যারা কৃষিকার্য করে এবং জমির সঙ্গে যাদের যোগাযোগ রয়েছে, তা'দিকে ২৮৪ একর জমি দেওয়া হবে, (গ) নাৎসীদের বিরুদ্ধে যে সব নাগরিক সংগ্রাম করেছে, বা মুক্তি আন্দোলনে যারা বিশেষ কাজ করেছে, তাদের মধ্যে জয়বটনের ভার একটা বিশেষ কমিটির হাতে থাকবে এবং কমিটির রায় অনুযায়ী তা'দিকে ৪২৬ একর জমি দেওয়া হবে, (ঘ) যে সব জমিদারীতে ১,৪২০ একরের বেশী জমি রয়েছে, সে সব

জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং পুরাতন মালিকদের ১৪২ একরের বেশী জমি দেওয়া হবে না, এই আইনের ফলে বড় বড় জমিদারী উৎখাত করা হয়। এইভাবে জমির উপর একচেটিয়া মালিকানা বজায় রেখে যারা নানা প্রকারে সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করেছিলেন, তাঁরা তার থেকে বঞ্চিত হলেন। বিপ্লবের ফলে বড় বড় জমিদার ও ধর্মযাজকেরা তাদের জমিদারী থেকে উৎখাত হলেন, সরকার প্রায় ১,৯০৫টি বড় বড় অট্টালিকা দখল করে এবং প্রায় ১১,০০০ ব্যক্তিগত পার্ক ও সরকারের দখলে আসে। এই সব বড় বড় অট্টালিকা আজ স্কুল, কলেজ, চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যনিবাস ও সরকারীদের জন্ত বিশ্রামাগারে পরিণত হয়েছে।

ভূমি-সংস্কার আইনে ক্ষতিপূরণের কথা রয়েছে, কিন্তু ক্ষতিপূরণের হার কত হবে, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কিছুই বলা হয় নি। ক্ষতিপূরণের জন্ত একটা বিশেষ ভাণ্ডার খোলা হবে, নতুন কৃষক মালিকদিগকে ১০ বৎসর ধরে এই ক্ষতিপূরণ ভাণ্ডারে কিস্তি করে টাকা দিতে হবে। কিন্তু প্রথম তিন বৎসর কোন টাকা দিতে হবে না, তবে ব্যরস্থা দেখে মনে হয় ক্ষতিপূরণের হার বেশী হবে না।

এই বিরাট বিপ্লবের ফলে দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ পরিবর্তন এসেছে, ভূমিহীন কৃষকের মুক্তি-সংগ্রামের এই অপূর্ণ সাফল্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ক্ষতি যে কিছু হয় নি, তা নয়। জমিদারদের যে সব যন্ত্রপাতি ছিল, তার অধিকাংশ নষ্ট হয়, দেশের প্রায় অর্ধেকেরও বেশী গরু ঘোড়া নষ্ট হয়, হাঙ্গেরির কৃষক নরনারী আজ নিজের হাতে চাষের কাজ আরম্ভ করেছে। যুদ্ধের পূর্বে যে পরিমাণ জমিতে চাষ করা হ'ত, ১৯৪৬ সালে তার শতকরা ৭০ ভাগ জমিতে চাষ করা হয়, কিন্তু যুদ্ধের অভাবে প্রধান প্রধান শস্তের উৎপাদনের হার যুদ্ধ-পূর্বে হার হতে অর্ধেক কমে যায়, অনেক ক্ষেত্রে আইন কার্য-করী হওয়ার আগে চাষীরা বিত্তর, জমি জোর করে দখল করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে চাষীরা আইন ভঙ্গ করে এবং সরকারকে বাধ্য হয়ে আইন সংশোধন করতে হয়।

সরকারী হিসাব মতে ধর্মশালা ও ধর্মযাজকদের দখলে ছিল মোট ১,৪২২,০০০ একর জমি, ভূমি-সংস্কার আইনের ফলে রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের হাত থেকে সরকার ১,১০৮,৭০০০ জমি বাজেয়াপ্ত করেন। এই জমির অর্ধেকের বেশী ছিল বন, আর বাকী অংশ চাষের উপযোগী। চার্চের অধীনে অনেক কয়লার খনিও ছিল। ফলের বাগান, আখুরের বাগান, এই সবই ছিল চার্চের আয়ের পথ এবং ভূমি-সংস্কার আইনের ফলে সরকারের দখলে এই সব আসে। হাঙ্গেরির বড় বড় জমিদারেরা চার্চের রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেছিলেন, চার্চের অধীনে অনেক স্কুল, কলেজ ও

বিভাগ ছিল, এতে লেখাপড়ার মোটামুটি বন্দোবস্ত ছিল। ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃপক্ষ অনেক দৈনিক, সপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করিতেন।

অভূতপূর্ব কৃষি বিপ্লবের ফলে যদিও লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন

• কৃষক জমি পায়, যদিও জমিদারী প্রথার অবসান হয়, তবুও হাদেরিতে আজ হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষক রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে ভাড়াটে কৃষকের দল, কৃষি-শ্রমিক ও ছোট ছোট কৃষি খামারের মালিক। শেষোক্ত কৃষক শ্রেণীর জমি এত কম যে, এতে তাদের জীবন যাপন করা সম্ভবপর নয়, ভূমি-সংস্কার আইনের পর প্রায় ৭,৫০,০০০ জন কৃষক রয়েছে এবং এই আইনে তাদের ভাগ্য বদলায় নি, সরকারও একথা স্বীকার করেন। জমি যথেষ্ট নাই বলে সকলকে সমান ভাবে জমি দেওয়া হয় নি।

কৃষি অর্থনীতিবিদদের মতে প্রতি কৃষক পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য ১২ই একর জমির আবশ্যক। যদিও জমিদারী ও সামন্ততন্ত্র উৎখাতের ফলে সরকারের হাতে যথেষ্ট জমি এসেছে, সে জমিই হাদেরির দরিত্রতা দূর করার জন্য যথেষ্ট নয়। জমি বন্টনের ফলে যারা জমি পেয়েছে, তারাও প্রতি পরিবার পিছু ১২ই একর জমি পায় নি এবং জমি নাই বলে তা সম্ভব হয় নি। ১,০৯,০০০ কৃষক পরিবার গড়পড়তা ১১০৯ একর জমি পায়। ২,৬১,০০০ জন ভূমিহীন কৃষক মোটামুটিভাবে ৬'৯ একর জমির মালিক হয়, ২,১৩,০০০

ছোট ছোট কৃষক পরিবারের গড়পড়তা ৫'৫ একর জমি বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তাতেও ১২ই একর হয় না, এখনও প্রায় এক লক্ষ কৃষকের পক্ষে জমিতে কাজ করার কোন সম্ভাবনা নাই।

বিরাট কৃষিবিপ্লব হয়ে গেল, জমিদারী প্রথা, সামন্ত-তান্ত্রিক স্বৈচ্ছাচারিতা, চার্চের অত্যাচার ও শোষণের সমাধি হ'ল, কৃষকদের মধ্যে জমি পুনর্বন্টন করা হ'ল, তবুও হাজার হাজার কৃষক জমি পায় নি; যারা পেয়েছে তারা উপযুক্ত পরিমাণে জমি পায় নি, এর মূল কারণ হচ্ছে জমির অভাব। এই সমস্যা কি ভাবে সমাধান করা যায়, তাহাই বুদাপেষ্ট কমিউনিষ্ট প্রভাবান্বিত সরকারের প্রধান সমস্যা। দেশের কৃষিব্যবস্থা সেকলে ধরণের। ট্রাক্টর নেই, ফার্টলাইজার নেই, আধুনিক বৈজ্ঞানিক কোন যন্ত্রপাতি হাদেরির কৃষকের হাতে নেই। জমিদারশ্রেণী কৃষিব্যবস্থাকে আধুনিক ধরণের করার কোন চেষ্টাই করেন নি। তা ছাড়া হাদেরির কৃষক-শ্রেণী সমবায় ও যৌথপ্রথা অনুযায়ী কৃষিকার্য চালানোর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্যক বুঝে উঠতে পারে নি। সরকার যৌথ ব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন কি না সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করেন নি। বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা ম্যালিনস রেকোশি এই ব্যাপারে এখনও নীরব। তবে সরকার যৌথ ও সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি-ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার বিষয় চিন্তা করছেন এবং তাতে এই সমস্যার সমাধান অনেকটা এগিয়ে যাবে।

## স্বাধীনতার পরে

### ক্রীলরতন দাশ

হুঃশাসনের নাগপাশ হ'তে মুক্তি লাভিল দেশ,  
এলো স্বাধীনতা বহুবাহিতা, পরাধীনতার শেষ।  
ব্যাকুল হৃদয়ে বসেছিহু মোরা আশায় বাঁধিয়া বুক,—  
স্বর্ণযুগের আগমনে সবে লাভিব স্বর্গস্থখ।

কিন্তু দেখি যে পিশাচেরা আজো হাসিছে অট্টহাস,  
নাগ-নাগিনীর গোপনে ফেলিছে বিষাক্ত নিখাস।  
শান্তির নীড় পল্লীকুটির ভাঙিছে গুণ্ডারাজ,  
বাস্তহারারা দলে দলে দেখি পথে পথে কঁাদে আজ।

এখনো যে দেখি নগর শহর আর্ন্ত অশোক বন,  
বন্দিনী সীতা লাক্ষিতা হয়ে কঁাদে সেখা অশ্রুধন।

রাজপথে চলে অর্ধনগ্ন বুকুক্ষিতের দল,  
ভিক্ষাপাত্র হাতে লয়ে তারা করে আজো কোলাহল।

স্বর্ণযুগের নিঃস্বেরা আজো স্বর্ণরেণু না পায়,  
ধনিকে বণিকে কান্ধন লুটে, বঞ্চিত ওরা হায়।  
সবহারাদের হাহাকার ধ্বনি এখনো যে শুনি আমি,  
হুঃগতিমাঝে হুঃভাগাদল কাঁদিছে দিবসযামী।

দেবতার তরে স্বর্গে এখনো মজুত হতেছে সুধা,  
মর্ত্য-মামুষ কণিকা তাহার পায় না মিটাতে ক্ষুধা।  
চিরবঞ্চিত নাহি পায় যদি মানুষ্যের অধিকার,—  
স্বধা তবে এত উৎসব, মিছে স্বাধীনতা-চীৎকার।

## পৃথিবীর বয়স

শ্রীদীলিপকুমার চক্রবর্তী

বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করার চেষ্টার বহু পূর্বেই প্রাচীন যুগের মনীষিগণ পৃথিবীর বয়স বের করার প্রণালী উদ্ভাবন করেছিলেন। এদের মধ্যে প্রথমে নাম করতে হয় পুরাকালের হিন্দুদের। তাঁদের গণনামুযায়ী পৃথিবীর জন্ম থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ১৯৭,২২,৪২,০৪৮ বৎসর কেটে গিয়েছে। এই গণনা আশ্চর্য্যকর ভাবে সঠিক। বর্তমান কালের অধিকাংশ ভূতত্ত্ববিদের মতে পৃথিবীর বয়স ন্যূনাধিক দুই শত কোটি বৎসর। যদি হিন্দু মনীষিগণ তাঁদের এই মতবাদ এবং গণনা ভূতাত্ত্বিক প্রমাণের উপর নির্ণয় করতেন তা হলে হয়ত পরের যুগের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এত মতভেদ ও তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হ'ত না।

কিন্তু অষ্টাবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এ বিষয়ে পশ্চিমের জনসাধারণের মন সংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। তারা বিশ্বাস করত মোজেস-বর্ণিত “ওল্ড টেস্টামেন্টে” লেখা পৃথিবীর জন্ম-কাহিনীতে। আর্কবিম্বপ উশারের মতামুযায়ী পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল ৪০০৪ খ্রিঃ পূঃ। তখনকার নবীন ভূতত্ত্ববিদগণ এই ধারণার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলে তাদের ধর্ম্মদেবী বলে বিক্রপ করা এবং ভয় দেখান হ'ত। এই ধর্ম্ম সংস্কার তাদের মনে সময় সম্বন্ধে কিরূপ ক্ষুদ্র ও অল্পদার মতের সৃষ্টি করেছিল তা বোঝা যায় নীচের দৃষ্টান্ত থেকে। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ এডমাণ্ড হ্যালি বুঝেছিলেন যে সমুদ্রের লবণত্ব (salinity) ক্রমেই বাড়ছে। তিনি ভেবেছিলেন যে যদি দু' হাজার বৎসর পূর্বের রোমানদের সময়ে সমুদ্রের লবণত্বের পরিমাপ জানা থাকত, তা হলে বর্তমান লবণত্বের সঙ্গে তুলনা করে সমুদ্রের বয়স নির্ণয় করা সম্ভব হ'ত। এতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, হ্যালি যদি পৃথিবীর বয়স কয়েক কোটি বৎসর বলে অনুমান করে থাকতেন তাহা হলে বুঝতে পারতেন যে দু' হাজার বছরে সমুদ্রের লবণত্ব এত সামান্য বেড়েছে যে তা মাপা সম্ভব নয়। অবশ্য তিনি একবার সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে “হয়ত পৃথিবীর বয়স আমরা যা অনুমান করছি তার চেয়ে অনেক বেশী।” ভূতাত্ত্বিক সময়ের বিশালতা ও সম্পূর্ণ অর্থ প্রথম অনুধাবন করেছিলেন আধুনিক ভূতত্ত্বের জন্মদাতা জেমস হার্টন।

এখন আমরা জানি যে পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত ক্রমাগত অন্ততঃ দশটি বিরাট পরিবর্তনের যুগ কেটে গিয়েছে। প্রত্যেক যুগের পরিবর্তন তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (১) প্রথমত ভূপৃষ্ঠের নিম্নের স্তরে (belt) ঘনীভূত হয়েছে তলানি (sediment) এবং আগ্নেয় শিলারাজী (volcanic rocks)।

(২) তারপর সেই স্তরে পড়েছে ভীষণ চাপ। ফলে দেখা দিয়েছে ভাঁজ ও সংকোচন। এরই সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তর হয়েছে গভীর নিম্নস্তরের শিলায় এবং জন্ম নিয়েছে বিরাট গ্রানাইটের স্তূপ। (৩) তৃতীয় অবস্থায় সেই স্তর ক্রমে ক্রমে উঁচুতে উঠেছে এবং আবরণমুক্তির (penetration) জন্ম সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে তার ক্ষয়। আল্পস ও হিমালয় পর্বত এখন এই পরিবর্তনের শেষ অবস্থায়। কশ ওয়াল ও ডেভনের পর্বতরাজী এখন দ্বিতীয় অবস্থায়। স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও নরওয়ের পর্বতশ্রেণী প্রথম অবস্থার উদাহরণ। এভাবে পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের চিহ্নগুলি পরীক্ষা করতে করতে যত দূরই আমরা অগসর হই না কেন তবুও জেমস হার্টনের ভাষায়, “আরম্ভের কোন নিদর্শনই পাই না”।

হার্টন কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে পৃথিবীর বয়স অনুমান করার কোন চেষ্টাই করেন নাই। ডারউইন কেণ্টের চূনাপাথরের ক্ষয়ের মাত্রা থেকে নিম্নস্তরের আবরণমুক্তির জন্ম কত বৎসর লেগেছে তার একটা মোটামুটি হিসাব করেছিলেন। তাঁর অনুমান ছিল প্রায় ৩০ কোটি বৎসর। আজ আমরা জানি যে এই অনুমান প্রকৃত সময়ের চেয়ে অন্ততঃ পাঁচ গুণ বেশী। ভূপদার্থবিদ্যার পথপ্রদর্শক কেলভিন পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ের জন্ম এক নতুন প্রণালীর প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে যখন পৃথিবী স্রষ্টা থেকে জন্ম নেয় তখন তা ছিল একটি প্রকাণ্ড অগ্নিগোলক। সেই বাষ্পীয় অগ্নিপিত্ত ক্রমে ক্রমে জমাট বেঁধেছে। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে তাপের প্রবাহ নির্ভর করে নিম্ন স্তরে উত্তাপের আধিক্য এবং শিলার তাপ পরিবহন ক্ষমতার উপর। তিনি বলেন যে বর্তমান “তাপক্রম” (temperature gradient) এর চেয়ে কম হ'ত যদি ভূপৃষ্ঠ ৪০ কোটি বৎসরেরও আগে ঘনীভূত হ'ত এবং এর চেয়ে বেশী হ'ত যদি ২ কোটি বৎসরের কম সময়ে ঘনীভূত হ'ত। অনেকেই কেলভিনের মতের বিরুদ্ধতা করেছিলেন। তবুও তিনি শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর বয়স ২ থেকে ৪ কোটি বৎসরের মধ্যে ধার্য্য করেন। কিন্তু আর্চিবল্ড ও জেমস গিকি দেখান যে কেলভিনের মতবাদ ভুল। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে দশ কোটি বৎসর ধরে ঠাণ্ডা হবার ফলেও কেবলমাত্র উপরস্থ এক পাতলা ভূস্তরই ঘনীভূত হবে। সেক্ষেত্রে আল্পস বা হিমালয়ের মত বিরাট পর্বতসমূহের অস্তিত্ব সম্ভব হ'ত না। কাজেই কেলভিনের পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই কোন গুরুতর ভুল আছে। পেরি মনে করেন যে পৃথিবীর অভ্যন্তর-



ভাগের তাপপরিবহনক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী—এ থেকে পৃথিবীর বয়স ৪০০ কোটি বৎসর বলে অনুমান করা যায়।

তবুও গত শতাব্দীর শেষভাগে অধিকাংশ ভূতত্ত্ববিদের মতে পৃথিবীর বয়স ছিল ১০ কোটি বৎসরের কম। কেলভিনের মতবাদে যা আসল ভুল তা ধরা পড়ে আরও কিছুদিন পর। লর্ড র্যালো দেখান যে ভূপৃষ্ঠের সমস্ত শিলাতেই রেডিয়াম আছে। কাজেই পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তাপ ছাড়াও শিলাসমূহ তেজস্ক্রিয় (Radioactive) পদার্থ হতে তাপ লাভ করছে। সেজন্য পৃথিবীর ঠাণ্ডা হতে যত সময় লাগত তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগছে। যদি ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়ে তাপপ্রবাহের দশ ভাগের নয় ভাগ তেজস্ক্রিয় পদার্থের জন্ম হয়ে থাকে তা হলে কেলভিনের দু থেকে চার কোটি হয়ে দাঁড়ায় ২০০ থেকে ৪০০ কোটি বৎসর।

এই সময় জলি প্রমুখ কয়েকজন ভূতত্ত্ববিদ হালির পদ্ধতি অনুসরণ করে সমুদ্রের বয়স নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তারা ধরে নেন যে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত গড়ে প্রতিবৎসরে একই পরিমাণ লবণ ভূখণ্ড থেকে সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত হয়েছে। এ থেকে তাঁরা হিসাব করেন যে পৃথিবীর বয়স হবে ৮ থেকে ১৫ কোটি বৎসরের মধ্যে। বর্তমানে নির্ভরযোগ্য ভূরাসায়নিক (Geochemical) তথ্য থেকে জানা গিয়েছে যে বৎসরে সমুদ্রে লবণের পরিমাণ বাড়ছে— $6 \times 10^9$  টন করে। সমুদ্রে লবণের বর্তমান পরিমাণ হ'ল  $1.5 \times 10^{15}$  টন। এখন যদি আমরা ধরে নিই যে সমুদ্রে লবণ পূর্বেও এই পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে তবে পৃথিবীর বয়স হবে ২৫ কোটি বৎসর। কিন্তু আমরা জানি বর্তমান কালের ভূতাত্ত্বিক অবস্থা প্রাচীন কাল হতে একেবারেই পৃথক। কাজেই বৎসরে যে পরিমাণ লবণ দ্রবীভূত হ'ত তারও নিশ্চয় পরিবর্তন ঘটেছে। এক্ষণ সমুদ্রের লবণস্থের পরিমাণ থেকে কখনই পৃথিবীর সঠিক বয়স নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।

পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত যত বৎসর কেটে গিয়েছে—এই মহাসময়ের পরিমাপ যদি আমরা করতে চাই তা হলে আমাদের এমন একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হবে যা পৃথিবীর জন্ম থেকে আরম্ভ হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার নিয়মগুলিও আমাদের জানা থাকা দরকার। তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাঙনই (disintegration) একমাত্র প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যা অনাদিকাল হতে অপরিবর্তিত ভাবে চলছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ হতে স্বতঃ বিস্ফোরণের ফলে (spontaneous disintegration) আলফা-কণা বা বিটা-কণা ও গামা-রশ্মি নির্গত হয়। এই ভাঙনের শেষ ফল সীসা। সম্পূর্ণ পরিমাণ সীসাই শিলায় জমা থাকে। যদি প্রাকৃতিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে পিচব্লেন্ড, ইউরেনাইট ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থগুলির কোন পরিবর্তন না ঘটে থাকে তা হলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ

হইতে উদ্ধৃত সীসার পরিমাণ নির্ভর করে ইউরেনিয়াম বা থোরিয়ামের বর্তমান পরিমাণ এবং খনিজ পদার্থটির বয়সের উপর। তেজস্ক্রিয় পদার্থ-উদ্ধৃত সীসা হতে সাধারণ সীসা পৃথক করা যায়। ইউরেনিয়ামে ইউরেনিয়াম ২৩৮ এবং ইউরেনিয়াম ২৩৫ নামক দুটি আইসোটোপ (Isotope অর্থাৎ একই রাসায়নিক প্রকৃতিবিশিষ্ট অথচ বিভিন্ন আণবিক ভরযুক্ত) আছে। ১৪০ ভাগ ইউরেনিয়ামে ১ ভাগ ইউরেনিয়াম ২৩৫ থাকে। কিন্তু ইউরেনিয়াম ২৩৫ ইউরেনিয়াম ২৩৮ এর চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি ভাঙে। কাজেই অতীতে এই দুই প্রকার ইউরেনিয়ামের অনুপাত বর্তমান অপেক্ষা বেশী ছিল। তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি এরূপভাবে ভাঙে :—

ইউরেনিয়াম ২৩৮—সীসা ২০৮ + ৮ হিলিয়াম

ইউরেনিয়াম ২৩৫—সীসা ২০৭ + ৭ হিলিয়াম

থোরিয়াম ২৩২—সীসা ২০৮ + ৬ হিলিয়াম

দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাঙনের ফলে ভিন্ন ভিন্ন আইসোটোপের উদ্ভব হয়। সাধারণ সীসা এই তিনটি আইসোটোপ এবং সীসা ২০৪ নামক আরও একটি আইসোটোপের সংমিশ্রণ। এই চতুর্থ আইসোটোপটি কোনও প্রকার তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাঙনের ফলে পাওয়া যায় না। কাজেই সীসাকে যদি তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আলাদা করে “ভর-বর্ণালী যন্ত্রের” (mass spectograph) সাহায্যে আইসোটোপীয় বিশ্লেষণ করে সীসা ২০৪ পাওয়া যায় তা হলে শোষণ পদার্থটির অনুপাত হতে প্রথমে কতরানি সাধারণ সীসা ছিল তা বের করা সম্ভব।

বর্তমানে তেজস্ক্রিয় পদার্থ হতে সীসা উৎপাদনের হার সঠিক ভাবে জানা আছে। কিন্তু স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে যে এই হার অতীত কাল থেকে আজ পর্যন্ত স্থির আছে কি? অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাঙনের প্রাকৃতিক হার (Physical constant) অপরিবর্তিত রয়েছে কি? এর উত্তর আমরা পাই প্লিওকোরিক জ্যোতির্বৃত্ত (haloes) থেকে। অনেক আনাইট পাথরে বাদামী অঙ্গের চূর্ণ পাওয়া যায়। শক্তিশালী অম্লবীক্ষণ দিয়ে এই অঙ্গচূর্ণ পরীক্ষা করে কতকগুলো কালো কালো বৃত্ত দেখা গিয়েছে। কালো ফুটকীগুলোর চারদিকে অনেকগুলো সুন্দর এককেন্দ্রিক বৃত্ত দেখা যায়। এই বৃত্তগুলোকে প্লিওকোরিক জ্যোতির্বৃত্ত বলা হয়। প্রত্যেক জ্যোতির্বৃত্তের কেন্দ্রে থাকে তেজস্ক্রিয় পদার্থের একটি ক্ষুদ্র ফটক। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে হিলিয়াম অণু বা আলফা-কণা নির্গত হয় তারাই এ কালো বৃত্তগুলো গঠন করে। প্রত্যেক বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ভর করে আলফা-কণার দূরত্ব ও গতিবেগের উপর। ১৯৪৩ সালে হেগারসন দেখিয়েছেন যে ১০০ কোটি বৎসরের পুরোণা প্রাগ-কেন্দ্রি যুগের জ্যোতির্বৃত্ত এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক জ্যোতির্বৃত্তের ব্যাসার্ধ ও গতিবেগ

সমান। এই ব্যাসার্ধ নির্ভর করে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাঙনের হারের উপর। কাজেই এ থেকে প্রমাণিত হয় যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাঙনের স্থিরাক্ষ অন্ততঃ ১০০ কোটি বৎসর যাবৎ স্থির আছে।

যে কোনও নির্দিষ্ট সময়ে সীসার কোন একটি আইসোটোপের উদ্ভবের হার নির্ভর করে ভাঙনের স্থিরাক্ষ এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থটির বর্তমান পরিমাণের উপর। কাজেই যদি সীসা ২০৬ ও ইউরেনিয়াম ২৩৮, সীসা ২০৭ ও ইউরেনিয়াম ২৩৫ এবং সীসা ২০৮ ও থোরিয়ামের অল্পপাত জানা থাকে তা হলে সহজেই সেই তেজস্ক্রিয় ধনিজ পদার্থটির বয়স নির্ণয় করা যায়। এই অল্পপাত থেকে নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহায্যে বয়স নির্ণয় করা হয়।

প্রথম অল্পপাত থেকে ধনিজের বয়স =  $1.5 \times 10^9$  লগ ১.

$$\frac{1 + 1.5 \times 10^9}{\text{ইউরেনিয়াম } 238} \text{ বৎসর।}$$

দ্বিতীয় অল্পপাত থেকে ধনিজের বয়স =  $2.7 \times 10^9$  লগ ১.

$$\frac{1 + 1.5 \times 10^9}{\text{ইউরেনিয়াম } 235} \text{ বৎসর।}$$

তৃতীয় অল্পপাত থেকে ধনিজের বয়স =  $8.6 \times 10^9$  লগ ১.

$$\frac{1 + 1.5 \times 10^9}{\text{থোরিয়াম } 232} \text{ বৎসর।}$$

এ ছাড়া সীসা ২০৭ ও সীসা ২০৬ এর অল্পপাত থেকেও বয়স বের করা সম্ভব। যদি ধনিজ পদার্থটির কোন পরিবর্তন না ঘটে থাকে তা হলে সবকয়টি অল্পপাত থেকে একই উত্তর পাব। কিন্তু সাধারণতঃ তা পাওয়া যায় না। যদি চারটি অল্পপাত হতে বিভিন্ন উত্তর পাওয়া যায় তা হলেও তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তা থেকে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করা সম্ভব। এই সম্বন্ধ অতি সহজেই তাদের লেখ (graph) থেকে পাওয়া যায়।

প্রক্সেসর এ. ও. নীলের বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া কতকগুলি তেজস্ক্রিয় ধনিজের আইসোটোপীয় বিশ্লেষণ করেছেন। কয়েকটি বিশ্লেষণের ফল দেওয়া হ'ল।

ম্যানিটোবার ইউরেনাইটের বয়স ১২৪'৫ কোটি বৎসর।  
প্রেগমার্টিট মোনাক্সাইটের বয়স ১২৫'০ " "  
প্রেগমার্টিট ইউরেনাইটের বয়স ১২৯ " "

এই বিশ্লেষণের ফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে ধনিজ পদার্থগুলি ন্যূনাধিক ২০০ কোটি বৎসরের পুরনো। পৃথিবীর বয়স নিশ্চয় এর চেয়ে বেশী। কাজেই পৃথিবীর ন্যূনতম বয়স ২০০ কোটি বৎসর বলে ধরা যায়।

পৃথিবীর বয়সে সর্বাধিক অল্পমান বার করতে হলে আমাদের মনে করতে হবে যে যখন পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল তখন এতে বিন্দুযাত্রণ সীসা ২০৭ ছিল না। এখন যে পরিমাণ সীসা ২০৭ আছে তার সমস্তটাই হয়েছে ইউরেনিয়াম ২৩৫ থেকে। গ্রানাইট পাথরে গড়ে প্রতি দশ লক্ষ ভাগে ২০ ভাগ সীসা এবং ৩'৫ ভাগ ইউরেনিয়াম আছে। এই সীসার বিশ্লেষণ থেকে উপরোক্ত সমীকরণের সাহায্যে পৃথিবীর বয়স ৫৪০ কোটি বৎসর বার হয়েছে।

আর্থার হোমস্ (১৯৪৬) এর মতে পৃথিবীর বয়স আরও সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। সীসার বিশ্লেষণের ফলের লেখ অঙ্কন করে সীসার তিনটি আইসোটোপের মধ্যকার সম্বন্ধ জানা গিয়েছে। ২'৫ থেকে ১৩৩ কোটি বৎসরের পুরোনো তেজস্ক্রিয় ধনিজ পদার্থগুলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ থেকে পৃথিবীর আদিম সীসায় সীসা ২০৭ ও সীসা ২০৬ এর আপেক্ষিক অল্পপাত জানা গেছে। আরও জানা গেছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ-উদ্ভূত সীসা সাধারণ সীসায় মিশ্রণের পূর্বে কত সময় কেটেছে। এই সব ফলের লেখ অঙ্কন করে পৃথিবীর বয়সের অনেকগুলো উত্তর পাওয়া গেছে। এই সমস্ত উদ্ভবের গড় ৩৩৫ কোটি বৎসর। কাজেই বর্তমানে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সঠিক নির্ণয় অনুসারে “ধনধাতু পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা”র সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে ৩৩৫ কোটি বৎসর পূর্বে।\*

\* এই প্রবন্ধ রচনায় আর্থার হোমস্-এর লেখা প্রবন্ধ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

## বাসন্তী ঘৃত

বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত

টেলি:—বাসন্তী ঘি কোন বি.বি. ৫৭৩৮ পো: বঙ্গ ৬৮৩৬ কলি

ঘি, সুগারমার্কেটস, এক্সপোর্টারস, ইম্পোর্টারস ও  
জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ারস

প্রমথনাথ পাল এণ্ড সন্স

২সি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা—৭

## পুস্তক - পারিচয়

বাংলার ভাস্কর্য — শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। আশুতোষ চিত্রশালা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৪৭। মূল্য দুই টাকা। পৃঃ ৪৪ + ১০ + ১৮ খানি ছবি।

আলোচ্য পুস্তিকাখানিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালায় অবস্থিত মূর্তিগুলিকে আশ্রয় করিয়া গ্রন্থকার সমগ্র বাংলার ভাস্কর্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় সাধারণ পাঠকের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। কল্যাণবাবু বিভিন্ন শিল্পধারার পরিচয় দিয়া অথবা চিত্রিত মূর্তিগুলির ভাবসৌষ্ঠব বিশ্লেষণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; বাঙলার রাজনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাসের উত্থানপতনের সহিত শিল্পের কি সম্বন্ধ ছিল তাহাও সংক্ষেপে নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

লেখার সম্পর্কে একটি কথা মাত্র বলিবার আছে। স্বল্পপরিমিত পুস্তিকায় বহু বিষয় একত্র পরিবেশনের ফলে স্থানে স্থানে বিশ্লেষণ অথবা ইঙ্গিত সাধারণ পাঠকের উপযোগী না হইয়া কেবলমাত্র অনুভবী রসজ্ঞ পাঠকের উপযুক্ত হইয়াছে। আরও লঘুপাক খাণ্ড রচনা করিলে সাধারণ পাঠক, অথবা বিশেষ করিয়া স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীস্বদের বেশী উপকার হইত বলিয়া মনে হয়।

বইখানির ছবি ও ছাপা ভাল; কিন্তু মূল্য কিঞ্চিৎ বেশী মনে হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিনা লাভে, অথবা কিছু লোকসান দিয়াও, একরূপ শিক্ষাপ্রদ পুস্তিকার বহুল প্রচারের আয়োজন করা ক্তব্য।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

দিনান্ত — শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য। পূর্বাশা লিমিটেড। পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ৩০ টাকা।

পিতৃকেন্দ্রিক (Patriarchal) একটি সংসারের ভ্রমপরিণতির মধ্য দিয়া লেখক কতকগুলি সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা উত্থাপন করিয়া নিজের ধারণা অনুযায়ী সেগুলির সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার বলিবার মোহা কথাটা এইরূপ মনে হইল যে, এরূপ সংসারে একজনের কতৃৎসের চাপে আর সবারই জীবন পঙ্গু হইয়া পড়ে। ব্যক্তিগততত্ত্বাদেয় যুগে খিয়েরটার একটা মোহ আছে, হয়ত অবস্থান্তরে খানিকটা সত্যও; কিন্তু লেখক তাহার প্রতিপাদ্যটিকে ঠিক ভাবে সপ্রমাণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। গৃহস্থামী অবনীবারু বৃহৎ, এক কারখানার মালিক, নিজের চেষ্টাতেই তিনি এটি

## কৃত্তিবাস রচিত

# সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

স্বনামধন্য ব্রাহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

সুবিখ্যাত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকৃষ্ট

অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইল

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রাক্ষিপ্ত অংশবর্জিত মূলগ্রন্থ অনুসারে ৫৮৬ পৃষ্ঠায় সুসম্পূর্ণ। ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের আঁকা রঙীন ষোলখানি এবং এক বর্ণের তেত্রিশখানি শ্রেষ্ঠ ছবি আছে। রঙীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিত্রশালা হইতে সংগৃহীত ছবির অনুলিপি। অন্যান্য বহুবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্রাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রবি বর্ম্মা, নন্দলাল বসু, সারদাচরণ উকীল, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধূরন্ধর, অসিতকুমার হালদার, স্বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র দে প্রভৃতির স্থনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত।

জ্যাকচেটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইণ্ডিং মূল্য ১০।০, প্যাকিং ও ডাকব্যয় ১

প্রবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতে পাইবেন। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে না। গ্রাহক নম্বরসহ সম্বন্ধ আবেদন করুন! এই সুযোগ সর্বপ্রকার দুর্ব্যয়ের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না।

প্রবাসী কার্যালয়—১২০১২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

গড়িয়া তুলিয়াছেন; স্বভাবত তিনি একজন দৃঢ়চিত্ত “পুরুষ-সিংহ”ই। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের মধ্যে সেই অত্যাচারী ‘টাইরেট’কে পাওয়া গেল না যাহার দ্বারা অস্ত্রের জীবনের উপর একটা অস্বাস্থ্যকর প্রভাব না পড়িয়াই পারে না। এইজন্য যে ‘চরিত্রগুলির জীবনে লেখক ব্যর্থতার ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, মনে হয় সেগুলি প্রধানত নিজের নিজের দুর্বলতায় বা অবস্থা-বিপর্যয়েই ব্যর্থ হইয়াছে। সুতরাং লেখকের প্রতিপাত্তও এই পরিমাণে হইয়াছে ব্যর্থ, শুধু অর্থাই যৌথ পরিবারের উপর তাঁহার একটা আক্রমণের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

খিয়েরীর এই অংশটুকু বাদ দিলে বইখানি সুখপাঠ্যই। লেখক ক্ষমতাবান, সহিতাক্ষেপে সুপরিচিত, তবে ক্ষমতার মাঝে মাঝে অপচয় ঘটাইয়াছে—সংলাপ এক এক স্থানে একটু দীর্ঘ ও ক্লাস্তিকর হইয়া পড়িয়াছে।

বইখানির বাহ্যমোষ্ট্য ভালই, ছাপার ভুল কিন্তু স্থানে স্থানে মারাত্মক।

### শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

অপরাধ বিজ্ঞান—দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল, এম-এস-সি। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।  
অপরাধ বিজ্ঞান প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ এবং জ্ঞান দুই-ই লাভ করিয়াছিলাম। আলোচ্য খণ্ডে নানারূপ অপরাধের পদ্ধতিসমূহ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কয়েকটি অপরাধ, যেমন পকেটমারী, বীড গ্যামব্লিং প্রভৃতি, কি উপায়ে সংঘটিত হয় সে সম্বন্ধে সাধারণের কিছু জানা থাকিবার কথা নহে। কি প্রকার সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক এবং কিরূপ সংরক্ষণভাবে এই সব অপরাধ সংঘটিত হয় গ্রন্থকার তাহা আমাদের স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বলিবার ভঙ্গী বড়ই মনোরম। বর্ণনাগুলি তাই মনে একটা স্থায়ী ছবি আঁকিয়া দেয়।

মনোবিজ্ঞান দিক হইতে অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই অপরাধসংক্রান্ত তথ্যগুলি সংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজন। গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তথ্যগুলি সংকলন করিয়াছেন। মনোবিদদের নিকট তাই এই পুস্তকখানির যথেষ্ট দাম আছে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সকলেই যদি অপরিচিত লোকের সহিত মেলামেশা করিবার সময় কথঞ্চিৎ সাবধানতা অবলম্বন করেন তাহা হইলে বহুবিধ অসুখা ক্ষতির হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

নিজ্ঞান মন—ডাঃ মণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—সংস্কৃতি বৈঠক, বালিগঞ্জ। মূল্য ২০০ টাকা।

শ্রীযুক্ত মণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মানসিক রোগ-চিকিৎসায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন এবং আলোচ্য পুস্তকখানিতে সে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। জটিল মানসিক ঘটনাসমূহ এবং কয়েকটি মানসিক রোগের কারণ, নিদান প্রভৃতি সম্বন্ধে সহজবোধ্য সরল ভাষায় তিনি হৃদয়-ভাবে পুস্তকখানিতে আলোচনা করিয়াছেন। মানসিক ব্যাধি বিষয়ে এই ধরণের পুস্তক বাংলাভাষায় আর নাই বলিলেও চলে। পুস্তকখানি পড়িয়া বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ লোক সকলেই উপকৃত হইবেন বলিয়া মনে করি। সহজভাবে লিখিত বলিয়া পুস্তকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কোথাও ব্যাহত হয় নাই। দাম্পত্যজীবন, মৃত্যু প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সকলের মনেই চিন্তার ধোরাক ঘোঁরাইবে। আমাদের দেশে মনঃ-সমীক্ষণের প্রথম পথপ্রদর্শক শ্রীগিরীন্দ্রেশ্বর বসু মহাশয় পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

“নিজ্ঞান মনের” বহুল প্রচার, বিশেষভাবে মনোবিজ্ঞা অধ্যয়নকারী ছাত্রদের মধ্যে হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়।

শ্রীমুহুৎ ১৫ মিত্র

## নেতাজীর অনুসরণে :—

বাংলার বিখ্যাত স্বত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার “শ্রী” মার্কা স্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিম্নপ্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ স্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা স্বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীমুভাষচন্দ্র বসু

## সমুদ্রের স্বাদ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিড়খিত মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যর্থতাকে উপজীব্য করে লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেরোটি নিখুঁত ও বলিষ্ঠ গল্পের সংকলন। জরাগ্রস্ত ও ভাঙনোমুখ সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর নিষ্পেষণে কাতর সাধারণ মানুষের হাসিকান্না ও স্বপ্নভঙ্গের বিচিত্র রূপায়ণ। দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম ৩।০

## অন্নদাতা

কৃষ্ণ চন্দ্র

তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ-লাঞ্ছিত বাংলায় মানবতার অপমৃত্যু ঘটাবার জন্য ষড়যন্ত্রের কাহিনী। কৃষ্ণ চন্দ্রের বলিষ্ঠ লেখনীতে পদদলিত জীবনবোধ ও নীতিবাদের বীভৎস বিকৃতির প্রতিফলন। অল্পবাদ করেছেন অবন্তী সান্তাল। দাম ১।০

## নবজাতক

ম্যাকসিম গোর্কী

ম্যাকসিম গোর্কীর সাতটি শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন। নিপীড়িতের যে অন্তর্জ্বালা পুঞ্জীভূত হয়ে দাবানলের সৃষ্টি করে গোর্কীর প্রতিটি চরিত্র সেই অন্তর্জ্বালারই মূর্ত প্রকাশ। অল্পবাদ করেছেন নীহার দাশগুপ্ত। দাম ৩।০

## মানবিক ও পরমাণবিক

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

আণবিক শক্তির একচেটিয়া মালিকানা করায়ত্ত করে ধ্বংসলীলার আড়ালে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পৃথিবীব্যাপী রাজ্যবিস্তারের ষড়যন্ত্রের তথ্যপূর্ণ আলোচনা। দাম ২।০



ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস

ডিভ লা ফ্রান্স!

১৯৪০ সালের ১৪ই জুন। অগ্ন্যাশ্রয় ঐতিহাসিক দিনগুলির মত এই দিনটিও পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে—বিল্লের মর্খাদা নিয়ে নয়—প্রতিবিল্লের কদর্য দলিলের কলহ নিয়ে। সেদিন প্রতিক্রিয়ার কাছে ফরাসী দেশের মানুষ আত্মসমর্পণ করল বটে কিন্তু নতুন এক ইম্পাত কাটিয়ে দৃঢ় হয়ে উঠল তারা। বিধাসম্বাদকতা ও ষড়যন্ত্র, নিষ্ক্রিয়তা ও স্বার্থপরতার পটভূমিকে আশ্রয় করে অভ্যাসচর্চা শিল্পোৎকর্ষতার সঙ্গে এই বিরাট উপস্থাস্থানি রচনা করেছেন ইলিয়া এরেনবুর্গ। অল্পবাদ করেছেন অমল দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র মজুমদার ও অনিলকুমার সিংহ। তিনটি পৃথক খণ্ডের দাম যথাক্রমে ৪১, ৩১, ৪১। একত্রে ১১১। ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড ৩০, চৌরঙ্গী রোড :: কলিকাতা ১৬

## পুতুলনাচের

ইতিকথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ পরিণত সাহিত্যসৃষ্টি দীর্ঘদিন ধরে আত্মবিশ্লেষণ ও অবিচ্ছিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণাম। তাঁর এই অন্তর্দ্বন্দ্বের শুরু 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য়। দুর্বল, নিরীহ মানুষের ওপর শক্তিশালী হৃদয়হীন সমাজের অকথ্য নিষ্পেষণের মর্মান্তিক ও রসঘন কাহিনী। মাখন দত্তগুপ্ত চিত্রিত অভিনব প্রচ্ছদপটভুক্ত দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম ৫.০

## ছোটদের বই

সকল দেশের সেরা

ব্রজেননাথ ভট্টাচার্য

ভবিষ্যৎ ভারতের ত্রাণকর্তা ও রক্ষক যারা তাদের সঙ্গে এই মহান দেশে আন্তরিক যোগাযোগের উদ্দেশ্যে গল্পের মত মনোরম ভঙ্গীতে লেখা ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিচয়। সূর্য রায়ের অজস্র ছবি। দাম ২।৫

ঘুমতাড়ানী ছড়া

সুকান্ত ভট্টাচার্য ও অন্যান্য

ছোটদের অপরূপ ছড়ার বই। ভারত-ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনার ওপর মজাদার সব ছড়া কেটেছেন চারজন খ্যাতনামা কবি। পাতায় পাতায় সূর্য রায়ের আঁকা আরও মজাদার সব রঙ্গীন ছবি। স্বদেশের ঘুমতাড়ানী কাহিনী বাংলার কিশোর-কিশোরীদের চোখ থেকে ঘুমকে সত্যিই তাড়াবে। দাম ৩

## কবিতার বই

সম্মতীপের চর—বিষ্ণু দে

২১

ছাড়পত্র—সুকান্ত ভট্টাচার্য

১১০

রবীন্দ্রনামা—প্রভাত বসু সম্পাদিত

১১০

ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড

৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৬



**আলালের ঘরের দুলাল**—টেকচাঁদ ঠাকুর। ত্রিভুজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ত্রিমজীকান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

টেকচাঁদ ঠাকুর—পারীচাঁদ মিত্রের ছদ্মনাম। এই ছদ্মনামেই তিনি বিখ্যাত। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ‘আলালের ঘরের দুলাল’ প্রকাশিত হয়। বঙ্গিমচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে, “তিনিই প্রথম দেখাইলেন সাহিত্যের একত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে।...প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি ‘আলালের ঘরের দুলাল’।...‘যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কতৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ-প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন।’” যুগসন্ধিকালের এই অমূল্য উপস্থানের একখানি প্রামাণিক সংস্করণ বাহির করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সাহিত্যপ্রিয় পাঠকের এক মহত্বপূর্ণ সাধন করিলেন। গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় গ্রন্থের দুইট সংস্করণ হইয়াছিল। সম্পাদকদ্বয় দ্বিতীয় সংস্করণকেই আদর্শ ধরিয়া পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন। যে চিত্রগুলি ছাপা হইয়াছে তাহাও এই সংস্করণ হইতে গৃহীত। গোড়ায় সম্পাদকদ্বয় কতৃক লিখিত একটি তথ্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। পরিশিষ্টে দুইরূপ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ ও অবহুপ্রচলিত প্রবাদবাক্য ও শব্দবিশ্তাদের নিদর্শন দেওয়া হইয়াছে।

**সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বসু, বিহারীলাল**

**চট্টোপাধ্যায়**—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৬৭। ত্রিভুজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয়গণের মধ্যে তিনিই প্রথম সিবিলিয়ান। বোম্বাই ছিল তাঁহার কন্ডস্থল। সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম ঠাকুর-বাড়ীর অবরোধ-প্রথা উচ্ছেদে যত্নবান হন। হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে সত্যেন্দ্রনাথ রচিত যে জাতীয় সঙ্গীত (‘মিলে সব ভারত সন্তান’) গীত হয়, তৎসম্বন্ধে বঙ্গিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শন’ে লিখিয়াছিলেন, “এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক।”

নাট্যকার অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠাতাদের অন্তর্গত। তাঁহার নাটক-গ্রন্থসমূহ খ্যাতি বহুবিস্তৃত। হান্তরস-প্রস্টা হিসাবে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯০১) বহু নাটকের রচয়িতা। তন্মধ্যে ‘রাবণ-বধ’, ‘নন্দবিদায়’ প্রভৃতি নাটকে সুখণ্ড অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি ‘বেঙ্গল থিয়েটার’ের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন এবং হৃদয়ক অভিনেতা হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল।

**শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা**

**যাত্রী**—শ্রীশ্রীমাপদ চট্টোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

কাব্যখানিতে মৌলিকতা ও রসবোধের পরিচয় আছে। অতি অধুনিকতার মোহ হইতে মুক্ত হইলে গ্রন্থকার উচ্চস্তরের সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি।

**অস্তরঙ্গা**—শ্রীরাইহরণ চক্রবর্তী। বীণা লাইব্রেরী, কলিকাতা।

কবিতাগুলিতে আন্তরিকতা ও মাধুর্য আছে। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের সহিত আশ্রয় ও ভরসা করি, কবির স্বপ্নের মুকুল একদিন পূর্ণ বিকাশ লাভ করিবে এবং কেবল মধু নয়, সৌগন্ধ্যও বিস্তার করিবে।

**শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**

**বিদ্রোহী ভারত (প্রথম পর্ব)**—নীহাররঞ্জন গুপ্ত, সবুজ সাহিত্য আয়তন; পরিবেশক—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা। ১৭০ পৃষ্ঠা; মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষের বুকের উপর জগদল পাথরের মত চাপিয়া ছিল, কিন্তু বিদেশীর নিমর্ম শোষণ ও পেথনে মুহূর্তমান দেশে প্রাণশক্তি একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। বিদেশীর কবল হইতে হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা, যাহা মূক্তি-সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত না হইয়া শাসকের ইতিকথায় বিদ্রোহ আখ্যা পাইয়াছে—তাহারই ধারাবাহিক কাহিনী এ পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। পলাশী, মীর কাশিম, মহারাজ নন্দকুমার, টিপু-সুলতান, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, গুর্খা বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ—এই সকল কাহিনী ১৯৪৭ সালের পটভূমিকায় এক কাল্পনিক উপস্থানের মধ্য দিয়া মনোজ্ঞভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

নীহাররঞ্জন কিশোর-মহলের প্রিয় লেখক। তাঁহার লেখনীর গুণে ইতিহাসের কাহিনীগুলি জীবন্ত ও সরস হইয়া উঠিয়াছে; ভারতের মুক্তি-পূজারী বীরসুন্দের কীর্তিকলাপ, দেশদ্রোহী স্বার্থবেষীর হীন যড়যন্ত্র ইত্যাদি চলচ্চিত্রের মত পাঠকের মনশ্চক্ষুর সমুখে ভাসিয়া উঠে, ঘটনার প্রবাহ তাহাকে টানিয়া লইয়া চলে। বর্ণনার কোশলে ইতিহাসও উপস্থানের মত চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। ঐতিহাসিক কাহিনীকে নাটকীয়তায় সাজাইয়া পরিবেশন-নৈপুণ্যের পরিচয় লেখক দিয়াছেন, বাস্তব সভ্য

## মাতৃমন্দির

২৬-এ, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা

গর্ভাবস্থায়, নিরাপদে থাকা, প্রসব এবং

শিশু রক্ষার সুব্যবস্থা করা হয়।

মানদা দেবী, লেডী সুপারিন্টেন্ডেন্ট

**ডাক্তার পালের ভীম বটিকা**

সেবনে স্নায়ুদৌর্বল্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, মাথাঘোরা, অন্ন, অজীর্ণ, শক্তিশীনতা, বাত, বেদনা, অনিদ্রা, বহুমূত্র বা ডায়েবেটিস ইত্যাদি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাভাৱে নিরাময় হয়। ভীম বটিকা বলকারক, রক্ত-পরিষ্কারক ও শক্তিবর্ধক। ১ শিশি ব্যবহারে অতি আশ্চর্য্য ফল পাইবেন। ১৫ দিবসের ঔষধ মূল্য প্রতি শিশি ৩ টাকা। ভিঃ পিঃ বস্ত্র।

**ডাক্তার পালের খাঁটি পদ্মগন্ধ**

ব্যবহারে চক্ষুর ছানি, চক্ষু লাল হওয়া ও জলপড়া, চক্ষু ক্ররকর করা ইত্যাদি সর্বপ্রকার চক্ষুরোগ সম্পূর্ণ স্বাভাৱে আরোগ্য হয়। মূল্য এক ড্রাম শিশি ১১০, দুই ড্রাম শিশি ২১০ টাকা। ভিঃ পিঃ বস্ত্র।  
**প্রাপ্তিস্থান:**—১। পাল ফার্মেসী, ৩০ নং বোম্বাজার স্ট্রিট, কলিকাতা।  
 ২। এল. এন্স. মুখার্জী এণ্ড সন্স—১৬৭ নং ধর্মতলা স্ট্রিট, কলিকাতা।  
 ৩। যমুনালাল এণ্ড কোং—চাঁদনী চক, দিল্লী।  
 ৪। কিং মেডিকেল হল—২৫ নং আমিনাবাদ পার্ক, লাহো।

জীবনানন্দ দাশের কবিতার বই

## মহাপৃথিবী

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে মাত্র কয়েকজনই এমন লেখক আছেন যাদের সৃষ্ট সাহিত্য-শিল্প শুধু কবিতার গভীরতাই আবদ্ধ—একমাত্র কবিতার বাহনই তাঁরা নিজস্বের জীবনবোধ পাঠকের কাছে উপস্থিত করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জীবনানন্দ দাশ। কাজেই আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনার জীবনানন্দ দাশ সর্বাগ্রগণ্যতার দাবী জানাতে পারেন। প্রকৃতিধর্মী, আবেগপ্রধান মন নিয়ে তিনি এই শতাব্দীর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন—বিশ্ব শতাব্দীর বিশ্বসত্যতা একজন বাঙালী কবির মনে যে ভাব, বোধ, কল্পনা, নৈরাশ্র, প্রশ্ন ও যীমাংসা লাগাতে পারে ‘মহাপৃথিবী’তে তারই ধ্বনি শোনা যায়। দাম দেড় টাকা ॥

দিনেশ দাসের কবিতার বই

## কবিতা (১৩৪৩-৪৮)

উনার দৃষ্টিভঙ্গি দিনেশ দাসের কবিতার একটি বড় গুণ, তার সঙ্গে মিশেছে আঙ্গিকের কল্পকাব্য, ছন্দের বঙ্কর। ফলে, কবিতাগুলো একদিকে যেমন যুক্তিবহু হয়েও অমৃতুতির গভীরতায় নিবিড়, অন্যদিকে তেমনি গঠন-নৈপুণ্যে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। দাম এক টাকা দুই আনা ॥

গোপাল ভৌমিকের কবিতার বই

## স্বাক্ষর

গোপাল ভৌমিকের কবিতার সঙ্গে পরিচয় নেই আধুনিক বাংলা কাব্যের পাঠকদের মধ্যে এমন একজনকেও হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। ‘স্বাক্ষর’ তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ। হুতরাং গোপাল ভৌমিকের কবিতাবলীকে একত্র পেতে হলে ‘স্বাক্ষর’ গ্রন্থটি সংগ্রহ করতেই হবে। দাম এক টাকা ॥

অজয় ভট্টাচার্যের কবিতার বই

## সৈনিক

ও অন্যান্য কবিতা

যে-কাব্য প্রেরণার বর্তমান যুগের অধীকৃতি নেই—তেমন বস্তু বাংলা সাহিত্যে সত্যিই দুলভ। অজয় ভট্টাচার্য্য সেই দুলভ কাব্য-প্রেরণার অধিকারী ছিলেন। তাঁর ‘সৈনিক’ এ-যুগের ‘সৈনিক-মানুষের’ অমৃতুতি দিয়েই তৈরী—সে বিরাট ও ব্যাপক অমৃতুতি হুঃসহ বর্তমানকে ভেঙে ওঁড়িয়ে দিয়ে একটি উজ্জ্বল প্রভাতের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম দেড় টাকা ॥

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতার বই

## সঙ্কলিতা

বস্তুজগতের তেমনাকে অধীকার না করেও যে, স্বকোমল স্বদয়ামৃতুতিকে কাব্যরূপে প্রকাশ করা সম্ভব, তার প্রমাণ ‘সঙ্কলিতা’। কমল-যুগের পর বাংলা কবিতা যে-ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে তার প্রকৃত গতির নির্দেশ পেতে হলে প্রত্যেক কাব্যরসিককেই ‘সঙ্কলিতা’র সাহায্য নিতে হবে। তাছাড়া, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা তাঁর সাহিত্যের প্রধান দাবীদার না হোক, প্রথম দাবীদার মনেই নেই। ‘সঙ্কলিতা’ তাঁর প্রথম দশ বৎসরে রচিত শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্কলন। পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম দুই টাকা ॥

নতুন দিন

আট আনা

যৌবনোত্তর

আট আনা

অজিত দত্তের কবিতার বই

## পুনর্নবা

রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা কাব্যসাহিত্যের গতিকে অক্ষুর রাখবার দায় গ্রহণ করেছিলেন যে কয়জন আধুনিক কবি, অজিত দত্ত তাঁদের অন্যতম, এবং স্বকীয় সাধনায় তিনি আজ অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকৃত হয়েছেন। হুতরাং আধুনিক বাংলা কাব্যের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে অজিত দত্তের সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ ‘পুনর্নবা’ অবশ্যই পড়তে হবে। দাম দেড় টাকা ॥

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য কর্তৃক আলোচিত

## তিনজন আধুনিক কবি

‘কমল’ ‘কালিকলম’ ‘প্রগতির’ দ্বারফৎ বাঙালী পাঠকসমাজ প্রথম জানতে পেরেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ ছাড়াও সাহিত্যের অল্প আদর্শ আছে। সেই অল্প আদর্শ নিয়ে সে-যুগে অনেক নতুন কবির আবির্ভাব হয়। জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু তাঁদের অন্যতম। এই তিনজন কবি সে যুগ থেকে স্বর করে আজ পর্যন্ত কবিতা লিখে চলেছেন। সাম্প্রতিক কবিতার উৎসাহী পাঠকদের জানা উচিত যে সাম্প্রতিক কবিদের ঠিক পেছনে কাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন। রবীন্দ্রোত্তর কবিতায় যেহেতু এঁরা তিনজনই শুধু জীবন্ত শক্তি, তাই এঁদের কবিতার আলোচনা দিয়েই বইটি সম্পূর্ণ। দাম নয় আনা ॥

শৈলেন ঘোষের উপস্থাপন

## তিনরঙ

বাংলার গ্রাম বাঙালী সাহিত্যিকের রচনায় যে-মমতায় যে-রঙে ফুটে ওঠে তার তুলনা নেই—শৈলেন ঘোষ সেই দলেরই লেখক যাদের চোখে বাংলার গ্রামের জীবন্ততা অক্ষুরন্ত। তাঁর ‘তিনরঙ’ উপস্থাপনানিতে বাংলার সেই গ্রামই একটি মেয়ের চরিত্রে প্রতিবিম্বিত—যে মেয়ে ফুরিয়ে যেতে জানে না। দাম দুই টাকা ॥

পূর্বাশা প্রকাশিত অন্যান্য বই-এর তালিকা সংগ্রহ করুন

প্রকাশক :

পূর্বাশা লি মি টে ড—পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩

উপস্থাসের মত সরস হইয়াছে, কিন্তু একটি কাল্পনিক উপস্থাস ইহার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়ার কোন সার্থকতা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সত্য ও কল্পনার সংমিশ্রণ না ঘটাইলেও, পাক রঙ ও জল-রঙের আলপনা ক সঙ্গে না দিলেও তাঁহার গল্প বলার ভঙ্গীর চমৎকারিত্ব ও আকর্ষণ কিছুমাত্র কমিত না, বরং ভেজালশূন্য হওয়ায় আরও উপাদেয় হইত। উপস্থাসের সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত করা হয় নাই।

মুখ্যতঃ কিশোরদের জন্য রচিত পুস্তকে 'গোপনে নারী-মানসের বেচাকেনা' ধরণের কথা না থাকাই বাঞ্ছনীয়। পুস্তকে কয়েক স্থানে '৫৬ গণিত বাহিনী', '১১ গণিত বাহিনী' প্রভৃতি কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। 'গণিত' শব্দের পরিবর্তে 'সংখ্যক' অথবা শুধু '৫৬ নম্বর', '১১ নম্বর' ইত্যাদির প্রয়োগ হঠাৎ হইত বলিয়া মনে করি। বিদ্রোহী ভারত প্রথম পর্ব পাঠ করিয়া কিশোর পাঠকপাঠিকা দ্বিতীয় পর্বের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিবে, সন্দেহ নাই। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদপট চমৎকার।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ্র

শ্রীশ্রীযুগাচার্য্য সঙ্গ ও উপদেশায়ত—(প্রথম খণ্ড)  
"শ্রীশ্রীপ্রবাস্তরঙ্গ" সম্পাদিত এবং ২১১ নং রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। (১৮/০ + ৪ + ৩০৮ + ৪০) পৃষ্ঠা—মূল্য দুই টাকা আট আনা।

স্বামী প্রবানন্দ তাঁর ভক্তমণ্ডলীতে যুগাচার্য্য বলে বিশেষিত। আমরা তাঁকে একজন স্বজাতিপ্রিয়, স্বধর্মনিষ্ঠ, স্বদেশহিতৈষী বিশিষ্ট কল্পবীর ও তপস্বীরূপেই দেখেছি এবং তাঁর জীবনভরা অবিরাম আচরণে সেই মহান রূপ ফুটে উঠেছে। তিনি তরুণদের প্রাণে কঠোর ত্যাগ তপস্বী ও সশ্রদ্ধ সেবার ভাব জাগাবার জন্য আশ্রমে, তীর্থে, গ্রামে, নগরে ঘুরে

ঘুরে অনুরাগীদের, তথা জনসাধারণের কাছে যে সব সারগর্ভ অমূল্য উপদেশ প্রাণমাতানো ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে ভাগবত নন্দীতত্ত্বগান, বেদবাণী কীর্তন ও পাঠ করেছেন সে সবেরই কতক এই প্রথম খণ্ডে পরিবেশিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে 'কথিত' এই সব অমূল্য হিতবাণীবলী বর্তমান সঙ্কট-সময়ে জাতির সত্যপথ নির্ধারণে যথেষ্ট সাহায্য করবে নিঃসন্দেহ।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

হিন্দুস্থানী উপকথা—

শ্রীশ্রী দেবী ও শ্রীসীতা দেবী  
পি ২৬, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা। মূল্য ২৫০ টাকা।

আত্মপ্রকাশের আকুলতায় আদিম মানব অরণ্যভীত কালে একদিকে যেমন গিরিগুহায় ছবি আঁকিয়াছে, অতীতের তেমনই মুখে মুখে গল্প রচনা করিয়া নিজেদের কল্পনাশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। তথাকথিত 'সুভ' মানুষও হৃদয় অতীত কাল হইতে এই একই প্রেরণায় উদ্ভূত হইয়া উপকথা বা রূপকথা সৃষ্টি করিয়া দুনিয়ার লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া আসিয়াছে আজ মানুষের মুখে মুখে রচিত উপাখ্যানবলী ছাপার অক্ষরে রূপান্তরিত হইয়া ব্যাপক ভাবে সমগ্র পৃথিবীর আবালবৃদ্ধবনিতার আনন্দ বিধান করিতেছে। পৃথিবীর এই বিশাল রূপকথা-ভাণ্ডারে যে সকল অবিশ্রবণীয় অবদান কালজয়ী হইয়া আছে, আরব্যোপস্থাসের গল্পগুলি তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যুগ যুগ ধরিয়া তাহা বিশ্বের সকল দেশের সকল বয়সের নরনারীর রসপিপাসা চরিতার্থ করিয়া আসিতেছে। কোন কোন মনোবীর মতে হিন্দুস্থানে প্রচলিত উপকথাসমূহ আরব্যোপস্থাসের সমপর্যায়-ভুক্ত। বাংলাদেশের শিশুমহলে 'হিন্দুস্থানী উপকথা' যে কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে পুস্তকখানির সংস্করণবাহুল্যই—বর্তমানে ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে—তাহার প্রমাণ।

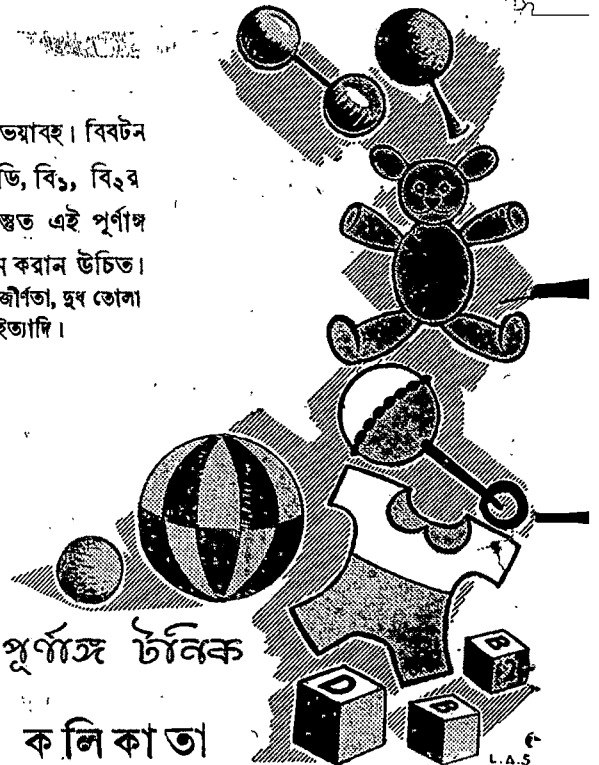
## মায়ের বর্তব্য

শিশুপালনের সম্যক জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন শিশুদের দৈনিক সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বি২ সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দন্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। বিবটন নিম্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারী :—শিশুদের বসন্তের পীড়া, অজীর্ণতা, দুধ তোলা পট কাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তশূন্যতা, রুগ্নতা, একাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি।



শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য  
**বিবটন**  
একটি পূর্ণাঙ্গ টনিক

লিষ্টার এন্টিসেপটিকস্ • কলিকাতা



হিন্দুস্থানী উপকথার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার অনেক গল্পের পাত্রপাত্রীদের আচরণ ও উক্তিতে এরূপ একটা স্বাভাবিকতা আছে যাহার দ্বারা ইহাদিগকে বাস্তব জগতের অধিবাসী বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য শিশুমন ইহাদের সহিত একটা আত্মীয়তা অনুভব করিয়া পুলকিত হয়। কোনো কোনো গল্প তাহাদের কল্পনাকে যেমন উদ্দীপিত করিয়া তুলে তেমনি তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিকেও নাড়া দেয়। 'জঞ্জাল' নগরীর কৃষ্ণ হুসিয়ার বাঁ বুদ্ধির খেলায় ও কথার মারপ্যাচে সবাইকে কেমন করিয়া হারাইয়া দিয়াছিল একটু মাথা খাটাইয়া তাহা পড়িলে শিশুদের আনন্দের মাত্রা আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। হিন্দুস্থানের মাটিতে হিন্দু-মুসলমান এই উভয় সংস্কৃতির ধারা কেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া গিয়াছে তাহারও আভাস এই উপকথাগুলিতে পাওয়া যায়। এই গল্পসংগ্রহে একদিকে যেমন রাজা বিক্রমের অপূর্ণ সঙ্গীতকুশলতার পরিচয় পাইয়া আমরা মুগ্ধ হই, অন্যদিকে তেমনি পারশ্ব দেশের রাজপুত্র মহাবীরের সৌন্দর্য্যের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা আমাদের মনে অতিভূত করে।

গল্পগুলি পড়িলে মোটেই মনে হয় না যে অনুবাদ পড়িতেছি। লেখিকার একেবারে উপকথাগুলির মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া ভিন্ন পরিবেশ হইতে আহরিত রসপরিবেশে অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষার যাহাতে ও বর্ণনাচাতুর্য্যে তাহারা শুধু শিশুদেরই নয়, বয়স্কদেরও বিম্বিত দৃষ্টির সম্মুখে যেন এক রূপময় জগৎ সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন। এক বিচিত্র চিত্রশালায় প্রবেশ করিয়া ছবির রসে আমরা যেন ডুবিয়া যাই। রাজকন্যার দেহাশ্রয়ী ব্রহ্মদেতা, রাজকন্যাকে অপহরণরত ডাইনী, অপরাধী রূপসজ্জায় শাহজাদী বানরী, মিঠাইমণ্ডা ভক্ষণরত ক্ষীণকুখা, নাপক রানে সঙ্গীতরত রাজা বিক্রম, মায়াদণ্ড-নাহাঘো সমস্ত উত্তরণরত

রাজপুত্র মহাবীর ইত্যাদি কত বিচিত্র প্রাণী চোখের সামনে লেখায় ও রেখায় মুক্তিমান হইয়া আমাদের মনে যেন হারানো শৈশবের স্মৃতি-দিয়া-ঘেরা কোন এক মায়াপুরীতে লইয়া যায় এবং আমাদের মত বয়স্ক পাঠকদের মনের ভিতরেও যে একটি চিরন্তন শিশু বাস করিতেছে, কল্পনায় ছন্দও এক নিরুপম সৌন্দর্য্যলোকে বিহার করিয়া তাহারও আদিম কৌতুহল কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হয়।

**শোণিত স্বর্গ**—শ্রীরণজিৎকুমার সেন। দাসগুপ্ত এও কোং। ৫৩৩ কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

দীর্ঘকালের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ফলে সম্প্রতি আমরা জাতীয় আত্ম-কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছি। বিদেশী শাসনের অবসান হইয়াছে সত্য, কিন্তু দেশের জনগণের উপর ধনিক-সম্প্রদায়ের শোষণনীতি এখনো অব্যাহতভাবে চলিতেছে। ধনতন্ত্র আর জমিদারীপ্রথা আজও ভারতের জাতীয় জীবনের উপর জগদ্বল পাখরের মত চাপিয়া আছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল-মুক্ত বিপুল জনসংখ্যার মনে আজ ধনতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া শোষণের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য দুর্দমনীয় সঙ্কল্প জাগিয়াছে। জমিদারীপ্রথা বিলোপের দিনও নিকটবর্তী—এখন দেশে কৃষক-মজুর রাজ প্রতিষ্ঠার দিকে প্রবল জনমতের সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে।

সমালোচ্য উপন্যাসখানির লেখক শ্রীরণজিৎকুমার সেন দেশের শোষিত জনগণের প্রকৃত কল্যাণের পথ কি সে সম্বন্ধে গভীর চিন্তা ও প্রচুর পড়াশুনা করিয়াছেন। বর্তমান উপন্যাসে তিনি একথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, জনগণের প্রকৃত মুক্তি আসিবে বিপ্লবের পথে, রক্তপাতের মধ্য দিয়া। প্রধানতঃ জমিদারের অত্যাচারে নিপীড়িত কৃষক ও প্রজাকুলের দুর্দশার ছবিই এই পুস্তকে তিনি আঁকিয়াছেন, কিন্তু শ্রমিকদের দুঃখ-খর্গতির



ক্যালকাটা  
কেমিক্যাল

**দুর্লভ নয় মোটেই—**

তহুমেহের পেলব কোমলতা ও লাবণ্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্য সুষমা প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কাম্য-বস্তুরূপের এই প্রার্থনা। প্রাকৃতিকৈবজ্ঞানিক যুগে নারীর পক্ষে এ সম্পদ দুর্লভ ছিল বটে, কিন্তু একালে 'ক্যাল-কেমিকো'র সহায়ে প্রস্তুত প্রসাধনী দেহের সৌন্দর্য্যকে প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে।

★ **তুহিনা** বিউটিফিক  
★ **য়েনুকা** চম্পেট পাউডার  
★ **লাবনী** স্নো এবং ক্রীম

চিত্রও ইহাতে আনুষঙ্গিক ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অত্যন্ত করণ পরিবেশের মধ্যে কাহিনীর সূচনা, আর নায়ক মনু ওরফে মানবের জীবনের শোচনীয় টাজেডির মধ্যে ইহার পারসমাংশ। অত্যাচারের রক্ততলক লনাটে আঁকিয়া সে মুতাপথযাত্রী হইল বটে, কিন্তু এই ধনিক ও জমিদার সম্প্রদায়ের শোষণক্লিষ্ট পৃথিবী হইতে যাত্রার পূর্বে সে শোনাহুয়া গেল অমরবাণী—“এই রক্তের মধ্য দিয়েই যে আমাদের স্বপ্ন রচনা করতে হবে।” পুস্তকখানি প্রচারগামী হওয়ায় রসস্বষ্ট মাকে মাকে ব্যাহত হইয়াছে। লেখক যখনই সুবিধা পাইয়াছেন তখনই জামদার ও ধানক-সম্প্রদায়ের উপর একহাত লইয়াছেন; ধনতন্ত্র ও জমিদারীপ্রথার বিরুদ্ধে লম্বা লোকচার ঝাড়িয়াছেন, তত্ত্বপরি নিঞ্জের রসরচনাকে হরোজ বচনের উচ্চীতে কণ্টকিত করিয়াছেন। পুস্তকে বর্ণাশুদ্ধি অজস্র—উৎকট শব্দপ্রয়োগ

এবং উদ্ভট বাক্যরচনার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি রহিয়াছে। যেমন—‘দেহী ক্ষীণ এবং কালো’ ‘বয়সের সূর্য্যটা গাঢ় হইয়া ওঠে নাই’, ‘বৈধবা জীবন’ ‘শ্লেষা-জড়িত কণ্ঠ’, ‘শ্লেষা জড়িত কান্দি’ (কি বস্তু!) ইত্যাদি। ‘বিক্ষিপ্ত উড়িয়া বেড়াইতেছে’, ‘বিক্ষিপ্ত খেঁকশিয়াল’, ‘বিক্ষিপ্ত পদসঞ্চালন’, ‘বিক্ষিপ্ত গতি’ ইত্যাদি—‘বিক্ষিপ্ত’ শব্দটি ভুল অর্থে স্থানে অস্থানে বহুবার প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পুস্তকের কাহিনী-অংশ এমন একটি বিপুল ভাবাবেগে উদ্বেলিত যে তাহার তোড়ে শ্রোতামুখে তৃণের মত ইহুস অনেক ক্রটিবিচ্যুতি ভাসিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে লেখকের আবরণ-মুখর বর্ণনা পাঠকচিত্তে একটি বিচিত্রমধুর ভাবব্যাকুলতার সঞ্চার করে।

শ্রীনিলিনীকুমার ভদ্র

## দেশ-বিদেশের কথা

### ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এইড সোসাইটি

এদেশে যাহারা রোগাক্রান্ত হইলে অস্বাভাব-নিবন্ধন শিক্ষিত চিকিৎসকের সহায়তা পায় না তাহাদের জন্য ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এইড সোসাইটি (১০৮ বি. আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা) খুব অল্পদায়ে নিয়মিত ভাবে চিকিৎসার বন্দোবস্ত কারয়াছেন। তাঁহঁর দক্ষিণা বাবদ পাঁচ টাকা এবং তার পরে মাসিক দুই টাকা হারে চাদা দিয়া সোসাইটির সদস্য হইলেই, সোসাইটি উক্ত সদস্য এবং তাহার পরিবারভুক্ত সকলের জন্মই উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সংবাদ পাইলেই সমিতির চিকিৎসক সদস্যের বাড়ীতে গিয়া রোগী দেখিয়া ওষধের ব্যবস্থা করেন এবং শ্রয়োজন হইলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপরেও রোগীর চিকিৎসার ভার অর্পণ করা হয়।

সমাজসেবা ও জাতিগঠনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াই ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এইড সোসাইটি এই জনহিতকর-কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। পারস্পরিক সহযোগিতায় অল্পদায়ে জনসাধারণের স্বাচিক্ক্ষ্যসাধনের এই উত্তম প্রশংসনীয়।

### যাত্রাকরের সম্মান

নিউইয়র্ক হইতে প্রাপ্ত এবং এসোসিয়েটেড প্রেস কর্তৃক প্রচারিত একটি সংবাদে প্রকাশ যে গত বৎসরের ষ্টেজ ম্যাজিক বা মঞ্চ-যাত্রাবিহারের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার, এবারের (১৯৪৮) ‘ফিনিক্স মেডেল’ স্বপ্রাসঙ্গিক ভারতীয় যাত্রাকর শ্রীযুক্ত পি. সি. সরকারকে দেওয়া হইয়াছে। এহ নিখিল-বিদ্য যাত্রাবিহা প্রতিযোগিতায় উক্ত বিভাগে দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছেন হল্যান্ডের প্রসিদ্ধ যাত্রাকর ওকিটো সাহেব। ভারতবর্ষের ছোট ছোট ম্যাজিকের খেলা বা বেদিদায়ের বাজিঙলি পৃথিবীর বিশ্বয়ধরূপ হইয়া থাকিলেও মঞ্চ-যাত্রাবিদ্যায় এতদিন প্রতীচ্য দেশীয় যাত্রাকরণ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। এইবার শ্রীযুক্ত সরকার উক্ত সম্মান লাভ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্যদেশবাসীর গৌরব বৃদ্ধি করিলেন।

### বাঁকুড়া হিন্দু মিলন-মন্দির

১৩৫৪ সালের বাৎসরিক কার্যবিবরণী

আলোচ্য বর্ষে ভারত সেবাশ্রম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মিলন-মন্দিরের বাঁকুড়া কেন্দ্রের উত্তোগে সেবাদর্শ প্রচার ও সমাজ-সংগঠনমূলক নানা কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জেলার বিভিন্ন স্থানে সাহায্য-কেন্দ্র

খুলিয়া দুর্গতদের অন্ন বস্ত্র ও অর্থসাহায্য প্রদান করিবার ব্যবস্থা কর হইয়াছিল। এ বৎসরে ৫৬টি নতুন হিন্দু মিলন-মন্দির স্থাপিত হইয়াছে বাঁকুড়া জেলায় মোট মিলন-মন্দিরের সংখ্যা ২৮৬। এ ছাড়া উহ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবৈতনিক শিক্ষাদান ইত্যাদি আরও নানা জনহিতকর কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

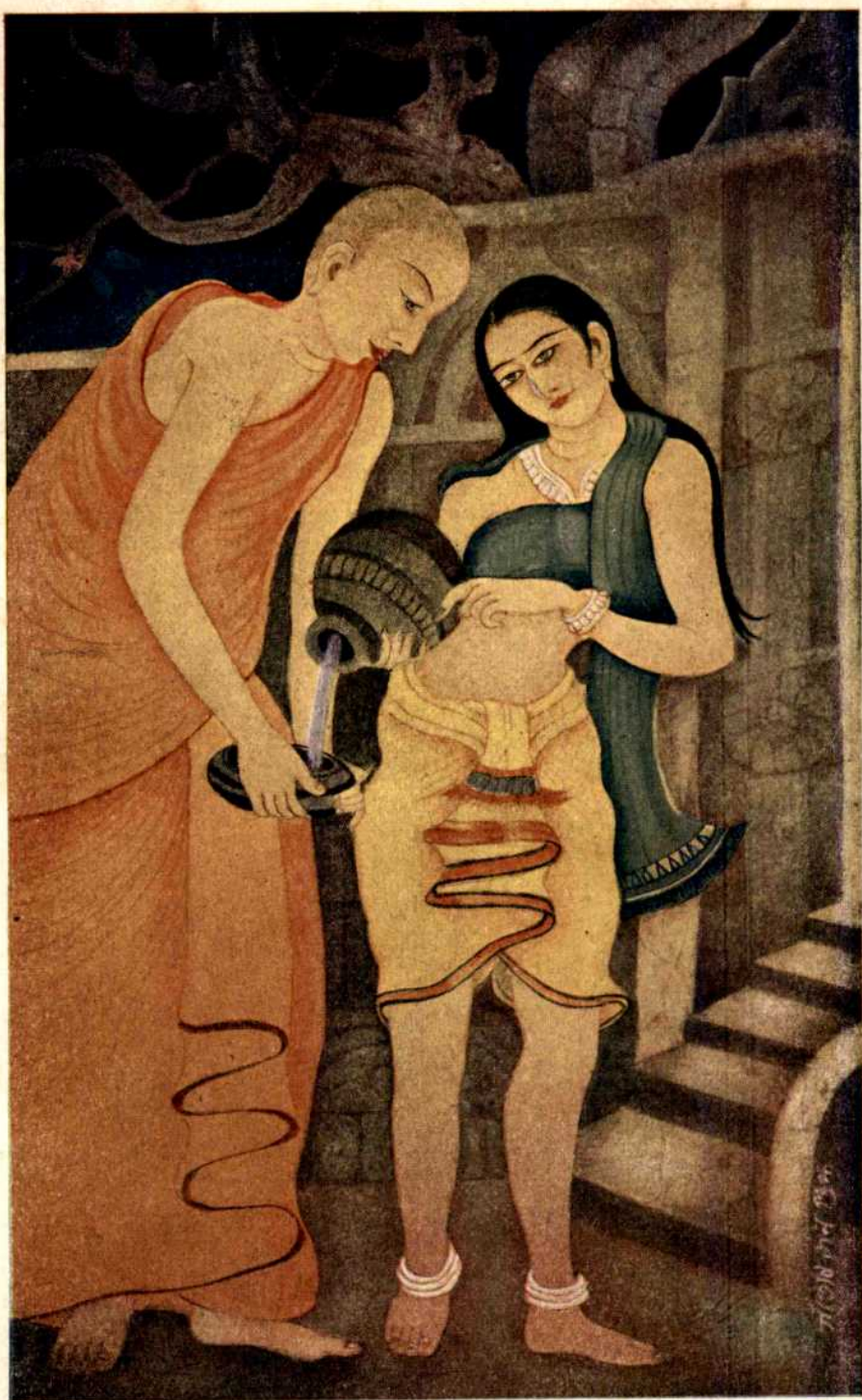
### অবিনাশচন্দ্র গুহ

বিগত ২২রা মার্চ তারিখে বহু ভাষাবিদ আইনব্যবসায়ী অবিনাশচন্দ্র গুহ মহাশয় ৭৩ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ বরিশাল জেলার রামচন্দ্রপুরে জন্মগ্রহণ করিবারে অবিনাশচন্দ্রের জন্ম হয়। অবিনাশচন্দ্র বিভাগে বরিশাল মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহু স্বর্ণপদক ও পুরস্কারাদি লাভ করেন। আই পীরিকায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে এডভোকেটরূপে আইনব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং স্বীয় প্রতিভা স্বর্ণকাল মধ্যেই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন। হিন্দু আই সম্বন্ধে তাঁহার মতকে সকলেই প্রামাণ্য বলিয়া মানিয়া লইতেন। বিধবা এবং ব্যবহারশাস্ত্রে স্বগভীর বাৎপত্তির জন্য তিনি বার এসোসিয়েশনে সভাপতির পদ লাভ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কলেজের অধ্যাপকরূপে তিনি বিশেষ কৃতি প্রদর্শন করেন। বিভিন্ন বিষয়ে বহুবিভূত অধ্যয়ন দ্বারা তিনি যে প্রগ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে ভারতের সর্বত্র বিদ্বন্মণ্ডল নিকট স্থপরিচিত করিয়াছিল। তিনি একজন বহু ভাষাবিদ ছিলেন—আরবী, ফারসি, উর্দু, গ্রীক, লাতিন, ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান, সুইডি প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু ভাষা তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ‘ন ভারত’ এবং ‘ভারতী’ পত্রিকায় তাঁহার কতকগুলি কবিতা এবং সমালোচন মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ইহার ঔপনিবেশিক দিক সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞ ছিল। ইংরেজী ও বাংলা এই উভয় প্রকার গানের স্বরলিপিই তিনি রচ করিতে পারিতেন।

নাম-বিশেষ প্রতি অবিনাশচন্দ্রের তিলমাত্রও মোহ ছিল না। যে একাগ্র নিষ্ঠায় তিনি আজীবন জ্ঞানের সাধনা করিয়া গিয়াছেন বাস্তবিক তাহা বিরল।

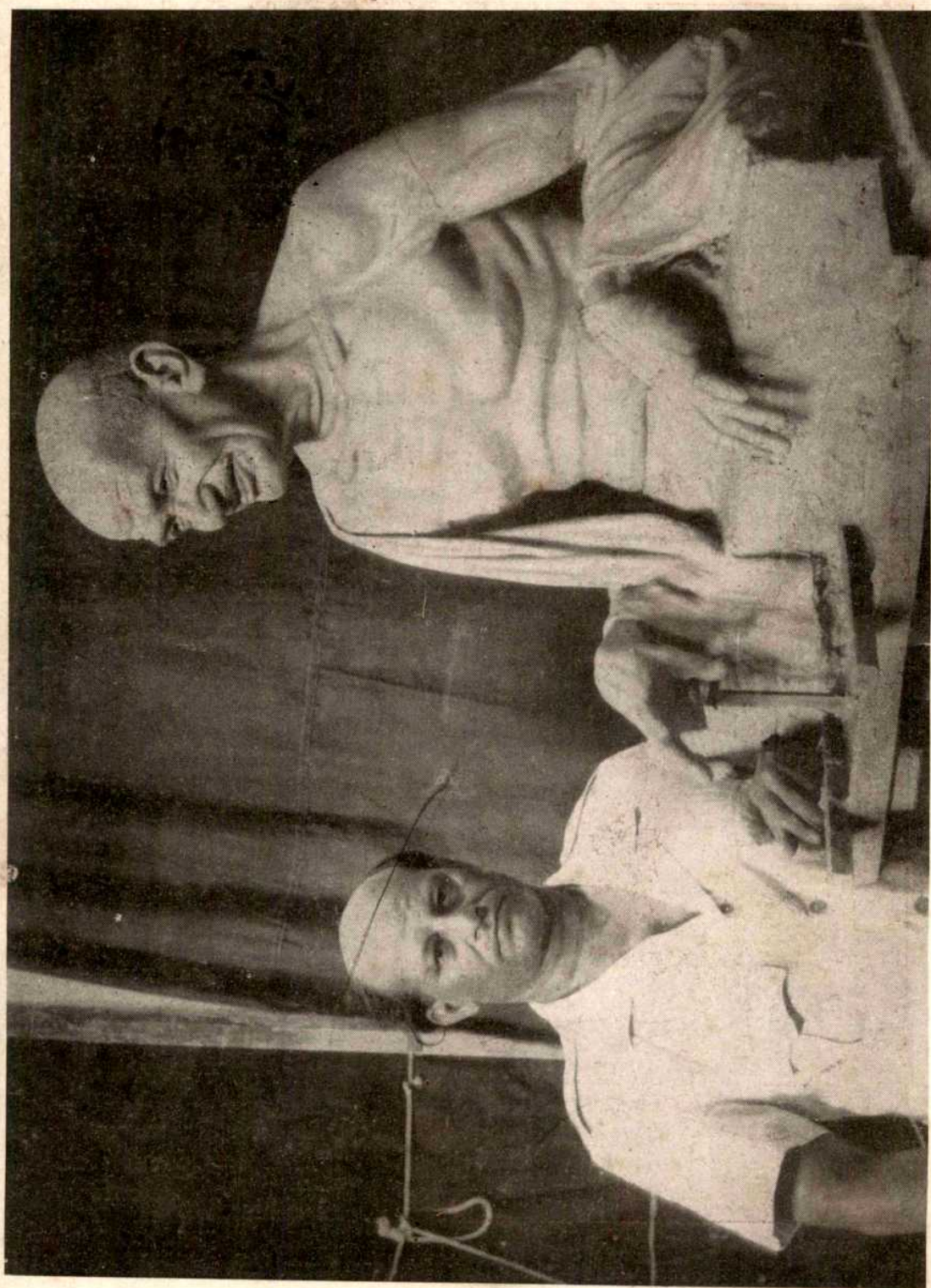




আনন্দ ও অনুষ্ঠা  
শ্রীস্বোষ সেনগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



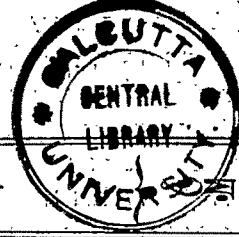


মহাত্মা গান্ধীর প্রতিমূর্তি  
পার্শ্বে—ভাস্কর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

# প্রবাস

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”



৪৮শ ভাগ  
২ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৫৫

সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ

### প্রাদেশিকতা

ইংরেজীতে প্রবাদবাক্য আছে, “charity begins at home” অর্থাৎ দয়াদাক্ষিণ্য ঘরেই আরম্ভ করা উচিত। আমাদের এই ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশেই এই প্রবাদবাক্যের সার্থকতা সকলেই বুঝিয়াছে, কেবল বুঝে নাই বাঙালী। অতঃপ্রদেশে বাঙালী ক্রমেই উচ্ছেদ হইতে চলিয়াছে, সম্প্রতি তাহার উপর পশুবলের প্রয়োগও আরম্ভ হইয়াছে, অথচ বাঙালী যদি তাহার স্বার্থরক্ষার কোনও চেষ্টা করে তখনই চতুর্দিকে চীৎকার শুনা যায় “প্রাদেশিকতা মহাপাপ, বাঙালী পাপের পথে চলেছে।” পণ্ডিত নেহরু হইতে আমাদের বিদায়প্রার্থী প্রদেশ-পাল ত্রিচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী পর্যন্ত সকলেই এই একই উপদেশ দিয়া আমাদের বাধিত করিতেছেন, কিন্তু কাহারও কোন মাথাব্যথা দেখা যায় না যখন ভিন্ন প্রদেশের লোকে নিজের স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হয় বা যখন তাহার বাঙালীর স্বার্থনাশে উত্তত হয়। সুতরাং এরূপ সকল উপদেশই বাঙালী-ধ্বংসের আয়োজনের অঙ্গ বলিয়াই গ্রহণ করা প্রয়োজন। পণ্ডিত নেহরু উচ্চপদের কাজ যাহা কিছু তাহার হাতে ছিল তাহার অধিকাংশই স্বজাতীয়দিগের হাতে দিয়া দিয়াছেন, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর দেশের লোকে নিজের স্বার্থ কতটা বুঝে তাহাও কাহাকেও বলিবার প্রয়োজন নাই, সুতরাং তাহাদের উপদেশ নিজের নিজের ঘরেই দিলে ভাল হইত বোধ হয়। বাঙালীর এখন একথা বুঝা নিতান্তই প্রয়োজন যে, তাহার স্বার্থরক্ষা সে নিজে না করিলে তাহার সর্বনাশ সুনিশ্চিত। আত্মীয়স্বজন বা সম্বন্ধসম্পত্তির স্বার্থরক্ষা যদি প্রাদেশিকতা হয় তবে প্রাদেশিকতা মহাপাপ, স্তোকবাক্যে জুলিয়া এ পুণ্যকার্যে অবহেলা যেন বাঙালী আর না করে।

এই সেদিন যে অর্থপিশাচের দল প্রায় ৬০ লক্ষ বাঙালী নরনারীকে অনাহারে বধ করিল, তাহাদের শতকরা ৯০ জন অবাঙালী বা অবাঙালীর দাস। আজ যে তরুণের দল দেশের অবশিষ্ট সম্পত্তির সবটুকু চোরাকারবারের পথে লুট করিতেছে তাহাদেরও দলপতি প্রায় সকলেই অবাঙালী। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযানও কি প্রাদেশিকতারূপ মহাপাপ?

মানভূম, সিংহভূম ও সাঁওতাল পরগণায় বিহারীর দল বাঙালীর ভিটাঘাট উচ্ছেদ করিয়া, তাহার মাতৃভাষা পর্যন্ত লোপ করাইবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহাতে বিহারীদের প্রাদেশিকতার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না, কেননা তাহার কংগ্রেস নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের প্রদেশের লোক। রাজেন্দ্র বাবু ত্রিচক্রবর্তীর স্বজাতি, হয়ত সেই কারণেই তিনি “দোষ লিখেছেন-বাঙালীর বেলা, আর বিহারীর বেলা লীলাখেলা।” ব্রিটিশ শাসকের জুয়াচুরিতে বাংলার মাটির যে অংশ অজ্ঞানভাবে বিহারের হাতে দেওয়া হইয়াছিল, যে অঞ্চলের মাটির সঙ্গে বাঙালীর রক্তমাংসের সম্পর্ক হাজার বৎসরেরও অধিক, সেই মাটি কিরিয়া চাওয়া, সেই আত্মীয়-কুটুম্বের “নিজ বাসভূমে পরবাসী” হওয়ার শেষ চাওয়া, ইহাই হইল ষোর অত্যাচার। বলিহারি বিচার, বলিহারি স্বার্থজ্ঞান।

আবার একদল রব তুলিয়াছেন যে ভারতের পুণ্যভূমিতে সকল ভারতীয়েরই সমান অধিকার, সুতরাং প্রাদেশিক অংশ লইয়া বাদবিসম্বাদের প্রয়োজন কি? সমান অধিকার যে কতটা সে ত বাঙালী আজ বিহারে, আসামে ও উড়িষ্যায় হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে। সুতরাং এই যুক্তি যে কতটা অসার সে কথা কি আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে? নিজের ভিটাতেই বাঙালী দাসেরে ডুবিতে বসিয়াছে, অতঃপ্রদেশের ত কথাই নাই। অতঃপ্রদেশের লোককে বাংলায় স্থান দেওয়ায়, কাজ দেওয়ায় বাঙালী এত দিন যাবৎ কখনও আপত্তি করে নাই, এখন অতঃপ্রদেশের লোকের কার্যকলাপ দেখিয়া তাহাকে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

বিদেশীর অত্যাচার ও দমননীতি হইতে আজ ভারতবর্ষ উদ্ধার হইয়াছে। কিন্তু এই অত্যাচার ও অনাচারের প্রকোপ কোন প্রদেশের উপর সকলের চেয়ে অধিক পড়িয়াছিল? কোন প্রদেশের লোক বিদেশীর হাতে নিদারুণ গীড়ন সহ্য করিয়া ও অদম্য উৎসাহে অক্লান্ত ভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইয়াছিল? বিদেশীর মাৎসর্য ও দমননীতির ফলে সর্বাপেক্ষা নির্যাতিত হইয়াছে কোন প্রদেশ? একথা অধীকার করিবার উপায় নাই যে এক বাংলা ও বাঙালী এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের

চল্লিশ বৎসরে যে ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে, সমগ্র ভারতের অল্প সকল প্রদেশ একত্র করিলেও তাহার তুলনা হয় না। বাংলার মাটিতেই এই সংগ্রামের আরম্ভ এবং এই মাটিতেই তাহার পূর্ণতম বিকাশ প্রাপ্তি। স্বীকার করিতে পারে? অথচ আংশিক ক্ষতিপূরণের কথা তুলিলেই আজ সেই বাঙালীকেই স্মৃতিতে হইরে দেশপ্রেমের বিষয়ে উপদেশ ও প্রাদেশিকতা সম্পর্কে অহুযোগ।

বাঙালী কোন দিনই বিদেশী বা ভিন্ন প্রদেশীয় প্রতি বিরূপ ছিল না এবং কোন দিন হইবেও না। কিন্তু ভিন্ন প্রদেশীয় শত্রুর সাহায্যে এবং শত্রুর ইঙ্গিতে যাহারা বাঙালীর ধনমান-প্রাণ নাশ করিতে উৎসাহ দেখাইয়াছে এবং আত্মও যাহারা অসং উপায়ে বাংলার সম্পদ বাংলায় ফিরাইয়া আনিবার পথে বাধা দিতেছে তাহাদিগকে বাঙালী আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিবে বা নির্বিকারে অপহৃত সম্পত্তি ভোগদখল করিতে দিবে এ কিরূপ বিচার?

ইহা সত্য যে আজ ভারতভূমির চতুর্দিকে শত্রু এবং ভিতরে প্রকাশ্যে ও পরোক্ষে শত্রুর দল চক্রান্ত চালাইতেছে। এরূপ অবস্থায় গৃহবিবাদ যুক্তিযুক্ত নহে ইহাও সত্য। কিন্তু এই গৃহবিবাদ ও আত্মকলহের পথ যাহারা সকলের আগে ধরিয়াছে, যাহারা অকারণে বাঙালীকে নির্ধাতন ও বাংলার সমৃদ্ধির পথ চিরদিনের মত কণ্টকিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছে, তাহাদিগকে কিছু বলা হয় না কেন? অল্প প্রদেশ মাতৃভাষার হিসাবে বিভাগ হইলে কোনও দোষ হয় না, যত দোষ এই অভাগা বাংলাদেশের।

বাঙালীকে এখন অবহিত হইয়া ভাবিতে হইবে আত্ম-রক্ষার কথা। দেশের শক্তি যাহাতে ক্রমেই গঠিত ও বর্ধিত হয় সে বিষয়ে শুধু মন্ত্রীসভাকে অহরোধ-উপরোধ বা অভিযোগ-অহুযোগ করিলেই চলিবে না। দেশে রাষ্ট্রশক্তির পুনর্জাগরণ নিতান্তই প্রয়োজন। বাংলার কংগ্রেস নেতৃদল যে পথে এত দিন চলিয়াছিলেন তাহারই ফলে দেশের এই অসহায় অবস্থা এবং বাংলার কংগ্রেসের এই অবনতি। ভিন্ন প্রদেশীয় নেতৃবর্গের আজ্ঞাপালন এবং দেশের লোকের নিকট দেশপ্রেম ও ত্যাগের অজুহাতে স্বার্থসিদ্ধির দাবী ভিন্ন অল্প কিছু চিহ্ন তাহাদের মধ্যে এতদিনেও বিশেষ দেখা যাইতেছে না। দেশকে রক্ষা করিতে হইলে সর্বপ্রায়ে প্রয়োজন কংগ্রেসকে সংস্কৃত ও অনাচার মুক্ত করা। দেশের লোকের উচিত এখন যাচাই করিয়া দেখা যে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রবাদের আদর্শ বর্তমান কংগ্রেসের দলে কতটা আছে। কংগ্রেসের ছাপের দৌলতে এত মেকী দেশে চলিয়াছে যে সাজা, চেনা, কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। দেশের প্রয়োজন বাটী জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বস্ত গণতন্ত্রবাদ, তাহার জন্ত প্রয়োজন হইলে দেশবাসীকে সমস্ত কর্মপদ্ধতি বদলাইতে হইবে। চোরাকারবারীর জুয়াচুরির ফলে হাজার টাকার নোটও অচল হইয়া গিয়াছে। আজিকার পরিস্থিতিতে ভাবিবার সময় আসিয়াছে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কি করা উচিত।

## পশ্চিম বঙ্গের সরবরাহ সচিবের অসহায়তা

পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ সচিব ত্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন নানা স্থানে তাহার নিজের অসহায়তার কথা প্রচার করিতেছেন। এই প্রচারের উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝা সহজ নয়। সহজ বুদ্ধির লোক মনে করিবে যদি অভিজ্ঞতার ফলে সেন মহাশয় বুদ্ধিতে পারিয়া থাকেন যে তাহার কিছু করিবার নাই, তবে মস্তিষ্ক পদটি ছাড়িয়া দিলেই ত পারেন। তাহা না করিয়া এইরূপে পরাজিতের মনোভাব দিকে দিকে বিস্তার করিবার সার্থকতা কি? পশ্চিম বঙ্গ রাষ্ট্রের কিছু ক্ষমতা আছে; সেই ক্ষমতার অংশীদার ত্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। এই ক্ষমতার একটা রূপ আছে। তিনি কেন এই রূপে প্রকট হইতেছেন না? মেদিনীপুর হইতে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রেরিত এক সংবাদে দেখা যায় যে তিনি বলিতেছেন—

“পশ্চিম বঙ্গ রাষ্ট্রের সমস্ত দ্রব্য বাটতি প্রদেশ হওয়ায়, ক্ষুধিত জনসাধারণের আহার দিবার যে গুরু দায়িত্ব তাহার উপর পড়িয়াছে সেই কর্তব্য পালনে তিনি অসমর্থ হইয়াছেন, এবং একান্ত অসহায় বোধ করিতেছেন।”

এই অসহায় বোধের সঙ্গে মুর্শিদাবাদে তিনি যাঁহা বলিয়াছিলেন, তাহার কোন সঙ্গতি নাই; সেখানে তিনি দেশের লোককে গালাগালি দিয়া নিজের অক্ষমতার জ্বালার উপর প্রলেপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

“দেশে শতকরা যদি একজন চোরাকারবারী থাকে, তা হলে তাকে ধরা যায়। কিন্তু শতকরা পঞ্চাশ জনই যদি চোরাকারবারী হয়, তা হলে তা প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা কোন সরকারের নেই।”

সেন মহাশয়ের অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেও, একটা প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। রাষ্ট্র কেন “শতকরা পঞ্চাশ জন” চোরাকারবারীকে দমন করিবার জন্ত আর পঞ্চাশ জনকে উদ্বোধিত করিতে পারে না? সমস্ত দেশের লোককে চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বলিলে তাহার কর্মচারীদের বিপদ আছে হয়ত। দেশের শতকরা পাঁচ জনের বেশী চোরাকারবারী হইতে পারে না ইহা সকলেই জানে, কেননা উহার অধিক ব্যবসারীই দেশে নাই। তবে মন্ত্রী মহাশয়ের পার্শ্বচরুরূপে যাহারা আছেন তাহাদের শতকরা পঞ্চাশ জন কেন শতকরা পাঁচজন জন এই পথের পথিক বলিয়াই হয়ত তিনি চতুর্দিকে চোরাকারবারী দেখিতেছেন।

## চোরাকারবারি আর্ডিন্যান্স

জনসাধারণের পক্ষ হইতে বহু আন্দোলন এবং গবর্নমেন্টের পক্ষ হইতে বহু গড়িমসির পর শেষ পর্যন্ত চোরাকারবারি আর্ডিন্যান্স জারী হইয়াছে। গত ১লা জানুয়ারী হইতে

অর্ডিন্যান্সের মেয়াদ আরম্ভ হইয়াছে। উহা জারী হইয়াছে ভারতশাসন আইনের ৮৮ ধারা অনুসারে, সুতরাং লোকে উহা ১৭ দিনের অর্ডিন্যান্স বলিয়া যাহা আশঙ্কা করিতেছিল তাহা হইবে না, ৩০শে জুন অর্ডিন্যান্সের মেয়াদ শেষ হইবে না। ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী অধিবেশনের প্রথম ছয় সপ্তাহ পর-পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে, এই ছয় সপ্তাহের মধ্যে অর্ডিন্যান্সটিকে আইনে পরিণত করিতে হইবে, মূল বিলটি পাস হইয়াই আছে, উহার সামান্য পরিবর্তন করিয়া বিলটিকে পাকা আইনে পরিণত করিতে ছয় সপ্তাহ সময়ই যথেষ্ট।

ডাঃ বিধান রায়ের মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রধান অভিযোগ দুর্নীতি ও চোরাকারবার নিরোধে উহার অক্ষমতা। তাঁহাদের এই অক্ষমতা অথবা দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ চোরাকারবারীরা এবং দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীরা গ্রহণ করিতেছে। গত কয়েক মাসের মধ্যে ছোট-বড় বহুসংখ্যক দুর্নীতিপরায়ণ এবং দেশদ্রোহী কর্মচারী তদ্বিরের জোরে নানা স্থলে নিয়োজিত হইয়াছেন, ফলে সং ও দক্ষ কর্মচারীদের মনোবল ভাঙিয়া গিয়াছে এবং সরকারের প্রত্যেক বিভাগে দুর্নীতির শ্রোতৃ বহিরা চলিয়াছে। ডাঃ ঘোষ এই জিনিসটির পত্তন করিয়া গিয়াছেন, ডাঃ বিধান রায় ও শ্রীকিরণশঙ্কর রায় এখনও উহার সংস্কার করিতে বিশেষ সক্ষম হন নাই। সরকারী কর্মচারীদের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয়বিধ সহায়তা। ব্যতীত চোরাকারবার কিছুতেই চলিতে পারে না, কারণ সমস্ত চোরাকারবারটা নানাবিধ পারমিট প্রদানকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে। পারমিট সংগ্রহে প্রকৃত ব্যবসায়ীর অক্ষমতা এবং অব্যবসায়ীর নিকট উহার সহজলভ্যতা চোরাকারবারের মূল কারণ। এইজন্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যতক্ষণ এই ধারণা না জন্মিতেছে যে চোরের সহিত যোগাযোগ রাখিলে একদিন না একদিন ধরা পড়িবই এবং সেদিন কিছুতেই রক্ষা পাইব না—ততদিন সহস্র অর্ডিন্যান্সেও চোরাকারবার বন্ধ হইবার উপায় নাই। মন্ত্রীরা ত অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া ছাড়িয়া দিলেন কিন্তু যে পুলিশ উহা কার্যে পরিণত করিবে তাহার শীর্ষদেশে যদি বর্তমান কমিশনার এবং হেড কোয়ার্টার্সের ডেপুটি কমিশনারের স্থায় লোক অধিষ্ঠিত থাকেন তবে ফলের আশা লোকে কিরূপে করিবে? এক্ষেত্রেও হয়ত দেখা যাইবে এই কঠোর অর্ডিন্যান্স সত্ত্বেও পূর্ববৎ পানওয়াল, বিড়িওয়াল, চাউলওয়ালী প্রভৃতিই দণ্ডিত হইতেছে, রাধব বোয়াল প্রভৃতি নির্বিলম্বাদে পার পাইয়া যাইতেছে। অর্ডিন্যান্সের একটি ধারা আমাদের নিকট খুব অসঙ্গত ঠেকিল; ১০ নং ধারায় চোরাকারবারকে পুলিশগ্রাহ এবং জামীন নামজ্ঞুর অপরাধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু ৩ (২) নং ধারায় বলা হইয়াছে যে এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে কাহাকেও মামলা সোপর্দ করিতে হইলে

প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি লইতে হইবে। এত বিচার-বিবেচনা ও গবেষণার পর যে অর্ডিন্যান্স জারী হইয়াছে তাহার মধ্যে এত বড় গলদ লোকে সামান্য ত্রুটি বলিয়া মনে করিতে পারিবে না; রাধব বোয়াল পার করিবার জন্ত জালের মধ্যে এই ছিদ্রটা রাখা হইয়াছে বলিয়াই লোকে ধরিয়া লইবে। গত বৎসর সর্দার প্যাটেল সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি নিবারণকল্পে যে দুর্নীতিদমন আইন পাস করিয়া দিয়াছিলেন তাহাতেও ঠিক এই ছিদ্রটি রাখা হইয়াছিল এবং তাহারই জন্ত এই আইন আজ পর্যন্ত দেশের কোন উপকারে আসে নাই। যে অপরাধ পুলিশগ্রাহ এবং জামিনের অযোগ্য করা হইতেছে তাহার মামলা চালাইবার জন্ত সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হইবে কেন?

ডাঃ বিধান রায়ের গবর্নমেন্ট এত দিন এই কথাই বলিয়া আসিয়াছেন যে ক্ষমতার অভাবেই তাঁহারা দুর্নীতি ও চোরাকারবার বন্ধ করিতে পারেন নাই। এই ক্ষমতা এখন হাতে আসিয়াছে। চোরাকারবারের মূল কাহারা তাহা তাঁহাদের জানা আছে। কাপড়ের কথাই ধরা যাক। বাংলা দেশে কাপড় বিক্রয়ের একমাত্র কর্তা ছিল বি-টি-এ; বিনিয়ন্ত্রণের সময় ইহাদের হাতে প্রায় ৫০,০০০ গাঁইট কাপড় ছিল। চারজন ব্যবসায়ী ইহা ছাড়া আমেদাবাদ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে আরও প্রায় ৫০,০০০ গাঁইট কাপড় আমদানী করিয়াছেন। তা ছাড়া বাংলার মিলগুলিতেও প্রায় ৩৫,০০০ গাঁইট কাপড় তৈরি হইয়াছে। এই সমস্ত কাপড় কেবল দশ-বার জন মাত্র লোকের হাত দিয়া বিলি হইয়াছে এবং আমরা জৈষ্ঠ সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে ইহার দুই-তিন মাসের মধ্যে এই কাপড়ের উপর প্রায় ১৮২০ কোটি টাকা দাম ও সাধারণ লাভ বাদে গাঁইট খুলিবার আগেই কেবল অতিরিক্ত লাভ করিয়াছে। ইহাদের নামটিকানা সরকারের জানা আছে, কারণ ইহারাই আইনতঃ কাপড় বিক্রয়ের পারমিটধারী। এই লোকগুলিকে অবিলম্বে নতুন আইনের কবলে ফেলিবার সক্রিয় ব্যবস্থা করিলে ও আদালতে লইয়া গেলে বড়বাজারের চোরাকারবারী মহলে হাহাকার উঠিতে এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগিবে না। ইহাদিগকে জেলে আটক করিয়া আইনের রক্তমুক্তি দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলে চোরাকারবারের একেবারে গোড়ায় দা পড়িবে। চালের ফটিকাধারী ও মুনাকাখোরির জন্ত যাহারা বাংলাদেশের ৬০ লক্ষ লোককে অনাহারে মারিয়া ফেলিয়া লাশ পিছু ২৫০ টাকা করিয়া লাভ করিয়াছে, সমস্ত ঋণগ্রস্তের চোরাকারবার ও ভেঁজাল চালাইয়া আজ যাহারা বাঙালী জাতিকে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছে, পুরনাদের বিবস্ত্র রাখিতেছে সেই সব মরপিশাচের প্রতি একটু কঠোর ব্যবহার হইলে সমাজ তাহাতে আনন্দিতই হইবে এবং



সমাজ হইতে দুর্নীতি ও চোরাকারবারের মহাপাপ দূর করিতে হইলে এই প্রকার কঠোরতা অপরিহার্য। স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিনে এক জনকে ধরিতে গিয়া এক শত জনকে আটক করা যদি সম্ভব হইয়া থাকে তবে এখন দশটা চোর ধরিতে গিয়া এক জন সাধুর কিঞ্চিৎ লাঞ্ছনার আশঙ্কা থাকিলেও তাহাতে পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নহে।

পুলিস বিভাগে অতীতের অসাধুতা এবং বর্তমানে দলাদলি ও অযোগ্য নিয়োগের ফলে যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে উচ্চদের নিকট হইতে কাজ পাওয়া অতিশয় কঠিন হইবে। অসাধু পুলিশকে প্রমোশন দিয়া, গ্রামের ও শহরের পুলিশ একাকার করিয়া এবং ভাল কর্মচারীদের সমর্থন না করিয়া পুলিশের সত্তা ও দক্ষতা একেবারে রসাতলে দেওয়া হইয়াছে। চোরাকারবার আর্ডিনালটিকে কাজে লাগাইতে হইলে বাছা বাছা উপযুক্ত ও সং লোক লইয়া এনফোর্সমেন্ট বিভাগটিকে চালিয়া সাজিতে হইবে। এরূপ উপযুক্ত লোকসংখ্যা অল্প হইলেও পুলিশে এখনও আছে, ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা দরকার। তাহা ছাড়া বাহির হইতে উচ্চশিক্ষিত ও সদ্বংশীয় যুবকদের এই কার্যের জন্ত নিযুক্ত করা ও চাহুরি দেওয়া দরকার। আবগারী বিভাগে একটা নিয়ম আছে যে, চোরাই কারবারের সংবাদ যে দেয় সে পুরস্কার পায়। এখানেও এই নিয়ম করা যাইতে পারে যে চোরাকারবারীরা কাজ ধরাইয়া দিতে পারিলে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

আমরা বারংবার যে কথা বলিয়া আসিয়াছি এই প্রসঙ্গে আবারও তাহা বলিতে চাই। কাজ করে মানুষকে, চেয়ার টেবিল নহে; উপযুক্ত লোকের উপর কাজের ভার না পড়িলে সহস্র আর্ডিনাল ও আইনেও কোন কাজ হইবে না। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত অফিসার সকল প্রকার দুর্নীতি, আশ্রিতবাংসল্য, পক্ষপাতিত্ব ও দুর্বলতার অতীত না হইলে বিভাগীয় শৃঙ্খলা ও কর্মদক্ষতা কিছুতেই বজায় থাকিতে পারে না। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগ, বিশেষতঃ পুলিশ বিভাগ, ইহার জলন্ত নিদর্শন। গবর্নর কেসির অহুরোধে ত্রিবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় এই সমস্তার আত্মপুষ্কিক বিশ্লেষণ করিয়া একটি অতি মূল্যবান রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন, লালদীঘির দপ্তরখানায় আজও উহা বস্তাবন্দী হইয়া রহিয়াছে। ঐ রিপোর্টটি পাঠ করিলে গবর্নর দুর্নীতি নিবারণের প্রকৃত পথের সন্ধান পাইবেন।

### শেষ কোথায় ?

“গণরাজ” নামক পত্রিকাখানি মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটির মুখপাত্র। জনাব রেজাউল করিম তাহার সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি। সুতরাং এই পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্য ও সংবাদ সত্যতা ও ধীরতার দিক হইতে অমূল্যবোধীয়। সেই পত্রিকার ১লা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় একটি সংবাদের উপর মন্তব্যের

শিরোনাম দেওয়া হইয়াছে—“শেষ কোথায়”? আমরাও সেই প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে চাই “মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় যে পাকিস্তানী হানাদকারের জহুম নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে”—তার শেষ কোথায়? আমাদের সহযোগী কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এবং তাহার বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে—“এই সব ঘটনা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। ‘পূর্ব পাকিস্তান’ কর্তৃক অফিসারের পশ্চাতে সুপ্রকল্পিত একটি নীতি কার্য্য করিতেছে।” এই নীতি কি তাহা এই প্রবন্ধে বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু তাহা বুঝিবার জন্ত খুব বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

এ দিকে পশ্চিম বঙ্গের গণবর্গমেন্ট এই সব বিষয়ে অনেকটা ক্ষমাবেন্দ্রা করিয়া চলিতেছেন বলিয়া মনে হয়। এই বৈধা সম্বন্ধে পশ্চিম বঙ্গের লোকের মন কিরূপ বিধিয়া উঠিতেছে, তৎসম্বন্ধে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্তব্য সভ্য নয়। “গণ-রাজ” মুর্শিদাবাদের “জনৈক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতার” একখানি পত্রের অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাংলাদেশের ছই অংশের মধ্যে তিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইতে পারে বলিয়া এই পত্রখানি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই মনে হয়। কেন এরূপ অনাচারের প্রস্তর দেওয়া হইতেছে, “গণরাজে” বর্ণিত একটি ঘটনায় তাহার সন্ধান পাওয়া যায়।

“আন্তর্জাতিক মিনিয়ন চুক্তি তখনও হয় নাই। মুর্শিদাবাদ হইতে প্রতিদিন—( ২৪ ঘণ্টা ) গরু ছাগল, চাউল আটা, তেল ঘি, চিনি লবণ, কাপড় করল প্রভৃতি গুপ্তপথে পদ্মা পার হইয়া যায়। সাধারণে দেখে সবই, বলিতে ভয় পায়। অসাধারণে দেখিলে চোরাকারবারীর কাছে বিধিমতে অর্থগুপ্তি লইয়া মাল ছাড়িয়া দেয়। এহেন কাঁকা ছ’পয়সা রোজগারের একটি লোভনীয় সুযোগ ভাগ্য ক্রমে ষাথ ক্রয় বা প্রোকিওরমেন্ট বিভাগের এক ইন্সপেক্টরের জুটিয়া যায়। অভাগা কিছু খাইয়া—পাকিস্তান-গামী মাল ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু তাহার এই খাওয়ার কথা কোনও প্রকারে বড়কর্তা জানিয়া ফেলেন। বড়কর্তা ইন্সপেক্টরকে তলব করিয়া খাওয়ার বিবরণ জানিতে চান। ইন্সপেক্টর অকপটে সব স্বীকার করেন : “হ্যাঁ স্যার, আমি খেয়েছি। তবে আমি কিছু না খেলেও তারা মাল পার ক’রে দিতই। কোন রকমেই আমি তাদের বাধা দিতে পারতাম না। কাজেই, মাল যখন চলে যাবেই, তখন আমার পাণ্ডনাটা বাদ যায় কেন?”

আর একটি অভিজ্ঞতা আরও চমৎকার। তাহাতে মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের শতকরা পঞ্চাশ জন চোরাকারবারীর খোঁজ পাওয়া যায়।

“আমাদের জনৈক মাড়োয়ারী বন্ধু প্রোকিওরমেন্ট করিতেন এবং সরকারী চাউলের বস্তা পিছু মাত্র এক সের

ওজন ধরিয়া লইতেন। প্রৌকিওরমেটে ঝাঁহারা মুসলমান রাজত্বে কার্য্য করিতেন তাঁহাদের অনেকে এখনও আছেন—তাঁহারা সং, অনাহারী (অর্থাৎ ঝাঁহারা খাইতে জানেন না) এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন কর্মচারী ছিলেন বলিয়া, আমাদের বন্ধু পঁচিশ হাজারের পর পঞ্চাশ হাজারে ধরা পড়েন এবং তাঁহার এজেন্সী চলিয়া যায়। অবশ্য নাম বদলাইবার ফলে এজেন্সী তাঁহার হাত ছাড়া হয় নাই। ব্যবসায়ের খাতিরে বিবিধ চূর্ণীতির আঁটখাটী জানা থাকায় তিনি বলেন যে গবর্ণমেন্টের কাজ একবার পাইলে সহজে যাইত না; তদ্বির থাকিলেই চলিত। সে দিন কথ্য ছিলে তিনি বলিয়া ফেলেন যে ১৫ই আগষ্টের পর হইতে তাঁহারা অর্থাৎ মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা সর্ববিধ অপকর্ম ছাড়িয়া দিয়াছেন, কিন্তু তৎসঙ্গেও কি সরকারে কি সাধারণে তাঁহাদের চূর্ণীম থাকিয়াই যাইতেছে। বন্ধুর ক্ষোভের কারণ বুঝিতে চেষ্টা করিয়া সাঙ্গনা দিয়া বলিয়াছিলাম : “এ যে বসন্তের দাগ জন্মে না মিলায়।”

### চাউল সংগ্রহে সরকারী ব্যবস্থা

চাউল সংগ্রহে ঘোষ মজ্লীসভার সরবরাহ সচিব আশ্রিত পোষণের সুবিধাজনক যে অদ্ভুত পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বুঝা যায় যে উহাতে আর যে কাজ হউক না কেন, চাউল সংগ্রহ হইবে না। ইহার ফলে কলিকাতার রেশন ব্যবস্থাও প্রায় ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। ত্রিচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী তাঁহার কর্মক্ষেত্রে ডায়মণ্ড-হারবার মহকুমায় চাউল সংগ্রহের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই মহকুমায় ধান চাউল সংগ্রহকার্য্যে তিনি মূলতঃ তাঁহার দলভুক্ত কংগ্রেস কর্মীদেরই পারমিট দিবার বন্দোবস্ত করিয়া ছিলেন। মহিলারাও এই অমুগৃহীতের তালিকা হইতে বাদ পড়েন নাই। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার রিপোর্টে প্রকাশ যে এই অমুগৃহীত কংগ্রেস কর্মীদের অনেকেই ছিলেন স্ব স্ব অঞ্চলের স্বনামখ্যাত চোরাকারবারী। অবশিষ্ট অনেকের এত বড় কাজে হাত দিবার উপযুক্ত আর্থিক সংস্থান না থাকায় দরদার নিজেদের নামের পারমিট প্রাপ্তঃই দাগী ব্যবসাদারদিগের নিকট হস্তান্তরিত করিয়া ধরে বসিয়াই মোটা লাভ করিতেন।

ডাঃ বিধান রায়ের মজ্লীসভার আমলে এই ব্যবস্থা লোপ হইয়াছে কিন্তু তার পরিবর্তে অল্প যে ব্যবস্থা চালু হইয়াছে তাহাও সুবিধাজনক নহে। ভাণ্ডারী মহাশয়ের অমুগৃহীত পদ্ধতির কতকটা বর্তমান সরবরাহ সচিব মহাশয় পরিবর্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার আয়ুল সংশোধন তিনিও করেন নাই, অথবা করিতে পারেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ চব্বিশ

পরগণা জেলার কথা ধরা যাইতে পারে। হাঁড়া হইতে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত যে পাকা রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে তাহাকে কড়ন লাইন ধরিয়া গোটা ডায়মণ্ডহারবার মহকুমাকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। রাস্তার দক্ষিণ দিকের চাউল উত্তর দিকে যাওয়া বারণ। ফলে রাস্তার দক্ষিণ দিকের চাউলের দর ১৪ টাকা, কিন্তু রাস্তার ঠিক অপর পাশেই সেই চাউল বিক্রয় হইতেছে ২২ টাকা হইতে ২৪ টাকা দরে। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই এপার হইতে ওপারে বে-আইনী ভাবে চাউল চালান দিবার চেষ্টা বেশ ভাল ভাবেই দেখা দিবে। এই চোরাকারবারে বড় বড় রুই কাতলা হইতে চূর্ণাণ্ট অনেকেই আছে। রুই কাতলার স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের হাত তৈলসিক্ত করিয়া তাহাদের কারবার ঠিক চালাইয়া যাইতেছে। সরকারী রোষের সমস্তটা আসিয়া পড়িতেছে মাথামুটে, গরীব চাষী আর ভূমিহীন দিনমজুরদের উপর।

### সুন্দরবনের চাষী

কলিকাতার চল্লিশ মাইলের মধ্যে চব্বিশ-পরগণায় সুন্দর-বন এলাকা। রাজধানীর এত নিকটে বাস করিয়াও এখানকার প্রজারা যে চূর্ণদশার মধ্যে বাস করে তাহা অবর্ণনীয়। রাস্তাঘাট নাই, পানীয় জল নাই, স্কুল, ডাক্তারখানা নাই, পোষ্ট অফিস নাই—তার উপর আছে কয়েক বৎসর পর পর নোনা জলের বহা। সাধারণ বহা এবং নোনা জলের বহার মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ। সাধারণ বহার জল সরিয়া গেলে লোকে হাঁক ছাড়িয়া বাঁচে, ঘরবাড়ী পরিষ্কার করিয়া আবার স্বাভাবিক কাজকর্মে মন দিতে পারে। নোনা জলের বহায় তাহা হয় না। এই বহায় ধানক্ষেতে লবণ পড়িয়া তিন বৎসরের জন্ম জন্মি নষ্ট হইয়া যায়, চাষ হয় না। পুকুরে নোনা জল ঢুকিয়া পানীয় জল নষ্ট হইয়া যায়, মাছগুলিও মরিয়া যায়। গরুবাছুরের পায়ে ও মুখে এক প্রকার ক্ষত দেখা দেয়, ফলে অল্প দিনের মধ্যে গৃহপালিত পশু নষ্ট হইয়া যায়। ঘরবাড়ীতে নোনা ধরিয়া ঐগুলিও যেসময়ের অতীত হইয়া পড়ে। সুন্দরবন এবং কাঁধি অঞ্চলে এই সব কারণে নোনা জলের বহাকে স্থানীয় লোকেরা ভয়ানক ভয় করে।

নোনা জলের বহায় চাষী এবং স্থানীয় গরীব লোকদের সমুদ্র ক্ষতি হইলেও এক শ্রেণীর লোকের লাভ আছে। ইহার স্থানীয় জমিদার ও ছোতদার। সুন্দরবন অঞ্চলের প্রজাবৃত্ত আইন এমন যে জমিতে লবণ ধরিয়া তিন বৎসর চাষ না হইলেও খাজনা মকুব হয় না। ঐ খাজনাও প্রজার নিকট হইতে আদায় করা হয়। যে প্রজা উহা না দিতে পারে তাহাদের নালিশ করিয়া তাহাকে উচ্ছেদ করা হয় এবং

প্রাণের দায়ে সে আবার ঐ জমিই নতুন সেলামী দিয়া নতুন করিয়া ইজারা লইতে বাধ্য হয়। এই কারণে চার-পাঁচ বৎসর পর পর এই এলাকায় বড়া হওয়া এক শ্রেণীর লোকের পক্ষে লাভজনক এবং আশ্চর্যের বিষয় ঠিক এই ভাবেই বড়াও হইয়া থাকে।

প্রজাদের জ্ঞাত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মাথাব্যথা ছিল না কিন্তু কোন কোন ইংরেজ বিবেক বজায় রাখিয়া চাকুরি করিতেন বলিয়া প্রজারা মাঝে মাঝে হিতকারী বন্ধু পাইয়া একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিত। সুন্দরবনের সারেস্বাবাদ অঞ্চলের হৃদয় দেখিয়া কালেক্টর ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলেন যে এখানে বাঁধ না দিলে নোনা জলের প্রাবন কিছুতেই বন্ধ করা যাইবে না। পি-ডার্লিউ-ডি ইহাতে আপত্তি করে কারণ বাঁধ মেরামত ও উহা ঠিক মত বজায় রাখিবার দায়িত্ব তাহাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। গবর্ণমেন্টের কোন বিভাগের সহিত কোন বিভাগেরই সংযোগিতা নাই, বরং প্রত্যেক যেন প্রত্যেকের সম্বন্ধে একটা armed neutrality-র ভাব লইয়া কাজ করে। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের যুক্তির সম্মুখে পি-ডার্লিউ-ডির অস্থায়ী আপত্তি টিকিল না, সারেস্বাবাদের বাঁধ দেওয়া হইল। প্রজারা রক্ষা পাইল। বাঁধ রক্ষার ভারপ্রাপ্ত এসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার বিবেকরান লোক-বলিয়া প্রত্যেক বৎসর উহাতে মাটি পড়ে, কাজেই বাঁধটি বজায় থাকে। সম্প্রতি এই ভদ্রলোক বদলী হইয়াছেন এবং তাঁহার স্থলে মিনি আসিয়াছেন তিনি দিনগত পাগক্ষয় করিয়া চাকুরি বজায় রাখাই বোধ হয় জীবনের ব্রত মনে করেন। বর্ষার আগে বাঁধ কাঁকড়া প্রভৃতি চুকিয়া গর্ত করে এবং ঐ সব গর্ত মাটি দিয়া বুজাইয়া না ফেলিলে উহাতে জল চুকিয়া বাঁধ ভাঙিয়া যায় এটা সব কর্মচারী জানেন, স্থানীয় লোকেরা ভোজানেই এবার সারেস্বাবাদের বাঁধ মাটি দিয়া গর্ত বুজাইতে ইঞ্জিনিয়ার অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া স্থানীয় লোকেরা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় না। এই গাফিলতির জন্ত শেষ পর্যন্ত বাঁধটি ভাঙে। নোনা জলের বড়ায় প্রায় ৬০ হাজার বিঘা জমির সর্বনাশ হইয়া যায়। ২২শে মে এই ঘটনা ঘটে। প্রায় পক্ষকাল পর ‘সাহায্য দেওয়া হইতেছে’ এই ধরনের কতকগুলি ভাসাভাসা উক্তি পূর্ণ একটা প্রেসনোট প্রকাশিত হয় কিন্তু দুর্গতদের সাহায্য করা বা যাহাদের দোষে শত শত লোকের এইরূপ সর্বনাশ ঘটিল এবং ৬০ হাজার বিঘা জমি বর্তমান ফসলের চানচানির দিনে তিন বৎসরের জন্ত নষ্ট হইয়া গেল তাহা তদন্তেরও কোন ব্যবস্থা হইল না। বাঁধ ভাঙিয়া গেলে লোকের সাহায্যের জন্ত কালেক্টরকে অপরিমিত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কালেক্টর এখন বাঙালী কিন্তু তিনি তাহা প্রয়োগও করিলেন না, ঘটনাস্থলে গিয়া দুর্গতদের পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের হৃদয়

মোচনের কোন চেষ্টামাত্র করিলেন না। সেচমন্ত্রী ত্রিভূপতি মজুমদার, রাজস্ব মন্ত্রী ত্রিবিমলচন্দ্র সিংহ এবং সাহায্যমন্ত্রী ত্রিনীকুঞ্জ মাইতি ঘটনাস্থলে গিয়াছেন কিন্তু ত্রিবিমল সিংহ কিছু জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছাড়া আর কেহই কিছুই করেন নাই। এ সম্বন্ধে সুন্দরবন প্রজামণ্ডল সমিতির ব্রহ্মচারী ভোলানাথ যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার কৃতকাংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। ব্যাপারটা লইয়া এখনও কি ভাবে গড়িমসি চলিতেছে উহা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

সুন্দরবন প্রজামণ্ডল সমিতির যুগ্মসম্পাদক ব্রহ্মচারী ভোলানাথ জানাইতেছেন—“ক্যানিং ও ভাদ্র অঞ্চলে প্রাবন ও সরকারী সাহায্য ব্যবস্থার সংবাদ বাহির হইয়াছে। সরকারী সাহায্যের সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, সরকার পুরাতন আমলাতন্ত্রী মনোভাবের এটুটু উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। গত ২২শে মে একটি বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হইয়াছে, সেচমন্ত্রী ও অস্থায়ী সরকারী কর্মচারীরা ২৬শে মে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। ২রা ও ৩রা জুন বৈঠক বসিয়াছে কিন্তু অতাবধি সাহায্যের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই, সরকারী সংবাদে যে সমস্ত বন্দোবস্তের কথা (পানীয় জলদান, নলকুল মেরামত, কুঠিরে সাহায্য ইত্যাদি) উল্লিখিত হইয়াছে তাহার কোন ব্যবস্থা হয় নাই; শুধু একখানি জলসরবরাহের নৌকা ৭ই জুন হইতে ঐ এলাকায় যাইতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, সরকার কোন হুগ্রে খবর পাইয়া লিখিতেছেন যে ‘সাহায্যের ব্যবস্থা হইতেছে’ এবং ‘সাহায্য দেওয়া হইয়াছে’? আজ এক পক্ষকাল ধরিয়া সরকার যে ভাবে শব্দক গতিতে অগ্রসর হইতেছেন তাহা বাধীন দেশের জনপ্রিয় সরকারের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা নয় কি?”

“গত ৭ই জুন ক্যানিং-এ মাননীয় মন্ত্রী ত্রিবিমলচন্দ্র সিংহের উপস্থিতিতে এবং দৈনিক ভারত পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ত্রিদেবজ্যোতি রথের সভাপতিত্বে একটি ‘সুন্দরবন সম্মেলন ও প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী’ অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সরকারী প্রেসনোটের দিকে মাননীয় রাজস্বমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আলোচনা করা হয়। মন্ত্রী মহাশয় ঐ খানেই ১৪খানি পানীয় জলসরবরাহকারী নৌকার ব্যবস্থার জন্ত আলিপুরের সদর মহকুমা হাকিমকে নির্দেশ দেন। জানি না এই ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে আবার কোন আমলাতন্ত্রী হিসাব নিকাশের বেড়াফাল সৃষ্টি হইবে। তবে এই প্রসঙ্গে আমাদের জানান দরকার যে, এই ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে নৌকা পিছু সরকারকে অন্ততঃ মাসে ১৪০ টাকা (এক জন মাষি ৫০ ও ২ জন দাঁড়ি ৩০ টাকা হিসাবে ৬০ টাকা এবং নৌকা ভাড়া ৩০ টাকা) খরচ করিতে হইবে।

“আমরা জানি যে, ‘২৭ নং ট্রেজারী রুল’ অনুসারে

প্রত্যেক জেলা কর্তৃপক্ষকে সরকার অসীম ক্ষমতা দান করিয়াছেন এবং এইরূপ ঘটনায় যখন জনসাধারণের ধন ও প্রাণ-বিপন্ন হয় তখন তিনি ঐ ক্ষমতাবলে প্রয়োজনমত যত বৃসী ইচ্ছা টাকা ট্রেন্ডারী হইতে তুলিতে পারেন। আজ পনেরো-ষোল দিনের মধ্যেও ২৪-পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কি ঐরূপ একটি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করিলেন না? অতিশয়োক্তিপূর্ণ বিভিন্ন বিবৃতি দাখিল করা অপেক্ষা ঐরূপ দ্রুত কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন সাধারণের বেশী উপকারে আসিত।

“আমরা আরও জানাইতে চাই যে, সারেক্ষাবাদের যে বাঁধ লইয়া অনেক কথাবার্তা হইতেছে এবং জনসাধারণের আশঙ্কা এবং আবেদন সত্ত্বেও প্রেসনোটে সরকার ঘোষণা করিলেন যে, এখানে বাঁধ হওয়া সম্ভব নয়, সেই বাঁধ সম্বন্ধে রাজস্বমন্ত্রী ত্রিবিমলচন্দ্র সিংহ ক্যানিঙে বলিয়া আসিয়াছেন যে, তিনি রাজস্ব বিভাগ হইতে টাকা দিয়া ঐ স্থানে বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা করিবেন এবং এ সম্পর্কে সম্মেলনে উপস্থিত আলিপুরের সদর মহকুমা হাকিমের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং অনতিবিলম্বে বাহাতে লোকজন সংগৃহীত হইয়া বাঁধ নির্মাণ আরম্ভ হয় সেইভাবে নির্দেশ দিয়াছেন। প্রেসনোটে সরকার কোন ঘোষণা করিতেছেন যে, ঐ স্থানে বাঁধ নির্মাণ অসম্ভব, তাহা আমাদের ধারণার বাহিরে।”

এই বিবৃতি হইতে সন্দেহ হয় পি-ডব্লিউ-ডি, এখনও নিজেদের জিদ বজায় রাখিয়া বাঁধ নির্মাণে বাধা দিয়া কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে এবং মন্ত্রীরা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ দুর্বলতা এবং শাসনকার্য্যে অজ্ঞতা ও অযোগ্যতার জন্য এই আপত্তি কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইংরেজ আমলেও এই শ্রেণীর ঘটনায় উদ্ভটন কর্তৃপক্ষ সরকারী কর্ম-চারীদের সম্বন্ধে কতখানি কঠোরতা অবলম্বন করিতেন একটি ঘটনা উল্লেখ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

কাঁথিতে বিয়াল্লিশের বস্তার কয়েক বৎসর আগে আর একবার প্রবল বড়া হয় এবং বহু সহস্র লোক উহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ইংরেজ, বিভাগীয় কমিশনারও ইংরেজ। ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট দেন বড়া ভয়াবহ রকমের হইয়াছে আন্তঃসাহায্য প্রয়োজন; কমিশনার রিপোর্ট দেন বিশেষ কিছুই হয় নাই। বাংলা-সরকার কমিশনারের রিপোর্ট গ্রহণ করিয়া বিষয়টি বামাচাপা দেন। ম্যাজিস্ট্রেট ভারত-সরকারের হোম সেক্রেটারীকে পত্রে বিষয়টি সবিস্তারে জ্ঞাপন করেন, ভারত-সরকার গবর্নরকে তদন্তের জন্ত অনুরোধ করেন। তদন্তে প্রকাশ পায় ম্যাজিস্ট্রেটের বিবরণই সত্য, বড়া ভীষণ রকমের হইয়াছে। এই ভুল রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বিভাগীয় কমিশনারকে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট, বিভাগীয় কমিশনার,

এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কাঁহারও একটা কৈফিয়ৎ পর্য্যন্ত তলব হইল না। মন্ত্রীরাও পরম নির্বিকার।

### প্রাথমিক শিক্ষকদের দুর্দশা

মুশিদাবাদের প্রাথমিক শিক্ষক সতীশচন্দ্র প্রামাণিক অর্থাভাবে বিব্রত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন—এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক প্রেসনোটে জারী করিয়া বলেন যে, মানসিক বৈকল্য, পারিবারিক অশান্তি এবং একটি বৃনের মামলার সাক্ষ্যদান এই আত্মহত্যার কারণ। প্রেসনোটে বলা হয়, “বকেয়া বেতন না পাওয়ার জন্য উক্ত প্রাথমিক শিক্ষক আত্মহত্যা করিয়াছেন—শিক্ষা বিভাগ তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না।” মুশিদাবাদ জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ত্রিনিমাল্য বাগচী সতীশচন্দ্র প্রামাণিকের মৃত্যু সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতেই প্রকৃত তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ১৫ টাকা অথবা তাহার খুব কাছাকাছি। এই সামান্য টাকাও যদি নিয়মিত না পাওয়া যায় তবে মানুষের এই বাজারে কি অবস্থা হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। সতীশবাবু জাহ্নুরারী, ফক্কয়ারী, মার্চ এবং এপ্রিল এই চারি মাস—অর্থাৎ তাঁহার আত্মহত্যার দিন পর্য্যন্ত বেতন পান নাই। বাগচী মহাশয়ের বিবৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে তাঁহার জাহ্নুরারী ও ফক্কয়ারী মাসের বেতন ২৬শে মে তারিখে অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর ১২ দিন পরে এবং মার্চ ও এপ্রিল মাসের বেতন ২৯শে মে তারিখে অর্থাৎ জুল ইন্সপেক্টরের উপস্থিতিতে সরকার কর্তৃক মৃত্যুর তদন্তের পূর্বেদিনমনি অর্ডারযোগে সতীশবাবুর নামে প্রেরিত হয়। আসল ব্যাপার এই যে, আত্মহত্যার সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়ার পর স্কুল-বোর্ড এবং স্কুল-ইন্সপেক্টর তাড়াতাড়ি মনি অর্ডারে টাকা পাঠান এবং নিজেদের গাফিলতি চাপা দিবার জন্য মৃত ব্যক্তির নামে টাকা পাঠানো হয়। চারি মাসের টাকা না পাওয়ার চরম দুর্দশার পড়িয়া ভদ্রলোকের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটয়া থাকিলে বাঁহাদের দোষে টাকা যায় নাই তাঁহার। তার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। সরকারী ইন্তাহারে পরিষ্কার বলা হইয়াছে তাঁহার মানসিক বৈকল্য ঘটয়াছিল এবং এই কথা বলিয়া গবর্নমেন্ট তাঁহাদের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাগচী মহাশয় দেখাইতেছেন যে, সতীশচন্দ্র তরা যে পর্য্যন্ত বিভাগলয়ে রীতিমত কাজ করিয়াছেন; কোন রূপ মানসিক বৈকল্য বা বিমর্ষতা যদি দেখা দিয়া থাকে তবে তাহা ৪ঠা হইতে ১২ই তারিখের মধ্যে ঘটয়াছে। ইহা নিশ্চিত যে সতীশচন্দ্র প্রামাণিক একাদিক্রমে চার মাসের বেতন পান নাই এবং তার জন্য তাঁহাকে অনশনে পারিবারিক অশান্তি এবং বিমর্ষতার মধ্যে কাটাইতে হইয়াছে। এই

অবস্থায় অকস্মাৎ জীবনে বীতশৃঙ্খল হইয়া কেহ যদি আত্মহত্যা করিয়া বসে তবে তাহাকে মানসিক বৈকল্যের ফল বলিয়া এড়াইবার চেষ্টা চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অত্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থাও যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে নিম্নলিখিত দুইটি বিষয়ই হইতে তাহা বুঝা যাইবে। গবর্নমেন্ট এখনও এই দুঃসহ অবস্থার প্রতিকারে অগ্রণী হইবেন কিনা আমরা জানি না। ত্রিশশাঙ্কশেখর সান্যাল লিখিতেছেন :

“মুশিদাবাদ জেলা স্কুল বোর্ডের শাসন পরিচালনা যে-কি পরিমাণে জটিলপূর্ণ আমি তৎপ্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহুসংখ্যক শিক্ষক এই দুর্ভিক্ষের বাজারে কিরূপে অবস্থায় কাল কাটাঁইতেছে, তাহা বিচার করিলেই উহা প্রমাণিত হইবে। বরহাট অর্ধবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত মহাশয়ের ৫ মাসের বেতন, সেকেন্ড পণ্ডিতের ১০ মাসের বেতন ও থার্ড পণ্ডিতের ১৩ মাসের বেতন বাকি পড়িয়াছে। ইহাদের নাম যথাক্রমে ত্রীনীলকান্ত ভট্টাচার্য্য, ত্রীললিতমোহন চাট্টোপাধ্যায় ও ত্রীশঙ্করপদ গোসাঁই।”

বালীর ত্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন :

“বাংলাদেশের প্রত্যেক পল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জেলা স্কুলবোর্ডের আদেশে ছাত্রদের নিকট হইতে কোন বেতন গ্রহণ না করিতে বলা হইয়াছে এবং শিক্ষকগণের বেতন দিবার দায়িত্ব স্কুলবোর্ড গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার ফলে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই অর্ধবৈতনিক কিন্তু শিক্ষকগণের মাসিক বেতন যে কত তাহা এ পর্য্যন্ত জানা গেল না। পূর্বে তিন মাস বা ছয় মাস অন্তর তিন মাসের বেতন একত্রে মণিঅর্ডারে আসিত; মণিঅর্ডারে টাকার অঙ্ক দেখিয়া শিক্ষকেরা খির করিতেন নিজ নিজ পারিশ্রমিকের পরিমাণ। এই মাসে অর্থাৎ জুন মাসে দেখা গেল শিক্ষকগণের মার্চ মাসের বেতন বাবদ কাহারো ভাগ্যে ১৪, কাহারো ১২, ১০ এমন কি ৮ পর্য্যন্ত। আট টাকা বেতন গ্রহণ করিয়া যদি কোন হতভাগ্য শিক্ষকের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে এবং সেইজন্য যদি আত্মহত্যা করে তবে সে দোষ আর যাহার হট্টক নিশ্চয়ই সরকারী জটিল ফলে নহে। ইহা কি অদৃষ্টের পরিহাস না ধৈর্যের পরীক্ষা?”

### পশ্চিম বাংলার সামরিক সংগঠন

কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতার বাংলা দৈনিক পত্রিকায় একটা সংবাদ প্রকাশিত হয় যে এখনও ভারতবর্ষের সৈন্যবাহিনীতে বাঙালী সৈনিকেরা স্থান পাইতেছে না; ইংরেজের আমলের ব্যবস্থা এখনও অটুট আছে; বাঙালীকে “সামরিক

জাতি” এই বদনাম দিয়া দূরে সরাইয়া রাখিতে হইবে। এ কথা কল্পনা করা যায় যে বর্তমানে যাহারা সৈন্যবাহিনীর উপর কর্তৃত্ব করিতেছেন, সেই বিভাগের সৈন্যবাহিনীদের বাঙালীকে “সামরিক জাতি” করিয়া তুলিবার জন্ত তাগিদ বা অবসর নাই; কাশ্মীর রণাঙ্গনে ব্যস্ত আছেন তাহারা; হাতের কাছে যে আয়োজন পাইয়াছেন, তাহা দিয়াই কর্তব্য প্রতিপালন করিয়া যাইতেছেন। আমরা শুনিয়াছি যে, কাশ্মীর রণাঙ্গনে বাঙালী সৈন্যবাহিনী আছেন, কয়েক জন, কিন্তু বাঙালী সৈনিক একজনও নাই। গণপরিষদের সদস্য ত্রী কে. শান্তনয় কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই কথা বলেন—কাশ্মীরে বাঙালী সৈন্যবাহিনী দেখিলাম, বাঙালী সৈন্য দেখিলাম না; অস্ত্রের কারণ ইংরেজ আমলে কোন বাঙালী সৈন্যবাহিনী গঠিত হয় নাই। তিনি এই বিষয়ে তৎপর হইবার জন্ত গবর্নমেন্টের নিকট আবেদন করেন।

কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের এই বিষয়ে কোন বিশেষ দায়িত্ববোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। সর্দার বলদেব সিংহ যে কাঠামো পাইয়াছেন, তাহার সাহায্যে কাজ চালাইয়া যাইতেছেন; যে-সর অঞ্চলে সৈন্যবাহিনীর জন্ত লোক সংগ্রহ করা হইতে সেইখানেই “রংলট মেলা” বসাইয়া সেনাদলে যোগদান করিবার জন্ত আহ্বান করা হইতেছে; যুক্ত প্রদেশের পার্শ্বত্যা অঞ্চলে, মহারাষ্ট্রে, মাদ্রাজে, আসামের পার্শ্বত্যা অঞ্চলে এই বিষয়ে চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া শুনিয়াছি। পশ্চিম বাংলার কেন হয় নাই, এই বিষয়ে কেহ প্রশ্ন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব জানিতে পারিলে স্তুতি হয়।

তৎপূর্বে পশ্চিম বাংলার মস্তিষ্কগুলিকে উত্তোষিত হইতে হইবে। তাহাদের প্রচার বিভাগের মারকতে জানিতে পারিয়াছি যে “জাতীয় ক্যাডেট কোর” সংগঠনের কার্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এই “ক্যাডেট কোর” সৈন্যবাহিনী প্রণীত হইয়া তুলিবার আয়োজনের প্রারম্ভ মাত্র। কিন্তু আমরা যে বাঙালী পণ্টনের কথা বলিতেছি, তাহার ব্যবস্থা ইহার মধ্যে নাই। পশ্চিম বাংলার জাতীয় রক্ষিবাহিনী দল গড়িবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে; ইতিমধ্যে কয়েক শত পূর্বে সীমান্তবাসী গ্রামিক লোককে সামরিক অ, আ, ক, খ, গ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে; এই শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের মধ্য হইতে বাঙালী পণ্টনের লোক সংগ্রহ করা যাইবে বলিয়া মনে হয় না; ইহারা বড়ই “ঘরমুখো”, ছাপোষা লোক একরূপ একটা কথা আছে। “টেরিটোরিয়াল ফোর্স” নামে পরিচিত যে সৈন্যবাহিনী গঠনের ব্যবস্থা হইতেছে তাহার মধ্যে হইতে বাঙালী পণ্টনের জন্ত লোক সংগ্রহ করা একমাত্র উপায় বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে, কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের রূপকর্তা “রংলট” নীতির কল্যাণে বাঙালীর সামরিক শিক্ষা ব্যাহত হইতে পারে।



এই নীতি পার্শ্বত্ব জাতির মধ্যে বরং নিবন্ধ রাখার প্রথা মানিয়া লইয়াছে ; পশ্চিম বাংলার উত্তরাঞ্চলে যে সব পার্শ্বত্ব জাতি আছে কেবল তাহাদের মধ্যে হইতে ১৩,০০০ হাজার টেরিটোরিয়াল ফোর্স সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না ।

আর একটা বাধার কথা আমাদের জানিয়া রাখা প্রয়োজন—কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের সামরিক কর্তৃপক্ষের মনে নাকি একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে বাঙালী সামরিক জীবনের সংযম ও নিয়মকানুন মানিয়া লইতে চাহে না ; তাহারা এমন আত্ম-স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় যে সামরিক জীবনে বাক্য ও কার্যে যে স্বাধীনতার অভাব অপরিহার্য্য এই বিধান তাহারা মানিতে প্রস্তুত নয় । বাঙালী বাহারা নৌ-বিভাগে ও বিমান-বিভাগে যোগদান করিয়াছেন তাহাদের মুখে এরূপ ধারণার ইঙ্গিত পাইয়াছি । বাঙালী সমাজের নেতৃবর্গের এই বিষয়ে অবহিত হওয়া এবং শিক্ষা দীক্ষার ভিতর দিয়া এইরূপ মনোভাবের সংস্কার-সাধন করা উচিত । ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ভাল কি মন্দ তাহার আলোচনা সামরিক জীবনে আবাস্তর । স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে সকল স্ত্রী-পুরুষকেই রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নিজ নিজ স্বাধীনতা সঙ্কট করিতে হয় । অতঃকোন পথ কাহারও জানা নাই । গান্ধীজীর অহিংস সমাজ-ব্যবস্থায়ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্কটের নিয়ম ছিল ।

এই সব কথা ও যুক্তি আলোচনা করিয়া মনে হয় পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত । কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের নিকট এরূপ অধিকার পাইবার দাবী করিতে হইবে । বাঙালী “অসামরিক জাতি” এই কলঙ্ক মোচনের জন্ত আমাদের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে । এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা সফলতার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে করি । আমরা এই বিষয়ে পশ্চিম বাংলার সকল শ্রেণীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি । গবর্ণমেন্ট ও বিধিবিভালয় তাহাদের কর্তব্য করিবেন তখনই যখন জনমত তাহাদের উপর চাপ দিয়া কর্তব্যকর্মে বাধ্য করিবে । গণতন্ত্র আর কোন উপায় নাই ।

### আসাম সরকারের কার্যকলাপ

আসাম সরকারের কার্যকলাপে ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে একটা জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে । অসমীয়াদের বাঙালী বিদ্বেষ রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার সঙ্কট করিতেছে—ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকবর্গের আসাম প্রদেশে বসবাস করিবার অধিকার নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি কোন্ প্রদেশের আছে কিনা, এই প্রশ্ন তুলিয়া চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার সময় আসিয়াছে । শীঘ্রই গণপরিষদের যে অস্মি বৈশন আরম্ভ হইবে, সেই সময়ে বাঙালী সদস্যবর্গের অঙ্গীকার হইয়া এই বিষয়ে একটা স্পষ্ট মীমাংসার চেষ্টা করা উচিত । কেবল আসাম প্রদেশেই

এই সমস্যা দেখা দেয় নাই ; বিহারেও তাহার একটা নয় মূর্তি আমাদের জাতীয়বাদকে বিজ্ঞপ্তি করিয়া যাইতেছে ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগে গোঁহাটিতে যে অসমীয়া উদ্ভাস দেখা দেয়, তাহার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে বিগত ২৫ বৎসরের ইতিহাস ঘাটিতে হয় । সে চেষ্টা না করিয়া যদি এক বৎসরের ঘটনাবলীর বিচার করা যায়, তবে এই উৎকট মনোভাবের একটা পরিচয় পাওয়া যাইবে । আসামের প্রদেশপাল সর আকবর হায়দারী ত আসাম ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়া বসিলেন যে, বাঙালীরা আসামে “বিদেশী” (foreigners) । আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ বড়দলৈ শ্রীহট্টের গণভোটের সময় তাহার প্রদেশে শ্রীহট্টের বাঙালী অধিবাসী সংখ্যা কমাইতে যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার বিষয় পূর্বে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বহুদিন পর্য্যন্ত বিবাক্ত করিয়া রাখিবে ।

আসাম ও শ্রীহট্টের বাঙালী নায়কগণ অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলিতে পারেন ; ভারতরাষ্ট্রের কল্যাণের জন্ত তাহারা মুখ বুজিয়া আছেন । এই সংঘর্ষের একটা অকল্যাণের দিকও আছে । গোপীনাথ বড়দলৈ, বিষ্ণুরাম মেধি, অম্বিকাগিরি রায়-চৌধুরী যে চিন্তাধারার বাহক তাহার ফল যে যত্নবশেষের মুখলের মত ভারতরাষ্ট্রের সংহতির পক্ষে মারাত্মক হইবে, এই বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই । আমরা মাসের পর মাস ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারগোষ্ঠীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্ত এই বিষয়ে আমাদের আশঙ্কার কথা প্রকাশ করিতেছি । প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়া প্রাদেশিকতার নিন্দা করিয়া কর্তব্য শেষ করিতেছেন ; সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দরাজ হাতে বাঙালীকে সম অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন । কিন্তু কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট এইরূপ অনাচারের কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না ।

এই উপলক্ষে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যত দিন শ্রীহট্ট আসামের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং আসামের মন্ত্রিমণ্ডলীতে শ্রীহট্টের প্রতিনিধি ছিল, তত দিন অসমীয়া মন্ত্রীমহোদয়গণের একটা চক্ষুলাজ্জার সংঘম ছিল ; গত জুলাই মাসের পর, শ্রীহট্টের গণভোটের পর, সে লজ্জার প্রয়োজন চলিয়া গিয়াছে । সর আকবর হায়দারীর বক্তৃতা তাহার প্রমাণ । আজ আমাদের অসমীয়া প্রতিবেশীবর্গ মনে করিতেছেন যে তাহারা দেশের (আসামের) দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়াছেন, এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা যখন তাহাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে তখন সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বানাইবাব শক্তিও তাহাদের জন্মিয়াছে । কিন্তু এই কথা তাহাদের তুলিয়া গেলে চলিবে না, গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রের ক্ষমতার চক্রব্যব পরিবর্তন হয় ।

আরও একটা কথা তাহাদের মনে রাখিতে বলি । আসামে চৌদ্দ-পনের লক্ষ মুসলমান এখনও আছে ; তাহাদের

মধ্যেই অধিক সংখ্যক বাঙালী; প্রায় দশ লক্ষ বাঙালী হিন্দু আছে। এই পঁচিশ লক্ষ বাঙালীকে বেশী দিন দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে, প্রায় পঁচিশ লক্ষ অসমীয়া ভাষাভাষী লোকসমষ্টির পক্ষে রাষ্ট্রের ক্ষমতা স্বীয় অধিকারে রাখা কঠিন হইবে। প্রায় কুড়ি লক্ষ পার্শ্বত্যা জাতি, তাহাদের বিশিষ্ট ভাষা ও সংস্কার লইয়া অসমীয়াদের দিকে বরাবর চলিয়া থাকিবে, এই কথা রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। আমরা জানি যে শ্রীযুত রোহিণী চৌধুরীর মত লোক মনে করেন তাঁহাদের সম্পর্ক পীত বর্ণ জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর। এইরূপ ভাব মাথায় না খেলিলে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিতে পারিতেন না যে অসমীয়াদের কেন্দ্রীয় শাসনকার্যে অধিকতর অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হউক, হয় কেন্দ্রীয় ভাষার হইতে আরও অধিক সাহায্য আসামের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট হউক, না হয় তাঁহাদের (অসমীয়াদের) বন্দীদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যাইবার সুযোগ দেওয়া হউক। এই কথা রোহিণী চৌধুরী মহাশয় অনেকটা ঠাট্টার ভাবে বলিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাট্টাটা অনেক সময় মনোভাবের মুকুর হইতে দেখা যায়।

এই সব ভবিষ্যতের কথা। যে ভাড়াগড়ার মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছি, তাহার কলাফল সম্বন্ধে কেহই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে না। তবে একথা সত্য যে বাঙালীকে ভারত-রাষ্ট্রের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আসামে ও বিহারে যে ভাণ্ড চলিতেছে তাহা বন্ধ করিতে হইবে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টকে অগ্রণী হইয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি অ-অসমীয়া ও অ-বেহারী আসামের ও বিহারের সীমান্ত রেখায় বাধাপ্রাপ্ত হয়, ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার যদি এই দুই প্রদেশের সীমান্তরেখায় গিয়া বাধা পায়, তবে ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের কোন মূল্য নাই। এই সংকীর্ণ মনোভাবই প্রাদেশিকতার প্রকৃত পরিচয়। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবর্গ এই বিসদৃশ পরিচয়ের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইতেছেন না। আবোলতাবোল বক্তৃতা দিয়া তিনি কালক্ষয় করিতেছেন। যে ক্ষিপ্ৰতা দেশীয় রাজ্যসমূহের সমস্তা-সংকুল অবস্থাকে অপেক্ষাকৃত সহজ করিয়াছে, তাহা কেন এই প্রাদেশিকতার সমস্তা সমাধানে প্রয়োগ হইতেছে না, সে রহস্য কে আমাদের বুঝাইবে?

### সোহরওয়ার্দি পর্ব

হুশেন শহীদ সোহরওয়ার্দির রাজনীতিক জীবনে আর একবার পটভূমিকার পরিবর্তন হইল। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কত রকম ভোল ফিরাইলেন তিনি। পশ্চিম বাংলার স্বরাষ্ট্র সচিব ত্রীকিরণশঙ্কর রায় এই বিষয়ে অনেক কথাই জানেন। জনসাধারণ আমরা যাহা জানি তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে

চাই। রাজনীতিক জীবনে প্রথম আমরা দেখি জনাব হুশেন সোহরওয়ার্দির দেশবন্ধুর সহকর্মীরূপে, কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়ররূপে। ছুই বৎসর যাইতে না যাইতে তিনি নিজ মূর্তি ধারণ করিলেন; হগ সাহেবের বাজারে এক জন মৃত ব্যক্তির কবরের ব্যাপারে আমরা তাঁহার “জেরাদী” মূর্তির আভাস পাই। এই ব্যক্তিটি যথেষ্ট কি ছিল কেহ সঠিক বলিতে পারে না; কেহ বলে তিনি ছিলেন খ্রীষ্টান; কেহ বলে তিনি ছিলেন মুসলমান; তিনি ছিলেন “দেওয়ানা” এবং হগ সাহেবের বাজারের মুসলমান কসাইরা তাঁহাকে পীর বলিয়া সম্মান করিত। তাহাদের আবদারে ডেপুটি মেয়র এই ব্যক্তির কবর দিতে দিলেন প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে। একটা বিব্রী আন্দোলনের সৃষ্টি হইল, এবং জনাব সোহরওয়ার্দি অলক্ষিতে কর্পোরেশন হইতে সরিয়া পড়িলেন। তারপর আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই “মিনা পেশওয়ারির” রক্ষকরূপে, এই শ্রেণীর লোকের সাহায্যে কলিকাতার অম-জীবী শ্রেণীর মধ্যে একটি দল গড়িয়া তুলিতে তিনি তৎপর হইয়া উঠেন। বর্তমান যুগে কলকারখানার সাহায্যে যে জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে “বস্তি” সকল তাহার একটা অপরিহার্য অঙ্গ; এই বস্তির মধ্যে যে লোকসমষ্টি বাস করে তাহাদের বলা হয় ইংরেজী ভাষায় “denizens of the underworld”—পাতালপুরীর অধিবাসী। আলো ও বাতাস-বজ্রিত এই লোকে যাহারা বাস করে, তাহারা সমাজের সাধারণ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অনেক সময়ে অ-মানুষে পরিণত হয়। জনাব সোহরওয়ার্দি এদের লইয়া খেলিতে গিয়া এদের কোন ভাল করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই; নিজে এদের দলপতি হইয়া অমিক আন্দোলনে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করেন।

তার পর তাঁহাকে দেখিতে পাই “শের-এ বাংলা” আবদুল করিম ফজলুল্লহক সাহেবের সহচররূপে। বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ তখন সরকারী চাকুরীর স্বাদ পাইয়াছে, “শের-এ-বাংলা” প্রধান মন্ত্রী হইয়া হাতে মাথা কাটিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন ভারিয়া হিন্দুকে “সাতানা” করিবেন বলিয়া শাসাইতেছেন। হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার মুসলমান রাজনীতিকের ব্যবসায়ের মূলধন—একমাত্র মূলধন হইয়াছে। জনাব সোহরওয়ার্দি এই খেলায় মাতিয়া গেলেন। “শের-এ-বাংলা” মুক্তহস্ত হইয়াও সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিবেন কেন? গবর্নর হারবার্ট সাহেবেরও না; জনাব হুশেন সোহরওয়ার্দির না। সুতরাং তাঁহাকে উজির-এ-আজমের তক্ত ছাড়িতে হইল। জনাব খাজা নাজিম উদ্দিন তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন; সোহরওয়ার্দি সাহেব হইলেন সরবরাহ মন্ত্রী, অর্থাৎ বাংলাদেশে ছয় সাত কোটি লোকের ভাত কাপড় সরবরাহ করিবার কর্তা। এই পদাধিকারের কল্যাণে দুই তিন বৎসরের

মধ্যে কোটি কোটি টাকা মুসলমান সমাজের হাতে আসিয়া পড়িল। এত বড় কুবেরের ভাণ্ডার যাহার হাতে, তাহার ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতাকেও ছাড়াইয়া যায়। ফলে ১৯৪৬ সালে আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশে জনাব হুসেন সোহর-ওয়ার্দ্ধিকে প্রধান মন্ত্রীরূপে। তখন “পাকিস্তানী” উম্মাদনা দেশের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিতে আরম্ভ করিল; “লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান” এই চীৎকারে মুসলমান সমাজের শুভবুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া গেল। এই লড়াই পরদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়; মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ এই বিষয়ে বিশেষ সাবধানী ছিলেন।

এই “লড়কে লেঙ্গে” গতিপ্রকৃতি প্রকট হইয়া উঠিল ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে। অপ্রস্তুত হিন্দু এই অপ্রত্যাশিত বিশ্বাসঘাতকতার প্রথম সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল; তার পর তাহার প্রাণ ও সম্মান রক্ষার আয়োজন করিতে বেশীক্ষণ লাগিল না। ফলে, “লড়কে লেঙ্গে” দল পলাইবার পথ পাইল না। এই অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে শুভ-বুদ্ধি ফিরিয়া আসিবে বলিয়া যাহারা ভরসা করিয়াছিলেন, তাহাদের চক্ষুর উপর আসিয়া উঠিল নোয়াখালি-ত্রিপুরার বীভৎসতা। কলিকাতা ও তাহার শিল্পাঞ্চল হইতে ব্যর্থ-মানস মুসলমান “জেহাদীরা” এই দুই জেলার হিন্দুর উপর কলিকাতার শোধ তুলিল। জনাব হুসেন সোহরওয়ার্দ্ধি বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী; নেতৃবৃন্দ আশা করিয়াছিলেন যে এই পদাধিকারের মারফতে তাহার হাতে রাষ্ট্রের যে ক্ষমতা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সদ্যবহার করিয়া “কাফেরকে” এমন একটা শিক্ষা দেওয়া যাইবে যে দেশের বৃকে মুসলমান প্রভুত্ব অটুট ও অটল হইয়া পড়িবে।

সেই সময় হইতে জনাব হুসেন সোহরওয়ার্দ্ধি মুসলিম-লীগের অ-বাঙালী নেতৃবৃন্দের নিকট খেলা হইয়া গেলেন। যত দিন তিনি বাংলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তত দিন একটা লোকদেখানো সম্মানের ঠাঁট তাহার বজায় ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর সেই ভদ্রতা রক্ষার প্রয়োজনও রহিল না। কায়দে-আজম (সুহদান নেতা) জিয়া দেখাইয়া দিলেন যে ছিন্ন বস্ত্রের শেষ আধার আস্তাকুড়ে। আর এ-ও হইতে পারে যে সোহরওয়ার্দ্ধি বিভাডন একটা অভিনয় মাত্র। ভারত-রাষ্ট্রে প্রায় ৪ কোটি মুসলমান রহিয়া গিয়াছে; ইহাদের অধিকাংশের “পাকিস্তানী” মনোভাব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এদের স্বার্থরক্ষার জন্ত একজন “পাকিস্তানী” নেতা ভারতরাষ্ট্রে রাখিয়া যাওয়া প্রয়োজন যিনি গান্ধীজীর কথা মুখে আওড়াইবেন এবং সেইজন্ত “পাকিস্তানীদের” বাহ শত্রুতা অর্জন করিবেন। “পাকিস্তানের” শত্রুতা তাহাকে ভারতরাষ্ট্রের মিত্রতার মুখোস পরাইয়া দিতে পারে। এই

মুখোস ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের অনেককেই বিভ্রান্ত করিবে। এই বিভ্রান্তি “পাকিস্তান” ধুরন্ধরবর্গের আকাজিক। নিজের রাষ্ট্রে “শরিয়তের” বিধান; প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় বিধানের ব্যবস্থা। এই পরস্পর বিরুদ্ধতাবের খেলায় স্বভাবতই একটা কুয়াসার স্রষ্ট হইয়াছে। সোহর-ওয়ার্দ্ধি বিভাডন অভিনয় এই কুয়াসা গাঢ় করিতে পারে। হইতে পারে এই ভরসায় একটা দাবার চাল দেওয়া হইল সোহরওয়ার্দ্ধি-নাজিমুদ্দিনের পুরাতন বৈরতার অজুহাতে।

### বাংলার মিউনিসিপালিটি

বাংলাদেশের মিউনিসিপালিটিসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের একটি সম্মেলন সম্প্রতি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় ৭১টি মিউনিসিপালিটির প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ত্রিচক্রেবর্তী রাজাগোপালাচারী সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া বলেন, কলিকাতার বাহিরের মিউনিসিপালিটিগুলির আর্থিক সচ্ছলতার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে, কারণ এ সকল স্থানের নাগরিক জীবন সর্বাঙ্গসুন্দর ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে না পারিলে কলিকাতার বাসস্থান সমস্তা ও শহর পরিচ্ছন্ন রাখার সমস্তা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে। বাংলার বিভিন্ন শহরের অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে চলিয়াছে। কিন্তু জনসাধারণকে কলিকাতায় অথবা ভীড় না জমাইতে অহরোধ করিবার পূর্বে এ সকল স্থান বাসোপযোগী ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার জন্ত পয়ঃপ্রণালী ও জল সরবরাহের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। লোকে যদি মঞ্চঃস্থল শহরে পরিবার লইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে না পারে তবে তাহারা স্বভাবতই ব্যবসা-বাণিজ্য ও আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রস্থল কলিকাতার দিকে ছুটিবে। নিশ্চিত স্বত্বাধিকার অপেক্ষা অনিশ্চিত অবস্থাকেও প্রেমঃ বলিয়াই লোকে বড় বড় শহরে আসিয়া ভীড় করে। এই সমস্তা সমাধানকল্পে কলিকাতার বাহিরের শহরগুলির আর্থিক সচ্ছলতা এবং বসবাসের সুব্যবস্থা বিধানের উপায় অবিলম্বে নির্ধারণ করিতে হইবে।

উপশহর গঠনের প্রতি বেশী ঝোঁক দেওয়া হইতেছে। মিউনিসিপাল শহরগুলিকে গড়িয়া তুলিবার দিকে মনোযোগ দিলে বাংলার বাসস্থান সমস্তার সমাধান অনেক সহজ ও অল্প সময়ে হইতে পারে। ৭১টি মিউনিসিপাল শহর বড় কম nucleus নহে। ১২টি জেলায় ১২টি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট গঠন করিয়া শহরগুলির উন্নতি বিধান করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। ইহাতে সরকারের এক পয়সা লোকসান নাই, অথচ দেশের ও দেশের লাভ। শহরের চতুর্পার্শ্বে জমি লইয়া ট্রাষ্ট সুপরিকল্পিত ভাবে শহর সম্প্রসারণ করিতে পারেন। ভিবেকার বিক্রয় করিয়া ট্রাষ্টের কাজের টাকা তোলা যায়। জমি বিক্রয়

আরম্ভ হইলে, টাকা উঠিয়া যাইবে। শহরে জল, রাস্তা, পয়ঃপ্রণালী এবং বিজলী বাতির ব্যবস্থা করিয়া দিলে বাকীটী লোকে আপনাই করিয়া লইবে। বাসস্থান-সমস্যার সমাধানের জন্ত এই দিকে অবিলম্বে মনোনিবেশ করা আবশ্যিক।

### পশ্চিম বঙ্গের সমুদ্র-তট

স্বাস্থ্যের অধেষণে বাঙালী বাংলাদেশের বাহিরে নানা স্থানে ঘরবাড়ী প্রস্তুত করিয়াছে। উড়িষ্যা পুরী, বারহামপুর, ওয়াশ্টিংটন, বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের দুই ধারে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর পর্যন্ত এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের দুই ধারে প্রায় প্রায় পর্যন্ত স্বাস্থ্যদেষীবর্গের কোঠাবাড়ী বাঙালীর প্রাচুর্যের যুগের পরিচয় দিতেছে। অনেক দিন পূর্বে একটা হিসাবে দেখিয়াছিলাম যে বাঙালীর এই সব সম্পত্তির মূল্য চার পাঁচ কোটি টাকার কম হইবে না। প্রাচুর্য হইতে এই ব্যয় হইয়াছিল বলিয়া কোন বাঙালী বাংলাদেশের বাহিরে এই ব্যয় লইয়া মাথা ঘামান নাই। আজ কি হিসাব করিবার দিন আসে নাই? বাংলাদেশে স্বাস্থ্যের উন্নতি বিশেষ হয় নাই; স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্ত বাংলাদেশের মধ্যেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা করিতে গেলে বাংলার সমুদ্রতটের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রবর্তক সজ্জের মুখপাত্র ‘নবসজ্জ’ এই বিষয় লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। যেদিনীপুর সমুদ্রতটে দীর্ঘ অঞ্চলে এইরূপ স্বাস্থ্যনিবাস নির্মাণের সুবিধা ও সুযোগ আছে। সেখানে স্বাস্থ্যনিবাস নির্মাণ সম্বন্ধে যেদিনীপুরের উদ্যোগী লোকেরা অবহিত হইলে ভাল হয়। সমুদ্রে স্নানের কি ব্যবস্থা সেখানে হইতে পারে তাহাই প্রধান বিচার্য বিষয়। আর আছে ২৪ পরগণা জেলার কেন্দ্রীয় ফ্রেজারগঞ্জ অঞ্চল। শেষোক্ত স্থান সম্বন্ধে আমাদের সহযোগী বলিতেছেন :

বৈপ্লবিক প্রয়োজনসিদ্ধির কামনায় ফ্রেজারগঞ্জের সমুদ্রতটে যে জমিখণ্ড খরিদ করা হইয়াছিল তাহা এক্ষণে প্রবর্তক সজ্জের অধিকারে। ফ্রেজার সাহেব বাংলায় ছোটলাট পদে যখন সমাসীন ছিলেন, তখন তাঁহারই নির্দেশে জনৈক ইংরেজ ফ্রেজারগঞ্জে নগর নির্মাণ পরি-কল্পনা করেন। বহু অর্থ ব্যয় করার পর তিনি এক খুনের দায়ে এই কার্য হইতে ইন্তাক দিয়া বিলাতে প্রস্থান করেন। তার পর ৩৮মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই বিশাল ফ্রেজারগঞ্জ তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। এই সময় হইতে বাংলার নানা শ্রমিক ও কৃষক এই স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ফ্রেজারগঞ্জের তটপ্রান্তে বঙ্গোপসাগরের উদ্ভিদালা লীলারত।...সমুদ্রতটবর্তী ফ্রেজারগঞ্জট উত্তম স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হইতে পারে। এত প্রশস্ত দীর্ঘ সমুদ্রতট

বাংলায় তো নাই-ই—কোন প্রদেশেও আছে বলিয়া মনে হয় না।

“নব-সজ্জ” এই আয়োজনে গবর্ণমেন্টের উপর নির্ভর করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। আমরা মনে করি ব্যবসায়বুদ্ধি-সম্পন্ন বাঙালী এই কাজে হাত দিতে পারেন। তবে সর্ব-প্রথমে জানা প্রয়োজন যে এখানে সমুদ্র-স্নান নিরাপদ কি না।

### দেশভেদে কর্মভেদ

“নির্ণয়” পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম যে বর্তমান গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে হুগলী জেলার কয়েক শত ছাত্র গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্ত এক দলবদ্ধ অভিযান আরম্ভ করিবার আয়োজন চলিতেছে। সেই কাজ এখনও চলিতেছে নিশ্চয়ই। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রণিধানযোগ্য। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের চাঞ্চল্যবনের কান্দা-মাটির মধ্যে ডাক দিবার কল্পনা করা কঠিন। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কলেজ বন্ধের অবকাশে কৃষিকার্যে সাহায্য করিয়া, গৃহকর্মে সাহায্য করিয়া, বাসন ধুইয়া অর্থ উপার্জন করেন বলিয়া শুনিয়াছি। আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা অতলোকে, কল্ললোকে, বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদের নিকট বিলাতের ছাত্রছাত্রীদের মত কর্মের আহ্বান আসে না। ছাত্র-আন্দোলনের অশু-প্রেরণায় হয়ত এরূপ একটা পরিণতি আমরা দেখিতে পাইব।

“ব্রিটেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ডাকা হয়েছে ক্ষেত বাহারে কাজ করে তাদের ছুটি কাটাবার জন্ত। আগামী গ্রীষ্মকালে তারা প্রায় পাঁচ লক্ষ ম্যান-আওয়ার ঘণ্টা (Man-hour) চাষের কাজ করে দেবে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ত ২৫টি ক্যাম্প স্থাপন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। জাতীয় ছাত্র-সংসদ বলে যে, ঐ সব ক্যাম্পে প্রায় ৫০০০ ছাত্রছাত্রী অবস্থান করবে। তারা ফল ও শস্ত সংগ্রহ, শস্ত ঝাড়া, বাছাই ইত্যাদি ধরনের কাজ করবে। ইউরোপের অত্যন্ত দেশ থেকেও প্রায় এক হাজার ছাত্র তাহাদের এই কাজে সাহায্য করবে।”

### নিজামশাহী নীতির উদ্দেশ্য

ভারতরাষ্ট্র ও হায়দরাবাদ রাজ্যের মধ্যে মীমাংসার যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। নিজাম বাহাদুর মীর ওসমান আলী খাঁ এইজন্য কতটা দারী ও মজলিসই-ইত্তেহাদুল-মুসলিমিন প্রতিষ্ঠান তাহার জন্ত কতটা দারী, তৎ-সম্বন্ধে বর্তমানে কিছু নিশ্চিত করিয়া বলা সম্ভব নয়। গত দুই-তিন মাস হইতে আমরা “প্রবাসী”র সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই সমস্যার গতি প্রকৃতি নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই গতি-প্রকৃতির সঙ্গে ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে কোন সামঞ্জস্য-বিধান সম্ভবপর নয় বলিয়া আমরা মনে করি, এবং বর্তমানে দিল্লী

ও হায়দরাবাদের সলা-পরামর্শের মধ্যে যে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সময়ে আবার নিজামশাহী নীতির গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। এই গতি-প্রকৃতির সম্যক ধারণা না থাকিলে, এই সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা বুঝা সহজ হইবে না।

মুঘল শাসনের অধঃপতন সময়ে দাক্ষিণাত্যের একজন মুঘল “নবাব” (দেশপাল) নিজের জন্ত একটা ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হন; নামে তিনি মুঘল সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে থাকেন। এই অস্বাধীন “নবাবকে” মারাঠা আক্রমণ হইতে রক্ষা করে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। তারপর প্রায় এক শত ত্রিশ বৎসর আসফ শাহী বংশ ইংরেজের সার্বভৌম অধিকার (Paramountcy) স্বীকার করিয়া আসিতেছে। সেই সময়েই, গত পঁচাত্তর বৎসরের মধ্যে, উত্তর-ভারতের মুসলমান ভাগ্যদেয়ীগণ গিয়া হায়দরাবাদ রাজ্যে ভিড় করিতে থাকে; সৈয়দ ছসেন বিলগ্রামি হইতে সৈয়দ কাশিম রাজভী এই দলের প্রতিভূ। এই সব মুসলমান বুদ্ধিজীবী শ্রেণী হায়দরাবাদ রাজ্যের চিন্তাধারা ও কর্মধারার নিয়ামক হইয়া পড়ে। এই শ্রেণীই মুসলমান স্বাতন্ত্র্যের প্রতীকার পরিণতি হইয়াছে “পাকিস্তানে”। এই শ্রেণীর পরামর্শেই “নবাব” বংশ এই ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হয় যে হায়দরাবাদ রাজ্য মুসলমান রাষ্ট্র। মাঝে মাঝে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দাবিচী শানাইয়া রাখা হইত। আবার ব্রিটিশ কূটনীতির প্রয়োজনে “নবাব”কে ক্ষণে তুষ্টি, ক্ষণে কষ্টও করিতে হইত। সেইজন্য নিজাম বাহাদুর ইংরেজের বিধান অনুসারে His Exalted Highness; অত্যাচারী বা “নবাবরা” (কবলমাত্র Highness, নিজাম বাহাদুরের উপাধি সকলের অপেক্ষা “উচ্চ”। তুর্কির সুলতানের পদ যখন কামাল আতাতুর্ক বাতিল করিয়া দিলেন, তখন অনেক ইংরেজ শাসনকর্তা ও সাংবাদিক প্রস্তাব করেন যে নিজাম বাহাদুরকে মুসলমান জগতের “খলিফা” করা হউক। এইরূপ নানাপ্রকার উৎসাহ ও প্ররোচনার নিজাম মীর ওসমান আলী খাঁয়ের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, তিনি মুসলমান জগতের মধ্যে এক জন প্রধান ব্যক্তি। এই অহমিকা চরিতার্থ করিবার জন্ত তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে তুর্কির শেষ “খলিফা” সুলতান মহম্মদের কন্যার বিবাহ দেন, এবং মুসলমান জগতের নানা দেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্ত মুক্ত হস্তে দান-খয়রাৎ করেন। এই প্রসঙ্গে এই কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে মীর ওসমান আলী খাঁ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিদের অগ্রতম।

এই ক্ষুদ্র ইতিহাসটি মনে রাখিলে নিজাম বাহাদুরের কার্যকলাপ বুঝিতে কষ্ট হয় না। বংশের গৌরব সকলেই

চায়। বর্তমান যুগে, বিশেষতঃ এই গণতন্ত্রের যুগে হায়দরাবাদ মীর-বংশের স্বার্থ-রক্ষার প্রয়োজনে রাজ্যের এক কোটি সত্তর লক্ষ লোকের স্বার্থ-হুঃখ, মান-অপমান নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। মীর-বংশের দুর্ভাগ্যে হায়দরাবাদ রাজ্যের লোকসমষ্টির অধিকাংশ লোক হিন্দু; তাহাদের সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষের উপর। সেইজন্য মীর ওসমান আলী খাঁর প্ররোচনায় ও সাহায্যে একটি গৌড়ার দল গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার নাম গত দশ বৎসরের মধ্যে কু-প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ইত্তেহাদ-উল-মুসলিমিন দল গুণামি করিয়া রাজ্যের শতকরা ৮৫ জন প্রজাকে দাবাইয়া রাখিতে চায়; অত্যাচার করিয়া বা ভয় দেখাইয়া তাহাদের দেশ-ছাড়া করিতে চায়। গত নবেম্বর মাসে ভারতরাষ্ট্র ও হায়দরাবাদ রাজ্যের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছিল, তাহার ফলে আশা করা গিয়াছিল যে রাজ্যের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং গণতন্ত্রের বিধান-অনুসারে প্রজাপুঞ্জের ইচ্ছানুযায়ী রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইবে। আজ মীর ওসমান আলী খাঁ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী; তাঁহার ইচ্ছাই রাজ্যের আইন-কাহন নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে এরূপ দাবী করা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় যে রাজ্যের মধ্যে ইত্তেহাদ-উল-মুসলিমিন প্রতিষ্ঠানের অত্যাচারের শেষ করিতে হইবে এবং প্রজাপুঞ্জের ইচ্ছানুসারে রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা চলিবে। এই ব্যবস্থা স্বীকার করিলে নিজামশাহী ক্ষমতার তিরোধান হইবে, এবং মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠের পক্ষ হইতে যে প্রাধাত্যের দাবী এত দিন কার্যকরী ছিল, তাহার অবসান ঘটবে।

এইরূপ ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়া মীর ওসমান আলী খাঁর পক্ষে বা ইত্তেহাদ-উল-মুসলিমিন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সহজ নহে। সেইজন্য গত তিন মাসব্যাপী আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের শান্তি নিজামশাহী বংশের অহমিকা ও রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায়ের উগ্র স্বার্থবুদ্ধির নিকট বলি পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ এই অবস্থায় কি করিবেন, তাহা আমরা জানি না। বোধ হয় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবেন না। শক্তির খেলার পরিণতি সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত-রাষ্ট্রের সাড়ে তিন কোটি মুসলমান জনসমষ্টির মতিগতির কথা ভাবিতে হইবে। “পাকিস্তান” রাষ্ট্রের প্রধানগণের মনোভাব আমাদের অবদিত নহে। ব্রিটিশ কূটনীতি এই খেলা জল আরও দ্রোণাক্ত করিবার চেষ্টা করিবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ধূম্রদরগণ যে খেলার নামিয়াছেন, তাহার কথাও ভাবিতে হইবে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে নিজাম মীর আলী খাঁ হাতের পাশার শেষ দান ছাড়িয়া দিয়াছেন; তাঁহার সমর্থক-সৈয়দ কাশিম রাজভির দল উদ্বাদনায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। ভারত-



রাষ্ট্রের কর্তব্যপথ সুস্পষ্টরূপে সম্মুখে বিস্তৃত হইয়া আছে। আমাদের কর্তব্যও সুপরিষ্কৃত। রাষ্ট্রের বিপদে আমাদের মনোভাবের মধ্যে কোন বিধার স্থান নাই।

### ইন্দোনেশিয়া

পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মাছুরা, বোর্নিয়ো প্রভৃতি প্রায় দুই হাজার দ্বীপসমষ্টির বেশীর ভাগ ডাচ সাম্রাজ্যবাদের অধীন ছিল। ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে যখন জাপান তাহার বিজয় অভিযানে বহির্গত হয়, তখন হলান্ড দেশের পক্ষে এই দ্বীপপুঞ্জের রক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না; কারণ তাহার নিজেরাই জার্মানীর কক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছিল। ডাচ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে মনোভাব পুঞ্জীভূত হইয়াছিল এই সময়ে এই দ্বীপপুঞ্জের দেশপ্রেমিকেরা তাহা জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেন; গোপন সংগঠন করিয়া জাপানী অধিকার হ্রাস ও সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টা করেন। ১৯৪৫ সনের আগষ্ট মাসে যখন জাপান পরাজয় স্বীকার করিল, তখন ইন্দোনেশিয়ার নেতৃবৃন্দ এক স্বাধীন সাধারণতন্ত্রের ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ ও আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের কৌশলেই এই স্বাধীন রাষ্ট্রের গতি কিন্তু বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া পড়িল; তাহারা তাহাদের তাঁবেদার ডাচ শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভগ্নপ্রবণ ডাচ সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল। এই তিন বৎসরের ইতিহাস এই অসমান যুদ্ধের ইতিহাস। সম্মিলিত জাতিসংঘের দরবারে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পড়িয়া একটা গৌজামিলের চেষ্টা হইয়াছে; লোক দেখানো একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু প্রতি পদে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্র কোণঠাসা হইয়া পড়িতেছে। এই সৈদিন হইতে উত্থাকামণ্ডে যে এশিয়া মহাদেশের বৈষয়িক সম্মেলনের অধিবেশন চলিতেছে, সেই উপলক্ষেও তাহার একটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকার লইয়া এই কমিশনে ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ হইতে একটা স্থান দাবী করা হইয়াছে। ডাচ গবর্নমেন্টের পক্ষ হইতে এই দাবীর বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয় এই যুক্তিতে যে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্র সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার উপর কর্তৃত্বের দাবী করিতে পারে না; ডাচ গবর্নমেন্টের তাঁবেদাররূপে অজ্ঞাত রাষ্ট্র আছে যাহাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী অগ্রাহ করা যায় না এবং তাহাদের পক্ষ হইতে ডাচ প্রতিনিধিগণ এই দাবী উপস্থিত করে। সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ জন মাধাই এই সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়া “ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতার” উল্লেখ করেন। এই তর্ক এখনও শেষ হয় নাই। ইন্দোনেশিয়ার দাবী সমর্থন করিয়া ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের নেতা ডাঃ জামাউসাদ মুখোপাধ্যায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,

বিদেশী বাণিজ্য সম্পর্ক বিষয়ে ইন্দোনেশিয়ার রিপারিক স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করিতেছে। হাভানা সম্মেলনে তাহাকে শুধু যোগ দিতে দেওয়া হয় নাই, ডাচ গবর্নমেন্টের সঙ্গে সে এই সম্মেলনের চূড়ান্ত স্টিবরণীতে স্বাক্ষর করিয়াছে। হাভানা সম্মেলনের নির্দেশ অনুযায়ী এক অন্তর্কর্তৃত্বকালীন কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, কমিশনে ইন্দোনেশিয়ার রিপারিককে একটি আসন দেওয়া হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কমিশনে সে যদি আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারে তাহা হইলে তাহার পক্ষে অর্থনৈতিক কমিশনে আসন গ্রহণ করিবার কোন বাধা থাকিতে পারে না।

পাকিস্তান রাষ্ট্র ও এশিয়া মহাদেশের সকল প্রতিনিধি, অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি পর্যন্ত এই যুক্তি স্বীকার করিয়া ইন্দোনেশিয়ার দাবীর সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু কাণা গরুর ভিন্ন পথ। ব্রিটিশ প্রতিনিধি সর এন্ড্রু ক্লো ডাচ পক্ষে ভিড়িয়া পড়িয়াছেন। এই ভিন্ন পথের বিপদ আছে। এশিয়া মহাদেশের সত্ত্বজ্ঞাত জনমত এই বিরুদ্ধতা স্মরণ রাখিবে।

### রাষ্ট্রনীতিতে বদান্যতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নানা ভাবে ছত্রভঙ্গ ইউরোপের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে। এই সাহায্যদানে বদান্যতা ও ব্যবসায়-বুদ্ধি দুইটি ভাবের খেলা চলিতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নও এইভাবে কিছু কিছু ব্যয় করিতেছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, এই দুই বিরুদ্ধ রাষ্ট্র কেহই ইউরোপের কোন দেশ সঙ্কে ব্যবসায়-বুদ্ধির হিসাবের বাহিরে যাইবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জার্মানীর কথা উল্লেখ করা যায়। সোভিয়েট ইউনিয়ন জার্মানীর আক্রমণে ধনে প্রাণে বিপর্যাস্ত হইয়াছে; সেই ক্ষতির কোন সীমা-পরিসীমা নাই। সুতরাং ত্রায়তঃ জার্মানীর নিকটে ক্ষতিপূরণের দাবি চলিতে পারে। কিন্তু পটসডাম-চুক্তির কল্যাণে পূর্ব জার্মানীতে সোভিয়েট ইউনিয়নের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চলিতেছে; সেই দেশ হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে কোন হিসাব-নিকাশের বালাই আছে বলিয়া মনে হয় না। একটা লোহার কারখানার আসল মূল্য ছিল প্রায় ৪ কোটি টাকা; ক্ষতিপূরণ উপলক্ষে ইহা রাশিয়ার ভাগে পড়ে এবং তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত হয় এই পরিমাণ টাকার অর্ধেক। রাশিয়ার পক্ষে যখন ইহার যন্ত্রপাতির পরীক্ষা হয়, তখন তাহার মূল্য কমাইয়া দেওয়া হয় তৃতীয়াংশে। যন্ত্রপাতি সরাইয়া লইবার জন্য সহস্র সহস্র লোকের খাটুনির মূল্য বাবদ ও কার্ঠের বাস্তব মূল্য বাবদ এই এক-তৃতীয়াংশের তিন ভাগ ব্যয় হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধরা হয়। অর্থাৎ জার্মানীর ৩৪ কোটি টাকার সম্পত্তি ২৫১০০ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়।

স্থানে রাখিয়া এই কলট চালাইলে প্রতি বৎসর এই পরিমাণ মূল্যের ইম্পাত প্রস্তুত করিয়া জার্মানী ক্ষতিপূরণ দিতে পারিত। আজ জার্মানীর ক্ষতি করিয়াও রাশিয়ার কোন লাভ হইল না।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের অংশে জার্মানীর যে দুই ভাগ পড়িয়াছে, তাহার অবস্থাও ইহা অপেক্ষা ভাল নয়। সেখানে এক হাতে যাঁহা দেওয়া হয়, তার তিনগুণ তুলিয়া লওয়া হয়। চিকাগো নগরীতে মাংসের দাম যখন হাজার টাকা টন (প্রায় ২৭ মণ) তখন আমেরিকা ও ব্রিটেনের অধিকারভুক্ত জার্মানীতে তার মূল্য তিন হাজার টাকার উপর। গমের মূল্য যখন আড়াই শত টাকা চিকাগোতে, তখন জার্মানীতে তার মূল্য প্রায় চারি শত টাকা। একটি ডাচ লোহার কারখানা ২৭ লক্ষ মণ কয়লা কিনিতে চায় রুর অঞ্চল হইতে। তাহা দেওয়া হইল না; কয়লা আসিল জাহাঞ্জে করিয়া যুক্তরাষ্ট্র হইতে। ৮০১০ মাইল দূর হইতে না আসিয়া আসিল সমুদ্রপথে ৩,০০০ মাইল দূর হইতে। জার্মানীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ এই কয়লা কিনিয়া দিতে হইল প্রায় ৮০ টাকা দরে প্রতি টনে কিন্তু তার হিসাবে—ক্ষতিপূরণের হিসাবে—উটিল প্রতি টন ৬ টাকা হারে।

এই ভাবেই কি “মার্শাল পরিকল্পনার” ৬৭ শত কোটি টাকার হিসাব করিয়া জার্মানীর সাহায্য করা হইবে? ডান হাত বা হাতের একপ কৌশল দেখিবার জিনিস বটে।

### রাজনারায়ণ বসু

রাজনারায়ণ বসুর জন্মশতবার্ষিকী বাংলাদেশের অনেক স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেই উপলক্ষে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থানের পুনরুদ্ধার করিয়া তথায় কোন সমাজ-সেবার প্রতিষ্ঠান করিবার কল্পনা চলিতেছে। তদ্বন্ধেই ত্রিহেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষকে সভাপতি এবং বোড়াল গ্রামবাসী ত্রিবিভূতিভূষণ মিত্রকে সম্পাদক করিয়া রাজনারায়ণ বসু স্মৃতিরক্ষা সংঘ নামে এক সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি ৫০,০০০ হাজার টাকা তুলিয়া রাজনারায়ণ বসুর পুস্তকাবলী পুনর্মুদ্রিত করিবেন। তাঁহার পৈতৃক ভিটায় একটি বালিকা বিদ্যালয়, একটি চিকিৎসালয় ও একটি প্রত্নতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিবেন।

বর্তমান যুগের বাঙালীর অব্যবহিত পূর্বযুগের বাঙালী প্রধানগণের কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত হইবার আগ্রহ নাই, গতানুগতিক রাজনীতিক উদ্গাদনার মধ্যে তাঁহাদের জীবন কাটিয়া যায়। কিন্তু যাহারা বর্তমান রাজনীতিকে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দেশের মনে পরাধীনতার জ্বালা জ্বলিয়াছিলেন, আগ্নেয়গিরি জ্বাতির মনে সখিৎ আনিয়াছিলেন, ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতাভিমান জাগাইয়াছিলেন, প্রাচীন

গৌরবকথা শুনাইয়া ভবিষ্যতের নবভারতের সংগঠনের মন্ত্র আমাদের কানে দিয়াছিলেন—তাঁহাদের কথা জানিতে ও বলিতে বাঙালী কোন উৎসাহ পায় বলিয়া মনে হয় না। খুব বেশী হইলে বৎসরে একবার স্মৃতিবাসরের আয়োজন করিয়া, কোনরূপে “নমো, নমো” করিয়া স্মৃতি-পূজা সমাপন করে। এই অকৃতজ্ঞতা কেবল বাংলাদেশে নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশেও তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

বাঙালী জানে না যে যখন ত্রিঅরবিন্দ ঘোষ ভারতবর্ষের রাজনীতিক গগনে মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতই দীপ্যমান হইয়া উঠেন, তখন রাজনারায়ণ বসুর নতুন পরিচয় হয়—নব-জাতীয়তার পিতামহ (Grandfather of Indian Nationalism)। এই কয়টি কথা প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করিলে ত্রিঅরবিন্দ-মাতামহের সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়। তাঁহার যুগের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়চন্দ্র দত্ত, নবগোপাল মিত্র, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আবদুল লতিফ প্রভৃতি বাঙালী প্রধানবর্গের কর্মজীবনের সহিত পরিচয় লাভ করিতে হয়। সেই চেষ্টা করিলে বাংলার বহুমুখিতা, মহারাষ্ট্রের বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলকার, অন্ধ্রদেশের বীরেশলিঙ্গম পাট্টাবু, মালাবারের নারায়ণ স্বামী, আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা প্রভৃতি সর্বভারতীয় চিন্তানায়ক ও সংস্কারকের কর্মজীবনের পরিচয়লাভ করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে গান্ধীজীর আবির্ভাব একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে; তাঁহার জন্ম জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি যুগপ্রবর্তকবৃন্দ। এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের মধ্যে নিহিত আছে প্রায় এক শত বৎসরের আকাজকা, আবেগ, স্বপ্ন ও তাহা রূপায়িত করিবার চেষ্টা। রাজনারায়ণ-স্মৃতিরক্ষা-সংঘের যিনি সভাপতি তিনি এই বিষয়ে অনেক কিছু বলিতে পারেন। এই সংঘের চেষ্টায় আমাদের পূর্বজগণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলে, তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে দায়িত্ব দেশের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিবে; অতীতকে বুঝিয়া আমরা বর্তমানকে সূই রূপ দিতে পারিব।

### রুচিরাম সাহানী

পঞ্জাবের এক জন বয়োযুক্ত ও জ্ঞানবৃদ্ধ নেতার তিরোভাব হইল। রুচিরাম যখন জীবনযাত্রা আরম্ভ করেন তখন পঞ্জাবের হিন্দুসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ, শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রীর দেবসমাজ ও দয়ানন্দের আর্থ্যসমাজের কল্যাণে ফেরদাভাবের আক্রমণ সহ করিবার শক্তি ভারতবাসী অর্জন করিয়াছে। এই সাম্য ও সমন্বয়ের যুগে দেশের চিন্তানায়ক ও কর্মনায়কবৃন্দ যে নব-সংগঠনের কল্পনা করিয়াছিলেন, জাতিধর্মের বিভেদ সম্বন্ধে দেশের জীবনে একপ্রাণতা আসিতে পারে, এই ভরসায় যে কর্মের ধারা তাঁহারা দেশের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া-

ছিলেন, তাহা দেশের জীবনের বিভেদের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া গেল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং বর্তমানের ব্যর্থতার মধ্যে তার সন্ধান করিতে পারিলে ভবিষ্যতের সংগঠন সার্থক হইতে পারে। রুচিরাম সাহানী যে পঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে পঞ্জাবের নানা সংস্কার প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি বর্ধিত হইয়াছিলেন—‘ট্রিবিউন’ পত্রিকার অধিকারে, দয়াল সিংহ কলেজের কণ্ঠ-নিরীক্ষক সভার সভ্যরূপে—সে পঞ্জাব আর আমরা দেখিতে পাইব না। কিন্তু সে পঞ্জাবের ইতিহাসের নিকট অনেক কিছু শিখিবার আছে। সেই ইতিহাসের কথা কিছু কিছু “ট্রিবিউন” পত্রিকার স্তম্ভে আমরা দেখিয়াছি রুচিরামের প্রবন্ধের ভিতর দিয়া। সেই প্রবন্ধাবলীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল সজ্ঞাপ মনের খেলা। সেই মন যে যুগে গঠিত হইয়াছিল তাহা শেষ হইয়াছে; সেই মনের অধিকারীও চলিয়া গেলেন তাঁহার প্রার্থিত লোকে।

### নেহরু ও প্যাটেল

বোম্বাইয়ের “ভারত জ্যোতি” সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই দুই লোকনৈতার সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য তুলনা করিয়া একটি প্রণিধান-যোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন ডাঃ বালকৃষ্ণ কেশকার, নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক। “গান্ধীজীর তিরোধানের পর এই দুই জনই ভারত রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের স্রষ্টা; দেশের লোক-মনের উপর তাঁহাদের প্রভাব এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আকৃতি-প্রকৃতি, শিক্ষায়-দীক্ষায় বিভিন্ন হইয়াও, গান্ধীজীর প্রতি আনুগত্য দুই জনকে একপুত্রে বাঁধিয়াছে। জবাহরলাল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির আওতায় বর্ধিত; বল্লভভাই প্যাটেল হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার সংস্কৃত রূপের আবহাওয়ায় বর্ধিত। জবাহরলাল ভাবুক, স্বপ্নবিলাসী, চিন্তাশীল; বল্লভভাই বস্তুতাত্ত্বিক লোক-সংগ্রাহক। জবাহরলাল দেশের লোকের গতানুগতিক ভাব ও চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন। বল্লভভাই এই সব সংস্কারের বিরুদ্ধে কখনও প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নাই; হিন্দু সমাজের সংস্কার চেষ্টায় নীরবে গান্ধীজীর অনুসরণ করিয়াছেন। জবাহরলাল নেহরুকে রাজনীতিক জীবনে প্রাধাত্যের জন্ম চেষ্টা করিতে হয় নাই; গান্ধীজী তাঁহাকে চৈলিয়া তুলিয়াছেন; জবাহরলাল নেহরু রাজনীতিক ক্ষেত্রে কূটনীতিক খেলা করিতে শিখেন নাই; তাঁহার ঐ ভাবনা গান্ধীজী যথাসম্ভব ভাবিয়াছেন এবং তাহা করিয়া তাঁহাকে নষ্ট (spoilt) করিয়াছেন। বল্লভভাই প্যাটেল রাজনীতিক মলের মোড়লী করিবার শক্তি লইয়া গান্ধীজীর কাছে আসেন (a born manager) এবং তাঁহার সাহায্য ও আশ্রুকুল্যে

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের চালক ও ধারক হইয়া আছেন। গত ২৫ বৎসর গান্ধীজী জবাহরলালকে জনতার মধ্যে নানা ভাবে চৈলিয়া দিয়াছেন; এই জনতার রিক্ত জীবন ও বিবিধ বিশ্বাসকে ঘৃণা করিয়াও জবাহরলাল নেহরু এই জনতার সাহচর্য্য ভাল-বাসিয়াছেন, তাহাদের শ্রদ্ধা অকুণ্ঠিত মনে গ্রহণ করিয়াছেন। বল্লভভাই এই জনতা হইতে কখনও দূরে ও উচ্চে ছিলেন না; সেইজন্য তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার একটা নির্বিকার ভাব আছে। জবাহরলাল নেহরু সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী—রক্তপাতশূন্য সমাজতন্ত্রবাদে; বল্লভভাই প্যাটেল কোন “বাদে” বিশ্বাস করেন কিনা তাহা বলা কঠিন। ধনিকতন্ত্র (capitalism) সমাজের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া তিনি মনে করেন; সেই জন্ম সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধী তিনি।”

এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবের অধিকারী দুই জনের মধ্যে গান্ধীজী লোকহিতৈষণার আদর্শে একটা সমন্বয়ের বিধান করিয়াছিলেন জবাহরলালের ভাবুকতাকে সংযত করিয়া, বল্লভভাইয়ের বস্তুতাত্ত্বিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া। তাঁহার তিরোধানে আজ দুই জনকেই তাঁর ভাবসম্পদ ও কর্মসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে নিকটে আনিয়াছে; স্ব-ইচ্ছায় আর তাঁহারা পৃথক হইতে পারিবেন না। ভারতরাষ্ট্রের দায়িত্ব তাঁহারা বাধ্য হইয়া এক পথে চালাইয়া লইবেন, একথা সুনিশ্চিত; দুই জনের বিরুদ্ধ গুণাগুণ একে অথের গুণ ও দোষের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করিবে। এই সব কথা স্বীকার করিয়াও ডাঃ বালকৃষ্ণ কেশকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই। তাঁহাদের দুই জনের কেহই দেশের ভবিষ্যতের নেতৃত্ব সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহাদের অল্পপরিচিতি বা অবর্তমানে শক্তিশালী লোকনেতৃত্বের এমন কোন কাঠামো তৈয়ার হইতেছে না। তাঁহারা কেহই অমর নহেন; তাঁহাদের পদের দায়িত্ব আস্তে আস্তে ও অলক্ষিতে তাঁহাদের নিজের চিহ্নিত লোকের হাতে দিয়া এইসব লোককে দায়িত্ব পালনে সক্ষম করিবার কোন চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। গান্ধীজীর অভাবে ভারতরাষ্ট্র অচল হয় নাই, কারণ জবাহরলাল ও বল্লভভাই আছেন। তাঁহার হাতে গড়া জবাহরলাল ও বল্লভভাই। কিন্তু জবাহরলাল ও বল্লভভাই কেন সরূপ লোক তৈয়ার করিতে পারিতেছেন না? লোকের অভাব আছে কি, শক্তির অভাব আছে কি? অদূর ভবিষ্যতে এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর চাহিয়া দেশের ভাগ্যবিধাতা আমাদের নুতন পরীক্ষায় ফেলিতে পারেন। জবাহরলাল বা বল্লভভাই এই বিষয়ে কেহই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না; তাঁহাদের জীবনের সাধনা তাঁহাদের নিকট হইতে এই নুতন সংগঠন আদায় করিয়া লইবে।

# বাঙ্গলা নবলিপি

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

ছুমিকা।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি আমার “বাঙ্গলা ব্যাকরণে” দেখাইয়াছিলাম, বাঙ্গলা ভাষা শেখা সোজা। ইহা অক্লেশে কহিতে ও বুঝিতে পারা যায়। এখানে আমি সাধুভাষার কথা বলিতেছি। সে ভাষাই প্রামাণিক ও লৈখিক। কিন্তু প্রচলিত বঙ্গাক্ষর অক্লেশে লিখিতে ও পড়িতে পারা যায় না। এই ভাষায় পঞ্চাশ মূলধ্বনি অর্থাৎ বর্ণ আছে। কিন্তু পঞ্চাশ আকৃতি অর্থাৎ অক্ষর দ্বারা সকল শব্দ লিখিতে পারা যায় না। লিখিতে বহু সংখ্যক যুক্তাক্ষর আবশ্যক হয়। প্রত্যেক যুক্তাক্ষরই একটি নূতন অক্ষর। ইহা মনে রাখিতে, লিখিতে, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে হয়। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পাস ছাত্র দেখিয়াছি যাহারা ঋ, ঙ, ঞ, ও, ঙ্গ, ঙ্গ ও এইরূপ অপর দুই একটা অক্ষর লিখিতে পারে না।

আমরা পাঠশালায় লিখিতে লিখিতে অক্ষর পড়িতে শিখিতাম। প্রায় দুই বৎসর লাগিত। সমুদয় অক্ষর ছয় ভাগ করা হইত। যথা—

- (১) অ আ ইত্যাদি স্বরবর্ণ;
- (২) ক খ ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণ;
- (৩) ক কা কি ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত করিবার স্বরাক্ষর;
- (৪) ক কিঅ (ক্য) অর্থাৎ য র ল ব ম ন ফলা এবং রেফ।
- (৫) আঙ্ক। অর্থাৎ ব্যঞ্জনের পাঁচ বর্গের পাঁচ অনুমানিক যোগ। য র ল বা দি অবগীয় ব্যঞ্জনে অনুস্বার যোগ।
- (৬) আঙ্ক। অর্থাৎ ব্যঞ্জনাক্ষরে অপর ব্যঞ্জনাক্ষর যোগ।

এই মূল ভাগের বহু ব্যতিক্রম হইয়াছে। কয়েকটা উদাহরণ দিতেছি।

ক + ঞ = কুং; কিন্তু ঞ্জ, ঞ্জ (যেমন ঞ্জ), ঞ্জ, ঞ্জ, ঞ্জ, ঞ্জ, ঞ্জ, ঞ্জ।

ক + ঞ্ = কু; কিন্তু ঞ্জ, ঞ্জ, ঞ্জ, ঞ্জ।

ক + ঞ্ = কু; কিন্তু হ।

বলিতেছি য-ফলা, কিন্তু ‘য’ অক্ষরের পূর্ণ আকার নাই। ইহাকেও নূতন শিখিতে হয়।

র-ফলা যোগে ঞ্; কিন্তু ঞ্জ, ঞ্জ, ঞ্জ, ঞ্জ।

কয় = কয়; কিন্তু হুম = ক। হন = হ, যেমন চিহ্ন।

ঙক = ক; ঙগ = গ; ঞ্চ = চ।

গধ = গ; দধ = দ; নধ = ন; বধ = ব।

নথ = হ; মথ = হ ইত্যাদি।

দেখা যাইবে, এক উকারের পাঁচ রকম আকার আছে। উকার ও ঋকারের দুই, ক-কারের তিন, গ-কারের দুই, ঙ-কারের তিন রকম আকৃতি আছে। এই প্রকারে বাঙ্গলা অক্ষরসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। উকারের পাঁচ রকম আকার বলা ঠিক হইল না; কারণ যে-কোন রূপ যে-কোন ব্যঞ্জনে যোগ করা চলে না।

আমার “বাঙ্গলা ব্যাকরণ” ও “শব্দ কোশে” সংযুক্ত স্বরাক্ষরের অনাবশ্যক অতিরিক্ত রূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে। সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর স্পষ্ট ও পূর্ণ আকারে মুদ্রিত হইয়াছে। রেফ-যুক্ত অক্ষরের দ্বিত্ব বর্জিত হইয়াছে। এইরূপ অক্ষর-সংস্কার দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার কিছুমাত্র হানি হয় নাই। অক্ষরের আকার চিরকাল এক ছিল না। অধিক নয়, শত বৎসর পূর্বের লিখিত পুথীর সকল অক্ষর পড়িতে পারা যায় না। সকল স্থানের পুথীর অক্ষরও অবিকল এক ছিল না। আমার প্রদর্শিত প্রণালীতে ১৪টি স্বরাক্ষর ও ৮টি রেফ দ্বিত্ব ব্যঞ্জনাক্ষর কমিয়াছে। ইহা অল্প লাভ নয়। যুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে, লিখিবার ও পড়িবার সুবিধা হইয়াছে।

এই ক্রমে “আনন্দবাজার পত্রিকা” মুদ্রিত হইতেছে। প্রত্যহ লক্ষাধিক পাঠক পড়িতেছেন, বিশেষ অহুবিধা বোধ করেন না। “পত্রিকা” আরও অগ্রসর হইয়াছেন, এ এই কয়েকটি চিহ্ন ব্যঞ্জনাক্ষরের সহিত না জুড়িয়া পৃথক মুদ্রিত হইতেছে। এই পরিবর্তনে অগণ্য টাইপ কমিয়াছে। কিন্তু র-ফলাটি পৃথক হয় নাই। এ কারণ ১৫১৬টা টাইপ রাখিতে হইয়াছে। এখন বই ছাপার দিন; ছাপাখানার সুবিধাও দেখিতে হইবে।

অপর যুক্তব্যঞ্জনাক্ষরের একটি ছোট অপরটি বড়, অথবা একটি বড় অপরটি ছোট করিতে হইতেছে। দুইটিই সমান ছোট করিলে অক্ষর অস্পষ্ট হয়। দেখা যায়, প্রত্যেক যুক্তব্যঞ্জনাক্ষর যদিও পূর্ণাঙ্গ ও স্পষ্ট; একটি নূতন অক্ষর হইয়াছে, চিনিতে শিখিতে হয়। যুক্তব্যঞ্জনাক্ষরের সংখ্যা অল্প নয়। ফলার সংখ্যা রেফ সহ ৮; আঙ্কের ২২; আঙ্কের ৩০; একুনে ৬০ সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর শিখিতে হয়। বস্তুতঃ আরও অধিক। প্রত্যেকের কলেবর নূতন।

এই কারণেই শিশুর বর্ণ-ও অক্ষর-পরিচয় করিতে দুই বৎসর লাগে। ইহার কমে সে অক্ষর পড়িতে শিখিতে পারে, কিন্তু লিখিতে পারে না। কারণ লিখিবার সময় প্রত্যেক অক্ষরের আকার, কোথায় কোণ, কোথায় তরঙ্গ, কোথায় বক্ররেখা, কোথায় ঋজুরেখা আছে, তাহা স্মরণ করিতে হয়। হাতের অভ্যাসও অল্প সময়ে হয় না।

অক্ষর-যোজনায় দোষও আছে। সংযুক্ত স্বরাক্ষর-যোগে স্বাভাবিক ক্রম রক্ষিত হয় নাই। ক+।=কা; কিন্তু ক+ি=কি। ক+ী=কী, কিন্তু ক+ে=কে। আমরা বলি, ক+এ=কে; কিন্তু লিখি এ (৫) ক=কে। এই অনিয়ম হেতু সংযুক্ত স্বরাক্ষর ভাঙ্গিয়া লিখিতে পারা যায় না। ‘বন্দ’ শব্দ ‘বন্দ’ লিখিতে পারি, দোষ হয় না। কিন্তু ‘বন্দে’ শব্দ যদি ‘বন্দে’ লিখি, প্রথমে ন্দ পড়িয়া পরে ‘ে’ যোগ করিতে হয়; অর্থাৎ শেষাক্ষর পড়িবার পর বামে দৃষ্টি করিতে হয়। ইহা অক্ষর শিক্ষার এক অন্তরায়। আর, হ্ চিহ্নই বা কত দেওয়া যাইবে? হ্ চিহ্ন দিয়া অক্ষর লিখিলে অন্তরায় দেখায়। বিশেষ দোষ, এই চিহ্ন লিখিবার সময় কাগজ হইতে কলম তুলিতে হয়। অতএব দেখা যাইবে, অক্ষর-সংস্কার ও অক্ষর-যোজনায় সংস্কার, দুই-ই আবশ্যক।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গরাজ্য দেশময় লেখাপড়া-বিভাবিস্তারে উদ্যোগী হইয়াছেন। দেশের সকল বালকবালিকাকে ও বয়স্ককেও লিখন ও পঠন শিখিতে হইবে। আদ্যশিক্ষা কলাশ্রমী হউক, আর বিদ্যাশ্রমী হউক, উভয় স্থলেই লিখন ও পঠন শিখিতে হইবে। যাহাতে লিখন ও পঠন সহজ হয়, তাহাদের শ্রম লঘু হয়, আমরাদিগকে সে বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে। লিখন-পঠন-বিভা জ্ঞান-ভাণ্ডারের কুক্ষিকা। লিখন ও পঠন উপায় মাত্র, উপেয় নহে। জনগণ যত সহজে সে কুক্ষিকা পাইবে, দেশে বিভা-বিস্তারও তত দ্রুত হইবে। এই কারণে বাঙ্গলা অক্ষর সংস্কার আবার চিন্তনীয় হইয়াছে।

কিন্তু মানুষ অচেতন পুতুল নয়, তাহার রাগ-বিরাগ আছে, ইতিহাস-সংস্কার আছে। আমরা স্ববিধা-অস্ববিধা ভাবিয়া সকল কাজ করি না। তথাপি আমরা ইদানীং রেল গাড়ীতে চড়িয়া তীর্থ-দর্শনে যাইতেছি, পূর্বের মত পায়ে হাঁটিয়া যাই না। যে সংস্কার দ্বারা অক্ষরের দোষ ও অক্ষর-যোজনায় দোষ সংশোধিত হইতে পারে, কিন্তু অক্ষর স্বীয় রূপ হারায় না, অক্ষর-যোজনায় বিপর্যয় ঘটে না, সে সংস্কার বাঞ্ছনীয়।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি “ভারতবর্ষে” দেশে জ্ঞান-প্রচারের উপায় চিন্তা করিয়াছিলাম। সাতাইশ বৎসর পূর্বে “প্রবাসী”তে তৎকালের শিক্ষার দোষ-গুণ আলোচনা

করিয়া নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন কামনা করিয়াছিলাম। কিন্তু পরাধীন জাতির আকাজক্ষা পূর্ণ হয় না। এক্ষণে শিক্ষামন্ত্রী সে বিষয় চিন্তা করিতেছেন। যদিও ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে, আমার আকাজক্ষিত শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন করিতে হয় নাই। কেবল শিক্ষা-পরিপাটীয় যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক মনে করিয়াছি। সম্প্রতি “শিক্ষা-প্রকল্প” নামে আমার প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হইতেছে। “বিশ্বভারতী” প্রকাশ করিতেছেন।

এখানে বাঙ্গলা লিপির সংস্কার চিন্তা করিতেছি। বাঙ্গলা স্বরাক্ষর ও ব্যঞ্জনাক্ষর তিন ভাগে লিখিতেছি। (১) প্রচলিত অক্ষর, (২) সংস্কর্তব্য অক্ষর, (৩) উপগ্রন্থ অক্ষর। সংস্কর্তব্য ও উপগ্রন্থ অক্ষর সম্বন্ধে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। স্বরীগণ নবলিপির প্রয়োজন, যোগ্যতা ও দোষ-গুণ বিচার করিবেন। ছাপাখানার এই দুই ভাগের অক্ষর নাই। ১, ২, ৩ অঙ্ক-ক্রমে লিখিয়া পরে আকার প্রদর্শিত হইল। নবলিপির আদর্শও প্রদর্শিত হইল। পাঠক সহজে দোষ-গুণ বুঝিতে পারিবেন।

### নবলিপি

১। স্বরাক্ষর—অসংযুক্তরূপ।

ক। প্রচলিত—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ  
ং ঃ। (১৪)

খ। সংস্কর্তব্য—ঈ (১)। দুই হ্রস্ব-ই যোগে দীর্ঘ-ঈ। একটি-ই দেখিতে পাওয়া যায়, অপরটি বিকৃত হইয়াছে। অক্ষরের দুইটি ‘ই’ দেখাইলে সহজে মনে রাখিতে পারা যাইবে।

গ। উপগ্রন্থ—এ, ও। ইংরেজী and শব্দের আচ্ছন্ন লিখিবার বাঙ্গলা অক্ষর নাই। আমি এই ধ্বনির নাম বাঁকা-এ রাখিয়াছিলাম। আমি ‘বাঁকা-এ’ লেখা আবশ্যক বিবেচনা করি না। কারণ, এ, কোথাও আ দ্বারা সে অক্ষরের কাজ চলিতে পারে। একদিন হাইকোর্টের এক প্রসিদ্ধ এডভোকেট (D.L.) ‘এফিডেবিট’ বলিতেছিলেন। আমি তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিলে তিনি বলিলেন, আমরা বাঙ্গলায় এইরূপ বলি। তথাপি কেহ কেহ অ্যা এ্যা, য্যা লিখিতেছেন। স্বরবর্ণে য-ফলা কিম্বা ব্যঞ্জন যোগ অসম্ভব। য্যা-র ধ্বনি ‘ইআ’-ই রহিল; ‘বাঁকা-এ’ হইল না। ‘এ,’ এই যুক্তস্বর দ্বারা বাঁকা-একারের ধ্বনি প্রায় আসে। স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণ যুক্ত হইতে পারে। স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের সন্ধি হইয়া অগ্র স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব নূতন নয়। আমার বাঙ্গলা ব্যাকরণে এ উপস্থিত করিয়াছিলাম।



ও, যেমন পাণ্ডা (পাওয়া), পুরাতন পুথিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত শব্দে ‘য’ অক্ষরের উচ্চারণ ঠিক আছে; যেমন, মায়া, বায়ু, প্রয়োগ। কিন্তু বাঙ্গলা শব্দে ‘য’ অক্ষর স্বরের বাহন হইয়াছে। ‘অন্তঃস্ব-অ’ এই নামই বর্ণের আধোগতি প্রকাশ করিতেছে। ইহাকে ‘ইঅ’ বলাই ঠিক। বাঙ্গলা ভাষায় ‘য’ অক্ষরের বাহুল্য ঘটিয়াছে। আমরা ‘করিআ’ না লিখিয়া ‘করিয়া’ লিখি; চেআর—চেয়ার। কিন্তু এতদ্বারা বাঙ্গলা শব্দের ‘য’ অক্ষরের প্রকৃত উচ্চারণ লুপ্ত হইতেছে। ইহারই ফলে প্রাকৃত জনে আউ (আয়ু), বাউ (বায়ু) বলে। ‘ও’ এই যুক্তস্বর দ্বারা ‘য়া’ লেখা হ্রাস হইবে। অসংখ্য বাঙ্গলা শব্দে ‘ও’ আছে। যেমন, ফেরীওলা, গাড়ীওলা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এ ও নতুন অক্ষর নয়।

## ২। স্বরাক্ষর—সংযুক্তরূপ।

- ক। প্রচলিত—১, ঠ, ঠি, ঠু, ঠে, ঠে, ঠে, ঠে। (১০)।  
খ। সংস্কৃতব্য—ঠ(২), ঠ(৩), ঠ(৪), ঠ(৫), ঠ(৬), ঠ(৭)।

‘ঠ’ অক্ষরে একটি ধনুঃ, তাহাতে আর একটি ধনুঃ যোগ করিয়া দীর্ঘ ‘ঠি’ হইয়াছে। সেই সাদৃশ্যে ঠ অক্ষরে আর এক জুড়িয়া দীর্ঘ-উ করা হইল। অক্ষরগুলির প্রচলিত রূপ ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র করিবার কোন হেতু নাই। এগুলিকে ব্যঞ্জনাক্ষরের সমান বড় করিলে সুন্দর হইবে। বাঙ্গলা ভাষায় সংযুক্ত দীর্ঘ-প্লু কদাচিৎ আবশ্যক হয়। ইহার নিমিত্ত একটি পৃথক অক্ষর না রাখিয়া দুইটা পরে পরে লিখিয়া দীর্ঘ জানাইতে পারা যাইবে।

**সঙ্কেত—১।** যাবতীয়া সংযোজ্য স্বরাক্ষর ব্যঞ্জনের পরে বসিবে, পূর্বে নয়। বর্তমানে ১০টি সংযোজ্য স্বরাক্ষরের মধ্যে ৫টি (ঠ, ঠি, ঠু, ঠে, ঠে) ব্যঞ্জনের পরে বসিতেছে। ৩টি পূর্বে (ঠ, ঠে, ঠে) ও ২টি (ঠে, ঠে) অর্ধেক পূর্বে অর্ধেক পরে বসে। আমরা ব্যঞ্জনের পরে স্বরবর্ণ উচ্চারণ করি। যথা—ক+ঠ=কু। অতএব পরে লেখাই ঠিক।

**গ। উপন্যাস্ত—ঠ (ঈষৎ-ই)।** মৌখিক ভাষায় শব্দের স্বরসংক্ষেপ ও স্বরলোপ ঘটে। ইদানীং কেহ কেহ মৌখিক ভাষা লিখিতেছেন। কিন্তু ইহার শব্দের শুদ্ধ বানান প্রচলিত হয় নাই। এই কারণে ঈষৎ-ই জ্ঞাপনের চিহ্ন উদ্ভাবিত হয় নাই। ‘কলিকাতা’ সংক্ষেপে ‘কইলকাতা’ কিন্তু ‘ই’ পূর্ণ নয়, ঈষৎ। এইরূপ, সে বকিবে—সে বইকবে, এখানেও ঈষৎ-ই। বহুকাল পূর্ব হইতে আমি এই বর্ণ জানাইবার নিমিত্ত ‘ই’ অক্ষরের হ্রস্বীকৃত শব্দ লিখিয়া আসিতেছি। ইহার কোন দোষ দেখিতে পাই নাই। ছাপায় ইহা সংযুক্ত ঠ অক্ষরের দক্ষিণাংশের শব্দ।

আকারের সহিত যুক্ত হইয়া ‘ঈষৎ-ই’ অসংখ্য শব্দে শুনিতে পাওয়া যায়। তখন ইহাকে ‘আই’ বলা যাইতে পারে। ই ও উ স্বর সংক্ষেপে ‘ঈষৎ-ই’ রূপে উচ্চারিত হয়। যথা, চাউল—চাল। দালি—দাল বা ডাল। ধাতু—ধাত। মারি ধরি—মারি ধরি। রামশালি—রামশাল। এইরূপ, পূর্ববঙ্গের ইন্দ্রশীল দান। গ্রামের নাম শ্রীকালী—শ্রীকাল, টাঙ্গালি—টাঙ্গাল ইত্যাদি। অক্ষর অভাবে পূর্ববঙ্গে পূর্ণ-ই লিখিত হইতেছে এবং পশ্চিম বঙ্গে উচ্চারণে ‘ঈষৎ-ই’ থাকিলেও বানানে লুপ্ত হইতেছে। যে ধ্বনি আছে, তাহা বানানে প্রদর্শিত না হইলে সে বানান অশুদ্ধ।

কেহ কেহ ঈষৎ ‘ই’ জ্ঞাপনের নিমিত্ত উর্ধ্বকমা দিয়া থাকেন। ইংরেজীর অনুকরণে উর্ধ্বকমা আসিয়াছে। ইংরেজীতে শব্দের অক্ষর ও ধ্বনি লুপ্ত হইলে সে স্থানে উর্ধ্বকমা বসে। যেমন can't। কিন্তু বাঙ্গলায় ধ্বনি আছে। অতএব তুল্য হইল না। ‘ইয়া’ প্রত্যয়ান্ত পদের মৌখিকরূপে অন্ত্য য-ফলা (ইঅ) প্রায় লুপ্ত হয়। যথা, চলিয়া—চল্যা—চল্যে, অন্ত্য য-ফলা (ইঅ) লুপ্ত হইলে থাকে চল। এখানে ল পরে উর্ধ্বকমা লিখিয়া অন্ত্য য-ফলা জ্ঞাপিত হইতে পারে। কেহ কেহ “চল্যে” লেখেন। কিন্তু চ-এর পরে কোন অক্ষর বা ধ্বনি লুপ্ত হয় নাই। অতএব পদের অন্তে উর্ধ্বকমা লেখাই যুক্তিসঙ্গত। উর্ধ্বকমা না বলিয়া উৎকলা বলা যাইবে।

## ৩। ব্যঞ্জনাক্ষর

ক। প্রচলিত রূপ—ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ।

ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম।

য র ল ব শ ষ স হ। য় ড় ঢ়। (৩৬)

খ। সংস্কৃত ব্য—ত(৮), ভ(২), য(১০), র(১১), য়(১৩), ড়(১৪), ঢ়(১৫)।

যে যে অক্ষর দ্বারা একটি শব্দ লিখিত হয়, সে সে অক্ষরের মাথায় রেখা অর্থাৎ মাত্রা দ্বারা পরবর্তী শব্দ পৃথক করিতে হয়। যেমন ‘রাম বনবাসে গেলেন’, তিনটি পৃথক মাত্রা দ্বারা তিনটি পৃথক শব্দ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু বর্তমান ছাপায় ত ও ভ বৃন্তহীন; মাত্রার নীচে নিরলস্ব থাকে। পূর্বে হাতে লেখা পুথিতে এরূপ ছিল না। অতএব কেহ কেহ সবৃন্ত ত ও ভ লেখেন। তাহাই ঠিক। অতএব ত-স্থানে সবৃন্ত ত এবং ভ-স্থানে সবৃন্ত ভ হইলে যুক্তিসঙ্গত হয়। এই দুই অক্ষরের সহিত অল্প অক্ষর যুক্ত করিতে হইলে মাত্রার সহিত যুক্ত হইবে। যেমন, তা, ভা। এ কারণেও ত ও ভ সবৃন্ত করা যুক্তিসঙ্গত।

যে ‘য’ হইতে য-ফলা (y) আসিয়াছে, সে ‘য’ বর্তমান ‘য’ নয়। দুইটি অক্ষর দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

বর্তমান 'য'তে চারিটি ঋজুরেখা আছে। পূর্বকালের 'য'তে প্রথম দুই ঋজুরেখার স্থলে একটি তরঙ্গ থাকিত। ফলার 'য'তে এবং নাগরীতে সেইরূপ আছে। নবলিপিতে য-ফলা একটি নূতন অক্ষর থাকিবে না। 'য়' অক্ষর দ্বারাই য-ফলা বুঝিতে পারা যাইবে। এইজন্য 'য' অক্ষরের আকার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক হইল।

র। পূর্বকালে ব-এ শূন্য র ছিল না, পেটকাটা র ছিল। সে র অক্ষরও ব-এর মত ছিল না, নাগরী ব-এর মত ছিল। বোধহয় সে অক্ষরে পেটকাটা সহজে দেখিতে পাওয়া যাইত না, বিন্দুর আকার ধরিয়াছিল। সে বিন্দু এখন ব-এর তলে আসিয়াছে। ব-ও র উচ্চারণে সম্পূর্ণ ভিন্ন; আকারেও এই দুই যত ভিন্ন হয়, ততই ভাল। র-স্থানে নাগরী ব অপর বাঙ্গলা অক্ষরের সহিত মিশিতে পারে। এই কারণে আমি র-স্থানে নাগরী ব গ্রহণ করিতে বলি। বিন্দু দিতে গেলেই কাগজ হইতে কলম তুলিতে হয়; এই দোষও সংশোধিত হইবে। এই দোষ য ড় এই তিন অক্ষরেও আছে। ইহাদের নীচের বিন্দু অক্লেশে ইহাদের অবয়বে জুড়িয়া দিতে পারা যায়। ড় উচ্চারণ করিতে অসংখ্য নরনারী কষ্টবোধ করে। কালে ড় উঠিয়া গেলে কোন ক্ষতি হইবে না। বস্তুতঃ, য, ড়, ঢ শত বৎসর পূর্বে ছিল না।

গ। উপন্যস্ত,—অন্তঃস্থ-ব (১২)। বর্গীয়-ব ও অন্তঃস্থ-ব আকারে ও উচ্চারণে এক হইয়া গিয়াছে। একটি কাটিয়া দিলে ভাষায় অভাব ঘটে না। কিন্তু ব-ফলার উচ্চারণ বিকৃত হইলেও ব চাই। অন্তঃস্থ-ব-এর উচ্চারণ পুনরুদ্ধার করা কঠিন। কিন্তু নবলিপিতে অন্তঃস্থ-ব আনিতে হইতেছে। নচেৎ ফলার ব পাওয়া যায় না। 'উদ্ভা' স্বচ্ছন্দে পড়িতে ও বুঝিতে পারি; কিন্তু 'গৃহদ্বার' লিখিলে পড়িতে ও বুঝিতে পারা যায় না। সংস্কৃত, হিন্দী, আসামী ও ইংরেজী শব্দ লিখিতে অন্তঃস্থ-ব আবশ্যক হয়। আসামীতে অন্তঃস্থ-ব বর্গীয়-ব এর তলে রেখা দিয়া র লেখা হয়। কিন্তু এই র লিখিতে গেলে কাগজ হইতে কলম তুলিতে হয় ও রেখা দিতে গেলেই অক্ষরটি কিছু ছোঁট হয়। নাগরী অন্তঃস্থ-ব বৃত্তাকার; ইহাতে বাঙ্গলা অক্ষরের কোণ নাই; সে র অন্য অক্ষরের সহিত মিশিতে পারে না। নাগরী অন্তঃস্থ-ব ঐযং রূপান্তরিত করিয়া বাঙ্গলায় স্কেপ ব করিতে পারা যায়।

২। যুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর.

ক্ষ (ক্ষিঅ), জ্ঞ (গঁ), ষ (ষ্ট)। (৩)

বাঙ্গলা ভাষায় এই তিন অক্ষরের উচ্চারণ সম্পূর্ণ

ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব এই তিনটি সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর রাখিতে হইতেছে।

সঙ্কেত ২। সংস্কৃত ও সংস্কৃত-মূলক ভাষায় একটি চমৎকার সঙ্কেত চলিয়া আসিতেছে; ব্যঞ্জনাক্ষর নিয়ত অকারান্ত। কিন্তু অন্য স্বরাক্ষর কিম্বা কোন ব্যঞ্জনাক্ষর যুক্ত হইলে সে অক্ষর হসন্ত হয়। যেমন, ক অকারান্ত, কিন্তু ক যুক্ত উ সন্ধি না হইয়া কু। ক যুক্ত ত ক্ত। নবলিপিতে এই সঙ্কেত অবশ্যপালনীয়। মনে রাখিতে হইবে যাবতীয় সংযুক্তব্যঞ্জন স্বরান্ত। 'চন্দ্র' 'চন্দ্র' পড়িতে হইবে, 'চন্দ্র' নয়। এই কারণে ইংরেজী park 'পার্ক' লেখা উচিত, পার্ক বানান ভুল।

সঙ্কেত ৩। উক্ত তিন সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর ব্যতীত অন্য যুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর লিখিবার সময় প্রথমাক্ষরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপরে একটি তির্যক ষোণ-রেখা দিতে হইবে, যেন নীচের হস্ চিহ্ন উপরে বসিয়াছে। যেমন ভকত। এই ষোণ-চিহ্নকে 'পাতী' বলা যাইবে, কারণ রেখাটি অক্ষরের মাথা হইতে নীচের দিকে আসে। ঙ, ছ, জ, ঞ, ত, ভ কয়েকটি অক্ষর ব্যতীত অল্প অক্ষর লিখিবার সময় কলমের এক টানে 'পাতী' আসিবে। কিন্তু ছাপায় একটি টাইপ পৃথক রাখিতে হইবে। পাতী নূতন নয়; সংযুক্ত 'ৎ' দেখুন।

নবলিপিতে 'ফলা' নাম নিরর্থক ও অনাবশ্যক 'য-ফলা' না বলিয়া 'ইঅ' বলাই ঠিক। 'তথ্য' বানান করিতে হইলে ত, থ, যুক্ত য (ইঅ) বলিতে হইবে। এইরূপ ত, ক যুক্ত র—তকর; ত, র যুক্ত ক—তরক, ইত্যাদি। বাঙ্গলায় কয়েকটি ফলার উচ্চারণ বিকৃত হইয়াছে। ব্যঞ্জন ও ফলা সমান-বড় লিখিলে উচ্চারণ-দোষ সংশোধিত হইতে পারিবে। ইহা অল্প লাভ নয়। য-ফলা সর্বত্র নষ্ট হয় নাই। দামিতা গ্রামে কবিকঙ্কণের নিবাস ছিল। তদেশবাসী অতাপি 'দামিতা' বলে, দামিতা বলেন না। বাঁকুড়া জেলায় নিরক্ষর জনেও য-ফলা স্পষ্ট উচ্চারণ করে। এই কারণে অতাপি বাঁকুড়ায় কেহ কেহ 'করিআ' লেখেন। উচ্চারণ শুদ্ধ হইলে শব্দের বানান সহজ হইয়া পড়ে।

কোন কোন শব্দে হস্ চিহ্ন আবশ্যক হইতে পারে, যেমন 'দৈবাত'। ইহার বিপরীত, কোন কোন শব্দের শেষাক্ষর অকারান্ত লিখিত হইলেও হসন্ত পড়িবার আশঙ্কা থাকে। এই আশঙ্কা নিবারণ নিমিত্ত সে অক্ষরের নীচে দক্ষিণ কোণে একটি বিন্দু বসিবে। যেমন স্বস্তিক। ইহা 'স্বস্তিক' নয়। এইরূপ কোন কোন বাঙ্গলা শব্দেও বিন্দু আবশ্যক হয়। যেমন, কট, মট, চোখ। বিন্দুর অল্প প্রয়োজনও আছে। অতুষ্ণার নীচে হস্ চিহ্ন অনাবশ্যক, যেমন কং।

॥ नमो ॥

- (୧) ଈ-ଉଁ । (୨) ି-ୱି । (୩) ଋ-ୠ । (୪) ଌ-ୡ ।  
 (୫) ୍ଋ-ୠ । (୬) ୍ଌ-ୡ । (୭) ୍ଐ-ୱି । (୮) ୍ଐ-ୱି ।  
 (୯) ୍ଐ-ୱି । (୧୦) ତ-ତ । (୧୧) ଡ-ଡ଼ । (୧୨) ସ-ସ ।  
 (୧୩) ଶ-ଶ । (୧୪) ଅକ୍ଷର-ବ-ବ । (୧୫) ଯ-ୟ । (୧୬) ଡ-ଡ଼ ।  
 (୧୭) ଡ-ଡ଼ । ଶୁଦ୍ଧ-ଂ । ମାତ୍ର-ଂ ।

ନବଲିପିର ଆଦର୍ଶ

(୧)

ବନ୍ଦା ମାତରମ୍ ।

ସର୍ବଜନାଂ ସର୍ବଭ୍ୟାଂ ମନସ୍ତତ-ଶୀତଳାଂ

ଶରୀର-ଶରୀରାଂ ମାତରମ୍ ॥

ଶରୀର-ଜଗତ୍ସମା-ସମ୍ବଳିତ-ସାମିନୀଂ

ସମ୍ବଳିତ-କରମ୍ବଳିତ-ଦୟାମୟ-ଶାନ୍ତିନୀଂ

ସମ୍ବଳିତ-ସମ୍ବଳିତ-ଭାଷିନୀଂ

ସମ୍ବଳିତ-ବନ୍ଦାଂ ମାତରମ୍ ॥

(୨) ମହାଶୟୀ ଅବନୀ ଉଦୟା ମିନିଷ୍ଟରାଂ କାମ୍ୟା-ସିନ୍ଧା ।

ମନୁଷ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କରମ୍ବଳିତ କତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟା ଶ୍ରୀମା ॥

ଏକା ସମ୍ବଳିତ-ଶରୀର-ମନସ୍ତତ-କରମ୍ବଳିତ-ସିନ୍ଧା ।

ଜାଣି ଉଚ୍ଚା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ-ମନସ୍ତତ-କରମ୍ବଳିତ-ସିନ୍ଧା ॥

ଶୌଚିକ ଶାସ୍ତ୍ର, —

ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଆମ୍ଭଙ୍କ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଆମ୍ଭଙ୍କ  
 ଶାସ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ, କାଳୀ ୧୮, ବାହ୍ୟା ୧୮ କାଳୀ କହୁଛନ୍ତି । ୧୮ତ  
 ନିକଟର ଶାସ୍ତ୍ର ହତା ଶତ-ଶତ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମାତ୍ର ମାତ୍ର । କତ  
 ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ମାତ୍ର । ଆମ୍ଭ ୮୮ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ମାତ୍ର । ଶବ୍ଦ  
 ୧୮ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ମାତ୍ର । ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏକତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ  
 ଶିଳ୍ପ । ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ମାତ୍ର, ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ । ମାତ୍ର  
 ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କି ? ଶିଳ୍ପ ଏହି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି  
 ଶିଳ୍ପ ଶିଳ୍ପ, ଶାସ୍ତ୍ର ମାତ୍ର । ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ୧୮ତ  
 ମହତ୍ତ୍ୱ, ୧୮ତ ମହତ୍ତ୍ୱ, ୧୮ତ ମହତ୍ତ୍ୱ, ୧୮ତ ମହତ୍ତ୍ୱ; ମହତ୍ତ୍ୱ  
 ଶିଳ୍ପ ମହତ୍ତ୍ୱ, ଶାସ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ; ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର କାଳୀ ଶିଳ୍ପ, ଏହି  
 ବହୁତ ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କାଳୀ ?

॥—হু-দাড়ি।

৭—খড়গ।

৮—তিলক।

—রেখ।

(-)-লিক (বা লিকি, সা লিকা)।

বেষ্টনীর চিহ্ন—

( )—চাপ

{ }—দীর্ঘ চাপ

[ ]—বাহ

\*—তার। এইরূপ দিতারা, ত্রিতারা।

গণিতের ১, ২, ৩...দশ অঙ্ক; ১০, ১০০, ১০০০, ১০, ১০০, ১০০০ ইত্যাদি চিহ্ন।

গণিত কণ্ঠের চিহ্ন—

+—বজ্র (বজ্র ও হীরা একই অর্থ)।

×—হীরা (ইহা হইতে বাঁ ঢেরা; যেমন ঢেরা সহ)।

—বিপাতী (ভাজন চিহ্ন)।

—দ্বিবেথ।

চিহ্ন সংখ্যা মোট ৩৪। অক্ষর ও চিহ্ন মিলিয়া মোট ১০২টি টাইপ থাকিলেই প্রেস চলিতে পারিবে। আর, ছোট, বড়, মোটা, গোদা নানা প্রমাণের অক্ষর রাখা স্বল্পব্যয় হইবে। একটা গোদা টাইপের অভাব পুনঃ পুনঃ অনুভব করিয়াছি। নাগরীতে মাতৃষের নামের ও গ্রন্থের নামের অক্ষর গোদা টাইপে ছাপা হইতে পারে। এক্ষণে সেরূপ টাইপ অক্লেশে পাওয়া যাইবে।

এখন 'টাইপার' নির্মাণ স্বসাধ্য ও স্বল্পব্যয় হইবে। অচিরে অসংখ্য ইংরেজী 'টাইপার' অনাবশ্যক হইয়া পড়িবে। সে সকল যন্ত্রের ইংরেজী টাইপ তুলিয়া বাঙ্গলা টাইপ বসাইতে পারা যায় কিনা, কারিকর চিন্তা করিবেন। সাধারণ টাইপারে ৮২টি টাইপ থাকে। বোধ হয় ৮২টি টাইপ দ্বারাই আবশ্যক অক্ষর ও চিহ্ন পাওয়া যাইবে।

## কীর্তনানন্দ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দহ্মা জগাই কি জানি কেন যে হঠাৎ হইল মন—  
পরিহাস-হাসি হাসিছে শুনিছে তবু সংকীর্ণন।  
নাচে ভক্তেরা তা যেই, তা যেই, বাজে খঞ্জনী খোল,  
শ্রোতৃমন্ডল মহা আনন্দে বলে হরি হরি বোল।  
জগাই ভাবিছে ভক্ত ওদের দূরাধিরোহিণী আশা  
নাচিয়া গাহিয়া স্বর্গে যাইবে পছা পেয়েছে থাসা।  
শ্রমে বীতরাগ অলসের দল নাচে দিয়া করতালি—  
সুধা বাড়াইয়া শূন্য করিতে ভরা অম্লের থালি।

নয়নে নিয়ত অশ্রু ঝরিছে—এইটা নূতন ঠেকে ?  
সকলেই কিছু আসেনি এখানে চক্রে মরিচ মেখে।  
কে ডাকে কাহারে? কোথায় ইহারা? ভগবান আছে কোথা?  
করণ ও সুরে অন্তরপুরে তবু যে জাগরে ব্যথা।  
ওকি কাভরতা, ওকি ব্যাকুলতা। ওতো নয় অভিনয়,—  
বেদনার ডাক, গাঢ় অহুঁরাগ বুক দেয় পরিচয়।  
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়ানি এতে কি হইবে ভাল?  
অজানার লাগি কি মধু যাতনা, আধারে এত কি আলো।

এটা খাঁটি কথা নয় কপটতা—কৈদে কৈদে পথ চাওয়া—  
বলে মোর মন হৃদয়ের ধন ওপথেই যায় পাওয়া।  
ভিতরে তুফান, চোখে ডাকে বান—বাধা যে মানে না আর  
চাঁদের উদয়ে উত্তল চকোর, উথলিছে পারাবার।  
একি কীর্তন পুরুষে কীদায়ে রমণীর মত করে,  
কোথা ছিল হেন রমণীর রূপ হৃদয়ের অন্দরে?  
বুক কেন মোর কঁাকা কঁাকা লাগে? বুঝিতে পারিনে কি যে—  
এই কি বিরহ? পাথারে পড়িছে পরিহাস করি নিজে।

কালিন্দী জল বহিল উজ্জান চিত উৎকণ্ঠিত  
কদম্ব হ'ল কোরকোদগম, তমাল মুঞ্জরিত।  
কোথা সে আমার কঠোর হৃদয় দেখে শুধু হাসি পায়  
নামাইতে গিয়া আপনি উঠিয়া বসিছে হিন্দোলায়?  
নব অহুঁরাগ বীজাণু পশেছে—হায় রে কপাল ভাঙা  
ফাগু খেলা দেখে বিজ্রপ করি নিজে হয়ে এমু রাঙা;  
কীদায়, নাচায় পুলকানন্দে—খেলা করে নিয়ে মন  
মনে ও বৃন্দাবনে মেশামিশি একি সংকীর্ণন?



# আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২৮

কোথা থেকে চালাবে আলাপ-আলোচনা এই হ'ল প্রশান্তর চিন্তা। ট্রেড ইউনিয়নের আপিসে যাবে কি? কিন্তু সেখানে তথাকথিত বহু নেতা আছেন—যাঁরা সজ্জকে ক্ষমতামালা করবার জন্ত বাঁকা পথটিই হয়ত বেছে নিয়েছেন। হলদে চিরকুটখানা যে অঙ্ক দাবি করেছে তা একের কল্পনাগ্রহৃত বলে বিশ্বাস হয় না। শুভার কাছে যাবে? সে-ও সজ্জের একজন প্রভাবশালী সভ্য। বাঁকা পথের এই খবর সে হয়ত জানে না—হয়ত সমর্থন করে না এই অজ্ঞান নীতি। নীতির একটি অর্থই তার কাছে পরিস্ফুট। সে হ'ল সত্য। মানুষের হৃৎ-হৃদয়শরীর সুযোগ নিয়ে মানুষ যে ক্ষীণ হয়ে উঠবে এই কল্পনা—তার কাছে অসহ্য। বুক-পকেটে হাত দিয়ে দেখলে চিরকুটখানা যথাস্থানে আছে কিনা। স্বাক্ষরহীন কাগজের দ্বারা হয়ত প্রমাণকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, তবু সজ্জের নীতি যে নিষ্ফল্য নয় এটি তার সর্বোত্তম নিদর্শন। প্রয়োজন হলে এটা কাছে লাগানো যাবে।

মোটর চৌধুরীর গ্যারাজে তুলে দিয়ে পায়ে হেঁটে চলল প্রশান্ত। সমান ভিত্তিতে চলুক আলাপ। মোটরে চেপে হৃদয়গ্রন্থি বাজীর ছায়ায় আসার অসম্পত্তি ইতিপূর্বে তাকে যথেষ্ট গীড়িত করেছে। শুভা তার সান্নিধ্য থেকে খানিকটা সরে গেছে। অন্তত তখন তাই মনে হয়েছিল। ওর সঙ্গী বহু—আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিভিন্ন—পদমর্যাদার শাল-আলোয়ান গায়ে চাপিয়ে সে বৃত্তে প্রবেশ করা সুকঠিন। ওদের মনে হয়—কম সীরিয়াস—নীতি-শিথিল—পরিমিত-ভাষী তর্কিক; আর দেশের মাটিতে পা দিয়েও চেয়ে থাকে দূর বিদেশের বর্ণময় আকাশে। সে আকাশের যে ভাষা ইথার-তরঙ্গে এ আকাশের গায়ে আখর ফোটাতে পারে স্পষ্ট হ্যাতিময় অক্ষরে—নিখিলের হৃৎ-হৃদয়শরীর ভাষা তবু...

আপাতত সে শুভার বাসায় পৌঁছে গেল। সেই নড়বড়ে সিঁড়ি—সেই আলো-বায়ুবাক্তি বন্দী-নিবাস। মন বিমুগ্ধ করা পরিবেশ। বৃকের মাঝখানে হৃৎপিণ্ডটা অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠবার পরিশ্রম, না বহুদিন পরে আসার সন্দেশ, 'না' অব্যাহত রক্তের মধ্যে একান্ত আত্মীয়-তার স্বাদলোলুপতা—বাস্তব-স্বপ্ন-মেশানো অভূত মনোময় আবেগে খানিকটা হুঁসল আর খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়ল প্রশান্ত। মাঝপথে এক মুহূর্ত সে ধামলে—শুধু মুহূর্তমাত্র—তারপর সবলে বৃত্তির গতিপথ ফিরিয়ে বাকি ক'টা ধাপ অনায়াসে অতিক্রম করলে।

ঘর থেকে বেরুছিলেন শুভার মা—তার সঙ্গেই মুখোমুখি দেখা।

শুভার মা আনন্দ-মেশানো হৃৎ প্রকাশ করলেন, 'আর আস না কেন প্রশান্ত। তোমার কথা প্রায়ই মনে হয় আমাদের।'

একটু হেসে কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিটাকে সে সহজ করে নিলে। বাহ্যত এটা ক্রটিস্বীকার।

শুভার মা বললেন, বস। শুভা এইমাত্র বেরিয়ে গেল। না না, তোমার সঙ্গে আমার ভীষণ দরকারী কথা আছে যে। তোমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্ত এইমাত্র আমি প্রার্থনা করছিলাম। ভগবান আমার কথা শুনেছেন।

অগত্যা বসতে হ'ল। শুভার মা ভূমিকা বাড়ালেন না। বললেন, শ' হুই টাকার বিশেষ দরকার যে বাবা। শোন নি বোধ হয় মাসখানেক হ'ল শাস্ত্রী ঠাকুর গত হয়েছেন। তাঁর প্রাদেশের দরুন আর ছেলেকে ছোট্ট আরট মাসের মাইনেতে বেশ কিছু অভাব বোধ হচ্ছে। আর জানই তো সংসারের খরচ আজকালকার দিনে—য়ে চালায় সে-ই জানে এর মর্ম।

বুকপকেটে হাত দিয়ে নোটের বাঙালটা সে অনুভব করলে—কিন্তু এঁদের অভাবগ্রন্থ সংসারের দ্বার মিটানোর গরজ কি তার। যে সমস্ত মধুর হতে পারত—অন্তরের স্বত্রে অভিন্ন হতে পারত—তা ঘটনার স্রোতে হ'ল ভিন্নমুখী। এ আকাশ একদিন তারই ছিল অগ্ধ এখানে স্বপ্ন-বিহার করার হুঁসলতা আজ তার নাই। আশ্চর্য—হাত গুটিয়ে না নিয়ে নোটের বাঙালটা নিঃশব্দে সে টেনে নিলে। গুনলে না কত টাকা আছে—তেমনি নিঃশব্দে শুভার মায়ের দিকে হাত-খানি বাড়িয়ে বললে, নিন—

শুভার মা-র কোটিরগত চক্ষু উজ্জ্বল বোধ হ'ল। অশ্রুতে চক্চকে—প্রাপ্তির আনন্দে চক্চকে—দায়মুক্তির আশ্বাসে চক্চকে। বললেন, তাই তো বলি ভগবান আছেন। নইলে আমাদের অভাব বুঝে তোমাকেই বা পাঠাবেন কেন আজ—আর ঠিক হুঁশো টাকা—

হুঁশো নয়—আরও বেশি আছে।

আরও বেশি। কিন্তু আর বেশি তো আমার দরকার নেই বাবা।

রেখে দিন—কখন কি দরকার হয় বলা তো যায় না।

শুভার মা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, হায়রে—হতভাগী তবু তুই ঘুরছিস টো টো করে। তোর বন্ধুবান্ধব—তোর সঙ্গ,

বক্তৃতা তোকে কি স্বর্গে নিয়ে যাবে। শোন বাবা—তুমি ওর কোন কথা শুনো না—ওকে জোর করে এসব ছাড়িয়ে দাও।

আমার কথা শুনবেন কেন উনি।

না, শুনবেন না। শুভার মা উত্তপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন।  
—একশো বার শুনবে। তুমি ওকে যথেষ্ট ভালবাস আমি জানি। আর ও তোমাকে ভালবাসে। যথার্থ ভালবাসে। না হলে—

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। রক্ত আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে—হৃৎপিণ্ড আঘাত হানছে বুকে। ধব্-ধব্-ধব্। এই বর্ণলেশহীন আকাশ—এই আকাশেই ধপ্পের ফুল ফুটেছে হৃৎ হুল বুকে।

হালো—কমরেড—রেসের খোড়ার মত চলেছ কোথায়?  
চল—চল—

উঠে এসে বসতে হ'ল ধরে। অন্ধকার ঘর, মনের ভাব-তরঙ্গ মুখের আয়নাতে কোন চিহ্ন ফুটিয়ে তুলবার ফুরসত পায় না। বেশ নিরঙ্কুশ কণ্ঠেই আলাপ চালানো যায়।

তোমার কাছেই নালিশ আছে আমার—প্রশান্ত সহজ কণ্ঠে বললে।

শুভা খিল খিল করে হেসে বললে, রক্ষে কর কমরেড—সারা পৃথিবীটাই নালিশে ভরে রয়েছে—কোনটা রেখে কোনটা শুনব। আর নিজেকে যোগ্য মনে করি না—নালিশ শোনবার যোগ্যতা থাকা চাই তো।

ঠাট্টা নয়—সত্যি আমার কিছু বলবার আছে।...প্রশান্ত গভীর কণ্ঠে বললে।

শুভা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে, বেশ রল—কিন্তু সংক্ষেপে।

জানি, তোমার সময়ের দাম আছে। প্রশান্তর কণ্ঠে পরিহাসের প্রচ্ছন্ন আভাস।

শুভা বললে, আমি ক্লান্ত। এইমাত্র একজনর সঙ্গে তর্ক করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

ক্লান্ত? আচ্ছা সংক্ষেপেই বলছি।

সমস্ত শুনে শুভা বললে, আমি কি করতে পারি।

তুমি কিংবা তোমরা যেই হোক—ওদের বুঝিয়ে—

পেট কাঁদলে, না ধর্ম না যুক্তি কিছুতেই কেউ বোঝে কি কমরেড।

তবু দাবি ত্যাগ কি অত্যা—

সবটাই ত্যাগ যাদের পরনে নেই কাপড়—পেটে নেই অন্ন।

তর্ক করে লাভ নেই—দাবির মতখানি মেটানো যায় সেই চেষ্টা করতে হবে আমাদের।

আলোচনা মীমাংসার পথে গেল না। প্রশান্ত দীর্ঘ

উষ্ণ হয়ে বললে, সত্যি বলতে কি—এ তোমরা ওদের কথা বলছ না—তোমাদের জিদ বজায় রাখছ।

তাতে আমাদের লাভ?

লাভ? লাভ এই—মাস মুভমেন্ট জাগিয়ে তোমরা নেতা-গিরি করতে চাও। এই হচ্ছে তোমাদের সজ্জের পাবলিসিটি।  
রেগে উঠছ কেন প্রশান্ত, গাল দিলেই কিছু যুক্তির সারবত্তা প্রমাণ করা যায় না।

শুভার নিরুত্তাপ কণ্ঠে প্রশান্ত বেশি মাত্রায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। বলল, তোমরা যে সাধু নও—তার প্রমাণ আমার কাছেই আছে। এই দেখ—

হলদে চিরচুটখানা সে শুভার কোলে ছুড়ে দিয়ে বললে, আশা করি এ লেখা সনাক্ত করা তোমার পক্ষে কঠিন হবে না।

শুভা বললে, আচ্ছা বস—আলোটা জালি।

না—বসব না। কাল সকালে আমি আসব।

মা কিন্তু দুঃখ করবেন।

প্রশান্ত প্রত্যুত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ধানিকটা উদ্বেগহীন ভাবে ঘুরে গোলদীঘিতে এসে বসল। দুপুরে লোক চলাচল কম থাকে—তবু শহর ক্ষীত হয়েছে আগেকার চেয়ে। ট্রামের ফুটবোর্ডে লোক ঝুলছে—বাসের সর্বোচ্চ মাত্রায়। রাজপথে সশস্ত্র পাহারার ঘটা বিশেষ করে চোখে পড়ল। সিনেট হলে কোন সভা আছে? কোথাও কি উত্তেজনার কারণ ঘটেছে? আশ্চর্য কিছু নয়। যুদ্ধের উগ্রতা হ্রাস হলো—উত্তাপ বেড়ে উঠেছে পৃথিবীতে। হু' হাতে সঞ্চয় করে যারা উপরে উঠল—তারা নাগালের বাইরে—যারা নীচের রইল তারা মানুষের জেগী থেকে নেমে পড়েছে—মাঝখানে কিছু নেই। প্রাসাদ-ভোরণে নিপতিত ক্ষুধা-নিষ্পিষ্ট ভারবাহীর প্রাণহীন দেহ—প্রাসাদ-অলিন্দ-বিহারীর মনে একটুও তৃফান তুলছে না। তেরশ পঞ্চাশের হুর্ভিক্ষ মানুষকে এমনি উদাসীন করেছে—তার অন্তর থেকে লোপ করে দিয়েছে কোমল অংশ।

হঠাৎ জনশ্রোত শুদ্ধ হ'ল—বড়ের আগেকার আকাশ নিঃশেষে টেনে নিল বায়ুকে। ঘুরে বহু কণ্ঠের চীৎকার। মিছিল আসছে—ভূখা মিছিল।

এ জিনিষ নূতন নয়—অভাবনীয় নয়। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এ রকমের বড় প্রতিদিনের ঘটনা। সাধারণ জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়ে গেছে।

সারি দিয়ে লোক চলেছে—নানা জাতি—নানা ধর্মের লোক—গৌঁটা ভারতবর্ষ বিশেষে কলকাতার রাজপথে। হাতে হাত মিলিয়ে যেতে যেতে টেঁচাচ্ছে অপরিমিত। ধ্বংস হোক—ধ্বংস হোক পুরাতন সব কিছু। কায়মি স্বার্থের প্রাচীর-ধেরা পৃথিবী জীর্ণ হয়ে এসেছে—জীর্ণ হয়েছে তার

আচারগত মানবীয় রুত্তি—সুপ্রাচীন আখ্যামির গৌরবভার বহন করতে পারছে না তথাকথিত সভ্যতা। ধ্বংস হোক—সব কিছু ধ্বংস হোক। মুছে যাক স্ক্রেক্টের পুরাতন লেখা—আভিজাত্য সংস্কৃতি হোক লুপ্ত—বর্ণাভিমান যাক মুছে—কমলা আবার ফিরে যান সিদ্ধুপুরীর মণিময় হৃদয়ে।

প্রশান্ত মুখ ফিরিয়ে নিলে। বড় বেশি উদ্বৃত্ত—বড় বেশি প্রগলভ মনে হ'ল। সৃষ্টিকে নস্যাত করে দেবার ছুঁসাহসে বড় বেশি আত্মপ্রত্যয়শীল। সৃষ্টি কিছু শূন্যস্থলিত হয়ে পৃথিবী আশ্রয় করে নি—ক্রমবিকাশে গড়ে উঠেছে বিরাট সভ্যতা। একক মানবগোষ্ঠী আত্মগত্যা মেনে নিয়েছে—একনায়কত্ব—পশুহনন রুত্তি থেকে উন্নীত হয়েছে কৃষিধর্ম—গুহা থেকে এসেছে কুটীরে—বস্ত্ররুত্তিকে শৃঙ্খলিত করে দীক্ষা নিয়েছে মানবীয় ধর্ম। এ তার এক দিনের খেয়াল নয়—এক যুগের সাধনা নয়—এক শতাব্দীর সঞ্চয়ও নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খাদ বার হয়েছে—সংস্কার হয়েছে বার বার—রাজ্য রাজ্য—রাজসিংহাসন নিয়ে কত না পরীক্ষা হয়েছে বারংবার। কেউ কি শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলবার ছুঁসাহস করেছে বিশাল মহীকহকে। তা হয় না। কাণ্ডে বসে মূলে কুঠারাঘাত করা—আর—

হুম্—হুম্—হুম্। দেবদারুর ডালে ডালে অসংখ্য কাক কা কা শব্দে ডানা ঝাপটে উঠল। বন্দুকের শব্দে ওরা এমনি কোলাহল করে। পথেও কোলাহল তীব্র হয়ে উঠল। ছ'ধারের জনতা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। অগ্রগামী মিছিল থেকে চীৎকার উঠছে—ধ্বংস হোক—ধ্বংস হোক। ব্যাপার কি? একশ-চুয়াল্লিশ ধারা বলবৎ, ওরা নিয়ম ভঙ্গ করেছে। ওদের সাবধান করা সত্ত্বেও নিষেধ মানে নি—অতএব আইন রক্ষার ভার নিয়েছেন সরকার।

লোক ছুটেছে মিছিলের বিপরীত দিকে—মিছিলের অভিমুখে। বন্দুকের শব্দ—শোভাযাত্রীদের বিক্ষোভকে তীব্র করে তুলছে—অসহায় ক্রোধ মুহূর্তে চীৎকারে শাসনতন্ত্রকে ধিকার দিচ্ছে—সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুকামনা করছে।

আরও কয়েকটা বোমা ফাটল। প্রচুর ধোঁয়া আর দম-আটকানো একটা তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বায়ুস্তরে। নাক মুখ চোখ জ্বালা করতে লাগল।

সরে আস্থন—সরে আস্থন—কাঁদানে গ্যাস ছেড়েছে—সরে আস্থন।

এখানে বসবেন না—এখনই সাক্ষ্য আইন জারী হবে। বাড়ী যান। আরে মশাই ধর্মতলার ব্যাপারটা ভুলে গেলেন। রামেশ্বর বাঁড়ুজ্যে কেন মরেছিল জানেন?

পিছু হটেতে হটেতে প্রশান্ত কখন গোলদীঘির বাইরে এসেছে। এধারের রাস্তাটি নির্জন। বৌদ্ধ বিহারের গা দিয়ে একটা বাঁকা গলি বেরিয়েছে। সেটার মধ্য দিয়ে ওপারে

হারিসন রোড বা এধারে ঘুরে মীর্জাপুর স্ট্রীটে পড়া যায়। তার পুরাতন মেসে যাবার পথ ওটা। বহুদিন এ পথে আসে নি। মেসে ছই একজন পরিচিত আছে—তাদের সঙ্গে আলাপ করে যাবার আগ্রহ হ'ল প্রশান্তর। আইন থেকে সাময়িক ভাবে নিষ্কৃতি লাভের বাসনা কিনা কে জানে।

হালো—কি খবর?

বলছি।

সুশীলের বিছানার ওপর বসে পড়ে প্রশান্ত বললে, এক গ্লাস জল খাওয়া দেখি।

শুধু জল। অক্ষুটে উচ্চারণ করে সুশীল বললে, তা ছাড়া আর কিই বা আছে। দোকানপাট এতক্ষণে হয়ত বন্ধ হয়ে গেল।

জলপান করে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, এত শীঘ্র যে আপিসের ছুটি হ'ল?

আপিস। সুশীল হাসলে, বোলই আগষ্টের পর থেকে নিয়মকানুন টিলে হয়েছে। এক শ চুয়াল্লিশ ধারার ওপর কারফিউ অর্ডার—এ তো লেগেই আছে; সকাল ছপুর সন্ধ্যা রাত্রি সব সময়ে। যাই হোক—অনেক দিন পরে দেখা—প্রাণভরে গল্প করা যাবে'খন।

আমাকে এখনই যেতে হবে।

সুশীল হাসলে, যাবে? রাস্তার এপিঠ ওপিঠ ছ'পিঠে আঠার ষষ্ঠী কারফিউ। কাল বেলা এগারটা পর্যন্ত এই জেলখানাতেই—হাসিটা ওর উচ্চ হয়ে উঠল।

প্রশান্ত পাংশুস্বরে বললে, আমার যে ফিরতেই হবে। বিশেষ জরুরি কাজ—

গল্পের চেয়ে জরুরি কাজ আপাতত নেই। বস ভাল হয়ে।

...গল্পের শ্রোতে চিন্তা কোথায় তলিয়ে গেল। সুশীল প্রধানমন্ত্রীর ২০শে ফেব্রুয়ারির বোষণার কথা তুললে। লর্ড ওয়াডেলকে সরিয়ে নিয়ে ব্রিটিশ তার প্রতিশ্রুতির আন্তরিকতা প্রমাণ করে নি কি? কিন্তু এই বোষণায় ভারত-সমস্যায় আর একটি যেন গ্রহি পড়ল। কার হাতে ক্ষমতা দিয়ে ভারত ত্যাগ করবে ওরা? অগ্রগামী একটি দল—অমুমান করা যায় কংগ্রেস—তারাই ক্ষমতা পাবে। সম্পূর্ণ ক্ষমতা অবশ্য নয়। লীগ-শাসিত প্রদেশ আছে—তাদের অনিচ্ছায় মূল অংশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে না। আছেন ভারতীয় রাজহরন্দ। তাঁরা প্রতিশ্রুতি পালনের শেষ তারিখ পর্যন্ত হয়ত প্রতীক্ষা করবেন। তাঁরা স্ব-স্ব স্বার্থ অমুযায়ী যদি অনিচ্ছুক হন—কেউ তাঁদের বাধ্য করতে পারবে না প্রধান অংশের অঙ্গীভূত হতে। এই সব গ্রহি ক্রমাগতই পড়ছে। সম্প্রতি পঞ্জাবে থিকির মন্ত্রীসভার পতন হয়েছে—তিরানবুই ধারায় শাসন চলছে। উনিশ শ আটচল্লিশের আগে যাতে পুরোপুরি

পাকিস্তানী সংগ্রাহ্যভুক্ত হতে পারে পঞ্জাব, তারই আয়োজন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সারা পঞ্জাবে আগুন জ্বলছে। সীমান্ত প্রদেশ আর আসামেও আগুন জ্বালাবার ইচ্ছা সংগৃহীত হচ্ছে। সিঙ্গু তো ইতিমধ্যে স্বতন্ত্র লীগশাসিত প্রদেশ বলে উনিশ শ আটচল্লিশের জুলাই থেকে স্বাধীনতালাভ করবে এই আশা ব্যক্ত করেছে। বাংলা ছ'ভাগে বিভক্ত হবার জরুর তুলেছে। ফেব্রুয়ারির ঘোষণার ফ্রিয়া সুদূরপ্রসারী বলেই মনে হচ্ছে। অছিগিরির চেষ্টা না থাকলেও—ভারতের মাটিতে অনেকখানি আশ্রয় যেন এই সব প্রতিক্রিয়ার সঙ্গেই কয়েক হবার আশা রাখে। ভারতের মহাসাগরে—আর ভারতের মাটিতে—দু-একটি শক্ত শিকড় নামিয়ে ওরা কি আমেরিকা ও সোভিয়েট প্রতিদ্বন্দ্বিতার পূর্ণ পরিণতির দিন গুণবে না? ইতিমধ্যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন আসছেন। ঘোষিত হয়েছে তিনি ভারতের শেষ বড়লাট। ক্ষমতা যাতে অশুভলায় হস্তান্তরিত হয় তারই চেষ্টা তিনি করবেন। তবু একথা স্বীকার করতে হবেই—ক্ষমতালান্তের আশাতেই হোক কিম্বা ভারতের দুর্ভাগ্য বলেই হোক—শুধুলা আজ কোথাও নেই। হিমালয়ের শীর্ষ থেকে কথাকুমারিকার অগ্রবিন্দু পর্যন্ত বিপ্লবের বহুদূরপারের মুহূর্তে কঁাপছে।

২৯

শুশীল খেয়ে যাবার জরুরী দীড়াপিড়ি করলে।

প্রশান্ত বললে, আচ্ছা ঘুরে এখানেই আসব। 'কাজটা মিটিয়ে নিই—যে তোমাদের শহর, কখন কি আইন জারি হয়।

শুভাদের বাসায় এসে শুভার দেখা পেলেন না—উলটে নতুন দুর্ভাবনা মাথায় চাপল। ওর মা অপ্রত্যাশিত কণ্ঠে বললেন, কাল নাকি শহরে ভারি হাঙ্গামা গেছে বাবা—শুভা সেই যে তোমার সঙ্গে বেরুল আর ফেরে নি? সারারাত ছ'চোখের পাতা এক করতে পারি নি। বুড়ো বয়সে আর কত সহ্য হয় বল ত। উনি কেঁদে ফেললেন।

কি সাধনা দেবে—প্রশান্ত চুপ করে রইল। মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে নেক্টু আর খুকী। সেই রুখ ছেলেটি আর সজীব মেয়েটি। মেয়েটির মুখখানি অত্যন্ত স্নান। চোখে মুখে ওর পর্যাপ্ত প্রাণশক্তির আভাস—একটু আশ্বাসে—সামান্য স্নেহে আদরে আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু বড়ের রাত্রি—পরে প্রভাত এলেও সুখ্যোদয় হয় নি—শাখা-চ্যুত লতা মাটিতে জুটয়ে আছে আধশুকনো পাতার ভারে। প্রশান্ত তাকেই ডাকলে কাছে—মাথায় হাত দিয়ে একটু আদর জানালে। বললে—কি খুকী—একটু জল খাওয়াবে? আশ্বাস নয়, অথচ এই কথাতেই মেয়েটি উৎফুল্ল হয়ে

বাড় নেড়ে হেসে উঠল...আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে গেল।

শুভার মা বললেন—বস বাবা।

প্রশান্ত বললে—আমি একবার খোঁজ করে দেখি—

একটু বোস—আমি আসছি...

ঘরের কোণে একটা হারিকেন জ্বলছিল। হারিকেনের সামনে বইখাতা ছড়ান দেখে মনে হয়—ছেলেটা লেখাপড়া করছিল। মা চলে যেতে ছেলেটি সেখানে দাঁড়ায় নি। যেমন দুর্বল ওর দেহ—তেমনি মনটিও হয়ত ভীক—অপরিচিতের সান্নিধ্য এই ধরনের লাজুক ছেলেরা সহ্য করতে পারে না।

অতঃমনস্ক একখানা খাতা সে টেনে নিলে। খাতার ভিতর থেকে মনিঅর্ডার কুপনের চিলতে কাগজটুকু ওর কোলের উপর খসে পড়ল। মনে কৌতূহল না জাগলেও চোখের ধর্ম পালন করলে চোখ। বেশ গোটা হরপে স্পষ্ট লেখা দু'লাইন সে অনায়াসে পড়ে ফেললে।

পঞ্চাশ টাকা পাঠালাম। পৌছান সংবাদ দিও। আশা করি তোমরা কুশলে আছ। ইতি—

অবস্খী

মীরাট থেকে টাকা পাঠিয়েছে অবস্খী। নুতন চাকরী—মাইনে এমন বেশি কিছু নয়—আর সংসারে তার পোষ-সংখ্যাও কম নয়। তবু তাঁদের অভাব না মিটিয়ে—কোন সুবাদে শুভাকে সে টাকা পাঠালে। কোন সুবাদে? মন আলোড়িত হয়ে উঠল। ঝড় কিংবা মনোজগতের বিপ্লব বলা যায় একে। জ্ঞানের ক্ষেত্রটি ভূমিকম্পে ধরিজীর মত টলমল করছে—বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে মস্তিস্ককে স্নেহে ঘনিয়ে এল কুয়াশা। ঈর্ষা অথবা অভিমান—অথবা দুঃখ ক্ষোভ মেশানো অবস্খি—কানের ডগা আর গণ্ডদেশ লেহন করছে মুহূর্তে মুহূর্তে শিখা। অন্ধকার পথে চলতে চলতে হঠাৎ ঘুরে দেখা গেল প্রদীপ। চোখে তার আলোয় জাগছে বিভ্রম—তবু স্পষ্ট হ'ল অনেক রহস্য।

আনমনে সে অচ্য বইগুলি ঝাঁটতে লাগল। উত্তেজনার মুহূর্তে—উচিত-অনুচিত বোধ থাকে না—মনও থাকে না সজাগ, নইলে লঠনের আলোয় সে দেখতে পেত, ঘরের ছয়রে দাঁড়িয়ে শুভা মুহূর্তে হাসছে।

শুভা অবশেষে বললে—আর কিছু পাবে না কমরেড, মিথ্যে বইখাতা ঝাঁটছ।

চমকে সে মুখ তুললে। মুখ তার পাংশু হয়ে গেল। বিবেক তার ভ্রত্বার ক্রটিতে চোখ রাঙিয়ে ধমক দিয়ে উঠল। মাথা নামিয়ে সে অতঃদিকে চাইলে অপরাধীর মত।

শুভা সরে এসে বললে—না না, অতায় কিছু কর নি। যে জিনিসে স্বস্তি তোমার স্থির করেছে নিশ্চয়—সে তো একান্ত করে তোমারই।

প্রশান্ত সবেগে মুখ ফিরিয়ে বললে, তার মানে?

মানে আমি জানি না—মা জানেন। হাসতে হাসতে জবাব দিলে শুভা।

প্রশান্ত বললে, তুমিও জানি—কেবল স্বীকার করতে ভয় পাও।

ভয়—তা হবে। শুভা এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলে। ওসব কথা কাটাকাটি এখন থাক কমরেড—তোমাদের সর্ব-গুলি আমি পড়েছি—পড়ে ভেবেছিও।

সর্বের কথা পরে হবে—

আমার ধারণা ছিল—তোমার মিলের ব্যাপার নিয়ে তুমি অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করছ।

হাঁ—অনেক রকমের অশান্তি আমার—অস্বীকার করব না—কিন্তু তোমাকে যা বলবার—

শুভা বসে পড়ল তার পাশে। যুহ শান্ত গলায় বললে—তোমার কথা আমি জানি। কোন অনাস্থীর পুরুষ যখন কোন অনাস্থীর মেয়ের কাছে একান্ত করে আর আগ্রহভরে কিছু বলতে চায়—তখন তার অর্থ অতি নির্বোধ মেয়েরও অনাস্থাসে বুঝতে পারে।

শুভা তোমার মন বলে কোন বস্তু কি নেই? প্রশান্তর কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হ'ল।

শুভা হাসল—বললে, মনের বালাই না থাকাই ভাল। একটা মাত্র মন—অবশ্যী টাকা পাঠায়—তুমি অর্থসাহায্য কর—সব্ব প্রাণ বাঁচানোর দায়িত্বটা বহন করে, কার প্রতি বেশি করে কৃতজ্ঞ হব বল।

প্রশান্ত কি বলতে যাচ্ছিল—হাত উঠিয়ে শুভা তাকে নিরস্ত করলে। কাছে এসে এইটুকু কি বোঝ নি—মতে আমরা ভিন্ন—পথও আমাদের এক নয়। তুমি চাও দাক্ষিণ্যে যত্ন করতে—টাকা দিয়ে হোক, মিষ্টি কথা বা ব্যবহার দিয়ে হোক কিংবা জীবনপাত করেও দুর্গতদের ভাল করতে চাও। এ হ'ল খানিকটা ওপরে ওঠার ব্যাপার। আর আমরা চাই—যারা কাদায় পড়ে লুটুচ্ছে তাদের হাত ধরে কাদা মেখে তাদের দুর্গতির অংশ নিতে। তোমার আমার মিলবার সাক্ষ্য কোথায় কমরেড?

না শুভা—

চুপ—অসম্মান যথেষ্ট করেছে তাও সয়েছি অসম্মানকে অস্বীকার করার জোরে—কিন্তু অসত্যকে মানব না বলছি।

আমি তোমায় অসম্মান করেছি।

কর নি? কেন ছ'শ টাকার বদলে মাকে বেশি টাকা দিয়েছ। আমার দুঃখ দূর করতে তোমার এত আগ্রহ কেন? পৃথিবীতে দুঃখী মানুষ আর তোমার চোখে পড়ল না।

শুভার কণ্ঠের শুষ্ক—দৃঢ়। ও কি ক্রুদ্ধ হ'ল। প্রশান্তর কি দোষ—মন যেখানে আত্মীয়তার সূত্রজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে—সেখানকার তুচ্ছ দুঃখকণ্ঠে বিচলিত হয়ে পড়া কি

এমনই অস্বাভাবিক? পৃথিবীতে দুঃখী যথেষ্ট আছে—মনের সঙ্গে তাদের দুঃখ যুক্ত নয় বলেই তো নরম হবার অবকাশ আসে না। বড় পৃথিবীতে মানুষ অত্যন্ত ছোট—যে পৃথিবী বাইরের; কিন্তু কতকগুলি সূক্ষ্ম মমতা দিয়ে সেই ছোট মানুষ যে ছনিয়া তৈরি করে তাও কি খণ্ডিত নয়—সূক্ষ্ম নয় অথচ সে মানুষ নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তখন তো আর ছোট থাকে না। সে হয় বৃহৎ—সে তখন অদ্বিতীয়।

শুভা বলতে লাগল, দোষ তোমার দিই না প্রশান্ত—জগৎটাই এমনি ভাবে তৈরি। বহুকাল থেকে যা দেখে আসছি, যা শিখে আসছি—সংস্কারের ধারা কি সংস্কৃতির আলো—ধর্ম কিংবা ঈশ্বর—ভালবাসা আর পরহিংসামোচনের চেহারা এ সব—যে সৃষ্টিগত উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে দৃষ্টিকে আর মনকে অমানি করেই তৈরি করেছে। সবাই বলে পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে কিন্তু মানুষ মিলতে পারছে না তবু। ছোট ধরে কলহ কোলাহল করলে আমরা সৃষ্টি থেকে কি মুছে যাব না কমরেড।

প্রশান্ত ভক্তকণ্ঠে সামলে নিয়েছে। শুভার সব কথা ওর ক্রটিস্পর্শ না করলেও তার আবেগ-গাঢ় স্বর ওর মনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সে যেন বলছে—বাইরেটা জগতের সব নয়—মানুষের তো নয়ই। এই বিশ্বসংস্কারের ভার তোমার আমার সকলের। সংস্কার করতে বিলম্ব হয়—রচনা কর নতুন করে। চিরচরিত প্রধায়, নীতিতে, বিশ্বাসে, বিশ্বাসিত সত্যে আঘাত লাগবে। প্রচণ্ড আঘাত। তবু এগিয়ে চল। এগিয়ে চল।

অবশ্য এ ধনি ক্ষীণ, আর অবিরাম নয়। মাঝে মাঝে মনের পর্দায় বাতাসের বেগে বেঙ্গে উঠছে। গভীর নয় বলেই কেন্দ্র-লগ্ন হতে পারছে না।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন মানসে ও বললে, আমার সর্ব সব পড়েছ আর ভেবেছ বললে। সত্যিই কি সেগুলি স্বীকার কর না?

শুভা ওর মনোভাব বুঝলে। সহজ কণ্ঠে বললে, সব-গুলোর কথা নিয়ে আলোচনা করব আর একদিন—আজ একটা কথা শুধু তুলব। তুমি বলেছ—আমাদের দেশে শ্রমিকদের সততা কম। তারা মজুরি বাড়িয়ে নেয় কিন্তু কাছে কাঁকি দিতে কসর করে না। এই ধীরপন্থা নীতিতে নাকি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে—মানুষের দুঃখ ঘুচ্ছে না।

অস্বীকার কর এ কথা? প্রশান্ত উদ্বীগু কণ্ঠে প্রশ্ন করলে। না, বরং স্বীকার করে নিচ্ছি তোমার অভিযোগ। কিন্তু প্রতিবাদ আমার এইখানেই যে, দোষ একলা শ্রমিকদের নয়।

মানে ধর্মঘট না হলে—

একে একে তোমার কথার জবাব দেব প্রশান্ত। শিল্প উৎপাদন কমানোর জন্তে দায়ী একলা শ্রমিক নয়—মালিকও।



কিসে।

কেন—জিনিসের বাজারদর যাতে চড়া থাকে, মুনাফা যাতে বাড়ে তেমন কৌশলের কথা কোন দিন কোথাও পড়নি—কি তোমার মনে হয় নি? বেশি দিনের কথা নয়, পঞ্চাশের দ্বিভিক্ষে বাংলায় যখন লক্ষ লক্ষ লোক মরছিল—যুদ্ধরত ইউরোপের যখন নাভিধ্বাস উঠেছিল—তখন আমেরিকা কত লক্ষ মণ খাদ্য-শস্য নষ্ট করে ফেলেছিল বাজারদর চড়া রাখতে—সে খবর নিশ্চয় রাখ। শোন—শিল্পের ক্ষেত্রেও এমন অসাধুতার দৃষ্টান্ত বহু আছে। ধনিকের ধারাই হ'ল—নিজেদের পুষ্টিসাধন।

কিন্তু—

ধর্মঘট করে দুঃখী মানুষের লাভ কতটুকু প্রশান্ত। একান্ত নিরুপায় হয়েই শেষ অগ্র হিসাবে—

না—ওদের ক্ষোপয়ে যখন ধর্মঘট ঘোষণা করা একজাতীয় নেতাদের পেশা। তাতেই তাদের নেতাগিরি টিকে আছে।

বেশ ত সেই নেতাগিরিতে আঘাত দাও না। ভণ্ডামির প্রশ্রয় দিলে সমাজ হুহু থাকে না।

আঘাত দেব কি করে—ভারা যে বর্ণচোরা। যাদের ক্ষেপানো হয়, তাদের হিংসাকে, তাদের ধর্মমতকে, এমন কি তাদের সব রকমের দুর্বলতাকে অস্ত্রের মত ব্যবহার

করতে এরা যে পট্টা...কাল যে চিরকুটখানা তোমায় দিয়েছি—

ওটা যে তোমাদেরই স্বপ্ন নয়—

হাতের লেখাটা সনাক্ত করা শক্ত নয়। আর সেটা তুমি চেষ্টা করলেই পারবে।

চেষ্টা করব কমরেড। শুভা হাসল।

তার আগে ধর্মঘটের যে গুজব শোনা যাচ্ছে।

গুজবে বিশ্বাস করো না। যারা দুকল তারা মুখে একটুও আঞ্চালন করবে না এ কেমন করে আশা কর কমরেড।

প্রশান্ত উঠবার ভঙ্গি করে বললে, কাল আসব কি?

সুবিধে হয় আসবে—না হয় চিঠি লিখে জানাব।

সিঁড়িতে নামবার মুখে শুভা বললে, একটা ক্রটি স্বীকার করে রাখি কমরেড। তোমার টাকাটা আপাতত ফিরিয়ে

দিতে পারছি না। তুমি হয়ত বলবে—যদি আত্মসম্মানে বাধল তো ও জিনিষ নেওয়া কেন। আমার উত্তর—অবস্থার চাপ।

ওটা আত্মসাৎ করব না—ফিরিয়ে দেব—তবে বিনা সন্দেহে।

প্রশান্ত আরক্ত মুখে বললে, তোমার এ আঘাতও স্বীকার করে নিলাম শুভা।

আর কোন কথা না বলে সে সিঁড়ি দিয়ে তরু তরু করে নেমে গেল।

ক্রমশঃ

## বৈদিক ও দেশী-সঙ্গীতের স্বর

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

লৌকিক স্বর দেশী স্বর হিসাবেই পরিচিত। দেশী-সঙ্গীতকে পশ্চাত্য সঙ্গীতবিদরা 'folk song' বলেছেন। ডঃ পারি (C. Hubert H. Parry) বলেছেন: 'Folk-tunes are the first essays made by man in distributing his notes so as to express his feelings in terms of design. \* \* Folk-music supplies an epitome of the principles upon which musical art is founded; \* \*<sup>১</sup> রাশিয়ান সঙ্গীতবিৎ ক্যালভোকোরেশী (M. D. Calvocoressi)-ও স্বীকার করেছেন, রাশিয়ার জাতীয় সঙ্গীত বেশীর ভাগ তখনকার সময়ে প্রচলিত দেশী আর গ্রীস, রোম, আরব সঙ্গীতের কাছ থেকে মালমশলা সংগ্রহ করেছিল: 'Russian national music owes much to the influence of native folk music, and also of Eastern music.'<sup>২</sup> রাগি এলিজাবেথের সময়ে (১৭৪১-১৭৬১ খ্রি:) ইউরোপের দেশী-সঙ্গীতের পাশে ইতালীয় দেশী-সঙ্গীতও বিকাশলাভ করেছিল।

এডোয়ার্ড ম্যাকডোয়েল (E. Macdowell) বলেছেন: মধ্যযুগীয় গির্জায় প্রাচীন-সঙ্গীতের সময় দেশী-সঙ্গীতই সর্বদা গাওয়া হ'ত।<sup>৩</sup> ক্রোয়েষ্ট (F. J. Crowest) ও পার্সি বাক্ (Percy C. Back) দেশী-সঙ্গীতের আগে বাদ্যের তথা বাদ্যযুগের ('drum age') প্রচলনের কথা বলেছেন।<sup>৪</sup> কিন্তু আমাদের মনে হয়, কণ্ঠ ও বাদ্য তথা যন্ত্রসঙ্গীতের ভেতর কোনটা প্রথমে বিকাশলাভ করেছিল তা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন; কেননা প্রাচীন যন্ত্র ও বাদ্য যেমন শঙ্খ, বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ, ভেরী, ছন্দুভি, শততন্ত্রী, সহস্রতন্ত্রী এসবের উপযোগিতা তখনি আসে যখনি স্বর ও সুরের সমবেত রূপ কণ্ঠে প্রকাশিত না হলেও মানুষের মনে স্বপ্ন আকারে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কাজেই উন্নত বিধিবদ্ধ রচিকর মার্গ-সঙ্গীতের উৎপত্তি গোড়াকার দিকে না হলেও দেশীর আওতায় সাধারণতঃ সঙ্গীতই ছিল কণ্ঠ, যন্ত্র ও বাদ্যের সংমিশ্রণ রূপে।<sup>৫</sup>

৩। Critical and Historical Essays, পৃ: ১৬ ড্র:

৪। Crowest, The Story of Music, পৃ: ১০; Back: A History of Music, পৃ: ৭৫ ড্র:

৫। সি: ক্রোয়েষ্ট আবার বলেছেন: 'Instrumental music-

১। The Art of Music (1923), পৃ: ৮০-৮১ ড্র:

২। A Survey of Russian Music (1944), পৃ: ১১-ড্র:

সামিক যুগের গানকে সাধারণতঃ আমরা 'সামগান' বলি। একটি মাত্র স্বর দিয়ে যে সময়ে গান গাওয়ার রীতি ছিল তখনকার নাম আটিক যুগ। আটিকের পর গাথিক যুগ। সে সময়ে দু'স্বরের গান গাওয়া হ'ত। সামিকে তিন স্বর দিয়ে গান গাওয়ার রীতি ছিল। সামিক অথবা সামগানে তিনটি স্বরের প্রচলন থাকলেও তিনটির বেশী স্বরও যে ব্যবহার হত তার প্রমাণ আমরা সামপ্রতিশাখ্য পুষ্পসূত্রে ও নারদীশিক্ষায় পেয়ে থাকি। পুষ্পসূত্রকার পুষ্পর্ষি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন : শাখাভেদে ভিন্ন ভিন্ন সামগানের প্রচলন বৈদিক সমাজে ছিল ও সেই সব গানে তিন, চার, পাঁচ, ছয় ও সাত স্বরের ব্যবহার ছিল। কাজেই শ্রেণী বা পঙক্তি হিসাবে সামিক গান ও সামগানকে আমাদের আলাদা ভাবেই দেখা উচিত; কেননা ওড়ব (পাঁচ) ষাড়ব (ছয়) ও সংপূর্ণ (সাত) স্বরের সঙ্গীত যখন সমাজের সর্বত্র প্রচলিত ছিল তখনও সামগানকে বৈদিক ও মাদ্রলিক যে কোন অস্থানের সঙ্গে গাওয়া হ'ত।

বৈদিক সঙ্গীত সামগানে সাত স্বরের নাম ক্রুষ্ঠ, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মজ্র, ও আতিস্বার্য। সায়ণাচার্য সামবিধান-ব্রাহ্মণ ও সামবেদের ভাষ্যভূমিকায় এদের আবার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্বর বলেও উল্লেখ করেছেন। বৈদিক সামগানের পাশাপাশি দেশী ও মার্গ-সঙ্গীতের ষড়ঙ্গাদি সাত স্বরের প্রচলনও ছিল। আর্যেয়, সামবিধান প্রভৃতি ব্রাহ্মণে অরণ্যেগেয়গান ও গ্রামেগেয়-গানের উল্লেখ থাকায় বোঝা যায়—অরণ্যেগেয়গানই ছিল বৈদিক তথা সামগান, আর গ্রামেগেয়গান ছিল উন্নত আকারে মার্গ ও গান্ধর্ব আর সাধারণভাবে দেশী-সঙ্গীত। অথবা বলা যায়, অরণ্যেগেয় থেকেই সামগান তথা নিছক বৈদিক সঙ্গীত আর গ্রামেগেয় থেকে মার্গ ও দেশী-সঙ্গীতের উৎপত্তি হয়েছিল। ঋগ্বেদের মজ্র বা ছন্দের ওপর স্বরবিভাস করে গাওয়াতেই সাম বা সামগানের সার্থকতা। সামগান প্রধানতঃ যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞবেদীর পাশে ঋত্বিক ব্রাহ্মণেরা গান করতেন।

সঙ্গীত-শাস্ত্রকারেরা সঙ্গীতকে দেশী ও মার্গ এই দু'ভাগে প্রধানত ভাগ করেছেন। মার্গ-সঙ্গীত বলতে তাঁরা বলেছেন :

ব্রহ্মা চার বেদ থেকে অব্রহ্মণ করে যা ভরতাদি শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন ও পরে ভরত প্রভৃতি কলাবিদ্রা আবার শিবের কাছে সাধারণ সমাজের কল্যাণের জন্তে যা প্রচার করেছিলেন তাই মার্গ—'মার্গঃ স যো বিরিকাঠৈঃ অব্রিষ্টো ভরতাত্তৈঃ শস্তোরগ্রে প্রযুক্তোহচ্য'। এই ব্রহ্মা চতুর্মুখ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা কিনা আজ পর্যন্ত তার কোন নিদারণ হয় নি। তবে মার্গ-সঙ্গীতের প্রচারক ব্রহ্মা যে একজন সঙ্গীত-শাস্ত্রবিৎ কৃতবিদ্য কলাকুশলী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই ব্রহ্মার কাছেই নাট্যশাস্ত্রকার ভরত, দণ্ডিল, তুশ্বক প্রভৃতি সঙ্গীত-নায়কেরা মার্গ তথা গান্ধর্ববিজ্ঞায় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। মোট কথা শিল্পাচার্য ব্রহ্মা সাম প্রভৃতি চারবেদ থেকে তন্ন তন্ন অব্রহ্মণ করে যে সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলেন তার নাম 'মার্গ', আর দেশে দেশে বাধানিষেধের বলাই না রেখে স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে লোকে যে গান গাইত তার নাম 'দেশী'। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত সামগানের খুঁটিনাটির পরিচয় না দিলেও গান্ধর্বগানের কথা উল্লেখ করেছেন।

অনেকে মনে করেন বৈদিক সঙ্গীতের স্বরের সঙ্গে মার্গ অথবা দেশী-গানের স্বরের কোন সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু তা ঠিক নয়। নারদী-শিক্ষায় নারদ 'যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেগোর্মধ্যমঃ স্বরঃ' শ্লোকগুলির নজরে বৈদিক ও মার্গসঙ্গীতের স্বরগুলির ভেতর একটা সম্পর্ক দেখিয়েছেন। এ ধরণের কৃত্রিম বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্যেরও প্রাপ্য, যদিও তাঁর পদ্ধতি ও ইঙ্গিত নারদ থেকে একেবারে আলাদা বা উল্টাই বলা যায়। যেমন নারদ বলেছেন : 'যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেগোর্মধ্যমঃ স্বরঃ। যো দ্বিতীয়ঃ স গান্ধারতৃতীয়তৃষভঃ স্মৃতঃ। চতুর্থঃ ষড়ঙ্গ ইত্যাহঃ পঞ্চমীর্ধৈবতো ভবেৎ। ষষ্ঠে নিষাদো বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তমঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ।' কিন্তু সায়ণাচার্য বলেছেন, 'লৌকিকে যে নিষাদাদয়ঃ সপ্তস্বরঃ প্রসিদ্ধাঃ ত এব সায়ি ক্রুষ্ঠাদয়ঃ সপ্ত স্বরাঃ ভবন্তি তদ্ যথা, যো নিষাদঃ স ক্রুষ্ঠঃ, ধৈবতঃ প্রথমঃ, পঞ্চমঃ দ্বিতীয়ঃ, মধ্যমতৃতীয়ঃ, গান্ধর্বশ্রুতর্ভঃ, ঋষভো মজ্রঃ, ষড়জ্যোতিস্বার্থ ইতি।' অর্থাৎ সামস্বরের আর নারদ ও সায়ণাচার্যের স্বরগুলির পরিচয় পাশাপাশি দেখালে দেখা যায়,

| সামস্বর        | নারদ    | সায়ণ   |
|----------------|---------|---------|
| (১) ক্রুষ্ঠ    | পঞ্চম   | নিষাদ   |
| (২) প্রথম      | মধ্যম   | ধৈবত    |
| (৩) দ্বিতীয়   | গান্ধার | পঞ্চম   |
| (৪) তৃতীয়     | ঋষভ     | মধ্যম   |
| (৫) চতুর্থ     | ষড়ঙ্গ  | গান্ধার |
| (৬) মজ্র       | ধৈবত    | ঋষভ     |
| (৭) আতিস্বার্য | নিষাদ   | ষড়ঙ্গ  |

as we know it, is of comparatively modern date—little more than two hundred years old.—*The Story of Music*, পৃঃ ১৫২।

কিন্তু আমাদের অভিমতে ক্রোয়েষ্টের অনুমান ঠিক নয়, কেননা প্রাগৈতিহাসিক মহেন্দ্রোদড়ের ধ্বংসস্তুপ থেকেও বাণী প্রভৃতি বাতাস্য গাওয়া গেছে যা বেশ উন্নত। মহেন্দ্রোদড়ের বয়স পাঁচ হাজারেরও বেশী। তা ছাড়া ব্রাহ্মণের যুগে শততন্ত্রী বীণারও উল্লেখ আছে।

এই সাতস্বরের বিকাশের কিন্তু একটি ইতিহাস আছে, ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ীই তারা সমাজে বিকাশ লাভ করেছিল। স্বরগুলির বিকাশের রীতি মোটামুটি বর্ণনা করতে গেলে বলা যায়, আটিকের যুগে প্রথম স্বরই মাত্র ছিল; গাথিকের যুগে প্রথম ও দ্বিতীয়, সামিকের যুগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, স্বরাঙ্করের যুগে প্রথম থেকে চতুর্থ, ওড়বের যুগে প্রথম থেকে পঞ্চম বা মজ্জ পর্যন্ত, যাড়বের যুগে প্রথম থেকে অতিস্বার্থ পর্যন্ত আর সংপূর্ণের যুগে প্রথম থেকে জুষ্ট পর্যন্ত স্বরের বিকাশ হয়েছিল। ঠিক এই ধরনের বিকাশের ধারা সকলে আবার স্বীকার করেন না। প্রথম স্বরকে কেউ কেউ বলতে চান পঞ্চম, কারো মতে নিষাদ অথবা ষড়্জ। কিন্তু সায়গাচারের স্বরগুলি নিয়ে আলোচনা করলে ধৈবত-স্বরই হয় প্রথম। কিন্তু সায়গাচারের আরোহণগতির বা upward movement-এর ক্রমবিকাশকে মেনে নিতে আমরা ঠিক রাজী নই, কেননা বৈদিক যুগে স্বরগুলির গতিই ছিল অবরোহণ গতিতে অর্থাৎ downward movement-এ। কাজেই বৈদিক যুগের অবরোহণগতি অনুযায়ী স্বরগুলির বিকাশ স্বীকার করলে বিকাশভঙ্গী হয় এরকম,—

| মজ্জ  |            |      |        | মধ্য   |          |       |             |  |
|-------|------------|------|--------|--------|----------|-------|-------------|--|
| পা    | ধা         | নি   | সা     | রে     | গা       | মা    | —দেশী স্বর  |  |
| জুষ্ট | অতিস্বার্থ | মজ্জ | চতুর্থ | তৃতীয় | দ্বিতীয় | প্রথম | —বৈদিক স্বর |  |
| ৭     | ৬          | ৫    | ৪      | ৩      | ২        | ১     |             |  |

কিন্তু এ সব বিকাশের ইতিহাস ও সঙ্গীতের খুঁটিনাটি শিল্পীরা আগেও বেশী আলোচনা করেন নি, এখনও নয়। এখন আমরা এসব ঔপপত্তিকের (theoretical) আলোচনার স্থান দিই ততটুকু যতটুকু সঙ্গীতের কার্যকর (practical) সাধনার পক্ষে একান্ত দরকার, তাও আধুনিক বিকাশের ওপরই বেশী জোর দিয়ে। যেমন কানড়া বা কানাড়া রাগিণীর শ্রেণী কত রকম, তাদের পরস্পরের রূপভেদ কি, তাদের বাদী সংবাদী ও ঠাটের স্বরূপ কি—এই সব নিয়েই আলোচনা আমাদের বেশী, অবশ্য খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জানা সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই উচিত; কিন্তু আমাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে, কানাড়াকুঞ্জের উৎপত্তির পেছনে অভিযুক্তি কেন এল, কি প্রয়োজনের তাগিদে তাগিদে সঙ্গীতসমাজ একটি কানাড়া থেকে আরো সতেরটি কানাড়ার রূপভেদের সৃষ্টি করল, আর সে করার পিছনে যুক্তি ও যথার্থ বিজ্ঞানই বা কি—এ সব বিষয়ে আলোচনা অথবা গবেষণাকে আমরা মোটেই স্থান দিই নি। বরং যুক্তি ও বিজ্ঞানের বালাই না রেখে পৌরাণিকী গল্পের দোহাই দিয়েই আমরা এক রকম সন্তুষ্ট হতে চাই। যেমন কানাড়া রাগ অথবা রাগিণীটির নামের সার্থকতা দেখাতে গিয়ে আমরা বলে থাকি কাঙ্, কানাই বা ত্রীকৃষ্ণের বাণী থেকে এই রাগ, রাগিণী বা সুরের জন্ম হয়েছিল আর একজন্মে এর নাম কানড়া, কানাড়া

অথবা কাঙ্ড়া। কথাটি উচ্চশিক্ষিত সঙ্গীতসমাজ থেকে এখনও মুছে যায় নি। অথচ কর্ণাট দেশ থেকে যে এর উৎপত্তি হয়েছে এ ঐতিহাসিক নজির দেখাতে আমরা রাজী নই। সে রকম সাত স্বরের জন্মকথা সম্বন্ধেও বলা যায়। প্রকৃতি-দেবী জীবজগৎ সকলকেই প্রসব করেছেন বলে পশুপক্ষীর ডাক তথা অস্তিম স্বর থেকে ষড়্জাদি সাত স্বরের উৎপত্তি হয়েছিল এ কথাই আমরা বেদবাক্য বলে আজ পর্যন্তও বিশ্বাস করি যদিও বাণী স্বর-সংস্থানের দূরত্ব দেখিয়ে কেউ কেউ যুক্তির নজির দেখাবার চেষ্টা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত ঠিক এ ধরনের প্রমাণ একটা দেবার চেষ্টা করেছেন। সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরাও ঠিক ঠিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর এর কোন সছত্তর দিতে পারেন নি। কিন্তু তা হলও দেশ ও সমাজের ধারা সকল দিক দিয়ে এগিয়েই চলেছে, পেছন হাঁটার ইচ্ছা মোটেই তাদের মধ্যে দেখা যায় না। বিশেষতঃ এখন যে যুগে আমরা বাস করি সে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ও যুক্তির যুগ। সকল জিনিষকে বিজ্ঞানের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করার এখন সময় এসেছে। সঙ্গীতের পুঙ্খানুপুঙ্খ আমাদেরও তাই উচিত—সঙ্গীতের সবকিছুকেই পুরোপুরি যুক্তির আলোক দিয়ে বিশ্লেষণ করা। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের প্রমাণগুলিকে আমাদের এখন থেকে বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষণে যাচাই করে দেখা উচিত। তাতে সঙ্গীতের গুণ ও আসল অনেক রহস্য বরং প্রকাশিত হবে। বৈদিক ও দেশী-সঙ্গীতের স্বরসম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় আমরা সকলেই জানি, কিন্তু বৈদিকের পাশে মার্গ তথা গান্ধর্বের স্বরগুলির বিকাশ কেমন করে হয়েছিল তার সত্যিকার রহস্য ও ইতিহাস আমরা ঠিক ঠিক ক'জন জানি বলা সত্যিই দুস্কর। বৈদিক, মার্গ ও দেশী সঙ্গীত নিয়েও সত্যিকার আলোচনা এখনো পর্যন্ত হয় নি। মার্গকে কেউ কেউ ক্লাসিকালের পর্যায়েও ফেলে থাকেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। মার্গ-সঙ্গীতকে অনেকে আবার পুরোপুরি বৈদিক সঙ্গীতও বলতে চান যেটা নিতান্তই ভুল। তা ছাড়া দেশীর সঙ্গে মার্গ তথা গান্ধর্ব আর বর্তমানে মুসলমান যুগের আমদানি করা ক্লাসিকাল সঙ্গীতের মিল ও অমিল অথবা সম্পর্ক কতটুকু তাই বা আমরা ক'জনে জানি? কাজেই এ “বৈদিক ও দেশী-সঙ্গীতের স্বর” প্রবন্ধের অবতারণায় আমরা বলতে চাই যে, সঙ্গীত-সাধনার উপযোগিতা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের ক্রিয়াংশ ও উপপত্তিকের সবকিছুকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং বিজ্ঞান ও যুক্তির মাপকাঠিতে আমাদের গ্রহণ করা দরকার। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আলোচনা প্রবর্তন করে ছাত্র-ছাত্রীদের ঠিক এভাবেই গড়ে তুলতে হবে, আর তা হলেই মনে হয় সঙ্গীতের বিকাশ ও আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হবে; দেশের জনসাধারণের ভেতরও সঙ্গীতের ওপর আগ্রহ ও শ্রদ্ধার ভাব জন্মণঃ বাড়বে।

# বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগ

শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রদেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমত এবার আমি ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত কয়েকখানি সুপ্রাচীন বাংলা উপন্যাস দেখিয়া শ্রীম্মবকাশের সদ্যবহার করিয়াছি। এগুলির কোন-কোনটি সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ আছে বলিয়া মনে করি।

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৭৯ শক বা ১২৬৪ সাল, অর্থাৎ সিপাহী-বিদ্রোহের সময়, বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই বৎসর তিনখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়; উহা— ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস,’ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের ‘দুরাকাজেকের বৃথা ভ্রমণ,’ ও টেকচাঁদ ঠাকুরের (ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্রের) ‘আলালের ঘরের দুলাল’।

‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ : ভূদেবের এই গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ একান্ত দুস্ত্রাপ্য; এই কারণে ইহার প্রকাশকাল লইয়া অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এমন কি, অধুনা প্রকাশিত ‘বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা’ গ্রন্থের ২য় সংস্করণে “প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস” প্রসঙ্গে উক্তরী ক্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, “ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাবের তারিখ অনিশ্চিত।” ব্রিটিশ মিউজিয়মে আমি যে কয়েকখানি প্রাচীন উপন্যাস দেখিয়াছি, ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ের ১ম সংস্করণ তাহাদের অগ্রতম। উহার আখ্যা-পত্রটি হুবহু উদ্ধৃত করিতেছি :—

Historical Tales

in Bengali

By

Bhoodeb Mookerjee

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রী ভূদেব মুখোপাধ্যায়

কর্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা সুচার যন্ত্রে

শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা, বাহির

মুদ্রাপুর, ১৩ সংখ্যক ভবনে মুদ্রিত

শকাব্দঃ ১৭৭৯।

ইহা হইতে ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ের প্রথম প্রকাশকাল যে “১৭৭৯ শক” তাহা জানা যাইতেছে। কিন্তু শকাব্দের সহিত মাস-তারিখের উল্লেখ না থাকায় ইহা ইংরেজী ১৮৫৭ কি

১৮৫৮ সনে প্রকাশিত তাহা জোর করিয়া বলা কঠিন। মনে রাখিতে হইবে, “১৭৭৯ শক” ইংরেজী ১২ এপ্রিল ১৮৫৭ হইতে ১২ এপ্রিল ১৮৫৮ পর্যন্ত স্থচনা করে।

‘দুরাকাজেকের বৃথা ভ্রমণ’ : ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ের সমসময়ে আচার্য্য কৃষ্ণকমলের এই উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়। ইহা পাঠ করিয়া মনস্কী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ‘বিবিধার্থ-সংগ্রহে’ (আখ্যাত ১৭৮০ শক) লিখিয়াছিলেন :—

“এতদেগীয় উপন্যাস সকলেরই এক ধারা; সকলেই ‘এক রাস্তা ছিলেন তাঁহার সো দো দুই রাণী’ এই রূপ বাস্তব ধরণে আরম্ভ হইয়া থাকে; এই উপন্যাস তদ্রূপ নহে, এবং গল্পটীও তাদৃশ নিন্দনীয় নহে।”

ইহার ভাব ভাষা ও গল্প সাহিত্যরতী অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে মুগ্ধ করিয়াছিল (২ নং সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : ‘কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য’ দ্রষ্টব্য)। শ্রীকুমার বাবুর ‘বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা’ গ্রন্থে ভূদেবের ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ের উল্লেখ আছে, অথচ একই সময়ে প্রকাশিত এবং একই ইংরেজী গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে লিখিত কৃষ্ণকমলের বইখানির নাম কেন যে হিসাবে বাদ পড়িল বুঝিয়া উঠা কঠিন; হয়ত তিনি ইহার সন্ধান রাখেন না। কিন্তু “দুস্ত্রাপ্য গ্রন্থমালা”র পুনর্মুদ্রিত করিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার দুস্ত্রাপ্যতা ঘুচাইয়াছেন।

‘বিজয় বসন্ত’ : উপরি-উক্ত উপন্যাসগুলির অব্যবহিত পরেই হরিনাথ মজুমদার (কাঞ্চাল হরিনাথ) প্রণীত ‘বিজয় বসন্ত’ প্রকাশিত হয়; উহার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

বিজয় বসন্ত। / নীতিগর্ভ অপূর্ণ উপাখ্যান, / কুমারখালী নিবাসী / শ্রী হরিনাথ মজুমদার কর্তৃক / প্রণীত / কলিকাতা সুচার যন্ত্রে / শ্রী লালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা বাহির / মুদ্রাপুর চাষাঘোবা পাড়ায়, ১৩ সংখ্যক ভবনে / মুদ্রিত হইল, / ১৭৮১ শক ১০ই পৌষ / মূল্য ১০ আট আনা মাত্র।

‘বিজয় বসন্ত’ সেকালের একখানি বহুল-প্রচারিত নীতিগর্ভ উপাখ্যান। শ্রীকুমার বাবুর গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিলে স্থখী হইতাম।

‘ফুলমাণি ও করুণার বিবরণ’ : ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। ইহার লেখিকা—বিবি ফুলমাণি। পুস্তকের আখ্যা-পত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

The history / of / Fbulmani and Karuna / a book for / Native Christian Women / ফুলমাণি

ও করুণার বিবরণ / জীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত / Calcutta, / Printed for the Calcutta Christian Tract and / Book Society, B. J Baptist, at Bishops / College Press / 1st ed, 1852 [3000 copies /]

এই বইখানিকে কেহ কেহ মহিলা-রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাস বলিতে চাহিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাকে উপন্যাস বলা চলে না। ইহাতে কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি দ্বারা গল্পছলে জীলোকদের মধ্যে তৎকাল-প্রচলিত কুপ্রথা ও কুসংস্কারের

বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এবং কি উপায়ে তাহা দূর করা যায়,— খ্রীষ্টান সমাজ ও তত্ত্ববিদ বা এ বিষয়ে কি করিতে পারেন, তাহাও আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকের সূচনায় Calcutta Christian Tract and Book Society-সম্পাদককে Mrs. Mullens পুস্তকের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষের একটি অধ্যায়ে খ্রীষ্টানদের যে হিন্দুদের অহুকরণে হিন্দু দেব-দেবীর নামানুসারে শিব কৃষ্ণ হরি প্রভৃতি নাম রাখেন তাহাতে আক্ষেপোক্তি আছে।

## সমুদ্র ও মহাদেশের উদ্ভব

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত

পৃথিবীতে শতকরা ৭১ ভাগ জল ও ২৯ ভাগ স্থল। জল ও স্থলের উৎপত্তিবিষয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ আলোচনা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক মতবাদও দেখিতে পাওয়া যায়। আদিতে পৃথিবী জলন্ত বাষ্পপিকল্পে সূর্য হইতে জন্মগ্রহণ করে। মহাশূণ্ডে বিচরণকালে তাপবিকীরণ হেতু উহা ক্রমেই শীতল হইতে আরম্ভ হয়। পৃথিবী প্রথমে তরল ও পরে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অবস্থান্তরের ফলে পৃথিবী আয়তনে সমুচিত হইতে থাকে এবং সঙ্কোচনের ফলে উহার উপরিভাগে তরঙ্গাকারে ভাঁজের সৃষ্টি হইতে থাকে। পৃথিবী জলধারণের উপযোগী শীতল হইলে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে ভাঁজের নিম্নাংশে সঞ্চিত হওয়ায় সমুদ্রের সৃষ্টি হইল। উচ্চাংশ স্থলভাগরূপে উথিত হইয়া বিরাজমান রহিল।

পৃথিবীর জন্মের পর হইতেই জলাশয় ও স্থলভাগের সৃষ্টি-কার্য স্বাভাবিক ভাবেই সম্পন্ন হইতেছিল—ইহাই কতিপয় বৈজ্ঞানিকের অভিমত। পদার্থবিদ কেলভিন বলেন যে, পৃথিবীর গ্যাসীয় অবস্থা হইতেই স্থলভাগ দানা বাঁধিয়া উঠিতে-ছিল। সোলাসের মতে বায়ু-মণ্ডলের অসমান চাপের জন্মই পৃথিবীর তরল অবস্থাতেই ভূপৃষ্ঠ অসমতল হইয়া স্থলভাগ ও জলাধারের সৃষ্টি করিয়াছে। আবার গ্রহাণুবাদ মতের (Planetesimal Hypothesis) উদ্ভাবক চেম্বারলেনের মতে কঠিন গ্রহাণুগুলি পরস্পরের আকর্ষণে ও সংঘর্ষের ফলে উদ্ভূত তাপদ্বারা জমাট বাঁধিয়া যায়। এইরূপে সৃষ্ট ভূতল অসমতল ও গহ্বরযুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। এই গহ্বরগুলিই পরে সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছে। উচ্চাংশ স্থলভাগের সৃষ্টি করিয়াছে।

যেখানেই সৃষ্ট হোক না কেন, পরবর্তীকালে এই সকল

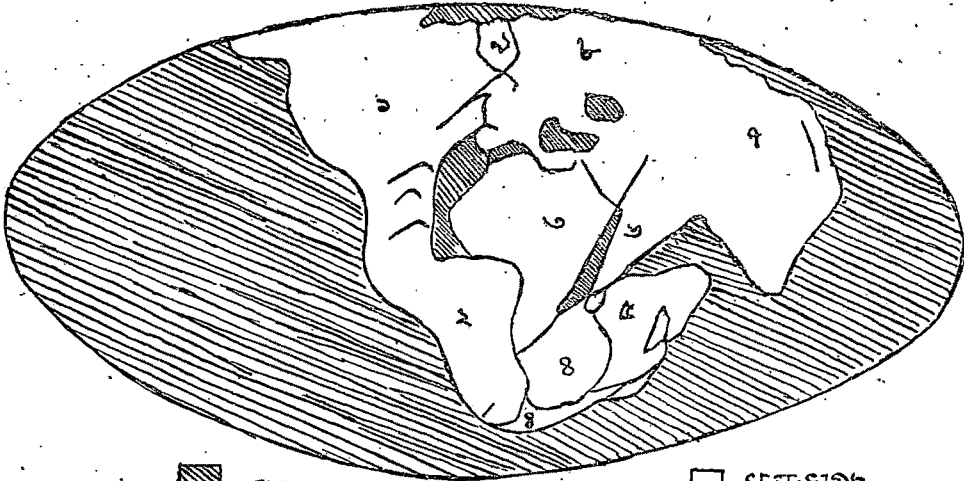
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থলভাগ একত্রে জমাট বাঁধিয়া এক বিরাট মহাদেশের সৃষ্টি করিল। তাহাকে যিরিয়া রহিল এক বিশাল মহাসমুদ্র। এই মহাদেশটির নাম দেওয়া হইয়াছে প্যানজিয়া (Pangaea) এবং মহাসমুদ্রটির নাম দেওয়া হইয়াছে প্যানথালাসা (Panthalassa)। বর্তমানের মহাদেশগুলির বঙ্কবিভাস (stratification) ও তদ্ব্যবস্থা প্রাণীর ধ্বংসাবশেষ হইতে এইরূপে একটি মহাদেশের অস্তিত্ব সমর্থিত হইয়াছে। এই মহাদেশটিই পরবর্তীকালে ভাঙিয়া চুরিয়া বর্তমানের মহাদেশ-গুলির সৃষ্টি করিয়াছে আর প্যানথালাসার জল ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছে।

প্যানজিয়ার ভাঙন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকমহলে কয়েকটি বিরুদ্ধ মতবাদের প্রচলন দেখা যায়। একদল বলেন যে, শীতল হইবার জন্ত সঙ্কোচের ফলে পৃথিবীতে যে ভাঁজের সৃষ্টি হয় তাহারই জন্ত প্যানজিয়ার ভাঙন শুরু হয়। এইরূপে সৃষ্ট ফাটলে সমুদ্রের জল প্রবেশ করিয়া অন্তর্বর্তী সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছে।

পৃথিবীতে কোন কোন জলপূর্ণ অবনমিত স্থানে পলি সঞ্চয় হইয়া থাকে। সঞ্চিত পলির চাপে ভূপৃষ্ঠের ঐ সকল অবনমিত অংশ আরও বসিয়া যায়। ফলে উহার উভয় পার্শ্বস্থ স্থলভাগ পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসে। এইরূপে সঙ্কোচনের দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠে ফাটল সৃষ্টি ও তাহাতে পলিসঞ্চয়ের দরুন উভয় পার্শ্বস্থ অংশের সঞ্চরণের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। একই প্রকারে প্যানজিয়া ভাঙিয়া সমুদ্র ও মহাদেশের সৃষ্টি করিয়া থাকিবে—ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে।

অপর মতে পৃথিবীপৃষ্ঠের অংশ-বিশেষের সঞ্চরণের ফলে প্যানজিয়ার ভাঙন ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। সঞ্চরণ মত-





■ ভূমি-ভাগ

□ সুদূর-ভাগ

২০০,০০০,০০০ বছর আগে “প্যানজিয়া” (Pangea) ও

“পান্থালাসা” (Panthalassa)—Wegener মতে।

১। উত্তর আমেরিকা, ২। দক্ষিণ আমেরিকা, ৩। আফ্রিকা, ৪। এন্টার্কটিকা, ৫। অষ্ট্রেলিয়া,

৬। ভারতবর্ষ, ৭। উত্তর এশিয়া, ৮। ইউরোপ, ৯। গ্রীনল্যান্ড

বাদকে একটি সুদূর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করান সর্বপ্রথম আলফ্রেড ভেগনার। ডালি ও টেলর নিজ নিজ ব্যাখ্যার দ্বারা এই মতবাদ সমর্থন করিয়াছেন। ভেগনার একজন জার্মান আবহাওয়া-তত্ত্ববিদ। পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ের আবহাওয়া নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি লক্ষ্য করেন যে, পৃথিবীতে এমন সব স্থান আছে যেখানে পূর্বের আবহাওয়ার সহিত বর্তমানের আবহাওয়ার কোন সাদৃশ্যই নাই। পূর্বে যেখানে হিমশীতল আবহাওয়া ছিল সেখানে হ্রত বর্তমানে উষ্ণ আবহাওয়া বিজ্ঞমান। ইহা সাধারণতঃ দুইটি কারণে ঘটতে পারে। হ্রত সেখানে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটয়াছে—নচেৎ সে স্থান পূর্বের জায়গায় আর নাই। আবহাওয়ার পরিবর্তন কল্পনা করিতে গেলে বহু প্রকৃতিগত বিষয়ের পরিবর্তন করাইতে হয়। সুতরাং উহা গৃহীত হয় নাই। অতএব কেবলমাত্র ভূপৃষ্ঠের অংশবিশেষের সঞ্চরণ-মতবাদ দ্বারাই ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে। আটলান্টিক মহাসমুদ্রের উভয় পার্শ্বের স্থলভাগের বক্ষবিভাস, জীবাশ্ম (fossil) পর্বতাদির অবস্থানের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া ভেগনার ভূপৃষ্ঠের অংশবিশেষের সঞ্চরণ স্বীকার করিয়া লন। ভেগনারের মতে একটি পশ্চিম-মুখী ও অপর একটি বিষুবরেখামুখী শক্তির প্রভাবে প্রায় ২০ কোটি বৎসর পূর্বে প্যানজিয়ার ভাঙন সুরু হয়। এশিয়া-বিষুবরেখার দিকে সঞ্চরণ করার ফলে ভারত মহাসাগরের ও আমেরিকা পশ্চিম দিকে সরিয়া যাইবার ফলে আটলান্টিক মহাসাগরের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের সম্বন্ধে

ভেগনার কিছু না বলিলেও এ বিষয়ে ফিশারের মত চিন্তাকর্ষক। ফিশার বলেন, চন্দ্রের উৎপত্তির জন্ম প্রকাণ্ড মহাসাগরের গহ্বর সৃষ্টি হইয়াছে। ফিশারের এই মত বৈজ্ঞানিক মহলে গৃহীত হয় নাই। তাহার কারণ চন্দ্রের আয়তন প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন অপেক্ষা অনেক বড়।

আর একটি দিক হইতে এই বিষয়টির সমাধান করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ভূত্বকের উপরি অংশে কতকগুলি তেজস্ক্রিয় (radio-active) পদার্থ বিদ্যমান আছে। ঐ পদার্থগুলির ধর্ম এই যে, উহারা স্বতঃই অপর মৌলিক পদার্থে পরিবর্তিত হইয়া যায়। এইরূপ পরিবর্তনের ফলে বহুল পরিমাণে তাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই তাপ স্থলভাগের নিম্নে সঞ্চিত হইতে থাকে। তাপের ধর্ম পদার্থমাত্রকেই আয়তনে বর্দ্ধিত করা। একই পরিমাণ পদার্থ বর্দ্ধিত-আয়তন হইলে উহার ঘনত্ব কমিয়া যায়। ঠিক একইরূপ স্থলভাগের নিম্নের চাপ-প্রভাবে উহার উপরিস্থিত অংশ লঘুতর হইয়া অধোগমন করিবে। উহাতে নিকটবর্তী সমুদ্রের জল স্থলভাগের উপর আসিয়া পড়ায় একটি বৃহত্তর সমুদ্রের সৃষ্টি হইবে।

সমুদ্র ও মহাদেশের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে অপর মতবাদে বলা হয় যে, প্যানজিয়ার অংশগুলি একটি বিরাট ভূভাগ দ্বারা সংযোজিত ছিল। কি প্রকারে এই সকল সেতুর অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল তাহা বলা কঠিন। তবে ভূপৃষ্ঠে সঙ্কেচন, শিলার রূপান্তর ও তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিবর্তনের দ্বারা সঞ্চিত তাপ এই সকল প্রক্রিয়ায় সাহায্য করিয়া থাকিবে।

# সাঁইত্রিশ রাগিনী

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সকালে উঠিয়া দেখিলাম নায়েবের প্রপাতের মুখের উপর বিরাট গম্ভীর এক পাহাড় খাড়া হইয়াছে। প্রপাতের উদ্ভাস উচ্ছ্বাসের শব্দে কান ঝালাপালা হইয়াছিল, তাই বলিলাম—যাক্ রাঁচা গেছে।

পাহাড়ের গর্ভ হইতে হঠাৎ আগুন বাহির হইল, গা বাহিয়া গলিত লাভার সোনালি আভা আকাশটা ঝলসাইয়া দিল। এ দৃশ্য সর্বদা দেখা ভাগ্যে জ্বোটে না, তাই আবার বলিলাম—দিনটা আজ ভালই যাবে দেখছি।

গৃহিণী নীলা চায়ের কেটলি হাতে লইয়া আসিয়া আমাকে উদ্বেষ্ট করিয়া বলিল—সকালে উঠেই আবার ওর পেছনে লেগেছ।

‘ও’ মানে আমার ছোট বোন সুমিতা, কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত যাকে দেখিলে নায়েবকেই মনে পড়িত এবং আজ সকাল হইতে যার মুখে পাহাড়িয়া গাভীর।

চোখ দিয়া আর এক ঝলক আগুন ঠিকরুইয়া সুমিতা তার বৌদিকে আক্রমণ করিয়া বলিল—ধাক, তোমাকে আর সাওখুরি করতে হবে না।

চা ঢালিতে ঢালিতে নীলা বলিল—বা রে, আমি আবার কি করলাম?

সুমিতার গাভীরে একটু চিড় লাগিল; মাথা ও কানের ঝুলন্ত ঝাড় লগ্নন দুটা এপাশ ওপাশ দোলাইয়া বলিল—তুমি না তো দাদাকে ভালমানুষ বানিয়েছে কে শুনি?

নীলা বলিল—দাদার বদলে তুমি নিজেও তো দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে গায়ের জ্বালাটা ঠাণ্ডা করতে পারতিস।

চা খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি?

নেহাত পাথরের পাহাড়, তাই বেলুনের মত ফট করিয়া না ফাটিয়া শুধু ভূমিকম্পের আলোড়ন তুলিয়া সুমিতা বলিল—আহা জানো না যেন কিছু! লোকটা বাড়ী বয়ে এসে যা-তা বলে গেল, আর তুমি চুপ করে বসে রইলে।

বলিলাম এরা এখনও গত কল্যের ঘটনা লইয়া ঝড় পাকাইতেছে।

বলিলাম—যা-তা বলে গেছে তা কি করে বুঝব?

নীলা বলিল—হাত পা ছুঁড়ে বাজঝাঁই গলায় কত কি বললে...

নীলার কথার বাধা দিয়া বলিলাম—তাই বলে তাকে ধরে মারতে হবে না কি?

সুমিতা বলিল—না, পুজো করতে হবে।

আমি বলিলাম—তোরা ঘরের পরশা গরুড় কুরে থিয়েটারে

গিয়ে যখন দেখিস ঠেজের ওপর হাত পা ছুঁড়ে বাজঝাঁই গলায় কেউ কিছু বলছে তখন সীটে বসে মিঠে মিঠে মন্তব্য না করে সোজা ঠেজে উঠে বক্তাকে তক্তাপেটা করিস নে কেন?

তাজ্জব বনিবার মত এমন কিছু বলি নাই যাতে নন্দ বৌদি অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারে। তাই তাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম—গত কল্যের বক্তা যাই বলিয়া যান না কেন, তাঁর কোন কথারই যখন অর্থ করিতে পারি নাই তখন অনর্থক চটয়া নিজেদের মাথা খারাপ করিলে লাভ কিছু হইত না।

নীলা বলিল—ওদের কথা আমরা বুঝতে পারি, আর তুমি বোঝ না বললেই হ'ল কি না...

আমি বলিলাম—তোমরা তো কাকপক্ষী নির্বিশেষে সর্বজীবের কথাই বুঝিতে পার, রামানুজনের মুখে মাদ্রাজী ভাষা তো তার কাছে জলের মত সোজা।

নীলা বলিল—তোমার কথা শুনেল গা জ্বালা করে। তুমি নিজে তো কোন দায়িত্ব নিলে না; আমরা খেটে খুঁটে যেটা তৈরী করবার চেষ্টা করছি বাইরের লোকের কথায় সেটা যে বন্ধ করে দেবো, তা ভেবো না।

বলিলাম—পাগল! তা ভাবব কেন? বরং তোমাদের রিহেশালের জন্তে আর এক জায়গায় ঘরের বন্দোবস্ত করে দেব।

নীলা বলিল—না না, আমরা এই বাড়িতেই রিহেশাল দেবো...দেখবো রামানুজন কি করতে পারে।

সুমিতা তাকে সমর্থন করিয়া বলিল—নিশ্চয়; আমাদের বাড়ীতে আমরা যা খুশি করবো।

এদের যা খুশির বহরটা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিলাম, মুখে বলিলাম—আচ্ছা বেশ।

নমিতা তবু জাড়িল না, বলিল—মুখে “আচ্ছা বেশ” বললেই হবে না, কাল যে সব মেয়ে আর আসবে না বলে গেছে, ছোড়দাকে বল তাদের খবর দিতে। ছোড়দা বলেছে যে তুমি না বললে এ ব্যাপারে আর হাত দেবে না।

নীলা বলিল—আর তোমার বন্ধুদের কাছে কতকগুলো টকিট বিক্রি করতে হবে, মনে থাকে যেন।

‘আচ্ছা বেশ’ বলিলে এরা সন্তুষ্ট হয় না দেখিয়া সংকত করিয়া বলিলাম—তথাস্তু।

গম্ভীর পাহাড়টা ধসিয়া গেল; নায়েবের ঢাকা রূপ আবার খুলিয়া গেল সুমিতার খিল খিল হাসিতে।

নিজের ঘরে আসিয়া তখনকার মত বাঁচিলাম।

এ বাড়িতে সুমিতার গভীর মুখ কারও পছন্দ হয় না; নীলাও যা জেদ ধরে সহজে তা টিলা হয় না। তাই আমারই যে জটিল জ্ঞান এদের এত বড় আয়োজনটা টুটুয়া যাইতে বসিয়াছে, অল্প উপায়ে সেটা অচিরে সংশোধন না করিলে পিসীমা এখনি ছুটিয়া আসিয়া রোদন করিতে বসিবেন এবং আমি না কি মুখচোরা নিজের মান নিজে রাখিতে জানি না ইত্যাদি বলিয়া সব ঝালটা আমারই উপর ঝাড়িবেন। ঝাড়িবেনই বা না কেন? পয়লা তারিখে কতকগুলি ময়লা নোট সংসারের জ্ঞান ফেলিয়া দিয়া সারা মাস গা ছাড়িয়া যে বসিয়া থাকে, বাহিরের কেহ উপর-চড়াও হইয়া ছ'কথা শুনাইয়া গেলে পুরুষ কণ্ঠে যে জবাব দিতে জানে না, সে আবার পুরুষ নাকি? আর নীলা সুমিতারা মেয়েমানুষ হইয়া যে আমোদের আয়োজনটা করিয়াছে আমি তাতে কোন সাহায্য তো করি নাই, বরং বাহিরের লোকের বাগড়া দিবার আগড়-গুলি খুলিয়া দিয়া আড়াল থেকে মজা দেখি।

আসল কাহিনীটা খুলিয়া বলি। আমাদের বাড়ির লোক-গুলি ত্রীপুরুষনির্কিশেষে একটু আমোদপ্রিয়; তবে আমাদের বিশেষ ধারাটা বহিয়া থাকে সঙ্গীতের তরঙ্গে ভর করিয়া।

পিসীমার মুখে বাউলকীর্তনের সাদৃশ্যিক নর্দন ছেলেবেলা থেকে অনেক উপভোগ করিয়াছি। তারপর যেদিন তাঁর নিরামিষ ধরে বসিয়া গুণগুণ করিয়া ভজন শুরু করিলেন, তার আসল ওজন বুঝিলাম। খাইতে বসিয়া তাঁর মাথা সীতারা-গাছির পদার্থবিশেষ গলাধঃকরণ করিয়া আমার নিজের গলার স্তম্ভস্থিতে। আরও বুঝিলাম যে ভজন গাছিতে হইলে গলা পরিষ্কার করিবার জ্ঞান এর মত আমোদ ঔষধ আর নাই।

কিন্তু আমার অ-স্বরকণ্ঠে কোন সুরই দানা বাঁধিল না দেখিয়া আমাকে ছাড়িয়া পিসীমা আমার ছোটভাই সুখেন্দুকে লইয়া পড়িলেন।

সুখেন্দুকে ইঙ্গিতভাবেই মানাইত ভাল, কিন্তু সে ইঙ্গিত নাই, তাঁর সভাও নাই। তাই স্নানের ধরের দরজা বন্ধ করিয়া সুখেন্দু যখন দরজা সুরে গানের গলা ছাড়িয়া দিত পিসীমা তখন একটা কাঠি দিয়া কান্ডি ঝাটিতে ঝাটিতে হয়তো ভাইপোর কণ্ঠমাধুর্য্যে পুলকিত হইয়া উঠিতেন।

সুমিতা যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তখন তার হৃদে অঙ্গ দেখিয়া মনে হইত, আকারে তারই মত ছোট একটা সারঙ্গ বাজনা জাকরানি রঙে রাঙাইয়া কে যেন বিছানার উপর শোয়াইয়া রাখিয়াছে। বালিকা বয়সে সারঙ্গীট গোড়ানি ছাড়িয়া খরখরে ঝরঝরে এসাজে পরিণত হইল। কিশোরী সুমিতা সেতারে পৌছাইল কথায় ও কাজে প্রিং প্রিং রব তুলিয়া, আর সে যখন তিড়িং তিড়িং করিয়া লাফাইত তখন তার পিঠের উপরকার ঝুলন্ত বিহুনি ছুটার একটা দিয়া রামকেলি ও আর একটাতে মালকোষ ফাঁস ফাঁস

করিয়া ফণা তুলিয়া ছরঙ্গ লয়ে নামিয়া পড়িত। সেতার কিন্তু বেতার হইল রামকেলি ও মালকোষে আপোষ হইল না বলিয়া—তাই রফা করিবার জ্ঞান বিহুনি ছুটা একত্র করিয়া তাগের মত ভারী একটা ধোঁপা বাঁধিয়া যেদিন সে বাহার ধরিল, সুখেন্দু জানাইল সুমিতা সুর-বাহারে প্রমোশন পাইয়াছে। সঙ্গীত-শাস্ত্রের জটিল তথ্য না বুঝিলেও সেদিন থেকে আমি সুমিতাকে সুরবাহার বলিয়া আদর করি। সুমিতা তাতে চটুয়া যায় এবং মনে মনে হাঙ্গীর ভাঁজিতে ভাঁজিতে ফাঁকা ধরে গিয়া সম ফাঁক তাক করিয়া তার পোষা বিড়ালটাকে চাপড়াইতে থাকে।

এ বাড়িতে নীলা যেদিন পদার্পণ করিল সুমিতা অমুনয় করিয়া বলিল—হ্যাঁ নীলু বৌদি, গান গাইলে না যে? ফিক করিয়া হাসিয়া নীলু পিলু সুরের গান ধরিল। নিমজ্জিত জনকে ভালমন্দ পরিবেশন করিতে করিতে সুখেন্দু তখন চাপা গলায় হিন্দোল ভাঁজিতেছিল; নীলুর মুখে পিলু শুনিয়া সে ছুটিয়া আসিয়া হাতের মাছের বালতিটা আলতো করিয়া তুলিয়া সে গান শুনিতে লাগিল।

বাস, তার পরের দিন থেকে শুধু রোয়াকে নয়, বাড়ীর সর্বত্রই গানের বজা বহিতেছে। নীলা সুমিতা সুখেন্দু—অর্থাৎ গঙ্গাযমুনা ব্রহ্মপুত্রের ত্রিধারা সুরের উত্তাল তরঙ্গের মাঝখানে অ-সুর আমি নিরেট কাঁপা বয়ার মত ভাসিতেছিলাম।

ভাসিতেছিলাম, তবে অকুলে নয়; শক্ত লোহার শিকলে বাঁধা ভারী একটা নোঙরে তলাকার মাটি ঝাঁকড়াইয়া ছিলাম। কিন্তু শিকলটা বুঝি এবার ছিঁড়িয়া যায়, প্রতিবেশী রামাহুজ্ঞন বনাম আমাদের বাড়ীর বাসিন্দাদের সাম্প্রতিক ঘন্ডে।

রামাহুজ্ঞনের মত সজ্জন লোক এ পাড়ায় আর নাই। যে-কোন একটা ছুটা করিয়া চাঁদার জ্ঞান রামাহুজ্ঞনের ছোট ভাই রামাশেষণকে একবার বলিলেই ইংরেজীতে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে রামাহুজ্ঞনের নাম-সই-করা একখানা চেক আসিয়া যাইবে, তাই এত বড় একজন মহাশয় ব্যক্তিকে আমরা ঘন্ডে আহ্বান করিয়াছি ভাবিয়া তিনি যদি ছ'কথা শুনাইয়া যান তাহা হইলে আর কি করিতে পারি। তবে তাঁর গরম মেজাজে হয়তো কিছু শীতল জল ঢালিতে পারিতাম, যে ছ'কথা কাল শুনাইয়াছেন তার একটারও যদি অর্থ করা আমার সাধ্য হইত।

গোড়ার কথা কিছু বলিয়া রাখি। দক্ষিণ ভারতের কুটীর-শিল্পের উৎকর্ষের নিদর্শনগুলি নামমাত্র দামে বিতরণ করিয়া রামাহুজ্ঞন এ অঞ্চলে কিঞ্চিৎ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন এবং আমাদের বাড়ীর পাশের খালি জমিটার উপর বৃহৎ একটি অট্টালিকা তুলিয়া প্রতিবেশীরাপে আমাদের

ধু করিয়াছেন। তবে বহুদিন ধরিয়া বড়বাজার ও রাধা-বাজারে ঘোরাফেরা করার জন্ত তাঁর কথ্য ভাষার অসঙ্গতিটা পূরণ করেন এ পাড়া ও অল্প পাড়ার অভিজাত নাগরিকমহলে ব্যাক্তের মোটা অঙ্কের অভিজাত্য দেখাইয়া এবং সেই আভিজাত্যের জোরেই প্রৌঢ় বয়সে একটি অষ্টাদশীকে বিবাহ করিয়াছেন।

লোকে বলে, 'অবিমিশ্র মাদ্রাজী ভাষার মত কাঠিন্ধ-বর্জিত স্থলিত' ভাষা একটি। অ-মাদ্রাজী বালকেও বুঝিতে পারে—বিশেষতঃ আমাদের এই দক্ষিণ অঞ্চলে, যেখানকার বালকের দল সেবার কার্ত্তবীর্য্যার্জুন রোডে সার্কজনীন পুজায় ঢাক-ঢোলের বদলে মাদ্রাজী কথকতার কোরাস শোনাইয়া সর্ব্বজনের ভূষ্টি বিধান করিয়াছিল। তবে রাধাবাজারের ঘোপ ও কৃষ্ণবাজারের ইস্তির পর রামানুজনের মুখে এ হেন একটি ভাষা কি দশায় যে পড়িয়াছে তা বাজার-অনভিজ্ঞ আমিই মর্মে মর্মে বুঝিতেছি।

তাই ভাবি, আমাদের বাড়ীর বাসিন্দাদের বিস্তর আমোদ-প্রিয়তা কেন এই প্রমাদ ডাকিয়া আনিল?

প্রমাদের ভূমিকাটা বলি। নীলা সুমিতাদের হর্ষবাহিকা সমিতি পাঁচ মাস আগে স্থির করিয়াছিল বর্ষামঙ্গল গীতাভিনয় করিবে; সেজন্ত আয়োজনের-জটিলও রাখে নাই—পাড়ার ও স্থল কলেজের কতকগুলি মেয়ে জুটাইয়া দিনের পর দিন মহল্লা দিয়া পাড়া সরগরম করিয়াছে। এমন সময় হঠাৎ একদিন রামানুজনের ছোট ভাই রামাশেষণ আসিয়া বলিল—মহল্লার হল্লা বন্ধ করিতে হইবে; কারণ রামানুজ-জায়ার মাথার অস্থখ শুরু হইয়াছে। কর্ণেল মাথাইকে 'কল' দেওয়া হইয়াছিল। তিনি নাকি বলিয়াছেন যে রামানুজ-পত্নীর মাথার অস্থখের জন্ত এখান থেকে চৌমাথা পর্য্যন্ত সকল বাড়ীর বাসিন্দাদের নিরানন্দে থাকিতে হইবে। এর সোজা মানেটা এই যে, আমাদের নাম করিয়া যে সোরগোল করা হয় সেটা যে প্রচণ্ড গণ্ডগোল, কর্ণেল মাথাই তা একদিন শুনিয়াই বুঝিয়াছেন।

সুমিতা কথটা শুনিয়া বলিল—রামাশেষণকে বল যে আমাদের রিহেশীল বন্ধ করবার চেষ্টা না করে সে তার বেহালা বাজানো আগে বন্ধ করুক।

তাই তো, ওদের বাড়ীর বেহালার কথা তো মনে ছিল না। তবু সুমিতাকে বলিলাম—রামাশেষণের বেহালাতে এমন আর কি গোলমাল হয়?

পিছন থেকে নীলা বলিল—বিশেষ কিছু না, তবে স্তম্ভ-মানুষের মাথায় গোলমাল হয়।

পিসীমা বলিলেন—বেয়ালো ত বাপু অনেক শুনেছি, কিন্তু উৎকর্ষ হুঁরে পেল্লীর কান্নার মত বেয়ালো বাজানো বাপের জন্মে শুনি নি। আর রাতে যখন আমি শুতে যাই ঠিক তখনই ছোঁড়াটার বেয়ালার বাতিক চাড়ে।

সুখেই মস্তব্য করিল যে, রামাশেষণের বেহালাই তাঁর বৌদির মাথার অস্থখের একমাত্র কারণ।

আমি বলিলাম যে রামাশেষণ যখন বেহালা বাজায় তাঁর বৌদি তখন নিশ্চয় ঘুমাইতে থাকেন। ঘুমাইতে ঘুমাইতে মানুষ বেহালা শুনিতে পায় না। কিন্তু আমাদের বাড়ীর রিহেশীল বসে বিকালে; মাথাব্যথার পক্ষে বিকালটা নেহাত অকাল নয়। আর মাথার রোগের কারণ অস্থসন্ধান করিবেন কর্ণেল মাথাই নিজে। আপাতত ছ'চার দিন রিহেশীল বন্ধ রাখিয়া ডাক্তার রক্ষা করিলে এমন কিছু আসিয়া যাইবে না; বরং অভিনয়ের দেবীর জন্ত কারও কোন অস্থবিধা-হইলে রামানুজনের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে মোটা টাকা আদায় করা যাইবে।

পরের দিন হর্ষবাহিকা সমিতি আমার প্রস্তাব শুনিয়া বিমর্ষ হইলেও বর্ষামঙ্গলের খাতা সাতদিন স্পর্শ করিল না।

ক'দিন পরে দেখিলাম প্রৌঢ় রামানুজ-পত্নী ললিতা দেবীকে লইয়া লেকের দিকে বেড়াইতে যাইতেছেন। সুতরাং আমাদের বাড়ীর রিহেশীল আবার শুরু হইল।

পাঁচ দিন পরে সকালের দিকে রামাশেষণ আবার আসিয়া জানাইল যে, তার বৌদির কর্ণপ্রদাহের জন্ত কর্ণেল সাহেবকে আবার ডাকা হইয়াছে।

সুমিতা সেখানে বসিয়াছিল; বলিল—তা হলে ত আমাদের গানবাজনা তোমার বৌদির কানেই ঢুকবে না।

রামাশেষণ বাংলা বলিতে পারে; মাথা নাড়িয়া বলিল—না সুমিতাদি, ডাক্তার সাহেব বলেছেন যে বৌদির কান দুটোকে একটানা আট দিন রেপ্ট দিতে হবে। কাজেই, আপনাদের গান-বাজনা—

সুমিতা বাধা দিয়া বলিল—তোমার বৌদিকে বলো; কানে দেড় সের তুলো গুঁজে অন্ধকার ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকতে, তা হলেই তাঁর কান মাথা সবই রেপ্ট পাবে।

রামাশেষণ সবিনয়ে জানাইল যে, ডাক্তার সাহেবের প্রেস-ক্রিপশানে দেড় সের তুলো ও অন্ধকার ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকার কথা লেখা নাই।

সুমিতা বলিল—নেই ত নেই, আমরা রিহেশীল বন্ধ করব না।

রামাশেষণ নেহাত বালক নয়; একজন নারীর কাছে হার মানাটা রামাশেষণের মানে বাধিল, তবু প্রতিপক্ষ নেহাত নারী-জাতীয়া জীব বলিয়াই হাত জোড় করিয়া বলিল—মাত্র আট দিনের জে, সুমিতাদি; এর মধ্যে বৌদির কান ভাল হবে আশা করা যায়।

সুমিতা কোন উত্তর না দিয়া—হুম হুম করিয়া পা ফেলিয়া উপরে চলিয়া গেল।

আট দিন বন্ধ থাকিবার পর রিহেশীল আবার শুরু হইল। তিন দিন পুরাদমে রিহেশীল চলিবার পর চতুর্থ দিনে প্রোফ রামামুজেন নিজে আসিলেন, সঙ্গে তরুণী ভায়া ললিতা দেবী ও ছোট ভাই রামাশেষণ। নীলা সুমিতারা ছুটিয়া আসিল ললিতা দেবীকে অভ্যর্থনা করিতে।

দোভাষীরূপে রামাশেষণ জানাইল যে তাদের বাড়ীতে একটা মহোৎসব লাগিতেছে দক্ষিণ-ভারতের কোন এক মহর্ষির জন্মতিথি উপলক্ষে; সেজন্ত দশ দিন ধরিয়া অহোরাত্র কীৰ্ত্তন নৃত্যগীতানুষ্ঠান চলিবে। মহিলাদের বসিবার জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে এবং প্রতিবেশী হিসেবে সুমিতাদি, নীলা বৌদি ও সুখেন্দুদা অবসর কালে যদি কিছু সহযোগিতা করেন তাহা হইলে রামামুজেন-পরিবার কৃতার্থ হইবে।

নীলা সুমিতারা কিছু বলিবার পূর্বে আমি সকলের পক্ষে বলিয়া বলিলাম—বেশ বেশ, তোমাদের বাড়ীর কাজও যা আমাদের বাড়ীর কাজও তাই; সকলেই যাবে, যা দরকার করবে—ইত্যাদি।

মাত্রাজী প্রতিবেশীর বিদায় লইলে পিসীমা ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—আমাকে বাপু অল্প কোথাও নিয়ে চল। ওদের একটা বেহালাতেই আমার ঘুম চড়ে যায়, আর বাইশটা বেহালা বক্সিটা খোল চারশো বিরানীটা মাত্রাজী গলার সঙ্গে দশ দিন ধরে যদি ক্রমাগত বাজতে থাকে প্রাণ তা হলে জাহি জাহি ডাক ছাড়বে, বাবা।

নীলা বলিল—আমি ঠাকুরপোর সঙ্গে মেজদার বাড়ীতে চলে যাই।

সুখেন্দু বলিল—মাপ করতে হবে বৌদি, বলাইদা কবে থেকে আমাকে দেওঘরে যাবার জন্তে বলছে। এমন সুযোগটা আর ছাড়ছি নে।

সুমিতার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তুই কোথায় যাবি?

সুমিতা বলিল—ঘরের বাড়ী।

বলিলাম—আমাকেও তোর সঙ্গে নিয়ে চল।

পিসীমা বলিলেন—যাট।

নীলা বলিল—কি যা তা বল।

সুখেন্দু বলিল—তোমরা সবাই মিলে দাদার মাথাটা খারাপ করে দেবে দেখছি।

বলিলাম—দাদার মাথা খারাপ হলে তুই তো দেখতে আসবি নে, তুই থাকবি দেওঘরে।

সুখেন্দু বলিল—বা রে, তোমাকে ফেলে যাব না কি? ওরা যেখানে খুশি থাকবে, তুমি আর আমি থাকব।

পিসীমা বলিলেন—তার মানে, দুই ভাইয়ে মিলে বাড়ীতে মেলেছপনার একশেষ করবে।

নীলা বলিল—ফিরে এসে দেখবো দেবাজের জিনিষ

চেনারের ওপর আর আলমারির জিনিষ খাটের নীচে জড়ো হয়েছে।

সুমিতার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আর তুই এসে কি দেখবি?

‘কলা’ বলিয়া স্বভাভুষ্ঠ দেখাইয়া সুমিতা পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যায় আপিস থেকে ফিরিয়া দেখিলাম’ সুখেন্দু সুমিতা নীলা, মায় পিসীমা পর্যন্ত কেহই বাড়ীতে নাই। তবে কি এরা আমাকে ফেলিয়া যে যার পথ দেখিয়াছে?

চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—বৌদি কোন চিঠি রেখে গেছে?

সে বলিল—না।

দিদিমণি কিছু বলে গেছে?

না।

ছোটবাবু কোন খবর রেখে গেছে?

না।

পিসীমাকে কে নিয়ে গেছে।

পিসীমা বৌদি দিদিমণি ছোটদাদাবাবু সব একসঙ্গে গেছেন।

কোথায়?

মাত্রাজীদের বাড়ী।

যাক, এদের সুবুদ্ধি হইয়াছে বলিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

সুখেন্দু সুমিতা নীলা—প্রতিবেশীর বাড়ীর মহোৎসবে মহা উৎসাহে কাজকর্ম করিয়া সামাজিক ধর্ম রক্ষা করিয়াছে। পিসীমাও নাওয়া-খাওয়া ভুলিয়া দশ দিন ধরিয়া বাইশটা বেহালা বক্সিটা খোল সহযোগে চারশো বিরানী জন মাত্রাজী গায়কের কীৰ্ত্তন শুনিয়াছেন; প্রাণ তাঁর জাহি জাহি ডাক ছাড়েন নাই।

পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি যে এখনও বেঁচে আছ?

তিনি বলিলেন—রামামুজেনের বৌ ললিতা কি ছাড়ে, ‘পিসীমা পিসীমা’ করে অস্থির। রামামুজেনের মত ভাল-মামুষের পেছনে তোরা কি বলে যে লাগতে যাস, বুঝিনে বাপু।’

আমিও বুঝি না এবং কারা পেছনে লাগে তাও জানি না। তবে পিসীমার কথা শুনিয়া মনে হইল উক্ত ভালমামুষটির পেছনে যারা লাগে, আমিই যেন তাদের দলের চাই।

রামামুজেনের বাড়ীর উৎসবের দিনগুলো কাটিলে সুখেন্দুকে বলিলাম—শরৎকাল পড়ে গেছে, এখন আর বর্ষামঙ্গল নিয়ে মাথা ঘামিও না।



সুখেন্দু বলিল—খ্যাপা প্রাণ প্রতি বছরই আখিনের  
আদিনার ছুটে আসে ; সুতরাং যেমানি কিছু হবে না।

আপিস হইতে ফিরিয়া দেখিলাম, রামাঙ্গুনের দৌতলার  
ঘরের লাগোয়া আমাদের বড় ঘরের মধ্যে এক্সাজ সেতার  
ম্যাণ্ডোলিন বেহালা তবলা ঘুড়ুর, ইত্যাদি সমস্তে রক্ষিত আর  
সতের জন মেয়ে ও আট-দশ জন ছেলেতে মিলিয়া আসর  
শুলজার করিয়াছে।

পুরা বার দিন ধরিয়া রিহেশাল চলিবার পর সুখেন্দু  
বোষণা করিল, মহালয়ার দিন বর্ষামঙ্গল অভিনয়ে কোন বাধা  
ধাকিবে না।

আরও কয়েক দিন রিহেশাল চলিল। শেষে এক দিন  
সন্ধ্যার বাজী ফিরিয়া দেখিলাম ঘরগুলো সব অন্ধকার। ফিউজ  
হইয়াছে না কি?—না তো—আমার ঘরে আলো জলিতেছে।  
অথচ বাড়ীর লোকজন সব কোথায়?

লোকজন সব বাড়ীতেই আছে, তবে ছাদে। ছাদে  
যাইতেই শুনিলাম সুখেন্দু বলিতেছে—ভারি শয়তান।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কে?

নীলা ধরা গলায় বলিল—রামাঙ্গুন।

জিজ্ঞাসা করিলাম—তিনি আবার কি করলেন?

পিসীমা বলিলেন—যা করবার তাই করেছে।

সুমিতা বলিল—ভয়ানক শত্রুতা করেছে।

সুখেন্দু ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল—যে হলটা আমরা সন্ধ্যার  
পাব বলে ঠিক করা হয়েছিল, এমন কি পাকা কথাও  
পেয়েছিলাম, আজ শুনিলাম, কোথাকার একটা ক্লাব মোটা  
টাকা আগাম দিয়ে সেই হলটা মহালয়ার দিনের জন্তে ভাড়া  
করে ফেলেছে; আর সেই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন রামাঙ্গুন।  
বুঝলে এখন ব্যাপারটা?

বলিলাম—উনিই যে এসব করছেন তা কি করে জানলে?

পিসীমা বলিলেন—তাও আবার বিশেষ করে জানতে  
হয় না কি?

বলিলাম—বেশ ত, তোমরা আর একটা হল ভাড়া  
নাও।

সুখেন্দু বলিল—সন্ধ্যার পাব না, তা ছাড়া বৌদিরা রাজী  
নয়।

কেন?

সুমিতা বলিল—এ হলই আমরা নেব।

নীলা বলিল—দু'দিন আগে আর পরে বই ত নয়।

শেষে স্থির হইল যে পুজার হিড়িক কাটিলে ভাল একটা  
দিনে বর্ষামঙ্গল অভিনয় হইবে।

মহালয়ার পর আর একটা খারাপ সংবাদ আসিল।  
অভিনয় ব্যাপারে যে সব ছেলেমেয়ের উৎকর্ষ উৎসাহ ছিল  
তাদের মধ্যে অনেকে ছুটিতে কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে।

নীলা সুমিতার মাথায় হাত দিয়া বসিল। পিসীমা বলিলেন  
—কপাল।

সুখেন্দু বলিল—কপাল না হাতী! আজ থেকে বাড়িতে  
প্রপদ খেয়ালের বান ডাকিয়ে দেব। কি রে সুমি,  
যখন জমবে ধুলা রিহেশালের ঘরগুলোয়,  
পড়বে ছাতা যন্ত্রপাতির ছড়গুলোয়,  
একলা তখন নাই বা বসে থাকবে;  
তানপুরাটা আনতে বলে  
খেয়াল গেয়ে হাফবে।

হর্ষবাহিকা সমিতির বর্ষামঙ্গল আপাতত ধামাচাপা পড়িল।  
পিসীমা আবার নিরামিষ ঘরে নির্জনে বসিয়া ভজন শুরু  
করিলেন। খেয়াল গাহিতে গাহিতে নীলা—অনেক সুরের  
হেঁয়ালি দেখাইল। সুমিতার কণ্ঠ থেকে নায়েগ্রা প্রপাতের  
মত প্রচণ্ড বেগে প্রপদ নামিতে লাগিল চৌতাল ধামারের  
উত্তাল তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে; সে ভরদে সঙ্গত দিবার জন্ত  
আহারনিজা জুলিয়া সুখেন্দু পরমানন্দে তবলার উপর পাখো-  
য়াজের আওয়াজ শোনাতে লাগিল:

কং ধুন দি কেটে তাক্ গদি খেনে;

চোল আর তবলার বোল সব রাখি খেনে।

কিন্তু ভাগ্যে যা মাথা আছে বারে বারে ফসকাইয়াও শেষ  
পর্যন্ত একদিন তা মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িবেই। যে সব  
ছেলেমেয়ে ছুটিতে বাহিরে গিয়াছিল কাঁড়িকের শেষে তারা  
ফিরিয়া আসিয়া বলিল—বেশ লোক তোমরা একেবারে গা  
ছেড়ে দিয়ে বসে আছো? ও সব শুনবো না, অভিনয় আমরা  
করবোই।

নীলা সুমিতার টনক নড়িল, তানপুরা রাখিয়া অল্প যন্ত্র-  
পাতিতে তার চড়াইতে শুরু করিল। বর্ষামঙ্গলের খাতা  
আবার খোলা হইল। হর্ষবাহিকা সমিতির সভ্যরা সমবেত  
হইয়া নূতন উত্তমে রিহেশাল শুরু করিল। তবে অনেক  
টালবাহানার জন্ত পাটগুলো সব টিলা হইয়া গিয়াছিল বলিয়া  
সবই আবার ঢালিয়া সাজিতে হইল। শেষে স্থির হইল যে  
পুরা সাত সপ্তাহ ধরিয়া রিহেশাল দিয়া বড় দিনের বন্ধে বর্ষা-  
মঙ্গল অভিনয় করা হইবে।

আমি সেই পুরানো কথাটার ধূয়া তুলিয়া বলিলাম—  
বর্ষামঙ্গলে তোমাদের অরুচি না হতে পারে, কিন্তু দর্শকদের  
রুচি বলে একটা পদার্থ আছে। পৌষ মাসে বর্ষামঙ্গল মানে  
কঁাসার বাটিতে অম্বল খাওয়ার সামিল।

সুখেন্দু বলিল—তুমি কিছু বোঝ না দাদা। আমাদের  
দৃশ্যপটের বালাই নেই বলে আবহাওয়ার সবটাই কল্পনা করে  
নিতে হবে; আর কল্পনার লাগামটা একটু আলগা করলেই  
দেখবে...পৌষে ঘন বরষা বর ঝরিয়ে ঝরে পড়ছে।”

রিহেশাল যখন আবার জমিয়া উঠিয়াছে এমন সময় এক

দিন রামানুজনের বাড়ী থেকে বিকট একটা আওয়াজ উঠিল। মেয়েরা গান বাজনা বন্ধ করিয়া কান পাতিয়া শুনিল, গলা ছাড়িয়া কতকগুলি পঁচা ডাকিতেছে। শব্দটা যখন খাদে নামিল তখন বুঝিলাম পূজার সময় ঢোল কঁাসির সঙ্গে যে সানাই বাজে কতকটা সেই রকম প্যাকপেকে আওয়াজ, আর সুরটা যখন চড়িয়া যায়, মনে হয়, সাতটা পঁচা এক সঙ্গে ডাকিতেছে।

পরের দিন রামানুজনের সঙ্গে পথে দেখা হইলে তার এই নূতন সুরসাধনার জ্ঞতা তারিফ করিলাম। সে জানাইল, প্রশংসার যার প্রাপ্য...সে রামানুজনের স্থালক, অর্থাৎ ললিতা দেবীর ভাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—সানাইটা আকারে কত বড়?

বেশী নয়, সোয়া ছ'হাত।

অর্থাৎ প্রায় রামশিঙ্গার সমান। নীলার ভাই, আমার স্থালক—খেলার মাঠে হু হু করিয়া ছোট একটা বাঁশী বাজায়, আর রামানুজনের স্থালক রামশিঙ্গার মত প্রকাণ্ড একটা সানাই বাজাইয়া পাড়ার লোকজন তাড়াইতে পারে। এমন গুণী স্থালকের ভগ্নীপতি রামানুজন দ্বিধার পাড় বটে।

সানাইয়ের জবাব দিবার জ্ঞতা শুধেই এক জোড়া কর্ণেট ও একটা স্যাক্সফোন জোগাড় করিয়াছে। রায়ে বড় ঘরে গিয়া দেখিলাম রিহের্শালের মেয়েরা চুপ করিয়া বসিয়া আছে, তবে শুধেই স্যাক্সফোনে হু দিতেছে আর নীলা ও স্মিতা গাল ফুলাইয়া দুইটা কর্ণেট বাজাইতেছে।

পিসীমা বলিলেন—বেশ করছে।

পরের দিন রামানুজনের বালি—বড়দা, আজকের রাতের আওয়াজটা শুনে বলবেন...হ্যাঁ।

নূতন একটা বাজনা শুনিব জানিয়া সারাদিন আগ্রহে কাটাইলাম। কিন্তু রাতে যে আওয়াজটা শুনিলাম তাতে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলাম। কালীপূজার পর জগদ্ধাত্রী পূজা শেষ হইয়াছে সবে; স্তবরাং কতকগুলি খালি টিনের মধ্যে কয়েক শত পটকার হালিতে আগুন দিলে শব্দটা অবশ্য উৎকট হয়, তবে নূতনত্ব তাতে কিছুই নাই। ইচ্ছা হইল রামানুজনের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তোমাদের রসিকতার রস মরিয়া গিয়াছে নাকি?

কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম কালীবোমের দমে ভারী আওয়াজ ও সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং রামানুজনের চড়া গলার চীংকার। শেষে আসল ব্যাপারটা শুনিয়া গালে হাত দিয়া বসিলাম।

রামানুজনের বাড়ীতে আধঘণ্টা ধরিয়া টিনের মধ্যে পটকার ফাটার পর শুধেই কতকগুলি কালীবোম জোগাড় করিয়া হুমদাম ছাড়িতে লাগিল। একটা বোমের সলিতায় আগুন দেওয়া হইলে বোমটা ব্যাঙের মত হঠাৎ তড়াক করিয়া লাফ দিয়া রামানুজনের বারান্দায় পড়িয়া হুম করিয়া ফাটিল, রামানুজনও রাগে ফাটয়া পড়িলেন।

রামানুজন সহজে রাগিয়া উঠেন না, তবে একবার রাগিলে সহজে ধামিতে চান না।

কি করা যায় ভাবিতেছি, এমন সময় রামানুজন সোজা আমাদের বাড়ীতে চলিয়া আসিয়া মুখে যা আসিল বলিতে লাগিলেন।

শুধেই বিশ্বস্ত ইংরেজী করিয়া বলিল—মশায়, কাজটা যখন ইচ্ছে করে করা হয় নি তখন অত মেজাজ দেখাবার কি আছে?

রামানুজন রাধাবাজার ও চীনাবাজারের ইংরেজীই শুধু বোঝেন, তাই শুধেই কেঁতাবি ইংরেজীতে কোন ফল হইল না। ব্যাপারটা পাছে বেশী দূর গড়ায় সেজ্ঞা শুধেই বাজীর ভিতরে পাঠাইলাম।

আজ সন্ধ্যা থেকে অনেক পটকার-বোমার আওয়াজ শুনিয়াছি, কিন্তু রামানুজনের বচন-বোমাগুলি সব আওয়াজকেই ছাড়াইয়া গেল।

রামানুজনের মুখে ভাড়া মাদ্রাজী বুঝিতে পারি, ললিতা দেবীর আধা হিন্দি আধা বাংলাও বুঝি; কিন্তু রামানুজনের কথার এক বর্ণও বুঝি না। না বোঝার অপরাধটা একা আমার নয়, পাড়ার অনেকেই বোঝেন না। তবে নীলা স্মিতার নাকি বুঝিতে পারে।

রামানুজনের ক্রোধ রোধ করিবার কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইলাম না। ঝাড়া কুড়ি মিনিট ধরিয়া হাতমুখ নাড়িয়া চড়া গলায় বকিয়া বকিয়া গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেলে রামানুজন আমাদের হাটিকরা দরজার একটা পাটের উপর ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন। নূতন একটা পোজ দেখাইবেন ভাবিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, বিশেষ আর কিছু না বলিয়া মুখ গৌজ করিয়া তিনি সোজা নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন।

রামানুজন বিদায় লইলে মাথা ধরিয়াছে বলিয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম।

সকালে উঠিয়া খাবার ঘরে গিয়া যা দেখিলাম তা আগেই বলিয়াছি।

যাই হোক, নীলা স্মিতা বলিয়াছে যে রামানুজন রাগই করুন বা তাঁদের বাড়ীর লোকজন যত বাগড়াই দিক বর্ধমান অতিনয় করিতেই হইবে—এবং এ বিষয়ে আমি তাদের সাহায্য করিবার জ্ঞতা 'তথাস্থ' বলিতে বাধ্য হইয়াছি; তবু এত রেধারেষির পর কার্যতঃ ব্যাপারটা কত দূর গড়াইবে তা ধারণা করিতে পারিলাম না।

রিহের্শালের মেয়েদের খবর দিবার জ্ঞতা শুধেই পাঠাইবার আগে একটা মতলব মাথায় আসিল। চুপি চুপি চাকরের হাত দিয়া এক টুকরা কাগজে রামানুজনের লিখিয়া

পাঠাইলাম তুমি আমাকে বড়দা বলিয়া খাতির কর। ভারি  
বিপদে পড়িয়াছি, একবার আসিবে কি ?

রামাশেষণ তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া প্রথমেই বলিল—দাদার  
হয়ে আমিই মাংস চাইছি বড়দা।

আমি বলিলাম—তোমার দাদার কথা ভুলে গেছি ; এখন  
তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করবো তার জবাব দেবে।

বলুন।

আমাদের বাড়ীর মেয়েরা যে অভিনয় করবার জন্তে  
আয়োজন করেছে তোমরা তাতে এত বাগড়া দিচ্ছ কেন ?

উহঁ, আমরা তো উৎসাহই দিয়েছি।

রামাশেষণ বাজিয়ে আর পটকা ফাটিয়ে ?

রামাশেষণ বলিল—এ সব তো হালের ব্যাপার।  
সুখেন্দুদাকে জিজ্ঞেস করবেন, আগে উৎসাহ দিয়েছি কিনা।  
গোলমালটা হ'ল শুধু স্মৃতিভ্রমের জন্তে—

অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—স্মৃতির জন্তে ?

বৌদি বলেছিলেন বর্ষাঋতুর গানের সঙ্গে বেহালা  
বাজাবেন—

তোমার বৌদি, ললিতা দেবী বেহালা বাজাবেন ?

হ্যাঁ বড়দা।

বেহালা তো তুমিই বাজাও—

আমি বৌদির কাছে শিখি। বৌদি বেহালা বাজিয়ে

অনেক মেডেল পেয়েছেন।

খবরটা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলাম ; বলিলাম—বটে।  
তারপর ?

স্মৃতিভ্রম রাজী হলেন না, আর বৌদিও চটে-রইলেন।  
তারপর যা হ'ল সবই জানেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম—এত সব কাণ্ড না করে আমাকে  
আগে জানালে না কেন ?

বৌদি বলতে বারণ করেছিলেন।

রামাশেষণকে বলিলাম—আজ বিকেলে তোমাদের  
বাড়ী যাব। তোমার বৌদিকে বলো কক্ষি তৈরি করে না  
রাখলে ঝগড়া করব ; বুঝলে ?

রামাশেষণ বিদায় লইলে স্মৃতিভ্রমকে বলিলাম—ভূই তো  
যত নষ্টের গোড়া।

স্মৃতিভ্রম যেন আকাশ থেকে পড়িয়া বলিল—আমি ?

বলিলাম—রামাশেষণ-জামাকে বেহালা বাজানোর পাঠ  
দিস নি কেন ?

নীলা বলিল—ওমা, সেই কথাটা এখনও মনে করে  
রেখেছে না কি ?

বিষয়টা চট করিয়া বুঝিয়া লইয়া পিসীমা বলিলেন—  
মনেই যদি না রাখবে তা হলে মহোৎসবে তোমাদের দেখিয়ে  
দেখিয়ে বেহালা বাজাবে কেন ?—কিন্তু মেয়েটা কি মিটমিটে  
শয়তান দেখেছে ? তাই ভাবি, ললিতা-বউ আজকাল  
আমাদের বাড়ীতে আসে না কেন ?

স্মৃতিভ্রমের হর্ষবাহিকা সমিতির জন্ত সব চেয়ে মোটা চাঁদা  
যিনি দেন সেই প্রেসিডেন্ট মহোদয়ার স্বামী বলিয়া যে সম্মানটা  
পাইয়া থাকি তার কতখানি খুটা আর কতখানি আসল তা  
পরীক্ষা করিবার জন্ত ছপুয়ে রিহের্শালের মেয়েদের লইয়া  
মিটিং করিয়া প্রস্তাব করিলাম—ললিতাদেবী বেহালা বাজাইয়া  
বর্ষাঋতুর সমাপ্তি করিলে সব দিক রক্ষা পাইবে।

মেয়েরা প্রথমে আপত্তি তুলিয়া বলিল—বেনো জল  
ছুকিলে বর্ষাঋতুর খোলা হইয়া যাইবে ; সুতরাং—

আপত্তিটা খণ্ডন করিবার জন্ত উত্তরে বলিলাম—বর্ষার জল  
চিরদিনই খোলা, মাসলিকী গাহিয়া যদি ফসল করিতে না  
পার, তবে—

কথাটা মেয়েদের প্রাণে লাগিল। ললিতাদেবীর বেহালা  
সমিতির কাজে বহাল হইল।

বিকালে ললিতাদেবী আমাকে উৎকৃষ্ট কফি খাওয়াইলেন।  
রামাশেষণ তন্ত জামার মুখ দিয়া জানাইয়া দিলেন যে অভি-  
নয়ের খরচের সব ভার তিনি নিজের কাঁধে লইয়া কৃতার্থ  
হইবেন।

অবশেষে সুখেন্দুর নির্বাচিত হলেই বড়দিনের বন্ধে বর্ষা-  
ঋতুর অভিনীত হইল। রামাশেষণ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া  
দুগ্ধপট এবং সাজসরঞ্জামের সাহায্যে ষ্টেজের উপর যে বৃষ্টিটা  
দেখাইলেন, পুনর আবহাওয়া আপিসে খোঁজ লইলে জানা  
যাইবে, চেরাপুঞ্জীতেও তত বৃষ্টি কখনও হয় নাই। বিরামের  
সময় পার্বীর পালক মাথায় শুঁড়িয়া রামাশেষণ-শ্রালক সোয়া  
ছু'হাত লম্বা সানাই মুখে করিয়া যখন নাচিতে লাগিল, দর্শকরা  
তখন হাঁচি কাশি সবই ভুলিয়া গেল।

অভিনয়-শেষে রামাশেষণ সৎকৃত করিয়া বলিল—নমস্কে।

## রামদাস সেন

ত্রিভুজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪৫—১৮৮৭

জন্ম ; বিদ্যাশিক্ষা : অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রজবল্লভ সেন নামে জনৈক বঙ্গ কায়স্থ পূর্ববঙ্গের ইদিলপুর হইতে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরে আসিয়া সঙ্গীক বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র কৃষ্ণকান্ত সেন নিম্নকির দেওয়ান হইয়াছিলেন ; কলিকাতা দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার স্মরণ্য বাস-ভবনটি আজিও “দেওয়ান-বাড়ী” নামে পরিচিত। কৃষ্ণকান্তের স্ত্রী জ্ঞানমোহিনী—কৃষ্ণগোবিন্দ। রামদাস এই কৃষ্ণগোবিন্দের পৌত্র ও লালমোহনের পুত্র। ১০ ডিসেম্বর ১৮৪৫ (২৬ অগ্রহায়ণ ১২৫২) তারিখে বহরমপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তিন বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন।

রামদাস প্রধানতঃ গৃহেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহশিক্ষকগণের মধ্যে ভোলানাথ পালের নাম করা যাইতে পারে। তিনি কিছু দিন বহরমপুর কলেজেও বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। লেখাপড়ায় তাঁহার বিলক্ষণ যত্ন ছিল। বহরমপুরের বাস-ভবনে স্থাপিত তাঁহার পুস্তকালয়টি আজিও তাঁহার বিদ্যাহারাণের পরিচয় দিতেছে। বহরমপুর কলেজের পণ্ডিত রামগতি হায়রত ‘বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব’ রচনাকালে এই মূল্যবান গ্রন্থ-সংগ্রহটি ব্যবহার করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

“এ স্থলে আমার প্রিয়তম ছাত্র বহরমপুর নিবাসী পরমক্ষেমাস্পদ ত্রিভুজেন্দ্র বাবু রামদাস সেনের নাম-গুণক্ভাবে উল্লেখ না করা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক কার্য্য করা হয়। রামদাস ধনিসন্তান ও অল্পবয়স্ক পুরুষ, কিন্তু ধন ও বয়সের অল্পতায় একত্র সমবেত হইলে সচরাচর যে সকল দোষের সংঘটন হয়, রামদাসে সে সকলের কিছুমাত্র নাই। রামদাস অতি বিনয়ী, নিরহঙ্কার, প্রিয়ভাষী ও সদগুণান্বিত। বিদ্যাহারাণই তাঁহার একমাত্র উপজীব্য। ...তিনি নিজ ভবনে একটি উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা যে সকল পুস্তক জন্ম করিতে পাওয়া যায়, সে সকল পুস্তকই প্রায় ঐ পুস্তকালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে।”

বিবাহ : ১৮৫৯ সনের ২১এ ফেব্রুয়ারি, ১৫ বৎসর বয়সে, রামদাসের বিবাহ হয়। পাত্রী—দুর্গাতারিণী দাসী, টাকী-নিবাসী জ্ঞানকীনাথ রায় চৌধুরীর কন্যা। এই বিবাহ প্রসঙ্গে ‘সংবাদ প্রভাকর’ (২৪ মার্চ ১৮৫৯) লিখিয়াছিলেন : “বহরমপুরনিবাসি ধনরাশি স্বর্গীয় লালমোহন সেন

মহাশয়ের পুত্র ত্রিমান বাবু রামদাস সেন মহোদয়ের শুভোদ্যাহ গত ১০ ফাল্গুন [২১ ফেব্রুয়ারি] সোমবার রজনীযোগে অতি সমারোহ পূর্বক নির্বাহ হইয়াছে, ...।” বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৬৪ সনে, রামদাস বিপত্নীক হন। পত্নী-বিয়োগে তিনি ‘বিলাপতরঙ্গ’ নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরে টাকীর ভারতচন্দ্র রায় চৌধুরীর কন্যা—বিদ্যালতা দাসীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

সাহিত্যানুরাগ : তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতেই মাতৃভাষার প্রতি রামদাসের অমুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে তিনি কাব্যচর্চা করিতেন ; ক্রমশঃ স্বদেশের অতীত গৌরবের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ; তিনি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব-আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। স্ত্রীজ্ঞানমোহিনীর হস্তলিখিত ‘পদ্মপাশমোক্ষণ’\* (প্রস্তোত্তর ছলে লিখিত) গ্রন্থ দেখিয়া সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার অমুরাগ জন্মিয়াছিল। তিনি কালীবর বেদান্তবাগীশের নিকট সমস্ত সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

বক্ষিচন্দ্র যখন রাজকাৰ্য্যে বহরমপুরে অবস্থান করিতেন, সেই সময়ে রামদাস তাঁহার সহিত গভীর সখ্য-স্বত্রে আবদ্ধ হন। বহরমপুরে তখন রীতিমত সাহিত্যের আসর—সাহিত্যচর্চায় যেন বান ডাকিয়াছিল। ১৮৭২ সনের এপ্রিল মাসে বহরমপুর হইতে ‘বঙ্গদর্শন’ প্রচারিত হইলে বক্ষিচন্দ্রের অমুরোধে রামদাস ‘বঙ্গদর্শন’ের জন্ম পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন ; এগুলি সাদরে ‘বঙ্গদর্শনে’ গৃহীত হইয়াছিল।

গ্রন্থাবলী : রামদাস যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলির একটি কালাভুক্তমিক তালিকা দিতেছি। বঙ্গনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সম্বলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। তত্ত্বসংগীত লহরী অর্থাৎ পরমার্থ বিমুক্তত্ব বিষয়ক গীতসমূহ।

১ মাঘ ১৭৮০ শক, জ্যৈষ্ঠ্যারি ১৮৫৯।

\* পুত্র-বিয়োগে রাধামোহন সংসারধর্ম ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনধামে আশ্রয় লইয়াছিলেন। বৃন্দাবনে তাঁহার বাগান-বাড়ী “বাগিচা বাড়ী” নামে পরিচিত। তাঁহার রচিত ‘পদ্মপাশমোক্ষণের পাণ্ডুলিপি বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।



“জগদ্বাক্ত্রীল ত্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় যথোচিত পরিশ্রম স্বীকার ও অপার করুণা বিতরণ করিয়া আত্মোপাস্ত সংশোধন করিয়াছেন...”

২। কুসুম মালা (কাব্য)। ১২৬৮ সাল, ইং ১৮৬১।

সূচী: গোলাপ, জুই, রজনীগন্ধা, বকুল, চাঁপা, গন্ধরাজ, কমলিনী, সন্ধ্যামণি, কুমকালতা, সুর্য্যমুখী, ধূতুরা।

৩। বিলাপতরঙ্গ (কাব্য)। ইং ১৮৬৪।

প্রথম পত্রীর বিয়োগে রচিত। ১৮৬৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ‘গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা’ লেখেন:—“বহরমপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ জমীদার ত্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয় স্বপ্রণীত ‘বিলাপ তরঙ্গ’ নামক একখানি পুস্তক আমাদিগকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। তিনি প্রণয়িনী-বিরহ-বিধুর হইয়া এইখানি প্রণয়ন করিয়াছেন।”

৪। কবিতালহরী। ১২৭৪ সাল (১৭ জুলাই ১৮৬৭)। পৃ. ৫২+১ শুদ্ধিপত্র।

৫। চতুর্দশপদী কবিতামালা। ১২৭৪ সাল (৩১ ডিসেম্বর ১৮৬৭)। পৃ. ৬৪

ইহা ১২৭৫ সালে প্রকাশিত ২য় সংস্করণ ‘কবিতালহরী’র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

৬। ঐতিহাসিক-রহস্য, ১ম ভাগ। ১২৮১ সাল (২৮ এপ্রিল ১৮৭৪)। পৃ. ২২০

সূচী: ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব সমালোচন, মহাকাবি কালিদাস, বরকচি, ত্রীর্ঘ, হেমচন্দ্র, হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়, বেদপ্রচার, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ, ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাস্ত্র, পরিশিষ্ট।

ইহার মধ্যে ‘ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব সমালোচন’ ও ‘মহাকাবি কালিদাস’ স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে যথাক্রমে ১৮৭২ সনের ২১এ সেপ্টেম্বর ও ১৩ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হইয়াছিল।

“ভাগবত-সম্বন্ধীয় সমালোচন ‘রহস্য-সন্দর্ভে’ ও অপার প্রস্তাবগুলি সমুদয় ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার পরম সুহৃদ বঙ্গদর্শনের সুযোগ্য সম্পাদক ত্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের অনুরোধক্রমে আমি এই প্রস্তাবগুলি বহু পরিশ্রম ও ব্যয়সাধ্য স্বীকারপূর্ব্বক নানাবিধ প্রাচীন সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সংকলন করিয়া বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করি,...”-বিজ্ঞাপন।

৭। ঐতিহাসিক-রহস্য, ২য় ভাগ। ১২৮২ সাল (১৯ ডিসেম্বর ১৮৭৬)। পৃ. ২৩৬

সূচী: বাণভট্ট, জৈন-ধর্ম, বৌদ্ধ-ধর্ম, শাক্যসিংহের দিয়াজয়, সঙ্গীত-শাস্ত্রাঙ্গত নৃত্য ও অভিনয়, সাহসিক চরিত, বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন, পালিভাষা ও তৎসমালোচন, বেদ, শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি, বুদ্ধদেবের দন্ত, পরিশিষ্ট।

৮। ঐতিহাসিক-রহস্য, ৩য় ভাগ। ১২৮৫ সাল (১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯)। পৃ. ২৩৩

সূচী: জৈনমত সমালোচন, বোপদেব ও ত্রীমদ্ভাগবত, বেদ-বিভাগ, কুমারপাল, বিজ্ঞাপতি বিহ্লগ, আর্ধ্যসম্প্রদায়ের আচারব্যবহার, বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ, স্বরবিজ্ঞান, পানিনি, রাগ-নির্ণয়।



রামদাস সেন

৯। রত্ন-রহস্য। ১২৯০ সাল (২১ জানুয়ারি ১৮৮৪)। পৃ. ২৮৩+৭২।

“এই গ্রন্থে সমস্ত মহারত্ন, স্বল্পরত্ন, উপরত্ন রত্নালঙ্কার ও স্বর্ণাদি ষাত্ত্ব সম্বন্ধে স্থূল স্থূল অবজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে;... ”

“বৃহৎসংহিতা মণিপরীক্ষা, স্তব্ধনীতি, মানসোল্লাস, অমর-বিবেক, হেমচন্দ্রকোষ, মুক্তাবলী, রাজনির্ঘণ্ট, অগ্নিপুর্ণাণ, গরুড়পুরাণ, ও রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কল্পক্রম, এই সকল মহান্ নিবন্ধ হইতে ইহার প্রমাণাবলী সংগৃহীত হইয়াছে এবং ইহার শেষে মণিপরীক্ষা পুস্তকখানি ক্ষুদ্র টিপ্পনীসহ মুদ্রিত ও সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

“সম্প্রতি খ্যাতনামা সঙ্গীতচার্য্য ত্রীযুক্ত রাজা সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুর (ডাক্তার অপ্‌ মিউজিক) মহোদয় ‘মণিমালা’ নামক এক খানি রত্ন-সম্বন্ধীয় বিতীর্ণ পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিদেশীয় জনসমাজে প্রচারিত করিয়াছেন। উহা এদেশে অতীব বিরলপ্রচার, সুতরাং তাহা আমি দেখিতে পাই নাই।”



১০। ভারত-রহস্য । ১২৯২ সাল ( ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ ) । পৃ. ৩০১ ।

“ভারত-রহস্য নাম দিয়া ভারতের পূর্বজ্ঞান, ভারতের পূর্বধর্ম, ভারতের পূর্বাচার, ভারতের পূর্ব ব্যবহার, ভারতের সময়-বিজ্ঞান, ভারতের যুদ্ধাঙ্গ এবং ভারতের পূর্বতন্ত্র ও পূর্ব-পরিচ্ছদ প্রভৃতি অবশ্য অর্ন্তব্য কতিপয় বিষয় সাধারণের গোচর করিলাম । পূর্বে ভারতবাসী ধর্মিরা কি প্রকারে যাগ-যজ্ঞ করিতেন ; কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতেন, যুদ্ধের উপকরণ বা অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি কিরূপ ছিল ? এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর বা প্রকৃতভাবে আজকাল জনসাধারণের অবদিতপ্রায় হইয়া আছে ; সুতরাং ঐ সকল তথ্যের অব-বোধক এতৎপুস্তকের ‘রহস্য’ নাম দেওয়া বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই ।”—ভূমিকা ।

সূচী : সোমযাগ, আর্ধ্যজ্ঞাতির যুদ্ধাঙ্গ, ধর্মর্ষেদ, অসি, দেবযান, রাজসূর্যযজ্ঞ, অশ্বমেধযজ্ঞ, পুরুষমেধ-যজ্ঞ, রাজাতিমেক-পদ্ধতি, ভারতীয়-যুদ্ধরহস্য, যুদ্ধ-ধর্ম ।

১১। বাকালীর ইউরোপ-দর্শন ( ভ্রমণ ) । ৭ ( ২০ জুলাই ১৮৮৬ ) । পৃ. ২৫২

যত্নের বছর-দুই পূর্বে ( এপ্রিল ১৮৮৫ ) রামদাস ইউরোপ যাত্রা করিয়াছিলেন । এই ভ্রমণ-কাহিনীর প্রায় সমগ্র অংশ প্রথমে ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ-মাঘ সংখ্যা ‘নবভারতে’ প্রকাশিত হয় । পুস্তকে এইকারের বা যুদ্ধ-কালের কোনরূপ উল্লেখ নাই । ‘বাকালীর ইউরোপ-দর্শন’ পাঠ করিয়া সাহিত্য-সন্নাট বন্ধিমজ্ঞ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

“ভ্রমণবিষয়ক পুস্তক অনেক সময়েই উপভাসের অপেক্ষাও মনোহর হয় । কিন্তু ইহা লিপিচাতুর্যের উপর নির্ভর করে । সেই লিপিচাতুর্য্য এই গ্রন্থে আছে । চাতুর্য্যের পরিভাষাই এই চাতুর্য্য । ইউরোপে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় বাকালীর পক্ষে তাহা অদ্ভুত । যেমন দেখিয়াছি, বাজে কথা ছাড়িয়া দিয়া ঠিক ভেমনি লিখিলেই উপভাসের অপেক্ষা বিষয়কর হয় ; তাহার ভিতর আপনার গুণগণা প্রকাশ করিতে গেলেই রসভঙ্গ হয় । এই গ্রন্থকার সেই কৌশল বিলক্ষণ জানেন । ইনি দৃষ্ট বস্তুর বর্ণনায় বিশেষ ক্ষমতালালী ; যাহা দেখিয়াছেন, চিত্রকর যেমন তুলিকায় ছবি তুলে, ইনি কথায় সেইরূপ ছবি তুলিয়াছেন ; তাহার উপর আপনার সরল, অকৃত্রিম হৃদয়ের ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন । ইহাতে গ্রন্থ বড় মনোহর হইয়াছে । গ্রন্থে শব্দের অনর্থক আভরণ নাই ; কোন প্রকার নিষেধ বাহাদুরি নাই ; কোন পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা নাই ; কাহারও প্রতি রাগঘেব নাই ; কিছুই বাতান হয় নাই ; কোন প্রকার রক্ত-ফলাইবার চেষ্টা নাই । ইহাই উৎকৃষ্ট রচনাচাতুর্য্য । এই ক্ষত এ গ্রন্থ আমার বড় ভাল লাগিয়াছে ।”

### [ মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ]

১২। বৃহদেব ( জীবনী ও ধর্মনীতি ) । ( ১২ আগষ্ট ১৮৯১ ) । পৃ. ২৮৩

“ইহার কিয়দংশ প্রচারাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল । ১২৯৪ সালের ভাদ্র মাসে যখন পিতৃদেব [রামদাস] পরলোক-গমন করেন, তখন এই পুস্তকের চারি করমা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল ।”

রামদাস-গ্রন্থাবলী : ১৩০৯ সাল ( ৩ জুলাই ১৯০২ ) হইতে ১৩২২ সালের মধ্যে মণিমোহন সেন পিতার গ্রন্থাবলী তিন ভাগে প্রকাশ করেন । ৩য় ভাগ গ্রন্থাবলীতে সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত অথচ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কতকগুলি রচনাও সংগৃহীত হইয়াছে ; এগুলি—

সংস্কার-রহস্য, যুদ্ধ-ধর্ম, পার্থিব চিন্তা, উৎকলে ত্রিগৌরাক ( কবিতা ), প্রলয় ( কবিতা ), ত্রীজীবগোবামী ( কবিতা ), ইন্দ্র ( কবিতা ), Ha-yarnava, On Chand's mention of Sri Harsha, Gaudiya Desa of the Ancients, The Firearm, of the Hindus, On the Modern Buddhistic Researches.

১২৯৪ সালের বৈশাখ-সংখ্যা ‘ভারতী ও বালকে’ প্রকাশিত “মহাকবি রাজশেখর” প্রবন্ধটি এই সংগ্রহে বাদ পড়িয়াছে ।

রামদাস স্বীয় অর্থব্যয়ে কয়েকখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ পুনঃ-প্রকাশ করিয়া বিত্তোৎসাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন ; সেগুলি ‘বাসবদত্তা’...মদনমোহন তর্কালঙ্কার ‘অভিধান চিন্তামণি’—সংস্কৃত অভিধান ‘অগস্ত্যমতম’ ( রত্নশাক্ত ) ।

### মৃত্যু

১৯ আগষ্ট ১৮৮৭ ( ৩ ভাদ্র ১২৯৪ ) তারিখে, মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে, রামদাস ইহলোক ত্যাগ করেন । তিনি নদীয়া জেলার হাট-বোয়ালিয়া গ্রামে জমিদারী দেখিতে গিয়াছিলেন ; তথায় সন্ধ্যাস রোগে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হয় । এই প্রসঙ্গে ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ ( ১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ ) লেখেন :—

Dr. Ram Das Sen, the Zamindar and *savant* of Berhampore, is no more ! It is simply impossible to express in adequate terms the deep sorrow we have felt at the news of his untimely death. The poignancy of the grief is enhanced by the fact that he died in a strange place—a village named Boalia in Nuddea where he had gone to see his zemindari affairs, and not a single member of his family was with him at the time of his death. He was overtaken by that fell disease, apoplexy, and died in the course of nearly 42 hours. The deceased was only forty-two years old, but he had long before established a literary reputation for himself which is not only Indian but European also. He was in constant correspondence with the *savants* of Europe,

যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহ করেন তাঁহারাও সমানভাবে প্রশংসার্হ। এই মুক-বধিরগণ নীরবে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে

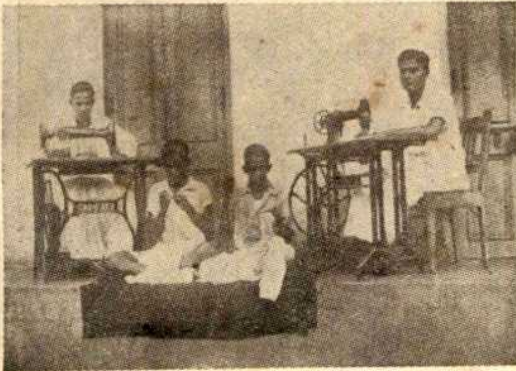
নিয়োগ করা যোল আনাই নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য। তাহাদের দায়িত্ব লইবার জন্ত বিশেষ কোন আইন বা



বাঠের কাজ করিতেছে

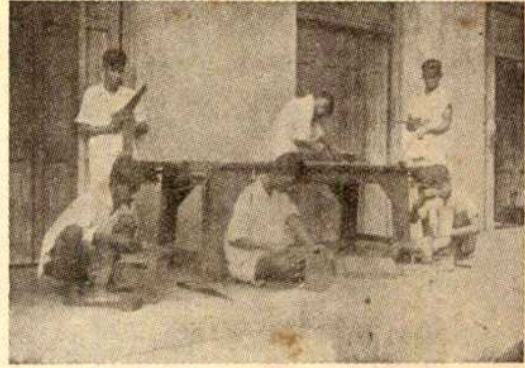
বিগত মহাসমরের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুতির কেন্দ্রসমূহে বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা নিজেদের শিল্পনৈপুণ্য-গুণে বড় বড় কল-কারখানায় কার্যাক্ষুণ্ণতা দেখাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মুক-বধিরদের নির্মিত কুটীর-শিল্প যুদ্ধের বহু অভাব মিটাইয়াছে।

অনেকের ধারণা মুক-বধিরগণ বড় বড় কল-কারখানাতে কাজ করিবার অশুপযুক্ত। কারণ সাধারণ বুদ্ধির অভাবে, শ্রবণশক্তির অভাবে যে কোন মুহূর্তে তাহারা বিপদগ্রস্ত হইতে



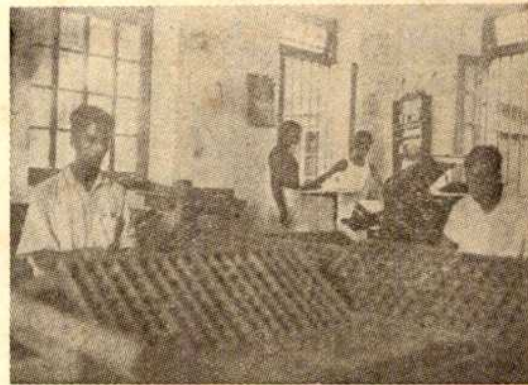
মেসিনে সেলাইয়ের কাজ করিতেছে

পারে। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই অশুলক। পাশ্চাত্য দেশসমূহে বহু বড় বড় কলকারখানায় অসংখ্য মুক-বধিরকে নানাবিধ দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিয়োগ করা হইতেছে। আমেরিকার বিখ্যাত “ফোর্ড কোম্পানীতে” বহু মুক-বধির সাধারণ কর্মীর মত কাজ করিয়া যাইতেছে। স্বয়ং হেনরী ফোর্ড স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, মুক-বধির কন্দিগণকে কার্যে



চুতারের কাজ করিতেছে

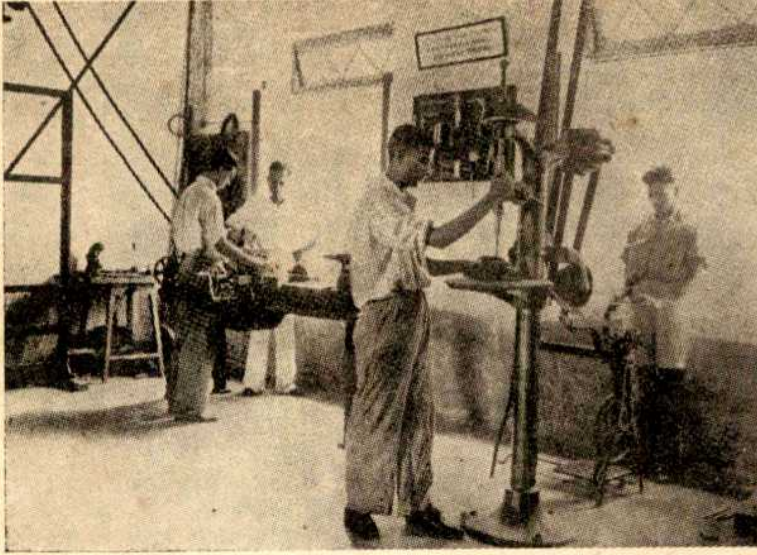
ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন নাই। অনেক মিল-মালিক দয়া-পরবশ হইয়া তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত করেন। কিন্তু মুক-বধিরগণ কৃপাপ্রার্থী হইতে যাইবে কেন? তাহারা তাহাদের পূর্ণ কর্মক্ষমতার দাবিতে সর্বত্র সমান মর্যাদা পাইবে। জন্ম-বধির হইলেই মানুষ মুক অর্থাৎ বোবা হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় বিকল হওয়ায় মুক-বধিরদের দর্শনেন্দ্রিয় ও স্পর্শনেন্দ্রিয় অতীব প্রখর হয়। এই দুই ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন দ্বারাই উহাদিগকে কণা বলা শিখানো হয়। শিল্পকলাদি বিষয়ে ইহারা ছোটবেলা হইতেই দক্ষতা অর্জন করে, কারণ সাধারণ লোক অপেক্ষা ইহাদের অহুকরণ করিবার ক্ষমতা অনেক বেশী। সেইজন্ত সাধারণ লোকেরা কখনো কখনো



ছাপাখানায় কাজ করিতেছে

ইহাদের শিল্পনৈপুণ্যের কাছে হার মানিতে বাধ্য হয়। যাহাতে মুক-বধিরগণ সরকারী কর্মে নিযুক্ত না হইতে পারেন, জ্ঞাত ধারণার বশবর্তী হইয়া গবর্ণমেন্ট তদন্তরূপ আইন প্রণয়ন করিয়া রাখিয়াছেন।





কলিকাতা মুকবধির বিজ্ঞানালয়ের শিল্প-শিক্ষা বিভাগে কুঁদে এবং তুরপুনে কর্মরত ছাত্রবৃন্দ

আজ আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। কিন্তু সে কেবল রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক এবং সর্বোপরি সামাজিক স্বাধীনতা আনিতে গেলে আমাদের এই মুক বহুদের কথা ভুলিলে চলিবে না। প্রগতিশীল সমাজ গঠন করিতে হইলে আমরা এতদিন যাহাদিগকে অবহেলা করিয়া আসিতেছি তাহাদিগের প্রাণে আশার সঞ্চার করিতে হইবে, 'মুক মুখে ভাষা' দিতে হইবে। তাহারা যেন বুঝিতে পারে যে তাহারা ঘৃণা, অবহেলিত জীবন যাপন করিতে আসে নাই। সমুদ্রে তাহাদের করিবার মত বহু কার্য পড়িয়া রহিয়াছে।



দপ্তরীর কাজ করিতেছে

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের স্বাধীন গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। কয়েক জন নিঃস্বার্থ আদ্যাত্ম্যগী নীরব কর্মীর প্রচেষ্টায় আজ ভারতের অগণিত মুক-বধিরের সেবাকল্পে কয়েকটি মাত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। মুক-

বধিরদের সংখ্যা-অনুপাতে শিক্ষাকেন্দ্র অতি অল্প। এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ছাত্র মুক-বধির-শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাহাদের পরবর্তী জীবনের কথা যদি সকলে ভাবিয়া দেখেন তবে তাহাদের জ্ঞান এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সার্থকতা উপলব্ধি



মাটির খেলনা তৈরি করা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে

করিতে পারিবেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহে মুক বধিরদের মধ্যে অনেকে এমন খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন যাহা সচরাচর বিরল। আমাদের দেশেও বহু মুক-বধিরের মধ্যে কেহ কেহ কোন কোনও বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। যে-কোন মুক-বধির বিজ্ঞানালয়ে মুক-বধিরদের কার্যপ্রণালী ও তাহাদের তৈয়ারি নানা ধরণের কাঠের আসবাবপত্র, চামড়ার দ্রব্য, লোহার নানা প্রকার জিনিষ ও বিভিন্ন রকমের পুতুল দেখিলে সকলেই বিস্ময়াবিত হইবেন। আজকাল কলিকাতায় বহু দোকানে মুক-বধির শিল্পীদের তৈয়ারী নানাপ্রকার জিনিষপত্র





পশ্চিমবঙ্গের গবর্নর শ্রীরাজাগোপালাচারী কারখানায় ছেলেদের  
কাজ পরিদর্শন করিতেছেন

বিজয় হইয়া থাকে, এতদ্বিধ মুক-বধির-চালিত অনেক দক্ষিণ  
দোকান আছে। বহু কর্মী ছাপাখানার কাজ এবং দপ্তরীর  
কাজ করিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছে। অনেক মুক-বধির  
চিত্রাঙ্কন, চারুশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। বড় বড়  
কলকারখানাতেও তাহাদের অনেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়া  
থাকে।

এই সব হৃতভাগ্য মুক-বধিরকে শিক্ষিত, আত্মমর্যাদা  
বোধসম্পন্ন, স্বাবলম্বী হইতে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত  
হইবেন সন্দেহ নাই। তাহারা প্রত্যেকেই যাহাতে শিল্প-  
শিক্ষা পাইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। শুধু  
মৌখিক উৎসাহবাণী বর্ষণ করিলে চলিবে না, এই কার্যে  
বৈদ্যাসহকারে নামিতে হইবে। এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টেরও  
দায়িত্ব অনেক।

## পলাতক

আশরাফ সিদ্দিকী

প্রেমমুক্তলিত প্রথম ফাগুনে বকুল-ঝরানো দিনে  
হে রাজকুমারী, তেপান্তরিকা, আশো হাসি আশো লাজে  
ফুলের বাসরে প্রথম প্রেমের দিয়েছিলে মালাখানি  
অধীর আবেগে অধর-সুধায় টেনেছিছু বাহুমাঝে।

শুক্রাতিথির চাঁদেদের জড়িয়ে সরসী স্বপন দেখে  
কুহুদ-বাসরে মরাল-মরালী বুকে বুকে মিশে রয় ;  
আমার হুবনে নামিল বুঝি রে স্বপ্নতেপান্তর  
‘বউ কথা কও’ ডাকছে তখনো মায়াময়, মধুময় !

চোখে চোখ রাখি সেদিন তোমায় বলেছিছ : ‘মমতাজ !  
আমি তব কবি—তুমি যে কাব্যশতদল সুবিমল  
আমি রূপকার—শ্রামলী গো মোর তুমি হবে রূপায়ণ  
ধূলির ধরায় নতুন প্রেমের গাঁথবো তাজমহল !’

মদির মলয়ে কামরাজা-বন কেঁপে ওঠে ধরোধরো  
ধরোধরো বুক, সেদিন আমায় বলেছিলে : ‘প্রিয়তম !

হে চাঁদ, তোমার রূপালী সুধার অমল ঝরণাতলে  
আমার পৃথিবী কুহুমে কুহুমে করে দিও অল্পমম !’

কাছে থেকে দূর সারাটি দিবস হাজারো কাকের কঁকে  
চুরি ক’রে তব ভীকু ছুটি চোখ আমারে খুঁজিয়া মরে ;  
হাসহুহানার মধু রজনীর গানের পাখীরা মোর  
জানিনি তো হায় ! সহসা প্রভাতে লুটাবে ব্যাধের শরে !

জানি স্বরগের সোনার টিয়ারে এ মাটির খেলাঘরে  
যাবে নাকো বাঁধা সোনার শিকলে ! হাসহুহানার দল  
জানি করে যায়—আবার মিলায় অসীম সুরভিলোকে  
এ মাটির বুকে সবটুকু তার ঢেলে দিয়ে পরিমল !

এই মধুমা—এই মধুরাত—জীবন-সাধী গো মোর !  
তুমি কাছে নাই—নাই নাই নাই ! নীরব বাসর-রাতি  
রক্ত কপাট ! ঘরের প্রদীপও নিভিয়ে দিয়েছি তাই  
আলোতে কি কাজ ? অন্তরে যার জ্বলিছে প্রেমের বাতি ॥

# ষ্টালিং ব্যালাংস্

শ্রীভূপেশ দত্ত, সি.-এ.-আই.-বি. (লণ্ডন)

ষ্টালিং ব্যালাংস্ সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল ও ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে এবং ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল ও পাকিস্তানের সঙ্গে যে আলোচনা সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলস্বরূপ পৃথক পৃথক ভাবে আগামী ৩০শে জুন, ১৯৪৮ তারিখ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্তকালীন চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে। এখন উভয় ডোমিনিয়নের পৃথক সত্তার উপর জোর দিয়া ভারতীয় ইউনিয়নের “ষ্টালিং ব্যালাংস্ একাউন্ট নাখার ওয়ান্”—এর অল্পরূপ রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া পাকিস্তানের জন্ত নতুন করিয়া খুলিয়াছে “পাকিস্তান ষ্টালিং ব্যালাংস্ একাউন্ট নাখার ওয়ান্।” পাকিস্তানের একাউন্ট নাখার ওয়ানের ওপেনিং ব্যালান্স হইল এক কোটি পাউণ্ড। তাহা ছাড়া দুই ডোমিনিয়নের সম্পত্তি হিসাবে রহিয়াছে “ক্রোজেন্ ষ্টালিং ব্যালাংস্ একাউন্ট নাখার টু”। এই একাউন্ট নাখার টু হইতে বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নের একাউন্ট নাখার ওয়ানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড, আর পাকিস্তানের একাউন্ট নাখার ওয়ানে করা হইয়াছে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। দুই ডোমিনিয়নের আলাদা আলাদা একাউন্ট নাখার ওয়ান চলতি হিসাবের জন্ত ব্যবহৃত হইবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারত ও পাকিস্তানের মোট পাওনা ছিল ১১৬ কোটি পাউণ্ড। তন্মধ্যে ব্রিটেন ১৭ কোটি পাউণ্ড পরিশোধ করিয়া দেওয়ার উক্ত পাওনার অর্ধ দাঁড়াইয়াছে ৯৯ কোটি পাউণ্ডে।

ভারতীয় ইউনিয়ন আগামী ৩০শে জুন, ১৯৪৮ তারিখ পর্যন্ত সেন্ট্রাল রিজার্ভ কর হাউস কারেন্সীস্ হইতে ১ কোটি পাউণ্ডের বেশী মুদ্রা উঠাইবে না বলিয়া চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। ভারত ইউ. এন্স. ডলারের খাটুতি প্রণ করিবার জন্ত মুদ্রা তহবিল হইতে কর্কট গ্রহণ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

৬ মাসের চুক্তি ছাড়া বর্তমানে ব্রিটেনের সঙ্গে অল্প কোনও আলোচনা হয় নাই। অদূর ভবিষ্যতে ষ্টালিং ব্যালাংস্ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা চলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

যুক্তবিরতির পর হইতে দীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে ব্রিটেনের সঙ্গে ষ্টালিং ব্যালাংস্ প্রশ্ন লইয়া সামগ্রিক আলোচনা করা হয় নাই। গত আগষ্ট মাসে করা হইয়াছে ৬ মাসের অন্তর্ভুক্তকালীন ব্যবস্থা, আর এইবারও করা হইল আর একটা ৬ মাসের চুক্তি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের ঘোর বিপদের দিনে দরিদ্র ভারত অপারিসীম ক্রেস খীকার করিয়া ব্রিটেনকে যে সব যুদ্ধোপকরণ যোগাইয়াছে সেগুলির ব্রিটিশের ধরা দাম অনুসারে ভারতের পাওনা দাঁড়াইয়াছে ১১৭ কোটি পাউণ্ডে। ক্রয়দংশ পরিশোধ হওয়ার দরুন ঐ

পাওনার অর্ধ এখন দাঁড়াইয়াছে ৯৯ কোটি পাউণ্ডে। দেনাদার কেবল তার খুশীমত কম দাম ধরিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, সুদের, হারও নিজের সুবিধামত ধরিয়াছে। পাওনাদার হওয়া সত্ত্বেও সঙ্কোচের ভাব যেন আমাদেরই বেশী। আমাদের টাকাকটকত বছরের মধ্যে, কি প্রকার কিস্তিতে এবং ষ্টালিং, ইউ-এন্স. ডলার ও বুলিয়ান্—এই তিনের কি কি প্রকার অংশে ফেরত পাওয়া যাইবে তাহা নির্ণয় করিবার সৌভাগ্যের অপেক্ষায় আছি।

“কুইট ইণ্ডিয়া”র দাবি জানাইয়া আমরা যেমন নির্ভীক ভাবে ব্যাপক আন্দোলন চালাইয়াছি, ব্রিটেনের নিকট ষ্টালিং ব্যালাংস্ পরিশোধের পাকাপাকি ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার দাবি জানাইয়া তেমন কোনও আন্দোলন আমরা চালাই নাই। সাধারণ লোক অর্থনীতির জটিলতা লইয়া মাথা ঘামাইতে চাহে না। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরাই এই ব্যাপারে যথোপযুক্ত উৎসাহ দেখান নাই। পক্ষান্তরে ব্রিটেন তার দেনাটা যত কম ও যত দেরি করিয়া শোধ করিতে পারে তত্ক্ষণ কর্ণধার হিসাবে পাঠাইয়াছে একজন ভারতের প্রাক্তন অর্থসচিবকে, ধীর ব্যক্তি-সত্তা ব্রিটিশ স্বার্থের পক্ষে অতীব কার্যকরী হইয়াছে।

কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে ব্রিটেন আমাদের পাওনা মিটাইয়া দিবার ব্যাপারে অবিচার করিবে না। ২৩শে নবেম্বর, ১৯৪৪ তারিখে ব্রিটিশ চার্জ কলেজের ইকনমিক সোসাইটিতে “আন্তর্জাতিক মুদ্রা-তহবিল ও ভারত” শীর্ষক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীমলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন,

“But I think it is best to proceed in the belief that Great Britain will not be deliberately unjust and will honour her obligations to India.”

তিনি আরও বলিয়াছেন—

“Britain need only pay about one per cent of her National Income towards the liquidation of India's sterling balances over a period of ten years. This should not put an excessive strain on the National Economy and standard of living of Britain.”

কিন্তু ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা থাকিলেই যে দেনাদারের মনে তাহা করিবার ইচ্ছা জাগিবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই। আমরা আজও ভারতীয় ঋণ পরিশোধকল্পে ব্রিটেনের দশবাধিকী চুক্তির কথা শুনি নাই। আগামী ছয় মাসের মধ্যে ব্রিটেন উভয় ডোমিনিয়নকে দিবে ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড + ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। মোট ৯৯ কোটি পাউণ্ডের মধ্যে উভয় ডোমিনিয়ন পাইবে ২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড



and the Italian and the German Governments conferred on him the title of "Doctor." He has left a library the like of which is perhaps not to be seen in whole Bengal. As an author his works always showed vast erudition and deep researches. His name will be remembered as long as the Bengali language ceases not to exist. In his private life, he was a dutiful son, an affectionate father, a loving husband and a warm friend. As a Zamindar, his treatment with the ryots was the most generous. In short, in Dr. Ram Das Sen Bengal has lost a most worthy son—one who, though belonging to young Bengal, had none of his vices, but had all the sterling merits of the old Hindu, and who was as unostentatious and silent a worker as a true patriot ought to be.

মুর্শিদাবাদের এই উজ্জ্বল রত্নের স্মৃতিরক্ষাকল্পে গুণমুগ্ধ দেশবাসী ইতালীয় ভাস্কর সিনিয়র রওনী (Signor Rondoni) সাহায্যে তাঁহার পাষণ-মুষ্টি রচনা করাইয়া, গঙ্গাতীরে বহরমপুর কলেজের উত্তর-পশ্চিম কোণের মাঠে স্থাপনা করিয়াছেন। ১ আগষ্ট ১৮৯৯ তারিখে বকের ছোট লাট উদ্ভার্গ প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। প্রতিমূর্তির নিয়ে শুভ-গাত্রো বেশিত আছে :—

To the Memory  
of

DR. RAMDAS SEN.

Born: Dec. 10, 1845.

Died: Aug. 19, 1887.

An eminent oriental scholar, a learned antiquarian and a staunch friend of education. This bust is raised by his admiring and grateful friends, the people of the district of Murshidabad. August 1. 1899.

**রামদাস ও বাংলা-সাহিত্য :** ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীদের মধ্যে পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে খুব অধিক লোক কাজ করেন নাই। মাত্র দুই জন বিশিষ্ট গবেষকের নাম আমাদের সর্বদা স্মরণে আসে—রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রামদাস সেন। ইহাদের মধ্যে রামদাসের প্রতি আমাদের অধিকতর কৃতজ্ঞ হইবার কারণ আছে। তিনি তাঁহার সমস্ত গবেষণা মাতৃ-ভাষার মাধ্যমেই প্রচার করিয়া পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল যাহা ইউরোপীয় ভাষায় ও ইউরোপীয় পদ্ধতিতে করিয়াছিলেন, রামদাস মাতৃ-ভাষায় সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে তাহা করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি খুব দীর্ঘ দিন মাতৃভাষার সেবা করিবার অবকাশ পান নাই, কিন্তু তাঁহার স্বল্প-পরিসর জীবনে

ঐতিহাসিক, ভারতীয় ও বহু বহু উদ্ঘাটন করিতে গিয়া তিনি আমাদেরকে যে সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। এই কারণেই 'ক্যালকাটা রিভিউ' (ইং ১৮৮৪) লিখিয়াছিলেন :—

"An as earnest and indefatigable student of Indian antiquities, he has no equal in this country, with the single exception of Dr. Rajendra Lala Mitra. But he is, in one respect, a greater benefactor to his country than even Dr. Mitra. Dr. Mitra's antiquarian writings are a sealed book to those who know not English; Dr. Ram Das Sen's antiquarian writings are open to those who know only Bengali, as well as those who know English."

বাংলা-সাহিত্যের প্রতি রামদাসের অসাধারণ ঐতি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুর হইতে যখন 'বঙ্গদর্শন' বাহির করেন, তখন রামদাস তাঁহাকে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। বাংলা-সাহিত্যের প্রসারকল্পে তাঁহার বদান্ততাও স্মরণযোগ্য। তাঁহার নিজস্ব চেষ্টায় পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে যে-সকল মৌলিক গবেষণা আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সেগুলি আধুনিক সাহিত্য-সাধকদের আদর্শস্বরূপও চিরদিন কীর্তিত হইবে।

রামদাসের পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণা পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। ইটালীর ফ্লোরেনটিনো একাডেমী তাঁহাকে "ডক্টর" উপাধি ভূষিত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সংস্কৃত-বিজ্ঞানী ইউরোপীয় পণ্ডিত-গণের সহিত রামদাসের পত্র-ব্যবহার ছিল। একবার মনীষী ম্যাক্সমুলার একখানি পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন :—

"Take all what is good from Europe only, do not try to become Europeans, but remain what you are, sons of Manu, children of a bountiful soil, seekers after truth, worshippers of the same unknown God, Whom all men ignorantly worship, and Whom all very truly and wisely serve by doing what is just and good."

রামদাসের জীবনের আদর্শও ইহাই ছিল। ধর্মীর সম্মান হইয়াও তিনি পাশ্চাত্য ভাব-প্রবাহে অন্ধ অনেকের মত ভাসিয়া যান নাই, ভারতীয় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। সে যুগের পক্ষে ইহা যে কত বড় শক্তির পরিচয়, আজ আমরা তাহা অহুমানও করিতে পারি না।

## দেশসেবায় মুক-বধির কারিগর

শ্রীনুপেন্দ্রমোহন মজুমদার

বাস্তব জগতে শিল্পকলার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত ব্যাপক। আমাদের সুখসুবিধার জন্ত যে নানাপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করি সেকথা ভাবিয়া দেখিলেই উপরোক্ত মন্তব্যটির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি। ইহার পশ্চাতে



কামারের কাজ করিতেছে

যে সকল শিল্পীর পরিশ্রম ও বুদ্ধির খেলা চলিতেছে তাহার সত্যই ধন্যবাদার্থ।

এই শিল্পী কন্মীদের মধ্যে এমন এক দল আছেন যাহাদের শিল্পনৈপুণ্য ও কার্যক্ষমতা দেখিলে বিম্বিত হইতে হয় ও তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা সহজেই অপসারিত



দপ্তরীর কাজে রত একটি মুক-বধির বালক

হইয়া যায়। ইঁহারা হইলেন সমাজের নগণ্য মুক-বধির শিল্পীগণ। এত দিন আমরা ইঁহাদিগকে কালা বা বোবা বলিয়া ঘৃণা ও উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি। উপরন্তু বলিয়াছি, ইঁহারা সমাজের বোঝাস্বরূপ। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা আর সেরূপ নাই। ইঁহাদের সম্বন্ধে এখন তেমন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করাও উচিত নয়। শিক্ষাশুণে ইঁহারা শিল্পকলায় অপূর্ব দক্ষতা লাভ করে, উপরন্তু কথাও বলিতে শিখে। আজকাল যে সমস্ত মুক-বধির শিল্পী শিল্পকলার সাহায্যে নিজেদের অন্নসংস্থান করিয়া দেশের ও দশের সেবা করিয়া যাইতেছেন তাঁহারা সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। আরও আশ্চর্যের বিষয়



মাটির পুতুল গড়া

এই যে, এই সকল মুক-বধির নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে যোগ দিতে এবং সমাজেও বিশিষ্ট আসন অধিকার করিতে পারেন। শিক্ষাশুণে সমাজের এই বিকল অংশ অমূল্য সম্পদে পরিণত হইতে পারে।

বিগত মহাসমরে জগতের বিভিন্ন স্থানে স্ব-স্ব দেশের কল্যাণ-কর্মে মুক-বধির শিল্পীদের দানও উল্লেখযোগ্য। মুক-বধিররাও যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিল। তাহারা অসংখ্য বহু কন্মীর মত দেশের সেবা করিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা সন্মুখসমরে প্রাণ দেন তাঁহাদের আত্মোৎসর্গ যেমন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়, তেমনই যাহারা

(উপরোক্ত পৃথক অঙ্কে)। এই অল্পপাতে বছরে পড়িবে প্রায় ৫ কোটি পাউণ্ড এবং সমস্ত টাকা সুদ সমেত পরিশোধ হইতে সময় লাগিবে ২৫ বৎসরের অধিক।

আমাদের ঘরের টাকা ব্রিটেনের কাছে আটকা পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও পরের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে আমাদের কি কি লোকসান তাহা বিচার করিয়া দেখা দরকার। চলতি খরচ ছাড়াও আমাদের শিল্প বিস্তার ও কৃষিকার্যের উন্নতিসাধনে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হইবে। আমাদের টাকা আমাদের হাতে ফিরিয়া আসিলে যেখানে মূলধন খাতে একটা মোটা রকমের নিজস্ব ক্রেডিট ব্যাল্যান্স থাকিত, পরের নিকট হইতে ধার করিলে সেই ক্রয়গায় আসিয়া পড়িবে একটা ক্যাপিটাল লোন। আসল টাকা ও তার সুদ উভয় মিলিয়া একটা বিরাট বোঝা বাড়ি চাপিবে। নিজেদের ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস ও তার সুদবাবদ কিছু পাওয়া যাক বা না যাক, কর্ত্ত করা টাকার সুদ কিস্তিমত চালাইয়া যাইতে হইবে। আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ তহবিলের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই সুদের টাকা পরিশোধ করিবার জন্ত মুদ্রা-তহবিল হইতে চড়া সুদে কর্ত্ত করা ছাড়া কোনও উপায় থাকিবে না। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা দরকার যে আমরা ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস-এর “বুক এন্ট্রি” হিসাবে যে সুদ পাইতেছি, আমাদের অপরের নিকট হইতে কর্ত্ত করা টাকার উপর সেই সুদ দিতে হইবে এবং ঐ সুদ পরিশোধ করিবার জন্ত মুদ্রা-তহবিলকে যে সুদ দিব, শেষোক্ত দুইয়ের গড়পড়তা হার প্রথমোক্ত পাওনা সুদের হারের চেয়ে কমপক্ষে শতকরা ১% বেশী হইবে। কোনও কালে আমাদের ঘরের টাকা ঘরে ফিরিয়া আসিলেও আমাদের মোট লোকসান একটা বিরাট অঙ্কে দাঁড়াইবে। ক্যাপিটাল লোন গ্রহণ করার দরুন সুদের জের টানা মুদ্রা-তহবিলস্থিত আমাদের চলতি হিসাবকেও দারুণভাবে পঙ্গু করিয়া ফেলিবে। সুদের টাকার বোঝা ও সুদ পরিশোধ করিবার জন্ত মুদ্রা-তহবিল হইতে কর্ত্ত গ্রহণ—এতদ্ব্যতীত নিয়মামুসারে মুদ্রা-তহবিলের চলতি হিসাবের এলাকায় আসিয়া পড়িবে। এই গুরুভার মুদ্রা-তহবিল ও ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়-হারের উপর জোর আঘাত হানিবে—যাহার ফলে আমরা একটা “ক্রনিক অ্যাডভান্স ব্যাল্যান্স-ওয়াল” দেশে পরিণত হইব। এমতাবস্থায় ব্রিটেনের নিকট হইতে আমাদের পাওনা টাকা আদায় করিবার জন্ত সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করাই সমীচীন।

ভারতীয় ইউনিয়ন ব্রিটেনের সঙ্গে এই প্রকার চুক্তিপত্র আবদ্ধ হইয়াছে যে আগামী ৩০শে জুন, ১৯৪৮ তারিখ পর্যন্ত “সেন্ট্রাল রিজার্ভস ফর হার্ড কারেন্সীস” হইতে এক কোটি পাউণ্ডের বেশী উঠাইবে না। দ্বিতীয়তঃ ভারত ইউ. এস. ডলারের ঘাটতি পূরণ করার জন্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা-তহবিল

হইতে কর্ত্ত গ্রহণ করিবে। এই কর্ত্তের পরিমাণ হইবে এক কোটি ইউ. এস. ডলার। এই ঋণের জন্ত সার্ভিস চার্জ দিতে হইবে শতকরা চার ভাগের তিন ভাগ। ওভারড্রাফট হারের নিয়ম এমন ভাবে বাঁধা আছে যাহাতে মুদ্রা-তহবিল হইতে বেশী পরিমাণ টাকা ধার করা অথবা দীর্ঘ দিন ঋণ পরিশোধ না করা—উভয় কার্যই দেনাদারের পক্ষে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িবে। ভারতকে মোটা টাকা ধার করিতে হইবে। আমাদের পক্ষে ইহা কত বড় লাভজনক ব্যাপার তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছে ষ্টেটসম্যান পত্রিকা ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ তারিখের এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। উক্ত প্রবন্ধে আছে,

“The Fund's articles of Agreement allow a member to buy the currency of another in exchange of its own currency subject to certain limitations. As India's quota is equivalent to \$400m she is apparently entitled to buy \$100 in the coming year at a service charge of 3 per cent, rising by 1 per cent annually. The U. K. has already purchased dollars from the Fund. India's present opportunity is a strange commentary to the Bretton Wood's debate in the Central Assembly during 1946. Ratification of the Agreement setting up the Fund was agreed to only after a prolonged debate.”

ষ্টেটসম্যান পত্রিকা স্বজাতিপ্রেম বশতঃ আমাদেরকে ভুল রাস্তা বাতলাইতেছে। উক্ত পত্রিকা আমাদের পাওনা টাকা ব্রিটেনের নিকট হইতে আদায় না করিয়া মুদ্রা-তহবিল হইতে কর্ত্ত গ্রহণের কাহনের কথা উল্লেখ করিয়াছে এবং ইহাকে একটা সুযোগ বলিয়া আখ্যা দিয়াছে। ব্রিটেনের মুদ্রা-তহবিল হইতে কর্ত্ত লওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া আমাদের আশঙ্কা দূর করিবার চেষ্টায় ষ্টেটসম্যান পত্রিকা কিঞ্চিন্মাত্র কসুর করে নাই। কিন্তু আর্থিক সঙ্কটে পতিত ব্রিটেনের নিকট যাহা সুযোগ আমরা তাহাকে সুবিধা মনে করিব কোন্ কারণে? বরং ব্রিটেনের অবস্থা আরও খারাপ হওয়ার পূর্বে আমরা আমাদের টাকা যতটা ঘরে উঠাইয়া আনিতে পারি তাহার চেষ্টাই করিতে হইবে। ব্রিটেন মুদ্রা-তহবিল হইতে ধার লইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইউ. এস.-এর নিকট হইতে যে মোটা অঙ্কের ধার করিয়াছিল তাহার শেষ কিস্তি ১০ কোটি ইউ. এস. ডলার এই মাসের মধ্যে উঠাইয়া লইবে। একদিকে অতি শীঘ্র ব্রিটেনের তহবিল শূন্য হইয়া পড়িবার কথা; কিন্তু অপর দিকে মার্শাল প্ল্যানের দৌলতে আগামী মাসেই ব্রিটেনের হাতে মোটা রকমের ইউ. এস. ডলারের তহবিল আসিয়া জুটিবে। সুতরাং ব্রিটেনের হাতে এই টাকা থাকিতে থাকিতে ভারত তার পাওনার একটা বড় অংশ আদায় করিবার চেষ্টা না করিলে প্রকাণ্ড ভুল করিবে। যাহাতে আমাদের চলতি খরচের জন্ত মুদ্রা-তহবিল হইতে কর্ত্ত গ্রহণ করিতে না হয় এবং আমরা



আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের জন্ত একটা বড় তহবিল পাইতে পারি, কালবিলম্ব না করিয়া ব্রিটেনের উপর সেই প্রকার চাপ দিতে হইবে। ষ্টেটসম্যান পত্রিকা আমাদের কাছে 'opportunity' স্বযোগ বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে তাহা মোটেই opportunity নহে। বরং ইহা আমাদের অতি বড় দুর্ভাগ্য যে আমাদের মুদ্রা-তহবিল হইতে কর্ত্ত করিতে হইতেছে। ইহাতে আমাদের অনিশ্চিত হইবার কারণ মোটেই নাই।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ষ্টালিং ব্যাল্যান্স-এর প্রয়োজন হইবে খুব বেশী। আমাদের শিল্পপ্রসারে এবং কৃষিকর্মে উন্নতিসাধনে বিদেশ হইতে মূলধন ও কাঁচা মাল আমদানী করিতে হইবে। এইজন্য আমাদের দুইটি স্থায়ী ষ্টালিং ফাণ্ড ও ডলার ফাণ্ডের দরকার যাহাতে আমরা প্রয়োজনানুসারে টাকা উঠাইয়া উপরোক্ত বিদেশী মাল ক্রয়ের পাকাপাকি ব্যবস্থা করিতে পারি। ব্রিটেনের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়াই এই ফাণ্ড দুইটির গোড়াপত্তন করিতে ও রূপ অংশ জোগাইতে হইবে। ব্রিটেনের ডলার ও স্বর্ণের অবস্থা সম্বন্ধে ইউ. এস. ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট হালে যে মন্তব্য করিয়াছে তাহা এই,—

"Britain's gold and dollar resources now at about \$200 m will go down to \$100 m by the end of 1948 and large dollar deficits, will continue thereafter."—*Reuter*, January 14, 1948.

ব্রিটেনের অবস্থার শোচনীয় অবনতি ঘটবার পূর্বেই জোর তাগাদা দিয়া ষ্টালিং ব্যাল্যান্স-এর একটা মোটা অংশ উত্তুল করিবার জন্ত আমাদেরকে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। ইহাও ভাবিবার বিষয় যে আমরা এক দিকে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করিয়াছি পাঁচ বৎসরের জন্ত এবং অপর দিকে ষ্টালিং ব্যাল্যান্স চুক্তি করিয়াছি ৬ মাসের জন্ত। দুইটার সময়ের বিরাট ব্যবধান। বৈদেশিক পাওনার প্রত্যেক এইভাবে উপেক্ষা করিয়া এত বড় একটা উন্নয়ন পরিকল্পনাকে যে কিরূপে কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইবে সর্ববিধ উন্নয়ন কার্যের সূচনা মাত্র। তারপরে আসিবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। এইরূপ পর পর দুইটা পরিকল্পনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে ব্রিটেনের নিকট হইতে যাহাতে পাওনা টাকার উদ্ধার বটে সেইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। দীর্ঘকালীন উন্নয়ন-পরিকল্পনার সঙ্গে কি করিয়া স্বল্পকালীন ষ্টালিং ব্যাল্যান্স চুক্তি খাপ খাইতে

পারে তাহা আমাদের নেতারা একবার ভাবিয়া দেখিতে পারেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের আশাহুয়ায়ী ব্রিটিশ-জাতি যদি ভায়পরায়ণ হইয়া দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের পাওনা টাকা ফিরাইয়া দেয় তাহা হইলে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ থাকে না। কিন্তু আমরা আজ পর্যন্ত আশাবিত্ত হইবার মত কিছুই পাই নাই। অথচ দ্বিতীয় অন্তর্জাতকালীন চুক্তিতে আমরা উল্লসিত হইয়াছি এত বেশী যে মুদ্রা-তহবিল হইতে কর্ত্ত গ্রহণ করার মত ছরবছা আমাদের হওয়া সত্ত্বেও সর জেরিমি রেইসম্যান ও তাঁর জাতভাইদের বর্তমান চুক্তির সম্বন্ধে ভয়সী প্রশংসা করিয়াছি। কংগ্রেসের অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে ষ্টালিং ব্যাল্যান্স লইয়া কোনও বিস্তৃত আলোচনা করা হয় নাই। 'ইকনমিক কমিটি'র নেতা হিসাবে পণ্ডিত জবাহরলালও আজ পর্যন্ত ষ্টালিং ব্যাল্যান্স সমস্যার উপর কোনরূপ আলোকসম্পাত করেন নাই। একটা বড় প্রোগ্রাম হাতে লইয়া আট-বাট বাঁধিয়া কাজে নামা উচিত। এই ক্ষেত্রে বৈদেশিক দেনা-পাওনা সম্বন্ধে চোখ বুজিয়া থাকিলে সমস্যার সমাধান হইবে না।

ষ্টালিং ব্যাল্যান্স-এর সামগ্রিক আলোচনায় বিলম্ব ঘটায় আমাদের সমুদ্র ক্ষতি হইতেছে। ব্যাপারটা ভাড়াভাড়ি হাতে লওয়া ভারতীয় স্বার্থের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। একজন বিচক্ষণ ও ভারতীয় স্বার্থ সম্পর্কে অতীব সজাগ ব্যক্তির নেতৃত্বে একটা মিশন ব্রিটেনে পাঠানো দরকার যাহাতে তথ্য আমাদের অহুঙ্কলে জনমত সৃষ্টি হইতে পারে। আর একটা মিশন পাঠানো দরকার অজান্তে দেশসমূহে। ষ্টালিং ব্যাল্যান্স অর্জন করিতে আমাদের কি প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং বর্তমানে আমাদের ঐ টাকার কিরূপ জরুরী দরকার তাহা সকলকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে হইবে— যাহাতে আমাদের পাওনা টাকা আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ধরে ফিরিয়া আসে। ব্রিটেন অতীব কৃতজ্ঞচিত্তে আমাদের পাওনা ছায়া হারে পরিশোধ করিবে এইরূপ আশা করিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের বিফলমনোরথ হইতে হইবে।

পরিশেষে ইহা বলাই-যথেষ্ট হইবে যে ষ্টালিং ব্যাল্যান্স পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য দেখাইবার বিষয়ও নহে কিম্বা সাধারণ লোকের জীতির বস্তও নহে। ইহা আমাদের একটি অতি প্রয়োজনীয় সম্পত্তি। ষ্টালিং ব্যাল্যান্স যুদ্ধের সময় গড়িয়া উঠিয়াছে, আর আজ আমাদের প্রয়োজনের সময় এই টাকা মুক্ত করিতে না পারিলে আমাদের দুর্ভাগ্যের বোঝা ক্রমশঃ ভারী হইতে থাকিবে।

# বিমান ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

মধ্য-পশ্চিম

শনিবার সকালে এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিংয়ের ছাদে গিয়া উঠিলাম। কিছু প্রবেশমূল্য লইয়া ইহার দর্শনাধিগম্যকে ছাদে উঠায়। শ্রেণী-বদ্ধ অসংখ্য লিফট নরনারীকে উঠাইতেছে ও নামাইতেছে।

৫টি বা ৬টি করিয়া তলার জুড় এক একটি লিফট নির্দিষ্ট আছে। প্রত্যেক লিফট শুধু নির্দিষ্ট তলা কয়টিতেই ওঠানামা করে। এতদ্ভিন্ন এক্সপ্রেস লিফট আছে। সেগুলি সকল তলায় না থামিয়া ক্রান্ত একটি বা দুইটি নির্দিষ্ট তলায় চলিয়া যায়। ছাদে উঠিতে আমাদের একবার লিফট বদল করিতে হইল। প্রথম এক্সপ্রেস লিফট কোথাও না থামিয়া আমাদের ৮৭ তলায় লইয়া গেল। দ্বিতীয় এক্সপ্রেস লিফট ৮৭ তলা হইতে ছাদ পর্যন্ত চলে। অল্প কোথাও থামে না।

মধ্য-ম্যানহাটনে ৫ম এভিনিউ ও ৩৪তম স্ট্রিটের সংযোগস্থলে বাড়ীটি অবস্থিত। বাড়ীটি ১০২ তলা, ১২৫০ ফুট উচ্চ—পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম। একবার নাকি একটি এরোপ্লেন এই বাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ছাদ হইতে নিউ ইয়র্ক নগরীর দৃশ্য অপূর্ব। আকাশচুম্বী সৌধমালা এখান হইতে ছোট মনে হয়। অদূরে ১০৪৬ ফুট উচ্চ, ৭৭ তলা ক্রাইস্টার বিল্ডিং। ইহা পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম দ্বিতীয় বাড়ী। রকফেলার কেন্দ্রের উচ্চতম ৭০ তলা আর, সি, এ বিল্ডিং উচ্চতম তৃতীয়। দক্ষিণে ৬০ তলা-বিশিষ্ট উল-ওয়ার্থ বিল্ডিং। ৫০ তলা, ৬০ তলা বাড়ীর অভাব নাই। সমস্ত শহরটি ছাদের উপর হইতে চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠে। দক্ষিণে স্বাধীনতার মূর্তি পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। পূর্বে ও পশ্চিমে নদী। নদীতে ইতস্ততঃ ভাসমান জাহাজসমূহ। নদীর উপর সেতুসমূহ দৃশ্যমান। হাডসনের ওপারে নিউ জার্সি শহর। দূরে ক্যাটসকিল পর্বতমালা। ইষ্ট নদীর ওপারে জেকলিন্। বহু দূরে লাগার্ডিয়া এরোড্রোম। দূরে হাডসনের উপরিস্থিত জর্জ ওয়াশিংটন সেতু। উত্তরে কেন্দ্রীয় পার্ক সম্পূর্ণ দেখা যাইতেছে। ওয়ালডorf এষ্টোরিয়া হোটেল বেশীদূর নয়। আমার হোটেলটিও দেখা যাইতেছিল। রাস্তায় প্রবহমান নদীর মত জনজোত ও শকটশ্রেণী। গাড়ীগুলি চলিতে চলিতে ইষ্ট নদীর টানেলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। সমস্ত মিলিয়া এক অভুলনীয় দৃশ্য।

বিকালে রকফেলার-কেন্দ্রে গেলাম। দর্শনার্থীদের এক একটি দল লইয়া এক একটি গাইড সমস্ত কেন্দ্রটি দেখাইতেছে। কয়েক মিনিট পর পরই এক একজন গাইড এক একটি দল লইয়া রওনা হইতেছে।

উক্ত কেন্দ্রটি ১৪টি আকাশচুম্বী সৌধের সমষ্টি; ৫ম ও ৬ষ্ঠ এভিনিউর মধ্যে ৪৮তম স্ট্রিট হইতে ৫১তম স্ট্রিট পর্যন্ত বিস্তৃত। বাড়ীগুলির উচ্চতা সমান নয়। উচ্চতম বাড়ীটি ৭০ তলা। বহু দোকান, আপিস, থিয়েটার প্রভৃতি এই গৃহসমষ্টির মধ্যে অবস্থিত। ৩০,০০০ কর্মচারী প্রত্যাহ এই বাড়ীটিতে কাজ করিতে আসে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় ও ছুটির সময় এই ত্রিশ হাজার লোককে উঠানো ও নামানো লিফটগুলির একটি বিরাট কার্য। প্রত্যাহ নানাবিধ কার্যোপলক্ষে এই বাড়ীতে কয়েক লক্ষ লোক প্রবেশ করে। এত বড় অঞ্চলের কেন্দ্রীয় তাপ-ব্যবস্থা ও সুডৃঢ়পথশ্রেণী বিষয়কর বস্তু। বস্তুতঃ ইহা একটি স্বতন্ত্র নগরবিশেষ।

বাড়ীগুলির মধ্যে বহু হোটেল ও আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত আছে। একস্থানে হেলেমেয়েরা স্কেট করিতেছে। দেখিতে বেশ লাগিল। পৃথিবীর বৃহত্তম রত্নমঞ্চ ইহারই একটি বাড়ীর মধ্যে অবস্থিত। এখানে ৬,২০০ লোকের বসিবার আসন বিজ্ঞমান। একটি বাড়ীর নাম আন্তর্জাতিক বাড়ী। ইহাতে ইংরেজ, ফরাসী, ইটালী, ভারতীয় প্রভৃতি বহু জাতির কন্সালগণের আপিস। একটি বাড়ীতে রেডিওতে নানা অমুষ্ঠান চলিতেছে। ছোট হেলেমেয়েদের একটি গীতাভিনয় আমাদের সমক্ষে প্রচারিত হইল। এখানে টেলিভিশন দেখিতে পাইলাম। আমাদেরই মধ্যে কেহ কেহ দূরের একটি ঘরে গিয়া কিছু আয়ত্তি করিলেন বা অল্প কথা-বার্তা বলিলেন। এ ঘরে যন্ত্রের উপরে তাঁহাদের চেহারা ও অঙ্গসঞ্চালন ভাসিয়া উঠিল। আমরা তাঁহাদিগকে পরিষ্কার দেখিলাম ও তাঁহাদের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনিলাম। ইহার কয়েকদিন পরে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সর্বপ্রথম তাঁহার “সাদা বাড়ী”তে বসিয়া টেলিভিশন যোগে কংগ্রেসের অধিবেশন দেখিলেন ও বক্তৃতা শুনিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশন টেলিভিশন যোগে সাধারণে প্রচার করা সম্ভব কিনা এ সম্বন্ধে তখন খবরের কাগজে আলোচনা চলিল। এক পক্ষ ইহার বিরোধিতা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, “কংগ্রেসের অধিবেশনকালে সভ্যগণের আচরণ প্রত্যক্ষ করিলে কংগ্রেসের উপর এবং কংগ্রেসের পাস করা আইনের উপর সর্বসাধারণের অশ্রদ্ধা আসিবে।”

ঐ দিন রাত্রে নিউইয়র্কস্থ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমিতির বাড়ীতে গিয়া সমিতির অধ্যক্ষ অধিলানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করি। ১৭নং পূর্ব-৯৪তম স্ট্রিটে সমিতির নিজস্ব বাড়ী। স্বামীজীর সহিত আলাপ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম।



এবং পরদিন সকালের প্রার্থনা-সভায় এবং মধ্যাহ্ন-ভোজনে উপস্থিত হইবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া হোটেলে ফিরিলাম। স্বামীজীর নিকট সংবাদ পাইলাম যে মহলানবিশ-গৃহিণী নিউ জার্সিতে ডাক্তার স্কাট নামক এক প্রসিদ্ধ সংখ্যাতত্ত্ববিদের গৃহে অতিথি রূপে অবস্থান করিতেছেন।

রবিবার সকালে নিউ জার্সিতে টেলিফোন করিয়া জানিলাম যে মহলানবিশ-গৃহিণী নিউ ইয়র্কে এক ভারতীয় ভ্রম-লোকের ফ্ল্যাটে দুই দিন যাবৎ আছেন। সেখানে টেলিফোন করিতেই মহলানবিশ-গৃহিণী তৎক্ষণাৎ আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে প্রাতরাশে যোগ দিতে বলিলেন। ফ্ল্যাটটি দূরে ছিল না—অধিবাসী একজন যুক্তপ্রদেশীয় ভ্রমলোক। তাঁহার পত্নী মার্কিন-বংশে রূপ। মাত্র এক কক্ষের ফ্ল্যাট। অতিথিসেবা-পরায়ণা মহিলাটি স্বামীকে বহুগৃহে ঘুরাইতে পাঠাইয়া মহলানবিশ-গৃহিণীকে দ্বীয় কক্ষে অভ্যর্থনা করিয়া স্থান দিয়াছেন। আমি পৌছিবার একটু পরেই ভ্রমলোক স্বগৃহে ফিরিলেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার। অনেক দিন এদেশে আছেন। তাঁহার মার্কিন গৃহিণী স্বহস্তে প্রাতরাশ প্রস্তুত ও পরিবেশন করিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। প্রাতরাশের টেবিলে একটি বাটিতে পাইন বৃক্ষের কতকগুলি কাঁচা পাতা জ্বলাইয়া দিলেন। এই অভিনব গন্ধে আমোদিত বোধ করিলাম। মহিলাটি বলিলেন, “এ গন্ধটা আমি খুব ভালবাসি।” কালিদাসের সরল বৃক্ষ পরিস্রুত ক্ষীর সৌরভে সুরভিত বায়ুর বর্ণনা মনে পড়িল।

পীতাম্বর পঙ্কে খবর দিয়া ওখানে ডাকিয়া আনা হইল। তাঁহাকে বৈকালে আমার হোটেলে আসিতে বলিয়া একটি ট্যাক্সি লইয়া দ্রুত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সমিতির বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তখন স্বামীজীর বক্তৃতা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। বাড়ীটির নীচের তলায় বড় হলধরের প্রান্তে দাঁড়াইয়া স্বামীজী বক্তৃতা করিতেছেন। পরিধানে গেরুয়া বস্ত্র। মাথায় গেরুয়া পাগড়ী। প্রায় দুই শত মার্কিন নরনারী একাধিগুণে বক্তৃতা শুনিতোছে। বক্তৃতার বিষয়—প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ। বক্তৃতান্তে শ্রোতাগণ কিছুকিছু দান করিয়া উঠিয়া গেলেন।

আশ্রমে একটি বাঙালী যুবক ও একটি মার্কিন যুবক বাস করে। উভয়েই ছাত্র। মার্কিন যুবকটি সন্ধ্যায় গ্রহণ পূর্বক ভারতবর্ষেই জীবন কাটাঁইবে সঙ্কল্প করিয়াছে। স্বামীজী বলিয়াছেন যে, যদি ভারতবর্ষেই থাকিবে তবে যাতে সে দেশবাসীর কাছে লাগিতে পার একরূপ কিছু শিখিয়া যাও। তিনি যুবকটিকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়াছেন।

যুবকটি ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণ মিশনের ডাক্তারী বিভাগের ভার লইতে পারিবে। সে বিনয়ী, অল্পভাষী ও কত ব্যপরাগণ। বাঙালী যুবকটিও অল্পবয়সী ও গুণসম্পন্ন। একটি বৃদ্ধা মার্কিন

প্রতিবেশিনী আশ্রমের খুব ভক্ত। আশ্রমের অনেক কাজকর্ম করেন। আমাকে বলিলেন, “আমার একবার ভারতবর্ষে যাইবার ইচ্ছা আছে। তোমরা আমাকে গ্রহণ করিবে ত?”

আমি—“ভারতবর্ষ সকলকেই গ্রহণ করিয়াছে। কাহাকেও সে প্রত্যাখ্যান করে না।”

মহিলাটি (লজ্জিতভাবে)—“হাঁ, এ বিষয়ে তোমাদের উদারতা সুবিদিত। হয়তো এ উদারতা আর একটু কম হইলেই তোমাদের সুবিধা হইত।” একটি নবাগত গুজরাটি যুবকের সহিত এখানে আলাপ হইল। তিনি টাটা কোম্পানীর অভিজ্ঞ কর্মচারী। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমেরিকা দর্শনে আসিয়াছেন। বলিলেন, “সঙ্গে আমার স্ত্রী আসিয়াছেন। কিন্তু আবাসস্থলের অভাবে বড়ই বিপন্ন বোধ করিতেছি।”

স্বামীজী বলিলেন—“বাসস্থান এখানে খুবই দুর্লভ। তারপর এখানে আদিম অধিবাসীদের অনেকে বাসা দিতে চায় না। আপনাকে যদি আদিম অধিবাসী বলিয়া ধরিয়া লয় তবে আরও মুশকিল। আপনার স্ত্রী যখন সঙ্গে আছেন তখন এ অসুবিধা নাও হইতে পারে। কারণ শাণ্ডীপরিহিতা স্ত্রীলোক দেখিলে বিদেশী বলিয়া বুঝিতে পারিবে এবং বিদেশীর সঙ্গে এরা ভাল ব্যবহারই করে।”

বিভা মুখুজ্জে নামে একটি মেয়ে এদেশে এম্‌স্‌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নিউট্রিশন পড়িতেছে। দুই দিনের ছুটিতে আশ্রমে বেড়াইতে আসিয়াছে। আশ্রমে মেয়েদের থাকিবার বিধি বা বন্দোবস্ত নাই। কাজেই মেয়েটি বৃদ্ধা মার্কিন প্রতিবেশিনীর বাড়ীতে আছে। মেয়েটি দক্ষিণ কলিকাতার অধিবাসিনী। আমাকে চিনিতে পারিল। সেদিন সে-ই ভাল ভাত, কপির ভালনা রান্না করিল। বহুদিন পর আশ্রমের প্রসাদ পাইয়া পরিতুষ্ট হইলাম।

এ দিন মধ্যাহ্ন-ভোজনে স্বামীজী, আশ্রমবাসী বাঙালী ও মার্কিন যুবকদ্বয়, বৃদ্ধা মার্কিন প্রতিবেশিনী, বিভা মুখুজ্জে ও আমি ভিন্ন আরও দুই জন আগন্তুক ভ্রমলোক উপস্থিত ছিলেন। এক জন মাদ্রাজী ও অল্প জন হিন্দুস্থানী। মাদ্রাজী ভ্রমলোক হায়দরাবাদ রাজ্যের ব্রডকাষ্টিং ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষ। হিন্দুস্থানী যুবকটি ছাত্র। ভোজনান্তে নানা বিষয়ে আলাপ চলিল। প্রসঙ্গত স্বামীজী বলিলেন, “আমি অনেক সময় বলিয়া থাকি যে আমাদের বিবেকানন্দ আমেরিকারই দান। ভারতবর্ষে ত কেহ তাঁহাকে চেনে নাই। যখন আমেরিকা তাঁহাকে চিনিла তখনই ত ভারতবর্ষ তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া বরণ করিয়া লইল।” সকলের সঙ্গে সদালাপে পরিতুষ্ট হইয়া, স্বামীজীর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইয়া হোটেলে ফিরিলাম।

বৈকালে পহু আমার হোটেলে উপস্থিত হইলেন। পহু উচ্চ আদর্শবাদী যুবক। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃত্তী

ছাত্র ও পরে অধ্যাপকরূপে সুনাম অর্জন করিয়াছেন। ১৯৪২ সনের আগষ্ট-আন্দোলনে জেলও খাটিয়াছেন।

কংগ্রেসের বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময় জবাবরলাল নেহরুর সেক্রেটারী রূপে বহু ঘুরিয়াছেন, পরে কলিকাতায় ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে গবেষণা করিবার জ্ঞান যোগদান করেন। সম্রাতি অধ্যাপক মহলানবিশের সঙ্গে এদেশে আসিয়াছেন। অধ্যাপক দেশে গিয়াছেন; অল্পদিন পরেই ফিরিবেন। তাঁহার কাক্সের ভার ইহার উপর তুল্য করিয়া গিয়াছেন। পছন্দ একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, এখানে যে ধরণের হোটেলের আছি তাহাতে খরচ বড় বেশী। ইহার অনেক কম খরচেও এদেশে থাকা চলে এবং সে টাকাটা আমি বোধ হয় চেষ্টা করিলে রোজগার করিয়া লইতে পারি। সরকারের উপর নির্ভরশীলতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে এখানে থাকিতে পারি কিনা তাহাই চিন্তা করিতেছি।”

পত্নীর সঙ্গে মধ্য-মানহাটনে অনেক ঘুরিলাম। সন্ধ্যার পর টাইম স্কোয়ারের দৃশ্য সত্যই অপূরণ্য। ব্রডওয়ের উভয় পার্শ্বে ৪২তম স্ট্রীট হইতে ৫২তম স্ট্রীট পর্যন্ত টাইম স্কোয়ার বিস্তৃত। অঞ্চলটি থিয়েটার, সিনেমা, নাচঘর, হোটেল, রেষ্টুরেন্ট প্রভৃতিতে পূর্ণ। আলোক-সজ্জা পল্লবময় উজ্জ্বলতায় দিবালোককেও হার মানাইয়াছে। রঙের খেলায় মনে হয় যেন সহস্র রামধনুর উদয় হইয়াছে। আলোকমালার নানা ভঙ্গীর গতিশীলতা এবং পালা করিয়া জলা-নেবার খেলায় এক অপূর্ব মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। মন হয়, ইহার তুলনা নাই।

একটি সিংহল-ভারতীয় রেষ্টুরেন্টে ভারতীয়-খাদ্যে নৈশ-ভোজন সমাপন করিয়া ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের দিকে চলিলাম।

প্রকাণ্ড উঁচু বাড়ী। ভিতরে হকি প্রভৃতি সর্বপ্রকার খেলা হয়। ১৯০০০ দর্শকের বসিবার ব্যবস্থা আছে। গৃহাভ্যন্তরে এত বড় ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। সুনীলাম ভিতরে হকি খেলা চলিতেছে। লাইনে দাঁড়াইয়া টিকিট কিনিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। দোতলার ছাতে খেলার মাঠ। উপরে চারিদিকে ঘুরানো গ্যালারী। লোকে পরিপূর্ণ। ফিরিওয়ালা আইসক্রীম, বাদাম প্রভৃতি হাঁকিয়া বেড়াইতেছে। উজ্জল আলোক দ্বারা ঘরটিকে দিবালোকের মতই আলোকিত করা হইয়াছে। খেলার মাঠটি বরফে প্রস্তুত। স্কেটের মাঠের মত। খেলোয়াড়গণ স্কেট পায়ে বাঁধিয়া বরফের উপর বেলিতেছে। স্কেট পায়ে হকি-শব্দ হাতে বল লইয়া ছুটিছুটি করার দৃশ্য আমার নিকট শুধু অপূর্ব নয়, অদ্ভুত লাগিতেছে। এ খেলায় পরিশ্রম অত্যধিক। সর্বদা স্কেটের উপর দেহের ভার-সাম্য রক্ষা করিয়া স্কেট ঠেলিয়া বলের পিছনে ছুটার অত্যধিক পরিশ্রম হয়। রেঞ্জার্স দল ও শিকাগো দলে খেলা

হইতেছে। ৬ জনে এক এক পক্ষ। রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিট হইতে সাড়ে দশটা পর্যন্ত খেলা চলিল। ২০ মিনিটের পর ৫ মিনিট বিশ্রাম। এইরূপ তিন বারে মোট ১ ঘণ্টা খেলা হইল। প্রত্যেক দলের রিজার্ভ খেলোয়াড়গণ পাশেই লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া। যে কোন খেলোয়াড় ক্রান্তি বোধ করিলে সেইখানে আসিয়া দাঁড়ায় এবং অপর এক জন তাহার জায়গায় নামিয়া পড়ে। এইরূপে যতবার ইচ্ছা বদলী দিয়া বিশ্রাম লওয়া যায়। এই খেলায় রেঞ্জার্স দল ৯-০ গোলে জিতিল। প্রত্যেক বিশ্রামের সময় মাঠের আলগা বরফ চাছিয়া ফেলিয়া জল ছিটাইয়া এই জলকে জমাইয়া দিয়া পুনরায় শক্ত ও মসৃণ করিয়া দেওয়া হয়। এই মাঠেই বক্সিং বাক্সেটবল প্রভৃতি খেলাও হয়। যন্ত্র-সাহায্যে মাঠটিকে ইচ্ছামত ছোট বড় করা চলে এবং গ্যালারীগুলিকেও আগাইয়া বা পিছাইয়া লওয়া যায়। প্রয়োজনমত বরফ দিয়া মাঠ ঢাকিয়া দেওয়া হয় বা বরফ গলাইয়া ফেলা হয়।

নিউ ইয়র্কের সুড়ঙ্গ-রেলপথ লওনের সুড়ঙ্গ-রেলপথের মত সুদৃশ্য নয়। লওনে লাইনের হৃদিস ও মানচিত্রগুলি বিদেশীর পরম সহায়ক বলিয়া মনে হয়। এখানে সেরূপ হৃদিস ও মাপ নাই বলিলেই হয়। তবে লওন অপেক্ষা শ্রমসংক্ষেপমূলক যান্ত্রিক ব্যবস্থা নিউ ইয়র্কে অনেক বেশী। এখানে ভাড়ার কোন ভারতম্য নাই। একবার উঠিলে পাঁচসেন্ট ভাড়া—তা তুমি যত দূরই যাও না কেন। টিকিট কেনা-বেচার রীতি নাই। স্টেশনে কোম্পানীর কোন টিকিট-ঘর, টিকিট বিক্রেতা বা টিকিট সংগ্রাহক নাই। একটি বাক্সের মধ্যে একটি মাত্র লোক কতকগুলি পাঁচ সেন্ট মুদ্রা লইয়া বসিয়া থাকে। যাত্রী-গণ ইহার নিকট অল্প মুদ্রার পরিবর্তে পাঁচ সেন্ট মুদ্রা পাইতে পারে। স্টেশনের প্রবেশপথ যন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একটি পাঁচ সেন্ট মুদ্রা নির্দিষ্ট ছিদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিলে প্রবেশপথটি খুলিয়া যায় এবং একজন মাত্র লোক প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়। স্টেশন হইতে বাহিরে যাইবার পথ আলাদা। সেখানে পয়সা লাগে না। এইরূপে অনেক কম কর্মচারীর দ্বারা, বিনা টিকিটে রেলপথটিতে লোকজন ও যানবাহন চলাচল করিতেছে। রেলের কোন কর্মচারীর সঙ্গে যাত্রীদের দেখাই হয় না। ভাড়াও খুব সস্তা, মাত্র পাঁচ সেন্ট বা দশ পয়সায় বহু দূর যাওয়া যায়।

নানা স্থানে ঘুরিয়া খেলা দেখিয়া সুড়ঙ্গ-পথে পছন্দ ও আমি স্ব-স্ব আবাসে ফিরিলাম।

৬ই জানুয়ারী সোমবার। সকালে ট্যাক্সিযোগে সিটি আপিসের দিকে চলিলাম। এ ট্যাক্সিওয়ালারও আলাপ শুরু করিল। সে যাহা বলিল তাহার মর্ম এইরূপ : “তোমাদের দেশ ঐশ্বর্যের দেশ। পৃথিবীর যত সোনা, রূপা, মণি, মুক্তা তোমাদের দেশ হইতে আসে। অথচ তোমরা নিজেরা

নিজেরা এত মারামারি কর কেন? ইংরেজ তোমাদের শাসক। তাহারা কি করে? আমরা দেখ টম্যানকে প্রেসিডেন্ট করিয়াছি। তাঁহাকে সেলাম করিতেছি। কিন্তু যদি তিনি তাঁহার কতব্য পালন না করেন তবে তাঁহাকে গদি হইতে টানিয়া নামাইব। তোমরা সেরূপ কর না কেন? আচ্ছা; তোমরা আমাদের গবর্ণমেন্টের নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত কর না কেন? ইংরেজ আমাদের কাছে অনেক টাকা ধারে। আমাদের গবর্ণমেন্টের কথা না শুনিয়া পারিবে না।”

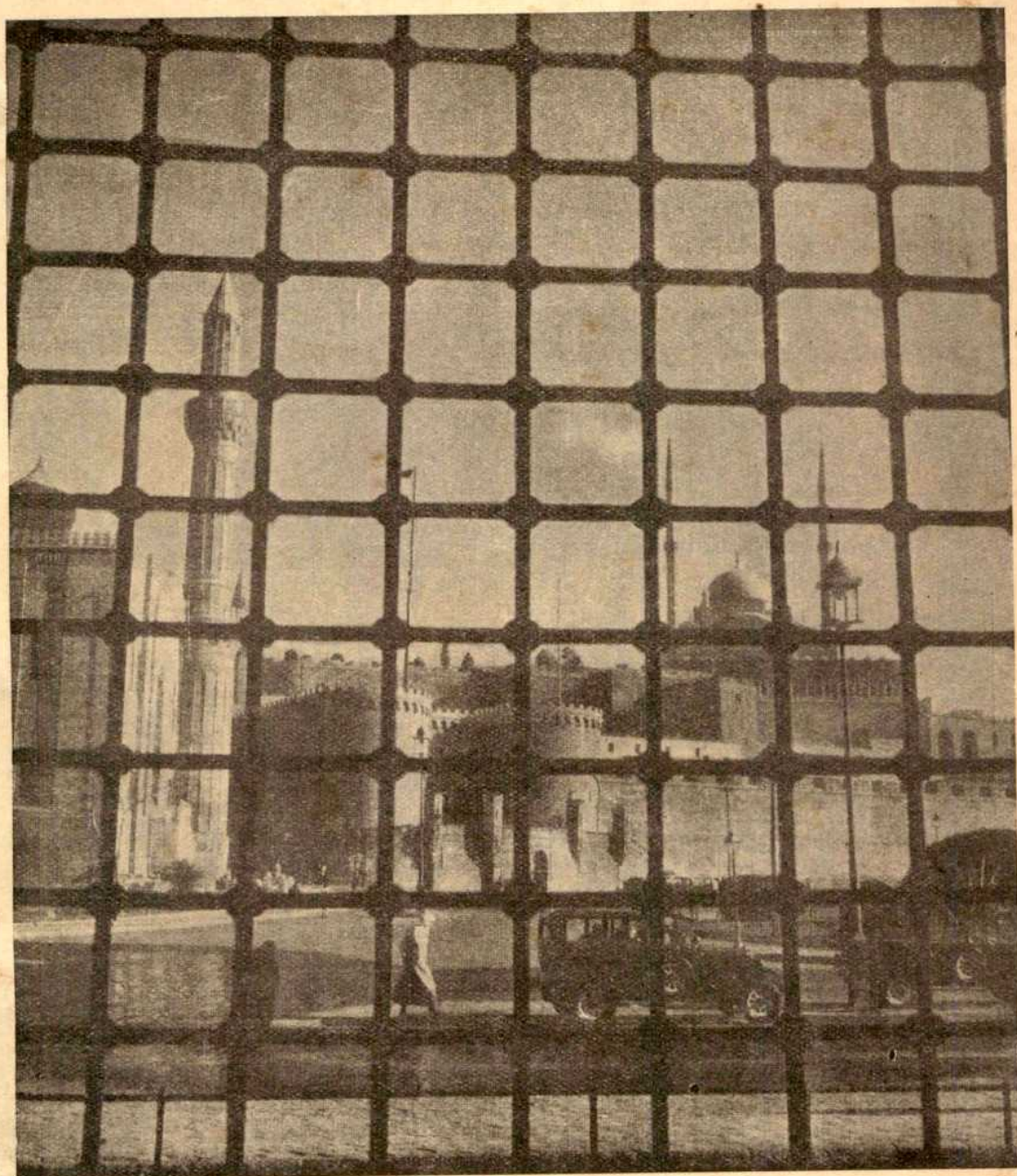
এ দিন নগরীর প্রথম ডেপুটি কন্ট্রোলার সিড্‌নি স্‌গার-ম্যানের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি ট্যাক্স কৌশলি মিল্টন স্যাণ্ডবার্গের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়া বলিলেন, “ইনি জাপানে যিমাশিটা বিচারে আসামী পক্ষের কৌশলি ছিলেন।” ইহার সঙ্গে নিউ ইয়র্কের বিক্রয়-কর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইল। নদীর ওপারে নিউ জার্সি শহরে বিক্রয়-কর নাই। কাছেই নিউ ইয়র্কের বিক্রয়-করের হার যতক্ষণ খুব বেশী না হয় ততক্ষণ কেহ সামান্য জিনিস কিনিবার জন্ত কষ্ট করিয়া নদী পার হইয়া ওপারে যায় না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলাপের পর যিমাশিটার বিচারের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। স্যাণ্ডবার্গ বলিলেন, “যিমাশিটা বিচারে দুইমুখা বিচারগুলির ছায় আন্তর্জাতিক আইনের প্রায় উঠে নাই। সাধারণ অপরাধ-ঘটত আইনের উপরই ইহা চলিয়াছিল। যিমাশিটার সৈন্ত-গণ লোকের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে, রমণীর উপর অত্যাচার করিয়াছে—এই সমস্ত বিষয়েই সাক্ষ্য উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। এই সমস্ত কাজ যে যিমাশিটার আঁজায় হইয়াছিল তাহারও কোন প্রমাণ ছিল না। আমি এইরূপ তর্ক করিয়াছিলাম যে এই সমস্ত সাক্ষ্য হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই সমীচীন যে যিমাশিটা তাহার সৈন্ত-বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় যিমাশিটার সৈন্তবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব স্পষ্ট করিবার জন্ত মার্কিন সরকার তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যখন তাহাদের এই প্রচেষ্টা সফল হইল এবং তাহাদের ঈশ্বিত বিশৃঙ্খলা ও আইন না মানার প্রবণতা দেখা দিল তখন সেই বিশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাবকে যিমাশিটার অপরাধ বলিয়া বর্ণনা করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। আমার এই তর্ক বিচারকগণের মধ্যে অন্ততঃ একজন সমর্থন করিয়াছিলেন।”

এই জাহাজারী মঙ্গলবার এখানকার বয়স্কাউটের সদর আপিসে যাই। আমার পরম মুহূর্ত, উৎসাহের প্রতিমূর্তি ক্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ বঙ্গীয় বয়স্কাউট সঙ্ঘের প্রাদেশিক কমিশনার। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বয়স্কাউট সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষের সহিত বঙ্গীয় সঙ্ঘের সংযোগ স্থাপন

মানসে বঙ্গীয় সঙ্ঘের প্রতিনিধিরূপে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি লওনে আন্তর্জাতিক স্কাউট সঙ্ঘের সভাপতি কর্ণেল উইলসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি কলিকাতার স্কাউট-সঙ্ঘের অগ্রতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ঘোষ মহাশয়ের গুরু। আমার নিকট কলিকাতার এবং বিশেষতঃ ঘোষ মহাশয়ের কথা শুনিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন। আগামী জাম্বুরীতে ঘোষ মহাশয়ের যোগ দিবার সম্ভাবনা আছে শুনিয়া তিনি খুবই উৎফুল্ল হইলেন। মার্কিন স্কাউটের ডাক্তার রে ও ওয়াইল্যান্ডের নিকট তিনি আমাকে একটি পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। সেইট লইয়াই এখানে আসিয়াছিলাম। সেদিন ওয়াইল্যান্ড মহাশয় অনুপস্থিত ছিলেন। তাহার সহকারী টমচীন্‌ পরম যত্নে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। দেখিলাম কর্ণেল উইলসনের উপর ইহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা। চীন্‌ মহাশয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হইল। ইনি বলিলেন, “আমেরিকার হাতে আজ বিশ্বনেতৃত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই নেতৃত্ব করিবার উপযুক্ত শিক্ষা তাহার নাই। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের বহু দিনের শিক্ষা। কিন্তু তাহার হাত থেকে আজ বিশ্বনেতৃত্ব চলিয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে আমেরিকার শিক্ষা লইতেই হইবে।” আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্বন্ধে বলিলেন, “ট্যাক্ট যদি দাঁড়ান এবং নির্বাচিত হন তবে সব চেয়ে ভাল হয়। ইহার পিতা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ইনি নানা সদৃশ্যে ভূষিত। বর্তমান বিশ্বে আমেরিকার নেতৃত্ব করিবার পক্ষে ইনি যোগ্যতম ব্যক্তি।” দেখিলাম দেশের বালকদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালী হিসাবে স্কাউটের উপর ইহাদের অগাধ বিশ্বাস।

চীন্‌ মহাশয় আমাকে হাউয়ার্ড আর. প্যাটনের নিকট পৌছাইয়া দিলেন। ইনি বিশ্ব-বন্ধুত্ব তহবিলের ডিরেক্টর। তাহার সহায় ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইলাম। এক এক করিয়া সমস্ত পদস্থ কর্মচারীর সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিলেন। ইহাদের কাছ্যাবলী সম্বন্ধে আমাকে বলিলেন। আপিসের যাবতীয় বিভাগ আমাকে দেখাইলেন। ইহাদের প্রতিষ্ঠানটি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। লওনে কর্ণেল উইলসনের আপিসে দেখিয়াছি তিনি নিজে একটি সেক্রেটারী লইয়া কাজ করেন। আপিসে দেখিতেছি ৬০০ কর্মচারী। যন্ত্রের ব্যবহারও যথেষ্ট। সমগ্র আমেরিকার স্কাউট-সঙ্ঘগুলি বৎসরে ৮০ লক্ষ ডলার ব্যয় করে। তন্মধ্যে এই আপিসের মারফত খরচ হয় ১৫ লক্ষ ডলার। এ দেশে ২০ লক্ষ স্কাউট আছে। এ দেশে যত লোক যুদ্ধে গিয়াছিল তাহার শতকরা ২৫ জন স্কাউট। এই শতকরা ২৫ জন পুরস্কার ও সম্মানাদির শতকরা ৪০ ভাগ লাভ করিয়াছিল। স্কাউট-সঙ্ঘ তাহাদের এই বিশিষ্টতায় বিশেষ গৌরব বোধ করে।

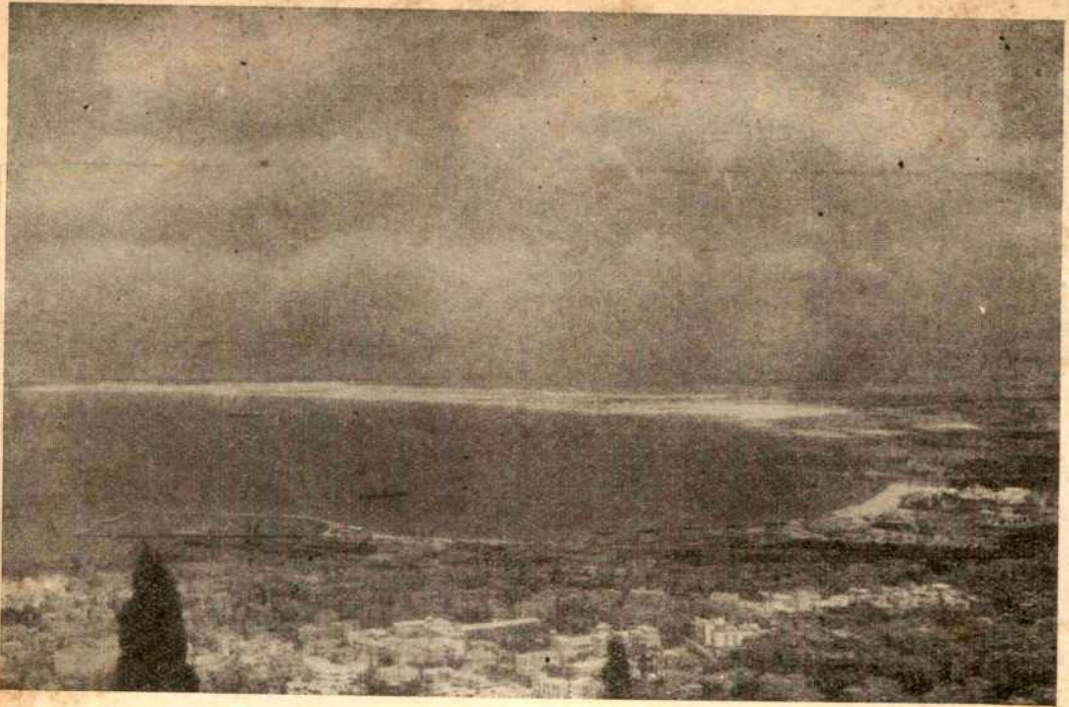
## ইন্দো-আরব সংঘর্ষ



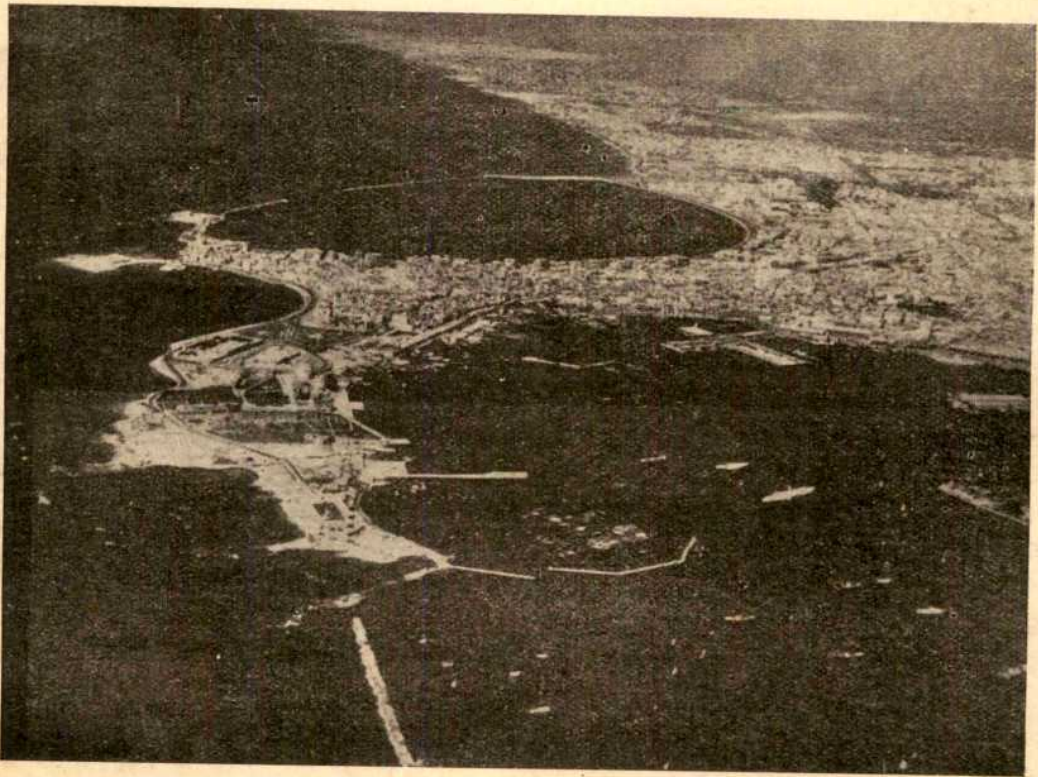
কায়রে। দুর্গ

এইখানে আরবদিগের পক্ষ হইতে যুদ্ধবিবর্তির সূচনা করা হয়





প্যালেষ্টাইনের হাইফা বন্দর । ইহা আরব ইহুদী উভয় পক্ষের কামা



মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরী ও বন্দর । ইহাই আরবদিগের অত্যন্তম অভিযান-কেন্দ্র



প্যাটন মহাশয় তাহাদের প্রচারিত পুস্তকাবলী কলিকাতার স্কাউট-সজ্জের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে প্রতিক্ষিত হইলেন। পরে শুনিয়াছিলাম যে তাঁহারা এত পুস্তক পাঠাইয়াছেন ও পাঠাইতেছেন যে কলিকাতার স্কাউট আপিসের কণ্ঠধারগণের পক্ষে তা ছিল সম্পূর্ণ অভাবনীয়।

প্যাটন মহাশয় বলিলেন, “সকল জাতির প্রতিনিধির সহিতই আমার সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু যে কয়েকটি জাতির বুদ্ধিমত্তা আমাকে চমৎকৃত করিয়াছে ভারতবর্ষ তাহাদের অগ্রতম। গ্রীস, চীন এবং কোরিয়ার লোকেরাও অল্পরূপে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন।

প্যাটন মহাশয় আমাকে পরদিন একটি প্রাতরাশের অল্পমানে নিমন্ত্রণ করিলেন। বলিলেন, “বহু জাতির প্রতিনিধি এই প্রাতরাশে উপস্থিত থাকিবেন। ভারতবর্ষের কেহই নাই। আপনি আসিয়া পড়িয়াছেন ভালই হইয়াছে। আপনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।” পরদিন প্রাতরাশের পূর্বেই আমাকে অটোমোবাইল রওনা হইতে হইবে। কাজেই দুঃখের সহিত নিমন্ত্রণটি প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলাম।

স্বদেশী যুগের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ভারকনাথ দাস মহাশয়ের দর্শনলাভেচ্ছায় তাহার নিকট টেলিফোনে একটু সময় চাহিয়া লইয়াছিলাম। তদনুসারে নৈশ ভোজনান্তে রাত্রি আটটায় তাহার হোটেলে উপস্থিত হইলাম। ব্রডওয়ে এবং ৭৩তম স্ট্রিটের সংযোগস্থলে ‘হোটেল এনসোনিয়ার’ ১৫৯২ নম্বর ঘরে অর্থাৎ ১৬ তলার ৯২ নং ঘরে তিনি সস্ত্রীক বাস করিতেছেন। শুভকেশ উজ্জল-চক্ষু-বুদ্ধ আমাকে দেখিয়াই ‘বন্দেমাতরম’ শব্দে অভিযান জ্ঞাপন করিলেন। তদীয় গৃহিণীকে আরও বেশী বুদ্ধি দেখাইতেছিল। ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী লইয়া আলাপ হইল। দেখিলাম দাস মহাশয় বহু বিষয়ে অধুনাতম সংবাদসমূহ ত্রীতিমত সংগ্রহ করেন। যাদবপুর কলেজ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। স্থানীয় কতৃপক্ষের একটি চিঠিতে কলেজের অনেকগুলি সমস্যার কথা উত্থাপন করা হইয়াছে। সেগুলি উল্লেখ করিলেন। আমাদের দেশে সরকারী সাহায্য সরকারী হস্তক্ষেপের অভূতাব্য হইয়া দাঁড়ায়। সে হস্তক্ষেপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নতির জন্ত না করিয়া বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির জন্ত করা হয়। এরূপ কেন হয়? তিনি অভিযোগ করিলেন, “আমাদের দেশের ধনী ব্যক্তিগণ শিক্ষার জন্ত দান করেন না কেন? সাধারণ উপার্জনক্ষম ব্যক্তিরাই বা তাহাদের আয়ের কিয়দংশ, অন্ততঃ একটি বা দুইটি ছাত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্ত দান করেন না কেন?”

আমি—আমাদের দেশে শিক্ষার জন্ত দানের অভাব আছে কি? শিক্ষার উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রবিধায়ী ঘোষ ও ভারকনাথ পালিতের বদান্ততার কথা তো সুবিদিত। পি.সি.রায় কি করিয়া গিয়াছেন? তাহার সমস্ত বেতন তো তিনি এই

জুই দিয়া গিয়াছেন? শিক্ষার্থীকে স্থান, আহাৰ প্রভৃতি দানে সাহায্য করায় কোন দিনই কি আমাদের দেশের লোক পরাশ্রয় ছিল?

দাস মহাশয়—কিন্তু এখন তো সেসময় দেখি না। এদেশের উচ্চশিক্ষা বেশীর ভাগই ব্যক্তিগত দানে। এই সেদিন জেনারেল মোটরের ম্যানেজার খুব বড় রকমের একটি দান করিলেন। তিনি বাল্যে সামান্য কারিগর রূপে ঐ কারখানায় কাজ শুরু করেন। আজ তিনি জেনারেল ম্যানেজার। তিনি বলেন, স্বাধীন ব্যক্তিগত উদ্যোগের দ্বারা ব্যক্তির প্রতিভা-সুশ্রবণের সম্পূর্ণ অবকাশ এদেশে আছে বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। উদ্যোগী পুরুষ-সিংহগণই দেশে দেশে লক্ষ্মীপ্রী আনিয়াছেন। তাই আজ পৃথিবীর এত উন্নতি। আটলান্টিকের ওপারে সংবাদ-প্রেরণ পূর্বে অসাধ্য ছিল। আজ তাহা সাধারণ লোকের সাধ্যায়ত্ত। কয়েকটি ডলার ব্যয়ে যে-কোন লোক ইহা পাঠাইতে পারেন। আজ আমেরিকার দীনতম লোক যে সুযোগ ও সুখ-সুবিধার অধিকারী, পূর্বে তাহা রাজারাজ্জারও অপ্রাপ্য ছিল। ইহা সমস্তই স্বাধীন ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফল। কাজেই তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগের ইকনমিক্স পড়াইবার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকপদ প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু টাকা দান করিতে যাইতেছেন।

আমি—ইহা প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ধনী আমেরিকার সঙ্গে দরিদ্র ভারতের তুলনা সাবধানে করা উচিত। ইহাও অস্বস্ত্য সত্য যে বর্তমানে ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে দানের উৎস যেন শুকাইয়া যাইতেছে। কেন এমন হইতেছে? শুধু দারিদ্র্যই ইহার কারণ নাও হইতে পারে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাও হয়তো ইহার জন্ত অনেকাংশে দায়ী। যে জন্ত দান করিলাম সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কিনা সে সন্দেহও হয়তো লোকের মনে আজ উঠিতেছে। সাম্প্রদায়িক বিষয়ে আজ দেশ জর্জরিত।

ভারতীয় সংবাদপত্রের কথা উঠিল। আনন্দবাজার প্রভৃতি বাংলা সংবাদপত্রের সৌষ্ঠব ও প্রচারের কথা শুনিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, এরা তো দেশের অনেক কাজ করিতে পারে। এখানকার ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস্’ তো একটি সাম্রাজ্যবিশেষ। বাংলাদেশের এক একটি বড় পত্রিকা দরিদ্র ছাত্রদের জন্ত প্রতি জেলায় একটি করিয়া বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিতে পারে। ইহাতে শিক্ষার উন্নতি হয়, খরচও বেশী নয়, পত্রিকারও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

ভারত বিভাগের কথা উঠিতে বুদ্ধগর্জন করিয়া উঠিলেন। তাহার চোখ জলিয়া উঠিল। সংক্ষেপে এবং দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, “যাহারা ধ্যান বা জ্ঞানে, জাগ্রতে বা স্বপ্নে ভারত-মাতার স্বাধীন মূর্তি একবারও দর্শন করিয়াছে তাহার কিছুতেই ভারত বিভাগের কথা চিন্তা করিতে পারিবে না।”

বুদ্ধ আমার সঙ্গে রাত্ৰা পর্যন্ত আসিয়া ‘বন্দেমাতরম্’ শব্দে আজ কত পরিবর্তিত, দূরে বসিয়া তাহা হয়তো ইঁহার বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া ঘরে ফিরিলেন। ভাবিলাম, অজ্ঞাত। আজ দেশে ফিরিলে অনশন-ক্লিষ্ট সাম্প্রদায়িক স্বপ্নের বিশ্বাস কি সরল ও দৃঢ়। ভারতমাতার যে হাতুমণ্ডিত বিষে জর্জরিত ভারত-মাতাকে ইনি চিনিতে পারিবেন অথও রূপ ইনি এখানে বসিয়া ধ্যান করেন তাহা যে কি?

## স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রভাষা

ক্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণে ভারত-মহাসাগরে অনেকগুলি ছোট-বড় দ্বীপ আছে। সমগ্রভাবে এ সকলের বর্তমান নতুন নাম ইন্দোনেশিয়া। দ্বীপগুলির মধ্যে সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, সেলিবিস বড় বড় দ্বীপ। ছোটগুলির মধ্যে বলী, মল্লুরা, তিমোর মলাক্কা, লঙ্কক আমাদের খুব পরিচিত। ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে এছাড়া আরও অনেকগুলি ছোট ও মাঝারি দ্বীপ পড়ে। দ্বীপগুলি পর্তুগীজ এবং একটি পর্তুগীজের অন্তর্গত। এককালে মালয় থেকে আরম্ভ করে অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত একটা বিরাট মালভূমি ছিল। কালক্রমে তার অনেক অংশ ভেঙেচুরে ভারতমহাসাগরে ডুবে গিয়েছে। যে যে অংশ এখনও উঁচু রয়েছে, সেইগুলিই এখন এক একটা দ্বীপে পরিণত হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে যারা বাস করে তারা মালয়ী-জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপের ভাষাও পুরাতন মালয়ী ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এ সমস্ত ভাষা মূলে এক হলেও এদের পরস্পরের মধ্যে এখন অনেক তফাৎ দাঁড়িয়ে গেছে। তা হলেও এক মালয়ী ভাষার সাহায্যে সমস্ত দ্বীপেই কাজকর্ম চালিয়ে নেওয়া যায়।

পূর্বকালে সমুদ্রপথে ঘুরে বেড়ান ছিল মালয়ীদের স্বভাব। তারা মালয় থেকে সমুদ্রপথে এসে এই দ্বীপগুলিতে বাস করতে আরম্ভ করে। তাদের মালয়ী ভাষাও সেই সঙ্গে এখানে আমদানি হয়।

যে মালয়ী ভাষা থেকে বর্তমান ইন্দোনেশীয় ভাষার উৎপত্তি হয়েছে তার শব্দকোষে অনেক সংস্কৃত, আরবী, ফারসী শব্দ আছে—কিছু তাদের পুরনো রূপে, আর কিছু বিকৃত হয়ে। এ ছাড়া আছে প্রচুর পর্তুগীজ, ইংরেজী ও ওলন্দাজ ভাষার শব্দ।

পুরাকালে আরব, ইরানী, ভারতীয় এবং চীনা ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় উপলক্ষে এখানে আসে। তারা এদের সঙ্গে আদান-প্রদান ব্যাপারে মালয়ী ভাষাই ব্যবহার করত। সে হিসাবে তৎকালে এখানে মালয়ী ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষার কাজ

করত। বাণিজ্যক্ষেত্রে ইউরোপীয়েরা এখানে আসে ষোড়শ শতাব্দীতে। তাদেরও কাজকর্ম চালাতে হ’ত মালয়ী ভাষায়। তাতে দ্বীপগুলিতে মালয়ী ভাষা আরও বিস্তৃতিলাভ করে।

ভাষা হিসাবে মালয়ী ভাষার রীতি ও প্রকৃতি খুবই সহজ, সরল। বীজধারা বা জটিল ব্যাকরণের খুঁটিনাটি এতে নাই। সেটা ভাষার অপূর্ণতা হলেও মোটামুটি খানিকটা শিখে নিয়ে তা দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া বিদেশীর পক্ষে কঠিন হ’ত না।

ইন্দোনেশিয়াবাসীর জাতীয়তাবোধও উদ্বীণ হয়েছে এই মালয়ী ভাষার ভিতর দিয়ে। পরে তারা জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির পথে এক দিন যেমন তাদের ‘নেদারল্যান্ড ইষ্ট ইন্ডিজ’ নাম পরিত্যাগ করে নতুন নাম নিলে ইন্দোনেশিয়া, তেমনি সেই সঙ্গে মালয়ী ভাষা ছেড়ে দিয়ে স্থানীয় এক কথ্য ভাষাকে তাদের জাতীয় ভাষা বলে গ্রহণ করলে এবং এই ভাষাকে তারা নানা রকমে সমৃদ্ধিশালী করতে লেগে গেল।

ইন্দোনেশীয় ভাষার সঙ্গে মালয়ী ভাষার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ—যেমন সংস্কৃতের সঙ্গে আমাদের বাংলায়। এর ব্যাকরণ মালয়ী ভাষার ব্যাকরণের আদর্শে রচিত হলেও অজানা ভাষা থেকে নতুন নতুন শব্দ গ্রহণ সম্বন্ধে এই ভাষা সম্পূর্ণ স্বাধীন, এর ব্যাকরণের বাধনও অনেক শিথিল।

মালয়ী ভাষা থেকে ইন্দোনেশীয় ভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করার পর হতে উক্ত ভাষার দ্রুত পরিবর্তন আরম্ভ হয়ে গেল—ধাপে ধাপে উন্নতিও হতে লাগল। ঊনবিংশ শতাব্দীর পর থেকে ইন্দোনেশীয়দের জাতীয় আন্দোলনের সব রকম প্রচারকার্য এই ভাষাতেই হতে লাগল।

১৯১৬ সালে হেগে ওলন্দাজ গবর্নমেন্টের এক ঔপনিবেশিক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে তামান্ শিশুওয়া স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কি হাজার দেওয়ান্ভারা উপস্থিত ছিলেন। ইন্দোনেশিয়ায় প্রচলিত মালয়ী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবহার পরিবর্তে ইন্দোনেশীয় ভাষায় শিক্ষাপ্রবর্তনের উপর তিনি খুব

জোর দেন। তাঁর সে প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয় নি। তিনিই প্রথম তাঁর স্কুলে ইন্দোনেশীয় ভাষাকে মুখ্য স্থান দেন। এর পর ১৯২৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার যুবসম্মেলন চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে যে, তারা এক জাতি এবং তাদের এক ভাষা। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপের বা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় ভাষা যাই হোক, ইন্দোনেশীয় ভাষা হবে তাদের জাতীয় ভাষা। সেই থেকে ইন্দোনেশিয়ার সকলেই তাদের যাবতীয় কাজ-কর্মে ইন্দোনেশীয় ভাষা ব্যবহার করে এবং এই ভাষাকেও তারা তাদের জাতীয় ভাষা বলে স্বীকার করে আসছে। নূতন শব্দও সেই থেকে ইন্দোনেশীয় ভাষার মধ্যে আরও বেশী আমদানি হচ্ছে। সে তার জননীস্বরূপ। মালয়ী ভাষা থেকে একেবারে আলাদা হয়ে বেড়ে উঠতে লাগল। আগেকার ইন্দোনেশীয় ভাষা, যা ছিল একটা প্রাদেশিক ভাষা, মাত্র কয়েক হাজার লোকের ভাষা, এখন তা হ'ল কয়েক কোটি লোকের জাতীয় ভাষা।

ওলন্দাজ সরকারের আমলে সরকারী তত্ত্বাবধানে ১৯০৮ সালে “বালাই পুস্তকা” নাম দিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সেখান থেকে যে সকল বই ছাপা হ'ত তা সমস্তই মালয়ী ভাষায়—পাঠ্যপুস্তক। এ হ'ল কেতাবী ভাষা—কথ্য ভাষা নয়। তা ছাড়া এই “বালাই পুস্তকা” থেকে রাজনীতি বা ধর্মসংক্রান্ত কোন বই ছাপা হতে পারত না—সরকারের নিষেধ ছিল। কবি এবং সাহিত্যিকদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁদের মালয়ী ভাষাতেই লিখতে হ'ত। তা না হলে তাঁদের লেখা “বালাই পুস্তকা” থেকে ছাপিয়ে বের করা যেত না। জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোনেশীয় ভাষায় স্বতন্ত্র ভাবে বই ছাপান আরম্ভ হ'ল—বিশেষ করে রাজনীতি ও ধর্মসংক্রান্ত বই। ১৯৩৩ সালে ইন্দোনেশীয় ভাষায় ইন্দোনেশীয়দের প্রথম মাসিকপত্র বেরল “পুজাংগা বারু”। চিন্তাশীল রাজনীতিক, প্রতিভাবান সাহিত্যিক, কবি, সকলেই এই মাসিকপত্রে ইন্দোনেশীয় ভাষায় লিখতে আরম্ভ করলেন। ভাষা আর একটা বড় ধাপে উন্নীত হ'ল।

সকল দেশেই যেমন রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বেধে থাকে, ইন্দোনেশিয়ায় ভাষার ব্যাপারেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এখানেও পুরাতনপন্থী মালয়ী ভক্তদের সঙ্গে নূতন দলের বিরোধ উপস্থিত হয়। ইন্দোনেশীয় ভাষাকে তাঁরা প্রাকৃতজনের ভাষা বলে অবজ্ঞা করতেন। মালয়ী ভাষাই ছিল তাঁদের কাছে আভিজাত্যের ভাষা। এঁরা শিক্ষকগোষ্ঠী—ইন্দোনেশীয় ভাষাকে প্রশ্রয় দেওয়া একেবারেই পছন্দ করেন নি। তাঁদের মতে কথ্য বলার ভাষা লিখবার ভাষার পর্যায়ে উঠবে সে ত স্বপ্নছাড়া অরাজক কাণ্ড। প্রথমটায় তাঁরা খুব বাধা দিলেন। তাতে কোন ফল হ'ল না। কারণ তরুণ দলের এই আন্দোলনের

লনের মূল ছিল তাদের স্বদেশপ্রেম। ইন্দোনেশীয় ভাষা হ'ল তাদের নিজের দেশের ভাষা—জাতীয় ভাষা।

বাধা দিয়ে কোন ফল হ'ল না দেখে, মালয়ীভক্তরা ইন্দোনেশীয় ভাষাকে উপেক্ষা করে চলতে লাগলেন। এই উপেক্ষা এবং অবজ্ঞার অবসরে তরুণেরা তাদের জাতীয় ভাষায় প্রয়োজনমত বিদেশী শব্দ গ্রহণ করে তাকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে লাগল। রাজনৈতিক প্রবন্ধ, প্রচারপত্র ইন্দোনেশীয় ভাষায় লেখা হতে লাগল, সভাসমিতিতে ইন্দোনেশীয় ভাষার ব্যবহার হতে লাগল এবং উপহাসও প্রকাশিত হ'ল এই ভাষায়।

১৯৪২ সালে গত মহাযুদ্ধে ওলন্দাজেরা জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করার ফলে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলি জাপানীদের হাতে গিয়ে পড়ল। ঐ সকল দ্বীপের উপর থেকে ওলন্দাজ আধিপত্য অন্তর্হিত হবার সঙ্গে সঙ্গে, ভাষার অগ্রগতির পথে তারা যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে আসছিল তাও লোপ পেল। উক্ত দ্বীপসমূহ অধিকার করে তাদের শাসন-কার্য চালাতে জাপানীদের ইন্দোনেশীয় ভাষা গ্রহণ করতে হ'ল। স্থানীয় লোকদের জাপানীভাষা শিখিয়ে নিয়ে তার পর কবীপের কাজকর্ম চালালো। সম্ভবপর ছিল না। কাজেই তারা ইন্দোনেশীয় ভাষাকে সরকারী ভাষা বলে স্বীকার করে নিলে এবং সরকারী স্কুল কলেজে ঐ ভাষা শেখাবার বন্দোবস্ত করলে। ওলন্দাজ ও ইংরেজী ভাষার ব্যবহার জাপানীরা দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করলে। অবশ্য ভিতরে ভিতরে জাপানীদের মতলব ছিল, যত দিন কিছু পরিমাণ স্থানীয় লোক কাজকর্ম চালাবার মত জাপানী না শিখছে তত দিন ঐ ভাষাই চলুক, তার পর ক্রমে ইন্দোনেশীয় ভাষাকে বিদায় করে দেওয়া যাবে।

নবীন ইন্দোনেশীয়গণ এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলে—তারা ভাষার আরও উন্নতি করে নিলে। তারপর জাপানীরা যুদ্ধে হেরে দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে গেলে তথাকার লোকেরা এবং তাদের ভাষা স্বাধীন জাতি ও স্বাধীন জাতির ভাষার মর্যাদা লাভ করলে। এটা আনুষ্ঠানিক ভাবে হয় ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগষ্ট। ঐ তারিখে ইন্দোনেশীয়েরা নিজেদের স্বাধীন জাতি বলে ঘোষণা করে।

ইন্দোনেশীয় ভাষা সাধারণতঃ রোমান অক্ষরে লেখা হয়, আরবী অক্ষরেও হয় যদিও খুব কম। নীচে ইন্দোনেশীয়দের জাতীয় সঙ্গীতের কিয়দংশ বাংলা অক্ষরে দেওয়া গেল।

ইন্দোনেশিয়া-তানা: আইকু;

তানা: তুপা: দারাকু,

দিসানালা: আকু বেরদিরি,

জাদি পানু ইবুকু।

ইন্দোনেশিয়া কেবাউ সাহু,

বাঞ্ছা দান তানাঃ আইকু,  
মারিলাঃ কিতা বেসেরু,  
ইন্দোনেশিয়া বেসাতু।

ইছুপাঃ তানাঃকু,  
ইছুপাঃ নেগেরিকু,  
বাঞ্ছাঃকু, রাজাংকু, সেম' ওয়াঞ্জা  
বাঙুনলাঃ জিওয়াঞ্জা,  
বাঙুনলাঃ বাদাঞ্জা,  
উজুক ইন্দোনেশিয়া রায়।

ধূয়া। ইন্দোনেশিয়া রায় মেদেকা মেদেকা,  
তানাঃকু নেগেরিকু যাঙু কুচিঙা,  
ইন্দোনেশিয়া রায় মেদেকা মেদেকা,  
ইছুপাঃ ইন্দোনেশিয়া রায়।

এর বাংলা মর্মান্ববাদ এই রকম—

ইন্দোনেশিয়া আমার মাতৃভূমি,  
আমার জনভূমি,  
আমি সেই দেশে দাঁড়িয়ে আছি,  
তাকে পাহারা দিতে।  
ইন্দোনেশিয়া এই আমার জাতি,

আমার জাতি, আমার দেশ,  
সকলকে আহ্বান করে,  
এস এক হয়ে দাঁড়াই।

দীর্ঘায়ু হোক আমার মাতৃভূমি,  
দীর্ঘায়ু হোক আমার স্বদেশ  
আমার জাতি, আমার জনগণ, আমার সকল,  
আজ্ঞা তার জাগো,  
ওঠো আমার দেশ,  
গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া।

ধূয়া। গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন মুক্ত,  
আমার মাতৃভূমি, আমার দেশ, যাকে আমি ভালবাসি,  
গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া, স্বাধীন মুক্ত,  
দীর্ঘায়ু হোক, গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া।

[ এই প্রবন্ধ রচনা করতে 'ইন্দোনেশিয়ান ইন্ফরমেশন  
সার্ভিসের' মুখপত্র 'মেদেকা'র প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে  
তথ্য সংগ্রহ করেছি। জাতীয় সঙ্গীত বাংলা অক্ষরে লিখতে  
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাহায্য  
করেছেন ]

১৩৫৫

শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেন শর্মা

তেরশো পঞ্চান্ন সাল, পূর্বের গগনে এল—

যাত্রাপথে তরী,

বন্দরে বন্দরে, নব তরঙ্গের স্বপ্ন তারে দিক

মণিমুক্তা ভরি ;

ভারতের সপ্তভিঙা, রত্নরাগে—আবার ভরুক,

কনক ধাতুর ;

অতীতের রক্তরেখা, লুপ্ত করি' জাগুক উৎসব—

মধু নবান্নের।

সঙ্গীর্ণ, সঙ্গীন পথ—অনেক করেছি অতিক্রম,

...সঙ্গে যারা ছিল—

রক্তের অঞ্জলি ভরি, মানবায়া-অনির্বাক শিখা...

তারা ছেলে দিল।

ভুলি নি তাদের বহু, সাতারা...মেদিনীপুর...

ভুলি নি, ভুলি নি—

মণিপুর-প্রান্তরের, সূর্যকরোজ্জ্বল ধ্বজা—

চিনি তারে চিনি।

প্রভাত-মধ্যাহ্ন পরে, ছাত্রাপথে, বর্ষেতে বর্ষেতে—

সাবিত্রী ধরণী ;

ঋতুচক্র-আবর্তনে, কাল্পন চৈতালী চলে বার—

অক্ষমালা গণি,

কাঁদা-হাসা, ভালবাসা, উৎকেন্দ্র মনেতে তুচ্ছ করি—

যাত্রা তার চলে,

তেরশো পঞ্চান্ন সাল, বহুর অঙ্গনে এল—

...সূর্য আরো জ্বলে।

মনেরো মঞ্জুষা 'পরে, বহিঃশিখা দীপ্তিমান জাগে—

আরো অজলেহী,

মানবের, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সে...ব্যথায় কাঁদছে—

দেহি, মুক্তি দেহি'...

অনেক রক্তেতে ভেজা, হৃদয় কঙ্কাল বেদী 'পরে

নতুন বাণীর—

হে রক্ত, শোনাও গান, সঞ্জীবনী অভয়মন্ত্রের,

দক্ষিণ পাণির।

আশীর্বাদ বরি পড়ে...প্রথম স্বাধীন সূর্য—

স্বাধীন আকাশে,

বন্দরে তরঙ্গগানে, আগামীর হাতছানি...

সুর ভেসে আসে।

রিক্তহাতে, দীপ্তবৃক্ষে, তেরশো পঞ্চান্ন সালে মাগি

—বিশ্বের কল্যাণ ;

হে রক্ত, এবার ভরো, ক্রান্তচিতে 'সত্য আর শিব-

হৃদয়ের' ধ্যান।

# মহাত্মা গান্ধী ও বাংলার রাজনীতি

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার লাহা.

নানা দেশে নানা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহাপুরুষের জন্ম দেশ বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ কথা সত্য। কিন্তু একথাও সত্য—মহাত্মা গান্ধীর জন্ম ভারতবর্ষেই সম্ভব। ইহার অর্থ এই নয় যে ভারতবর্ষ এক অভিনব দেশ, দেবমুগ্ধহীত দেশ। এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য, ভারতের মুক্তিকামহামহীকরের জন্ম ও পরিপুষ্টির ক্ষয় যুগযুগান্তর হইতে প্রস্তুত হইয়া আছে।

মহেঞ্জোদারো বা তাহারও পূর্বের যুগ হইতে ভারতবর্ষের সভ্যতা প্রবহমান। বহু ধর্মপ্রবর্তক ভারতে জন্মিয়াছে, বহুবিধ ধর্মমত এখানে প্রিয়দ্বি লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন, জরথুষ্ট্রীয়, খ্রীষ্টান, ইসলাম, শিখ প্রভৃতি ধর্ম এখানে স্থায়ী হইয়াছে। একই ধর্মের নানা শাখা বিভিন্ন মত লইয়া পরীক্ষা করিয়াছে। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব বিভিন্ন দিক হইতে সত্যের সন্ধান করিয়াছে। তন্ত্রের প্রভাব হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে সমান ভাবে পড়িয়াছে।

এ সব সত্ত্বেও দেখিতে পাই—ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হোক, বৌদ্ধ হোক, জৈন হোক, যে-কোন ধর্মপ্রবর্তক অথবা সংস্কারক অথবা ঋষি অথবা সাধক সত্যকে তন্ত্রের মধ্যে রাখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজের জীবনে তাহা উপলব্ধি করিবার জ্ঞান কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, ত্যাগ করিয়াছেন, কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই—আনন্দের সঙ্গে দুঃখকে বরণ করিয়াছেন। দিগম্বর জৈনদের কথাই ধরা যাক। শীতাতপকে তাহার অগ্রাহ্য করে, আহারে বিশ্রামে বাক্যে কর্মে কুচ্ছ্রতা-সাধনই তাহাদের অভ্যস্ত ব্যাপার।

ইহাই ভারতবর্ষের ঐতিহ্য। গান্ধীজীও যখন জীবনে নানা ভাবে সত্যকে লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের ছয় সহস্র বর্ষের ঐতিহ্যই তাহার মধ্যে কাজ করিয়াছে।

জৈন ধর্মের কথা বলিতেছিলাম। গৃহী জৈন—বিশেষতঃ বরায়সী জৈন মহিলারা—আজ পর্য্যন্ত অল্প কুচ্ছ্রতা সাধন করেন না। উপবাস অর্থাৎ অনশন ত লাগিয়াই আছে, মাসের মধ্যে চার পাঁচ দিন মৌনব্রতও তাঁহারা পালন করেন। জৈন ধর্মের মূল মন্ত্র—অহিংসা পরমো ধর্ম। এই অহিংসা বৌদ্ধ অহিংসা হইতে কঠোরতর। শুধু মানুষ নয়—দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রাণিগণও জৈনের নিকট এই অহিংসা আচরণ হইতে বঞ্চিত হয় না। গান্ধীজীর জন্ম শুক্রবারে। শুক্রবারে জৈনপ্রভাব অল্প নয়। প্রতিবেশ-প্রভাবে শৈশব হইতেই গান্ধীজী অহিংসাপন্থী। বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের বাণী ও জীবন-সাধনা পরবর্তীকালে তাঁহার অন্তরে এই অহিংসা-তত্ত্বকে দৃঢ়মূল করিয়া তুলিয়াছিল। অতঃপক্ষে

জন্মিলে গান্ধীজীর অহিংসা হয়ত অত্যাচার ধারণ করিত। কিন্তু তাহা অসম্ভব ও কল্পনার কথা। বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম আছে, জৈন প্রভাব নাই।

বাংলা শতবর্ষ ধরিয়া স্বাধীনতার সাধনা করিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনে এই ধারা বিরাট রূপ পরিগ্রহ করে। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত কাব্যে এই ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এই দেশপ্রেমকে ধর্মে পরিণত করেন। তিনি মন্ত্রবিৎ। ‘বন্দে-মাतरম্’ দেশাত্মবোধের এক অপূর্ব মন্ত্র। বঙ্কিম-সাহিত্য দেশপ্রেমের সাহিত্য। বাঙালী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পত্রাবলী এবং অত্যাচার রচনার মধ্যে সেই একই ধারার সন্ধান পাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের ‘উপক্রমণিকা’য় আছে—

“অতি বিস্তৃত অরণ্য। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদ-শূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোকপ্রবেশের পথমাত্রশূন্য।... সেই অস্ত্রশূন্য অরণ্য মধ্যে, সেই সুরভিভেদ অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অনন্ততবনীয় নিশুন্ধ মধ্যে শব্দ হইল,

—“আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?”

শব্দ হইয়া আবার সেই অরণ্যানী নিশুন্ধে ডুবিয়া গেল।... এইরূপ তিন বার সেই অন্ধকারসমুদ্রে আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, “তোমার পণ কি?”

প্রত্যুত্তরে বলিল, “পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব।”

প্রতিশব্দ হইল, “জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।”

“আর কি আছে? আর কি দিবে?”

তখন উত্তর হইল, “ভক্তি।”

বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমের দর্শনকার। এই ভক্তি কি?

গান্ধীজী ‘বন্দেমাतरম্’ মন্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও জানিতেন জীবন তুচ্ছ। চাই ভক্তি।

এইখানে গান্ধীজীর-সহিত বাংলার মিল। এই ঐক্যের অন্তর্ভুক্তিতেই বাংলায় বিশেষতঃ মেদিনীপুরে সত্যগ্রহ অপূর্ব সাফল্যলাভ করিয়াছিল। এইজন্যই বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের অবসান ঘটাইতে গান্ধীজীকে বেগ পাইতে হয় নাই।

মূলগত আদর্শে যেমন ঐক্য আছে, তেমনি এক প্রভেদও আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তিবাদ ও গান্ধীজীর ভক্তিবাদ এক নয়।



২

‘ধর্মতত্ত্ব’ বা ‘অমূল্যলেন’ বন্ধিমচন্দ্র এই ভক্তি কি তাহা বুঝাইয়াছেন।

“ভক্তি” কথাটা হিন্দুধর্মে বড় গুরুতর অর্থবাচক।...

যখন মনুষ্যের সকল রুত্তিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুভবিত্রী হয় সেই অবস্থাই ভক্তি।...

সকল রুত্তির ঈশ্বরানুভবিত্রীই ভক্তি এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।...

দেশভক্তির কথা ধরিতে হইলে অবশ্য বলিতে হইবে, সকল রুত্তিকে দেশাভিমুখিনী করিতে হইবে। “যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যায় যে পাবে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম।”

শিষ্যের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। শিষ্য বলিতেছে,

“সকল রুত্তিগুলিই কি ঈশ্বরগামী করা যায়? কোধ একটা রুত্তি, কোধ কি ঈশ্বরগামী করা যায়?”

গুরু বলিতেছেন, “জগতে অতুল সেই মহাক্রোধগীতি তোমার স্মরণ হয়?”

কোধঃ প্রভো সংহরসংহরেতি,

যাবৎ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।

তাবৎ স বহির্ভবনেত্রজন্মা

ভ্রমাবশেষং মদনঞ্চকার ॥

এই কোধ মহা পবিত্র কোধ।...ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের কোধ।”

এখানে মহাত্মা বলিবেন, ‘অক্রোধেন কোধঃ জিনে।’

এখানেও কিন্তু গান্ধীজী ও বন্ধিমচন্দ্র মূলতঃ প্রভেদ নাই। প্রভেদ অল্পতম। এই ভক্তিতত্ত্ব বুঝাইতে বন্ধিমচন্দ্র গীতার কথা আনিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, “যুদ্ধ মাত্র যে পাপ নহে এ কথা পূর্বের বুঝাইয়াছি।”\* বলিতেছেন, “আত্মরক্ষার্থ ও স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্মমধ্যে গণ্য।”†

৩

মহাত্মা কোন অবস্থাতেই যুদ্ধের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার নিকট সত্য ও অহিংসা অভিন্ন।

\* “আত্মরক্ষা যেমন আমাদের অন্তর্গত ধর্ম, আপনাদের জীপুত্র পরিবার স্বজন কুটুম্ব প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও তাদৃশ আমাদের অন্তর্গত ধর্ম।... যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম।...জুর্জবল সমাজকে বলবান সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় সর্বদায়ই আছে।”—ধর্মতত্ত্ব, অষ্টম অধ্যায়।—শারীরিক রুত্তি

† গীতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বন্ধিমচন্দ্র বলিয়াছেন,

“যুদ্ধ পরিহার করিতে পারিলে, যুদ্ধ কাহারও কর্তব্য নহে। কিন্তু এমন অবস্থা ঘটে যে, এই নৃশংস কার্য অপরিহার্য ও অবশ্যসম্পাদ্য হইয়া উঠে।...ধর্মযুদ্ধও আছে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, সমাজরক্ষা, দেশরক্ষা, সমস্ত প্রজার রক্ষা, ধর্মরক্ষার জগৎ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। একপক্ষ যুদ্ধে যোদ্ধার অধর্ম সঞ্চয় না হইয়া পরম ধর্ম সঞ্চয় হয়। এখানে কেবল স্বধর্মপালন নহে, অন্যন্ত পূণ্য সঞ্চয়।”—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিতীয়োহধ্যায়ঃ

“Truth and non-violence are synonymous with God, and whatever we do is nothing worth apart from them.”

অহিংসার মধ্য দিয়া দেশের স্বাধীনতা যদি না আসে মহাত্মা সে স্বাধীনতা কামনা করেন না।

১৯০৮ সালে স্বদেশী আন্দোলন যখন বাংলায় চরমে উঠিয়াছে তখন মহাত্মা একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থের নাম, *Hind Swaraj or Indian Home Rule*. তখনকার দিনের স্বাধীনতাকামীরা যে সব কথা বলিতেন তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মহাত্মা নৌবাহিনী, সেনা-বাহিনী, অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্র-স্ত্র ক্রিষ্টই চাহেন নাই। তিনি তখনকার দেশহিতৈষীদের কাম্য দেশপ্রগতির প্রচলিত উপায়গুলিকে পরিহার করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

বাংলার পথ বন্ধিমচন্দ্রের পথ। বন্ধিমের অনুসরণে সেদিনের দেশভক্তেরা গীতাপন্থী ছিলেন। গান্ধীজীও গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিন্তু যুদ্ধই ত গীতার পটভূমিকা। যুদ্ধকে বাদ দিলে গীতা দাঁড়াইবে কোথায়? কিন্তু গান্ধীজী অহিংসাবাদী। তিনি গীতার রূপক ব্যাখ্যা—allegorical interpretation প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, “মহাভারতকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ ব'লে ধরা হয়, কিন্তু আমার মতে মহাভারত ও রামায়ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয়—ধর্মগ্রন্থ।...দেব ও দানব, রাম ও রাবণের ভিতর প্রতিদিন যে সংগ্রাম চলছে, মহাভারত ও রামায়ণে তারই বর্ণনা রয়েছে।” (গীতাবোধ—প্রস্তাবনা)। প্রথম অধ্যায় ব্যাখ্যাকালে তিনি বলিতেছেন, “কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ত নিমিত্ত মাত্র, অথবা আমাদের শরীরই প্রকৃত কুরুক্ষেত্র।”

এইখানেই বাংলার চিন্তাধারার সহিত মহাত্মার চিন্তা-ধারার মৌলিক প্রভেদ। গীতার সম্বন্ধে নানারূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতে পারে। গান্ধীজীই প্রস্তাবনাতে বলিতেছেন, “গীতা মহাভারতের এক ছোট অংশ।” ভারতবাসীর স্বয়ং মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া কীর্তিত করিয়াছেন। কিন্তু সে কথা গৌণ। মহাত্মা অহিংসায় একান্ত বিশ্বাসী। যে শাস্ত্রে আপাত-অন্তরূপ কথা আছে, মহাত্মা অহিংসার অনুগামী করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন।

তিনি যে রামরাজ্যের কথা বলেন, তিনি অযোধ্যাধিপতি দশরথপুত্র রাবণহস্তা শ্রীরামচন্দ্র নহেন। অর্থাৎ ঐতিহাসিক শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণকেই কি আমরা পূজা করি? ইতিহাস ত দেশ-কালে আবদ্ধ। দেশ ও কালের অতীত যিনি আমরা তাঁহারই অর্চনা করি। এই হিসাবে মহাত্মার রামরাজ্য, Kingdom of God—Heaven on Earth।

কোন নীতি সর্বোত্তম—কথা ইহা নয়। মনের গোচরে অথবা অগোচরে বাংলা বঙ্কিম-নিয়ন্ত্রিত পথে চলিয়াছে। অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র কেহই এই পথকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই দেশভক্তির ক্ষেত্রে এক হইয়াও মহাত্মার মত এবং বাংলার পথ বার বার বিভিন্নমুখী হইয়াছে। মহাত্মা-নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও দেশবন্ধুকে স্বরাজ্যদল গঠন করিতে হইয়াছে। মহাত্মার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াও নেতাজীকে দেশ হইতে দূরে সৈন্যবাহিনী গঠন করিতে হইয়াছে। এ সব সত্ত্বেও মহাত্মার মহাত্ম্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। গান্ধীজী যে fundamental difference—মৌলিক পার্থক্যের কথা বলিয়াছেন তাহা এই।

অনেকে মনে করেন বাংলার দেশাত্মবোধ বুদ্ধি Hindu Nationalism। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা মহাত্মা শুনাইয়াছেন। এই কার্যে তিনি জীবন দান করিয়াছেন। শেষজীবন বাংলার নোয়াখালীতে বাস করিয়া এই মন্ত্রই প্রচার করিবেন ইহাই ছিল তাঁহার মনোগত ইচ্ছা।

বাংলার জাতীয়তা হিন্দু জাতীয়তা নয়। এখানেও মহাত্মার সহিত বাঙালী চিন্তানায়কের কোন পার্থক্য নাই। বঙ্কিমচন্দ্রকে কোন কোন মুসলমান সূক্ষ্মে দেখেন না। সেই বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়ে কি বলিতেছেন দেখা যাক।

“সীতারামে”র প্রথম সংস্করণের একটি পরিত্যক্ত পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।\*

শ্রামপুরে সীতারাম একটু স্থির হইলে লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর দর্শনে সজীক চলিলেন।...দেখিলেন মন্দির ভূগর্ভস্থ, বাহির হইতে কেবল চূড়া দেখা যায়।...সোপান সাহায্যে তাঁহার তিন জনে মন্দিরদ্বারে অবতরণ করিলে পর, সীতারাম সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, মন্দিরদ্বারে দেবমূর্তিসমীপে একজন মুসলমান বসিয়া আছে। বিস্মিত হইয়া সীতারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে বাবা তুমি?”

মুসলমান বলিল, “আমি ফকির।”

সীতারাম। মুসলমান?

ফকির। মুসলমান বটে।

সীতা। আ সর্বনাশ।

ফকির। তুমি এত বড় জমীদার, হঠাৎ তোমার সর্বনাশ কিসে হইল?

সীতা। ঠাকুরের মন্দিরের ভিতর মুসলমান।

ফকির। দোষ কি বাবা। ঠাকুর কি তাতে অপবিত্র হইল?

সীতা। হইল বৈ কি। তোমার এমন দুর্বুদ্ধি কেন হইল?

ফকির। তোমাদের এ ঠাকুর, কি ঠাকুর? ইনি করেন কি?

সীতা। ইনি নারায়ণ, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্তা।

ফকির। তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সীতা। ইনিই।

ফকির। আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সীতা। ইনিই—যিনি জগদীশ্বর তিনি সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন।

ফকির। মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়া ইনি অপবিত্র হন নাই—কেবল মুসলমান ইহার মন্দিরদ্বারে বসিলেই ইনি অপবিত্র হইবেন?

ফকির। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ইনি থাকেন কোথা? এই মন্দিরের ভিতর থাকিয়াই কি ইনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন? না, আর থাকিবার স্থান আছে?

সীতা। ইনি সর্বব্যাপী; সর্ব্বদেহে সর্ব্বভূতে আছেন।

ফকির। তবে আমাতে ইনি আছেন?

সীতা। অবশ্য—তোমরা মান না কেন?

ফকির। বাবা, ইনি আমাতে অহরহ আছেন, তাহাতে ইনি অপবিত্র হইলেন না—আমি উহার মন্দিরের দ্বারে বসিলাম, ইহাতেই ইনি অপবিত্র হইলেন?

[এইরূপ নানা কথার পর ফকির বলিলেন]

তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ তবে এই হিন্দু মুসলমানদের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্ম্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ, পাপের রাজ্য থাকে না।

সীতা। মুসলমান রাজ্য প্রভেদ করিতেছে না কি?

ফকির। করিতেছে। তাই মুসলমান রাজ্য ছারেধারে যাইতেছে।...আমি মুসলমান হইয়াও হিন্দু-মুসলমানে কোন প্রভেদ করি না।

অতএব বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান সমতারও সমাধান পাওয়া যায়।

৫

গান্ধীজী একজন আবিষ্কারক। সহনশীলতার মধ্যে যে অসীম শক্তি নিহিত আছে তাহা গান্ধীজীরই আবিষ্কার। তিনি ভারত-বর্ষের এই বিপুল অধুর্দূরপরিচিত সঞ্চিত-শক্তিকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছিলেন। এই নুতন শক্তির সন্ধান পাইয়া তিনি অল্প দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। করিলে শক্তি বিক্ষিপ্ত হইত। সত্য এক, কিন্তু সত্য বহুযুগ। বিভিন্ন দিক দিয়া সত্যের সন্ধান করিতে পারা যায়। ধর্ম্ম-নির্বিশেষে জনগণের সহিত মহাত্মা নিজেকে একীভূত করিয়াছিলেন।

বলিয়াই জনগণকে তিনি অমুগ্ধেরিত করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সকল সাধকই নিজেদের জীবনে সত্যকে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলার তরুণ দেশভক্তেরাও নিজেদের জীবনদানে এই সত্যকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মহাত্মার ভ্যাগ, কারাবরণ, হুংখবরণ এবং অবশেষে মৃত্যুবরণও—আত্মজীবনে সত্যকে উপলব্ধি করিবার

অপূর্ব চেষ্টা। ভারতবর্ষের ছয় সহস্র বর্ষের সাধনা এই দারুণ হুংখনিপীড়িত দেশে মহাত্মার আবির্ভাবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। আজ স্বাধীনতার জ্যোতি মহাত্মার আদর্শকে উজ্জ্বল করুক।\*

\* রবিবাসরে পঠিত।

## কথা-সাহিত্যের দু'একটি দিক

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পূর্বস্মরণ বহু দিক থেকেই সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁদের মূল্যবান প্রবন্ধ-সমূহ বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু তত্ত্বনিরূপণ—গতিপ্রকৃতি নির্ণয় ছাড়াও সাহিত্য সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যায়। সেটি হ'ল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতি এইটুকু নয় যে—সত্যের উপর রঙের পোঁচ একটু গাঢ় করে দেওয়া চলে, এদিকে ওদিকে কয়েকটি রেখা টেনে ছবিটাকে গ্রহণযোগ্য করা যায়। এটা সকলেরই জ্ঞান আছে যে, যে কাহিনী নিজ গুণে মনের ভেতর আসন করে না নিতে পারে—সে কাহিনী শোনবার কৌতূহল বা শোনাবার উৎসাহ কোন পক্ষেই থাকে না। দু'পক্ষের যোগসূত্র কাহিনীর প্রাণ।

সাহিত্যের অল্প বিভাগের কথা ছেড়ে দিয়ে গল্প লেখার কথাই বলব। কারণ গল্পলেখক মাত্রেরই গল্পলেখার পিছনে কিছু অভিজ্ঞতা থাকে। বিচিত্র নয় এবং একজন গল্প-রচয়িতা বলে বর্তমান লেখকও তার ব্যতিক্রম নয়।

এই প্রসঙ্গে দু'একটি প্রশ্ন যা প্রায়ই শুনতে হয় তার কথাই বলব। গল্প লেখবার সময় বাস্তব সত্যকে কল্পনার সঙ্গে কতটুকু গ্রহণ করি, এই প্রশ্ন বহুবার শুনতে হয় আর লেখবার সময় পাঠককে সামনে রেখে লিখি কিনা—এ বিষয়েও অনেকে জানতে চান। এই ধরনের প্রশ্ন থেকে মনে হয় যে, কাহিনী আমার ভালবাসি চিরকাল। অপরিপক্ব বুদ্ধির স্তিমিত আলোয় যতটুকু পাই আর পূর্ণজ্ঞানের জ্যোতিতে যা প্রভাসিত হয়, তার মধ্যে কাহিনীই সর্বোত্তম—যাকে আশ্রয় করে কৌতূহল মেটে—রসপিপাসা পরিতৃপ্তি লাভ করে। সে কাহিনী জীবনজিজ্ঞাসার সমতালে যতই গতিছন্দ মেলায় ততই তা অন্তরকে অভিভূত করে—আনন্দকে পূর্ণতর করে।

এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুশর্মা বা ঈসপের গল্পগুলির কথা স্বতঃই

মনে পড়ে। বনের বাঘ সিংহ শৃগাল ভল্লুক, গাছের বানর পাখী বা গর্ভের সাপ আর জলের কুমীর এরা যখন মানুষের মত আচরণ করে মানুষের ভাষায় কথা বলে তখন তার চেয়ে কৌতুককর ব্যাপার আর কি আছে। যদিও তা হিতোপদেশ তবু তা অদ্ভুত গল্প। এর মধ্যে কতটুকু বাস্তব কতখানি বা কল্পনা এ বিচার জাগে না। যে কথা জীবজন্তুর মুখ দিয়ে বার হচ্ছে—যা তাদের আচার-আচরণে পাওয়া যাচ্ছে, যে প্রকৃতিবশত তারা চলাফেরা করছে তা মানুষের অন্তর্নিহিত সত্যকেই প্রকাশ করেছে। অন্তঃসন্ধানী দৃষ্টি না থাকলে এমন মনোহর কাহিনীগুলির সৃষ্টি হ'ত না। বাস্তব অল্পভূতির দিক দিয়ে ঈসপ বা বিষ্ণুশর্মার গল্পগুলি উপাদেয় এবং শিশু ও যুবাবৃন্দকে তা সমানভাবেই আকর্ষণ করে।

লেখকমাত্রেরই জানেন, যে-কোন উপাদান পেলেই তা থেকে লেখা যায় না। এমন অনেক জীবন আছে যার মধ্যে ঘটনাপ্রবাহ যথেষ্ট অথচ গল্পের উপাদান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—আবার এমন সামান্য ঘটনাও ঘটে যা কাহিনী বলে আপাতদৃষ্টিতে মেনে নেওয়া শক্ত অথচ তা থেকেই গড়ে ওঠে চিত্তাকর্ষক গল্প। আসল কথা, ঘটনা থাক আর নাই থাক, বৈচিত্র্য যার মধ্যে আছে তাই গল্পের উপাদান আর সে উপাদান গ্রহণ করে বৈচিত্র্যপিয়ালী মন। সব মনের গ্রহণ-ক্ষমতা সমান নয়, সকলের দৃষ্টিভঙ্গি এক হবার কথাও নয়। তবু যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশেষ একটি দিকের কাহিনী আমি লিখব তা যেন আমার রসবোধের পরিধিতে আবদ্ধ না থাকে। আমার হুংখ বেদনা কৌতুক অথবা হুংখ বেদনা কৌতুককে উজ্জীর্ণ করতে না পারলে সৃষ্টিকার্য সম্পূর্ণ বা সার্থক হবে না। মনের এই গ্রহণ-ক্ষমতার উপরই কাহিনীর বাস্তব কল্পনা উভয় অংশ নির্ভর করে। ধরুন, চোখের সামনে দেখছেন, একজন ধনী লোক দরিদ্র প্রতিবেশীর উপর উৎপীড়ন করছে। আপনার মনের মধ্যে সেই ঘটনার বেগ

সম্প্রসারিত হ'ল। একজন্মের জন্ম জাগল দরদ আর এক জন্মের উপর ঘৃণা। গল্পে ফুটিয়ে তুলছেন ঘটনাটি। কিন্তু এই ঘটনা ফুটিয়ে তুলতে যতটুকু বস্তু আপনি সামনে পেয়েছেন তার চেয়ে বেশী সংগ্রহ করেছেন যা পান নি। অর্থাৎ কল্পনায় আপনি মানবমনের বেদনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে আপনার অমুহুর্তি যত গভীর হবে, আপনার কল্পনা যত সুদূরপ্রসারী হবে, আপনার চিত্রাঙ্কন ততই হবে সার্থক। আমাদের মনের বিচিত্র ধারা হ'ল কল্পনা-বাস্তবে মেশামিশির ব্যাপার। ধরুন, কোন ছব্ব লোকের কথা কারও মুখে শুনলেন, তাকে কোন দিন না দেখলেও তার আচার-অচরণের সঙ্গে একটি অপ্রিয়দর্শন মুক্তি আপনার চোখের সামনে ফুটে উঠবেই। চোখের সামনে যা ঘটে তাই সব সময়ে রূপ বাস্তব হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়—অমুহুর্তির রসে পরিপাক করে জ্ঞান যা প্রকাশ করে তারই মধ্যে সত্য-মিথ্যার সার্থকতা। যেমন ছপুনের চড়া রোদে সঙ্গীর্ণ দিগন্ত পরিপূর্ণ শ্রীতে উদ্ভাসিত হয় না—সকাল-সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে অপূর্ণ বিস্তারে তা মনকে অভিষিক্ত করে। সর্বজনগ্রাহ্য যে রস তা পরম আনন্দ থেকে উদ্ধৃত—যে পরম আনন্দ থেকে নিখিল চরাচরের ধাবতীয় প্রাণীর উদ্ভব। লিখতে বসলেই দেখা যায়—বাস্তবের কাঠামোটা অস্থিকঙ্কালসমেত চোখের সামনে ছায়ার মত এগিয়ে আসছে আর দূরে সরে যাচ্ছে; কল্পনার রক্তে মাংসে যতক্ষণ না পেঁগুলি কায়াবন্ধনে ধরা পড়ছে ততক্ষণ তার আকার নাই, গতি নাই, লাভ্য নাই। কথিত আছে, জগৎ সৃষ্টির মূলে এই পরমা কল্পনা নিহিত।

সামান্য অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে গুরুভার তত্ত্বকথা এসে পড়ছে। অভিজ্ঞতা তত্ত্বকথার আকার নিলে উপদেশের অহমিকা প্রকাশ পায় জানি, তবু ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা জানাবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। এ কথা জানা আছে যে, অন্তর্লোকপ্রবাহিত রসপ্রবাহের ধারাটি যেইমাত্র কণ্ঠে এসে পৌঁছয় তখনই মুগ্ধ বিশ্বাস বলে উঠি, 'চমৎকার'। তা সন্দেহ বলেই সত্য এবং রসসমৃদ্ধ বলেই শাস্ত।

এই রসসমৃদ্ধে পাক করা বৃহৎ বেদনা—অন্তরীক্ষ ছুঁখ, অপার আনন্দ ও গভীর অমুহুর্তি সব কিছুই জীবন-জিজ্ঞাসার বিচিত্র রূপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রশ্নে ছিল—গল্পে বাস্তব সত্যকে কতটুকু নিতে পারি? কতটুকু কল্পনায় মিশিয়ে তার প্রকাশ সম্ভব? সে নির্দেশ দেয় অমুহুর্তিহীন মন। শিক্ষকের নির্দেশে ত্রৈমাসিক অঙ্কের নিয়ম মেনে তবে অঙ্কটাকে নিভুল করা যায়, কিন্তু জীবনশিল্পীর গতিপ্রকৃতি ভিন্নরূপ। জ্ঞাতশিল্পী বলে যে

একটা কথা আছে তা মনীষীর স্বীকার করেন। সবার মধ্যে শিল্পী হবার উপকরণ থাকে না সেদিক দুঃখ করে কোন লাভ নাই। একথা স্বীকার করতেই হবে—সাহিত্য-সেবার প্রধান উপকরণ হ'ল নিষ্ঠা; মূলধন—অমুহুর্তিসম্পন্ন মন। কল্পনার বিলাস নয়—বিকাশই হ'ল সাহিত্যের প্রাণ। বলুন ভোঁ কল্পনা কার প্রাণে নাই? অশ্ব-মনোরথে চড়ে মানুষ কোন্ হস্তের পারাবার না উত্তীর্ণ হয়, কোন্ 'সব পেয়েছির দেশে' গিয়ে ছ'দণ্ডের জ্ঞাপ্তি নিজেতে সার্থক না মনে করে।

লিখবার সময় পাঠক সম্মুখে থাকেন কিনা জানি না—অন্তত ধ্যানলোকে জাগ্রত প্রহরী রেখে কেউ সাধনার পথে অগ্রসর হয়েছেন কিনা, শুনি নি। আত্মলুপ্তির মুহুর্তে কে রইল, কে রইল না—সে হিসাব রাখা তো সম্ভব নয়। লেখা শেষ হ'লে তবে সে বিচার সম্ভব। তখন তীক্ষ্ণ সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে সৃষ্টিকে পুঞ্জাপুঞ্জ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে হবে বহু গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত লোক রয়েছেন আমার সম্মুখে। আমার অকিঞ্চির দান তাঁদের গ্রহণের অযোগ্য যেন না হয়, যেন অনাদরের দৃষ্টিতে তাঁরা মুখ ফিরিয়ে না নেন। তাঁদের কথা ভেবে আমার লেখনী নিরুৎসাহ হবে না এবং সৃষ্টিকার্যের খুঁতগুলি আমার মনশক্ষে প্রথর ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে একথা সত্য, তবু তাঁদের প্রসন্নতা অর্জন করবার জ্ঞাপ্তি আমাকে যত্ন ও পরিশ্রম করতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে।

গল্প লেখার গল্পকে আর দীর্ঘ করব না। গল্প যারা বলতে ভালবাসেন তাঁরা নিঃসন্দেহে উত্তম শ্রোতা, কিন্তু যারা গল্প শোনেন একাধিচিত্তে তাঁদের ভাল গল্প লিখিয়ে বলে আমি প্রেরণা দিই। কেননা বাণীতে আর ক্রটিতে শ্রীতিবন্ধন চিরকালের। বক্তা ও শ্রোতা ছ'পক্ষের মনকেই সৃষ্টিরসের আনন্দে অমুহুর্তির গাঢ়ত্বে উদ্বল করে তোলে এই প্রিয় বন্ধন। সমুদ্রের বাষ্প আকাশে উঠে মেঘ সৃষ্টি করে—দুই খন নীলের সংযোজন অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্যে ভরা। তেমনি মিতালী লেখকে আর পাঠকে। এর মাঝখানে রয়েছে যে প্রাণ-সঞ্চারণী সৃষ্টি তা অনন্ত কালের লীলাপ্রবাহ ছাড়া আর কিছু নয়। জাগ্রত মন, প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা মন—সর্বসংশয়হীনকারী সত্যঅভিমুখী বলিষ্ঠ মন—রসবস্তুর আদানপ্রদান—সেতু দিয়ে মানুষের কাছে মানুষকে এগিয়ে আনে—মানুষকে ভালবাসতে শেখায়—সম্মুখে তার ভুল সংশোধন করে দেয়—গ্রন্থির পূর গ্রন্থি মোচন করে সংস্কৃতি-উজ্জ্বল বিস্তৃত জগৎকে তার সামনে তুলে ধরে। এই বাধাবন্ধনীন সংস্কৃতি-উদ্ভাসিত বিস্তৃত জগতের প্রবেশপত্র হ'ল সাহিত্য। সব কালে সব দেশের লোকেরা এরই একাধ সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে দিচ্ছেন।\*

\* বড়ল যুবসজ্জের সাহিত্যসভায় পঠিত।

# সোভিয়েট রাশিয়ার ধনসঞ্চয়ের উপায়

ক্রীষ্টমিত্র দেবী

গত ডিসেম্বর মাসে যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন সরকার যুদ্ধ-প্রচলন সম্পর্কে একটি সর্বদেশব্যাপী আইন ঘোষণা করেন, তখন আমেরিকার জনসাধারণ প্রায় সর্বত্রই এই মন্তব্য প্রকাশ করে, “রাশিয়ানদের আবার ব্যাঙ্কে জমা সম্পত্তি থাকে নাকি? আমাদের কেমন জ্ঞানি ধারণা ছিল তারা কম্যুনিষ্ট, সাম্যবাদী।”



খেলনার দোকান—এই সমস্ত খেলনা অত্যন্ত দামী

আসল কথা হচ্ছে এই যে, সোভিয়েট রাশিয়াও এমন একটি দেশ যেখানে যে-কোন অবস্থাপন্ন লোকে ইচ্ছে করলেই কোন শহরের মধ্যে এবং তৎসঙ্গে শহরের বাইরেও যতগুলি খুশী বাড়ী কিনতে পারে। সে তার খুশীমত আলমারী বোবাই কাপড়-চোপড় এবং নিজের ব্যবহারের জুতা মোটরগাড়ীও কিনতে পারে। তার জী সিন্ধ এবং দামী ফার কোর্ট পরে বেড়াতে যায়। মনের সাধ মিটিয়ে রাশিয়ান মদ ভড্কা এবং পেন পান করতে পারে। তার বাড়ীর যাবতীয় কাজে-কর্মে সাহায্য করবার জুতা, নিজের কাপড়চোপড়ের যত্ন করবার জুতা, চিঠিপত্র টাইপ করে দেবার জুতা, রান্না-বাড়া করা, গাড়ী চালানো, এসবের জুতা সে বেতন দিয়ে ভৃত্য রাখে। এমন কি, সরকারের অঙ্গুষ্ঠিত পেলেই সে তার নিজের একটি শার্টওয়েভ রেডিও ষ্টেশন তৈয়ারী করতে পারে (আমেরিকায় অনেক সময় এই ধরনের বিচিত্র রাশিয়ান বেতারবার্তা শোনা গিয়েছে)—দরকার-মত প্রচুর বিক্ষোভক পদার্থ, নিদারণ বিষের রসদ এবং তার সঙ্গে জুতোর বাস্ক ভরে রেডিয়ম রাখতেও আপত্তি নেই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রজা যাকিছু জিনিষ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে জানে—দলিলপত্র, সব রকম দ্রব্য, টাকাকড়ি, পেটেন্টের স্বত্ব ইত্যাদি সবই তার মৃত্যুর

পর তার পরিবারের সম্পত্তি বলে ধরা হয় এবং সেগুলির জুতা তাকে কোন কর দিতে হয় না।

এসব শুনতে নেহাত ধনতন্ত্রবাদী প্রধার অল্পরূপ মনে হয়, তবে এর একটা সীমা আছে। ব্যক্তিগত ধনলাভের জুতা মজুরীভুক্ত শ্রমিককে “স্বার্থপর” ভাবে খাটিয়ে নেওয়া, “শোষণ” করা সোভিয়েট আইনে নিষিদ্ধ। কোন ধনী ব্যক্তি তাই নিজের ধনসম্পত্তির দ্বারা মজুরী দিয়ে লোক নিযুক্ত করে কোন দ্রব্য তৈরী করে বিক্রী করতে পারে না। সে কোন কারখানা বা ফ্যাক্টরীর মালিক হতে পারে না, বা এমন কোন বড় কৃষিক্ষেত্র বা ফার্মের মালিক হতে পারে না যেখানে কাজ চালাবার জুতা বেতনভোগী মজুর রাখতে হয়। সে একটি বা দশটি বাড়ী কিনতে পারেন, কিন্তু যে জমির উপর সে বাড়ী নির্মাণ করা হয়েছে সেই জমি কিনতে পারে না—সে জমির নিমিত্ত তাকে খাজনা দিয়ে সরকারের কাছ থেকে বছ বৎসরের পত্তনি নিতে হয়। অবশ্য কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই নিয়মে কারুর বিশেষ অসুবিধা হয় না। জমির জুতা তাকে যা খাজনা দিতে হয় তা কোন ধনতন্ত্রবাদী দেশের জমির কর বা ট্যাক্সেরই সমান, এবং সোভিয়েট সরকার যেমন প্রয়োজন-মত জনসাধারণের বা রাষ্ট্রের কোন কাজের জুতা সে পত্তনি বাতিল করে দিতে পারেন, ঠিক তেমনি সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরেও অল্প দেশেও এমন আইন ও নিয়ম আছে, যাকে বলে রাষ্ট্রীয় একাধিপত্য আইন। এই রকম কয়েকটি সীমাবদ্ধ আইন-কানুন ও নিয়মাদি ব্যতীত সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধিবাসী আপন খুশীমত যে-কোন ভাবে টাকা উপার্জন এবং খরচ করতে পারে।

গোড়াতেই বলা উচিত যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের অতি সম্পদশালী ব্যক্তিসমষ্টির মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য খুব কমই আছে। পার্টির সাধারণ সভ্য অনেকটা আগেকার আমলের আমেরিকার “ট্যামানি” অঙ্গুষ্ঠের মত রাজকার্যে সাহায্যকারী। তার কাজ হচ্ছে জনসাধারণের মতামতের খবর রাখা, সমবায়ী চাষীদের বা স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সভ্যদের বুঝিয়ে দেওয়া কেন স্থানীয় নেতারা এটাওটা করতে চান, আবার স্থানীয় কর্তাদেরও বুঝিয়ে দিতে হয় তাদের অঙ্গুষ্ঠ জনসাধারণ কি কি নিয়ম বা সঙ্কল্প সহজেই গ্রহণ করবে, আর কি কি তারা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এই রকম সারা দিনব্যাপী পরিশ্রমের পারিতোষিক হিসাবে পার্টির সভ্য, ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উন্নতির প্রত্যাশা করে। জীবনে তবে আমেরিকার শহরস্থিত কারখানার এই ধরনের সাহায্যকারী



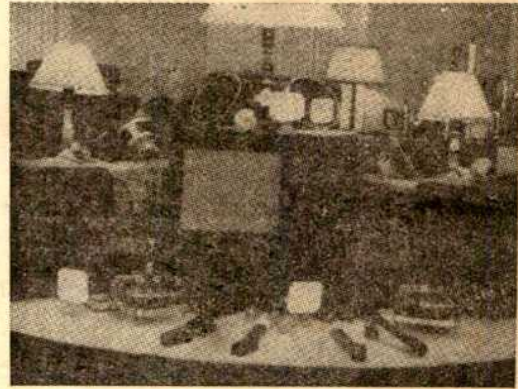
এবং এদের মধ্যে তফাৎ আছে। সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্যরা সাধারণতঃ খুব সাবধানে জায়পথে চলে এবং আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করে।



সুগন্ধি দ্রব্যের দোকান

কিছুদিন যাবৎ এই মুদ্রাপ্রচলন আইনটি ঘোষণা করবার পর ধনশালী রুশীয়দের সংখ্যা বেশ কমে গেছে। যারা তাদের টাকাকড়ি ঘরে জমিয়ে রেখেছিল, তাদেরই হয়েছে সবচেয়ে বেশী দুর্দশা। অনেকে এরকম ভাবে টাকা ঘরে লুকিয়ে রাখে, হয় সঠিক কি পরিমাণ সম্পত্তি আছে তা প্রকাশ করতে চায় না বলে, অথবা ইউরোপের অধিকাংশ চায়ীর মত তারাও ব্যাঙ্ক-বইয়ে লেখা নীরস হিসাবের চেয়ে হাতে টাকা ঘরে নাড়াচাড়া করা বেশী পছন্দ করে। এইরূপ ধনসঞ্চয়ীরা তিন হাজার রুবলের অধিক যা ছিল তার দশ ভাগের নয় ভাগ হারিয়েছে। সরকারী “বণ্ড” কিনে দেশের ধন-ভাণ্ডার বাড়াবার এবং জনসাধারণকে উৎসাহে অনুপ্রাণিত করবার জন্ত আমেরিকায় গবন্মেণ্ট ইদানীং যে রকম চেষ্টা করেছে, ততোধিক চেষ্টার ফলে রাশিয়ায় সেসব স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তি এরকম “বণ্ড” কিনে তার দুই-তৃতীয়াংশ হারিয়েছে। তার তুলনায় যেসব লোকের টাকা ব্যাঙ্কে ছিল তাদের ভাগ্য ঢের ভাল—তাদের সম্পত্তির তিন থেকে দশ হাজার রুবলের মধ্যে প্রতি তিন রুবল মুদ্রার পরিবর্তে দুটি “নুতন” রুবল লাভ করেছে, এবং দশ হাজারের উপর টাকার মধ্যে প্রতি দুই রুবলের বদলে একটি নুতন রুবল লাভ করেছে। তবে টাকাকড়ি, ব্যাঙ্কে জমা সম্পত্তি এবং সরকারী দলিলপত্র বাদে অজ্ঞ কোন দিক দিয়ে ধনী রুশীয়ের সম্পদের কিছু ক্ষতি হয় নি। তার মাসিক আয়ের কোন পরিবর্তন হয় নি। সে যদি লেখক বা হরশিল্পী প্রকৃতি হয় তা হলে তার সম্মান-মূল্য আগের মতই সে পায়। তার বাড়ীঘর, নিজের ভাল জামাকাপড়, তার মদ্যভাণ্ডার, জীর হীরের গয়না, ইত্যাদি যাবতীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তিই অক্ষুণ্ণ আছে এবং এই পরিবর্তনের পর তার যা রুবল বাকি রয়েছে, তার মূল্য আগের চেয়ে অনেক বেশী।

এই আইনের ফলে রুবলের মূল্য বেড়ে গেছে। ১৯৪৭ সালের ১৯শে মাসের আগে রুশীয় জনসাধারণ বেশ কম দাম দিয়েই রেশন-নিয়ন্ত্রণাভূসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ জিনিষপত্র কিনতে পারত। তবে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণটি ছিল, নেহাত যতটুকু জিনিষ না হ’লে জীবনযাপন করা যায় না ততটুকু। তার বেশী কিছু যদি প্রয়োজন হ’ত তা হলে জায়সদত ভাবেই। হয় সরকারী ব্যবসায়ী দোকানে কিংবা কৃষিকর্মীদের বাজারে লোকে সে সব কিনতে পারত, কিন্তু তার জন্ত তাকে যা দাম দিতে হ’ত তা রেশননিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের তিন-চার শত গুণ বেশী। গরীব লোকে তার রেশনের বরাদ্দের বাইরে প্রায় কিছুই কিনতে পারত না, এবং বড়লোককেও বেশী জিনিষ কিনতে হ’লে অত্যধিক অর্থদণ্ড দিতে হ’ত। এখন রেশনপ্রথা তুলে দেওয়ার পর “একাধিক মূল্যের” প্রথার বদলে “এক দর” নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে—(অন্ততঃ এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে) এবং

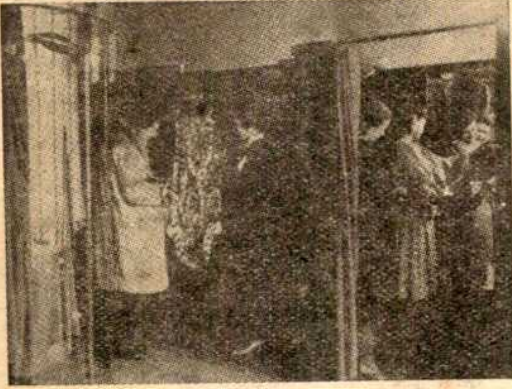


রেডিও

নিয়ন্ত্রিত দরের সকলেই যত খুশী, নিজ নিজ শক্তিমত, জিনিষ কিনতে পারে। অধিকাংশ জিনিষের দাম এখন যা স্থির করা হয়েছে তা এর পূর্বের রেশনের দামের থেকে একটু বেশী, কিন্তু আগে রেশনের বাইরে জিনিষ কিনতে হ’লে যা দিতে হত তার থেকে অনেক কম—এতে অবস্থাপন্ন লোকদের খুব সুবিধাই হয়েছে। তবে, পূর্বে অনেকে কোন বিশেষ কাজ—যা জনসাধারণের পক্ষে মহামূল্যবান নির্ধারিত হ’ত, করবার জন্ত উচ্চ পারিশ্রমিক পেত, তারা সেগুলি হারিয়েছে। যেমন, তারা খুব আগে প্রচুর পরিমাণ দ্রব্য জায়া রেশন হিসেবে পেত, এবং কয়েকটি শ্রেষ্ঠ দোকান থেকে অল্প দামে ভালরকমে মজুত রাখা দ্রব্য সব কেনবার অধিকার পেত—এখন সেগুলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আবার এরই সঙ্গে গরীব লোকেরাও এক বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, তারা পূর্বের রেশনের দামের থেকে কম দামে প্রচুর পরিমাণ রুটি কিনে নিয়ে যেতে পারে—(রুটিই হচ্ছে রুশীয়দের খাবার টেবিলে



একান্ত আবশ্যক খাজদ্রব্য)। নূতন প্রণালী কতদূর সফল হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে জিনিষ সরবরাহের উপর—যে পরিমাণ রুটি প্রয়োজন গবমেণ্ট যদি তত না ঘোষণা করতে



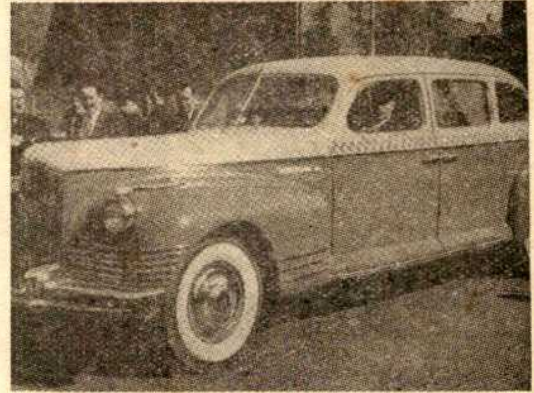
মক্কা শহরে একটি বস্ত্র বিক্রয়ের কেন্দ্র

পারে, তা'হলে কৃষকরা বাজারে যতদূর পৌঁছাবে তত বেশী দাম চাইবে। তবে সম্ভবতঃ সোভিয়েট অর্থনীতিবিদগণ মনে করছেন যে তাঁদের দেশে এটা নূতন, পূর্বের চেয়ে অল্পসংখ্যক কিন্তু অধিকতর মূল্যের রুবল দিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্য কেনা যায়, সেই পরিমাণই প্রাপ্ত করা যাবে।

অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়াতে এখন একটি শ্রেণীর অবস্থাপন্ন লোকেরা বেশ অসুবিধা ভোগ করবে। কৃষিকর্মীরা বিশেষ করে পূর্বের “বহু মূল্য” প্রথা থাকার প্রচুর লাভ করে আসছিল। সমবায় কৃষিক্ষেত্রগুলি থেকে তাদের ভাগে যা লাভের অংশ পড়ত তা তো তারা পেতই, উপরন্তু তাদের ব্যক্তিগত কৃষিক্ষেত্রে যা উৎপন্ন হ'ত তাও বাজারে বিক্রয় করে যথেষ্ট লাভ করত। একজন সমবায়ী কৃষক পঞ্চাশ লক্ষ (৫ মিলিয়ন) রুবলের সরকারী “বণ্ড” কিনেছিল বলে দৈনিক পত্রিকাগুলিতে তার নাম প্রশংসিত হয় এবং সে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করে। নতুন আইনের ফলে তার এই বৃহৎ সম্পত্তির অনেকখানিই নষ্ট হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাজার-দর ধরাবাঁধা করে দেওয়াতে আর এই রকম ধনসঞ্চয় করাও সম্ভব হবে না।

এই নূতন আইন প্রচারের পর বে-আইনী অর্থোপার্জনের কয়েকটি পথ বন্ধ হয়ে গেছে। রেশন-নিয়ন্ত্রিত জিনিষ এবং রেশনের বাইরে জিনিষের মূল্যে যে প্রভেদ ছিল তার ফলে “ঝুঁকিদার” ব্যবসায়ীগণ (speculator) যথেষ্ট সুযোগ পায়। তাদের বিরুদ্ধেই এই আইন বিশেষ করে প্রয়োগ করার কথা ঘোষণা করা হয়। এতে আছে, “যে সব দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবসায়ী যুদ্ধের সময়ে প্রচুর ধন অর্জন এবং সঞ্চয় করেছে, তারাই যে রেশন-প্রণালী তুলে দেওয়ার পর বাজারের সব জিনিষ কিনে নিতে পারবে তা সহ করা যায় না।”

দেখা গিয়েছে, সোভিয়েট রাশিয়ায় যুদ্ধে জয়লাভকারী সৈনিকদের উঁচু দরের ব্যবসায়ী (commercial) দোকান-গুলিতে বাজারদর থেকে কম দামে জিনিষ কিনবার অধিকার ছিল। তাদের পক্ষে অল্প লোকের ‘মধ্যস্থ’ ব্যক্তি হয়ে জিনিষ কিনে দিয়ে ভাগে টাকা দেওয়া খুব সহজ হ'ত। যে সব লোকের রেশনের পরিমাণ অল্প লোকের চেয়ে বেশী ছিল, তারা তাদের পাওনা সবকিছু সম্ভাব্যে কিনে যা প্রয়োজন হ'ত না তা ফের বাজারে খোলাবুলি ভাবেই বাজার-দরে বেচে দিত। অবশ্য রেশনিং তুলে দেওয়াতে যে সোভিয়েট রাশিয়ায় এরকম বে-আইনী অর্থোপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে তা নয়। যখনই এই ভাবে দ্রব্যাদি প্রয়োজন অপেক্ষা কম থাকার দরুন ধরাবাঁধা দামে বিক্রী করা হয়, তখনই কিছু কিছু ক্ষুণ্ণ বাজারে বা চোরাবাজারে কেনা-বেচা চলবেই। কিন্তু এ



সোভিয়েট রাশিয়ার ‘জিস’ নামক এক শ্রেণীর মোটর গাড়ী

কথা সত্য, যে এক ব্রিটেন বাদে যুদ্ধকালীন ইউরোপে বোধ হয় সোভিয়েট রাশিয়ার গুপ্ত-বাজারই সব চেয়ে ক্ষুদ্র ছিল। তা হলেও ব্ল্যাক-মার্কেট তখনও ছিল এবং এখনও আছে।

বর্তমান বাসস্থানাভাব হুর্দলচরিত্র বাড়ীওয়ালাদের সম্মুখে প্রবৃদ্ধ হওয়ার সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত করেছে। নিউ ইয়র্কে আজকাল বাসস্থানের যে রকম টানাটানি পড়েছে, মক্কাতে প্রায় তার দশগুণ বেশী। একটি উদাহরণ দিচ্ছি,—একটি মধ্যশ্রেণীর গৃহস্থপরিবার বাস করে মাত্র একটি ঘরে, সে ঘরের মধ্যে একটি খাবার টেবিল, চারদিকে দেওয়াল ঘিরে রয়েছে শোবার ষাট। রান্নাঘর ও স্নানাগার প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাগে ব্যবহার করতে হয়, স্নতরাণ পরস্পরের মধ্যে স্কাব রাখা একান্ত আবশ্যক। কোন অল্পবয়স্ক বিবাহিত দম্পতিকে নিতুতে বাস করতে হ'লে ঘরের মধ্যে পর্দা, ইত্যাদি দিয়ে ঘরের কিয়দংশ ভাগ করে নিতে হয়। মক্কা শহরের লোকসংখ্যা এমন ভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে সোভিয়েট সরকার এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না, বেশ বড়রকম আয়োজন



করেই বাসস্থান নির্মাণ করা শুরু হয়, কিন্তু যুদ্ধের দরুন এই প্রচেষ্টা পণ্ড হয়ে যায় এবং এখনও মস্কোর ক্রেমলীন প্রাসাদের পাশ দিয়ে চতুর্দিকে যে সব রাজপথ চলে গেছে তার দু'ধারে অর্ধ-নির্মিত বাড়ীর কাঠামোগুলো পড়ে আছে।

বাসস্থানের এ রকম মারাত্মক অভাব থাকা সত্ত্বেও বাড়ীভাড়া এখনো খুব সামান্যই রয়েছে, এত কম যে, যে সব পরিবারের আয় অতি অল্প তারাও ঘরভাড়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয় না। নিয়ম হচ্ছে, যে সব লোক মস্কোতে কাজ করে, তারাই প্রথমে থাকবার জায়গা পাবে এবং তার জন্ত কাকে প্রথম সুযোগ দেওয়া হবে তার নিয়মাবলীও

আছে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময় কোন বাসিন্দার মৃত্যু হ'লে বা কেউ অসুস্থ চলে যাওয়ার দরুন কোন ঘর খালি হয়ে গেলেও সেকথা সরকারী দপ্তরে পৌঁছায় না। ইতিমধ্যে যে সব দম্পতির বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, তাদেরও স্থান-ভাবে এক ঘরে বাস করতে হয়; নববিবাহিত বর তার বধূর পরিবারের সঙ্গেই বাস করতে বাধ্য হয়, শহরে নবগতরা এসে তাদের পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে তাদের ঘরেই আর এক একখানি বিছানা পেতে তাদেরও স্থান দিতে গীড়াগীড়ি করে। এ ছাড়া শহরে হাজার হাজার লোক আছে যাদের বাসস্থান পাবার কোন আশা নেই, কারণ আইন অনুসারে তাদের মস্কোতে বাস করবার অধিকার নেই—কারুর ওপর হয়তো রাজনৈতিক কারণে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে, কেউ বা স্বদূর সাইবেরিয়া থেকে ছুটি না নিয়ে কাজ ছেড়ে চলে এসেছে। এমনি একটি মেয়ে ছয় মাস তার এক বন্ধুর হোটেলের কক্ষে গোপনে বাস করবার পর হোটেলে একটি ঘর পায়—তার ভাড়া অবশ্য অতি সামান্য, কিন্তু ঘরটি পেতে ম্যানেজারকে তার যে সেলামী দিতে হয় তার জন্ত তাকে পারিবারিক উত্তরাধিকারস্বত্রে প্রাপ্ত একটি বহুমূল্য মুক্তার মালা বিক্রী করতে হয়।

যে-কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির কাছে যদি কোন একটি ছুপ্রাপ্য বস্ত্র থাকে (সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন অনেক জিনিষই ছুপ্রাপ্য হয়ে পড়েছে), সে তার জন্ত অভাবনীয় দাম চাইতে পারে। যে সব রুশ সৈন্ত এখন জার্মানীতে আছে তারা প্রত্যেকেই হাতখড়ি যোগাড় করতে ব্যস্ত, তাদের যে সময় সম্বন্ধে অত্যধিক আগ্রহ আছে তা নয়, আসল ব্যাপার হচ্ছে যে-কোন সাধারণ ভাল খড়িরই দাম ছিল তিন হাজার রুবল—বাজার খড়িতে ছেয়ে যাওয়ার পূর্বে—সাধারণ কারখানার শ্রমিকের মাসিক আয়ের পাঁচ-ছয় গুণ টাকা।



সোভিয়েট রাশিয়ার একটি খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়-কেন্দ্র

ভাল মজবুত একটি ধূমপানের পাইপ, একটি সৌখীন নেকটাই বা দুটি আমেরিকান লিপ-ষ্টিক কিনতে হ'লে দুই সপ্তাহের আয় খরচ করতে হয়। আমেরিকার প্রচারপত্র “আমেরিকা”র প্রকৃত মূল্য হচ্ছে দশ রুবল, কিন্তু এই পত্রিকার মাত্র কয়েক-খণ্ড যায় হাসপাতালগুলিতে, লাইব্রেরিসমূহে, কয়েকটি ক্লাবে এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী রাজকর্মচারীর কাছে। কিন্তু এ ছাড়াও বহুসংখ্যক লোক বহিজর্গং সম্বন্ধে খবরাখবর জানতে চায় বলে এবং পত্রিকাটি দেখতেও সুন্দর বলে বেসরকারী ভাবে বিক্রী হ'লে এর মূল্য কখনও আশী রুবলে দাঁড়ায়—ব্যক্তিগত ভাবে হাত বদলালে কখনও কখনও এই পত্রিকার বিনিময়ে, যে থিয়েটারে সব টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে, সেরকম স্থানেও দুইখানি টিকিট পাওয়া যায়, কিম্বা নিজের মোটরগাড়ীর জন্ত ষ্টোরজ ব্যাটারী পাবার সুযোগ পাওয়া যায়, কখনও বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করা যায়।

অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়াতে যে কেবলমাত্র ব্যবসা করেই শ্রায়সদ্ধত বা বে-আইনী মতে ধনলাভ করা যায় তা নয়; ব্যক্তিগত ভাবে কোনো বিশেষ কর্মোজ্জমে প্রবোধিত হবার জন্ত আর্থিক পুরস্কারই যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, সোভিয়েট সরকার দৃঢ়ভাবে তা বিশ্বাস করে। প্রতি কর্মক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে প্রস্তুতকারীরা দক্ষতার সহিত ও স্নিগ্ধ ভাবে কাজ করবার চেষ্টা করে সেই উদ্দেশ্যে। প্রায় সব শ্রমিককেই প্রতিটি কার্যের জন্ত পারিতোষিক দেওয়া হয় এবং যারা তাদের সাধারণ গড় পরিমাণের চেয়ে বেশী কাজ দেখাতে পারে, তাদের কাজ হিসেবে যা পাওয়া উচিত তার চেয়ে ঢের বেশী পুরস্কার দেওয়া হয়। সুতরাং “ষ্টাখানো ডাইট”রা (যারা শ্রমিকদের কাজের চেয়ে বেশী কাজ দেখাতে পারে) বেশ আরামেই দিন



কাচিয়া...তাদের জীবিকা ও সাধারণ রুশীয় শ্রমিকের আয়ের মধ্যে যা তফাৎ আছে, তা অন্ততঃ আমেরিকার একজন অতি সুদক্ষ, শিল্পপদ্ধতিতে শিক্ষিত কর্মীর ও একজন সাধারণ দিনমজুরের আয়ের তফাতের সমান। রাশিয়ার মত শ্রমশিল্পে নিরত দেশে ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার এবং ইঞ্জিনিয়ার সর্বক্ষণই আবশ্যক এবং যারা কাজে দক্ষতা দেখাতে পারে তারা যে-কোন হিসেবেই অবস্থাপন্ন বলে গণ্য হয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় লেখক এবং শিল্পীসম্প্রদায় বেশ মোটাকম আয়



মদের দোকান

করে। সাধারণতঃ তারা তাদের মূল জীবিকা অর্জন করে কোন একটি বিশেষ সম্মুখ থেকে, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে কাজ করে যায়। যেমন, কোন একজন লেখক হয়ত এভাবে কোন দৈনিক পত্রিকার পত্র-প্রেরক বা সংবাদদাতা হতে পারে, বা সে হয়ত কোন মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে থাকতে পারে। কিন্তু তার এই মূল মাহিনা তার আসল আয়ের একটি অংশ মাত্র। অল্প কোন পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে যদি তার কোন লেখা প্রকাশ করতে চায় তা হলে তার জন্ম তাকে বিশেষ নিয়মাবলী দক্ষিণ দিতে হয়। তা ছাড়া উক্ত লেখক তার লেখা প্রতি গ্রন্থের জন্ম “রয়্যালটি” বা সম্মান-মূল্য পায়, তার পরিমাণ নির্ভর করে বইয়ের কত পাতা, সংস্করণের সংখ্যা, কয়টি সোভিয়েট ভাষায় সে বই অনুবাদিত হয়েছে—এ সবের ওপর। এই সব “রয়্যালটির” যা কিছু ব্যবস্থা করতে হয় তা সব প্রকাশক এবং লেখকের মধ্যে আলোচনা হয়ে ঠিক ধনতত্ত্ব-বাদী দেশের মত আইনানুযায়ী দলিলপত্র লেখাপড়া করা হয়। কোন জনপ্রিয় লেখক অনায়াসে রেডিওতে বা এমনি মঞ্চে বক্তৃতা দিয়ে নিজের আয়বৃদ্ধি করতে পারে। কোন লেখক যদি বিদেশে বই প্রকাশ করে কিছু ধন অর্জন করে, সে টাকা সে ইচ্ছামত যেখানে খুশী খরচ করতে পারে—কনষ্টানটিন সিমিনড মাত্র অল্প কিছু দিন আগে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে একটি বৃহৎ মোটর গাড়ী

কিনে এনেছেন। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে একজন ইচ্ছে করেই রোজ নিয়মিতভাবে “চ্যাম বোর্ড” নামক নিউ ইয়র্কের বেশ একটি নাম করা রেস্টুরাঁতে খেতেন, সেখানে খেতে হলে বেশ খরচ করতে হয়। মস্কোনিবাসী লেখকদের মধ্যে অনেকেই শহরের একটু বাইরে সুন্দর সাজান গুছান বাড়ীতে বাস করেন।

ডাক্তারদের পক্ষেও সম্মতিপন্ন হওয়া কিছু কঠিন নয়। তাঁদের সবাইকেই রুটিন অনুসারে হাসপাতালে কাজ করবার জন্ম কিছু সময় দিতে হয়, তার জন্ম তাঁদের ধরাবাঁধা মাহিনা আছে, কিন্তু এছাড়া বাকি সময়ে পৃথকভাবে রোগী দেখলে তাঁরা পৃথক ফি নিতে পারেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে-কোন প্রজা প্রয়োজনমত বিনা খরচে বা নামমাত্র খরচে ডাক্তারের এবং হাসপাতালের চিকিৎসা পেতে পারে, কিন্তু সে যদি নিজের ইচ্ছানুসারে কোন বিশেষ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্ম যায়, তা হলে তার প্রতিদানে উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়।

নর্তকী এবং ছায়াচিত্র অভিনেত্রীরাও সুখে জীবনযাপন করতে পারে। ছোটবেলায় প্রতিভার লক্ষণ দেখা গেলে তাদের বিশিষ্ট শিক্ষালয়ে ভর্তি করা হয়, সেখানে অগাধ সাধারণ বিজ্ঞানময় শিক্ষার্থীদের চেয়ে উত্তম মধ্যমভোক্তাদের ব্যবস্থা আছে এবং শিক্ষালাভের জন্ম টের বেশী পরিশ্রম করতে হয়। পরে তারা ধরাবাঁধা মাহিনা হিসাবে বেশ মোট টাকা পায় এবং তার ওপর আলাদাভাবে কনসার্টবান্দন, অভিনয় ইত্যাদি করে, অথবা সেই সঙ্গে বেতার-শিল্পী হয়ে উপার্জন করতে পারে। যুদ্ধের সময় আমেরিকার অভিনেতা ও শিল্পীদের মতন রুশীয় শিল্পীরাও সৈন্যদের আনন্দদান করবার জন্ম ঘুরে ঘুরে বিনা পারিশ্রমিকে অভিনয় ইত্যাদি করেছিল।

বৈজ্ঞানিক প্রতিভা এবং উদ্ভাবনী শক্তি যার আছে এমন ব্যক্তিও হঠাৎ ধনবান হয়ে যেতে পারে। নূতন এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের কিছু আবিষ্কার করলে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করবার আশা আছে—তা নূতন প্রণালীতে বল-বেয়ারিং তৈয়ারী করবার পছন্দ হোক বা অজানা নতুন টিনের খনির খোঁজই হোক। এই ধরনের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার সম্বন্ধে দেশ জুড়ে প্রচার করা হয়, কারণ তার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে নূতন চেষ্টার উদ্বীপনা করা। লোভনীয় পুরস্কারের উপরেও একটি বিশেষ সুবিধা আছে, এই পুরস্কারের টাকার থেকে কিছু আয়কর দিতে হয় না।

জীবিকার জন্ম বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বনকারীদের মধ্যে সব চেয়ে উপরের ধাপে হচ্ছে লেখক, শিল্পী, সুরশিল্পী, নর্তকী, রঙ্গমঞ্চ এবং ছায়াচিত্রের অভিনেতা, এর সঙ্গে আছে ফ্যাক্টরী ম্যানেজার ও ইঞ্জিনিয়ার। এর বেশ কয়েক ধাপ নীচে রয়েছে নানা উপজীবিকায় নিরত ব্যক্তিবর্গ—যেমন, চিকিৎসক, আইনজ্ঞ, সেনা ও নৌ-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, শিল্প-পদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষিত কর্মী, কারিগর এবং মধ্য-এশিয়ার নূতন

ফলসেচ-প্রণালী দ্বারা উর্বর-করা কৃষি-ক্ষেত্রগুলিতে যে সব কৃষিকর্মী রয়েছে, সেই সব লোক। একেবারে নীচের ধাপে রয়েছে কেরাণীকুল, সাধারণ সৈনিক ইত্যাদি, অধিকাংশই কৃষক ও মজুর। দুই বছর আগে পর্যন্ত শিক্ষকদেরও এই সর্বনিম্ন ধাপে ফেলা হ'ত। কিন্তু ইদানীং তাদের বেতন হঠাৎ তিনগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের কারিগরদের সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ফেলা যায়।

ব্রিটেন, আমেরিকা বা ফ্রান্সের তুলনায় সোভিয়েট রাশিয়াতে “ইনকম ট্যাক্স” খুব সামান্যই দিতে হয়। সব চেয়ে নিম্নশ্রেণীর আর যাদের—যেমন সাধারণ মজুর এবং কেরাণী, তাদের আরের শতকরা দুই থেকে তিন ভাগ ট্যাক্স দিতে হয় এবং এর মধ্যে যাদের পরিবারে তিন জন বা তার বেশী আশ্রিত আছে তাদের এই ট্যাক্স কম দিতে হয়, অতদের চেয়ে শতকরা ত্রিশভাগ কম। উপরের ধাপে আবার যে সব লেখক বা শিল্পী ইত্যাদির বার্ষিক আয় ৩০০,০০০ রুবল অথবা তারও বেশী তাদের ট্যাক্স শতকরা পঞ্চাশ ভাগই হয়ে থাকে। কৃষিকর্মীদের বেলায় নিয়ম হচ্ছে যে, সমবায় কৃষিক্ষেত্র থেকে তারা যা লাভ করে তার থেকে ট্যাক্স কিছু দিতে হয় না, তবে তাদের ব্যক্তিগত কৃষিক্ষেত্র থেকে যা লাভ হয় তার থেকে ট্যাক্স কিছু দিতে হয়, এর সর্বোচ্চ হার হচ্ছে বার্ষিক আট হাজার রুবলের পিছ শতকরা ত্রিশ ভাগ। ১৯৪২ সাল থেকে উত্তরাধিকারস্বত্রে দেয় খাজনা বা ট্যাক্স ইত্যাদি উঠে গেছে।

কয়েক শ্রেণীর লোককে একেবারেই ট্যাক্স দিতে হয় না, তার মধ্যে পড়ে সেনা-বিভাগের লোক এবং তাদের পরিবারবর্গ, স্বর্ণ, রৌপ্য, টিন, গ্লাটিনাম প্রভৃতি বহুমূল্য ধাতুর সন্ধানে যারা কাজ করে—সেই সব লোক যারা পেনসনের ওপর নির্ভর করে, যে সব কর্মীর মাসিক আয় ২৬০ রুবলের কম, নতুন জিনিষের উদ্ভাবক এবং আবিষ্কারকগণ, মাসে ২১০

রুবলের কম যুক্তিধারী ছাত্রী, এবং এক শ্রেণীর লোক যাদের “হিরোজ অব সোভিয়েট সোবার” বলা হয়। অবশ্য, সত্য কথা বলতে গেলে, যাদের এমনি আরের ওপর ট্যাক্স দিতে হয় না, তাদেরও অতভাবে একটি প্রচুর কর দিতে হয়, তার রকম অল্পপ। এর ফলেই রুবল এবং ডলার বা পাউণ্ডের মূল্য তুলনামূলক ভাবে নির্ধারণ করা যুখা এবং হাঙ্গর প্রয়াস হয়ে পড়ে। “নিউ ইয়র্ক টাইমস” পত্রিকার একজন লেখক কিছুদিন আগে লিখেছিলেন যে, এক জন সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধিবাসী যে সব দ্রব্য কেনে তার জন্ত আমেরিকাবাসীর চেয়ে তাকে ঢের বেশী অর্থদণ্ড দিতে হয় পরিগ্রহের দিক দিয়ে। তুলনা করে দেখা গিয়েছে যে, এই হিসেবে রুশীয় ও ব্রিটিশ জনসাধারণ, বা রুশীয় ও ইতালীয় বা মেক্সিকোবাসীর মধ্যে এত বেশী প্রভেদ নেই। কিন্তু প্রত্যেক রুশিয়ার ক্রয় করা দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে নিহিত আছে সুবহুৎ ফ্যাক্টরী ও প্রমিশ্রিত গড়ে তোলার সম্ভাবনা। স্থলের ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে মধ্যাহ্নের আহার-করান, অণুপরমাণু সম্বন্ধে অমুসন্ধান, শাসনকার্য নির্বাহের জন্ত বিরাট আমলাতন্ত্র এবং তার অপটুতা, অল্পশত্রু নির্দাণ, বাস-স্থান তৈরির জন্ত অর্থ সাহায্য করা, ফ্যাক্টরী শ্রমিকদের ক্রিমিয়াতে গিয়ে ছুটি-উপভোগ করবার দায়িত্ব বহন এ সব তো আছেই—উপরন্তু মস্কো শহরে “দি প্যালেস অব দি সোভিয়েটস”—“সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রাসাদ,” আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে যাতে এক দিন সে উচ্চতায় “এম্পায়ার স্টেট”-কেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই গোপন “ট্যাক্সটি”র জন্তই বিশেষ সম্ভ্রতিপন্ন রুশীয় যে-কোন অবস্থাপন্ন আমেরিকাবাসীর মতই হালচালে জীবনযাপন করতে পারে। কিন্তু আর একটি লক্ষ্য করবার মত জিনিষ হচ্ছে, সোভিয়েট রাশিয়ার ধনী ও অবস্থাপন্ন লোকেরা তাদের দেশের জন-সাধারণের চেয়ে বহুগুণ স্নেহে স্বত্তিতে জীবন যাপন করে।

## বরষার গান

শ্রীশান্তি পাল

এসেছে বরষা, এসেছে বরষা  
বিজলী বিহসি চমকে।  
এ কি উচ্ছ্বাস মেঘ-ডগ্বরে  
অধরে ডিমি-ডমকে।  
বিজলী বিহসি চমকে।  
আজি এমনি মধুর যামিনী—  
তোরা কেমনে গোয়াবি কামিনী?  
হের তালীবন ঘন কাঁপিছে সঘন  
রিম্ রিম্ ঝম্ ঝমকে।  
বিজলী বিহসি চমকে।

আজি নুপুরে নৃত্যে রণনে  
এস চঞ্চল চল-চরণে,  
এস ঘোঁবন লোল চরকি উছল  
অঞ্চল ঝাপি ঠমকে।  
বিজলী বিহসি চমকে।  
ওগো এসেছে বরষা ঝামল সরস।  
মীড়-মুর্ছনা-গমকে।  
দারুণ দামিনী দমকে।



## অমৃতের উত্তরাধিকার

শ্রীমুনীলকুমার বসু

মায়ের চিঠিখানা পাওয়ার পর থেকে বারবারই মনে পড়ছে রেণুর কথা। আমার বাণ্যের সঙ্গিনী রেণু, দীর্ঘ দশ বছরের উদাসীন বিচ্ছেদের ওপারে যাকে ফেলে রেখে এসেছি। বছর পাঁচেক আগে একবার যখন ওর সঙ্গে দেখা হয়, তখন সে পাকা গৃহিণী এবং অভিজ্ঞ জননী। তার পর দেখা হয় নি, কেননা বিয়ের পর থেকে বরাবরই রেণু স্বামীর সঙ্গে দূর মফস্বল শহরে থেকেছে। হঠাৎ মায়ের চিঠিতে জানলাম মাসখানেক হ'ল রেণুরা কলকাতায় এসেছে। এসেই মাকে চিঠি দিয়েছে রেণু আমার খোঁজ করে, ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়েছে আমাকে দেখা করবার অনুরোধ জানিয়ে। তাই অনেক দিন পর বারবারই মনে পড়ছে রেণুর কথা। জানি, জীবনের চেহারাটা আজ আমূল বদলে গেছে, বাণ্যে যে আনন্দ উৎসারিত হ'ত ঐ মেয়েটিকে কেন্দ্র করে, জানি সে উৎস আজ শুকিয়ে গেছে। তবু মনে হ'ল হয়ত আজও ভাল লাগবে সেই প্রায় ভুলে যাওয়া রেণুকে, ভাল লাগবে তার মুখে পুরানো ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা ওঁচাটতে। তাই রবিবার অপরাহ্নে বেরিয়ে পড়লাম ফটক মিশ্রির গলির উদ্দেশ্যে।

মধ্যবিত্ত ও নিয়ন্ত্রণের বাসিন্দাদের ভিড়ে এ স্থানটি অদ্ভুত রকমের শিথিল, দারিদ্র্যের ছরপনের কলক এরা যেন লজ্জায় গোপন করতে এসেছে এই সর্পিলা গলির মধ্যে, লাশময়ী নগরীর এই অন্ধকার অন্তহলে। গলিটা এত সঙ্কীর্ণ এবং ঘোরালো যে সন্ধ্যার অন্ধকারে মনে হচ্ছিল যেন তুতেন-ধামেনের তমিষ্র সমাধিগৃহের প্রবেশ করছি। তার উপর আবার এক নাছোড়বান্দা রিক্সাওয়ালার গলির মধ্যে রিক্সাটাকে নিয়ে গিয়ে আর বাইরে আনতে পারছে না। ফলে পথটা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে এবং পাড়ার ছেলেরা রিক্সাওয়ালাকে রীতিমত নাকাল করতে লেগেছে।

গলির দু'ধারে পুঞ্জীভূত জঞ্জাল থেকে বেরুচ্ছে বীভৎস গন্ধ, তার উপর ধোঁয়ায় চারদিক ছেয়ে গেছে। একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, ৩৩৭ ডি নং বাড়ীটা কোথায়? অমনি চার-পাঁচটি উৎসাহী ছেলে এসে আমাকে প্রশ্রবানে জর্জরিত করে তুলল,—‘কার বাড়ী যাবেন? কত নম্বর বললেন? রাস্তার নামটি কি? ঠিকানা ভুল হয় নিতে?’ ওদের পরহিত-ব্রতকে ধন্যবাদ। কেননা ওদেরই সাহায্যে সেই অন্ধকার গোলকধাঁধার মধ্যে উক্ত নম্বরের বাড়ীটার ভগ্নাংশ খুঁজে বার করতে পারলাম।

একটা ছোট গ্যাভসেতে ঘরের মেঝেয় বসে ষট্‌চারেক

ছেলে মোমবাতি জালিয়ে বই সামনে নিয়ে কলরব করছে। ঘরের মধ্যে ঢুকে অবস্থাটা উপলব্ধি করতে না করতেই—সুনতে পেলাম তীব্র কণ্ঠের চীৎকার, ‘তুমি সাক্ষী থেকে, ভগবান, তুমি তিরিহুগির সার, তুমি শুনো সব, আমারে বলে মিথ্যেবাদী। খসে পড়বে, ওর জিবে খসে পড়বে, আমি অভিলাপ দিচ্ছি, এ বেরখা হবে না...’

অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এটা কি বিমলবাবুর বাড়ী, রেণু কি এখানে থাকে?’ একটি ছেলে ছুটে চলে গেল বাড়ীর মধ্যে। আর একটি ছেলে পাশের ঘরে গিয়ে শাসনের সুরে বললে, ‘ধাম না ঠাকুমা, বাইরে একজন ভদ্র-লোক এসেছেন।’ উত্তরে শোনা গেল, ভদ্রর নাক এসেছেন তাতে আমার কি, আমি হক কথা বলবই।

পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এল রেণু—না, রেণুর প্রেতমূর্তি বললেই ভাল হয়। কে, অভয়দা? না? কি ভাগ্যি আমার। বলে নীচ হয়ে পায়ের ধুলো নিতে এল ও। আমি ওকে ধামিয়ে দিয়ে বললাম, এ তোমার কি হাল হয়েছে রেণু? তোকে যে আর চেনা যায় না। মোমের আলোয় এক ক্ষীণ পরাজিত দীপ্তি ওর শীর্ণ তোবড়ানো গালে ক্ষণিকের জ্বল চমক দিয়ে গেল। আমি বললাম, তুই এত রোগা হয়ে গেছিস? চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে? কি হয়েছে তোমার? উত্তর না দিয়ে ও শুধু বললে, ভিতরে এস অভয়দা, প্রণাম কর, ওরে বিস্তু, পন্টু, ঘণ্টা, ভোম্বল, ইনি তোদের মামা হন...।

ভিতরে ঢুকলাম, আর একটি সঙ্কীর্ণ গলিপথে বললেই চলে। আসলে গলি নয়, একখানা লম্বাটে ঘর। এক দিকে তার কিছু কমলা সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে—অল্প দিকে, সভয়ে চেয়ে দেখি, মাটিতে একটা ময়লা ছেঁড়া বিছানা পাতা—পাশেই কালীর একখানা ছবির সামনে প্রদীপ জালিয়ে পূজার ভঙ্গিতে বসে এক যুগ্মা এদিকে ওদিকে কুতূহলী চোখে চাইছেন। পূজায় তাকে খুব নিবিষ্টচিত্ত মনে হ'ল না। যেতে যেতে সুনতে পেলাম নিজের মনেই তিনি বলে চলছেন। হেঃ রোগা হয়ে গেছে না আরও কিছু, ভাবি তো হাল ছিল, রোগা, চিমড়ে-পড়া এক বউ নিয়ে একেছিলাম। তা' বউরি তো আর বসে বসে খাওয়াতি পারি নে, খেটে খাতি তো হবে...।

পাশের ঘরে একটি মোড়ার বসেছি। যুগ্মার কণ্ঠস্বর তখনো কানে আসছে, ‘ওরে ও পন্টু, ও বিস্তু, বলি ও লোকটা কেভা?’ ‘শুনলে না, ঠাকুমা’, বললে বিস্তু, ‘উনি

আমাদের মামা হন।' 'হ্যাঁ, মামা না আরও কিছু,' বুদ্ধা বললেন, 'কোথাকার কে, বোন পাতাতি এসে হাজির হ'ল। বলি ও রাতিরি থাকতি চাবে না তো?' 'জানি না' বুদ্ধা বললে, 'তুমি পুজো করতে বসে বড় বকবক কর ঠাকুমা।' 'তুই থাম, বখাটে ছোঁড়া,' বুদ্ধা বললেন, 'তোরা মা'পোরা মিলে আমাদের আলায়ে খানি।'

বিবর্ণ আলোয় রেণুর মুখে ব্যর্থতার বিশীর্ণ রেখা ফুটে উঠেছে পেন্সিল স্কেচের মত, কোটিরগত চোখ থেকে ভ্রমিত দীপ্তি প্রতিফলিত হচ্ছে বোলাটে কাচের মত। মনে হ'ল বহু বৎসরের বিস্থতি-ধেরা এক মমি আমার সামনে উঠে এসেছে পিরামিডের গহ্বর থেকে।

ছেলেগুলি এসে আমাদের ঘিরে ধরেছে। 'গায়ের উপর খুঁকে পোড়ো না পন্টু,' রেণু বললে। বৃষ্ঠা ভীত অস্থসন্ধিৎসা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি বুঝি আমাদের মামা হন? বিস্ত্র বয়সে বড়, অতএব বৃষ্ঠার প্রগলভতা সে সহ্য করলে না। বললে, তুই থাম না। বৃষ্ঠার সপ্রতিভ ভাব আমার ভারি ভাল লাগল, ওকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি পড় খোকা?' ওর হয়ে জবাব দিলে রেণু, পড়াশুনোয় ওরা চার ভাই-ই বেশ ভাল। বৃষ্ঠা একটু দুঃস্থ। কিন্তু ভারি বুদ্ধিমান, এখনই ও ক্লাস ফোরের বই সব পড়ছে। আবার বিস্ত্র কেমন ছবি আঁকতে পারে। দেখা না-তোরা মামাকে, সেই মহাত্মা গান্ধীর ছবিখানা।

রেণুর বিশীর্ণ মুখ এক অলৌকিক আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে আলো মাতৃগর্ভের। অতলম্পর্ষ অম্লহৃতির আবেশে ওর চোখ দুটি যেন দীর্ঘায়ত হয়ে সমতার ভারে নিম্পন্দ হয়ে গেছে। মুক্ত পুলকের দৃষ্টিতে ও চেয়ে আছে ওর ছেলেদের দিকে। ইতিমধ্যে আর একখানি কুতূহলী মুখ আমার পানে উঁকি দিচ্ছে, গোছা গোছা কৌকড়ানো চুলে সে মুখের অর্ধেক ঢাকা। রেণু ডাকলে, 'এদিকে আয় না পুণিমা। প্রণাম কর। এ আমার মেরে, ঐ একটাই'। মেয়েটি এগিয়ে এল, সুন্দর, সহাস্যমুখ—রুগ, তবু প্রাণের আনন্দে উজ্জল। রেণু বললে, তোর মামার জন্মে একটু চা করে নিয়ে আয়। আমি বললাম, সে কি, অতটুকু মেয়ে চা করবে কি করে? রেণু বললে, ও সব পারে। আমি তো এই শরীর নিয়ে সব পেরে উঠি না। তাই ওকে করতে হয়। একটু আধটু রাঁধতেও পারে। রাঁধবার লোক তো আর নেই।

শিশুর কান্নার শব্দে সচকিত হয়ে উঠলাম, ঠিক কান্না নয়, অব্যক্ত যন্ত্রণার একটা ভাষাহীন প্রকাশ। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, এবার চেয়ে দেখি, রেণুর ঠিক পাশেই কাঁধা দিয়ে ঢাকা একটা শিশু শুয়ে আছে। স্বল্প আলোয় ভাল করে দেখা যাচ্ছে না, শুধু তার আকারটা দৃষ্টগোচর হচ্ছে মাত্র। রেণু ধীরে ধীরে ওর গায়ে চাপড়াতো চাপড়াতো বললে, 'ইস, গা

একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। বৃষ্ঠা ছুটে এসে শিশুটির গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'তাই ত'। রেণু বললে, 'আমার কোলের ছেলে, দিন দশেক হ'ল অস্থখ করেছে, সন্ধি জর আর কাশি। পরন্তু থেকে বেশ একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে'। শিশুটি নড়ে উঠল, তার পর স্থর করলে প্রবল কাশি। রেণু তাকে কোলে তুলে নিয়ে মুহূ দোলা দিতে দিতে তার মুখে তুলে দিলে বিশীর্ণ শুন দ্বিধাহীন অকপট সারল্যে, তার পর বললে, বাচ্চাটার অস্থখের জন্মে মনে শাস্তি নেই।

ছেলেরা বাইরের ঘরে ফিরে গিয়ে পুনরায় কলরব স্রব করলে। পাশের ঘরে বুদ্ধার কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, এ সংসারে শাস্তি নেই, উজ্জ্বল বাবে এ সংসার, যে সংসারে বউ এমন, ছেলেপিলে এমন...। আমি সন্তোষে জিজ্ঞাসা করলাম, 'উনি কি তোর শাস্ত্রী রে, রেণু?' রেণু বললে, 'হ্যাঁ, ওই এক রকমের মাংস, খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে দিনরাতই খালি খিটখিট করেন।...পুণিমা কানা-ভাঙা কাঁচের প্লাসে চা নিয়ে এল। বুদ্ধার স্বর সপ্তমে উঠেছে, যাবে, এড়াও যাবে, একটা গেছে, এড়াও...। পুণিমা ছুটে গিয়ে দাবড়ি দিয়ে বললে, 'তুমি থামো না ঠাকুমা'। কেন না—বুদ্ধা দ্বিগুণ তেজে জলে উঠলেন, আমি কি কাউকে ভয় করি? কোন বেটাবেটিকে?

রেণুর মুখখানা বাসি ফুলের মত বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি বললাম, তোর কাঁটি ছেলেমেয়ে রে? ও বললে, বেঁচে আছে ছাঁটি, বাইরের ঘরে ওই চারটি ছেলে আর কোলের এটা। মেয়ে ঐ পুণিমা। কিন্তু...। বলতে বলতে বৃষ্ঠাও ধেম গেল রেণু, ইতস্তত করতে করতে, কি যেন অদম্য আবেগের ঝড় বুকে চেপে রাখবার চেষ্টা করতে করতে বললে, কিন্তু...আর একটা ছেলে ছিল আমার—এই এরই মত। আর বছর ঠিক এই সময় সে চলে গেছে—সেই আমার মিষ্ট... বলতে বলতে ওর রক্ত আবেগ চোখ দিয়ে অজস্র অশ্রুধারায় ঝরে পড়ল।

আমি শুধু শুনে যাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক চাইছিলাম। সমস্ত ঘরখানায় কি কর্তোর নিখাসরোধী দারিদ্র্যের বিষাক্ত আবহাওয়া চারদিক থেকে যেন ঘিরে ধরেছে, নিঃশ্বাস রোধ করে মেরে ফেলতে চাইছে—আলো ও হাওয়া বর্জিত সেই ছোট ঘরখানায় মেঝের উপরে শুয়ে সেই 'মুখু' শিশুটি প্রাণবায়ুকে আটকে রাখবার জন্মে যেন মরীয়া হয়ে চেষ্টা করছে। পাশে বসে অসহায় জননী। রেণু একটু আত্মসম্বৃত হয়ে বললে, মিষ্টর জন্মের পর থেকে আমার স্মৃতিকা হয়। সে কিন্তু চলে গেল আমাদের ছেড়ে। তার পর যখন পেটে এল এই নানটু, তখন আমার শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। প্রায় না বাঁচার মত। কিন্তু কি সুন্দর চেহারা, কি সুন্দর স্বাস্থ্য হয়েছিল এর। শুধু অস্থখ অস্থখ বাচ্চা আমার সারা

হয়ে গেল, কিন্তু এবারে তাকে বাঁচাতে পারব কিনা...বলতে বলতে আবার সে ঝর ঝর করে কঁদে ফেলল।

সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা পাচ্ছিলাম না, তবু বললাম, ভয় নেই তোর, বাচ্চাদের ও একটু-আধটু অল্পখবিত্ত্ব হয়েই থাকে। তা কি ওষুধ খাওয়াচ্ছিস ওকে? রেণু বললে, গোড়ার দিকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাচ্ছিল। তাতে কোন ফল হয় নি। এখন খাচ্ছে তারিগী বৈরাগীর জলপড়া, আমি বললাম, সে কি? এই মারাত্মক অস্থখে জলপড়া? ও বললে, কি করব, শাস্ত্রীর ওতে অগাধ বিশ্বাস। তা ছাড়া। তা ছাড়া...মানে...আর কিছু বলতে পারলে না।

বুললাম ও আর্থিক অসচ্ছলতার ইঙ্গিত করছে। ও প্রসঙ্গ আর তুললাম না। তার প্রয়োজনও ছিল না। ওর জীবনের পূর্ণাবয়ব একখানি সর্বাঙ্গীণ চিত্র আমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে, সেখানে আমি সবই দেখতে পাচ্ছি। মনে হ'ল বহু দূরে চলে গেছি। অনেক দূরে, যৌবনের খেয়াপারে, সেখানে হাস্যমুখী সঙ্গিনী রেণু, কৌরুড়ান চুল, ছিপছিপে চেহারা। রেণুর মেয়েটির চুল ঠিক তার মায়ের মতই কৌকড়ানো। আর রেণুর? ওর মাথার চুল তো প্রায় উঠেই গেছে, কয়েক গাছা আছে মাত্র ছুড়ির মত। রেণু অতীতের ভগ্নশূণ্য, যৌবনের ধ্বংসাবশেষ।

অভয়দা, রেণু ডাকলে। চমকে উঠে বললাম, 'বিমল বাবু তো এখনও ফিরলেন না?' ও বললে, 'ওঁর ফিরতে অনেক রাত হয়। আপিস থেকে বেরিয়ে ছোটো টিউশনি করে তবে ফেরেন।'

সদরের দরজা পর্যন্ত এল রেণু আমাকে এগিয়ে দিতে। 'ভাইকে নিয়ে তো বসে গল্প করা হ'ল অনেকক্ষণ,' বৃদ্ধার ক্রুর কণ্ঠ শোনা গেল, বলি আমার ছ'খানা রুটি কি তৈরী হবে, না হবে না?'

'আমার অবস্থা, সবই তো দেখলে অভয়দা,' রেণু বললে, 'আর একদিন এসো কিন্তু'। ছেলেরা আবার আমার ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ওদের বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে রেণুকে আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাইরে পা বাড়িয়েছি—এমন সময় রেণু হঠাৎ বলে উঠল, একটা কথা বলব অভয়দা? তুমি কাক্সের মানুষ, তোমার কি সময় হবে? আমি আশ্চর্যিত হয়ে বললাম, কি বলবি বল? আমি সময় করে নেব তোর জন্তে। অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে ও বললে, একটা জিনিস আনবার কথা বলছিলাম। মানে ওঁর তো সময় হয় না, রবিবারেও উপরি থাটুনি। আর তো কোনো লোক নেই আমার। আমি বললাম, বল না কি আনতে হবে? ও ইতস্তত করে বললে, বলছিলাম কি, একটা মাহুলি। আমাকে বিস্মিত হবার সুযোগ না দিয়ে বললে, বরানগরে এক সন্ন্যাসী এসেছেন, কালী-সাধক। তাঁর মাহুলির নাকি ভয়ানক ক্ষমতা। এ পাড়ার অনেকেই

এনেছে, ফলও পেয়েছে খুব ভাল। এই তো বিনয়বাবুর ছেলের অশ্বলের ব্যথা ছিল। তারপর পুটির মা'র ছিল বুক ধড়-ফড়ানি—সব সেরে গেছে, আরও অনেকে টের উপকার পেয়েছে। তাই আমার খুব ইচ্ছে একটা মাহুলি এনে আমার নান্টুকে পরিয়ে দেখি।—মাহুলিতে বিশ্বাস করি না, তবু মনের উদগত আবেগ চেপে বললাম, দেব, নিশ্চয় এনে দেব তোকে। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ও বললে, দেবে? একটু দাঁড়াও তবে। পূর্ণিমা যা তো মা, ঐ তাকের উপর সিঁহরের কোটোর মধ্যে সোয়া পাঁচ আনা পয়সা আছে। সন্ন্যাসীর কাছে ভোগের জন্ত দিতে হয় পয়সা...। আমি বাধা দিয়ে থামিয়ে দিলাম, থাক থাক পয়সা দিতে হবে না। তুই নিশ্চিন্ত থাক রেণু, কাল আমি মাহুলি নিয়ে আসব।

পরদিন আবার সেই নিরানন্দ গলিটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। সন্ধ্যা উত্তরে যাচ্ছে প্রায়। গলির মোড়ে পাড়ার ছেলেদের জটলা। একটা ভ্যাপসা গরু উঠেছে গলির মধ্যে-কার পুঞ্জীভূত জঞ্জাল থেকে, ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে বাতাস হয়েছে ভারাক্রান্ত। নিকটে কোনো বাড়ীতে পুজো হচ্ছে। সেখানকার কাঁসর-খটার শব্দ একটা তীব্র রোল তুলেছে। পকেট থেকে মাহুলিটা বার করে এক বার দেখে নিলাম। মাহুলিতে আস্থা নেই। তবু আজ ছপুরে বরানগরে গিয়ে সন্ন্যাসীকে কাতর অস্থন্ন করে বলেছিলাম, তিনি নেন এই ক্ষুদ্র মাহুলির বুকো নিরাময়ের অমোঘ শক্তি ভরে দেন, এর স্পর্শ মুমূর্ষু শিশুর জরতপ্ত দেহে যেন বুলিয়ে দেয় চন্দনের স্নিগ্ধ প্রলেপ। ভাল করে দেখে নিলাম মাহুলিটাকে। ক্ষুদ্র আমার একটা জিনিষ, তার ভিতরে ওষুধের শিকড় ভরে মোম দিয়ে মুখটা আঁটা। রোগীর কপালে তিনবার ছুঁয়ে রত্নীম স্তোত্র দিয়ে পরিয়ে দিতে হবে তার গলায়। তারপর তার মাকে পাঁচ সিকের ভোগ দেওয়ার মানত করতে হবে। রোগ সেরে গেলে মাকে ছেলে সহ সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে মানত শোধ দিতে হবে। ভাবতে ভাবতে চলে গেছি ওদের বাড়ীর কাছে।

ছেলেগুলো আজ নিঃশব্দে বসে আছে বাইরের ঘরে। বললাম, 'কি রে, তোরা যে আজ বড় চুপচাপ। গোলমাল করছিস না, মারামারি করছিস না, ব্যাপার কি? তোদের মা কোথায়?' 'ভিতরে আছেন আপনি', বললে মণ্টা স্বভাব-বিরুদ্ধ গাভীর্য নিয়ে। একটা ক্লান্ত, করুণ, বিলাপের স্বর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দেখি, রেণুর শাস্ত্রী বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছেন। বললাম, রেণুর সঙ্গে কলহের পরিণাম হয়তো। ভিতর থেকে পুরুষ-কণ্ঠের আওয়াজ পাওয়া গেল, কে রে মণ্টা। কে এলো?—কে, বিমলবাবু নাকি, বেশ মশায়, আপনার যে দেখাই পাওয়া যায় না।' বলতে বলতে ধরে ঢুকলাম। আগুন, আগুন বলে মোড়া

এগিয়ে দিলেন বিমলবাবু। মেঝের শায়িত অবসর রেণু তাকাতাকি উঠে বসে গায়ের কাপড় সামলে নিলে, তার পর মাথার উপর ঘোমটাটা টেনে দিলে—তার পাশে বসে পুর্ণিমা। কাল আপনি আমার জুড়ে অনেকক্ষণ বসেছিলেন শুনলাম,—  
• বললেন বিমলবাবু। আমি বললাম হ্যাঁ, তা বটে, আপনি কেমন আছেন? কই রেণু, তোর ছেলে কই? কেমন আছে আজ? তার জুড়ে মাহুলি নিয়ে এলাম যে, এই নে মাহুলিটা...।

সহসা একটা তীব্র মর্মভেদী আর্তনাদ বিযাক্ত তীরের মত ছুটে এসে আমার বুকের মধ্যে বিধে গেল, আর তার দীর্ঘায়িত প্রতিধ্বনি বিষবাপ্পের মত সমস্ত ঘরখানাকে অসহনীয়-যন্ত্রণায় ভরে তুলল। আকস্মিকতায়, ত্রাসে চমকে উঠলাম। দেখলাম, রেণু উপুড় হয়ে শুয়ে অঝোরে কাঁদছে, আর পুর্ণিমা মায়ের গায়ে আছড়ে পড়ছে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে কালকের সেই সুন্দর, সপ্রতিভ ছেলে ধক্টা,—আজ তার মুখ ঝড়ের মত গম্ভীর।

কোথা থেকে কি যেন ঘটে গেল, অভাবিত, অপ্রত্যাশিত, কাল এখানে ঐ মেঝের উপর শিশুটিকে শোয়া দেখে গেছি। আজ সে নেই। এত শীঘ্র, এত অতর্কিতে মাহুয পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। কেউ তাকে আটকে রাখতে পারে না। এমন কি মায়ের স্নেহাতুর অন্তরও নয়। বললাম, বিমলবাবু এ কি হ'ল। রান হেসে বিমলবাবু বললেন, ভাগ্য। রাখা গেল না, কাল রাতেই চলে গেছে।

রেণু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, গায়ের কাপড় তার বিশৃঙ্খল। লজ্জা পাবার মত সংজ্ঞা নেই ওর। আমি দেখছি ওর অসম্মত দেহ—হাড়-বার-করা, শীর্ণ, মাংসহীন কঙ্কাল যেন। জানি না, ঐ কঙ্কালের নিভৃত নিঃসঙ্গ বুকে কি অমৃত লুকানো আছে যার হাজার ধারায় ঐ মাটি ভেসে গেল।

উদ্ভ্রান্তের মত পথে বেরিয়ে এসেছি, সহ করতে পারি নি বেলীক্ষণ। জনবহুল পথ দিয়ে আবার চলছি। লক্ষ্যহীন ভাবে চলতে চলতে হঠাৎ মনে হ'ল হাতের মুঠির মধ্যে কি যেন রয়েছে। মুঠি খুলে দেখি সেই মাহুলি।

## সংস্কৃতশিক্ষা ও বাঙালী হিন্দু সমাজ

অধ্যাপক শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ রায়

এদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যসমাজ শিক্ষা বলিতে ইংরেজী শিক্ষাই বুঝিয়াছিলেন। মাতৃভাষা ও সংস্কৃত ভাষা সেই দিন হইতেই উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। আপাততঃ তথাকথিত বিজাতীয় শিক্ষার মোহে আমরা এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যাহার দরুন বাংলা ভাষায় চিঠিপত্র লেখা পর্যন্ত আমাদের কাছে লজ্জাকর হইয়া উঠিয়াছিল। স্বনামধন্য স্যার আশুতোষের অন্তর্ভাষণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই আমাদের বঙ্গভাষা-জননী বিশ্ববিদ্যালয়ভবনে প্রবেশের অধিকার লাভ করিলেন। আশুতোষের চিন্তাশক্তির মৌলিকতা ছিল বলিয়া শ্রোতের তৃণের মত তিনি গতানুগতিকতার প্রবাহে ভাসিয়া যান নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার যোগ্য স্থান লাভ যে অত্যাবশ্যক তাহা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন। সেও আজ অনেক দিন হইল। তারপর আমাদের ভাষাজননী ধীরে ধীরে নিজের আসন কায়ম করিয়া লইতেছেন, বঙ্গের বাহিরেও তাঁহার প্রভাব আজ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। ইহা খুবই আনন্দের কথা সন্দেহ নাই—কিন্তু সেই বঙ্গভাষার অস্থিমজ্জা যে-সংস্কৃত ভাষার উপাদানে গঠিত সমগ্র ভারতের সেই মহীয়সী ভাষাজননী মর্যাদা আজ বাংলাদেশের শিক্ষামন্দিরে ধূল্যবলুণ্ঠিত একথা বলিলেও অত্যন্তি হয় না।

কিছু দিন ধরিয়া 'প্রাচ্যবাণীমন্দির'র শ্রীযুক্ত রমা চৌধুরী সংস্কৃত সাহিত্যের অবদান ও উক্ত ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার যোগ্য সেবিকা, তাঁহার প্রয়াস সার্থক হইবে ও বর্তমান শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারগণ তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিবেন বলিয়াই আশা করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বুদ্ধ প্রাঙ্গণে বিবিধকুম্ভসম্মত্রে সংস্কৃতভাষার পূজার স্থান হওয়া এক দিন হয়তো সম্ভব, কিন্তু আমার অজ্ঞকার আলোচ্য বিষয় "টোলের সংস্কৃত শিক্ষা"। যথাযোগ্য উপায়ে এই টোলের অধ্যাপনায় এক দিন শাস্ত্রাদিক্ষা সম্ভব হইয়াছিল। এই শিক্ষা সরকারের অধীন হইলেও ইহাকে নানা কারণে আর প্রকৃত শিক্ষার কোঠায় স্থাপন করা এখন অনেকেরই অনভিপ্রেত। ভবিষ্যৎ জীবনের সহিত সামঞ্জস্য রাখা করিয়া শিক্ষাধারার পরিবর্তন আজ যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যেও দরকার হইয়া পড়িয়াছে, সংস্কৃতশিক্ষার মধ্যেও তাহার অমূরূপ প্রয়োজনীয়তা নিতান্ত অল্প নহে। প্রথমতঃ দেখা উচিত এ জাতীয় টোলের শিক্ষার প্রয়োজন আছে কিনা? যদি প্রয়োজন না থাকে তবে তাহা লইয়া মাথা বামাইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমরা টোলের শিক্ষার ভিতরে দুইটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই—প্রথমটি প্রাচীনভাবধারার সংরক্ষণ; দ্বিতীয়টি শাস্ত্রগ্রন্থ-

সংরক্ষণ। পূর্বে শিষ্যবর্গ গুরু-গৃহে ব্রহ্মচর্যপালনপূর্বক অধ্যয়ন করিত। আচার্য্যেরাই ছিলেন তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী, শিষ্য-দিগকে কোন বেতন দিতে হইত না। অধ্যয়ন শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন কালে যথা অভিরুচি কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দেওয়া হইত—কিন্তু তাহাও বাধ্যতামূলক ছিল না। শিষ্যেরা গুরুগৃহে বাসকালে গুরুর সাংসারিক কার্যে সাহায্য করিতেন এবং আনন্দের সহিত আপন বাড়ীর মতই থাকিতেন। গুরু ও গুরু-পত্নী অপত্যনিবিশেষে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। রবীন্দ্রনাথ গোড়ায় শান্তিনিকেতনে এই ভাবধারার রক্ষার জন্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। শিষ্য গুরুদেবের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইলে, শিক্ষা মাত্র আক্ষরিক না হইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে এবং ক্রমশঃ আধ্যাত্মিকভাবেও তাহার অন্তরে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়। আরশিতে বিশ্বের প্রতিফলনের ছায় গুরুর মহনীয় শিক্ষার ছাপ শিষ্যে সর্বত্রই ফুটিয়া উঠে। টোলে এই আদর্শশিক্ষার কাঠামো এখনও বর্তমান আছে। সংস্কার করিয়া লইতে পারিলে—সমাজ এ বিষয়ে একটু সচেতন হইলে, ইহা অংশতঃ কার্যে পরিণত করা একান্ত অসম্ভব নাও হইতে পারে; কারণ এখনও পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ টোলের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মনে সম্পূর্ণরূপে আসন পাতিয়া লইতে সমর্থ হয় নাই। স্বাবলম্বী-সমাজ গঠন করিতে হইলে এই জাতীয় ভাবধারার অনুবর্তন ফলপ্রসূ হইবে ইহা নিঃসংকোচে বলা যায়। “হাতে কলমে” শিক্ষার সুযোগও ইহাতে সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়। স্তত্রাং বিশেষ চিন্তা করিলে দেখা যায়, টোলে প্রথমোক্ত বৈশিষ্ট্যটির মর্যাদা নিতান্ত অল্প নহে। দ্বিতীয়টির মর্যাদা আরও অনেক বেশী। সংস্কৃত দর্শনাদি বিবিধশাস্ত্রসম্পদের যথার্থ অধিকারী হইতে হইলে শাস্ত্রের নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্ত ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাভূষণ যে সমস্ত অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন সেগুলির সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সেইগুলি যথাযথভাবে পর্যালোচনা করিলে স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তাধারা স্বতঃপরিচ্ছুরিত হইয়া উঠে—বাহার ফলে শাস্ত্রার্থবোধ ও শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ সম্ভব হয়। শাস্ত্রের যথাযথ তাৎপর্য বোধগম্য না হইলে শিষ্যগুরুম্পরার তাহা যে প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব নয় তাহা সহজেই বোঝা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা শাস্ত্রমর্ম সংরক্ষণে অসমর্থ। সংক্ষেপতঃ, উল্লিখিত অপরিহার্য দুইটি কারণে সম্প্রতি টোলের শিক্ষার আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না। এজাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়মন্দিরে যে একান্ত অসম্ভব—এরূপ কথা বলা যাইতেছে না, কিন্তু যে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লিখিত প্রণালীতে শিক্ষাপ্রবর্তন সম্ভব না হয় সে পর্যন্ত কে এই গুরু-কৃত ব্যাভার বহন করিবে? কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই এই কতব্য দুইটির গুরুত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। বর্তমানে শাস্ত্রার্থরক্ষা ছুড়হ ব্যাপার হইয়া

পড়িয়াছে, আমরা শাস্ত্রের মর্মার্থ হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছি...তাই ভবিষ্যৎবেত্তা মহর্ষি উদয়ন চুংখের সহিত বলিয়াছিলেন “জ্ঞানসংস্কারবিজ্ঞানঃ শাস্ত্রেঃ স্বাধ্যায় কর্মণোঃ। হ্রাসদর্শনতো হ্রাসঃ সম্প্রদায়স্য মীরতাম্”—(কুসুমাজ্জলিঃ)। তাঁহার উক্তি অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া যাইতেছে।

যদি বর্তমান সুধীসমাজ মনে করেন, এই দুইটিতে গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন নাই, অথবা অন্য উপায়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে টোলের উদ্দেশ্যই একান্তভাবে তাহাদের কাম্য। আজ ‘টোল’ কথাটি পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালীর কাছে কাছে উপহাসাস্পদ। টোলে অধ্যয়ন করিয়া যাহার কৃতবিদ্য হন তাঁহাদের মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষকে শিক্ষিতের মর্যাদা সময়বিশেষে দেওয়া হইলেও আধিক মর্যাদা তাঁহাদের তাদৃশ দেওয়া হয় না। টোলের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা যেন একান্ত রূপার পাত্র। টোলের শিক্ষার উপর সমাজের অনাস্থা ইহার অগ্রতম কারণ হইলেও অধিকার শিক্ষাধারার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও নিতান্ত অল্প নহে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে আমাদের নিত্য নূতন অভাব পূরণের জন্ত অর্থের অকারণ আবশ্যকতা সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও মোটামুটি জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্তও বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা টের বেশী অর্থের প্রয়োজন। আজ টোলের কৃতবিদ্য পণ্ডিতসম্প্রদায় আধিক মর্যাদায় যদি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের অপেক্ষাও ন্যূন হন তবে সমাজ কেনই বা এই সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্ত যত্নবান হইবে? এই ভাবে যে সংস্কৃতশাস্ত্র-সম্পদের নিকট পৃথিবীর সভ্য-সমাজ ঋণী, আজ তাহা চরম অবনতির স্তরে পৌঁছিয়াছে। আজ সমাজের চিন্তা করার সময় আসিয়াছে। আজ ভারতে হিন্দু সংস্কৃতি বজায় রাখার প্রয়োজন থাকিলে সংস্কৃতশিক্ষাকে অধিকতর মর্যাদাশালী করিতে হইবে। আজ ভারত ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত হইতে চলিয়াছে, স্তত্রাং তাহার নিজস্ব সংস্কৃতির ভাষাকে তাহার মুখে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

ভারতের প্রদেশবিশেষে সংস্কৃতশিক্ষার একটা বিশিষ্ট মর্যাদা আছে কিন্তু বাংলায় তাহার মর্যাদার প্রশ্ন তোলাও যেন অনাবশ্যক বিবেচিত হয়। তাই বাঙালী সুধীসমাজ ও শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষদের নিকট এই বিষয়টি চিন্তা করিবার জন্ত উপস্থাপিত করিতেছি। সংস্কারের যুগ আসিয়াছে—সর্ববিধ সংস্কারের মধ্যে মহুগুয়ের উদ্বোধক শিক্ষাসংস্কারের মূল্য যে সর্বাপেক্ষা বেশী সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই। সমাজে যে যে শিক্ষার প্রয়োজন অপরিহার্য সেগুলির আধিক মর্যাদার এরূপ ভারতময় নিতান্তই অবিস্মৃয়কারিতার পরিচায়ক। সমাজের নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে আশা করা যায়।



যে ইংরেজ জাতি সংস্কৃত ভাষাকে যত ভাষা বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতির চরম অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের উক্তিকে অতিরিক্ত মৰ্যাদা দিয়া এককাল ভারতীয় ভাবধারাকে ও তাহার সংস্কৃতিসমৃদ্ধ

ভাষাকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। কিন্তু আজ ভারতজননী পুনরুজ্জীবিতা ও মুক্ত। এখন আর সংস্কৃত ভাষাকে পাশ্চাত্য বুলির অশ্রুতরূপে যত ভাষা বলিয়া অবমাননা করা আবহুত্যা ন্যাস্তর বলিয়া পরিগণিত হইবে।

## ভারতের বর্তমান সমস্যা

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার পুরকারস্থ

ভারতের বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, প্রথমেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা মনে পড়ে। পৃথিবীর কোন দেশে, কোন কালেই বোধ হয় এই রকম জটিল সমস্যা আর দেখা দেয় নাই।

হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায় বহু শতাব্দী হইতে একই দেশে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছে। যাহারা এতদিন সৌহার্দ্যের সহিত একত্ব বসবাস করিয়াছে, আজ তাহাদের মধ্যে এই হিংসা ও বিদ্বেষের ভাব দেখা দিল কেন?

আজ আমাদের প্রথমে এই কথাটাই ভাবিয়া দেখিতে হইবে, এবং এই প্রশ্নের উত্তর আমরা যত সম্ভব বাহির করিতে পারিব আমাদের আসল সমস্যার সমাধানও ততই সহজ হইয়া আসিবে।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। প্রতিবেশীর সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া তাহার কোন মতেই চলে না। এই প্রয়োজনের তাগিদই মানুষকে উচ্ছিন্ন বাসাবর-রুত্তি ত্যাগ করিয়া, দলবদ্ধ ভাবে বসতি স্থাপনে তৎপর করিয়াছিল।

রামপুরের নিতাই মণ্ডলের ঘরে, আগুন লাগিলে, মাধবপুরের কেশব সরকার আসিয়া সাহায্য করিবে না। তাহার প্রতিবেশী করিম আলীকেই সাহায্যের জন্য দৌড়িয়া আসিতে হইবে। প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর এই যে সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের ভাব, সুখে দুঃখে ও বিপদে আপদে সমবেদনার ভাব—ইহাই সমাজবন্ধন এবং ইহার স্বতন্ত্র সংস্করণই জাতীয়তাবাদ।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত। দেশ বলিতে আমরা এক একটা বিশেষ ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ স্থানকেই বুঝি। এই সকল স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অজ্ঞাত কতকগুলি সমস্যা থাকে। দেশে যদি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তাহা হইলে কোন দল বা সম্প্রদায়বিশেষ তাহা হইতে রেহাই পায় না। গত পঞ্চাশের মধ্যভাগে দেখা গিয়াছে, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারী দুর্ভিক্ষের কবলে প্রাণ দিয়াছে। কাজেই দল ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের স্বার্থের স্বত্ব, দেশের সাধারণ

উন্নতিবিধান করা ও সকল রকম বিপদ আপদ হইতে দেশকে রক্ষা করার সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইতে দেশের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহযোগিতা ও সমবেদনার ভাব আসে, একটা একতাবোধ জাগ্রত হয়—ইহাই জাতীয়তাবাদ। এইজন্মই রুশিয়ার খ্রীষ্টান ও মুসলমান অধিবাসী—সম্মিলিত রুশ জাতি। চীনের বৌদ্ধ ও মুসলমান—চীনা জাতি। বাংলার হিন্দু-মুসলমান—বাঙালী। ভারতের অধিবাসী সমুদয় ভারতবাসী একই জাতি।

এক দেশের অধিবাসীদের এক-জাতীয়তার যে সত্যকে আমরা গায়ের জোরে স্বীকার করিয়াছিলাম, প্রয়োজনের চাপে আজ আমাদের তাহাই স্বীকার করিতে হইতেছে।

রাজনৈতিক উদ্বেগসিদ্ধির জন্ম এক শ্রেণীর লোক সাম্প্রদায়িক ভেদ-নীতিকে প্ররোচিত করিয়াছে। তাহারা প্রচার করিয়াছে, হিন্দু মুসলমান দুই পৃথক জাতি, কেননা তাহারা দুই পৃথক ধর্মাবলম্বী। তাহাদের মধ্যে মিলন হইতে পারে না, এক দেশে সম্প্রীতির সহিত পাশাপাশি বসবাস সম্ভব হইতে পারে না। কাজেই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে (ভৌগোলিক সীমার ভিত্তিতে নয়) দেশ-বিভাগের প্রয়োজন। এই দুই-জাতি-তত্ত্বই আমাদের ভিতরে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি আনিয়াছে, আমাদের বহু শতাব্দীর সাম্প্রদায়িক মিলন ও ঐক্য ভাঙিয়া দিয়াছে।

দেশবিভাগের পর আজ আমাদের স্বীকার করিতে হইতেছে যে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হইলেও উভয় সম্প্রদায়কে উভয় রাষ্ট্রেই থাকিতে হইবে এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও সৌহার্দ্য বজায় রাখিতে না পারিলে তাহা সম্ভব হইবে না। তাই দল ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশের সকল নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিও আজ এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

বর্তমানে যে সাম্প্রদায়িক মিলন ও ঐক্যের চেষ্টা করা হইতেছে, বিভিন্ন রুচি ও প্রয়োজনের অমুসারে তাহাকে যে নামেই অভিহিত করা হোক, আসলে ইহা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত এক-জাতীয়তাবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে।

আমরা আসল জিনিষই চাই। আমরা চাই পরস্পর শান্তিতে বাস করিতে, তার জন্ত চাই সাম্প্রদায়িক মিলন ও ঐক্য। যে নামে যে পথ দিয়াই তাহা আহুক, আমরা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়াই গ্রহণ করিব।

এ সম্বন্ধে আর কথা বাড়াইয়া লাভ নাই। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মিলন আনিতে হইলে প্রথমেই তাহার উপযোগী পরিস্থিতি ও আবহাওয়ার সৃষ্টি করা প্রয়োজন। যে সকল নীতি, যে সকল মতবাদ আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ আনিয়াছে, মিলনের অন্তরায়-রূপে হইয়া রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে হইবে। ইহা করিতে না পারিলে কেবল বক্তৃতা ও বিরতির দ্বারা কোন ফল হইবে না।

এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই যে, 'ডিভাইড এণ্ড রুল' অর্থাৎ বিভেদ এবং শাসন—এই নীতিই সাম্রাজ্যবাদকে টিকাইয়া রাখার প্রধান অপকৌশল। পরস্পরবিরোধী দল বা সম্প্রদায়গত স্বার্থের সৃষ্টি করিয়া, দেশের মধ্যে দুই বা ততোধিক দলে বিরোধ লাগাইয়া রাখাই ইহার উদ্দেশ্য। তাহা হইলে এক দল অল্প দলকে জয় করার জন্ত সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য লইতে বাধ্য হয় এবং তাহারাও এই সুযোগে সাম্রাজ্যবাদকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে।

যে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ আয়ারল্যাণ্ডে আলস্টার ও মিশরের সুদান-সমস্তার সৃষ্টি করিয়াছে, প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইহুদী সমস্তার মূলে রহিয়াছে—যাহা, ভারতের হিন্দু-মুসলমান দুই জাতিভেদ সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই সৃষ্টি।

ইংরেজরা যখন বুঝিল যে, ভারতের হিন্দু-মুসলমান দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি বিরোধের সৃষ্টি করা না যায়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে এই দেশে টিকিয়া থাকা সম্ভব হইবে না, তখন বিভেদসৃষ্টির সুযোগেরও অভাব তাহাদের হইল না। অনেক দিন হইতেই শিক্ষিত ও অভিজাতশ্রেণীর এক দল মুসলমান সরকারী চাকুরী প্রভৃতিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্ত কতকগুলি বিশেষ সুবিধার দাবী করিয়া আসিতেছিলেন। লর্ড কার্জন যখন ভারতের বড়লাট মুসলমান জমিদারদের পক্ষ হইতে তখন তাহার নিকট এক ডেপুটেশন প্রেরিত হয়। তখন তাহারা এই সব দাবিই উত্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির উদ্গোষ্ঠা, লর্ড কার্জন পর্যন্ত তখন তাহা সমর্থন করিতে পারেন নাই। ইহার দাবির উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—

"I say you put forward these requests. You are asking for preferential advantages, which are unreasonable and which no Government would dream of giving you."

"Again when you ask for a fixed proportion of appointment in the public service and promotion, re-

gulated not by merit but by a fixed numerical standard, you must see that you are advancing an untenable claim."

"It is a cheering spectacle to see a community, once so great and prosperous and so richly endowed with stability of intellect and force of character, lifting itself again in the world by patient and conscientious endeavour. But the pleasure of the spectacle is diminished and the chances of success are reduced if those who are pluckily engaged in climbing the ladder, cry out for artificial ropes and pulleys to haul them up."

লর্ড কার্জন যাহা অত্যাচার ও অর্থোক্তিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্ত, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টই তাহার প্রবর্তন করেন। ফলে মুসলমানসম্প্রদায়ের জন্ত সংখ্যাভূপাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক চাকুরী প্রভৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইল। ইহাতে শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণীর একদল মুসলমানের বিনা প্রতিযোগিতায় একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক চাকুরী প্রভৃতি নানা রকম সুবিধা-লাভের বিশেষ সুযোগ হইল। শিক্ষাদীক্ষার অধিকতর উন্নত হিন্দুসম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া এই সুবিধা আদায় তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। এক-জাতীয়তাবাদের আদর্শ হইতে মুসলমান সম্প্রদায়কে পৃথক করিতে না পারিলে, পৃথক ভাবে সৃষ্ট এই বিশেষ সুবিধার অস্তিত্ব থাকে না। নিজের স্বার্থের জন্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের এই বিশেষ সুবিধাভোগী দলই হিন্দু-মুসলমান ভেদনীতিকে উত্থান দিতে লাগিলেন। ইহা হইতেই ক্রমে দুই-জাতি-তত্ত্বের (Two-Nation theory) উদ্ভব হইল।

কংগ্রেসের ক্রটিবিচার্যতাও এর জন্ত কম দায়ী নহে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকে বানচাল করার জন্ত কংগ্রেস যতটুকু শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন, দেশের আভ্যন্তরিক সংগঠন-কার্যে সেই অল্পপাতে মনোযোগ দেন নাই। ইহাই কংগ্রেসের মারাত্মক ভুল।

কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য জনসাধারণের ধরে ধরে পৌছাইয়া দেওয়ার জন্ত যে ব্যাপক প্রচার-কার্যের প্রয়োজন ছিল, কংগ্রেস আশাহীনভাবে তাহা করেন নাই; মুসলিম লীগের সহিত আপোষ করিয়া, তোষণনীতির আশ্রয় লইলেন। তাহাদিগকে আঘাত প্রাপ্যর অনেক বৈধি দিয়াও কংগ্রেস তাহাদের সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না, বরং ফল বিপরীত হইল। লীগের সহিত আপোষের জন্ত সীমাহীন উদারতা দেখানোর ফলে, কংগ্রেসের অতিরিক্ত গরজ ও দুর্বলতা প্রকাশ পাইল।

ওদিক কোনো কোনো মুসলমান নেতা মুসলমানসম্প্রদায়কে বুঝাইলেন যে, কংগ্রেস হিন্দু-প্রতিষ্ঠান। হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনই তাহার লক্ষ্য। কংগ্রেসের হাতে শাসনক্ষমতা আসিলে মুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য কিছুই থাকিবে না।

ভারতবর্ষ হইতে ইসলাম ধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। উপরন্তু লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের আপোষের আশঙ্কায়, মুসলমান সমাজকে ধোঁকা দেওয়ার কূটনৈতিক চাল বলিয়াই বুঝানো হইল। একতরফা প্রচারের ফলে সরলবিশ্বাসী মুসলমান জনসাধারণ তাহাই বুঝিল।

১৯৩৫ সালের নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর কংগ্রেস যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে তখন কংগ্রেস কর্তৃক মুসলমান নির্বাচনের নানা মিথ্যা কাহিনী প্রচার করা হইল।

তার পর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত মতভেদ হওয়ার কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিল। মুসলমান সমাজ কংগ্রেসের জুলুম-জবরদস্তি হইতে রেহাই পাইল। বলিয়া, মুসলিম লীগ হইতে মুসলমান সম্প্রদায়কে একদিন মুক্তি-দিবস (Day of deliverance) পালনেরও নির্দেশ দেওয়া হইল।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধী ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইহার প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি সর মরিস গায়ার বা অথবা যেকোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তির নেতৃত্বে একটা জুডিশিয়াল ট্রাইবিউথাল গঠন করিয়া ইহার নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক। কিন্তু মিঃ জিন্নাই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। নিরপেক্ষ তদন্তের ফলাফল তাহার অনুকূল হওয়ার আশা থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই গ্রহণ করিতেন না।

মহাত্মা গান্ধী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মিঃ জিন্নার মধ্যে এই সম্বন্ধে যে পত্র বিনিময় হয়, সেগুলি পড়িয়া দেখিলেই সমস্ত পরিষ্কার বুঝা যায়। এই সমস্ত পত্রাবলী এখানে উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধ অতীব দীর্ঘ হইয়া পড়ে। অমুসন্ধিগ্ন পাঠক আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার, মৌলবী জায়ালা-উদ্দীন আহম্মদ প্রণীত "Recent speeches and writings of Mr. Jinnah" নামক বহিধানি পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।

ঘটা করিয়া মুক্তিদিবস পালন ও একতরফা প্রচারের ফলে মুসলমান জনসাধারণ বুঝিল যে, কংগ্রেসের চেয়ে মুসলমান সমাজের বড় শত্রু আর নাই।

তার পর বলিতে হয় আসামের বহিরাগত-উচ্ছেদ প্রধার কথা। বাংলার যে সকল বহিরাগত আসাম গবর্ণমেন্টের বাস জমি ও গোচরণ-ভূমি দখল করিয়াছিল, আসাম গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে উচ্ছেদ করেন। সাহুজা গবর্ণমেন্ট (লীগদল) ইহা-দিগকে এক বৎসরের মেয়াদে উচ্ছেদের নোটিশ দেন। তার পর বরদলৈ (কংগ্রেসদল) গবর্ণমেন্টের আমলে সেই নোটিশের মেয়াদ পূর্ণ হয়। লীগ-গবর্ণমেন্টের নোটিশের-সর্ব্বই কংগ্রেস-গবর্ণমেন্ট কার্য্যকরী করেন। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে (অবশ্য হিন্দুর সংখ্যা খুব কম) সকল বহিরাগতকেই এই সময় উচ্ছেদ করা হয়।

এই উচ্ছেদনীতি অসমীয়াদের বাঙালীবিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই নহে। অসমীয়া মুসলমানদেরও ইহাতে সমর্থন ছিল। কাজেই ইহাকে কংগ্রেসের মুসলমান বিদ্বেষের পরিবর্তে, অসমীয়াদের বাঙালীবিদ্বেষ আখ্যা দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু এই সকল ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়া কংগ্রেসের মুসলমানবিদ্বেষ বলিয়াই প্রচার করা হইয়াছে। কংগ্রেসের তরফ হইতে প্রতিবাদের একটা ক্ষীণকণ্ঠ পর্য্যন্ত জনসাধারণের কাছে পৌঁছে নাই।

কংগ্রেসের প্রচারকার্য্যের জটিল জঞ্জাল মুসলমান জনসাধারণ কংগ্রেসকে ভুল বুঝিয়াছে। ধীরে ধীরে কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

আগে যে দুই জাতি-তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, ইহার অস্তিত্ব রাখিয়া সাম্প্রদায়িক মিলন সম্ভব হইবে না। কারণ ইহার মধ্যে মিলনের কোন নীতি নাই। পরস্পরকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াই ইহার আদর্শ। দুই জাতিতত্ত্বের সমর্থকগণ আজও তাঁহাদের পুরাতন নীতিকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। জাতিতত্ত্ব লইয়া উদ্বেগমূলক গবেষণা চালাইলে, দুই জাতিকে আরও বহু জাতিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। হিন্দুদের ভিতরেও আরও একটা উপ দুই-জাতির (বর্ণহিন্দু ও হরিজন) সৃষ্টি ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে। বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ আছেন, কায়স্থ আছেন, হরিজনদের ভিতরেও নানা সম্প্রদায় আছে। ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে আরও কয়েকটা জাতিতে বিভক্ত করা যায়।

মুসলমান সম্প্রদায়ও বাদ যান না। তাঁহাদের সমাজেও সিয়া আছেন, সুন্নি আছেন, মৎস্যজীবী সম্প্রদায়, জোলা-সম্প্রদায়—অনেক কিছুই আছে। মুসলমান মৎস্যজীবীদের মধ্যে পৃথক সুবিধার দাবি করিবার প্রয়াস ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে বিভক্ত হওয়ার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার প্রভাবও সাম্প্রদায়িক মিলনের পথে কম অন্তরায় নয়।

পাকিস্থানের মুসলমানগণ মনে করিতেছেন, পাকিস্থান তাঁহাদের নিজস্ব হোমল্যান্ড বা বাসভূমি—হিন্দুরা এখানে 'পরবাসী' অবস্থায়ই আছে। হিন্দুরাও মনে করিতেছেন, পাকিস্থানে তাঁহাদের কোন অধিকার নাই। মেজরিটর দম্বা করিয়া দেওয়া, কেবলমাত্র প্রাণে বাঁচিয়া থাকার অধিকারটুকু লইয়াই তাহাদিগকে থাকিতে হইবে। এই সব কারণে জনসাধারণের মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ দেখা দিয়াছে, তাহারা দলে দলে দেশত্যাগ করিতেছে।

এই অবস্থা দূর করিতে না পারিলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্ভব হইবে না। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই বুঝাইতে

হইবে যে, কোন দেশেই সম্প্রদায়বিশেষের একচেটিয়া অধিকার নাই। উভয় দেশে উভয় সম্প্রদায়েরই সমান অধিকার বিদ্যমান। তাহা হইলে আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া দল, সম্প্রদায় ও ধর্মনিরপেক্ষ সকলের মিলিত সেই এক-জাতীয়তাবাদের আদর্শেই আসিতে হয়।

হিন্দুসম্প্রদায় চিরদিনই মিলনের প্রত্যাশী, মিলনের অর্থ্য লইয়া তাহার চিরদিনই প্রস্তুত হইয়া আছে। হিন্দুর স্বার্থপরতায়, হিন্দুর অদূরদর্শিতায় সাম্প্রদায়িক মিলন ব্যর্থ হইয়াছে, হিন্দুর উপর কাহারও এই দোষারোপ করিবার সম্ভব হেতু নাই। কংগ্রেসের আহ্বানে হিন্দুসমাজ চিরদিনই সাড়া দিয়াছে, কংগ্রেসের আন্দোলনে মহাজনী আইন পাস হইল। ইহাতে শতকরা প্রায় একশত হিন্দু মহাজনেরই সর্বনাশ ঘটাইয়া মুসলমান খাতকদেরই উপকার করা হইল। হিন্দুরা ইহার প্রতিবাদ করে নাই। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বৃহত্তর জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি তাহাদিগকে তাহা করিতে দেয় নাই।

সিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিন্দুর চেষ্টা ও অর্থেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু দাতাগণ ইচ্ছা করিলে এই সব দান কেবল নিজ সম্প্রদায়ের উপকারের জন্তই করিতে পারিতেন। কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের জন্তই তাহারা ইহা করেন নাই।

সিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় আজ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে, অল্প প্রদেশের অযোগ্য মুসলমান ছাত্ররা তাহাতে প্রবেশাধিকার পাইতেছে, কিন্তু সিদ্ধপ্রদেশের যোগ্যতর হিন্দু ছাত্রদের জন্ত উহার দ্বার রুদ্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া কি রকম টানাহিঁচড়া চলিয়াছিল, তাহা কাহারও অজানা নাই।

দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের অধিকাংশই মুসলমান। তাহাদের দাবি ও অধিকার লইয়া কংগ্রেসই চিরকাল আন্দোলন করিয়াছে, আজও করিতেছে। মুসলিম লীগ কোনদিনই তাহাদের জন্ত দরদ দেখায় নাই, বরং কংগ্রেসের আন্দোলনে চিরদিন বাধাই দিয়াছে। ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে কংগ্রেস যখন দক্ষিণ-আফ্রিকার লবঙ্গ বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, হিন্দুব্যবসায়ীরা তাহাতে যোগ দেন, কিন্তু মুসলমান ব্যবসায়ীরা সহযোগিতা করেন নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকার মুসলমান অধিবাসীদের জন্ত পাকিস্তানের দরদে পরিচয় আজও পাওয়া যায় নাই।

হিন্দু-নিজের সংস্কৃতি অজ্ঞের উপর চাপাইয়া দিতে চাহে না। কিন্তু অজ্ঞের সংস্কৃতি তাহার ঘাড়ে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হোক, ইহাও তাহার মানিয়া লইতে পারে না। ইসলামের সত্য ও আদর্শকে তাহার প্রহ্লা দেখাইতে প্রস্তুত এবং বহুক্ষেত্রে তাহা দেখাইয়াছেও, কিন্তু ইসলামের সত্য ও আদর্শ নহে, কেবল এইজন্তই অজ্ঞ যে-কোন

ধর্মের সত্য ও আদর্শকে ঘৃণা করিতে হইবে, ইহাও তাহার সমর্থন করিতে পারে না।

সাম্প্রদায়িক মিলন ও সম্প্রীতির জন্ত যতটুকু করা প্রয়োজন তাহা করিতে হিন্দু-সম্প্রদায় কোন দিনই পশ্চাৎপদ ছিল না, আজও নহে।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া বলিতে চাই, আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদের উপরই আজ অধিকতর দায়িত্ব পড়িয়াছে। তাহাদিগকেই আজ অধিকতর উদারতা দেখাইয়া মিলনের জন্ত আগাইয়া আসিতে হইবে—অবশ্য, ইহার অর্থ এই নহে যে, মুসলমানসম্প্রদায়কে নিজেদের শ্রাঘ্য দাবি ও অধিকার ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইহার অর্থ, নিজের যথাযোগ্য দাবি ও অধিকারের জন্ত অপরকে শ্রাঘ্যসম্মত দাবি ও অধিকারের প্রতি প্রদাণীল হওয়া, তাহা মানিয়া লওয়া। মুসলমানসম্প্রদায়কে, শাসকসম্প্রদায়ের পর্যায়ে উন্নীত হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া দেশের সকল দল ও সম্প্রদায়ের সহিত সমান অধিকার লইয়া মিলিয়া-মিশিয়া থাকার গণতান্ত্রিক নীতিই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ইহা করিতে না পারিলে সাম্প্রদায়িক মিলনের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।

ইহা করিতে হইলে সকল রকম বিশেষ সাম্প্রদায়িক সুবিধার অন্তিম লোপ করিতে হইবে। তাহা হইলে দুই-জাতিতত্ত্বের আর কোন প্রয়োজনই থাকে না এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিভাগের সমস্ত যুক্তিও বানচাল হইয়া যায়।

দেশ-বিভাগের পক্ষে যে সকল যুক্তি ছিল, তাহার অসারতা ইতিমধ্যেই প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। পুনরুজ্জীবিত হইলেও কথাকাটা এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না।—হিন্দু-মুসলমান দুই পৃথক জাতি, ইহাদের মিলন হইতে পারে না, এক দেশে পাশাপাশি বাস করা সম্ভব হইতে পারে না—কাজেই উভয় সম্প্রদায়ের জন্ত পৃথক পৃথক হোম ল্যান্ডের প্রয়োজন—পাকিস্তানের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা না দিলেও লীগ নেতৃবৃন্দ এই সব কথা চিরদিনই খোলাখুলি ভাবে প্রচার করিয়াছেন এবং দেশবিভাগের পক্ষে ইহাই ছিল আসল যুক্তি। এই সকল যুক্তি দেখাইয়া যাহারা দেশবিভাগ করিয়াছেন, দেশবিভাগের পর তাহারাই আজ স্বীকার করিয়াছেন যে, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মিলন হইতে পারে এবং উভয় সম্প্রদায়ই উভয় ডোমিনিয়নে মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে পারিবে।

বিস্তৃত ভারতের উভয় ডোমিনিয়নে, উভয় সম্প্রদায়ই যদি মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে অবিভক্ত ভারতেও তাহারা এইভাবেই মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারিত—একথা অস্বীকার করার কোন কারণ থাকিতে পারে না। কাজেই দেশ-বিভাগের সকল যুক্তি ও উদ্দেশ্য আজ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

‘হাইদারাবাদ’ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা লইয়া পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের জন্ত বিভক্ত অঞ্চল গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা করার অধিকারও হয়তো তাহাদের আছে। হিন্দুদের ইহাতে আপত্তি করার কোন কারণ নাই।

কিন্তু পাকিস্তানে হিন্দুসম্প্রদায়কে কতটুকু অধিকার দেওয়া হইবে এই সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কথ্য উঠিয়াছে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র শরিয়তের বিধান অনুযায়ী রচিত হইবে। ইহা যদি ইসলামিক রাষ্ট্র হয়, এবং মেজরিটর কূপালক স্তম্ভ কায়রুশে প্রাণধারণের অধিকার লইয়া সম্ভ্রষ্ট থাকে, তাহা হইলে এই সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। আর ইহা যদি সত্যই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়, তাহা হইলে ইহার গঠনতন্ত্রে বাহ্যতে গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিগুলি অনুসৃত হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

রাষ্ট্রের আচরণ জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান ও পক্ষপাতবর্জিত হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের অধীন প্রত্যেক নাগরিকই নিজের সামর্থ্য ও যোগ্যতার অনুপাতে আত্ম-বিকাশের ও সব রকম সুখ-সুবিধা ভোগ করার স্বাধীন ও অবাধ অধিকার পাইবে। জাতি ধর্ম বা বর্ণের জন্ত রাষ্ট্র কাহারও প্রতি কোন রকম বৈষম্যমূলক আচরণ করিবে না। ইহাই গণতান্ত্রিক নীতি।

এক সম্প্রদায়কে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্ত অল্প সম্প্রদায়ের বিশেষ অসুবিধা ঘটাইবার নীতি, এক সম্প্রদায়কে অগ্রগামী করার উদ্দেশ্যে অল্প সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক অগ্রগতির পথে আইন-কানুন ও বাধানিষেধের কৃত্রিম গাঠী সৃষ্টি করিয়া তোলার নীতি—এই সকল নীতিকে গণতান্ত্রিক নীতি বলা চলে না।

মুসলমান-সম্প্রদায় ধর্ম মুসলমান, কেবল এইজন্তই যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক শতকরা সম্ভ্রষ্ট সরকারী চাকুরী, কণ্ট্রাক্ট প্রভৃতি তাহাদের জন্ত সংরক্ষিত থাকিবে। যোগ্যতা, না থাকিলেও নির্দিষ্টসংখ্যক বৃত্তি পাইবে। হিন্দু বা হিন্দু, কেবল এইজন্তই, তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের যোগ্যতা তাহাদের প্রতিভা উপেক্ষিত হইবে, আত্ম-বিকাশের সব রকম সুযোগ-সুবিধা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে, এই রকম একদেশদর্শী ও পক্ষপাতমূলক আচরণ পৃথিবীর কোন সভ্য দেশই সমর্থন করিতে পারে না। এই সুযোগী ছুরোরাগী নীতিকে গণতন্ত্র বলা চলে না। ইহাকে ধর্মীয় ক্যাসিজম্ আখ্যা দিলেই ঠিক হয়।

যোগ্যতাকেই চাকুরী প্রভৃতির মাপকাঠি করা উচিত। ইহা হইতেই জনসাধারণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব আসে, জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির স্বচনা করে। তাহা ছাড়া এই নীতি

অনুসৃত হইলে রাষ্ট্র ও দেশের যোগ্যতম ব্যক্তিদের প্রতিভা ও কর্মকুশলতা কাজে লাগাইবার সুযোগ হওয়ায় জনসাধারণ উপকৃত হইতে পারে। পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই এই নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে। পাকিস্তানকে যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র করিতে হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্রের এই মৌলিক নীতিগুলিও তাহার মানিয়া লওয়া উচিত।

এখন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। ভারত এশিয়া ও আফ্রিকার সমস্ত নিশীড়িত জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। সে চিরদিনই তাহাদের দাবি ও অধিকার লইয়া দৃঢ়তার সহিত আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানও তাহার এই দায়িত্বের গুরুত্ব আরও বর্ধিত করিয়াছে। ভারতের নতুন শাসনতন্ত্র জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমদর্শিতা ও উদারতাই প্রদর্শন করিয়াছে। সেখানে মাইনরিটি ও মেজরিটিতে কোন তফাৎ নাই। মাইনরিটিকে সেখানে মেজরিটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয় নাই, পর করিয়া দূরে রাখা হয় নাই। তাহাদিগকে সুখ-সুবিধা ভোগ ও আত্মবিকাশের সুবিধা সংখ্যাভূপাতের নিক্তি দিয়া ওজন করিয়াও দেওয়া হয় নাই। সামর্থ্য ও যোগ্যতার অনুপাতে সেখানে সকল নাগরিকের অধিকারই সমান—মুক্ত, উদার, সব রকম বাধানিষেধ ও পক্ষপাত বর্জিত।

কংগ্রেস দেশ-বিভাগ মানিয়া লইয়াছে। আমাদের মতে ইহা কংগ্রেসের ভুল নহে—এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু জনসাধারণ কংগ্রেসকে ভুল বুঝিয়া বিক্রম হইয়া উঠিতেছে, তাহা সত্ত্বেও কংগ্রেস এই সম্বন্ধে কোন প্রতিকারই করিতেছেন না—ইহা বাস্তবিকই কংগ্রেসের ভুল। তাহা ছাড়া স্বাধীনতার পর কংগ্রেস জাতিকে কোন সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন নাই। উদ্বেগজনক লক্ষ্যহীন জাতি মাঝপথে দিশাহারা হইয়াছে। আর প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি এই সুযোগে তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে।

দিশাহারা ও বিচ্ছিন্ন জাতিকে সম্বদ্ধ করাই রাষ্ট্রনায়কদের আজ প্রধান কর্তব্য। তাহাদিগকে সমন্বয়পন্থাগী মত ও পথের সন্ধান দিতে হইবে। এইজন্ত দেশের আভ্যন্তরিক প্রচার ও গঠনমূলক কাজের প্রয়োজনই বেশী। জনসাধারণকে বুঝাইতে হইবে—দেশবিভাগ স্বীকার করিয়া কংগ্রেস ভুল করে নাই। বরং বিচার করিলে মনে হয়, কংগ্রেসের জয়ই স্থচনা করিতেছে।

দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্ত কংগ্রেস লীগকে যে চড়া মূল্য দিতে রাজী হইয়াছিল, ইহা দ্বারা দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখিতে পারিলেও, আভ্যন্তরিক জটিলতা দূর হইত না। পরস্পর রেযারেবি পরস্পরকে বাধা



দেওয়ার ও নাজেহাল করার মনোবৃত্তি, দেশের আভ্যন্তরিক সমস্যাকে আরও জটিল ও দুঃসাধ্য করিয়া তুলিত। কংগ্রেস-লীগের অন্তর্ভুক্তি গবর্ণমেন্টের অঙ্গদ্বিনের কার্যকালে আমরা এই সম্বন্ধে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি।

তাহা ছাড়া অঞ্চলভিত্তিক প্রত্যেক প্রদেশই প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব ভোগ করিত। প্রদেশের আভ্যন্তরিক কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের থাকিত না। কারণ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা কেবল দেশরক্ষা, যানবাহন, ডাক, বৈদেশিক নীতি প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকিত। ইহার ফলে, দেশের যতটুকু অংশ লইয়া এখন পাকিস্থান হইয়াছে, তার চেয়ে অনেক বিস্তৃত অংশে—(সমস্ত পঞ্জাব ও বাংলা) পাকিস্থান না হওয়া সত্ত্বেও, পাকিস্থানী নীতি কান্নেম হইত। পাকিস্থান স্বীকার করিয়া কংগ্রেস এই সব জটিলতা হইতে রেহাই পাইয়াছেন। প্রাকৃতিক সম্পদহীন একটা ঘাটতি এলাকা পাকিস্থানের ভাগে পড়িয়াছে। বিরাট জনবল ও প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদপূর্ণ যে বিস্তৃত এলাকা কংগ্রেসের হাতে আসিয়াছে, তাহা যথাযথ কাজে লাগাইতে পারিলে অচিরেই ভারত পৃথিবীর অগ্ৰতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইবে।

কংগ্রেসের এই দেশবিভাগ মানিয়া লওয়ার ফলে পাকিস্থানের হিন্দুদের উপর অবিচার করা হইয়াছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় পাকিস্থানের হিন্দুরাও ইহাতে মত দিয়াছিল। জাতির বৃহত্তর মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই তাহারা স্বেচ্ছায় এই ছরবস্থা বরণ করিয়া লইয়াছে। পাকিস্থানে যদি তাহাদের বসবাস অসম্ভব হইয়া উঠে তাহা হইলে তাহারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় পাইবে ইহাই তাহারা আশা করে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র—হিন্দুরাষ্ট্র, এইজন্তই হিন্দুগণ এখানে আশ্রয় পাইবে—এই ধারণা হইতেই তাহারা ইহা দাবি করে না। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। নিপীড়িত মানবতার প্রতি যে স্বাভাবিক মমত্ববোধ—ভারতকে, ইন্দো-নেশিয়ার মুসলমান, দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় (অধিকাংশই মুসলমান) এবং পৃথিবীর অগ্ৰতম নিপীড়িত মানবজাতির স্বার্থের জন্ত আন্দোলন করিতে অগ্রপ্রাণিত করিয়াছে, সেই নীতিবোধই তাহাকে পাকিস্থানের হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রতি, হিন্দু হিসাবে নয়, একদল নিপীড়িত মানব হিসাবে—সহানুভূতি-সম্পন্ন করিয়া তুলিবে। পাকিস্থান যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয় এবং জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল অধিবাসীর সমান নাগরিক অধিকার সেখানে থাকে তবে ইহার কোন প্রয়োজন হইবে না।

পাকিস্থানের হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্ত ভারতের হিন্দুদের যে যথেষ্ট দরদ ও সহানুভূতি আছে, একথা উল্লেখ করা বাহ্যল্য মাত্র। কাজেই তাহারা নিজেদের রাষ্ট্রকে যদি শক্তিশালী

করিয়া তুলিতে পারে তাহা হইলে তাহারা আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থানের হিন্দুদেরও স্বার্থ এবং নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। পাকিস্থানের হিন্দুরাও তাহাই চায়।

ভারতের মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে পাকিস্থানের হিন্দুদের কোন লাভ হইবে না, বরং ইহা তাহাদের নিজেদেরও সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে। দেশের ভিতরে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও উচ্ছ্বলতা জীয়াইয়া রাখিলে তাহারা নিজেদের গবর্ণমেন্টকেই বিব্রত করিয়া তুলিবে। গঠন-মূলক বা প্রগতিমূলক কোন কাজেই সরকার হাত দিতে পারিবেন না। ইহাতে তাহাদের নিজেদের রাষ্ট্র দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং সন্ত্রাসদেরই উদ্বেগু সিদ্ধ হইবে।

তা ছাড়া একের অপরাধের জন্ত অন্নের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ নীতির দিক দিয়াও গর্হিত এবং সমস্ত মুসলমানই মুসলমান সম্প্রদায়ের অপকর্মের জন্ত দায়ী নহেন। মোলানা মাদানী ও মোলানা আব্বাদের মত নেতা মুসলমান-সমাজ হইতেই আসিয়াছেন। পৃথিবীর যে-কোন দেশ ও জাতি ইহাদের নেতৃত্ব লাভে গৌরব-বোধ করিতে পারে।

ইংরেজ বলিয়াছিল, তাহারা চলিয়া গেলে ভারতে হানাহানি শুরু হইবে, গৃহযুদ্ধে ভারত ছারখার হইয়া যাইবে। তাহাদের সেই ভবিষ্যদ্বাণী আংশিকভাবে সফল হইয়াছে। ইহাতে স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের উপর কলঙ্ককালিমা লিপ্ত হইয়াছে। যে-কোন মূল্যে, যে-কোন উপায়ে ভারতকে এই কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিতে হইবে। “পাকিস্থানে যাহা ঘটয়াছিল ভারতে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে”—সত্য জগৎ এই ধরণের কৈফিয়ত শুনিতে রাজী হইবে না।

যে তায় ও সত্যকে সঙ্গী করিয়া আমরা দুর্গম পথে যাত্রা শুরু করিয়াছিলাম, বহু অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়া তাহা আমরা উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমরা আমাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছি। তীরের কাছে আসিয়া আমরা আজ হাল ছাড়িয়া দিতে পারি না। আমাদের কাছে ধৈর্য ও তিতিক্ষার সহিত অপেক্ষা করিতে হইবে। এই দুঃখ-দুর্যোগ ও অশান্তির ভিতর দিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি জলন্ত প্রমাণ চিরদিনের জন্ত অক্ষয় হইয়া রহিবে যে, সত্য কখনো ব্যর্থ হইতে পারে না।

এই সঙ্গে পাকিস্থানের হিন্দুসম্প্রদায়কে একথাটাই বলিতে চাই যে, দেশত্যাগে বাধ্য করা না হইলে তাহাদের দেশত্যাগ করা উচিত হইবে না। পাকিস্থান যদি হিন্দু-মুসলমানের দেশ হয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়, তাহা হইলে আমাদের অধিকার কেহই স্তব্ধ করিতে পারিবে না। আর আমাদের যদি জানাইয়া দেওয়া হয় যে, ইহা মুসলমানের দেশ—দখল করিয়া যতটুকু অধিকার দেওয়া হইবে, তাহা লইয়াই আমাদের কাছে সন্তোষ থাকিতে হইবে, তাহা হইলে আমরা প্রতিকার অসম্ভব

হইলে প্রতিবাদ না করিয়া ভারতে চলিয়া আসিব। ভারত যদি আমাদেরকে আশ্রয় না দেয় আমরা পৃথিবীর সমস্ত মানব-জাতির কাছে মানবতার আবেদন জানাইব, সকলের সাহায্য ভিক্ষা করিব। সমস্ত সভ্যজগৎ তখন আমাদের কথা শুনিবে। কিন্তু বিনা কারণে আমরা যদি দেশত্যাগ করি, ছুয়ারে ছুয়ারে অশ্রয় খুঁজিয়া ফিরি, আমাদের অদৃষ্টে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই জুটবে না।

ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ যে অহেতুক চাকল্য দেখা দিয়াছে, স্থানে স্থানে কলকারখানার শ্রমিকদের কর্মঘণ্টার ফলে দেশের উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে, রাষ্ট্র দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, এসকল জাতির উন্নতির সূচনা করিতেছে না। ছাত্রদের ও যুবকদের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, বেপারোয়া উচ্ছৃঙ্খলতার নামই ব্যক্তি-স্বাধীনতা নহে। শ্রমিকদের তরফ হইতেও অভিযোগের অনেক কিছুই আছে। বিক্ষোভপ্রদর্শন এবং ধর্মঘট করার অধিকারও তাহাদের আছে একথাও স্বীকার করি, কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও বুঝা উচিত যে, মাত্র সেদিন আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি; সমস্ত সমস্তা দূর করিয়া, সরকার এরই মধ্যে দেশকে একেবারে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবেন—আমরা এখনই এতটা আশা করিতে পারি না। এই সকল অভাব-অনুবিধা আমরা যখন এত দিনই সহ্য করিয়াছি, তখন বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের উচিত—অন্ততঃ কিছুকাল ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিয়া গবর্ণমেন্টকে রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ দেওয়া। তারপর যদি বর্তমান গবর্ণমেন্ট এই দিকে মনোযোগী না হন তাহা হইলে আমরা আমাদের স্বাধীনতা ভিন্ন গবর্ণমেন্ট গঠন করিতে পারিব। কিন্তু এখন দেশের ভিতর এই রকম হটগোল বাঁধাইয়া তুলিলে আমরা আমাদের নবজাত স্বাধীনতাকে স্মৃতিকাগারেই বিনষ্ট করিয়া ফেলিব।

ভারতের সমস্তা বহুবিধ। স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনেক অভিনব সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তাহার কোনটার চেয়ে কোনটাই ছোট নয়। তবু আত্মরক্ষা-ব্যবস্থাকে সকলের উপরে স্থান দিতে হইবে। কারণ স্বাধীনতা বজায় থাকিলে আজ হোক, আর দুই দিন পরেই হোক আমরা আমাদের অতীত সমস্তারও সমাধান করিতে পারিব। কিন্তু আবার যদি স্বাধীনতা হারাইতে হয়, তাহা হইলে কোন সমস্তারই সমাধান হইবে না। আমরা আবার যে ভিমিরে সেই ভিমিরেই ডুবিয়া যাইব। কাজেই আমাদের দেশরক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রথমেই দৃঢ় ও শক্তিশালী করিয়া তোলা প্রয়োজন।

ইংরেজ সৈন্ত আমাদের দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে। দেশীয় সৈন্তও দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে আমাদের সামরিক শক্তি স্বাভাবিকই দুর্বল হইয়াছে। এই সব কারণে আমাদের সৈন্তবাহিনীর পুনর্গঠনে বিশেষ দৈর্ঘ্য, বিচক্ষণতা ও সাবধানতার প্রয়োজন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কামান-গর্জন ধামিতে না ধামিতে তৃতীয় মহাযুদ্ধের রণ-দামামা বাজিয়া উঠিতেছে। আজ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া ভারতকেও চলিতে হইবে। তাহা ছাড়া, ভারতের আভ্যন্তরিক জটিলতা, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ভৌগোলিক অবস্থান এই প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি করিয়াছে।

শান্তিই আমাদের কাম্য, কিন্তু দুর্বল ও কাপুরুষের শান্তি নহে। আধুনিক জগতে শান্তির ব্যাখ্যা অল্পরূপ। Perpetual Preparedness for war is peace—যুদ্ধের জন্ত সব সময় প্রস্তুতির নামই শান্তি। আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত এমনই একটি বিরাট শক্তিশালী সৈন্যদল আমাদের গঠন করিতে হইবে, যাহার সাহায্যে পৃথিবীর যে-কোন স্থানে দুর্বলের উপর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইবে তাহারই প্রতিকার আমরা করিতে পারিব। শক্তির প্রাচুর্যের মধ্যে সংঘর্মের বিকাশ হইতে যে শান্তি আসিবে সেই শান্তিই আমরা চাই। কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত শত্রুতা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যুদ্ধকে আমরা অকারণে নিজের দেশে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে চাই না। কিন্তু বিশ্বমানবের মঙ্গলের জন্ত যুদ্ধ যদি অপরিহার্য হইয়া উঠে, তখন এবং সত্য যদি তাহাই চায় তবে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখার পক্ষে যুক্তি নাই।

আমরা চাই; সব রকম অত্যাচার-অবিচার, উৎপীড়ন ও শোষণ, মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব পৃথিবী হইতে বিদূরিত হোক। পৃথিবীর প্রত্যেকটি নরনারী মানুষের মত বাঁচিয়া থাকার অধিকার লাভ করুক। শান্তির কুসুমাস্ত্রী পথে তাহা যদি নাই আসে তবে তার জন্ত আমরা বসিয়া থাকিব না। দুর্বোলের কণ্টকাকীর্ণ পথেই আমরা তাহার সন্ধানে বাহির হইব। ভারতকে যদি কোনদিন অস্ত্র ধরিতে হয় তাহা হইলে পৃথিবীতে তখনও সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ব-মানবের কল্যাণের মহান উদ্দেশ্য লইয়াই সে তাহা করিবে।

খাদ্য-সমস্তা আজিকার পৃথিবীর একটি প্রধান সমস্তা। ভারত-সরকারকে প্রত্যেক বৎসরই অত্যন্ত চড়া দামে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হয়। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাড়ে তিন বৎসরে মাত্র ৫৫ লক্ষ টন খাদ্য-শস্ত্রের জন্ত গবর্ণমেন্টকে ১৬৯ কোটি টাকা বিদেশে পাঠাইতে হইয়াছে। দেশের ভিতর ইহা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করার ফলে, প্রত্যেক বৎসরই গবর্ণমেন্টকে অনেক টাকা বাটতি দিতে হয়। এইজন্ত আগামী সাড়ে সাত মাসেই মোট ২২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা বাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই এই খাদ্য-সমস্তার সমাধান করিতে পারিবেন। কলিকাতার মাড়োয়ারী চেষ্টার অব কমান্ডার সভাপতি শ্রীযুক্ত বি. এম. জালান দেশের খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি

দেখাইয়াছেন যে, ভারতে মোট ৯ কোটি ৪০ লক্ষ একর আবাদযোগ্য অনাবাদী জমি আছে। এই সব জমি যদি বন্দোবস্ত দিয়া ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে কৃষিকার্যের প্রজাগণ নিজেরাই এই সব পতিত জমি আবাদ করিয়া ফসল উৎপন্ন করিতে পারিবে। গবর্ণমেন্টকে এর বেশী কোন দায়িত্বই লইতে হইবে না।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীতে ব্যাপক খাদ্য-সঙ্কট দেখা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের ইহাই প্রধান কারণ। তারপর তাহার দেশের খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মন দেয়। এই প্রচেষ্টাকে সফল করিবার উদ্দেশ্যে তাহার দেশের এক ইঞ্চি জমিও পতিত ফেলিয়া রাখে নাই। ধনিগণ তাহাদের সখের বাগান পর্যন্ত এইজন্ত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

আমাদের দেশে খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই অবস্থায় সরকারের অবিলম্বে এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। ইহা দ্বারা এক দিকে যেমন সরকারকে প্রতি বৎসর প্রচুত অর্থ আর বিদেশে পাঠাইতে হইবে না, অতীতকে তেমনি খাদ্য-শস্য চড়া মূল্যে ক্রয় করিয়া নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করার ষাটটি হইতেও সরকার রেষাই পাইবেন। অপর দিকে রাজস্বও বৃদ্ধি পাইবে।

এই কাজে লোকেরও অভাব হইবে না। পশ্চিম-পঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ হইতে যে-সব আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে, তাহাদিগকে এই সব জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইতে পারে। এই রকম জমি বন্দোবস্ত পাইলে পূর্ববঙ্গ ও পাকিস্থানের অত্যাচার হইতেও কৃষক সম্প্রদায় উৎসাহ সহকারে ছুটিয়া আসবে।

আমাদের দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী করিয়া তোলার জন্ত দেশের লোকবল ও সম্পদকে পরিপূর্ণ ভাবে কাজে লাগাইতে হইবে। কোথায় কোন শিল্প, কি ভাবে গড়িয়া তোলার সম্ভাবনা আছে, কোথায় কোন সম্পদ নিহিত, তাহা কি ভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে—এই সম্বন্ধে ব্যাপক তথ্য-সংগ্রহের প্রয়োজন।

এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া ভিন্ন ভিন্ন কমিটি গঠন ও জনসাধারণের নিকট হইতে এই সম্বন্ধে পরিকল্পনা রচনার সাহায্য গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হোক। এইসব পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া, কমিটিসমূহ নিজ নিজ মত

গঠন করিবেন। ইহাই হইবে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট উপায়। ইহা দ্বারা সরকার দেশের প্রত্যেকটি প্রতিভার উদ্ভাবনী-শক্তি কাজে লাগাইবার সুযোগ পাইবেন।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কি হওয়া উচিত, এখন এই সম্বন্ধেই দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। পৃথিবীর যাবতীয় দেশ বিশেষ ভাবে ইংলও ও আমেরিকার সহিত ভারতের বন্ধু-ভাবাপন্ন হওয়াই সম্ভব।

সত্যি যদি পৃথিবীতে তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ভারতের উচিত হইবে—নিরপেক্ষ থাকিয়া নিজের শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া তোলা। প্রথম মহাযুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত শিল্পপ্রধান রাষ্ট্রসমূহ যখন যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে, জাপান তখন নিরপেক্ষ থাকিয়া এই সুযোগে তাহার শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারতকেও এই সুযোগে নিজের শিল্পায়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উপসংহারে এই কথাই বলিতে চাই—আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি, কিন্তু অত্যন্ত জটিল অবস্থার ভিতর দিয়াই তাহা পাইয়াছি। এইজন্ত আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। জাতির জীবনে দুঃখ আসে, দুর্ভোগ আসে, সমস্যা আসে। জয় পরাজয় ও উত্থান-পতনের কাহিনী প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই আছে। নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে সকলেই তাহা অতিক্রম করিতে পারে। আমরা দুর্বল নহি, অক্ষম নহি, ব্রিটিশ শাসকদের আমরাই ভারত ছাড়িতে বাধ্য করিয়াছি। আমাদের শিক্ষা, আমাদের প্রতিভা, বিশ্বের জানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে। আমরা যদি আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথ পালন করিতে পারি তাহা হইলে কোন প্রতিকূল শক্তিই আমাদের অগ্রগতি রোধ করিতে পারিবে না।

সমস্ত হিংসা-দেষ ও দলাদলি তুলিয়া আমাদের এক হইতে হইবে। “জীবন ধূলিমুষ্টির চেয়েও তুচ্ছ; কর্তব্য পরিত্যক্তের চেয়েও কঠোর”—এই মহামন্ত্রেই আমাদের এক হইতে হইবে। দেশের জন্ত, জাতির জন্ত, কর্তব্যের জন্ত, পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতির মঙ্গলের জন্ত যত্নকে পর্যন্ত আমরা সহজ ও শান্ত ভাবে বরণ করার শিক্ষা গ্রহণ করিব। সমস্ত পৃথিবীকে আমরা নূতন সত্য ও আলোকের সম্মান দিব।

## বাসন্তী স্মৃতি

বিশুদ্ধ দুঃখজাত

টেলি:—বাসন্তী বি ফোন: বি.বি. ৫৭৩৮ পো:বঙ্গ ৬৮৩৬ কলি:

বি, স্কারমার্কেটস, একস্পোর্টারস, ইম্পোর্টারস ও  
জেনারেল অর্ডার সপ্লায়ারস

প্রমথনাথ পাল এণ্ড সন্স

২সি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা—৭

# ধাতুর বিনতি

## ত্ৰীপিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

• কাঠিষ্ঠ ধাতুর সাধারণ ধর্ম হলেও তার বিনতি (প্লাস্টিসিটি) আছে। এই বিনতির সুযোগ নিয়ে কামার গড়ে কৃষাণের কাশে লাঙল, দিন-মজুরের কোদাল কড়ুল, সেকরার কাঁসারির হাতুড়ি; সেকরা সোনা রূপা গড়ে পিটে তৈরী করে কৃষাণ বোয়ের, কামার বোয়ের, মজুর বোয়ের হাতের কাঁকন, পায়ের মল; কাঁসারি কাঁসা পিটে তৈরী করে তাদের ঘটি বাটি, থালা কলসী। কৃষাণ ফসল ফলায়, দিন-মজুর রাত্তা ঘাট তৈরী করে, সেই ফসলকে পৌছে দেয় হাটে বাজারে।

ধাতুর ছুটি প্রধান ধর্ম হল: ঘাত-কাঠিষ্ঠ (work-hardening) ও ক্ষর-লেখ্য জাবকের (etching agent) প্রভাবে বহু বিচিত্র নক্সা ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা। এ ছুটি ধর্মের মূলেও রয়েছে তার বিনতি। প্রথম ধর্মটি অর্থাৎ ঘাত-কাঠিষ্ঠের সঙ্গে কামার, সেকরা ও কাঁসারির বিশেষ পরিচয় আর দ্বিতীয়টিকে চেনেন গোয়েন্দা পুলিশের অপরাধ-তত্ত্ব বিভাগের ধাতুবিদ।

পিটলে ধাতু নমনীয় হয়। কিন্তু ক্রমাগত পিটিতে থাকলে এমন একটা অবস্থা আসে যখন ধাতু আর নরম না হয়ে কঠিন হতে শুরু করে, তার ভঙ্গপ্রবণতা বেড়ে যায়। এই অবস্থায় তাকে তাতিয়ে না নিয়ে যদি কেবলই পেটা হয় তা হলে সে ভেঙ্গে পুঁড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু তাতিয়ে নিলে তার নমনীয়তা আবার ফিরে আসে, তাকে প্রসারিত করা যায়। তাপের মাত্রাটা এক্ষেত্রে ধাতুর গলনাঙ্কে (মেল্টিং পয়েন্ট) পৌঁছবার কোনও প্রয়োজন নেই। তাই কোনও কিছু পেটাই করে গড়তে হলে ধাতুকারকে জিনিষটিকে একবার গরম করতে ও একবার হাতুড়ির দ্বা মারতে হয়। অবিস্মরণ আধাতে কঠিন হয়ে যাওয়া ধর্মকে বলা হয় ঘাত-কাঠিষ্ঠ (ওয়ার্ক হার্ডেনিং)।

ধনের তদন্ত করতে গিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ অনেক সময় দেখে যে ধনী পলাতক, ঘটনাস্থলে খুন-করা বন্দুকটী ফেলে যাওয়া ছাড়া আর কোনও চিহ্ন রেখে যায় নি। ধরা পড়বার ভয়ে গোয়েন্দা পুলিশের পাকা ধাতার চৌকা, বন্দুকের গায়ে খোদাই করা রেজিষ্টার্ড নম্বরটা উকো দিয়ে একেবারে ঘসে তুলে ফেলেছে। ধনীর চালাকি, কিন্তু ধাটে না। গোয়েন্দা পুলিশের ধাতুবিদ বন্দুকটার রস জায়গায় ক্ষর-লেখ্য জাবক লাগিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ইলেক্ট্রালের মত নখরটি পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়ে তোলেন, ধরে ফেলেন ধনীর কেরামতি।

ধাতুর ঘাত-কাঠিষ্ঠ বা সংখ্যার নক্সা ফোটান-ধর্মের

ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানীরা কি বলেন তার সংবাদ নেওয়া যাক। বিজ্ঞানীরা বলেন ধাতু তৈরী হয় বহু ছোট ছোট কেলাস অর্থাৎ ক্রিষ্টাল দিয়ে এবং কেলাস সজ্জার বৈচিত্র্যের ফলেই জন্ম নেয় ঘাতব-বিনতি, ঘাত-কাঠিষ্ঠ ও নক্সা-ফোটান ধর্ম। ঠিকমত তৈরী করতে পারলে যে কোন ধাতুতেও এই ছোট ছোট কেলাসগুলিকে অল্পবীনের (মাইক্রোস্কোপ) সাহায্যে দেখতে পাওয়া যায়। অল্পবীনের নাগালের বাইরে আছে কেলাসের অসংখ্য, অতি ক্ষুদ্র কোঠাদল (ক্রিষ্টাল ব্লক্) আর বহু কোঠাদলের সমাবেশে গড়ে ওঠে এক-একটি অল্পবীক্ষণিক কেলাস (ক্রিষ্টাল)। কেলাসের বহু অল্প-কোঠা (ইউনিট সেল) এক সঙ্গে মিলে তৈরী করে এক একটি কোঠাদল। কেলাসে কোঠাদল বা অমুকোঠার সমাবেশ-বৈচিত্র্য তাদের এক্স-রশ্মির (X-rays) আলোক-চিত্রের পাঠোদ্ধার করে বুঝতে পারা যায়। কেলাসে কোঠাদল অমুকোঠার সমাবেশের তারতম্য অল্পযায়ী তাদের গায়ে ধাক্কা ধেয়ে ফিরে-আসা রঞ্জন রশ্মির (X-rays) তীব্রতা কমে বাড়ে। অঙ্কের সাহায্যে এই কমা-বাড়ার হিসাব করা যায় এবং তার থেকে ধরা পড়ে কেলাসে কোঠা-দল ও অমুকোঠাদের সমাবেশ-বৈচিত্র্য।

ধাতুর কেলাসে অমুকোঠাই আদি নয় কারণ অমুকোঠার আদিতে রয়েছে ধাতুর পরমাণু কণারা। অল্পবীক্ষণিক কেলাসের দশে একটি কেলাস যেন আকাশ-ছোঁয়া প্রাসাদ, এক একটি কোঠাদল যেন তার এক একটি তলা আর এক একটি অমুকোঠা যেন তার এক একটি ধর। এক একটি অমুকোঠার ধর আবার তৈরী ধাতুর একাধিক পরমাণু কণা দিয়ে—প্রত্যেকটিই নক্সা অল্পযায়ী তলায় তলায়, ধাপে-ধাপে, সারিতে সারিতে সমস্ত কেলাসটিতে স্তম্ভরূপে মেপে-জুপে সাজান। একটি কোঠাদল আর একটি কোঠাদলের, একটি অমুকোঠা আর একটি অমুকোঠার, একটি পরমাণু আর একটি পরমাণুর আকর্ষণে বাঁধা। স্বাভাবিক অবস্থায় আকর্ষণের টান এড়িয়ে তাদের অবস্থান সমাবেশ বদলাতে পারে না—টানের বাঁধনেই সমস্ত কেলাস প্রাসাদটা টিকে থাকে, তাসের ঘরের মত সহজে ধসে পড়ে না। কোন একটি ঘাতব কেলাসে প্রচণ্ড চাপ পড়লে কেলাসের কোঠাদলগুলির একটি অপরাটর ওপরপিছলে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত তার সিঁড়ির ধাপের মত রা হাতের তৈলায় ছড়িয়ে-পড়া এক প্যাকেট তাসের মত সাজিয়ে পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত এই পিছলে যাওয়াটা

চলতে থাকে। বিজ্ঞানীদের ভাষায় একে বলে বিনতি-বিকৃতি (প্লাস্টিক ডিফরমেশন)। চাপের বহুরূপী যদি মাঝামাঝি রকমের হয় তা হলে এই খলনটা প্রত্যাকর্ষণের বাইরে যায় না, কোঠাদলেরা পরস্পরের টানের এলাকার মধ্যেই থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র স্বাভাবিক অবস্থান থেকে পরমাণুদের সামান্য বিচ্যুতি ঘটে। চাপটা সরিয়ে নিলে পরমাণু কণার তৎক্ষণাৎ পূর্বের স্থানে ফিরে যায়, কেলাসের বিকৃতিটা স্থায়ী হয় না। শচও ঝড়ের মুখে উঁচু পাকা বাড়ীর অবস্থা অনেকটা এরকম হয়। শড়ের প্রচণ্ড বেগের মুখে বাড়ীটা একটু ঝুঁকে পড়ে, ঝড় কমলে আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসে। এ ধরনের বিকৃতিকে বৈজ্ঞানীরা বলেন বিনতি-বিকৃতি বা স্থিতিবেদী বিকৃতি (ইলাস্টিক ডিফরমেশন)। বিনতি-বিকৃতির ব্যাখ্যায় এক টুকরো ধাতুকে পিটে পাতে, কিম্বা টেনে তারে কেন রূপান্তরিত করতে পারা যায় তার উত্তর দেওয়া চলে। কিন্তু ধাতুর স্বাত-কাঠি, ভঙ্গপ্রবণতা বা নজা-কুটিয়ে তোলার রহস্য ভেদ বিনতি-বিকৃতির ব্যাখ্যায় হয় না।

কয়েকটি সিদ্ধান্ত বা একল্পের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা এই ধর্মগুলির ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। প্রথম সিদ্ধান্ত অনুসারে কেলাসের একটি কোঠাদল আর একটি কোঠাদলের উপর চাপের ঠেলায় হড়কে গেলে কোঠাদলের ঘষটে-যাওয়া পিঠিহুটি থেকে পরমাণু কণার ছিঁড়ে আসে; ছিঁড়ে-আসা পরমাণু কণার ঘষটে-যাওয়া পিঠিহুটোর মাঝখানে এলো-মেলো ভাবে ছড়িয়ে পড়ে মিশে যায়। এই অনিবার্য অবস্থায় পরমাণু কণার আঠার মত কাজ করে এবং রগড়ে যাওয়া কোঠাদল ছটোকে টান লাগিয়ে ধরে রাখবার চেষ্টা করে। চাপের ধাক্কায় কোঠাদলেরা যতই পেছলাতে থাকে আঠাল পরমাণুদের সংখ্যা ততই বাড়তে থাকে এবং জোরাল হতে থাকে খলন-নিবর্তি বাধা। এভাবে খলন-নিবর্তি-বাধার টানে পিছলে যাওয়াটা কমলে ধাতুর বিনতিটাও কমে যায় এবং তার স্বাত-কাঠিও বাড়ে। চাপের ধাক্কাটা পরিমাণে খুব বেশী হলে কোঠাদলদের পরস্পরের সংযোগটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, আর এর ফলে ধাতুর টুকরোটা ভেঙ্গে বা ছিঁড়ে যায় ছ'ভাগে। এই ভেঙ্গে যাওয়াটাই আমরা চোখের স্থলদৃষ্টিতে দেখি। সিদ্ধান্তটিকে আঠালপরমাণুর সিদ্ধান্ত (এটমিক গ্লু থিওরি) বলে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটির ভাষাটি একটু অল্প রকমের। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ঘষটাবার সময় কোঠাদল থেকে খুব ছোট টুকরো ভেঙ্গে গিয়ে খলন-তলের (স্লিপ-প্লেন) মাঝে মাঝে আটকে থাকে। টুকরো জমায় রুক্ষতায় ও চাপের ধাক্কায় কোঠাদলের পেছলানটা মোলায়েম ভাবে ঘটতে পারে না কারণ টুকরোগুলো বাধা দেয়। সানবীধান রকে পেছলান

আর খোয়া-ওঠা কাঁচা রাস্তায় আছাড় খাওয়ায় যে তফাৎ সেই আর কি। সিদ্ধান্তটির নাম হ'ল "টুকরো ভাঙ্গা সিদ্ধান্ত" (ফ্র্যাগমেন্টেশন থিওরি)।

তৃতীয় সিদ্ধান্তটি অনুসারে পিছলে যাবার সময় কোঠাদলরা নিজেরাই বেঁকে তরঙ্গিত হয়। ঢেউ খেলান একটি লোহার পাতকে আর একটি ঢেউ খেলান পাতের উপর দিয়ে লম্বান্বিত ভাবে টেনে যাবার সময় একটির ঢেউয়ের মাথা অপরটির ঢেউয়ের পেটের সঙ্গে ঝাঁজে ঝাঁজে মিলে আটকে যাওয়ার জন্য যেমন বাধার সৃষ্টি করে এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কোঠাদলে ভাঁজ পড়ে সেই রকম বাধার সৃষ্টি করে, চাপের ধাক্কায় পিছলে যাওয়া কোঠাদলদের আটকে রাখে; পেছলান বাড়লে কোঠাদলের তরঙ্গ বিকৃতির মাত্রাও বাড়ে, ফলে তাদের পেছলানটা ক্রমশঃ কমতে কমতে থেমে আসে, বিনতি-বিকৃতি পৌছায় তার শেষ সীমায়। সিদ্ধান্তটিকে "অস্থূল বিকৃতি" (ল্যাটাস ডিস্টরসন) বলা হয়।

এতক্ষণ কেবল একটিমাত্র কেলাসের কথা বলা গেছে।

কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এক টুকরো ধাতুর মধ্যেও এ রকম হাজার হাজার কেলাস আছে। প্রত্যেকটি কেলাস তার কোঠাদলকে নিয়ে দৈবক্রমে নানা দিকে নানা ভাবে পংক্তি করা থাকে, আশে পাশের কেলাসদের সঙ্গে সকল সম্ভাব্য কোণে সাজান থাকে। কেলাসদের এই সমাবেশটিকে কাঁচের ইঁটের নিছিন্ন ভরাট স্তূপের সঙ্গে তুলনা করা চলতে পারে। কাঁচের স্তূপটিতে চাপের ধাক্কা লাগলে কতকগুলো ইঁট সামনে এগোবে, কতকগুলো তাদের পাশেরগুলিকে পাশে বা পেছনে ঠেলে দেবে। যেন খেলার মাঠে পুলিশের স্তম্ভের দর্শকদের মধ্যে ঠেলাঠেলি। প্রত্যেক দলেরই চেষ্টা আশ-পাশের দলকে ঠেলেঠেলে নিজের দলকে সামলে রাখা। চাপের ধাক্কায় ধাতুর ঘন সন্নিবিষ্ট কেলাসদের মধ্যেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটে; কতকগুলো কেলাসের কোঠাদল ধাক্কায় মুখে পিছলে যায়, ঠেলমারা অপরাপর কেলাসের কোঠাদলকে পাশে ওপরে নীচে পিছলে যেতে বাধ্য করে। চাপটা হাতুড়ির ধাক্কা, টান বা ঠেল যেকোনোই আসুক না কেন এলো-মেলো পেছলানোর ফলটা হয় একই। প্রত্যেক কেলাসের কোঠাদলরা বিনতি-বিকৃতির শেষ সীমায় পৌছায়। তারা বিনতি-বিকৃতির সীমা ছাড়ালে ধাতুর টুকরোটি ভেঙ্গে যায়। পূর্বোক্ত তিনটি সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যায় স্বাত-কাঠিের রহস্যটা একটু পরিষ্কার হলেও সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোন সিদ্ধান্তটি আসলে ঠিক কে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আজও নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। স্বাত-কাঠিের রহস্য তা একটু পরিষ্কার হ'ল। এইবার তাড়াতাড়ি পর পেটাই করা রূপটা (যে রূপটার জন্য হাতুড়ীর ধাক্কা থেকে) না হারিয়ে ধাতু আবার নমনীয় ও প্রসার্য হয় কেন বা ধাতুর বিনতি ফিরে আসে কি ভাবে তার ব্যাখ্যায়



আসা যাক। ক্ষর-লেখ দ্বারকের প্রভাবে নম্বর বা নম্বা ছুটিয়ে ভোলার কারণও সেই সঙ্গে বুঝতে পারা যাবে।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে স্বাভাবিক অবস্থায় পারস্পরিক টান এড়িয়ে ধাতুর কেলাসে, কোঠাদল ও তাদের পরমাণু কণাদের অবস্থান সমাবেশ বদলান হুঁচট। কেলাসে কোঠা-দলে পরমাণু কণাদের স্তরে স্তরে পঞ্জিতে পঞ্জিতে সাজিয়ে পড়বার ঝোকটা খুব প্রবল। চাপের থাকায় একটি কোঠাদল আর একটি কোঠাদলের ওপর যখন পিছলে যায় তখনও এই ঝোকটা থাকে। কিন্তু ঝোকটা থাকলেও সেটা সব সময় কার্যকরী হতে পারে না। হাতুড়ীর বা বা অঙ্ক চাপের থাকায় পিছলে যাবার সময় প্রায়ই কোঠাদলের পিঠ থেকে একটা পরমাণু কণা ছিঁড়ে গিয়ে তার নিকটবর্তী কোঠাদলের ছুঁতে। পরমাণু-কণার মাঝামাঝি ধামতে বাধ্য হয়। তখন ছুঁতে লড়ায়ে জ্বালের মাঝখানে একটি নিরপেক্ষ জ্বালের মত এই ছিঁড়ে আসা পরমাণু-কণাটির অবস্থা উভয় সঙ্কট হয়ে দাঁড়ায়, ছুঁপাশের পরমাণু-কণার টানে সে একই সময়ে যেতে চায় ছুঁতে অবস্থিতিতে। কাজেই নিরপেক্ষ জ্বালটার মত অসম্ভব টানাটানির মধ্যে থাকা ছাড়া তার অঙ্ক উপায় থাকে না। চারদিকের টানের মাত্রাটা এত বেশী হয় যে তাকে অচল হয়েই থাকতে হয়। হাতুড়ীর বা বা অঙ্ক কোন

বাইরের চাপ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ধাতুর ওপরের পিঠে ও ভিতরের মাঝামাঝি জায়গার কোঠাদলগুলিতে এটা ঘটতে থাকে, কিন্তু বাইরের চাপ সরিয়ে নিলে ধাতুর ওপরের পিঠের অবস্থার সঙ্গে ভিতরের মাঝামাঝি জায়গার অবস্থার আর কোনও মিল থাকে না। ছুঁজায়গার অবস্থা তখন সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। সে সময় ধাতুর ওপরের পিঠের কোঠাদলগুলি থেকে ছিঁড়ে আসা পরমাণু-কণাদের ওপর চাপের থাকায় স্থানচ্যুতির টান ছাড়া অপর কোন বাড়তি চাপ থাকে না। তখন তাদের ওপর ধাতুর মাঝামাঝি জায়গার পরমাণু-কণাদের টানটা তাদের স্থানচ্যুত অবস্থার আর ধরে রাখতে পারে না। এর ফলে স্থানচ্যুত পরমাণু-কণার স্থানচ্যুতির টান এড়িয়ে কাছের পঞ্জিতে আবার সারি দিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু হাতুড়ীর বা বা অঙ্ক কোন বাইরের চাপ সরিয়ে নিলে ধাতুর ভিতরের মাঝামাঝি জায়গার কোঠাদল থেকে স্থানচ্যুত পরমাণু-কণার স্থানচ্যুতির টান এড়াতে পারে না—স্থানচ্যুতির টান ছাড়াও সেখানে তাদের ওপর চারদিক থেকে, ওপর থেকে নীচে থেকে ছুঁপাশ থেকে একটা বাড়তি টান থাকে এবং এই টানের জোরটা তাদের পঞ্জিতে সারি বাঁধবার স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে অনেক বেশী জোরাল। সুতরাং ধাতুর ভিতরের পিঠের স্থানচ্যুত পরমাণুদের স্থানলুপ্ত হয়ে

## মায়ের কর্তব্য

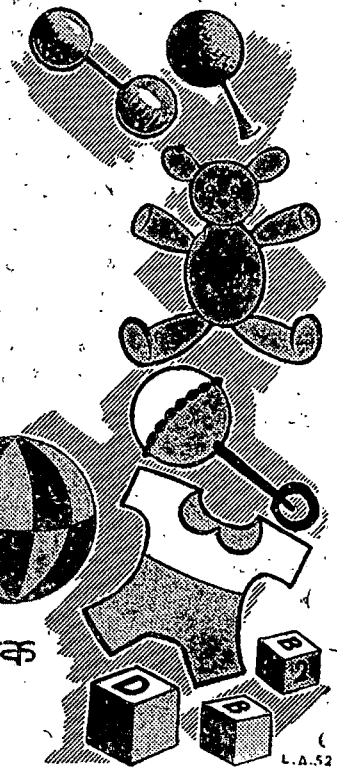
শিশুপালনের সম্যক জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন শিশুদের দৈহিক সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বি২ সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া নবোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। বিবটন নিম্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারীঃ—শিশুদের বকুতের পীড়া, অজীর্ণতা, হৃদযন্ত্রাণ পট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তশূন্যতা, রুগ্নতা, একাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি।



শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য  
**বিবটন**

একটি পূর্ণাঙ্গ টনিক

লিষ্টার এন্টিসেপটিকস্ • কলিকাতা



অচল অবস্থায় টানাটানির মধ্যেই থাকতে হয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে ধাতুর ওপরের পিঠের ও ভিতরের মাঝামাঝি জায়গার কেলাসের কোঠাদলে পরমাণু-কণারা বাইরের চাপের ফলে টান-পীড়িত হয়। বাইরের চাপটা সরিয়ে নিলে ধাতুর ভিতরে এই টানটা থেকে যায় কিন্তু ধাতুর ওপরের পিঠের পরমাণু-কণারা এই টানটাকে এড়িয়ে পংক্তি সাজিয়ে ধাতুর ওপরের পিঠে কেলাসের কোঠাদলে টানমুক্তি ঘটায়। খুনের বন্ধকের নখর ফুটে ওঠার কারণ এবার পরিষ্কার হবে। নখরগুলো বন্ধকের ওপর প্রচণ্ড চাপে খোদাই করা হয়। উকোর ষষ্ঠানিতে খুনি নখরগুলো ও তার আশপাশের টানমুক্ত তলটাই কেবল নষ্ট করে কিন্তু নখরগুলোর নীচে প্রবল টান-পীড়িত কেলাসগুলির ওপর কোন প্রভাব রেখে যেতে পারে না। ক্ষর-লেখ দ্রাবক প্রথমে টান-পীড়িত কেলাসগুলির ওপরের পাতলা স্তরটা ক্ষয়ে ফেলে, তার পর টানমুক্ত কেলাসগুলির চেয়ে টান পীড়িত কেলাসগুলিকে বেশী এবং তাড়াতাড়ি ক্ষয় করায়। কাজেই নখরগুলোর নীচের কেলাসগুলি ক্ষয় হয় বেশী আর ক্ষয় হওয়ার ফলে ঘষে ফেলা নখরক'টি ফুটে ওঠে। ভেতরে টান থাকা ধাতু মোটেই ভাল নয়। তাপের প্রথম কাজ হ'ল এই টান দূর করা। ধাতুতে পরমাণু-কণারা এমন কি স্থানভ্রষ্ট পরমাণুর পর্যাপ্ত একসঙ্গে তাড়াতাড়ি কাঁপতে থাকে; উষ্ণতা যত বেশী হবে কাঁপুনিটা ততই বাড়বে। ক্রমে এমন একটা অবস্থা আসে যখন পরমাণুদের কাঁপুনি এত বেশী বাড়ে যে আভ্যন্তরিক টান থাকা সত্ত্বেও স্থানচ্যুত পরমাণুরা পংক্তিতে ফিরে যেতে পারে এবং যায়ও। এই রকম তাপ লাগানকে ধাতুবিদদের ভাষায় বলে গীড়ন মুক্তি (ট্রেস রিলিভিং) বা আরোগ্য (রিকভারি)। গীড়ন মুক্তির জন্ম খুব বেশী উষ্ণতার দরকার হয় না। কতকগুলি ধাতু আবহিক উষ্ণতায়ও (রুম টেম্পারেচার) টানমুক্ত হয়। সাদা কথায় ক্রমাগত হাতুড়ির খা খেলেও তারা কঠিন বা ভঙ্গপ্রবণ হয় না—কারণ হাতুড়ির খা থামলেই তারা তাদের পূর্বাবস্থা ফিরে পায়। রাং (টন) ও সীসে হ'ল এ সব ধাতুদের দলে।

কেবলমাত্র আরোগ্য ধাতুর প্রসার্যতা বা নমনীয়তা কিরিয়ে দিতে পারে না। কেলাসরা তখনও বিকৃত এবং বিকৃত অবস্থায় থাকে। ধাতুকে যদি আরও বেশী গরম করলে ব্যাপক পরিবর্তন আরম্ভ হয়; বিকৃত বিকৃত

কেলাসরা ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়, ও তাদের জায়গায় নূতন স্রুগঠিত ছোট ছোট কেলাসরা গড়ে ওঠে। অনিয়তাকার আঠাল পরমাণু-কণারা লাগাম-টানা (ব্রেকিং) টুকরো পরমাণুপুঞ্জ তরঙ্গিত বন্ধুর কোঠাদলরা নূতন গড়ে ওঠা কেলাসগুলিতে মিশে যায়। অণুবীনের দৃষ্টিতে এটা দেখতে ও-ধরতে পারা যায়। নূতন কেলাসগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন স্থলন তলও (স্লাইড প্লেনস) গড়ে ওঠে। নূতন স্থলন তল গড়ে ওঠার ফলে কোঠাদলগুলি আবার পেছলাতে পারি এবং ধাতুর টুকরাটি তার পূর্বের প্রসার্যতা ফিরে পায়। তখন তাকে আবার তার বিনতি সামর্থ্যের (স্লাইট-এবিলিটি) শেষ সীমা পর্যন্ত পেটাই করা বা টানা চলতে পারে।

এভাবে ধাতুর ষাত-কাঠি ও কমলায়নের (অ্যানিলিং) নানা পর্যায়ের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন ধাতুর বিনতি সীমা (প্রাস্টিক-লিমিটস), আরোগ্যদায়ক উষ্ণতা (রিকভারি টেম্পারেচার); কেলাস পুনর্বিকাশক তাপমাত্রা (রিক্রিষ্টালি-জেশন টেম্পারেচার) সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা ধাতুকারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ধাতু নিয়ে কাজ করার বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তার এ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান জন্মান স্বাভাবিক কিন্তু বিজ্ঞানীই ধাতুর নানা ধর্মের উৎস জেনে তার ব্যাখ্যা করেন, যে অদৃশ্য ছন্দ দোলায় ধাতুর দেহে নানা বিস্ময়কর পরিবর্তন রূপ নেয় তাকে লোকগোচর করেন।

## মাতৃমন্দির

২৬-এ, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা

গর্ভাবস্থায়, নিরাপদে থাকা, প্রসব এবং

শিশু রক্ষার সুব্যবস্থা করা হয়।

মানদা দেবী, লেডী সুপারিন্টেন্ডেন্ট

## পুস্তক-পরিচয়

হুতোম প্যাচার নকশা ও অন্যান্য সমাজ-চিত্র—

• শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য রাঙে চার টাকা।

‘সমাচার-দর্পণে’ ‘বাবুর উপাখ্যান’ প্রকাশিত হয় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে। ‘সমাচার চন্দ্রিকা’-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘কলিকাতা-কমলালয়’ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং ‘নবাবুলিলাস’ ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার পর হইতেই বাংলা-সাহিত্যে সামাজিক নক্সা রচনার ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। অর্থাৎ উপন্যাস-রচনার পূর্বে হইতেই সমাজচিত্র-রচনায় বাঙালী মন দিয়াছে। ভূমিকায় সম্পাদকব্রত ‘আলালের ঘরের দুলাল’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘আনন্দ-লহরী’ পর্যন্ত দশখানি সামাজিক চিত্রের নাম করিয়া বলিয়াছেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে বাংলা-গণ্ডে এইরূপ আরও অনেকগুলি চিত্র জন্মলাভ করে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ‘হুতোম প্যাচার নকশা’ প্রথম প্রচারিত হয়। বসিতে গেলে বাংলা ভাষা ও রচনারীতির উপর ‘হুতোম প্যাচার’র প্রভাব সাধারণ নয়। আজকাল চলিত ভাষায় গ্রন্থ-রচনার যে রীতি প্রচলিত হইয়াছে ‘হুতোম’কে তাহার পথপ্রদর্শক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) শুধু মহাভারতের অনুবাদ সম্পাদন এবং প্রকাশ করিয়াই বশবী হন নাই, ‘হুতোম প্যাচার নকশা’ তাহার অক্ষয় কীর্তি। ‘নকশা’য় তখনকার কলিকাতার অপূর্ণ চিত্র দেখিতে পাই। সচিত্র ‘হুতোম প্যাচার নকশা’ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সহিত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘সমাচার চিত্র’ (১৮৬৫ খ্রীঃ) ও রামসর্ব্বদেব বিদ্যাতৃষ্ণের ‘গল্পীগ্রামস্থ বাবুদের দ্বগোৎসব’ (১৮৬৮ খ্রীঃ) পরিষৎ-প্রকাশিত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সম্পাদকব্রত লিখিত ভূমিকাটি মূল্যবান।

দেবতার জন্ম ও অস্থান্য গল্প—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী। দ্বি বুক. এম্পোরিয়াম লিমিটেড, ২২১২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

ছোট গল্পের বই, এগারোটি গল্পের সংষ্টি। গ্রন্থকারের লিখিত একটি নিজস্ব ভঙ্গী আছে এবং এই বিশেষ রচনাভঙ্গী গল্পগুলিকে সরস ও সুপাঠ্য করিয়াছে। প্রথম গল্প ‘দেবতার জন্ম’। পথের-মান্ধে-পড়িয়া-থাকা এক শিলাখণ্ড কিরূপে প্রস্তর জন্ম পরিহার করিয়া দেবতার পদে উন্নীত হইল তাহারই কাহিনী। শেষের গল্পটি ‘মহা পাকিস্থানের পথে’। গল্পটি অত্যন্ত সুকোশলে লিখিত। বাহা মধ্যান্তিক ট্রাজেডি হইতে পারিত তাহাই এক কৌতুককর ঘটনায় পরিণত হইয়া প্রচুর হাস্তের উপাদান যোগাইয়াছে। ‘আমার প্রথম লেখা’ নামক গল্পটিতে লেখক বলিতেছেন, ‘আমার গল্পরা যখন রূপান্তরিত হয়ে সেজেগুজে আপনাদের সমক্ষে গিয়ে দাঁড়ায় তখন তাদের দেখে হয়ত হাস্তকর বলে মনে হলেও হতে পারে কিন্তু যখন আমার সামনে বা আঁশেপাশে, আমাকে জড়িয়ে নিয়ে, গাঁজতে থাকে তখন তা দস্তুরমতই গল্পনাদায়ক। মোটেই হাস্তকর নয়, অন্ততঃ আমার পক্ষে তো নয়।’ ভাবাবেগসম্বল গুরুগাভীরের দেশে হাসি এবং কৌতুকের লীলাচাপল্য সত্যই রচিকর। তবে ভঙ্গী যেখানে ভঙ্গিমায় অর্থাৎ mannerism-এ পরিণত হইবার

## নেতাজীর অনুসরণে :—

বাংলার বিখ্যাত স্মৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাহার ‘শ্রী’ মার্কা স্মৃতির নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিম্প্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ স্মৃতির ব্যবহার অত্যাৱশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্মৃতির যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্মৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা স্মৃত ব্যবসায়ী মাত্রেই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

বিশেষ সম্ভাবনা লেখককে সেখানে সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়। পাঠক গুরুত্ব পড়িয়া আনন্দলাভ করিবেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন কাব্য-

বিশারদ—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৬৮—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৫) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র। সাহিত্যের এই নীরব এবং অক্লান্ত সাধক বহু বিষয়েই অগ্রণী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানেন্দ্রনাথের নাম প্রথম সম্পাদকরূপে থাকিলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথই “ভারতী”র সম্বল্লয়িতা ও প্রতিষ্ঠাতা। “পুরুষবিহীন”, “সরোজিনী”, “অশ্রুমতী” প্রভৃতি নাটক, “কিঞ্চিৎ জলযোগ” “অলীক বাবু” প্রভৃতি প্রহসন একদা যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত ও ফরাসী সাহিত্যের অন্তর্গত বিভিন্নপ্রকার গ্রন্থের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত স্তম্ভ অনুবাদগুলি বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। জ্যেষ্ঠ-অনুসৃত পথে তিনি বাংলা শ্রমলিপির নতুন ধারা প্রবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার চিত্রাঙ্কনশক্তি সাধারণ ছিল না। তিনি নানা-বিষয়ক প্রায় অর্ধ শত গ্রন্থের প্রণেতা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবন-গঠনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব অল্প নহে।

স্বদেশপ্রেমিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক “হিতবাদী”র খ্যাতনামা সম্পাদক, স্বদেশী আন্দোলনের হুগ্গিসিক বক্তা ও প্রচারক, কয়েকটি বিখ্যাত জাতীয় সভার রচয়িতা, হরসিক এবং হুলেখক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭) মাত্র ছোটলিঙ্গ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহার তীক্ষ্ণ বিজ্ঞপ-বাণ এবং নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা প্রতিপক্ষের ভয়ের কারণ ছিল। তাঁহার সম্পাদনায় “হিতবাদী” একদিন সংবাদপত্র-জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

২ শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ লাহা

সাহিত্যবিচার—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং। ৮মি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

লক্ষপ্রতিষ্ঠ কবি এবং সমালোচক ‘মোহিতলালের রচনা সাহিত্যরসিক-নাটকেরই নিকট স্থাপিত। বর্তমান গ্রন্থে ‘কবি ও কাব্য’, ‘কাব্য ও জীবন’, ‘বাংলা সাহিত্যে উপজ্ঞান’, ‘সাহিত্যের ষ্টাইল’ ‘নাটকীয় কথা’, ‘আধুনিক সাহিত্যের ভাষা’, ‘সাহিত্যের আসরে’ এবং ‘সংবাদপত্র ও সাহিত্য’ এই আটটি প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। মোহিতবাণু চিন্তাশীল এবং হরসিক লেখক। মনোবৃত্তি এবং হৃদয়বস্তুর এরূপ সম্মিলন বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে বিরল। লেখক ‘কাব্য কথা’ নাম দিয়া একখানি গ্রন্থরচনার সংকল্প করিয়াছিলেন, ঐ নামে কতকগুলি প্রবন্ধও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, —‘কবি ও কাব্য’ সেই সংকল্পিত গ্রন্থের অংশবিশেষ। দেশী ও বিদেশী শ্রেষ্ঠ কাব্যের রসে তাঁহার চিত্ত পরিপুষ্ট। আজিকার অনেক সমালোচক নতুন ভঙ্গীমাত্র দেখিয়া চমৎকৃত, কেহবা পাণ্ডিত্যপ্রকাশে উদ্ভ্রাব, কাহারও দৃষ্টি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারে আচ্ছন্ন, আবার কাহারও কাব্যবিচার অপর সমালোচকের প্রতিধ্বনি ছাড়া কিছু নয়। মোহিতলালের আছে স্বাধীন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, তাঁহার আলোচনার পাই সংবেদনশীল হৃদয়ের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। পুরাতনের মধ্যে যাহা অমর, তাহার প্রতি তিনি অতিশয় শ্রদ্ধাবান, নূতনের মধ্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা দেখিলে তিনি তাহার অন্বেষণে অগ্রসর। তিনি নিজে যাহা বুঝিয়াছেন, অনুভব করিয়াছেন, স্থায়ী সাহিত্যের কণ্ঠপাথরে কথিয়া যে মূল্য নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা অকুণ্ঠিত ভাবে জানাইয়াছেন। শুধু জানাইয়াছেন বলিলে যথেষ্ট হইবে না, রচনাগুণে আপন আনন্দ ও প্রত্যয় পাঠকের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন।

সাহিত্যের মূলতত্ত্বের অভ্যন্তরে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন এবং সেই

## রূপ ও রূপসী-

রূপের ঐশ্বর্য বিধাতার দান; কিন্তু মানুষ সেই রূপের উৎকর্ষ সাধন করেছে প্রসাধন-বিজ্ঞানের সযত্ন ওদৃষ্টিতে। সামান্য রূপের অধিকারিণীরাও তাঁদের রূপ প্রস্তুত করে তুলতে পারেন প্রকৃষ্ট প্রসাধনীর নিয়মিত সদ্যবহারে। এ বিষয়ে কালকেমিকোর নির্বাচিত প্রসাধনী সম্ভার রূপচর্চা-কারিণীদের বিশেষ সহায়তা করতে পারে।

মার্গো সোপ \* রেণুকা পাউডার  
ক্যাষ্টরল \* লাবণি জ্বো ও ক্রাম

ক্যালকাটা কোমিক্যাল



স্ববোধ ঘোষের

## পরশুরামের কুঠার

দ্বিতীয় সংস্করণ। দুই টাকা।

খানিই এনে নিয়েছিলেন স্ববোধ ঘোষ। আশ্চর্য্য এক রূপ ও রসের আমদানী করে তিনি যেন বাংলা-সাহিত্যের গভীরেই মোড় ফিরিয়ে নতুনতর পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁর ভাষাও এক অপূর্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। স্ববোধ ঘোষের গল্পের আলোচনাগ্রন্থে চতুঃপাশে বলা-ছিলো : 'রবীন্দ্রনাথের পর

## শুক্লাভিসার

দুই টাকা চার আনা।

দুঃখবিলাসের কান্না নয়, মুক্তির বাণীর অদম্য প্রেরণাটাই সেগুলি গতিবান, ফলে শিল্প চাতুর্যের অপূর্ব নিবর্শন।' ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিচয় যে তাঁর রচনার ছায়ে ছায়ে ছড়িয়ে আছে, একটামাত্র উক্তি থেকেই তা স্পষ্টই জানা যাবে, 'স্ববোধবাবুর দৃষ্টি আধুনিকতার দৃষ্টি—সত্যের প্রত্যক্ষতায় তাঁহার লেখা সরস এবং সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।'

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

## পতাকা

দুই টাকা।

সাহিত্যক্ষেত্রে নেমে খুব অল্প দিনের মধ্যেই যারা পাঠকসাধারণের কাছ থেকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করতে সমর্থ হন, তাঁদের সংখ্যা সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যে খুব বেশী নয়, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ সেই অল্পসংখ্যক লেখকদের অন্তর্গত। ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে দিয়ে মানবমনের যে আবর্তন তা-ই নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনায়। 'পতাকা' তাঁর সর্বাধুনিক গল্পগ্রন্থ।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের

## নয়নচারা

দেড় টাকা।

জাহাঙ্গীর সারোং এবং নৌকার দাঁড়ি মাঝিমালা আমাদের প্রতিদিনকার পরিচিত জগতের অধিবাসী নয়, কিন্তু তাদেরই হৃদয়ের অন্তরমহলে প্রবেশ করে লেখক এই অজ্ঞাত-পরিচয় মানুষগুলির সত্যিকার রূপকে প্রকাশ করেছেন এই গল্পগ্রন্থে। মনস্তত্ত্বের পটভূমিকায় রচিত কয়েকটি গল্প যে এমন সার্বক হৃদয় হয়ে উঠতে পেরেছে তাঁর কারণ লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত মমতাবোধ ও অন্তর্দৃষ্টিতে কোথাও ফাঁকি থাকে নি।

প্রমোদ মিত্রের

## মহানগর

যে কল্পন লেখকের সাধনার মধ্যে দিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথপরিক্রমা শুরু হয়েছিল প্রমোদ মিত্র তাঁদের অন্তর্গত। সরস দ্বিতীয় সংস্করণ। দুই টাকা। গল্পরচনায় তাঁর প্রতিষ্ঠা বহুদিনের। সব জড়িয়ে তিনি তাঁর গল্পে যে ভাবটি পরিষ্কৃত করে তোলেন তা এমনি অনির্বচনীয় রসে পরিপূর্ণ যে আপনি যদি রসের অভিসারী হন এবং জীবনে দার্শনিক ভাবগর্ভ উপলব্ধি করবার দিকে যদি আপনার মনের সহজ প্রবণতা থাকে, সোজা কথায় আপনার যদি জীবন-বোধ থাকে, তাহলে তাঁর দ্বারা আপনি অভিভূত হবেনই হবেন।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের

## ফসল

যে দুঃখীনাধারণকে নিয়ে দেশের বৃহৎ জনসমাজ চিরাচরিত শ্রোতা ধারায় দ্বিতীয় সংস্করণ। এক টাকা চার আনা। প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তারাই এ-গল্পগুলোর প্রধান চরিত্র; গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও আন্তরিক সহানুভূতির স্পর্শে প্রত্যেকটি চরিত্রই সত্যিকার মূর্তি পরিগ্রহ করেছে—লেখক কোথাও আবরণের আশ্রয় নেন নি।

বাঙালীর সমাজ ও পারিবারিক জীবনের পারস্পরিক সংস্বার মধুরতা অন্তর্হিত হতে চলেছে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক কারণে। যে আর্থিক এক টাকা সাড়ে ছয় আনা। সামাজ্য পারিবারিক শান্তি ও মধুরতা রক্ষা করবার পক্ষে অপরিহার্য তাঁর অভাবে পিতামাতার প্রতি ভক্তি, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা, অপত্য মেহ, বন্ধুপ্রীতি সবই ধীরে ধীরে কমে আসছে। বাংলার এই পূর্বাশু সমাজজীবনের রূপটিই প্রতিফলিত হয়েছে 'ফল' গল্পগ্রন্থে।

'গল্পগুলির উপাদান প্রধানতঃ আধুনিক দুই টাকা।

শিক্ষিত অভিজাত ও সম্পন্ন পরিবারের যুবক-যুবতীর মনস্তত্ত্বের অতিশূন্য বিশ্লেষণ। ভাষা বলিষ্ঠ, বর্ণনাভঙ্গী চিত্তাকর্ষক।'—আনন্দবাজার 'চিরাচরিত পরিবেশে গল্পগুলি দাঁড় করান হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাষার সৌন্দর্য্যে এবং রচনামূল্যে নিপুণতায় সেগুলি আকর্ষণীয়।'—যুগান্তর

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

## খেলনা

দেড় টাকা।

আজকের দিনের উদ্ভাস্ত অনিশ্চয়তায় ঈর্ষকো খেলনার মতোই দেখার অজস্র মধ্য-বিভিন্ন নষ্টজট জীবনের দাবী। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সাম্প্রতিক গল্প-সাহিত্যে এ-জন্মই বিশিষ্ট যে তাঁর নায়ক-নায়িকার চরিত্রে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে ভঙ্গুর খেলনারই করুণ প্রতিভাস।

প্রকাশক :

পূর্বাশা লিমিটেড—পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩



কার্যেই তাঁহার বিচার কেবল কঙ্কাল বিশ্লেষণ নহে, তাহা প্রাণ-রহস্তেরই সন্ধান সন্ধান। 'সাহিত্যের ষ্টাইল' প্রবন্ধ তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। 'Mind in Style' এবং 'Soul in Style' এর পার্থক্য দেখাইয়া লেখক বলিয়াছেন : "বাহার মধ্যে 'Soul of humanity', বিশ্ব-মানবের প্রাণস্পন্দন, অনুভূত হইয়া থাকে, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রসযুক্ত, তাহাই Great Art—অতএব তাহাই শ্রেষ্ঠ ষ্টাইল। আধুনিক ভাষাবিকারের দিনে লেখকের নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "ভাষার রীতি একটা খেলা বা খেলালের বস্তু নয়, ব্যক্তিবিশেষের খুশী বা বিলাস-বাসনা যদি এমন করিয়া কোনও জাতির ভাষাকে গড়িতে বা ভাঙিতে চায় ও পারে তবে সে জাতির মৃত্যু অবধারিত। বাঙালী কি সত্যই মরিতে বসিয়াছে?"

সাহিত্য-বিষয়ে যাহারা চিন্তা ও চর্চা করেন, তাহারা এ গ্রন্থখানিকে পরম মূল্যবান বিবেচনা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পুতুলনাচের ইতিকথা - ক্রীমণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। দি বুকম্যান—৮৭ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা।

ছোট একটি গ্রামের অতি সাধারণ কয়েকটি নরনারীকে গল্পের উপাদান হিসাবে লেখক বাছিয়া লইয়াছেন। এরা অদৃষ্টের অদৃষ্ট হস্তের ক্রীড়নক। এদের পরিমিত আশা-আকাঙ্ক্ষা চারিপাশের ঘটনা-সংঘাতে, প্রতিনিয়ত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—রূপ বদল করিতেছে। বাহির হইতে এই সব অতি সাধারণ নরনারীর জীবনযাত্রার ধারাটিকে অত্যন্ত সরল বোধ হয়, কিন্তু এদের প্রাণ ব্যভিচার যেরূপ ভালবাসা নিষ্ঠুরতা মহত্ত্ব প্রভৃতির অন্তর্নিহিত রহস্য লেখক নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে উন্মোচন করিয়াছেন। এই ধরণের চরিত্র-বিশ্লেষণ বাস্তবানুগত্যের পরিচয়।

কাহিনীর প্রধান পুরুষ শশী অদৃষ্ট হস্তের পুতুলের মতই ইতস্তত সঞ্চরণশীল। সেই কারণে অস্পষ্ট এবং প্রাণহীন বলিয়া মনে হয়। কুসুম বাস্তব কল্পনায় মেশানো হইলেও জীবন-চাক্ষুস্য পরিপূর্ণ। অত্যন্ত সজীব ও স্পষ্ট হইল কুমুদ আর মতি। চলমান জগতে তাদের চলা এখনও শেষ হয় নাই। গোপাল, রূপসী, সেন-দিদি ও বিনুচরিত্রের অন্তর্বিপ্লবের হেতু বাহিরের আচার আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে। খানিক আলো খানিক ছায়া মেশানো এই সব চরিত্র, এদের চারিপাশের ঘটনা—এদের খেলালখুশিভরা আচরণের তলায় মনোবিকলনের ধারা—এই সব অনুসরণ করিতে করিতে প্রমত্ত জাগে—মানুষের মনের অন্ধকার দিকটা প্রকাশ করাই কি মনস্তত্ত্বের বিষয়? উপরের মহত্ত্ব কি তার ক্ষুদ্রত্বের আবরণ মাত্র? গৌরব-স্বপ্নের প্রচণ্ড মোহে মানুষ অকাতরে আত্মহত্যা করে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, কিন্তু সংসার হইতে প্রায়-বিমুক্ত আত্মসম্পূর্ণ মানুষের মহত্ত্বের তলায় আত্মহত্যার ধারা অমর হইবার বাসনা হান্তকর বলিয়াই মনে হয়; বাস্তববাদের উর্দ্ধে যে জগৎ মানুষের কল্পনায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মানুষকে পান্থিক কামনার কল্বমুক্ত করিতেছে বস্তুসম্বন্ধী দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাহার রহস্যভেদ করা কি ততটাই সহজ? এ যেন নৈরাশ্রবাদীর মনস্তত্ত্ব নিরাপণ চেষ্টা।

অনেকে বলিবেন, সম্পূর্ণ জীবন-দর্শন দুলভ বস্তু; তার খানিকটা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বাকিটা সমৃদ্ধ কল্পনার সঙ্গে মিশাইয়া আলো ছায়া ভরা ছবি আঁকার যে দক্ষতা তাহার পরিচয়কাহিনী ও চরিত্র-চিত্রণে থাকিলেই তো যথেষ্ট। স্বল্প মনোবিকলনের চেষ্টা হয়ত ইহার মধ্যে নাই। তবু কাহিনীগত রস উপভোগে পাঠক-সম্প্রদায় যে বিমূর্ণ নহেন দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

## কৃতিবাস রচিত

# সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

স্বনামধন্য ও স্বাচ্ছন্দ্য চিত্রোপাধ্যায় সম্পাদিত

সুবিখ্যাত কৃতিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকৃষ্ট

অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইল

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রসিদ্ধ অংশবর্জিত মূলগ্রন্থ অনুসারে ৫৮৬ পৃষ্ঠায় সুসম্পূর্ণ! ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের আঁকা রঙীন ষোলখানি এবং এক বর্ণের তেত্রিশখানি শ্রেষ্ঠ ছবি আছে। রঙীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিত্রশালা হইতে সংগৃহীত ছবির অনুলিপি। অন্যান্য বহুবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্রাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রবি বর্মা, নন্দলাল বসু, সারদাচরণ উকীল, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর, অসিতকুমার হালদার, স্বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র দে প্রভৃতির স্থনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত।

জ্যাকটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইন্ডিং মূল্য ১০।০, প্যাকিং ও ডাকব্যয় ১।

প্রবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতে পাইবেন। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে না। গ্রাহক নম্বরসহ সম্বর আবেদন করুন! এই স্থযোগ সর্বপ্রকার দুর্মূল্যের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না।

প্রবাসী কার্যালয়—১২০১২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

## সমুদ্রের স্বাদ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিড়ম্বিত মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যর্থতাকে উপজীব্য করে লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেরোটি নিখুঁত ও বলিষ্ঠ গল্পের সংকলন। জরাগ্রস্ত ও ভাঙনোশূন্য সমাজের সন্ধীর্ণ গণ্ডীর নিষ্পেষণে কাতর সাধারণ মানুষের হাসিকান্না ও স্বপ্নভঙ্গের বিচিত্র রূপায়ণ। দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম ৩।০

## অন্নদাতা

কৃষ্ণ চন্দর

তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ-লাঞ্ছিত বাংলায় মানবতার অপমৃত্যু ঘটাবার জঘন্য ষড়যন্ত্রের কাহিনী। কৃষ্ণ চন্দরের বলিষ্ঠ লেখনীতে পদদলিত জীবনবোধ ও নীতিবাদের বীভৎস বিকৃতির প্রতিফলন। অন্নবাদ করেছেন অবন্তী সাত্তাল। দাম ১।০



ইমিন এফেন্ডুগ

১৯৪০ সালের ১৪ই জুন। অজ্ঞাত ঐতিহাসিক দিনগুলির মত এই দিনটিও পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে—বিপ্লবের মর্যাদা নিয়ে নয়—প্রতিবিপ্লবের কদর্য দলিলের কলঙ্ক নিয়ে। সেদিন প্রতিক্রিয়ার কাছে ফরাসী দেশের মানুষ আত্মসমর্পণ করল বটে কিন্তু নতুন এক ইম্পাত কাঠিছে দৃঢ় হয়ে উঠল তারা।

বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র, নিষ্ক্রিয়তা ও স্বার্থপরতার পটভূমিকে আশ্রয় করে অভ্যাসার্ঘ্য শিল্পোৎসর্গভার সঙ্গে এই বিরূপ উপভাসস্থানি রচনা করেছেন ইলিয়া এরেনবুর্গ। অন্নবাদ করেছেন অমল দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র মজুমদার ও অনিলকুমার সিংহ। তিনটি পৃথক খণ্ডের দাম যথাক্রমে ৪০, ৩০, ৪০। একত্রে ১১০।

ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড

৩০, চৌরঙ্গী রোড :: কলিকাতা ১৬

## নবজাতক

ম্যাকসিম গোর্কী

ম্যাকসিম গোর্কীর সাতটি শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন। নিপীড়িতের যে অন্তর্জালা পুঞ্জীভূত হয়ে দাবানলের সৃষ্টি করে গোর্কীর প্রতিটি চরিত্র সেই অন্তর্জালারই মূর্ত প্রকাশ। অন্নবাদ করেছেন নীহার দাশগুপ্ত। দাম ৩।০

## মানবিক ও পরমাণবিক

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

আণবিক শক্তির একচেটিয়া মালিকানা করায়ত্ত করে ধ্বংস-লীলার আড়ালে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পৃথিবীব্যাপী রাজ্য-বিস্তারের ষড়যন্ত্রের তথ্যপূর্ণ আলোচনা। দাম ২।০

## পুতুলনাচের

ইতিকথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ পরিণত সাহিত্যসৃষ্টি দীর্ঘদিন ধরে আত্মবিশ্লেষণ ও অবিচ্ছিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণাম। তাঁর এই অন্তর্দ্বন্দ্বের গুরু 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য়। দুর্বল, নিরীহ মানুষের ওপর শক্তিশালী হৃদয়হীন সমাজের অকথা নিষ্পেষণের মর্যাস্তিক ও রসঘন কাহিনী। মাখন দত্তগুপ্ত চিত্রিত অভিনব প্রচ্ছদপটভূক্ত দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম ৫০

## ছোটদের বই

সকল দেশের সেরা

ব্রজেননাথ ভট্টাচার্য

ভবিষ্যৎ ভারতের ত্রাণকর্তা ও রক্ষক যারা তাদের সঙ্গে এই মহান দেশের আন্তরিক যোগাযোগের উদ্দেশ্যে গল্পের মত মনোরম ভঙ্গীতে লেখা ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিচয়। সূর্য রায়ের অজস্র ছবি। দাম ২।০

## ঘুমতাড়ানী ছড়া

সুকান্ত ভট্টাচার্য ও অন্নাগু

ছোটদের অপরূপ ছড়ার বই। ভারত-ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনার ওপর মজাদার সব ছড়া কেটেছেন চারজন খ্যাতনামা কবি। পাতায় পাতায় সূর্য রায়ের আঁকা আরও মজাদার সব রঙ্গীন ছবি। স্বদেশের ঘুমতাড়ার কাহিনী বাংলার কিশোর-কিশোরীদের চোখ থেকে ঘুমকে সত্যিই তাড়াবে। দাম ৩০

## কবিতার বই

সন্দ্বীপের চর—বিষ্ণু দে

২০

ছাড়পত্র—সুকান্ত ভট্টাচার্য

১১০

রবীন্দ্রনামা—প্রভাত বন্থ সম্পাদিত

১১০

ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড

৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৬

মহামানব মহাত্মা—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত। এ. মুখার্জী  
এও কোং, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। ১৭০ পৃ, মূল্য ২।০ টাকা।

এই সেদিন মহাত্মা আমাদের মধ্যে ছিলেন, আজ তিনি নাই। এই  
বিরাট ব্যবধান জাতি হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক এবং  
সমস্ত পৃথিবী মধ্যে মর্মে অনুভব করিতেছে। ১৮৬৯ সনের ২রা অক্টোবর  
যাঁহার জন্ম ১৯৪৮ সনের ৩০শে জানুয়ারী যাঁহার তিরোধান। পৃথিবীর  
ইতিহাসে তাঁহার স্থান কত সুপ্রতিষ্ঠিত, মানব-মনে তাঁহার কর্ম ও  
সাধনাময় জীবনের ছাপ কত স্পষ্ট এই বেদনাবিশ্রুত বিবদমান ও  
ভ্রাতৃবাতী জাতিসমূহের নির্মল শান্তিস্বাপন-প্রয়াসের মধ্যে তাহা প্রতি-  
দিনই প্রকট হইতেছে। তিনি কি কেবল ভারতের ছিলেন? আজ  
সমস্ত পৃথিবী কোন্ আকর্ষণে মহাত্মার জয়গান করিতেছে? এতদুপেক্ষে  
মহাত্মাজীই ভারতের পরিচয়। আমরা গান্ধীর দেশের লোক বলিয়া  
বিদেশে সম্মান পাইয়াছি। স্বাধীন ভারতের আবার সম্মান? আজ  
ভারতের স্বাধীনতালান্ডের সাধনায় যদি কেবলমাত্র এক জনকে সম্মান  
দিতে হয় সে সম্মান, সে সম্মান, দেশ-বিদেশের কৃতজ্ঞতার মূল্য পাইবেন  
আমাদের গান্ধীজী। বিজয়বাবু এই মহামানবের যে আলেখ্য অঁকিয়াছেন  
তাহাতে গান্ধীজীর কর্মময় জীবনের সকল দিকেই অঙ্গবিস্তার আলোকপাত  
করা হইয়াছে। ছাত্র, ব্যবহারজীবী, দক্ষিণ-আফ্রিকায় অপমানিত  
সত্যগ্রহী, গোথেলের শিষ্য, চম্পারণের কৃষক, অসহযোগী, অস্ত্রায়ের  
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, অহিংস, সেবাত্রী, লবণকর অসাম্রাজ্যকারী, জেলের  
কয়েদী, আশ্রমিক, শিক্ষাত্রী, চরখার প্রচারক, হরিজন-প্রেমিক ও  
কর্মী, সর্বশেষে হিন্দু-মুসলমান মিলনের দৃষ্টি অমূল্য-জীবন উৎসর্গকারী—  
নানা দিক দিয়া বিজয়বাবুর গ্রন্থখানি তথ্যবহুল ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।  
গান্ধীজীর নানা সময়ের কয়েকখানি চিত্র পুস্তকখানির আরও শোভা-  
বুদ্ধি করিয়াছে। গ্রন্থশেষের জীবনপঞ্জীতে এই মহাজীবনের বিশেষ  
ঘটনাগুলি স্বল্পপরিমিতের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইরূপ স্থলিখিত  
মহাপুরুষ-জীবনী দেশের সর্বশ্রেণীর পাঠকের মধ্যে যতই প্রচারিত হইবে  
ততই মঙ্গল।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

অবরোধ (নাটক)—শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য। ইন্টারন্যাশনাল  
পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড। ৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। ১২৩ পৃ,  
মূল্য দুই টাকা আট আনা।

“পৃথিবীর মানুষ আজ এক অত্যন্ত তীব্র ও তীক্ষ্ণ শ্রেণীবিচ্ছাদে চিহ্নিত।  
আমাদের সমাজেও সেই শ্রেণী-বিচ্ছাদ তেমনি নির্দম ও ধারালো।  
প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিত্য সাধারণ ও অনাড়ম্বর মানুষ কি করে  
আজকের অসম ও বিচিত্র শিবিরে ভাগ হয়ে গেল সে এক ঐতিহাসিক  
প্রক্রিয়া এবং সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বর্তমান উত্তরাধিকারীদের সংঘাত  
ও সংঘর্ষই ‘অবরোধ-এ’র মূল উপজীব্য।” চলতি নাটক ও মঞ্চের বিরুদ্ধে  
বহুদিনের অভিযোগ ক্রমশঃই পুঞ্জীভূত হয়ে এসেছে এবং তারই প্রতিবাদে  
নতুন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে নতুন রীতিতে নাট্য-রচনার প্রয়াস দেখা  
যাচ্ছে। এই নব-নাট্য আন্দোলনের অগ্রগতির মধ্যে বর্তমান গ্রন্থকার  
অন্ততঃ।

শ্রেষ্ঠ নাটকের একটি প্রধান গুণ এই যে তা পাঠক এবং  
দর্শকের মনে বিরাট ‘ইম্প্রেশন’ সৃষ্টি করে। নাটক পড়তে পড়তে  
বা অভিনয় দেখতে দেখতে আমরা নাটকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই,  
তার পাত্র-পাত্রীর সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনাকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে  
জড়িয়ে ফেলি। নাটকের ট্রাজেডি বা কমেডিতে নিজের দুঃখে ভ্রিয়মাণ  
হই-অথবা খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠি। নাট্যরচনার এই রহস্য যার যত

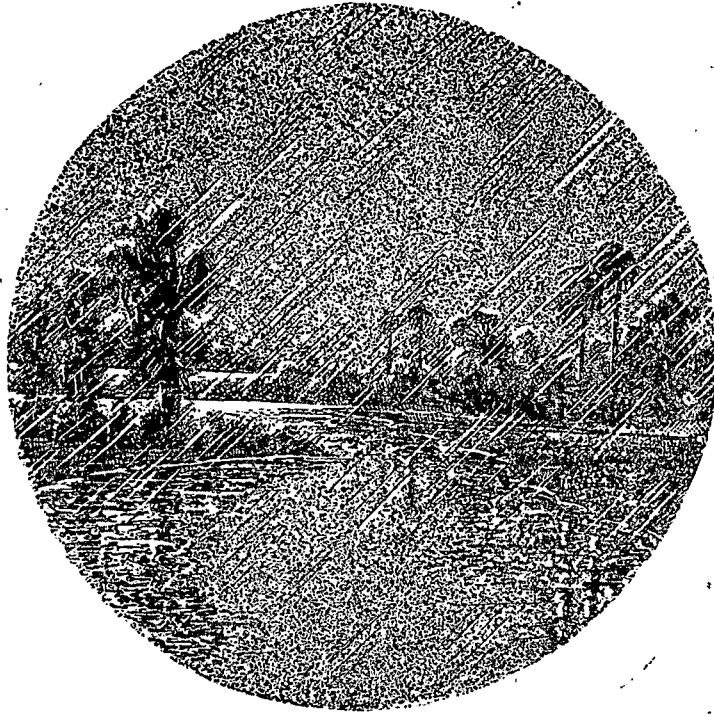
বেশি আয়ত্ত তিনি তত বড় নাট্যকার। শ্রেষ্ঠ নাটক-সৃষ্টির এই সত্যকে  
মনোপ্রাণে উপলব্ধি না করে শুধু আধুনিক মঞ্চের আদর্শব্রততা এবং  
সমনাময়িক মঞ্চ-সফল নাটকের বিরুদ্ধে মেলোড্রামা এবং হাক্স রস-  
পরিবেশনের অভিযোগ করলে না হবে নব-নাট্য আন্দোলনের পুষ্টি, না  
হবে মঞ্চ-সংস্কার। একটা বড় সমস্যাটিকে নাটকের কাঠামোতে ঢেলে  
সাজলেই তা নাটক হয় না। ‘অবরোধে’ নাটক লেখার চেয়ে পরস্পর-  
বিরোধী বিভিন্ন-শ্রেণীতে বিভক্ত মানব-গোষ্ঠির ‘ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া’র  
বিশ্লেষণ-করবার প্রয়াসই বড় হয়ে উঠেছে। পড়তে পড়তে সব সময়ই  
মনে হয়, সংলাপ ও সিচুয়েশনের মাধ্যমে যেন একটি বিশেষ সমস্যাটিকে  
বিশ্লেষণ করবার জেগেই লেখক তাঁর ঈর্ষিত বক্তব্য বলে যাচ্ছেন।  
নাটকের অনিবার্য গতিবেগে নয় নাট্যকারের ইচ্ছানুসারেই যেন  
ঘটনার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই ‘ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া’কে  
ফুটেবে তুলবার জেগে গোটা নাটকটাই যেন সাজানো এবং ছক্কাটা।  
নাট্যকারের এই সচেতন প্রয়াসই ‘অবরোধ’ নাটকের রসশ্রোতকে বার  
বার ব্যাহত করেছে। নাটকের যে আবেগ, যে বিশ্বাস, যে নীলা পাঠকের  
মনকে হাসি-অশ্রু, আনন্দ-বেদনায় মুহূর্তে মুহূর্তে চঞ্চল করে তুলে,  
‘অবরোধের’ নাট্যকার যেন সচেতন ভাবে তা এড়িয়ে গিয়েই নাটকের  
নতুন পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। নতুন আঙ্গিকে নাটক লেখবার প্রয়াসকে  
খাটো করে দেখব না—সামান্য ক্রটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও নয়। সমস্তা-মূলক  
নাটক লেখা হবে না—এমন আবদারও কোন রসগ্রাহী পাঠক করবেন  
না। কিন্তু নাটক নাট্যরসের চেয়ে যদি সমস্তা বড় হয়ে উঠে তবে তা ভালো  
নাটক বলে কোন কালেই অভিনন্দন লাভ করবে না। কারণ নাটকের বড়  
কথাই হচ্ছে ‘নাটকত্ব’। ‘নবান’ বচনা করে শীঘ্রই বিজয় ভট্টাচার্য প্রাশংসা  
লাভ করেছিলেন। তিনি শক্তিম্যান নাট্যকার। সত্যকার রসমোহর্ষণ  
নাটক লিখে তিনি তাঁর খ্যাতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুন এটাই কাম্য।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ—স্বামী সত্যানন্দ  
গিরি। প্রকাশক সেবায়তন, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর। মূল্য ১।

ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণু ঘোষের অগ্রজ পরমহংস যোগানন্দ স্বামী তাঁহার  
Autobiography of a Yogi নামক পুস্তকে শ্রীরামপুরের লাহিড়ী  
মহাশয় ও তাঁহার প্রধান শিষ্য শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিকে তাঁহার ধর্মজীবনের গুরু  
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই উন্নতশিরীর্ষকায় সৌম্যদর্শন বিরাট পুরুষ  
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাধুসভা বা সংসদ নামক আশ্রমগুলি শ্রীরামপুর, রাঁচি,  
পুরী, মেদিনীপুর প্রভৃতি বাংলার এবং বাহিরে বহু পল্লীতে নানা লোক-  
হিতকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করিতেছে। তাঁহার  
প্রধান শিষ্য যোগানন্দ স্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাধুসভাগুলি তাঁহার  
নামানুসারে ‘যোগদা সংসদ’ নামে পরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দ ও  
অভেদানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্যগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতাশ্রম  
বা বেদান্ত মঠগুলি যেমন আমেরিকার প্রধান প্রধান কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত  
হইয়া ভারতবর্ষের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে, যোগানন্দ স্বামী কর্তৃক নিউইয়র্ক,  
বোষ্টন, লস্ এঞ্জেলস্, হলিউড, ক্যালিফোর্নিয়া, ওয়াশিংটন, মেক্সিকো  
প্রভৃতি বহু স্থানে Self-Realisation Church নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া  
ভারতের বাণী প্রচারে সহায়তা করিতেছে। তাঁহার ধর্মমন্দিরগুলির  
মুখপত্র East-West নামক পত্রে যোগানন্দ স্বামী নিয়মিতভাবে  
ভারতের বাণী ও সাধনা প্রচার করেন। এই গ্রন্থের লেখক স্বামী  
সত্যানন্দ গিরিও শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজের অগ্রতম শিষ্য হিসাবে  
ঝাড়গ্রামস্থ সেবায়তনে প্রধান কর্মধাক্ষরূপে নিযুক্ত আছেন। তল্লিখিত  
গিরি মহারাজের এই জীবনী পড়িয়া কোতুহলী পাঠক উপকৃত হইবেন।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ শীল



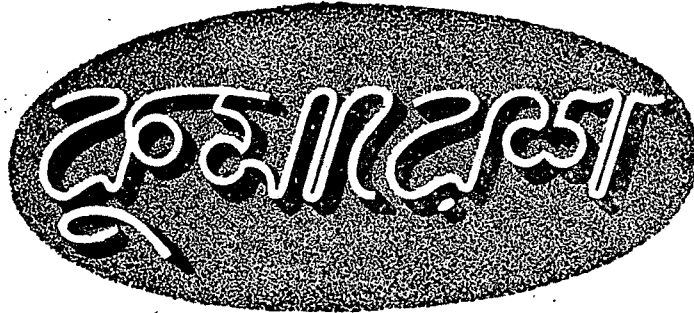
## “গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা”

কবিত্ত বর্ষা আসে—মেঘমেহুর আকাশ অবিজ্ঞাম বর্ষণ, আর  
ময়ূরের কেকাধনি নিয়ে।

কবিত্তাজেন্ন বর্ষা আসে আমাশয়, উদরাময় ও অগ্নাত্ত  
লিভারঘটিত পীড়া নিয়ে, কিন্তু মুস্তিল এই যে কবিত্তাজের বিধান না মানলে  
কবিত্ত বর্ষা উপভোগ করা যায় না।

কুমারেশ লিভার ও পেটের যে কোন পীড়া ত আরোগ্য  
করেই, তাছাড়া লিভারকে শক্তিশালী করে অগ্ন রোগেরও আক্রমণ  
প্রতিরোধ করে।

তাই স্ববিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বর্ষাগমে শুধু ঔষধ নয়, প্রতিষেধক  
হিসাবেও কুমারেশ সেবনের পরামর্শ দেন।



দি ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ এণ্ড কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ

সালকিয়া :: হাওড়া

## দেশ-বিদেশের কথা

### সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ (৬ই জুন) পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। সুকুমার বাবু বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রামসদন চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র।



সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুকুমার বাবু ১৯০৮ সনে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদে যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া ১৯৩৬ সনে ইন্সপেক্টর-জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশন পদে উন্নীত হন। সত্যকার স্বদেশপ্রীতি থাকিলে ইংরেজ আমলের শেষের দিকে সরকারী কর্মচারীরা কখন কখন কিরূপে দেশের কাজ সুষ্ঠুভাবে করিয়া যাইতে পারিতেন সুকুমার বাবু ছিলেন তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বীরভূম জেলার হুড়িঙ্গ ও অনারুপ্তিতে খাজ ও পানীয়ের অভাব বিমোচনে, গোপালগঞ্জের কচুরীপানা ধ্বংস-কার্য্যে, ভাটপাড়া মিউনিসিপালিটির উন্নতি-বিধানে তাঁহার কর্মতৎপরতা অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহার রচিত বয়স্কদের শিক্ষা-পরিকল্পনা তৎকালীন বাংলা-সরকার গ্রহণ করেন। তিনি বয়স্কদের সহজ-পাঠ 'পড়ার বই' প্রবর্তন করেন। [সুকুমার বাবু রবীন্দ্রনাথের আস্থানে সরকারী কর্ম ছাড়িয়া ১৯৩৮ সনে বিশ্বভারতীর পল্লীউন্নয়ন বিভাগের কার্য্য-ভার গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার অবসর গ্রহণের অল্পকয়েক বৎসর মাত্র অবশিষ্ট ছিল। দেশসেবায় তাঁহার এতাদৃশ ত্যাগ-স্বীকার কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। মৃত্যুর পূর্বে মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি দেশের কথা ভাবিয়া গিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের হুড়িঙ্গের প্রধান কারণ

জলাভাব ও সেচের অব্যবস্থা। আর ইহার অনেকটা প্রতিকার হইতে পারে সেচোপযোগী পুকুরিগুণ্ডির পঞ্চোদ্ধার দ্বারা। সুকুমার বাবু অসুস্থ অবস্থায়ও এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করেন এবং আলাপ-আলোচনা চালান। বাঁকুড়ার তিনি আদর্শ সুসন্তান ছিলেন। তাঁহার যুগ্মতাত প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে তিনি বাঁকুড়া স্মিলনীর ও বাঁকুড়া উন্নয়ন সমিতির সভাপতি ছিলেন। সংস্কৃত সহিত্য সুকুমার বাবুর বড় প্রিয় ছিল। রবীন্দ্র-সাহিত্যেও তাঁহার গভীর প্রবেশ ছিল।

### কান্তিচন্দ্র ঘোষ

১৮৮৬ সনে ঞামবাজারের বিখ্যাত ঘোষ-পরিবারে কান্তিচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে



কান্তিচন্দ্র ঘোষ

যুক্ত ছিলেন। তিনি পরে বঙ্গীয় আইন-পরিষদের রিপোর্টার ও লাইব্রেরিয়ান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি কবিতা, গল্প প্রভৃতি লিখিতেন। তৎকৃত ওমর খৈয়ামের সুললিত বঙ্গানুবাদ সুধীরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিগত ১৭ই মে কালিম্পঙে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

### প্রিয়দা দত্ত

বাংলার বিশিষ্ট জননায়ক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ভূতপূর্ব ডেপুটি প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা প্রিয়দা দত্ত বিগত ২৩শে মে ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নিখিল-ভারত নারী-সম্মেলনের কলিকাতা শাখার সহ-সভানেত্রী ছিলেন। নারী-আন্দোলনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং কলিকাতা, দিল্লী ও কুমিল্লায় বহু নারী-প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি পতির সঙ্গে কারা-বরণ করিয়াছিলেন। গত ১৯৩৭ সনে তিনি তাঁহার স্বামীর সহিত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন।





নটী

শ্রীমাহারজন সেনগুপ্ত

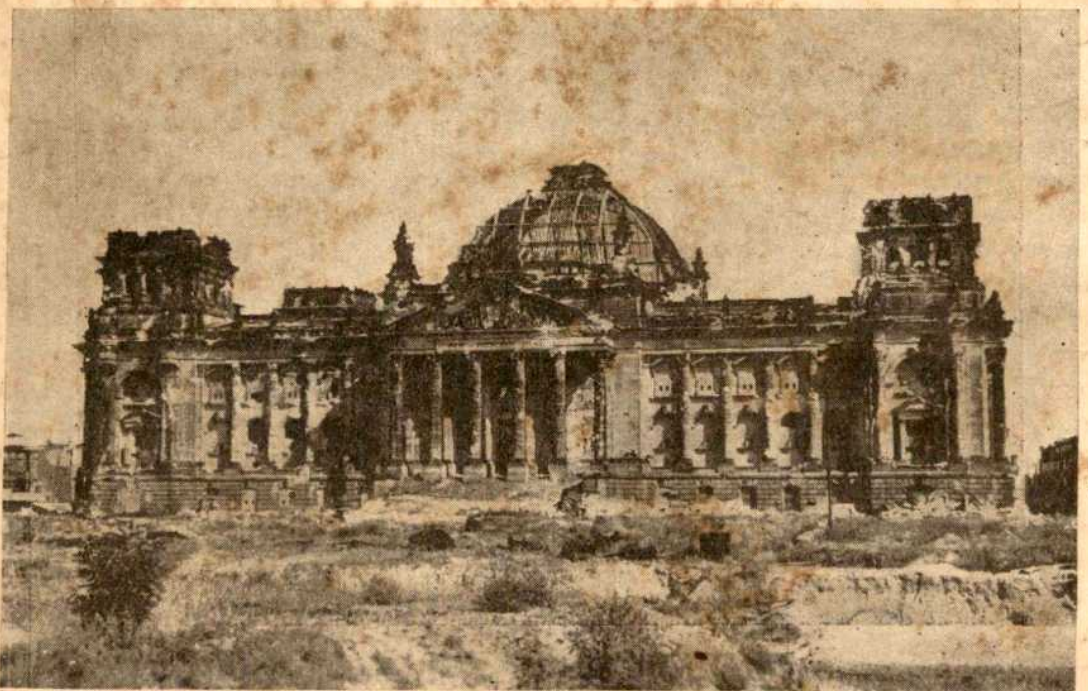
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



যুদ্ধোত্তর বার্লিন



রাইসটাগ শহর—যুদ্ধের পূর্বে



যুদ্ধোত্তর রাইসটাগ

# একাত্তর

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

৪৮শ ভাগ  
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৫৫

৪র্থ সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ

### স্বাধীনতার প্রথম বৎসর

স্বাধীনতার প্রথম বৎসর শেষ হইতে চলিয়াছে। এই বৎসরের হিসাব-নিকাশের এখনও সময় হয় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে কি সন্দেহ আছে যে এই বৎসরের মধ্যে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র যে ঝড়-ঝঞ্ঝার, যে বিষম অনাচারের ষ্রোতের সম্মুখীন হইয়াছে তাহার তুলনা ভারতের ইতিহাসে অতি অল্পই আছে? আজ দেশ যে ছত্রাচারদিগের কবলে পড়িয়া অতিশয় শঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে রহিয়াছে তাহার সাক্ষ্যই ঘরের শত্রু, সকলেই এদেশের মাটিতে ক্ষয় ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে। এখন আর বিদেশীর উপর ঘোষারোপ করিয়া নিজের মনকে ভুলাইবার উপায় নাই। স্বাধীনতার যে উজ্জ্বল চিত্র আমাদের সকলেরই মানসচক্ষে উপর এত দিন ছিল, আজ বাস্তবের কঠোর সম্মুখে তাহা যুগত্বক্ষিকার মত ক্রমেই দূর হইতে দূর হইতে চলিয়া যাইতেছে কেন?

কারণ প্রধানতঃ দুইটি, প্রথমতঃ স্বাধীনতা সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা এবং রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব, দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতার হস্তে আমাদের দেশের শাসন ও পরিচালনের ভার রহিয়াছে তাঁহাদের অনেকের নিদারুণ নৈতিক অবনতি। স্বাভাব্য ও বেচ্ছাচারের মধ্যে এবং স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার মধ্যে প্রভেদ বুঝেন আমাদের মধ্যে এমন লোক এক লক্ষে এক জনও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এত দিন আমাদের বিশ্বাস ছিল যে কংগ্রেস নেতৃবর্গ এ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সজাগ; আজ তাঁহাদের অধিকাংশের চরম অধঃপতনের পরিচয় পাইয়া আমাদের চমক লাগিতেছে। জনসাধারণের তো কথাই নাই, চতুর্দিকে স্বাধীনতার নামে যে সকল যুক্তি-তর্ক শুনা যায়, যেরূপ কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ছয় শতাব্দী ব্যাপী দাসত্বের ফলে আমরা স্বাধীনতার অর্থে বুঝিয়াছি স্বাধীনতার ভ্রমণ ও প্রবঞ্চনার ভ্রমণ, স্বাভাব্য অর্থে বুঝিয়াছি কাকি দিয়া কার্য-সিদ্ধির ভ্রমণ। স্বাধীনতা বিনামূল্যে পাওয়া যায় না একথা আমাদের বুঝাইবে কে এবং স্বাভাব্যরূপের জন্ম যে আমাদের সদা সর্বদা সজাগ হইয়া থাকিতে হইবে ইহাই বা বলিবে কে? ইংরেজীতে যে প্রবাদ আছে “Eternal vigilance is the price of Liberty.”—“স্বাধীনতার মূল্য অবিচল সজাগ-

সতর্কতা”—তাহা আমাদের সকলেরই সম্যক ভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

ঘুষ, চোরাকারবার এবং শাসনতন্ত্রের অবনতির ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে যে কলুষ চতুর্দিক কলঙ্কিত করিতেছে, তাহার প্রতিকারে কয়জন প্রকৃতপক্ষে চেষ্টা? প্রায় সকলেই উহাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্রামের সময় পর-নিন্দায় আনন্দলাভ করেন, কেহ কেহবা স্বাধীনতার অঙ্গরূপে উহাকে আশ্রয় করিয়া পরের অনিষ্টের ব্যবস্থা করেন। কদাচিৎ একজন দেখা যায়, যিনি নিজে সচেষ্ট হইয়া উহার প্রতিকারের বিষয়ে চিন্তা করেন। দেশ জাগ্রত হইলেও চোরাকারবার, ঘুষ ইত্যাদি বন্ধ করা যায় না ইহা অবিবাক্ত কথা। এক জনের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে, দশ জনের চেষ্টাতেও ফল না ফলিতে পারে, কিন্তু শত সহস্র লোকের মিলিত চেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে না, ইহা স্বাধীন দেশে সম্ভব নয়। আসলে আমরা এখনও সমষ্টিগত ভাবে দেশের ও নিজেদের প্রগতির বিষয় চিন্তা করিতেই শিথি নাই।

নেতৃবর্গের উপর নির্ভর করিলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। ইংরেজ অভিধানকার জনসন অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক ছুখে লিখিয়া গিয়াছিলেন, “Patriotism is the last resort of a scoundrel”—“হৃৎকৃত নরাধর্মের শেষ আশ্রয় দেশভক্তি”—এবং ঐরূপ লেখার ফলেই বোধ হয় ইংরেজ পরে জগতে অত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল। আজ আমাদের ঐ কথা মনে রাখিয়া স্বাধীনতা দেশভক্তির ও “ত্যাগ” নামক পরশপাথরের সাহায্যে আমাদের কর্ণধার হওয়ার দাবী করিতেছেন তাঁহাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে।

উদাহরণ-স্বরূপ সেই দলের কথা বিচার করা যাউক স্বাধীনতা পূর্ববঙ্গের লোকজনকে বিপদে ফেলিয়া পশ্চিম বঙ্গের “গদী” দখলের চেষ্টায় ব্যস্ত—বলা বাহুল্য, প্রকৃত দেশপ্রেমী ও ত্যাগী স্বাধীনতা তাঁহাদের প্রায় সকলেই পূর্ববঙ্গেই থাকিয়া স্বদেশবাসীর পরিচরণের চেষ্টা করিতেছেন—ইহাদের ব্যরহারা ও কার্য-কলাপে দলগত এবং ব্যক্তিগত স্বার্থাশ্রয় ভিন্ন অস্ত্র কিছুই পরিচয় পশ্চিম বঙ্গের লোক কোনও দিন পায় নাই। আজও ইহাদের যদি পশ্চিম বঙ্গের লোক না চিনে তবে এদেশের উদ্ধারের

আশা কম। ইহাদের মুখে আজকাল এক নূতন যুক্তি শুনা যাইতেছে যে, ইহাদের “ত্যাগ” না থাকিলে, পশ্চিম বঙ্গ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিত না, সুতরাং পশ্চিম বঙ্গের লোকের জ্ঞানতঃ ও ধর্মতঃ উচিত ইহাদের কাছে দাসখত লিখিয়া দেওয়া। “ত্যাগ” কি করিয়াছেন সে প্রশ্নের উত্তরে শুনা যায় যে ইহারা যে দয়া করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় ভোট গ্রহণ কালে বঙ্গচ্ছেদের ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্গের ভারতরাষ্ট্রে যোগদানে বাধা দান করেন নাই, তাহাতেই উহারা ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ পক্ষে ইহারা পূর্ববঙ্গের আত্মীয়স্বজনকে যেভাবে ভাসাইয়া দিয়া স্বার্থচিন্তায় বিভোর রহিয়াছেন, তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের লোকের ইহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে ইহারা ঐ চরম বিশ্বাসঘাতকতার নোভ সম্বরণ করিয়া, “নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ” করেন নাই। পূর্ববঙ্গের হিন্দু বাঙালীর হুঃখ-স্বখের চিন্তা আমাদের সর্বদাই করা কর্তব্য, আত্মীয়তার জ্ঞ, মনুষ্যত্বের জ্ঞ, কিন্তু তাঁহাদের এই যে রাষ্ট্রনৈতিক চোরাকারবারী নেতৃবর্গ—যাহারা হুদিনে তাঁহাদের স্বন্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং দুদিনে তাঁহাদের মাথায় পা দিয়া জলা পার হইয়া পশ্চিম বঙ্গের ডাঙ্গায় উঠিতে ইচ্ছুক—তাঁহাদের প্রতি আমাদের প্রকৃত দায়িত্ব কি তাহা সকলেরই বুঝা উচিত। পশ্চিম বঙ্গ না বাঁচিলে না বাড়িলে বাঙালী নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে একথা সকলেরই বুঝিতে হইবে। দেশে যে উদ্ধাম উচ্ছৃঙ্খল নিয়ম-বিরোধিতা চলিয়াছে, তাহা যে চরম দেশদ্রোহিতার পরিচয় ইহা সকলেরই জানা প্রয়োজন। দেশের লোক যদি বাঁচিতে চাহে তবে এখনই এই অনাচারের শ্রোতে বাঁধ দিতে কর্তৃপক্ষকে আস্থান ও সাহায্য করা প্রয়োজন।

### স্বাবলম্বী বাঙালী

গত বার বৎসর যাবৎ বাঙালীর উপর দিয়া সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত এই ঝঞ্ঝায় ভাঙিবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবন প্রায় ধ্বংসের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। খাড়া, বস্ত্র এবং প্রত্যেকটি নিত্য-ব্যবহার্য্য শিল্পদ্রব্যের জ্ঞ বাঙালী পরমুখাপেক্ষী। বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার সমগ্রভাবেই ভিন্ন প্রদেশীয়দের হাতে চলিয়া গিয়াছে। ইহাদের হাতে তেল, ঘি প্রভৃতির ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে চলিয়া যাওয়ার ফল হইয়াছে এই যে ভেজাল খাণ্ডে বাঙালীর জীবনী-শক্তি ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে; ছুধের ব্যবসা অবাঙালীর হাতে চলিয়া যাওয়ার উচ্ছ্রান্তে যে ভেজাল চলিতেছে তাহাও স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। ভেজাল ছুধ এবং ভেজাল খাণ্ডের দ্বারা ভবিষ্যৎবংশীয় বাঙালীকে ক্ষীণজীবী ও পঙ্কপ্রায় করিয়া ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার পথ প্রশস্ত হইতেছে। বাংলার যে মধ্যবিভক্ত সমাজ দেশের সর্ববিধ উন্নতির মূল তাহাই মরণের পথে দাঁড়াইয়াছে। স্বদেশীয় নামে কষ্টস্বীকার ইহারা করিয়াছে, তাহার লাভ কুড়াইয়াছে অবাঙালী ধনীর দল। দীর্ঘস্থায়ী দুর্গুণ্যের বাজারে এবং ভেজাল খাণ্ডে

মধ্যবিভক্ত, বিশেষতঃ নিম্নমধ্যবিভক্ত বাঙালীর অবস্থা এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে একটু কঠিন রোগের ধাক্কা সামলাইবার শক্তি তাহার আর নাই, আগেকার দিনে যাহাকে সাধারণ রোগ বলা হইত এখন তাহাতেই অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটতেছে। যক্ষ্মা তো প্রায় ঘরে ঘরে।

বাঙালী জাতিকে বাঁচাইতে হইলে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশকে সর্ববিধে স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। পশ্চিম বঙ্গে যে জমি আছে তাহার সবটুকু যদি ভাল ভাবে চাষ হয়, কৃষকেরা যদি ভাল বীজ, সার এবং অল্প হুদে প্রয়োজনীয় যারী ঋণ পায়, সেচ-ব্যবস্থার যদি উন্নতি হয়, তাহা হইলে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ খাদ্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারে। রায়ডল্লিক এওয়ার্ডে পশ্চিম বঙ্গের আয়তন এমন করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বাঙালীকে গ্রাম্য জীবনের পরিবর্তে এখন শহরকেন্দ্রিক শিল্পজীবন অবলম্বন করিতে হইবে। এই পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়া লইয়া এখন হইতে উহাকে রূপ দিবার জ্ঞ পরিকল্পনা আরম্ভ করা দরকার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এখনও এ বিষয়ে কোন পরিকল্পনা আরম্ভ পর্য্যন্ত হয় নাই। প্রতি জেলায় একটি করিয়া স্বতাকল বসাইয়া তাঁতে কাপড় বুনিবার ব্যবস্থা করিলে বাঙালীর বস্ত্রসমস্যা ঘুচিয়া যায়, বহু লোকের কর্মসংস্থানও হয়। বস্ত্র উৎপাদনের দায়িত্ব যুগ্মেয় কয়েকজন মিল-মালিকের হাতে ছাড়িয়া না দিয়া উহা বহু জনের মধ্যে ছড়াইয়া সমবায় নীতিতে বণ্টন করিয়া দিলে এখনকার জায় রক্তচোষা জুয়াচোর বস্ত্রব্যবসায়ীর সৃষ্টিও হইতে পারিবে না। বাংলার বড় বড় শিল্পগুলি এতদিন ছিল ইংরেজের হাতে, এখন ঐগুলি ক্রমে অল্প প্রদেশীয় লোকে কিনিয়া লইতেছে; উহা আশু বন্ধ হওয়া দরকার। কাপড়ের এবং খাণ্ডদ্রব্যের ব্যবসা মাড়োয়ারীদের এবং ছুধের ব্যবসা অবাঙালীদের একচেটিয়া অধিকার থাকা অত্যন্ত বিপদজনক। পশ্চিম বঙ্গের পরিভ্রাণের পথ সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠানের গঠন এবং শিল্পকেন্দ্র-গুলিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা—বাঙালী জাতিকে বাঁচাইতে হইলে এ কাজ করিতেই হইবে।

অভিজ্ঞ, দূরদর্শী এবং উপযুক্ত লোক লইয়া অবিলম্বে একটি অর্থনৈতিক বোর্ড গঠন করিয়া বাঙালীকে স্বাবলম্বী করিবার উপায় নির্ধারণের ভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করা উচিত। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা বাঙালীর স্বাবলম্বনের একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত হইলে এবং উহা কাজে পরিণত হইলে বাঙালীর বাঁচিবার উপায় হইবে। কাজটা কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্তু মোটেই অসম্ভব নহে। তবে ইহা ঠিক যে, এ বিষয়ে যতই অবহেলা করা হইবে কাজ ততই কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিবে।

### কংগ্রেস গবর্নমেন্টের ভিতরে ও বাহিরে

ত্রীকিশোরীলাল মশরুফুল্লাহ সম্প্রতি ‘হরিজন’ পত্রে কংগ্রেস এবং কংগ্রেস গবর্নমেন্টের যে সমালোচনা করিয়াছেন দেশের মঙ্গলাকাজী প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিতেছেন যে যাহারা

কংগ্রেস কমিটিসমূহে পদ অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং যাহারা তাহার বাহিরে আছে তাহাদের উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সন্দাবপূর্ণ নহে। গবর্নমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের ও প্রতিষ্ঠানের ভিতরে যে কংগ্রেস কাজ করিতেছে এবং বাহিরে যে কংগ্রেস কাজ করিতেছে তাহাদের সম্বন্ধও মোটেই সন্দাবপূর্ণ নহে। প্রত্যেক শ্রেণীই অপর দুই শ্রেণী সম্বন্ধে বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। এই সকলের বাহিরে আরও দুই শ্রেণীর কংগ্রেসের লোক আছে। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণী স্বাধীনতা অর্জন ও ত্রায়নিষ্ঠ নিষ্কলঙ্ক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্ত যৌবনের প্রারম্ভে আন্তরিক আগ্রহ ও আত্ম-গত্যের সহিত কংগ্রেসের কাজ করিয়াছে। স্বাধীনতালাভের দ্বারা তাহাদের মনে শান্তি ও আনন্দ আসে নাই বরং তাহারা অস্থখী ও নিকংসাহ হইয়া পড়িয়াছে; কারণ যে মহান কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলার কাজে তাহারা সাহায্য করিয়াছে সেই কংগ্রেস ক্ষমতা লাভ করিয়াই জন-সাধারণের প্রতি কর্তব্যচ্যুত হইয়াছে এবং যে সকল উচ্চ আদর্শের কথা পূর্বে প্রচার করিয়াছে আভ্যন্তরীণ দুর্নীতির জন্ত তদনুযায়ী কাজ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহারা অতি বেদনাক্রান্ত চিত্তে চোখের সন্মুখে দেখিতেছে যে কংগ্রেস এখন স্বার্থসিদ্ধির ও ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক দল-উপদল গঠনের সুবিধাজনক যন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা এখন আর নিজেরা সক্রিয়ভাবে কাজ করিতেছে না কিন্তু চারিদিকে দুর্নীতির বিস্তার দেখিয়া শান্তিতে বিশ্রাম করিতেও পারিতেছে না। দ্বিতীয় শ্রেণী সাধারণ লোক; তাহারা এদল ওদল লইয়া মাথা ঘামায় না। তাহারা চায় ত্রায়নিষ্ঠ গবর্নমেন্ট, ভ্রষ্ট ব্যবহার, জনসাধারণের আবেদন নিবেদন সম্বন্ধে অনতি-বিলম্বে ব্যবস্থা এবং দুর্নীতিবিহীন শাসন পরিচালনা যাহাতে জনসাধারণের সুখসুবিধা বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই সকল বিষয়ে জনসাধারণ কোন উন্নতি দেখিতে পাইতেছে না এবং তাহাদের ধারণা জন্মিতেছে যে অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে আরও মন্দের দিকে চলিয়াছে। ইহার ফলে কংগ্রেসের নাম লোকের নিকট দিন দিন অপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে।

গবর্নমেন্টের ভিতরের কংগ্রেসকর্মী এবং কংগ্রেস কমিটির কর্মীদের মধ্যে বিরোধ কেন ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং একটা দৈত শাসন কেন দেখা দিতেছে ত্রীযুক্ত মশরুওয়াল তাহা অতি সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন—

“কংগ্রেসের যাহারা গবর্নমেন্টের ভিতরে আছে আর যাহারা বাহিরে আছে, তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষভাবের প্রধান কারণসমূহ এইরূপ বলিয়া আমার মনে হয়।

“যে লোক গবর্নমেন্টের উচ্চপদ অধিকার করিয়া আছে, সে লোক দায়িত্বের বোঝা ততটা অল্পভব না করিয়া তাহার পদকে অর্থ ও মর্যাদা লাভের উপায়স্বরূপ মনে করিয়া থাকে। গবর্নমেন্টের প্রত্যেক পদে ও গবর্নমেন্ট নিযুক্ত কমিটির প্রত্যেক স্থলে, ভাতা, বাহিনা, অস্ত্রের সুবিধা করিয়া দেওয়া, চাকুরী প্রদানের ক্ষমতা কিংবা অস্ত্রের দ্বারা নিজের কিছ কাজ করাইয়া

লওয়া—যে কাজ গবর্নমেন্টের পদ অধিকার করিয়া না থাকিলে আদায় করা যায় না—এই সমস্ত সুযোগ আছে। তাহাকে যে সকল কাজ করিতে হয় তাহা অপেক্ষাকৃত হালকা আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেখানে দায়িত্ব রহণ ও চরম সেখানে কংগ্রেস-পরিচালিত গবর্নমেন্টসমূহও জাঁত ও সম্প্রদায় দেখিয়া কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। অথচ কংগ্রেস নীতি-এই পদ্ধতিতে কর্মচারী নিয়োগের বিরোধী। যখন কংগ্রেসের সমর্থন দেওয়া হয়, মঞ্জী নিযুক্ত করা হয়, এমন কি অল্প সময়ের জন্য যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমিটি গঠন করা হয় সেই সকল ক্ষেত্রেই কোন্ ব্যক্তির কি যোগ্যতা আছে না আছে সে দিকে দৃষ্টি না দিয়া, সেই ব্যক্তি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ও কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী তাহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। দলকে মজবুত রাখিবার জন্য এরূপ প্রয়োজন হইয়া উঠে এবং প্রত্যেক চাকুরীই গোপন ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়ায়। চাকুরীর জন্য লালায়িত নহে এরূপ লোক খুব অল্পই আছে এবং যদিও চাকুরীর প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে তথাপি যত লোক আশা করিয়া থাকে চাকুরীর সংখ্যা তত নয়, ফলে যাহারা চাকুরী পায় না তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। গবর্নমেন্টের কার্যালয়ে ব্যর্থ হইয়া ইহার কংগ্রেস কমিটিসমূহের কার্যনির্বাহক সমিতিতে স্থান করিয়া লইবার চেষ্টা করে এবং কংগ্রেসের যাহারা গবর্নমেন্টের কাজে নিযুক্ত আছে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কংগ্রেস কমিটিগুলিকে পরিচালিত করে। এই প্রকারে এক রকম দৈত শাসনের সৃষ্টি হইয়াছে। কংগ্রেসের যাহারা গবর্নমেন্টের অভ্যন্তরে আছে কংগ্রেস কমিটিগুলি তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে চায়, আর যাহারা গবর্নমেন্টের অভ্যন্তরে আছে তাহারা কংগ্রেস কমিটিগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়।”

রাজনৈতিক কারণে উচ্চপদে প্রিয়পাত্র নিয়োগ দেশের পক্ষে যে কি ভয়ানক ক্ষতিকর “spoil system” প্রবর্তন করিয়া আমেরিকা তাহা বুঝিয়াছিল এবং এখন উহা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ ভাবে কর্মচারী নিয়োগের নীতি অবলম্বন করিয়া নিজের শাসনযন্ত্র সুদৃঢ় করিয়াছে। আমাদের দেশে কংগ্রেস ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার পরিত্যক্ত এই spoil system চাকুরিক্ষেত্রে প্রবর্তন করিয়াছেন এবং তার ফলে উচ্চপদে অযোগ্য লোক নিয়োগ করিয়া শাসনযন্ত্রের দক্ষতা যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা রসাতলে দিয়াছেন ও দেশের সমুদ্র অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। পাবলিক সার্ভিস ট্রিবিউনাল কর্তৃক প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার দ্বারা নিরপেক্ষ ভাবে নিছক যোগ্যতার ভিত্তিতে লোক নিয়োগ ও প্রমোশনের নীতি প্রবর্তিত হইলে শাসনযন্ত্রের দক্ষতা বাড়িবে, গবর্নমেন্টের ভিতরের ও বাহিরের কংগ্রেস কর্মীদের বিরোধের মূল কারণটি দূর হইবে এবং ইহাতে শাসনযন্ত্রের ব্যয়ভারও অনেক কমিয়া আসিবে। আশ্চর্যের বিষয় কংগ্রেস এই ত্রায়নিষ্ঠ ও কল্যাণকর নীতি এখনও প্রবর্তন ও পালন



করিতে চাহেন না, খসড়া রাষ্ট্রবিধিতেও এখনকার ছায় পাবলিক সার্ভিস ট্রিবিউনালকে এই ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। কংগ্রেস কমিটিগুলিতে বর্তমান দলাদলি যে এত বাড়িয়াছে তার একমাত্র কারণ মন্ত্রি ও চাকুরির লোভ। ইহারই জন্য কংগ্রেস স্মৃশ্বলা সম্পন্ন একমাত্র প্রতিষ্ঠানরূপে জনসাধারণের সম্মুখে আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না। যাহারা এখন বড় হইয়া উঠিতেছে, যাহাদের বয়স উনিশ-বিশ বৎসর হইতে চলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই ধারণা জন্মিতেছে যে কংগ্রেস অকর্মণ্য হইয়া পড়িতেছে ইহা আর যুবকদের বোণদান করিবার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নাই। ত্রিযুক্ত মশরুফালা এই কথা বলিয়া বর্তমান কংগ্রেস নেতাদের সতর্ক করিয়া দিয়া মন্তব্য করিতেছেন যে যদি কংগ্রেস নিজের দোষ দূর না করে তবে ইহা কয়েকটি প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির পরসায় পোষা লোকের সংকীর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে।

### ট্যাক্স ফাঁকি

ভারতের যে সমস্ত কোটিপতি আয়কর ফাঁকি দিয়া বিপুল বিভ্রম সঞ্চয় করিয়াছেন তাহাদের সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি আয়কর তদন্ত কমিশন গঠিত হইয়াছে। সয় এস. বরদাচারী কমিশনের সভাপতি। গত বাজেট-বক্তৃতায় অর্থ-সচিব শ্রীমন্তম চট্টো বলিয়াছেন যে সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি না দিলে কাহারও পক্ষে কোটি কোটি টাকা সঞ্চয় করা সম্ভব নহে। আয়কর কমিশন ভারতের শ্রেষ্ঠ ধনকুবেরদের নামের একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তালিকায় যাহাদের নাম আছে তাহাদের সম্পত্তি যুদ্ধের পূর্বে কি ছিল এবং এখন উহার পরিমাণ কি তাহা জানাইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আমেদাবাদ, বোম্বাই, কলিকাতা, কানপুর, কোয়েম্বাটুর, মাদ্রাজ, মস্কো এবং আজমীরে প্রাথমিক তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে। যাহাদের অভিযোগ আয়কর তদন্ত কমিশনের বিচারের জন্য দেওয়া হইয়াছে তাহার কয়েকটি তুলিয়া লওয়া হইবে বলিয়া কোন কোন সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছিল। ভারতের কয়েকটি সবচেয়ে বড় ধনকুবের পরিবারের অনেকগুলি নাম তদন্ত কমিশনের তালিকায় আছে এবং ইহাদের সম্বন্ধে তদন্ত স্থগিত রাখিবার চেষ্টা হইতেছে বলিয়া সাধারণের মনে একটা ধারণা জন্মিতেছে। এই ধারণা যত শীঘ্র দূর করিয়া দেওয়া হয় ততই মঙ্গল।

শুধু আয়কর নয়, বড় বড় ধনকুবেরগণ প্রাদেশিক ক্রয়শুল্ক ফাঁকি দিতেও সমান আগ্রহীল এমন সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। এইরূপ এক গোষ্ঠীর প্রায় ৬৮টি কোম্পানী আছে, তার মধ্যে কয়েকটি বড় বড় কারবার কলিকাতায় আছে। ইহাদের নিকট হইতে ক্রয়শুল্ক বণারীতি আদায় হইতেছে না বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ আমাদের আছে। এই শ্রেণীর বৃহৎ কারবারগুলি হইতে বণারীতি করতক আদায় হইলে বাজেটে

আদায়ের পরিমাণ যাহা ধরা হইয়াছে তাহা হইতে অনেক বেশী আদায় হওয়ার কথা। এই সব কোম্পানীর ব্যালান্স-শীটে উৎপাদনের পরিমাণ যাহা দেখানো হয় তাহা সঠিক কিনা বলা কঠিন, তথাপি উহার উপরও ক্রয়শুল্ক ধার্য হইলে টাকা অনেক বেশী আদায় হওয়ার কথা। এখন আইন যাহা আছে তাহাতে খাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া পার-পাওয়া কঠিন নয়। অবিলম্বে এই মর্মে অর্ডিনাল জারী করা উচিত যে প্রত্যেক কোম্পানী তাহাদের পাঁচ বৎসরের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবের খাতা রক্ষা করিতে এবং প্রয়োজন মাত্র সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবে। মাস-ফ্যাকচারিং একাউন্ট প্রাধা আপিস মারফৎ বিক্রয়ের হিসাব এবং ফাটকাবাজির হিসাব লুক্কাইয়া সরকারের ট্যাক্স এবং অংশীদারের লভ্যাংশ ফাঁকি দেওয়ার জন্য ম্যানেজিং এক্জেলি পরিচালিত কোম্পানীগুলির আর্থিক এত বেশী যে খাতা গোপন করিবার জন্য ইহার অত্যন্ত উদ্ভাব। শুধু জরিমানার ভয় দেখাইয়া ইহাদিগকে খাতা বাহির করিতে বাধ্য করা যাইবে না, ইহার জন্য কঠোর কারাদণ্ডের বিধান আবশ্যক। এইরূপ অর্ডিনাল করা হইলে আয়কর এবং ক্রয়শুল্ক উভয় বিভাগেরই আয় বাড়িবে। শিয়ালদহ ট্রেনে ল্যাণ্ড কাষ্টমসের বিবেকবান কর্মচারীরা ট্রেন ভরাসী করিতে গেলে ভারপ্রাপ্ত অফিসার বাধা দেন একথা প্রকাশিত হইয়াছে এবং আমরাও শিথিয়াছি। ক্রয়শুল্ক বিভাগেও বড় কারবারিদের বাঁচাইবার জন্য এরূপ হইতেছে কিনা তাহা দেখা দরকার।

### মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকার

কয়েক দিন হইল পশ্চিম বঙ্গের গবর্নমেন্ট আর্টা, ময়দা ইত্যাদির দাম প্রায় শতকরা ৫৬ ভাগ বাড়িয়া দিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পাউরুটির কথা বলা যায়—আম সের ওজনের রুটির দাম ছিল ১/০; হইয়াছে ১০। এই মূল্যবৃদ্ধির অজুহাত দেওয়া হয় যে বিদেশ হইতে গম ও আটাময়দা ধুব বেশী দামে কিনিতে হয় এবং আমাদের প্রদেশে বিক্রয় করিতে হয় কম দামে; এই ব্যবসারে প্রায় ৪ কোটি টাকা বৎসরে ক্ষতি হয়। কত দামে কেনা হইয়াছিল তাহা না জানিলে, এই হিসাব গ্রহণ করা যায় না। গম, আটাময়দার আদত দাম; জাহাজ ভাড়া, রেল ভাড়ার খরচ; গুদাম ভাড়ার খরচ; কর্মচারিদের অসাবধানতায় শস্তের ক্ষতি—এই সব এই হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে। এরূপ হিসাব না দেখাইয়া সরবরাহ বিভাগের খেরাল মত দাম ধার্য করিলে তাহার সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ থাকিয়া যাইবে। কারণ কাপড় ও চিনি লইয়া যে খেলা চলিতেছে, তাহার সঙ্গে গবর্নমেন্টের নানা বিভাগের যোগাযোগ না থাকিলে ইহা কখনও সম্ভব হইত না।

পাঁচ-ছয় মাস পূর্বে চিনির জন্য আমাদের দিতে হইত

সেরপ্রতি ১৬/১০ আনা; এখন দিতে হয় ১/০, ১৬/০ আনা। কাপড়ের বাজারে ত ফাটিকাওয়াজী চলিয়াছে; তাহার কোন নির্দিষ্ট দাম নাই। গত মে মাসের ৮ তারিখে কলিকাতার নিকটবর্তী কোন মিলে যে ধুতি জোড়া বিক্রয় হইত ৫৮/১০ আনার, ২২ মে তারিখে তাহা বিক্রয় হইয়াছিল ১০৮/১০ আনার। তারপর কাপড়ের বাজারে যাহা হইয়াছে তাহা আমাদের হাড়ে হাড়ে বুঝাইয়া দিয়াছে “স্বদেশী ভাবের” মূখ্যমি। গবমেণ্ট প্রায় আড়াই মাস এই গলা-কাটা দৃষ্ট দেখিয়াছেন দ্রষ্টাক্রমে, বেদান্তের দ্রষ্টাক্রমে। এই গলা-কাটাগিরি ছায়া বা অজ্ঞান্য তাহা স্থির করিবার ভার শুদ্ধ সমিতির (Tariff Board) উপর দিয়া কিছু সময় কাটাইলেন; এই সুযোগে কাপড়ের কলের মালিক ও ব্যবসায়ীরা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা আমাদের গলা টিপিয়া ট্যাকে পুরিলেন। এখন শুদ্ধ সমিতি নাকি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বর্তমানে কাপড়ের কলে যে দাম আদায় হইতেছে তাহা “অত্যধিক ও অত্যাচার” (“exorbitant and unjustified”)। গত জাহুয়ারী মাসের তুলনায় মোটা কাপড়ের দাম শতকরা ৫০ ভাগ, মাঝারি কাপড়ের দাম শতকরা ৭৫ ভাগ ও মিহি কাপড়ের দাম শতকরা ১০০ ভাগ অধিক। কেন্দ্রীয় গবমেণ্টের মজুমহোদয়গণ কাপড় কিনেন না; খাদি পেরেন। কাপড়ের দাম যে চড়িতেছে তাহার খবর তাঁহাদের কানে পৌঁছিতে কত সময় লাগিয়াছিল জানি না। কিন্তু জনসাধারণ শুদ্ধ সমিতির হিসাব-নিকাশ না দেখিয়াই কাপড়ের কলের মালিকের ও ব্যবসায়ীর ডাকাতিটা বুঝিতেছিল।

কাপড় ও চিনি সম্বন্ধে বিদেশ হইতে আমদানীর অজুহাতটা চলে না। কিন্তু আমাদের সরবরাহ বিভাগগুলির কল্যাণে একটা অজুহাত খুঁজিয়া বাহির করা যাইবে। তাহাদের পেছনে পুলিশ ও মিলিটারি আছে; তাহার জোরে আমাদের হাড়ে যাহা ইচ্ছা তাহাই যে চাপাইয়া দেওয়া চলে তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছে। বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে চিনি ও গুড় মজুত হইয়া যাইতেছিল; তাহাদের দাম কমিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। আমাদের সদাশয় সরকার বাহাদুর হুকুম দিলেন—“চালাও এসব বিদেশে; দেশের লোকে বেশী দাম দিয়া কিনিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যখন তখন দাম কমিতে দেওয়া হইবে না; বিদেশে চালান দিতে পারিলে দাম কমাইবার কোন কথা উঠিবে না।” এই ত অবস্থা। কোপিনবস্ত্র হইয়া থাকিতে হইবে; আধপেটা খাইয়া থাকিতে হইবে। আর দিল্লী কলিকাতায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা “স্বাধীনতার” শ্লোগান তুলিয়া আমাদের বুদ্ধিকে করিবেন বিভ্রান্ত; চোরাকারবারীরা আমাদের পকেট মারিবে; আর আমাদের সরকার বাহাদুর ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিবেন। আছি বেশ! কোন অজ্ঞানের প্রতিকারের কথা হুয়াশা ছাড়া কিছু নয়।

### পাকিস্তানে চোরাই চালান

জৈনৈক প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদপত্রে পত্র লিখিয়া পাকিস্তানে কাপড় চালানোর একটি বিবরণ দিয়াছেন। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সহিত উহা হুবহু মিলিয়া যায়। বে-আইনি চালান কি ভাবে কোথা দিয়া হয় এতদিনে কর্তৃপক্ষ তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাইয়াছেন এবং ইচ্ছা করিলে এই চোরা কারবার সপ্তাহ কালের মধ্যে বন্ধ করা অসম্ভব কাজ নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বহু আন্দোলন সত্ত্বেও সরকার ইহা নিবারণের জন্ত কোন আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন না বরং নিষ্ক্রিয় থাকিয়া এই পাপের প্রশ্রয় দিয়া চলিয়াছেন। শিয়ালদহ হইতে বেনাপোল পর্য্যন্ত কি কৌশলে কাপড় চালান যাইতেছে প্রত্যক্ষদর্শী ভদ্রলোকের বিবরণ হইতে তাহা সুন্দর ভাবে জানা যায়। গ্রীষ্মাবকাশে তিনি পাকিস্তানের পল্লীভবনে যাইতেছিলেন; সন্ধ্যার পর শিয়ালদহ-স্টেশনের ভীড়ে সাধারণ যাত্রীদের ফটক অতিক্রম করাও দুঃস্বপ্ন ব্যাপার। কিন্তু প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়া দেখা গেল বস্ত্রের পুটুলিধারী অসংখ্য নরনারী পূর্বে সুকৌশলে প্রবেশলাভ করিয়াছে। শুদ্ধ বিভাগের কর্মচারীদের প্রথম সাক্ষাৎ মিলিল কয়েকটি স্টেশন পার হওয়ার পর, শিয়ালদহ স্টেশনে নহে এবং তদন্ত আরম্ভ হইল বনগাঁ স্টেশনে। বনগাঁয় পৌঁছিবামাত্র প্রত্যক্ষদর্শী যে কামরায় ছিলেন সেই কামরা হইতেই পাঁচ-সাত জন লোক কাপড়ের বড় বড় বোঁচকা পিঠে করিয়া নামিয়া বিনা বাধায় অদৃষ্ট হইয়া গেল। লক্ষ্য করিয়া তিনি দেখিলেন যে প্রত্যেক কামরা হইতেই এইরূপ কয়েকজন পাইকারী ব্যবসায়ী নামিয়া গেল। পাকিস্তানে প্রবেশ করিবামাত্র সমগ্র কামরাটি কর্ণ-চকল হইয়া উঠিল। ভোজবাজীর ছায় নানা অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে কাপড়ের বাঁড়িল বাহির হইতে লাগিল। যে সব ফেরিওয়ালা এতক্ষণ ‘আশ্চর্য্য মলম’ বা ‘নকল দানা’ বেচিতে-ছিল তাহারা থলি হইতে ‘আসল দানা’ চার-পাঁচ জোড়া ধুতি-শাড়ী বাহির করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যায়িত করিয়া দিল। বারো আনা যাত্রীই তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ কেহ জুদি খুলিয়া দেখাইল চার-পাঁচখানা কাপড় সুকৌশলে তাহারা পরিধান করিয়াই চলিয়াছে। অনেকে উলঙ্গ ও অর্দ্ধ উলঙ্গ হইয়া লুক্কায়িত কাপড়ের বস্তা বাহির করিতে আরম্ভ করিল।

রেলের কামরাগুলি এতক্ষণে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের দর কষাকষিতে মুখরিত হইয়া ছোটখাট এক একটি বড় বাজারে পরিণত হইয়াছে। দেখা গেল ট্রেনের বারো আনা যাত্রীই এই মাল বেচাকেনার জন্ত প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক পল্লীভেই বেকার দল রাতারাতি বড়লোক হইবার এই কন্দীতে দলবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাশা প্রতি ট্রেনে দলে দলে কলিকাতায় আসে। যশোর হইতে আগত আর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতার

ট্রেনে ছাদে, ফুটবোর্ডে ও চাকার পাশের লোহার ডাঙায় পর্যন্ত লোকের ভীড় দেখিয়া উভার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে ইহার 'মাগ' লার'—কাপড় আনিতে কলিকাতা চলিয়াছে। কলিকাতা হইতে কাপড় কিনিয়া ইহার পুলিস, শুক বিভাগের কর্মচারী এবং রেল-কর্মচারীদের সহায়তায় গাড়ীতে কাপড় উঠায় এবং ভরত সীমান্ত অতিক্রম করিয়া গাড়ীতেই বিক্রী আরম্ভ করে। বিক্রয়বশিষ্ট মাল পল্লীগামে পৌঁছে এবং সেখানে স্বর্ণমূল্যে বিক্রীত হয়।

খুলনা লাইনে এবং রাণাঘাট লাইনে এই চোরাকারবার নিরন্তরভাবে চলিয়াছে। বেকার দল ছাড়া ইহার মধ্যে পুলিস, শুক বিভাগের কর্মচারী এবং রেল কর্মচারীদের একটা বড় অংশ রহিয়াছে। রেলগাড়ীর তলায় বাঁধা অবস্থায় এবং ছাদের তক্তা সরাইয়া তাহার ভিতর হইতে কাপড় বাহির হওয়ার অর্থ রেল কর্মচারীদের সক্রিয় সাহায্য; তাহাদের সহায়তা ভিন্ন ঐ সব স্থানে কাপড় প্যাক করা যাইতে পারে না। শুক বিভাগের কর্মচারীরা কি ভাবে এই কুকার্যে সহায়তা করে তার একটা বড় দৃষ্টান্ত সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। শিয়ালদহে শুক বিভাগের লোক আছে; তন্মধ্যে দুই-তিন জন কর্মচারী চোরাই মাল ধরবার জন্ত উদ্ভাবিত কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া রাখিতেছেন। এই কর্মচারীটি আদেশ দিয়াছেন যে সন্ধ্যা ৬টার পর কোন ট্রেনে তল্লাসী করাই চলিবে না, অথচ সন্ধ্যার পরেই শিয়ালদহ হইতে দার্জিলিং মেল, ঢাকা মেল, খুলনা মেল প্রভৃতি বড় বড় ট্রেনগুলি ছাড়ে। শিয়ালদহে মোতায়েন শুক বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সর্বদা গুরুতর অভিযোগ হইতেছে যে তিনি দুই-চারিটা ক্ষুদ্রে লোক ধরিয়া বড় বড় কারবারিয়ারদের পার করিয়া দিতেছেন। এই সমস্ত অভিযোগ দীর্ঘকাল যাবৎ হইতেছে কিন্তু তার কোন প্রতিকার আজ পর্যন্ত হয় নাই। চোরাকারবারে লিপ্ত পুলিস, রেল এবং শুক বিভাগের কতকগুলি বড় বড় কর্মচারীকে ধরিয়া কঠোর শাস্তি দিলে যে কাজ হইত, সহস্র ইত্তাহার জারী করিলেও তাহার একাংশও হইবে না ইহা নিশ্চিত। এখানে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারত-বণ্ড হইতে পাকিস্থানে মাল চোরাই চালান যায় কিন্তু যশোর, খুলনা বা পূর্ববঙ্গের কোন স্থান হইতে একটি সজী পর্যন্ত কেহ আনিতে পারে না। এ বিষয়ে পাকিস্থানের কর্মচারী এবং নাগরিক উভয়েই সমান সতর্ক।

### আসামে প্রাদেশিকতা

আসাম, বিহার ও উড়িষ্যায় বাঙালীর দ্বার ক্রমশঃ কি-ভাবে রুদ্ধ করিয়া আনা হইতেছে এবং বাঙালীর উদ্বাস-চিন্তা ও আদর্শবাহুরাণের সুযোগ লইয়া কিভাবে ঐ তিন

প্রদেশেরই লোক বাংলায় বসিয়া বাঙালীকে শোষণ ও অপমান করিতেছে তার কিছু কিছু আলোচনা আমরা করিয়াছি। নিজের প্রদেশে অপর প্রদেশের লোককে বসবাসের জন্ত আসিতে না দেওয়া ঐ সব প্রদেশে সাধারণ নিয়মে পরিণত হইয়াছে কিন্তু বাংলা আত্মরক্ষার জন্ত এবং নিজের বেকার-সমস্তা মিটাইবার জন্ত বাংলাদেশের কাজে কর্ম্ম আগে বাঙালীর দাবি গ্রহণের কথা তুলিলেই বলা হয় বাঙালীর মন অতি সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতায় ভরিয়ো উঠিতেছে। এই কয়েক দিন আগেও আসামের নগরী জেলায় পূর্ব-বাংলা হইতে আগত কতক লোক খড়ের ঘর বাঁধিয়া বসবাসের চেষ্টা করিতে গিয়াছিলেন; গবর্নমেন্ট তাহাদের ঘরবাড়ী জালাইয়া দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন। একটি প্রাদেশিক গবর্নমেন্ট অপর প্রদেশের লোক সেখানে আশ্রয়ের জন্ত আসিয়াছে বলিয়া তাহাদের ঘর জালাইয়া বিতাড়িত করিয়াছে এ দৃষ্টান্ত বোধ হয় পৃথিবীর কোন অসভ্য দেশেও নাই। গোঁহাটিতে বাঙালীদের উপর আক্রমণের কথা ছাড়িয়া দিলেও জাতীয় সঙ্কীর্ণ "জনগণমন অধিনায়ক" গানে আসামের নাম নাই বলিয়া একদল অসমীয়া গোঁহাটি বেতার-ষ্টেশন উদ্বোধনের দিন ভারত-সরকারের নিমন্ত্রিত অতিথি দুইটি আমেরিকান মহিলাকে যেভাবে অপমান করিয়াছে তাহা তীব্র নিন্দার যোগ্য। এই লোকগুলির অতিশয় অসম্মত দাবি সমর্থন করিয়া এবং অতিথিদের অপমানের নিন্দা না করিয়া আসাম-সরকার যে প্রেসনোট দিয়াছেন প্রাদেশিকতাসূচক সঙ্কীর্ণতার দৃষ্টান্ত হিসাবে তাহাও অতুলনীয়। আসামের এই ক্রমবর্ধমান প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে ত্রিরোহিণী চৌধুরী একটু শক্ত ভাষা প্রয়োগ করিয়া একটি বিবৃতি দিয়াছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আসামের অল্পতম মন্ত্রী মোলানা তায়েবুল্লা চৌধুরী মহাশয় বিবৃতিটির আপত্তি করিয়া শিলচরে বক্তৃতা করিয়াছেন। আসামে ৭৮ লক্ষ লোকের বাস। তন্মধ্যে মাত্র ২২ লক্ষ অসমীয়া এবং ইহারাই প্রদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অলস লোক। আসামের প্রধান সম্পদ চা-বাগান ও পেট্রল। প্রায় সমস্ত বড় ও ছোট চা-বাগানের মালিক ইংরেজ; অতি অল্প কয়েকটি মাত্র অসমীয়া-দের হাতে। সমস্ত চা-বাগানের প্রমিক সাঁওতাল, কোল, জীল, মাদ্রাজী প্রভৃতি ভিন্ন প্রদেশের লোক; আসামের চা-বাগানে একটিও অসমীয়া প্রমিক নাই। পেট্রল কোম্পানীর মালিক ইংরেজ, সমস্ত প্রমিক আসামের বাহিরের লোক। আসামের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য মাড়োয়ারীদের হাতে। কৃষকদের মধ্যেও অধিকাংশই অসমীরা নহে। তালুকদারী প্রভৃতি জমির উপর ভোগ করে অসমীয়ারা, কৃষি ব্যবসা বা শিল্প কোনটতেই তাহারা পরিশ্রম করে না। এণ্ডি, মুগা, পাট প্রভৃতি রেশমের কাপড়ের ব্যবসা আসামে আছে, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে পরিচালনা করে অসমীয়া জীলোকেরা। জী-

লোকেরা সেখানে পুরুষদের চেয়ে বেশী পরিশ্রমী এবং ঘরের বাহিরের কাজ তাহারাই বেশী ভাগ করিয়া থাকে। চাকুরি ও বিনাশ্রমে জমির উপস্থিত ভোগ অসমীয়া পুরুষদের একমাত্র লক্ষ্য। আসামে আবাদী এবং গোচারণ ভূমি ছাড়া বহু লক্ষ বিঘা আবাদযোগ্য জমি পতিত রহিয়াছে। এই সব জমিতে প্রচুর আনারস, কলা প্রভৃতি ফল ফলিতে পারে, খাস তো প্রচুর আছে। কানাদার ছায় আসামে ফলের চাষ ও ডেয়ারী কার্খ গঠন করিয়া টিনের ফল ও টিনের ছুধের বড় বড় ব্যবসায় গড়িয়া তোলা যায় কিন্তু তাহাতে পরিশ্রম দরকার। অসমীয়ারা নিজেরাও ইহা করিবে না, জমি ফেলিয়া রাখিবে তবু বাঙালীকে আসিয়া উছা করিতে দিবে না। ইংরেজ, মাড়োয়ারী, সাঁওতাল প্রভৃতি কাহারও বিরুদ্ধে অসমীয়ারা একটি কথাও বলে না, যত আক্রোশ তাহাদের বাঙালীর উপর। বাঙালী যাহাতে আসামে স্থায়ীভাবে বাস করিতে না পারে তাহার জন্ত যত সতর্কতা সম্ভব সমস্ত এহ্ন করা হইয়াছে, ডোমিসাইল সার্টিফিকেট তো বহু পূর্বেই প্রবর্তিত হইয়াছে। আসামে যে সময়ে বাঙালীদের ধরে আগুন দেওয়া পর্য্যন্ত শুরু হইয়া গিয়াছে সেই সময়েও বাংলাদেশে অসমীয়ারা নির্ভয়ে এবং নির্বিবাদে লেখাপড়া, চাকুরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছেন। আমরা এখানে অসমীয়াদের অসভ্যতার অঙ্কুরণ করিতে বলি না কিন্তু এই দাবী করি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কঠোর হস্তে এখানে অসমীয়াদের প্রবেশ, ব্যবসা ও চাকুরি প্রভৃতি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন, যাহাতে অসমীয়াদের সদ্‌বুদ্ধি জ্ঞাপ্রত হইতে পারে। বাঙালীর এই প্রচেষ্টাকে প্রাদেশিকতা বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না।

### বিহারে প্রাদেশিকতা

বিহারে প্রাদেশিকতা যে কত নীচে নামিয়াছে সম্প্রতি শ্রীজগৎনারায়ণ লাল তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মানভূম, সিংভূম প্রত্যর্পণের বিরোধিতাকল্পে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ হইতে শুরু করিয়া সকল বিহারী নেতা এবং বিহার গবর্নমেন্ট যাহা করিতেছেন তাহাকেও অসমীয়া ও আসাম গবর্নমেন্টের ছায় বর্ষরোচিত আখ্যায় ভূষিত করা যাইতে পারে। পাটনার বিড়লার কাগজ সার্চলাইট বাঙালীদের বিরুদ্ধে অসংযত ভাষায় বিবোধকার এবং কলিকাতায় বিহারীদের উপর ট্রামে, বাসে ও বাজারে ব্যাপক আক্রমণের মিথ্যা কাহিনী প্রচার করিয়া এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে যাহাতে যে কোন সময়ে বিহারে বাঙালীদের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড রকমের মারামারি আরম্ভ করিয়া দেওয়া যায়। মানভূম, সিংভূম প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে বাংলার দাবী ক্রমশঃ যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে এরূপ একটা গোলমাল বাধাইতে পারিলে উচ্চস্থানীয় নেতারা উহার সুযোগ লইয়া ইহার মীমাংসা ধামাচাপা দিতে পারিবেন। মানভূম, সিংভূম

প্রত্যর্পণের দাবীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস-সভাপতি ও গণপরিষদের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলালের অভিমত আজ কাহারও অজানা নাই; সম্প্রতি গঠিত সীমানা-কমিশনে বাংলার দাবী কেন সুকৌশলে এড়ানো হইয়াছে তাহাও হৃদ্যে নহে। পাটনার বিড়লা-পরিচালিত সংবাদপত্রই বা কেন বাঙালীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার ও বিবোধকার করিয়া আসর গরম করিয়া রাখিতেছে তাহারও তাৎপর্য অল্পমান করা কঠিন নয়। সীমানা-কমিশনের অন্ততম সদস্য শ্রীজগৎনারায়ণ লাল সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। নববঙ্গ সমিতির কয়েকজন সদস্য তাঁহার সহিত বঙ্গ-বিহার সীমানা লইয়া আলোচনা করিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে শ্রীজগৎনারায়ণ আসল কথা এড়াইয়া গিয়াছেন কিন্তু পাটনা ফিরিয়া গিয়াই বাঙালীকে প্রাদেশিক মনোভাব পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে কলিকাতায় বিহারী এসোসিয়েশন তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে এখানে নাকি বিহারীদের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক মনোভাব বড় বেশী বাড়িয়া গিয়াছে এবং মারামারিও বেশ চলিতেছে। আমরা যত দূর জানি এটা নির্জলা মিথ্যা এবং এই সব ধরনের প্রচার-কার্যের দ্বারা বাঙালীর উপর ভবিষ্যৎ আক্রমণের পথ পরিষ্কার করা হইতেছে। বাঙালীদের উপর বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ হইতে শুরু করিয়া বিহারী নেতাদের মনোভাব বিহারে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রবর্তনের সময় এবং বাঙালী-বিহারী সন্ধান সৃষ্টির জন্ত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু-প্রদত্ত লক্ষ টাকার ব্যাপারে বেশ ভাল করিয়াই দেখা গিয়াছে। এখন ত মানভূম ও সিংভূমে, পাটনায় ও রাঁচীতে উছা প্রত্যাহ একট হইয়া উঠিতেছে।

বিহারে বাঙালী বিতাড়ন চলিতেছে কিন্তু বাংলায় লক্ষ লক্ষ বিহারী বিনাবাধায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে এবং সং অসং নানাবিধ উপায়ে অর্জিত অর্থ মণিঅর্ডার করিয়া দেশে পাঠাইতেছে। বাংলা হইতে প্রাপ্ত মণিঅর্ডারের টাকা বিহারের সবচেয়ে বড় জাতীয় আয়। বিহারীরা এখানে কলকারখানায় শ্রমিকের কাজ, রেলস্টেশনে মুটেগিরি, রিক্সা টানা, ঠেলাগাড়ী চালানো, দারোয়ান ও সিপাহীর চাকুরী, ছুধের ব্যবসায় প্রভৃতি নানাবিধ কাজ করে। ইহার ফুটপাথে বা আত্মীয় দারোয়ান থাকিলে পরের দালানে শোয় এবং ফুটপাথে রায়্য করে; ঘরভাড়া ইহাদের লাগে না। সরকারের ট্যাক্স ইহার সর্ব্বরকমে ফাঁকি দেয়। কাঁজেই ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় বাঙালীরা পারিয়া উঠে না; Rate war যেমন নিন্দনীয়, ফুটপাথে বাস করিয়া ধরচা কমাওয়া ইহাদের এই অজায় প্রতিযোগিতাও ঠিক তেমনি আপত্তিজনক। বাংলাদেশে ইহাদের সংখ্যা ৩০ লক্ষের কম হইবে না। ইহার নিজেদের ভাষা সম্পূর্ণরূপে বঙ্গায়

রাখে; বাঙালী মনিব নীচে নামিয়া ইহাদিগের ভাষায় কথা বলেন কিন্তু বাংলা ভাষা শিখিতে ইহাদের বাধ্য করেন না। দেশে ইহার বাঙালীকে ঠেংইয়া হিন্দী বলায়, এখানেও বাঙালী inferiority complex বশতঃ হিন্দী বলে। ট্রামে বিহারী কণ্ঠস্বরকে বাংলার কথা বলিতে বলিলে সে বলিয়াছে “আমার ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইবে, তোমাদেরই এখানে হিন্দী বলিতে হইবে।” আত্মদার্থ এবং হিন্দীর প্রাধান্য স্বত্ব অশিক্ষিত বিহারীদেরও যে মনোভাব প্রতি পদে ফুটিয়া উঠে তৎপ্রতিও বাঙালীর সতর্ক হওয়া দরকার। বিহারে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট কঠোরভাবে সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতেছে। বাংলায় বিহারীদের বিরুদ্ধে সমস্ত কাজের জন্ত লাইসেন্স এবং ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রদত্ত হওয়া একান্ত দরকার, ইহাকে প্রাদেশিকতা বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না। Reciprocity বলিয়া একটি ক্রিয়া আছে এবং তাহা রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এবং রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় একবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ডিগ্রী অননুমোদিত করায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৎক্ষণাৎ উহাদের ডিগ্রী সম্বন্ধে ঠিক সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়েরই চৈতন্ত উদ্বেক হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার সহিত ভারতবর্ষের ব্যবহার এখনও এই Reciprocity নীতির দ্বারাই চালিত হইতেছে। মাড়োয়ারী, উড়িয়া প্রভৃতি আরও বাহারা বাঙালীর প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধেও বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ও অন্যান্য কাজের জন্ত ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইলে উহাদেরও চৈতন্ত সম্পাদনে বিলম্ব হইবে না।

### ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন

ভারতীয় গণ-পরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠন সম্পর্কে একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। তার প্রথম অধিবেশন বসিবে আগামী ত্রয়োদশ তারিখে। যুক্তপ্রদেশের দুই জন শ্রী এস. কে. দার ও ডাঃ পান্নালাল ও বিহারের এক জন শ্রীজগৎনারায়ণ লাল, এই কমিশনের মূল সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। বিভিন্ন নূতন প্রদেশের গঠন স্বত্ব এই কমিশন অঙ্গীকার করিবেন। বর্তমানে এই উপলক্ষে চারিটি প্রদেশের নাম শুনা যাইতেছে—অন্ধ্র, তামিল, কর্ণাটক ও মারাঠা। যদি এই প্রদেশ কয়টি রূপ গ্রহণ করে, তবে গুজরাট ও মালয়লম-ভাষী লোকসমষ্টির জন্ত একটা পৃথক ব্যবস্থার আয়োজন করিতে হইবে। উপরোক্ত চারিটি প্রদেশ স্বত্ব যখন আলোচনা ও অঙ্গীকার চলিবে, তখন তত্ত্ব প্রদেশের প্রতিনিধি এই কার্যে যোগদান করিতে পারিবেন; এই প্রতিনিধিবর্গের নামও ঘোষণা করা

হইয়াছে। এই উপলক্ষে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পশ্চিম বাংলার দাবী স্বত্ব কোন ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছেন না। ১৯১২ সালে আমাদের প্রদেশের যে কয়টি অংশ বিহারে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ফিরাইয়া পাইবার দাবী নূতন নয়; গত পঁচিশ বৎসর নানা ভাবে ইহা জানানো হইয়াছে। ১৯১২ সালে বিহারী নেতৃবৃন্দ এই দাবীর যুক্তি মানিয়া লইয়াছিলেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ আত্ম সে কথা মনে করিতে চাহেন না। এই স্বত্বের তাঁহার নিজের কোন স্বীকৃতি যে আছে, তাহা তিনি ভুলিবার ভান করিতেছেন। কিন্তু লোকে তাঁহাকে জানপাশী হইতে দিবে বলিয়া মনে হয় না। সেইজন্ত দেখি যে “আনন্দবাজার পত্রিকা”র শুভে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের এই স্বীকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৪ই জুন তারিখে প্রেরিত একটি পত্রে জ্যোতিষচন্দ্র সরকার তাহা লোক সমক্ষে আনিয়াছেন। জ্যোতিষবাবু বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলা উদ্যান্ত সমিতির সম্পাদক। এক সময়ে তিনি বিহার প্রদেশে সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য ছিলেন, বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য ছিলেন, পালামো জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন।

জ্যোতিষবাবুর বক্তব্য হইতে নিম্নলিখিত বিবৃতিটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

“গত ১৯০১ সালে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে মানভূম জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সভাপতির আসন হইতে আনীত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—

যে হেতু এই মানভূম জেলার শতকরা ৮৯ জন লোক বঙ্গ-ভাষায় কথা বলে, সেই হেতু যখন দেশ স্বাধীন হইবে এবং ভাষানুযায়ী প্রদেশ গঠিত হইবে, তখন এই মানভূম জেলা বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হইবে।

বিনা বাধায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। যখন এই প্রস্তাব বিষয়-নির্বাচনী সভায় রচিত হয়, তখন ইহার বিরোধিতা করেন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত। তিনি বলেন দেশ যখন স্বাধীন হইবে তখন কংগ্রেসের আদর্শ অনুযায়ী এই জেলা ত বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হইবেই। সুতরাং এই প্রস্তাবের সার্থকতা নাই।”

১৯০১ সালের পরে পৃথিবীর অনেক কিছু বদলাইয়া গিয়াছে। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তিন-তিন বার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন। গণ-পরিষদের সভাপতি হইয়াছেন; কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের মন্ত্রী হইয়াছেন। ব্যক্তিগত জীবনের এই নানা পরিবর্তনে যদি তাঁহার মনোভাব পরিবর্তিত হইয়া থাকে, তবে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু এই কথাটা পরিষ্কার



করিয়া সকলকে জানাইয়া দিলে, আমরা এক বিষয়ে নিশ্চিত হইতে পারি। তাঁহার হুঁমুখে নীতি অসংহ হইয়া উঠিতেছে। নববঙ্গ সমিতির সভাপতির সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তাঁহার এক মুষ্টি, গণ-পরিষদের সভাপতিরূপে তাঁহার ভিন্ন মুষ্টি। এইরূপ পোষাক পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নহে। নানা কারণে বাঙালী হুঁভাগ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু কংগ্রেসী বিধানমতে পশ্চিম-বাংলা ভারত-রাষ্ট্রের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। এই প্রদেশের লোকের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখাইলে রাষ্ট্রের কল্যাণ নাই; এই প্রদেশের লোকের উপর পূর্ব সীমান্তরক্ষার ভার দিতে হইবে। সুতরাং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তাচ্ছিল্য করিলে চলিবে না। বিহারের অন্তর্গত বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের বহুভুক্তি এই আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি প্রতীক।

### “অসংযত প্রাদেশিকতা”

এই প্রসঙ্গে ত্রিকিশোরলাল মশরুওয়াল “হরিজন” পত্রিকায় ২৭শে জুন (১৩ই আষাঢ়) সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। বিহার সরকারের রাজস্ব বিভাগ ৪৮টি খনি-শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে একটি নির্দেশ দিয়াছে। মশরুওয়ালদ্বী তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন; নিম্নে তাহা দেওয়া হইল,—

পাটনা—১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮

বিষয় : সিংহভূম জেলার খনি-শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বিহারীদের নিয়োগ সম্পর্কে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালকগণের প্রতি :

মহাশয়, প্রাদেশিক সরকারের খনি-নীতির সর্ব আপনার গোচরে আনিতে আদিষ্ট হইয়াছি। গবর্নেন্ট একটি বোর্ড নিযুক্ত করিবেন। এই বোর্ডের সুপারিশক্রমে অ-শ্রমিকের চাকরিগুলিতে লোক লইতে হইবে, নহিলে কোন ব্যক্তি বা ব্যবসায়কে ভবিষ্যতে ইজারা (“লিজ”) দেওয়া হইবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ এই যে এই সকল প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ভাবে বিহারীদের এবং বিশেষভাবে স্থানীয় লোকদের ঠিক মত চাকরি দেওয়া হয় না। এ কথা সত্য যে বর্তমান ইজারাদারদের উপর এরূপ কোন সর্ব নাই। কিন্তু গবর্নেন্ট ভাল করিয়াই বলিতে চান যে অতঃপর এই নীতি অমুযায়ী যেন কাজ হয়। নির্দেশপত্র অমুযায়ী আপনি কি ব্যবস্থা করেন গবর্নেন্টকে তাহা জানাইবার জন্ত আপনাকে অমুরোধ করা যাইতেছে। ইতি—

কর্মসচিব

পত্রলেখক বলিতেছেন যে এই নির্দেশপত্র বিহারীদের স্বার্থের অমুরোধে বলা হইলেও আসলে বাংলা ভাষা-ভাষী সংখ্যালগণের স্বার্থের বিরুদ্ধেই ইহা কাজ করিবে— ইহা তাহাদেরই বিরুদ্ধে অভিযান।

এইরূপ ইঙ্গিত করা পত্রলেখকের পক্ষে কতটা ঠিক হইয়াছে তাহা আমি জানি না। তবে এই কথা বলিতে পারি, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রে যদি স্বীকৃত হয় যে প্রত্যেক ভারতবাসীর ভারতের যে কোন স্থানে বসবাস করিয়া স্থায়ী হইবার অধিকার আছে, তাহা হইলে সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই কর্তব্যেরও উল্লেখ করিতে হয়, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কোন অঙ্গ (প্রদেশ) এরূপ কোন নীতির অমুসরণ করিতে পারিবে না যদ্বারা সেখানকার কোন অধিবাসী তাহার যোগ্যতা অমুযায়ী জীবিকাজনের কাজ হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। কংগ্রেস যে ধরণের প্রাদেশিক গবর্নেন্টের পরিকল্পনা করেন তাহাতে সেই গবর্নেন্ট সেই প্রদেশে কার্যরত কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে কোন একটা বিশেষ শ্রেণীর লোক হইতে কর্মচারী নিয়োগের নির্দেশ দিতে পারেন কি না সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। এরূপ চেষ্টাকে আমি কর্মচারী নির্বাচন ব্যাপারে ব্যবসায় পরিচালকগণের স্বাধীনতার উপর অযথা আক্রমণ বলিয়া মনে করি।

আজ পশ্চিম বংসর যাবৎ বিহার প্রদেশে বাঙালীর বিরুদ্ধে যে অভিযান চলিয়াছে তৎসম্বন্ধে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়াছে। এক রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও যেরূপ ভাবে বিহারে, আসামে ও উৎকলে বাঙালীর সম্বন্ধে পার্থক্য করা হয়, তৎপ্রতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ও তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলী সজাগ আছেন বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। বরং তাঁদের প্রশ্নই পাইয়া এদের ব্যবহার এত উৎকট হইয়া উঠিয়াছে যে ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের কোন মূল্য আছে বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হয়। উৎকল ও বিহারের শাসক সম্প্রদায় তুলিয়া গিয়াছেন যে বাংলাদেশের কল্যাণে যত লক্ষ উড়িয়া ও বিহারী জীবিকা উপার্জনের পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন, তার এক-চতুর্থাংশ বাঙালী এই দুই প্রদেশে উক্ত উদ্দেশ্যে যান নাই। এই হিসাব হইতে বিহারের বাংলাভাষা-ভাষী অঞ্চলের ২০১২২ লক্ষ বাঙালীকে বাদ দিতেছি। এই অবস্থায় নিজেদের স্বার্থের খাতিরও উৎকল ও বিহার ভদ্র ও সংযত হইতে পারিত। কিন্তু এই দুই প্রদেশের শাসক সম্প্রদায় তাহা হন নাই।

### মানভূম জিলার ভবিষ্যৎ

কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারী। বিহারের বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলসমূহ পশ্চিম বাংলায় প্রত্যর্পণ করা সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব আজ আর কাহারও অবদিত নহে। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতীয় গণ-পরিষদেরও সভাপতি, ভারতরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার দায়িত্ব

আছে। এই শাসনতন্ত্রের সাফল্যের জন্ত প্রদেশসমূহের আঞ্চলিক সীমা পরিবর্তন অপরিহার্য। ভাষার ভিত্তিতে নূতন নূতন প্রদেশ গঠন করিবার নীতি এই পরিবর্তনের পরিপোষক। সেইজন্তই গণ-পরিষদের সভাপতিত্বপে তিনি একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। গত ১৬ই জুন (২রা আষাঢ়) এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ইত্তাহারটি পরিষদ দপ্তর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে :

জনসাধারণ কিছুদিন হইতে কয়েকটি নূতন প্রদেশ গঠনের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন। গণ-পরিষদ যে খসড়া কমিটি গঠন করিয়াছিলেন তাহার এ সম্পর্কে একটি কমিশন গঠনের জন্ত সুপারিশ করেন। উক্ত সুপারিশে বলা হয় যে কমিশনকে নূতন প্রদেশ গঠন সম্পর্কে সকল বিষয় তদন্ত করিতে নির্দেশ দেওয়া হউক এবং ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবার পূর্বে এই সম্পর্কিত রিপোর্ট দাখিল করিতে বলা হউক। তদনুযায়ী গণ-পরিষদের সভাপতি অজ্ঞ, কর্ণাটক, কেরল ও মহারাষ্ট্র এই ৪টি নূতন প্রদেশ গঠন সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্ত নিম্নলিখিত কমিশন গঠন করিয়াছেন—

শ্রী এস কে ধর (এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ)—চেয়ারম্যান, ডাঃ পান্নালাল (অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস, (ত্রিঙ্গগুন্যারায়ণ লাল, শ্রী সি, সি, ব্যানার্জী (অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল, বিহার) সম্পাদক।

কমিশনের কার্য সাহায্য করিবার জন্ত নিম্নলিখিত সহযোগী সদস্যগণকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। সহযোগী সদস্যগণ—শ্রীরামকৃষ্ণ রাজু (মাদ্রাজ), শ্রীরামলিঙ্গম চেন্নৈয়ার (অজ্ঞ), শ্রী টি সুব্রাহ্মণিয়াম (বেলারি কর্ণাটক) শ্রী কে এম মুন্সী (গুজরাট), শ্রী আর আর দিবাকর (কর্ণাটক), শ্রী এইচ ডি পাতাসকর (মহারাষ্ট্র) শ্রী টি এল শেয়োদে (নাগপুর হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ) শ্রীগোপীলাল ত্রীবাস্তব (মহাকোশল)। উপরে যে ৪টি স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে কয়টি নূতন প্রদেশ গঠিত হইতে পারে, কমিশন সে সম্পর্কে রিপোর্ট করিবেন এবং উক্ত প্রদেশসমূহের সীমানা কি হওয়া উচিত কমিশন সে সম্পর্কেও রিপোর্ট দিবেন। পরে নূতন প্রদেশসমূহের সীমানা কমিশনের সাহায্যে চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হইবে।

নূতন প্রদেশগুলি গঠনের ফলে ঐসব প্রদেশের অর্থ-নৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া কি হইবে কমিশন সে সম্পর্কে তাহাদের মতামত জানাইবেন। নূতন প্রদেশসমূহ গঠনের ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া কি হইবে কমিশন তাহাও রিপোর্ট করিবেন।

এই ইত্তাহারে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন। পশ্চিম বাংলার দাবী পূরণ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, একজন “সহযোগী সদস্য” পশ্চিম বাংলার পক্ষ হইতে নিযুক্ত করা হইত। তাহা করা হয় নাই। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের মত উকীল এই কার্যের সপক্ষে যুক্তি বা অজুহাত আবিষ্কার করিতে পারিবেন না, তাহা আমরা মনে করি না। এই যুক্তি বা অজুহাত আমরা স্বীকার করিতে পারি না, স্বীকার করিয়া লইব না, এবং পশ্চিম বাংলার জনমতকে এই বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিলে আর চলিবে না। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে বিহারের কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট ও কংগ্রেসী সভাপণ বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে যে তাওব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। এই অন্যায়ের প্রতিকার বাঙালীকে করিতে হইবে—যেমন ব্যর্থ করিতে হইয়াছিল বড়লাট কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গের প্রচেষ্টাকে। এই কার্যে কে অগ্রণী হইবে, তাহা দেখিবার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করিয়া আছি। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী নেতৃবর্গ এই বিষয়ে নিশ্চেষ্ট। নব বঙ্গ সমিতি যে আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা জমাট বাঁধিতেছে না। পশ্চিম বাংলা হইতে মনোনীত গণ-পরিষদের সদস্যবর্গও তদপেক্ষা তৎপর বলিয়া কোন প্রমাণ পাই নাই। এক এক জন করিয়া তাহাদের নাম ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—এই বিষয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে আপনারা কে কি করিয়াছেন বা করিতেছেন? যত দূর মনে হয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পশ্চিম বাংলার পক্ষ হইতে গণ-পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন এবং এই পদ অধিকার করিয়া আছেন : শ্রীভামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকিতীশচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, জনাব আবদুল হেলিম গজনবী, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ, শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত, শ্রীবসন্ত-কুমার দাশ, শ্রীসুরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ; ২১টা নাম হয় ত বাদ যাইতেছে। সে যাহাই হউক এই কংগ্রেসী নেতৃ-বর্গকে জিজ্ঞাসা করিতেছি বিহার প্রদেশস্থ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে পশ্চিম বাংলায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাহারা কি করিয়াছেন, তার একটা হিসাব দিবার সময় কি আসে নাই? এবং গণ-পরিষদের সভাপতিত্বপে বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদ যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহার প্রতিকারকল্পে তাহারা কি করিতে প্রস্তুত আছেন? অবস্থা দেখিয়া মনে হয় ভারত-রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট এই অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু ভাষার ভিত্তিতে নূতন প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে তাহার অমত জানাইয়াছিলেন। কিন্তু গণ-পরিষদের সভাপতি ঐ অমত মানিয়া লইতে পারেন নাই। অজ্ঞ, তামিল, মহারাষ্ট্র, গুজর সম্বন্ধে ভাগ-বাটোয়ারার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাংলার

বেলায় এক যাত্রায় পৃথক ফল হইবে কেন তাহার উত্তর কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের নিকট জানিতে হইবে।

### পশ্চিম বাংলার সামরিক সংগঠন

গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এই সম্বন্ধে দুইটি সংবাদ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমটি আমাদের জানাইয়া দিল যে “জাতীয় রক্ষাবাহিনী” বলিয়া পশ্চিম বাংলার পূর্ব সীমান্তবাসী জনগণকে সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। দ্বিতীয় সংবাদটি দুই ব্যাটেলিয়ন প্রায় ১,৫০০ হইতে ২,০০০ বাঙালী যুবক লইয়া দুইটি পদাতিক বাহিনী গঠনের অসংবাদ আমাদের মধ্যে বিতরণ করিল।

কি কারণে “জাতীয় রক্ষাবাহিনী”র শিক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, তৎসম্বন্ধে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী নীরব। সেইজন্য নানা জল্পনা-কল্পনা হইতেছে। কেহ বলিতেছেন যে কেন্দ্রীয় সামরিক বিভাগ কোন বিষয়ে বিশেষ আপত্তি জানাইয়াছে, কেহ বলিতেছেন যে পূর্ব সীমান্তবাসী জনমণ্ডলী এই বিষয়ে উৎসাহ দেখাইতেছে না; সামরিক জীবনের দায়িত্ব ও হাঙ্গামা তাহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। জাতীয় রক্ষাবাহিনীর শিক্ষা বন্ধের সংবাদে এরূপ একটা ইঙ্গিত ছিল বলিয়া মনে হয়। আমরা সর্বদাই বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার পরিকল্পনা সমর্থন করিয়া আসিয়াছি; প্রধানতঃ এই কারণে যে ইংরেজ আমলে বাঙালীকে অসামরিক বলিয়া সামরিক জীবন সম্বন্ধে অপটু করিয়াছে, কোনরূপ বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে এই মনোভাবের পরিবর্তন হইবে না। বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেনাবাহিনীতে ও বিমান-বিভাগে সৈন্যধ্যক্ষ পদে উন্নীত হইয়াছে; নৌবিভাগেও কয়েকজন উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ সৈনিক-রুত্তি যে সব শ্রেণীর অবলম্বন করিবার সম্ভাবনা তাহারা কেহই অগ্রসর হইয়া আসে নাই। সেইজন্য কাশ্মীর রণাঙ্গনে বাঙালী সৈন্যধ্যক্ষ দেখা যায় কিন্তু পদাতিক শ্রেণী অল্পপস্থিত; এই দৃশ্য দেখিয়া অল্পদেশের সাংবাদিক বিশ্বয় প্রকাশ করিয়াছেন।

সেইজন্য আমরা মনে করি শেষ পর্যন্ত বাঙালী পণ্টনের সম্পূর্ণ সংগঠন বিষয়েও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রায় দেড় শত বৎসরের অনভ্যাসজনিত মনোভাব দূর করা কঠিন হইবে। কর্তৃপক্ষ হয়ত ভাবিতেছেন যে সব শ্রেণী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের নানা বিভাগে যোগদান করিয়াছিল, তাদের মধ্য হইতে এই দুই হাজার সংগৃহীত হইতে পারে। একটু অল্পসন্ধান করিলেই জানা যাইবে যে প্রকৃত রণাঙ্গনের মধ্যে খুব কম বাঙালীই উপস্থিত ছিল; বেশীর ভাগ লোক রাস্তাঘাট, বিমানকেন্দ্র তৈয়ার করিতে খাটিয়াছে মজুরের মত; রেলওয়ে বিভাগে বা মোটর

বিভাগে অনেকে যোগদান করিয়াছিল; তাহারা লড়াই করিয়াছে কয় জন বা কয় শত? পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী এই বিষয়ে একটা আদমশুমারী লইলেই প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিতে পারিবেন; ভ্রান্ত ধারণায় চালিত হইয়া আয়োজন-উজোগের ঘটনা করিয়া লোককে বিভ্রান্ত করিবার প্রয়োজন নাই। জাতীয় রক্ষাবাহিনীর সংগঠন ব্যাপারে এই কথাটা পরিষ্কার প্রমাণিত হইয়াছে। কেন এই শিক্ষার ব্যবস্থাটা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল, তাহা যদি আমাদের জানাইয়া দেন তবে লোকের মনে যে আশাভঙ্গের ক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা যায়।

দুই ব্যাটেলিয়ন বাঙালী পণ্টনে রংকট ভর্তি করা কঠিন হইবে না; কিন্তু তাহা বাঙালী হইবে কি না, সেই বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। পশ্চিম বাংলার উত্তরাঞ্চলে “পাহাড়ী” জাতি হইতে এই সংখ্যক লোক অতি সহজে সংগৃহীত হইতে পারে। আমরা চাই বাংলার জনসাধারণ সামরিক জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার শিক্ষাপ্রাপ্ত হউক; নিয়মামুখবৃত্তি, কষ্টসহিষ্ণুতা ও দেশের জয় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিবার যোগ্যতা ও সাহস অর্জন করুক। “জাতীয় রক্ষাবাহিনী” সংগঠন-ব্যবস্থায় সেইজন্য উৎকৃষ্ট হইয়া বিধান-মন্ত্রিমণ্ডলীকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়াছিলাম। সেই ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়া বাঙালী ব্যাটেলিয়ন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইতেছে “মনের ভাল” বলিয়া তাহা আমরা গ্রহণ করিব। কিন্তু যত দিন বাঙালী জনসাধারণের কপালে “অসামরিক” জাতি বলিয়া যে কলঙ্কের ছাপ দাগিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা মুছিয়া না যায়, তত দিন আমরা বাংলার কোন মন্ত্রিমণ্ডলীকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে দিব না। কলঙ্ক মোচন যে সম্ভব তাহা পূর্ববন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে; মুসলিম লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী “আনহার বাহিনী” গঠন করিয়া এবং তাহাদের সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া একটা কাজের মত কাজ করিয়াছেন। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী এই বিষয়ে গড়িমসি করিয়া দিন গুণিতেছেন; দলাদলিতে কাল কটাইতেছেন। সামরিক শিক্ষা এই দলাদলির উদ্বেগ্বাণ উচিত, এবং দেশের লোককে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই বিষয়ে অবহিত হইবার শিক্ষা দেওয়া উচিত। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী এই বিষয়ে যে তৎপর হইয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। তাহাদের একটা প্রচার-বিভাগ আছে; তাহা যে এই বিষয়ে সজাগ তাহার লক্ষণ আমাদের চোখে পড়ে না। দেড় শত বৎসরের নিশ্চেষ্টতা এই সরকারের সকল বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে বলিয়া মনে হয়। একটা বিপ্লব না আসিলে তাহা দূর হইবে না।

অবশ্য এতদিনের বাধা যে ক্রীড়ার বন্ধন ছিল তাহা দূর করিয়া বাঙালীকে সচেতন ও সচেষ্ট করা কঠিন ব্যাপার

তাহা আমরা জানি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আছে যে সঠিক পন্থা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে সুফল পাওয়া যাইবে। বাঙালী কৃষক, মৎস্যজীবী ও ঐক্লপ শ্রেণীর মধ্যে বলিষ্ঠ সৈনিক সংগ্রহ করা মোটেই অসম্ভব নহে।

### ভারত-রাষ্ট্রের মুসলমান

হায়দরাবাদ রাজ্যের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত অর্থনীতিক সংগ্রাম চলিতেছে; নিজাম সরকার কর্তৃক পুষ্ট “রজাকর” দল রাজ্যের হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে। ভারত-রাষ্ট্রের পরিচালকবর্গ এই দৃষ্ট দেখিয়াও এখনও কোন চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিতেছেন না। তাহাদের অক্ষমতার কারণ কি তৎসম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া তাঁহারা কিছু বলিতে চাহিতেছেন না যদিও দাক্ষিণাত্যের প্রধান সেনাপতি রাজেন্দ্র সিংহী আমাদের অভয় বাণী শুনাইতেছেন। এ বিষয়ে আমরা যাহা বুঝি তাহাতে মনে হয় ভারত-সরকার যে কয়েকটি কারণে এখনও ইতস্তত করিতেছেন তাহার তাহার মধ্যে প্রধান কথা সংযুক্ত জাতিসংঘের কাম্বীর কমিশনের উপস্থিতি। স্থিতীয় বিষয়টি এই যে, ভারত-সরকার এখনও নিজামের পক্ষে বিদেহী রাষ্ট্রের সহায়তা ও সহানুভূতির পরিমাণ বিচার করিতে পারিতেছেন না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভারত-রাষ্ট্রে এখনও সাড়ে তিন চারি কোটি মুসলমান রহিয়া গিয়াছেন। হায়দরাবাদ সমস্তার সমাধানকল্পে কি ইহাদের মনোভাব হিসাবের মধ্যে ধরা হইতেছে এবং সেইজন্মই ভারত-রাষ্ট্রের নীতি সম্বন্ধে একটা দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছে? এই মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়া দিল্লীর “হিন্দুস্থান টাইমস্” দৈনিক পত্রিকায় একটি পত্র গত মে মাসের ২৭ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রটি “জামাল-উদ্দিন” এই নামে লিখিত হইয়াছিল। পত্রলেখকের বিশ্লেষণ ও তার রাজনীতিক গুরুত্ব এত অধিক যে আমরা তার মূল অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

এই কঠোর সত্যটি এখনও স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে যে, ভারতের মুসলমানেরা কোনকালেই ভারতীয়দের মত চিন্তা করিতে, কার্য্য করিতে অথবা নিজেকে সম্পূর্ণ ভারতীয় বলিয়া উপলব্ধি করিতে শিখে নাই। ইহাও স্মরণ রাখা দরকার যে, মুসলমানেরা সমগ্র জগতের মুসলমানকেই ভাই বলিয়া মনে করে। প্যান-ইসলামিজম একটি কাল্পনিক বস্তু নহে। পাকিস্তান জন্মগ্রহণ করিয়া সমগ্র মুসলমান জগতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। সকল মুসলমানই মুসলিম রাষ্ট্র চাহে। জগতে একই সম্প্রদায় (মুসলিম সম্প্রদায়), একই ধর্মশাস্ত্র (মুসলিম শাস্ত্র) এবং একই রাষ্ট্র (মুসলিম রাষ্ট্র) স্থায়ী

হউক, ইহাই মুসলমানগণের কাম্য। সুতরাং যে সকল মুসলমান ভারতরাষ্ট্রের প্রতি আহুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতেছে, হয় তাহারা নিজেকে প্রবঞ্চিত করিতেছে, নচেৎ পরম উদার ভারত গবর্ণমেন্টকে প্রতারিত করিতেছে। মুসলমানেরা মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখিতে অসমর্থ; কেবল মুসলমান কি অ-মুসলমানরূপে দেখিতে পারে। অ-মুসলমানকে মুসলমানের সমান অধিকারপ্রাপ্ত বলিয়া স্বীকার করিতে সে অসম্মত নহে। মুসলমানের দৃঢ়মূল সাম্প্রদায়িকতা যে কোন অ-মুসলমান রাষ্ট্রে বোরতর সমস্তা সৃষ্টি না করিয়া পারে না। আমাদের দেশে এক দিকে পণ্ডিত জবাহরলাল বিশ্বমানবতার ভিত্তিতে সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখিতেছেন; অপরদিকে মুসলমানেরা কেবল মুসলিম জাত্বের কথা চিন্তা করিতেছে।

“হিন্দুস্থান টাইমস্” পত্রিকা এই পত্র প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, বিশেষতঃ “কংগ্রেসপন্থী রাষ্ট্রনায়কগণকে” প্রশ্ন করিয়াছেন—“এ সমস্তার সমাধান কোথায় মিলিবে?” এই বিশ্লেষণ যদি সত্য হয়, এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে মন ও বুদ্ধি আমাদের সাধ্য দেয় না, তবে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর প্রচেষ্টা সহজ হইবে না। তিনি চাহিতেছেন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে; কিন্তু তাহা তিন-চারি কোটি নাগরিকের জ্ঞানবিশ্বাসের বিরোধী; এবং এই বিপুল জনসমষ্টির প্রকৃত মনোভাবের বিরুদ্ধে কোন রাষ্ট্রীয় বিধান চাপাইয়া দেওয়া সম্ভব কি? নূতন রাষ্ট্রের গঠন সম্বন্ধে নানা পরিকল্পনা চলিতেছে; এই পরিকল্পনা নানাভাবে আমাদের চিরাচরিত চিন্তা ও কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিবে; প্রায় প্রতি পদে তাহা আমাদের নানা সংস্কারের উপর আঘাত হানিবে। গত এক শত বৎসরে হিন্দুসমাজ নানাভাবে বর্তমান যুগ ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। ভারতীয় মুসলমান সমাজ তাহা পারে নাই বলিয়াই “পাকিস্তানের” জন্ম আন্দোলন করিয়াছে, এবং প্রতিবেশী সমাজের বিরুদ্ধে আক্রোশ উদ্দীপিত করিয়া আমাদের দেশের জন-মনকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই অসুস্থ মনোভাবের একটা বহিঃপ্রকাশ নিজাম সরকারের কার্য্য-কলাপের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতরাষ্ট্রের তিন-চারি কোটি মুসলমান বর্তমানে তুচ্ছভাবে অবলম্বন করিয়া আছে। হায়দরাবাদ রাজ্যের বিরুদ্ধে যদি কখনও কোন চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, তবে তাহারা কি করিবেন, তৎসম্বন্ধে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন লোকের মনকে ভারাক্রান্ত করিতেছে।

ভারতীয় রাজ্যসমূহের নূতন সংগঠন

ইংরেজ জামলে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের সঙ্গে

তাহাদের প্রতিবেশী জনপদের কোন রাজ্যিক যোগ ছিল না। ইংরেজের বিধানে দেশীয় রাজ্যসমূহ অনেকটা যাদুঘরের প্রদর্শনীর মত পুথক করিয়া রাখা হইয়াছিল। ১৯৪৭ সনের এই জুলাই হইতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অধীনে যে দেশীয় রাজ্য বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার একটা কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে দেখিতে পাই ৩৩২টি দেশীয় রাজ্যের একটি নতুন সংগঠন চেষ্টা। ২১৯টি রাজ্যকে প্রতিবেশী প্রদেশসমূহের সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে; ৩১৩টি রাজ্য মিলাইয়া নতুন প্রদেশ গঠন করা হইয়াছে অথবা নতুন “রাজস্থান” সৃষ্টি করা হইয়াছে। “হিমাচল” প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ২১টি ক্ষুদ্র রাজ্য ভারত-রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন রাখা হইয়াছে, ভারতবর্ষের পশ্চিম সমুদ্রকূলে কচ্ছ-রাজ্যও সেই ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে; এই রাজ্যটি সিন্ধুদেশের প্রতিবেশী বলিয়াই ভারত-রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ২৯১টি রাজ্য মিলাইয়া যে ৬টি “রাজস্থান” সজ্জের পত্তন করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ২১৭টি রাজ্যকে “সৌরাষ্ট্র” সজ্জের মধ্যে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে; “মণ্ড” সজ্জের ভাগে পড়িয়াছে ৪টি রাজ্য; “বিন্ধ্য প্রদেশ” গঠিত হইয়াছে ৩৫টি রাজ্যের সমবায়ে; “রাজস্থানে”—১০টি, “মধ্য-ভারতে”—২০টি এবং “পাতিয়ালা ও পূর্ব-পঞ্জাব” ৮টি রাজ্য পড়িয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে সান্দুর রাজ্য, যুক্তপ্রদেশে বারানসী ও রামপুর রাজ্য, পূর্ব-ভারতে ত্রিপুরা, কুচবিহার, ১৯টি খাসিয়া রাজ্য ও মণিপুর সম্বন্ধে এখনও কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

এই বিধান অনুসারে রাজ্যের নৃপতিবৃন্দের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রহিল না। যে সব রাজ্যকে প্রতিবেশী প্রদেশসমূহের সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের রাজারা একটা “ভাতা” পাইয়া পেনশন ভোগ করিতেছেন বলিলেই চলে; তাহাদের আত্মীয়-কুটুম্বদেরও সেই অবস্থা। এই “বেকার” রাজাদের ভারত-রাষ্ট্রের সেবায় নিযুক্ত করা যাইবে কিনা বা যাইতে পারে কিনা, তৎসম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। বড় বড় রাজ্যের রাজাদের, যেমন—জামনগর, গোয়ালিয়র, উদয়পুর, রেওয়া, পাতিয়ালা, যোধপুর, ভরতপুর, ইন্দোর,—তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও রাজপ্রমুখ ও উপ-রাজপ্রমুখ প্রভৃতি পদ পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে হইয়াছে। এই-সব রাজ্যসমূহে, দায়িত্বপূর্ণ শাসনব্যবস্থা যখন প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন তাহাদের ক্ষমতা বা অধিকার ভারত-রাষ্ট্রের প্রদেশ-পালের (Governor) ক্ষমতা ও অধিকার হইতে উচ্চ হইবার কথা নয়।

এই বিবরণী হইতে আমরা যে নতুন সংগঠনের পরিচয় পাই, তাহাতে মনে হয় এই নৃপতিবৃন্দ বর্তমান যুগের কর্তব্য

ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন; রাজ্য পরিচালনে তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতার দিন ফুরাইয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছেন; অনেকেই স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের সংগঠনে সাহায্য করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়াও নিজেদের স্বার্থ বলি দিয়াছেন। হায়দরাবাদ রাজ্য কিন্তু ভিন্ন পথে চলিতেছে। ইচ্ছার হটক, অনিচ্ছার হটক, কাশ্মীর ও জুনাগড় সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ সংসদের দরবারে হাজির হইয়াছে। এই তিনটি রাজ্যের ভবিষ্যৎ লইয়া ভারত-রাষ্ট্রের পরিচালক-বৃন্দের হৃদয়স্তর অস্থির নাই। ইহাদের ভাগ্য লইয়া কূটনীতির খেলা চলিতেছে। আমেরিকা ও বিলাত “পাকিস্থানের” পিছনে থাকিয়া দুষ্ট চালিতেছে। এই বিষয়ে আমাদের রাষ্ট্র-পরিচালকদের পিছনে জনমণ্ডলীর অকুণ্ঠ সহযোগ আছে। হায়দরাবাদ, কাশ্মীর প্রভৃতি ছাড়া, রাজপুতানা ও উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহেও কিছু কিছু গুণগোল চলিতেছে।

উড়িষ্যা প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে উড়িষ্যার প্রদেশপাল জনাব আসফ আলী বক্তৃতা প্রসঙ্গে তথাকার নৃপতিদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন, তাহারা যেন কোনোপ্রকার বেআইনী কার্যকলাপে জড়িত না হন। প্রাদেশিকতার নিন্দা করিয়া তিনি বলেন, আমাদের উদার ও সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন।

তিনি বলেন, “আপনারা জানেন, কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারত গবর্নমেন্টকে অধিকতর মনোযোগ দিতে হইয়াছে এবং দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদের ব্যাপারেও তাহাদিগকে প্রথম দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে। আমি আপনাদিগকে এই আশ্বাস দিতেছি যে, ভারত গবর্নমেন্ট প্রত্যেক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থার জ্ঞ প্রস্তুত আছেন।”

গবর্নর বলেন, স্মৃতির বিষয় এই যে, উড়িষ্যা এই সকল অঞ্চল হইতে দূরে আছে। তবুও পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলির পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের সজাগ থাকা দরকার।

উড়িষ্যার রাজ্যগুলির সংহতির কথা উল্লেখ করিয়া জনাব আসফ আলী বলেন, চুক্তি শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ইহারা পূর্বেরকার ব্যবস্থায় যে সকল ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা পাইতেন সেগুলি পাইবেন না এই মনে করিয়া ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। তাহাদের কার্যকলাপ সমূলে বিনষ্ট করিবার জ্ঞ অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহারা এখনও বাস্তব অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন নাই, তাহারা যাহাতে বিপথে চালিত না হন তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়।

জনাব আসফ আলী উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহের মূল্যবান খনিজ সম্পদের উল্লেখ করিয়া বলেন, এতদঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারণের উন্নতিকল্পে এই সমস্ত সম্পদ নিয়োজিত হইবে।

তিনি নৃপতিবৃন্দকে সহযোগিতা করিতে আহ্বান করেন।



তিনি বলেন, নৃপতিদিগকে বিশেষ করিয়া শিল্পোন্নতিতে সহযোগিতা করিতে হইবে। ইহার কলে শুধু যে ভবিষ্যৎ সমাজের কাঠামো রচিত হইবে তাহা নহে; নৃপতিবৃন্দ দেশবাসীর সদিচ্ছাও লাভ করিতে পারিবেন। আমি উড়িষ্যার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বাস্তব রূপ যেন চক্ষের সমক্ষে দেখিতে পাইতেছি। জীবনধারণের মানের উন্নতিকল্পে নৃপতিবৃন্দ প্রজাদের সহযোগিতা করিবেন বলিয়া আমি আশা করি। তবে এই সতর্কবাণী আমি উচ্চারণ করিতেছি যে, যাহারা বে-আইনী কার্যকলাপে জড়িত হইবেন তাহাদের পরিণতি ভয়াবহ হইবে।

অতঃপর তিনি বলেন, চরম প্রাদেশিকতা আজ সর্বত্র লক্ষিত হইতেছে, ইহা সত্যই হঃখজনক ব্যাপার। বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠজাতি হিসাবে ভারতকে গড়িয়া তুলিবার জন্ত আমরা যে ভিত্তি স্থাপন করিতেছি তাহা দ্ব্যতসহ ও শক্তিশালী করিতে হইবে—ইহার জন্ত প্রয়োজন উদার, বলিষ্ঠ সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গী। সংলগ্ন প্রদেশসমূহ নিজেদের সীমান্ত অঞ্চল বিস্তার সাধনের জন্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। তাহা লইয়া পরস্পরের মধ্যে বিরোধিতা চলিতেছে। আমাদের প্রদেশে সেরাইকেলা ও খরসোয়ান রাজ্য লইয়া অসংখ্য অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, আমি ইহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছি। প্রদেশগুলির সীমা পুনর্নির্ধারণের চূড়ান্ত সময় এখনও আসে নাই। আমাদের প্রধানতম কর্তব্য হইতেছে শাসনতন্ত্রের ঐক্য প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র শান্তিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করা। তখন আমরা সীমানা পুনর্নির্ধারণের ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পুনর্বর্গীকরণের অনেক সময় পাইব। বর্তমানে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দিকেই সর্বাধিক মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য।

### সিন্ধু দেশের হিন্দু-শিখ

সিন্ধু দেশে প্রায় ১৪ লক্ষ হিন্দু-শিখ ছিলেন; পাকিস্থানীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া প্রায় ১২ লক্ষ তাহাদের জমিজমি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। পাকিস্থানীদের আকাজক্ষা পূর্ণ হইয়াছে, বিধর্মীর মুখ আর তাহাদের প্রতিদিন দেখিতে হইবে না। এই বিরাট জনসমষ্টি ভারতরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশে বোম্বাই, কাশ্মীর, কচ্ছ, ও রাজপুতানায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, নতুন করিয়া জীবন সংগঠন করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এই কাজে তাহাদের সাফল্য অর্জন করিতে হইবে। নানা প্রকার কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়া তাহারা এই আয়োজন সার্থক করিতে দৃঢ়পঙ্কজ। আচার্য্য কৃপালনীর একটি বিবৃতির মধ্যে এইরূপ একটি প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। কচ্ছ রাজ্যে কান্দলা (Kandla) নামক একটি স্থান সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। কচ্ছের মহারাজের নিকট হইতে এই ৪৫,০০০ হাজার বিঘা জমি দানস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু

পুনর্বর্গসতি সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে; সমবায় প্রণালীতে এই জমি ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে, এবং সিন্ধুর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ছিন্নভিন্ন না হইয়া এই স্থানকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্নেন্ট কচ্ছ রাজ্য পরিচালনার ভার নিজ হস্তে লইয়াছেন এবং কান্দলাকে একটি বন্দরে পরিণত করিবার দায়িত্ব এখন তাহাদের। কালে এই বন্দর করাচি বন্দরের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে পরিগণিত হইবে, এরূপ কল্পনা উদ্ভট নয়। এই বন্দরের কল্যাণে সিন্ধুর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সহজাত কৌশল ও ব্যবসায়-বুদ্ধি দ্বারা নুতন ভাবে নিজেদের লুপ্তিত সম্পদ পুনর্গঠন করিতে পারিবেন। কান্দলার উদাহরণ অত্যন্ত প্রদেশের, বাস্তব-ত্যাগীদের নিকট পথপ্রদর্শকরূপে অমুপ্রাণনা দিবে।

### রাষ্ট্রপাল মাউন্টব্যাটেন—রাষ্ট্রপাল

#### রাজাগোপালাচারী

গত ৭ই আষাঢ় রাষ্ট্রপাল মাউন্টব্যাটেন চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর হাতে কর্তব্যভার অর্পণ করিয়া ভারতরাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ১৯০ বৎসরের ব্রিটিশ আধিপত্য শেষ হইল। এই আধিপত্যের ফলাফল লইয়া আলোচনা করিয়া লাট মাউন্টব্যাটেনকে দায়ী করিবার প্রয়োজন নাই। নিয়ম-তান্ত্রিক শাসনকর্তা বলিয়া ভারতরাষ্ট্রের মন্ত্রিমণ্ডলী তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট লাট মাউন্টব্যাটেন নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হইলেন। তাহার পূর্বে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন হইতে ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত, ২ মাস ১১ দিন যে কাজ বা অকাজ করিয়াছেন, তাহার জন্ত দায়ী তিনি। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর মন্ত্রিমণ্ডলী এই সময়ের কার্যকলাপের জন্ত কোন দায়িত্ব স্বীকার করিবেন কিনা তাহা আমরা জানি না। এই সময়ের মধ্যেই পঞ্জাবের খুনখুনি আরম্ভ হয়। সেই জন্ত “পাকিস্থানের” অর্থমন্ত্রী জনাব গোলাম মহম্মদ লাট মাউন্টব্যাটেনকে দায়ী করিয়াছেন, “পাকিস্থানের” ভূতপূর্ব পুনর্বর্গসতি মন্ত্রী জনাব গজনফর আলী খাঁ বলিতেছেন যে লাট মাউন্টব্যাটেন তাহাকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে যদি খুনখুনি আরম্ভ হয়, তবে নিষ্ঠুরভাবে তাহা দমন করা যাইবে। সে চেষ্টা হইয়াছিল কিনা তাহা আমরা এখন পর্যন্ত জানি না। তবে পশ্চিম-পঞ্জাব হইতে হিন্দু ও শিখকে বাস্তবত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছিল তাহাদের মুসলমান প্রতিবেশীর অত্যাচারে এবং পূর্ব-পঞ্জাব, পাতিয়ালা, আলোয়ার ও ভরতপুর রাজ্য হইতে সম-সংখ্যক মুসলমানকে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল তাহাদের হিন্দু ও শিখ প্রতিবেশীর প্রতিশোধের অত্যাচারে। প্রতিবেশীর মধ্যে এই হানাহানির জন্ত ব্রিটিশ কূটনীতি দায়ী, তাহার জন্ত ব্যক্তিগতভাবে লাট

মাউন্টব্যাটেনের ফোন দায় আছে কিনা ইতিহাস তাহা হির করিবে। সেই ইতিহাস আমরা জানি না।

এর বেশী তাহার কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু বলিবার সময় আসে নাই। তাহার হাতে তিনি কার্যভার দিয়া গেলেন, তাহার সম্বন্ধে এই কথা জানি যে শান্তির জন্ত ভারত বিভাগ তিনি পছন্দ করিয়াছেন। ১৯৪২ সাল হইতে মুসলিম লীগের “পাকিস্তান” দাবী মানিয়া লইবার জন্ত তিনি চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখে মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না যে খণ্ড “পাকিস্তান” স্বীকার করিয়া লইলেন তাহা যদি ৩৪ বৎসর পূর্বে করিতেন তবে ব্রিটশ্ৰাজ্য গোপালাচারীর রাজনীতিক কৌশলের সার্থকতা হইত। আজ দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষে যে রক্ত-গঙ্গা দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে তাহার মধ্যে কোন সেতু নির্মাণ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য নূতন রাষ্ট্রপাল তাহা করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। আর করিবেন ব্রিটিশ রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর (British Commonwealth) সঙ্গে সম্বন্ধ অটুট রাখিতে। হুনিয়ার কূটনীতির ক্ষেত্রে যে চৈলাঠেলি চলিয়াছে, এই অনিশ্চয়তার মধ্যে রাষ্ট্রপাল রাজাগোপালাচারী ব্রিটেনের সামরিক আয়োজন-উত্তোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিবেন না। এই সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কোন কথা না বলিলেও আমরা জানি তাহার মনোভাব কি। এই মনোভাবের সঙ্গে দেশের রাজনীতিক সাধারণ কন্মিষন্দের বিরোধ আছে, কংগ্রেসের নানা ঘোষণা তাহার বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু এই বিরোধের সমাধান হইবে যেমন হইয়াছে “পাকিস্তানী” সমস্যার। ব্রিটশ্ৰাজ্য গোপালাচারী এই বিশ্বাস করেন যে অবস্থার তাড়নায়, হুনিয়ার রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রের নানা জটিলতার প্রয়োজনে একটা গোঁজামিলের ব্যবস্থা হইবে। আমাদের নূতন রাষ্ট্রপাল বস্তুতাত্ত্বিক, ভাবের উদানায় তিনি চলেন না; আপদধর্মের নীতি অনুসারে তিনি কর্তব্য পালন করেন। এই কথাটা আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

### বার্লিন লইয়া ঝগড়া

“ওয়ার্ল্ড অভার প্রেস” (Worldover Press) মার্কিন মূল্যের একটি সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান; ইহা পৃথিবীর নানা স্থানের সংবাদে উপর প্রবন্ধ প্রকাশ করে—এই সংবাদে অস্তিত্বিত ভাব ও কর্ম-দ্বারা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্ত। এইরূপ একটি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে (ভাদ্র-আশ্বিন) ইউরোপের বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিবে; তখন জার্মানীর পশ্চিম অংশে ত্রিশক্তি—যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স—একটি রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবে, হয়ত বা তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবে। সোভিয়েট ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছে; তখন হয়ত তার প্রতিষ্ঠায় বাধা দিতে গিয়া

এমন কোন কার্য করিয়া বসিবে যাহা পরিণতি লাভ করিবে যুদ্ধে। বার্লিন লইয়া যে ঝগড়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়।

বর্তমানে বার্লিন অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে; ত্রিশক্তি তাহাদের এলাকায় যাইতে পারিতেছে বিমানের সাহায্যে; প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি বিমানপথে পৌছাইয়া দেওয়া হইতেছে; কয়লা পর্যন্ত এই ভাবে পাঠানো হইতেছে। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এই বিমানপথ রুদ্ধ করিবার ভয় দেখাইতেছে; তাহারা যদুচ্চ ভাবে সোভিয়েট বিমান বার্লিনের উপরের আকাশপথে চলাইয়া যাইবে; যদি তার ফলে ত্রিশক্তির বিমান জখম হয়, তবে তার ফলাফল সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব তারা এহণ করিবে না। এইরূপ এক তরফা ব্যবস্থা ত্রিশক্তি মানিয়া লইলে বার্লিন হইতে তাহাদের বাহির হইয়া আসিতে হইবে, নতুবা সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট নতি স্বীকার করিতে হইবে। যুদ্ধের হার-জিত ছাড়া, এই অবস্থা কল্পনা করা কঠিন। “ওয়ার্ল্ড অভার প্রেসের” পর্যবেক্ষক যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল বলিয়া মনে করেন না।

তার সপক্ষে একটা যুক্তি তিনি দিতেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের আশ্রিত রাষ্ট্রসমূহ এই চীনা-ইঁচড়ায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে; তারা মনে করে না যে মার্সাল-পরিকল্পনা অনুযায়ী সাহায্য-প্রত্যাখ্যান করিয়া তাদের উপকার করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েট ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীতে (Polit Buro) মলোটিভ নীতির বিরুদ্ধে মনোভাব দেখা দিয়াছে; এখনও তাহা দানা বাঁধে নাই। কিন্তু বার্লিনের ঝগড়া না মিটিলে ও যুদ্ধ ছাড়া মীমাংসার কোন উপায় দেখাইয়া দিতে না পারিলে, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বেশী দিন তাহাদের দেশের লোককে ও তাহাদের আশ্রিত রাষ্ট্রসমূহের লোককে অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখিতে পারিবেন না।

বার্লিনে যেমন ভিয়েনায় তেমনি ত্রিশক্তিকে ঝাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিবার জন্ত চৈলাঠেলি চলিতেছে। তাহারা কিন্তু খুঁট গাড়িয়া বসিয়া আছে; যুদ্ধে না হারিলে নড়িবে বলিয়া মনে হয় না। ইতিমধ্যে যুগ্মশক্তির শাসকশ্রেণীর সঙ্গে বিবাদ বাধিয়া গিয়াছে। মার্সাল টোটোর পিছনে দেশের কম্যুনিষ্ট দল পর্যন্ত সার বাধিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্তের দেশসমূহে যে কম্যুনিষ্ট সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার মধ্যে একটা ফাটল দেখা দিয়াছে। এই ফাটল একটা ছিদ্রমাত্র হইতে পারে, কিন্তু ছিদ্র দিয়াই বতীর জলের তোড় পথ করিয়া বাঁধ ভাঙিয়া দেয়। এরূপ অবস্থা হইলে আমরা বিস্মিত হইব না। ইউরোপের ভাগ্য লইয়া যে খেলা চলিতেছে, তাহার শেষ কখন ও কোথায় হইবে তাহা বিশেষজ্ঞগণও বলিতে পারিতেছেন না। বার্লিন লইয়া ঝগড়া এমন এক মনোভাবের

সাক্ষ্য দিতেছে যাহা শান্তির পথে বিশেষ বিঘ্নস্বরূপ। এর বেশী কেহ কিছু দেখিতে পাইতেছেন না।

### প্যালেস্টাইন

প্রায় চারি সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির পর আবার প্যালেস্টাইনে রণদামামা বাজিয়া উঠিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদের প্রতিনিধি কাউন্ট বার্গাদেতো বিফল হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন—ইহুদি ও আরবের পরস্পরবিরোধী আকাজক্ষার মধ্যে সমঝয় বিধান সম্ভব হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নেতৃ-বর্গের যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের মতের ও পথের মিল নাই বলিয়াই ইহুদি ও আরব এই ভাবে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত নস্যাৎ করিবার পক্ষে সাহস পাইল। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন প্যালেস্টাইন বিভাগের পক্ষপাতী ছিল; ১৯৪৭ সালের নবেম্বর মাসে এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়—প্যালেস্টাইনে দুইটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত তৎ-সম্বন্ধে তাঁহাদের সম্মতি ছিল; ব্রিটেন তখনও প্যালেস্টাইনের “অছি” ছিল; তাঁহার পক্ষে ঘোষণা করা হইল যে ইহুদি ও আরবে মিলিয়া যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, ব্রিটেন তাহা স্বীকার করিয়া লইবে। আপাতদৃষ্টিতে এই মনোভাব সরল বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের ব্রিটিশ কূটনীতির সহিত সামান্য পরিচয় আছে, তাহারা ইহাতে বিভ্রান্ত হইতে পারে না। ব্রিটিশ স্বার্থের প্রয়োজনে প্যালেস্টাইনে ইহুদির জন্ত একটা আন্তানা করিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল ১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে; ব্রিটিশ স্বার্থের প্রয়োজনে আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আরবদের তোয়াজ্য করিতে হইল। এই যুদ্ধের সময়েই ক্লেবজালেমের মুফতি আল-হুশেনী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেন; ইরাকের রশিদি সশস্ত্র বিদ্রোহের চেষ্টা করেন; মিশরের শাসক সম্প্রদায় কেবলমাত্র ভদ্রতা রক্ষা করিয়া প্রকাশ্যে কোন অনিষ্ট করেন নাই। কিন্তু ইহাদের মন-স্তম্ভিত জন্ত এমন কোন অত্যাচার কাজ নাই, যাহা ইহুদির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ রাজনীতিকরা করেন নাই।

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইহুদিরা পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের লোকবল ১ লক্ষ হইতে ৬ লক্ষে পরিণত করিয়াছে; বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের সাহায্যে প্যালেস্টাইনে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিয়াছে। এই উন্নতি দেখিয়াও আরবদের মোহ ভঙ্গ হয় নাই। ব্রিটিশ শাসন তাঁহাদের মধ্যযুগীয় মনোভাব পরিবর্তন করিতে পারে নাই। কিন্তু ব্রিটেন তাঁহার নিজের স্বার্থের জন্য আরব নৃপতি-বৃন্দের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। এ কথা আজ অবদিত নাই যে অধুনা-প্রসিদ্ধ “আরব লীগের” জন্ম হইয়াছিল ব্রিটিশ কূটনীতিকবর্গের চক্রান্তে। মিঃ বার্ট কেসি ১৯৪২-৪৩ সনে আরব দেশসমূহে ব্রিটিশ দূত ও মন্ত্রীরূপে বিরাজ করিতেছিলেন; ১৯৪৪-৪৬ সনে তিনি বাংলাদেশের

গবর্ণর হইয়া আসেন। তিনি ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল “আরব-লীগের” জন্মদাতা। এই ইতিহাস যাহারা জানেন, ব্রিটেনের কূটনীতিক চাল বুঝিতে তাঁহাদের কোন কষ্ট হয় না। “অছি-গিরির” দায়িত্ব এড়াইয়া আরব রাষ্ট্রপুঞ্জের সাহায্যে ব্রিটেন নিজের ক্ষমতা ও স্বার্থ এই অঞ্চলে অটুট রাখিতে চায়। এই বিষয়ে আমেরিকার খুজিপতিদের স্বার্থ জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য আমেরিকার পক্ষ হইতে প্যালেস্টাইন বিভাগের সমর্থন প্রত্যাখ্যার করা হইয়াছে, যদিও ঘটা করিয়া ইসরাইল রাষ্ট্রকে এক প্রকার স্বীকার করা লওয়া হইয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এই রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়াছে। কিন্তু গভীর জলের সব মাছ; কত খেলাই যে তাহারা খেলিতেছে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ইহুদি-আরবের যুদ্ধ ঘনীভূত হইয়া উঠিলে তাহাদের স্ব-মুক্তি প্রকট হইয়া উঠিবে।

### সত্যানন্দ বসু

সত্যানন্দ বসুর দেহত্যাগে স্বদেশী যুগের একজন নীরব, ও নিরলস কর্মী আমরা হারাইলাম। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পুরোভাগে আমরা দেখিয়াছি সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে। এই আন্দোলনের আয়োজন-উদ্যোগে বহুবাজারের ভারত-সভা সর্বপ্রথমে অগ্রণী হইয়াছিল; এবং এই সভার একজন কর্ণধার ছিলেন সত্যানন্দ বসু। জীবিকা উপার্জনের জন্ত তাঁহাকে কোন চাকুরী করিতে হয় নাই, তিনি সেইজন্ত আত্মবিনাশ নানা প্রকার লোকসেবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন। দেশের শিল্পবাণিজ্যের নূতন শিক্ষা ও ব্যবস্থার আয়োজনে তাঁহার আগ্রহ ছিল বলিয়াই তিনি বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (Council of National Education) প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। এই পরিষদের কাজ যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া আছে। সত্যানন্দ বসু বহু বৎসর এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকমণ্ডলীর একজন ছিলেন বলিয়া মনে হয়। দেশের অর্থনৈতিক নানা সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত সুরেন্দ্রনাথ পরিচালিত “বেঙ্গলী” পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্থান পাইত, এবং বিগত বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেও তাঁহাকে এই বিষয়ে বিশেষ চিন্তাগ্রস্ত দেখিয়াছি। স্বদেশী যুগের স্মৃতি-কথা লিপিবদ্ধ করিবার তাঁহার কল্পনা ছিল; কিন্তু তৎসম্বন্ধে কিছু করিয়া যাইতে পারিয়াছেন কি না জানি না। মৌবনে ও প্রোচে তিনি রাজনৈতিক ভাবে ও কর্মে ছিলেন নরমপন্থী (Moderate)। ১৯১৭ সাল হইতে তাঁহাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। গান্ধীজী প্রবর্তিত অনেক কর্মপন্থায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, কারণ ধর্মসাধ্যক কাণ্ডাবলী তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। পূর্বযুগের একজন বাঙালী প্রধানের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

## কাল-আম

ত্রিকালিকারজন কালুনগো

[ তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধের লুপ্ত স্মৃতি ]

কাল-আম একটি আমগাছ। পাণিপত শহর হইতে কয়েক মাইল দূরে ধূ-ধূ মাঠে পথহারা পথিক কিংবা রৌদ্র-ক্লিষ্ট কৃষক দুই শত বৎসর পূর্বের মধ্যাহ্নে ইহার ছায়ায় বিশ্রাম করিত। তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধের পরে এক বিবাদময় স্মৃতি বৃক্ষে লইয়া এই “কাল-আম” কখন মরিয়া গিয়াছে কেহ জানে না। এই আমগাছের তলায় মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত কালো সন্ধ্যার অঁধারে বিলীন হইয়াছিল। এইজন্য উহা “কাল-আম” বা অভিশপ্ত আশ্রয়স্থল দুর্নাম বহন করিয়া জনশ্রুতিতে পরিণত হইয়াছে। চতুর্দিকস্থ জনপদের গ্রামবৃদ্ধগণ পুরুষাত্মক্রে এই জনশ্রুতি শুনাইয়া আসিতেছে, গ্রাম্য যোগী বা চারণ যুদ্ধগীতিকা গাহিয়া ইতিহাসকে সজীব রাখিয়াছে।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি সূর্য্যাস্তের সময় তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধের বহুবিস্তৃত রণক্ষেত্রে শ্মশানের নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিয়াছিল। এই সময় রাশীকৃত শবদেহের মধ্যে ভূপতিত এক সৈনিক পুরুষ সংজ্ঞালাভ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং হস্তস্থিত ভল্লের সাহায্যে দেহভার রক্ষা করিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে স্বপ্নাবিষ্টের গ্রায় চলিতে লাগিলেন, কেন কিংবা কোথায় চলিয়াছেন তিনি জানেন না। এইভাবে তিনি অর্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া জনশূন্য মাঠে একটি আমগাছের তলায় বসিয়া পড়িলেন। যোদ্ধার বয়স তখনও ত্রিশ পার হয় নাই; তাহার সবল দেহসৌষ্ঠবের মধ্যে যেন সৌন্দর্য্য ও বীর্ষের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। পরিধানে তাঁহার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, সর্দার বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত। যুবকের রাজশ্রীমণ্ডিত প্রশস্ত ললাটে ব্রাহ্মণ্যের পরিচায়ক তিলক, গলায় মুক্তার মালা, কানে হীরকের ছল, মস্তকে রত্নখচিত উকীষ, অবসর চক্ষুদ্বয় ভস্মাচ্ছাদিত বহির মত স্তিমিতলীপ্ত। ঐ দিন সূর্য্যোদয় হইতেই তিনি অমিতবিক্রমে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহাকে পিঠে লইয়া পর পর তিনটি ঘোড়া মরিয়াছে। হয় যুদ্ধজয় কিংবা মৃত্যু—ইহাই ছিল তাঁহার কাম্য; কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁহার এ দুটি আকাঙ্ক্ষার কোনটিই চরিতার্থ হইল না। বসিয়া বসিয়া তিনি আপন অদৃষ্টের কথাই ভাবিতেছিলেন এমন সময় পাঁচ জন দুরাগী পাঠান অশ্বারোহী আমিমলোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায় শিকার খুঁজিতে খুঁজিতে “কাল-আমে”র তলায় পৌঁছিল। বৃক্ষতলে

উপবিষ্ট রক্তাশ্রুত অবসন্ন রাহুগ্রস্ত মধ্যাহ্নভাস্করসদৃশ সেই মারাঠা সেনানীর বীরত্বব্যঞ্জক মুক্তি দেখিয়া পাঠানেরা বিস্মিত ও দয়াদ্রচিত হইল। সরাসরি মাথা না কাটিয়া তাহারা তাহাকে বলিল, যাহা আছে দাও, প্রাণে মারিব না। নির্ভীক যোদ্ধা আত্মপরিচয় দিলেন না, নির্বাক নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া রহিলেন। লুঠের লোভে পাঠানেরা তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিবামাত্র সেই অর্দ্ধমৃত যোদ্ধার দেহে যেন নব চেতনার সঞ্চার হইল; নিমেষমধ্যে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় গা বাড়া দিয়া উঠিয়া একাকী পাঁচ জনকে তিনি আক্রমণ করিলেন। ভল্লের আঘাতে চারি জন পাঠানকে আহত করিয়া স্বয়ং বীরগতি প্রাপ্ত হইলেন। ক্রুদ্ধ পাঠানগণ যোদ্ধার বসনভূষণের সহিত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন মস্তকটিও লইয়া চলিল। ইহাতে আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। ইহাই তো বীরের অতীপ্ত মৃত্যু। কবি বলিয়াছেন—

“জীযত সিংহ নহি আপুধরাবা, মুয়ে পিছে কোই ঘিসি আওবা।”

(প্রাণ থাকিতে জীবন্ত সিংহ নিজে ধরা দিবে না। মরিলে যে কেহ তাহার গা ঘেষিতে পারে।) বীরধর্ম অল্প-সরণকারী এই তরুণ সেনানীও জীবিত অবস্থায় শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করেন নাই, সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুকেই বরণ করিয়াছিলেন। পাঠানেরা কাহাকে হত্যা করিয়াছিল তাহা কিন্তু কেহই জানিতৈ পারিল না।

যে আহত মহারাষ্ট্র বীরকেশরী চিরাভ্যন্ত “মারা! মারা! হানা! হানা!” এই মারাঠা রণজঙ্ঘার ছাড়িয়া একাকী পাঁচ জন দুরাগী অশ্বারোহীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি কে? আচার্য্য যদুনাথ লিখিয়াছেন, ইনিই সেনাপতি সদাশিব রাও “ভাওসাহেব”। পাণিপতের কাল-আম সম্বন্ধে জনশ্রুতি তাঁহার অজানান নয়; উহার অবস্থান নির্দেশসূচক পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক নিশ্চিত প্রস্তর ফলক তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু স্বরচিত ইতিহাসে কাল-আমকে স্থান দেন নাই। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন—

“As he was walking over the field . . . a knot of five Durrani horsemen surrounded him and cried out to him to surrender . . . he gave them no reply . . . he was killed and his head cut off and carried away by his slayers.”\*

\* Fall of the Mughal Empire, II, p. 343.

কয়েক পাতার পর এই পুস্তকেই ভাও সাহেবের শেষ-কৃত্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"The headless trunk of the Bhau was dragged out of a huge heap of the slain two days after the battle, and the head on the third day, and burnt at different times with proper rites."†

উদ্ধৃতাংশদ্বয় আমাদের কাছে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হইতেছে, যথা :—

(১) প্রথমাংশের বর্ণনা যদি সত্য হয় তবে ভাও সাহেব যুদ্ধস্থলে যেখানে এবং যে সময়ে নিহত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার সঙ্গে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না, আক্রমণকারী পাঠানগণ আহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কেহ মরে নাই। স্তত্রাংশে এই স্থানে দ্বিতীয়াংশে উদ্ধৃত "huge heap of the slain" কেমন করিয়া আসিল?

(২) এই মৃতদেহের স্তুপের মধ্যে শুধু ভাওসাহেবের ধড় কেমন করিয়া পড়িয়া রহিল? যে ব্যক্তি মাথাটি কাটিয়াছিল সে যদি জানিত উহা ভাওসাহেবের মাথা তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহা সরাসরি আহমদশাহ আবদালীর কাছে পৌছাইয়া দিয়া শাহানশাহ-র দৃষ্টিভঙ্গি এবং তৎসহ আলুয়দিক সকল ঐতিহাসিক-সমস্তার অবসান ঘটাইত।

আমাদের মনে হয় তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধের প্রমাণপঞ্জী বিচারের সময় মারাঠা ভাষায় লিখিত "ভাওসাহেব-টা বখর" প্রায় সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয় সংশয়গ্রস্ত হইয়াছেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"But what puzzles the critical historian in the *Bhau Sahibanchi Bakhar* is that, hopelessly mixed up with its mass of demonstrably false statements, there are some true traditions (as, proved by authentic facts), and some statements which have every appearance of being true though unsupported elsewhere. Therefore, the simple remedy of rejecting this work in its entirety would impoverish our scanty store of information on the battle, and yet it is not safe to accept any of its statements so long as it cannot be corroborated by other and more reliable sources."

উদ্ধৃত কথাগুলির সারমর্ম হইতেছে এই যে, সংশয়স্থলে যাহা একাধিক প্রমাণদ্বারা সমর্থিত হয় না ঐরূপ কোন উক্তি তাঁহার মতে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা নিরাপদ নহে। আমরা কিন্তু বিপদের ঝুঁকি লইবার পক্ষপাতী। যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ক্ষেত্রে যে উক্তি অধিকতর প্রামাণ্য, প্রতিকূল উক্তির দ্বারা তাহা যত দিন খণ্ডিত না হয় তত দিন ঐ উক্তিকে সত্যের কাছাকাছি কিছু বলিয়া

গ্রহণ করিতে দোষ কি? অবশ্য এই রীতি—নীতি নহে, আপদমর্মে—ইহাতে সত্যের সম্মান না মিলিতেও পারে। 'ভাও-বখর' হইতে ইতিহাস সংগ্রহ অনেকটা স্বর্ণকারের পোড়া কাঠকয়লা ধুইয়া চালিয়া দু-এক রতি সোনা বাহির করার মত ব্যাপার। ভাওসাহেব এবং তাঁহার দ্বিগুণিত শব ও মস্তকের পরিণাম আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা আচার্য যদুনাথের বর্জন-নীতির একটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি।

ভাওসাহেব-বখরে লিখিত আছে—বিশ্বাস রাও এবং অপর তিন জন মারাঠা সর্দারের মৃতদেহ নিজের বেতন হইতে তিন লক্ষ টাকা কাটাইয়া স্বজাউদৌলার সেনানায়ক উমরাও গিরি গোসাই মুক্ত করিয়াছিলেন এবং তৎসমুদয় বিধিপূর্বক অগ্নিসংকার করিয়াছিলেন। এই উক্তির মধ্যে যে অংশ ভ্রমাত্মক আচার্য যদুনাথ অধিক প্রামাণ্য গ্রহণের সাহায্যে উহা সংশোধন করিয়াছেন; কিন্তু ছাঁটাইয়ের সঙ্গে "তিন লক্ষ টাকা" এবং গোসাই উমরাও গিরির প্রশংসা এই ব্যাপার হইতে বাদ পড়িয়াছে। আমাদের অভিযোগ এই ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে। "তিন লক্ষ টাকা" ভাওসাহেব-বখর ব্যতীত অন্য কোথাও নাই বলিয়া তিনি গ্রহণ করেন নাই। বিশ্বাস রাও-র মৃতদেহ তিন দিন দুরাগীর ডেরায় আটক ছিল। কাঁচা চামড়ার ভিতর বিচালী পুরিয়া ঐটিকে তাহার বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ দেশবাসীকে "হিন্দুর বাদশাহ" দেখাইবে ইহাই ছিল পাঠানদের দাবি। বিনা মূল্যে শুধু স্বজাউদৌলার কাকুতি-মিনতিতে দুরাগী বিশ্বাস রাও-র মৃতদেহ হাতছাড়া করিল—ইহা যত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, মৃতের জন্ত "তিন লক্ষ টাকা" পণ ততদূর অবিশ্বাস্য নহে। দ্বিতীয় কথা—উমরাও গিরির নাম স্বতন্ত্র প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত না হইলেও তাঁহার দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। দুরাগী যদি কোন কাকের উপর এই মেহেরবাণী করিয়া থাকেন তবে সেই কাকের উমরাও গিরি ছাড়া আর কেহ নহে। কেননা মুসলমান অপেক্ষা অধিক ইমানদারীর সহিত তিনি ও তাঁহার নাগা চেলারা দুরাগী-পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বহু মারাঠা বধ করিয়াছিলেন। ইহার উপরে আরও তিন লক্ষ টাকা না পাইলে দুরাগী হয়ত বিচালী-ভরা বিশ্বাস রাওকে কাবুল লইয়া যাইতেন। বিভিন্ন বর্ণনার গোলমাল মিটাইবার জন্ত আচার্য যদুনাথ গোসাইজীর নাম না করিয়া লিখিয়াছেন, "স্বজাউদৌলার ব্রাহ্মগণ"। ইহাতে গোসাইজীর প্রতি হয়ত অবিচার করা হইয়াছে। গোসাই উমরাও গিরির গুরু রুদ্রতেজা রাজেন্দ্রগিরি ছিলেন স্বজাউদৌলার পিতা নবাব সফদর জঙ্গের গুরু এবং নাগা-

† Ibid, p. 349.



বাহিনীর সেনানায়ক; শিষ্যের জ্ঞান বাদশাহী কোজের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া ফিরোজশাহ কোটলা আক্রমণ করিবার সময় তিনি লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। পুত্রকে যুদ্ধে বিদায় দেওয়ার সময় স্জাউদ্দৌলার মাতা উমরাও গিরির হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন, যেহেতু রাজমাতা স্ত্রী মুসলমানের সাম্রাধ্য মিত্র হিসাবেও শিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক মনে করিতেন। স্ততরাং ভাও-বখর-বর্ণিত উমরাও গিরির পুণ্যকৃত্যের প্রশংসা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা যায় না; পাঠান শিবিরে থাকিয়া হিন্দুর শেষকৃত্য সমাধা করিবার মত বৃক্কের পাটা এক মাত্র উক্ত নির্ভীক সন্ন্যাসী যোদ্ধা ব্যতীত আর কাহারও হইতে পারে না।

৩

তৃতীয় পাণিপত-যুদ্ধের সম্পূর্ণ প্রমাণপঞ্জী আচার্য্য যদুনাথ ব্যতীত আর কাহারও হস্তগত হয় নাই। তাঁহার সর্বশেষ এবং অতি মূল্যবান সংগ্রহ সৈয়দ নূরউদ্দীন হাসান-প্রণীত নাজিবুদ্দৌলার জীবন-চরিত যুদ্ধের বার বৎসর পরে লিখিত। নূরউদ্দীন যুদ্ধের কয়েক মাস পূর্বে ভরতপুরে পলাইয়া গিয়াছিলেন। স্জাউদ্দৌলার শিবিরে এবং মহম্মদ জাফর শামলু দুবাণী সন্দীর শাহ-পছন্দ খান ডেরায় উপস্থিত ছিলেন। কাশীরাজ যুদ্ধের ১৯ বৎসর পরে এবং শামলু ৩৫ বৎসর পরে ক্ষীয়মাণ স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভাওসাহেব সম্বন্ধে অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত, এ ধরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন মহারাজবাসীর লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। বহু বৎসর পরে জনশ্রুতিমূলক কতকগুলি বখর এবং কৈফিয়ত লেখা হইয়াছিল। ভাওসাহেব-চাঁ বখর এই শ্রেণীর রচনা এবং এইগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। আচার্য্য যদুনাথ ভাও-বখরকে আফিমখোরের গল্পের পর্য্যায় ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। পূর্বেই তাঁহার মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অগ্র কোন লেখক কর্তৃক সমর্থিত না হইলেও ইহার কোন কোন অংশ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া তিনি মনে করেন, এবং স্বয়ং স্থানে স্থানে এই বখরের বিবরণ গ্রহণ করিয়াছেন। তবুও আমাদের মনে হয় ইহাকে তিনি কিছু অতিরিক্ত সন্দেহের চোখে দেখিয়াছেন। যাহারা এই যুদ্ধ দেখিয়াছে, যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাগুলি যাহারা সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষভাবে অবগত হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে এই বখর-লেখক খবর সংগ্রহ করিয়াছেন—এইরূপ অনুমান করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। মারাঠা পক্ষের সত্য এবং অর্দ্ধ সত্য বিবরণ এই বখর ছাড়া আর কোথায়ও আছে বলিয়া মনে

হয় না। সন তারিখ অন্তর্ভুক্ত কিংবা বিভিন্ন অংশ পরস্পর অসংলগ্ন এই ক্রটির জন্য ইহাকে বাতিল করা যায় না। এই বখর জনশ্রুতি সংগ্রহ; কিন্তু ‘নাহমূল্য জনশ্রুতি’—শুধু এই কারণেই আমরা ইহাকে নির্বিশেষে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী নহি। “জনশ্রুতি অমূলক নয়”—এই দ্বর্ব্বলতার স্থান ঐতিহাসিক গবেষণায় থাকিতে পারে না; অথচ বিনা বিচারে সামান্য বস্তুকেও ত্যাগ করিবার অধিকার ঐতিহাসিকের নাই। উৎপত্তিস্থল, সময় এবং বক্তা ও শ্রোতার মনোভাব দ্বারা জনশ্রুতির বিচার যদি ইতিহাস-সম্মত হয় তবে ভাও-বখর মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।

যাহা হোক, ভাওসাহেবের অস্তিমদশা এবং মৃতদেহের কি গতি হইয়াছিল—উহাই বিচার্য্য বিষয়। আচার্য্য যদুনাথের বিবরণ বহু পুস্তক হইতে সংগৃহীত এবং প্রত্যেকটি ঘটনা বিচারের কষ্টপাথরে তিনি ঘষিয়া দেখিয়াছেন; তবে পাঁচ জন পাঠানের সহিত ভাওসাহেব একা যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিলেন, অথচ দুই দিন পরে তাঁহার ধড় মৃত দেহের স্তূপ হইতে বাহির হইল—ইহাই বা কেমন কথা? সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় ইহার একটি সত্য হইলে অপরটি মিথ্যা। যাহারা কাশীরাজের পুস্তক অন্যান্য বিবরণের সহিত মিলাইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা বুদ্ধিতে পারিবেন উক্তির কোনটাই মিথ্যা কিংবা অসম্ভাব্য নহে। দুইটি ঘটনার মধ্যে যেমন দুদিনের ব্যবধান, উভয়ের মধ্যবর্তী ব্যাপারগুলি আচার্য্য যদুনাথ বিশদভাবে বর্ণনা করিলে পুস্তকের (*Fall of the Mughal Empire*, vol. ii) অন্ততঃ দুই পাতা বাড়িয়া যাইত এবং সাধারণ পাঠক কোন অসংলগ্নতা দেখিতে পাইত না। তিনি মাত্রারক্ষার খাতিরে তাহা করেন নাই বলিয়া আমরা বিভ্রান্ত হইয়াছি। প্রথমে আমরা ভাওসাহেব-বখর হইতে মোটামুটি ঘটনাবলী উদ্ধৃত করিব। বখরকার লিখিয়াছেন—

“[ভাওসাহেব এবং জনকোজী সিদ্ধিয়া] কিছুক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। ইহার পর ভাওসাহেব ও জনকোজী সিদ্ধির গতি কি হইল কেহ বলিতে পারে না; বিশেষতঃ তাঁহারা দুই জন কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হইলেন না—গায়েব হইলেন, কি আশমানে উড়িয়া গেলেন, কি পৃথিবীর পেটে ঢুকিয়া পড়িলেন? ভগবানের লীলা ব্রহ্মাদি বুঝিতে পারে না, মানুষের কি কথা? শত্রুর হাতে পড়িলে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী তাহাদের আনন্দ হইত—তাহাও হয় নাই।” (পৃ: ১৫৩ টি: ১৭)।

যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভাওসাহেব সম্বন্ধে ইহার বেশী কিছু জানা যায় না। তাঁহার স্ত্রী পার্বতী বাঈ অতি কষ্টে

দিল্লী পৌঁছিলেন; ভাওসাহেব সেখানেও নাই দেখিয়া তিনি নিরাশ হইলেন। সেখান হইতে হতাবশিষ্ট মারাঠা সর্দারগণের সহিত পার্শ্ববর্তী বাক্ষি মথুরার পথে গোয়ালিয়রে আসিয়া একমাস অপেক্ষা করিলেন। ভাওসাহেবকে তালাশ করিবার নিমিত্ত চারিদিকে সন্ন্যাসী-চর প্রেরিত হইল; কিন্তু তাঁহার কোন ঠিকানা মিলিল না। ভাওসাহেব মরিয়াছেন কি বাঁচিয়া আছেন কেহ নিশ্চয়পূর্বক জানিতে পারে নাই। মোট কথা, যুদ্ধের বিশ বৎসর পরেও মহারাষ্ট্রের জনসাধারণ ভাওসাহেব বাঁচিয়া আছেন এই গুজবে বিশ্বাস করিত, এবং এইজন্তই এক “জালী ভাও” উত্তর-ভারতে দেখা দিয়াছিল। “বলবন্তনামা”-প্রণেতা ঐতিহাসিক ফকর-উদ্দীন এলাহাবাদী লিখিয়াছেন, একজন মারাঠা কর্মচারী নিরুদ্দিষ্ট ভাওসাহেবকে চূপারে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত ভোজন করিয়াছিলেন। পেশবা-দপ্তরের কাগজপত্রে এই “জালীভাও”-র সহিত যাহারা ভোজন করিয়াছিল তাহাদিগকে দণ্ডপ্রদানের উল্লেখ আছে। ভাও-বখর হইতে ইহা পরিস্কার বুঝা যায়, ভাওসাহেবের মৃতদেহ আবিষ্কার ও অগ্নি-সংকার মারাঠাগণ বিশ্বাস করে নাই। বিশ্বাস রাও এবং অজ্ঞাত মারাঠা সর্দারদের মৃতদেহ উমরাও গিরি গৌসাই কর্তৃক উদ্ধার এবং দাহক্রিয়া সম্পাদনের কথা ভাও-বখরে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি এই ব্যাপার জানিতেন, অন্য ব্যাপার অর্থাৎ ভাওসাহেবের ধড় ও মাথার বিভিন্ন দিনে দাহক্রিয়ার কথা তিনি শুনে নাই এমন অল্পমান করা যায় না।

তবে ভাওসাহেবের কি হইল? দুরাগী রক্ষী সেনাদলের শেষ হামলায় ভাওসাহেব আহত ও ভূপাতিত হইয়াছিলেন কিন্তু প্রাণে বাঁচিয়া ছিলেন; নতুবা শেষ বেলা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাঁহার পক্ষে পাঠানের দৃষ্টি এড়াইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আধ ক্রোশ দূরে যাওয়া সম্ভব নয়। আধ ক্রোশ দূরে যেখানে তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন-এ স্থান পানিপতের “কাল-আম”। আচার্য্য যদুনাথের বিবরণ জনশ্রুতি হইতে গৃহীত না হইলেও জনশ্রুতি উহার পরিপূরক। তাঁহার বর্ণনার মধ্যে “কাল-আম” নাই কিন্তু এখন উহাকে ইতিহাসে স্থান দেওয়া আমরা অযৌক্তিক মনে করি না।

কাল-আমের তলায় ভাওসাহেবের যে মস্তকবিহীন দেহ নিভৃত পড়িয়া রহিল দুই দিন পরে উহা শুণীকৃত মড়ার গাদার মধ্যে কেমন করিয়া আসিল? এই প্রশ্নের উত্তর কাশীরাজ-লিখিত বিবরণে নাই; কিন্তু মৃতদেহের শুপের মধ্যেই ঐ দেহ পাওয়া গিয়াছিল ইহা তিনি

লিখিয়াছেন। যুদ্ধের পরের দিন পানিপতের ময়দানে মরা বাছাই এবং গণনার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। মুসলমানদের মৃতদেহ গোর দেওয়া হইল এবং কাফেরগণ পড়িল শব্দ-শিয়ালের ভাগে। যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য বীভৎস—স্থানে স্থানে মড়ার গাদা এবং প্রতি দুরাগী ভাবুর সামনে কাটা মাথার শুপ। আটশ হাজার মৃত এবং বাইশ হাজার বন্দী মারাঠার মধ্যে ভাওসাহেবকে না পাইয়া দুরাগী আহমদশাহ দৃশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। বন্দী স্ত্রীলোকগণের মধ্যে যাহারা ভাওসাহেবকে চিনিত তাহাদের দ্বারা মড়া সনাক্ত করিবার লুকুম জারী হইল। ভাওসাহেবের নর্তকী এবং ক্রীতদাসীগণ গায়ের গন্ধ শুকিয়া ভাওসাহেবের মৃতদেহ চিনিতে পারে কিনা এই জন্য তাহাদিগকে যুদ্ধস্থলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, ইহার বেশী ইতিহাসে নাই। কিন্তু ইহা হইতে বুঝা যায় মৃতদেহগুলির মধ্যে মাথাকাটা শব বিস্তর ছিল। মুখ দেখিয়া চিনিবার উপায় থাকিলে গায়ের গন্ধ শুকাইবার বুদ্ধি মাথায় গজাইত না। তালাশের এই তোলাপাড়ের হিড়িকেই যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্তী স্থান হইতে গৃহীত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃতদেহের মধ্যে সম্ভবতঃ ভাওসাহেবের কবন্ধ ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। মাথা না থাকিলেও অন্তরঙ্গ-জনের পক্ষে সদাশিব রাওয়ের মত স্পৃহাবশত ডন-কুত্তী করা শরীর ঠিক ঠিক সনাক্ত করা এবং আটশ হাজার মড়া ওলট-পালট করিতে দুই দিন সময়ক্ষেপ কিছুই বিচিত্র ব্যাপার নহে। ভাওসাহেবের ধড় পাইয়াও আহমদশাহ-র সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই। এইজন্যই ধড়ের পরে আসিয়াছিল মাথা সনাক্তের পালা। যে পাঁচ জন দুরাগী অশ্বারোহী অজ্ঞাতসারে মহারাষ্ট্র সেনাপতির ছিন্নমস্তক লইয়া ফিরিয়াছিল তাহারা অন্যান্য গাজীগণের ন্যায় বাহাদুরির নমুনা-স্বরূপ ঐ মাথা ভাবুর সামনে নিশ্চয়ই রাখিয়া দিয়াছিল এবং পরে তালাশের সময় উহা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

আচার্য্য যদুনাথ টিপু সুলতানের মৃত্যুর সহিত সদাশিব রাওয়ের অসীম সাহস ও বীরোচিত মৃত্যুর তুলনা করিয়াছেন বলিয়া যদি কেহ মনে করেন যুদ্ধস্থলে শত্রুমিত্রের শবদেহ-বেষ্টিত হইয়া ভাওসাহেব মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন, এই কথা ঐতিহাসিক বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা হইলে ভুল করা হইবে। এইরূপ অভিপ্রায় থাকিলে ঐ অংশ পুস্তকের পূর্ববর্তী অল্পচ্ছেদে সংযুক্ত হইত।

আহমদশাহর মত আচার্য্য যদুনাথও অনেককাল ভাওসাহেব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। এই জন্য দশ বৎসর পূর্বে তিনি একবার শিশু “কাল-আম” অভিযান করিয়াছিলেন; সম্প্রতি সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই পাঠকদের কাছে নিবেদন করিব।

৫

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর বেলা ১১টার সময় একখানা মোটরগাড়ীতে আচার্য যদুনাথ ঠাঁহার যে দুই জন ছাত্রকে লইয়া পাণিপত যাত্রা করেন তন্মধ্যে এক জন এক ছদ্মবেশী রাজপুত্র, অপর ব্যক্তি বর্তমান লেখক স্বয়ং । আমাদের সঙ্গে পাণিপত তহশীলের ৪ মাইল স্কেল ম্যাপ, ক্যামেরা ইত্যাদি ছিল, স্থানীয় কোন পথপ্রদর্শক ছিল না । বেলা সাড়ে বারটার সময় পাণিপত স্টেশনে মোটরগাড়ী রাখিয়া আমরা শহরের মধ্যে একটি জৈন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাজির হইলাম । স্কুলের প্রধান পণ্ডিত আচার্য যদুনাথের পূর্বপরিচিত । ঠাঁহার খরকাকৃতি দোহারা-চেহারা, বং কালো চোখ-দুইটি বড় এবং দৃষ্টি চঞ্চল । জাতিতে তিনি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ ; মহাদজী সিদ্ধিয়ার আমল হইতে ঠাঁহার পূর্বপুরুষগণ পাণিপত তহশীলে জায়গীর ভোগ করিয়া প্রায় হিন্দুস্থানী হইয়া গিয়াছেন । আমরা “কাল-আম” দেখিতে যাইব, অথচ পথ কাহারও জানা নাই । স্কুলের এক জন শিক্ষক তালাশ করিয়া এক ব্যক্তিকে লইয়া আসিলেন, জাতিতে চামার, নাম রামদাস । উক্ত শিক্ষক এবং রামদাসকে সঙ্গে লইয়া আমরা শহরের বাহিরে ধু-ধু করা মাঠে উপস্থিত হইলাম । এখানে রাস্তা দুয়ের কথা, পাকদণ্ডী পর্য্যন্ত নাই, মাথার উপর রোদ বাঁ-বাঁ করিতেছে । মাইলখানেক চলিবার পর আচার্যদেব একটা উঁচু টিবিয় মত দেখিতে পাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কালিকা ! ওটা কি ?’ আমি একটু অস্থমনস্ক ছিলাম, চারিদিকেই যেন শুধু অতীত ইতিহাসের ছবি দেখিতেছি । গুরুদেবের কথায় চমক ভাঙিল, দেখিলাম একটা ছোটখাটো পাহাড়, লাল রং, রৌদ্রে ঝলমল করিতেছে । একটু বৃদ্ধি খাটাইয়া উত্তর দিলাম, ‘বোধ হয়, ইটের পাজা, কি কোন পুরনো জিনিষ হইতে পারে ।’ আমার উত্তর শুনিয়াই সকলে হাসিয়া উঠিলেন ; আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম । গুরুজী হাসিয়া বলিলেন— ‘তোমার নেহাত চেনা জিনিষ চাটগেয়ে লঙ্কামরিচ চিনিতে পারিলে না ?’ একটু কাছে গিয়া দেখিলাম সত্যই শুকনা লঙ্কামরিচের ক্ষেত যেন ছোটখাটো একটা পাহাড়ের মত । চলিতে চলিতে আমি কল্লনায় পাণিপতের ময়দান মারাঠার রক্তে লালে লাল দেখিতেছিলাম, লঙ্কামরিচ কল্লনায়ও আসে নাই ।

ইহার পর আরও কিছুদূর যাইবার পর আমাদের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িল । রামদাস আমাদের কখনও বামে, কখনও ডাহিনে হাঁটাইয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিল । তাহাকে বিদায় দিয়া গুরুজী ম্যাপ খুলিয়া বসিলেন । কদম

ফেলিয়া স্থানের দূরত্ব নির্ণয়ের ঠাঁহার আশ্চর্য ক্ষমতা । তিনি ম্যাপ দেখাইয়া আমাদেরকে বলিলেন, ‘শহর হইতে আমরা এত দূরে এই জায়গায় এখন আছি ; অমুক গ্রাম হইতে এত মাইল দূরে লড়াই হইয়াছিল ; মারাঠারা পলাইয়া হয় উত্তর না হয় পশ্চিম দিকে গিয়াছিল । এই জায়গা হইতে দুই মাইল অমুক দিকে গেলে আমরা “কাল-আম”-এ পৌঁছিতে পারি । রামদাসের মত আমিও দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়াছিলাম । আমরা ঠাঁহার পিছে পিছে চলিলাম । এক ঘণ্টা পরে প্রায় তিনটার সময় “কাল-আম”-এ পৌঁছিলাম । এক শত-ছিয়াত্তর বৎসর পূর্বে এমন সময়ই তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল ; শতাব্দীতে সন্ধিহারী ভাওনাহেব তখনও শবদেহের স্তূপ হইতে উঠিয়া কাল-আমের দিকে শেষ যাত্রা শুরু করেন নাই । “কাল-আম”ের স্মৃতিচিহ্নের কাছে এক জন সপ্ততিপদ ব্রাহ্মণ-কৃষক Persian wheel-এর দ্বারা কুয়া হইতে ক্ষেতে জল দিতেছিল । গুরুজী বলিলেন, ‘এই স্থানের সন্নিকটে কোন একটা বাউলী বা পাকা ঘাট-বাঁধান কুয়ার ধারে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নবেম্বর মারাঠা সৈন্যগণ এক দল ছুরাণী অশ্বরোহীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে হটাইয়া দিয়াছিল । ঐ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ এই জায়গার কাছাকাছি কোন বাউলী আছে নাকি ।’

এই বার আমার পালা । পূর্ব-পঞ্জাবের গ্রামীণ লোকের সহিত কথা বলিবার ভাষা গুরুজী কিংবা রাজপুত্রের রপ্ত নাই । দিল্লী রোহতকের গ্রামে জাঠ চৌধুরী-গণের সাহচর্যে আমি গ্রাম্য ভাষা কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়া ছিলাম । আমি কুয়ার কাছে গিয়া নিতান্ত পরিচিতের ন্যায় বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিলাম । বৃদ্ধ বলিল, ‘লালাজী, (যেহেতু আমার মাথায় লঙ্কোর লাল টুপী ছিল) এই জায়গার চারদিকে বহু ক্রোশ পর্য্যন্ত মাঠ-গ্রাম আমার কদম কদম জানা আছে । যেখানে আমরা চাষবাস করিতেছি সেইখানে সুরা খেরী নামে এক গ্রাম ছিল । এখান হইতে দেড় মাইল দূরে রাজা খেরী গ্রামে একটা বাউলী আছে ; গ্রামের যোগী এখনও ভাও-র গীত গাহিয়া ভিক্ষা করে ।’ আমি আসিয়া গুরুজীকে এই কথা বলিলামাত্র তিনি আমাকে বলিলেন, ‘তুমি সেই বাউলী দেখিয়া যোগীর নিকট হইতে ঐ গীত লিখিয়া আনিতে পার ? অতঃপর স্থির হইল, আচার্যদেব ঠাঁহার অপর শিষ্যসহ আমার জন্য স্টেশনে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন, ইতিমধ্যে আমি রাজা খেরী গ্রামে যাইয়া যোগীর গান লিখিয়া আনিব এবং বাউলী দেখিয়া আসিব । তিনি কয়েকটা টাকা আমাকে দিলেন, ‘টাকার কি প্রয়োজন

হইতে পারে আমি তখন ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই। পরে মর্মে মর্মে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

স্বর্ধ্যাস্তের প্রাক্কালে পূর্বোক্ত বৃদ্ধ এবং আরও কয়েকজন লোকের সহিত আমি গ্রামের দিকে চলিলাম। কথা-বার্তায় তাহাদের সঙ্গে ভাব হইয়া গেল। তাহারা বলিল রাত্রে আমার থাকার বন্দোবস্ত করিবে এবং যোগীর গীত শুনাইবে। আমরা গ্রামে পৌঁছিতেই বেলা প্রায় শেষ হইয়াছিল। গ্রামের বাহিরে যেখানে লোকে গরু-মহিষকে জল খাওয়ার সেখানে আসিয়া আমার সঙ্গীরা ফিস ফিস করিয়া কি বলাবলি করিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকজন লোক সেখানে জমায়েৎ হইল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-কৃষক বলিল, গ্রামের ভিতরে গেলেই “বাউলী” দেখা যাইবে, আমি ইচ্ছা করিলে সেটি গিয়া দেখিয়া আসিতে পারি, আমি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আমার জন্ত তাহারা অপেক্ষা করিবে। বৃদ্ধ যে দিকে পথ দেখাইয়া দিল সেই দিকে গিয়া দেখিলাম কিছুই নাই; কতকগুলি উলঙ্গ শিশু ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। ফিরিয়া আসিয়া দেখি বৃদ্ধ ও তাহার সঙ্গী লোকজন সবাই চম্পট দিয়াছে। বেগতিক দেখিয়া আমি সটান গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া সরকারী মেজাজে কড়া আওয়াজে এক জনকে বলিলাম, ‘চৌকিদার-কো বোলাও।’ ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন লোক জড় হইয়া সম্ভবতঃ হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইল। তাহারা আমাকে গ্রামের চোপাড়ে লইয়া গেল।

চোপাড় কাঁচা চোঁচালা বড় হল-ঘর, সর্বসাধারণের খরচে তৈয়ারী। এখানে সারি সারি খাটিয়া, গোটা দুই জলের মটকা, দুই ডজন হুঁকা। এই হল-ঘর একাধারে গ্রামের ক্লাব, অতিথিশালা এবং পঞ্চায়েতী আদালত। ঐ গ্রামের লম্বদার এক জন অশীতিপর বৃদ্ধ জাঠ। এইবার আমি নিশ্চিত হইলাম। আমার উপস্থিতিতে গ্রামে মাড়া পড়িয়া গেল। আমি কে? কি জন্ত আসিয়াছি? কেহ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। যোগীর খবর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে এই গ্রামের লোক নয়; রিসালু গ্রামে তাহার নিবাস। একজন লোক সাইকেল লইয়া যোগীকে আনিবার জন্ত চলিয়া গেল। আমি এই অবসরে বাউলী দেখিয়া আসিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম পুরনো বাউলীর নূতন সংস্কার হইয়াছে। এক ঘণ্টা পরে লোকটি রিসালু হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, যোগী ভিক্ষা করিবার জন্ত কোন দূর গ্রামান্তরে গিয়াছে, পরের দিন ফিরিতে পারে। গ্রামের লোকেরা এক বানিয়ার বাড়ী হইতে আমার জন্ত রুটি আনা হইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। আমি কিন্তু আতিথ্যগ্রহণে অক্ষমতা জানাইয়া একাকীই পাণিপত

যাত্রা করিলাম। গ্রামবাসীরা সম্ভবতঃ মনে করিল নায়েব তহশীলদার বাউলীর তদন্ত করিতে আসিয়াছিলেন, বাড়ী গাজিয়াবাদ। তাহারা গ্রামের সীমানায় রাস্তা পর্যন্ত আমাকে আগাইয়া দিয়া বিদায় লইল।

রাস্তায় চলিতে চলিতে যাহাকে জিজ্ঞাসা করি পাণিপত কত দূর, সে-ই বলে আধ ক্রোশ। এই ভাবে চারি আধ ক্রোশ চলিয়া পাণিপতে উপস্থিত হইলাম। তখন রাত প্রায় ৮টা হইয়াছে। নূতন কিছু পাওয়ার উত্তেজনা এবং সরকারী মেজাজের গরমে এতক্ষণ শীত অনুভব করি নাই; এবার কাঁপুনি আরম্ভ হইল। শীতে কাতর হইয়া আমার আসল বিলাতী গরম ওভারকোটের কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম যাওয়ার সময়ে গুরুজী হয়ত গাড়ীতে তালাশ করিয়া প্রাইমারী স্কলমাষ্টারের কাছে ওটি রাখিয়া গিয়াছেন। মাষ্টারের বাড়ীতে গিয়া জানিতে পারিলাম সন্ধ্যা পর্যন্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া গুরুজী দিল্লী চলিয়া গিয়াছেন, কোন কোট রাখিয়া যান নাই। ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, শুনিলাম রাত ১২টায় দিল্লীর একখানা গাড়ী আসিবে। এখানে ভাজা ছোলা ও গুড় ছাড়া কোন ভোজ্য দ্রব্যই নাই। দুই আনা পের পেট ভরাইয়া শেষে ঠাণ্ডা জল খাইলাম। ইহার পরে শীতের সহিত লড়াই। দুইখানা হাত মাত্র সম্বল—বুকটা চাপিয়া ধরিলাম। যাত্রী সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর। এক জন গরীব জাঠ ছেঁড়া কবল মুড়ি দিয়া বসিয়াছিল। আমার অবস্থা দেখিয়া সে বলিল, “মাষ্টারজী, আধা কবল ওড় লেও।” তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিলাম—রাত্রি ২টায় দিল্লী পৌঁছিয়া বাকী রাতটা কাটাইব কোথায়? গুরুজী যেখানে আছেন রাত্রিবেলা সে আস্তানা বাহির করা যাইবে না, হামিণ্টন রোডে রাস্তা হইতে চীংকার ছাড়িলে বন্ধু অশ্বিনী মুখুজে জাগিবেন কিনা সন্দেহ; স্বতরাং ষ্টেশন ইয়ার্ডে যেখানে কাঁচা কয়লা পোড়াইয়া কুলীরা রাত কাটায় সেখানেই আশ্রয় লইতে হইবে। যাহা হোক শেষে অশ্বিনীবাবুর কাছে জানিতে পারিয়াছিলাম, রাত প্রায় ৮ টার সময় একখানা মোটর গাড়ী হইতে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছিলেন; তিনিই আমার ওভারকোট রাখিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়াছিলেন রাত্রিতে আমি দিল্লী ফিরিব। তাহার সঙ্গে আর একজন যুবক ছিলেন—বলা বাহুল্য ইনিই “সীতামৌ” রাজ্যের উত্তরাধিকারী রাঠোর কুল-তিলক কুমার রঘুবীর সিংহজী। দিল্লীতে পৌঁছিয়া প্রস্তুত অন্ন এবং অপেক্ষমাণ অর্ধজাগ্রত বন্ধুকে পাইয়া পথশ্রম সার্থক মনে করিলাম।

৬

এই অভিযান নিতান্ত নিরর্থক হয় নাই। রিসালু গ্রামের যোগীর গীত সম্বন্ধে যে খবর পাইয়াছিলাম, ঐ গীত প্রায় এক মাস পরে পাণিপতে আচার্য যদুনাথের পরিচিত এক সহৃদয় ব্যক্তি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কাছে পাঠাইয়া ছিলেন। ঐ গীত ব্যতীত ভাওসাহেব সম্পর্কিত অন্য জনশ্রুতিও গ্রাম্য লোকদের মধ্যে প্রচলিত আছে। রাজা-খেরী গ্রামের চোপাড়ে নিকট হইতে আমি যাহা শুনিয়াছিলাম উহার সারমর্ম এই :—

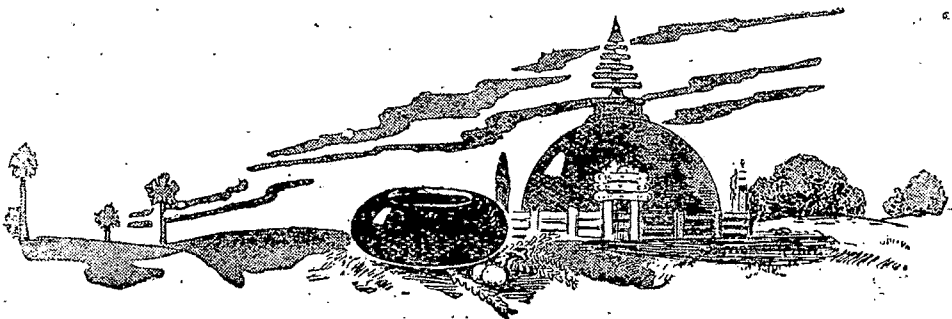
“ভাওসাহেবের এক গেড়েয়িয়ার সহিত এক পাঠানের যুঝযুদ্ধ ছিল। পাঠান ঐ গেড়েয়িয়ারকে বলিল, বাবা! এইবার লড়াইয়ে আমাকে জিতাইয়া দাও, না হয় ছুরাগীর কাছে আমার মান থাকে না। ভাও কুঞ্জপুরার (কুরুক্ষেত্রের কাছে) “ওলী”কে [নবাব] বন্দীদশায় অনাহারে রাখিয়াছিলেন, মরিবার সময় সে শাপ দিয়াছিল তাহারাত্ত অন্নকষ্ট পাইবে। এইজন্ত ভাও-র ডেরায় দুর্ভিক্ষ লাগিল। যুদ্ধে হার-জিতের অনিশ্চয়তার সময় ঐ গেড়েয়িয়ার কথায় ভাও হাতী হইতে নামিয়া পড়িয়াছিল। এই সময় ঐ বিশ্বাসঘাতক নীল ঝাণ্ডা তুলিয়া পাঠানকে ইশারায় জানাইয়া দিল সব শেষ হইয়াছে অর্থাৎ ভাও মরিয়াছে। ইহার পর দক্ষিণীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইয়া গেল; এবং ঐ পাঠানের যোগসাজসে গেড়েয়িয়ার মরিয়া পড়িল। ভাও “কালা-আমে”র তলায় যুদ্ধ করিতে করিতে মারা গেল।”

ইহার অধিক ইতিহাস প্রায় দুই শত বৎসর পরে জনশ্রুতির মধ্যে কেহ আশা করিতে পারেন না। কুঞ্জ-পুরার যুদ্ধে (অক্টোবর, ১৭৬০) বিজয়ী মারাঠাগণ বর্করোচিতে আচরণ করিয়াছিল। গুরুতররূপে আহত এবং বন্দী হইয়া কুঞ্জপুরার পাঠান-বীর কুতব শাহ মারাঠাদের কাছে প্রার্থনা করিলেন, “আগে আমাকে একটু

জল দাও, পরে আমার মাথা কাটিয়া ফেলিও।” দিল্লী হইতে ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে বাদলীর যুদ্ধে দত্তাজী সিন্ধিয়া যখন মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন (২ই জানুয়ারী ১৭৬০) তখন এই কুতব শাহ দত্তাজীর মাথা কাটিয়া ছুরাগীকে উপহার দিয়াছিলেন। এই নিষ্ঠুর আচরণ মারাঠারা ভুলিয়া যায় নাই, প্রতিহিংসায় উন্মত্ত মারাঠারা মল্লযুদ্ধ বিসর্জন দিয়া মুম্বু যোদ্ধাকে অশ্লীল গালাগালি দিল—“য়া মাত্ৰাগমনিয়াস লঘুশংকা প্রাশণ করবণে” [—কে মৃত্র খাওয়াইয়া দাও]; এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিল। জনশ্রুতি-উল্লিখিত “গেড়েয়িয়ার” বিশ্বাসঘাতক হীন প্রতিহিংসায় উত্তেজিত মলহর রাও হোলকর। হোলকর এবং সিন্ধিয়া শূদ্রজাতীয় ছাগল ও মেঘপালক (হিন্দী—গেড়েয়িয়ার) ছিলেন। নজীর খাঁ রোহিলার নাম গ্রামবাসীরা ভুলিয়া গিয়াছে; তিনিই এই গল্পের “পাঠান।” “নীল ঝাণ্ডা” সম্পূর্ণ কাল্পনিক হইলেও হোলকার-নজীর খাঁর ব্যাপার সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। “সকরতাল” দুর্গে সিন্ধিয়া কর্তৃক অবরুদ্ধ নজীর খাঁ হোলকারকে পিতৃ সম্বোধন করিয়া রেহাই না পাইলে দুর্গাণী শেষ বার হিন্দুস্থান আক্রমণ করিত না এবং পাণিপতের তৃতীয় যুদ্ধও হইত কিনা সন্দেহ। হিন্দুস্থানে হোলকারের অনেক “ধর্মপুত্র” ছিল—নজীর ইহাদের অগ্রতম।

রিসালু গ্রামের যোগীর যুদ্ধগীতি\* ছাপা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু “কালা-আম” এইবার সত্যই মরিয়া গেল। কারণ, আচার্য যদুনাথ “কালা-আম”কে তাঁহার ইতিহাসে স্থান দেন নাই। ভবিষ্যতে কোন ঐতিহাসিক উহা করিতে সাহসী হইবেন কিনা বর্তমানে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না।

\* Fragment of a Bhao-Ballad in Hindi by K. R. Qannungo in Sardesai Commemoration Volume.





## আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৩০

যত বার শুভার সান্নিধ্য থেকে সরে এসেছে তত বারই মনে হয়েছে, এক একটা দুঃখের অবসান হ'ল। মনে হয়েছে সঙ্গীর্ণতা পরিহার করে স্বহস্তর পরিধিতে বুঝি মুক্তি এল এগিয়ে। আসক্তির বাষ্প তরল হবামাত্র কর্তব্যের পথ স্পষ্ট হুটে ওঠে সামনে। প্রশান্ত তখন ভিন্ন মানুষ। তবে সে কাঠিও কিছু দিন বাদে দ্রব হতে থাকে, যেখান থেকে আঘাত খেয়ে বিমুখ হয়েছিল চিত্ত—আবার সেই দিকেই তার গতিবেগ প্রসারিত হয়। আবার জন্মে বাষ্প—আশায় আবেগে উচ্ছ্বাসে আবার সব ভাসানোর, সব ভুলানোর মত্ততায় সে অধীর হয়ে ওঠে। হুনিরীক্ষা নক্ষত্রের নাগাল পাবার জন্ত—এত দূর কেন—সে রহস্য কে বোঝাবে তাকে। যুগা কি মানুষকে নিকটবর্তী করে? বেদনা কোন্ আনন্দ-অমৃত-রসের সন্ধান দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠাকে লঘু করে—আত্মবিশ্বাসকে শিথিল করে দেয়? হুলজ্যা বাধা বুঝি পূর্ণত্বের প্রথম সোপান।

এ অজায়—অজায়। শুভা আজ তাকে আনন্দ দিতে পারে না—পূর্ণতা তো নয়ই। ওর কাছে এসে কেবল অস্ত্রের ধার পরীক্ষা করবার বাসনা হয়। যুক্তি দিয়া যুক্তি খণ্ডনের পুলক সর্বোচ্চে অগ্নুভব করা যায়। ওকে অস্ত্রহীন করে যদি বাধ্য করাতে পারে আত্মসমর্পণে অর্থাৎ পরাজয় স্বীকারে—তার চেয়ে বড় সম্পদ প্রশান্তির কামনাতে আর কি-ই বা আছে। কিন্তু এই দণ্ডে মনে হচ্ছে—এ খেলার মত তুচ্ছ জিনিষ জগতে কিছু নাই। আনন্দ-অমৃতের সন্ধান শুভাই তাকে দেয় নি—মালতীও দিয়েছে পূর্ণতার ইঙ্গিত। একখানি ঘর, একটি মধুর সঙ্গ, নির্জন অবসর আর আত্ম-উদ্ঘাটনের মুহূর্তে—আত্মনিমজ্জন—পৃথিবীতে এই পাওনাটাই তো নর-নারীর সর্বোত্তম সম্পদ। শুভা মরীচিকা—মালতী বন্দর। মালতী পরিপূর্ণ বিশ্বাসে তার আত্মার সমীপে এসে দাঁড়িয়েছে—তাকে প্রত্যাখ্যান করবার ক্ষমতা প্রশান্তর নাই। এ রকম আত্মবঞ্চনা সে নাই বা করলে।

হাঁ অজায় হয়েছে—কালই মালতীকে নিয়ে তার ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। শুভার সঙ্গে বুঝাপড়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। যে পার্টর অণুতম অংশ শুভা—সেই পার্টর কাছেই তার দরবার। তাদের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজনকে যুক্তি বলে স্বমতে আনলেই ব্যাপারটার আশু নিষ্পত্তির সম্ভাবনা ছিল। অথচ আলোচনার ছুতায় শুভাকে আর একবার দেখে...

পায়ের গতি দ্রুত হ'ল। স্থানবাজারের মোড়ে এসে দেখলে ট্রাম ডিপোর কাছে জনতা। কারা উত্তেজিত ভাবে

কি বলছে—মাঝে মাঝে চাঁৎকার উঠছে শ্রমিকের হায়া দাবি নিয়ে। ওরা শাসাচ্ছে ধর্মঘট করবে। আর্ট হাজার শ্রমিক রুখে দাঁড়িয়েছে বিলিভী মালিকের দ্বারা শোষিত না হবার দৃঢ় সঙ্কল্পে। আয়ের অঙ্ক বাদে ব্যাঙ্ক-ব্যাংকালে উপচে পড়ছে তাদের কর্মচারীরা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে চারশো গুণ দ্রব্যমূল্য যুগিয়ে অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিন যাপন করছে। যা সামান্য মুষ্টিভিক্ষা রেশনে ও মাগুগি ভাতায় মিলছে—তা 'ভাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম'। ওরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে ধর্মঘট করবে।

পাশ থেকে একজন বললে—পনেরোটা দিন সবুর করলেই হ'ত—বিলেতের কর্তাদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া হ'লে—

একজন রোগামত ছোকরা বেকিয়ে উঠল—বুঝাপড়া তো মাসখানেক থেকে চলছে। ছাকা! কর্তারা কিছু জানে না—না?

তবু—

না—মশাই—না—যেমন কুতুর তেমনি মুগুর হওয়া দরকার।—উৎসাহে ছোকরার মুখ-চোখ জ্বলছে।

প্রশান্ত সরে এল। এ সব আলোচনা তার ভাল লাগছে না। আগুন জ্বললে দাহ বস্তুর বিচার-বিবেচনা নিরর্থক। ধর্মঘট হবেই।

মালতীর সন্ধানে সে একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করলে। কিন্তু মালতীর টিকানা সে জানে না। বারকয়েক গলির এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত ঘুরে বেড়িয়ে আবার ফিরে এল বড় রাস্তায়। ফুধা বোধ হচ্ছে। মেসে ফিরে যাবার ইচ্ছা তার নেই—একটা মাঝারি মত রেপ্টরেট দেখে চুকে পড়ল।

শুধু আসন্ন ট্রাম-ধর্মঘটের নয়—আরও বহু জায়গায় ধর্মঘট চলছে ও চলবে তারও কর্ণরোচক মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। পোর্ট ট্রাষ্ট নাকি কুড়ি হাজারের ওপর কর্মচারী নিয়ে আসন্ন যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত। প্রস্তুত হচ্ছে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—রাস্তায় রাস্তায় ওদের প্রাচীরগুজ দেখা যাচ্ছে। একশো চুমালিশ ধারা না থাকলে ধর্মঘট ঘোষণার বহুয় কলকাতা পরি-প্লাবিত হয়ে যেত।

ভাবতে ভাবতে মালতী যে গলিতে থাকে সেই গলিটাই সে বার দুই পরিভ্রমণ করলে। যদি পরিচিত কারও দেখা মেলে—কিন্তু মালতীই যদি দৈবক্রমে তাকে দেখে ছুটে আসে।

ছপুর বেলা—গলিটা নির্জন আর আলো-আঁধারী। কারও

সফীর্ণ অষ্টবক্রাকৃতি গলি। লোকজনের চলাচল কম। চার বার পাক খেয়ে গলিটা বড় রাস্তায় এসে মিশেছে। দ্বিতীয় বার পরিষ্কার সেরে প্রশান্ত যেমন মাঝামাঝি একটা বাকের কাছে পৌঁছেছে—অমনি তার মনে হ'ল কারা যেন হুজুং করে সরে গেল অন্ধকারের মধ্যে। হুজুংকারী না হ'ল অমন করে পালাবে কেন ওরা?

কে—কে—ওখানে? প্রশান্ত টেচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কোন একটি কঠিন দ্রব্যের আঘাত এসে পড়ল মাথায়। অত্যন্ত আক্রমণের বেগ সহ করতে পারলে না—জান হারিয়ে ও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তার পর কিছুদিন কাটল ছায়ার জগতে। পরিচিত পৃথিবীর বহু দূরে সে লোক। তল্লা-জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হ'ল। অগাধ আলো মম্বর হয়ে উঠল মুহূর্ত—বিস্তৃত হ'ল দিন—আবার গভীর নিদ্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল—কোন চিহ্ন না রেখে। কত সংবাদ প্রবণ-পথে অর্থহীন প্রবাহে ভেসে এল—নিদ্রা আর অর্ধ চৈতন্যে মিশে তারা কালসমুদ্রে হারিয়ে গেল একে একে। প্রায়ই দেখা দেয় সুপ্রসাধিত একটি মেয়ে। মমতাভরা ছুটি চোখে তার পলক পড়ে না—সেবানিপুণ করে প্রশান্তর মাথার চূলে সে পরিচর্যার স্পর্শ রেখে দেয়।

সেই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর স্পর্শ-চৈতন্য পূর্ণ প্রস্তুতি হতে চায়—আবার ছেয়ে আসে গভীর অন্ধকার। এমনি ভাবে চলতে চলতে এক দিন সে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, আমি কোথায়?

মেয়েটি ছুটে এসে তার মুখের ওপর হুঁকে পড়ে বললে, আমায় চিনতে পারছ?

ক্ষীণস্বরে প্রশান্ত উচ্চারণ করলে, মালতী।

মেয়েটির মুখচোখ আনন্দে ঝলসে উঠল। পরম স্নেহে প্রশান্তর মাথায় হাতখানি রেখে বললে—ঘুমোও।

আমি কোথায়?

আমাদের বাড়ীতে।

প্রশান্ত মাথা নাড়লে। জান ফিরে আসছে—মালতীও ফিরে এসেছে—কিন্তু সে কোথায়? অস্থির হয়ে উঠল প্রশান্ত। হাত দিয়ে টেনে টেনে মাথার বালিশটা খাটের একধারে সরিয়ে দিলে—ডান হাতের কব্জীয়ে ভর দিয়ে মাথাটাকে অঙ্গ তুললে—বিস্ফারিত চোখে মালতীর পানে চেয়ে বললে, না—না—এসব সরিয়ে নাও—সরিয়ে নাও। ওরা ধর্মঘট করেছে—বুঝতে পারছ না।

মালতী তার মুখের ওপর হুঁকে পড়ে কোমল কণ্ঠে বললে, কেউ ধর্মঘট করে নি—তুমি ঘুমোও।

শরীরে ক্লান্তি—মনে কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে কৌতূহল জেগে উঠেছে। ও একটার পর একটা প্রশ্ন করেই চলল। অবশেষে

ওর জিজ্ঞাসায় ক্লান্ত হয়ে মালতী উঠে গিয়ে রেডিয়ার চাবিটা ঘুরিয়ে দিলে। স্বরের অনর্গল প্রবাহ বয়ে চলল।

আন্তঃ-এশিয়া সম্মেলন শেষ হ'ল আজ। গান্ধীজী বললেন—এক-দুনিয়া তৈরির মহৎ দ্রুত এশিয়াবাসীরা যেন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত নেহরু বললেন, ইউরোপের শক্তির উৎস আজ দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। একটি ধারা আত্মসাৎ করেছে আমেরিকা—আর একটি ধারা এশিয়াতে পৌঁছল। হুঁশো বছরের নিপীড়িত মানুষেরা সেই শক্তিকে যেন সত্যের মহিমায় স্তম্ভীকৃত করে নিতে পারে। বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদে এই বিশোধিত শক্তি আঘাত করুক প্রচণ্ড ভাবে, এশিয়ার জাগরণ হোক—পৃথিবীর নির্ধাতিত মানবের কল্যাণময় জাগরণ।

৩১

এর পর ভারতবর্ষের জয়যাত্রা সুর হ'ল। ঘটনার পর ঘটনার প্রবাহ দ্রুত গতিতে বয়ে চলল। বিদায় নিলেন ওয়াশেল—শেষ বড়লাট হয়ে এলেন মাউন্ট ব্যাটেন। ভারত-সমস্তার মীমাংসার জয় স্বরাধিত হয়ে উঠলেন তিনি।...তিন মাসের স্তিমিতপ্রায় অগ্নি—জাতিবিদ্বেষ আবার জলে উঠল। যে যেখানে প্রতিক্রিয়াপন্থী ছিল সবাই তৎপর হয়ে উঠল। কেউ বললে, দ্বিজাতি-তত্ত্বের ফয়সালার জয় এ একটা চাপ—কেউ বললে, না এটা বিদায়ী ব্রিটিশের কূটনীতি। দিনে দিনে নরশোণিতে ঘাতকের অস্ত্র হ'ল রঞ্জিত—পঞ্জাবী পুলিশের অত্যাচারে শহর হ'ল দৃষিত। পঞ্জাবেও আশুত জলে উঠল। মুসলিম লীগ দৃঢ় পণ করলে—পাকিস্তান চাই-ই। জীবন-পণ। হিন্দুর ষড়যন্ত্রকাল ছেদন করে মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করলে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। অবশেষে কংগ্রেসও টলল তার দৃঢ় সঙ্কল্প থেকে। দ্বিধাভিত্তি বাঙলা আর দ্বিধাভিত্তি পঞ্জাবের ভিত্তিতে ভারত-বর্ষকে বিভক্ত করার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে। প্রস্তাব নিয়ে মাউন্টব্যাটেন ছুটলেন বিলেতে। বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি ঘোষণা করলেন—যেহেতু নেতৃবৃন্দ অঞ্চ ভারতের আপোষ-মীমাংসায় রাজী নন সেজ্জা ভারতবর্ষ দুটি খণ্ডে বিভক্ত হবে—হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান। সেই সঙ্গে পঞ্জাব আর বাংলাও বিভক্ত হবে। দুটি গণপরিষদ বসবে—প্রয়োজন হবে দু'জন গভর্নর-জেনারেলের। দেশীয় রাজারা যে-কোন একটি গণপরিষদে যোগদান করতে পারবে। আর কোন বিভাগ হবে না। কেবল গ্রীহট জেলা গণভোটের দ্বারা আসামে থাকবে কি বাংলায় যাবে—ঠিক হবে। আর সীমান্ত প্রদেশেও গণভোট প্রযুক্ত হবে। ওখানকার কংগ্রেসী মন্ত্রী বহাল থাকে-না-থাকে তারই দ্বারা নির্ণীত হবে। ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়া হবে—আর পনেরই আগষ্টের ভিতর ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। একে তরা জুনের পরিকল্পনা বলা যায়।

মলয় এক মনে ডায়েরি লিখছিল। ভারতবর্ষের এই পরিবর্তন তাকে নিজ শক্তি সম্বন্ধে প্রত্যয়শীল করে তুলেছে। এক দিন ছুগুম অন্ধকারে যাত্রা হয়েছিল সূর্য—পথের নিশানা দৃষ্টিগোচর ছিল না—মনের দৃঢ় সম্বন্ধে পথ চলছিল। লালনা নির্ধাতন সয়ে অশেষ ক্লেশ ভোগ করে সর্বস্বান্ত হবার পর যে পথ আজ সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার আবিষ্কার ইতিহাসের নজীর হয়ে থাকবে—বিশ্বের বিশ্বয়ও বটে। বিনা রক্তপাতে...জয়যুক্ত করে এক মিনিট স্তব্ধ হয়ে থেকে মলয় হাসল। আবার সে কলম তুলে নিয়ে লিখলে, এই ভাবে বিনা রক্তপাতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল। পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুনতর অধ্যায় সংযোজিত হ'ল। বিনা রক্তপাতেই বটে। শক্তির কেন্দ্রে কেন্দ্রে যে আঘাত পড়ছে—চুকরো ভারত শুধু নয়—জাতি-বিদ্বেষ ও শক্তি বিকেন্দ্রীকরণের প্রধান উপকরণ হয়ে আরও কতকাল ধরে এই দেশকে—প্রত্যক্ষ না হোক অলক্ষ্য-নিয়ন্ত্রিত পরশাসনের ষড়যন্ত্রজালে আবদ্ধ করে রাখবে, কে জানে। ভ্রাতৃশাতী দ্বন্দ্ব তো চলছেই—পৃথক অস্তিত্বে সে বিদ্বেষের নিয়তি ঘটবে এ ধারণা হয়ত ভুল। তবু আলাপ না হয়ে আজ গত্যস্তর নাই।...কুখ অঙ্গে অস্ত্রোপচারের দ্বারা আসল মানুষটাকে মুছ করে তুলবার মত আশা পোষণ না করে উপায় কি। আবার খণ্ড ভারত জোড়া লাগবে—যদি মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। মানুষ সৃষ্টি করেছে দেশকে—মানুষকেই আবার দাঁড়াতে হবে দৃঢ় সম্বন্ধে—যাতে রুদ-পঙ্কিল বিষাক্ত বাসনাগুলির ধ্বংসসাধন হয়।

সুচিত্রার হাসিতে মলয় মুখ তুলে চাইলে। ও এতক্ষণ চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে মলয়ের লেখনী চালনা লক্ষ্য করছিল। কলমের ডগায় বাইরের খটনা মনের রসে অভিযুক্ত হয়ে যা ব্যক্ত করছিল তা একান্ত মলয়ের বক্তব্য নয়। রক্তমোক্ষজনিত দৌর্যল্যে পৃথিবী ফিরে পেতে চাইছে এমন শান্তি বা সত্যকারের কল্যাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা তাই জাতিকে সতর্ক করে দিচ্ছেন—পরমাণুর ধ্বংসকারিতা শক্তি বাড়ানোর গবেষণা এইবার ইতি হোক। মানুষ আর তার সভ্যতাকে বাঁচানোর জন্ত এই অমুসন্ধিৎসাকে নিরস্ত করতেই হবে। অস্ত্র সঞ্চয় করে যুদ্ধ করব না—এই নীতি অচল। আগেকার বহু যুদ্ধ ও বিশ্বব্যাপী গত দুটি মহাযুদ্ধে এর প্রমাণ স্বাক্ষরিত রয়েছে। সুচিত্রার হাসির পরও কলম নিয়ে মলয় ঐ ক'টি লাইন যোগ করে দিলে।

ডায়েরি বন্ধ করে সে হাসিমুখে বললে, তোমার হাসির কারণ?

কারণ—সৃষ্টির আদিযুগের প্রথম কথাটি মনে পড়ল। পুরাণে আছে না—সুর-অসুরের দ্বন্দ্ব পৃথিবীর জন্মকাল থেকে চলে আসছে। সমুদ্র মন্থনে এর সূত্রপাত—

মলয় বললে, তখন অসুরেরা ছিল বর্ণজ্ঞানহীন, কাজেই তাদের কথা পুরাণে নাই। তবু সুচিত্রা, সেই প্রথম যুগের বঞ্চনার প্রতিক্রিয়া আজও চলছে।

আজ অসুরেরা কোথায়—দেবতাই বা কে?

সেটা এক কথা বল। শক্তি নয়। আর বললেও কেউ মানবে না। হিটলারের 'আমরা আর্ধ্য' নীতির প্রত্যুত্তরে রাশিয়ার নৃতত্ত্ববিদেরা ঘোষণা করেছিলেন, সভ্য মানুষের আদি জন্মভূমি নাকি ঐ দিকে—স্বর্ণ বলতে সেকালে যা বোঝাত তা উরাল পাহাড়ের ওপাঠে কোন দেশ—

আচ্ছা—ওসব বড় বড় কথা না বললেও আমরা জানি—আজকার অসুরেরা আর বর্ণজ্ঞানহীন নয়—তারা বুদ্ধিহীনও নয়। তারা বেশ বদল করেছে বলে আমরা তাদের চিনতে পারছি না।

আজকের দেবতার কে?

আজ দেবতার সংখ্যা কমে গেছে—এত কম যে আঙুলের পর্কে এসে দাঁড়িয়েছে সে সংখ্যা। যাই হোক—তোমার মিলনতত্ত্বের মধ্যে এই কথাটিও লিখে রাখ—দুটি পরস্পর-বিপরীত-ধর্মী জীবের মিশ্রণেই সৃষ্টির উন্নতি—সৃষ্টির সার্থকতা। অনেক চেষ্টা করেও—আধবুদ্ধি, রসের মাথার কাঁচা চুল থেকে পাকা চুলগুলো নিঃশেষ করা যায় না—তেমনি এই সৃষ্টিকেও সর্বাদ্ভ্রমের করবার চেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তবে চেষ্টা করব না? মলয় হাসল।

বাঃ! না হলে বেঁচে থাকার অর্থ কি রইল।

মলয় কলম তুলে নিয়ে বললে, দাঁড়াও তোমার মস্তব্যটা লিখে রাখি।

সুচিত্রা ওর হাত চেপে ধরে বললে, না। কলম রেখে এটা পড়ে ফেল তো চট করে। একখানা চিঠি সে এগিয়ে দিলে।

খাম ছিঁড়ে মলয় বার করলে চিঠিখানা। চার পৃষ্ঠার চিঠি—আসছে গ্রাম থেকে। মায়ের জ্ববানীতে লেখা। পূত্রকে স্নেহ জানিয়ে তিনি লিখেছেন কিছু টাকা পাঠাতে। আর জানিয়েছেন মেজ ছেলে ও পুত্রবধূর আচরণের কথা। তা ছাড়া দেশের সংবাদও জানিয়েছেন সবিস্তারে। তাতে জানা যায়—দেশ এখন শান্ত। আসন্ন বাঁটোয়ারা সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা তো চলছেই—খানিকটা উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়েছে। বড়লারের ঘোষণা অস্থায়ী—অস্থায়ী বিভাগে কোন পক্ষ উল্লসিত—কোন পক্ষ ভ্রিয়মান হলেও রায়ডব্লিফ রোয়েদাদের দিন গুনছে। তখন কিছু অশান্তি ঘটতে পারে—তবে সবাই আশা করে কলিকাতায় নোয়াখালির পুনরায়ত্তি হবে না। মলয়ের কি মত?—এসব মায়ের জ্ববানীতে এলেও লেখকের অমুসন্ধিৎসার প্রকাশ। আর একটা খবর সর্বশেষে দিয়েছেন মা এবং সত্যতরে জানিয়েছেন যে যেখানে থাকুক জঘাতিটার টানে মায়ের কোলে একদিন ফিরে আসেই। মলয় কি

ফিরে আসবে না? সর্বশেষের খবরটি এই—হুগা মোহন পক্ষাঘাতে মারা গেছেন—প্রশান্ত বাড়ী ফিরে এসেছে। সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়ে—ওর বাগদত্তা বধূ। রূপে-গুণে মেয়েটির তুলনা নেই; আবার ধনবতীও—শোনা যাচ্ছে এই বিয়েতে যোতুকই পাবে একটা লাঞ্ছিত টাকার সম্পত্তি—

মলয় হেসে বললে, রূপগুণের ওজনটা খাঁটি কি বল চিত্রা?

সুচিত্রা বললে, যতই সাম্যবাদের জাঁক করি না আমরা আমাদের মন থেকে ও-বিষ সহজে যাবার নয়।

যাবে দেশে?

না। মুখ নামিয়ে সুচিত্রা উত্তর দিলে। সেবারও তো যাবার সব ঠিক করেছিলাম কিন্তু—

শেষ পর্যন্ত আমিই পিছিয়ে ছিলাম—নয়? কি করি চিত্রা—মার সেই চিঠিখানা যদি না আসত—

আজ তো মা তোমার যেতে লিখেছেন।

তোমাকে যেতে লেখেন নি।

তবু তোমার কর্তব্য—

মলয় একটু হাসল। বললে, জান চিত্রা—এই পৃথিবীটা আশ্চর্য্য। সম্পদ আমাদের মনকে এতখানি বিধিয়ে তুলেছে যে আসল-মেকি চিনলেও—মানতে পারি না। একটু ধেমো বললে, আমি না গিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিই যদি—তাতেই মা খুশী হবেন। হয়ত বেশী খুশী হবেন। যুহু একটা নিশ্বাস পড়ল।

সুচিত্রা বললে, এমনও হতে পারে ছুটি জিনিষই তাঁর অত্যন্ত দরকারী।

স্বাভাবিক সেটা। সংসার যাকে ঘিরে ধরেছে চারদিক থেকে—সে সংসারের তুচ্ছ জিনিষটিকে পর্যাপ্ত আগলে রাখতে চায়। তা হয় না বলেই আমরা অনেক দুঃখ পাই।

মলয়ের গভীর দুঃখ সুচিত্রাকে স্পর্শ করল। সাধুনা দেবার চেষ্টা না করে সে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নিলে। আচ্ছা, প্রশান্ত-ঠাকুরপো তা হলে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করলে না—যার জন্ত ও বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

মলয় বললে, সে এখন একটা ক্যান্ট্রীর ম্যানেজার—তার মনের খবর জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব কি?

সুর আগেই কেটে গেছে—এ প্রসঙ্গটাও তাই ভেসে গেল। সুচিত্রা আর কি বলবে ভেবে পেল না। টেবিলের ওপর একখানা বই পড়ে ছিল, গান্ধীজীর নোয়াখালি-ভ্রমণের বৃত্তান্ত। গান্ধীজীর সত্য-পরীক্ষার শেষ অধ্যায়। পরীক্ষা শেষ হতে না হতে তিনি বিহারে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে গেছেন দিল্লীতে। স্বাধীন ভারতের কর্তব্য নির্ণয়ে তাঁর উপস্থিতি প্রয়োজন—অত্যাশ্রয় স্বাধীনতার মুখে চারদিকে জ্বলছে আগুন। গান্ধীজী তাঁর সমগ্র শক্তি দিয়ে রোধ করতে চান এই বহিঃস্থিতিকে—অকল্যাণকে।

বইখানা হাতে নিয়ে সুচিত্রা বললে, পড়বে?

মলয় বললে, বেশ ত। গান্ধীজী বলেন, স্বাধীনতা আসছে। এত দিন পরশাসনের প্রতিবাদে যে সংগ্রাম-শক্তি আমরা প্রয়োগ করেছিলাম—সেই শক্তিকে গঠনের কাজে নিয়োগ করতে হবে। ভারতীয় রাষ্ট্র ভারতবর্ষীয়দের রাষ্ট্র—কোন ধর্মগত দাবি নিয়ে সে সার্থক হতে পারবে না। স্বাধীনতা আর স্বরাজ্য এ দু'য়ের মধ্যে কোনটা বড় জ্ঞান সুচিত্রা?

সুচিত্রা বললে, স্বাধীনতা?

না—স্বরাজ্য। মলয়ের সংক্ষিপ্ত গভীর স্বর নিম্নতর কক্ষে প্রতিধ্বনিত হ'ল।

স্বাধীনতার সাধনা আমাদের প্রায় শেষ হয়ে এল—এবার চলবে স্বরাজ্যের সাধনা। শোন।

মলয় বইখানা হাতে তুলে নিলে।

৩২

স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার শেষ অধ্যায় চলছে। কঠিন পরীক্ষা সম্মুখে। বহুবাধা অতিক্রম করতে হয়েছে—বহু প্রতিবন্ধক রয়েছে সামনে। মার্চের শেষ থেকে আবার যে আত্মঘাতী কলহ সুরু হয়েছে কলকাতায়, তার মধ্যে স্বাধীনতার ঘোষণাকে সর্বাঙ্গঃকরণে মেনে নেওয়া যাবে কি না—এই আশঙ্কা জাগছে সকলের মনে। পূর্বপাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হলে আবার ধ্বংসলীলার অহুষ্ঠান হবে হয়ত। গান্ধীজী আশ্বাস দিয়েছেন ঐ দিন তিনি পূর্ব-পাকিস্থানে থেকে স্বাধীনতা-দিবস পালন করবেন। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীসভা কান্সলাভ করবে; সরকারী কর্মচারীদের লিখিত ভাবে জানাতে হবে—পাকিস্থান অথবা ভারতবর্ষ—কোন ডোমিনিয়নে তারা যোগদান করবে। পাঠান পুলিশ কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হচ্ছে। ভাগা-ভাগির কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজ নিয়ে—পদস্থ কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। গান্ধীজীও এসেছেন কলকাতায়। দু-একদিন এখানে কাটিয়ে যথাসময়ে তিনি নোয়াখালি যাবেন। সংবাদপত্রের নিত্যনুতন সংবাদে বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

আর সেই উত্তাপের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল অচিরেই। হানাহানি কাটাকাটি ত চলছিলই—স্বাধীনতা-দিবসের সপ্তাহ-খানেক আগেই তা দাবানলের মত শহরে ছড়িয়ে পড়ল। আক্রমণ ও আত্মরক্ষার যে সব উপকরণ এতদিন গোপনে গোপনে সঞ্চিত হয়েছিল—পুলিস-শাসন শিথিল হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রতিহিংসাকে শাণিত করে তুলল। বিদ্যায়ী প্রধান মন্ত্রী গান্ধীজীর কাছে প্রার্থনা জানালেন—স্বাধীনতা-দিবসে তিনি যেন কলকাতা ত্যাগ না করেন। গান্ধীজী কর্তব্য বেছে নিলেন। বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় বসে তিনি সারা বাংলাকে রক্ষা করবার দ্রত গ্রহণ করলেন। সেই সঙ্কল্পে

নগরোপান্তে এক অখ্যাত পল্লীতে এসে আশ্রয় নিলেন—আরস্ত হ'ল অগ্নিপরীক্ষা।

এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন বাপুজী ?

সুচিত্রার প্রশ্নে ডায়েরি লেখা বন্ধ করলে-মলয় ? তোমার কি মনে হয় চিত্রা ?

কালকের রাজির ঘটনা পড়েছ তো—ক্ষিপ্ত জনতা তাঁর বাসগৃহ আক্রমণ করেছিল—তাকে আঘাত করেছিল।

দাঁড়াও লেখাটা শেষ করি। সত্যকে সামনে রেখে যিনি বলতে পারেন—হয় জীবন, নয় মৃত্যু—তাকে এই ভাবেই বারবার পরীক্ষা দিতে হয়। আর সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। কাল রাত্রিতে গান্ধীজী অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

ডায়েরিটা বন্ধ করে মলয় হাসল।

বাঃ রে—কোথায় পেলো এ খবর। বিষয়ে প্রশ্ন করলে সুচিত্রা।

চল—দেখবে। হিংসার উত্তত ফণা যেইমাত্র নত হ'ল—তখনই হ'ল সত্যপ্রসারী জয়। চল দেখে আসি।

হুজুনে গান্ধীজীর আশ্রয়স্থলের দিকে এগুতে লাগল। পদব্রজেই চলল। যেন তীর্থযাত্রা করেছে। বহু অখ্যাত পল্লী দিয়ে নির্ভয়ে ওরা অগ্রসর হ'ল। আরও অনেকে চলেছে। নিরস্ত্র—নির্ভীক। কয়েকদিন আগে এই পথ দিয়ে সশস্ত্র হয়েও চলবার কল্পনা পর্য্যন্ত কেউ করত না।

তীর্থে এসে দেখলে—হিংস্র সাপটা ফণা নীচু করে পড়ে আছে। ষ্টেনগান, বোমা, এসিড বাল্ব, তীর, বর্শা, তরবারি প্রভৃতি নানান রকমের মারাত্মক অস্ত্রে আকীর্ণ হয়ে রয়েছে গৃহ-প্রাঙ্গণ।

মলয় হাসিমুখে সুচিত্রার পানে চাইলে, কি চিত্রা, পরীক্ষা শেষ হয় নি ?

সুচিত্রা উত্তর না দিয়ে যুক্ত কর ললাটে স্পর্শ করলে। ওর হুট চোখের কোণ অক্রবাস্পে মেঘের হয়ে উঠল।

স্বাধীনতার উৎসবের ঢেউ গ্রামেও এসে লাগল। তবে র্যাডক্লিফ রোয়েদাদ প্রকাশিত না হওয়ায় দ্বিধা সন্দেহে ছলতে লাগল হু'পফের মন। তবু উভয় পক্ষেরই আয়োজন চলল—গোপনে এবং প্রকাশে। বড়লাটের অস্থায়ী ঘোষণা অস্থায়ী এ গ্রাম আপাতত পাকিস্তান এলাকায়—র্যাডক্লিফ ঘোষণা না বেরলেও—গোপন সংবাদে জানা গেছে ভারত-রাষ্ট্রে সংলগ্ন হয়েছে এ জায়গা। প্রকাশ ঘোষণা না হলে—উৎসব করতে নিষেধ করে দিয়েছেন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। হিন্দুরা তাই ত্রিযমাণ চিত্তে রোয়েদাদের অপেক্ষায় দিন গুনছে। রীতিমত আশঙ্কাও জেগেছে তাদের মনে। যারা অতি সাবধানী তারা ইতিমধ্যে যতদূর সম্ভব—স্বাবর-অহাবর সম্পত্তি ভারত-সীমানায় অর্থাৎ গুদার অপর পারে চালান

করে দিয়েছে। কেউ উঠেছে আস্থায়ী-বাড়ী—কেউ নিয়েছে অস্থায়ী ভাড়াবাড়ী। কেউ কেউ জমির বায়না দিয়েও রেখেছে—শেষ ফল জেনে সরে পড়বে। মোট কথা হু'শো বৎসরের দাসত্বমোচনের উল্লাসকে সর্ব্বাঙ্গঃকরণে মেনে নিতে পারছে না কেউ। তবু উৎসবের আয়োজন চলছে। নব্বু-দাছুর বৈঠকখানায় ছেলেরা জমায়েত হয়েছে। একটা হারমোনিয়ম এসেছে—তার সঙ্গে একটা ক্ল্যারিওনেট বাঁশী—আর একটা পিকল জোঁগাড় হয়েছে। স্বদেশী গানের বই থেকে বাছা বাছা কয়েকটি গানের মহলা দেওয়া চলছে। বাড়ীর ভেতরে উৎসাহী ছেলেরা মিলে তৈরি করেছে অশোকচক্র-চিহ্নিত তিনরঙা পতাকা—লাল শালুর অভাবে—লালরঙে ঝাকড়া ছুপিয়ে তাতে তুলো বসিয়ে তৈরি করছে স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণাবাণী—জয়হিন্দ—বন্দেমাতরম্। দিল্লী পৌছে গেল যারা তাদের দিল্লীযাত্রার তাগিদ বা লাল কেন্না ধ্বংস করার উৎসাহ না থাকাই স্বাভাবিক। শ্লোগানটা বাদ পড়েছে। আর তৈরি হচ্ছে নেতাদের প্রতিমূর্ত্তি—গ্রাম্য পট্টয়ারা আঁকছে। সুচিপাঠায় খবর দেওয়া হয়েছে—সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র তারা যেন যন্ত্রপাতি নিয়ে ইকুলের মাঠে এসে জমায়েৎ হয়। এখান থেকেই বিরাট একটি শোভাযাত্রা বেরবে—চুচকাওয়াড়ের ভঙ্গিতে। পুরোভাগে থাকবে গান্ধীজী আর নেতাজীর পুষ্পমালাভূষিত সুরহং ছবি। পরি-কল্পনা প্রতিদিন পরিপূর্ণ হচ্ছে। শহর থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জাররা এসে বর্ণনা দিচ্ছে কি ভাবে ওখানকার উৎসব হবে। হিন্দুরাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে কোনো কোনো উৎসাহী যুবক। গান্ধীজী একা আর কি করবেন। বন্ধ হয়েছেন—ওঁর এখন এ সব চিন্তা না করাই ভাল। এই ধরনের সংবাদে এরাও চক্কল হয়ে উঠেছে, কিন্তু পাছে শান্তিভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় মথেষ্ট বন্দুকধারী সৈন্য মোতায়েন করা হচ্ছে—শহরে, গ্রামে। কংগ্রেস-নেতারা উপদেশ দিচ্ছেন—অহিংস থাকতে। তাঁদের অনুরোধ পাকিস্তানের আত্মগত্য স্বীকার করে জনগণ যেন সংঘত থাকে—শান্ত থাকে। ভাবোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বল হয়ে আনন্দ প্রকাশ করলে স্বাধীনতাকে অসম্মান করা হবে। বলা বাহুল্য—এই উপদেশ বা অনুরোধে অনেকেই মনঃক্ষুব্ধ হয়েছে। হৈ হৈ কাঙ রৈ রৈ ব্যাপার না করে নিরীহ গোছের একটি শোভাযাত্রা, খানিকটা বন্দেমাতরম বা জয় হিন্দ বলে চৈচানো, কোন মাঠে লোক জমিয়ে কিছু জোলা বক্তৃতা—এরই জুহু হু'শো বছর ধরে এত কাঙকারখানা, জেলখাটা সর্ব্বদ্বাস্ত হওয়া, কাঁসি কাঠে কোলা, গুলি বা বিষ খেয়ে মরা—এ সবের কি দরকার ছিল ? উত্তেজক সুরার মত যদি উৎসবকে না গ্রাণ ভরে পান করতে পারলাম—তবে কেমনতর উৎসব এ ? বাঁটিতে বাঁটিতে পাঠান পুলিশ বসিয়ে শান্তি রক্ষার অহিলায় ধমক



দিচ্ছেন বাংলা-সরকার, খবরদার অছায় কাজ কর না—শান্তি পাবে। তবু রাষ্ট্রক্লিষ্ট সাহেবের রোয়েদাদ বেরুলে—দলবৈধে রাস্তা দিয়ে যখন চৈচাতে চৈচাতে যেতে পারবে তখন উৎসবের নাচে প্রতিশোধস্বপ্নের খানিকটা অন্তত চরিতার্থ করে নিয়ে এরা পরিতুষ্ট হবে। পনেরোইএর মধ্যে খবরটা কি আসবে না।

হেমলতা আশুর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দিদি—দিন-কতকের জ্ঞান না হয় আবার ময়রাপাড়ায় গিয়ে থাকি। কি বল?

আশুর মা বললেন, মরণ—কি দুঃখে যাবি সেখানে। শুনছি রাজ্যি আমাদেরই হবে। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুললে হেঁটে কাঁটা আর ওপরে কাঁটা দিয়ে ডালকুড়ো দিয়ে খাওয়াবে না?

সাহস সঞ্চয় করে হেমলতা ভিটের পড়ে রইলেন। বড় বাঁড়ীটা শূণ্য খাঁ খাঁ করছে। মেজ ছেলে বউ নিয়ে কলকাতা-বাসী হয়েছে। যে সংসার কোলাহলে পূর্ণ ছিল—সেখানে আজ সাধন ভক্তের অমূল্য আবহাওয়া। বুদ্ধ বয়সে নিরিবিবিলিতে বসে হৃদয় ভগবানের চিন্তা করবার আকাঙ্ক্ষা কি-মানুষের মনে জাগে না? এই রকম অবসর পেলে অনেকে ত ধন হয়ে যান। তবু হেমলতা এমন অখণ্ড অবসর চান না। সংসারে আজ তাঁর কেউ নেই—অথচ ভাঁড়ারে গুহানো জিনিসের প্রাচুর্য—রাবার ঘুম নেই, গৃহপরিপাটের শ্রম আছে; যে সংসারের তুচ্ছতম খবরে বাইরের বড় পৃথিবীর আকর্ষণ গতি স্থানান্তরিত সে সংসার হেমলতার কল্পলোক থেকে মুছে যাচ্ছে—তবু তাতেই মগ্ন হয়ে রয়েছেন তিনি। উঠান কাঁটা, বাসিপাট সারা—শাকের ক্ষেত বা ফুলগাছে জল ঢালা, রাবার আয়োজন—ঘর-বারান্দা ধোয়া মোছা—লেগ বালিশের ওয়ার তৈরি, ঘর-বারান্দার ঝুল ঝাড়া—কি না করছেন তিনি। দুপুরে খাওয়ার পর মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে খানিকটা ঘুম, ঘুম থেকে উঠে—এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পান—দুটি পান ও এক খামচা দোস্তা গালে দিয়ে কোন দিন প্রশান্তদের বৈঠকখানা ঘেঁষে আড়িপাতা কোন দিন বা পাড়ায় টুহল দিয়ে সংবাদ বিতরণ ও সংগ্রহ কোনটির অঙ্গহানি ঘটছে না। ঘুম তাঁকে শুধুই আনন্দ দেয় না—দুঃখও নিরবচ্ছিন্ন বেদনাদায়ক নয়। এ দুয়ের ওপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে বৃহৎ ভিটের স্বচ্ছন্দে দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন। দেশের স্বাধীনতা কি বস্তু হেমলতা বোঝেন না—তবে চারদিকে যে কিদৃশ কানাকানি চলছে তাতে উত্তেজনা খানিকটা—খানিকটা কৌতূহল আর তৃপ্তিও বেশ লাভ হচ্ছে। প্রশান্তদের বৈঠকখানায় প্রায়ই আলোচনা বসে—এবং রোয়াকের কোল ঘেঁষে তিনিও জলের গ্লাস ও জরদার কোটা নিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করেন। কয়দিন আগে প্রশান্তদের উপরে তাঁর কৌতূহলটা উগ্র হয়েছিল।

মালতী মেয়েটি চলে যাওয়াতে সে কৌতূহল স্তিমিত হয়েছে—এবার রটনার বিষয় অভাবে রসনাও প্রায় শুষ্ক হয়েছে। কিন্তু মেয়েটি ভাববার খোরাক যথেষ্ট রেখে গেছে। আশ্চর্য্য ছেলে মেয়ে আজকালকার! ওরা মিশবে হাসবে কথা বলবে নির্লজ্জের মত অথচ বিয়ে করবে না।

কথাটা পেড়েছিলেন এক দিন, হাঁ দিদি—এই মেয়েটির সঙ্গেই তো ঠিক করলে? তা স্বয়ম্বর হয়েছিলেন সেকালে দময়ন্তী—

প্রশান্তর মা গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছিলেন, ছেলে আমার আগে সারুক—তারপর বিয়ে।

টোক গিলে বলেছিলেন হেমলতা, তা বিয়ে হবে তো। ওই মেয়েটি না থাকলে—ছেলেকে কি ফিরে পেতে ভাই।

সেও তাঁর দয়া। উপর দিকে চেয়ে প্রশান্তর মা কাজের অছিলায় অল্প ঘরে গিয়েছিলেন চলে। সেই থেকে প্রকাশ্য সংবাদ নেওয়া দুফর জেমে হেমলতা জরদা আর জলের গ্লাস নিয়ে ওদের বৈঠকখানা ঘেঁষেই প্রায় স্তব্ধ থাকেন।

স্বাধীনতা-উৎসবের দু'দিন আগে মালতী বললে, কলকাতায় যাবে না তুমি?

না।

মামা চিঠি লিখেছেন আমায় যেতে। তোমাদের ফ্যাক্টরী তো ভালই চলছে। স্বাধীনতা-উৎসবে শ্রমিকদের কিছু বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা নাকি হচ্ছে।

ভাল।

আচ্ছা—তুমি এমন মুমূর্ষু পড়লে কেন বল ত? আর কি ফিরে যাবে না?

কি হবে সেখানে গিয়ে—কাজের যখন অল্পবিধে হচ্ছে না। প্রশান্তর কণ্ঠস্বর নিরুৎসাহ।

কিন্তু মামা লিখেছেন—একখানা চিঠিতে নয় প্রায় প্রত্যেক চিঠিতে লিখেছেন—তোমার জ্ঞানই নাকি অভাব বর্জ্জ বন্ধ হয়ে গেল।

আমার জ্ঞান। প্রশান্ত হাসল। আমি তো তখন শয্যাশায়ী।

তার ফলে শ্রমিক-নেতাদের সঙ্গে কি সব চুক্তি নাকি করেছিলে—

চুক্তি। আমি করেছিলাম? প্রশান্তর কণ্ঠস্বর উচ্চ হ'ল।

হাঁ—সেই রফা অমুসারেই তো দশ হাজার টাকা দিয়ে—এতবড় ব্যাপারটা মিটল।

প্রশান্তর স্বর পুনরায় স্তিমিত হয়ে এল। সে বললে, তা হবে।

হবে নয়—সবাই জানেন—

সহস্র উত্তেজিত হয়ে উঠল প্রশান্ত, আচ্ছা মালতী, এতবড় অসম্মানের বোকা আমার কাছে না চাপালে কি চলছিল না?

অসম্মান ? বিষয়ে প্রশ্ন করলে মালতী।

হাঁ—বিশ্বাসঘাতকতাও বলতে পার। কিন্তু বিশ্বাস কর—এ কাজ আমি করি নি—আমি করতে পারি না। অত্যন্ত কাতর স্বনাল তার স্বর।

মালতী তার একখানি হাত টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিলে, আঃ কি পাগল তুমি ! ছিঃ লক্ষীট, আবার কঁাদে।

ফৌপানোর শব্দ—সান্ত্বনা দেওয়ার গদগদ ভাষা—আরও কলিত কয়েকটি মধুর আশ্বাসের স্পর্শ—হেমলতা ছরছর বুক উঠে বসলেন।

তারপর দিন মালতী চলে গেল। পাড়ায় রটল প্রশান্ত তার সন্মানহানি করেছে।

তারপর বছরের মত এল কতকগুলি ঘটনা। স্বাধীনতা-দিবস ঘোষিত হ'ল ঘটা করে। মুসলমানরা আল্লা-হো-

আকবর রবে ঘরবাড়ী কাঁপিয়ে—রাস্তা দিয়ে মার্চ করে গ্রামের বারোয়ারি ভলায় একটা প্রকাণ্ড বাঁশের খুঁটিতে চাঁদ-তারামার্চ পতাকা টাঙিয়ে দিল। এ যেন স্বাধীনতার জয় ঘোষণা নয়—দ্বিজাতিতত্ত্বের বনিয়াদের গাঁথুনকে পাকা করবার জন্ত খানিকটা সিমেন্ট আর খানকয়েক ইট বসানো হ'ল। ছ'দিন বাদে র্যাডক্লিফ রোয়েদাদ বেরুনোর পর হিন্দুরা দিলে এর প্রত্যুত্তর। চাঁদ-তারাকে ভূমিশায়ী করে অশোকচক্রাঙ্কিত তিন বর্ণের পতাকাকে উড্ডীন করে দিলে সেইখানে। ব্যাঙ বাজিয়ে সদর্প কূচ কাওয়াজ—জয়ধ্বনি আর মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীত আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। বলা যেতে পারে এরাও আর খানকয়েক ইট আর কিছু মশলা দিয়ে পার্থক্যের বনিয়াদকে আরও শক্ত করে দিলে। স্বাধীন হ'ল ভারতবর্ষ। (ক্রমশঃ)

## রবীন্দ্রনাথ : শিল্পী ও দার্শনিক

শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়

মাহুষ সীমাবদ্ধ জীব। ভাষাটুকু তার অর্থ দিয়ে ধেরা—সে অর্থ দেখে সীমায় পীড়িত মানবের চারিপাশে নিরন্তর ঘুরে বেড়ায়। অথচ মাহুষ চায় মুক্তি—সীমার বন্ধন থেকে মুক্তি। এই মুক্তিসাধনায় প্রয়োজন শিল্পী। তাই তো এলেন শিল্পী, সৃষ্টি করলেন ভাষার মধ্যে ভাষাতীতকে—রূপের মধ্যে অরূপকে। রবীন্দ্রনাথ “ভাষা ও ছন্দ” কবিতায় লিখেছেন—

“মানবের জীব্য বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব স্বর  
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর  
ভাবের স্বাধীন লোকে।”

এই হচ্ছে প্রকৃত শিল্পীর কাজ। আর্ট দেয় মাহুষকে সীমা থেকে মুক্তি, শিল্পী আমাদের ভুলিয়ে দেয় পৃথিবীর অন্তর্বিহীন বন্ধন। নিখিল-বিশ্বের সহিত মাহুষের একটা নিগূঢ় যোগ আছে, অথচ মাহুষের কাছে অনেক সময়ই তা থাকে অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত। শ্রেষ্ঠ শিল্পী সেই নিগূঢ় যোগকে প্রকাশ করে। শিল্পী প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা থেকে মানবাত্মাকে দেয় মুক্তি, তাকে নিয়ে যায় অসীমের পথে, তার মধ্যে জাগিয়ে তোলে হৃদয়ের পিপাসা। বাসনা থেকে মানবাত্মাকে মুক্তি দেওয়াই যে কবি বা শিল্পীর কাজ, রবীন্দ্রনাথ সে কথাই “ফাল্গুনী”তে কবি-বাউলের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন।

প্রত্যেক মাহুষের মধ্যে আছে একটা কবি বা শিল্পী-মন, কিন্তু সাধারণ মাহুষের কাছে তার প্রকাশ নেই। একমাত্র প্রকৃত শিল্পীই পারেন মাহুষের অন্তর্নিহিত শিল্পীকে মুক্তি দিতে, সীমার মধ্যে অসীমের যোগমুখ রচনা করতে। এখন

দেখতে হবে আর্টের জন্ম-রহস্যের মূল কোণায়। বাইরের জগতে যে অজস্র আনন্দধারা নানা রূপে নানা বর্ণে বিকীর্ণ হচ্ছে তা শিল্পীর মনে সাদ্ধা জাগায়। শিল্পী ভুলে যায় সব, ভুলে যায় নিজেকে, অন্তর্বিহীন আনন্দধারার সহিত আপন সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে একীভূত করে দেয়—জীবনে আসে সৃষ্টির মাহেন্দ্র ক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “আজকের আকাশে যে তীক্ষ্ণ নির্মমতা, তার মধ্যে ভয়ানক ছুঁধের আশঙ্কা আছে। এর যেমন একটা বাণী আছে, তেমনি বসন্তকালে আনন্দের রবে চতুর্দিক ভরে উঠে, তাতে আমরা কান দেই বা না দেই, তার প্রতি সম্পূর্ণ অগমনক্ষ থাকে আমাদের পক্ষে অসম্ভব।”

“এই বাণীর ভাষায় কোথাও প্রকাশ নেই, ব্যাকরণগুস্ত বানানো কোনও কথা নেই, কিন্তু তার একটা ধ্বনি আছে তা অনির্বচনীয়। সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করে সেই ধ্বনি উঠে। আমাদের চারিদিকে যা রয়েছে তা অসীম, তার কোন নির্দিষ্ট ভাষা নেই, তা অতি বিরাট, কবি তাকে ছন্দের মধ্যে ছাঁচের মধ্যে ফেলে তৈরি করে তুলেছেন, তিনি মনের ভিতর যে প্রতিমা গড়েছেন তাতে তার আশা, ভালবাসা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। এই হচ্ছে কবির কাজ। তাকে হৃদয়ের সীমায় বাধতে চেয়েছেন, তাই তিনি তার মানসী প্রতিমা গড়েছেন, সেই প্রতিমায় রূপ নিয়েছে তার আশা, তার ভালবাসা।”

নিখিল-বিশ্ব অন্তরে-বাহিরে নিরন্তর যে বিচিত্র সংঘাত দ্বারা কাব্যরূপের সৃষ্টি করে, কবি তাকে রসের পথে ভাষা-

অলঙ্কারে গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের “মানসী” কাব্য-গ্রন্থের “উপহার” কবিতাটি তারই অভিব্যক্তি :

“নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে  
জগতের তরঙ্গ আঘাত,  
ধ্বনিত হৃদয় তাই মুহূর্ত বিরাম নাই  
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।  
সুখ দুঃখ গীতস্বর ফুটেতেছে নিরন্তর  
ধ্বনি শুধু সাথে নাই ভাষা ;  
বিচিত্র কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে  
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।  
এ চির জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই  
রচি শুধু, অসীমের সীমা ;  
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে  
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।”

শিল্পের জন্ম আনন্দের মধ্যে। নিখিল-বিশ্বের আনন্দধারা কবি-চিত্তে ধ্বনিত হয়ে উঠে, কিন্তু সে ধ্বনি নির্দিষ্ট নয়, স্পষ্ট নয়—তা বিরাট, তা অসীম। এই নিয়েই তো শিল্পীর কারবার। তাই শিল্পীর সাধনায় দেখি তিনি নির্দিষ্টকে চান না—চান অনির্দিষ্টকে, অরূপকে—রূপাতীতকে।

আর্টের সৃষ্টি আনন্দের মধ্যে, আর্ট তাই মানুষকে দেয় আনন্দ। নিখিল প্রকৃতির আনন্দধারার সহিত ‘আপন মনের মাধুরী মিশায়ে’ কবি রচনা করেন তাঁর কাব্য। আর্ট মানুষকে আনন্দ দান করে, তা বলে একথা যেন কেউ না মনে করেন, আনন্দ দিতে হবে এই সজাগ উদ্দেশ্য নিয়েই আর্টিষ্ট সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আর্টিষ্টের অন্তরে যখন আনন্দবেগ ছরীর হয়ে ওঠে তখন তিনি তা প্রকাশ না করে পারেন না। অন্তরের মধ্যে রস উচ্ছল ও ছুঁবার হয়ে উঠলে তবেই প্রকৃত আর্টের সৃষ্টি সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথ বারবার নানা জায়গায় নানা প্রবন্ধে এই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, আর্টের জন্ম প্রয়োজনাতীত আনন্দের মধ্যে—রসের মধ্যে। প্রয়োজনে মানুষ দীন, আত্মস্থ, অপ্রয়োজনে সে ঐশ্বর্যবান—সে সকলের। তাঁর নিজের ভাষায়, “যে রস সর্বপ্রকার প্রয়োজন মাত্রকে অতিক্রম করিয়া বাহিরের দিকে ধাবিত হয়, তাহাই সাহিত্যরস। এইরূপ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদকেই আমরা ঐশ্বর্য বলিয়া থাকি। সাহিত্য মানব-হৃদয়ের ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্যেই সকল মানুষ সম্মিলিত হয়—যাহা অতিরিক্ত তাহাই সর্বসাধারণের।”\* “বিশ্ব-সাহিত্য” প্রবন্ধেও কবি সেই একই কথা জানিয়েছেন, “সাহিত্যে আমরা কিসের পরিচয় পাই? না, মানুষের যাহা প্রাচুর্য, যাহা ঐশ্বর্য, যাহা তাহার সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

যাহা তাহার সংসারের মধ্যেই ফুরাইয়া যািতে পারে নাই।”\* ‘শিক্ষা’ বা ‘সাহিত্য’ গ্রন্থে কবি যে কথা বলেছেন, সে কথাই Religion of an Artist নামক প্রবন্ধে এবং অগ্রদূত স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, সাহিত্যসৃষ্টির জন্ত দরকার রসের, কিন্তু সে রস হবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কেননা যা প্রয়োজনের চেয়ে বেশী তাই আমরা আর এক জনকে দিতে পারি। সাহিত্যরস সকলের জন্ত। তাই সাহিত্যের এত গৌরব।

প্রয়োজনে মানুষ বদ্ধ, সেখানে তার প্রকাশ নেই, অথচ মানুষের অন্তরাত্মা ডুকরে কেঁদে উঠে আত্মপ্রকাশের জন্তে। তারই জন্তে এল চিত্র, এল সঙ্গীত, এল নৃত্য—এগুলি মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তাই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছে চিত্রের মধ্য দিয়ে, সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে, নৃত্যের মধ্য দিয়ে। প্রয়োজনের ভিতরে মানুষের পরিপূর্ণ প্রকাশ নেই, নেই তার অঞ্চল বিকাশ। সম্পূর্ণ প্রকাশ আছে একমাত্র সাহিত্য আর শিল্পে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “যতই আলোচনা করছি ততই অসুভব করছি যে সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ।...মানুষের প্রবাহ ছ হ’করে চলে যাচ্ছে; তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর কোথাও থাকবে না, কেবল সাহিত্যে থাকবে। সঙ্গীতে চিত্রে, বিজ্ঞানে দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই। এইজন্যই সাহিত্যের এত আদর। এইজন্যই সাহিত্য সর্বদেশের মানুষের অক্ষয় ভাণ্ডার।”

সৃষ্টির মধ্যে যেমন স্রষ্টার লীলা তেমনি মানুষের লীলা চলেছে সাহিত্যে। সাহিত্যে মানুষ নিজেকেই বিচিত্র রূপে দেখে। মানুষ এক—সাহিত্যে সে বহু এবং বিচিত্র। সাহিত্য তাই ব্যক্তির প্রকাশ। যারা বলেন সাহিত্য নৈর্ব্যক্তিক তাঁরা ভুলই করেন। সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ-অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “হৃদয় আপনার ভিতরের আকাঙ্ক্ষা ও আবেগকে যখন বাইরের কিছুতে প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, তখন অন্ততঃ সে নানা উপকরণ লইয়া নিজের হাতে তাহার একটা প্রতিরূপ গড়িবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করে। এমনি করিয়া জগৎকে আপনার ও আপনাকে জগতের করিয়া তুলিবার জন্ত হৃদয়ের ব্যাকুলতা কেবলি কাজ করিতেছে।”† এই চেষ্টাতেই সাহিত্যের সৃষ্টি। সুতরাং সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ না থাকার কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত নয়। এখানে ‘ব্যক্তি’ শব্দটিতে তার ধাতুযুক্ত অর্থের উপরই জোর দিতে চাই। স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তাই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্র। বিশ্বজগতে তার

\* সাহিত্য—পৃঃ ৬৩

† সাহিত্য—পৃঃ ৫৯

সম্পূর্ণ অল্পরূপ আর দ্বিতীয় নেই।”\* প্রেম হবে, এই ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় কোন্ পথে? হৃদয় যখন পরিপূর্ণ আনন্দে রসের তরঙ্গে উচ্ছল হয়ে ওঠে, প্রয়োজন নিঃশেষে শেষ হয়ে যায় তখনই ব্যক্তি ‘বেগের আবেগে’ প্রকাশমান হয়। এই প্রকাশে মানুষ পায় নিজেকে—তার আত্মাকে। এই প্রকাশের পথে মানুষ সীমার বন্ধন হতে মুক্তি পায়; সীমার মধ্যে পায় অসীমের সন্ধান। রবীন্দ্রনাথ বলেন, “‘আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিতীতি’—আনন্দরূপের অমৃতবাণী বিধে প্রকাশ পাচ্ছে, জলে স্থলে, ফুলে ফলে, বর্ণগন্ধে, রূপে সঙ্গীতেন্ত্যে, জ্ঞানে ভাবে-কর্মে। কবির কাব্যও সেই বাণীর ধারা; যে চিত্তযন্ত্রের ভিতর দিয়ে সেই বাণী ধ্বনিত হয়, তার প্রকৃতি অল্পসারে এই প্রকাশ আপন বিশেষত্ব লাভ করে। সেই বিশেষত্বই অসীমকে বিচিত্র সীমা দেয়। এই সীমার সাহায্যেই সীমার অতীতকে আপন করে নিয়ে তার রস পাই।”† তা হলে দেখা যাচ্ছে যে অনন্তের সন্ধান দার্শনিক করেন, কবিও চান সেই অসীমকেই প্রকাশ করতে। কথ্যটা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। কবি সৌন্দর্যের পূজারী আর দার্শনিক সত্যের সাধক। কবি বা শিল্পী সৌন্দর্যের পূজারী বটে, কিন্তু সকল সৌন্দর্যের নয়—আনন্দজাত সৌন্দর্যের। প্রেম হবে আনন্দ কি? কোথায় তার প্রকাশ?

উপনিষদ বলেন, জ্ঞানময় অনন্ত সত্য অহরহ নিখিল প্রকৃতি ও মানবসমাজে আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশিত হয়ে চলেছেন। এই আনন্দধারা বা নিখিল-বিধে অক্ষয় সৌন্দর্যধারায় প্রকাশমান, কবি বা শিল্পীর কারবার সেই সৌন্দর্য নিয়ে। সুতরাং বলতেই হবে, যে আনন্দজাত সৌন্দর্য নিয়ে কবির কারবার সেই সৌন্দর্য এবং জ্ঞানময় অনন্ত সত্য একই। ইংরেজ কবি তাই বলেছেন, Truth is beauty, beauty is Truth। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “সাহিত্য জানাইতেছে, সত্যই আনন্দ, আনন্দই অমৃত। সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে—‘রসো বৈ সঃ। রসং হেবায়াং লক্ষানন্দীভবতি।’ তিনিই রস, এই রসকে পাইলে মানুষ আনন্দিত হয়।”‡

সৃষ্টির মধ্যে দার্শনিক খুঁজে বেড়ান স্রষ্টাকে, বৈচিত্র্যের মধ্যে সন্ধান করে ফিরেন এক-কে। যে মুহূর্তে সেই এক-কে পান—বলে উঠেন—

বেদাহমেতৎ পুরুষং মহাশুভং

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরশ্রবং।

অর্থাৎ—জ্ঞানধারের পরপারে আমি জ্যোতির্ময় এক-কে পেয়েছি। প্রকৃত কবি বা শিল্পীর সন্ধানও সেই একের জন্ম।

নিখিল-বিশ্বের নানা সৌন্দর্য, নানা বৈচিত্র্য শিল্পীকে বিম্বিত করে, শিল্পী নিজেকে হারিয়ে ফেলেন সেই রসমাধুর্যের মধ্যে। তারপর আনন্দাচ্ছূতির পথে শিল্পীর মনে জাগে প্রেমের পর প্রেম—বিশ্বের এই নানা বৈচিত্র্যের মূল কি এবং কোথায়। সেই জিজ্ঞাসার সমাধান করতে গিয়ে শিল্পী আবিষ্কার করেন বিশ্বপ্রকৃতির নিগূঢ় যোগসূত্রকে—জ্ঞানধারের পারে জ্যোতির্ময় এক-কে। তাই দেখা যায়, কবিরা বাস্তবকে স্বীকার করেও বাস্তবের অতীত এক আদর্শকে বরণ করে নেন এবং সেইখানেই হয় কাব্যসাধনার চরম সার্থকতা।

পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য মাধুর্য, নদীর কলধ্বনি, প্রভাতের সুর্যালোক এবং বসন্তের মিলন-উষার মধ্যে অনন্তকাল ধরে যে সুর ধ্বনিত হয়ে চলেছে তাতে আছে এক অতীন্দ্রিয় জগতের আভাস। রবীন্দ্রনাথ জীবনের সেই আদর্শে বিশ্বাসী। কবি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন সেই ইন্দ্রিয়াতীত জগতের বাণীকে এবং এমনি করে সূত্রের সন্ধান করতে গিয়ে পৌঁছেছেন ‘মহাশু পুরুষ’র কাছে। পুরুষই বলেছি সাহিত্য ব্যক্তির প্রকাশ। মাধুর্যের অন্তরে যে শিল্পী বাস করে সে জন্মগত নিজেকে নানাভাবে প্রকাশ করে থাকে—নিখিলবিশ্বের আনন্দধারা ধীর প্রকাশ তাকেই পাবার জন্ম সে সচেষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

“In Art the person in us is sending its answers to the Supreme Person, Who reveals Himself to us in a world of endless beauty across the lightless world of facts.” (*Personality*, p. 27)

রবীন্দ্রনাথের মতে পৃথিবীর সৌন্দর্য এবং মানবপ্রেম অসম্পূর্ণ; এই সৌন্দর্য, এই প্রেম অসীমের ছায়ামাত্র। অসম্পূর্ণের মধ্যে পরিপূর্ণতাকে, অখণ্ডকে নিয়ে আসতে না পারলে কবি-মানবের চরম তৃপ্তি হতে পারে না এবং কাব্য সৃষ্টিও সম্পূর্ণ সার্থক হয় না। “অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Ideal-এর মিলনেই কবিতার সৌন্দর্য। কল্পনার centrifugal force Ideal-এর দিকে Real-কে নিয়ে যায়, এবং অহরহগের Centripetal force Real-এর দিকে Ideal-কে আকর্ষণ করে; কাব্যসৃষ্টি নিত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না এবং নিত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।”\* কবিত্বের এই উভয় অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা কঠিন, কিন্তু প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যেই সেই সামঞ্জস্য আছে। শ্রেষ্ঠ কবির রচনার তাই তো এত গৌরব।

কাব্যসৃষ্টির গোড়ার কথা আত্মপ্রকাশ, “In Art man reveals himself and his objects।” মনের ধর্ম এই যে, বাইরের জগৎ অন্তরে এসে এক নূতন জগতের সৃষ্টি করে।

\* কবি-পরিচিতি—পৃঃ ১১

† কবি-পরিচিতি পৃঃ ২

‡ সাহিত্য—পৃঃ ৪৮

সেই অন্তরঙ্গগৎ নিজের মধ্যে নিজে সম্পূর্ণ নয়, বাইরে পুনর্ব্যার প্রকাশিত হ'লে তবে সে হয় পূর্ণ। কবি-হৃদয় সেই প্রকাশে তৃপ্ত হয়।

কবি জীবনের পথে বন্ধ নন, তাঁর গতি সর্বত্র। “কান্ডনী” \* নাটকে আছে, “সংসারে যে কেবলি সর, কেবলি চলা; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলি সরে, কেবলি চলে, সেই তো বৈরাগী, সেই তো পথিক, সেই তো কবি-বাউলের চলা।” †

কবি যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও গানের ভিতর দিয়ে নিজকে প্রকাশ করতে করতে চলে, সে কি কেবল অর্থহীন চলা? তাঁর চলার কি কোন স্থির লক্ষ্য নেই? কবি বলেন :

“আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ,  
সেই তো বাঁধায় সেই তো মেটায় দ্বন্দ্ব।  
জানা আমার যেমন আপন ফাঁদে  
শক্ত করে বাঁধে  
অজানা সে সামনে এসে হঠাৎ লাগায় দ্বন্দ্ব  
এক নিমেষে যায় গো কেসে অমনি সকল বন্ধ।”  
তাই কবি ব্যাকুল হয়ে বলে উঠেন—  
“বঁটা যে ঐ বাজলো কবি, হোক রে সভাভঙ্গ।  
জোয়ার জলে উঠচে তরঙ্গ।  
এখনো সে দেখায় নি তার মূণ,  
তাই তো দোলে বুক।  
কোন রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ,  
কোন সাগরের কোন কূলে গো কোন নবীনের রঙ্গ।”

( বলাকা, পৃ: ৮০ )

দার্শনিকের মত শিল্পীও অজানার সন্ধানী। শিল্পী তার সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন—আপনাকে জানতে চান। সেই জানার মধ্য দিয়ে কবি উপলব্ধি করেন নিখিল বিশ্বব্যাপী এককে—অনন্তকে। ভারতীয় কলাসৃষ্টির মূল কথা সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে সপ্রমাণ করেছেন, সৌন্দর্য্যের প্রকাশ সাহিত্যের বড় কথা নয়, সৌন্দর্য্য সাহিত্যসৃষ্টির উপলক্ষ্যমাত্র—অথবা মাহুযকে প্রকাশ করাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য; বাইরের জগৎকে অন্তরের জগৎ—আপনার

জগৎ—মাহুযের জগৎ করে তোলাই সাহিত্যের কাজ। কবি বলেন, মাহুযের সত্যিকার জগৎ সেইখানেই গড়ে উঠে যেখানে সে নিজের মধ্যে অমৃত্যব করে অনন্তকে, জানতে পারে সৃষ্টির মধ্যে প্রত্যেকে,

“Building of man's true world...is the function of Art. Man is true, where he feels his infinity, where he is divine, and divine is the creator in him” ( *Personality* p. 31 )!

রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টি হ'ল ধ্যানী দার্শনিকের দৃষ্টি। কবি দার্শনিক নন, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেরই যে আনন্দাহুতির দ্বারা অহরহ জীবনের ব্যাখ্যা করে থাকেন তা দার্শনিকমূলভ আনন্দাহুতি। Poetry is the criticism of life—কাব্যের মধ্যে রূপায়িত হয় জীবনের ব্যাখ্যা। এইজন্যই কবিমানসের পিছনে একটি দার্শনিক মন না থাকলে সেই কবি, বড় কবি—শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারেন না। তাই শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেরই দার্শনিক। দার্শনিক কবি না হতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত কবিকে দার্শনিক হতেই হয়। রবীন্দ্রনাথ কবি এবং কবি বলেই দার্শনিক। রবীন্দ্রনাথ কবি—তাঁর একটি মাত্র পরিচয় তিনি শিল্পী। কাব্যসৃষ্টিকে সার্থক করে তুলতে হ'লে যে দার্শনিক অহুতির প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের ‘ধর্ম’ সেই পথেরই যাত্রী। দার্শনিক কবির ধর্ম তার শিল্প-চেতনার পথ ধরেই আয়ত্ত্ব প্রকাশ করে থাকে। ‘Religion of An Artist’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই মর্মে লিখেছেন, “আমার ধর্ম মূলতঃ কবির ধর্ম। কাব্যের প্রেরণা যেমন করে অজ্ঞাত অপরিচিত পথ ধরে আমার কাছে এসেছে সেই পথ ধরেই এসেছে আমার জীবনে ধর্মপ্রেরণা। আমার ধর্মজীবন ও কবিজীবন একই পথে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। যদিচ এই উভয় জীবনের সম্মিলন হয়ে গেছে বহুকাল পূর্বে তবু অনেক দিন পর্যন্ত তা ছিল আমার কাছে অজ্ঞাত।”

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন এবং ধর্মজীবনের পরিপূর্ণ মিলন হয়েছে এবং সেই মিলনে সৃষ্টি হয়েছে তাঁর কাব্যসম্ভার। রবীন্দ্রকাব্যে তাই অধ্যাত্মরাজ্যের অন্তহীন সুর, অসীমের জন্ত অনন্ত ব্যাকুলতা, স্রুত্বের জন্ত অশান্ত ক্রন্দন।

\* *Personality*, p. 12

† কান্ডনী, পৃ: ১৩

\* রাধাকৃষ্ণ সম্পাদিত *Contemporary Indian Philosophy*.  
পৃ. ৩২।



## কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

### শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি অক্ষয়কুমার গাধিয়াছেন :—

নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,  
নহে কোন কর্ম্মী—গর্বোন্নত শির,  
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর;  
নাহি প্রতিমূর্তি ছবি;  
তবু কাদ কাদ,—জনম-ভূমির  
সে এক দরিদ্র কবি।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারও বঙ্গভূমির এইরূপ একজন ভাগ্যহীন কবি। বর্তমান খুলনা জেলার ভৈরবনদতটবর্তী সেনহাট গ্রামে, এক বৈজ্ঞ-পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম-তারিখ— ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪ (৩১ মে ১৮৩৭)। তিনি যখন ৬ মাসের শিশু, সেই সময়ে তাঁহার পিতা মানিকচন্দ্রের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার অগ্রজেরও কাল হয়। কি করিয়া দিন চলিবে এই চিন্তায় তাঁহার মাতা ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এই ছঃসময়ে কৃষ্ণচন্দ্রের পিতার মাতামহ—বরিশাল কীর্তিপাশার ভূম্যধিকারী রাজারাম সেন জমিদারী হইতে তাঁহাদের কিছু কিছু বৃত্তি নিদ্ধারিত করিয়া দেন। তাহাতেই কষ্টেস্থগে তাঁহাদের দিনাতিপাত হইত। কৃষ্ণচন্দ্র গুরুশাশুরের গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, গৃহ-পুরোহিতের নিকট কলাপ ব্যাকরণ পড়িয়া এবং কীর্তিপাশার ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিয়া, ১৯ বৎসর বয়সে, ভাগ্যান্বেষণে ঢাকায় উপস্থিত হন।

এই সময়ে গবর্মেণ্ট হইতে বাংলা শিক্ষা প্রদানের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছিল। কৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডিত নিয়োগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫ বেতনের একটি সার্কেল পণ্ডিতের পদলাভ করেন। ইহার অল্প দিন পরেই তিনি ঢাকা নর্মাল স্কুলের অন্তর্গত মডেল স্কুলের হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার অবসরকাল মাতৃভাষার সেবায় নিয়োগ করিতেন। ‘সংবাদ প্রভাকর’, ‘সম্বাদ ভাস্কর’, ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ প্রভৃতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে কবিতা লেখা অভ্যাস করিতেন। ঢাকার অবস্থানকালে তিনি একজন অকৃত্রিম বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন; ইনি তাঁহার সমবয়সী কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র। তাঁহাদের প্রাথমিক রচনাগুলি ১৮৫৮ সনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর’ ও ‘সংবাদ সাধুরঞ্জন’ স্থান পাইয়াছিল; গুপ্ত-কবি তাঁহাদের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র, ভগবানচন্দ্র বসু (আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের পিতা) প্রমুখ কয়েক জন কৃতবিদ্য বাঙালীর চেষ্টায় ঢাকায় সর্বপ্রথম একটি বাংলা মুদ্রাযন্ত্র—‘ঢাকা বাঙ্গলা

যন্ত্র’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মুদ্রাযন্ত্রেই দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীল-দর্পণ’ নাটকের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা যন্ত্রের মুদ্রাকর ছিলেন—কৃষ্ণচন্দ্রের বন্ধু হরিশ্চন্দ্র। এই মুদ্রাযন্ত্র হইতে, এই দুই দরিদ্র কবির উত্তোগে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ‘কবিতাকুসুমাবলী’ নামে একখানি পত্রবহুল মাসিক পত্রিকা জন্মগ্রহণ করে। কৃষ্ণচন্দ্রের ‘সদ্যবশতক্কে’র অধিকাংশ কবিতাই ইহাতে স্থান পাইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে ‘কবিতাকুসুমাবলী’ই ঢাকা হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র।

এই সময়ে কৃষ্ণচন্দ্রের মনের মত একটি নতুন চাকুরী জুটয়া গেল। তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া সংবাদপত্র-সেবায় ব্রতী হন। ঢাকাবাসীরা অনেক দিন হইতে স্থানীয় একখানি বাংলা সংবাদপত্রের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। বাঙ্গলা যন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকবর্গের দ্বারা সে অভাব পূরণ হয়। তাঁহার ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত দ্বারকানাথ বিজাভূষণ-সম্পাদিত ‘সৌম-প্রকাশ’ের আদর্শে, ‘ঢাকাপ্রকাশ’ নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার করেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারই সম্পাদকের গৌরবময় আসন অলঙ্কৃত করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর।

ইহার তিন বৎসর পরে বালিয়াটী-নিবাসী গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী ঢাকায় আর একটি বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ও ‘বিজ্ঞাপনী’ নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিবার সঙ্কল্প করেন। তিনি ৫০ বেতন দিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে ‘ঢাকাপ্রকাশ’ হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া তাঁহার হস্তে পত্রিকা ও প্রেসের সম্পূর্ণ ভার হস্ত করিয়াছিলেন। ‘বিজ্ঞাপনী’র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—মার্চ ১৮৬৫।

যোগ্যতার সহিত সাড়ে তিন বৎসর ‘ঢাকাপ্রকাশ’ ও দেড় বৎসর ‘বিজ্ঞাপনী’ পরিচালন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ঢাকার সংবাদপত্র প্রসঙ্গে কলিকাতার ‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়’ একবার লিখিয়াছিলেন :—“কলিকাতায় যে যে বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে, ঢাকার বিজ্ঞাপনী ও ঢাকাপ্রকাশ ইহার কাহার দ্বিতীয় নহে।” প্রকৃতপক্ষে বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে ঢাকার প্রথম সাংবাদিক-পদের গৌরব কৃষ্ণচন্দ্রেরই প্রাপ্য। এই হিসাবে তিনি ঢাকাবাসীর কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন।

কৃষ্ণচন্দ্র ঢাকায় সঙ্গদোষে সুরাপানে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার আত্মকথায় প্রকাশ :—“দেশেও তখন সুরার বড়ই প্রকোপ। বড়-লোকের চিহ্ন ছিল তখন—

স্বরাপান। ভাগ্য-দোষে, মতিহীন আমি, আমিও তাহাতে মজিয়াছিলাম।...বন্ধুগণ বলিতেন, ‘পোলাও-কালিয়া ভাল খাবার খেতে হ’লে মদ খাওয়া চাই-ই; নহিলে, শরীর টেকে না—অতিসারে মারা যেতে হয়।’ কাজেই, আমিও প্রথমে বুঝিয়াছিলাম, তাই। এই প্রলোভনে, ক্রমেই তাহা নেশায় পরিণত হইয়াছিল; আর, তাহাতেই আমার সর্বনাশ! শেষ, ইহাতেই, ঝগড়া করিয়া আমার কাজ যায়; আমি পরিবারাদি লইয়া বাঙী চলিয়া আসি। কর্ম ছাড়িয়া আমি কেবলই ছরবছর চরম সীমায় উপনীত হইতে থাকি। এমন কি, ক্রমে যতই সাংসারিক কষ্ট বাড়িয়াছে, আমিও ততই পাগলের মত হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে, আমার পাগলের মত হইতে দেখিয়া, আমার কোন আত্মীয় আমায় কীৰ্ত্তিপাশায় লইয়া যান। এবং তাঁহারা নানারূপে আমার চিত্ত-সংস্কারেরও চেষ্টা পাইতে থাকেন। এই সময় মদটাও আমার আর তত জুটত না; ক্রমে আমিও একটু স্থির হইতে থাকি। অধিকন্ত, ‘শিব-বিবাহ’ নাম একখানি গানের পুস্তক এবং পারশী, উর্দু, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এই ভাষা চতুষ্টয়ে আমার পূর্বতন শিক্ষক-গণের গুণবর্ণনা নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া, আমার মতি অনেকটা ফিরিয়া যায়। এই সময়ই আমার মাতাঠাকুরাণী আমায় কীৰ্ত্তিপাশা হইতে বাঙী আনিতে যান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া আমিও প্রতিজ্ঞা করি—‘আর কখনও এমন কোন হৃদয়ে প্রবৃত্ত হইব না।’ বেশীর ভাগ, বাঙীর তাৎকালিক হৃদয় দেখিয়াও আমার মনে বড়ই ঘৃণা জন্মে।’ (‘অম্মসন্ধান’, ৩০ ফাল্গুন ১২৯৮)

কর্মহীন অবস্থায় দুই-তিন বৎসর দেশে কাটাইবার পর, কৃষ্ণচন্দ্র সামান্য বেতনে কখন ঢাকা ব্রাহ্মস্কুলে (ইং ১৮৭০), কখন দৌলংপুর স্কুলে, কখন-বা পিলজঙ্ক-নপাড়া এন্ট্রাল স্কুলে পণ্ডিতী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; শেষে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ২৫ বেতনে যশোহর জেলা-স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। যশোহরে অবস্থানকালে তিনি ‘দৈভাধিকী’ নামে একখানি স্বল্পায়ু সংস্কৃত-বাংলা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ উনিশটি বৎসর অতি দীনভাবে যশোহরে এক ব্রাহ্মণের হোটেলে কাটাইয়া, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি শিক্ষকতা কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে রায় বাহাদুর বহুনাথ মজুমদার ও গণিতজ্ঞ কালীপদ বসুর নাম উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণচন্দ্রের শেষের দিনগুলি স্বগ্রাম সেনহাটিতেই বিশৃঙ্খল-ভাবে কাটিতেছিল। ‘ক্রমে বিধবাসী ও সাধক কৃষ্ণচন্দ্রের মর্ত্যলীলা শেষ হইয়া আসিল। লোকচক্ষুর অগোচরে প্রক্ষুণ্ণিত বনকুসুমের মত সমগ্র দেশকে অজান্তাসারে সৌরভে আর্মোদিত করিয়া তাঁহার জীবন-পুষ্প ফুরিয়া পড়িবার দিন আসিল। কিছু দিন হইতে তিনি রোগে অস্বাধিক ক্লেশ পাইতেছিলেন।

এইরূপে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৯শে পৌষ [ ১৩ জানুয়ারি ১৯০৭, ৭০ বৎসর বয়সে ] প্রভাত্রে জন্মভূমি সেনহাটির ক্রোড়ে তিনি সজ্জানে দেহত্যাগ করিলেন।’ (‘জীবনচরিত’) ইহাই সংক্ষেপে কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন-কথা।



কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

এইবার বাংলা-সাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্রের দানের কথা বলিয়া বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার দানের পরিমাণ বিপুল নহে। তিনি চারিখানি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে দুইখানি কাব্য,—‘সত্তাবশতক’, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি (ইং ১৮৬১) ও ‘মোহভোগ’—মহাভারতের বাসব-নহষ সংবাদ অবলম্বনে নাট্যকারের লিখিত ক্ষুদ্র কাব্য (জানুয়ারি ১৮৭১)। অপর দুইখানি—গল্প-গ্রন্থ; ‘ইতিবৃত্ত’ নামে দুর্বোধ্য ভাষায় লিখিত আত্মকথা (এপ্রিল ১৮৬৮) ও ‘কৈবল্যতত্ত্ব’ নামে সম্ভর্ভ-

\* ইহার ‘বিজ্ঞাপনে’ কৃষ্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন :—“এই পুস্তকে কৈবল্য ও কৈবল্য লাভের উপায় বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা কেবল ব্রাহ্মধর্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।” যশোহরে অবস্থানকালে তিনি সাধ্বিক হিন্দুর আচার পালন করিতেন। একদিন দুর্গাদাস লাহিড়ী তাঁহার ধর্মমতটি জানিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন :—“এখন তো বুঝিতেছেনই! তবে ঢাকায় যখন ছিলাম, সেখানে তখন বড়ই ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন; আমারও তখন যৌবনোচ্ছ্বল প্রবৃত্তি! কাজেই, তখন সেইরূপ ভাবেই ছিলাম। পরেই এই ভাব।”



সমষ্টি (জানুয়ারি ১৮৮৩)। পুরাতন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার গল্প-পত্র বহু রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল রচনার মধ্যে ১২৯৮-১৩০০ সালের পাঞ্চিক ‘অনুসন্ধান’ প্রকাশিত তাঁহার আত্মকথা, সাহুবাদ “শিবপঞ্চাশৎ” ও নীতি-কবিতা” উল্লেখযোগ্য। ‘ব্রহ্ম-সঙ্গীতে’ও “তুমি আত্মীয় হতে পরমাত্মীয় হে” ও “কি বেশ ধরেছ আঁকি শারদীয়া” প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটি গান স্থান পাইয়াছে।

কৃষ্ণচন্দ্রের অপর সকল রচনা বিশ্বস্তির অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু একমাত্র ‘সদ্বাবশতক’ই তাঁহাকে বাংলা-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়াছে। এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, যশোহরে অবস্থানকালে, একদা হুগাদাস লাহিড়ী ‘অনুসন্ধান’ পত্রের জন্ত তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সংগ্রহে আশ্রয় প্রকাশ করিলে, বিনয়-সহকারে বলিয়াছিলেন :—

“কোন এক পারস্ত-গ্রন্থে একটি গল্প পড়িয়াছিলাম। সে গল্পটির মর্ম এই যে, ধর্ম্মর্ষণ দ্বারা এক লক্ষ্য-ভেদ করিবার জন্ত কয়েক সহস্র যুদ্ধা পারিতোষিক ছিল। যাহার বাণ সেই লক্ষ্য-ভেদ করিতে পারিবে, সেই ঐ যুদ্ধা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু কেহই সে লক্ষ্য-ভেদ করিতে পারিল না। মহা মহা ধর্ম্মর্ষণ-পারদর্শীগণও তাহাতে অকৃতকার্য হইলেন। অন্তঃপর, কৌতুকজ্বলে, একটি বালক তৎপ্রতি একটি বাণ প্রয়োগ করায়, কি দৈব ঘটনা, সেই লক্ষ্যটি ভেদ হইয়াছিল। কিন্তু যেই লক্ষ্যটি ভেদ হইল, বালক অমনি তাহার ধর্ম্মর্ষণ জলে ফেলিয়া দিল। এবং লোকে তাহার ধর্ম্মর্ষণ জলে নিক্ষেপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে উত্তর দিল,—‘দৈবাৎ একটা লক্ষ্য ভেদ হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমি তো আর ধর্ম্মর্ষণ-পারদর্শী হই নাই। আমার ছেলেখেলায় যজ্ঞ কেন আর লোকের নিকট হাত্ত্যাপদ হইব; তাই উহা ফেলিয়া দিলাম।’...আমারও হইয়াছে তাই। দৈবাৎ ‘সদ্বাবশতক’টা একটু ভাল হইয়াছে বলিয়া, আমি তো আর একটা দিগ গজ পণ্ডিত হই নাই যে, আমার জীবনে নানা গৌরব-গরিমার কথা পাইবেন?”

‘সদ্বাবশতক’ প্রকাশিত হয়—১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে; কৃষ্ণচন্দ্র তখন ‘চাকাপ্রকাশ’ের সম্পাদক। এই কাব্যখানি বাংলা দেশের ছাত্র-সমাজকে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক হইতে লব্ধ এই খ্যাতি ছাত্র-সমাজকে অতিক্রম করিয়া অভিভাবক-সমাজকেও অভিভূত করিতে বিলম্ব হয় নাই।

চিরস্থায়ী জন,                      জন্মে কি কখন,  
ব্যাপিত বেদন বুঝিতে পারে ?

কি যাতনা বিধে,                      বুঝিবে সে কিসে,  
কতু আশ্চর্যবিধে, দংশে নি যারে ?

কবিতার লেখককে বাংলা দেশের রসিকমাত্রই সহজে চিনিয়া লইয়াছিলেন। কবি কৃষ্ণচন্দ্র পারস্ত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সর্বদা পারসিক কবি হাকেম ও সাদীর কাব্যরসে নিমগ্ন থাকিতেন। ‘সদ্বাবশতক’ প্রধানতঃ হাকেমের কাব্য অনুসরণেই রচিত। পারসিক কবিদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবোধ ও এই বিশ্বপ্রকৃতির যিনি শ্রদ্ধা, তাঁহার প্রতি সহজ আত্মনিবেদন কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্যে বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই সৌন্দর্য্য ও ভগবৎ-প্রীতিই বাংলা-সাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ দান।

‘সদ্বাবশতক’ের কবিতাগুলি এমনই প্রসাদগুণবিশিষ্ট যে অনেক কবিতার অনেক পংক্তিই আমরা প্রবাদবাক্যরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি; ব্যবহার করি বটে, কিন্তু এগুলির রচয়িতা যে কৃষ্ণচন্দ্রই তাহা অনেক ক্ষেত্রে বিস্মৃত হইয়াছি। দৃষ্টান্তরূপ “অপব্যয়ের ফল” নামে তাঁহার সুপরিচিত

যে জন দিবসে,                      মনের হরষে,  
জালায় মোমের বাতি;  
আন্ত গৃহে তার                      দেখিবে না আর,  
নিশিতে প্রদীপ ভাতি।

কবিতার উল্লেখ করিতে পারি। ক্রীমোহিতলাল মজুমদারের মত খ্যাতনামা কবি ও সমালোচকও কবিতাটিকে কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের নামে ‘কাব্য-মঞ্জুষা’র স্থান দিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর মজুমদার-কবি উনবিংশ শতাব্দীর মজুমদার-কবির সম্যক মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কবি-পক্ষেই যদি এইরূপ হয়, সাধারণে যে তাঁহাকে বিস্মৃত হইবেন তাহাতে আর বিচিৎ কি!

আমরা সাহিত্যিক পূর্বপুরুষদের স্মরণীয় করিবার জন্ত সচরাচর বার্ষিক স্মৃতিবাসরের অনুষ্ঠান করি; কখন কখন তাঁহাদের নামে রথ্যা-রচনা, পদক-দান বা স্মৃতি-সৌধের আয়োজন করিয়া কর্তব্য শেষ করিয়া থাকি। কিন্তু কেবল-মাত্র এইগুলির দ্বারাই তাঁহারা অমরত্ব লাভ করেন না; তাঁহারা সত্যকার বাঁচিয়া থাকেন—সাহিত্যে তাঁহাদের বিশিষ্ট দানের জন্ত। কৃষ্ণচন্দ্রকে হৃদেবাসীর অন্তরে জাগরক রাখিতে হইলে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন তাঁহার ‘সদ্বাবশতক’ের একটি সুই সংস্করণ প্রকাশ করা; তবেই তাঁহার আত্মার শান্তি হইবে, তবেই তাঁহার যথোপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা হইবে।\*

\* কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে, ৬ই জুন, অনুষ্ঠিত কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের বার্ষিক স্মৃতিসভায় প্রধান অতিথির ভাষণ।

## যুদ্ধোত্তর বার্লিন

শ্রীপশুপতি ঘোষ

অনেক দিন থেকেই বার্লিন দেখবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের বাহুল করে তুলেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় বার্লিনের যে চিত্র ধ্বংসের কাগজে পাঠ করেছি তাতে হিটলারের পতন হওয়ার পরেও বার্লিনে যাওয়ার ইচ্ছা আমার একটুও কমে নি। বার্লিনের পতন হয়েছে, মিত্র-শক্তির আক্রমণের আঘাতে বার্লিন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, বোমার আঘেয়গিরির অগ্নিশ্রাবে বার্লিনের কত ঐতিহাসিক স্মৃতিজড়িত প্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বার্লিনের প্রসিদ্ধ রাইস্ট্যাগ, ব্রাওনবার্গ গেট, কাইজার উইলহেলমস গেট ইত্যাদি অভীতের কত সমৃদ্ধ স্মৃতি বহন করে দণ্ডায়মান, ইতিহাস তার সাক্ষী। বোমার আঘাতে ধ্বংস-যাওয়া তাহাদের বিম্বাদ-মাথা স্মৃতি মনকে অভিভূত করেছিল। যে বার্লিন মাত্র পনের-ষোল বৎসরের মধ্যে বিপুল শক্তির অধিকারী হয়ে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলবার সামর্থ্য অর্জন করেছিল তার সেই শক্তির উৎস কোথায় দেখবার জ্ঞান আমি ব্যর্থ হয়ে উঠেছিলাম। একা হিটলার, এক গোয়েরিং বা গোয়েবল্‌সের সাধ্য ছিল না এত বড় একটা বিরাট শক্তিকে পূর্ণ বিকাশের পথে চালিয়ে নেবার। যারা জার্মানীকে গড়ে তুলেছিল, শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধ করেছিল, দিগ্বিজয়ীর বিরাট পরিকল্পনাকে মূল কেন্দ্রাভিমুখে পরিচালিত করেছিল, তারা জার্মানীর অসংখ্য শিল্পী বা টেকনিসিয়ান। তাদের পরিশ্রম ও প্রতিভা, তাদের অনমনীয় কর্মনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা, জাতিকে বড় করার উদ্যেগ বাসনা হিটলারের কর্মকুশলতায় সুপরিচালিত হয়ে জার্মানীকে এত বড় করে তুলেছিল। জার্মানীর মধ্যমণি সেই বার্লিনকে দেখবার জন্মে আমি ভারত থেকে যাত্রা করেছিলাম।

ভারতবর্ষ থেকে ১৯৪৭ সনের ২২শে ডিসেম্বর বিওসি-এর ইয়র্ক প্লেনে যাত্রা করে আমি ২৪শে ডিসেম্বর বেলা ২টায় লণ্ডনে উপস্থিত হলাম। লণ্ডনে কয়েক দিন নানা কাজে কাটিয়ে শেষে বার্লিন যাত্রা ঠিক করলাম। লণ্ডনের ৪৬ মাউন্ট স্ট্রিটে ইণ্ডিয়া সাপ্লাই কমিশনের অধ্যক্ষ মিঃ বিঞ্জিমিনের

সঙ্গে দেখা করলাম। মিঃ বিঞ্জিমিন পণ্ডাবের অধিবাসী, ভারতীয় খ্রীষ্টান। প্রত্যেক মাসেই ভারতবর্ষ থেকে বার্লিনের যাত্রীদের একটা সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে—নির্বাচনের ব্যবস্থা সাপ্লাই কমিশনের অধ্যক্ষই করে থাকেন। তিনি আমার নাম নির্বাচন করে সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করলেন। সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লগনে দেখা করলে আমার ছাড়পত্রে



যুদ্ধোত্তর বার্লিনের একটি রাস্তা।

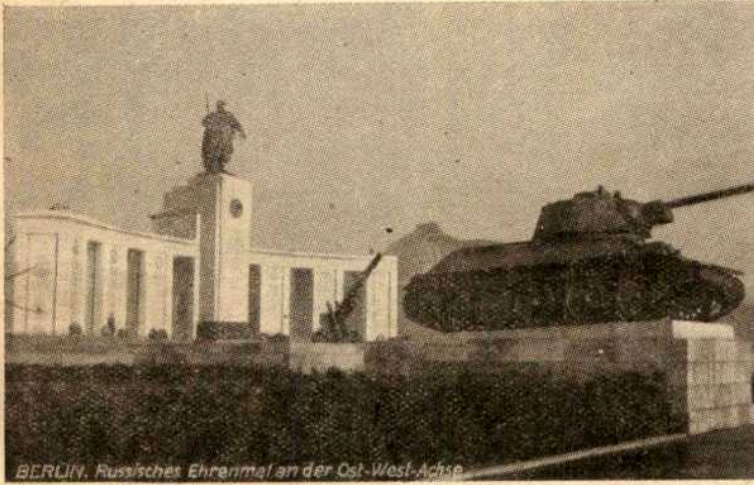
অনুমতির স্বাক্ষর দিয়ে আমাকে আর একখানি চিঠি দিলেন। সেই চিঠি পেয়ে আমার বার্লিন যাত্রার ব্যবস্থার জ্ঞান প্রথমে এজ্ঞচেজ্ঞ আপিসে (করেন অফিস, নরফোক হাউস, সেন্ট-জেমস স্কোয়ার, লণ্ডন) টাকা জমা দিতে গেলাম, সত্তর পাউণ্ড ব্রিটিশ ও আমেরিকান কোনের জ্ঞান জমা দিলাম এবং পনের পাউণ্ড জমা দিলাম লিপজিগের মেলা দেখবার জ্ঞান। এই মেলা দেখবার জ্ঞান পূর্বে থেকেই আমি নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম।

আমষ্টার্ডাম থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ রওনা হয়ে ২৭শে ফেব্রুয়ারী বৈকালের দিকে বার্লিন পৌঁছলাম। ইংরেজদের অতিথি হয়ে যারা বার্লিন দেখতে যান তাঁদের জন্মে ব্রিটিশ কোনে দুটি হোটেলের ব্যবস্থা আছে। একটি হোটেল আম্‌জু আর একটি হোটেল সেভয়। যাত্রারসম্ভেই বেশ খানিকটা নাজেহাল হয়েছিলাম। ভুল করে জার্মান ট্রেনে উঠেছিলাম। জার্মান ট্রেনে কোনও রেপ্লুরেট-কার নেই এবং পথে যে সমস্ত হোটেল পড়ল তাতেও কিছু কিনতে পাওয়া যায় না।



ফলে সারারাত্রি হরিবাসর করেই কাটাতে হয়েছিল। আমি হোটেল আমজুতেই উঠলাম।

পরের দিন থেকেই আমার কাজ শুরু হ'ল। আমি এক জন মুদ্রাকর—আমার একান্ত অভিপ্রায় ছিল মুদ্রায়ন্ত্র দ্বারা নির্মাণ করছেন তাঁদের বোজ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং তাঁদের কাছ থেকে যন্ত্রপাতির কল্যাকৌশল শিখে তবে ভারতে সেটাকে কার্যকরী করা। সাম্রাজ্যবাদ-নিষ্পেষিত ভারতে এটা আশা করতে পারি নি, গঠন-মূলক কার্যে বিশেষ সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত গবর্ণ-মেণ্টের কোনও সাহায্য পাব আশা করতে পারি নি, তাই



বার্লিনের একটি দৃশ্য

স্বাধীন ভারতের নয়া তালিমে যন্ত্রশিল্পের উন্নতিকল্পে বার্লিন থেকে কিছু কার্যকরী শিক্ষা আয়ত্ত করে নিজের দেশের শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করব এই আশা নিয়েই বার্লিন গিয়ে-ছিলাম।

বার্লিনে পৌঁছবার পরের দিনই সেখানকার ভারতীয় সামরিক মিশনের সহিত সাক্ষাৎ করে বার্লিনের নাম-করা মুদ্রাকরদের এবং মুদ্রায়ন্ত্র-নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম জ্ঞানতে চাইলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা আমায় কোনও সংবাদ দিতে পারলেন না। তাঁদের এই অজ্ঞতায় খুব বিস্ময়-বোধ করলাম। এইখানেই বলে রাখছি যে ভারতীয় সামরিক মিশনের কর্মচারীদের ভিতরে একজনও টেকনিসিয়ান ছিল না। সামরিক মিশনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? ভারত ইউ-নিয়নের সহিত বার্লিনের যোগসূত্র অটুট রাখার দায়িত্ব কি সামরিক মিশনের নয়? তাই যদি হয় তবে পরাধীনতার শৃঙ্খল-মুক্ত ভারতের পক্ষে বর্তমানে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কি তার আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ় করা নয়? বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে যে সকল জাতি শিল্প-উন্নয়ন দ্বারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে

জাতিগঠনমূলক কার্যে তাদের কাছ থেকে যেটুকু আমাদের গ্রহণ করবার আছে তৎসম্বন্ধে আমরা যদি সচেতন না হই তা হলে আমাদের কল্যাণ হবে কিসে? বার্লিনে বসে বসে এসব প্রশ্ন আমার মনকে ব্যাকুল করে তুলত এবং নিজেদের অসহায়তা আমার মনকে পীড়া দিত।

যুদ্ধোত্তর বার্লিনের একটু পরিচয় এখন দেওয়া প্রয়োজন। প্রায় পঁচাত্তর ভাগ বার্লিন এখনও ধ্বংসের গর্ভে। ধ্বংস-মাওয়া প্রাসাদগুলির সংস্কার করা দূরে থাকুক ছাইয়ের জঞ্জালও দূর করা হয় নি। মিত্রশক্তি অধিকৃত বার্লিন চার ভাগে বিভক্ত।

- (১) ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চল।
- (২) মার্কিন অধিকৃত অঞ্চল।
- (৩) রুশ অধিকৃত অঞ্চল।
- (৪) ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল।

আমি ইংরেজ সরকারের অতিথি। অতএব আমার পক্ষে সকল স্থান পরিভ্রমণ করার কোনও বাধা ছিল না। হোটেল থেকে ট্যাক্সি দেওয়া হ'ল এবং ট্যাক্সিতে সব জায়গা ঘুরে দেখতে লাগলাম। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে আমি চলাফেরা করছি, সর্বত্র ঘুরে সবকিছু দেখার চোখের স্বাধীনতা আমার রয়েছে, কিন্তু মনের স্বাধীনতা আমার নেই। চোখ খুলে দেখতে

পারি, কিন্তু মন খুলে কথা কইতে পারি না এবং ইচ্ছামত নিজের পকেটের টাকা ব্যয় করবার অধিকার আমার নেই। অন্তরের এই রিক্ততায় কেন আমার মন বিষিয়ে উঠেছিল তার বর্ণনা একটু পরেই পাবেন। লগুন থেকে যে টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম সেটা জার্মানদের দেওয়া ছিল নিষিদ্ধ, কোনও জার্মানকে টাকা দিতে পারবে না এই ছিল কর্তৃ-পক্ষের বিধান—পারিতোষিক হিসাবে কেবল সিগারেট বিতরণের প্রথাটাই দেখলাম, টাকার বদলে সিগারেটকেই চতুঃশক্তি কারেন্সি হিসাবেই মেনে নিতে চায়।

পূর্বেই বলেছি যে ভারতীয় সামরিক মিশন আমাকে কোন সাহায্য করতে পারে নি, ইংরেজী জানা একজন জার্মান ডাক্তার বন্ধু এখানে পেলাম। নাম Dr. Kuhnest। তিনি স্থানীয় একটি মেডিক্যাল জার্নালের সম্পাদক এবং এই স্বত্রে অনেক মুদ্রাকরের সহিত ও তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সহিত পরিচিত। ডাঃ কুনের সৌজন্দের অভাব ছিল না—কিন্তু তাঁর সময় এত কম ছিল যে তিনি সব সময় আমাকে নিয়ে ঘোরাফেরা করবার অবসর করে উঠতে পারেন নি। তিনি



এক জার্মান ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার পরিচিত করে দিলেন। তিনি কাজ চালাবার মত ইংরেজী ও রুশ ভাষা জানতেন। তিনিই আমার দোভাষীর কাজ করতেন। ডাঃ ক্যুনের কাছ থেকে যুদ্ধ-পূর্ব বার্লিনের যে সকল ছাপাখানার তালিকা পেয়েছিলাম তন্মধ্যে অনেকগুলির অস্তিত্বের সন্ধানই পেলাম না। অনেক বোঁজাখুজির পর করাঁসী অধিকৃত অঞ্চলে একটি প্রেসের পাড়া পাওয়া গেল। ডাঃ ক্যুনের সঙ্গে করে প্রেসের মালিকের সঙ্গে দেখা করলাম, জঞ্জালের স্তূপ পরিষ্কার করে একটি মেশিন বের করা হ'ল। একত্ব শুধু সিগারেটের খরচাই হয়েছিল। কর্মব্যপদেশে বার্লিনে যে সকল জার্মানের সহিত পরিচিত হয়েছিলাম তাঁদের সৌজঙ্গে মুক্তি হয়েছিলাম।

বার্লিন একটি শিল্পকেন্দ্রিক শহর, যুদ্ধ-পূর্ব বার্লিনের পরিচয় আগে পাঠ করে মুক্তি হয়েছি, কিন্তু যুদ্ধোত্তর বার্লিন নিজের চোখে দেখতে গিয়ে হতাশ হয়েছি। বার্লিনের বাজারে দোকানীরা দোকানপাট সাজিয়ে বসে, কিন্তু অতি সাধারণ জিনিষও কিনতে পাওয়া যায় না। নিত্যব্যবহার্য জিনিষের অভাব বার্লিনে প্রচুর। হুঁচ রেড প্রকৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ বার্লিনের বাজারে নেই। জার্মানীর “পানামা” রেড এক সময় সারা দুনিয়ার বাজারে খুব চালু হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান বার্লিনে রেড দুপ্রাপ্য বললেই চলে। এত সব দুর্ভাগোর মধ্যেও দেখলাম বার্লিনের শিল্পীদের প্রতিভায় মরচে পড়ে নি, স্বজনীশক্তি তারা হারায় নি। ইংরেজ ও মার্কিনরা টিনে ডরা খাদ্যটুকু গ্রহণ করে টিনগুলিকে অকেজো জিনিষ বলে ফেলে দেয়, কিন্তু বর্তমান বার্লিনের শিল্পকারগণ সেই পরিত্যক্ত টিনগুলি কুড়িয়ে তা দিয়ে কাজ চালাবার মত রেড প্রস্তুত করছে। ধাতুর অভাব খুবই বেশী, দেখলাম কাঠ দিয়ে ক্ষুরের হাতল তৈরী করে চমৎকার ভাবে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। বার্লিনে বস্ত্রসমৃদ্ধ ভারতের চেয়ে অনেক প্রবল, বিশেষ করে শীতের দেশে গরম কাপড় না হলে চলতেই পারে না, তারা কিন্তু বর্তমান অবস্থাকে বুখীমনে মেনে নিয়েছে—বস্ত্রাভাবের জন্যে হা-হতাশ নেই।

যুদ্ধের সময় থেকেই জার্মানীর ঋণ ভাঙারে খাটতি শুরু হয়েছে—বর্তমান অবস্থার ত তুলনাই হতে পারে না।

বার্লিনে প্রত্যেক জার্মান সপ্তাহে ৫১ গ্রাম (সাড়ে চারি তোলা) মাংস পায়, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে সকলের ভাগ্যে ভাও জোটে না। লার্ড বা ফ্যাট নামক পদার্থ খাওয়া

ভাজবার জল অল্প পরিমাণেও সেখানে পাওয়া যায় না। রুটি প্রতি সপ্তাহে আধ পাউণ্ড করে দেওয়া হয়, দুধ চোখে দেখা যায় না। নবজাত শিশুকে প্রথম কয়েক দিন জ্বাকারিন জলে ডিঙ্কিয়ে খাওয়ান হয় তারপরে সুপ অভ্যাস করান হয়। কোনও প্রকারের কাঁচা বা পাকা ফল জার্মানীর কি গ্রামবাসী কি শহুরে লোকেরা বহুদিন চোখে দেখে নি।

স্কুল কলেজের শিক্ষা চলছে মন্দাক্রান্ত। ছন্দে। বাইরের জলুস খানিকটা আছে, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের প্রাণবোলা পতঃ-স্মৃতি আনন্দের অভিব্যক্তি নেই। বার্লিনে পৌঁছে বিশেষ করে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচিত হওয়ার বাসনা



রুশ অধিকৃত অঞ্চলের প্রবেশদ্বার

ছিল, কিন্তু অন্তরায় হ'ল জার্মান ভাষা সত্ত্বে আমার অজ্ঞতা। বিশেষ চেষ্টা করে কতকটা কাজ চালাবার মত ভাষা আয়ত্ত করলাম, আর বাকিটা বোঝাবার প্রয়াস পেতাম অল্পভঙ্গীর সাহায্যে। তৎসত্ত্বেও যেটুকু ক্রটি রয়ে যেত—সেটুকু পূরণ করতে চেয়েছিলাম ভালবাসা দিয়ে তাদের চিন্তা জয় করে। ট্যাক্সি করে টিকিনের সময় প্রায়ই কোনও না কোন স্কুলের দরজায় গিয়ে হাজির হতাম—কাঁধে বেহুর্দনের তুলি তাতে নানা রকমের চক্লেট, লজ্জা, টকি ইত্যাদি। ওগুলি তাদের বিলিয়ে দিয়ে এক নির্মল আনন্দ লাভ করতাম। বালকবালিকারাও তাদের ভারতীয় বন্ধুকে কয়েক দিনের মধ্যেই আপন করে নিয়েছিল।

পূর্বেই বলেছি যে আমি হোটেল আমজুতে উঠেছিলাম। হোটেল আমজুর একটু বর্ণনা দেওয়া দরকার। হোটেল আমজুর কর্মকর্তাদের মধ্যে ম্যানেজার ইংরেজ এবং রাষ্ট্রাধরের ভাবাবধানকারী হুঁজন ছিলেন ইংরেজ। নিম্নতন কর্মচারীদের ভিতরে সবাই ছিল জার্মান। পরিবেশন থেকে

আরম্ভ করে ধোয়া-মোছা পর্যন্ত সব কাজই জার্মানগণ করে। আগন্তুকদের প্রাভুত্বের চার প্রকারের ঝাড়া, ছপুনের লাঠির জড় ছয় প্রকারের ঝাড়া, বিকালে চায়ের চার প্রকারের ঝাড়া এবং রাত্রে জড় সাত প্রকারের বিভিন্ন ঝাড়া জার্মান পরিবেশকগণ পরিবেশন করে; কিন্তু নিজেরা এক টুকরো কালো কুটি এবং এক মগ সুপ দিয়ে তাদের অভ্যন্তর-মানবকে তুষ্ট করার ব্যর্থ প্রয়াস পায়। এ ধরনের পার্শ্ব্য অভ্যন্তর ব্যাপারেও অল্পপ ভাবে বিভ্রম। হোটেলের বসবার ঘর ছ'রকমের। স্থায়ী বাসিন্দারা আসবাবপত্র-সমৃদ্ধ ও নীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর পাচ্ছেন আর জার্মান কর্মচারীদের ঠাণ্ডা ঘরে দুই খানা টেবিল ও কয়েকখানা কাঠের চেয়ার নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হচ্ছে। এদের সঙ্গে কোনও জার্মান অতিথি দেখা করতে এলেও সজ্জিত ঘরে বসবার অধিকার পায় না। হোটেলের নিয়ম জার্মান কর্মচারিয়াল তাঁদের বিশিষ্ট পুরুষ-বন্ধুদের সপ্তাহে একবার করে খাওয়াতে পারবেন।

বালিনে থাকাকালে ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে অনেকেই আমায় প্রশ্ন করেছেন, বিশেষ করে গান্ধীজী ও জবাহরলালজী সম্বন্ধে তাঁদের কৌতূহলের অন্ত নেই। অজ্ঞাত স্থানের জায় বালিনবাসীরাও মনে করেন, গান্ধীজী জগতের শ্রেষ্ঠ মানব। গান্ধীজীর যুত্বাসংবাদ যখন বালিনে পৌঁছল তখন বালিনের সর্বসাধারণ শোকাভিভূত হয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানবের লোকান্তরিত আত্মার প্রতি সম্মান দেখাবার জন্তে তারা একটি শোকসভার আয়োজনও করেছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হয় নি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে আমি বালিনে কয়েকজন লোককে বিশেষ ভাবে প্রশ্ন করেছিলাম। আমার সঙ্গে নেতাজী বন্ধুর কটো ছিল, আমি তাদের সে কটো দেখিয়েছিলাম—অনেকে নেতাজী বন্ধুকে চিনতে পেরেছিলেন এবং যুদ্ধকালীন বালিনে হিটলারের সঙ্গে একত্র দেখেছিলেন বললেন।

রুশীয় কোণে আমার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটুকু বলে আমি বালিনের কাহিনী শেষ করব। বালিন পরি-ত্যাগের আগের দিন সকালে আমি আমার ট্যাক্সিচালককে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ইচ্ছে ছিল শহরটাকে একবার ঘুরে দেখা। ট্যাক্সিচালক ইংরেজী জানত না। ভুল করে রুশ অধিকৃত অঞ্চলের মুখে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ছ'জন রুশীয়

সৈনিক আমাকে এবং ট্যাক্সিচালককে ঘিরে কেলে রুশ ভাষায় কি সব বলতে লাগল বুঝতে পারি নি। আকারে ইকিতে বুঝলাম যে আমার কাছ থেকে ও চালকের কাছ থেকে তারা আমাদের ছাড়পত্র চাইছে। যে মহিলাটি আমার দোভাষীর কাজ করত তার কাগজপত্রও দেখতে চাইলে। মহিলাটি ইংরেজ বলে পরিচয় দিতেই তাকে নিয়ে আর কোনও গোল-মাল করল না। দূর থেকে দেখতে পেলাম ব্রিটিশ পতাকাবাহী একখানি লরী আসছে। গাড়ীটি কাছে এলে আরোহী সৈনিক-দের একজনের কাছে আমার নাম ও অজ্ঞাত ধরসম্বলিত এক টুকরো কাগজ বালিনে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলে পৌঁছে দেবার জন্তে দিয়েছিলাম। তখন বেলা সাড়ে দশটা। বালিন থেকে আমাদের উদ্ধারের জন্ত লোক আসতে সাড়ে তিনটে হ'ল। এতক্ষণ ঠাণ্ডার ভেতরে একটা সেতুর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল। ভারতীয় সামরিক মিশন থেকে লোক এসে আমাদের উদ্ধার করল। রুশ অঞ্চলের কথা শেষ করবার পূর্বে জার্মানী সম্বন্ধে রুশ সামরিক কর্তৃপক্ষের কর্মপন্থা বিষয়ে একটু বলে আমার কথা শেষ করব। মহাযুগের কথা ছেড়ে দিয়ে বর্তমান যুগ থেকে আরম্ভ করলে দেখা যাবে যে, ক্রেডারিক দি প্রেটের সঙ্গে থেকে আরম্ভ করে ইংলও, ফরাসী, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে যুদ্ধে জার্মানী অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। ইতিহাসে তাদের শৌর্যবীর্যের কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। অতীতের বীরদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিপনের জন্ত বালিনে অনেক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল। ওনতে পেলাম রুশ কর্তৃপক্ষ সে সকল ঐতিহাসিক স্তম্ভগুলি ধ্বংস করে ফেলবেন, কেন না ঐ স্তম্ভসমূহ সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক এবং ফাসিষ্ট মনোবৃত্তিকে বাঁচিয়ে রাখে তাই রুশ কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যৎ ফাসিষ্ট আন্দোলন বিনাশ করার জন্তে জার্মান ঐতিহ্যের বাহন স্তম্ভগুলিকে ধ্বংস করে ফেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য আমি করব না, কিন্তু অতঃপূর্ব বাদ দিলেও শিল্পসম্পদের ধারক ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভগুলির একপ পরিণতি চিন্তা করলে মন বিষাদে পূর্ণ হয়। হোটেল আমজুতে ফিরে আসার পরক্ষণেই রয়টারের লোক এসে আমার সঙ্গে দেখা করে আমার কাছ থেকে সমস্ত যুক্তান্ত লিপিবদ্ধ করে নিলেন। লণ্ডনের কয়েকটা কাগজে এ খবর প্রকাশিত হয়েছিল।

পরের দিন বালিন ত্যাগ করলাম।





## স্মৃতির ব্যথা

(সাঁওতালী গল্প)

শ্রীচারুলাল মুখোপাধ্যায়

“বাং” (না) শুনা ধমক দিলে। তার কুকুর ‘কাটকো’ তাকে খাটিয়ার তলা থেকে ধাক্কা দিচ্ছে। “যা না হতভাগা,” মনিব আবার রেগে আদেশ দিলে। কুকুরটা খেউ করে উঠল, তাতে আকার ও হাসির খাদ মেশান। সে আবার কাপড় কামড়ে টানতে লাগল। শুনা আবার বললে, “কেন বিরক্ত করছিস,” তারপর খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে স্মৃতির স্বপ্নের জালছাঁকে আবার আঁকড়ে ধরতে চাইল, চেষ্টা করলে—আবার বোনা যায় কি না।

কাটকো খানিকক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে রইল, যেন গোবেচারী; ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। তারপর যেমন চিরকালের অভ্যাস, আবার খাটিয়ার নিচে গিয়ে মাথা দিয়ে শুনাকে নাড়া দিলে। এবার প্রভু উঠল টেচিয়ে, গাল-মন্দ সুরু করলে। কাটকো বেজব্রহ্ম ছাত্রের মত লেজটি গুটিয়ে নিয়েছে। প্রভুকে একখানা লাঠি হাতে করার চেষ্টা করতে দেখে, কেঁউ মের্ড করে বাইরে চলে এসে, পরম দার্শনিকের মত এই মায়াময় পৃথিবীর অদ্ভুত পরিবর্তনের কথাই বুঝি ভাবতে লাগল।

সত্যি কথা বলতে গেলে কাটকোরই বা কি দোষ? বদলে গেছেন প্রভুই; ও বেচারী কি জানে? শুনার ঘরের বেড়ার ফাঁকে সূর্যের আলো ঠিক করে বেরুচ্ছে। এতক্ষণ ত সে শুনার সঙ্গে পাছাড়ে, মাঠে খাটে হৈ হৈ করে বেড়ায়। আজ তার আবলুস-কালো বুকুর উপরে সোনালী রোদ, চোখে ঘুমের ঘোর...এখনো। তার চাউনিই বদলে গেছে, মনে হয় চোখ ছটোয় স্বপ্নের ছায়া ঘুরছে।

খাটিয়া নড়ল। শুনা আড়মোড়া ভেঙে, আঙুল মটকাচ্ছিল। কাটকো তাকাল বাইরের দিকে, দেখলে সূর্য আকাশে উঠে গেছে। আজ তার দেবী হয়ে গেছে, এমন কখনও হয় না। শুনা হেসে ফেলল, “হিজু মে” (এদিক আয়) বলে ইসারা করলে। এবার কাটকোর পালা; সে স্থায় মত স্বস্থানে বসে রইল।

“আগুন না মশাই,” শুনা রাগ ভাঙাবার মোলায়েম সুরে বললে। কাটকোর সাড়াশব্দ নেই।

“আচ্ছা, দেখি রাগ কতক্ষণ থাকে,” বলে শুনা একটা মাটির ভাঁড় থেকে কিছু খই নিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দিলে। চোরা চাউনিতে প্রভুকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে, মনে হ’ল কাটকোর মতটা বদলে গেল। সকাল বেলায় খাবার—নিত্যকার পাওনা, মাঠে মারা যায় কেন? খাওয়াই যাক না।

“বেটা পেটুক কোথাকার।” বলে শুনা আপন মনে হাসতে লাগল।

সেই সাত সকালে কাটকোকে নিয়ে বেরুবেই কি করে।

সারারাত ঘুমায় নি। এখনও মনে পড়ে তার—সমস্ত দেহ-মনে একটা নতুন সাড়া, একটা মজতার চাঞ্চল্য...। স্মৃতি?...শান্তি?...আবার? এই পাঁচ-ছ’ বছর নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করেছে, আঁকড়ে ছিল জীব স্মৃতি আর কোলে ছিল কাটকো, তার একমাত্র চিহ্ন। এত দিন সে ভেবেছে স্মৃতিশাস্তি এ পৃথিবীতে থাকলেও তার নাগালের বাইরে। এখানে থাক, খাও-দাও, হাঁড়িয়া টান ছুঁখ কষ্ট ভুলে যেতে। বছরের পর বছর কেটেছে...এসেছে নাচ, গান, শিকার... আবার শিকার...নাচ...গান। হাঁড়িয়া মদে চুর হয়ে থেকেছে, শুঁড়ির দোকানে বাঁধা রেখেছে জীব অলঙ্কারগুলো। এদিকে আবার অজন্মা হ’ল...বীজের ধান খেয়ে বাঁচল কিছু দিন...ধরে চাল নেই, যা কিছু পায় মজুর খেটে, লেগে যায় কাটকোকে খাওয়াতে আর হাঁড়িয়া তৈরি করতে...জীবনে এসেছে একটা উল্লাস...এই জীবন একটা ছুঁখ কষ্টে ভরা মলিন অধ্যায়...যা করে হোক ভুলে যাও যে বেঁচে আছ।

এদিকে এক দিন ধরে আগুন লেগেছে। কাটকো টেচিয়ে কেঁদে পাড়া মাথায় করে তুলেছে। শুনা দেখলে তার আশ্রয়—শেষ সম্বল—তাও চলে যাচ্ছে। বাইরে এসে হতভম্বের মত আলোর খেলা দেখলে। শুনা ভাবলে, “বা, কি সুন্দর! ধোঁয়াগুলি কুণ্ডলী পাকাচ্ছে, সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। আগুনে চারদিকে লাল লাল...” হঠাৎ পিছু টান পড়ল, তার কাপড়ের বুট ধরে কে টানছে। কাটকো? দেবা যায় পরগনাইত লোকজন নিয়ে এসে পড়েছে আগুন নেবাতো। “আগুন সে নেবাবেই বা কেন?” ভাবলে শুনা। তার কি অধিকার? এ সৌন্দর্য্য নষ্ট করতে হয়? বিদ্যুৎদেগে শুনা নিয়ে এল তীর-ধনুক। তার চোখে যেন বাঘের চাউনি, হুস্বার দিয়ে বললে, “যে আগুন নেবাবে, মারব এই তীর।” তার মুখে অটহাসি। সবাই ভাবলে, পাগল হতে আর বাকী নেই। তার বাড়ী যাক পুড়ে, আমাদের কি মাথাব্যথা? পরগনাইত এলেন, শুনাকে শান্তভাবে বোকাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। আগুনের “বোদ্ধারা” সব ছাই করে রেখে চলে গিয়েছে...শুধু একটা গরম ভাপসা হাওয়া বইছে।

পরের দিন পরগনাইত আবার শুনার কাছে এলেন, তার সঙ্গে একটি মেয়ে। দেখে মনে হয় চেনা চেনা, তুলসী না? হাঁ সেই তো বটে। পরগনাইত শুনাকে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, “গায়ের সবাই এ টাকাটা উঠিয়েছে। তুলসী ত বাড়ী বাড়ী গিয়ে অর্ধেক আদায় করেছে। যা হবার হয়েছে, এখন ঘরটা তোলা।” শুনার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছিল, টাকা কয়টা সে

বুঝি ছুঁড়েই ফেলে দেয়। তুলসীর চোখ যেন মৌন ভাষায় বলে, “আহা, কত কষ্ট। নাও না এ টাকা কয়টা।” সে যেন মুক্তিমতী করুণা। কি জানি কি ভেবে শুনা রাজী হ’ল।

দিন সাতেক পর তুলসী আবার এল, তার হাতে কিছু জুনা আর মহুয়া ফল। শুনা রাঁধছিল। হাসি হাসি চোখে তুলসী বেটাছেলের রান্না করা দেখছিল, ...হাত পুড়ছে, ভাত পুড়ছে; হাঁড়ি হেঁসেল ওলটপালট...

যার কাজ তাকে সাজে। তুলসী বললে, “আসব আমি।” শুনা না বলতে পারল না। মুহূর্তে সব বদলে গেল নিপুণ হাতের ছোঁয়ায়। মেঘের মত কালো-চুল ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের মেঝেতে, কতদিন গোবর-লেপ পড়ে নি মেঝের ওপর কে জানে। উল্লুনের আঙনের লাল আভা এসে পড়েছে মেয়েটির মুখে—আঙুলের ডগাগুলির লীলায়িত গতি, হুড়োল বাহু দুটি চোখকে আকৃষ্ট করে। সর্বদা নিকম-কালোর অপরাধ চাকচিক্য।

পেটুক ছেলের মত শুনা খেতে বসল। এ যে কতদিন জোটে নি, এই মমতার স্নিগ্ধতা, গৃহিণীপনার স্নেহস্পর্শ। শুনার সামনে শালপাতা, তুলসী হাওয়া করছে; বলছে, ‘এটা খাও, ওটা ফেলো না’—এর মধ্যে অকস্মাৎ শোনা গেল কাটিকোর বিকট খেউ খেউ, যেন বাড়ীতে ডাকাত চড়াও হয়েছে। দাঁত খিঁচিয়ে কুকুরটা তুলসীকেই যেন বলছে “তফাৎ যাও, নইলে টের পাবে আমার দাঁতের ধার”। তার চোখে যেন খুনীর দৃষ্টি। তুলসীকে এক কোণে ভয়ে জড়সড় দেখে শুনা ভাত কেলে একটা চেলাকাঠ নিয়ে কুকুরটাকে এক ধা বসিয়ে দিলে, তারপর মনে হ’ল যেন চোখের জল সামলাল। কাটিকো কিন্তু ধামে না, উঠানে বসে আর্তনাদে পাড়া কাঁপিয়ে তুলল, যেন বাড়ীতে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। তুলসী হেসেই বিদায় নিলে, যাবার সময় কি ভাবল সে-ই জানে। কাটিকো আড়চোখে মেয়েটির চলনশীল ছায়ায়কেই যেন লক্ষ্য করতে লাগল।

বিকালবেলা শুনার মনে পড়ল কাটিকোর খাওয়া হয় নি; অল্পতাপের গ্লানিতে তার মনটা ভরে গেল। কুকুরটা তার একসঙ্গে খায়, তাদের দুজনের সমান সমান ভাগ। আজ সে করেছে কি? অবোলা জীবটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। তাই তো জীমানের গোসা হয়েছে। শুনা ডাক দিলে ‘কাটিকো’। সে এল, ভাবে ভঙ্গিতে তাহার ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র নেই, একটা সলজ্জ অপরাধীর দৃষ্টি। প্রভু খাবার দিচ্ছে দেখে কাটিকো আনন্দে যেন উপচে পড়ল।

শুনা হাসল, আদরের সুরে বললে, “হাংলা, হাভাতে”। তারপর কুকুরটার গায়ে হাত বুলাতে লাগল, আদরে আদরে, হাসিঠাট্টায় উজ্জল হয়ে উঠল। মনে পড়ল যত্না জীর কথা, কাটিকো ছিল একান্ত ভাবে তারি আদরের। সেই এক

আন্তারিক থেকে হৃড়িয়ে এনে মায়ের মত যত্নে সে কুকুরটাকে এত বড়ট করেছিল; সন্তানহীনা নারী মাতৃহের স্বাদ সে পেত কাটিকোকে আদর সোহাগ করে। খাওয়া-দাওয়া শোয়া সব সময়েই কাটিকোর বোঁজ পড়ে, এ যেন তার জাগ্রতে চিন্তা, নিদ্রায় স্বপ্ন। সবাই বলত, কুকুর-পাগলী এমন আর দেখি নি বাপু। লক্ষ্মীছাড়া কুকুরটার কাণ্ড ছিল অদ্ভুত। এক এক দিন সে কোথায় পালাত কে জানে। তখন “বোঁজ, বোঁজ” বনেবাদাড়ে, পাহাড়ে, মাঠে। ওদিকে শুনার জীর খাওয়া-দাওয়া বন্ধ... দু দিন-তিন দিন পর মহাপ্রভু বাড়ী ফিরলেন যেন হারানিধি।

ক্রমে ক্রমে মনে পড়তে লাগল, জীর মৃত্যুর কথা, তার শেষ উক্তি ‘কাটিকোকে দেখো’। চারপাইয়ে করে শব নিয়ে তারা যাত্রা করেছে, সঙ্গে তাদের কাটিকো, চোখ ফুলেছে কেঁদে কেঁদে, মাঝে মাঝে করুণ আর্তনাদে চারদিক কেঁপে উঠেছে...

আর ভাবা যায় না। মাথাটা বন্ বন্ করে ঘোরে... টলতে টলতে শুনা বেরিয়ে পড়ে, সামনের জঙ্গলে গিয়ে কি একটা লতাপাতা নিয়ে এল। তারপর তা ছেঁচে কাটিকোর সেই কাটা জায়গাটায় দিতে গিয়ে ক্ষত দেখে বুঝতে পারল সে কি অন্ডায় করেছে। ততক্ষণে চোখের জল আর মানা মানে না।

বিপত্তীকের বিয়ে হবে, চারদিকে একটা হাসিঠাট্টার জোয়ার এসে গেছে। কেউ বলছে, “এ সব মদ্রার মুখ ভেঙচায় বানরের মত।” কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি মত প্রকাশ করছে, “সব সমান, ছাড়ই কুড়ী” (তালাক দেওয়া মেয়ে) সবুজ বুলবুল, হাজার রকম ডাকে। রাজীগুলো বাঁজা ঘোড়া, হান্ হান্; আর বউ-মরা বর, কর্কশ ঝাঁটার মত।

চলল নাচগান, তুলসী-শুনাকে নিয়ে ঠাটা-মদ্রা... শুনা যেন কি একটা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে... এক একবার আড় চোখে তুলসীকে দেখছে, আর ভাবছে এতক্ষণ ‘লু’ বইছিল, দিগদিগন্ত জলে-পুড়ে যাচ্ছিল; তার মধ্যে আজ বর্ষা নেমেছে, সেই নব জলধারায় সে ভিজছে—এ যেন তার মুক্তিমান।

দূরে বুড়া পরগনাইত, পাকা দাড়িওয়ালা মুখে হাসছে। সামনে তার বউ। ছ’জনার চোখেই যেন একটা স্বপ্ন খেলে যাচ্ছে... প্রকৃতি আজ উর্গনাভের মত দুটি নরনারীকে তার জালে জড়িয়েছে।

শুনা কাপড়ের মধ্য থেকে একটা রূপার হাঁসুলী বার করে পরগনাইতের জীর হাতে দিলে। বুড়ী তুলসীকে কোলে করে তার গলায় পরাল... মেয়েরা কতকগুলি ফুল তার হাতে গুঁজে দিচ্ছে...

দূরে মনে হ’ল সরে যাচ্ছে এক জোড়া ঠাটার মত লাল চোখ। আপন মনে শুনা বলে উঠল, “কাটিকো”।

চার দিকে একটা মাতাল হাওয়া বইছিল। বসন্ত এসে গেছে, কিন্তু শুন্য মনে হ'ল আচমকা একটা কুয়াসার জ্বাল এসে যেন দিগ দিগন্ত আচ্ছন্ন করে দিলে। হঠাৎ সে যেন অন্ধ হয়ে গেল.....

আবার বিশ্রান্তালাপ, নিজের কুটির খাটিয়ায় শুয়ে।

“পাগল হয়েছিস। দেখি মাথাটা। বাবা, কি গরম।” কাটকো মাথা নাড়ে, “না।”

“তা হ'লে এখানে সেখানে কেঁদে কেঁদে বেড়াস কেন? তুলসীর সঙ্গে আমার দেখলেই কেঁপে যাস কেন? বল কেন, হতভাগা পাঙ্গী!...”

কাটকো শুড়িঝুড়ি মেরে শুন্য পা চাটছে।

“জবাব দে, তা নইলে, তোর এক দিন আমার এক দিন।”

কুকুরটা সাড়া দিলে। যেউ যেউ নয়, যেন একটা কাঁহুনার মুর, ক্লান্ত, অতীতের স্মৃতিবিজড়িত; কোথায় যেন কাঁটা বিঁধিয়ে দেয়।...

জুজু প্রহু হুহু জারী করলেন, “এক দিন উপোস, ঠায় উপোস। পাগলামির ওষুধ দিলাম।”...

বিয়ের দিন এসে গেছে। বহুবাহুব নিয়ে, বাজনা বাজিয়ে বরপক্ষ দক্ষিণ কাটিকুণ্ড রওনা হ'ল। পৌছুতেই জগ-মাঝি মেয়েদের নিয়ে এল বরপক্ষের পা ধোয়াতে...হু-পক্ষে একটা দাঙ্গার নাটক হ'ল, বর কাড়াকাড়ি...নাচ, গান, মজাপান... জগ-মাঝি মাতালদের সামলায়, গ্রামের ভদ্রতা বাঁচায়...

পাগলী মাথায় শুন্য বসে আছে, সিঁদুর দানের এখনো অনেক দেরি। সব যেন আঁজ ওলটপালট, খেয়ালী কাণ্ড। চোখে যেন পুখিবি, নরনারী—সব কিছুরই চেহারা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। লোকগুলো কি ‘বোকা’ (অপদেবতা), নারীগুলো সব ডাইনি? মনে হচ্ছে শুন্য যেন পাতালপুরীতে যাচ্ছে...তাদের রূপকথায় যেমন বলে...তাকে পাকড়াও করেছে এক অপক্লপ ‘বোকা’ রাজকতা...গভীর অন্ধকার, গহ্বর...রাজসভা...অজগরের মাথায় আসনগুলো ঝলমল করছে...বোকা? না তুলসী? সে নাচছে, ছলছে, সাপ-  
০ বাঘের সঙ্গে খেলা করছে...

আর একটি মেয়ে এসে শুন্যকে বলছে, “আমরা জিতছি।”

শুন্য সাঁহস বেড়েছে—সে জবাবে বলছে, “মেয়েরা সব-  
খানেই জেতে।”

পাশ থেকে আর এক বোকা হাসল, “এটা কাপুরুষ।”

একটি ছিপছিপে তরুণী বললে—“বোকা।” তার দেহে একটা চাকল্য খেল যাচ্ছে...

“তুলসীর চাকর গো,” খিল খিল করে হেসে বললে এক মোটা বোকা।

তার পর নাচ শুরু হ'ল, দাড়িওয়ালা বোকা, অর্ধেক নারী, অর্ধেক পশু বোকার দল...হৈ হৈ, কলরব, উদ্ভগ তাণ্ডব...

অনতিদূরে শোনা গেল একটা কোলাহল, তার পর একটা চিংকার, “মার, মার। খেপা কুকুর।” আর একজন যেন বলছে—“মেরো না ওটা শুন্যর পোষা, কাটকো যে।”

তজ্রাবিজড়িত চোখে শুন্য আঁৎকে উঠল, বললে—  
“কাটকো, কি বলছ।”

একজন শুন্যকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে—“দেখ দেখ, তোমার কুকুরটা পাগল হয়েছে। কাছে গেলেই কামড়াত আসে।”

নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল। “হ'ল কি”, ভাবলে শুন্য। রাগে আগুন হয়ে বুড়া পরগনাইত, শুন্যকে এসে বললে—  
“তোমার কুকুর তুলসীকে কামড়চ্ছে।”

শুন্য হাঁকল, “কোথায় ওটা?”

আঙ্গিনার কোণে একটা পেঁপে গাছের নীচে কাটকো শুড়ি মেরে বসে ছিল। কোথা থেকে একটা লাঠি যোগাড় করে শুন্য তার দিকে ছুটল। কাটকো চাইল শুন্যর পানে, যেন সে জানে তার অন্তিম মুহূর্ত এসে গেছে। শুন্য চোখ বুজল...ভড়িবেগে তার চোখের সামনে যেন একটা ছায়া-ছবি খেল গেল...তার জীর মৃত্যু হচ্ছে...মৃত্যুপথ-যাত্রিণী বলছে, “ওকে দেখো।” লোকজনের চিংকার কানে গেল, কে একটা লোক, হয় তো বা একটা মাতাল, বলছে—“মার, মার, ফেপা, কুকুর, মার।” দিশাহারা শুন্য মারল লাঠি ছুঁড়ে।

মেয়েরা বর নিতে এসে শোনে শুন্য কাটকোর মৃতদেহ নিয়ে পালিয়েছে। এ কি কাণ্ড। লোকে ছুটল শুন্যর বাড়ী, কিন্তু ভগ্নদূত ফিরে এল, শুন্য আসবে না।

চার দিকে যেন একটা অমঙ্গলের ছায়া ঘুরছে। তুলসীকে সবাই প্রবোধ দিচ্ছে, এমন সময় পরগনাইত ও তার স্ত্রী ফিরে এলেন দেখা গেল; ততক্ষণে সাঁওতাল পরগণার জাদ্বালে রাঙা বেলুনের মত সূর্য্যোদয় হচ্ছে।

শোনা গেল কুকুরটাকে নিয়ে পাঁচ মাইল দৌড়ে এক ওঝার বাড়ী ছুটেছিল শুন্য। সে মরা বাঁচিয়েছে কি এক পাতা দিয়ে। অদ্ভুত ওষুধ, পেয়েছিল সে ময়ূরভঞ্জের এক জান-গুরুর কাছে।

“কিন্তু, কুকুরটা ত বেঁচেছে; বিয়ে করতে ক্ষতি কি?” একটি মধ্যবয়সী নারী প্রশ্ন করলে।

“তা, হয় না গো,” জবাব দিলেন পরগনাইতের স্ত্রী। “শুন্য আমার পা ধরে বললে, তুলসীকে বল আমার ক্ষমা করতে। আমি নিজের মন বুঝি, কাটকোকে ছেড়ে আমি বাঁচব না। আসলে আমি তো তুলসীকে ভালবাসি নি, চেয়েছিলাম তুলতে...”

ততক্ষণে কুয়াসার মধ্য দিয়ে সূর্যালোক এসে সবাইকে যেন অভিষিক্ত করেছে। ধীরে ধীরে কখন যে এসে তুলসী সেখানে দাঁড়িয়েছিল, কেউ দেখে নি। সে বলে উঠল, “তা বেশ, ওরা স্ত্রী হোক।” মনে হ'ল গলাটা যেন কেঁপে গেল।



# আরি বার্গস

(১৮৫৯-১৯৪১)

## শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

১৯১৪ সাল প্রথম মহাযুদ্ধের বাড়বাগ্নিকে পৃথিবীর বুকে নিয়ে এল। মানবসমাজ নীতিজ্ঞান হারিয়ে ধ্বংসের লীলায় মেতে উঠল। সেদিন মনে হয়েছিল সভ্যতার অগ্রগতির পথ বুঝিবা রুদ্ধ হয়ে গেল।

ঠিক এমনই সময় এই প্রলয় তাণ্ডবের অন্তরাল থেকে ফরাসী দেশের এক সৌম্যমুষ্টি অধ্যাপক সর্বসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করলেন এই বাগ্নি নিয়ে : ‘আজ মানুষ হতাশ হয়ে পড়েছে, পথচলায় তার ক্লাস্তি এসেছে। কিন্তু নিরাশার কিছু নেই। এক দিন আমিও ক্লাস্ত হয়েছিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই অকস্মাৎ আমি এ জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করেছি।’

প্রথম জীবনে এই সত্যসঙ্গ অধ্যাপকটির অন্ধ ভক্তি ছিল বিজ্ঞানশাস্ত্রে, গণিতে ছিল অসাধারণ মেধা। কিন্তু তারই সঙ্গে ছিল শিল্পকলায় অহুরাগ; সুন্দর ভাষা, সুন্দর প্রকাশভঙ্গী—একই সঙ্গে বার্গসের ব্যক্তিত্ব দুটি বিভিন্ন ধারায় বয়ে চলেছিল। একই সময়ে তিনি প্রকৃতিবিজ্ঞান ও গ্রীক সাহিত্যে সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন।

১৮৫৯ সালে পারী শহরে বার্গসের জন্ম। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন ষোরতর জড়বাদী। হৃদয়াবেগের মূল্য তাঁর কাছে কিছুই ছিল না। তাঁর মতে মায়ের অঙ্ক, প্রকৃতির রূপরাশি অর্থহীন, জগতের সব কিছু আকস্মিক আণবিক সংগঠনের ফলে উদ্ভূত, আবার ধূলিতেই তারা মিশে যায়। জীবন একটা আকস্মিক ঘটনা—তার কোন উদ্দেশ্য নেই।—এই ধারণার মতবাদের জেতে সহপাঠীরা তাঁকে নাস্তিক আখ্যা দিয়েছিল।

পরীক্ষা পাসের পর ‘ক্লের্ম’-‘ফেরাঁ’র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ নিলেন বার্গস। এইখানে মহানগরীর কলকোলাহল থেকে বহুদূরে শান্ত পল্লীর পথে ঘুরতে ঘুরতে বার্গসের মনে একটা পরিবর্তন এল।

এখানে মহানগরীর ‘জনসম্মাত-মদিরা’ ছিল না, ছিল যুক্ত প্রকৃতির দৈতুলেশহীন রূপসম্ভার। এখানকার মৌন প্রশান্তির মধ্যে বার্গস উপলব্ধি করতে পারলেন জীবন নামে সত্যটাকে শুধু একটা বৈজ্ঞানিক স্তর দিয়ে বেঁধে ফেলা যায় না—তার অন্তরালে নিগূঢ়, অনির্বাচনীয় কোনও একটা শক্তি রয়েছে। পল্লীর আকাশে সূর্যাস্তের আরক্ত, মহিমার কাছে রসায়ন-গারের পরীক্ষাগুলিকে বড় তুচ্ছ, বড় ক্ষুদ্র মনে হ’তে লাগল। তারাপ্রতি নৈশ আকাশের অতঙ্গ মৌরতায় যে জীবন গোপন রয়েছে, মহাকাবি শেক্সপিয়ারের যে বিরাট মনের আভাস পেয়ে বিশ্ববাসী বিমুগ্ধ—সে সব কি শুধুই কতকগুলি আকস্মিক আণবিক সংগঠনের ফল? বার্গসের মন বলল, ‘না। যারা

জীবনে বিশ্বাস হারিয়েছে, জীবনের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য যাদের অন্ধ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না, বিজ্ঞান তাদেরই স্বপ্ন। বিজ্ঞান জীবনের সারল্যকে অনর্থক জটিল করে তুলেছে। পূর্ণকে খণ্ড করে দেখাই তার স্বভাব। এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন—

‘আপনারা সকলেই অণুবীক্ষণ যন্ত্র দেখেছেন ও ব্যবহার করেছেন। একটা মাকড়সার পা-কে অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়ে কি অভূত দেখায়। কিন্তু জিনিষটাই বা কি, আর আপনারা দেখলেনই বা কি।’

তিনি যা বললেন, তার সার মর্ম্ম হচ্ছে এই যে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সব পাওয়া যায়; শুধু পাওয়া যায় না গতিকে। বিজ্ঞান গতিকে আজ অবধি ব্যাখ্যা করতে পারে নি। গতিকে সে স্থিতির রূপ দিয়ে দেখায়। দুটি বিন্দু একে একটা রেখার সাহায্যে তাদের যুক্ত করা হ’ল। বিজ্ঞান বলবে, ঐ দুটি বিন্দুর মাঝে ঘন ঘন করে আরও বহু ‘স্থির’ বিন্দু অঙ্কনের ফলে এই রেখাটি হ’ল। বার্গস বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করলেন তা-ত্রয়, আয়ত্তাতীত একটা গতিবেগ এর অন্তরালে রয়েছে। রেখা আঁকার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত যে চঞ্চল হয়ে উঠল, সে কি শুধু কতকগুলি স্থির অবস্থার সমষ্টি?—তা নয়।

আবার, কালের মাপকে আমরা স্থানের মাপের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলি। ঘড়ির কাঁটা অথবা দোলক যতটা স্থান অতিক্রম করল, তাই তো আমাদের সময় নয়। সময়ের কোনও পরিমাণ নেই, কোনও পরিমাপ নেই। ঘণ্টা ‘মিনিট’ সেকেন্ডের সমষ্টিই সময় নয়—সময় ধরা-ছোঁয়ার অতীত, সে অমেয়। তাকে শুধু অহুতব করা যায় আমাদের ‘অস্তিত্ব’ দিয়ে।

মনোরাজ্যের একটা গুণকে বার্গস আবিষ্কার করলেন—সেটি আন্তর অস্তিত্ব বা ‘ইনার ডায়ালেক্সিস’। তিনি বললেন, ‘আমাদের মনের যে অংশ যুক্তিতে অভ্যস্ত, সে পারে শুধু যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে, অহুতব করতে পারে না। এই অহুত্বের ক্রিয়া মনের আর এক অংশে—তার নাম স্বজ্ঞা বা ইন্টুইশন। তাঁর মতে ‘স্বজ্ঞা’ মনোরাজ্যের মহান একটা বিভাগ। বস্তুতঃ বস্তুর অন্তরসত্তা উপলব্ধি করার এই একমাত্র সহায়।’

বার্গস বিচার ক’রে দেখলেন, স্বজ্ঞা জিনিষটি মানুষের ‘মস্তিষ্কের’ অন্তর্গত নয়। রাগ, ভয়, শোক, দ্বেষও মস্তিষ্কের অন্তর্ভুক্ত নয়। মস্তিষ্কের অহুত্ব তাই তার উদ্দীপনার মান বা,

‘ম্যাগনিটুড অফ স্ট্রিয়ালি’ অনুসারে ধার্য্য হয়। কিন্তু আমাদের অন্তরের কোনও আবেগকে কি ‘এত ক্যালরি তাপ’ এই হিসাব করা যায়? রণক্ষেত্রে সেদিন স্বদেশের জেতে যে লক্ষ লক্ষ যুবা প্রাণ উৎসর্গ করেছিল, তাদের সে বীর্যের পরিমাণ কি তাদের মস্তিষ্কের ব্লিগিপ্রদাহ শুনে পাওয়া যাবে?

—বস্তুতঃ তা সম্ভব নয়। আপনার মনুষ্যত্ব নিয়ে মানুষ যেখানে সমগ্র জীবজগতে অধিতীয়, তার হিসাব তার মস্তিষ্কে পাওয়া যাবে না। ধরাছোঁয়া না গেলেও অমুভবে সে আছে আমাদের স্বজ্ঞাসম্পন্ন সত্য বা ‘ইন্টুইটিভ সেল্ফ’-এ। বার্গস্‌ তারই নাম দিয়েছেন স্বজনী বুদ্ধি—‘ক্রিয়েটিভ ইন্টেলেক্ট’। এরই সাহায্যে অমৃতের সন্তান, মানুষ আমরা উপলব্ধি করি আমাদের অস্তিত্ব এবং বুদ্ধি, অমুভব করি আত্মার অমরতা।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ ছাত্র ফ্রাঁস-এ বৈজ্ঞানিক বার্গস্‌ দর্শনের অধ্যাপক হয়ে এলেন। দেশ-বিদেশে তখন তাঁর নবপ্রচারিত মতবাদ নিয়ে তুমুল আলোচনার সৃষ্টি হয়েছিল। এই বস্তুবাদের যুগে যিনি আত্মার অমরতার বাণী নিয়ে এলেন, সকলের দৃষ্টি পড়ল তাঁর ওপর। নিন্দা-প্রশংসার কোলাহল উঠল চারদিকে।

তাঁর বক্তৃতাগুলি খুবই জনপ্রিয় হতে লাগল। ধীরপদক্ষেপে এসে তিনি যখন মঞ্চে বসতেন, ঘরে নামত নিঃশব্দতা, শ্রোতৃমণ্ডলীর মুখে পড়ত নীরব প্রতীক্ষার ছায়া। ধীরে ধীরে

তিনি ব’লে যেতেন—সংক্ষিপ্ত, মধুরা কথাগুলি সবার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করত। শ্রোতাদের তিনি অমুরোধ করতেন, যেন অন্ধের মত তাঁর মতবাদ অনুসরণ না করে তাঁরা তাঁর চিন্তাগুলিকে পরীক্ষা করে নিজেরাও ভেবে দেখেন।

জনসাধারণের কাছে দর্শন যতই দুর্বোধ্য হোক, বক্তৃতা সভায় বার্গস্‌র সরল কথাগুলি কিন্তু সবাই বুঝত, তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তায় তারা মুগ্ধ ও অমুপ্রাণিত হ’ত। তাদেরই মত করে সহজ সরল ভাষায় বলতে পারতেন তিনি।

বার্গস্‌ ইহুদিবংশজাত। ১৯৪০-এ হিটলার ফরাসী দেশে অধিকার করেন। বিস্ময় আর্ধ্যত্যাভিমাত্রী তিনি, সেমিটিক ইহুদিদের প্রতি তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কলেজ ছাত্র ফ্রাঁস-এর সমস্ত ইহুদি অধ্যাপক পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হ’ল, শুধু বার্গস্‌কে এ নির্দেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি এ অমুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করে সহকর্মীদের ভাগ্যই বরণ করে নিলেন। পর বৎসরেই অকস্মাৎ তাঁর জীবনান্ত হ’ল।

আজ দেশে দেশে মারণ-মন্ত্র উল্লেখ্য। এই মহামারণের মধ্যে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন বার্গস্‌—আলো-আধারের মধ্য দিয়ে যুগে যুগে ক্ষয়হীন সেই মহাজীবন শুধুই এগিয়ে চলেছে কোন্ অজানা লক্ষ্যের দিকে। এ পথ জীবনের অগ্রগতির পথ, সেই জীবন-পথ-যাত্রীর এক মুহূর্তও আর পিছনে ফিরে যাওয়ার, ফিরে চাওয়ার উপায় নেই।

## আকিঞ্চন

শ্রী অমলকুমার মাল

আজাদী এবং অন্ন এবং বস্ত্রের সংগ্রামে—

দেশের ভাগ্যে দেশের ভাগ্যে কি যে সঁপিয়াছ প্রভু

তার মাহাত্ম্য আজিও বুঝিতে নারি।

আজিও বুঝিতে নারি—

মৃত্যুর সাথে যে-ই জীবনের শাস্ত্র সংগ্রাম

যে জীবন অবিদ্যা, স্বজনপিয়াসী, বিধাতার শুভাশীষ ;

সেই জীবনের অজস্র অপচয়

লাঞ্ছনা আর নির্যাতনের নিত্য-নূতন রূপ।

দ্বিধাবিশুদ্ধ মা ও মাটির

বুক চিরে জাগিয়াছে—

স্বৈত-হস্তের সর্কশেষের দান।

হিন্দু এবং পাকিস্থানের বৃকে,

ইসলাম আর শাস্ত্র বেঁধেছে বাসা—

মানুষের ঠাই নাই।

মহিমা তোমার অপার, তোমার করুণা অসীম জানি—

তাই আকুল আবেগে করুণ-কণ্ঠে আকৃতি জানাই,

প্রভু, রেখোনা প্রতীক্ষার—

বজ্র-আঘাত হানো গো বিধাতা

বজ্র-আঘাত হানো,

মিলিত-মৃত্যু দাও

এক সাথে যেন সবাই মরিতে পারি।

তিলে-তিলে ক্ষয়, সে তো অপচয়—মৃত্যুর লাঞ্ছনা,

শুধু হানাহানি আর অন্নহানিরও ক্ষুদ্র অস্ত্র জানি—

ব্যাপক বিনাশ? সে নহে তো সম্ভব।

ওগো দয়াময়।

তোমার দয়ার আদি ও অন্ত নাই।

দয়া কর প্রভু—বজ্র আঘাত হানো,

মিলিত-মৃত্যু দাও—

এক সাথে যেন সবাই মরিতে পারি।

# বাঙালী

## ঐতিহাসিক দাশগুণ

নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া কোন কথা কেহ যদি বলিতে যায়, লোকে তাহাকে মনে করে সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক মনোভাবপূর্ণ। আমি বাঙালী হইয়া বাঙালীর কথা বলিতে বসিয়াছি, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা মনোভাবাপন্ন হইয়া বা প্রাদেশিকতার মনোভাব লইয়া নহে। আমি সাম্প্রদায়িক নই, তবে মানুষ মাত্রেই নিজ গৃহ ও পারিপার্শ্বিকের প্রতি টান সর্বত্র, তার পর সে ভাবে প্রতিবাসীর কথা। নিজের ঘরে আশ্রয় লাগিলে, প্রতিবেশীর গৃহ নিরাপদ আছে—এই আশ্বাস তাহার মনে সান্ত্বনা আনে না। তাহার নিজের গৃহ তো পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল, সতর্ক না হইলে এই আশ্রয় প্রতিবেশীর গৃহেও ছড়াইতে পারে। স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী বাঙালীর বাংলার প্রতি আকর্ষণ সর্বত্র। তাহার জ্ঞান তাহাকে প্রাদেশিক মনোভাবসম্পন্ন বলা সম্ভব নহে। বাঙালী জাতির আর যাই দোষ থাকুক সঙ্গী প্রাদেশিকতা নাই। সাক্ষাত্যভিমান তাহার আছে বটে, কিন্তু সাক্ষাত্যভিমান ও প্রাদেশিকতা এক নয়।

বস্তুতঃ বাঙালী যতটা উদার মনোভাববিশিষ্ট এমন আর ভারতের কোন প্রদেশের অধিবাসীই নয়। বিদেশ ভারতবর্ষকে প্রথম জানিয়াছে বাঙালীর ভাবধারা ও কর্মপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়াই। বাংলার রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ চন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ বিদেশে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সমগ্র ভারতের জ্ঞানই ভাবিয়াছেন, সমগ্র ভারতের কথাই বলিয়াছেন কেহই কখনও শুধু বাংলার কথা বলেন নাই। সাধারণ বাঙালীরও অল্প প্রদেশবাসীর প্রতি অহুয়া নাই। বাঙালীদের গর্বের ভিন্ন প্রদেশবাসীর প্রতি কিছু অবজ্ঞা হয়তো আছে, কিন্তু যেখানে তাহাদের গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, বাঙালী সেখানে অবাঙালীদের জ্ঞান তাহাকে গুণের মর্যাদা হইতে বঞ্চিত করে নাই; বরং অগ্রসর হইয়া কণ্ঠে যশের মাল্য পরাইয়াছে। ভারতের বাহিরেও তাহার এই উদার দৃষ্টি প্রসারিত।

কিন্তু মানবপ্রীতি ও প্রাদেশিকতা সভ্য জগতের পক্ষে যতই উচ্চ আদর্শ হোক বাঙালীর এখন নিজের ঘর সামলাইবার সময় আসিয়াছে। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রমেই পিছু হটিতেছে। বাংলা আজ যাঁহা ভাবে, কাল সারা ভারত তাহাঁই চিন্তা করে—গোথেলের। এই প্রশংসাবাগী লইয়া আমরা বহু-কাল গর্ব অনুভব করিয়াছি, কিন্তু এখন আর সে জের টানিয়া লাভ নাই। অতীতের ঐশ্বর্যের কথা বার বার টানিয়া আনিলেও বর্তমানের দৈহিক ঢাকা পড়ে না।

একদা বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে ভারতের শীর্ষস্থানে ছিল। সে স্থান বাংলাদেশ ক্রমে হারাইতে বসিয়াছে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে বাংলা আজ অবজ্ঞাত। অথচ রাজনীতির চেতনা জাগে প্রথম এই বাংলা দেশেই। বাংলার সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন সর্ব ভারতের নেতা ছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি বাঙালী উমেশচন্দ্র। ভারতের বিপ্লববাক কার্য প্রসারলাভ বাংলাদেশে। ভারতের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ শহীদ বাঙালী হুদিরাম। কিন্তু বর্তমান বাংলা অতীত বাংলার যোগ্য উত্তরাধিকারী হইতে পারে নাই। বাংলার যুবশক্তি আজ বিবদমান বিভিন্ন দলে বিভক্ত। বাংলাদেশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া হৃত-শক্তি। একযোগে গঠনমূলক কাজ করিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা আজ বাঙালীর নাই। দলাদলি ও ভাঙ্গাচোরাতেই তাহার রাজনীতি পর্যাবসিত। এক দিন বাংলার যে প্রাণশক্তি এক-যোগে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজ তাহা পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী এখন ভাঙার কাজেই মন দিয়াছে, গড়িতে যেন তুলিয়া গিয়াছে। বিদেশী শাসন যে-দিন দেশে ছিল, সে দিন বাঙালীর এই ভাঙার মন্ত্র কাজে লাগিয়াছিল। আজ দেশ স্বাধীনতার সোপানে উঠিয়াছে—এখন দরকার ভাঙা নয়, গড়া। বাঙালী এখনও এই নূতন পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছে না।

বাঙালীর সব চেয়ে গর্ব তাহার সংস্কৃতি লইয়া। বাংলার বহু পুণ্যে রামমোহন, বিজ্ঞানাগর, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রনাথের মত অসাধারণ মানুষেরা এদেশে জন্মিয়াছেন। বাংলার কৃষ্টি-জগৎ তাঁহাদের দানে গৌরবোজ্বল হইয়া আছে। ইহাদেরই প্রভাবে বাঙালী অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে স্বাভাব্য লাভ করিয়াছে। সংস্কৃতি লইয়া গর্ব করিবার অধিকার বাঙালীর এখনও আছে, তবু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে যে সব উজ্জল নক্ষত্র দেখা দিয়াছিল, আধুনিক বাংলার সেইরূপ দেখা যায় নাই।

চিত্রশিল্পে আমরা পাইয়াছি শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদিগকে। ইহাদের উপযুক্ত মর্যাদা আমরা দিতে পারি নাই। আমাদের চিত্ত কি চিত্র-শিল্পের রস গ্রহণে উন্মুখ হইয়াছে? চলচ্চিত্রের তারকাদের নাম-ধাম ও বিভিন্ন অভিনয়-ভূমিকা আমাদের কণ্ঠস্থ, কিন্তু চিত্র-শিল্পে কাহার কি অবদান তাহা কি আমরা ভাল করিয়া জানি?

সাহিত্য লইয়া বাঙালীর এখনও গৌরব করিবার

অধিকার আছে। সাহিত্য-সৃষ্টিতে বাঙালী অত্যন্ত প্রদেশের বহু উর্দ্ধে। বর্তমান কালেও বাঙালীর যদি কিছু গর্ব করিবার থাকে তবে সে তাহার সাহিত্য। অনন্যসাধারণ প্রতিভা না থাকুক, বাংলাদেশে এখনও প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন লেখক আছেন যাহারা বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতেছেন।

কিন্তু শুধু ভাববিলাস লইয়া এবং সাহিত্য বা শিল্পকলার-চর্চা করিয়া কোনো জাতি দাঁড়াইতে পারে না। তাহার মধ্যে বলিষ্ঠতা থাকা চাই। আরও চাই পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা এবং একত্রে কাজ করিবার আগ্রহ। সর্বোপরি চাই একাগ্রতা ও নিষ্ঠা। বাঙালী-চরিত্রে এ সমস্ত সদগুণের অভাব ঘটিয়াছে। কেন আজ বাঙালী তাহার পুরাতন গৌরবময় আসন হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। একদা বাঙালী বিপ্লবনীতিকের কাজে লাগিয়া বিদেশী শাসনকে বানচাল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এখনো সেই সংগ্রামের উদ্দানদা তাহার অস্থিমজ্জায় ও প্রতি শোণিত-বিন্দুতে মিশিয়া রহিয়াছে। সেইজন্যই বোধ হয় বাঙালী এখনও স্থির হইয়া কাজ করিতে শিখিল না। মতের অমিল সে সহ করিতে পারে না; ফলে পরিণামে কাজে বিঘ্ন ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

বাঙালীর অবনতির আর একটি কারণ তাহার অহমিকা। একদা শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, শৌর্যে, বীর্যে ভারতে সে অগ্রণী ছিল। সেই গর্বের আচ্ছাদিত বাঙালী কিছু না করিয়া এবং কিছু না হইয়াও নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে শিখিল। সে যে পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে, সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই। অতীতের সেই গৌরব বাঙালী এখনও মূলধন করিয়া রাখিতে চায়। বিজ্ঞান বুদ্ধিতে অত্যন্ত প্রদেশ যে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে সেদিকে তাহার দৃষ্টি নাই। সর্বত্রই সে কঁাকি দিয়া জয়ী হইতে চায়। সে দলাদলি করিতে ভালবাসে। কাজ কেমন হইল, সে বিচার সে করে না। কে নেতৃত্ব করিবে তাহাই তাহার লক্ষ্য। সকলেই বড় হইতে চায়। দলাদলি বাঙালী-চরিত্রের প্রধান কলঙ্ক। তরুণের বাঙালী হুজুগপ্রিয়।

প্রবাসী বাঙালী আমরা, এই অবাঙালীর প্রদেশে চারিদিকে দেখি বাঙালীর পূর্বগৌরবের স্থিতি। স্কুল, কলেজ ও অত্যন্ত বহু প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই বাঙালী কর্তৃক স্থাপিত। বহু বাঙালী অতীত কালে এই প্রদেশে ব্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আক্ষিপ্ত স্বরগায় হইয়া আছেন। শুধু এই একটি প্রদেশেই নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেই এইরূপ। বাঙালী সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যেখানে গিয়াছে সেখানেই সে জ্ঞান, চরিত্র ও কর্মে সেখানকার অধিবাসীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। বাংলা আজ সে মর্যাদা হারাইয়াছে। এই অবস্থা অত্যন্ত বেদনা-দায়ক। রাজনীতিতে বাংলাকে পুরোভাগে লইয়া যাইতে পারেন এমন লোক বর্তমানে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও জনসেবা, একনিষ্ঠ সহযোগিতা ও সহৃদয়তার দ্বারা বাঙালী এখনও পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে।

বাঙালী আগে চলুক, অল্প সমস্ত প্রদেশ পিছনে পড়িয়া থাকুক—এমন কথা বলার অর্থ স্বাধীন প্রাদেশিকতা। এমন কথা বলি না। নিজের প্রদেশের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণবশে তাহার গৌরবে গৌরবাধিত, অপমানে ক্ষুব্ধ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। একথা যেন বিনা দ্বিধায় আমরা বলিতে পারি যে অঞ্চল ভারত গঠনে বাংলার দান যেন কম না হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে, “এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে বাংলাদেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই। সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফল-প্রসূ হয়, যাতে সে রিজলশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে তারই জগ্রে আমার এই আবেদন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রমিলন-যজ্ঞের যে মহদহুতান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার জগ্রে উপযুক্ত আছতির উপকরণ সাঙ্গিয়ে আনতে হবে। বাংলা দেশের সেই আত্মাহুতি যোড়শোপ-চারে সত্য হটুক, ওজস্বী হটুক, তার আপন বিশিষ্টতা উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।”

## ধ্বনিতত্ত্বের নূতন নিয়ম

শ্রীগিরিধারী রায় চৌধুরী

ধ্বনিতত্ত্বের কতকগুলি নূতন নিয়ম দৃষ্টান্তসমেত এখানে দেখাব। এই ধ্বনির বিকৃতিগুলি বহুকাল থেকেই ঘটে আসছে, সুতরাং অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের কাছে এগুলি পরিচিত বলেই বোধ হবে। তবু এই বিকৃতিগুলি এখানে তুলে দেখানর সাধকতা হচ্ছে এই যে এ পর্য্যন্ত এগুলো কোন নিয়মের অধীন বলে ব্যাখ্যা হয় নি।

(১) শব্দ-হেটেরো রীতি—অনেকটা “সতেম-কেন্তম

রীতি”র মতন, তাই সংস্কৃত “শব্দ” শব্দ আর গ্রীক “হেটেরো” শব্দ দিয়ে এই বিশেষ রীতির নামকরণ হ’ল। গ্রীক ও ইরাণীয় উপভাষা-বিশেষে ইন্দো-ইউরোপীয় “স”ধ্বনি “হ”-ধ্বনিতে পরিবর্তিত হ’ত। ফলে ঐ গোষ্ঠীর অসংখ্য ভাষার সঙ্গে উপরোক্ত শাখা দুটির উপভাষার “স-হ” পার্থক্য হ’ত। যেমন, সংস্কৃত বা প্রাচীন ভারতীয় আৰ্য্যভাষার “শব্দ”= ইরাণীয়—“বোধর”=গ্রীক—“হে-টে-রো”; সংস্কৃত—“সিন্ধু”=

ইরাণীয়-“হিন্দু”=গ্রীক “ইন্ ডুস্”; সংস্কৃত-“সম”=ইরাণীয় “হম”=গ্রীক—“হো মো”; সংস্কৃত—“অধ্য”=গ্রীক—“হে লি ও”; সংস্কৃত—“সোম”=ইরাণীয় “হস্তম”; সংস্কৃত “সরমা”=গ্রীক—“হে মে স্” ইত্যাদি।

(২) ধ্বনি সম্প্রসারণ ও ধ্বনি-দৃঢ়ীভবন (Phonetic elongation and phonetic elaboration—একটি শব্দ তার আয়ত্বকালের মধ্যে কোন সময়ে দৃঢ়ীভূত বা সম্প্রসারিত হয়ে থাকে। সব ভাষাতেই এই লক্ষণটি দেখা যায়। যেমন, ইংরেজী Message + er = Messenger; Passenger + er = Passenger। আবার ভারতীয় আৰ্যভাষাগুলিতে—সু + নর = সুন্দর; বানর < বান্দর < বান্দর; “মক্ষি” স্থলে “মক্ষিকা”; “জী” স্থলে “জিয়ক”; “ময়ূর” স্থলে “মজুর” ও “মজুল”, “পারিজাত” স্থলে “পারিয়াত্র”; “বঙ্গ” স্থলে “বান্দাল” \*ক-লি স্থলে “কন্দলী, কন্দলী”; \*বী, রাং হইতে “বংশ, বেতস, বেত্র”; “লঙ” হইতে “লঙ্গ”, “উলঙ্গ” ইত্যাদি।

(৩) ধ্বনি-ব্যত্যয় (Reduction)—অনেক সময়, প্রায় সব ভাষাতেই দেখা যায় যে, শব্দবিশেষের কোন অংশ খসে পড়েছে। এমন কি, তার যথাযোগ্য কারণও নির্দেশিত হয় না। যেমন—ইংরেজীতে university থেকে varsity, কি, Cabriolet থেকে Cab। আমাদের ভারতীয় আৰ্যভাষাগুলিতে—“হ্রদ” থেকে “হদ”; কি “দহ”; “জাতক পুত্র” থেকে “জাত-পুত্র”, আবার তা থেকে “জাত পুত্র”, আরার তা থেকে “নাথ পুত্র” এবং তার পরিণতি (উপাধিবাচক) “নাথ-এ। \*আবরকর-গঞ্জ” থেকে “রকর-গঞ্জ” এবং তার পরিণতি “বাধরগঞ্জ-এ; “মোমিনশাহী” থেকে “মৈমিনসিং” “পগার” থেকে “গড়”, ইত্যাদি।

(৪) ধ্বনি-বিশ্ব (Doubling)—অনেক সময় ভাষা-বিশেষের মধ্যে দেখা যায় যে, কোন দ্রব্য, গুণ বা অবস্থাকে বুঝাবার জন্ত এক সঙ্গে দুইটি একার্থক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন ইংরেজীতে—Cruc + hill = Cruc hill < Churchill (দুইটিই পাহাড়বাচক শব্দ)। ভারতীয় আৰ্যভাষাতে পাই—“আগাপোড়া, বেটাছেলে, জুমচাষ, কলিকাতা” ইত্যাদি। “আগা” সংস্কৃত “অগ্র” থেকে উদ্ভূত; তার সঙ্গে মিলেছে অষ্ট্রিক “গুল” বা “গুরহ” থেকে উৎপন্ন “গোড়া” শব্দ। দুটো শব্দই আদিবাচক শব্দ, কিন্তু একত্র হ’লে অর্থ হয়—আদ্যোপান্ত। সংস্কৃত “পুত্র” শব্দ থেকে উৎপন্ন ( “পুট < বুট < ”) “ব্যাটা” আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শাব + আল + ইআ = শাওয়ালিআ = ছাওয়ালিআ < ছেলিআ < “ছেলে।” দুটিই সম্ভাবনাবোধক শব্দ, কিন্তু একত্রিত হয়ে অর্থ করে পুরুষ। “জুম”—অষ্ট্রিক কৃষিবোধক শব্দ আর সংস্কৃত “কৃষি” শব্দ থেকে উৎপন্ন “চাষ” একত্রিত হ’লে বিশেষ এক রকম কিনা, পাহাড়-জমিতে শস্তোৎপাদন বোঝায়। “কলি” অর্থে শামুক পোড়ান চূর্ণ

বোঝায়, তার সঙ্গে যুক্ত হ’ল সংস্কৃত “কাথ” থেকে উৎপন্ন “কাতা”—কিনা জলে গোলা চূর্ণ; এই দুইয়ে মিলে স্থানবিশেষ বোঝায়।

(৫) ভ্রান্তশ্রুতি (mis-audition)—“তিলকে তাল করা” আর “ধান শুনতে কান শোনা”র ব্যাপার প্রায় সব ভাষাতেই আছে। এরকম দু’খটনাকে শ্রুতিভ্রম কি, ভ্রান্তশ্রুতি বলে। “অজ্ঞাত শ্রুত বালক”—এর বদলে অনেকেই—“অজাতশ্রুত বালক” বলে থাকেন; “সবার উপরে মহুয়ত্ব” কি না, “ন মানুষাচ্ছে ঠতরং-হি কিঞ্চিৎ”—“সবার উপরে মানুষ সত্য” বলে বহুকাল চলে আসছে। লোকে একবারও ভেবে দেখে না যে মানুষের চেয়ে সত্য, মানুষের ওপরে সত্য আরও কত রয়েছে, সুতরাং কি ক’রে এমন কথা আমরা বলে থাকি। রীতিমত নামকরা লেখকও—“উদ্দেশের” জায়গায় “উদ্দেশে”, “মুদিত”র জায়গায় “মুদ্রিত”, “আব্রাহাম”-র জায়গায় “আব্রাহামন্ত”, “লক্ষ্য”র বদলে “লক্ষ” লিখে থাকেন।

(৬) ধ্বনি-বৈপরীত্য (Spoonerism)—অনেক ভাষা-তাত্ত্বিক মনে করেন যে, কোন শব্দ বা কোন ধ্বনি একেবারে উল্টে যেতে পারে না। ভারতীয় আৰ্য ভাষাতে অন্ততঃ, এই রকম উল্টে যাওয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, “হ্রদ < রহদ < হদ < দহ”; সবুর < সউর < সোর < রোস; দেখ < দেহ < দেহো, দেহে < হেদে (= “হ্যাদে”) ইত্যাদি।

(৭) অস্থানাসিকতা (Nasalization)—আধুনিক ভারতীয় আৰ্যভাষাগুলিতে নাসিক্যপ্রবণতা কিছু দেখা যায়। যে সব শব্দ মূলতঃ নাস্ত, কি মাস্ত নয়, এমন কি যার মধ্যে কোন অস্থানাসিক ধ্বনির আভাসমাত্র নাই, এমন শব্দও সময় সময় দেখা যায় চক্ষুবিদ্যুৎ হইয়াই উচ্চারিত হইতেছে। যেমন অক্ষি < আঁখি; বজ্র < বাঁকা; কুজ < কুঁজা; ওষ্ঠ < ঠোঁট; চীৎ (কার) < চৈচান, ইত্যাদি।

(৮) সংস্কৃত-করণ (Sanskritization)—আর্য্য-করণের অল্পরূপ ব্যাপার এই সংস্কৃত-করণ। আনাধ্যিক—হয় অষ্ট্রিক, নয় দ্রাবিড় শব্দগুলিকে, অনেক সময় দেখা যায় যে, সংস্কৃত তার নিজের রঙে রসে সবুজ ক’রে সত্য ক’রে তুলেছে, যেমন—\*“দিগ্ভাং” বা “তিস্তা”কে “ত্রিস্রোতা” করা; “তমলুক”, কি, “তমলুক”কে “তাম্রলিপ্তি” করা; \*ত্রক \*ত্রক থেকে “ময়ূর” কি “বহু” ইত্যাদি।

এ ছাড়া, কোন কোন বিদেশী শব্দও সংস্কৃতায়িত হয়েছে বলে দেখা যায়, যেমন—Shakespeare হয়েছে “সেক্সপীয়ার” বা, “সেক্সপীর”; Max-muller হয়েছে—“মাক্সমুলার”, Anderson হয় “ইন্ড্রসেন”; Sun yat-sen হয় “সনৎ সেন” ইত্যাদি।

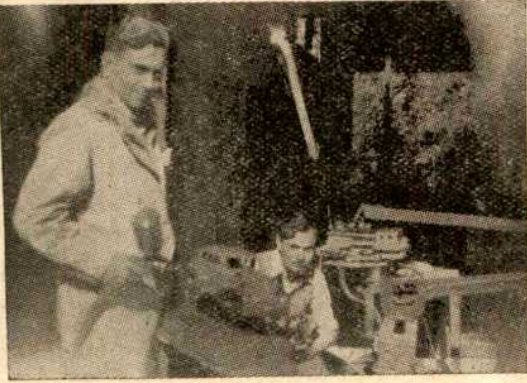
১ অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণার ফল। তিনি আরও এই রকম যুক্তশব্দের উল্লেখ করেছেন তাঁর ইউরোপ-ভ্রমণ সম্বন্ধীয় কোন পুস্তকে।



# শিল্পী প্রণবনাথ ঠাকুর

শ্রীমুখীর খাস্তগীর

— ছবি একে ও খেলনা বানিয়ে সময় কাটানো যে কত আনন্দ-দায়ক হতে পারে, সে বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্তমান লেখকের আছে। সেইজন্মে যখন শ্রীপ্রণবনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হ'ল, আর তাঁর খেলনার কারখানা ও তাঁর আঁকা ছবি দেখলাম—খুব খুশী হয়ে উঠেছিলাম।



খেলনার কারখানায় প্রণবনাথ ঠাকুর (বামদিকে)

নিজের খেলালমত ছবি একে ও কাঠের খেলনা বানিয়ে জীবিকা অর্জন করা আমাদের দেশে খুবই কঠিন। এতে ব্যবসায়-বুদ্ধির দরকার—যারা ছবি আঁকেন সাধারণতঃ তাঁদের সেটার বড়ই অভাব। আবার ব্যবসায়-বুদ্ধি অত্যাধিক হয়ে উঠলে সার্বিক শিল্পসৃষ্টিও যে ব্যাহত হয় তাতে সন্দেহ নেই। শিল্প-প্রতিভার সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবসায়-বুদ্ধির সংমিশ্রণ আমাদের দেশে হুজুঁড় বললেই চলে।

বাংলাদেশের বাইরে আমার বহুকাল কাটল। হিমালয়ের পাদদেশে দেরাহুনে নিজের কাজ নিয়ে আমার দিন কাটে। এখানে যে আর কেউ নিজের খেলালে ছবি একে ও খেলনা বানিয়ে সময় কাটাচ্ছেন, যখন প্রথম তা জানতে পারি তখন যেন কোন নতুন জিনিষ আবিষ্কারের আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠেছিলাম। আমার আশানা থেকে শহরে যাবার পথে একটি প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী দেখতাম—বাড়ীটির নাম “টেগোর ভিলা”। শুনেছিলাম এটা হচ্ছে কলকাতার রাজা পি. এন. ঠাকুরের বাসভবন। মাঝে মাঝে সে বাড়ী লোকজনের আগমনে সরগরম হয়ে উঠত—কিছুকাল পরেই বাড়ীটি হ'ত জনশূন্য, সদরে পড়ত তাল—বিরিচি ভবনটি যেন চলে-যাওয়া অতিথিদের স্মৃতি নিয়ে বিমাত।

কয়েক বছর আগেকার কথা—একদিন খবর পেলাম শিল্পী শ্রীপ্রণবনাথ ঠাকুর সপরিবারে ঐ বাড়ীতে এসে উঠেছেন এবং

একটি কাঠের খেলনার কারখানা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আমরা ছ'জনেই শিল্পতীর্থের যাত্রী, সুতরাং সম্বন্ধ—কাজেই আমাদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হওয়ার পথ খুবই সুগম। এগিয়ে গিয়ে অপরিচয়ের বাধা কাটিয়ে নিলেই হ'ল। এক



প্রত্যাখ্যাতা

দিন চুকে পড়লাম বাড়ীর ভেতর। পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে আলাপ হ'ল। প্রণবনাথের আঁকা ছবি দেখলাম, তারপর তিনি আমাকে তাঁর কারখানায় নিয়ে গেলেন।

কাঠের পুতুল থেকে আরম্ভ করে রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী নানান রকম জন্তু-জানোয়ার—সবই শিল্পী তৈরি করছেন। বাজারে কিছু কিছু বিক্রীও হচ্ছে। নানান রকমের যন্ত্র-পাতিও বসিয়েছেন। কথাবার্তায় বুঝলাম—নেহাং আনন্দের প্রেরণায়ই তিনি এসব নিয়ে সময় কাটাচ্ছেন। নতুন কিছু খেলনা বানাতে পারলেই তাঁর মন খুশীতে ভরে ওঠে। সে-গুলো বাজারে বিক্রী করার ভেমন উৎসাহ তাঁর নেই।





কালো মেয়ে

ব্যবসায়-বুদ্ধি তাঁর তেমন প্রবর নয়, সেইজন্মেই বাজারের চাহিদামত গতানুগতিক খেলনা তৈরির পক্ষপাতী তিনি নন।

এক দিন দিবাভাগে তাঁর কারখানায় গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম রং দেবার যন্ত্র হাতে তিনি কাজে ব্যস্ত। তাঁর ছোট্ট মেয়ে ছুটিও হাতে পায়ে রং মেখে তাঁর কাজের সাহায্য করছে, কি ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে—ঠিক বোঝা গেল না। যাই হোক, মনে হ'ল খেলালী শিল্পীর সময়টা কাটছে বেশ।

নূতন ছবি কিছু আঁকছেন কি না জিজ্ঞেস করলাম। একটি ছবি দেখালেন। তখনও শেষ হয় নি। বললেন, ছবি আঁকতে আমার বড় দেরি হয়।

বললাম—হোক না দেরি ক্ষতি কি? আপনাকে ত ছবি এঁকে জীবিকা অর্জন করতে হবে না।

তিনি উত্তর দিলেন, কথটা সত্য কিন্তু কাঠের খেলনা বানিয়ে খরচটা অন্ততঃ উঠিয়ে নিতে পারলে ত মনটা খুশী থাকে।

ছবি আঁকা তিনি শিখেছিলেন কলকাতায় শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। পরে 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে শিখতেন। একবার ছবি দেখিয়ে বললেন, "এতে অবনবাবুর হাতের 'টাচ' আছে"—দেখলাম সেই আগেকার 'ওয়াশ' পেণ্টিং গোছের। খুব ভাল 'ফিনিশ'।

তাঁর আঁকা ছবির আলোকচিত্র কয়ট থেকে বুঝতে পারা যাবে যে কাজ তিনি বেশ ভাল ভাবেই শিখেছিলেন। যদি আরো কিছু সময় তিনি ছবি আঁকার সাধনায় রত থাকেন তবে তাঁর হাত দিয়ে যে নূতন ধরণের শিল্পসৃষ্টি বেরিয়ে আসবে তাতে সন্দেহ নেই।

## রবিস্মৃতি

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাহিরে মলিন ধূমল আকাশ, ভিতরে আধার ঘর,  
নবজীবনের স্বপ্ন দেখালে তুমি।  
নব অরুণের উদয়রশ্মি লাগিল ললাট 'পর,  
জাগে ধরিত্রীতুমি।

ভেঙে গেল ঘুম, প্রাণ-নির্ধ্ব'র বহিল কলোচ্ছ্বাসে,  
দূরে সরে গেল মরণের কালো ছায়া,

অজানা রূপের অপরূপ আভা আকাশে বাতাসে ভাসে,  
এ কোন্ মন্ত্রমায়া।

শিশু-মনে দিলে জীলা-হিলোল কল্পনা-মণ্ডুখারা,  
যৌবনশিখা জ্বালালে তরুণ প্রাণে,  
ছন্দে বহিল স্বর্গ-মর্ত্য রবি শশী গ্রহতারা—  
নিখিল ভরিল গানে।

# মালয় উপদ্বীপের পুরাতত্ত্ব

শ্রীনিরুপমা দত্ত

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যতগুলি বড় রাজ্য আছে তন্মধ্যে রাজ-নীতিক্ষেত্রে মালয় আঞ্চল্যে যে সর্বনিম্নস্থানীয় এ কথা অস্বীকার করিবার জো নেই। কিন্তু ইহার বর্তমান পরিস্থিতি যাহাই হোক না কেন, প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে ইহার গৌরবোচ্চল অতীত হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্বেগ করে। মালয় উপদ্বীপের অধিবাসীরা প্রধানতঃ মোঙ্গোলীয় মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত। নৃতত্ত্ববিদগণের অভিমত এই যে, ইহাদের দেহে আর্য্যবর্ত্তের কিঞ্চিৎ ছিটেফোঁটা আছে। স্মরণাতীত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কত বিভিন্ন জাতি আসিয়া এই সুফলা সুফলা ভূখণ্ডে রাজত্ব করিয়া গিয়াছে। তাহাদের পতন-অভ্যুদয়ের কাহিনী পরম চিত্তাকর্ষক।

মালয়ের ইতিবৃত্ত কবে প্রথম লিপিবদ্ধ করা আরম্ভ হয় সে বিষয়ে এখন আলোচনা করা যাইতেছে। গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে এই দেশের ইতিকথা ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব পর্য্যন্ত অলিখিত ছিল, এবং ইহার ইতিহাসের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বাঁচিয়া রহিয়াছিল। শুধু মালয় জাতির উপকথা ও কিংবদন্তীর ভিতর দিয়া। মালয় যে অতি প্রাচীন দেশ তা সেখানকার ভূগর্ভ খনন করিয়া যে সমস্ত নিদর্শন-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতীত হয়। সেই আদিম যুগ হইতে ইসলাম অভিযানের পূর্ব পর্য্যন্ত ইহার বুকে যে কত বিভিন্ন রাজ্যের অভ্যুত্থান ও পতন হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও পাওয়া যায় নাই।

গত চতুর্বিংশ বৎসর ধরিয়া পুরাতত্ত্ববিদদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বিস্তৃত অতীতের যে সমস্ত প্রত্নসম্পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটি সহজে আমরা এবার আলোচনা করিব।

উত্তর-মালয়ের ওয়েলসলি জেলায় ষাণ্মুখ্যে মধ্যে অনেকগুলি সুউচ্চ ঝিঙ্ক-স্তূপ সম্ভ্রুতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের কোনটিরই উচ্চতা ত্রুটি ফুটের কম নয়। এগুলির গড়ন ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে উক্ত স্থানটি সমুদ্রোপ-উপকূলবর্তী ছিল। সাগরের এই তীরভূমিতে বাস করিত নাম-গোত্র না-জানা এক দল মানুষ, যাহারা কৃষিকার্য্য এবং শিকার করিতেও জানিত না। ঝিঙ্ক, গুলি, কাঁকড়া ইত্যাদি সমুদ্র-তীরে অনায়াসলব্ধ ষাণ্মুখ্য আহার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারা জীবন ধারণ করিত। তাহাদের ভুক্তাবশিষ্ট ঝিঙ্কের খোলা-গুলি ক্রমে ঐ সকল স্তূপে পরিণত হয়। আশ্চর্যের বিষয়, সুদূর অষ্ট্রেলিয়ার হাঙ্গবেরি নদের উপকূলেও অল্পরূপে স্তূপাবলী

আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনৈক জার্মান নৃতত্ত্ববিদ বলেন, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের দৈনন্দিক গঠন হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে তাহাদের পূর্বপুরুষেরা আসিয়াছিল বৃহত্তর ভারত ও ইন্দোনেশিয়া হইতে। তাহাদের নিশ্চিত পাণ্ডাদি এবং প্রস্তর-যন্ত্রসমূহের আশ্চর্য্য সাদৃশ্যের জন্ত এই ধারণাটি দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে।

প্রস্তর-যুগের অসংখ্য যন্ত্রপাতি মালয়ের বহু স্থানে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি বেশ সুদৃষ্ট এবং কারু-কার্য্যচর্চিত। মধ্য-মালয়ের পাহাঙ জেলায় তেমলিং নদীর তীরেও সম্ভ্রুতি প্রস্তরোত্তর যুগ ও লৌহ-যুগের কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করা হইয়াছে। প্রাগুযুগকালে এই নদীটির উপকূলস্থ নিবিড় অরণ্য-মধ্যে আবিষ্কৃত অনেকগুলি প্রস্তরনির্মিত গৃহের ভগ্নাবশেষ লোকেদের মনে অভিনব কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছিল। এখানে উদ্ধৃত বিভিন্ন বস্তু হইতে ইহা নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া মনে হয় যে একদা ঐ স্থানে একটি বিরাট নগরী বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশের সরস্বতী নদীতীরস্থ সপ্তগ্রামের ভায় তেমলিং নদীতীরস্থ উক্ত বিস্তৃতনামা নগরীটিও বহির্বাণিজ্যের দৌলতে একটি মহাসমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই নগরীটি আধোন রূপকথায় বর্ণিত “দারাবাণেশা” রাজ্যের প্রধান বন্দর “আমারোয়াতী” (অমরাবতী)। কিন্তু আসলে ইহা অল্পমান ছাড়া কিছুই নহে। কারণ রূপকথায় উল্লিখিত ‘আমারোয়াতী’ চীনসমুদ্র-তীরে অবস্থিত ছিল—তেমলিং নদীর সহিত ইহার কোনই সংশ্লিষ্ট ছিল না।

আদিম যুগের তথাকথিত অসভ্য মানুষ কি ভাবে গিরি-গহবরে বাস করিত তাহার নিদর্শনও মালয়ে মিলিয়াছে। উত্তর-মালয়ে কেডা ও পেরাক জেলায় অবস্থিত চুন পর্বত-গুহায় (Lime Stone Hills) তাহাদের ব্যবহৃত অস্ত্র ও প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র এবং যুগপাণ্ডাদি পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি এখন স্থানীয় বাহুধরে সযত্নে রক্ষিত।

উক্ত অঞ্চলে এক প্রকার পাতলা শিলাখণ্ডে নির্মিত কতকগুলি আশ্চর্য্যজনক মূর্তির সমাধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বাক্সা, বিলিটন ও বিহাউ দ্বীপে অল্পরূপ সমাধি পাওয়া গিয়াছে। এগুলির মধ্যে যুগপাণ্ড, অস্ত্রশস্ত্র এবং কাঁচের ও পুঁতির অলঙ্কার ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কঙ্কাল বা এক খণ্ড অস্থিরও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ কঙ্কালগুলি শত শত বৎসর ভূগর্ভে পড়িয়া থাকার দরুন ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

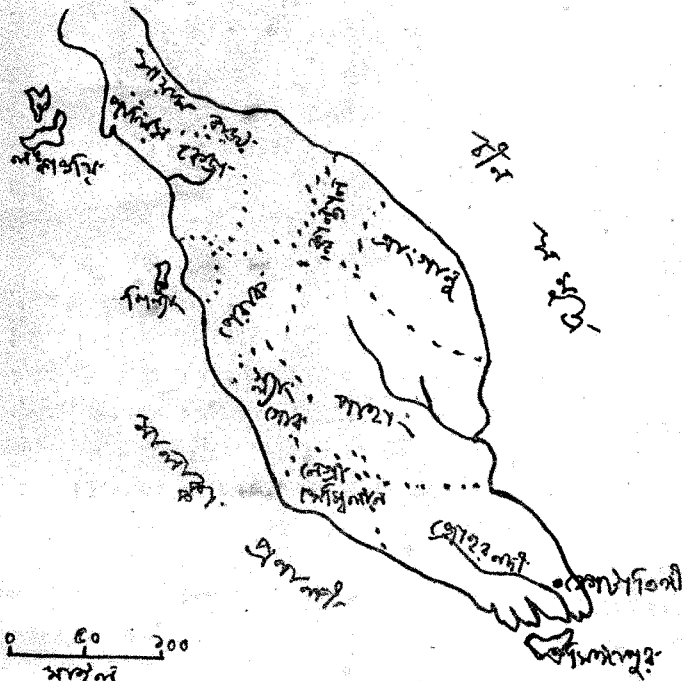


কাহার। এই সমস্ত সমাধি তৈয়ার করিয়াছিল এই প্রাচীর সঠিক উত্তর আজও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা দিতে পারেন নাই। তবে সুবিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ডাটো ব্র্যাডেল বলেন, অতি প্রাচীনকালে ভারত হইতে যেসব ব্যবসায়ী টিনের সন্ধানে মালয়ে আসিয়া পেরাক অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এগুলি তাহাদেরই সমাধি...

কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণ মালয়ে জোহর নদীতীরে অবস্থিত একটি অখ্যাত শহরের উপকণ্ঠে প্রাপ্ত কতকগুলি চূর্ণিত হিটাইট + পুঁতির সাহায্যে এই দেশের অতীত কালের অনেক অজানা তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। উক্ত পুঁতিগুলি বিবিধ বর্ণের কাঁচে নিখিত। খ্রিঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে হিটাইট রাজ্যের মেয়েরা অল্পরূপ পুঁতির অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদরা প্রমাণিত করিয়াছেন। এখানে এই প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সেই বিখ্যাত প্রায় মাঙ্গাতার আমলে সুদূর হিটাইট হইতে উক্ত বস্তু কি করিয়া

সমসাময়িক আলেকজান্দ্রিয়ার নাবিকদের অজানা ছিল না। ইহাতে মালয় উপদ্বীপের চিত্রটি এমন নিখুঁত ভাবে খুঁটিনাটিসহ অঙ্কিত যে তাহা আজও আমাদের বিশ্বাসের উদ্বেক করে। উত্তর মালয়ের “ক্রা” যোজকটিও ইহাতে অঙ্কিত আছে।

টলেমি তাহার পুস্তকে লিখিয়াছেন—স্বর্ণভূমির দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত “পালাঙাস” নামক নদীতীরে অবস্থিত পালাঙা নগরী ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিয়া বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। প্রাচ্য-ভাষাতত্ত্ববিদ ক্রাসী পণ্ডিত বার্লিট দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন টলেমির উল্লিখিত “পালাঙাস” নদীই বর্তমানে জোহর নদী নামে পরিচিত। কিন্তু জোহর নদীতীরে অবস্থিত বর্তমানে “কোটাতিঙ্গী” শহরটি টলেমি-বর্ণিত সেই পালাঙা নগরী কিনা তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে “কোটাতিঙ্গী” শহরটি যে অতি প্রাচীন এবং ইসলাম অভিযানের বহু পূর্ব থেকেই

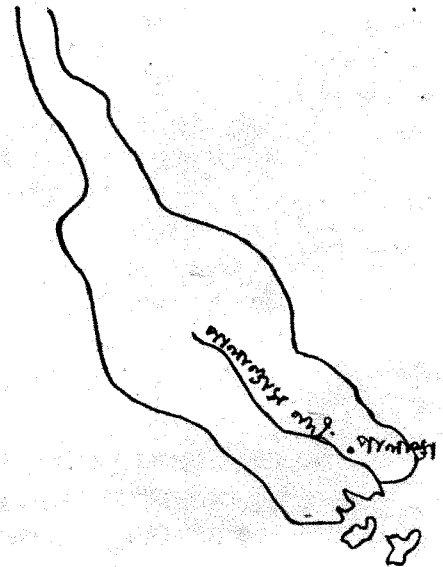


মালয় উপদ্বীপ

এই ভূখণ্ডে আসিল? ইহার সঠিক উত্তর ইতিহাস আজও দিতে পারে নাই। তবে ১৫০ খ্রিষ্টাব্দে মিশরীয় জ্যোতির্বিদ টলেমির অঙ্কিত একখানি মানচিত্র হইতে উক্ত প্রশ্নের উত্তর কতকটা মিলিতে পারে বলিয়া মনে হয়। উক্ত মানচিত্রটি হইতে জানা যায় যে, প্রাচ্যে আসিবার জলপথ টলেমির

\* Notes on Ancient Times in Malay—R. Braddell.

† ভূমধ্যসাগর তীরস্থ সিরীয়া রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত একটি প্রাচীন দেশ।



টলেমির স্বর্ণভূমি

যে বিস্তারিত ছিল তাহা ইহার অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার ভূগর্ভ হইতে হিটাইট পুঁতি ছাড়া আরও এমন সব হুপ্রাণ্য বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা দুই সহস্র বৎসর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত মালয়ের ব্যবসায়গত এবং অর্থনৈতিক কিংবদন্তি যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার নীরব অথচ অকাটা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উক্ত বস্তুগুলি

পরীক্ষা করিয়া এবং তৎসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া জানা গিয়াছে যে একদা সেগুলি এদেশে আসিয়া-ছিল হিটাইট, ফিনিসিয়া, মিশর, ইটালী, দক্ষিণ-আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, থাম, কাছোজ, চীন এবং প্রশান্ত মহা-সাগরের কয়েকটি অধুনাবিলুপ্ত রাজ্য হইতে। এই সমস্ত নিদর্শন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অস্বাভাবিক করেন যে, দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদ্যমান সুবিখ্যাত নগরী “পালাঙা” বোধ হয়, কালক্রমে আফ্রিকার অখ্যাত শহর কোটাতিদীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।\*

সুপ্রাচীন কালে ভারতবর্ষের সহিত তৎকালীন “স্বর্ণভূমির” (মালয়ের প্রাচীন নাম) যে কি সুদৃঢ় যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল তাহা যে শুধু ভূগর্ভে নিহিত বিবিধ দ্রাব্যনিচয় হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে তাহা নহে; এই উপদ্বীপের নগর পল্লী পর্বত নদী ইত্যাদির সংস্কৃত নাম এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষা সংস্কৃতি আচার-ব্যবহারাদিতেও তাহা সুপরিস্ফুট। শিক্ষিত মালাইরা আজও তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা ভারতবর্ষ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন একথা বলিতে গৌরববোধ করেন।

জাপানী যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে ক্রান্তান্ত্র ও জাংগাহু জেলার সীমান্তে “চিন্তাশা” পর্বতের উপত্যকায় একটি প্রাচীন বিলুপ্তপ্রায় শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন মালয়ে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি যে কি বিপুল প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন এই নাম-না-জানা শহরটির প্রতি ইষ্টকখণ্ডে বিজ্ঞমান। শহরটির চারিদিকে ছিল প্রশস্ত রাজপথ; পথিকদের নিমিত্ত পথিপার্শ্বে কয়েক ফারলং অন্তর অন্তর কূপ এবং সরাইখানার ব্যবস্থা ছিল। দক্ষিণ-ভারতের শৈব-মন্দিরের ছায়া আকৃতিবিশিষ্ট কয়েকটি ভগ্ন জীর্ণ মন্দির এখানে বিজ্ঞমান। তন্মধ্যে একটি মন্দিরে প্রস্তরনির্মিত শিবলিঙ্গের অর্ধাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া অনেকগুলি যুগপাত্র, ছ'খানি তাম্রখালা এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের কয়েকটি মুদ্রা ও পদক এ স্থানের ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছে। এই সমস্ত মূল্যবান বস্তু সিঙ্গাপুরে আনিয়া যাহুঘরে রাখা হইয়াছিল। এমনি ভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক বননকার্য্য বেশ চলিয়াছিল। কিন্তু মালয়ে অকস্মাৎ জাপানীদের আক্রমণাত্মক অভিযান সুরু হওয়ায় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কাজকর্ম একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়।

তখন এদেশীয় জনৈক প্রত্নতত্ত্ববিদ জাপানী সরকারকে অনুরোধ করেন যে যাহুঘরে রক্ষিত মালয়ের অতীত সম্পদগুলি কোন নিরাপদ স্থানে সরাইতে পারিলে ব্রিটিশ বিমানবহরের ব্যাপক আক্রমণ হইতে এগুলিকে রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে।

প্রথমে এই আবেদনটি অগ্রাহ করা হয়। আত্মসমর্পণের কিছুদিন পূর্বে, যখন সিঙ্গাপুরের উপর রোজ তিন-চার বার

করিয়া বিমানহানা চলিতেছিল তখন যাহুঘর হইতে মালয়ের বহু অমূল্য প্রত্নসম্পদ বিমানযোগে জাপানে প্রেরিত হয়। কিন্তু শত্রুর ঝাঁট অতিক্রম করিয়া সেগুলি যথাস্থানে ঠিকমত পৌঁছিয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় নাই।



উত্তর মালয়ে কেডা জেলায় প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি

মালয় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পুনরুদ্ধারিত হইলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগটিও পুনরায় খোলা হয়।

ছই বৎসর পূর্বে কেডা অঞ্চলে আর একটি চমকপ্রদ বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা শাক্যমুনির একটি ব্রোঞ্জনির্মিত মূর্তি। প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাঃ ওয়েলস্ বলেন, ইহা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গুপ্তযুগে নির্মিত মূর্তি। কেডা অঞ্চলে অদ্যাবধি যতগুলি হিন্দু এবং বৌদ্ধ দেবদেবীর বিগ্রহ উদ্ধৃত হইয়াছে তন্মধ্যে শুধু এই মূর্তিকেই অভয় অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্তিটির গঠনপ্রণালী হইতে ইহাও স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কেডার হিন্দু ঔপনিবেশিকরা আসিয়াছিলেন ক্রফা-গোদাবরী অঞ্চল হইতে। উক্ত মূর্তি বর্তমানে স্থানীয় যাহুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে।



# শিশুশিক্ষার গোড়ার কথা

শ্রীনীলরতন দাশ

অতীতের বহু স্থিতি-বিজড়িত ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত ইটন স্কুলের নাম অনেকেই জানেন। বস্তুতঃ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাদীক্ষার গুণে বহু ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়া পরবর্তী জীবনে প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছেন। এই ইটন স্কুলের জনৈক প্রধান শিক্ষক রোজই ক্লাসে প্রবেশ করিয়া প্রথমে নিজেই ছেলেদিগকে অভিযাদন করিতেন। ফলে ছেলেরা আগে তাঁহাকে অভিযাদন করিবার সুযোগ পাইত না। একবার ছেলেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তিনি আগেই কেন তাহাদিগকে অভিযাদন করেন। তৎপরে তিনি বলিয়াছিলেন, “কে বলতে পারে, তোমাদের মধ্যে একজন ভাবী সেক্স-পিয়ার নেই? কে জানে তোমাদের ভেতরে কোনও নুতন নিউটন বালকরূপে রয়েছে কিনা? কে বলতে পারে, তোমাদের মধ্যে আর একজন ক্রমওয়েল আসেন নি? তোমাদের রয়েছে সেই অজানা মহা সম্ভাবনা। তাই আমি ক্লাসে প্রবেশ করেই তোমাদের সেই অজানা মহা সম্ভাবনাকে জানাই আমার অন্তরের অভিযাদন।”

বাস্তবিক, ভগবানের কি অদ্ভুত সৃষ্টি মানবশিশু। দেহে ক্ষুদ্র হইলেও তাহার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এক বিরাট সম্ভাবনা। তাই ইংরেজ কবি বলিয়াছেন—“The child is father of the man.” “চুম্বিয়ে আছে শিশুর পিতা, সব শিশুরই অন্তরে।” অনাগত ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী এই মানবশিশু বহন করিয়া আনে সমগ্র জীবনের নবীন বার্তা। এই অসহায় ক্ষুদ্র প্রাণটির উপরেই নির্ভর করে পরিবারের সুখশান্তি, সমাজের কল্যাণ, জাতির গৌরব, রাষ্ট্রের শক্তি, দেশের আশাভরসা। যে শিশুটি আজ এক আনা মূল্যের একখানি ‘শিশুশিক্ষা’ বই, ‘নব বারাপাত’ এবং ভাড়া স্ট্রেট সহল করিয়া পাঠশালার জীর্ণ গৃহে বসিয়া বর্ণমালা শিখিতেছে, অথবা নামতা মুখস্থ করিতেছে—সেই শিশুটিই হয়ত এক দিন হইবে দেশের ও দশের ভাগ্যবিধাতা। বৃক্ষজীবনের যেমন অঙ্কুর, মানবজীবনের পক্ষে সেইরূপ শৈশব। শৈশব সমগ্র ভবিষ্যৎ মানবজীবনের অঙ্কুরীকৃত সম্ভাবনা মাত্র। তাই উপযুক্ত যত্নে লালন করিতে না পারিলে শৈশব সার্থক যৌবনে পরিণত হইতে পারে না।

অতএব ছেলেকে যদি প্রকৃত মানুষ করিতে হয়, তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে; নতুবা “সে ছেলেই থাকিয়া যাইবে, মানুষ হইবে না।” ছেলেকে মানুষ করিতে হইলে, শৈশব হইতেই আনন্দময় পরি-

বেশের মধ্যে তাহার প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে আনন্দের ভিতর দিয়া তাহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিশুকে শিক্ষাদান করা যে কত কঠিন, কত জটিল, কত গুরুতর বিষয় তাহা আমরা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। অনেকেই বলেন, “ছেলে পড়ান? ও! এ আবার কঠিন কি? পড়াইলেই হইল।” এই শ্রেণীর লোক শিক্ষাদানের যোগ্য অধিকারী নহেন। অধ্যাপনা যে কিরূপ গুরুতর এবং কঠিনতর কার্য তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শিক্ষাদাতাকে শিশু হইয়া শিশুর অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। শিশু কি প্রকার জ্ঞান চাহিতেছে, কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহার জ্ঞানপিপাসা স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইবে, শিশু কেন বুঝিতেছে না, কি করিলে সে সহজে বুঝিতে পারিবে ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদাতার বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের অন্তর্নিহিত স্তম্ভ শক্তিকে জাগ্রত, বিকশিত ও পরিপুষ্ট করিয়া তাহাকে সমাজ ও সংসারের উপযুক্ত করিয়া তোলা। শিশুর মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে, তাহাকে জীবনে রূপায়িত করিয়া তোলা—শিক্ষার সোনার কাঠি স্পর্শে তাহার অন্তরের ‘মানুষটিকে’ জাগ্রত করিয়া তোলাই শিক্ষাদাতার কাজ। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, শিশুশিক্ষার এই গুরু দায়িত্বভার কে গ্রহণ করিবে? কবির কথায় বলিতে গেলে—

“এই যে শিশু তরুণ তত্ত্ব

নতুন মেলে আঁধি,

ইহার ভার কে লবে আজি

তোমরা জান তা কি?”

করাসী দেশের সুবিখ্যাত মনীষী রুশো বলিয়াছেন—মাতৃগর্ভ হইতে মানবশিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়; সুতরাং গৃহই শিশুশিক্ষার ভিত্তিভূমি এবং শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়া মানুষ করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্বও পিতামাতার। কিন্তু শিশুকে যথোচিতরূপে শিক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা অথবা সুবিধা সকল পিতামাতার থাকে না। বিশেষতঃ আমাদের দেশে, যেখানে শতকরা ৯০ জন নরনারী নিরক্ষর, সেখানে পিতা-মাতার পক্ষে গৃহে শিশুশিক্ষার ভার গ্রহণ করা কতটা সম্ভব, তাহা সহজেই অনুমেয়। এমন কি, শিক্ষাদীক্ষায় সম্যক্ অগ্রসর এবং জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সমুন্নত পাশ্চাত্য দেশসমূহে—যেখানে শতকরা ৯০ জনের অধিক নরনারী শিক্ষিত, সেখানেও শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাসরি স্কুলে

প্রধানতঃ শিক্ষয়িত্রীদ্বারা চালিত হয়। ইংলণ্ডের জনৈক গ্যাতনামা শিক্ষক বলিতেন যে, যদি তাঁহার কোন ছাত্রের বাড়ী না থাকিত, তবে তিনি তাঁহার আদর্শকে কিয়ৎ পরিমাণে কার্যে পরিণত করিতে পারিতেন। তাঁহার অধিকাংশ ছাত্রই সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলে ছিল, এবং তাহারা সকলেই বোর্ডিঙে থাকিয়াই অধ্যয়ন করিত। তথাপি উক্ত শিক্ষকের ধারণা ছিল যে, ছুটির সময় ছাত্রগণ গৃহে অবস্থান করে বলিয়া তাঁহার শিক্ষাদানকার্যের সাফল্যে ব্যাধাত জন্মে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “শিশুদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থতার পিতামাতার উপর। কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা না থাকিতেই অল্প উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাৱশ্যক হইয়া উঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা-স্থানীয় না হইলে চলে না। বর্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর প্রয়োজনই বেশী। শিশুবয়সে নির্জীব শিক্ষার মত ভয়ঙ্কর আর কিছুই নাই। তাহা মনকে যতটা দেয়, তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশী। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি, যিনি আমাদের চিন্তার গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন।”

সদাচল ও ক্রীড়াশীল শিশু খেলাধুলা, হাসি-গান ও আনন্দের মধ্য দিয়া এবং স্বতঃপ্রসূত হইয়া কৌতূহলবশে যে শিক্ষালাভ করিবে, তাহাই হইবে সত্যকার শিক্ষা। শিক্ষক যদি সকল শিশুকে একই ছাঁচে ঢালিয়া, ধর্ম্মা মাজিয়া, মারিয়া পিটিয়া, অচিরং পণ্ডিত বানাইতে চেষ্টা করেন, তবে কালক্রমে সেই শিশুর মানসিক বৃত্তিসমূহের উপযুক্ত বিকাশ হইবে না, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহার পক্ষে বিকৃত মনোর্ত্তিসম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। শিক্ষকের প্রধান কাজ হইবে, সর্বদা শিশুর সঙ্গে থাকিয়া সাবধানে, সত্ব্রে ও সুবিবেচনার সহিত তাহাকে পরিচালিত করা। শিক্ষক হইবেন শিশুর “Friend, philosopher and guide”। শিশু ও কিশোরদের এই ভাবে শিক্ষাদানের জন্ত পৃথিবীর স্বাধীন ও প্রগতিশীল দেশগুলিতে কত বিচিত্র রকমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং নিত্য কতই না অভিনব শিক্ষাপদ্ধতির আবিষ্কার ও গবেষণা চলিতেছে। শিশুর জীবনকে শিক্ষাদীক্ষায় সর্বাঙ্গসম্পন্ন ও সার্থক করিয়া তুলিবার জন্ত সেই সকল দেশে নাসাঁরি স্থল, এবং কিওয়ার্গার্টেন প্রণালী ও মন্টেসেরী-পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্ত কত উন্নত-ধরণের শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উপরন্তু প্লেগেয়ে রীতি, ড্রামাটিক্‌ ওয়ে অব টিচিং প্রভৃতি শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। ইহার সহিত আমাদের দেশের শিশুশিক্ষার ব্যবহার তুলনা করিলে মন দুঃখ ও নৈরাশ্যে ভরিয়া উঠে। কারণ এ দেশে

শিশুশিক্ষার নামে চলিতেছে শিশুপাল বধ, এখানে এখনও বহু-ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবহার অল্পরূপে শিক্ষাদান চলিতেছে। “Spare the rod and spoil the child”—এই নীতিবাক্য এ দেশের অনেক শিক্ষক এখনও পরিহার করিতে পারেন নাই। কাজেই শিশু যেদিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম আসিয়া ভর্ত্তি হইল, সেদিন হইতে আরম্ভ হইল তাহার জীবনের ট্রাজেডি। যে সূক্ষ্মারমতি সদাপ্রজ্ঞ শিশু আপনার গৃহে, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে, সর্বদা ছুটাছুটি করিয়া খেলাধুলায় মাতিয়া মনের আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিত, আজ সহসা তাহার উপর নামিয়া আসিল শিক্ষকের প্রচণ্ড শাসনদণ্ড। সদানন্দ শিশুর অন্তরাত্মা শিক্ষকের রক্তচক্ষু আর দুর্গম্যান বেত্রদণ্ড দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। শিশুমনে সেই যে প্রথম আতঙ্কের স্মৃতি হইল, তাহা আর মুচিল না। শিশু পাঠশালাকে আনন্দ-নিকেতন বলিয়া ভাবিতে পারিল না, উহা তাহার কাছে একটা ভীতিপ্রদ বন্দীশালাসদৃশ বলিয়া মনে হইল, মুক্ত বনবিহঙ্গ যেন পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া পড়িল। এখানকার বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে নিরানন্দ শিক্ষাপ্রণালীকে সে প্রাণের সহিত, আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারিল না। রক্তশ্বাসে বদ্ধবরে আনন্দহীন পরিবেশের মাঝখানে বসিয়া বসিয়া তাহার শিশুচিত্ত অবসাদ ও অশান্তিতে হাঁপাইয়া উঠিল। শিশুর মানস-শতদলের পাপড়িগুলি পূর্ণবিকশিত হইবার পূর্বেই রেহবারি-সিঙ্কনের অভাবে এবং রক্তশ্বাসনের খররোজে শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িল। যে সকল নববিজ্ঞানী পৃথিবীতে গুরুমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হয়তো ভাবী বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র, আশুতোষ ও চিত্তরঞ্জন লুকাইয়া ছিল,—তাহাদের হইল অকালমৃত্যু।

রবীন্দ্রনাথ বড় ছুৎখৈ বলিয়াছেন—“বাঙালীর ছেলের মত এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অল্প দেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোদগত দৃষ্টিতে আনন্দমনে ইচ্ছা চর্চণ করিতেছে, বাঙালীর ছেলে তখন স্থলের বেঞ্চের উপর কৌচাসমেত দুই-খানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোহুলামান করিয়া শুকমাত্র বেত্র হজম করিতেছে, মাষ্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর অল্প কোনরূপ মসলা মিশানো নাই।”

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বেও ইউরোপের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীকে শারীরিক শাস্তিদানের ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু শিশুচরিত্র ও শিশুমনস্তত্ত্ব পর্যালোচনা করিয়া ক্রমে ক্রমে শিক্ষাবিদ পণ্ডিতগণ শারীরিক দণ্ডবিধান প্রথা বিদ্যালয় হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার আইন অনুসারে পিতামাতা পর্যন্ত সন্তানকে প্রহার করিতে পারে না, সন্তানকে শারীরিক কষ্ট দেওয়া তথায় অপরাধ

বলিয়া গণ্য, এবং ইহার জ্ঞান পিতামাতাকে শান্তি পাইতে হয়। কিন্তু এ দেশে শিশুদের কোমলগাত্রে কত পিতামাতা আর শিক্ষক যে প্রতিদিন আশাতের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। জীবনের প্রভাতে শিশুর যাত্রাপথ যদি চোখের জলে ভিজিয়া উঠে, তবে শিশুজীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা বড় দুর্ভাগ্য আর কিছু হইতে পারে না। স্বাধীনতা এবং আনন্দের মধ্য দিয়া যদি শিশুদের জীবনকে আমরা পুষ্পের

মত বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ দিতে পারিতাম, তবে আজ পৃথিবীর রূপ বদলাইয়া যাইত। শিশুর জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে জোরজবরদস্তিতে নয়, স্নেহমমতা দিয়া; আশাত করিয়া নয়, আলিঙ্গন করিয়া। শিশুশিক্ষা কেবল কটকিত পথে ঠিকমত হইবার নয়; অপরিমেয় সহানুভূতি, অসীম ধৈর্য্য আর অক্লান্ত দরদের পথই শিশুশিক্ষার প্রকৃত পন্থা।

## জৈন মহর্ষি রায়চাঁদ ভাই

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

গুজরাটী ভাষায় লক্ষপ্রতিষ্ঠ কবি রাজচন্দ্র অথবা রায়চাঁদ ভাই কাথিয়াবাড় ষ্টেটের অন্তর্গত ভবানীয়া নামক স্থানে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। লগুন থেকে ১৮৯১ সালে, যেদিন আমি দেশে ফিরে আসি সেদিনই বোম্বাইয়ে ডক্টর পি. জে. মেহতার বাসভবনে এই কবির সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আমি কবি বলেই তাঁকে সম্বোধন করতাম, তিনি ডক্টর মেহতার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি শত-বাধনী অর্থাৎ একসঙ্গে এক শত বিষয় স্মরণ রাখতে সমর্থ বলে আমার নিকট পরিচিত হন। কবি তখন যুবক ছিলেন, আমার প্রায় সমবয়সীই হবেন। বয়স খুব সম্ভব তখন একুশের কাছাকাছি। বাস্তব জগতের সকল কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়ে তিনি ধর্মসাধনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছিলেন। আমি তাঁর সরল অনাড়ম্বর জীবন, এবং স্বাধীন বিচারশক্তির জন্ত তাঁর প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতাম। তিনি সর্ববিধ অন্ধ গোঁড়ামির হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। তিনি কর্মকে সক্রিয় ধর্মসাধনার রূপান্তরিত করেছিলেন বলেই সম্ভবতঃ তাঁর প্রতি আমি সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলাম। অধ্যাত্ম-দর্শনের একজন কৃতী ছাত্র হিসাবে তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাই কার্য্যত অনুশীলনেও সচেষ্ট হতেন। স্বয়ং জৈন ধর্মাবলম্বী হলেও অন্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর সহনশীলতা উল্লেখযোগ্য। উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্ত ইংলও যাবার সুযোগ পেয়েও তিনি তা গ্রহণ করেন নি।

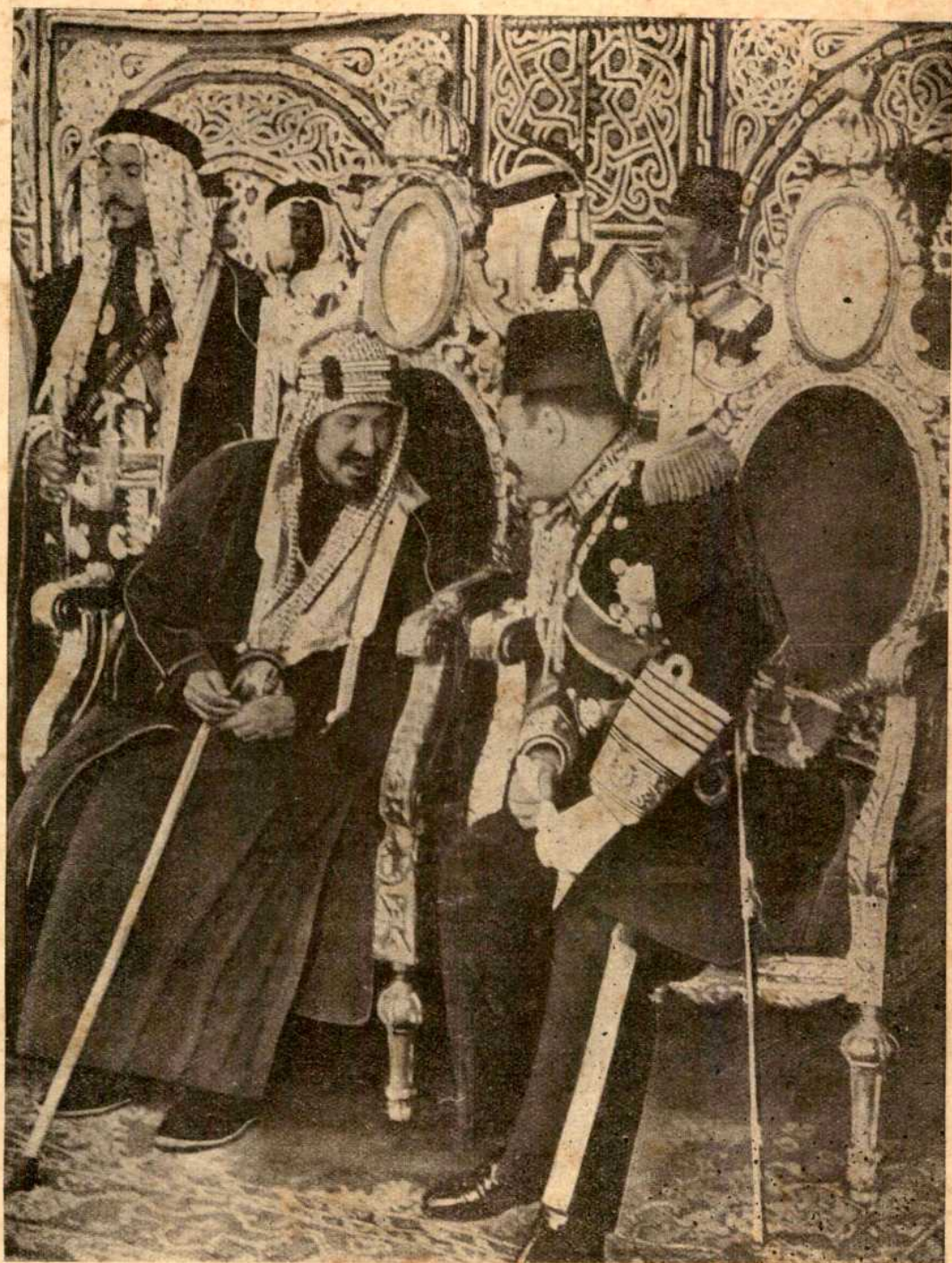
তিনি ইংরেজী শেখেন নি। তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাথমিক বিজ্ঞানয়েই যা কিছু হয়েছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন বিশেষ প্রতিভার অধিকারী। তিনি সংস্কৃত ও মাগধী ভাষা জানতেন এবং আমার ধারণা পালী ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ধর্মগ্রন্থ পাঠে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি একজন প্রহেলিকা ছিলেন। গুজরাটী ভাষার মাধ্যমে তিনি অধ্যাত্মশাস্ত্র-বিষয়ক প্রভূত জ্ঞান আহরণ করেন, এমন কি ইসলাম ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম এবং জরগুট্ট-প্রবর্তিত ধর্মবিষয়েও যথোচিত ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি বাস্তবিকই একজন মনীষী ছিলেন। আধ্যাত্মিক

বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আমাকে নিরতিশয় মুগ্ধ করেছে। আমি অজ্ঞাত বছবার বলেছি যে, আমার আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে উক্ত কবির প্রভাব টলটল, রাস্তিন প্রভৃতির প্রভাবকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। কবির প্রভাব গভীরতম হওয়ার এটাই মুখ্য কারণ যে, আমি তাঁর ব্যক্তিত্বের নিকটতম সংস্পর্শ লাভে বঞ্চিত হয়েছিলাম। তাঁর উপদেশাবলী জীবনের বিরাট কর্মক্ষেত্রের অধিকাংশ ব্যাপারেই আমার বিবেককে প্রবৃত্ত করেছে। তাঁর ধর্মবিশ্বাসের মূলভিত্তি নিঃসন্দেহভাবে অহিংসা। একমাত্র বুদ্ধ ও রুদ্র গৃহপালিত পশু এবং বিবিধ কীটপতঙ্গ ইত্যাদিকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করাই অহিংসার পরাকাষ্ঠা। একথা যারা বলে থাকে, সেইসব তথাকথিত অহিংসার পুজারীর দ্বারা যে সকল অদ্বুত আচরণ অমুষ্ঠিত হতে দেখতে পাওয়া যায়, রায়চাঁদ ভাইয়ের অহিংসা ঠিক সে ধরনের নয়। তাঁর অহিংসা ক্রুদ্ধতম কীট থেকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সমভাবে প্রযুক্ত হ'ত।

তথাপি কবিকে দোষাক্রটিহীন পূর্ণ মানবরূপে মেনে নিতে আমি কখনো পারি নি। কিন্তু যেসব শ্রেষ্ঠ মনীষীর সঙ্গে আমি সবিশেষ পরিচিত তাঁদের সকলের চেয়ে এই কবি পূর্ণতার অধিকতর নিকটবর্তী বলে আমার নিকট প্রতিভাত হতেন। হয়। তিনি অকালে, মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। সত্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সত্যলোকে প্রয়াণ করলেন। তিনি তাঁর স্তাবক রেখে গেছেন অসংখ্য, কিন্তু অল্পগত শিষ্য রেখে গেছেন খুবই কম। তাঁর লেখার ভিত্তর অধিকাংশই প্রজাবলী, যা তিনি অসুস্থত্বের নিকট গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতিপূর্ণ প্রাণের ভাষায় লিখেছিলেন। এই পত্রসকল প্রকাশিত হয়েছে গুজরাটী ভাষায়। হিন্দীতে অনূদিত হয়ে এগুলি প্রকাশের চেষ্টাও হচ্ছে। এর ইংরেজী অনুবাদও শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে আমি জানি। এই প্রজাবলীতে বর্ণিত বিষয়গুলি প্রধানতঃ কবির আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

\* ১৯৩০ জুনের 'মডার্ন রিভিউ'র একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে ট্রিউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক লিখিত।





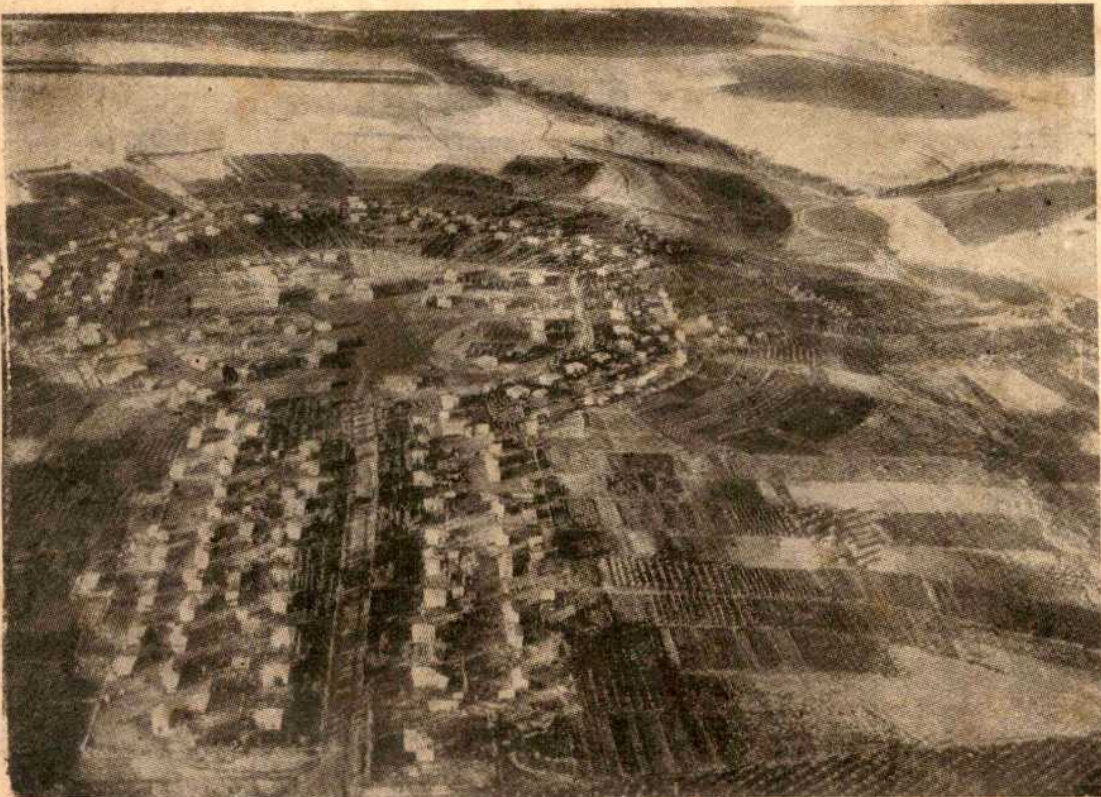
পোর্ট তকিফে 'আরব লীগের' দুই কর্ণধার ।  
 সৌদি আরবের নৃপতি ইব্ন সৌদ ( বামে ) ও মিশরের রাজা ফারুখ



## আরব-ইহুদী সংঘর্ষ



ইজরায়েল রাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্র তেল আভিভ



সমবায় নীতিতে গঠিত, ধরবাড়ী ও শক্তক্ৰিপূর্ণ ইহুদী উপনিবেশ কাফার জেবেকেল



# কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্য ও তাহার বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ-প্রণালী

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস, এম-এসসি

ভারতবর্ষে উৎপন্ন কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্যসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যে একান্ত প্রয়োজন তাতে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও জলসেচন প্রভৃতির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে প্রত্যেক ফসলের উৎপাদন বহুলাংশে বাড়ানো যেতে পারে। বর্তমানে কৃষিবিদগণ এ কার্যে আগ্রহনিয়োগ করেছেন এবং আশা করা যেতে পারে বৈজ্ঞানিক প্রথার কৃষিকার্য পরিচালনা করলে ক্রমশঃ উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেড়ে চলবে। কিন্তু কেবল ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয় চিন্তা করলেই চলবে না—দেখতে হবে কি করে এই উৎপন্ন ফসলসমূহ সুরক্ষিত অবস্থায় দেশবাসীর নিকট দীর্ঘ কালের জন্য ব্যবহারযোগ্য থাকে। আমরা সকলেই ফসলের ক্ষতি সাধনকারী বিবিধ কীটপতঙ্গের বিষয় অবগত আছি। ফসল গোলাজাত করবার পরও কীটপতঙ্গের দ্বারা বহুলাংশে বিনষ্ট হতে পারে। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এজন্য বহু অর্থের অপচয় ঘটে এবং গবর্ণমেন্ট ও বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টায় এইরূপ অপচয়-বহুলাংশে নিবারণ করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের পক্ষেও এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। এই দেশেও এইরূপ কীটপতঙ্গের জন্ম বহুল পরিমাণে শস্য বিনষ্ট হয় এবং বার্ষিক অপচয়ের পরিমাণ লক্ষ লক্ষ টাকা হবে সন্দেহ নাই। বিশ্বের ধান, চাল, ডাল, গম, তামাক ও বিবিধ ফল এইরূপ কীটপতঙ্গের জন্ম বিনষ্ট হয়। এর আন্ত প্রতিকার একান্ত প্রয়োজন।

উপরোক্ত কীটপতঙ্গসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর হতে পারে এবং এদের বিনষ্ট করারও নানারূপ উপায় আছে। সাধারণ ভাবে গরম ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সৃষ্টি করে উপযুক্ত আধারের মধ্যে শস্যাদি সংরক্ষণ করবার ব্যবস্থা করলে কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে অনেকাংশে সেগুলোকে রক্ষা করা যেতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ১৪০° ফারেন হাইট টেম্পারেচারের সাহায্যে ধান ও তামাক ছাড়া অনেক শস্য-বীজকে কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে বাঁচানো যেতে পারে। এই উপায় অবলম্বন করলে বীজগুলির অধুনি হবার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হয় না। অতিশয় ঠাণ্ডা আধারসমূহের মধ্যে খাদ্য-দ্রব্যাদি সংরক্ষণ করবার ব্যবস্থাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। অবশ্য এটা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং এদেশের পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। ঠাণ্ডা ও গরম আধারের মধ্যে শস্য ও ফসলসমূহ সংরক্ষণ করার বিষয় আলোচনা করা গেল। এক্ষণে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগে কিভাবে শস্যাদি সংরক্ষিত হতে পারে তা দেখা যাক।

ফরমালডিহাইড, ছাপথলিন প্রভৃতি কতিপয় রাসায়নিক পদার্থের সহিত অনেকেরই সুপরিচিত এবং এই সকল পদার্থ সাধারণ টেম্পারেচারেই ধীরে ধীরে বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত হয়ে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে ও সকল রকম কীটপতঙ্গ বিনষ্ট করে। সঞ্চিত দ্রব্যসমূহ এই বাষ্পের কিয়দংশ শোষণ করে রেখে দেয় যার ফলে অনেকদিন নতুন কীটসমূহ জন্মাতে পারে না। খাদ্যদ্রব্যাদি সঞ্চয়ের জন্য যে সব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করতে হবে সেগুলো মানুষ ও যাবতীয় জীবজন্তুর পক্ষে সর্বতোভাবে নিরীক্ষণ হওয়া দরকার। অবশ্য এই সকল পদার্থ অতি সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করেই বহুল পরিমাণে খাদ্যশস্য সংরক্ষিত করা চলবে। কীটপতঙ্গ বিনষ্ট করবার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ঔষধ পাইরেথ্রাম নামক একপ্রকার গাছের তুল হতে প্রস্তুত হয় এবং তাকে পাইরেথ্রাম এক্সট্রাক্ট বলে। এটি একটি তরল পদার্থ এবং তৈলে দ্রবীভূত করে স্প্রে করবার ব্যবস্থা করলে এর কীটবিনাশক শক্তি অনেক বেড়ে যায়। পাইরেথ্রাম জাপান থেকে, বেশী পরিমাণে আমদানী হত এবং পূর্বে আফ্রিকা থেকেও কিছু কিছু পাওয়া যেত। শস্য সংরক্ষণগারে পাইরেথ্রাম স্প্রে দিয়ে মধ্যে মধ্যে কীটাদি বিনাশ করবার চেষ্টা করতে হবে। এতে কীটপতঙ্গ বহুল পরিমাণে ধ্বংস হবে। শুষ্ক আবহাওয়াই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। তাতে কীটপতঙ্গ বেশী পরিমাণে জন্মগ্রহণ করতে পারে না। সে কারণ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে যেন খাদ্যশস্য-সঞ্চয়ের আধারসমূহ বেশ শুষ্ক থাকে ও ভাঙতে না হয়।

আমেরিকায় আর একটি মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে—এর নাম ডি, ডি, টি। এর পুরা রাসায়নিক নাম ডাইক্লোরো, ডাইফেনিল, ট্রাইক্লোরোইথেন। এটা দেখতে শাদা লবণের মত এবং কেরোসিন তৈল, ইথার, স্পিরিট প্রভৃতি তরল পদার্থে দ্রবীভূত হয়। ডি, ডি, টি উপরোক্ত দ্রাবক পদার্থসমূহের সহিত ভালরূপে মিশে গেলে স্প্রে করা উচিত। তখন বাষ্পীয় আকারে ডি, ডি, টি কণাসমূহ কেরোসিন, ইথার প্রভৃতি তরল পদার্থসমূহের সহিত স্ফলভাবে মিশ্রিত হয়ে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। ফলে বায়ুগুণ্ডস্থ কীটপতঙ্গসমূহ সমস্ত বিনষ্ট হয়। স্প্রে সাহায্যে ডি, ডি, টির ক্রিয়া কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাপকভাবে ডি, ডি, টি স্প্রে করবার জন্য বড় বড় স্প্রে পাম্প ব্যবহার করা যেতে পারে। ডি, ডি, টি যেখানে স্প্রে করা

সম্ভব হইবে না সেখানে পাউডার ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। ডি, ডি, টি অত্যাধিক পাউডারের সহিত মিশ্রিত করা হয় এবং সাধারণতঃ শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ ডি, ডি, টি এই পাউডারের মধ্যে থাকে। কীটনাশকসমূহের বাসস্থানে এই পাউডার ছিটান হয়, ফলে আস্তে আস্তে সমস্ত কীটনাশক ধ্বংস হয়ে যায়। প্রের মত এত শীঘ্র না হলেও বেশ স্বল্পকালের মধ্যেই সমস্ত কীটপতঙ্গ বিনষ্ট হয়। ডি, ডি, টি-র কীটনাশক শক্তি অসীম এবং সফিত শতাব্দি মাত্র সহস্র ভাগের এক ভাগ ডি, ডি, টি-র প্রয়োগেই কীটনাশক আক্রমণ হতে নিরাপদ থাকে।

আদর্শ শতাব্দিগার নির্মাণই সর্বোপেক্ষ প্রয়োজনীয়। আবহাওয়া ভেদে খাদ্যদ্রব্যাদির সংরক্ষণ-কার্যের মধ্যে বেশ তারতম্য দেখা যায়। বাংলাদেশের জলীয় বাষ্পপূর্ণ আবহাওয়ায় কীটনাশক সহজেই জন্মগ্রহণ করে এবং সেজন্য এখানে খাদ্য সংরক্ষণের আধারসমূহ খুব সাবধানে তৈরি করতে হবে। পক্ষান্তরে শুষ্ক আবহাওয়ায় ফলশতাদি প্রকৃতির সাহায্যেই বেশ কিছুকাল সংরক্ষিত হতে পারে। এর উপর যদি বিজ্ঞানসন্মত ভাবে আধারসমূহ নির্মাণ করা যায় ত এগুলো দীর্ঘকাল টাটকা থাকবে। বিহার, যুক্তপ্রদেশ পঞ্জাব এবং আরও কয়েকটি শুষ্ক আবহাওয়া প্রধান দেশে আদর্শ শতাব্দিগারসমূহ নির্মিত হতে পারে। এমন কি, বাংলার উৎপন্ন মুদ্রাবান খাদ্যশতাদির কিয়দংশও এই সকল দেশে ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্ত সংরক্ষিত করা যেতে পারে।

খাদ্যসংরক্ষণ-ব্যবস্থার উন্নতি না হলে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্যাদি বিনষ্ট হবে। এরূপ অপচয়

নিবারণ করা অবশ্য কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই, তবুও বিভিন্ন প্রদেশের গবর্নমেন্টের ঐকান্তিক সহযোগিতা পেলে এটা সম্ভব হবে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে হলে এই সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন সর্বোপেক্ষ প্রয়োজন। অবশ্য এ সংরক্ষণ জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতাও দরকার। সাধারণ কৃষক যদি বুঝতে পারে যে তার উৎপন্ন ফসল দীর্ঘদিন সময়ে সংরক্ষিত থাকবে এবং সে উপযুক্ত মূল্যে একদিন নিশ্চয়ই তা বেচতে পারবে তা হলে সে এই সংরক্ষণনীতি অবশ্যই মেনে চলবে। আদর্শ শতাব্দিগার নির্মাণ যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য হবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সরকারের সহায়তা পেলে এই কাজ কঠিন হবে না। কৃষি-দ্রব্যাদি বার মাস সমান উৎপন্ন হয় না। প্রত্যেক ফসলেরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে এবং এই উৎপন্ন ফসলের স্থায়িত্ব সব সময় সমান নহে। অধিকাংশই দু-এক মাসের মধ্যে পচে নষ্ট হয় এবং সেজন্য শীঘ্র জনসাধারণের মধ্যে সেগুলি বিলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। জনসাধারণও প্রত্যেক খাদ্যশতাদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করে। ফলে অনেক সময় তাদের অর্থের অপচয় ও স্বাস্থ্য-হানি ঘটে। এরূপে অবশ্য খাদ্যদ্রব্য কীটপতঙ্গের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেল, কিন্তু এর দ্বারা ঠিক অপচয় নিবারণ হ'ল না। যে সকল খাদ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপন্ন হয় সেগুলো যদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় ত ভবিষ্যতে তাদের সদ্যাবহার হবে এবং হ্রাসিত প্রকৃতি অনেকাংশে নিবারিত হবে। খাদ্যশতাদি সংরক্ষণ বিষয়ে সুচিন্তিত পরিকল্পনা রচনা করা দরকার। এরূপ পরিকল্পনা যে জাতির অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

## বাংলা পরিভাষা

### অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

ইংরেজ জাতির সহিত আমাদের দেশের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পর হইতেই বিকৃত ও অবিকৃত ভাবে অনেক ইংরেজী শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া অল্প ইংরেজী শব্দ বাংলায় অনূদিত হইয়া বাংলার শব্দভাণ্ডারকে পুষ্ট করিতেছে। সাধারণতঃ লেখকগণ যে যাহার প্রয়োজন মত শব্দের অনুবাদ করিয়া থাকেন—সংস্কৃত চেষ্টাও মাঝে মাঝে কিছু কিছু দেখা যায়। তবে দেশের জনসাধারণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ সম্পর্কে বিশেষ কোনও আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যই শিক্ষাভিমানী সমাজের মুখ্য উপকীৰ্ত্তব্য—

ছুঁচার জন ছাড়া তাহাদের অধিকাংশই বাংলার ধার ধারেন না—বাংলায় কোনও গভীর বিষয়ের গুরু আলোচনার প্রয়োজন বা তাগিদ তাহাদের অনেকেই নাই। বাংলায় কিছু বলিতে বা লিখিতে হইলে বিপন্ন বোধ করেন এরূপ লোকের সংখ্যা শিক্ষিতের মধ্যেও যথেষ্ট। তার পর ইংরেজী ভাবে ভাবিত, ইংরেজী শব্দে আচ্ছন্ন হইয়া অনেকে যাহা লেখেন তাহা বাঙালীর বাংলা প্রায়শই হয় না—তাহার মধ্যে সাহেবী গন্ধ পুরা দস্তুর বর্তমান। বাংলার এই অবস্থার কথাই অতি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়া শ্রীবুদ্ধদেব বসু লিখিয়াছেন—

‘বাংলায় লিখতে ব’সে দেখি ইংরেজীতে ভাবছি, অথচ ইংরেজীতেও কথাটা পুরোপুরি বলতে পারি না। বাংলা লেখা আমাদের শিখতে হয় অতি কষ্টে প্রাণপণ পরিশ্রমে... ভাষাকে শিল্পরূপে গড়ে তোলা এমনিতেই শক্ত কাজ, আমাদের দেশে তার ওপরে বিদেশী ভাষার মধ্যবর্তিতা জড়িত হ’য়ে ব্যাপারটিকে আরও জটিল করে তোলে।...এখন পর্যন্ত আমাদের সাধারণ শিক্ষিত লোকদের বেশির ভাগই, ভাল বাংলা দূরে থাক, নিজের বাংলাও লিখতে পারেন না—ছাপার অক্ষরের বইয়েও শুধু অপটুতা নয়, প্রমাদও লক্ষিত হয় প্রচুর।’ (সব পেয়েছির দেশ, পৃঃ ৮৫-৬)।

এই অবস্থায় ভাষার সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার দিকে দেশের জনসাধারণ বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি তেমন ভাবে পড়ে নাই। এক জনের ব্যবহৃত শব্দ অন্যর হইল কি অন্তর হইল, শুধু হইল কি অন্তর হইল তাহা লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন কচিৎ হই এক জন মাত্র অনুভব করিয়াছেন। ফলে আজ যে কত অসঙ্গত, অসুন্দর ও অশুদ্ধ শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অতের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ বা অন্তর এ বিষয়ে বিশেষ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বহুল প্রচলিত শব্দের মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা, কৃষ্টি, সুহৃৎকৃতি, অন্তরীণ প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্ট ভাষায় তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অথচ কয়জন তাহার খবর রাখে বা রাখার প্রয়োজন বোধ করে?

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া আমরা বলিতে পারি ‘ভাষা যে সব সময় যোগ্যতম শব্দের বাছাই করে কিম্বা যোগ্যতম শব্দকে বাঁচাইয়া রাখে’ তা নয় তথাপি ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের দোষগুণ সম্বন্ধে উদাসীনতা অবলম্বন করা যে কোন ভাষাভাবীর পক্ষে মোটেই প্রশংসার বিষয় নহে। এ দিকে সতর্ক দৃষ্টি ও মমত্ববোধ থাকিলে তবেই ভাষার ঐশ্বর্য সম্ভবপর, অতথা নহে। আজ স্বাধীনতালাভের পর যখন বাংলাভাষার প্রসাররুদ্ধি অবশ্যজ্ঞাবী—যখন ইংরেজীকে একেবারে না ছাড়িলেও বাংলা ভাষার মধ্য দিয়াই আমাদের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্য নির্বাহ করিতে হইবে তখন আর কাহারও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে অনবহিত হওয়া সম্ভব ও শোভন নয়। খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে হইতে সরকারী অনুবাদ-সমিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর প্রবর্তিত সারস্বত সমাজ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ইংরেজী শব্দের স্থল বাংলা প্রতিশব্দ প্রণয়নে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ চেষ্টার সূত্রপাত করেন তখন যথেষ্ট চাহিদার অভাবতঃ এই সকল প্রচেষ্টা কল্পনাবিলাসীর বিলাস হিসাবে জনসমাজ কর্তৃক অনাদৃত বা উপেক্ষিত হইয়া থাকিলেও তেমন দোষ দেওয়া চলে না। কিন্তু বর্তমানে শোভন

অনুবাদের মধ্য দিয়া কেবল বাংলা সাহিত্যের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্ত নহে আধুনিক জগতের ভাবধারা বাঙালীর কাছে বাঙালীর মত করিয়া বলিবার প্রয়োজনে উপযুক্ত শব্দের চাহিদা ও মূল্য অধীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু হুঃখের বিষয়, জনসাধারণের ঊদাসীনের ভাব এখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই। ফলে, কয়েক বৎসর পূর্বে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দেশীয় ভাষার পূর্ণ ব্যবহারের ব্যবস্থার জন্ত যখন বিভিন্ন বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইল তখন দেশের লোক শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে বরণ করিয়া লয় নাই—নিন্দা করিয়াছে, ব্যঙ্গ করিয়াছে কিন্তু দোষ থাকিলে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করে নাই—দোষগুলি নির্দেশ করিয়া দেওয়ার ক্রেশ পর্যন্ত স্বীকার করে নাই। সত্ত্বপ্রকাশিত ‘সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা’ সম্বন্ধেও অমুরূপ মনোভাব ও ব্যবহার লক্ষ্য করিতেছি। বিভিন্ন পত্রিকা একরূপ সমররে ইহাকে নিন্দা করিয়াছেন—উপহাস করিয়াছেন। পক্ষে-বাটে বন্ধুবান্ধব, সরকারী কর্মচারী, উকীল, মোক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী যাহারই সঙ্গে কথা হয় তিনিই ইহার নিন্দা করেন—ইহা অচল, অব্যবহার্য বলিয়া মত প্রকাশ করেন। সংস্কৃতের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাতিতা, প্রচলিত ইংরেজী বা অল্প দেশীয় শব্দের প্রতি উপেক্ষা ও খাটি বাংলার প্রতি অশ্রদ্ধা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সরকারী পরিভাষার প্রধান দোষরূপে সাধারণত উল্লিখিত হইয়া থাকে। তবে ইহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে অনেকের কাছেই জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও সহজতর পাওয়া যায় না। কোন্ কোন্ শব্দের অনুবাদের প্রয়োজন নাই—কোন্ কোন্ শব্দের অনুবাদের কিরূপ পরিবর্তন সম্ভবপর হইতে পারে এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও খুঁটিনাটি আলোচনার বিশেষ কেহ আগ্রহ হইতে চাহেন না। সত্য বটে, অনেকের পক্ষেই এরূপ আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। হয়ত বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাদের মতামত সরকারের পরিভাষাসংসদের নিকট সরাসরি পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু দেশের সাধারণ লোকের যে আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ আছে তাহার ভেতন কোনও নিদর্শনও পাওয়া যায় নাই। বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সভাধিবেশনের বিবরণ প্রতি দিনের পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কিন্তু কোথাও এই পরিভাষার আলোচনার ইঙ্গিতমাত্র দেখা যায় না। সাধারণের আগ্রহের ফলেই ছোট বড় নানা বিষয় সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দের মতামত সাক্ষর পত্রিকায় প্রচারিত হয়। সরকারী পরিভাষা সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্ববিদ বা সাহিত্যিকগণের অভিমত বা সমালোচনা কিন্তু পত্রিকাধ্যক্ষগণ সংগ্রহ করিয়া পত্রিকাস্থ করার বিশেষ কোনও প্রয়োজনই অনুভব করেন নাই। সাধারণের এ বিষয়ে আগ্রহের অভাবই কি ইহার মুখ্য কারণ নয়? অথচ এরূপ সমালোচনা উপযুক্ত পরিভাষা নিরূপণের কাজে হয়ত প্রচুর সহায়তা করিতে পারিত।

একথা কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে প্রস্তাবিত পরিভাষা সম্বন্ধে আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। প্রথমেই পূর্বাচার্য্যগণ, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ, এ বিষয়ে যে সাধারণ স্বেচ্ছা নির্দেশ করিয়াছেন তাহা মরণ করা কর্তব্য। তাঁহার প্রথম ও প্রধান কথা—‘বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থির হয় নাই, অতএব পরিভাষার প্রয়োগ লইয়া আলোচনা কর্তব্য, কিন্তু বিবাদ করা অসঙ্গত।’ আজ কবিগুরুর এই উপদেশ মাথায় করিয়া আমাদের কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। নূতন শব্দ গঠনের সময় ভাষার প্রকৃতি, সৌন্দর্য্য, বিস্তৃতি ও অর্থের স্পষ্টতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অবশ্য সব সময় সকল দিক রক্ষা হইবে না—তবে তাই বলিয়া বিচলিত হইবার কোনও কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘নতুন তৈরি শব্দ নতুন নাগরী জুতোর মতই কিছুদিন অধস্তি ঘটিয়া।’ ‘বার বার ব্যবহারের দ্বারা ই শব্দ বিশেষের অর্থ আপনি পাকা হয়ে ওঠে, মূলে যেটা অসঙ্গত অভ্যাসে সেটা সঙ্গতি লাভ করে।’ (শব্দতত্ত্ব, পৃঃ ১৬৬, ১৮৭)। অবশ্য এই অজুহাতে যদৃচ্ছাচার শোভা পায় না বা সমর্থন করা চলে না। যথাসম্ভব, নির্দোষ শব্দ গঠনের চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। এজন্ত বিপুল সমৃদ্ধিশালিনী সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। রবীন্দ্রনাথ তাই স্পষ্টই বলিয়াছেন—‘একথা স্বীকার করতেই হবে সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল। কি জ্ঞানের কি ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাঙার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে। পাশ্চাত্য ভাষাগুলিকেও এমন করেই গ্রীক-লাটিনের বশ মানতে হয়।’ (বাংলা ভাষাপরিচয়, পৃঃ ৫০)। কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার প্রকৃতিগত একটা দৌর্ভাগ্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন—‘বিশেষ্যকে বিশেষণ বা ক্রিয়াপদে পরিণত করবার সহজ উপায় আমাদের ভাষায় নেই বললেই হয়। তাই বাংলা ভাষার আপন রীতিতে শব্দ বানানো প্রায় অসাধ্য।’ (বাংলা ভাষাপরিচয়, পৃঃ ১০৪)। তাই দেখিতে পাই বিগত দেড় শত বৎসর ধরিয়া যখনই বাংলায় নূতন শব্দের প্রয়োজন হইয়াছে তখনই সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে—সুস্থ ভাবে হটুক বা অসুস্থ ভাবে হটুক, মূল অর্থ বজায় রাখিয়া হটুক বা উহাকে সঙ্কুচিত, প্রসারিত বা বিকৃত করিয়া হটুক সংস্কৃতমূলক শব্দকেই বাঙালী তাহার ভাষার মধ্যে বরণ করিয়া লইয়াছে। বর্তমানেও যে এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে তাহা মোটেই বলা চলে না। ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক স্থাপনের পর যে সমস্ত নূতন শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহাদের কোনও তালিকা এখন পর্য্যন্ত সঙ্কলিত হয় নাই সত্য তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে

পারে যে এই জাতীয় শব্দের মধ্যে অধিকাংশই সংস্কৃত বা সংস্কৃতের আদর্শে রচিত। বাহারা চলতি বা কথ্য বাংলার একান্ত পক্ষপাতী তাঁহারাও যে দরকারমত অল্প সংস্কৃত শব্দ গঠন ও প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, অতি আধুনিক মতাবলম্বীদের লেখা হইতেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। উদগাতা, ঋষিক, পুরোধা, স্নাতক, সমাবর্তন প্রভৃতি লৌকিক সংস্কৃতে অপ্রচলিত বৈদিক শব্দ পর্য্যন্ত আজ অবাধে বাংলায় ব্যবহৃত হইতেছে। বস্তুতঃ মুখে আমরা যাহাই বলি না কেন সংস্কৃতের প্রতি আমাদের অন্তরের চান অস্বীকার করিবার উপায় নাই—পরিভাষারচনায় বা নূতন শব্দ গঠনে তাই সংস্কৃতের প্রভাব অপরিহার্য্য।

তাই বলিয়া প্রচলিত শব্দের স্থলে নূতন অপরিচিত সংস্কৃত শব্দ গঠন করিয়া চালাইতে হইবে এরূপ কথা বলা চলে না। অবশ্য প্রচলিত শব্দের দ্বারা সমস্ত কাজ চলে কিনা এবং প্রচলিত বলিতেই বা ঠিক কি বুঝায় তাহা ধীর ভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। পুলিশ শব্দটি প্রচলিত সন্দেহ নাই কিন্তু পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে প্রচলিত বলিলে ভাষার মর্যাদা রক্ষা হয় কি? Deputy Superintendent of Police, Inspector-General of Police প্রভৃতির বেলায় কোনও অজুহাতেই অমুবাদ চেকাইয়া রাখা সঙ্গত বা শোভন বলিয়া বিবেচিত হইবে না। আর এগুলি অমুবাদ করিতে গেলে পুলিশ শব্দটিকে বাঁচাইয়া রাখা মুকঠিন। এইরূপ magistrate, deputy-magistrate প্রভৃতি শব্দও বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া না যাওয়ায় তাহাদেরও অমুবাদ না করিয়া বাংলা ভাষায় কাজ চালান চলে না। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর মুখে মুখে সাধারণ কথাবার্তার মধ্যেও অনেক ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হয় সত্য তবে সেগুলিকে বাংলা ভাষার অঙ্গ বা আভরণ কোনওক্রমেই বলা চলে না—সেগুলি পরাধীন জাতির পরাধীনকরণের মোহ ও বিকারের সাক্ষ্য বহন করে মাত্র। জোর করিয়া সেগুলিকে ভাষায় চালাইতে গেলে তাহাতে ভাষা পরিপুষ্ট না হইয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িবে—ভাষার ত্রীভুজি না হইয়া বিকৃতিই একটি হইয়া উঠিবে। তাই আমরা কথাবার্তায় যত ইংরেজী শব্দই ব্যবহার করি না কেন লেখার বেলায় যথাসম্ভব বাংলা শব্দ ব্যবহার করিতে সাধারণত ক্রটি করি না। meeting, secretary, editor, election, nomination, report, proceedings, result, class, subject প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ আমরা কথ্য ভাষায় ব্যবহার করিয়া থাকি কিন্তু লেখার সময় সভা, সম্পাদক, নির্বাচন, মনোনয়ন, কার্য্যবিবরণ, ফল, শ্রেণী, বিষয় প্রভৃতি ব্যবহার করিতে কোনও দ্বিধা করি না অথচ কথ্য ভাষায় এ সব শব্দ ব্যবহার করিতে যে একটা সংকোচ বোধ করি না এমন কথা কল্পনায়ও বলিয়া পারেনা—

অনুবাদ-প্রবণতা শুধু বাংলাদেশে নয় বাংলার বাহিরেও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। যে সমস্ত ইংরেজী শব্দ আজ বিভিন্ন দেশীয় ভাষার অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছে তাহাদের দেশীয় রূপ প্রচারের অসীম আঁগ্রহ সর্বত্র অন্তর্বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়। তাই স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, হোটেল, থিয়েটার, সিনেমা আজ দেশীয় ভাষায় সাদরে গৃহীত হইলেও বিদ্যালয়, বিদ্যানিকেতন, বিদ্যাপীঠ, পাঠশালা, মহাবিদ্যালয়, আরোগ্যশালা, ভোজনাগার, নাট্যনিকেতন, চিত্রমন্দির, ছবিঘর প্রভৃতি অনুবাদাত্মক শব্দ ব্যবহারের দিকেও ঝোঁক নিতান্ত কম নয়। মধ্যপ্রদেশ সরকার তাহাদের এলাকার সরকারী কলেজগুলির দেশী নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। নাগপুর মরিস কলেজ, জব্বলপুর রবার্টসন কলেজ, অমরাবতী এডওয়ার্ড কলেজের পরিবর্তিত নাম নাগপুর মহাবিদ্যালয়, মহাকাশল মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যুৎ মহাবিদ্যালয় নিশ্চয়ই লোকরুচির পরিপন্থী নহে। বোম্বাই শহরে রেটোরার্ট অবাধে উপাহারগ্রহণে চলিতেছে। পূর্বে যে সমস্ত দোকান ইংরেজী নাম লইয়া সাধারণের মধ্যে মর্যাদা লাভ করিত কিছুকাল যাবৎ তাহাদের স্বজাতীয় অনেকেই বাংলা নামকরণকেই অধিকতর লোকরঞ্জক মনে করিয়া আরামঘর, তৃপ্তিসদন, বসনালয়, বাসনালয়, সাধনালয়, স্মৃতিশিল্পসদন, রূপায়তন, মিষ্টান্নাগার, বজ্রাগার, বজ্রালয়, বজ্র-প্রতিষ্ঠান, পরিচ্ছদভবন, মাতৃভাণ্ডার, কমলাভাণ্ডার, বিক্রমপুরভাণ্ডার, খাদ্যপ্রতিষ্ঠান, পাছকাপ্রতিষ্ঠান, উপানয় শিল্পসদন, মুদ্রণী, মুদ্রণালয়, গ্রন্থগেহ, প্রকাশনী, পুঁথিঘর প্রভৃতি নাম সাড়ম্বরে প্রচার করিতেছে। এই সকল ব্যাপার হইতে দেশের লোকের প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—তাহার মানসিক গতির প্রত্যক্ষ আভাস মিলে। নির্ঝাঁপে নিজের রুচির অনুসরণ করিতে দিলে নিজের অজান্তসারেই সে ইংরেজী শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃতমূলক গালভরা শব্দের দিকে আকৃষ্ট হইবে।

পরিভাষা রচনায়ই হউক আর সাধারণ ইংরেজী শব্দের অনুবাদেই হউক মূল শব্দের প্রকৃত তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—কেবল আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া দেশের প্রকৃতি, রীতিনীতি অনুসারে নূতন শব্দ গঠন করিতে হইবে। ইংরেজী হাবভাব আদবকায়দা আজ আমাদের বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু নূতন শাসন-তন্ত্র ও তাহার দেশী পরিভাষা রচনার সময় আমাদেরকে ভাবিতে হইবে—আমাদের কাজকর্ম কি চিরদিনই বিলাতী ছাঁচে চলিবে? বিলাতী নামগুলিই অত্র ভাষায় আমাদের চালাইয়া যাইতে হইবে? ইংরেজীর ভুলক্রটি অসম্পূর্ণতাও কি নির্ঝাঁপে উত্তরাধিকারসূত্রে আমাদেরকে বহন করিয়া যাইতে হইবে? Gazetted officer এবং non-gazetted officer

এই পার্থক্য কি চিরকাল আমাদেরগকে ঠিক এই নামেই বা ইহার আক্ষরিক অনুবাদ দিয়াই বজায় রাখিতে হইবে? আমাদের দেশে ত উত্তম মধ্যম বা প্রথম দ্বিতীয় প্রভৃতি নামে শ্রেণীবিভাগ অধিকতর সুপরিচিত এবং সাধারণের নিকট সহজবোধ্য।

পূর্বে আমলে নানা সময়ে যখন নূতন নূতন পদের সৃষ্টি ও নামকরণ হইয়াছে তখন যে বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া তাহা করা হইয়াছে এরূপ মনে হয় না। যখন আমাদেরগকে নূতন ভাবে সমস্ত জিনিষ গড়িয়া তুলিতে হইবে তখন এ বিষয়ে যথাসম্ভব শৃঙ্খলা ও সারল্য বিধানের চেষ্টা করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। Superintendent, manager, director, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কর্মগত যে স্বল্প পার্থক্যই থাকুক না কেন ইহারা সকলেই প্রাচীন মতে অধ্যক্ষ বা মুখ্যাধিকারী—ইহাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র শব্দ উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। Care-taker (Writers Buildings) এবং superintendent (Governor's Estate) দুইয়ের মধ্যে কর্মগত এমন কি বিভেদ আছে যাহাতে দু'জনকেই তত্ত্বাবধায়ক বলা চলে না? অপরপক্ষে Superintendent (Government House Gardens) স্বতন্ত্র পদের দরকার থাকিলেও সেই পদাধিকারীও কি তত্ত্বাবধায়কমাত্র নহেন? Chief Executive Officer (Calcutta Corporation) এরূপ স্থলে executive শব্দের বিশেষ কোনও সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না—অনুবাদে ইহাকে বর্জন করিলে বিশেষ অঙ্গহানির আশঙ্কাও করা যায় না। বিষয়পতি বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের করণীয় বিচিত্র কর্মরাশির পূর্ণ পরিচয় কেবল গুটি দুই শব্দের মধ্য দিয়া অভিযুক্ত হইতে পারে না অথচ পতি শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সুতরাং magistrate and collector-এর অনুবাদে দুইটি শব্দ ব্যবহার না করিয়া কেবলমাত্র বিষয়পতি শব্দের দ্বারাই বেশ কাজ চালান যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে কোনও ভাষায়ই পারিভাষিক শব্দ বাস্তবিক অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং তাহার মধ্য দিয়া সমগ্র অর্থ প্রকাশ করিতে যাওয়ার চেষ্টা নিফল। তাহাকে যথাসম্ভব সরল ও সুন্দর করিতে হইবে। তাহার পর বিভাগীয় ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা ছাড়া গতান্তর নাই।

পরিভাষা বিষয়ে সর্বভারতীয় একোত্র কথো বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইংরেজ এ সকলের রাজত্বকালেই এই বিশাল ভারতবর্ষে—বিশেষ করিয়া শাসন ব্যাপারে মোটামুটি একটা একা ছিল; সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজী ভাষার যারফত শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে একই শব্দ সর্বত্র প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন প্রদেশের



লোকসমাজের মধ্যে তখনকার দিনে ভাবের আদান-প্রদান বা পারস্পরিক আলাপ-পরিচয় মেলামেশার তেমন প্রয়োজন বা প্রচলন না থাকিলেও এই ঐক্যের মূল্য অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক যুগে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ঐক্য অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। এই ঐক্য যাহাতে ফুল না হয় সেজন্য চাই ভাষার ঐক্য—সর্ব-ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা যাহাই হউক না কেন প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়াও যথাসম্ভব এই ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করিতে হইবে—শাসন-সংক্রান্ত বা অল্প বিষয়ক পারিভাষিক শব্দগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায়ও যাহাতে একটা সাম্য থাকে সে দিকে তৎপর হইতে হইবে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মধ্য দিয়া এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিবার আশ্রয় পণ্ডিত সমাজে বহু দিন হইতেই দেখা দিয়াছে। তবে ছুঃখের বিষয় প্রকৃত কার্যের মধ্যে তাহা সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই।

বর্তমানে যখন সমগ্র দেশময় ইংরেজী শব্দের দেশীয় প্রতিরূপ প্রণয়নের আয়োজন চলিতেছে তখন এই ঐক্যের কথা প্রধান ও প্রথম বিবেচ্য বিষয়। এজন্য সকল ভাষার প্রতিনিধি লইয়া একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা দরকার। কয়েক বৎসর পূর্বে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-প্রণয়নের

উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কর্তৃক একদপ একটা প্রতিষ্ঠান গঠিতও হইয়াছিল মনে হইতেছে। তবে কার্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল জানি না। প্রদেশগুলি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিলেও বিভিন্ন প্রদেশের—বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের—পক্ষ হইতে যে কাজ হইতেছে তাহার ব্যাপক প্রচার ও আলোচনা আবশ্যক। ভারতীয় গঠন-পরিষদ বা গণপরিষদ এ সম্পর্কে যে সমিতির উপর কার্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন তাহার কার্য সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু কার্যের পূর্ণ পরিচয় এখনও প্রকাশিত বা প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারি নাই—এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আলোচনার আভাসও পাই নাই। অল্প প্রদেশের মধ্যেও কোন্ট কত দূর অগ্রসর হইয়াছে বুঝিবার উপায় নাই। অথচ এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের মনীষিগণের কৃত কার্যের বিবরণ যথাযথ প্রচারিত হইলে পরস্পরের কার্যে সহায়তা হয়—যথাসম্ভব ঐক্যপ্রতিষ্ঠার সুবিধা হয়—একের প্রস্তাবিত সূত্রের গ্রহণযোগ্য শব্দের কথা না জানার জ্ঞান নূতন শব্দ সংকলনের অনর্থক প্রয়াসের পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না। সুতরাং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অল্পকাল দৃষ্টি সাগ্রহে ও সনির্বন্ধভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

## পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

বাঙালীর যখন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা ও সংসারে আসন সঙ্কচিত হয়ে আসছে তখন আমাদের বার বার ও সবলে উপলব্ধি করতে হবে যে আমরা সামান্য নই, বিধে আমাদের অশ্রুত এমন একটি দান আছে যার গৌরবে ও গুরুত্বে আমাদের ইতিহাস চির গরীয়ান হয়ে থাকবে। হঠাৎ একটা মহা প্রলয়ে যদি বাঙালীর যা-কিছু সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কোন দিন, দুঃখ ভবিষ্যতে যদি সে প্রলয়-সাগর-তীরে মম্বুর কোন বংশধর—বাঙালীর বিস্মৃত পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করতে বসে, তখনো রবীন্দ্রনাথের অদ্ভুতদীর্ঘ বিশালতা তার দৃষ্টি অতিক্রম করবে না। রবীন্দ্রনাথ যে বাঙালী ছিলেন, অতএব বাঙালীর স্থান যে সভ্যতার ইতিহাসে সার্থক, সে কথা সে অকুণ্ঠিত চিন্তে স্বীকার করবে।

তার কারণ রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কবি। যে-পৃথিবী তিনি রচনা করেছেন, যে-সৌরভ ও অমৃতত্ব তাতে স্রষ্ট ও বিকশিত হয়েছে তা বিশ্বমনের জন্ত; বিশ্বমানবের প্রতিবিশ্ব তাতে আছে। গত বৎসর ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী শহরে

অকুণ্ঠিত আন্তঃ-এশিয়া মহাসম্মেলনে, শুধু সমগ্র এশিয়ার নয়, বিশ্বের মহামানবতার ঐক্য-গাথার কবি রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করতেও বহু ভারতপ্রধান যখন কুণ্ঠা ও বিস্মৃতির পরিচয় দিয়েছিলেন তখন আমরা নিখিল-ভারত সাহিত্য-সম্মেলনের পক্ষ থেকে এশিয়ার সাহিত্যিকদের যে সংবর্দ্ধনা করেছিলাম তাতে সেই বিদেশী সাহিত্যিকরাই বার বার বিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথের কথা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন; তাঁর বাণী যে মানুষকে নূতন আত্মপ্রকাশ ও আত্ম-প্রত্যয়ের ভাষা দিয়েছে, ঐক্য ও মৈত্রীর গান শুনিয়েছে সে কথা স্বীকার করেছিলেন, এবং বর্তমান লেখক সে সময় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁদের যে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেজন্য তাঁরা ধন্যবাদ দিয়েছিলেন।

“আমি পৃথিবীর কবি, সে কথা তার যত ওঠে ধ্বনি  
আমার বাণীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,  
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,  
রয়ে গেছে ফাঁক।”

পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ বহুদূরই এ আক্ষেপ করেছেন, কিন্তু তাঁর বাঁশীর সুরে যদি সব সময় সাড়া না জেগে থাকে সে ক্রটি পৃথিবীর; পৃথিবীর কবির নয়। আমরা কবি-জগতে গৌরী-শুন্দের ঠিক নীচেই এখন রয়েছি; তাই তাঁর বিশালতা ও উচ্চতা বুঝতে পারার সময় আসে নি এখনো। হয়ত ১৪০০ সালের মানুষ সেই ভাবী কালের নববসন্ত-প্রভাতে অমুভব করবে আমাদের যুগের ও চিরযুগের এই কবির প্রভাব এবং তাঁর কাব্যের বিস্তার ও প্রসার। তবুও আমরা ত এমনি বুঝতে পারি।

“কতো যে প্রাণের আশা ও রাতের প্রীতি

কতো যে সূখের স্মৃতি ও দুখের গীতি”—

নব-নব বিকাশ ও বৈচিত্র্য নিয়ে কারণে-অকারণে সময়ে-অসময়ে চিন্তে দোলা দিয়ে যায়। বাঁশীর উচ্ছ্বাসে হাসির উল্লাসে বেদনায় ও সমবেদনায় বিচিত্র অমুভব জাগিয়ে তোলে বিশ্বমনের মধ্যে।

জীবনে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও সঙ্গীত তিনি এনে দিয়েছেন। “পুরকার” কবিতাটির অভাবগ্রস্ত কবি রাজসভায় গেয়েছিল যে ধরনীতে সে আর একটি সুর যোগ করে দিতে চায়, আর একটু সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে দিতে চায়। সে কথাই কবিরও মর্ম্মবাণী। পৃথিবীকে তিনি মায়াময় বলে ত্যাগ করেন নি; কারার সঙ্গে ছায়ার মতও লিপ্ত হয়ে থাকেন নি। অবজ্ঞা বা উপেক্ষার চোখে তিনি জীবনকে দেখেন নি। বন্ধনের মধ্যে মুক্তির, সংগ্রামের মধ্যে সম্বন্ধের সন্ধান তিনি করেছেন। প্রাচীর বৈরাগ্য ও প্রতীচীর অহরাগ মিশ্রিত হয়েছে তাঁর কাব্যধারায় রাসায়নিকের প্রক্রিয়ায় নয়, রসস্রষ্টার প্রতিভায়। তাই তিনি বিশ্বনিখিলের কবি; শুধু বাঙালীর বা ভারতবাসীর নয়।

তাই মর্ত্যই কবির কাছে স্বর্গ; মর্ত্যই মহান্—মানবেরই অশ্রুজলে চিরশায়ল, প্রীতিফুলে চিরসুহৃদিত। প্রেমধারা মানুষকে শুধু প্রিয় করে নি দেবতা করেছে। “দেবতার প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা”—এই ছিল ইউরোপীয় রেণেসাঁসের মর্ম্মকথা। মানুষকে এই মূল্যদান, দেবতাকে এই প্রীতিমাল্যদান রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ তথ্য।

শুধু যে প্রিয় দেবতা হয়েছে তা নয়, সাধারণ মানুষ ‘মানুষ’ হয়েছে—বিশ্ববিধানে এটাও তো কম কথা নয়; তারও যে জীবন সার্থক ও সম্পূর্ণ হতে পারে এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেছেন। মানুষ তার সভ্যতাসৌধের ভিত্তি ও প্রাকার গড়ে তুলেছে মানুষকে সমষ্টিগত ভাবে বলি দিয়ে। ধনী শ্রমিককে শোষণ করেছে, রাজা প্রজাকে শাসনের নামে উৎপীড়ন করেছে। প্রতাপশালীর প্রতাপের আশ্বিন জলেছে দুর্ব্বলের রক্ত-আহুতিতে, রাষ্ট্র-স্বার্থের রথ চলেছে রজ্জুবদ্ধ প্রজার সম্মিলিত আকর্ষণে। এই সভ্যতার মধ্যে ক্ষমতা আছে মমতা নেই,

আত্মসন্ত্রস্ততা আছে, কিন্তু আত্মা নেই। রক্তকরবীর রাজ্য যে যৌবনকে হত্যা করে, আনন্দকে নিঃশেষ করে নিজেই নিজের নিগড় গড়ে তুলেছে সে কথা বিশ্বকবি যত গভীর ভাবে বলেছেন বিশ্বব্যাপী মে-দিবসের সরব ও প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যেও সে কথা তেমন ভাবে ফুটে উঠে না। “মুঠ গ্লান মুক মুখে ভাষা” দিতে “শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে আশা” ধনিত করে তুলতে যিনি এরূপ সার্থক চেষ্টা করেছেন তিনি বিশ্বজনের কবি, তাই তিনি বিশ্বকবি।

রবীন্দ্রনাথের জগতে পাই মানব, অমুভবের প্রভাবে যে মহামানব হয়ে উঠেছে; কিন্তু অতিমানব সেখানে নেই। তিনি মহাকবি, কিন্তু মহাকাব্য তিনি রচনা করেন নি, কারণ মহাকাব্যের অতিমানব পৃথিবীর কবির সৃষ্টিতে থাকার কথা নয়। দীনের জীবন মহত্তর, বৃহত্তর হবে, কিন্তু দীনতর বা অল্পম্বর হয়ে প্রকাশিত হয় নি কখনও সে প্রচেষ্টার মধ্যে। যেখানে সমাজ ক্ষমাহীন, ধর্ম্মাচার দয়াহীন ও মানুষ উদাসীন সেখানে সাধারণ জীবনের সাধারণ কাজে ও কলনায়, চিন্তায় ও চেষ্টায় তিনি এনে দিয়েছেন সুকুমারতার আভা ও সার্থকতার আভাস। এই যে শ্রামল স্তম্ভের ধরনী—প্রিয়গৃহ ও গিরিপ্রান্তর, সাগর ও অরণ্যানী নিয়ে অপূর্ণপ-শোভায় প্রতিভাত হয়ে উঠেছে কাব্যে ও জীবনে, এই প্রকৃতি যদি নিজেই প্রধান-হ’ত মানবকে বাদ দিয়ে তা হলে তা হ’ত প্রাণহীনা। এখানে যারা ছিল, যারা আছে ও যারা আসবে তাদের সকলেরই কবির জগতে সার্থক স্থান আছে। “পলাতকায়” বাইশ বছরের রোগিণী যখন প্রথম বসন্ত অমুভব করে, মরণ-পথের যাত্রিণী বিহু যখন বাইরের জগৎকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠে ও দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি দেখায়, ‘শ্রামলী’র প্রণয়ভীতা প্রেমিতা যখন হৃঃসাহসে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে, তারা এই আমাদের গৃহকোণের সামান্য প্রাণী হলেও বিশ্বনিখিলের অধিবাসিনী। শ্রামল বাংলাদেশের একপ্রান্ত থেকে বেরিয়ে এসে এরা পৃথিবীর প্রান্তরে স্থান পেয়েছে; নিখিলের অমুভব এদের জন্ত প্রতিভাত হয় কবির মানসদর্পণে। সেই জন্তই তিনি বিশ্বকবি।

শুধু প্রাণধারণ করলেই যে বাঁচা যায় না, শুধু প্রত্যাহার দিন যাপনের গ্লানি ও গ্লানিমা, সংশয় এবং সংগ্রামের উদ্বেগ ও অজীত ক্ষেত্রে যে এমন একটি জগৎ আছে যা আমাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন সে কথা যিনি আমাদের বুঝিয়েছেন তিনি বিশ্বের কবি। স্নেহলোভুপ অথচ বীরভাবময় বাল্য, অসীমের আহ্বানচঞ্চল কৈশোর, প্রেমের আনন্দবেদনারসে উচ্ছল যৌবন, বহুমুখী কর্ম্মসাধনার পথে পরিণত প্রৌঢ় ও জীবনের চরম পরিণতি—এই সব স্তরেরই বিকাশ ও বিস্তার প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীতে। তারই প্রতিবিম্বে আমরা নিজেদের চিনতে পারি—

“সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি  
চিনি আপনারে।”

জীবনে যে আশা ও আলো ছিল বলে মনে করি নি, তাকে এনে দিলে এই সাহিত্য। তাই বৈশাখের ভয়াবহ তাপের মধ্যে দেখি নটরাজের পিঙ্গল জটাজালময় ধূসর ভৈরব-মূর্তি, বর্ষার নবমেঘভারে বিশ্বের সব বিরহীর শোক সখন সঙ্গীতের ধারায় ঝরে পড়ে। কেউ বা তখন জীবনদেবতার অতীব অমুভব করে বলে

যেখের পরে মেঘ জমেছে

আধার করে আসে

আমায় কেন বসিয়ে রাখ

একা ঘরের পাশে।

সেই একই বর্ষগুরু দিনে বিশ্ব থেকে ব্যক্তিগত যখন ফিরে আসি, প্রেমের পাশেই চাষাকে সোনার ধানের তরী বেয়ে চলে যেতে দেখি।

মানব থেকে মানসে এই পরিণতি, উভয় লোকের এই সমন্বয় ও সুসম্বন্ধ আত্মীয়তা কাব্যকে দিয়েছে নূতন আত্মা, প্রেমকে দিয়েছে নবীন সত্তা। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির ভিতর দিয়ে সংসারকে সুন্দরতর করে তাই দেখতে পাই, সাংসারিকতার মধ্যে থেকেও সংসারাতীত শালীনতা ও শোভনতা অমুভব করি। দেহের নিগড়ে গড়া গৃহের বনিতা তাই কল্পনার উদার স্বক্ৰিতে বিশ্বের কবিতারূপে উদয় হয়, ‘পরানের সাথে খুলন খেলা’ খেলে। তার বিরোধে কবি এই প্রভাত এই পৃথিবী সব-কিছুকে বিলোপ করে দিয়ে নিজের চিত্ত দিয়ে তার কামনাকে ফুটিতে চেয়েছেন—‘তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ’—এই অতীন্দ্রিয় আশ্বাস অমুভব করতে পেরেছেন। মিলনে যে একটি মূর্তিতে আবদ্ধ, বিচ্ছেদে সে দক্ষধূপগন্ধসম বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে চিরমিলনের আশ্বাস দেয়। এই ভাবেই বসন্তবিলাসের ধরা প্রেমের অমরাবতীর পথে পরম পরিণতি লাভ করে।

কিন্তু আগে সাধনা, পরে সিদ্ধি। প্রেমপূজায় দেহের আরাধনার পরেই তাতে দেহাতীতের আরোপ হয়। যৌবনের প্রথম আশাচের বাসনার মেঘে আবৃত এই আকাশ, তার ছায়াচ্ছন্ন অরণ্য, নীলিমায়ান গিরিশিখর কিন্তু—কামনার যুগপৎকর বহু বহু উদ্ভের প্রতিচ্ছবি। সেই যুগ চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন মেঘকে সুখধ্বজের মতন পিছনে ফেলে, হৃদয়ের বাঁধ ভেঙে, নবনীপ ও কেশকীর গন্ধবিকল, নদীকলধ্বনিত বিপুল কল্পনার পৃথিবীতে আমাদের নিয়ে যায়। সে এক অপূর্ণপ সুখসৌন্দর্য্যভোগ ঐশ্বর্য্যের চিত্রলেখা যা মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু কাছে আসতে দেয় না, আকাজক্ষার উজ্জেক করে, কিন্তু নিবৃত্তি করে না।

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার

জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

এই আত্মল ও অন্তরীণ অন্বেষণ ক্রমে অল্পের সন্ধানে পরিণতি লাভ করল। প্রেম কখনও বলে—

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই

যাহা পাই তাহা চাই না

কখনও বলে—

নাই নাই কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ

নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।

কখনও প্রশ্ন করে—

হৃদয়ের ধন কতু ধরা দেয় দেহে ?

প্রশ্ন ও প্রাপ্তি, আবাহন ও আবির্ভাবের মাঝখানে যে ব্যবধান তাকে কবি অতিক্রম করলেন বহু বিচিত্র ভাবধারা বিকাশের মধ্য দিয়ে। ক্রমে দেখি কোন্ সময় যে ইন্দ্রিয় অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় জগতে প্রবেশ করেছে তা লক্ষ্য করি নি। নীলাসঙ্গিনী লীন হয়ে গেছে মানস-আকাশের নীলিমায় এবং যে আকাজক্ষা অপূর্ণ আছে তার প্রকাশ হচ্ছে এই বাণীরূপে—

দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধোয়ায় তোমার

অজুলি পরশ,

তারায় তারায় খোঁজে তুফান আতুর অন্ধকার

সঙ্গ সুধারস।

এ ভাবেই কবি বিরহের ধরনীতেই মিলনের সরণী রচনা করেছেন; মুহূর্তকে অনন্তে পরিণত করে দিয়েছেন। তাই মানব চির আশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে যে “এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল।” সবচেয়ে বড় কথা এই যে, মানসী যে অন্তরদেবতার মধ্যে লীন হয়ে যান, প্রেমের পরম পরিণতি যে অনন্ত পরমাত্মায়, সে বাণী নবীন করে আমরা পেয়েছি নূতনের আবেদনের মধ্য দিয়ে। তাই ত আমাদের মানসী প্রিয়া মর্ত্যের মানবীর সন্নীমতা অতিক্রম করে সেই অসীমে স্থান লাভ করেছে যেখানে বাসনা নেই সাধনা আছে, আত্মলতা নেই আত্মা আছে।

আমরা ছ’জনে ভাসিয়া এসেছি যুগল মিলনশ্রোতে

অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হ’তে।

এই উৎস যে পরমাত্মা সে কথা কবি কখনও ভাষায় প্রচার করেন নি, কিন্তু ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা বহু বিচিত্র ব্যঞ্জনায।

বিরহী যখন ভাবে—

পাছে আপন ব্যথা মিটাইতে

ব্যথা জাগাই তোমার চিতে,

পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুর ডাকে

রাজে তোমার জাগিয়ে রাখি,

সেই ভয়েতেই মনের কথা কইনে ফুটে।

অথবা যখন বাণবিন্দু বেদনাক্ত মুকুরিণের মত অনাসক্ত প্রিয়ার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শুধু শুধু রাজিতে একটি চুখন রেখে চলে যায় প্রশান্ত গান্ধীর্ষ্য ও উদার বৈরাগ্য অন্তরে বহন করে—

অথবা যখন আশ্বাস পায়—

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই

নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাই,

অজি তাই

ছামলে ছামল তুমি নীলিমায় নীল,

আমার নিখিল

তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল—

তখন যে মিলনের আশ্বাস আমরা লাভ করি সে মিলন-  
জীবনদেবতার সঙ্গে যাকে উদ্দেশ্য করে কবি নিবেদন  
করেছেন—

মোর হাতে যাহা দাও

তোমার আপন হাতে তার বেশী ফিরে তুমি পাও।

জীবন যখন অন্ধকার হয়ে আসে তখনি আমরা তাঁর  
কবিতার দীপশিখায় অন্তর উদ্ভাসিত করে দেখতে পাই,  
“কোথাও দ্বন্দ্ব, কোথাও যুগ্ম, কোথাও বিচ্ছেদ নাই।”

কিন্তু শুধু অতীন্দ্রিয় প্রেমাত্মিক বা আত্মার অমৃত  
নিষেকেই বিশ্বের প্রতি কবির বাণী নিবদ্ধ ছিল না। সত্য  
শিব ও সুন্দর এই তিনের সমন্বয়ে তাঁর আদর্শের পরিপূর্ণতা  
এসেছে; সুন্দরের প্রতি অমুরাগ সমাজে অসত্য বা অকল্যাণকে  
প্রশ্রম দেয় নি। সাহিত্য ও শিল্পকলাকে সমগ্র মনুষ্যত্ব থেকে  
স্বতন্ত্র করে কবি দেখেন নি। স্বজাতির সমাধির উপর ফুলবাগান

রচনা কখনো তাঁর কাব্যে সম্ভব হ'ত না। বিশ্বের পক্ষে যা  
শিব তাই তিনি চেয়েছেন, জাতীয়তার পরিপূর্ণ অমু-  
রাগী হর্ষেও আন্তর্জাতিকতাকে নবজীবন দান করতে  
চেয়েছেন। তিনি ত শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষের ছিলেন  
না। আমাদের দৌড়াগ্য যে জমজুমি তাঁর ছিল এখানে; কিন্তু  
মনোভূমি তাঁর ছিল বিশ্বময়। নিখিল-মানস-স্বর্গ যিনি রচনা  
করেছেন তিনি পৃথিবীর কবি।

এই যে পৃথিবী কবি সৃষ্টি করে গেছেন সেখানে তার

—মনের নৃত্য কতবার জীবন যুগ্মারে

এড়ায়ে চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের স্মরণুরে।

সেখানে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অক্ষয় দান ও অনন্ত প্রেরণা  
ভারতবর্ষের বৈশাখের তপ্ত তান্ন আকাশ ও শুষ্ক ধূসর প্রান্তর  
অতিক্রম করে ছামল সুন্দর এক বিশ্বসৃষ্টি করে নখর মর্ডোই  
ভাষার অমরতা দান করে গেছে। কবির লোকান্তর হয়েছে  
যেমন ভাবে হয়ে থাকে আমাদের সকলের, কিন্তু তাঁর  
কবিতার আলোক চিরকাল অন্তরের গহনে চির উজ্জ্বল দীপ-  
শিখা জ্বালিয়ে রাখবে। পৃথিবীর কবির পৃথিবীতেই ত  
আমরা আছি।\*

\*জোড়াসাঁকো রবীন্দ্র-ভবনে নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলনের  
উদ্বোধন-অভিভাষণ।



স্বাধীনতার প্রতীক—প্রাচ্যে



স্বাধীনতার প্রতীক—প্রতীচ্যে

# বিমান ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

সমুদ্র মার্কিন

সমুদ্রিতে আমেরিকা আজ শুধু অদিতীয় নয়, অথ যে-কোন দেশকে সে বহু পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে মাত্র ১৩টি রাষ্ট্র স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া একটি কন্ফেডারেশন গঠন করিয়াছিল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে উাহারই নেতৃত্বে এই কন্ফেডারেশন ফেডারেশনে পরিণত হয়। তখন 'নূতন পৃথিবীতে' অল্পসংখ্যক শ্বেতকায় মানুষ পুরাতন লোকালয়ের বহুদূরে নিজেদের আবাস গড়িতে মনোযোগ দেন। দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি ছিল কৃষিপ্রধান, আর আটলান্টিক রাষ্ট্রগুলি ছিল বাণিজ্যপ্রধান; কৃষি ছিল দাসপ্রথার উপর নির্ভরশীল।

স্থানীয় আদিম অধিবাসিগণ দাসরূপে আগন্তুক শ্বেতকায়-গণের কৃষিকর্মে সহায়তা করিত। কৃষিস্বার্থ ও বাণিজ্যস্বার্থে নীড়ই সম্বন্ধ উপস্থিত হইল। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ দেশ-বিভাগের দাবিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এভ্রাহাম লিঙ্কন তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। তিনি দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিবার দাবি প্রত্যাখ্যান করিলেন। ফলে গৃহযুদ্ধ উপস্থিত হইল। লিঙ্কন জয়ী হইলেন। লিঙ্কনের নেতৃত্বে আমেরিকা সম্বন্ধে উত্তীর্ণ হইয়া জাতীয় এক্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। যুক্তরাষ্ট্র তখন স্ব-শক্তিতে দুই বিশ্বাসী এবং রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী। ক্রম চুক্তি প্রভৃতি দ্বারা বহুদেশ এক এক করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হইয়া গেল। এইরূপে আজ ৪৮টি রাষ্ট্র লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। ইহা ছাড়া আলাস্কা, হাওয়াই প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলও তাহার শাসনাধীন। যদি রুশ-মার্কিনে কখনও যুদ্ধ হয় তবে সে যুদ্ধে আলাস্কা হইবে আমেরিকার একটি মূল্যবান ষাঁটি। আলাস্কা আয়তনে ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪ শত বর্গ মাইল। ১৯৪০ সালের আদমশুমারী অনুসারে এখানে ৭২,৫০০ লোকের বাস। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২০ লক্ষ টাকা মূল্যে আমেরিকা রুশিয়ার নিকট হইতে এই দেশটি ক্রয় করিয়াছিল।

বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ৩০ লক্ষ ২২ হাজার ৩ শত ৮৭ বর্গ মাইল, আলাস্কা, হাওয়াই প্রভৃতি অঞ্চল ধরিলে ৩৬ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬ শত ৬০ বর্গ মাইল। ইহার লোক-সংখ্যা ১৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৬৯ হাজার ২ শত ৭৫; উপরোক্ত অঞ্চলসমূহের লোকসংখ্যা ধরিলে ১৫ কোটি ৬ লক্ষ ২১ হাজার ২ শত ৩১। ঐ অঞ্চলগুলির মধ্যে পুরোটা রিকোর জন-সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৬৯ হাজার আর হাওয়াইয়ের জনসংখ্যা ৪ লক্ষ ২৩ হাজার।

রাষ্ট্রগুলির আয়তনের তারতম্য অনেক। ক্ষুদ্রতম নেভাডা রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ১ লক্ষ ১০ হাজার। বৃহত্তম নিউইয়র্ক রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাজার। জনবসতির গড়পড়তা হার প্রতিবর্গ মাইলে নেভাডায় ১, নিউইয়র্কে ২৮১.২, রোড দ্বীপে ৬৭৪.২, এবং সমগ্র দেশে ৪৪.২।

জনসংখ্যার শতকরা ৫৬.৫ শহুরে এবং ৪৩.৬ গ্রামে বাস করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই অনুপাতের প্রভূত তারতম্য আছে। শহরবাসীর সংখ্যা রোড দ্বীপে শতকরা ৯১.৬, ম্যাসাচুসেট্‌স রাষ্ট্রে ৮৯.৪, নিউইয়র্ক রাষ্ট্রে ৮২.৮ এবং সি সি সি পি রাষ্ট্রে মাত্র ১৯.৮।

সমগ্র দেশে ৩৪৬৪টি শহর। লক্ষাধিক লোকপূর্ণ শহরের সংখ্যা ১৯৯। ১০ লক্ষাধিক লোকপূর্ণ শহরের সংখ্যা ৫। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র দেশে শ্বেতকায় জনসংখ্যার অনুপাত ছিল শতকরা ৮৬.৫, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ৮৯.৫-এ উঠিয়াছে।

পর্বতসঙ্কুল ওয়াইয়োমিং রাষ্ট্রের চেই-এন্ শহরের উচ্চতা ৬১৪৪ ফুট। সমুদ্রতীরবর্তী মায়ামী শহর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে মাত্র ২৫ ফুট উচ্চ।

নিউইয়র্কের তাপ জাহুরারীতে ২৪° ডিগ্রী, জুলাইয়ে ৮২° ডিগ্রী। শীতে মায়ামীর দিনগুলি পরিষ্কার, তুষারপাতশূন্য। মায়ামীর শীত কলিকাতার শীতের মতই উপভোগ্য। মন্টানা, সিন্বেসোট্টা প্রভৃতি অঞ্চলে শীতকালে তাপ শূন্যের ৪৯° ডিগ্রী নীচে পর্যন্ত নামিয়াছে, এবং ৫৫" ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারপাত হইয়াছে। গ্রীষ্মে তাপ আলাবামায় ১১৮° ডিগ্রী পর্যন্ত এবং মিনিয়াপলিসে ১০৮° ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিয়াছে।

দেশের শিল্প ও বাণিজ্য পূর্বাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল কৃষিপ্রধান। কৃষিপ্রধান পশ্চিমে মজুরীর হার শিল্পপ্রধান পূর্বাঞ্চলকেও হার মানাইয়াছে। দক্ষিণাঞ্চলের টেনেসী প্রভৃতি স্থানের কৃষি নিম্নস্তরের।

এই বিশাল ও বিচিত্র দেশের কৃষি, শিল্প এবং খনিজ সম্পদ অতুলনীয়। এই দেশবাসীদের সংগঠনশক্তি অসাধারণ। ফলে এখানকার কলকারখানা সর্বোৎকৃষ্ট এবং বিরাট কোম্পানী-গুলি শিল্প ও বাণিজ্যে পৃথিবীতে গীর্ঘহান অধিকার করিয়াছে।

জর্জ ওয়াশিংটনের বাঙীতে বা লিঙ্কনের গ্রামে যে সব যন্ত্রপাতি দেখা যায় তাহা খুব উন্নত যন্ত্রশক্তির ব্যবহারের পরিচয় দেয় না। তার পর ধীরে ধীরে আমেরিকা উন্নতির পথে চলিয়াছে। মনরো নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সে পুরাতন পৃথিবীর আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব নিজেকে লিপ্ত করে নাই। ফলে তাহার উন্নতি অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। বিংশ



শতাব্দীর দুইটি বিশ্বযুদ্ধের সংঘাতে তাহার উন্নতির গতি বিষয়-  
কর রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। যে দুইটি যুদ্ধ ইংলণ্ডের ঔপনি-  
বেশিক প্রথা ভাঙিয়া দিয়া তাহার অর্থনৈতিক কাঠামোকে  
চূর্ণপ্রায় করিয়া দিয়াছে সেই উভয় যুদ্ধই আমেরিকার স্বপ্ত  
শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে বিপুল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত  
করিয়া জগতে অদ্বিতীয় করিয়া তুলিয়াছে। আমেরিকার উন্নতি  
কোনরূপ ঔপনিবেশিক প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইহার  
প্রতিষ্ঠা তাহার নিজস্ব কৃষি-শিল্প ও খনিজ সম্পদে। তাহার  
লোকবল ছিল কম। এখনও ভারতবর্ষের দ্বিগুণায়তন দেশে  
ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ লোক বাস করে। অতএব স্বতঃই  
সে যন্ত্রশক্তির সমধিক ব্যবহারে বাধ্য হইয়াছিল। আজ যন্ত্র-  
শক্তিতে তাহার জুড়ি নাই। নব নব যন্ত্রের দ্রুত আবিষ্কারে  
তাহার সমকক্ষ নাই। যুদ্ধ দুইটিতে জড়িত হইয়া পড়ায় দ্রুত  
উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইয়াছিল।  
সেই-ধাক্কায় তাহার উৎপাদনশক্তি এত বাড়িয়া গেল যে যুদ্ধের  
মধ্যেই যুদ্ধের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়াও সে জনগণের  
জীবন-যাত্রার মান উন্নত করিয়া তুলিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর  
উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ায় দেশের যে স্থায়ী উন্নতি হইয়াছিল,  
১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্যচক্রের মহাবেগে নিম্ন আবর্তনে তাহা  
কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। তখন ডিমো-  
ক্রেটিক দলের নেতা রুজভেল্ট তাঁহার ‘নিউ ডিল’ অবলম্বনে  
বাণিজ্যচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এবারও নানা পথে  
বিপদ আসিতে পারে। যুদ্ধকালে জনসাধারণের হাতে যে  
অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা এখন দ্রুত বাজারে আসিয়া মুদ্রা-  
ক্ষীতির সৃষ্টি করিয়া বিপদ আনিতে পারে। যুদ্ধকালে যে মূল্য-  
বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নামিয়া আসিবার সময় বিপদ উপস্থিত  
হইতে পারে। উৎপাদন-বৃদ্ধিতে বাধা হইলে বিপত্তির সৃষ্টি  
হইবে। জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান, উৎপাদনের সঙ্গে  
তাল রাখিয়া চলিতে না পারিলেও বিপদ অবশ্যস্বার্থী। পূর্ন-  
সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে এবারে হয়তো সমস্ত সঙ্কট এড়াইয়া  
যাওয়া সম্ভব হইবে অনেকেই এরূপ আশা পোষণ  
করেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের ‘গ্রোস্‌ হাশভাল প্রোডাক্ট’ বা  
‘সমগ্র জাতীয় উৎপাদন’ের মূল্য ছিল ৮৮’৬ বিলিয়ন ডলার;  
১৯৪৫ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭’৩ বিলিয়ন ডলারে উঠিয়া-  
ছিল। (১) এত অল্প সময়ে এত বেশী বৃদ্ধি পূর্বে লোকের  
অপেক্ষাও অগোচর ছিল।

আমেরিকার বহির্বাণিজ্য তাহার স্বকীয় উৎপাদনের

তুলনায় নগণ্য। কয়েক বৎসরের হিসাব নিয়ে প্রদত্ত হইল,—  
(সংখ্যাগুলি সহস্র ডলারের)

|      | রপ্তানী    | আমদানী    | বিশোধ ফল     |
|------|------------|-----------|--------------|
| ১৯৩৯ | ৩,১৭৭,১৭৬  | ২,৩১৮,০৮১ | + ৮৫৯,০৯৫    |
| ১৯৪০ | ৪,০২১,১৪৬  | ২,৬২৫,৩৭৯ | + ১,৩৯৫,৭৬৭  |
| ১৯৪১ | ৫,১৪৭,১৫৪  | ৩,৩৪৫,০০৫ | + ১,৮০২,১৪৯  |
| ১৯৪২ | ৮,০৭৯,৫১৭  | ২,৭৪৪,৮৬২ | + ৫,৩৩৪,৬৫৫  |
| ১৯৪৩ | ১২,৯৬৪,৯০৬ | ৩,৩৮১,৩৪৯ | + ৯,৫৮৩,৫৫৭  |
| ১৯৪৪ | ১৪,২৫৮,৭০২ | ৩,৯১৯,২৭০ | + ১০,৩৩৯,৪৩২ |
| ১৯৪৫ | ৯,৮০৫,৮৭৫  | ৪,১৩৫,৯৪০ | + ৫,৬৬৯,৯৩৫  |

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার নিজস্ব উৎপাদন ছিল ১৭৯  
বিলিয়ন ডলার, বিদেশ হইতে আমদানী মাত্র ৪ বিলিয়ন  
ডলার এবং বিদেশে রপ্তানী মাল ৯৮ বিলিয়ন ডলার। ইহা  
হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে আমেরিকার অর্থনৈতিক শক্তি  
পরিনিরপেক্ষ; এবং তাহার অর্থনৈতিক গঠন ইংলণ্ডের গত  
শতাব্দীর অর্থনৈতিক গঠন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

আমেরিকার বর্তমান সমৃদ্ধির প্রধান প্রমাণ তাহার মজুরীর  
হারে এবং মজুরগণের দৈনিক শ্রমকালে। ১৯৪৫ সালে  
প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল অঞ্চলে কৃষি-মজুরীর মাসিক হার  
ছিল ১৮৬ ডলার বা ৬২০ টাকা।

শিল্প-মজুরীর সাপ্তাহিক হারের গড় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছিল  
৪৬’০৮ ডলার বা ১৫০ টাকার কিছু বেশী এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে  
ছিল ৪৪’৪১ ডলার বা ১৫০ টাকার কিছু কম। সাপ্তাহিক  
শ্রমকালের গড় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৪৫’২ ঘণ্টা এবং ১৯৪৫  
খ্রীষ্টাব্দে ৪৩’৪ ঘণ্টা। এত বেশী মজুরী এবং এত অল্প শ্রমকাল  
ইংলণ্ড রাশিয়া বা যে-কোন দেশে স্বপ্নেরও অগোচর। মজুরের  
স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তবে সে আমেরিকা।

সমস্ত পৃথিবীতে ডলারের ছুপ্রাপ্যতার কারণও আমেরিকার  
অর্থনৈতিক গঠনের মধ্যে নিহিত। আমেরিকা ছনিয়ার  
নিকট খুব কম জিনিষই চায় বা পায়। অথচ ছনিয়া  
আমেরিকার কাছে চায় নানা প্রকারের মাল—এমন কি  
খাণ্ডশস্ত্র পর্য্যন্ত। কিন্তু তাহার বিনিময়ে আমেরিকার চাহিদা-  
মত তুল্য-মূল্য মাল সরবরাহ করিবার সামর্থ্য পৃথিবীর নাই।  
ডলারের ছুপ্রাপ্যতা এই মৌলিক অসামঞ্জস্যের বহিঃপ্রকাশ  
মাত্র। আমেরিকার মাল কিনিতে চাই ডলার। আমেরিকায়  
মাল বেচিতে না পারিলে ডলার পাওয়া যায় না।  
আমেরিকায় আমরা কম মালই বিক্রী করিতে পারিতেছি;  
কিন্তু কিনিতে চাহিতেছি তদপেক্ষা অনেক বেশী।  
কাজেই যত ডলার পাইতেছি তদপেক্ষা বহু বেশী ডলারের  
প্রয়োজন বোধ করিতেছি। ফলে আমাদের নিকট ডলার  
হ্রাস হইয়াছে। চাহিদার তুলনায় কম পাওয়া যাইতেছে  
বলিয়াই সব দেশে ডলার রেশনিং চলিতেছে। ডলারের

(১) টেবল নং ৩০২, ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট অব দি ইউনাইটেড  
স্টেটস, ১৯৪৬

দুপ্রাপ্যতা কমানিতে হইলে আমাদের প্রথমতঃ খাজ বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইয়া আমেরিকা হইতে খাদ্যশস্ত্র আমদানী বন্ধ করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ আমেরিকার রাজ্যের আমাদের মাল যাছাতে বেশী কাটে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমেরিকা বাহির হইতে যত মাল আমদানী করে ততদ্ব্যে পাট-জাত দ্রব্যের স্থান বেশ উচ্ছে। আমেরিকায় পাটজাত দ্রব্য বেচিয়া আমরা কম ডলার পাই না।

আমেরিকার স্বয়ং-সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে ডিমোক্রেসি ও ব্যক্তি-উদ্যোগের ভিত্তিতে। সাধারণ মানুষেরাই এই সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছে। ষ্ট্যালিন বা হিটলারের মত কোন ডিক্টেটর তাহাদিগকে জ্বরদস্তি করিয়া একাঙ্গে লাগায় নাই। তাহারা নিজের স্বাধীন এবং সহজ বুদ্ধিতেই এই কাজে প্রয়ত্ন হইয়াছে। সাধারণ লোকের মধ্য হইতেই উদ্যোগী পুরুষ-সিংহগণ আবির্ভূত হইয়া দেশে লক্ষ্মী আনিয়াছেন। ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যেই লোকে এখানে কাজ করে। অথচ লক্ষ্মী এখানে ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের ক্রয়ান্ত হন নাই, ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছেন। ফলে এদেশের দীনতম মজুর মাসিক ৬০০ টাকা উপার্জন করে এবং সপ্তাহে ৪০।৪৫ ঘণ্টার বেশী পরিশ্রম করে না। ডিক্টেটরশিপ ও দারিদ্র্যানির্ণীড়িত পৃথিবীতে আমেরিকা ডিমোক্রেসি ও স্বাধীন ব্যক্তি-উদ্যোগের আকাশচুম্বী বিজয়-নিশান স্বরূপ।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আমেরিকায় ব্যক্তি-উদ্যোগের এক সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়। আবর্তমান বাণিজ্য-চক্রের প্রচণ্ড সঙ্কটে ব্যক্তি-উদ্যোগের কক্ষ্যাত হইবার উপক্রম হয়। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তখন তাঁহার ‘নিউ ডিল’ নীতি অনুসারে বহুখুশী রাষ্ট্র-উদ্যোগের আয়োজন করেন। এই নীতিতে রাষ্ট্র-উদ্যোগকে ব্যক্তি-উদ্যোগের প্রতিযোগীরূপে ব্যবহার করা হয় নাই—ফল-বিভাজ্য ব্যক্তি-উদ্যোগকে গণ-তত্ত্বাচিত উপায়ে স্ব-মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জুই প্রয়োগ করা হইয়াছিল।

আমেরিকায় ব্যক্তি-উদ্যোগের প্রসার দেখিয়া অবাচ্ হইয়াছি। টেলিগ্রাফ লাইন পর্যন্ত এখানে কোম্পানীর হাতে। রাষ্ট্র ব্যক্তির ক্ষমতাকে অভিব্যক্ত করিবার জুই—ব্যক্তিকে ধর্ম করিবার জুই নয়। এখানকার ডাকবিভাগের খরচ স্বকীয় আয়ে নির্বাহিত হয় না। ডাকমাঞ্চল সস্তা করিয়া ব্যক্তি-উদ্যোগকে সহায়তা করা সরকারের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য।

ডিমোক্রেসি সাধারণ মানুষের শক্তিতে আস্থাশীল। সাধারণ মানুষের বিচারবুদ্ধির উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিলে সাধারণ মানুষ সত্য ও মঙ্গলের পথই বাছিয়া লইবে। স্বাধীন উদ্যম এবং স্বাধীন মত প্রকাশের স্বযোগ এই অবস্থাগুলির মধ্যে প্রধান। যুক্তি দ্বারা অপরকে স্বমতে আনিবার অবাধ স্বযোগ ডিমোক্রেসির অচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এই সমস্ত বিষয়ে সুযোগ-সাম্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে চাই সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, পুস্তক প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমিতিতে অবাধে মিলিত হইবার স্বাধীনতা, এবং স্বমত প্রতিষ্ঠাকল্পে নিরঙ্কুশ বক্তৃতা করিবার স্বাধীনতা। গবর্ণমেন্টকেও সমস্ত বিষয় যথাসম্ভব সাধারণের গোচরীকৃত করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। গোপনতা ও রহস্যসৃষ্টি ডিমোক্রেসিতে যথাসম্ভব পরিহার্য। এইরূপ স্বাধীনতা ও সুযোগ-সাম্যের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া জনসমুদ্র মন্থন করিতে পারিলেই কল্যাণ-লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে।

গবর্ণমেন্ট নির্বাচন-প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই ডিমোক্রেসি হয় না। সাধারণ মানুষকে নিগড়বদ্ধ করিয়া বা তাহাকে উপযুক্ত সুযোগ না দিয়া নির্বাচন নিরর্থক। নির্বাচনের পিছনে স্বাধীনতা ও সুযোগ-সাম্য থাকা চাই। তজ্জপ মেজরিটি শাসনও ডিক্টেটর শাসন হইতে পারে, যদি মাইনরিটির কখনও মেজরিটি হইবার সম্ভাবনা বা সুযোগ না থাকে। ডিমোক্রেসির আসন এই সমস্ত নাম ও রূপের মধ্যে নয়। নাম ও রূপের বহু পিছনে ডিমোক্রেসির সন্ধান করিতে হইবে।

মেজরিটির আত্মকূল্য লাভ করিলেও পেসিফিষ্টার্স-এর গবর্ণমেন্টকে কেহ ডিমোক্রেসি বলে নাই। সিদ্ধান্তের শক্তি নির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত এবং রিপাবলিকান গবর্ণমেন্ট রূপে প্রকাশিত হইলেও তাঁহার গবর্ণমেন্ট ডিমোক্রেসি নামের অযোগ্য ছিল। ষ্ট্যালিন বা হিটলারের গবর্ণমেন্টের কদাপি ভোটের অভাব হয় নাই। অবিভক্ত বঙ্গে মুসলিম লীগ গবর্ণ-মেন্টেরও ভোটের অভাব হয় নাই। তথাপি ইহারা কেহই ডিমোক্রেসি নয়। ইহারা সকলেই ডিমোক্রেসির ছদ্মবেশে ডিক্টেটরশিপ।

সাধারণ মানুষের বিচারবুদ্ধিতে আস্থা ডিমোক্রেসির প্রথম প্রতিজ্ঞা। ডিমোক্রেসির দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা—মানুষ যুক্তিবাদী এবং তৃতীয় প্রতিজ্ঞা—মানুষ পরস্পর সদীক্ষাপরায়ণ ও সহযোগিতা-মূলক মনোবৃত্তিসম্পন্ন। সামাজিক জীবনের মধ্যে নানা প্রকার বিরোধ নিহিত আছে। ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থের সংঘাত সেখানে উপস্থিত হইবেই। ডিমোক্রেসির বিশ্বাস এই সমস্ত বিরোধের উভয় দিক বুঝিবার মত বুদ্ধি সাধারণ মানুষের আছে এবং তাহারা পরস্পরের প্রতি এইরূপ সদীক্ষাপরায়ণ ও সহযোগিতার মনোভাবসম্পন্ন যে অপর পক্ষের স্বার্থ বুঝিয়া একটি গ্রহণযোগ্য আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হইবার মত সুবুদ্ধিও তাহাদের আছে।

আলোচনা দ্বারা মীমাংসায় পৌছিবার ক্ষমতা আমেরিকা-বাসিগণের স্বভাবসিদ্ধ। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে যেখানেই আইন প্রণয়নে দুইটি স্বতন্ত্র সভার একমত প্রয়োজন সেখানেই দেখা যাইবে যে, অন্ততঃ টাকাকড়ির বিষয়ে একটি সভাকে

সম্পূর্ণ ক্ষমতাশূন্য করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের লর্ড সভার এ বিষয়ে প্রায় কিছুই ক্ষমতা নাই। এরূপ ব্যবহার কারণ এই যে সভা দুইটি আলোচনা দ্বারা সর্বদা একমত্যে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; এবং টাকাপয়সাঘটত প্রস্তাব একমত্যের অভাবে গৃহীত না হইলে রাষ্ট্রব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে। আমেরিকায় কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। এখানে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ ও কংগ্রেসের সর্ববিষয়ে তুল্য শক্তি—বাজেট, ট্যাক্স প্রভৃতি সমস্ত জরুরী বিষয়ে আলোচনা দ্বারা প্রতি বৎসর একমত্যে উপনীত হওয়া ইহাদের নিকট এখন পর্যন্ত অসম্ভব হয় নাই। আমি অবাক হইয়া সবাইকে প্রশ্ন করিয়াছি—“ইহা কিরূপে সম্ভব হয়।” সহজভাবে জবাব আসিয়াছে “কোনরূপে হইয়া যায়।”

শ্রমিক-বিরোধও এখানে আলোচনাদ্বারা মীমাংসা হয়। যুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা চালাইতে সবাই অভ্যস্ত। শ্রমিকগণ এখানে যন্ত্রব্যবহারের বিরোধিতা করে না। ট্রেড ইউনিয়নসমূহ নিয়মিতরূপে অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাগততত্ত্ববিদদের নিযুক্ত করিয়া উৎপাদনের অগ্রগতির হিসাব রাখে এবং বর্ধিত উৎপাদনের ভাষা অংশ দাবী করে। ধর্মঘট করার স্বাধীনতা সকল শ্রমিকেরই আছে। আলোচনাদ্বারা যাঁহাতে যাবতীয় বিরোধের মীমাংসা হয় তাহার অহুঙ্কার অবস্থার পোষণ করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এইরূপে উৎপাদনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবনযাত্রার মানও বাড়িয়া চলে।

আইন-আদালত যুক্তিদ্বারা বিরোধ মীমাংসারই একটি উপায়। এইজন্ত গণতান্ত্রিক দেশ মাজেই আইন-আদালতের বিশেষ প্রাধান্য।

পারস্পরিক সদিচ্ছা ও যুক্তিপ্রবণতা ইহাদের জীবনযাত্রার সর্বত্র সুপরিচ্ছূট। ডিমোক্রেসি ইহাদিগকে আলোচনাপরায়ণ করিয়াছে; আলোচনাপরায়ণতা ইহাদিগকে যুক্তিপ্রবণ করিয়াছে এবং যুক্তিপ্রবণতা ইহাদিগকে প্রত্যেকটি বিষয়ের সুনিপুণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে উত্তেজিত করিয়াছে। ইহাদের উন্নতির মূলে এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-প্রবৃত্তি। কাজ সম্বন্ধে ইহাদের ঢাকঢাক গুড়গুড় ভাব নাই। প্রত্যেকটি কাজ ইহারা এরূপভাবে নিষ্পন্ন করিবে যে তাহার সম্পাদন-চাতুর্য এবং ফলোৎকর্ষ সম্বন্ধে কাহারও কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবকাশ না থাকে। সরকার তাঁহার কার্যাবলী ও সমস্তাগুলি সম্বন্ধে অনাবশ্যক গোপনতা অবলম্বন করেন না—সরকারের সমস্তা জনসাধারণেরই সমস্তা। তাহার সমাধান চিন্তায় সকলেরই তুল্য অধিকার।

এদেশে স্বযোগ-সমতা অতুলনীয়। ন্যূনতম শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নয়নমূলক ব্যবস্থা সকলেরই করায়ত্ত। দীনতম মার্কিন শ্রমিক যে আয় এবং সুখ-স্বাস্থ্যের অধিকারী তাহা অল্প দেশের শ্রমিকদের আশাতীত। সাধারণ সামাজিক ব্যবহারে

ছোট বড় ভেদ নাই। প্রভু ভৃত্যের সঙ্গে বিনা দ্বিধায় একজ বসিয়া আহার করেন।

মহুযজ্ঞাতির পাঁচ-ছয় হাজার বৎসরের ইতিহাস প্রায় ডিক্টেটরশিপেরই ইতিহাস। পৃথিবীতে ডিক্টেটরশিপ নানা সময়ে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; নানা মতবাদের উপর স্বীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রাজতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র, ক্যাসিবাদ, কম্যুনিজম প্রভৃতি ডিক্টেটরশিপের রূপভেদ মাত্র। ইহাদের মধ্যে কেহ নির্জলা শক্তিবাদের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে; কেহ ঈশ্বরদত্ত অধিকার দাবি করিয়াছে; কেহ সর্বপ্রাণী রাষ্ট্রাদর্শের কাছে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বলি দিয়াছে, আবার কেহ বা ইতিহাসের অনিবার্য শ্রোতাবেগের মুখে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ভাসাইয়া দিয়াছে।

সাধারণ মানুষে অনাস্থা ডিক্টেটরশিপ মাজেরই প্রথম প্রতিজ্ঞা। ইহারা সকলেই অতিমানবে বিশ্বাসী। সাধারণ মানুষ ভ্রান্তবুদ্ধি। অতিমানবের বুদ্ধি অজ্ঞাত। অতএব সাধারণ মানুষকে পরিচালিত করিবার অধিকার তাঁহার জন্মগত।

ডিক্টেটরশিপ মাত্রই শক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যুক্তিবাদে ইহাদের আস্থা নাই। সাধারণ মানুষের বিচার-বুদ্ধি ভ্রান্ত। যুক্তিদ্বারা তাহাদিগকে কাজ করান সব সময় সম্ভব নয়। অতএব নিয়ন্ত্রণ ও জবরদস্তির বিশেষ প্রয়োজন।

কম্যুনিষ্টদের মতে শক্তিবাদী ডিক্টেটরশিপ আরও দুইটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি শ্রেণীবিদ্বেষ, অপরটি ইতিহাসের এক অনিবার্য গতির ধারণা। শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম অনিবার্য। শ্রেণী প্রধানতঃ দুইটি; শোষক ও শোষিত। এই সংগ্রামে পরিণামে শোষিতের জয় সুনিশ্চিত। ইতিহাসের গতি এই সুনিশ্চিত পরিণামের দিকে ছুঁকার বেগে ছুটয়া চলিয়াছে। এই ছুঁকার গতি ডিক্টেটর বা মহানায়করূপে আমাদের সম্মুখে প্রকট। তাহার কাছে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই; ব্যক্তি এই ছুঁকার নিয়তির ক্রীড়নক মাত্র।

ডিমোক্রেসি ও কম্যুনিজম আদর্শ হিসাবে সম্পূর্ণ বিরোধী। ডিমোক্রেসি সাধারণ মানুষে আস্থাবান ও যুক্তিপ্রতিষ্ঠ। কম্যুনিজম সাধারণ মানুষে আস্থাহীন ও শক্তিপ্রতিষ্ঠ। ডিমোক্রেসি বলিতেছেন সংসারের ভিত্তি প্রেমে। পারস্পরিক সদিচ্ছাই মহুয-সমাজের বিশেষত্ব। সদিচ্ছাপ্রণোদিত আলাপ-আলোচনা দ্বারা বিরোধী স্বার্থসমূহ বা বিরোধী ভাব-সমূহ মীমাংসায় উপনীত হয়। এক মীমাংসা হইতে অল্প মীমাংসায় সংক্রমণ দ্বারাই ইতিহাসের অগ্রগতি সূচিত হয়। কম্যুনিষ্ট বলিতেছেন শোষক ও শোষিত লইয়াই সমাজ। হিংসা ও বিদ্বেষেই এই সমাজের প্রতিষ্ঠা। যুক্তি এখানে অচল। মীমাংসা এখানে অসম্ভব। সংগ্রাম সর্বত্র প্রযোজ্য। ছুঁকার নিয়তি তোমাকে এই সংগ্রামে লিপ্ত

করিবেই এবং অবশ্যস্বার্থী পরিণামের দিকে লইয়া যাইবে। শৌখণ ও শৌখিতের সংগ্রামে শৌখিতের জয় অনিবার্য। তাহাদের মধ্যে যে সংগ্রাম সর্বত্র প্রধুমিত অবস্থায় বর্তমান, তাহাতে ইহন যোগাইয়া উদ্ধীপ্ত করিতে পারিলেই শৌখিতের জয় অনিবার্য। সংগ্রাম হইতে সংগ্রামান্তরে গমনই ইতিহাসের অগ্রগতি সূচনা করে।

ডিমোক্রেসির একটি অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রয়োজন। যখন মানুষের ন্যূনতম আর্থিক প্রয়োজন সহজেই মিটিয়া যায় এবং মোটামুটি সুযোগ-সমতাও বিদ্যমান থাকে তখনই মানুষ সাধারণতঃ সদিচ্ছাপরায়ণ ও যুক্তিপ্ৰবণ হয়। যাহার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান নাই এবং সংস্থান করিবার সুযোগও নাই তাহার বিদ্বেষপ্রবণ ও যুক্তিবিমুখ হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই ডিমোক্রেসির জন্ম কথঞ্চিৎ আর্থিক সমৃদ্ধি অবশ্যপ্রয়োজনীয়। দারিদ্র্য কম্যুনিজমের প্রসূতি। বর্গন-ব্যবস্থায় অসমতা বেশী দূর গড়াইলে শ্রেণীবিদ্বেষ দেখা দেয়। তখন উৎপাদন কমিয়া যায়। উৎপাদন কমিয়া গেলে ভাগ লইয়া টানাটানি আরও বাড়িয়া যায়। এইরূপে বিদ্বেষ হইতে দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্য হইতে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। তখন সাধারণ মানুষকে তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বারা একতাবদ্ধ ও সদিচ্ছাপরায়ণ রাখা দুষ্কর হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় গণতন্ত্রোচিত মনোবৃত্তিসমূহ লোপ পায়। দারিদ্র্যাক্রান্ত সাধারণ মানুষ সহজেই ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা নেতার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ইহাই ডিক্টেটরশিপের আবির্ভাবের চিরন্তন কারণ।

আমেরিকা, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ইংলণ্ড প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেই আজ সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান উচ্চতম এবং স্বাধীনতা সর্বতোমুখী। কাজেই ফলদ্বারা বিচারে ডিমোক্রেসির শ্রেষ্ঠতা সুপরিস্ফুট। কিন্তু শুধু শ্রেষ্ঠ বলিয়াই ডিমোক্রেসি আপনা আপনি আসিবে না, বা আসিলেও টিকিয়া থাকিবে না।

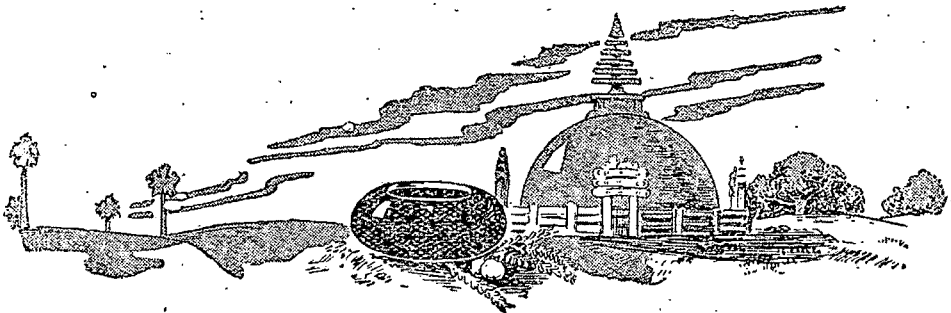
ডিমোক্রেসিকে জীয়াইয়া রাখিতে হইলে সাধারণ মানুষকে বিদ্বেষমুক্ত ও যুক্তিপ্ৰবণ রাখিতে হইবে। তজ্জন্ম চাই ন্যূনতম

সমৃদ্ধি ও সুযোগ-সমতা। যদি আমরা এরিষয়ে কৃতকার্য না হই, আমাদের ডিমোক্রেসি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বজায় রাখিতে বিফল হইবে। বিদ্বেষ ভুলিয়া প্রেম ও সদিচ্ছার সহিত মিলিয়া মিশিয়া স্ব-স্ব কর্তব্য পালন করিতে হইবে। তবেই দারিদ্র্য দূর হইবে; ডিমোক্রেসি ও স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় এ কাজের দুষ্করতার প্রমাণ মিলিবে।

মানুষ স্বরূপতঃ অনন্ত জ্ঞানৈর্ধর্ম্যময়। ব্যবহারে মানুষের অশেষ দোষ। স্বরূপই যদি তাহার আসল পরিচয় হয় তবে একথা অবশ্যই মানিতে হইবে যে পরিণামে ডিমোক্রেসিই মৃদলকর। কিন্তু স্বরূপ বা তত্ত্ব লইয়া তো লোক-ব্যবহার চলে না। বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান চলিতে পারে কিন্তু সমব্যবহার তো চলিতে পারে না। অতএব যদিও ডিমোক্রেসি মানুষের স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত তথাপি ব্যবহারিক জগতে মানুষের দোষ-গুলির নিয়ন্ত্রণের যথোচিত ব্যবস্থা ডিমোক্রেসিকে করিতে হইবে। আবার ব্যবহারের দ্বারা যদি স্বরূপই ব্যাহত হইয়া যায় তবে ফল অবশ্যই অশুভ হইবে, কাজেই স্বরূপকে ব্যাহত না করিয়া তাহার দোষরাশিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

ডিক্টেটরশিপ মানুষের দোষগুলির উপরই নিবন্ধদৃষ্টি হওয়ার স্বরূপকে বিকৃত করিয়া দেখে। রক্ততঃ তাহা মানুষের প্রকৃত স্বরূপে অবিস্বাসী।

তত্ত্ব এবং ব্যবহারের সামঞ্জস্যবিধানের উপরই ডিমোক্রেসির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে তত্ত্ব ও ব্যবহারের নব নব সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতে হইবে। তবেই তো ডিমোক্রেসি টিকিবে। অবস্থা পরিবর্তিত হইলেই নূতন সামঞ্জস্যের উদ্ভব হইবে, নূতন সমস্তার উদয় হইবে। এই সমস্তার সমাধান করিয়া নূতন সামঞ্জস্যে উপনীত হইতে হইবে। ইতিহাসে সমস্তার সমাধান নাই, রূপান্তর মাত্র আছে। সমস্তার রূপান্তরের মধ্য দিয়াই ইতিহাস অগ্রসর হইতেছে। আর এই অগ্রগতিতে মানুষের একমাত্র সহায় তাহার বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি।



## নতুন মানুষদের কাহিনী নয়

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

জামার পকেট বার কয়েক হাতড়াল স্তম্ভ। আধপোড়া একটা সিগারেট যে ছিল, গেল কোথায়? কে নিলে? হঠাৎ মনে পড়ল, প্রতুল সেদিন বলছিল, বলাই নাকি গোল্লায় গেছে। গোল্লায় যাওয়া মানে অনেক কিছু; সিগারেট টানাও তার মধ্যে আসে। এই ভেবে সে সটান ওকে ধরল।

—এই, আমার পকেটে একটা সিগারেট ছিল, নিয়েছিস তুই?

স্পষ্টই বললে বলাই—হ্যাঁ।

রাগে ফেটে পড়ল স্তম্ভ—হারামজাদা, উল্লুক ছেলে, এ সব কবে থেকে শুরু করছ?

—গাল দিও না বলছি। ভারি তো একটা সিগারেট, তাও আবার পোড়া।

—বেশ করব দোব, একশ বার দোব।

—ভদ্রলোকের ছেলে, ভদ্রলোকের মত কথা বল।

স্তম্ভ টেঁচিয়ে উঠল,—বেরো বাড়ী থেকে, বেরো।

—বেরুব না। তোমার বাড়ী নাকি।

মা ছুটে এলেন—তোরা ধামবি না কি? ছুই ভায়ে রোজ ছোটলোকের মত ঝগড়া। কে বলবে এটা ভদ্র লোকের বাড়ী।

স্তম্ভ বললে—ওই রাস্কেলটাই তো প্রথম ঝগড়া শুরু করলে।

—রাস্কেল বোলো না বলছি বড়দা।

—না বলবে না। আদর দিয়ে তুমিই ওর মাথাটা খেয়েছ, মা।

—‘খেয়েছি, বেশ করেছি।’ মা বললেন—‘তুই এখন মাঝি কিনা এখান থেকে।’

—আমার কি, আমি যাচ্ছি। তোমরা দু’জনে মিলে যাচ্ছে কর।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সোজা রাস্তায়। রাগ হয়েছে ওর বলাই ইডিয়েটটার ওপর। এই বয়স থেকে সে ওসব নেশা করতে শিখেছে বলে নয়, সিগারেটটা মেরে দিয়েছে বলে। যে মাই নেশা করুক, তার তাতে কি? হোক না সে যতই আপনার লোক। নেশা কর আপত্তি নেই। তবে যে যার গাঁট খসিয়ে কর। সিগারেটটা দামী, কাল ছোটো কিনেছিল। বাঁজে সিগারেট খেয়ে মুখ মরে গেছে। রেখে দিয়েছিল অর্ধেকটা। আজ স্নুখে টানবে বলে রেখেছিল। হতভাগা বলাইটার ঠিক চোখ পড়েছে।

পানের দোকানটার দিকে তাকাল। ব্যাটা বড় চালাক

হয়ে গেছে। আর ধার দেয় না। তা ওরই বা দোষ কি। ধার দিলে ধার বেড়েই চলে। পুরনো ধার শোধ হবার কোনই আশা নেই দেখেই না ও নতুন ধার দেওয়া বন্ধ করেছে। তা বেশ করেছে। স্তম্ভ পকেটে হাত দিয়ে একটা ঘষা স্নিকি পেলে। দোকানটার সামনে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। নাঃ, রোজ আর পরসাদ দিয়ে নেশা করা চলে না।

হনহন করে দোকান পেরিয়ে গেল। অন্ধকার, ভিজে ঘর। দরজার কীক দিয়ে দিয়ে উঁকি মারল স্তম্ভ। বিলাস এক কোণে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে।

—কি কবি, কি করছ?

—কিছু নয়, কিছু নয়। এই যে এস।

—কি এত ভয় হয়ে ভাবছিলে?

—কিছু নয়, আচ্ছা বল তো রাতারাতি কি করে বড়লোক হওয়া যায়? আচ্ছা মনে কর, কেউ যদি আমার নামে লাখ দু’য়েক টাকা উইল করে যায়।

—কে ক’রবে?

—এই ধর যে কেউ।

—তার আপনার লোক থাকতে তোমাকে কেন দিয়ে যাবে শুনি?

—ধর, তার তিন কুলে কেউ নেই।

—তবে সে কোনো ভাল কাজে দান করে যাবে।

—‘তা বটে।’ বিলাস ঘাড় হেলাল।—‘আচ্ছা মনে কর, এখানে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ যদি সোনার খনি আবিষ্কার করি।’

হাসল স্তম্ভ।—‘খুঁড়ে দেখেছ নাকি কোন দিন?’

—দেখলে হয়, কি বল?

—তুমি দেখছি টাকা টাকা করে পাগলই হয়ে যাবে। এখন একটা সিগারেট খাওয়াও দেখি।

—সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি। বিড়ি দিতে পারি।

—ছেড়ে দিয়েছ? কবে থেকে?

—এই দিন কয়েক হ’ল।

—তাই দাও। কিন্তু কবি, বিড়ি! স্বপ্ন থেকে একেবারে নেমে এলে বাস্তবে।

ভাতের থালার সামনে বসে বলাই ডাকলে—মা।

—কি রে?

—রোজ রোজ খাওয়ার এ কি ছিরি হচ্ছে!

জবাব দিলে বাপ—‘মা পাচ্ছিস খেতে হয় খা, না হয়



উঠে যা।...একটু থেমে—‘লবাবের জুয়ে নবাবী থানা আসবে কোথেকে শুনি?’

শ্রমস্ত নিবিষ্টমনে থাকিল। বললে—তোমরাই ত নবাব করে তুলেছ ওকে।

বলাই ভারি কী চালে বললে, ‘রোজ এমনি যা-তা খাওয়া যায় নাকি। এই এক ভাত আর চচ্চড়ি। তুমি কি বলে এসব খাওয়াও বাবা।’ ছেলের ভাল খাইয়ে মানুষ করা তোমার মরাল ডিউটি।—বাপ চোঁচিয়ে উঠল: ‘শুয়ার ছেলে, ফাজলামি করতে হবে না। ভাল খেতে হয়, গাঁটের পয়সা খরচ কর। বাপের হোটেলের নবাবী চলবে না।’

শ্রমস্ত না হেসে পারল না।

আমার এক বন্ধুর হোটেল আছে। সেখানেই খাব কাল থেকে।—বলাই বললে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইখানেই যা। দূর হ’।

ভাত খেয়ে আঁচাতে আঁচাতে বললে—নিশ্চয়ই যাব। এখানে আধ-পেটা আর অখাণ্ড খেয়ে মরব নাকি।

রাগী বললে—সত্যি ঠাকুর পো, রাগ করে চলে যেও না।

—‘যাবে কোথায় শুনি?’ বাপ বলে উঠল—‘কোন চুলোতেই কারুর জায়গা হবে না। সব মিয়াকেই এখানে ফিরে আসতে হবে। ওসব লম্বা-চওড়া বুলি আমার জানা আছে। ওর সেই হোটেলওয়ালার বন্ধু কেমন মাংগনা পাত সাজিয়ে খেতে দেয় দেখি।...’

কবির কাছ থেকে কতকগুলো বিড়ি পকেটে পুরেছিল শ্রমস্ত। ঘরে বসে তারই একটা টানতে থাকে। বিড়িতে নেমে মন্দ করে নি কবি।

একটু পরে রাগী ঘরে এল। বললে—একটা কথা বলব।—নিশ্চয়ই বলবে।

—এমনি করে কত দিন বসে থাকবে।

—যত দিন পারা যায়।

—রোজ মা-বাবা গাল দেন। সেটা কি খুব ভাল?

শ্রমস্ত বললে—বাপমায়ের গালাগাল না খেয়ে কোন ছেলে বড় হয়েছে বল।

—তুমি আর বড় হবে কি, বড় তুমি অনেক দিনই হয়ে গেছ।

—তা যা বলেছ। হাসল শ্রমস্ত।

—পুরুষমানুষ হয়ে ঘরে বসে থাকতে তোমার লজ্জা করে না?—আমি তো তোমার জুয়ে লজ্জায় মরে যাই।

—সে তো মরবেই। কেননা লজ্জা সখী, রমণী-ভূষণ।

—ঘরে বসে থাক, নানা লোকে নিন্দে করে।

—কেন? দোষটা কি করলাম? কারুর বাড়ীতে সিঁদুক ভাঙি নি, কারুর মেয়ের দিকে কুনজরে তাকাই নি।

—কিছু বলতেই তোমার আটকায় না দেখছি।

—না, আটকায় না। লোক ভাবে আমার কথা, আমি ভাবি তোমার কথা—আর তুমি ভাব লোকের কথা।

রাগী বললে—ভাব তুমি আমার কথা?

—নিশ্চয়ই। তোমায় আমি খুব ভালবাসি। আর যেই বিয়ে করুক তোমায়, আমার মত এত ভালবাসতে পারবে না। আমি বেকার বলে তুমি আমার ততটা ভালবাস না। দুঃখ কেন তোমার, আমি বেকার বলে? কবি বিলাস কি বলে জান, ‘বেকারস্ আর দি মেকাস্ অব নেছান’।

ওকে ছ’হাতে একটু উঁচুতে তুলে ধরল শ্রমস্ত।

—এই ছাড় ছাড়। বাবা মা দেখে ফেলবেন যে।

—বাবা-মা দেখুন, ভাই দেখুক, পাড়ার লোকেরা দেখুক। দেখুক না, তোমার ভয় কি।...

সতীনাথ পেনসন্ পান সত্তর টাকা। সত্তর টাকায় এই বাজারে সংসার চালানো অসম্ভব ব্যাপার। ছোটো ছেলে—ছোটোই বেকার। কিছুই তারা করে না। তবে ঘরে বসে থাকে না। দিনরাত্রি বাইরে ঘোরে। কি যে করে সতীনাথ জানেন না, তবে টাকাকড়ি যে উপায় করে না তা নিঃসংশয়ে জানেন। সতীনাথের ঘাড়ের বিরটি সংসার, অভাবে-অনটনে মাথা ঠিক থাকে না। একটা ছেলের আবার বিয়ে দিয়েছেন। ভাবতে ভাবতে মাথা তাঁর গরম হয়ে ওঠে। ঘর থেকে ছোটো বেরিয়ে যান। গৃহে শান্তি নেই। দিনরাত্রি চীৎকার, কলহ। সব সময় অশান্তির আগুন জ্বলছে।...

সোজা বলে দিলেন সতীনাথ—সাক জানিয়ে দিচ্ছি, আমি আর ঘরে বসিয়ে ষাঁড় পুষতে পারব না। যে যার খেটে খাও।

বলাই বলে উঠল—ভারি তো পুষছো। ছ’বেলা চাট্টি তো খেতে দাও। তাও যা দাও, তা বলবার নয়।

—যাই হোক, তাও আঙ্গ থেকে বন্ধ।

—দিও না, চায় কে।

—তবে রে উল্লুক, এত বড় কথা। বেরো বেরো এখুনি।...লাল হয়ে ওঠে সতীনাথের মুখ-চোখ।

—খাম। আর কিছু পার না, শুধু গাঁক গাঁক করে চোঁচাতেই শিখেছ।

থেমেই যান সতীনাথ। ইচ্ছে হয়, এমন জোরে ওর গালে এক চড় মারেন যে আর কোন দিন উঠে দাঁড়িয়ে কথা না বলতে পারে। কিন্তু পারেন না।

সাতে পাঁচে নেই শ্রমস্ত। কারুর সঙ্গে ঝগড়া করে না। কেউ ঝগড়া বাধালেও চূপ করে থাকে। তা তার দোষ থাকুক আর না থাকুক। চোঁচামেচি করতে ওর ভাল লাগে না। বাড়ীতে সব সময় চোঁচায় সবাই। তাই ঘরে ওর মন ঢেকে না।

বাড়ীওয়াল। রাত্তায় ধরে।—দুব্বি গা-ঢাকা দিয়ে আছ  
বাবাজী। যখনই যাই, বাড়ী নেই। বাপ যেমন ধড়িবাজ  
শয়তান ছেলেগুলোও ঠিক তেমনি হয়েছে।

—বাপ তুলো না বলছি।

—আলবৎ তুলব। একশো বার তুলব। বাপ কেন;  
বাপের বাপ তুলব।

স্বমস্ত হাসল : তা তোলে। তবে তাতে লাভ এই হবে  
যে ভাড়া পাবার সম্ভাবনার যেটুকু ছিটেকোটী ছিল, তাও  
হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।

বাড়ীওয়াল। একটু যেন নরম হ'ল। : ও, তবে ভাড়া  
দেবে ঠিক করেছিলে নাকি।

—পাগল। ও এমনি কথা কথ। বললাম।

—পুরো পাঁচটা মাস তো বিনা ভাড়ায় কাটালে।  
কত দিন আর এভাবে চালাবে।

—যত দিন পারি।

—মানে।

—এর আর মানে নেই।

—ওসব চালাকি ঢের হয়েছে। শোন, আজ বলে  
যাচ্ছি, কাল সকালের মধ্যে বাড়ী খালি করা চাই।

—ক্ষেপেছে। যাদের পাঁচ মাসেও নড়াতে পারলে না,  
এক দিনে তারা নড়াবে কি করে।

—তার মানে বলতে চাও, ভাড়া কোনদিনই দেবে না।

—টাকা থাকলে কি আর দিই না।

—টাকা না থাকে, বাড়ী ছেড়ে দাও।

—তার পর ?

—তারপর যেখানে যাও, আমার কি।

—বাঃ, বেশ বললে যা হোক। টাকা নেই বলে বাড়ীতে  
থাকা হবে না।...

বাড়ীওয়ালার অবাস্তিত সঙ্গ যত ভাড়াভাড়ি পারল ত্যাগ  
করলে। পানের দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল। বিড়ি  
টেনে খুব নষ্ট হয়ে গেছে। বললে : ছোটো পাসিং দাও তো...

—নগদ পয়সা ছাড়ুন। ধার চলবে না।

—অমন বেয়াড়া কথা বল কেন ? সঙ্গ করে নেশা করব  
তার জন্তেও পয়সা। এই নাও। একটা আনি অনেক খুঁজে  
বার করে নিজের মান রাখল স্বমস্ত।

বিলাস ঘরের মেঝেয় চিং হয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনছে।  
স্বমস্ত ডাকল : কবি, কি খবর ?

—আচ্ছা হঠাৎ যদি লাখবানেক টাকা পাই, কি করে  
খরচ করা যায় বল তো ? বাড়ী আর গাড়ী তো হবেই।

—পাবার আশা আছে নাকি ?

—নিশ্চয়ই।

—‘পাব’ ‘পাব’ রোজই গুনছি। তুমি আর পেয়েছ কবি।

—লাখ না হোক, আধ লাখই যদি পাই।

—দেখো লাখ থেকে শেষ পর্যন্ত হাজারে নেমো না।  
শোনো, বিড়িটিড়ি তো খাওয়াও। সিগারেট ছোটো ঝট করে  
কিনে ফেললাম। থাক, অসময়ে কাজ দেবে।

—বিড়ি নেই, ছেড়ে দিয়েছি।

—সে কি। এবার দেখছি কোন্ দিন ভাত ছাড়বে কবি।  
নাঃ কবি, তোমার স্বপ্ন দেখা বুধাই গেল।

—‘নাঃ, কিছু টাকাকড়ি উপায়ের চেষ্টা দেখতে হবে।  
টাকা খালি রেখে আর তো দিন চলে না।’—ভাবতে থাকে  
স্বমস্ত।—‘লেখাপড়া কেন যে শিখেছিল ছোটবেলায়। এতগুলো  
আপিস রয়েছে, যে-কোন একটাতে স্থায়ীভাবে ঢুকে পড়া গেল  
না এত দিনে। গেল মাসে সেই কারখানায় কাজ করে তিরিশ  
টাকা পাওয়া গিয়েছিল। তারপর ওরাই তাড়িয়ে দিলে।  
ওখানে একবার চুমারলে মন্দ হয় না। নাঃ, থাক। লোহা-  
লকড় নিয়ে ঠোকাঠুকি, ওসব কি আর ভ্রমলোকের ছেলের  
পোষায়।’ গোকুল সেদিন বলছিল, ওদের আপিসের সামনে  
নতুন একটা কোম্পানী খুলেছে। সেখানকার শেয়ার বিক্রিতে  
মোট কমিশন দেয় নাকি। একবার দেখলে হয়।—গালে  
হাত বুলালে স্বমস্ত। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। কামানো  
বিশেষ দরকার। তিনটে আনা গছা হবে। হোক গে।...  
রাগী কেমন যেন হয়ে গেছে আত্মকাল। হয়েছে অনেক  
দিন থেকেই। চোখে পড়ে নি স্বমস্তর। কথা কয় না,  
হাসে না। গায়ের সেই উজ্জল রং রান হয়ে গেছে। কানায়  
কানায় ভরা উজ্জল যৌবন অকালেই রিক্তপ্রায়। চোখের  
কোলে পড়েছে কালি। দেহে ছেঁড়া, ময়লা শাড়ী।—স্বমস্তর  
ভাবনার স্রোত চলেছে অবাধ গতিতে—কেন এমন হ'ল।  
পরে নিজেই হেসে ওঠে। এই অভাব আর হাহাকারের  
সংসারে ও যে এতদিন বেঁচে আছে, এইটেই আশ্চর্য।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে স্বমস্ত বলে : এখানে  
তোমার বড় কষ্ট না, রাগী ?

—কষ্ট কেন ? কে বললে ?

—আমি জানি।

—ইস, তারি আয়ার গনংকার এসেছেন।

—তুমি আর হাস না, সব সময় চুপ করে থাক।

—কি যে বল। হাসবার আর হৈ হল। করবার ব্যয়স  
আর আছে নাকি।

স্বমস্ত আঙুলে আঙুল বললে : সত্যিই কি সে ব্যয়স তুমি  
হারিয়েছ রাগী ?

রাগী কি বলবে ডেবে পার না।

—রোজ দেখি ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে থাক। ভাল  
কাপড় পর না কেন ?

হাসল রাগী। বা রে, ঘরে কেউ বুঝি ভাল কাপড়-জামা পরে থাকে।

—থাকলে ত পরবে।

—আছে গো আছে, অনেক আছে।

—ছোড়ার ডিম আছে।

প্রতিবাদের ভাষা পায় না রাগী। বলেঃ তোমারও তো ময়লা ছেঁড়া কাপড়।

—আমার কথা তোমায় ভাবতে হবে না।

—আমার কথাও তোমার ভাববার দরকার নেই।

—কে ভাবছে কে? বয়ে গেছে ভাবতে। তুমি ময়লা ছেঁড়া কাপড় পর, না খেয়ে শুকিয়ে মর কার কি।

কিন্তু সত্যিই কি কিছু নয় স্তম্ভের?...

অনেকদিন আগে বিশ্বনাথের কাছ থেকে কুড়িটা টাকা ধার করেছিল স্তম্ভ। ফিরে পাবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে, বাজারে সবার সামনে বিশ্বনাথকে যা মুখে এল তাই বলে অপমান করলে। কুতূহলীদের ভিড় জমে গেল।

হেসে বললে স্তম্ভঃ এতদিন ধরে এই কিনিষটাই শিখলে বিশ্বনাথ।

—টাকা ধার করে শোধ না দিলে এমনি গালি দিতে হয়।

—তোমার টাকা ফেরত দেবার মত অবস্থা আমাদের নেই।

—তবে ধার নিয়েছিল কেন?

—ভীষণ দরকার পড়েছিল।

—বেশ তো, এখন শোধ দাও।

হেসে জানায় স্তম্ভ—শোধ দেবার মত অবস্থা থাকলে কি কেউ কখনও ধার নেয়।

রাগে গজরাতে লাগল বিশ্বনাথ,—ছোড়োর, মিথোবাদী, ধাপ্লাবাজ।

ভিড়ের মধ্যে বলাইও ছিল। সহ্য করতে পারল না। ছুটে গিয়ে ওর নাকে মারল সজোরে এক ঘুষি। বিশ্বনাথ ছিটকে পড়ল মাটিতে আচমকা আঘাত পেয়ে। নাক দিয়ে রক্ত ছুটল। সবাই হৈ হৈ রৈ রৈ করে উঠল।

—এই বলাই রাঙ্কেল, এ কি করলি!

বলাই টেঁচিয়ে উঠল—তুমি ধাম বড়দা। ঠিকই করেছি। ও শূয়ারকে মেরেই ফেলব।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বড় মারতে শিখেছিস। চল শিগগির এখন থেকে চল। এক রকম জোর করে টানতে টানতেই স্তম্ভ ওকে ভিড়ের মাঝখান থেকে বার করে আনল।

—মারলি কেন?

—না মারবে না। যা তা বলে অপমান করবে।

—বেশ করবে।

—আমিও বেশ করেছি, মেরেছি। সেই কখন থেকে যা-তা বলে যাচ্ছে, আর তুমি চুপ করে শুনে যাচ্ছে। একটু লজ্জাও করল না তোমার।

—লজ্জা করে করব কি? টাকা তো শোধ দিতে পারব না।

—তাই বলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপমান হবে।

—তা ছাড়া উপায় কি? মারলেই কি অপমান বন্ধ হবে?

—ও সব তুমি সহ্য করতে পার বড়দা, আমি পারব না।

মুখ ভেংচে উঠল স্তম্ভ—না পারবেন না। না পারবি তো কেন গরীব হয়ে জন্মেছিলি?...

নগরীর চোখে ঘুম নেমেছে। সঙ্কীর্ণ ছোট গলিটার নিব নিব আলো। হোটেলটার এক কোণে ক'জন গোল হয়ে বসে তাস পেটা শুরু করেছে। মুখ তাদের নির্বাক, চোখে হিংস্র লোভুপতা। বিভিন্ন কড়া বোঁয়া পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। বলাইকে এদের মাঝে দেখা গেল। পকেটে একটা সিকি ছিল, তারই ভরসায় এগিয়ে এল। কেউ কেউ ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

মোটী মতন একজন শুধাল—কত সঞ্চে আছে?

—বাই থাক। তোমার কি দরকার তাতে?

বলাই উঠে দাঁড়িয়ে টাকাগুলো খুণে নিলে। চব্বিশ টাকা দশ আনা। সিকির বদলে হাতে এল। মন্দ কি।

একজন বলে উঠল—এরই মধ্যে চললে? এই তো সব সন্ধ্যা হ'ল। আর খেলবে না?

—না।

—ও আর কি নিয়ে চললে। নিয়েই যদি যেতে হয়, কম করে একশো নিয়ে যাও।

বলাই কোন জবাব না দিয়ে এগুলো। পার হ'ল গলিটা। ভীষণ বিদে পেয়েছে। খেতে হলে মোড়ের মাথার ওই বড় হোটেলটাতেই ঢুকতে হয়। হোটেলে ঢুকে গোত্রাসে গিলে চলল। অনেক খাবার—ভাল খাবার, দামী খাবার। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল বোদির কথা। বোদি না খেয়ে আছে। বোদি কি খায়, কখন খায় সে জানে না। উপোসই বোধ হয় করে রোজ। কেউ তো আর দেখতে যায় না। বাড়ীর সবার খাওয়া হলে বোদি খায়। সকলের খাবার পর হাঁড়িতে কিছু কি পড়ে থাকে।

একটা ঠোঙায় রকমারি মিষ্টি প্রচুর কিনে বলাই বাড়ী ফিরল। বন্ধ দরজায় আঙুলে আঙুলে টাকা দিলে।

—কে?

—আমি, বোদি।

রাগী দরজা খুলে দিয়ে বললে—কোথায় ছিলে এত রাত অবধি তাঁকুরপো?

—এই এমনি ঘুরছিলাম। তোমার জন্তে কি এনেছি দয়।

—কি? কি আছে এতে?

—খুলেই দেখ না।

—ওরে, এ যে অনেক ধাবার, এ কি হবে?

বলাই বললে—ভূমি ধাবে।

—এ...তো! তা ছাড়া এই তো ভাত খেয়ে উঠলাম। পট একদম ভর্তি।

—তা হোক। এত ভাল ধাবার তো ভূমি খেতে পাও না।

—তোমরাও যেন কত পাচ্ছ।

বলাই জবাব দিতে না পেয়ে চূপ করে থাকে।

রাগী ডাকল—ঠাকুরপো।

কি?

এত ধাবার কোথেকে পেলো?

বলাই হাসল—পাণ্ডা আর কোথেকে। কিনলাম।

—টাকা পেলো কোথেকে?

—পেলাম।

—জুয়া খেলেছ বুঝি?

বলাই চূপ করে রইল। সুমন্ত এতক্ষণ চূপ করে এক কাণে শুয়েছিল। বলে উঠল—যা করে পাক তোমার তাতে কি বল তো? তোমায় খেতে দিচ্ছে, খেয়ে নাও।

সুমন্তর কথায় কান দিলে না রাগী। ওকে বললে—তোমায় না আমি জুয়া খেলতে বারণ করেছিলাম। তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে ঠাকুরপো, আর কোন দিন খেলবে না।

বলাই বললে—সত্যি। কিন্তু বৌদি অনেক চেষ্টা করে দেখলাম এ ছাড়া টাকা রোজগারের আমার আর কোন পথ নেই। ভাল কাজ করে টাকা উপায় আমা দ্বারা হবে না।

সুমন্ত বললে—পুরুষ মানুষ টাকা রোজগার করেছে। তা যা করেই হোক। চুরি করে বা জুয়া খেলে তা নিয়ে এত চুলচেরা বিচার কেন?

চৈচিয়ে উঠল রাগী—তুমি ধাম। নিজে তো নীচে নেমেছ, ওকে আর নামিও না। এ সব বলতে লজ্জাও করে না।

হাসল সুমন্ত। তুমিই বল রাগী, চোরের মুখে কি শোভা পায় ধর্মের কাহিনী।

রাগী বলাইকে বললে—ধাবার আমি ধাব না, ঠাকুরপো। যি নিয়ে যাও।

—কেন?

—জবাব নেই রাগী।

—ইস ধাবে না। না ধাবে তো বয়ে গেল। জেজ আমরাই ধাব, দে তো বলাই। গরীবের আবার

—না। বলাই ধাবারের চৌকাটা দরজা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়।—তোমাদের কারুরই ভাল করতে নেই।

সুমন্ত কিছুক্ষণ প্রাণ ভরে হাসল। অন্ধকারে এক কোণে রাগী আচ্ছন্ন মত বসে। কেউ দেখতে পেলো না, ওর কাল দুটো চোখে জল টলটল করছে।...

মাসের শেষ সপ্তাহ। রেশন আনতে হবে। হাতে একটাও টাকা নেই সতীনাথের। বাস হাতড়ালেন, এদিক-ওদিক খুঁজলেন। কোথাও নেই কিছু। রাগীকে বললেন, তোমার কাছে কিছু টাকা হবে বোমা?

—না তো।

—তাই তো। আজ রেশন আনার দিন।

স্বামীকে বললে রাগী, তোমার কাছে টাকা আছে? দাও তো আমায় কিছু।

—কেন-কি হবে?

—দরকার আছে।

সুমন্ত জোরে হেসে উঠল।—টাকা চাইছ আমার কাছ থেকে? হায় নারী, এখনও পতি-দেবতাকে চিনলে না।

রাগী কিছুক্ষণ চূপ করে থেকে বললে, টাকা না দিতে পার, একটা কাজ করতে পারবে?

—টাকা দেওয়া ছাড়া আর সব কিছুই পারব।

—বেশ।—হু হাতে দুটো সোনার চুড়ি ছিল। সে দুটো খুলে ওকে দিলে।—এই নাও।

—এ কি হবে?

—এ দুটো জমা রেখে আমার অন্ততঃ দশটা টাকা এনে দাও।

—এ তো সোজা কাজ। কিন্তু টাকার তোমার কি এমন জরুরী দরকার শুনি?

—টাকা না আনলে এই হস্তা উপোস করে থাকতে হবে।

—উপোস করতে তোমার তো বেশ অভ্যাস আছে।

—ছি ছি, আমি আমার নিজের জন্তে বলছি নাকি।

চুড়ি দুটো হাতে নিয়ে সুমন্ত রাস্তায় নামল। মল নয় চুড়ি দুটো। বিয়েরই সময় রাগী পেয়েছিল। বার কয়েক সে দেখল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। অনেক ময়লা জমেছে। কেমন যেন ক্ষয়ে ক্ষয়ে রান হয়ে গেছে।

ঘুরতে ঘুরতে সোজা প্রভুলের বাড়ী হাজির। প্রভুল ডাক্তার, বড়লোক।

—কি রে, কি ব্যাপার? আজকাল যে বড় আসিস না?

—চাইতে আর ভাল লাগে না। কাঁহাতক আর হাত

পাতা যায় বল? এবার তাই দিতে এলাম।

চুড়ি দুটো ওর দিকে এগিয়ে দিল সুমন্ত।

—এ কি, এ কার চুড়ি? বউয়ের বুঝি?

—হু।

—ছিনিয়ে এনেছিস নাকি?

—না। ও নিজেই দিলে। এগুলো রেখে দশটা টাকা দে দিকি। অথ কোথাও বাঁধা রাখতে পারলাম না।

—কেন?

—কনসাল্‌জে বড় বাধলো রে।

—হুঁ। হাসল প্রভুল।—কিছু ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে দেখছি। মনিব্যাং থেকে দশ টাকার ছুটো নোট বার করল।—এই নে।

—থ্যাংক্‌স্। চুড়িটা রাখ।

—পাগলামি করিস নে। বাড়ী যা।

বাড়ীর পথেই পা বাড়াল হুমন্ত, কিন্তু বাড়ী গেল না। চুড়ি টাকা পকেটে রয়েছে। একসঙ্গে চুড়িটা টাকা কদাচিৎ তার পকেটে থাকে। এখন সে যা যা খুশী করতে পারে। কিন্তু টাকা নিয়ে যা খুশী সে করল না। দোকান থেকে খুব ভাল দেখে একটা শাড়ী কিনল। বেশ মানাবে এ শাড়ী রাণীকে। কত দিন ও ভাল শাড়ী পরে নি কে জানে। এ শাড়ীতে তাকে চমৎকার দেখাবে। দেখাবে ঠিক রাণীরই মত। রাণী সত্যিই ছিল রাণী। সেই তো তাকে ভিখারিণী করেছে।

বাড়ী ঢুকতেই রাণী শুধাল—টাকা এনেছ?

—আমার কাছে এস। হাত ছুটো দেখি।

—কেন?

—এস তো।

কাছে আসতেই ওর হুঁ হাতে চুড়ি ছুটো পরিয়ে দিল।

—এ কি, চুড়ি ফিরিয়ে আনলে কেন? টাকা কই?

—টাকা আনি নি।

—পাও নি বুঝি?

—পেয়েছিলাম। টাকা দিয়ে শাড়ী এনেছি। দেখতো কি হুমন্ত শাড়ী। কেমন তোমার মানাবে।

—এ কেন আনলে। এ তো আমি চাই নি।

হুমন্ত বললে, চাও নি বলেই তো আনলাম। মেয়েরা নিজের জুতো কখনই যে কিছু চায় না। ওই তো মেয়েদের দোষ।

—তোমার মাথা ধারাপ হয়েছে নাকি? এতো টাকা খরচ করে এই দামী শাড়ী কিনতে বলেছিল কে?

—কেউ বলে নি। তোমার আজ রাণীর বেশে সাজাব, তাই আনলাম।

—খুব কাজই করেছে। এদিকে একটা হুণ্ডা যে উপোস করতে হবে, তা ভেবে দেখছো?

—না বেয়ে থাকা আমাদের জীবনে নতুন নয়। এমনি উপোস করার দিন প্রায়ই আসে। কিন্তু আজ হঠাৎ এই যে মনের কোণে রং লাগল, একি আর কোন দিন ঠিক এমনি করে লাগবে।

—সত্যিই তোমার মাথা ধারাপ হয়েছে আজ।

রাগে ধর ছাড়ল রাণী।

আবছা অন্ধকার ঘরে রাণী নির্বাক হয়ে বসেছিল। বলাই আস্তে ডাকল—বৌদি।

—কে, ঠাকুরপো? রাণীর যেন তম্বা ভাঙে।—একি তোমার চেহারা হয়েছে। কোথা থেকে আসছ?

বলাই হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, কোথাও তো যাই নি। এই নাও, ধর।

—কি?

—নাও তো।

এক গাদা নোট মুঠো করে ওর দিকে এগিয়ে দিল। রাণী ভীত, কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল—এ কি, এত টাকা কোথেকে আনলে? সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতের দিকে চোখ পড়তে রাণী শিউরে উঠল। বেঁৎলে গেছে হাতের আঙুলগুলো। টু টু করে রক্ত পড়ছে হাত বেয়ে। ও আতঁনাদ করে উঠল—এ...এ তোমার কি হয়েছে ঠাকুরপো?

—ও কিছু নয়, হাসল বলাই।—পালাতে গিয়ে নীচে পড়ে গিয়েছিলাম বৌদি। পুলিশের জুতোটা একেবারে হাতের উপর এসে পড়ল। কি ভাবি জুতো, নীচে লোহা লাগানো।

তাই তো...

সতীনাথ কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন কেউ লক্ষ্য করে নি একবারও। সাজা পেয়ে হুঁহুনেই চমকে উঠল।

—দেখি টাকাগুলো। গুনতে গুনতে বললেন, এ যে অনেক টাকা রে। তারপর বলাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছিস। পালা শিগগির। নিজে তে যা করবার করেছিস, বাড়ীমুদ্র সবাইকে কঁাসাতে চাস নাকি। পালা পালা।

রাজির অন্ধকারে ও ধর ছাড়ল।...

‘কে কাঁদে?’ হুমন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল।—‘রাণী।’

—আঃ, চূপ কর।

রাণী ধামে না।

—আঃ, আচ্ছা এক ছিঁচকাছনে মেয়ে নিয়ে পড়া গেছে

তবু কান্না ওর ধামে কই? ওই ছেলেটা, যাকে এরা সব অনারসে, অপরাধের বোকা মাথায় লাগিয়ে দিয়ে এই গা রাখে ঘরে ঠাই দিল না তার জুতো ঘরের মেয়ের বুক ভাঙবে না। তারাই যে ঘর বাঁধে, ভালবাসে, ব্রহ্মমতা দি

প্রিয়জনকে দিয়ে রাখে? হুমন্ত ওর কাছে এগিয়ে গেল।

পাগল এত বড় হয়ে এও জানি না, কান্না আমাদের পাপ।



# কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

জীবনময় রায়

(জনমনের ধোলা কণা)

[বামপন্থীদের জুড়ে এ প্রবন্ধ লেখা হয় নি। তাদের মনোভাবের সঙ্গে আমার প্রবন্ধের আন্তরিক কোন যোগ নাই। পণ্ডিত জবাহরলালের সত্যতা ও কৃতিত্ব বিশ্ববিদিত। কান্দ্রী, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি হুন্স সমস্যা তঁার রাজনীতি প্রয়োগ-পদ্ধতি, তঁার শাস্ত্র, দৃঢ়, আত্মশক্তিতে আত্মবান মনের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচক্ষণতা প্রমাণ করে।

আমি ভারতের জনসাধারণের যে মনোভাব ব্যক্ত করেছি, সে জনসাধারণ জবাহরলালের প্রতি খ্রীতিসম্পন্ন জনসাধারণ এবং পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনে তঁার নায়কত্বের উপর তার নির্ভর ও আশাশীল।

প্রবন্ধটিকে এই মনোভাব নিয়েই পড়তে হবে।]

ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা পেয়েছে এ ধারণা ভারতবাসীর মনে ঠিকমত শিকড় নিতে পারে নি। ৬০ বছর ধরে এই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে আসমুদ্রহিমাচল সমস্ত ভারত। কংগ্রেসের পত্তন থেকে শুরু করে কংগ্রেসের নায়কেরা এবং তাঁদেরই ভাবে প্রভাবিত নরনারী বহুকাল পর্যন্ত প্রচলিতভাবে চেয়েছে ব্রিটিশবৃত্তি স্বাধীনতা আর প্রকৃষ্টে চেয়েছে—আরো চাকরি দাও, আরো স্ববিধা দাও, দেশের শাসনে তোমাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে দাও—অর্থাৎ যতটুকু আবদার করলে ব্রিটিশ প্রভুর সেটাকে বেয়াদবি বলে মনে করবেন না, ততটুকু। ইংরেজের কামানের সামনে দাঁড়িয়ে তখনও “ভারত ছাড়ো” বলে হুন্স দেবার হিম্মৎ হয় নি তাঁদের। কিন্তু আজ যখন বহু যুগের প্রতীক্ষিত সেই সাধনার ধন ঘরে এল তখন তাকে দেখে আমরা চিনতে পারছি না। কেন? ভারতবাসী কি এতই অসাড়, এত বিচারজ্ঞানহীন? প্রকৃত স্বাধীনতার রিহাৎপ্রবাহ কি তাদের ধমনীতে চেতনা আনতে পারে না? যদি আনত তবে ‘হুশমনের’ (Satanic Government শব্দটি অরণ করুন) কবলযুক্ত ভারতবর্ষে হুশমনির বাড় রুদ্ধি এত কেন? তবে কি ভারতবর্ষ আসলে ‘হুশমনের’ কবল যুক্ত হয় নি? প্রচ্ছন্ন ভাবে তারা কি সর্বঘণ্টে বিরাজ করে ভারতের সর্বনাশ সাধনে নিযুক্ত আছে? তা নইলে, যুক্ত ভারতের জনগণের যে ছবি যে স্বপ্ন দেখিয়ে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জনতাকে নায়কেরা, ধন-প্রাণ সুখ-শান্তি তুচ্ছ করতে আহ্বান করেছিলেন, সে ছবি আজ তারা দেখতে পাচ্ছে না, কেন? তবে কি নায়কেরা হুশমনের সঙ্গে রফা করে একটা মেকী স্বাধীনতা হাত পেতে নিয়েছেন? এবং তাকেই কি গলার জোরে সকল নায়কে মিলে প্রজাসাধারণের কাছে

“স্বাধীনতা, স্বাধীনতা” বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছেন? নইলে এত সাধের স্বাধীনতা ধন এত প্রতীক্ষার পর লাভ করেও আজ তারা স্বাধীনতার সেই স্বাভাবিক প্রাণবান চেতনা পাচ্ছে না কেন?

আর সে প্রতীক্ষা এবং চেষ্টা কি এক দিনের? রামমোহন রায়ের মুক্তি আন্দোলনের টেউ স্পষ্ট ভারতের অন্তরে এসে আঘাত করেছে। সে মুক্তি দিকে দিকে দিনে দিনে আত্ম-প্রকাশ করেছে মাহুশের জীবনের সর্ববিধ বন্ধন ছেদন করে ভারতবাসীকে মুক্তি-প্রয়াসী হবার শিক্ষা দিতে—বহু যুগের অন্ধকার কারাগার ভেঙে—সংস্কারে, ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে, ভাষায়, চরিত্রে, শিক্ষায়, মনুষ্য বিকাশের সর্বক্ষেত্রে। এক দিকে বহুতাক্ষীব্যাপী রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জড়তা এবং অল্প দিকে সেই দাসত্ব-প্রসূত নব-উজ্জীবনের প্রতি ভয়, সন্দেহ, বিরুদ্ধতা, স্বার্থ পদে পদে সেই মহামুক্তির আন্দোলনকে ব্যাহত করবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু পারে নি। ধীরে-ধীরে ভারত-বাসীর মন জেগে উঠেছে সেই মুক্তির আহ্বানে। ক্রমে তীব্র-তর হয়েছে তাদের অন্তঃকরণে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—“স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?” পরাধীনতার অপমান বহন করে, নিশ্চিন্ত নিরাপদে, শান্তিপূর্ণ আরামে সুখে স্বাধীনতা ভোগ করার স্বাধীন জীবন বিসর্জন দিয়ে, একদিন দুর্দর্শ বিদেশী দানবের বিরুদ্ধে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিশ্চিত যুত্মার আহবে—পরমানন্দে, নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। “আমি যত্ন হব মায়ের জন্ম কঁাসিকার্ঠে ঝুলিলে।” এ কথা কোনো দিনই তারা মনে করে নি যে তারা সামান্য কয় জনে কংগ্রেসটা বোমা হুঁড়ে ব্রিটিশকে ভারত ছাড়া করবে। ব্রিটিশের প্রসাদভোজী ভীকু বুদ্ধিমান দল তাঁদের চায়ের আসরে নিরাপদে বসে সে দিন একে “ছেলে মাহুশি” বলে বাকা হাসি হেসেছিল। নিকোঁধেরা এ কথা সে দিন ভাবে নি যে এই বীর-ভঙ্গী ‘সুধু প্রবলের অত্মায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রাণ তুচ্ছ করে “মানি না তোমাকে” বলবার নৈতিক বলের ভঙ্গী; দেশের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করার জুতাই তারা প্রাণ উৎসর্গ করেছিল। সেই নির্ভয় দল যে আগুন জ্বলে-ছিল, দেশের প্রাণে সে আগুন নেবে নি। ক্রমেই সে আগুন প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। দেশের পূর্ণ মুক্তি লাভ করতে চাইলে, প্রাণটা যে তুচ্ছ করতে হয়, এ প্রেরণায় দেশের যুব-শক্তি জেগে উঠেছে। আজ দেখতে পাচ্ছি, দেশের জনতার সঙ্গে সঙ্গে সেই ‘বাকা-হাসি’র দলও ওদের “শহীদ” বলার জুত্রে দৌড়ে দৌড়ে আসছে। কালের কুটিল গতি।

কামান-বন্দুক-মাইন-রণপোত-বোমা-বোম্বায়ে হুসজ্জিত

ইংরেজকে ভারত ছাড়বার নূতন শিল্পকলা আবিষ্কার করলেন ও শেখালেন মহাত্মা গান্ধী।

১ম—কংগ্রেসের আন্দোলনকে শিক্ষিত মুষ্টিমেয়ের অভিজ্ঞাত মঞ্চ থেকে বঞ্চিত জনতার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করার শিল্প। “দেশের জনতাই প্রকৃত দেশ; তারা স্বাধীনতা দাবি করতে না শিখলে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না; ভারতবর্ষ জন সাধারণের; দেশের অল্প কয়েক জন মানুষের হাতে শাসনভার গেলেই দেশ স্বাধীন হ’ল না। স্বাধীনতা আনবে জনতা, স্বাধীনতা গড়বে জনতা, স্বাধীনতা বাঁচিয়ে রাখবে জনতা। তাদের বঞ্চিত করলে, দেশের জ্ঞান নাই।”

“ভাগ করে খেতে হবে সবাকার সাথে অন্নপান।”

“সেই নিয়ে নেমে এসো নহিলে নাহিরে পরিজ্ঞান।”

কবি এ কথা অনেক আগেই গেয়েছেন। সাধক তাকে কাজে রূপান্তরিত করার শিল্পকলা শিক্ষা দিলেন।

২য় শিল্পকলা—অহিংসা। প্রচুর মারণাজের বিরুদ্ধে প্রচুরতর মারণাজ সংগ্রহ করে, কোন পরাধীন দেশের পক্ষে ব্রিটিশের মত কোনও দুর্ভিক্ষ শত্রুকে জয় করা অসম্ভব। অতএব বিনা অস্ত্রে, নির্ভয়ে যুত্পণ করে, প্রবলের বিরুদ্ধে অত্যাচার বিরুদ্ধে দাঁড়াও অহিংস অসহযোগ করে। সেই দুর্ভিক্ষ সাহস মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলা, সম্পূর্ণ অগ্রমত অমুত্তেজিত অবস্থাতেও যে সাহস যুত্পকে হাসিমুখে বরণ করতে পারে; বলতে পারে, ‘সির দিয়া, সর্ দা হি দিয়া।’—প্রাণ দিয়েছি, ধর্ম দিই নি। বলতে পারে, ‘মানি না তোমার পশু-শত্রুকে, আমাকে মারতে পারো—মানাতে পারো না।’ বড় দুর্ভিক্ষ সেই যুত্পশঙ্কায় বীরত্ব। জীৱ পরপদাশ্রয়ী মানুষ এমন সাহসের কথা কল্পনা করতে পারলে না। আবার নিরাপদ আরাধীর দল বাঁকা হাসি হাসলে। কেউ বললে, তা কি করে হবে? লড়াই না করে কি ওদের তাড়ানো যাবে? চটে গেল তারা গান্ধীজীর উপর। “তুলসীর মালা নিয়ে উনি হিমালয়ে চলে যান।” “এই বোষ্টোমী করেই দেশটা নপুংসক হয়ে গেল।” বললে, কিন্তু ‘চাল নেই তলোয়ার নেই ধামচি মারেদ্য’র দল কোন উপায় বাংলাতে পারলে না—কি করে ব্রিটিশ যাঁড়কে ভারতছাড়া করবে। আবার তার চেয়েও বুদ্ধিমান কেউ কেউ বললে, “ও অছিল লড়াই করে মরার ভয়ে।” কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর নিজস্ব যুত্পশঙ্কাপরিশূষ বীৰ্য্য ও প্রেম ধীরে ধীরে জনতার মধ্যে, দেশের যুবকদের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। সম্ভব হয়ে উঠল, যা অসম্ভব। দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা নির্ভয়ে শান্তমুখে বারংবার ব্রিটিশের গুলির মুখে এগিয়ে গেল। শিক্ষিত অশিক্ষিত ভারতের জনতার পবিত্র শোণিতে দেশ প্রাণের ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হয়ে উঠল। লোকে মার খেতে খেতে মরে গেল, জেলে গিয়ে অকথা অত্যাচার হাসিমুখে সয়ে প্রাণ দিলে,

সঙ্কল্পে স্থির থেকে মেসিনগানের সামনে বুক পেতে দিলে। সমস্ত দেশের মধ্যে স্বাধীনতার আঁকাঙ্ক্ষা ফল্গুশ্রোতের মত বইতে লাগল। এক দিন লাহোর কংগ্রেসে বীর জব্বাহরলাল যে পূর্ণ স্বাধীনতা পণ করেছিলেন, বছরের পর বছর সেই পূর্ণ স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার যুদ্ধ চলতে লাগল।

তার পর পৃথিবী জোড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে উপস্থিত হ’ল—ইংরেজের সঙ্গে জার্মানীর স্বার্থ বিরোধে। একজন সাম্রাজ্যবাদী, আর একজন ফ্যাসিষ্ট। ইংরেজ ভারতবাসীকে এসে বললে, গত যুদ্ধের মত এস আমার জন্তে লড়, আমাকে বাঁচাও—তোমাদের স্বাধীনতা দেব। কংগ্রেস উত্তর দিলে যে গত যুদ্ধেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার স্বরূপ আমাদের জানতে বাকী নেই। ভারতবাসী ধনপ্রাণ দিয়ে তোমাকে বাঁচালে আর তুমি তার প্রতিদানে দিলে জালিয়ানওয়ালাবাগ। বেশ, এবারেও তোমাকে বাঁচাতে আমরা রাজি আছি, কিন্তু আগে স্বাধীনতা চাই। হাত পা বাঁধা নিয়ে আমরা ইচ্ছামত লড়তে পারি না। এখন লড়তে গেলে তোমাদের ইচ্ছা এবং আবশ্যক মত আমাদের দিয়ে লড়িয়ে শুধু আমাদের প্রাণ বের করে দেবে; তাতে তোমরা বাঁচবে কিনা জানি না, কিন্তু আমরা যে মরব তা নিশ্চয়। স্বাধীনতা দাও। চল্লিশ কোটি মানুষের জনসমুদ্র তোমাদের পক্ষে উদ্বেল হয়ে উঠলে সেই বিরাট শক্তির কাছে যুদ্ধ আপনাই অসম্ভব হয়ে উঠবে। নইলে যুদ্ধে তোমরা বলবে হুনিয়ার মানুষের মুক্তির জন্তে লড়াই করছ আর কাজে আমাদের তোমরা তোমাদের দানিতে বেঁধে রেখে তেল ভাঙাবে তা হতে দেব না। স্বাধীনতা যদি না দাও তবে বুঝবে যে স্বাধীনতা-যুদ্ধ কথাটা ভাঙতা বই আর কিছুই নয়। তোমাদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থেই তোমরা আমাদের ধনপ্রাণে সারা করতে চাও; অতএব সে রকম যুদ্ধে আমরা বাধা দেব। চার্লিল কথাটা স্পষ্টই কবুল করলে, মঞ্জী হয়ে সে সাম্রাজ্য ভেঙে দিতে বসে নি।

ক্ষেপে গেল ইংরেজ। ১৯৪২, ৮ই আগষ্ট, কংগ্রেসের সব বড়দের নিয়ে জেলে ডরলে একদিনে। নায়কহীন দেশ, ৯ই আগষ্ট, অহিংস সংগ্রামে নেমে পড়ল স্বতঃপ্রযুক্ত হয়ে। হাজারে হাজারে নিরস্ত্র মানুষকে খুন করলে ইংরেজ, লক্ষ লোক জেলে পচতে লাগল, তাদের ঘর জালিয়ে দিলে মেয়েদের বে-ইজ্জৎ করলে, শিশু-যুদ্ধ-কেউ তাদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেলে না। দেশে হিন্দু মুসলমানের যে বিরোধ ঘটয়েছিল, তাকে চরমে আনবার জন্তে তলে তলে ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। দুর্ভিক্ষ ঘটালে, কালো বাজারের সৃষ্টি করলে, টাকার দাম কমিয়ে দিয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ-গুলোকে খাওয়ার লোভ, টাকার লোভ, মুনাফার লোভ আর সর্বনাশের ভয় দেখিয়ে যুদ্ধে সাহায্য করতে বাধ্য

করলে। দেশের সমস্তান স্বার্থলোভীর দল সুবিধার লোভে, টাকার লোভে, চাকরির লোভে, নিরাপত্তার লোভে এবং কংগ্রেসের উপর যে অত্যাচার চলছিল সেই অত্যাচারের আভঙ্কে সাম্রাজ্যলোভী ব্রিটিশের ভাবেদারীতে লেগে গেল। ভেঙে পড়ল দেশের নৈতিক ভিত্তি। পাপ সম্বন্ধে, অপরাধ সম্বন্ধে নির্লজ্জতা বাহাহুরী দেখানোর পর্যায়ে গিয়ে উঠল। সমস্ত ধর্মনীতি, মনুষ্য টাকার তলে চাপা পড়ল।

রুশিয়া আর আমেরিকার দৌলতে ব্রিটিশ যুদ্ধ শেষ করে বেরিয়ে এল দুর্বল রক্তশূন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে। ইংলণ্ডের জনসাধারণ চেকিবাহন চার্কিসকে গদি থেকে নামিয়ে এটলীকে বসালে গদিতো।

ভারতের জনসাধারণের, দলনির্বিশেষে, তখন একটি মাত্র ইচ্ছা—ইংরেজ ভারত ছাড়ো। গান্ধীজী ঐ রব তুলে-ছিলেন ‘কুইট ইণ্ডিয়া’। কোটি কোটি কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হ’ল ‘কুইট ইণ্ডিয়া’—ভারত ছাড়ো। ইংরেজ দেখলে যে এই প্রবল জনমতের অত্যাখ্যাতের বিরুদ্ধে টেকা অসম্ভব। বললে হাঁ, এবার আমরা ভারত ছাড়ব। কিন্তু সে কি ‘ছাড়ো’ রে বাবা। সমস্তানের গুড়ের ফোঁটা। এত দিন মুসলমানদের ভাতিয়ে তাদের দিয়ে অজুত উদ্ভূটে এক দাবি ষাড়া করেছিল—যার মাথাযুগ্ম কিছু নেই—যে হিন্দু আর মুসলমান দুটো আলাদা ধর্ম নয় শুধু দুটো আলাদা জাত—সুতরাং মুসলমানদের জন্মে পাকিস্তান চাই। জিন্মা বললেন, ছাড়ো ভারত, তবে তোমরা মুকবি থেকে ভারত ভাগ ক’রে আমাদের পাকিস্তান দিয়ে তবে ছাড়ো—ডিভাইড এণ্ড কুইট। এই দাবি বীভৎস চরমে তোলার ব্যবস্থাও (মুসলমানদের উৎসাহ এবং জমি তোয়ের করিয়ে দিয়ে) করতে তারা ক্রটি করে নি। ফলে ১৯৪৬, ১৬ই আগষ্ট “লচকে লেয়েঙ্গে পাকিস্তান”—রূপী বর্ষের তাওব সভ্যতা-গর্ভিত ইংরেজ রাজের দ্বিতীয় প্রধান নগরী কলকাতার বুকের উপর প্রকাণ্ডে দিবা-লোকে স্ক্রু হয়ে গেল। নরনারী শিশুহত্যা হিন্দু মুসলমানের কাছে ছারপোকা, তেলাপোকা মারার সামিল হয়ে উঠল। নারীহরণ ধর্মের অঙ্গ হয়ে উঠল। কয়েক দিনের মধ্যে কলিকাতায় পাঁচ হাজার অগ্নিকাণ্ড দিয়ে লক্ষাকাণ্ড স্ক্রু হ’ল। সে আগুন দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি। সমস্ত ভারত জুড়ে মানুষ পশুরও অধম হয়ে উঠল। ইংরেজ নিজের কৃতকার্যতায় মনে মনে নৃত্য করতে লাগল আর হুশিয়ার দরবারে আমাদের পশুত্বের কথা ভণ্ড হা-হতাশে সোৎসাহে পেশ করতে লাগল। চার্কিলের চর ওয়াভেল, দিল্লীতে বসে ছাজ নাড়ছিলেন, কলিকাতায় এসেও একদফা ছাজ নেড়ে গেলেন, কিন্তু বন্দুক-কামান-বোমা-বোমারুধারী ইংরেজ ঐ তাওবকে ধামাতে পারলে না—ধামতে দিলে না। কেননা তারা

চাইছিল যে অবস্থা এমনই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক যে কংগ্রেসকেও বাধ্য হয়ে বলতে হয়, আচ্ছা, তাই সই, ভাগাভাগিই হোক। যাতে হু’জনে হু’জনের শত্রু হয়ে ওঠে আর দুই শত্রুতে চিরশত্রু হয়ে পাশাপাশি থেকে চিরদিন ঝেঁয়োঝেঁয়ি করে এবং বৃটিশের মুকবি-আনাটা বজায় থাকে।

মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। মহাত্মাজী আশি বছরের যুদ্ধ ভয়দেহ। তবু অতিমানুষিক বলে পদব্রজে বেরলেন তিনি শান্তি অভিযানে—নোয়াখালিতে, বিহারে, দিল্লীতে। বললেন, ধামাও প্রতিশোধ ধামাও, নইলে প্রতিশোধের প্রতিশোধ তার প্রতিশোধ কোন কালেই ধামবে না। ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি করে নিজেরাই মারা যাব। শত্রু হাসবে। পৃথিবীতে আমাদের চিরকলঙ্ক রয়ে যাবে। কেউ বাঁচবে না—ধামাও প্রতিশোধ ধামাও।

জবাবহরলাল প্রমুখ নেতারা দেশের এই নিদারুণ অবস্থায় বিচলিত হয়ে ভাবলেন, আর ত চল না, ভাইয়ে ভাইয়ে এই খুনখুনি যদি ভাগাভাগিতে ধামে তবে আপাতত তাই হোক। তার পর মুসলমান ভাইদের মাথা ঠাণ্ডা হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এবারেও স্থিরপ্রজ্ঞ গান্ধীজী পই পই ক’রে বারণ করলেন কংগ্রেসকে—নিও না এই খণ্ডিত ভারত, এই দ্বি-জাতিরূপ মিথ্যা। কাটাকাটি তাতে ধামবে না; বরং আরও নতুন নতুন এবং জটিলতর দুর্দশার উদ্ভব হবে—তা সামাল দিতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। ষাট বছর যে অখণ্ডভারতের জন্মে লড়ে এসেছ, আরও অল্প সময় তার জন্মে যুদ্ধ কর, সহ্য কর, কাপুরুষের মত নিজের ধর্মত্যাগ করে নিও না এই সর্বনাশ হাত পেতে। ইংরেজ জগতের সামনে প্রতিজ্ঞাতি দিয়েছে ১৯৪৮-এর জুনে ভারত ছাড়ার—এই ক’টা দিন অপেক্ষা কর। তাদের হাতের বর্টন করা বিষপাত্র মুখে তুলো না, তুলো না। তারা যাক, তারপরে, উসকে দেবার জন্মে পিছনে যখন ইংরেজ থাকবে না তখন আমরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেব। সাবধান, আরও সর্বনাশ ডেকে এনো না।

কিন্তু শুনলে না কেউ তাঁর বুদ্ধির কথা। জবাবহরলাল, প্যাটেল, আজাদ প্রভৃতি এই টুকুরো-স্বাধীনতাকে হাতছাড়া করতে পারলেন না। জবাবহরলাল ত স্বপ্নে বিভোর—সব ঠিক হো জায়গা।

কিন্তু হায়। এই ছিন্ন ভারতের দুগ্ধ-সমস্তার পাকে পড়ে তিনি হাবুডু খাচ্ছেন। চিংকার করে পরিতাপের আর্জনাদ উঠছে তাঁর গলায় ‘হায় রে, স্বাধীন ভারত গড়ার স্বপ্ন আমার, এই খুনোখুনি, নারীহরণ, ধর্মহান্সরণ, পুনর্বাসতি, কান্দীর, জুনাগর, হায়দ্রাবাদের হাবড়ে পড়ে হা হতোম্মি বলে ডাক ছাড়ছে।’

কিন্তু স্মৃতিপরিচাপ ও আর্জনাদে কি দেবে তাঁকে? তাঁর

মত আর কাকে রাখলেন তিনি তাঁর সঙ্গে—এই ছরস্ত্র দুর্দশার মধ্যেও যারা চরিত্রবলে চতুর্দিকের সমস্তার বিরুদ্ধে, তাঁরই আদর্শ গড়ে তোলবার জন্তে, সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হবে? ধনপ্রাণ মান ভবিষ্যৎ সর্বদা পণ করে যারা তাঁরই আদর্শে অখণ্ডতার ভেদে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্তে লড়াই করেছিল। তিল তিল করে, ভোগস্বাস্থ্যসম্পদসৌভাগ্য বিসর্জন দিয়ে যারা মার খেয়েছে, জেলে পড়েছে, মরতে ভয় পায় নি—আজ কোথায় রইল তারা পড়ে! তারা কি শুধু তাঁর মরণের সঙ্গী, বিপদের বন্ধু ছিল, সম্পদের কেউ নয়, জীবনের আবহে তাদের স্থান নেই? যারা প্রাণ দিয়ে, দিলসে, হিম্মৎ নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, নিঃসন্দেহ চিত্তে এগিয়ে চলতে সাহায্য করত, হায়, তাদের আজ মহারথীরা ভুললেন কেন? কোথা থেকে পাবেন আর তাঁরা আদর্শ জয় করার মত কর্মী দেশের এই সর্বনাশের দিনে?

আজ স্বাধীনতার নামে পরাধীন ভারতের সেই চিরন্তন শোষণযন্ত্র তার সমস্ত প্যাঁচকলসমেত ভারতের বুকের উপর জাঁতানো হয়েছে এবং সেই ইংরেজ বুরোক্রেসির কলে তৈরি আর স্বার্থসর্ব্ব্ব দেশের বিশ্বাসভাষী সমস্ত ভৃত্যকুলকেই ত তিনি নিজের ভাবেদারীতে এবং দেশের খবরদারীতে যথাপূর্ণ বহাল করেছেন। চিরকাল যারা নিজের ক্ষুদ্রতম স্বার্থেও দেশকে শত্রুর চরণে বলি দিতে লজ্জা পায় নি আজ অকস্মাৎ এক দিনে তারা “পৈতে পুড়িয়ে সন্ন্যাসী” হয়ে যাবে। যে মুহূর্ত্তে দেশের সব চেয়ে বেশী করে দরকার স্বার্থত্যাগী, নিলোভ, চরিত্রবান মানুষের, দেশকে গড়ে তোলার জন্তে, সেই অবস্থায় কাদের হাতে সব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে? যারা ইংরেজ প্রভুকে চিরস্থায়ী করার চেষ্টায় দেশের মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে—মেরেছে, ধরেছে, খুন করেছে, গুলি করেছে, ঘর জালিয়ে দিয়েছে, জেলে পুরেছে, কাঁসী দিয়েছে, সেই আই-সি-এস, সেই পুলিশের হাতে, সেই মিলিটারির হাতে—যাদের দিয়ে ইংরেজ ভারতবাসীর গলায় শিকল পরিয়ে রেখেছিল—অন্ত দেশে স্বাধীনতা এলে প্রথমেই যাদের চরম শাস্তি দিত। দেশদ্রোহিতার অপরাধে শাস্তি পাওয়া দূরে থাক, পেল তারা আশাতীত পুরস্কার; তারাই আমাদের দণ্ডযন্ত্রের কর্তা হয়ে রইল; আর রইল তাদের বন্ধু কালোবাক্সারী মুনাফাখোর পেটমোটা ধনিকের দল—প্রথম গদিতে বসার উত্তেজনার মুখে, যাদের কাঁসী দিতে চেয়েছিলেন জবাহরলালজী।

আত্মস্বার্থে দেশের সর্বনাশ করতে যারা কোনোদিন কুণ্ঠিত হয় নি, আজও আত্মস্বার্থে তারা সে কাজে কখনই কুণ্ঠিত হবে না। এদের দিয়েই দেশের মঙ্গলসাধন, দুর্নীতি দমন, ভয়-পঙ্কিত দেশের সংগঠন হবে? যে সরষেতে ভূত, সে সরষে

দিয়ে ভূত ছাড়াবে? শিল্পে, বাণিজ্যে, শাসনে, রাষ্ট্রব্যাপারে দুর্নীতি যাদের স্বার্থে অজ্ঞানদী হয়ে উঠল; সেই দুর্নীতি-পরায়ণরাই হ'ল দুর্নীতিদমনের অভিভাবক। এদের দ্বারাই জবাহরলালজী দুর্নীতি দূর করবেন? আজ কালোবাক্সার, ঘুষ, ঠকামি, জুয়াচুরিভরা নির্দয় অর্থগুপ্ততা যেতেই পারে না এরা সব পূর্ব্বের ঝাটতে বহাল থাকলে—এই পুলিশ, এই আই-সি-এস, এই গণেশ্বরাম বাইপাড়িয়ার দল। অল্প কয়েকজন সজ্জন এদের মধ্যে আছেন এ দেখিয়ে কোন সাধুনা আমাদের নাই। প্রচুর পরিমাণে সজ্জন নিলোভ স্বার্থত্যাগী দেশপ্রেমিক মানুষ এই দুর্ভোগে আমাদের বড় দরকার তা না হলে শুধু বক্তৃতার তোড়ে এ কায়মী দুর্নীতি ভেসে-যাবে না, যেতে পারে না। শুধু উপদেশে আর গলাবাক্সিতে কাজ হবে না, হতে পারে না। আর কার উপদেশই বা শুনবে লোকে? সর্ব্বত্যাগী মহাত্মা গান্ধী কেউ নন। লালচে পড়ে তাঁর কথাই বড় মেনেছে লোকে, তা অল্প কেউ।

জবাহরলাল আজ জাঁতিকলে পা দিয়েছেন। এই বুরোক্রেসির কল এমনি কায়দায় তৈরি যে, “যে যার লঙ্কার সেই নাকি হয় রাবণ”। তাই ভয় হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর মানস-পুত্র সিংহশিশু জবাহরলাল আজ আই-সি-এস-এর খাঁচাকলে পড়ে তাদের তোষামোদের অহিফেন প্রভাবে পাছে বা তিনি সার্কাসের সিংহ হয়ে দাঁড়ান—তাঁর চিরজীবনের ধর্ম্ম পাছে বিস্মৃত হন, ভারতবাসীর কাছে পাছে সত্য ভঙ্গের দায়িত্ব হন, বাস্তব পরিস্থিতির অজুহাতে ভারতের গলায় শিকল দিয়ে আবার তাকে টেনে নিয়ে ব্রিটিশ-রাখালের গোয়ালভুক্ত না করেন। অতএব সাধু সাবধান! কাগারী, হাশিয়ার!

আজ কোথায় জবাহরলালের সেই পণ “অখণ্ডভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই—নইলে কিছুতেই নিরস্ত হব না” যার জন্ত লক্ষ লক্ষ লোক সর্ব্বদা পণ করে তাঁর পিছনে ছুটেছিল। তাঁর নেতৃত্বে অবিচলিত বিশ্বাস নিয়ে ছুটেছিল তারা। আজ তাদের সেই বিশ্বাসের অছি হয়ে তিনি জনতার হাতে এ কি স্বাধীনতা তুলে দিলেন? এর জন্তই জীবন পণ করেছিলেন তিনি এবং তাঁর সৈনিকের দল—করেছে যা মরেছে? না, কখনই না, এই বুরোক্রেসির অধীন ভারতের স্বপ্ন দেখে জবাহরলালের খাণ্ডার ভলে ছোটো নি তারা। জবাহরলালরা কয়েকজন ইংরেজের কয়েকটা উচ্চ আসন দখল করে বসবেন এবং দেশের জনতার উপর চির-অত্যাচারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চুট্টে রাজত্ব করতে থাকবেন এমন কথা ছিল না। তাঁরা কয়েকজন হবেন পুঙ্খভূত্যকুলের প্রভু এবং জনতাকে রেখে দেবেন সেই ভাবেদারকুলের শাসনের তলে এই পরমাশ্বাস দিয়েই কি জনতাকে স্বাধীনতা-যুদ্ধে তিনি নামিয়েছিলেন? এরই নাম

জনগণের স্বাধীনতা? “যথা পূর্বে তথা পরং” “তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে” এই যদি জনসাধারণের অবস্থা হয় তা হলে তারা কি দিয়ে অগ্রভব করবে যে তারা স্বাধীনতা পেয়েছে? তা যদি উপলব্ধি না করে তবে তারা স্বাধীন দেশের মানুষের মত ব্যবহার করবে কি করে? দেশের সংগঠনে তারা অন্তরের সঙ্গে যোগ কি করে দেবে? শুধুই গলাবাজির জোরে?

যে বিশ্বাসে জনতা এত হুংকট ভোগ করেছে সে বিশ্বাস কাণ্ডারীর প্রতি বিশ্বাস, সে বিশ্বাস জনগণের জন্ম পূর্ণ স্বাধীনতার আশ্বাসে বিশ্বাস। তাদের সে বিশ্বাস কাছে পরিণত না হলে তাদের শক্তি, তাদের বীর্য, তাদের অত্যাশ্রয়ের বিরুদ্ধে অভিযানের ইচ্ছাশক্তি, এক কথায় ইংরেজীতে যাকে বলে “morale” তা যে চূর্ণ হয়ে যাবে। এই জনতার ইচ্ছাশক্তি এবং ভাগ্যের মূল্যেই না জবাবলালজীরা আজ গদিতে বসেছেন? আজ তাঁর অগ্রগত দেশ-প্রেমিকদল তাঁদের সহকর্মী হতে পারবে না—দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা যোগ দিতে পারবে না—দেবে তারা, যারা একনা আত্মঘাতী ব্রিটিশের কবলে দেশকে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে সমর্পণ করেছে। হা অদৃষ্ট! যারা বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি শুনে অল্পদিন আগেও খেঁকিয়ে তেড়ে এসেছে, জাতীয় পতাকাকে প্রতি মুহূর্তে অপমান করেছে এবং বিজাতীয় পতাকার তলে গিয়ে পুচ্ছ আন্দোলন করেছে, দেশের এই সর্বনাশের অবস্থা, এই চরম দুর্নীতির অবস্থা নিজ হাতে ঘটায়, নির্গজ আত্মপ্রসাদে যারা মশগুল হয়েছে, তাঁরাই আজ জাতীয় পতাকার অভিভাবক। তাঁরাই দেশের দুর্নীতিদমনের কর্তা। তাদেরই কপট কণ্ঠে আজ বন্দে মাতরম্ ধ্বনি, রাতের বেলার শব-বাহী মাতালের বিকৃত “হরি-বোল” ধ্বনির মত নিনাদিত হচ্ছে। হায় রে দুর্ভাগ্য দেশ।

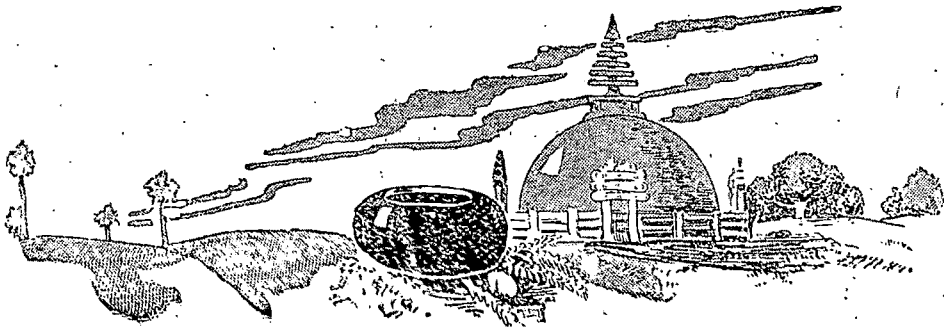
হবে না, কিছুতে হতে পারে না জনগণের স্বাধীনতা এই পথে, এই পদ্ধতিতে, যে পদ্ধতি সাম্রাজ্যবাদীদের কলে প্রস্তুত। এতে জনতার স্বাধীনতা, দেশের সকলের স্বাধীনতা আসবে না। এতে অল্প কয়েকজন-সকলের উপর বুরোক্রেসির

চালে রাজত্ব করার সুযোগ পাবে মাত্র। এমন করে জনতার বিশ্বাস-ভাঙতে থাকলে বাঁচবে না ভারত।

কংগ্রেস নায়কদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, কংগ্রেসকে থাকতে হবে সর্বাধিনায়ক হয়ে। সমস্ত শাসন তারই নির্দেশে, তারই কর্তৃত্বে পরিচালিত হবে। তা না হয়ে কংগ্রেসের সেরা মাথাগুলি যদি চাকরী নিয়ে গিয়ে গদিতে বসেন তা হলে বাকি কংগ্রেস স্বভাবতই তাদের পরিচালক না হয়ে, তাঁদের পরিচালক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। ব্রিটিশ যদি লীগ আর কংগ্রেসের হাতে ভারতকে ছেড়ে দিয়ে গিয়ে থাকে তা হলে কংগ্রেসের আইন-সম্মত পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত শাসন-নিয়ন্ত্রণে। তা না হলে, ব্রিটিশ গঠিত শাসন-ব্যবস্থার চক্ষে যারা চাকরী নেবে দুর্নীতি-দমনে, বিপদ-বারণে, তাদের অসহায়তা থেকে রক্ষা করা কারও সম্ভব হবে না, এবং দেশ সেই শাসন-ব্যবস্থায় মকর-সকল কাল-হুদে ভুবে মরবে, অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে তাই চোখে দেখতে হবে।

কাণ্ডারীর উপর জনতার যে অখণ্ড বিশ্বাস তা ভেঙে গেলে নির্বার্য হয়ে পড়বে জনতা; তাদের হৃদয় ভেঙে গিয়ে হিম্নং ধুলোয় ছুটবে। জনতার প্রীতি ও শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত জবাবলালজী এক দিন দেখতে পাবেন যে তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। কেননা, সেই জনতার শক্তিতেই না তাঁর শক্তি?

হায়! জবাবলালজী জনতার নায়কত্ব ছেড়ে কেন এ চাকরি নিতে গেলেন? জননায়ক জবাবলালের চাকরি করা মানে কি নিজের ধর্ম নষ্ট করা নয়? নেমে আসুন তিনি মেকী স্বাধীনতার তরুণা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, দৃঢ় প্রত্যয়ে জনতার মধ্যে। নেমে আসুন তিনি পূর্ণ-স্বাধীনতালাভের সংগ্রামে—পূর্ণ করুন তাঁর পণ। ‘তথ্যে’ বসে নিজেকে নিঃসহায় না মনে করে তিনি জনতার ক্ষেত্রে নেমে এসে তাদের নতুন করে চালনা করুন অতীষ্ট সিদ্ধির অভিযুখে। দেখবেন চল্লিশ কোটি হৃদয়ের প্রীতির রসায়নে তিনি অজ্ঞ ও অমিত-বল, অজয়।





# ক্রোকের মূল্যহানি

গ্রীকস্টরচাঁদ লালুয়ানী

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে মুদ্রার মূল্যহানি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিছুদিন আগে ক্রোকের যে মূল্যহানি করা হয়েছে তাতে করে দ্বিতীয় বার কয়েকটি জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এবং তাঁর ফলে এই প্রসঙ্গ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনাও চলেছে। তাই ক্রোকের মূল্যহানির তাৎপর্যই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বলার আগে মুদ্রার মূল্যহানি বিষয়ে দু-এক কথা বলা দরকার। মুদ্রার মূল্য দুই প্রকার—অন্তমূল্য এবং বহিমূল্য। মুদ্রার অন্তমূল্য বলতে আমরা টাকার আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির কথা বুঝি; যেমন—এক টাকার বিনিময়ে আমরা কতটুকু চাল, কাপড় বা অন্যান্য সামগ্রী নিজের দেশে পেতে পারি। মুদ্রার বহিমূল্য বলতে আমরা বুঝি এক টাকার পরিবর্তে আমরা কি পরিমাণ সামগ্রী বিদেশ থেকে আনতে পারব। স্বদেশে আমরা যে সকল দ্রব্যসামগ্রী কিনি তার বেলায় কোন জটিলতার উদ্ভব হয় না; কারণ টাকার বদলে আমরা সহজেই সেগুলো কিনতে পারি। কিন্তু যখনই আমাদের বিদেশী পণ্যদ্রব্য কিনতে হয় তখন প্রথমে নির্দিষ্ট বিনিময়হার অনুসারে টাকাকে রূপান্তরিত করতে হয় সেই দেশের মুদ্রায় এবং সেই বিদেশী মুদ্রা দিয়ে কিনতে হয় সেই দেশের দ্রব্যসামগ্রী। এই ভাবে যে ডলার, ষ্টার্লিং বা অন্য বিদেশী মুদ্রার টাকার রূপান্তর হয় এবং সেই বিদেশী মুদ্রার রূপান্তর হয় বিদেশী দ্রব্যসামগ্রীতে তাতেই যত রকম জটিলতার সৃষ্টি হয়। যত দিন বিভিন্ন দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল এবং বিভিন্ন দেশের দ্রব্যমূল্য পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ছিল তত দিন কোন অসুবিধাই হয় নি। কারণ স্বর্ণমানের স্বয়ং সামঞ্জস্যশীল বিধানে বিভিন্ন দেশের আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা মোটামুটি বজায় থাকত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর স্বর্ণমান ভেঙে পড়ল। তাই বিভিন্নদেশের দ্রব্যমূল্যের পারস্পরিক সম্বন্ধেরও অবসান ঘটল। যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলার জের চলল যুদ্ধেরও পর পর্যন্ত। এইভাবে অর্থনৈতিক কারণে অথবা ভ্রান্তমুদ্রানীতির ফলে কোন কোন দেশের দ্রব্যমূল্য বর্ধিত হ'ল এবং কোন কোন দেশের দ্রব্যমূল্য হ'ল আনুপাতিক ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত। এতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রবল বিপর্যয় উপস্থিত হ'ল। যেসব দেশের দ্রব্যমূল্য কম তারা আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে রইল আর অবস্থাগতিকে যে সব দেশে মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ল হুনিয়ার বাজারে তাদের ঠাই মেলা মুশকিল হয়ে পড়ল। যেমন—মনে করা যাক, ১৯১৩ সনে এক টাকার বিনিময়-মূল্য ছিল এক শিলিং হয় গেজ, তখন পাঁচ টাকার বা সাড়ে সাত

শিলিং 'ক' সংখ্যক দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যেত। যুদ্ধের ফলে ১৯২০ সনে দ্রব্যমূল্য হ'ল দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৫ শিলিং। টাকা ষ্টার্লিং বিনিময়-হারে যদি কোন পার্থক্য না ঘটে তা হলে ১৯২০ সনে সেই 'ক' সংখ্যক দ্রব্যসামগ্রী কিনতে লাগবে দশ টাকা, অর্থাৎ যুদ্ধ-পূর্ব মূল্যের দ্বিগুণ। অতঃপর সেই দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য যদি বিশেষ পরিবর্তন না হয়ে থাকে তা হলে ইংলণ্ডের পক্ষে হুনিয়ার বাজারে টিকে থাকা কঠিন। এই অবস্থায় ইংলণ্ডকে দ্রব্যমূল্য এমন ভাবে কমাতে হবে যাতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সে টিকে থাকতে পারে। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উপপাদন কার্যে সাহায্যকারীদের পারিশ্রমিক এত অপরিবর্তনশীল হয়ে উঠল যে, খরচা কমান হয়ে দাঁড়াল অসম্ভব। এ অবস্থায় যদি উপপাদনের খরচাই না কমে তা হলে দ্রব্যমূল্য কমান যাবে কি করে? অতএব ইংলণ্ডকে যদি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে টিকে থাকতে হয় তা হলে ষ্টার্লিংয়ের মূল্যকে আধাআধি কমিয়ে দিতে হবে এবং উপরের হারের নিম্নলিখিত রূপ পরিবর্তন করতে হবে :—

১৯১৩ সনে টাকা ষ্টার্লিং বিনিময়হার ১ = ১ শিঃ ৬ পেঃ; ক সংখ্যক সামগ্রীর মূল্য সাড়ে সাত শিঃ বা পাঁচ টাকা।

১৯২০ সনে টাকা ষ্টার্লিং বিনিময়হার ১ = ১ শিঃ ৬ পেঃ; ক সংখ্যক দ্রব্যের মূল্য ১৫ শিঃ বা ১০ টাকা।

এই অবস্থায় যদি বাজারে টিকে থাকতে হয় তা হ'লে যে ভাবেই হোক মূল্য ১৫ শিলিং হতে দেওয়া উচিত হবে না; মূল্যকে রাখতে হবে সাড়ে সাত শিলিং। তা হলে যুদ্ধ-পূর্ব ৫ টাকার দ্রব্যসামগ্রী ৫ টাকাতেই পাওয়া যাবে। কিন্তু আগেই বলেছি যে, দ্রব্যমূল্যহানি কোনমতেই সম্ভবপর নয়; অতএব দ্রব্যমূল্য স্থির রেখে টাকা ষ্টার্লিং বিনিময়-হারেই উপযুক্ত পরিবর্তন করা দরকার। এই পরিবর্তন হবে নিম্নলিখিত প্রকার :—

টাকা ষ্টার্লিং বিনিময় হার যদি ১ = ৩ শিঃ বা ১০ আঃ = ১ শিঃ ৬ পেঃ হিসাবে বেঁধে দেওয়া হয় তা হলে শিঃ-এর ক সংখ্যক দ্রব্য মূল্য দাঁড়াবে টাকার হিসাবে টাকা বা যুদ্ধ-পূর্ব মূল্যেরই মান।

অর্থাৎ বিদেশে যুদ্ধ-পূর্ব মূল্য বজায় রাখা সম্ভবপর হ'ল মুদ্রার মূল্যহানি করে, বিদেশী মুদ্রার অনুপাতে দেশের মুদ্রা সত্তা করে দিয়ে। এই হ'ল মুদ্রার বহিমূল্য হ্রাস তাৎপর্য। মুদ্রার বহিমূল্য হ্রাস যদি

অর্থাৎ একে যদি ঠিকমত কার্যকরী হতে দেওয়া হয় তা হলে এতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অসামঞ্জস্য ত দূর হবেই, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতাও আসতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা হয় না। এক দেশের মুদ্রার বহিমূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে অল্প দেশগুলোও আপন আপন মুদ্রার বহিমূল্য কমিয়ে দিতে আরম্ভ করেন। এই প্রতিযোগিতায় মুদ্রাহ্রাসের যেসব সুবিধা আছে তা উবে যায় এবং তার জায়গায় এসে পড়ে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ, সংরক্ষণমূলক নীতি ইত্যাদি। ১৯২৯-৩৭ সনে পৃথিবীব্যাপী মহাসঙ্কটের আবির্ভাবে প্রত্যেকটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনেকখানি অসামঞ্জস্য দেখা দিলে। এই অসামঞ্জস্যের হাত থেকে রেহাই পাবার জুড় পৃথিবীর প্রায় সব দেশই মুদ্রার মূল্য হ্রাস করে। ১৯৩১ সনে ষ্টালিন্ডের বহিমূল্য হ্রাস থেকে এর সূচনা হয়। ইংলণ্ডে এই মূল্যহ্রাসের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল দুটি। প্রথম, যুদ্ধ-পূর্ব মূল্য বজায় রাখার পাউণ্ডের যে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছিল তা দূর করা; এবং দ্বিতীয় রপ্তানী বাড়ান। পাউণ্ডের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় ১৯২৪ সনের পর থেকে ইংলণ্ডের রপ্তানী-বাণিজ্য কমে যায়; ফলে, বিদেশে ইংলণ্ডের যে পুঁজি ঝাঁটছিল তার কিছু কিছু উঠিয়ে আনতে সে বাধ্য হয়। ষ্টালিন্ডের মূল্যহ্রাসের পরই ঘটল ডলারের মূল্যহ্রাস; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইংলণ্ডের মুদ্রার মূল্যহ্রাসের পিছনে যেমন এক বিরাট অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রার মূল্যহ্রাসের পিছনে তা ছিল না। তাই এদেশের মুদ্রার মূল্যহ্রাস নিছক প্রতিযোগিতামূলক। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা মূল্যাবনতির ফলে ফ্রান্স এবং স্বর্ণমান-প্রতিষ্ঠিত দেশসমূহের মুদ্রার মূল্য আত্মপাতিকভাবে বেশী হয়ে পড়ল। তাই অবশেষে ফ্রান্সকেও ফ্রান্সের মূল্যহ্রাস করতে হ'ল। এই যে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা এতে কারও সুবিধা হয় না বরং সবারই ক্ষতি হয়। কতকটা নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার মত। বাজারে যদি একজন দোকানদার স্ত্রায় জিনিষ বিক্রি করে তা হলে তার বিক্রয়ের পরিমাণ হবে বেশী; কিন্তু সবাই যদি মূল্য কমিয়ে দেয় তা হলে কোন বিক্রেতারই কিছুমাত্র সুবিধা হবে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এ ধরনের ব্যাপারই ঘটে।

বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বহিমূল্যের মধ্যে অসামঞ্জস্যের ফলে বিশ্বব্যাপী মহাসঙ্কটের পর সারা পৃথিবী জুড়ে যে এক বিরাট অনিশ্চয়তার উদ্ভব হয় তার পুনরায়ত্তি যাতে না হতে পারে সেজন্ত দ্বিতীয় মহাসমর শেষ হবার আগেই বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিবিশারদগণ সচেতন হয়ে উঠলেন। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার এই চেষ্টার ফল। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের

সদস্যেরা এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁরা দেশী-বিদেশী মুদ্রা-বিনিময়-হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখবেন। এ ব্যাপারে যাতে কোন প্রকার প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয় সে বিষয়েও তাঁরা মনোযোগী থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে যদি কোন দেশের মুদ্রার বহিমূল্য পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক হয়ে ওঠে তা হলে সেদেশ মুদ্রাভাণ্ডারের পরামর্শ অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। অবশ্য এ ব্যাপারে প্রত্যেকটি সদস্যদলভুক্ত দেশকেই ক্রিয়ৎপরিমাণ স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়েছে; কিন্তু বুঝাপড়া হয়েছে যে, এই স্বাতন্ত্র্যের কোন প্রকার অপব্যবহার করা চলবে না যাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যাহত হতে পারে। যদি কোন সদস্য এর বিরোধিতা করেন তা হলে মুদ্রাভাণ্ডার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন এবং প্রয়োজন হলে সেই দেশকে সদস্যপদ থেকে বরখাস্ত করবেন।

ফ্রান্সের মূল্যহ্রাস বর্তমান সময়ের মুদ্রা-বিনিময়-হার বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে পাউণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের বিনিময়-হার ছিল ১ পাউণ্ড = ১৭৬.৭০ ফ্রাঙ্ক। জার্মানীর কবল থেকে মুক্তি পাবার পর এই বিনিময়-হার হ'ল ১ পাউণ্ড = ২০০ ফ্রাঙ্ক। এই অবস্থাই চলল ১৯৪৫ সালের শেষ পর্যন্ত। এই সময় সরকারীভাবে ফ্রান্সের যে মূল্য হ্রাস করা হয় তার ফলে টাঁডাল ১ পাউণ্ড = ৪৮০ ফ্রাঙ্ক। গত জাভুয়ারী মাসে সরকারীভাবে দ্বিতীয় বার ফ্রান্সের বহিমূল্যের যে পরিবর্তন করা হয়েছে তার ফলে বিনিময়-হার হয়েছে নিম্নলিখিত প্রকার :—

১ পাউণ্ড = ৮৬৪ ফ্রাঙ্ক।

১ ডলার = ২১৪.৩৯২ ফ্রাঙ্ক।

পেনের ১ পেনেসো = ১০.৯৫৮ ফ্রাঙ্ক।

ফরাসী ১ টাকা = ৬৪.৮০ ফ্রাঙ্ক।

ফ্রান্স শুধু ফ্রান্সের মূল্য হ্রাস করেই ক্ষান্ত হয় নি; সেই সেই সঙ্গে ফ্রান্সের ক্রয়-বিক্রয়ের জুড় এক খোলা বাজার প্রতিষ্ঠিত করবার সিদ্ধান্তও জ্ঞাপন করেছে। প্যারিসের টাকার বাজারের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ হিসাবে এই নতুন বাজার কাজ করবে এবং এই বাজারে মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারিত হবে চাহিদা ও সরবরাহ অনুযায়ী। এই বাজারে মার্কিন ডলার এবং অল্প কয়েকটি মুদ্রা, বাদেই সহজেই উলারে রূপান্তরিত করা চলে সেগুলোর কেনা-বেচা চলবে দৈনিক বিনিময়-হার অনুসারে। অবশ্য এই বিনিময়-হার নির্ভর করবে চাহিদা ও সরবরাহের উপর। অতএব সরকারী বিনিময়-হার থেকে খোলা বাজারের এই বিনিময়-হার পৃথক হয়ে পড়বে। ফ্রান্সের রপ্তানীকারিগণ তাঁদের রপ্তানী-দ্রব্যের মূল্য হিসাবে যে সব বিদেশী মুদ্রা পাবেন তার অর্ধেক দিতে হবে সরকারী কর্তৃপক্ষকে সরকারী বিনিময়-হার অনুসারে—বাকি অর্ধেক তাঁরা খোলা বাজারে

দৈনিক বিনিময়-হার অনুসারে বিক্রি করতে পারবেন। আমদানীকারিগণ নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের আমদানীর জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী টাকা খোলা বাজারে কিনতে পারবেন। এ ছাড়া খোলা বাজারে নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলিও সম্পন্ন হবে :—ভ্রমণকারীদের মুদ্রা পরিবর্তন, মূলধন স্থানান্তর, ব্যক্তিগত ভাবে মুদ্রা প্রেরণ ইত্যাদি।

এই ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তন কতকটা অপরিহার্যও হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধের ফলে ফরাসী দেশের রাজস্ব-ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতিতে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের জন্য যে সব কর ধার্য করা হয় এবং যে-সকল মুদ্রাবিষয়ক ব্যবস্থা গৃহীত হয় তাতে অবস্থা আরও জটিল হয়ে ওঠে। এ ছাড়া দীর্ঘদিন স্থায়ী শ্রমিক ধর্মঘট, উৎপাদন হ্রাস, কর্তার বুদ্ধি এবং পারিশ্রমিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার দরুন ক্রমে উৎপাদন-বিষয়ক ধরচ অনেক গুণ বেড়ে যায়। এতে ক্রয়ের পক্ষে বিদেশী বাজারে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। রপ্তানীর পরিমাণ বাড়ান ত দূরের কথা, যুদ্ধের আগে ক্রয়ের রপ্তানী-বাণিজ্য যা ছিল যুদ্ধের পর সেটুকু ফিরে পাওয়ার আশাও অদূর-পর্যন্ত হয়ে উঠল। ক্রয় থেকে যুদ্ধের আগে যে সব জিনিষ রপ্তানী হ'ত তাদের অধিকাংশই বিলাস-সামগ্রী। যুদ্ধোত্তর কালে এদের চাহিদা অসম্ভবরকম কমে যাওয়ায় অত্যন্ত দেশের তুলনায় ক্রয়ের সঙ্কট হ'ল আরও জটিল। তা ছাড়া যুদ্ধের দরুন ক্রয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহের ধরচ অতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার বিদেশী ভ্রমণকারীদের সংখ্যাও অনেক কমে গেছে। এতেও ক্রয়ের আয়ে যথেষ্ট ঘাটতি পড়েছে। সর্বোপরি, ক্রয়ে বিদেশী মুদ্রার চোরাবাজার যে ভাবে গড়ে উঠেছিল তাতে সরকারী মুদ্রা-বিনিময়-হারের গুরুত্ব অনেকখানি কমে যায়। এই সব কারণে ক্রয়ের বহিমূল্য পুনর্বিবেচনা করা ফরাসী সরকারের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠল।

এই অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই ফ্রান্স উপরি-উক্ত ব্যবস্থা দুটি গ্রহণ করে। এগুলির উদ্দেশ্য হ'ল রপ্তানী বাড়ান, আমদানী কমান এবং এই ভাবে দেশে নিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং ব্যবসায়ক্ষেত্রে যে সব অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছিল তা দূর করা। খোলা বাজার প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য হ'ল দেশের লোকানো সোনা এবং বিদেশী টাকাকে আকর্ষণ করা এবং এই ভাবে ক্রয়ের বহিমূল্যকে যথাযথভাবে নির্ধারিত করা। অবশ্য এই সমস্ত উদ্দেশ্য কতখানি সফল হবে সে সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ আছে। মসিমে রুমের কথায়, “যত দিন ক্রয়ের মূল্যহ্রাস চলতে থাকবে তত দিন ফাটকা-বাজের আত্মপ্রকাশ করবে বলে মনে হয় না। এই মূল্য নিম্নতন শুধু নেমে না আসা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করে

দেখবে।” এই যুক্তিতে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কারণ আজও ক্রয় মূল্যাবনতির সর্বশেষে শুধু এসে পৌঁছায় নি, ১৯৪৫ সনে এর যা মূল্য ছিল ১৯৪৮ সনে তা হয়ে পড়েছে তদপেক্ষা অনেক কম। ভবিষ্যতে যে এর মূল্য আরও কমবে না এ কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে ফরাসী সরকার গত জানুয়ারী মাসে যে শুধু ক্রয়ের বহিমূল্য বেঁধে দিয়েছেন তা বজায় রাখা সম্ভব হবে বলেই তাঁরা আশা করেন এবং ভবিষ্যতে খোলা বাজারের সহায়তায় ক্রয়ের বহিমূল্য পুনরায় গড়ে তোলা এদের উদ্দেশ্য।

এই ভাবে ক্রয়ের দুইটি বহিমূল্য নির্ধারিত হয়েছে—একটি সরকারী এবং অপরটি খোলা বাজারের। এতে বাইরের দেশগুলিতে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে তার আশঙ্কায় সবাই হুশিয়ারপ্রসূ হয়ে উঠেছেন। ক্রয়ের মূল্যহ্রাসের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করেছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে একটা খোলা বাজার প্রতিষ্ঠা করার যুক্তি অনেকেই সমর্থন করতে পারেন নি। এবিষয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষ নিম্নলিখিত মতামত প্রকাশ করেছেন :—

“এ বিষয়ে মুদ্রাকোষ অবাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করতে চান না, বিশেষ করে বর্তমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তা সমীচীন নয়। মুদ্রাবিনিময় হার বিষয়ে যদিও মুদ্রাকোষের সিদ্ধান্তগুলি প্রায় অপরিবর্তনীয় তথাপি ক্রয়ের অর্থনৈতিক অবস্থা দৃষ্টে তাঁরা যথাসম্ভব কার্যকরী পন্থা নির্দেশের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে মুদ্রাকোষ খোলাবাজার প্রতিষ্ঠা বা রপ্তানী-বাণিজ্যে প্রাপ্ত বিদেশী মুদ্রাকে সে বাজারে চালু করার পক্ষে যুক্তি দিতে পারেন না। কারণ এতে এক দিকে যেমন ক্রয়ের বাণিজ্যিক স্বার্থ সিদ্ধ হওয়ার আশা নেই অন্য দিকে তেমনি মুদ্রাকোষের অত্যন্ত সদস্যদের উপর এর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে বলেই মনে হয়।

মুদ্রাকোষের কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে অত্যন্ত দেশের মুদ্রার বহিমূল্য যখন অপরিণতি আছে তখন যে-কোন একটা অঞ্চলের উপর কোনো দেশ প্রতিযোগিতামূলক মূল্যহ্রাস চাপিয়ে দিতে পারে। যে দেশ এই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করবে সেই দেশ যদি বাণিজ্যপ্রধান হয় তা হলে তার বাণিজ্য-ব্যবহায় বিপর্যয় ঘটবার সম্ভাবনা আছে এবং তাতে করে অত্যন্ত দেশের মুদ্রার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও অনেকে শঙ্কিত হয়ে উঠবেন; কারণ অন্তত সেই দেশের খোলা বাজারে সেই সব মুদ্রার মূল্য হ্রাস হবে না থাকার জন্য এইরূপ অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হবে।

মুদ্রাকোষের কর্তৃপক্ষ আরও মনে করেন যে, অত্যন্ত দেশেও যদি অল্পব্যয় ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় তা হলে মুদ্রা-বিনিময়-হারে এসে পড়বে এক বিরাট অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা এবং এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে এর সভ্যশ্রেণীভুক্ত

প্রত্যেক দেশকেই দুর্গতি ভোগ করতে হবে। যদিও ফ্রান্সের অবস্থা এখন জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে তথাপি সহযোগিতার ভিতর দিয়ে যদি বিনিময়-হার স্থির করা হয় তা হলে সকল দেশের পক্ষে সেটিই হবে সব চেয়ে কল্যাণপ্রদ ব্যবস্থা।

ফ্রান্সের মূল্যহ্রাসে ইংলণ্ড এবং আমেরিকাও গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। ইংলণ্ডে অনেকেই আশঙ্কা করেন যে, ফ্রান্সের খোলা বাজারে যদি সমস্ত ষ্টালিং পাওয়া যায় তা হলে বিদেশীয়েরা সেই ষ্টালিং কিনে নেবে এবং তাতে ইংলণ্ডের রপ্তানী-বাণিজ্য গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে ইউরোপের পুনর্গঠন-কার্যও অন্তরায় উপস্থিত হতে পারে। তা ছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশও নিজ নিজ দেশের মুদ্রার বিনিময়মূল্য কমাবার জ্ঞান উদ্ভাবন হয়ে উঠতে পারে। যদি তাই হয়, এবিষয়ে যদি প্রতিযোগিতা শুরু হয় তা হলে তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পক্ষে তো ক্ষতিকর হবেই, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষের ভবিষ্যৎও তমসাস্ফর হয়ে উঠবে। ফরাসী কর্তৃপক্ষ অবশ্য একথা স্বীকার করেছেন যে, উল্লিখিত ব্যবস্থা ব্রাবরের জ্ঞান গ্রহণ করা হয় নি। ফ্রান্সের মূল্য স্থির অবস্থায় এলেই এই ব্যবস্থা পরিহার করা হবে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, বর্তমানে আমরা যে পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে চলেছি তাতে সময়ের গুরুত্ব খুবই বেশী। বর্তমান সময়ে যে ব্যবস্থায় কিছুমাত্র অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হবে তার ফল হবে হুদ্রপ্রসারী এবং ভবিষ্যৎও তাতে অনিশ্চয়তাপূর্ণ হয়ে উঠবে। অবশ্য আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষ বা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু এক একট দেশ যদি এ ভাবে স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে থাকে তা হলে তাতে আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হবে।

ফ্রান্সের মূল্যহ্রাসে আমাদের বহির্বাণিজ্যে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করবে বলে মনে হয় না। কারণ যুদ্ধের আগে আমরা ফ্রান্সে রপ্তানী করতাম তুলা, তৈলবীজ ও কফি এবং সেখান থেকে আমদানী করতাম বিবিধ বিলাস-সামগ্রী। বর্তমানে দেশেই তুলা এবং তৈলবীজের প্রয়োজনীয়তা এত বেশী যে সম্প্রতি এগুলির রপ্তানীর প্রসঙ্গই ওঠে না। ওদিকে আমরা বিলাস-সামগ্রীর আমদানী প্রায় বন্ধ করে দিয়েছি। কারণ যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা আমরা নাড়াচাড়া করতে পারি, অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করতেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। এ অবস্থায় বিলাসের সামগ্রী আমদানী করা চলতে পারে না। তবে ফ্রান্সের মূল্য-

হ্রাসে আমাদেরও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সূতর্ক হওয়া উচিত। একথা সকলেরই জানা আছে যে, যখন পৃথিবীব্যাপী মহাসঙ্কটের পর হুনিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি দেশই নিজ নিজ মুদ্রার বহিমূল্য হ্রাস করেছিল, ভারতের টাকার মূল্য তখনও প্রায় যথাপূর্ণই ছিল। প্রায় বলছি এইজন্মে যে, টাকার মূল্য যেটুকু হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল তা ষ্টালিংয়ের সঙ্গে এর যোগসুত্র স্থাপিত হওয়ার দরুন। ভারতের জনমত দাবী করেছে ১ টাকাকে ১ শিলিং ৪ পেন্সের সমান করার জ্ঞান; সে জারগায় সরকার স্থির করলেন ১ শিলিং ৬ পেন্স হারে। তার পরে কত পরিবর্তনই না হয়েছে। ডলার ও ফ্রান্সের মূল্যহ্রাস হয়েছে; যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে পৃথিবীব্যাপী একটা বিরাট ওলটপালট দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের বিনিময়-হার আজও ঠিক আছে। ফ্রান্সের ছায় আমাদের দেশেও মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য বহুগুণ বেড়েছে, এমতাবস্থায় দেশের শিল্প-প্রসারের জ্ঞান আমাদেরও রপ্তানী এবং আমাদানী বাণিজ্যকে অবহেলা করলে চলবে না। তাই বলছি এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুসারে টাকার বহিমূল্যেরও পরিবর্তন আবশ্যক। অবশ্য আমরা এমন কোন পরিবর্তনের কথা বলছি না যাতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় অথবা আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষের সম্মান ও প্রতিপত্তির হানি হয়। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করতে গিয়ে আমরা নিজেদের ভবিষ্যৎকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে পারি না। তা ছাড়া ভারত শিল্পবাণিজ্যে আজও অনগ্রসর দেশ। এ কারণে আমরা সরকারী সহায়ভূতি পাবার অধিকারী। এ অবস্থায় বর্তমান পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা টাকার বিনিময় হারকে কিছুতেই ১ = ১ শিলিংয়ের বেশী করতে পারি না। সরকারী কর্তৃপক্ষ আজও এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট। যদি অদূর ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয় তা হলে যুদ্ধের সময় চরম স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়ে আমরা যে সব বাজার বিদেশে গড়ে তুলেছি তা অচিরেই হারাতে হবে। এই ভাবে যদি আমরা নিজেদের রপ্তানী-বাণিজ্য নষ্ট করে ফেলি তা হলে বিদেশ থেকে পণ্যদ্রব্য আমদানী করার টাকাই বা পাব কোথা থেকে? এইজন্মে আমাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ সম্বন্ধে জাতীয় সরকারের অবিলম্বে সচেতন হওয়া উচিত। শিল্পের অগ্রগতি এবং আমাদের আর্থিক ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া বা না হওয়ার উপর।

# নাইলন

## শ্রীকৃষ্ণবিহারী পাল

মহুগুসমাজে বস্ত্র প্রচলনের ইতিবৃত্ত, মহুগুসভ্যতার ইতিহাসের মতই পুরাতন। মহেঞ্জোদরোতে যে কাপীসবস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা যীশুখ্রিষ্টের জন্মেরও তিন সহস্র বৎসর পূর্বেরকার বলিয়া অনুমিত হয়। যদিও প্রাচীন মহুগুসমাজ তাহাদের বস্ত্রের নিমিত্ত প্রকৃতির অফুরন্ত দানেরই মুখাপেক্ষী ছিল তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তাহাদের বস্ত্রবয়ন-প্রণালী কম উন্নত ধরণের ছিল না। বিভিন্ন দেশের প্রাচীনতম ইতিহাসের যে সামান্য অংশ আমাদের কাছে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, তদানীন্তন মহুগুগণ তিন প্রকার প্রাকৃতিক আঁশ বা তন্তুজাতীয় পদার্থসাহায্যেই তাহাদের বস্ত্র সমস্তার সমাধান করিয়াছে—উদ্ভিজ্জ আঁশ, তুলা ও প্রাণিজ আঁশ, রেশম ও পশম। নূনপক্ষে তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া বস্ত্রের নিমিত্ত এই তিন প্রকার আঁশেরই ব্যবহার চলিয়াছে। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে আরও অনেক প্রকার উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ আঁশের প্রচলন হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপায়ে আঁশ প্রস্তুত করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত হয়। কৃত্রিম রেশম বা রেয়নই হইল এই শ্রেণীর সর্বপ্রথম আঁশ। তৎপর নানাভাবে কৃত্রিম আঁশ প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানকালে বহুপ্রকার কৃত্রিম আঁশ জগতের বস্ত্রসমস্তার সমাধানকল্পে বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

কৃত্রিমভাবে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিবার সময় বৈজ্ঞানিক-গণকে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়—তন্মধ্যে প্রস্তুত করিবার মূলবস্তুগুলি যাহাতে সহজলভ্য হয় এবং প্রস্তুত-প্রণালী যাহাতে ব্যয়বহুল না হয়। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বস্ত্রপ্রদানকারী আঁশের মধ্যে রেয়ন প্রস্তুতে এই সমস্ত গুণই কমরেণী রহিয়াছে বটে, কিন্তু আমরা এখানে যে নাইলন সম্বন্ধে আলোচনা করিব তাহার প্রস্তুতির মধ্যেও উপরোক্ত সুবিধাগুলি বিশেষভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন কোন বিষয়ে নাইলন কৃত্রিম রেশম অপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। স্ত্রতাং অতি অল্প সময়ের মধ্যে যেমন কৃত্রিম রেশম প্রাকৃতিক রেশমকে সকল দিক দিয়া অতিক্রম করিয়াছে তদ্রূপ অদূর ভবিষ্যতে নাইলন ব্যবহারও প্রাকৃতিক পশমকে অতিক্রম করিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, কৃত্রিম-ভাবে রেশম তৈয়ারীর প্রধান কথা হইল মাত্র উদ্ভিদরাজ্যের সেলুলোজের আণবিক গঠনবিধি পরিবর্তন করা; কিন্তু নাইলনের বেলায় এরকম কোন নীতি অনুসৃত হয় না।

এই প্রকারে কৃত্রিম আঁশ বলিতে নাইলনই হইল সর্বপ্রথম আঁশ যাহা প্রস্তুত করিতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী-মূল পদার্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। নাইলন আবিষ্কারের ইতিহাস বিশেষ চমকপ্রদ।

১৯২৭ সন হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ডু পন্স দ্য নেমুর (du pont de nemour) কোম্পানীর কেরোথার (carother) এবং তাঁহার সহকর্মীগণ সরল প্রাকৃতিক পদার্থ সাহায্যে কি করিয়া জটিল পদার্থের সৃষ্টি করা যায় তাহার চেষ্টা করিতে থাকেন। প্রাকৃতিক পদার্থের গঠনবিধি সম্বন্ধে গবেষণা চালাইয়া কৃতকার্য হইবার পর তাঁহারা কয়লা, জল ও বায়ুর সংমিশ্রণে জটিল অণু সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পান এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর ব্যয় করিয়া ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে নাইলন নামে এক প্রকার কৃত্রিম স্ত্রতার আঁশ তৈয়ারী করেন। নাইলনের ভিতর অঙ্গার, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন বিশেষভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। ১৯৩৯ সনের শেষের দিকে প্রচুর পরিমাণে নাইলন প্রস্তুত করিবার জন্ত কলকারখানা স্থাপিত হয় এবং ১৯৪০ সনের মে মাসে সর্বসাধারণের নিমিত্ত নাইলন মোজা বাজারে বাহির হয়। ১৯৪১ সনে ভার্জিনিয়ায় আর একটি কল স্থাপিত হয়। ঐ স্থানে বৎসরে ৮০ লক্ষ পাউণ্ড নাইলন স্ত্রতা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১৯৪১ ও ১৯৪২ সনে ব্রুটেনেও দুইটি কল স্থাপিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক রেশম, পশম ও চুলের স্ত্রতা নাইলন হইল একটি প্রোটিন জাতীয় পদার্থ, যদিও উহাদের কোনটির সঙ্গেই নাইলনের সাদৃশ্য তত বেশী নয়। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, নাইলন হইল প্রকৃতির অমুকরণে প্রস্তুত প্রোটিন ঘটিত এক বিশেষ গুণসম্পন্ন পদার্থ। নাইলন নামটিও প্রয়োগ করা হইয়াছে ব্যাপক অর্থে, যেমন হইয়াছে কাচ, প্লাষ্টিক প্রভৃতির। নাইলন নানা আকারে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, গুঁড়ার আকারে, দ্রবণ আকারে, স্ত্রতার আকারে প্রভৃতি। এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রায় চারি শত প্রকারের নাইলন প্রস্তুত হইয়াছে।

যদিও অঙ্গার, জল ও বায়ুর সাহায্যেই নাইলন প্রস্তুত করা হয় তথাপি ইহার প্রস্তুত প্রণালী বিশেষ ভাবেই জটিল এবং বহুপ্রকার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইয়া থাকে। জটিল রাসায়নিক ক্রিয়াদি এবং যন্ত্রপাতির বিস্তৃত বিবরণ রাসায়নিক এবং নাইলন-বিশেষজ্ঞদের এলাকাভুক্ত। এখানে মোটামুটি কি ভাবে জল, বায়ু এবং অঙ্গারকে নাইলনে রূপান্তরিত করা হয় তাহা



সংক্ষেপে বলা হইতেছে। বায়ুমধ্যস্থ নাইট্রোজেন গ্যাস ও জলমধ্যস্থ হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়া এমোনিয়া তৈয়ারী করা হয়। অক্সার হইতে প্রথমে আলকাতরা এবং তৎপর ফেনল তৈয়ারী করিয়া বায়ুর অক্সিজেন সাহায্যে উহাকে এডিপিক এসিডে পরিবর্তন করা হইল। এইবার পূর্বোক্ত এমোনিয়া, জলমধ্যস্থ হাইড্রোজেন এবং এডিপিক এসিড মিলিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হেক্সামিথিলিন ডাই-এমিন-এ রূপান্তরিত হইল। এই ডাই-এমিন হইতে পাওয়া যাইবে নাইলন-বটত লবণ এবং তাহা হইতে উপযুক্ত প্রক্রিয়া সাহায্যে নাইলন পাওয়া যাইবে।

নাইলন স্বতন্ত্র এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে যাহার জন্ত বস্ত্র ও নানা প্রকার কাপড়ের নিমিত্ত ইহার ব্যবহার বিশেষ সুবিধাজনক। ইহার একটি গুণ হইতেছে যে, ইহাতে ছাতা ধরে না বা ভিজাইলে পচিয়া যায় না। ফলে যুদ্ধকালে ঐশ্বর্যপ্রধান দেশের জব্বলে খাতিরি রক্ষা করিবার নিমিত্ত নাইলন বস্ত্র ও জাল ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার স্থিতি-স্থাপকতা ও দৃঢ় সংলগ্নধর্মিতার জন্ত গেলি, মোজা প্রভৃতি তৈয়ারীর নিমিত্ত ইহা ব্যবহার সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, একই আয়তন বিশিষ্ট নাইলন

মোজা রেশমের মোজা অপেক্ষা দীর্ঘ স্থায়ী হয় এবং ব্যবহারও বিশেষ আরামদায়ক ও তাপরক্ষক। একমাত্র দু পছ কোম্পানীই বৎসরে ৪৫ লক্ষ জোড়া মোজা তৈয়ারী করিয়া থাকে। কৃত্রিম রেশমের বিশেষ অসুবিধা হইল যে, উহা ভিজাইলে স্বতন্ত্র দৃঢ়তা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, ফলে বেশী দিন স্থায়ী হয় না। কিন্তু নাইলন এ দোষমুক্ত। নাইলনের বিভিন্ন বস্ত্রখণ্ড সেলাই দিয়া জোড়া লাগাইবার প্রয়োজন হয় না; সামান্য উত্তাপ প্রয়োগ করিলে জোড়ার যুগ্ম আপনা-আপনি মিশিয়া যায়। তাহা ছাড়া রেশম বা তুলার তায় নাইলন সহজে অগ্নিপ্রজ্বলনশীল নহে। যুদ্ধকালীন কয় বৎসরে নাইলন দিয়া প্যারাসুটের দড়ি, জাল, সেলাইয়ের স্বতা, টুথ ব্রাস, চুলের ব্রাস প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। তবে নাইলন ব্যবহারে কোন কোন বিষয়ে যে অসুবিধা আছে তাহা অব্যাহার করা যায় না, বৈজ্ঞানিকগণ অবশ্য এই সমস্ত দোষ মুক্ত করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, বিলাত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কৃত্রিম রেশমের যুগ অন্তিমিত হইয়া নাইলন যুগের সুপ্রভাত নানা দিক দিয়া ঘোষিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

## কম্যুনিজম্ কোন্ পথে ?

### ত্রিশিশির মুখোপাধ্যায়

একটি মাত্র দেশে রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করেই প্রোলেটারিয়েট-বৈপ্লবিক যুগের অবসান ঘটেছে। সে বিপ্লব মূলগতভাবে মার্ক্সীয় নীতি অনুসারে, বিশেষ করে তার গঠনতাত্ত্বিক দিক অনুসরণপূর্বক অনুষ্ঠিত হয় নি। এমন কি প্রাথমিক অংশে মার্ক্সীয় বৈপ্লবিক পন্থাও অনুসৃত হয় নি। মার্ক্সীয় নীতি অনুসারে-যদি প্রোলেটারিয়েট বিপ্লব শক্তিসঙ্কর করত তা হলে তার স্বচনা হওয়া উচিত ছিল ইংলণ্ডে, যেখানে যন্ত্রশিল্পের ইমারৎ গড়ে উঠেছে। রুশ-বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে একটি চূর্ণটনা মাত্র—কয়েকটি আকস্মিক ঘটনার সংমিশ্রণেই তা সম্ভব হয়েছিল। বস্তুতঃ এ বিপ্লব ঐতিহাসিক ধৈর্যবাদের যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীকে অস্বীকার করে। অভিজ্ঞতার দ্বারা নির্ণীত ঐতিহাসিক প্রসারের নিশ্চিত ফল না হওয়ায় সে বিপ্লব জগদ্বাণী কোন অদূর বিপ্লবের ইঙ্গিত দিতে পারে নি। পক্ষান্তরে ১৯২১ সন থেকেই অত্যন্ত দেশে সে বিপ্লবের বিস্তৃতির পথ রুদ্ধ হয়েছে।

তখন থেকে রাশিয়াতেও সে বিপ্লবের ঝোড়ো হাওয়া

প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সমস্তার সমুদ্রীন হয়েই লেনিন আবিষ্কার করলেন যে মার্ক্স এ সম্বন্ধে কিছুই লেবেন নি। মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক রচনাবলী সবই সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা। ধনতন্ত্রবাদের শরীরব্যবচ্ছেদ নিয়েই ব্যাপৃত ছিলেন মার্ক্স—তার উদ্দেশ্য ছিল ধনতন্ত্রবাদের পরস্পরবিরোধিতা সাধারণের সামনে প্রকট করা। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—সময়ের স্রোতে পরস্পর বিরোধিতার টানাপোড়েনের বিপাকে ধনতন্ত্রবাদের বিরাট ইমারৎ ভেঙে পড়বে, আর সেই ভগ্নশূণ্যের মধ্যে থেকে জন্ম নেবে সর্বস্বামী সাম্যবাদ। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ তিনি করেছিলেন বটে, কিন্তু সাম্যবাদী পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করে যেতে পারেন নি। অব্যাদি নির্মাণের বিভিন্ন শক্তির প্রসারের দ্বারাই তা স্থিরীকৃত হতে পারত। ধনতন্ত্রবাদের শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্ত করতে পারে কেবলমাত্র সামগ্রিক বিপ্লব; তার পর ভবিষ্যৎ আপনা থেকেই তার পথ বেছে নেবে। অর্থনীতিবিদ বলে মার্ক্সের যা কৃতিত্ব

সে শুধু সমালোচকরূপে। তাঁর বিপুল পরিমাণ রচনার কোন স্থানে সামাজিক পরিকল্পনা বা অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে ইঙ্গিত নেই। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে-কোন পরিকল্পনাই “ইউটোপিয়া” ছাড়া কিছু নয়—এই ছিল তাঁর মত। “New Economic Policy” প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন যে, মাজের রচনায় সাম্যবাদী অর্থনীতি সম্বন্ধে একটি কথাও লিপিবদ্ধ হয় নি।

বিপ্লবোত্তর রাজনীতি সম্বন্ধেও মাজের কোন রচনা নেই। বুর্জোয়া শাসনের ভিত্তিমূলকে শিথিল করে দেওয়ার জন্ত তিনি প্রোলিটারিয়েট একনায়কের আদর্শের জন্ম দিয়েছেন। তারপর কি ঘটবে, কেমন করে বিপ্লবোত্তর সমাজকে রাষ্ট্রিক নীতি অনুসারে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করে শাসন করা হবে—সে প্রশ্নের উত্তর তিনি সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েছেন ইতিহাসের অজানা শক্তির হাতে। রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে যাবে—এই অলীক কথার সৃষ্টি করে তিনি রাজনীতির মূল কথাটি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। নতুন সমাজব্যবস্থায় পারস্পরিক অর্থনৈতিক সমতা সম্বন্ধে তিনি “এনার্কিষ্ট” আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন—“from each according to his ability, to each according to his need”—লেনিনের মতে এই আদর্শ ‘স্বার্থ স্বেচ্ছাচার’। ঠালিনের ব্যবস্থায় মার্ক্সীয় নীতিকে নিম্নলিখিত ভাবে রূপান্তরিত করা হয়েছে—“from each according to his ability, to each according to his work.” যদি মার্ক্সীয় নীতিকে ব্যর্থ স্বেচ্ছাচার বলা হয়, তা হলে তার রূপান্তরকে, যদিও মোটামুটি তাকে একই বিষয় বলে মনে হবে, একেবারে অর্থহীন বলা চলে না; বস্তুতঃ এর অর্থই নতুন সমাজব্যবস্থায় অসাম্য ও অসমবন্টনকে স্বীকার করা। কাজের মূল্যনির্ধারণের কোন উপযুক্ত মাপকাঠি নেই। যাদের হাতে রাষ্ট্রশক্তি তাঁরাই কেবলমাত্র সে মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে, এবং এখন তার ফল কি দাঁড়িয়েছে সে কথা সকলেরই জানা আছে।

রাশিয়ায় বিপ্লবোত্তর রাজনীতিক-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রনায়কদের ইচ্ছানুসারে করা হয়েছে। তাদের কোন লিখিত ভিত্তি নেই, মাজবাদের সঙ্গে সংযোগ অতি সামান্য। সুতরাং এই ব্যবস্থাদ্বয়কে সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রবাদী বলা অজায়। পঞ্চাশতের নতুন সমাজব্যবস্থা কেমন হবে মাজ তাঁর কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত না দেওয়ায় যে-কোন ব্যবস্থার ওপরেই খুশীমত লেবেল সঁটে দেওয়া চলে এবং কেউই প্রশ্ন করতে পারবে না যে, সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং সোভিয়েট অর্থনীতি সাম্যবাদী নয়। সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যে সংঘাত তাঁ-কাউকেই উৎসাহিত করতে পারবে না। এই হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতা আজ আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন স্বীকার করিয়েছে—বিশেষ

করে তাদের, যারা কেবলমাত্র ঘটনা-সংঘাতকেই প্রগতির ধারা বলে মানে না, যারা সেই সংঘাতের তাৎপর্য নির্ণয় করতে চায় বিচারশীলতাকে মাপকাঠি করে।

বর্তমান সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক বিপ্লব—কোনটা গ্রহণযোগ্য এখন সে প্রশ্ন অবাস্তব; এক দিকে বিকৃত অত্যাচারী বিলীয়মান-ধনতন্ত্রবাদের কদাকার বাস্তব রূপ—যার ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পেরেছে ফাসিষ্ট স্বেচ্ছাচার, আর অপরপক্ষে রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক সমতার বেদীতে স্থাপিত নতুন আদর্শ—এ দুয়ের মধ্যে বেছে নেবার প্রশ্ন ওঠে না। স্থির চিত্তে ভেবে দেখা উচিত এখন আমাদের চোখ ফেরাতে হবে কোন্ দিকে? আমরা অনুপ্রাণিত হব নতুন ব্যবস্থার আদর্শে অথবা চলতি সাম্যবাদের অভিনব বাস্তবতায়, বাকি আমরা কণীয়া সাম্যবাদ বলি।

পূর্বে সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে এই বেছে নেওয়ার সমস্তার সহজ সমাধান ছিল, কিন্তু বিপ্লবোত্তর যুগে বাধীন চিন্তা-শীল ব্যক্তিমাত্রেরই যে সমস্তার সম্মুখীন হয়েছেন তার সমাধান ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠেছে। কেবলমাত্র প্রচলিত সাম্যবাদই যে নৈরাশ্রের সৃষ্টি করেছে তা নয়, অভিজ্ঞতার ফলে সেই আদর্শই সন্দেহের উদ্বেগ করেছে। আমাদের বিচার্য বিষয় এই যে, তেমন আদর্শকে কি অনুসরণ করা চলে, আশীশরূপ ফল না পাওয়ায়, যে আদর্শের প্রতি সোপানে হাঁচট খেতে হচ্ছে? ওদিকে বর্তমান সমাজব্যবস্থা ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠেছে; এবং নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য সকলেই আজ মর্মে মর্মে অনুভব করছেন। এই ভাব-সংঘাত আজ প্রতি বিপ্লবী চিন্তাশীল মাজেরই মনে আলোড়ন তুলেছে, ফলে সাম্যবাদী আন্দোলনের আজ এক সঙ্কটকাল উপস্থিত।

তবু আজও অনেকে আশা নিয়ে প্রতীক্ষা করছে; প্রয়োজনীয়তার অজুহাতে অনেকে রুশীয় রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের নৈরাশ্রজনক বিফলতাকেও মেনে নিচ্ছে, ভাবছে অজানা দেশে বিপ্লবের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হয় তো সে বিফলতার বীজ আর থাকবে না। কিন্তু সেই ভাবী আশাবাদকে টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর হয় না, যখন দেখতে পাওয়া যায় যে, প্রতিক্রিয়াশীলতার দূষিত আবহাওয়ায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের সমস্ত সম্ভাবনা। সেই থেকে সুরূপ হয় আত্মজিজ্ঞাসা—অন্তরের অন্তরতম স্থল অনুসন্ধান করে দেখার পালা। তার ফলে আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে সে প্রভেদ দেখতে পাই, বাস্তব ও বিচারবুদ্ধিপ্রবণ দৃষ্টি-ভঙ্গীর সাহায্যে। এক দিকে দেখা যায়, সর্বপ্রাণী শক্তির আশাদীপ্ত বিশ্বাস, অপর দিকে নতুন সমাজব্যবস্থার সমতা—যা প্রোলিটারিয়েট নয় ভেমন অংশকে সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এবং স্বভাবতঃই

আন্দোলন হয়ে পড়েছে দুর্বল ; সে অংশের কাজ বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের পথ প্রশস্ততর করা নয়, তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ন্যূনতন “রুশ জাতীয় রাষ্ট্র” নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও সুবিধার জন্য যে-কোন পন্থা অবলম্বন বা যা কিছু করবে তাতেই অংশীদার হওয়া এবং এই জাতীয়-রাষ্ট্রই নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলে বিশ্বের সমক্ষে প্রচার ও দাবি করছে।

এই সঙ্কটের প্রথম আসামী হ'ল কম্যুনিষ্ট ইন্টারনেশন্যাল, আগামী বিশ্ববিপ্লবের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হবার জন্য যার জন্ম হয়েছিল। প্রাক-বৈপ্লবিক ও বিপ্লবোত্তর সাম্যবাদের সমস্যাগুলির পারস্পরিক বিরোধিতার ফলে সে প্রতিষ্ঠান টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে। শক্তি করায়ত্ত করে একমাত্র সাম্যবাদীদল রাশিয়ার কম্যুনিষ্টরা আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে দিকপালস্বরূপ হয়ে উঠল। অন্যান্য দেশের সাম্যবাদী দলগুলি যেচ্ছায় প্রাক-বৈপ্লবিক সমস্যাসমূহের সমালোচনা থেকে বিরত হ'ল—যদিও সেইসব সমস্যার গুরুভারে আজও তাদের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত। রাশিয়ার কম্যুনিষ্টরা কেবলমাত্র চলতি সাম্যবাদ নয়, সাম্যবাদী ধর্মোত্তর প্রভু বলে নিজেদের প্রচার করছে। অদৃষ্টপূর্ব বিপ্লবোত্তর চলতি শাসনব্যবস্থার যেচ্ছাপ্রণয়ন রাশিয়ার কম্যুনিষ্টদের মার্ক্সীয় বিধিব্যবস্থার যথেষ্ট ব্যবহারে শক্তি দিয়েছে। প্রথম প্রোলেটারিয়েট বিপ্লবের পর উক্ত শাসন-যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় সুবিসিধা বিশ্ববিপ্লবের পথে বাধারূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটিমাত্র দেশের সমাজ-তান্ত্রিকতা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের আদর্শ প্রচারে প্রবলতম অন্তরায় হয়েছে।

সোভিয়েট রিপাবলিক বাস্তব পক্ষে একটি জাতীয়-রাষ্ট্র—যদিও এক নতুন ধরণের—এবং এইজন্যই আন্তর্জাতিক শক্তি সঙ্ঘের ক্ষেত্রে রাশিয়া এসে পড়েছে একেবারে কেন্দ্রস্থলে।

রাশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জানতে পেরেছি যে, সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদ রাষ্ট্রিক ধনতন্ত্রবাদের এক ইচ্ছা ওপরে উঠতে পারে নি। রাশিয়ার সাম্যবাদী জাতীয়-রাষ্ট্র বর্তমান শোচনীয় বিধিব্যবস্থা রক্ষণের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে। দুই ধরণের জাতীয়-রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধিতা বিদূরণের কোন খোলা পথ নেই। যথা ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ এরা পরস্পরবিরোধী—যদিও আজকাল রাজনীতিতে পারস্পরিক শক্তিসম্মুখিতে সকল আদর্শই রাহগ্রস্ত হতে বসেছে। আজ এই দুই ধরণের জাতীয়-রাষ্ট্র পরস্পরবিরোধী দুটি বিভিন্ন শিবিরে তাদের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করেছে—সে বিরোধ বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লবের সম্বর্ধ নয়, সে বিরোধ আত্মরক্ষা এবং সুযোগ-সুবিধার বিরোধ, স্বার্থের সম্মুখিতা—যার ফলে পৃথিবীতে আজ জলস্থলব্যাপী আর একটি বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন। পৃথিবীব্যাপী সভ্যতা ও সংস্কৃতির আজ এক মহা-সঙ্কট কাল উপস্থিত, এই ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল হয়েছে। এ সঙ্কট পার হবার কি কোন পথ নেই? ইতিহাস কি সভ্যতার বৃকে আর একটি চিতাঘি-রেখা আঁকবার আয়োজন করছে?

যদি এই আসন্ন সঙ্কট পার হতে হয় তা হলে আমাদের সাম্যবাদী আদর্শের কাঁকিকে কাটিয়ে উঠতে হবে। মাহুঘের জানের উপর, তার শক্তির উপর আমাদের আস্থা রাখতে হবে, মানব-মনের সৃষ্টিশক্তিকে স্বীকার করতেই হবে। বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে কার্ল মার্ক্সের অদূরদর্শী ভবিষ্যৎ-বাণীর বিরুদ্ধে—নতুন সমাজসৃষ্টির অগ্রদূতেরা মনোনিবেশ করবেন সমাজগঠন-ব্যবস্থার ও সামাজিক পরিকল্পনার দিকে, এবং তাঁরা যুক্তির সঙ্গে পরিকল্পনাকে, ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক কল্যাণ ও প্রগতিকে মিলিত ও সংযুক্ত করে পৃথিবীতে নব যুগ আনয়ন করবেন।

## মেঘের গুহায় ঘুমায়েছে চাঁদ

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নির্জনে ঘনবনে

বিরামবিহীন নৃত্যের মত আশার স্বপন যত  
মৌনমাতাল হৃদয়ে আমার করে কোলাহল কত !  
ছিন্ন প্রহরে পথের প্রান্তে তোমারে পড়েছে মনে :  
পথে প্রেতায়িত দিগ-বুগুণ অবগুষ্ঠিতা রহে,  
খড়োত-ছাওয়া পল্লব দোলে যুহল গন্ধ বহে।  
বাণীহীন মোর অন্তর তলে প্রদীপের সম জলে  
অনাদিকালের কথা।

মেঘের গুহায় ঘুমায়েছে চাঁদ : ঝরা বকুলের বাধা

এই ভিজে রাতে করিতেছি অস্থব,  
ধেমি গেছে সব পৃথিবীর কলরব ;  
সময় সাগরতীরে  
আমি একা। রাজ্য করবীর সম ধীরে  
হুয়ে পড়ে স্থতি তব  
ঘোবন বায়ে। ভূমি নাই—মিছে অভিনয় অভিনব।  
কালের যাত্রা অনধিগম্য প্রাণের বিবর্তনে।

## পুস্তক - পরিচয়

**পাহাড়িয়া কাহিনী**— শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র। এস. কে. মিত্র. এণ্ড ব্রাদার্স, ১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

নানা দেশের নানা উপকথা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু আসামের পাহাড়ে পাহাড়ে খাসিয়া, লুসাই, গারো, মিকির, কাছাড়ীদের মধ্যে যে-সব রূপকথা প্রচলিত আছে তাহার সন্ধান এতদিন আমরা করি নাই। খাসিয়া জৈন্তিয়া লুসাই পর্বতের অধিবাসীরা আমাদের প্রতিবেশী। এই আদিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল জাগ্রত করিতে শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব-প্রকাশিত “বিচিত্র মণিপুর” এবং “আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী” সেই চেষ্টার ফল। ‘খাখা ও থাইবি’র উপাখ্যান “বিচিত্র মণিপুরে” সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। “পাহাড়িয়া কাহিনী”তে লেখক আসামের পার্বত্য জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রচলিত সাতটি গল্প সংকলন করিয়াছেন। চয়ন করিতে তিনি ইংরেজী পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন বটে, এ-সব গল্প কিন্তু সম্পূর্ণ অনুবাদ নয়। জৈন্তিয়া পাহাড়ের রাজধানী জোয়াইয়ে এবং অন্যান্য স্থানে আদিবাসী বন্ধুদের মুখে লেখক এই সব উপাখ্যানের অনেকগুলি শুনিয়াছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া তিনি রচনার মধ্যে সহানুভূতির সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। এই দরদ কাহিনীগুলিকে সত্যিই উপভোগ্য করিয়াছে। লোকসাহিত্য নৃত্বের একটি অঙ্গ। বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত উপকথাগুলির তুলনামূলক আলোচনা জাতিসমূহের মধ্যে বিচিত্র সম্পর্কের সন্ধান দেয়।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি সুন্দর এবং তথ্যপূর্ণ ভূমিকায় এই সব পার্বত্য আদিবাসীর পরিচয় দিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন, “এর তিনটি গল্প (মিকির উপাখ্যান ‘হারাটা কুর’র, কাছাড়ী উপকথা ‘রাজহংস-কুমারী’ আর গারো রূপকথা ‘সতী-সিংউইল’) পৌরাণিক রূপকথা হিসাবে অতি সুন্দর। এদের বিষয়বস্তু অতি প্রাচীন। দেবকল্পার সঙ্গে মানুষের প্রেম ও মিলন, বিচ্ছেদ, কচিং পুনর্গিলন এবং এই আশয় নিয়ে উপাখ্যান বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে।”

প্রত্যেকটি উপাখ্যানের উপক্রমণিকায় যে আদিম জাতির মধ্যে সে কাহিনী প্রচলিত গ্রন্থকার সেই জাতির পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই পরিচয় উপক্রমণিকাগুলিকে মূল্যবান করিয়াছে।

দুইটি মিকির, দুইটি কাছাড়ী, একটি গারো, একটি খাসিয়া এবং একটি লুসাই উপাখ্যান “কাহিনী”র মধ্যে সংকলিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি উপাখ্যানের মধ্যেই একটি বিশেষ মনোহারিত্ব আছে। রচনার গুণে এই কাহিনী-সংকলন শিশু এবং বয়স্ক পাঠক উভয়েরই মনোরঞ্জন করিবে।

রামরাম বসু, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী— সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৬, ৭, ৯। মূল্য এক টাকা।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য; রামকমল ভট্টাচার্য্য; জয় গোপাল তর্কালঙ্কার; মদনমোহন তর্কালঙ্কার; গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার; রাধামোহন সেন;

## রূপ ও রূপসী-

রূপের ঐখ্য বিধাতার দান; কিন্তু মানুষ সেই রূপের উৎকর্ষ সাধন করেছে প্রসাধন-বিজ্ঞানের সবুজ অনুরাগে। সামান্য রূপের অধিকারিণীরাও তাঁদের রূপ প্রস্তুতি করে তুলতে পারেন প্রকৃষ্ট প্রসাধনীর নিয়মিত সাহায্যে। এ বিষয়ে কালকোমিকের নির্বাচিত প্রসাধনী সম্ভার রূপচর্চা-কারিণীদের বিশেষ সহায়তা করতে পারে।

মার্গো সোপ \* রেণুকা পাউডার  
ক্যাষ্টরল \* লাবণি স্নো ও ক্রীম

ক্যালকাটা কোমিক্যাল



# ছায়া ছবির গান



বোসার্ট প্রোডাকসনের

‘প্রিয়ভাষা’

GE 7266

এসো আরো কাছে  
কুঞ্জের গুঞ্জন শোন ঐ

অজিত চট্টোপাধ্যায়

GE 7267

Good Evening

১ম ও ২য় ভাগ

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

GE 7268

স্বপ্নের এই বানুকা-বেলায়  
তোমার বিরহ (আধুনিক)

মজুমদার-স্বামী প্রোডাকসনের

‘সর্বস্বারা’

GE 7264

ও চাঁদ বদনী  
ফুল কলিরে কয়

GE 7265

সুন্দরী লো মাই  
হামরা দোনা জনে হাথ

এম, জি, পিকচার্সের

‘বিশ্ব বছর আগে’

GE 7277

কথাটি বলি না বে

GE 7278

মায়াজাল বুনছে মনে

GE 7279

একি দোলা লাগে প্রাণে  
হৃদয় দিয়ে কি পাব না

চিত্রবাণী লিমিটেডের

‘মহাকাল’

GE 7280

এ জীবনে সুখ যেন  
কে গো আমার মনের

GE 7281

পরীদেব জলসায়  
আমরা বেদের দল

এম পি প্রোডাকসনের

‘অনির্বাক’

VE 2553

কানন দেবী

সেদিন দুজনে হলেছিল বনে  
তোমায় সাজাব বতনে কুসুম রতনে



## কলস্রিয়া

প্রাচীন যুগের গান কোং লিঃ  
নিবাস: বোম্বে, দিল্লী, কলকাতা, কল্লং

CB/F.7/48



ব্রজমোহন মজুমদার; নীলরত্ন হালদার - সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ২, ১৩, ১৭। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের’ রচয়িতা রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩), বাঙালী-প্রবর্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র (১৮১৮ খ্রিঃ) ‘বাঙ্গাল গেজেট’র প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, প্রথম বাংলা অভিধানকার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬-১৮৫৪) এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিহরানন্দনাথ তীর্থধামী রূপে পরিচিত প্রসিদ্ধ তত্ত্বশাস্ত্রজ্ঞ নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের (১৭৬২-১৮৩২) চরিত্র প্রথম গ্রন্থখানিতে আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য (১৮৪০-১৯৩২) প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলীর পরিচয় আছে। দু-খানি পুস্তকেরই চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইয়াছে। নূতন সংস্করণে বহু নূতন উপকরণের সন্নিবেশ আছে। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা কিরূপ জনপ্রিয় হইয়াছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে চারিটি সংস্করণ প্রকাশেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

স্বর্ণাবর্ত গ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য। ডি, এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য ৩ টাকা।

প্রথমেই একটি মুসলমান চরিত্র লইয়া বইটি আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আগ্রহের সহিতই পড়িতে আরম্ভ করি, কিন্তু অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই নিরাশ হইয়া পড়িতে হয়। মুসলমান-সমাজের পারিবারিক জীবনের বাতাবরণ সৃষ্টি করার উপযোগী ভাষা এবং খানিকটা অভিজ্ঞতা দুই-ই

লেখকের আছে, কিন্তু উপস্থাসকে দাঁড় করাইতে হইলে যে মাত্রাজানের দরকার বর্তমান পুস্তকে সেটির অভাব আছে। একে উপস্থাসের গতি ঘটনা বা সংলাপের মধ্য দিয়া নয়, বর্ণনার মধ্য দিয়া—যাহাতে স্বভাবতই একটা রূপান্তর আসে, এর ওপর বর্ণনাও অবধা এত দীর্ঘ যে ধৈর্য রাখা দায় হইয়া উঠে। সমস্ত বইখানির মধ্যে মাত্র দুই জায়গায় ‘ইন্টারেস্ট’ একটু জমিয়া উঠিয়াছে—যেখানে কতকগুলি মতবাদ লইয়া বিতর্ক চলিতেছে এবং যেখানে কলিকাতার দাঙ্গার কথা আসিয়াছে; শেষ পর্যন্ত কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেও মাত্রাধিক্যের জন্ম ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

প্লটও নিতান্ত দুর্বল—টানিয়া বুনিয়া মেলানো। মাঝে মাঝে নাটকীয় বলক আনিবার চেষ্টা আছে—যেমন ধীর ও নীরার পিতৃগৃহ ত্যাগের মধ্যে; কিন্তু চরিত্রগুলি হৃদয়ঙ্গম হইয়া ফুটিয়া না ওঠায় এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির অভাবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

লেখকের উদ্দেশ্য ভাল—সাংসদায়িকতার উপরে মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সখ্য স্থাপন করা। কিন্তু উদ্দেশ্য ভাল হইলেও মুসলমান-সম্প্রদায়কে চটাইবার ভয়ে বা অনিচ্ছায় লেখক যে-ভাবে চরিত্র তথা ঘটনা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হিন্দু পাঠকের মনে পীড়া দিবে। এক শ্রেণীর লোক এ ব্যাপারটাকে উদারতা বলিয়া কাটাইতে চান, কিন্তু এমনও অনেকে আছেন যাহারা মনে করেন এটা হীন মনো-বৃত্তির পরিচায়ক—কাপুরুষতাজনিত তোষণ-নীতি।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র—

শ্রীদুর্গাদাস বসু, পৃষ্ঠা ৩৩, মূল্য ১।

কৃত্তিবাস রচিত

# সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

স্বনামধন্য ৩৮৮মানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

সুবিখ্যাত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকৃষ্ট

অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইল

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রসিদ্ধ অংশবর্তিত মূলগ্রন্থ অল্পসারে ৫৮৬ পৃষ্ঠায় হৃদয়স্পর্শ! ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের আঁকা রঙীন ঘোলখানি এবং এক বর্ণের তেজ্রিশখানি শ্রেষ্ঠ ছবি আছে। রঙীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিত্রশালা হইতে সংগৃহীত ছবির অল্পলিপি। অন্যান্য বহুবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্রাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রবি বর্ম্মা, নন্দলাল বসু, সারদাচরণ উকীল, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর, অসিতকুমার হালদার, স্বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র দে প্রভৃতির স্বনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত।

জ্যাকটেটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইন্ডিং মূল্য ১০।০, প্যাকিং ও ডাকব্যয় ১।

প্রবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতো এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতো পাইবেন। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে না। গ্রাহক নম্বরসহ সত্বর

আবেদন করুন! এই সুযোগ সর্বপ্রকার দুর্মূল্যের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না।

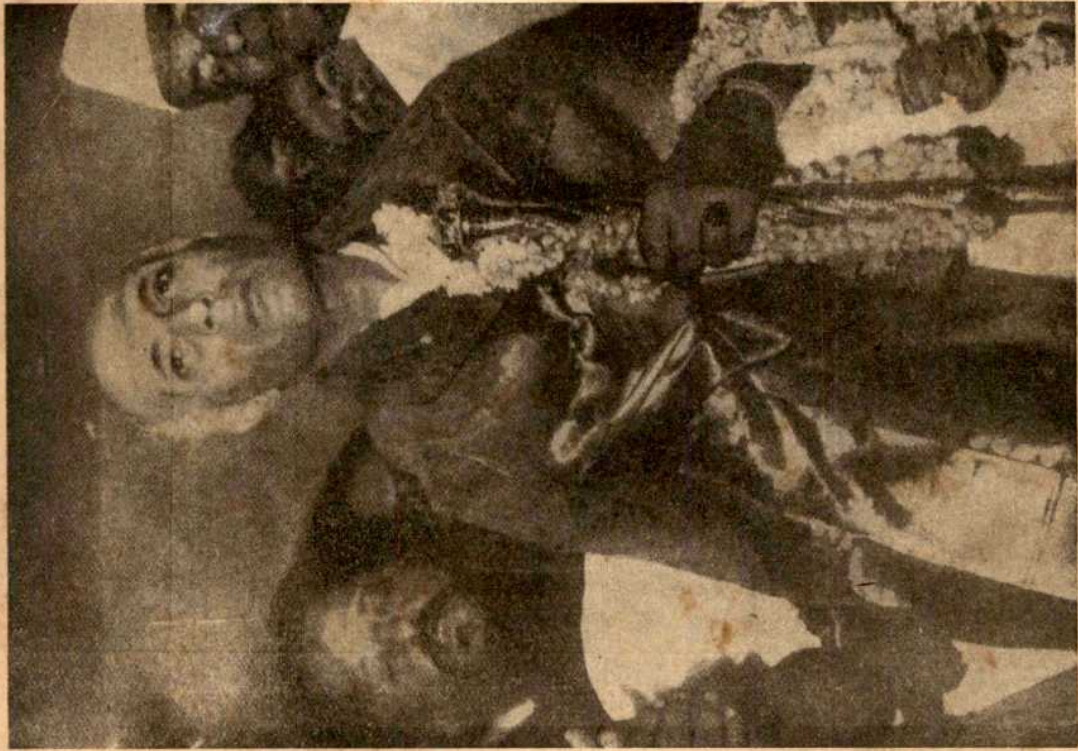
প্রবাসী কার্যালয়—১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

জগাই মাধাই  
শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

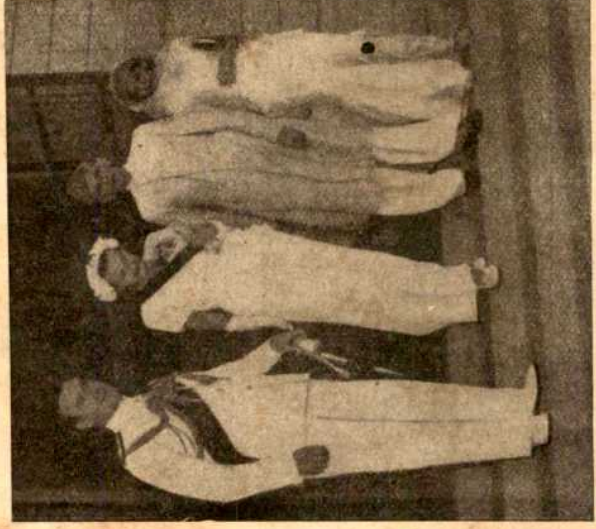




ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিবার পূর্বে সন্ন্যাসীগণ কর্তৃক  
পণ্ডিত মেহরুদ্র অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন



১৪ই আগষ্ট ( ১৯৪৭ ) ।  
ভারত-সম্রাটের শেষ বাণী  
পাঠিত লর্ড মাউন্টবাটেন  
—পাশে মিঃ জিন্না



করাচি ব্যবস্থা পরিষদ  
ভবনে জিন্না ও তাঁহার  
ভগ্নী এবং সঙ্গীক ভারতের  
শেষ বক্তৃতাটি

# প্রবাস

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্  
নামমাত্মা-বলহীনেন-লভ্যঃ”

৪৮শ ভাগ  
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৫৫

৫ম সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ

### স্বাধীনতার প্রথম বৎসর

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, সকল দেশ, সকল জাতি স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধবিগ্রহ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের পথই বাছিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। ইউরোপের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতির ইতিহাসেই অবিরাম অবিশ্রাম সংগ্রামের কথাই পাওয়া যায়। শত বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ (Hundred Years' War), ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ (Thirty Years' War)—ইহা ত বিখ্যাত। তাহা ছাড়াও বিরাট সমর-অভিযান, দ্বিবিজয় ইত্যাদির কাহিনী প্রত্যেক জাতির ইতিহাসের শত শত পৃষ্ঠা জুড়িয়া আছে। পরাধীন জাতি স্বাধীনতা অর্জন করিবে বিনা বলিদানে, বিনা ধ্বংস-বিপ্লব রক্তের প্লাবনে, ইহা জগতের ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় না। অথচ বিগত ১৯৪৭ সালের জুন মাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন বিভক্ত ভারতের স্বাধীনতার পরিকল্পনা দিলেন তখন আমরা সকলেই ভাবিলাম অসম্ভব সম্ভব হইল, বিনাযুদ্ধে, বিনা বলিদানে আমরা স্বাধীনতা পাইলাম। আমাদের কাহারও জীবনধারায় কোন বাধাবিঘ্ন আসিবে না, রূপকথার রাজপুত্র রাজকন্যার মত আমরা চিরস্থায়ী সুখ-শ্রোতে তরী ভাসাইয়া যাইব। এ কথা কাহারও মনে উদ্ভিত হইল না যে, স্বাধীনতা ও সংগ্রাম এই দুই বস্তু বাস্তবের রাজ্যে প্রায়ই অবিভাজ্য সংজ্ঞা জ্ঞাপন করে। অতীতের ইতিহাসে সল জাতিই সংগ্রামের পর স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, আমাদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পর সংগ্রাম আসিবে প্রভেদ মাত্র হইবে।

বস্তুতঃক্ষে স্বপ্নরাজ্যের বাহিরে সংগ্রামবিহীন স্বাধীনতার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। মনুষ্য জগৎ কেন প্রাণি-জগতের সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্বাধীন প্রাণীর জীবনমরণ, আহাৰ-বিহার সমস্তই একটা অবিশ্রাম সংগ্রামের মধ্যে চলে। বিনা যুদ্ধে আহাৰ্য্য সংগ্রহ, বিনা যুদ্ধে জীবনধারণ গৃহপালিত ভারবাহী বলিবর্ধই আশা করিতে পারে কিন্তু বনের স্বাধীন পশুও তাহা পায় না। অথচ সহস্র বৎসরের দাসত্বের ফলে আমরা স্বাধীনতার রূপ এমনই জুলিয়াছি যে আমরা নিঃসন্দেহে

বুঝিয়া লইলাম—বিনা রক্তপাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল হইতে যখন আমরা মুক্ত হইয়াছি তখন আমাদের সকল বিপদ-আপদের শান্তি হইল, অতঃপর আর কোনও ভাবনা আমাদের রহিল না।

সুখশান্তির এইরূপ অলীক স্বপ্ন কখনও কোথাও স্থায়ী হয় নাই, আমাদের ক্ষেত্রেও যে হইবে না ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আশ্চর্য্য এইমাত্র যে, আমরা এখনও বুঝিলাম না কেন এই ষড়-ষড় আসিল, কেন এই সুখের স্বপ্ন আলোর মতই বাস্তবের কঠোর রশ্মিতে মিলাইয়া গেল। বাহ্যিক আত্ম-অনুযোগ-অভিযোগের গগনভেদী আর্তনাদে ভারত-রাষ্ট্রের আকাশ মুখরিত করিয়াছেন তাঁহাদের চিন্তা করা উচিত যে যদি রাষ্ট্র-বিপ্লব ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইত তাহা হইলে আজ দেশের অবস্থা কত শত গুণ ভীষণতর হইত এবং তখন তাঁহাদের এই সকল চীৎকারের অবকাশই বা থাকিত কোথায় এবং তাহা শুনিতে চাহিতই বা কে। সত্য কথা—এই যে, আমরা স্বাধীনতার যোগ্যতা এখনও সম্যক অর্জন করিতে পারি নাই, এবং আমাদের মধ্যে এখনও দাসত্বের চিহ্ন পূর্ণধাত্রায় বিজ্ঞান রহিয়াছে। রাষ্ট্রের ক্ষতি করিয়া নিজেদের ও দলগত স্বার্থকামনা চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তি এখনও চতুর্দিকেই রহিয়াছে তাহার প্রধান কারণ এই, সহস্র বৎসরের দাসত্বের ফলে দেশের অধিকাংশ লোকেরই মনে এই ধারণা বজ্রমূল যে রাষ্ট্র যখন পূরের অধীন তখন তাহার ক্ষতি করিয়া নিজের লাভের পথ পরিষ্কার করাই সুবুদ্ধির পরিচয়। সেইজন্ত আজ ধনিক আরও ধনলাভের জন্ত রাষ্ট্রের সহিত ও ভারতের জনসাধারণের সহিত প্রবঞ্চক তরুরের ছায় ব্যবহার করিতেছে এবং অমিক দল বিশ্বাস-ঘাতক, বিদেশীর পঞ্চম বাহিনীর নায়কদিগের ছলনায় জুলিয়া ক্ষণিক লাভের আশায় নিজের ও দেশের সর্বনাশের স্বপ্নপাত করিতেছে।

আজ এক বৎসর হইল দেশ স্বাধীন হইয়াছে। এই এক বৎসরে দেশের অবস্থার যেটুকু পরিবর্তন হইয়াছে তাহাতে যে

নৈরাশ্র বা আক্ষেপের কোন কারণ নাই একথা বলা বাতুলতার পরিচায়ক ইহা সত্য। কিন্তু সেই নৈরাশ্র বা আক্ষেপের কারণ দূর করিতে বন্ধপত্রিকর হইয়া, সংগ্রামের জন্ত সর্বস্ব পণ করিয়া দাঁড়াইতে যিনি প্রস্তুত তাঁহার মধ্যেই স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা আছে এবং ভারত-রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা তাহারই হাতে। নৈরাশ্রবাদী ক্লীব, পরনির্ভার মুখর সুবিধাবাদী বা সংগ্রামবিমুখ ভাগ্য্যেষ্মী যাহারা তাহারাই স্বাধীন-রাষ্ট্রের বিপদের কারণ। নিজেরদের দুঃখকষ্ট মোচনের জন্ত যদি আমরা সম্পূর্ণভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া কর্তব্যে অবহেলা করি এবং নিজের অযোগ্যতা ও কৰ্ম্মবিমুখতা ঢাকা দিবার জন্ত কেবলমাত্র পরের নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হই, তবে আমরা সর্বনাশই ডাকিয়া আনিব এবং সেই সর্বনাশের কবল হইতে আমাদের কেহই রক্ষা করিতে আসিবে না একথা যেন আমাদের স্মরণ থাকে।

স্বাধীন ভারতের জন্মক্ষণ হইতেই চতুর্দিকে বিপদ-আপদ দেখা দিয়াছে। ভবিষ্যতে আরও ঘোরতর বিপদের আশঙ্কা আছে বলিয়াই পণ্ডিত নেহরু তাঁহার ১৫ই আগষ্টের বক্তার-বক্তৃতায় বলেন যে, “সংঘর্ষ চলিতেছে এবং ভারতে ও সমস্ত বিশ্বে ব্যাপক সংঘর্ষের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জমরবও রটিতেছে। আমাদের সর্বপ্রকার বিষম পরিস্থিতির জন্ত প্রস্তুত থাকিতে হইবে। জাতির সমুখে যখন বিপদ উপস্থিত হয় তখন নিঃশঙ্কচিত্তে এবং পুরস্কারের আশা না রাখিয়া জাতির সেবার আত্মোৎসর্গ করাই প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।” পণ্ডিত নেহরু বাহিরের বিপদের কথাই বলিয়াছেন, যাহার সম্ভাবনার সূচনা আমরা পাইয়াছি জিম্মার ১৫ই আগষ্টের ঘোষণায়। ঐ ঘোষণা হিটলার বা গোয়েবেল্‌সের বক্তৃতার অংশ বলিয়া মনে হইতে পারে, এমনই তাহার ধরণ-ধারণ। প্রতিবেশীর মনোরত্তির একপ প্রকাশ পরিচয় যেখানে পাওয়া যায়, যাহার নীতি ও প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কাশ্মীর ও হায়দরাবাদে, সেখানে বিপদের জন্ত প্রস্তুত থাকিতে হইবে প্রতিক্ষণে, প্রতিপদে। ভারত-রাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ বিপদের কথা বলিয়াছেন সর্দার প্যাটেল তাঁহার ১৫ই আগষ্টের বক্তার-বক্তৃতায়। তিনি অত্যাশ কথার মধ্যে বলেন, “এক সময়ে সকলেই মনে করিয়াছিল যে, এশিয়ার মধ্যে চীনই সকলের অগ্রণী হইবে। কিন্তু চীনে আজ গুরুতর অভ্যুত্থান বর্তমান। জগতের মধ্যে কোন রাষ্ট্রই চীনের মত এত জটিল ও সমস্তাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে নাই। তারপর মালয়, ইন্দোচীন এবং ব্রহ্মেরও আভ্যন্তরীণ অবস্থা আজ উদ্বেগজনক। ভারতেও বাহ্যতে সেইরূপ অবস্থার উদ্ভব না হয় তাহার ব্যবস্থা করাই ভারত-সরকারের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে কঠোর ব্যবস্থার প্রবর্তন করায় ভারতের জনসাধারণকে কিছুকালের জন্ত আংশিক ভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা অত্যাশঙ্কক

হইয়া পড়ে। দেশের অব্যাহতিদিগকে যদি অবিলম্বে কঠোর হস্তে দমন করা না হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার এশিয়ার অত্যাশ দেশের চায় ভারতেও বিশৃঙ্খলা ও অচল অবস্থার সৃষ্টি করিত।” আজও এই অচল অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা চলিতেছে প্রচ্ছন্নভাবে ছদ্মবেশী শ্রমিক-নেতার প্ররোচনায়। সমস্ত ভারতের, বিশেষতঃ বাংলাদেশের ছাত্র-সমাজের, এক বৃহৎ অংশ এই পঞ্চমবাহিনীর প্ররোচকদিগের কার্যক্রমের ফলে আজ উদ্ভ্রাণ ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া অবনতির পথে চলিয়াছে। অচিরে তাহাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় না হইলে তাহাদের অধঃপতন অনিবার্য।

কিন্তু রাষ্ট্রের অমঙ্গল ও অকল্যাণের প্রধান আশঙ্কা হইয়াছে কংগ্রেস কর্মী ও তাঁহাদের নেতৃবর্গের দ্রুত নৈতিক অধঃপতনে। আজ দেশের চতুর্দিকে ক্ষমতার লোভে ও অর্থলাভের লালসায় কংগ্রেসের নামে যে সকল দুর্নীতির প্রদর্শন দেওয়া হইতেছে কঠোর হস্তে তাহার প্রতিকার অত্যাশঙ্কক হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রের কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে সরবরাহ বিভাগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখানা বিভাগ এই দুর্নীতির মূল আকর। এই সকল বিভাগের সমস্ত কার্য-কলাপের অধিকাংশই সাধারণের দৃষ্টির আড়ালে হয় বলিয়াই উচ্চাতে এতটা ঘৃণ ও দুর্নীতির প্রদর্শন হইয়াছে। কেন্দ্র ও প্রদেশের রাষ্ট্রচালকগণ যদি সত্য সত্যই রাষ্ট্রের মঙ্গল কামনা করেন তবে প্রত্যেকটি কন্ট্রোল, প্রত্যেকটি “পারমিট” এবং প্রত্যেকটি এক্সেস নিয়োগ সাধারণের অবগতির জন্ত অবিলম্বে প্রকাশ করা প্রয়োজন, যাহাতে সাধারণে বুঝিতে পারে যে কোন বিভাগে কত অযোগ্য লোক, কত চোরাকারবারী রাষ্ট্রকে লুণ্ঠন ও প্রবঞ্চনা করার সুযোগ পাইল এবং কোন কংগ্রেস-ভেকধারীর অধঃপতন কতদূর অগ্রসর হইয়াছে।

### প্রথম বৎসরের হিসাব-নিকাশ

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিল। এই মুক্তির জন্ত দেশের ঐতিহাসিক সংহৃতিকে বলি দিতে হইল। তার ফলে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে ছুইটি রাষ্ট্রের পত্তন হইল— ভারত-রাষ্ট্র ও পাকিস্তান-রাষ্ট্র। এই বিভাগের কথা মনে করিয়াই পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বলিয়াছিলেন— স্বাধীনতা, রাজনৈতিক মুক্তি ত আসিল, কিন্তু সেই জন্ত আমাদের হৃদয়ে কোন আনন্দ নাই (there is no joy in our hearts)। ১৯৪৭ সালে ভারত-রাষ্ট্রের জন্মক্ষণে আনন্দোৎসবের মধ্যে যে নিরানন্দের ছায়া পড়িয়াছিল, ১৯৪৮ সালে বার মাস পরেও তাহা লুপ্ত হয় নাই।

এই অবস্থার জন্ত কোন ব্যক্তিকে দায়ী করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ যে অবস্থার তাড়নায় ভারতবর্ষের বুকের উপর



দিয়া কালি টানিতে হইল অন্ততঃ গত পঞ্চাশ বৎসর হইতে তাহার পটভূমি ত প্রস্তুত হইতেছিল। এই আয়োজনে ব্রিটিশ কূটনীতি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, এই কথা স্বীকার করিয়াও আমাদের কোন সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজের মনে একটা ভাব ছিল যে ধর্মবিধ্বাসে ও জীবন-যাত্রার দৈনন্দিন রীতিনীতিতে তাহারা প্রতিবেশী হিন্দু, শিখ, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সমাজ হইতে পৃথক। এই ভাব জমাট বাধিয়া উঠে যখন হইতে রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহাদের প্রভুত্ব ও প্রাধাত্যের অবসান হয়। পরদেশী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে স্বাভাবিক ক্ষোভ তাহাদের মনে দানা বাধিতেছিল তাহা ইংরেজের কৌশলে প্রতিবেশী সমাজের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রিত হইতে আরম্ভ হইল। লর্ড কার্জনের সময় যে বঙ্গবিভাগ করা হয়, সেই উপলক্ষে এই ভাবের একটা বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখিতে পাই। সেই সময়েই মুসলিম লীগের জন্ম হয় এবং তাহা স্বকীয় রূপ ধারণ করে ১৯৪০ সালে যখন লীগের লাহোর অধিবেশনে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূ-খণ্ডে পৃথক রাষ্ট্রে পত্তন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই প্রস্তাবানুযায়ী উপায় অবলম্বন করিবার জন্ত ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন সংগঠন করিবার কথা মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের মনে উদয় নাই, তাহারা প্রতিবেশী সমাজের বিরুদ্ধে আয়োজন-উদ্যোগ করিবার ব্যবস্থাই সহজ বলিয়া মনে করিল। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট কলিকাতায় ও তারপর নোয়াখালি-জিপুরায় অক্টোবর মাসে যে তাওব ও রক্তারক্তির স্রোত প্রবাহিত হইল, তাহার ফলে সারা ভারত-বর্ষে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইল। কলিকাতা, নোয়াখালি-জিপুরার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল বিহার ও যুক্ত-প্রদেশের পশ্চিমাংশে; পরে ইহারই প্রতিক্রিয়া হুদুদপ্রসারী হইয়া প্রকাশ পাইল পশ্চিম ও উত্তর পঞ্জাবে। বড়লট ওয়াভেলের কর্তৃত্বাধীনে যে মল্লিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল, তাহার অপদার্থতা প্রত্যক্ষ হইয়া পড়িল এই বিপর্যয়ের সময়; পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ছিলেন এই কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের সহকারী সভাপতি, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতবর্ষের শান্তিরক্ষা বিভাগের কর্তা। কিন্তু মুসলিম লীগ প্ররোচিত অরাজকতা দমন করিবার আয়োজন তাহাদের সাধ্যের বাহিরে ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ তাহা দমন করিবার ইচ্ছা বড়লট ওয়াভেলের ছিল না। এই নীতিগত বিপর্যয় ব্রিটিশ কূটনীতির কল্যাণে সৃষ্টি হইয়াছিল।

সুতরাং যখন ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখে বড়লট মাউন্টব্যাটেনের বিধানানুসারে ভারতবর্ষের বিভাগ স্বীকার করিয়া লওয়া হইল তখন লোক-নেতাদের মনে যে হতাশার ভাব দেখা দেয়, তাহা পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর কথার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পঞ্জাবের জনসাধারণ—হিন্দু-

মুসলমান-শিখ প্রতিবেশী-হত্যার প্রতিযোগিতায় এমন করিয়া মাতিয়া উঠিল যে ঐতিহাসিক যুগে তাহার তুলনা খুজিয়া পাওয়া কঠিন।

#### পাকিস্থানের প্রতিক্রিয়া

১৯৪৭ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসের তাওব মহাভারতে বর্ণিত যত্ন-বংশ ধ্বংসের কথা মনে করাহুয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণ আপন কুলের নরনারীর নানা দুর্গতি দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন দহুয়া যত্ন-নারীদের হরণ করিতেছে। আমরাও ইহা দেখিয়াছি। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর এই তের মাসে উত্তর-ভারত ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। মুঘল-পর্বের পরিণতি দেখিতে পাই ব্যাধ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ এবং তাঁহার দেহভ্যাগে। স্বজন হত্যা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাঁচিবার কি কোন সাধ ছিল? সেইরূপ আমাদের সামনে আর একজন মহাপ্রাণ মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন; ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি তাঁহার কামনা পূর্ণ হইল। বিনায়ক গড়সে নিমিত্ত মাত্র।

১৯৩৭ সাল হইতে দশ বৎসর মুসলিম লীগ হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার করিয়া যে জমি তৈয়ার করিয়াছিল, এবং তাহাতে যে বীজ বুনিয়াদ ছিল, তাহার ফসল ১৯৪৬-৪৭ সালে আমরা ঘরে তুলিয়াছি। ইহাই শেষ নয়। কান্দীর ও হায়দরাবাদ সমস্তা এই বিপদের প্রতি অঙ্গুলী-নির্দেশ করিতেছে। এই সমস্তা সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই যে পাকিস্থান রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এই বিষয়ে সক্রিয় ভাবে ভারত-রাষ্ট্রবিরোধী কার্যে উৎসাহ দিতেছে এবং নেহরু মল্লিমণ্ডলী তাহাতে বাধা দিবার জন্য ও লোকসমক্ষে এই কূচকের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিবার জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা সম্মত হইয়াছে। পাকিস্থানের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিসংঘের নিকট যে আরজি পেশ করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে দেশের মধ্যে একটা মতভেদের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া এইরূপ মনে হয় যে এই অভিযোগ উপস্থিত না করিলে যে ফল হইত, আজিও তাহা হইয়াছে। ভারত-রাষ্ট্র ও পাকিস্থান-রাষ্ট্রের মধ্যে একটা যুদ্ধ চলিতেছে। গতানুগতিক ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াও পাকিস্থান-রাষ্ট্র যুদ্ধে গোড়া হইতেই নামিয়াছে।

এত দিন পাকিস্থান-রাষ্ট্র নানা মিথ্যা কথা বলিয়া কান্দীরের উপর হানাদারদের বর্বর কার্যাবলীর সঙ্গে তাহার সম্পর্ক অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে এই দায়িত্ব সে এড়াইতে পারে না। এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে হানাদারেরা পাকিস্থান-রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া কান্দীর আক্রমণ করিতে দল বাধিয়া অগ্রসর হইয়াছে, পাকিস্থান-রাষ্ট্র তাদের বাধা দেয় নাই। এই অনিচ্ছার জন্ত আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে সে দোষী।

হায়দরাবাদ সমগ্র পাকিস্তান দাবীর অল্প একটা রূপ। মুসলমান বলিয়া নিজাম মীর ওসমান আলী খাঁ এক কোটি ত্রিশ লক্ষ হিন্দুর উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, এই দাবীর পিছনে বর্তমান যুগে কোন যুক্তি থাকিতে পারে, তাহা কেহই স্বীকার করিবে না। “ইন্ডোহাদ-উল্-মুসলিমিন” নামে পরিচিত যে প্রতিষ্ঠান ২৫।৩০ লক্ষ মুসলমানের পক্ষে যুদ্ধের পায়তারা করিতেছে, তাহারাও এই মনোভাবের স্বপ্নী। সুতরাং কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ প্রমাণ করিতেছে যে ভারতবর্ষকে দ্বি-খণ্ডিত করিয়া কোন লাভ হয় নাই। যে বিষ মুসলিম লীগ ছড়াইতে-ছিল, তাহার ক্রিয়া এখনও চলিতেছে, এবং কোন উৎকর্ষ চিকিৎসা না হইলে সেই বিষ সমাজ-দেহ হইতে দূর হইবে না। সেই চিকিৎসা অবিলম্বে আরম্ভ করিতে হইবে। এই সমগ্রায় জন-মন এমনি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে যে মন স্থির করিয়া কোন সংগঠনকার্যে হাত দিবার চিন্তা করিতেও পারিতেছে না। আত্মপর ভেদ-বুদ্ধি বিরহিত হইয়া একটা অক্ষম ক্ষোভে নিজের ক্ষুদ্রায়ুগি ক্ষুদ্র স্বার্থ-চিন্তায় দিন গুণিতেছে। এই অবস্থা চলিতে দিলে ভারত-রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলে যে সব আশার কথা ভাবিতেছে, তাহা সফল হইবে না।

ভারতের প্রধান শত্রু চোরাকারবারী

এই নিরাশার আরও অনেক কারণ আছে। ভারত-রাষ্ট্রে প্রকৃতিপুঞ্জের জীবন-মাত্রার নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থার ব্যাপারে যে বিপর্যয় দেখা দিয়াছে, তাহা নিবারণ করিবারও কি তাঁহাদের সামর্থ্য নাই বাহাদের হাতে শাসন-দণ্ড আজ চলিয়া গিয়াছে? গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে; কংগ্রেসের নেতৃবর্গ আজ শাসন-ব্যবস্থার কেন্দ্রে অবস্থিত; রাষ্ট্রের দণ্ড-যুগের কর্তা। সুতরাং রাষ্ট্রের সার্বভৌমতা বা ব্যর্থতার জন্ত কংগ্রেস নেতৃবর্গকে প্রশংসা বা নিন্দার ভাগ লইতেই হইবে। এই দায়িত্ব এড়াইবার উপায় নাই। সেইজন্য “ভাত-কাপড়ের” ক্ষেত্রে যে অব্যবস্থা দেখা দিয়াছে, তাহার জন্ত নিন্দা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রি-মণ্ডলীর প্রাপ্য। কংগ্রেসের ভ্যাগ, কংগ্রেস-নেতৃবর্গের বিভা-বুদ্ধি কৌশলের বড়াই করিয়া এই নিন্দার মুখ বন্ধ করা যাইবে না। ভারত-রাষ্ট্রের দরিদ্র সাধারণ আজ হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে যে স্বাধীনতার আগমন তার জীবনে কোনও পরিবর্তন আনিতে পারে নাই; তাহার প্রতিদিনের অভাব-অভিযোগের কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই। শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্যের নানা জটিলতা তাহার বুদ্ধিগ্রাহ্য না হইতে পারে; কিন্তু তাহার নিত্য-প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দ্রব্যের জন্ত তাহাকে স্বাধীন রাষ্ট্রে কেন একরূপ কাঙালের মত দিন কাটাতে হইবে, তাহার একটা কারণ আছে নিশ্চয়ই। যে জমি চাষ করিয়া শস্ত উৎপাদন করে সে হয়ত

তার উৎপাদিত দ্রব্যের জন্ত চারি গুণ মূল্য পাইতেছে; কিন্তু এই বর্দ্ধিত আয়ও তাহার অজ্ঞাত প্রয়োজনের মূল্য মিটাইতে পারিতেছে না। এক কাপড়ের ব্যাপারেই তাহার জুরবস্থা বিশেষ ভাবে দেখা হইতেছে, ইহা সর্বদাকীন চিত্রের একদিক মাত্র। এই কাপড়ের রাজার লইয়াই পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে যে স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ কাপড়ের উৎপাদক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর নিকট হারিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত জবাহর-লাল নেহরু এই কথা স্বীকার করিয়াছেন যে গত তিন-চার মাসে কাপড়ের উৎপাদক ও ব্যবসায়ী এক শত কোটি টাকা অজ্ঞায় লাভ করিয়াছে। একটা হিসাবে দেখিয়াছি যে আমাদের কাপড়ের ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে ৭৫ কোটি টাকা উত্তোলন করা হইয়াছে; এবং আয়কর ও বিক্রয়-কর বাবদ পঁচিশ কোটি টাকা রাষ্ট্রকে ফাঁকি দেওয়া হইয়াছে। অথচ এই অজ্ঞায়ের কোন প্রতিকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলী করিতে পারিলেন না।

এই সম্পর্কে কাশ্মীরের সেখ আবদুল্লাহ মন্ত্রিমণ্ডলীর ব্যবস্থায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর শিক্ষা লাভ করা উচিত। কাশ্মীরের চাউলের ব্যবসায়ীরা দেশের লোকের গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল। “খাল্লোদার” নামে পরিচিত এই শ্রেণী দেশের লোকের অর্দ্ধাচার ও অনাহারে অবিচলিত থাকিয়া চালের দাম মগ প্রতি ত্রিশ টাকায় তুলিয়াছিল। মন্ত্রিমণ্ডলীর কেহ কেহ ইহাদের “ধর্ম-কথা” শুনাইতে গিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন কাশ্মীরের সহকারী প্রধান মন্ত্রী ও স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রী বকসি গোলাম মহম্মদ তাহাদের “বুঝাইবার” ভার নিলেন। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীতে তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হইল; চাউলের দাম কুমাঈবার প্রভাবে তাহারা সম্মত হইল না। শেষ কথার জন্ত দশ মিনিট সময় দিয়া বকসি সাহেব অজ্ঞ ঘরে চলিয়া গেলেন। “খাল্লোদাররা” অটল। তাহার আদেশে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট লিখিয়া দিলেন। তখনও “খাল্লোদাররা” ভাবিল যে এ এক কৌতুক। পুলিশের গাড়ী আসিল, এবং তাহা চড়িয়া ছাপ্পান জন ভুড়িওয়াল। “খাল্লোদার” শহরের মধ্য দিয়া যাত্রা আরম্ভ করিল। শহরের কেন্দ্র-স্থানে পুলিশের গাড়ী থামাইয়া এক সভার অনুষ্ঠান হইল; শহরের লোক ইহাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় লাভ করিল। লক্ষ-পতিদের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কাহাকেও রুষ্ট হইতে দেখা গেল না। পনের দিন জম্মু প্রদেশের জেলখানায় বাস করিয়া ইহাদের সুবুদ্ধির উদয় হইল। আগামী ফসল হইতে চাউলের ব্যবসা “জাতীয়করণ” হইবে।

ভারত-রাষ্ট্রে চোরাকারবারী ও দেশের লোকের গলা-কাটা ব্যবসায়ীদের অভাব নাই। বকসি সাহেবের “দাওয়াই” তাহাদের প্রতি প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা কেন নেহরু মন্ত্রি-

মণ্ডলীর মনে উদয় হয় না, তাহা একটা রহস্য হইয়া আছে। সমাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী, রক্তশোষক এই শ্রেণী আজ বার মাস ধরিয়া স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের প্রজাপুঞ্জের জীবন দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের প্রকৃতি ও কার্য-কলাপ আজ কাহারও অবিদিত নাই। সহের সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে বলিয়াই “ইণ্ডিয়ান ফাইন্যান্স”-এর (সাপ্তাহিক) মত সংবাদপত্রও লিখিতে বাধ্য হইয়াছে যে অল্প দেশে ইহাদের রাষ্ট্রের শত্রু বলিয়া পরিগণিত করা হইত। এই পুঁজিপতিরা আমাদের জাতীয় সরকারের কার্যাবলী ভীতির চক্ষে দেখে; গোপনে তাহাদের বাধা দেয়। এদের নষ্টামি, সমাজদ্রোহিতা, সম্বন্ধ বিরোধ ভারত-রাষ্ট্রের নানা ব্যর্থতার জন্ত দায়ী; দেশের সংগঠন-চেষ্টা যে বানচাল হইতেছে তার জন্ত এই শ্রেণীর কার্যকলাপ দায়ী। “ইণ্ডিয়ান ফাইন্যান্স”-এর ১৯শে জুন তারিখে এই বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়।

“The attitude of Big Business in India to the National Government has been one of sullen suspicion, and frequently of covert hostility. It is the sinister and anti-social designs and the organised though veiled opposition of Big Business in India which must explain the failure of Government policies in many fields, and the tardy progress of their programmes in others. In any other country, conduct such as some of our businessmen have been guilty of, would be treated as nothing short of treason.”

ইহাদের নষ্টামিতে কংগ্রেস কর্মস্বন্দ পৰ্য্যন্ত “নষ্ট” হইয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ যুগের কর্মচারিবৃন্দ গত যুদ্ধের সময় কি করিয়াছিল, তাহা এত শীঘ্র ভুলিয়া যাইবার কথা নয়। পুঁজিপতিদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া ইহারা দেশের মধ্যে অসন্ততার শ্রোত বহাইয়াছিল। সেই পুঁজিপতিরা আজও আছে; সেই কর্মচারিবৃন্দ আজও তাহাদের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই দুই পক্ষের সঙ্গে কংগ্রেসের কর্মস্বন্দের এক বৃহৎ অংশ মিলিয়া-গিয়াছে। চোরাবাজারী, “পারমিট” বেচা, সরকারী কর্তৃক লইয়া হাত-চালাকী—এই ত্রয়ীর মিলিত শক্তি আজ দেশের সর্বনাশ করিতেছে। ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গ নিফল আক্ষেপ করিয়া দিন কাটাইতেছেন। বার মাসের মধ্যে তাহারা এমন কোন ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না যাহার ফলে চোরা-কারবারী দমন ও বিনষ্ট হয়, যাহার ফলে পুঁজিপতির রাফসী লোভ সংযত হয়, যাহার ফলে অসামর্থ সরকারী কর্মচারী শাস্তি পায়, কংগ্রেসকর্মী তাহাদের আদর্শ-পুত্র ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরিয়া পায়। আমাদের ভাবের রাজ্যে, চিন্তা-ক্ষেত্রে কোথাও কোন অসত্য ও অজ্ঞান আছে, যাহার জন্ত আমাদের নেতৃবৃন্দ তাহাদের স্বাভাবিক শক্তি হারািয়া ফেলিয়া-ছেন, যাহার জন্ত তাহারা গান্ধীজী-প্রবর্তিত সাধনা ও শিক্ষার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমাদের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত করা কম কষ্টদায়ক নহে। কারণ ইহা আমাদের দেশবাসীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের কলঙ্কের কথা, এবং কোন

সাংবাদিক নিজেদের দেশের লোকের কলঙ্ক কীর্তন করিতে পারে না। কিন্তু যে যুগ সঞ্জির সময়ে আমাদের কার্য করিতে হইতেছে, যে সময় বিপদের আশঙ্কার মেঘ আমাদের দেশের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, তখন দেশের লোকের নিরাশা এবং দেশ-নায়ক-বৃন্দের নিশ্চেষ্টতা ও অপারগতার কারণ আর তার ফলাফল বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার দায়িত্ব সাংবাদিকের।

### মধ্যবিভক্ত বেকার সমস্যা

মধ্যবিভক্ত বেকার সমস্যা বাংলাদেশে অতি মারাত্মক আকার ধারণ করিতেছে। গত এক বৎসরে ইহা আরও তীব্র হইয়াছে। অথচ বাংলা-সরকারের এদিকে একটুকুও দৃষ্টি নাই। পঞ্জাবের আশ্রয়প্রার্থীরা সকল সুযোগ ত পাইতেছেই এই সঙ্গে সরকারী চাকুরিতে তাহারা খুব বেশী সংখ্যায় ঢুকিয়া পড়িতেছে। তার উপর আছে মাদ্রাজী। বাংলাদেশে সরকারী চাকুরিগুলিও ইহারা দখল করিয়া লইতেছে। কেন্দ্রীয় আয়কর বিভাগের সঙ্গে প্রাদেশিক গবর্নমেন্টগুলির এই মর্মে একটা বোঝাপড়া আছে যে, যে-প্রদেশে আপিস সেই প্রদেশের লোক প্রাদেশিক আপিসে নিযুক্ত করিতে হইবে। তদনুসারে বাংলা-দেশের আয়কর বিভাগে বাঙালী নিযুক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি সম্প্রতি ঐ আপিসে প্রায় শতখানেক পঞ্জাবী ও মাদ্রাজী ঢুকিয়া গিয়াছে। শতখানেক বাঙালী মধ্যবিভক্ত পরিবার এইভাবে তাহাদের প্রাপ্য অন্ন হইতে বঞ্চিত হইল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটয়াছে। এই সব পদে নিযুক্ত হওয়ার উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন বহু লোক সিভিল সাপ্লাই বিভাগে অথবা বিনা কাজে বসিয়া আছে এবং কর্ম-হ্রাসের আশঙ্কায় ক্লিষ্ট হইতেছে। তাহার বাহিরে তো অজস্র লোক আছে। ইহাদিগকে বাহিয়া আয়কর আপিস, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে প্রভৃতিতে ভর্তি করা যাইতে পারে যদি বাংলা-সরকার এই কার্যের জন্ত একজন উপযুক্ত লোককে ভার দেন। আসানসোলের রেল কারখানায় লোক নিয়োগ কার্যটা এতদিন সেখানেই হইতেছিল। সম্প্রতি ঐ রিজুটিং আপিসটি যুক্তপ্রদেশে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ বাঙালীর কর্মপ্রাপ্তির ঐ পথটিরও দফা নিকাশ হইল। চাকুরি ভিন্ন অল্প কাজে বাঙালীকে সুযোগ দেওয়ার যে সব পথ আছে, অযোগ্য এবং স্বার্থপর লোকের হাতে পড়িয়া সেগুলিও কাজে লাগিতেছে না। কয়েক সপ্তাহ আগে মোটর ভেহিকল বিভাগ হইতে জনৈক অবাঙালীকে এক শত লরীর লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। এই লাইসেন্সগুলি এক শত জন বাঙালীকে ভাগ করিয়া দিলে এক শতটি পরিবারের অন্নসংস্থান হইত। এদিকে অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

### সরকারী দপ্তরে অপব্যয়

অবিভক্ত বাংলার তুলনায় এখন ব্যয়ভার বহু ক্ষেত্রে সমান

রহিয়াছে, অনেক স্থলে বাড়িয়াছে এবং কোনস্থানে কমে নাই। সরকারী অর্থ বিভাগ তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। অর্থ বিভাগের মূল নীতি এই যে, ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা সরকারের টাকাকে নিজের টাকা মনে করিয়া ব্যয় করিবেন এবং ঐ মনোভাব লইয়া সকল বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিবেন। স্বাধীন বাংলায় এই নিয়মটি অবহেলা করা হইতেছে। মাঝে মাঝে মিতব্যয়িতার ছই-একটা নমুনা যে না দেখান হয় তা নয়, তবে সেটা সর্বত্রই নিয়মিত কর্মচারীদের উপর দিয়াই যায়। মোটা বেতনের বড় বড় নুতন চাকুরি সৃষ্টিতে ইঁহারা বাধা দেন না। অর্থ বিভাগের নিজের কথাই ধরা যাক। এই বিভাগের সেক্রেটারী পদে আগে বাংলাদেশের সব চেয়ে অভিজ্ঞ এবং কর্মদক্ষ কর্মচারীকে বাছিয়া বাহির করিয়া নিযুক্ত করা হইত। মুসলিম লীগ আমলে অনেক বিভাগে অনেক কুকার্তি হইয়াছে, কিন্তু এই বিভাগটিকে কলুষিত করিতে তাহারা বিশেষ সক্ষম হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের পর এক বৎসরের মধ্যে সেক্রেটারিয়েটের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই বিভাগটিতে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে।

কর্মচারী সংখ্যার দিক দিয়াও অর্থ বিভাগে ব্যয়বৃদ্ধি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। সেক্রেটারীর সঙ্গে আবার এক জন সিভিলিয়ান পেশাল অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। তার উপর চার জন ডেপুটি সেক্রেটারী মোতায়েন আছেন; অবিভক্ত বাংলায় সাধারণতঃ এক জন সেক্রেটারী এবং এক জন ডেপুটি সেক্রেটারী কাজ চালাইতেন, কাজ বেশী পড়িলে বড় জোর অপর এক জন ডেপুটি সাময়িক ভাবে আনা হইত। এখন অর্থ বিভাগে এক জন ২৭৫০ টাকার সেক্রেটারী, এক জন সিভিলিয়ান পেশাল অফিসার আর এক-তৃতীয়াংশ বাংলায় চার জন ডেপুটি সেক্রেটারী। তাহার উপরে এসিষ্ট্যান্ট-সেক্রেটারী প্রভৃতি ত আছেনই।

লালদীখির দপ্তরখানায় ইংরেজ, মুসলিম লীগ এবং বর্তমান আমলের উচ্চপদস্থ কর্মচারী সংখ্যার তুলনামূলক হিসাব প্রকাশ পাইলে দেখা যাইবে যে, এখন মুসলিম লীগ আমলের চেয়েও বাংলাতে এক-তৃতীয়াংশ বেশী কর্মচারী রহিয়াছেন এবং ক্রমশঃই সংখ্যা আরও বাড়িতেছে। জেলা শাসন, পুলিশ প্রভৃতি ব্যয়বহুল এবং অনাবশ্যক কর্মচারীবহুল বিভাগগুলিতে উচ্চপদাধিকারীর সংখ্যা আরও বাড়িয়াই চলিয়াছে। উচ্চতম পদে অযোগ্যতম লোক নিয়োগের যে নীতি ডাঃ ঘোষ আরম্ভ করিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহার পরবর্ত্তী পদাধিকারীরা অতি যত্নের সহিত সেই পথেই চলিতেছেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অযোগ্য হইলে তাঁহাকে দুইটা এডিশনাল, তিনটা এসিষ্ট্যান্ট না দিলে কাজ চলে না; পুলিশ কমিশনার অপদার্থ হইলে তাঁহাকে অনেক বেশী সংখ্যায় ডেপুটি কমিশনার দিতে হয়।

অবস্থাটা সাধারণ ভাবে এই দাঁড়াইয়াছে যে প্রিয়পাত্র এবং পোষ্যবর্গের যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক, তাহাদিগকে উচ্চতম পদগুলি দিতেই হইবে। সমান পদে যোগ্য লোক দিলে ইহাদের অপদার্থতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে, সুতরাং উপযুক্ত লোকদের নিম্নপদে নানাবিধ অছিলায় দাবাইয়া রাখা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যাহাকে উচ্চতম পদে বসাইতে হইবে তাহার কর্মজীবনের মসীলিপ্ত এবং কলঙ্কমলিন রেকর্ডেও অগ্রবিধা হয় না; উপযুক্ত লোকদের সার্ভিস রেকর্ডে দোষ ধরা যায় না বলিয়া অত অছিলায় অর্থাৎ Confirmation আটকাইয়া রাখিয়া পরবর্ত্তী উচ্চ পদে প্রমোশন বন্ধ রাখা হয়। সমস্ত সরকারী বিভাগে এটা একেবারে সাধারণ নিয়মে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

### সমবায় ও মৎস্য বিভাগের ব্যর্থতা

সমবায় বিভাগ কৃষির প্রাণ। ইংরেজ আমলে এই বিভাগটিকে চিরকাল উপেক্ষা করা হইয়াছে। তাহার কারণও আছে। আলাউদ্দীন খিলজী মুখেও বলিতেন যে, হিন্দুদের দারিদ্র্যের চরম সীমায় যদি চাপিয়া না রাখা যায়, একটুখানি দম ফেলিবার সুযোগ যদি তাহারা পায়, তৎক্ষণাৎ তাহারা বিদ্রোহ করিবে। তিনি ট্যাক্স নির্ধারণ এবং আদায় এমনভাবে করিতেন যাহাতে হিন্দু পুরুষেরা মাঠের কাজের পর আর এক মুহূর্ত্ত সময় না পায় এবং স্ত্রীলোকেরা মুসলমান বাঙালীতে চাকুরি করিতে বাধ্য হয়। হিন্দুদের আর্থিক উন্নতির সমস্ত পথ তিনি কঠোর হস্তে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন খিলজী হিন্দুদের বেলায় যে নীতি প্রয়োগ করিয়াছেন, ইংরেজ সরকার হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলের উপর তাহাই চালাইয়া গিয়াছেন, শুধু মুখে কিছু বলেন নাই। ভারতের তিন-চতুর্থাংশ লোক কৃষিকীবী, ইহাদের অবস্থা সচ্ছল হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ টিকিবে না—ইংরেজ এটা খুব ভাল করিয়া জানিত; তাই কৃষি এবং সমবায় এই দুটি বিভাগকে তাহারা সর্বপ্রযত্নে উপেক্ষা করিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন হইয়াছে বটে, কিন্তু নুতন শাসকবর্গ এখনও কোট প্যাণ্টুলানের মোহ ছাড়িতে পারেন নাই; ইংরেজের ধারাতা এখনও অব্যাহতই রহিয়াছে। দেশকে বাঁচাইতে হইলে কৃষকের দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইবে, কৃষকের দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইলে কৃষি, সেচ এবং সমবায় বিভাগকে একমন একপ্রাণ হইয়া এক মহা উদ্বেগ সাধনের জন্ত একযোগে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। দপ্তরখানার কাইল ছাড়িয়া কৰ্ত্তাদের মাঠে নামিতে হইবে। বর্তমান কর্মচারীদের দ্বারা এটা হইবে না। কৃষি বিভাগের ভার দুই জন ভাগ্যান্বেষী এবং অক্ষম অবাঙালীর হাতে রহিয়াছে; সেচ বিভাগের কর্ম নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া হইয়াছে একটি অকর্মণ্য ও অক্ষম সিভিলিয়নের হাতে; এবং সমবায় বিভাগের রেজিষ্টার রূপে

বাঁহাকে শীর্ষদেশে বসানো হইয়াছে তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে—এইরূপ সরকারী ব্যবস্থা যেখানে, সেখানে কৃষির উন্নতি হইবে কিরূপে? লোক নাই এই বাঁধা বুলি আমরা শুনিতে প্রস্তুত নহি। বাংলাদেশে মানুষ নাই এটা একেবারে মিথ্যা কথা। মানুষ আছে, বুজিয়া বাহির করিতে হইবে।

কৃষি বিভাগ হইতে মৎস্য বিভাগ আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে কেন তাহার তাৎপর্য আমরা বুঝিলাম না। মৎস্য-মন্ত্রী গ্রীহেম নক্ষরের সহিত মাছের ব্যবসায়ের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে; এরূপ ক্ষেত্রে মৎস্যবিভাগ আলাদা করিয়া তাঁহার হাতে তুলিয়া দেওয়া হোক ইহা তো তিনি স্বভাবতই চাহিবেন। আমরা ইহার নিয়োগের পরেই লিখিয়াছিলাম যে এবার মাছের দাম ছয় টাকা হইবে। দাম যখন প্রায় পাঁচ টাকার কাছাকাছি পৌছিয়াছিল তখন নক্ষর মহাশয় মন্ত্রীর গদী হইতে বিতাড়িত হন। মাছের দাম অল্প দিনের মধ্যেই আড়াই টাকায় নামিয়া আসে। বেগতিক দেখিয়া কাকুতি-মিনতি করিয়া ইনি পুনরায় হারানো গদী ফেরত পাইয়াছেন এবং যথারীতি মাছের দর আবার হু হু করিয়া চড়িয়া চার-পাঁচ টাকা হইয়াছে। মাছের দর বৃদ্ধির একমাত্র কারণ দালালদের অতি লোভ এবং এটা সংযত করা আদৌ কঠিন নয়; তবে এর জন্ত নিঃস্বার্থ লোকের হাতে ভার দেওয়া দরকার।

### কলিকাতার পুলিশ ও বেঙ্গল পুলিশ

কলিকাতার পুলিশ অস্ত্রবিধেবে অকর্মণ্য হইয়া পড়িতেছে ইহা প্রতিজ্ঞনে প্রতিদিন অমুভব করিতেছেন। পুলিশ কাজে তৎপরতা না দেখাইতে পারিলেও বক্তৃতায় সক্ষম হইতেছে। কমিশনার প্রতি মাসে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করিতেছেন এবং পূর্বে গোয়েন্দা বিভাগের ও বর্তমানে হেড কোয়ার্টার্সের ডেপুটি কমিশনার ত্রিপ্রণব সেন পত্রিকায় সচিত্র প্রবন্ধ লিখিতেছেন। অপরাধ কিন্তু ইহাতে কমিতেছে না, বাড়িয়াই চলিয়াছে। জুলাই মাসের মধ্যে ১১২ জনের পকেট মারা গিয়াছে, ৯০ জন ধরা পড়িয়াছে; প্রকায় দিবালোকে সাইকেল চুরি হইয়াছে ৮৮টি, ধরা পড়িয়াছে ১৪টি; রাত্রে রাহাজানি হইয়াছে ২০১টি, ধরা পড়িয়াছে ৫২টি; ডাকাতি হইয়াছে ১৪টি, ধরা পড়িয়াছে ৭টি; বাড়ীর চাকর কর্তৃক চুরি হইয়াছে ১৫৫টি, ধরা পড়িয়াছে ৪৮টি। এইসব ধরা পড়া লোকের মধ্যে আসল অপরাধী কয়টি এবং চাকরি বাঁচাইবার জন্ত প্রেস্তারই বা কয়টি তাহা জানা নাই। ডাকাতি দমন বিভাগটি যত দিন ছোট ছিল তত দিন ভাল কাজ হইয়াছে; এখন উহার আয়তন অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাই ডাকাত ধরা পড়িতেছে না। যেগুলি ধরা পড়িতেছে তাহার মধ্যেও কিছু রহস্য আছে বলিয়া সন্দেহ হয়।

গত বৎসর শ্রাবণ মাসের “প্রবাসী”তে কলিকাতা পুলিশের লোক নিয়োগের সমালোচনা করিয়া আমরা দেখাইয়াছিলাম যে উহাতে পুলিশ অধঃপাতে যাইতে বাধ্য। ঠিক তাহাই হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি যে মন্ত্রী মহাশয়ের অস্ত্র কাজে ব্যস্ত থাকার অবকাশে বর্তমান পুলিশ কমিশনার নিজের দল পাকা করিতেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে কলিকাতার পুলিশবাহিনীর নিয়মশৃঙ্খলা ও কার্যোৎসাহকে (discipline and morale) জাহান্নমে দিয়া মহানগরীর সর্বনাশ করা হইতেছে সেটা কেহ দেখিতেছেন না। কলিকাতা পুলিশ ও বেঙ্গল পুলিশ একত্রীভূত করিয়া তিনি নিজের লোক আমদানী করিতেছেন এবং কলিকাতা পুলিশের অভিজ্ঞ ও সং কর্মচারীদের দাবাইয়া রাখিতেছেন। গ্রামের ও শহরের পুলিশ পৃথিবীর কোন দেশ কখনও একাকার করে নাই; কলিকাতায় ইহাই করা হইতেছে। শহরের অপরাধীরা চতুর, শিক্ষিত এবং বহু ক্ষেত্রে অর্থশালী। স্পেশাল ট্রিবিউনালের কয়েকটি মামলায় দেখা গিয়াছে যে অপরাধ করিবার সময়েই ইহার উকীল এবং অডিটার প্রভৃতির পরামর্শ লয়। ইহাদিগকে ধরিবার জন্ত যে পুলিশ দরকার তাহাদের উচ্চশিক্ষা ও অভিজ্ঞতা থাকা চাই। ইহাদের গ্রামে বদলী করা যেমন বোকামী, গ্রামের আনাড়ী পুলিশ সহরে আনিয়া তাহাকে দিয়া আধুনিক অপরাধী ধরাইবার চেষ্টা আরও নির্দুহিতার পরিচায়ক। গ্রামের অপরাধ ধরিবার জন্ত অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত লোক অল্প বেতনে নিয়োগ করিলেই যথেষ্ট। এই দুইটি একাকার করিলে সকলের দৃষ্টি থাকিবে কলিকাতার দিকে; না থাকিলে এ-আই-জি (ফোর্স) এর হেড ক্লার্ককে ঘুষ দেওয়ার প্রয়োজন থাকিবে না। শহরের পুলিশ পাঁচ বৎসরের পর গ্রামে বদলী হইয়া অজ্ঞিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ভুলিবে এবং গ্রামের পুলিশ কলিকাতায় বদলী হইয়া চোখ খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে বদলীর সময় আসিবে—এটা জানিয়াও ডাঃ বোষ এই বিচিত্র ব্যবস্থাটি করিয়া গিয়াছেন এবং বর্তমান পুলিশ-মন্ত্রীও উহাই আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন। থানার পুলিশকে দিয়া কোন কাজ হয় না, বাসার চাকরের চুরিটা পর্যন্ত কমিল না। অথচ এক্টি-রবারি, এক্টি-স্মাগলিং প্রভৃতি গালভরা নামের নূতন নূতন বিভাগ ক্রমেই বাড়িতেছে। গোয়েন্দা বিভাগ, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ, ডাকাতি দমন বিভাগ ও এক্টি-স্মাগলিং বিভাগ—একই ধরনের কাজের জন্য এই চারটি আলাদা বিভাগের প্রয়োজন কিসের? আমরা জানি এবং জনসাধারণও বিশ্বাস করে যে ত্রিপ্রণব মুখোপাধ্যায়ের উপর ভার দিলে এবং উপযুক্ত সহকারী দিলে এই চারটি বিভাগের কাজই তিনি একাই কৃতিত্বের সহিত চালাইতে পারেন।



## কলিকাতা পুলিশে দুর্নীতি

কলিকাতা পুলিশ ও বেঙ্গল পুলিশ একীকরণ সম্বন্ধে আমরা এই কৈফিয়ত শুনিয়াছি যে তাহা হইলে নাকি কলিকাতার মার্কিমারা অযোগ্য ও অসং কর্মচারীগুলিকে আরামবাগ পাঠানো যাইবে। কিন্তু কার্যকালে দেখিতেছি শশিকলার ছায় গত এক বৎসর যাবৎ এই শ্রেণীর কর্মচারীদেরই জীবিত হইয়াছে।

গত মাসে কলিকাতা পুলিশ এসোসিয়েশনস একটা সম্মেলন করিয়া প্রকাশ্যে এই বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে কলিকাতা ও বেঙ্গল পুলিশ একাকার করা বন্ধ করা হউক। পুলিশ-দুর্নীতিপরাগণতা বন্ধ করিবার জন্ত আগে আত্মীয় প্রেম ও আশ্রিতবাংসল্য বন্ধ করা হউক, তারপর অসাধু কর্মচারীদের বাহিয়া বাহিয়া বরখাস্ত করা হউক। এসোসিয়েশনের সভাপতি ত্রিশতোজ মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে গবর্ণমেন্টের বর্তমান নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া উহার প্রতিকার দাবি করেন এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীহিমাংশু গুপ্ত মূল প্রস্তাবগুলি উপস্থাপনকালে দুর্নীতির কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দেন।

এখন আমাদের পুলিশের যে অবস্থা লণ্ডন পুলিশের অবস্থা ১৮২৮ সালে ঠিক তাহাই ছিল। প্রধান মন্ত্রী পীল পুলিশ-সংস্কারে বন্ধপরিষ্কার হন এবং বাহিয়া বাহিয়া সং, শিক্ষিত এবং স্বাস্থ্যবান লোক উপযুক্ত বেতনে নিয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। কনেটবলের বেতনের শতকরা ২০ ভাগ বেশী পাইত সার্জেন্ট, ইনস্পেক্টরের বেতন তার দ্বিগুণ এবং সুপারিন্টেন্ডেন্টের বেতন চার গুণ। আমাদের দেশে কনেটবল ২৫ টাকা; সার্জেন্ট ও ইনস্পেক্টর ২৫০ টাকা এবং সুপারিন্টেন্ডেন্ট ১০০০ হইতে ২০০০ টাকা। পীল ৫০০০ পুলিশ কর্মচারীকে বরখাস্ত করিয়া এবং ৬০০০ জনকে পদত্যাগে বাধ্য করিয়া ৩০০০ লোকের একটি আদর্শবাহিনী গঠন করিতে সক্ষম হন। আমাদের পুলিশ মন্ত্রী ইহার সবই জানেন, আরও জানিবার ইচ্ছা থাকিলে সে সুযোগও তাঁহার রহিয়াছে, এই কাজে হাত দিলে দেশসুদ্ধ লোকের সহায়ত। তিনি পাইবেন ইহা বুঝিবার মত বুদ্ধিও তাঁহার আছে; তথাপি তিনি কমিশনার মহাশয়ের হাতের ক্রীড়নক হইয়া দুর্নীতির প্রদীপ দিয়া কলিকাতাকে অরক্ষিত শহরে পরিণত করিতেছেন কিসের মোহে এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?

## শাসন যন্ত্রে দুর্নীতি

পূর্ণ এক বৎসর হইল ভারতবর্ষ ইংরেজের দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। রাজনৈতিক হিসাবে দেশ এখন

স্বাধীন, কিন্তু এই স্বাধীনতা এখনও জনগণের অধিগত হয় নাই। নবভারতের নূতন শাসকবর্গ এক বৎসরের মধ্যে দেশের মূল সমস্যাগুলির কোন সমাধানই করিতে পারেন নাই। রাজনৈতিক সমস্যাগুলির মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল দেশীয় রাজাদের গুটাইয়া আনিয়া সর্দার প্যাটেল একটা মত্ত সমস্তার সমাধান প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছেন; বাকি রহিয়াছে শুধু ছায়দরবাদ। কান্দীর লইয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতির খেলা চলিতেছে। কিন্তু অল্প রাজনৈতিক সমস্তার মধ্যে দেশরক্ষার আয়োজন, সমরোপকরণ নির্মাণব্যবস্থা ও সামরিক শিক্ষা উপেক্ষিত হইতেছে। শিক্ষা সমস্তা সমাধানকল্পে এতদিন যতটা কাজ অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল, তাহাও হয় নাই।

অর্থনৈতিক সমস্তার সমাধানে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় গবর্ণমেন্টই সমান অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। এক দিকে দেশের মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র, চিনি, তেল, সাবান প্রভৃতি জীবনধারণের জন্ত অপরিহার্য সর্ববিধ দ্রব্যের অভাব এখনও তীব্র হইয়াই রহিয়াছে, অপর দিকে ঐ সব দ্রব্য চোরাই পথে পাকিস্থানে বিস্তারিত পরিমাণে চালান হইতেছে। ভারতের পশ্চিম ও উত্তর প্রান্তে পাকিস্থানের সহিত যে বিরাট ভূমি-সম্বন্ধ প্রাচীর উঠিয়াছে, তার মধ্যে এত বেশী রাজপথ রহিয়া গিয়াছে যে উহাদের ভিতর দিয়া দেশের অমূল্য সম্পদ বাহির হইয়া যাইতেছে। শুধু পাকিস্থানে গিয়াই যে এই সব চালান-থামিতেছে তাহা নহে, পাকিস্থান মারফত ভারতীয় দ্রব্যের চোরা কারবার পশ্চিম এশিয়ায় আরব রাজ্যসমূহ এবং পূর্ব এশিয়ায় চীন দেশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষে নিদারুণ কাপড়ের অভাব রহিয়াছে, অথচ চোরাপথে করাচী হইয়া কাপড় আরবদেশে এবং চট্টগ্রাম হইয়া চীন দেশে যাইতেছে। রেলকর্মচারী, পুলিশ এবং ভূমি-সম্বন্ধ কর্মচারিবৃন্দ এই চোরাকারাবারের সক্রিয় সহায়ক। রেলের ছাদের তক্তা সরাইয়া জলের ট্যাঙ্কে কাপড় ভর্তি করিয়া ঐ তক্তা আবার বসাইয়া যথারীতি রং করিয়া দেওয়া হইতেছে এরূপ ব্যাপারও ধরা পড়িয়াছে। রেলকর্মচারীদের সাহায্য ভিন্ন ইহা কখনও হইতে পারে না। কলিকাতায় শিয়ালদহ ষ্টেশনে ভূমি-সম্বন্ধ বিভাগের যে সব কর্মচারী মোতায়েন রহিয়াছেন তাঁহারা যথাসম্ভব চোরাকারবারের সুযোগ করিয়া দিতেছেন বলিয়া সংবাদপত্রে অভিযোগ হইয়াছে। রাজ্যের যে সব ট্রেনে জোর চোরাকারবার চলে সেগুলিতে তজ্জাসী বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ ভারপ্রাপ্ত অফিসার দিয়াছেন এরূপ সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু এ পর্যন্ত তাহার কোন প্রতি কার্য হয় নাই। যে সব সং কর্মচারী তজ্জাসী করিয়া কর্তব্যপালন করিতে চাহিতেছে তাহাদিগকে ইনি বাধা দিয়া রাখিতেছেন

এবং বিভাগ হইতে সরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। ভূমি-  
শুল্ক বিভাগের কালেক্টর এই অভিযোগ জানেন কিন্তু উহার  
প্রতিকারের কোন প্রয়োজন তিনিও অনুভব করেন নাই।  
মাকে মাকে বছরে কয়েক হাজার বা দু-এক লক্ষ টাকার মাল  
আটকের চমকপ্রদ সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে; এবং কোটি  
কোটি টাকার চালান যে ঘরা পড়িল না এই ঢকা নিনাদের  
ঘারা তাহা চাপা দেওয়া হইতেছে।

বাঁদ্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত  
বক্তৃতা অনেক হইয়াছে কিন্তু কাজ কিছুই হয় নাই। গত  
এক বৎসরের মধ্যে কোন বিষয়ে একটি স্থিতি পরিকল্পনা  
পর্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই, কাজ আরম্ভ হওয়া ত দূরের কথা।  
সুপরিচালিত ভাবে কাজ আরম্ভ করিতে হইলে শাসনযন্ত্রের  
দক্ষতা ও সততা ইতি অপরিহার্য। তাহার জন্ত সর্বশক্তি দিয়া  
তুর্নতি দমন আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই কাজটিও  
এখনো আরম্ভ হইল না।

### সেচ বিভাগে অবহেলা ও অক্ষমতা

সেচ বিভাগের কাজ সুপরিচালিত না হইলে কৃষির উন্নতি  
পদে পদে ব্যাহত হইতে বাধ্য। জল সরবরাহ এবং জল  
নিকাশ বাংলাদেশে এই দুইটাই সমান সমস্ত। এই সমস্ত  
সমাধানের যে স্বাভাবিক প্রণালীগুলি ছিল ইংরেজ আমলে  
সেগুলি ধ্বংস করা হইয়াছে। বাংলাদেশের এই মহা অনিষ্ট  
কিন্তুপে করা হইয়াছে তাহার বিস্তারিত পরিচয় বিশ্ববিখ্যাত  
সেচবিশেষজ্ঞ সার উইলিয়াম উইলকিন্স কলিকাতা বিশ্ব-  
বিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহাতেও  
গবর্নমেন্টের চোখ খোলে নাই। দামোদরের সহিত সংলগ্ন  
কাণানদীগুলি সমস্ত এলাকার জল সরবরাহ করিত এবং  
স্থানীয় লোকেরা নিজেরাই ঐগুলি সংস্কার করিয়া রাখিয়া  
জলের ব্যবস্থা করিয়া লইত। সেচ বিভাগের ইংরেজ  
বিশেষজ্ঞেরা কাণানদীগুলির মর্দ্ব বৃদ্ধিতে না পারিয়া  
ঐগুলিকে উপেক্ষা করেন। নদীনালা সংস্কারের ভার আন্ত-  
র্গামিকভাবে সরকারী সেচবিভাগের হাতে বাঁওয়ায় তাঁহারাও  
উহা করেন নাই, দেশের লোকেও করিবার সুযোগ পায় নাই।  
বাংলার বিচিত্র প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং বৈষয়িক সমস্তার  
সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত বিলাতী বিশেষজ্ঞেরা পুঁথিগত বিজ্ঞার  
জোরে উণ্টা রিধান দিয়াছেন, দেশের লোকের নিকট ঐ সব  
বিধান কার্যে পরিণত হইয়াছে এবং উণ্টা ফল ফলিয়াছে।  
বিলাতী বিশেষজ্ঞেরা তাঁহাদের বেতনের টাকা লইয়া দেশে  
কিরিয়া গিয়াছেন। দেশের চাষী শুকনা মাঠ চোখের জলে  
চষিবার চেষ্টা করিয়া সপরিবারে শুকাইয়া মরিয়াছে। সার  
উইলিয়াম উইলকিন্স তাঁর বক্তৃতায় এই কথাটাই বার বার  
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে বাংলার স্বাভাবিক যাহা কিছু  
ব্যবস্থা ছিল সেটিকে ধ্বংস করা হইতেছে এবং যে কাজটি

করিলে বাংলা বাঁচিয়া যায় ঠিক সেইটি বাদ দিয়া কোটি কোটি  
টাকা ব্যয়ে সহস্র প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে। বাঙালীর  
দারিদ্র্য এবং ম্যালেরিয়ার জন্ত এই বিপরীত বুদ্ধিই একমাত্র  
দায়ী। কৃষি বিষয়ে অভিজ্ঞ দেশপ্রেমিকরাও বার বার এই  
কথাই বলিয়াছেন যে, বাংলার শুভকর দাঁড়া প্রভৃতির  
জায় ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থাগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিলে  
এবং পুকুরগুলির সংস্কার করিলে কৃষির প্রভূত উন্নতি হইবে।  
প্রচলিত ভূমি আইনে পুকুরগুলিও ভাগ হইয়াছে, ভাগের  
পুকুরের মাছটা সকলেই চায় কিন্তু সংস্কারের টাকার  
কাহ্নেই বাহির করিতে চায় না। যে সরকার পুকুর সংস্কার করিবে  
সম্প্রতি তাহার হইবে এই মর্মে একটি আইন পাস করা হইয়া  
লইলে গ্রাম্য সেচ ব্যবস্থার অপরিমেয় উন্নতি হইবে।  
দামোদর খালের জায় ছোটখাট পরিচালনাও এখনই আরম্ভ  
হইতে পারে। বড় দামোদর কীম কবে কার্যে পরিণত  
হইবে তার জন্ত হাত গুটাইয়া বসিয়া না থাকিয়া এখন হইতে  
ছোটখাট কাজগুলি করিতে থাকিলে বছর দুয়েকের মধ্যে  
তার ফল পাওয়া যাইবে।

সেচ বিভাগে রাজনীতির প্রবেশ দেখিয়া আমরা  
আশঙ্কান্বিত হইয়াছি। এটা অল্পেরই বিনষ্ট হওয়া দরকার,  
নতুবা উহা দেশের লোকের পক্ষে একটি মহা অনিষ্টের কারণ  
হইয়া দাঁড়াইবে। খাজ লইয়া রাজনীতি যেমন যোরতর  
নিম্ননীয় কার্য, খাজোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচকার্যে  
রাজনীতির প্রবেশও তেমনি নিম্ননীয়। ক্যানিং অফিস সারেক-  
বাদের বাঁধ সরকারী সেচ বিভাগের অবহেলায় ভাঙিয়াছে  
এবং উহাতে বিস্তৃত ভাবে উর্বর জমি তিন বৎসরের মত নষ্ট  
হইয়া গিয়াছে; ইহা লইয়া আমরা বিস্তারিত আলোচনা  
করিয়াছি। এই বাঁধ ভাঙা ব্যাপার লইয়া একজন সুপরিচিত  
কর্মী আন্দোলন করেন এবং উহার প্রতিকারের চেষ্টা করেন।  
যে কর্মচারীদের দোষে বাঁধ ভাঙিয়াছে তাহাদের বিষয়ে  
কোনও তদন্ত হয় নাই। এখন গবর্নমেন্ট স্থানীয় লোকদের  
বলিয়াছেন যে একটি কমিটি গঠন করিয়া তাঁহারা ঐ সমস্ত  
লইয়া ভ্রমিতে কি করা উচিত তাহা নির্ধারণ করুন, তবে  
ঐ কমিটিতে তাঁহারা ঐ সুপরিচিত কর্মীকে লইতে পারিবেন  
না। এই আদেশের তাৎপর্য্য লোকে এই বুঝিয়াছে যে যদি  
কোনও বিশেষ কর্মীর চেষ্টায় স্থানীয় অধিবাসীরা বাঁধ ভাঙার  
জায় একটা মহাবিপদ ও তাহার বিষময় প্রতিক্রিয়া হইতে  
উদ্ধার পায় তবে আগামী নির্বাচনে ঐ এলাকা হইতে তাঁহার  
নির্বাচন আটকান যাইবে না; কলিকাতায় নবাবী করিয়া  
বাঁহারা ঐ এলাকা হইতে এককাল নির্বাচিত হইয়া আসিতে-  
ছেন তাঁহাদের পক্ষে সেখানে মুখ দেখান অসম্ভব হইবে।  
দেশবাসীর জীবন লইয়া এই শ্রেণীর রাজনৈতিক পাঁচ স্তর  
হইলে তাহা জাতির পক্ষে সমুদ্র অনিষ্টের কারণ হইবে।

### কৃষির উন্নতি

অন্নসম্ভার সমাধান করিতে গেলে কৃষির উন্নতিতে মন দিতে হইবে। এ বিষয়ে আলোচনা অনেক হইয়াছে, কাজ কিছুই হয় নাই। ১৯৪২ সালে ডাঃ এগরী ফসলবৃদ্ধি সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা দিয়াছিলেন, তদনুসারে কাজ হইলে এত দিনে অনেকটা ফল পাওয়া যাইত কিন্তু তাহাও হয় নাই। ফসল বৃদ্ধির নামে ভারত-সরকার বহু কোটি টাকা খরচ করিয়াছেন, তার প্রায় সবটা জলে গিয়াছে। তার পর বহু শত কোটি টাকার খাত আমদানী করিয়া দ্রুতক্ষ সামলাইতে হইয়াছে। ভারত-সরকারের ছায় বাংলা-সরকারের কাজ এ বিষয়ে সমান অক্ষমতার পরিচায়ক। কৃষির উন্নতির পক্ষে একটি গোড়ায় গলদ রহিয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ এটি একটি প্রাদেশিক বিষয়; তার পর কৃষির উন্নতির জন্ত কৃষি বিভাগ এবং সমবায় বিভাগ একসঙ্গে একই লোকের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়া উচিত কিন্তু বাংলায় উহা দুইটি আলাদা মন্ত্রীর অধীন। কৃষি বিভাগ হইতে মৎস্য বিভাগ আলাদা করিয়া উহাকে অপর একটি তৃতীয় মন্ত্রীর অধীনে দেওয়া হইয়াছে। সমবায় বিভাগ রাখা হইয়াছে পুনর্ব্বাসতি মন্ত্রীর হাতে; পুনর্ব্বাসতি লইয়াই ইনি ব্যতিব্যস্ত, সমবায় বিভাগের প্রতি নজর দেওয়ার ইঁহার সময় কোথায়? সেচ বিভাগটিও কৃষি মন্ত্রীর হাতে থাকিলে ভাল হয়; এতটা কাজ এক জনের উপর দেওয়া হয়ত অসুচিত বোধ হইতে পারে, কিন্তু এটা ঠিক যে কৃষি সমবায় এবং মৎস্য বিভাগ গ্রাম্য অর্থনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন কর্ম্মী লোকের হাতে না দিলে কৃষির উন্নতি পদে পদে ব্যাহত হইতে বাধ্য। বাংলা-দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, ডাঃ বোষ কৃষি বিভাগের শীর্ষদেশে দুইটি ভাগ্যান্বেষী এবং বাংলার কৃষিবিষয়ে অজ্ঞ অবাঙালীর উপর ভার চাপাইয়া দিয়া গিয়াছেন; বর্তমান মন্ত্রীসভা উহাদিগকে সরাইয়া না দিয়া এখনও বহাল রাখিয়াছেন। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় যে যুক্তপ্রদেশের কৃষিবিভাগ সংগঠন করিয়াছেন কৃষি বিষয়ে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ এমন একজন বাঙালী হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও এবং তিনি বিনা বেতনে বাংলার কৃষি বিভাগে সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও বাংলা সরকার তাঁহাকে কাজে লাগাইতে পারিলেন না। ইঁহার নাম ঐপ্রমোদকুমার দে; যুক্তপ্রদেশে ডাঃ কাটজুর অধীনে ইনি কাজ করিয়া অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বাংলার খাতসমস্ত সমাধান করিতে হইলে প্রমোদবাবুর ছায় লোকেরই দরকার; শিক্ষা, ভান প্রভৃতির কর্ম্ম নয়। ঐশ্বরীল দেব ছায় যে সব সিভিলিয়ানের উপর কৃষি বিভাগের উন্নতির ভার অর্পিত হইয়াছিল তাঁহারাও কিছুই করিতে পারেন নাই। এবার উপযুক্ত লোক আনা দরকার। কৃষি বিভাগে আজ কাঁচা পরমা আছে, স্তবরাং এখানে মধুলোভী মক্ষিকার ভীড়

হওয়া আশ্চর্য নয়। এই চাকরী অবিলম্বে ভাড়া দরকার। আলুর বীজ লইয়া গত বৎসর এবং এ বৎসর যাঁহা হইয়াছে ও হইতেছে তাঁহা ঐ বিভাগের অশেষ গলদের কিছু পরিচয় স্মৃতিত করিতেছে।

### পশ্চিম বাংলায় সামরিক শিক্ষা

পশ্চিম বাংলার গবর্নমেন্টের একটি প্রচার বিভাগ আছে। এই প্রদেশের সামরিক শিক্ষার সফলতা বা অসফলতা সম্বন্ধে তাহাদের কোন বিরূতি পড়িয়া ব্যাপারটি বুঝা যায় না। বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষী বাহিনী দলের শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের এই অভিযোগ প্রযোজ্য। কাঁচড়াপাড়া শিক্ষা-শিবিরে পশ্চিম বাংলার পূর্ব প্রান্ত নিবাসী কতজন শিক্ষা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কতজন শেষ পর্যন্ত টিকিয়া রহিল, এই সম্বন্ধে এই বিভাগ নীরব। অথচ আমরা দেখিতেছি, বাহিরের লোকে এই বিষয়ে বেশী খবর রাখেন; নব-বঙ্গ সমিতির সভাপতি ডাঃ এস, কে, গাঙ্গুলী বলিতেছেন যে ৭০২ জন লোক ভর্তি হইয়াছিল শিক্ষা শিবিরে, তাহার মধ্যে ৩৪০ জন টিকিয়া-ছিল শিক্ষা শেষ করিবার জন্ত। এই অবস্থার কারণ সম্বন্ধে ডাঃ গাঙ্গুলী নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :

প্রথম অবস্থাতেই আংশিকভাবে সময়মত খাদ্যব্যাতির অভাবের জন্ত এবং অংশতঃ কোন একটি মহলের অপপ্রচারের ফলে শতকরা প্রায় ৫০ জন শিক্ষার্থী শিবির পরিত্যাগ করে। অবশিষ্ট শিক্ষার্থীগণের অধিকাংশই নদীয়া জেলাভূক্ত।

এই সংবাদ পড়িয়া মনে হয় যে পশ্চিম বাংলার গবর্নমেন্ট এই শিক্ষা ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম যে তাঁহার এক বৎসরের মধ্যে পশ্চিম বাংলার প্রান্তবাসী গ্রামাঞ্চলের লোকদের মধ্যে ৬২০০ জনকে রক্ষী বাহিনীর উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া দিবেন। এই ঘোষণা অস্বল্প চেষ্টা করা হইতেছে কি না তাহা দেশের লোকের জানা প্রয়োজন।

ইংরেজের আমলে বাঙালীকে “অসামরিক জাতি” বলিয়া সামরিক বিভাগ হইতে দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছিল, এবং আমরা মাথা খাটাইয়া বা কলম পিষিয়া রাষ্ট্রের সেবা করি বলিয়া সামরিক বিভাগের কর্তৃপক্ষের মনে এই ভাবটা বিজ্ঞান বলিয়া শুনিয়াছি। বাংলাদেশ হইতে সৈন্যধ্যক্ষ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সৈন্য পাওয়া যাইবে না—এই ধারণার বশবর্তী হইয়া নাকি তাঁহারা তাঁহাদের রংরঙ-নীতি নিয়ন্ত্রিত করিতে-ছেন। না হইলে দক্ষিণ-ভারতে মেলা বসাইয়া, ঢাক ঢোল বাজাইয়া লোক সংগ্রহের ব্যবস্থা চলিতেছে আর বাংলাদেশে এই কার্য চলিতেছে নিভৃত্তে কোন আপিসে বসিয়া। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে ভারত-রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্ট ইংরেজ আমলের জের টানিয়াই চলিবেন যদি না পশ্চিম বাংলার

গবমেণ্ট এই বিষয়ে সক্রিয় হইয়া কেন্দ্রীয় গবমেণ্টকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলেন। আমাদের বিশ্বাস যে বাংলাদেশে আংশিক ভাবে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে, দেড় শত বৎসরের অনভ্যাসের শৃঙ্খল আমরা ভাঙিতে পারিব না। পশ্চিম বাংলার গবমেণ্ট প্রদেশের বিশেষ অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া কেন্দ্রীয় গবমেণ্টের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিতে পারেন।

এই বিষয়ে বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী একেবারে নিশ্চেষ্ট তাহা আমরা বলিতে চাই না। ১৮ই শ্রাবণের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রধান মন্ত্রীর একটি বিবৃতি দেখিলাম। তিনি বলিয়াছেন যে হিজলীর নিকটে একটি পরিত্যক্ত বিমান ঘাটিতে আবাসিক সামরিক শিক্ষা কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার একটা কল্পনা তাঁহার মাথায় খেলিতেছে; এই কলেজটি আজমীর, রাজপুতানা, বাঙ্গালোর (মহীশূর) ও খিলার (পূর্ব পঞ্জাবের) অনুরূপ করিবার চেষ্টা হইবে। এই প্রস্তাবের মধ্যে বাংলায় সামগ্রিক সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন মিটাইবে না; সেনাধ্যক্ষ তৈয়ার করিবে। কিন্তু বাংলার সৈনিক বাহিনী কোথায়? যে দুই ব্যাটেলিয়ন সংগ্রহের ও শিক্ষার পরিকল্পনা চলিতেছে, তাহার মধ্যে “জাত” বাঙালী কতজন থাকিবে, তাহা আমরা জানি না। প্রান্তিক রক্ষীবাহিনী দল প্রকৃতভাবে গঠন করিতে পারিলে, কিছু ভরসার কথা ছিল। কিন্তু এই বিষয়ে যে নীতি অনুসরণ করা হইতেছে, তাহার ফলে সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। পশ্চিম বাংলাকে স্পষ্ট জানাইতে হইবে এই বিষয়ে তাহার অভাব কোথায়।

দেড় শত বৎসরের অনভ্যাস এই বিষয়ে আমাদের শরীর মনকে অনড় করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার প্রতিষেধ চাই। ইহার প্রয়োগে কে অগ্রণী হইবেন—গবমেণ্ট, কংগ্রেস, না নুতন কোন প্রতিষ্ঠান? গবমেণ্ট তাঁহার “লালকিতা”র চালে চলিতেছেন, পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস যে কি চিহ্ন তাহা “বঙ্গীয় রক্ষী বাহিনী”র ব্যর্থতায় প্রমাণিত হইয়াছে। ডাঃ প্রফুল্ল বোষের মন্ত্রিসভা নৈষ্ঠিক গান্ধিবাদী সাজিয়া এবং প্রদেশপাল ত্রীরাঙ্গাপালাচারী ঐ ভাবের ভারুক বা দার্শনিক বলিয়া এই বিষয়ে বিশেষ কিছু করেন নাই। কংগ্রেস দলাদলি করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছে; সামরিক শিক্ষার মত অত্যাৱশ্যক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিবার তাহার সময় ছিল না। ডাঃ বিধান রায়ের মন্ত্রিমণ্ডলী এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন এবং নুতন প্রদেশপাল ত্রীকৈলাসনাথ কাটজু দার্শনিক নহেন এইমাত্র ভরসা। কিন্তু “অসামরিক জাতি” বলিয়া যে কলঙ্ক ইংরেজ আমাদের কপালে দাগিয়া দিয়াছিল, তাহা কেবলমাত্র সরকারের চেষ্টায় মিলাইয়া যাইবে না। ধাঁহারা দলাদলির উর্ধ্বে থাকিয়া, এই কার্যে অনমন্যমান হইয়া খাটিতে পারিবেন, তাঁহাদের প্রতীক্ষায় আমরা বসিয়া আছি। তাঁহাদের আবির্ভাব সহজ ও সুগম

করিবার জন্য আমরা মাসের পর মাস এই বিষয়ে কথা বলিয়া যাইতেছি। আমাদের সহযোগিতা তাঁহাদের জন্য অব্যাহত হইয়া আছে।

### বাঙালীর ভবিষ্যৎ

ত্রীধুর্জটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লক্ষ্যো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ভার তাঁহার উপর। তিনি চিন্তাশীল লেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বোম্বাই-এর “নিউ ডেমোক্রেট” (New Democrat) সাপ্তাহিক পত্রিকায় তিনি বাংলা ও বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই উপলক্ষে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে তিনি নিরাশার কথাই শুনাইয়াছেন। ভারত-রাষ্ট্রে বাঙালীর কোন বিশিষ্ট স্থান আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী নব-ভারতের সংগঠনে অগ্রণী হইতে পারে; কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে তাহার সেই শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। ব্যবহারিক জীবনে অল্প প্রদেশের লোকেরা বাংলাদেশেই তাহাদের কোণঠাসা করিয়া ফেলিয়াছে। এবং নিজের দেশে নিজের আসন অটল রাখিতে পারে নাই যে সমাজ, সর্বভারতীয় সমাজে তাহার কোন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে তাহার কোন শক্তিতে। বরং তাঁহাদের একটা সাংস্কৃতিক অভিমান আছে, বাহা অল্প প্রদেশের লোককে আঘাত করে; প্রতিদানে লাভ হয় তাহাদের বিরূপ ভাব। ইহাই হইল অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের প্রতিপাত্ত বিষয়।

এই প্রবন্ধ কয়টি পড়িয়া একটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগিয়াছে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নহেন বলিয়া আমরা জানি। সুতরাং তিনি বিংশ শতাব্দীর বাঙালীকে শ্রদ্ধা করিবেন, তাহা মনে করিবার কারণ নাই। কিন্তু তিনি যে পর্যালোচনার ফল বোম্বাইয়ের সাপ্তাহিক পত্রিকায় বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে কোন সত্য বস্তু থাকিলে বাঙালীকেই তাহা প্রথম শুনান উচিত ছিল। তাহা তিনি কেন করেন নাই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। সমাজবিজ্ঞানীর চক্ষু সমাজের দুর্বলতার উপরেই প্রথমে পড়ে। এরূপ দুর্বলতার বিবরণ প্রদানের এক মাত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে যে উদ্দিষ্ট সমাজ নিজের চেষ্টায় নিজের দুর্বলতা দূর করুক; নিজেকে সুস্থ করিয়া তুলিবার দায়িত্ব গ্রহণ করুক। বাঙালী হইয়াও অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের বর্তমান বাংলা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অতি সামান্য, কেননা বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে তিনি সরেক্ষমিত্তে এ বিষয়ে লেশ-মাত্রও অনুসন্ধান করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই। অল্প দিকে তিনি দূরে থাকিয়া আমাদের অনেক ক্রটিবিচারিত দেখিতে পান ইহাও ঠিক। কিন্তু তৎসম্বন্ধে, তাহার কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে, আমাদের সাবধান করিবেন, এরূপ

প্রত্যাশাই আমরা করিয়া থাকি। তাহা তিনি করেন নাই কেন?

### পূর্বাচল প্রদেশ

বাঙালী-প্রধান কাছাড় জেলার মধ্যে একটি আন্দোলন দানা বাধিয়া উঠিতেছে; ক্রমশঃ ইহা আসামের অন্তর্গত বাঙালী-প্রধান অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িবে। কারণ, আসাম-সরকার ইহার পিছনে তাঁহাদের গোয়েন্দা লাগাইয়াছেন যেমন করিতেছেন বিহার-সরকার মানভূম-ধলভূম অঞ্চলে। এইরূপ একটা আন্দোলনের কথা আমরা গত ফাল্গুন মাসে শুনিয়াছিলাম। ওয়ার্ডাঙ্গজে গঠনমূলক কর্মীবৃন্দের একটি সভা হয়। গান্ধীজীর কর্মপন্থায় বাঁহারা বিধানী সেইখানে তাঁহার সম্মিলিত হইয়াছিলেন এবং “সর্বোদয় সমাজ” প্রতিষ্ঠার কল্পনা গ্রহণ করেন। সেই সম্মেলন হইতে আগত এক জন কর্মী, বাঙালী কর্মী, আমাদের বলিয়াছিলেন যে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের কেহ কেহ এইরূপ নূতন প্রদেশ গঠনের কথা অনুমোদন করিতেছেন বলিয়া মনে হয়।

আজ প্রায় ছয় মাস পরে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এই নূতন প্রদেশ সংগঠিত হইবার যে আয়োজন চলিতেছে তাহাতে কাছাড়, ত্রিপুরা রাজ্য, মণিপুর রাজ্য ও লুসাই পাহাড়ের জনমণ্ডলীর সম্মতি আছে বলিয়া শুনিতেছি। আসাম প্রদেশের ২৫ লক্ষ আসামী ভাষাভাষী লোকসমষ্টির অধিকারী নাকি এরূপ আন্দোলনের অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। সংখ্যালঘিষ্ঠ এই সম্প্রদায়ের এইরূপ স্পর্ধা নাকি অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। রাজনীতিক ক্ষমতা পাইয়া ইঁহারা যেরূপ হিতাহিত বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহার ফলে এরূপ একটা বিরোধী ভাবের সৃষ্টি অবশ্যস্বাভাবিক।

কিন্তু এই নূতন প্রদেশের পক্ষে আন্দোলনকারী নেতৃবর্গকে আমরা একটা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতে চাই। তাঁহারা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের, বিশেষতঃ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের, মতামত জানিয়া লইবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়। অল্প কোম উদ্বেগ লইয়া বরাহী বিভাগ আসামের প্রদেশপালকে কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছেন। পশ্চিম বাংলার প্রদেশপাল এই দুইটা বাংলা ভাষাভাষী রাজ্যের সঙ্গে নিকটতর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার কথা। সর্দার প্যাটেলের বিভাগ তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মনে কি পরিকল্পনা আছে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। ভারত-রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল লইয়া আর একটা ভাঙা-গড়ার কাজে তাঁহারা মনোনিবেশ করিতেছেন, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। পশ্চিম বাংলার রাজনীতিকেরা এই বিষয়ে শ্রোতের জলে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। নিজ নিজ দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থ তাঁহাদের নিকট বড় হইয়া উঠিয়াছে।

### কস্তুর-বা শিক্ষা-কেন্দ্র

প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে পশ্চিম বাংলায় গঠনমূলক কিছু কিছু কার্য প্রয়োজনের তুলনায় অতি ধীরে চলিতেছে। নদীয়া জেলায় সাহেব-নগর গ্রামে কস্তুর-বা শিক্ষা-কেন্দ্র এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাতৃজাতির শিক্ষা ও সেবা-ধর্ম লইয়া যে এই কাজের আয়োজন চলিতেছে তাহা বাংলা দেশে নূতন নয়। গত দশ বৎসর হইতে নারীশিক্ষা সমিতি অল্পরূপ শিক্ষা ও সেবা করিয়া আসিতেছে। পল্লীগ্রামের বয়স্ক জীলোকের মধ্যে লিখন, পঠন ও বর্তমান যুগোপযোগী স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেন্টের কোন সাহায্য এই সমিতি পায় নাই। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর এক লক্ষ টাকা দানের উপস্থিতি হইতে সমিতির এই প্রচেষ্টার ব্যয় নির্বাহিত হয়; আচার্য্য-পত্নী ত্রীযুক্তা অবলা বসু এই আয় সমিতির হস্তে অর্পণ করিয়া একটা নূতন শিক্ষার প্রবর্তনে সাহায্য করিতেছেন।

সাহেব-নগর কেন্দ্র আরও ব্যাপক ভাবে এই কার্যের আয়োজন করিতেছে। ১৯৪৫ সালের নবেম্বর মাসে এই কেন্দ্রের পত্তন হয়। ত্রীযুক্তা নিরুপমা সেন এই কেন্দ্রের ভার প্রাপ্ত হন। এক বৎসরের মধ্যে ২৫ জন শিক্ষার্থিনী তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হন। এই সময়ে মুসলীম লীগ বাংলাদেশে যে আশঙ্ক জালায় তাহা নিবাইবার জন্য তাঁহাদের ডাক পড়ে; কুমিল্লায় ও নোয়াখালীতে তাঁহাদের যাইতে হয়। ত্রিপুরার দাঙ্গাবিশ্বস্ত অঞ্চলে দুইটি সেবাকেন্দ্রে কস্তুর-বা কর্মক্ষেত্রে পরিণত করা হয়।

“সংগঠন” (মাসিক) পত্রিকায় সাহেব-নগর কস্তুর-বা শিক্ষা-কেন্দ্রের গত দুই বৎসরের কার্য্য-বিবরণীর একটা চূড়ক প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপাঠে আমরা জানিতে পারি যে ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যে শিক্ষা-বৎসর আরম্ভ হয় তার অন্ত্রে ১৮ জন শিক্ষার্থিনী শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের হিসাবে দেখা যায় যে ২৩টি কেন্দ্রে ইঁহারা ব্যাপকভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন; প্রায় প্রত্যেক কেন্দ্রে দুই জন করিয়া সেবাব্রতী বসিয়া গিয়াছেন। ইঁহার মধ্যে ১০টি কেন্দ্র পূর্ববঙ্গে—বানরিপাড়া (বরিশাল); কাইতল (ত্রিপুরা); হর-নগর (ত্রিপুরা); সূচীপাড়া (ত্রিপুরা); ইব্রাহিমপুর (ত্রিপুরা); কাউনিয়া (বরিশাল); বাগোয়ান (কুষ্টিয়া); কাছনগোপাড়া (চট্টগ্রাম); কাণ্ডিকপুর (ফরিদপুর); বালিয়াখোড়া (ঢাকা)। বাকী কেন্দ্রগুলি পশ্চিম বাংলার নানা জেলায় বিস্তৃত। বাহুবদেবপুর, বাল-গোবিন্দপুর, গোয়াল-পাড়া, ও বাড় বাহুবদেবপুর (মেদিনীপুর); সাত মাইল বস্তি (কালিমপং) ২টি কেন্দ্র; সাহেবনগর; ক্ষুদ্রচন্দ্রপুর (নদীয়া),



রাধবপুর, হুটগঞ্জ ও বসর-কেজ (২৪-পরগণা); জাজিগ্রাম  
কেজ (বীরভূম); আকুই কেজ (বাঁকড়া)।

কস্তুর-বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিরাট ব্যাপার; ইহার কর্ম-  
কেজ সারা ভারতবর্ষে বিস্তৃত আছে। ইহার অর্থসঙ্গতি,  
প্রায় ১২৫ লক্ষ টাকার সুদের আয়, যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে  
গর্বের বিষয়। বাংলাদেশের শিক্ষা-কেজের বিবরণীর একটি  
সংবাদে আমরা স্থখী হইয়াছি, ভবিষ্যতে ইহাদের সাহায্যে  
ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামসমূহে গান্ধীজী-প্রবর্তিত শিক্ষা  
বিস্তারের আশায়। লুগলী জেলার খালনা ইউনিয়ন কংগ্রেস  
কমিটি আপনি উজোগী হইয়া দুইটি গ্রাম্য মেয়েকে শিক্ষার জন্য  
সাহেব-নগর শিক্ষা-কেজে পাঠাইয়াছে। অন্যান্য ইউনিয়ন  
এরূপ উদ্যোগী হইলে বাংলাদেশের আশী হাজার গ্রামে কত  
বড় সংগঠন আরম্ভ করিতে পারেন। ভারতের নারীসমাজের  
সম্মুখে কি বিরাট কর্মের সুযোগ উন্মুক্ত রহিয়াছে।

### বিহার সরকারের অবস্থা

বিহার সরকার বড়ই কাঁপরে পড়িয়াছেন। বাংলার সংবাদ-  
পত্র তাঁহাদের সম্বন্ধে নাকি মিথ্যা কথা প্রচার করিতেছে।  
ইহা একরূপ সহ করা যায়। কিন্তু যখন ত্রীকিশোরলাল  
মশরুওয়ালার মত লোক “হরিজন” পত্রিকার সম্পাদকরূপে  
তাঁহাদের বিরুদ্ধে কলম ধরিতে বাধ্য হন, তখন ব্যাপারটা  
গুরুতর হইয়া পড়ে বই কি। গান্ধীজীর নাম ভাঙাইয়া বাঁহারা  
রাজনীতিক্ষেত্রে নিজের স্থান করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে  
গান্ধীজী-প্রবর্তিত পত্রিকায় গান্ধী-ভক্ত একজন প্রধানের বিরূপ  
সমালোচনা সহ করা কঠিন হইয়া পড়ে, এবং তাঁহাদের অভি-  
মান অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেইজন্ত দেখিতে পাই যে বিহারের  
শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীবদরীনাথ বর্মা রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন।  
বিহারের ভাষা-শিক্ষা নীতির আলোচনা করিতে গিয়া তিনি  
“হরিজন” পত্রিকায় একটি পত্র লিখিয়া তাঁহার “বাঙালী ভাই-  
দের” উপর এক হাত লইয়াছেন। “তাঁহারা বিহার গবন্মেণ্টকে  
লোকচক্ষে ধীন করিবার জন্ত জিদ ধরিয়াছেন। বিহার  
প্রদেশের এক অংশ পশ্চিম বাংলাভুক্ত করিয়া লওয়া তাঁহাদের  
উদ্দেশ্য, এবং মতলব হাঁসিল করিবার জন্ত কোন উপায়কেই  
তাঁহারা অতি নীচ বলিয়া মনে করেন না।” তিনি নাকি এই  
কথা বলিতে “বড় ব্যথা” পাইয়া থাকেন। আমরাও তাঁহার  
“ব্যথার” নমুনা ও বছর দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি।

কিন্তু বর্মাজী তাঁহার গুরুজী শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের মত জ্ঞান-  
পাণী বলিয়াই এরূপ “ব্যথা” পাইতেছেন। তিনি যনে  
রাখিতে চান না কি কারণে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল বিহার  
প্রদেশের জগৎক্ষেপে বাংলাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়া-  
ছিল। এই প্রদেশের জগৎবর্তী ঘোষণা করা হয় ১৯১১ সালে।

১৯১২ সালের জাম্ময়ারী মাসে তদানীন্তন বিহারের নেতৃবর্গ  
একটি বিষয়টি দিয়া এই অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে তাঁহাদের মতামত  
ব্যক্ত করেন; এবং কোন কোন অঞ্চল বিহার হইতে বিচ্ছিন্ন  
করিয়া বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত তাহাও নির্দেশ  
করিয়া দেন। ১৯৩১ সালে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে  
মানভূম জেলা কংগ্রেস সম্মেলনের একটি অধিবেশন হয়; এবং  
বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজে একটি প্রস্তাব করেন: “যেহেতু  
মানভূম জেলার লোক-সংখ্যার শতকরা উননব্বই জন বাংলা  
ভাষায় কথা বলেন, সেইজন্ত এই সম্মেলন মনে করে যে যখন  
দেশ স্বাধীন হইবে এবং ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠন  
হইবে, তখন মানভূম জেলা বাংলাদেশের সঙ্গে পুনর্মিলিত  
হইবে।”

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ অসুবিধায় পড়িয়া এই প্রতিশ্রুতির কথা  
বিস্মৃত হইয়াছেন ভান করিতেছেন। শ্রীবদরীনাথ বর্মার মত  
তাঁহার চেলা-চামুড়ারা যে গুরুদেবকে ছাড়াইয়া যাইবেন তৎ-  
সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। “হরিজন” পত্রিকায়  
বর্মাজীর পক্ষে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৩১ সালে বাবু  
রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বীকার করিয়াছিলেন যে মানভূম জেলার  
শতকরা ৮৯ জন লোকের মাতৃভাষা বাংলা। আর ১৯৪৮  
সালের ২৭শে জুলাই রীচি হইতে “হরিজন” পত্রিকার  
সম্পাদককে লিখিত এক পত্রে বিহারের শিক্ষা-মন্ত্রী  
লিখিতেছেন:

আপনি বোধ হয় জানেন মানভূমের শতকরা ৭০ হইতে  
৮০ জন হয় হিন্দী নয়ত কোন উপজাতীয় ভাষা—বিশিষ্ট  
ভাগ সাঁওতালী বলে। ইহাদের সকলকেই জোর করিয়া  
বাংলা ভাষায় মাধ্যমে পড়ান হইত। নূতন পাঠ্যক্রম  
অনুযায়ী এই সব লোক বাঙালীদেরই মত প্রাথমিক শিক্ষা  
কালে নিজের মাতৃভাষায় লেখাপড়া করিতে পারিবে।  
আমাদের কয়েকজন বাঙালী বন্ধু—তাঁহারা প্রায় সকলেই  
বাহির হইতে আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন—স্পষ্টতঃ এই  
পরিবর্তন চান না এবং বাহিরের জগতের কাছে বিহার-  
সরকারের বদনাম দিবার জন্ত সব রকম কলকৌশল  
খাটাইতেছেন।

এই “পুহুরচুরি” করিয়া সম্ভব হইল তাহা মশরু-  
ওয়ালাজী ধরিয়। সেইজন্তই ১১ই জুলাই-এর  
“হরিজন” পত্রিকায় বর্মাজীর প্রবন্ধে লিখিয়া-  
ছিলেন: “যদিও মশরুওয়ালার মত লোকেরা  
বিহারের পশ্চিম অংশে বসিয়া রহিয়াছে  
তাহা বিহার-  
সরকারের পক্ষে, যাহা যাহা  
কাকে,

### হায়দরাবাদের প্রকৃত রূপ

ভারত-রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিবরণী প্রকাশ করিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে হায়রাবাদ সম্ভার প্রকৃত রূপ ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দৈনিক সংবাদপত্রে এই বিবরণীর যে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ভারতবাসীর পক্ষে নূতন কথা কিছুই নাই। পূর্ণ বিবরণী পাইলে আমরা বলিতে পারিতাম ইহাতে হায়দরারাদ রাজ্যের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন নির্দেশ আছে কিনা। কিন্তু যদিও এই বিবরণীতে নিজাম মীর ওসমান আলী খাঁ বাহাদুরের “কুলের কথা” বর্ণিত হইয়াছে, তবুও মনে হয় কংগ্রেস নেতৃবর্গ—বাহারী বর্তমানে ভারত-রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য চালাইতেছেন, তাহাদের নিজাম রাজ্যের সম্বন্ধে কোনও কৌতুহল ছিল না; তাহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, পাকিস্তান দাবীর পিছনে যে মনোভাব জিয়া করিতেছিল, তাহার জন্মস্থান হায়দরাবাদে, এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন অধ্যাপক, সৈয়দ আবদুল লতিফ, তাহার হিন্দু মুসলমান সাংস্কৃতিক বিরোধ সম্বন্ধে পুস্তিকায় ১৯৩৮ সালে ভারত বিভাগের পক্ষে যুক্তি দিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটি সঙ্গতি ছিল। এই কথা বুঝিলে কংগ্রেস নেতৃবর্গ হায়দরাবাদ রাজ্যের গণ-আন্দোলনকে এমন ভাবে নিকৃৎসাৎ করিতেন না।

হায়দরাবাদ রাজ্যের শাসকগোষ্ঠীর ভারত-বিরোধী মনোভাব নূতন নয়। গত এক শত বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এই কথা পরিষ্কার বুঝা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তদানীন্তন নিজামের এক ভ্রাতা, “ওহাবী” আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলিয়া সহযাত্রীদের সঙ্গে আটক-বন্দী ছিলেন। ১৮৫৭ সালের পর উত্তর-ভারতের মুসলমান প্রধানগণ নিজামের রাজ্যে নিজেদের ভাব ও আদর্শ অস্থায়ী জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবেন এই ভরসায় তথায় ভিড় করিতে থাকেন। তাহাদের চেষ্টার ফলে মুসলিম সংস্কৃতির বিশেষ কেন্দ্ররূপে এই রাজ্যকে রূপায়িত করিবার আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ৫০ বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাহার মূর্ত প্রতীক। আমাদের দেশের নেতৃবর্গের এই বিষয়ে নিকৃৎসৎ মন ছিল বলিয়াই তাহারা এই ঘটনার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন নাই।

তারপর যখন পাকিস্তানী ভূতত্ত্বের বৃক্ক নৃত্য আরম্ভ করিল তখন তাহারা মুসলমানদের কার্য্যকলাপ লইয়াই ব্যস্ত থাকিলেন। তাহাদের পিছনে নিজামের যে অর্থ ছিল, তাহা বুঝিলেন না। হায়দরাবাদে হায়দরাবাদীরা থাকার দায়িত্ব জন্ম ইহাও বুঝিলেন না।

হইল তখন নিজাম মীর ওসমান আলী খাঁর সাহস বাড়িয়া গেল। কারণ তাহাকে যে মারিবে হায়দরাবাদ রাজ্যের সেই গণ-আন্দোলনকে ত তাহারা বাড়িতে দিলেন না। আর একটা কারণ নিজামের সাহস বাড়িয়াছে। তিনি দেখিলেন যে মহম্মদ আলী জিন্নার প্ররোচনায় হুসেন সহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলাদেশে যে ভাঙবের সূচনা করিলেন তাহার ফলে লাভ হইল পাকিস্তান। সুতরাং এরূপ একজন ক্রীড়নকের সৃষ্টি করিতে পারিলে দক্ষিণাভ্যে পাকিস্তান কায়ম করা কঠিন হইবে না। সৈয়দ কাসেম রাজভী এই নীতির হায়দরাবাদী সংস্করণ। উত্তর-ভারত যদি মুসলমানের সংখ্যা-গরিষ্ঠতার নামে দ্বি-খণ্ডিত হইতে পারে, তবে দক্ষিণ-ভারত কেন দ্বি-খণ্ডিত হইবে না—মুসলমানের ৫০০ বৎসরের রাজনীতিক প্রাধান্যের (traditional political superiority of Muslims) নামে। কারণ নিজাম বাহাদুর কি বাহমণী রাজবংশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী নন? এই বিশ্বাস হায়দরাবাদ রাজ্যের শাসকগোষ্ঠীর মনে গাঁথিয়া গিয়াছে বলিয়াই মীর ওসমান আলী খাঁর হুরাকাজ্জা বাড়িয়া গিয়াছে। তাহারা রাজ্যের প্রকৃত রূপ কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে, আজ যাঁহা আমাদের চক্ষের উপর ষটিতেছে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। বিলম্বে হইলেও এই বিষয়ে আমাদের নেতৃবর্গ সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি।

আর একটা কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। “বুট্টির ছোরে যেড়া লড়ে” এইরূপ একটা প্রামাণ্য কথা আছে। কোন বুট্টির ছোরে নিজাম লড়িতেছেন? ব্রিটেনের শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট একটা সাফ জবাব দিয়াছেন। কিন্তু ব্রিটেনের শাসকগোষ্ঠীর একাংশ যে নিজামের স্পর্ধার পিছনে আছে, এই বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। মহম্মদ আলী জিন্নার মানসপুত্র পাকিস্তানের কথা না-ই বলিলাম। উত্তর-ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশ যে পাকিস্তানের জন্মদাতা, এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের সকলেই পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাহারা ভারত-রাষ্ট্রে আছে, এবং নিজাম ওসমান আলী খাঁ তাহাদের উপর কোন ভরসা রাখেন না, এই কথা কেহ বিশ্বাস করে না। কোটিল্যের রাষ্ট্রনীতি এরূপ বিভীষণ-গোষ্ঠীর সহযোগিতার কথা আমাদের শুনাইয়া গিয়াছে। ভাবানুভূত ইহা তুলিয়া গেলে চলিবে না। হিন্দুও ভারত-রাষ্ট্র বিরোধী হইতে পারে, তার প্রমাণ আছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর তাহা নির্বংশ হয় নাই। হিন্দু ব্যবসায়ী প্রধানরা পর্যাপ্ত এরূপ বিশ্বাসঘাতকায় লিপ্ত আছে। এই সব বিপদের কথা মনে রাখিয়াই ভারত-রাষ্ট্রের শাসন-কর্তাদের যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।





## যাজ্ঞবল্ক্যের দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

বৃহদারণ্যকোপনিষদে মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ নামে দুইটি ব্রাহ্মণ আছে (২।৪-৩ ৪।৫)। উভয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত বিষয় একই, স্থানে স্থানে ভাষার কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে মাত্র। ব্রাহ্মণদ্বয়ের উপাখ্যানভাগ সুপরিচিত। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। প্রব্রজ্যা অবলম্বনে ইচ্ছুক মহর্ষি মৈত্রেয়ীকে কহিলেন, “আমি অন্যত্র যাইতেছি; যাইবার পূর্বে আমার যে সম্পত্তি আছে, তোমার ও কাত্যায়নীর মধ্যে তাহা বিভাগ করিয়া দিতেছি।” শুনিয়া মৈত্রেয়ী কহিলেন “সম্পত্তি ত দিবেন, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীও যদি বিভূত্বপূর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা কি আমি অমর হইতে পারিব?” যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, “তাও কি হয়? বিভূত্ব দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা কোথায়? উপকরণবান ব্যক্তির জীবন যেমন হয়, তোমার জীবনও তেমনই হইবে। বিভূত্ব দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না।” তখন মৈত্রেয়ী বলিলেন, “যাহা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, তাহা দ্বারা আমি কি করিব। এই অমৃতত্ব বিষয়ে ভগবান যাহা জানেন, তাহা আমাকে বলুন।” প্রিয়া ভাৰ্য্যার এই কথা শুনিয়া মহর্ষি বিশেষ প্রীত হইলেন, এবং তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান করিলেন। মহর্ষির এই উপদেশের মধ্যে তাঁহার দার্শনিক মতবাদ নিহিত, এবং মনে হয় এই উপদেশই আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যাত অদ্বৈতবাদের ভিত্তি।

মহর্ষি কহিলেন, “পতি পত্নীর প্রিয়, জায়া পতির প্রিয়, পুত্র পিতার প্রিয়, কিন্তু কেহই নিজের জন্ম অন্নের প্রিয় নয়; যে যাহার প্রিয়, সে তাহার নিজের প্রীতির জন্মই প্রিয়, তাহাকে ভালবাসিয়া স্থখ হয়, তাই সে প্রিয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আমাদের প্রিয়, বেদ ও দেবগণ আমাদের প্রিয়, বিত্তও আমাদের প্রিয়, ইহার এবং জগতে যাহা কিছু আমাদের প্রিয় আছে, তাহার কেহই আপনার নিমিত্ত প্রিয় হয় না, যাহার প্রিয় তাহার নিজের জন্ম প্রিয় হয়। যাহার প্রীতির জন্ম এই সমস্ত প্রিয় হয়, তিনি আত্মা; সেই আত্মা এক ও অবিতীয়। সেই আত্মার দর্শন, মনন ও নিদিধ্যাসন কর্তব্য। আত্মার দর্শন, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা যাবতীয় পদার্থ জানা যায়। যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, স্বর্গাদিলোকসমূহ, দেবগণ, বেদ, ভূতসমূহ ও সমুদায় বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে সে তাহাদের স্বরূপ অবগত হইতে পারে না।”

ইহার পরে যে যে দৃষ্টান্ত দ্বারা মহর্ষি সর্বাত্মকত্ব

প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা নির্বিশেষ-অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক। গভীর মনস্তত্ত্বের উপর এই ব্যাখ্যান প্রতিষ্ঠিত। একটু বিস্তারিত ভাবে তাহার বর্ণনা আবশ্যক।

মহর্ষি বলিলেন, “তাড়মান হৃন্দুভি হইতে নির্গত শব্দকে গ্রহণ করিবার জন্ম হৃন্দুভি অথবা হৃন্দুভিবাদককে গ্রহণ করিতে হয়। তাহা না করিলে আমরা সে শব্দকে হৃন্দুভি-শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। হৃন্দুভি যখন বাদিত হয়, তখন হৃন্দুভি বা তাহার বাদনকার্য্য হৃন্দুভির শব্দের সঙ্গে মিলিত হয়, এবং যখন দূরে হৃন্দুভিশব্দ শ্রুত হয় তখন তাহার সঙ্গে হৃন্দুভি অথবা তাহার বাদনকার্য্যের চিন্তাও এক সঙ্গে মনে উদ্ভিত হয়। কিন্তু ইহাই হৃন্দুভি-শব্দজ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যখন প্রথম হৃন্দুভিশব্দ শুনিয়াছিলাম, তখন মনের মধ্যে যে অল্পভবের উদয় হইয়াছিল; শ্রোত অল্প কোনও অল্পভবের সঙ্গে তাহাকে এক শ্রেণীতে ফেলিতে পারি নাই। সেটা ছিল অনন্যসদৃশ, অল্পম একমাত্র (unique) অল্পভব। তাহার দেখা আর এ জীবনে পাই নাই—পাইবার সম্ভাবনাও নাই। কেননা তাহার পরে যখনই হৃন্দুভিবাদ্য শুনিয়াছি, তখন যে অল্পভব (sensation) হইয়াছে, তাহার সঙ্গে পূর্বে শ্রুত বাদ্যের সাদৃশ্য ছিল, কিন্তু অনন্যতা (identity) থাকা সম্ভব ছিল না, একজাতীয় হইলেও তাহা ভিন্ন ছিল; সময়ের ভিন্নতা, আমার মানসিক অবস্থার ভিন্নতা, বাদ্য-ভঙ্গীর ভিন্নতা, শব্দের গ্রামের ভিন্নতা প্রভৃতি নানা পার্থক্য পূর্বে শ্রুত বাদ্য হইতে তাহাকে পৃথক্ করিয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় শব্দের মধ্যে যে সাদৃশ্য ছিল আমার মন তাহা উপলব্ধি করিয়া বুঝিয়াছিল—সেদিন অমুক স্থান অমুক সময়ে যে শব্দ শুনিয়াছিলাম, ইহা তাহারই অনুরূপ। এই ভাবে যখনই হৃন্দুভি-শব্দ শুনিয়াছি, তখনই তাহার ভিন্নতা সত্ত্বেও পূর্বে শ্রুত শব্দের সহিত তাহার সাদৃশ্যের প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়া এই সর্বমস্ত বিশিষ্ট হৃন্দুভিশব্দের মধ্যে যে সাধারণ ভাবটি আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাই আমার হৃন্দুভিশব্দের জ্ঞান (concept)। তাহারই মধ্যে প্রতি হৃন্দুভিশব্দকে ফেলিয়া আমি তাহাকে হৃন্দুভিশব্দ বলিয়া বুঝিতে পারি। হৃন্দুভিশব্দের এই সাধারণ জ্ঞানকে হৃন্দুভি-শব্দ—“সামান্য” বলে। এইরূপ বীণাশব্দ, শঙ্খশব্দ প্রভৃতি যাবতীয় শব্দজ্ঞানই “সামান্য” জ্ঞান—কোনও



বিশেষ শব্দের জ্ঞান নহে। এই সামান্যের অস্তিত্ব বাহ্যজগতে আমরা খুঁজিয়া পাই না। রাম, শ্রাম, গোপাল সকলেই “মাহুষ”। রামের জ্ঞান, শ্রামের জ্ঞান, গোপালের জ্ঞান আমাদের মাহুষ-সামান্য জ্ঞানের (concept of man) অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু “মাহুষ”কে, বিশেষত্ব-বর্জিত কোনও মাহুষকে জগতে দেখিতে পাই না। এই স্থলে দর্শনের একটি গুরুতর প্রশ্ন আসিয়া পড়ে,—বাহ্যপদার্থ ও তাহার প্রতিক্রিয়া প্রত্যয়ের মধ্যে সম্বন্ধ। সে প্রশ্নের আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে বর্তমান আলোচনায় আমাদের আরও কিয়দূর অগ্রসর হওয়া আবশ্যিক।

আমাদের ইন্দ্রিয় দশটি—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। ইহা ভিন্ন জ্ঞান ও কর্ম—উভয়-সাধারণ মনও ইন্দ্রিয়মধ্যে পরিগণিত। উভয়বিধ ইন্দ্রিয় আমাদের “আমি”র সঙ্গে বাহ্যজগতের সংযোগ বিধান করিতেছে। বাহ্যজগৎ আমাদের মনে প্রতিষ্ঠিত হয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারপথে; এবং বাহ্যজগতের উপর আমাদের স্বকীয়শক্তি প্রযুক্ত হয় কর্মেন্দ্রিয় করণ দ্বারা। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটির প্রত্যেকেই বাহ্য-বস্তুর এক-একটি গুণের পরিচয় বহন করিয়া আনে। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ, জড় পদার্থের এই পাঁচ গুণের পরিচয় আমরা পাই যথাক্রমে চক্ষু, রসনা, নাসিকা, শ্রবণ ও কণ্ঠ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা। ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ আমাদের স্থূল অঙ্গবিশেষ নহে; আমাদের “আমি” (আত্মা, বলিলাম না, কেননা “আমি” ও “আত্মা” এক অর্থ ব্যক্ত করে না) যে শক্তি স্থূল অঙ্গবিশেষের সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করে, সেই শক্তিই ইন্দ্রিয়শব্দবাচ্য। পূর্বে দেখিয়াছি যে প্রকার শব্দের জ্ঞান আমাদের আছে, তাহা “শব্দ-সামান্য”র অন্তর্ভুক্ত। সেইরূপ নীল, লোহিত, পীত প্রভৃতি বর্ণ, সরল, বক্র, বর্জুল প্রভৃতি আকার—যত বিভিন্ন রূপ আছে, তাহার প্রত্যেকেই “সামান্য” হইয়াও বৃহত্তর “রূপ-সামান্য”র অন্তর্গত। চৈতন্য নামক অশ্ব নীল বর্ণ। আরও বহু অশ্বের বর্ণ নীল। কিন্তু প্রত্যেক নীল অশ্বেরই নীলবর্ণ ব্যতীত আরও এমন অনেক বিশেষত্ব আছে যাহার সহিত নীল বর্ণের সমবায়ে তাহার ব্যক্তিত্ব গঠিত হইয়াছে। আরার নীল অশ্ব ভিন্ন আরও অনেক দ্রব্য নীলবর্ণযুক্ত। তাহাদের নীল বর্ণের সঙ্গে অন্য বিশেষত্ব যুক্ত হইয়া নীল অশ্ব হইতে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। যাবতীয় নীল বর্ণের পদার্থের নীল বর্ণ ভিন্ন অন্য সমস্ত বিশেষত্ব বর্জন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই “নীলবর্ণ-সামান্য”। রূপের বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন “সামান্য” আছে। এই সমস্ত খণ্ড রূপ-সামান্য—নীল-সামান্য, লোহিত-সামান্য, পীত-সামান্য,

সরল-সামান্য, বক্র-সামান্য প্রভৃতি সকলেই একটি বৃহত্তর বিস্তৃততর সামান্যের অন্তর্ভুক্ত, যাহা প্রত্যেক বর্ণ ও আকারের বিশেষত্ব-বর্জিত, যাহাতে যাবতীয় বর্ণ-ও-আকার-সামান্যের মধ্যে যাহা সাধারণ, সেইরূপ ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই বৃহত্তর-সামান্যই রূপ-সামান্য। ইহা রূপ-মাত্র। কোনও বিশেষ ইহার মধ্যে নাই। এইরূপে দেখা যায়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে যে পদার্থের জ্ঞানলাভ করি, তাহার রূপ-সামান্য, রস-সামান্য, গন্ধ-সামান্য, শব্দ-সামান্য ও স্পর্শ-সামান্য—এই পাঁচ সামান্যের অন্তর্ভুক্ত। কর্মেন্দ্রিয়গুলির বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা কখন-সামান্য, গ্রহণ-সামান্য, গমন-সামান্য, বিসর্গ-সামান্য ও রতি-সামান্য এই পাঁচটি ক্রিয়া-সামান্য প্রাপ্ত হই।

যাজ্ঞবল্ক্যের যুক্তির সোপানপরম্পরায় আরোহণ করিয়া আমরা অনেক দূর উঠিয়াছি। আর দুইটি সোপান অতিক্রম করিতে পারিলেই আমরা মীমাংসা-শিখরে উপনীত হইতে পারিব। এই সোপান দুইটি আমাদের পক্ষে পাক্‌ভৌতিক হইতে আধ্যাত্মিক জগতে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে। ইহারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা দেখিয়াছি প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে যে বিশিষ্ট পদার্থের পরিচয় লাভ করি, তাহার সকলেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সামান্যের বিশিষ্ট রূপ মাত্র—প্রকৃতপক্ষে তাহা সেই বিষয়-সামান্য মাত্র। কর্মেন্দ্রিয়গুলির প্রতি কার্যও ক্রিয়া-সামান্য মাত্র। এখন বুঝিতে হইবে আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা জ্ঞাত হই, তাহা মনেরই সঙ্কল্পবিশেষ মাত্র। স্বতরাং রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ ইহার সকলেই মনঃ-সামান্যের বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার মনঃ বুদ্ধির বিশেষ মাত্র। স্বতরাং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যাবতীয় বিষয়বুদ্ধিরই বিশিষ্ট রূপ। এই বুদ্ধিরূপ সামান্যই (বিজ্ঞান-সামান্য, বিজ্ঞান মাত্র) মহাসামান্য প্রজ্ঞান-ধন ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মা অথবা মহাত্মা।

অন্য দিকে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় হইতে আমরা যে পাঁচটি ক্রিয়া-সামান্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহারও প্রাণেরই বিভিন্ন বিশিষ্ট রূপ; বাপী, তড়াগ প্রভৃতি জলের বিশিষ্ট রূপকে জল হইতে পৃথক করা যায় না, তেমনি প্রাণ হইতে তাহার বিশিষ্ট রূপসমূহকে বিভক্ত করা অসম্ভব, তাহার প্রাণই। আবার প্রাণও বিজ্ঞানেরই বিশেষ। বিজ্ঞান মাত্রই “যো বৈ প্রাণঃ, সা প্রজ্ঞা, যা বৈ প্রজ্ঞা, স প্রাণঃ” (ইতি কোষিতকী)। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, সমস্ত পদার্থই—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় সমস্তই বিজ্ঞান।

এখন বোধ হয়, আমরা মহর্ষির উদাহৃত পরবর্তী দৃষ্টান্ত-গুলি সহজেই বুঝিতে পারিব। আর্জ ইন্দ্রনাহৃত অগ্নি হইতে থাকিয়া থাকিয়া পৃথক পৃথক ধূমকুণ্ডলী নির্গলিত হইতে আমরা দেখিয়াছি। সেই ধূমস্ফটিতে অগ্নির প্রয়াস নাই, স্বতঃই ধূম তাহা হইতে নির্গত হয়। তেমনই সেই মহাভূত হইতে নিঃশ্বাসের মত বিনা প্রযত্নে নির্গত হয় ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিজ্ঞা, উপনিষৎ, শ্লোকসমূহ, সূত্রসমূহ, অল্পব্যাখ্যান ও ব্যাখ্যান-সমূহ, ইষ্ট, হৃত, পান, ইহলোক, পরলোক এবং এই ভূত-সমূহ। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে সৃষ্টির এই বর্ণনায় সৃষ্ট পদার্থের তালিকায় মহর্ষি মনোজগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে কোনও ভেদ করেন নাই। ভূতসমূহও যেমন সেই মহাভূত হইতে নিঃশ্বাসিত হয়, বেদ-উপনিষৎ প্রভৃতি বিদ্যাও তেমনই। উভয়ই একজাতীয় পদার্থ—প্রকারভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু স্বরূপতঃ একই।

তার পর মহর্ষি বলিতেছেন, “সমুদ্র যেমন যাবতীয় জলের একমাত্র আশ্রয়, স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয়-সামান্য (স্পর্শমাত্র) তেমনই যাবতীয় স্পর্শ-বিশেষের এক আশ্রয়। রসেন্দ্রিয়-বিষয়-সামান্য (রসমাত্র) তেমনই যাবতীয় রস-বিশেষের একমাত্র আশ্রয়। নাসিকেন্দ্রিয়-বিষয়-সামান্য (গন্ধমাত্র) তেমনই যাবতীয় গন্ধ-বিশেষের একমাত্র আশ্রয়। দর্শনেন্দ্রিয়-বিষয়-সামান্য (রূপমাত্র) তেমনই যাবতীয় বিশিষ্ট-রূপের একমাত্র আশ্রয়। শ্রোতেন্দ্রিয়-বিষয়-সামান্য (শব্দমাত্র) তেমনই যাবতীয় বিশিষ্ট শব্দের একমাত্র আশ্রয়। তেমনই মন যাবতীয় সঙ্কল্পের একমাত্র আশ্রয়, বুদ্ধি যাবতীয় বিদ্যার একমাত্র আশ্রয়, হস্ত যাবতীয় কর্মের একমাত্র আশ্রয়, উপস্থ যাবতীয় আনন্দের একমাত্র আশ্রয়, পাদ যাবতীয় পথের আশ্রয়, পায় যাবতীয় বিসর্গের আশ্রয়, বাক্ সর্ববেদের আশ্রয়।” সমুদ্র অর্থে জল-সামান্য। বিশেষ-বিশেষ আধারে জল তড়াগ, বাপী, নদী প্রভৃতি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঐ সমস্তই জল-সামান্যের অন্তর্ভূত। তেমনই উপরি-উক্ত যাবতীয় বিষয়-সামান্য একই মহা-সামান্যের বিশিষ্ট রূপ; সেই মহা-সামান্য সকল পদার্থেই বর্তমান; যাবতীয় বিশিষ্ট পদার্থ সেই মহাসামান্যেরই বিশেষ, সেই মহাসামান্যকে বর্জন করিয়া কোনও পদার্থই সত্যক্ বিদিত হইয়া যায় না।

মহর্ষি আবার বলিতেছেন, “সৈন্ধবথও সিন্ধু অর্থাৎ জল হইতে উৎপন্ন, জলেরই বিকারমাত্র। স্বীয় বোনি জলে প্রক্ষিপ্ত হইলে সৈন্ধবথও জলেই বিলীন হইয়া যায়, আর তাহাকে কঠিন সৈন্ধবথওরূপে পাইবার সম্ভাবনা থাকে না, সেই জলের যেখান হইতেই কিছু তুলিয়া দেখ না, তাহা

তরল জলই—কঠিন সৈন্ধবথও তাহার কোথায়ও পাওয়া যায় না। সৈন্ধবথও যেমন জলের বিকার, জল হইতে উদ্ভূত হয়, জীবাশ্মাও তেমনই সেই অনন্ত, অপার ও বিজ্ঞানঘন (কেবলই বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই বাহ্যতে নাই) মহাভূত হইতে উদ্ভূত হয়। সেই মহাভূত এই সমুদ্র ভূতসমূহ হইতে (জীবাশ্মরূপে) উদ্ভিত হইয়া আবার এই সমস্ত ভূতেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তার পরে আর সংজ্ঞা থাকে না।” অর্থাৎ সৈন্ধবথওকে যেমন আর জলের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, জীবাশ্মকেও আর সেই পরমাশ্মরূপী মহাভূতের মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে না।

এই কথা শুনিয়া মৈত্রেয়ী চমকিত হইলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন অমৃতত্ব—চাহিয়াছিলেন মৃত্যুকে জয় করিয়া অমর হইতে, এবং কিসে সেই অমরত্ব লাভ করা যায়, মহর্ষির নিকট তাহা জানিতে। মহর্ষি বলিলেন, জীবাশ্ম ব্রহ্মে লীন হইয়া যাইবে—তাহার আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকিবে না। এ কি রকম অমরতা? কহিলেন, “ভগবন, আপনার কথায় আমি মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িলাম। প্রেত্য সংজ্ঞা ন আস্ত—এ কি বলিলেন আপনি? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।” মহর্ষি কহিলেন, “মোহকর কিছুই তো আমি বলি নাই। আত্মা তো অবিনাশী, অল্পচ্ছিত্তিধর্ম্মা-ই। যেখানে দ্বৈত আছে বলিয়া মনে হয়, সেখানেই একজন দ্বিতীয়কে দেখে, ভ্রাণ করে, আশ্বাদ করে, শোনে, স্পর্শ করে, জানে, অভিবাদন করে। কিন্তু যখন সকলই আত্মা হইয়া গেল, তখন কে কিরূপে কাহাকে দেখিবে, কে কিরূপে কাহাকে স্পর্শ করিবে, কে কিরূপে কাহাকে অভিবাদন করিবে, কে কিরূপে কাহাকে জানিবে? বাহা দ্বারা সকল পদার্থ জানা যায়, তাহাকে কিরূপে জানিবে? বিজ্ঞাতাকে কিসের দ্বারা জানিবে?

আমরা দেখিলাম যাজ্ঞবল্ক্য জাগতিক যাবতীয় পদার্থকে ইন্দ্রিয়-বিষয়-সামান্যে পর্যাবসিত করিয়া দশবিধ ইন্দ্রিয়-সামান্যকে মনঃ-সামান্যে ও প্রাণ-সামান্যে পর্যাবসিত করিয়াছেন, এবং মনঃ-সামান্য ও প্রাণ-সামান্যকে বুদ্ধি-সামান্যের “বিশেষ”—এ পরিণত করিয়া, তাহাকেই “মহাভূত” আখ্যা দিয়াছেন। এই মহাভূত ও “বিজ্ঞান” একই—ইহা অনন্তর অবাছ, ক্লেশ ও বিজ্ঞানঘন। ইহাই পরমসত্য, জগতে বাহা কিছু আছে, সমস্তই ইহা; ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই আত্মা। কিন্তু শব্দ-সামান্য, রূপ-সামান্য প্রভৃতি যাবতীয় সামান্যই আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ হইলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ নহে, অবিশিষ্ট অবস্থায় কোথায়ও তাহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। আমাদের দেশকালের জগতে তাহাদের অস্তিত্ব নাই। তাহা হইলে তাহারা যে সত্তাহীন নয়, আমাদের মনো-

গঠিত ভাবমাত্র নয়, তাহার প্রমাণ কি? যে মহাসামান্যে যাজ্ঞবল্ক্য সমগ্র জগৎকে বিলীন করিয়াছেন, তাহারই বা বাস্তব সত্তা কোথায়?

সামান্যের (universals, concepts) বাস্তব সত্তা আছে কি না, ইহা দর্শনের একটি সনাতন প্রশ্ন। প্লেটোর মতে বহির্জগতের অন্তরালে আর এক জগৎ আছে, যাহা “সামান্য”-দিগের আবাসভূমি। আমাদের জগতের যাবতীয় পদার্থ—বিশেষ-স্কৃদ পদার্থ—সেই অদৃশ্য জগতের “সামান্য”দিগের আদর্শে গঠিত, দেশ ও কালে প্রতিকলিত সেই সামান্য হইতেই আমাদের জগতের বিশিষ্ট পদার্থ সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। প্লেটোর দর্শনে সামান্যের নাম Ideas। আমাদের জগতে নির্বিশেষ মানবত্ব, গোষ্ঠ, বৃক্ষত্ব না থাকিলেও, সেই অদৃশ্য জগতে আছে। সর্ববিশেষত্ব-বর্জিত মানব, গো, বৃক্ষ সেখানে বর্তমান। আমাদের জগৎ নশ্বর, অনিত্য, কিন্তু সেই ‘আইডিয়া’র জগৎ নিত্য। কিন্তু প্লেটোর এই জগৎ ও যাজ্ঞবল্ক্যের মহাভূতের মধ্যে ব্যবধান দূরজ্যো। প্লেটোর অবিনশ্বর জগৎ বহুর আবাসস্থল, বৈচিত্র্যপূর্ণ। অসংখ্য Idea শিবকে (The good) কেন্দ্র করিয়া বর্তমান—সেই দেশকালের অতীত জগতে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের মহাভূত অনন্তর, অবাহ ও বিজ্ঞানঘন। তাহা এক ও অদ্বিতীয়—বিজ্ঞান ভিন্ন তাহাতে আর কিছুই নাই। সমুদ্রে নদী-প্রবাহের মত যাবতীয় খণ্ডসামান্য যে মহা-সামান্যে বিলীন, তাহার মধ্যে তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি খণ্ডিত জ্ঞানই বহন করিতে পারে; অথও জ্ঞান তাহাদের দ্বারা লাভ করা যায় না। খণ্ডিত পদার্থসম্বন্ধেও তাহাদের সাক্ষ্য সকল সময় সত্য হয় না। সেইজন্য বিজ্ঞানে নানা ভাবে ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ পরীক্ষা করা হয়। স্বতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়গণ যদি এক সর্বাত্মক মহাভূতের সাক্ষ্য না দেয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের প্রমাণকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নাই। অসংশয়ে সমগ্র জগৎকে জানিবার জন্য যে “সবজ্ঞান-জ্ঞানে”র প্রয়োজন, গীতায় যাহার উল্লেখ আছে, সে জ্ঞান ইন্দ্রিয়লভ্য নহে। তাহার জন্য দিয়া ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন, বুঝি-বা দিব্য ইন্দ্রিয় দ্বারাও তাহা লাভ করা যায় না। দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া অর্জুন মহাভূতের যে রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে বহুত্বের অভাব ছিল না, সে রূপ দেশ ও কালের অতীত ছিল না। তাহা অনন্তর, অবাহ, বিজ্ঞানঘন রূপ নহে।

এক অথও পদার্থকে ইন্দ্রিয় অথওরূপে দেখিতে পায় না বলিয়াই যে তাহা অথও নয়, তাহা নহে। এখন প্রশ্ন এই জগৎ যদি অথও হয়—এক বিজ্ঞানঘন পদার্থই হয়,

তবে তাহাকে আমরা খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখি কেন? ইহার উত্তর উপনিষদ দিয়াছেন—নাম ও রূপের জন্য। অথও বিজ্ঞানে নাম ও রূপ আরোপিত হইয়া খণ্ডিত অসংখ্য পদার্থের আবির্ভাব হইয়াছে। এই বহুত্ব সত্য নয়, নামরূপ সত্য নয়, একমাত্র বিজ্ঞানই সত্য। বিজ্ঞানের উপর নাম ও রূপের বহু প্রলেপ পড়িয়া বিজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের মধ্যেও সেই বিজ্ঞান যেমন আছে, বহির্জগতেও তাহা তেমনই বর্তমান। নামরূপে খণ্ডিত প্রত্যেক পদার্থে সেই বিজ্ঞানই সত্য,—তদতিরিক্ত যাহা তাহা “বিশেষ”, তাহা নাম ও রূপ, তাহা আরোপিত, তাহা সত্য নয়। নাম রূপের আবরণ উন্মোচিত হইলে এক অথও বিজ্ঞানই অবশিষ্ট থাকিবে। কিন্তু ভ্রান্তির কারণ এই নামরূপ আরোপিত হয় কেন?

নাম ও রূপের আবরণযুক্ত হওয়া, তাহাদের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সহজ অর্থ দেশ ও কালে প্রকাশিত হওয়া। নামরূপহীন অবস্থা—অব্যক্ত অবস্থা, দেশকালের অতীত অবস্থা, প্রলেয়ের অবস্থা। নামরূপ কোথা হইতে আসিল? ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—জগৎ এক; অদ্বিতীয় সংস্করণে বর্তমান ছিল, তিনি ইচ্ছা করিলেন বহু হইতে, এবং তেজ, জল ও অগ্নির সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে অল্পপ্রতিষ্ঠ হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন। ইহার অর্থ যখনই সেই অনন্ত বিজ্ঞানময় পরমাত্মা আপনার বিজ্ঞানকে সঙ্গী করিয়া জীবরূপে পরিণত হইলেন, তখনই সেই জীব নামরূপের বন্ধনে আবদ্ধ হইল, সমগ্র জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া সামগ্রিক দৃষ্টি হারাইল। সসীমত্বের ইহা অবশুস্তাবী ফল। সেই অনন্ত বিজ্ঞানঘন ব্রহ্ম নামরূপ নাই, আছে আমাদের সান্ত দৃষ্টিতে এবং যত দিন আমাদের সসীমত্ব থাকিবে তত দিন নামরূপও থাকিবে। এই সসীমত্ব কখনও যাইবে কি?

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—“ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি।” “প্রেত্য” শব্দের সাধারণ অর্থ “মরিয়া”, “মৃত্যুর পরে”। এই অর্থ ধরিলে মহর্ষির কথার অর্থ হয় “মৃত্যুর পরে বিশেষ-সংজ্ঞা থাকে না—অর্থাৎ জীবাত্মারূপে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলোপ হয়। কিন্তু মৃত্যুর পরেই যে বিশেষ-সংজ্ঞার লোপ হয় তাহা মহর্ষির বক্তব্য না হইতেও পারে। আচার্য্য শঙ্কর অর্থ করিয়াছেন “ন তত্র প্রেত্য বিশেষসংজ্ঞাস্তি কার্য্য-কারণ-সংঘাতেভ্যঃ বিমুক্তস্ত।” অর্থাৎ—“কার্য্যকারণ সংঘাত হইতে বিমুক্ত যিনি, তাহারই সেখানে (ব্রহ্মধামে) গমন করিয়া বিশেষ-সংজ্ঞা থাকে না। ইহা মোক্ষ-প্রাপ্তের পক্ষেই প্রযোজ্য, সকলের পক্ষে নহে।” কিন্তু এই গতি, এই মোক্ষ, এই ব্রহ্মপ্রাপ্তি—ইহাকেই কি অমরত্ব বলা যায়? কাহার অমরত্ব? পরমাত্মার অমরত্ব তো

আলোচ্য নহে? মৈত্রেয়ী চাহিয়াছিলেন কিরূপে তিনি নিজের অমর হইতে পারিবেন—কার্য্যকারণ-সংঘাত-যুক্তা থিয়া ভাবাপন্ন মৈত্রেয়ী নামধেরা জীবাত্মায় অমরত্ব লাভ কিরূপে হইতে পারে, তাহাই জানিতে। কিন্তু মহর্ষি যাহা বলিলেন তাহাতে বিত্তবর্জন ব্রহ্মজ্ঞানের পরিণাম ও জ্ঞাপ্রজ্ঞা কাত্যায়নীর পরিণাম হইতে ভিন্ন নহে। বরং মোক্ষের জন্য প্রযত্নবতী মৈত্রেয়ীর বিনাশ সংসারাসক্তা কাত্যায়নীর

বিনাশের বহুপূর্বেই সংঘটিত হইবে। “ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি।” মহাভূতের সংজ্ঞা তো চিরকাল আছে, চিরকালই থাকিবে। সে সম্বন্ধে মৈত্রেয়ীর সংশয় ছিল না। সংশয় ছিল—তাহার নিজের বিশেষ-সংজ্ঞা সম্বন্ধে। মহর্ষি তাহাকে বলিয়া দিলেন বিশেষ-সংজ্ঞা থাকিবে না। জানি না এই বিশেষ-সংজ্ঞা লোপ রূপ বিনাশকে অমৃতত্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে মৈত্রেয়ী স্বীকৃত হইয়াছিলেন কি না।

## আজ—আগামী কাল

### শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৩৩

কয়েক দিন পরে মালতী ফিরে এল। বললে, বড় ভুল করেছ কলকাতায় না গিয়ে। ঈদের দিন যদি থাকতে—বলতে যাহুকরের বাড়ি ছাড়া এ জিনিস সম্ভব নয়। হিন্দু-মুসলমানের এমন মিলন আর কোনদিন দেখবে না।

প্রশান্ত অল্প হেসে বললে, তোমার চোখ ছলছলিয়ে উঠল দেখেই বুঝতে পারছি—

দূর! বলে আঁচলে চোখের কোণটা মুছে মালতী হাসল। তবে একটা খবর তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি—চৌধুরী ছাড়বেন না তোমায়—এক সপ্তাহের মধ্যে এখানে আসছেন তিনি।

প্রশান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল, কি মুশকিল—আমি এখনও সেরে উঠি নি যে।

সেরে উঠেছ—বাইরে তোমাকে দেখলে কেউ বলবে না অসুস্থ, তবে মনের অসুস্থ আলাদা জিনিস। কয়েক দণ্ড চূপ-চাপ কাটল। মালতী আর একটু সরে এসে ওর একখানা হাত হাতের ওপর তুলে নিয়ে কোমল কণ্ঠে বললে, কি হয়েছে আমাকেও বলবে না?

প্রশান্ত হাসবার ভঙ্গি করে বললে, কিছুই হয়নি—ভাল লাগছে না শুধু।

আচ্ছা—হাত ছেড়ে দিয়ে মালতী অভিমানে খানিকটা দূরে সরে এল। চলেই যাচ্ছিল স্বর ধেকে। ত্রিক বাবার ইচ্ছায় নয়—ভক্তিতে অন্ততঃ সেটা দেখালে। প্রশান্ত ওর এই নিঃশব্দ অভিমানটুকু বুঝলে। বুঝে ডাকলে, শোন।

মালতী ফিরল। খানিকটা ব্যবধান বজায় রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রশান্ত বললে, তুমি কেন আমার জন্ত কষ্ট পাও। বুঝতে পারছ না কি—আমি ফুরিয়ে গেছি। আমার দ্বারা আর পৃথিবীর কোন কাজ হবে না।

এই কথায় মালতীর হৃৎস্রোতের দ্বিগুণ হ'ল—মমতায়, প্রেমে সে বিগলিত হয়ে উঠল। এগিয়ে এসে আবার প্রশান্তর হাতখানি তুলে নিয়ে ছ' হাতে চেপে ধরলে। কান্নার আভাসে ওর কণ্ঠধর করুণ হয়ে উঠল। না না, ও কথা বলো না। তোমাকে ফিরতেই হবে—বাঁচতেই হবে। এ ভাবে তিলে তিলে তোমাকে আয়ত্ব্য করতে দেব না আমি। শেষের দিকে কণ্ঠে ওর দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল।

প্রশান্ত মুখ তুলে মালতীর পানে চাইলে—তার পর বাঁ হাত দিয়ে মালতীর হৃৎখানি হাত চেপে ধরে বললে, তাই হোক।

অনেক সংবাদ এনেছে মালতী। একটা পেপার মিল স্থাপনের পরিকল্পনা চলছে। স্বাধীন হ'ল ভারতবর্ষ—সংবাদ-পত্র চালনার জন্ত পশ্চিমের মুখ চেয়ে সে বসে থাকবে কেন? তবে এ কাজে যে সব আধুনিক যন্ত্রপাতির দরকার, তা পেতে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এনামেল-শিল্পের ভবিষ্যৎও বেশ উজ্জ্বল। চৌধুরী কয়েকজন অংশীদার জুটিয়ে অনেকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠান চালু করবেন—এই আশা করছেন। দেশ যখন স্বাধীন হ'ল তার শিল্প-সম্পদ না বাঁড়ালে স্বাধীনতার মূল্য থাকবে কেন। শ্রমিকদের সঙ্গে একটা রফাও নাকি করতে হবে। প্রশান্ত বোধ হয় জানে—ভারতের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের উদ্বোধন হবে গীর্জাই। জাতির শক্তি যাতে ক্ষমতালোভীর নেতৃত্বে অপচিত না হয় তার জন্ত এই ধরণের সজ্জ প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। শ্রমিকে-মালিকে আর শাসকে সহযোগিতা না থাকলে কেউ বাঁচতে পারবে না। বহু দেশেই শিল্পকে জাতীয় সম্পদে রূপান্তরিত করে রাষ্ট্র তথা সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্য যথেষ্ট হয়েছে—আর হবেও, তবে মেকি দিয়ে সত্যকে ঢেকে রাখতে পারে না কেউ চিরকাল। বিলেতে কল্যাণ-খনির কথা নিশ্চয় প্রশান্ত জানে।

প্রশান্ত আশ্চর্য্য হ'ল মালতীর এই ধরণের কথা শুনে। শোনা কথা নিয়ে এতক্ষণ ধরে আলোচনা চালাতে পারে কেউ? মালতী যা ছিল না—তারই দিকে এগিয়ে চলেছে। গভীর চিন্তার ছাপ ওর মুখে। প্রকৃত চক্ষুতেও ছায়া ফেলছে চিন্তা। আত্মচিন্তা ঠিক নয়—বাহীন ভারতবর্ষকে নিয়ে চিন্তা। কিসে দেশ উন্নত হবে, সমৃদ্ধ হবে, সম্মানিত হবে বিশ্ব-সভায় সেই চিন্তা। নতুন পৃথিবী রচনার স্বপ্ন-ধোর ওর চোখেও লাগল বুঝি।

অবশেষে ও সঙ্কল্প করলে কলকাতায় ফিরে যাবে।

কিন্তু পরের দিন খবরের কাগজ পড়ে ও স্তম্ভিত হ'ল। কলকাতায় আবার আত্মঘাতী হানাহানি শুরু হয়েছে। শাস্তিদূত উপস্থিত থাকতেও হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জলে উঠল। অভিশপ্ত ভারতবর্ষ! ছশো বছরের পরাবীনতা তার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে।

পরদিন ছপূরে বৈঠকখানায় বসে ওরা পরামর্শ করলে কালই কলকাতায় ফিরে যাবে। মহাত্মা অনশন আরম্ভ করেছেন, এই ভ্রাতৃহনন যজ্ঞে আত্মাহুতি দেবেন। ছাত্রেরা বেরিয়েছে শান্তিমিছিল নিয়ে। বেরিয়েছে অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের—বালক-যুবক-যুগ্ম-মহিলা। অকুতোভয়ে, তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র—প্রচার করছে শান্তির বাণী। স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে গান্ধীজীর অমূল্য জীবন যাতে নষ্ট না হয় তারই চেষ্টা চলছে দিনরাত।

হকার খবরের কাগজ দিয়ে গেল। মালতী দোরের কাছ থেকে কাগজখানা উঠিয়ে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়েই চীৎকার করে উঠল, কি সর্বনাশ!

এই দেখ—। কাঁপতে কাঁপতে ও বসে পড়ল প্রশান্তর পাশে। এই দেখ—বড় বড় হরফে ক্షিপিত আঙুল ঠেকিয়ে ও বললে, ছর-ভেরা শান্তিমিছিল আক্রমণ করেছিল। শচীন মিত্র স্মৃতিশ বঁড়ুজ্জে হ'ত হয়েছেন—আরও অনেকে সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছেন। উঃ—

প্রশান্ত রুদ্ধ নিশ্বাসে ঘটনার বিবরণ পড়ে যেতে লাগল। উত্তেজিত মুহুর্তে ওর কণ্ঠধর উচ্চ হয়ে উঠল—কৈপে কৈপে উঠতে লাগল। আহত নামের তালিকায় এসে হঠাৎ ও চৈতন্যে উঠল, মলয়—মলয়ও আহত হয়েছে। আরাত গুরুতর।

বৈঠকখানার ওপিঠে একটি কাতরোক্তির সঙ্গে গুরুভার দ্রব্যবিশেষ পতনের শব্দ হ'ল। মালতী তাড়াতাড়ি জানালা খুলে চোকির ওপর উঠে পাঁচিলের ও-পিঠে চেয়েই ভীতকণ্ঠে বললে, দেখ, দেখ—ও বাড়ির গিন্নী অজ্ঞান হয়ে উঠোনে পড়ে গেছেন।

সুচিক্রাণকে দেখে প্রশান্ত অবাক হয়ে গেল। চিত্তের সৈরীরা ওকে মহীয়সী করে তুলেছে কিংবা পাষণ করে দিয়েছে হয়ত। যার একমাত্র আশ্রয় ভেঙে পড়ল অকস্মাৎ—সে কি করে অরান মুখে সহজভাবেই উচ্চারণ করলে, ঠাকুরপো—এইবার আমাকেও তোমাদের শান্তিমিশনে টেনে নাও—ওর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করি।

প্রশান্ত বললে, তার দরকার হবে না বৌদি—দাদা ধেমেরে গেছে।

সুচিক্রা বললে, গান্ধীজী যে হৃদয়ের পরিবর্তন আশা করেন তা হয়েছে কি?

না হোক—উনি অনশন ভঙ্গ করেছেন—হিন্দু-মুসলমান মিলে ওকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ভাল। একটু ধেমেরে বললে, কিন্তু মানুষ ত মানুষই, মহাত্মা নয় ঠাকুরপো। তাঁর সাধনা আছে—অথচ সাধ্যে কুলোয় না এমন তো অনেকবার দেখা গেল। আমাকে যে কোন কাজ দাও—আমাকে বাঁচাও।

প্রশান্ত বুঝলে—সুচিক্রার অন্তরের বেদনা। নির্দারুণ শোককে ও কাজের চাপে ডুবিয়ে দিতে চায়। ওর গৃহ আজ দিগন্তে মিশেছে—আরাম-বিলাসের চিন্তা আগুনের মতই দগ্ধ করছে। এমন গভীর বেদনা থেকেই তো মানবকল্যাণ-ভ্রতের সঙ্কল্প নেয় মানুষ। আমাদের মধুরতম সঙ্গীতের মর্ম্মমূলে রয়েছে গভীরতর শোকের আঘাত—কবির এ বাণী অমর সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

বললে, আপনি নিশ্চিত থাকুন বৌদি—কাজ আপনাদের মিলবে। যাবার আগে বললে, সত্যিই কি দেশে ফিরে যাবেন না?

আজ নয় ঠাকুরপো। হয়ত সেখানেই যেতে হবে। এখানকার কাজ যেদিন শেষ হবে—

এখানকার কাজ শেষ হবে না বৌদি—ঐষ্ট ক্রুশবিক হয়েও জগতে করুণা জাগাতে পারেন নি—গৌতম সাধনায় বুদ্ধ লাভ করেও জরা-মৃত্যু উত্তীর্ণ হবার ভেলা তৈরি করতে পারেন নি। যেটুকু আলো জ্বলেছে—পৃথিবীতে অন্ধকারের পরিমাণ তার বহুগুণ বেশী।

তবু আলো জ্বালাতে হবে। আলো না জ্বলে আমরা টাই পাব কোথায়।

সুচিক্রাণকে মুখে সাহস দিলে—মনে মনে জানালে প্রণতি। সঙ্কল্প করলে, আবার সে কাজ করবে। যে কালে সে রয়েছে সে কালের দাবি তাকে পূরণ করতেই হবে—আর অনাগত কালকেও স্বাগত জানাতে হবে। সমস্ত বন্ধনের মূলে রয়েছে জাঘা—সে বন্ধন ছেদন করতেই হবে।



থেকে নয়—কাজকে ভালবেসে—সুখ-দুঃখকেও গ্রহণ করতে হবে। উদাসীনের ধর্ম সংসার নয়—সংসারীর ধর্ম নয় শাল্লবচন আউড়ে কর্মবিমুখ হওয়া। মান-অভিমান, তুচ্ছ হৃদয়ের আবেগ, উত্তেজনা সবকিছুকেই মেনে নিয়ে—কখনো হাসিতে কখনো কান্নায় অতিক্রম করতে হবে পথ। ভুল ভ্রান্তি স্বীকার করে মনঃ না হোক সহজ হতে হবে। সহজ হওয়া আজকের দিনে কত যে শক্ত সভ্যতা-নাগিনীর পাশবিক মাহুত তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে।

শুভার চিঠিখানা হাতে করে এই ধরণের কথাই সে ভাবছিল। যে দিকের ছয়ার ঘটনার প্রবাহে একদিন বন্ধ হয়ে গিয়েছে—সেই রুদ্ধবারে নিষ্কল কামনায় কন্ঠাঘাত করার কোন সম্ভব অর্থও তো নাই। অথচ বুঝাপড়ার জুজু সেই ছয়ারে গিয়ে তাকে দাঁড়াতেই হবে—মালতী তার পাশে থাকা সত্ত্বেও।

শুভা তাকে আস্থান জানিয়েছে, দৃঢ় সম্বন্ধ স্বযোজিত তুষারকণার মত অমনি দ্রব হতে আরম্ভ হয়েছে। হাঁ, সে যাবে। শুভাকে আর একবার বোঝাবে—যে পথ তুমি বেছে নিয়েছ—তা কল্যাণের পথ নয়। গণ-অধিকারের দাবি জানিয়ে শ্লোগান ছুঁড়ে মারার নাম—গণবিপ্লব সাধন নয়। ও হ'ল দেশলাই কাঠির আগুন—ছোট কাঠির আগায় যা বহন করছে তা পরিমাণে অল্প, স্থায়িত্বে আয়তন। ওর মধ্যে 'ভাল করছি'র গুরুত্ব প্রচুর—'সব জানি'র অহঙ্কার আকাশস্পর্শী—তরঙ্গের কুলুধ্বনিতে মিশে আছে রাশি রাশি ফেনা—স্বয়ংের কিরণে যা শুকিয়ে যায়।

চিঠির তারিখ বহু দিন আগের। ফ্যাক্টরীতে তখন আসন্ন ধর্মঘটের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। আপোষ-আলোচনা এক দিকে ব্যর্থ হবার উপক্রম হয়েছিল—অল্প দিকে গোপন চুক্তির ফলে শ্রমিকস্বার্থ বলি দিয়ে নেতারা উপরে উঠবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন ধর্মঘটের রসদ সংগ্রহ করছি। আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি।

শুভা লিখেছে : একবার এস কমরেড—দোঁটানায় পড়ে গেছি। হৃদিক বজায় রাখা চলবে না—বুঝতে পারছি। তবু পথ বেছে নেবার আগে—তোমাকে সব খুলে বলব। অসুস্থতা নয়—পরামর্শও নয়—তোমাকে উপদেশ দেবার সম্বন্ধও নয়—শুধু একবার এস—পথ আমার ঠিক করাই আছে—যাবার আগে তোমাকে জানিয়ে যাব শুধু।

বহুদিন আগেকার আস্থান—রক্তে নতুন করে দোলা দিলে। এ আস্থানের ভাষা পুরাতন হয় নি—হয়ত শুভা তার শেষ কথাটি তাকেই বলে যাবার আশায় এখনও প্রতীক্ষা করছে—সেই আলো-বাতাসবিক্ত জীর্ণ স্নাতস্নেতে ধর-খানিতে। সেখানে জ্বলছে যুগ বায়ু-শিহরিত তৈলবিন্দু-নিঃশেষিত একটি প্রদীপ—তারই স্নান আলোতে করতললয়

চিবুকে—চিটার গুরুভার বহন করছে সে; চুল কক্ষ—গণ্ডে বলিরেখা—চক্ষুতে কালিমা।

ঝড়ের বেগে প্রশান্ত এসে পৌঁছল সেই বাড়ীর সামনে। মুহূর্ত্ত মাত্র ইতস্তত না করে সে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল।

ঘরের মধ্যে বসে খুকী এক মনে কি লিখছিল। ইঙ্কুলের গড়া তৈরি করছিল হৃদয়। প্রশান্ত আসতেই উৎফুল্ল মুখে উঠে দাঁড়াল। বললে, বসুন—মাকে ডেকে আনি।

ও ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল—প্রশান্ত থপ করে ওর একখানা হাত চেপে ধরে বললে, আরে—তোমার সঙ্গেই গল্প করতে এলাম যে।

খুকী হাসল। ও বুঝতে পারে কার সঙ্গে গল্প করার জুজু প্রশান্ত এসেছে—হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে বললে, দিদি কিন্তু এখানে নেই—তা বলে দিছি।

সে কি—তোমার দিদি গেলেন কোথায়?

বাঃ—আপনি জানেন না বুঝি? সে ত কবে চলে গেছে।

সবিস্ময়ে প্রশান্ত বললে, চলে গেছে? কোথায়?

তা কি করে জানব—মাকে ডেকে আনি—তিনি বলতে পারবেন।

প্রশান্ত ওর হাত ছেড়ে তত্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শুভার স্নান-জানেন না মেয়ে কোথায় গেছে। প্রায় মাস দুই হবে সে চলে গেছে। বলে গেছে ফিরতে দেবী হবে। বাইরে তার নাকি অনেক কাজ।...চিঠিপত্র আসে মাঝে মাঝে—ঠিকানা থাকে না। পোষ্টাফিসের মোহরের ছাপ এক জায়গার নয়। টাকাও আসে অত্যন্ত কম—কোন রকমে আসাচ্ছাদন চলে। তাতেও হুঃখ নেই শুভার মার—কিন্তু মেয়ে যে ভেসে গেল—সংসারে ঠাই পেলে না—এই হুঃখ শৈলের মত বিধে আছে বুকে। যে-মেয়ে স্বামী পেলে না, সংসার পাতলে না—তার মেয়ে-জন্মই যে স্বপ্ন। কোন সান্ত্বনায় বুক বাঁধবেন তিনি।

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, এ ভাবে তার চলে যাওয়ার কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন।

না বাবা—জানই তো সে মেয়ে খেলালী। পুরুষের সঙ্গে সমান তালে তর্ক করে ঝগড়া করে। যেদিন সে চলে যায় তার দু'দিন আগে দু'জন লোকের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়—সে একরকম ঝগড়াই। তাদের সঙ্গে মতের মিল ছিল না ওর।

তাঁদের চেনেন আপনি?

মানে বারকতক তাঁরা এসেছিলেন এখানে। ভারি ভাল লোক। তাঁদের কাছেই বুঝি ও কাজ করত—কারণ মাঝে মাঝে তাঁরাই টাকাপয়সা দিয়ে যেতেন। এ-বাজারে এমনিতে কে কাকে সাহায্য করে বাবা।

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, তাঁদের সঙ্গে কগড়াই যদি হয়ে থাকে তাতে ধর ছাড়বার যুক্তিটা ঠিক বোকা গেল না। তাঁরা তো নিকট-আত্মীয় নন।

না—। কিন্তু একটু দাঁড়াবে বাবা—একটি জিনিস তার বাস্তব থেকে পেয়েছি—তাতে অনেক কথা লেখা আছে। সব আমি বুঝতে পারি নি। দাঁড়াও বাবা, আমি আসছি। তিনি দ্রুতপদে চলে গেলেন এবং ফিরে এলেন দ্রুতপদেই। একখানি ছোটমত ডায়েরি প্রশান্তর হাতে দিয়ে বললেন, এইটি পড়লে হয়ত অনেক কথা তার জানতে পারবে। পড়ে দেখো।

প্রশান্ত সঙ্কোচ প্রকাশ করলে, কিন্তু—এ পড়া কি আমার পক্ষে অত্যাশ্চর্য হবে না।

একটুও না। আমি তার মা, আমি বলছি—একটুও অত্যাশ্চর্য হবে না।

তবু—প্রশান্ত নতমুখে চেয়ে রইল ডায়েরিখানির দিকে।

শুভার মা হাসির ভঙ্গি করলেন, বয়স আমার কম হয়নি বাবা—এ সংসারে অনেক দেখলাম—অনেক শুনলাম। কিসে কার অধিকার সে আর আমাকে বোঝাতে হবে না বাবা। মেয়ের যদি আমার কপাল মন্দ না হবে তো তুমিই বা দূরে সরে থাকবে কেন?

প্রশান্ত লজ্জায় আরক্ত মুখে ডায়েরির একখানা পাতা খুলে তার ওপর মুখে পড়ল। বললে, কাল এখানা ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

সে তোমার ইচ্ছে। খানিকটা এগিয়ে এলেন তিনি। হাতখানা একবার বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ গুটিয়ে নিলেন। দ্বিধায় সঙ্কোচে ভীক চোখে চাইলেন প্রশান্তর পানে। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, মাঝে মাঝে খবর নিও বাবা, তোমার ভরসাই আমার সবচেয়ে বড় ভরসা।

আসব, বলে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল প্রশান্ত।

৩৫

ডায়েরির পাতা উন্টে যাচ্ছে প্রশান্ত। পুরো ডায়েরি নয়—ছাড়া ছাড়া ঘটনাগুলিকে জুড়ে—রঙ ফলিয়ে কাহিনী রচনা করবার প্রয়াস নেই এর মধ্যে। এ অভ্যস্ত খাপছাড়া এলোমেলো চিত্রা—অক্ষরের ছাঁচে বন্দী হয়ে আছে পরিমিত পৃষ্ঠায়। কোথাও স্পষ্ট—কোথাও বা কুয়াসাজ্বর। কাটা-কুটি—লাইনবীকা লেখা—চঞ্চল ও দ্রুত সঞ্চরণশীল মনোভাবকে প্রকাশ করছে। তারিখের ধারাবাহিকতা নাই—কতকগুলি ছিন্ন চিত্রকে জোড়া লাগিয়েও একটি মীমাংসায় পৌছানো দুস্কর। তবু এগুলি যেন অনাবিস্কৃত দেশ—প্রশান্তর কাছে গভীর রহস্য সমাধানের ইঙ্গিত বহন করে আনছে। অপরাঙ্কে ঘরের ছয়ার বন্ধ করে এক নিশ্বাসে অনেকখানি

সে পড়েছে—গভীর রাত্রিতে রক্ত দারকক্ষে আবার অক্লান্ত রহস্যের পাঠোদ্ধারে মগ্ন হ'ল সে।—যেখানটা তার ভাল লাগছে—হুঁবার তিনবার করে পড়ছে। তন্ময় হয়ে পড়ছে। বাইরে ক্ষুণ্ণক্ষের রাত্রি ক্রমে গভীর হচ্ছে—নীরব হচ্ছে সে খেয়াল তার নেই।

এক জায়গায় আছে :

আজও প্রশান্ত এসেছিল। ওর সঙ্গে বেশ খানিকটা তর্ক হয়ে গেল। ও একটা কথা ভুলে আছে যে হুঃখীর হুঃখ-মোচনপ্রয়াস ওর অন্তরের বস্তু নয়। দয়্যাস্তি মানুষকে কোমল করে—অহঙ্কৃত করে। সাধারণের চেয়ে উচুতে উঠে নিজেদের পরিতৃপ্ত বোধ করে না কি? ও কি করে বুঝবে দারিদ্র্যের বেদনা—ও তো দরিদ্র নয়।

পরের পাতায় :

বর্ষষট যদি হয়ই আমি কি করতে পারি। যারা পেট ভরে হুঁবেলা খেতে পায় না—তাঁদের দাবিকে অত্যাশ্চর্য বলবে কোন্ যুক্তিতে? তোমার শিল্প উৎপাদনে কি ব্যয় পড়ল—তোমার যুনাফায় কোথায় ধরল টান—আধপেটা খেয়ে কোন দুর্গত রাখতে পারে তার হিসাব। জুধাকে নিরস্ত করবার সবচেয়ে বড় যুক্তি অন্ন—উৎপাদনের আয়ব্যয় লাভ-লোকসান এসব তো তুচ্ছ ব্যাপার। হাঁসকে মেয়ে ফেললেই একসঙ্গে অনেকগুলি সোনার ডিম পাওয়া যায় না সত্য—কিন্তু সোনার ডিমের লোভ অন্নপ্রাপ্তির চেয়ে বড় বস্তু এটাই বা ভাবছ কেন। পৃথিবীতে দুর্দিন এসেছে—মানুষের সুখামান্দ্য তো ঘটে নি। খাত-শস্ত্রের দাম পাঁচ ছ' গুণ বাড়িয়েছ—সিকি ভাগ মাইনে বাড়াতে যত আপত্তি তোমাদের। তোমরা বুজ্জিয়া নও বললে সর্বস্বকারার মেনে নেবে কেন? তোমরা কথার কৌশল জান—অন্ধের কৌশল জান—ষ্টাটিস্টিকসের দোহাই তোমাদের প্রতি যুক্তিতে। সে যুক্তি বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়ত বিবেকগ্রাহ্য নয়—সহজবোধ্য তো নয়ই।

কয়েকখানা পাতা উন্টে পাওয়া গেল :

একটা সভায় বক্তৃতা দিলাম। প্রথমটা অত্যন্ত সঙ্কোচ হচ্ছিল—কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। ভাল ভাল কথা বা যুক্তি-গুলো ভাবের স্রোতে একই সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে বেরুতে চাইছিল—আর একসঙ্গে বেরুনোর জ্ঞান কোনটাই স্পষ্ট হ'ল না। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল, নিজের অক্ষমতা বুঝে বসে পড়লাম।

অতঃপর :

আজ বক্তৃতাটা ভালই হয়েছে। যাদের উদ্দেশ্যে কথাগুলি বললাম—তারা হাততালি দিয়ে সম্বর্দনা করলে। আজও মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল—অক্ষমতার দরুন নয়—নিজেকে উপযুক্ত মনে করে।

কয়েক দিন পরের একটি তারিখে এসে পৌছল প্রশান্ত :

যখন বক্তৃতা দিই—নিজেকে বেশ ধানিকটা উঠু মনে হয়। আজকাল ভাল কথা যুক্তি কিছুই আটকায় না। ধানিকক্ষণ বলার পর আরও বলতে ইচ্ছা হয়। এ-ও কি নেশা? শুনেছি সুরার ক্রিয়ায় দেহমনে উত্তেজনা জাগে—অনেকটা এই রকমের উত্তেজনা কি? নইলে নিজেকে যোগ্য মনে করে ক্ষীত হয়ে উঠি কেন? শুনেছি নেশা কাটলে আসে অবসাদ। ডায়েরি লিখতে লিখতে অবসাদ অহুভর করছি। আমার কেবলই মনে হচ্ছে গোর্কির সেই কথা: You are not that which you want to appear. আমি যা নই ভঙ্গিতে ভাষণে চালচলনে তাই হবার চেষ্টা করছি।

পর পৃষ্ঠায় :

না—বক্তৃতা আর দেব না। সত্যিই আমি তো তা নই। চাষীর দুঃখ, মজুরের দুঃখ হয়ত বুঝি—দারিদ্র্যের সঙ্গে আমারও আরালোর পরিচয়। তবু আমি গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে—যাকে বলে মধ্যবিত্ত। আমি চাষী নই—মজুর নই। এক এক সময় মনে হয় সাম্যবাদের নামে ওদের হিংসাকে ওদের লোভকে জাগিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করছি না তো। আচ্ছা, আমাদের কয়েকজন নেতাকে লক্ষ্য করব।

তারপরের মন্তব্যগুলি লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে। কাটাকুটির মধ্যে একটি লাইন এই: নেতারা সবাই মধ্যবিত্ত পরিবারের।

কয়েকটা তারিখ পার হয়ে...আছে :

ধর্মঘট সর্বত্র সফল হচ্ছে না—কারণ শ্রমিকরা ভালমতে সজ্জব নয়। তা ছাড়া শ্রমিক-সংগঠন আঙ্গুপিছু ডেবে না দেখেই কাজে ঝাপিয়ে পড়ে। রীতিমত ফণ্ডের সৃষ্টি না হলে ধর্মঘট সফল হবে কেন। যে ক্ষুধা মেটাবার জন্ত এই আয়োজন তাকেই সাধী করে কখনও যত্ন করা সম্ভব। দাঁড়াবার ঠাই না থাকলে বলবার শক্তি আসবে কোথা থেকে।

এক জায়গায় আছে :

অবস্তীর টাকা নিলাম। না নিলে সংসারের অভাব মিটছিল না। কিন্তু কেন নিলাম। আমি তাকে দিতে পেরেছি কি কিছু? দেওয়া নেওয়া সমান মানে না থাকলে সমাজের সুর কাটে—মনের তালও কাটে। কাল প্রশান্ত যা বলে গেল—তা ভাবছি। সত্যিই তো ছনো দাবি চাপিয়ে আধাআধি পেয়ে মিটিয়ে ফেলা মানে আপোষ-নিষ্পত্তির ব্যাপার। এটা যেন ভয় দেখানো ও ঘৃণা ঝাওয়ার মত ঠেকছে। অধিকাংশ ধর্মঘট এইভাবে মিটছে। এ পথ ভাল নয়।

অন্ততঃ

দাশগুপ্ত কিছুতেই বুঝবেন না—বীকা পথ কল্যাণের পথ নয়। সজ্জের শক্তি বাড়াবার জন্ত মালিকদের সঙ্গে টাকা

নিয়ে রফা করার যুক্তিটা কি। শ্রমিকদের বোঝানো হ'ল, এ হচ্ছে রসদ সংগ্রহ। ভবিষ্যতে তোমরা যাতে ভাল ভাবে লড়তে পার তারই প্রস্তুতি এটা। ছলে বলে অথবা কৌশলে। আমি বললাম, অপকৌশল। উনি ক্রুদ্ধ হলেন, বেশ বুঝা গেল। বক্তোক্তি করলেন; গান্ধীর ছোঁয়াচ লেগেছে। সত্য কি শুধু গান্ধীরই একচেটে? আশ্চর্য।

তারপর লিখেছে :

শ্রম আর মূল্য-বিনিময়ের কথাটা প্রশান্ত মন্দ বলে নি। ছায়া পরিশ্রমিকের বিনিময়ে ছায়া শ্রম এত দিতেই হবে—এরই ভিত্তিতে আমরা দূত করতে পারব এই আন্দোলনকে। নইলে আধাআধি রফায় কারো বিশ্বাস অর্জন করা যায় না। যে শোষণের বিরুদ্ধে আমাদের জেহাদ ঘোষণা সেই শোষণকেই সমর্থন করা হচ্ছে এই নীতির দ্বারা। গুপ্ত বললেন, কিসে? বললাম, নয় কিসে? আপনারা শ্রমিকের হয়ে যে দাবি জানাচ্ছেন তা কি ধনিক-শোষণের যত্ন নয়। দাবি জানিয়ে পুরোপুরি যদি আদায় করতে পারেন তবে বুঝব দাবি আমাদের যথার্থ। রফা মানেই তো মানহানির মারলা।

অত্যন্ত অস্পষ্ট লাইন ক'টিতে বিক্ষিপ্ত মনের পরিচয় আছে : মাকে তিরস্কার করেছে—কটু বলেছি। প্রশান্তকেও কটু কথা বললাম, আমাদের দুঃখ দেখে ওর অর্ধসাহায্যের হেতু কি থাকতে পারে। ওর রক্তে নীল রঙের নেশা জমেছে, ও জগৎকে কিনতে চাইছে।...হলদে চিরকুটখানা হাতে আঙুলের শিখার মত জ্বলছে। জানি এ কার লেখা। কতবার প্রতিবাদ জানিয়েছি এ নিয়ে। ক্ষুধার্তের অন্ন প্রার্থনার দাবিতে যুদ্ধের তহবিল পূর্ণ করবার কি অধিকার আছে। এ নিয়ে আমরা বিলাস করছি হয়ত।

তারপর—

ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে অনেক কিছু। পেলেই মানুষ তৃপ্ত হয় না—অজ্ঞেরও প্রয়োজন আছে। যত তার স্বভাবের ক্রিয়া। নানান রকমের যুদ্ধ। ক্ষমতামদের মত—এ পাওয়ার বাসনা কমে না বাড়ই। এ দৃষ্টিকে করে সঙ্কচিত আবির্ভাব, একাংশে লয়।...পৃথিবীর বড় দিক আছে—নানা বিপরীতবর্ণী সমস্তা আছে। সব দুঃখের কারণই খাঁটি নয়, ছায়া নয়। তর্ক করলাম—কলহ করলাম—ওঁরা কিন্তু অবিচল। বললেন, এ দাবি প্রত্যাখ্যার করব না আমরা। শ্রমিকরা কিছু পেলেই আপাতত সন্তুষ্ট হবে। নইলে বহুদিন ধরে ধর্মঘট চালানোর মনোবল বা অনবল ওদের নাই। ওঁরা চলে গেলেন। ভাবছি—পার্টীর কাজে ইস্তফা দেব কিনা।

তারপরের লাইনগুলি স্পষ্ট—বড়—

না ইস্তফা দেব না—শেষ পর্যন্ত এই অজ্ঞের বিরুদ্ধে লড়াই করব—এ প্রধার সংস্কার করব। শ্রমিকের সঙ্গে—চাষীর সঙ্গে জীবনকে মিশিয়ে দিয়ে ওদের প্রকৃত মর্মকথাটি বুঝতে

চেষ্টা করব। যুদ্ধই যখন মানবীয় যুক্তির অপরিহার্য ধর্ম তখন সে ধর্ম কেন পালন করব না। ভীতুর মত পলায়ন আমার স্বধর্ম নয়।

এর পর তিনটি পাতায় লেখার ঠাসবুনানি—কাটা ও লাইনগুলি বাঁকা আর কালি ঝারঝানো। বোকা যাচ্ছে চিত্তের স্বৈর্য্য হারিয়েছে। কোথাও অস্পষ্ট লেখা আছে; এ সংসারের ভার ওর ওপরেই দেব কি? ওকে চিঠি লিখলাম। তার পরেই মন্তব্য রয়েছে; সব ভাবনা একসঙ্গে ভাবা যায় না। আমার যথাসাধ্য সাহায্য করব—কিন্তু সংসার থেকে দূরে যেতে হবে। ছুঁথের পাকৈ গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে ছুঁথটাকে জদয়ঙ্গম করা সহজ—কিন্তু সমস্তার সমাধান তাতে হবে না। পাকৈর বাইরে একটা পা না রাখলে আর একটা পাকে পাক থেকে তুলব কি করে।

হুঁ একজনকে সঙ্কল্পের কথা বললাম। ওরা হাসল, বললে, ভীক। ধর্মবর্ষ যত এগিয়ে আসছে—হুঁরল যুক্তির জালে জড়িয়ে আমি নাকি চাইছি পিছিয়ে যেতে। কিন্তু আমি তো জানি যুদ্ধ হবে না—এ শুধু যুদ্ধের অভিনয়।

প্রায় শেষ পাতায় এসে পৌঁছল প্রশান্ত। কাকেই বা জানাই সঙ্কল্পের কথা। সবাই ভুল বুঝল। কিন্তু একজনকে না জানিয়ে আমিও তো স্বপ্তি পাচ্ছি না। প্রশান্তকে জানাব কি? না—ছিঃ। তার চেয়ে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব পত্র লিখে। সে একদিন কাছে আসতে চেয়েছিল—পথের বাঁধা তখন ছিল দুর্গম্য; পথ আছও অগম নয়। তবে সত্যের অরুণবর্ণ জ্যোতি মাঝে মাঝে দেখতে পাই আজ। যে যা বলে তার সবটা ভুলো নয়—আমাদের নীতিও ভেজাল-শূন্য নয়। সত্য আছে এ ছয়ের মাঝামাঝি। এখন পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষার মূল্য দিতে হবে বৈ কি—তার পর যো সম্পদ আসবে...নতুন কালের রহস্য উদ্ঘাটিত হলে আমরা সে সম্পদের সন্ধান পাব। তবু জানিয়ে রাখি—সম্পদ সংগ্রহ করব না আমরা—তাকে ভাসিয়ে দেব কালের স্রোতে। নতুন সমাজ—নতুন বিধিবিধান—নতুন পারিপার্শ্বিক বার বার ফিরে আসে নতুন হয়ে। পুরাতন রীতি-অভ্যন্তর মন তাকে সহজে স্বীকার করতে চায় না। বয়োধর্ম্মে স্থিতিশীলতার জাড্যভারে তার কল্যাণবুদ্ধি আচ্ছন্ন—চিন্তা অথচ্ছ আর বিবেক গীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মোহযুক্ত দৃষ্টি ও বিচারপ্রবৃত্ত মন—এ যেন জরা-এস্ত না হয়। এ যদি জাগ্রত না রইল—কিসের প্রয়োজন জীবনে।

শেষ লাইন ক'টি।

চলে যাচ্ছি—গতি পার হয়ে। প্রণাম জানাচ্ছি পুরাতন পৃথিবীকে—প্রণাম জানাচ্ছি অনাগত পৃথিবীকে। দেশ স্বাধীন হতে চলেছে—সে দায়িত্ব বহন করবার যোগ্য যেন হতে পারি—যেন প্রগতিজানাবার অধিকার অর্জন করি।

খুকী এই মাত্র ক্রিডাসা করছিল, দিদি ভাই কোথায় যাচ্ছ? ফিরবে তো এফুনি—মার শরীর খারাপ।

ওর চিবুক ধরে চুমো খেয়ে উত্তর দিলাম, ফিরব বই কি ভাই।

ভায়েরি শেষ হয়েছে এইখানে—প্রশান্ত আত্মসমাহিত হয়ে বসে আছে। শুভা কোন সত্যের সন্ধানে গৃহ ছাড়ল—সে সত্য সে লাভ করবে কিনা—মজলিস হয়ে সে ফিরে আসবে কিনা একদিন—এ সব প্রশ্ন ওর মনেই উঠল না। ওর মন চলে গেছে—জগৎ ছাড়িয়ে স্বপ্নর ধ্যানলোকে। যে অন্যদি কালস্রোতে জন্মমৃত্যুর ফুল ভেসে আসছে আর ভেসে যাচ্ছে—স্বর্ষাপিণ্ডের জ্যোতি আকর্ষণে পৃথিবী স্বকোলে লগ্ন হয়ে গ্রহ পরিক্রমা করছে শূন্যমণ্ডলে—অনিত্য বস্তু নিত্যসত্তার সংঘাতে প্রতি মুহূর্তে রূপ বদল করছে—সেই কালস্রোতে পা রেখে দাঁড়িয়েছে প্রশান্ত, দাঁড়িয়েছে আজকের মানবগোষ্ঠী। সে মাহুষ মরণশীল অথচ চিরজীবী। এক হাতে ধ্বংসের ধ্বংস—অন্য হাতে সৃষ্টির লীলাকমল—খড়্গ ও বরাভয়যুক্ত পানিতে—যুগপৎ শাসন ও সাধুনা—আপাত বিপরীতধর্ম্মী অথচ পরস্পরের পরিপূরক—হুই বস্তু নিখিলের নিত্য প্রবহমান স্রোতধারাকে নির্মল ও গতিবান করে রেখেছে। ভায়েরির পাতা থেকে যে ইঙ্গিত পেলো—তাই বুঝি ওর দৃষ্টিতে ফুটে উঠল স্বপ্ন-কল্পনায়। ও মগ্ন হয়ে রইল তার মাঝে।

ছয়ারে বসে করাঘাতের শব্দ। ঠুক—ঠুক—ঠুক।

প্রশান্ত চুমকে উঠল—ওর, ধ্যান, ভঙ্গ হ'ল।

প্রশান্ত—প্রশান্ত—

অন্তরস্থিত প্রিয় কণ্ঠের আহ্বান বাইরের প্রতিধ্বনিতে বুঝি বেজে উঠল।

ও শব্দমড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এ আহ্বানের অর্থ ওর কাছে অস্পষ্ট নয়...ও ভুল করে নি।

রাজিশেষের বার্তা নিয়ে সে ফিরে এল...প্রশান্ত তাকে ভাল মতে জানে। তাকে স্বাগত জানাতেই হবে।

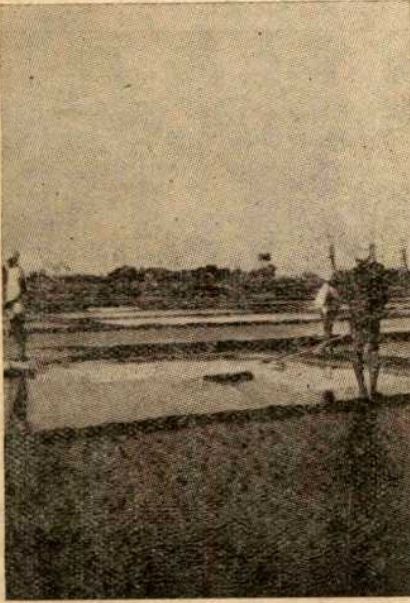
(সমাপ্ত)



# নিম্ন বঙ্গের আবহাওয়ায় লবণের চাষ

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ, এম এস-সি.

পশ্চিম বঙ্গের মাত্র দুইটি জেলা সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত—মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা। এই দুইটি জেলার সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল ভিন্ন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বপ্রান্তে এমন আর কোনও স্থান নাই যেখানে লবণের চাষ চলিতে পারে। এই দুই স্থানে লবণ-চাষ কত দূর সফল হইবে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত, কারণ লবণাক্ত ভূমিকে ক্রমশঃ উর্বরী করিয়া ঋতু-শস্ত্রের চাষও সম্ভব এবং তাহা বর্তমান ঋতু-পরিস্থিতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।



কোকনদের জগনায়কপুর কেন্দ্রে লবণ তৈরি

বর্তমান প্রবন্ধে লবণাক্ত অঞ্চলের আবহাওয়া, মাটির অবস্থা এবং লোণ জলের গাঢ়তা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। এ বিষয়ে লোকের যথেষ্ট ভ্রান্ত ধারণা বিজ্ঞমান। অনেকেই বলিয়া থাকেন—‘যা বৃষ্টি, জল তো কম লোণ, তার উপর ঘেরাপ স্যাতসেতে আবহাওয়া তাতে কি আর আমাদের দেশে লবণ হয়?’ কিন্তু একদা নিম্ন বঙ্গে কিরূপ বিস্তৃত ভাবে লবণের চাষ হইত সে কথা ইহাদের জানা নাই—যে প্রণালীতেই হোক আগেকার দিনে মলঙ্গীরা প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করিত এবং স্বর্ধোর তাপ, বৃষ্টি ও আর্দ্রতা সব কিছুই উপযুক্ত ব্যবস্থা তাহাদের করিতে হইত। কাজেই বর্তমানে তাহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বলিলে চলিবে কেন?

লবণ-চাষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রভাব বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য :—

- ১। সাগরের বা নদীর লোণাক্ততার গাঢ়তা (density)
- ২। জমির অবস্থা এবং মাটির গুণ
- ৩। যেখানে লবণের চাষ হয় সেই স্থানের বৃষ্টির পরিমাণ, বিশেষ করিয়া লবণ-চাষ-ঋতুতে বৃষ্টির পরিমাণ এবং বৃষ্টির দিবস-সংখ্যা
- ৪। বাতাসের গতি
- ৫। আর্দ্রতা
- ৬। তাপমান বা টেম্পারেচার

এই কয়টি বিষয় বিশদ ভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, নিম্ন পশ্চিম বঙ্গের আবহাওয়ায় লবণ-শিল্প প্রসারের পক্ষে কতটা অসুকল।

লোণাক্ত জল—পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণদিকস্থ সাগরের বা সাগরে পতিত নদীগুলির লবণাক্ত জল—যাহা হইতে রৌদ্র সাহায্যে লবণ নিষ্কাশন করা হয়, তাহার ঘনত্ব বা লোণাভাগ কিরূপ তাহা নিম্নের রিপোর্ট দেখিলে বুঝা যাইবে।

নমুনার শতকরা অংশ

দিবা-কাঁথি সপ্তমুখী (সুন্দরবন) মাদ্রাজ

|                         |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) | ২'২০ | ২'১৯ | ২'৫  |
| ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড  | ২'৪  | ২'৭  | ২'৭  |
| সালফেট                  | ১'৯  | ১'৯  | ১'৮  |
| ক্যালসিয়াম             | ১'০  | ১'০  | ১'০  |
| কার্বনেট                | ০'১  | ০'১  | —    |
|                         | ২'৭৪ | ২'৭৬ | ৩'০৮ |

উপরের রিপোর্ট হইতে এইটুকু দেখা যায় যে, মাদ্রাজ ও তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহের সাগরজলের সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের উপকূল অঞ্চলের সাগরজলের বিশেষ পার্থক্য নাই। কাঁথি ও সপ্তমুখী হইতে যে জলের নমুনা সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহা ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসের। প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে এপ্রিলের জল তদপেক্ষা কিছু গাঢ়। সাধারণতঃ বোম্বাই ও মাদ্রাজের সাগরজলের লোণাভাগ আড়াই বা তিন। নিম্ন বঙ্গের সাগরজলেও লোণাভাগের অনুরূপ প্রায় সেইরূপ—এই সামান্য পার্থক্যে কিছু আসিফা যায় না। এ বৎসর মার্চ মাসে মাদ্রাজের কোকনদ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্ন কাঁথির উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের সাগরজল পরীক্ষা করিয়াছি—সর্বত্রই লবণাক্ত ভাগের পরিমাণ ২'৫ বা ২'৬।



অতএব সাগরের লোণাক্ত লবণে বাংলাদেশের সর্ব-সাধারণের ধারণা যে ভ্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। কাথিয়া-বাড় বা কচ্ছদীপে শতকরা ৩৪ লবণাক্ত ভাগ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভারতের সমুদ্রতীরবর্তী প্রায় যাবতীর লবণ-প্রস্তুতি-কেন্দ্রে যে জল ব্যবহার হয় তাহার শক্তি (strength) গড়ে শতকরা ৩ বা ৩-এর কম। সিংহল ও ব্রহ্মদেশের কার-খানাতেও ২৩ বা ৩-এর অধিক লবণের ভাগ পাওয়া যায় না। কাথিতে দেখিয়াছি মার্চে আড়াই ট্রেন্‌থের জল কন্ডেন্সারে এক দিনের রৌদ্রতাপ ও বাতাসে ৩-এর অধিক হইয়া যায় এবং এপ্রিলের ৩ শক্তির জল একদিনে ৪ হইয়া যায়। রীতিমত বর্ষার সময় সর্বত্রই এই জলের লবণ-ভাগ যথেষ্ট হ্রাস পায়। কিন্তু সে সময় এদেশের কোথাও লবণ প্রস্তুত হয় না। সাধারণতঃ জাহুয়ারী হইতেই ভারতের সমুদ্রোপকূলস্থিত স্থানগুলিতে লবণের চাষ আরম্ভ হইয়া জুন জুলাই বা আগষ্ট মাস, অর্থাৎ বর্ষার পূর্ব পর্যন্ত চলিতে থাকে। সাধারণতঃ আষাঢ়ে মৌসুমী বায়ুর আবির্ভাব ঘটিলেই লবণ-প্রস্তুতি-কেন্দ্রসমূহের কাজ বন্ধ হইয়া যায়, বিশেষ করিয়া বোম্বাই, বাংলা, উৎকল এবং অন্ধ্র প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে। নবেম্বর মাস হইতে মেরামতি কাজ আরম্ভ করিয়া জাহুয়ারীর শেষ হইতে পুনরায় লবণ সংগ্রহ করিতে হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে ঠিকমত লবণ-চাষ-ঋতু ৬৭ মাসের অধিক নহে। মাদ্রাজের দক্ষিণ দিকে তিউতিকোরিণ পর্যন্ত অবস্থ ৭৮ মাস কাজ চলে, কারণ উক্ত অঞ্চলে বর্ষা সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হইতে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত ৪ মাস মাত্র থাকে। জাহুয়ারীতে অল্প বৃষ্টি হইলেও ফেব্রুয়ারী হইতে লবণ উৎপাদিত হয়।

মাটি—উৎকৃষ্ট লবণ উৎপাদনের উপযোগী গুণ মাটির আছে কিনা তাহা দেখিতে গেলে জমির অবস্থান এবং অবস্থা পরীক্ষা করিতে হয়। সাধারণ ভাবে নিম্ন বন্ধের মাটি, আমরা যতটুকু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, লবণ-চাষের পক্ষে বেশ উপযোগী—পলি পড়িয়া পড়িয়া যে এঁটেল মাটির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা মাদ্রাজের অনেক লবণ-ক্ষেত্রের মাটির চেয়ে ভাল। কাথি, তমলুক, মৌসুনী (সাগর), মধুরাপুর (উপকূল অঞ্চল) প্রভৃতি সর্বত্রই ভাল মাটিই দেখিয়াছি—এ সমস্ত জায়গায় পূর্বে রীতিমত লোনা মাটি চাচিয়া লবণের চাষ হইত। উপরকার স্তর বেলে (loamy) হইলেও নিম্ন স্তর খুব শক্ত—তাহা ঠাসিয়া সম্পূর্ণ শোষণ-ক্ষমতাহীন [impervious (watertight)] করা যায়, যাহাতে লোণা জল ভেড়িতে কমিয়া না যায়। আর একটা কথা এই যে, যে মাটিতে ধান জন্মে সেই মাটিকেই ঠিকমত প্রস্তুত করিয়া লইলে লোনা জল শুষ্ক করিবার আধার বা কন্ডেন্সার-এ পরিণত করা যায়। সেইজন্য উপকূলস্থিত যে সমস্ত জমিতে বাঁধ দিয়া ঋতুশস্ত্রের চাষ হইতেছে, তৎসংলগ্ন লোণা জল প্রাবিত পতিত অংশগুলিকে বেশ ভাল কন্ডেন্সারে পরিণত করা

যায়। এল্প জমি কাথি অঞ্চলে বহু আছে। ২৪-পরগণার মুন্দরবন অঞ্চলে আবাদের প্রসারের ফলে বৃক্ষহীন লবণাক্ত পতিত জমির পরিমাণ অবশ্য অনেক কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু বনাঞ্চলের সীমানায় সীমানায় যে সমস্ত জমিতে ভাল ধান হয় না, সেগুলিকে লবণ-চাষের জন্য কাজে লাগান যাইতে পারে। এই সমস্ত জমির ষাট-উৎপাদিকা শক্তি খুব কম, কারণ বর্ষার পূর্বে মিষ্ট জলের অভাবে সেচকাৰ্য্য হয় না। মাটি খুঁড়িয়া যে জল পাওয়া যায় তাহা কান্ডন হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত বেশী ভাগই লোণা। এইজন্য আমাদের মনে হয়, এই জমিগুলি লবণ-চাষের কাজে লাগাইলে তাহাদের উপযোগিতা অনেক বৃদ্ধি পাইবে। বিধা প্রতি সাত-আট মণ ষাটোৎপাদন না করিয়া যদি অন্ততঃ ১০০ মণ লবণ উৎপাদন করা যায় তাহা হইলেও জমির কদর বাড়ে। ফসল বাড়াইবার জন্য সাগরের



মাদ্রাজে লবণ উৎপাদন

সাহায্যে এ সমস্ত জমির কিছু উৎকর্ষ সাধন করা যায় সত্য, কিন্তু লোণা জলের পরিবর্তে মিষ্ট জল কোথায় পাওয়া যাইবে? মিষ্ট জলের সেচ ভাল ভাবে করার অনেক অসুবিধা আছে। বৃষ্টির ভরসায় থাকিলে বড়জোর ১০।১২ মণ ধান হইবে, কিন্তু প্রতি বৎসর ক্রমাগত লবণের চাষ করিয়া গেলে শত মণের স্থানে দুই শত মণ লবণ উৎপাদন করা সম্ভব হইতে পারে। ইহা ছাড়া খানিকটা অংশে লোণা জলের ভেড়িতেই মাছের চাষ করা যায়।

আর একটা কথা। পশ্চিম বঙ্গে এখনও বহু জেলায় এমন প্রচুর ধান-জমি আছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যাহার উর্বরতাশক্তি







৪। বাতাসের গতিও (wind velocity) মোটের উপর প্রায় মাস্তাজের মত। মাস্তাজ ও সাগর-মানমন্দিরের হিসাব অস্থায়ী ৫০ বৎসরের গড় পরিমাণ—

|              | সাগরদ্বীপ        | মাস্তাজ |
|--------------|------------------|---------|
| নবেম্বর—     | ৫'১ মাইল ঘণ্টায় | ৪'৫     |
| ডিসেম্বর—    | ৫'২ "            | ৫'১     |
| জানুয়ারী—   | ৫'২ "            | ৪'১     |
| ফেব্রুয়ারী— | ৬'৩ "            | ৩'৬     |
| মার্চ—       | ৯'৩ "            | ৪'৪     |
| এপ্রিল—      | ১৩ "             | ৫'৪     |
| মে—          | ১২'৫ "           | ৬'৩     |
| জুন—         | ১১'৬ "           | ৬'৪     |

বায়ুর গতি সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে, আবহাওয়ার অত্যন্ত দিক—যথা স্বর্ষ্যের তাপ এবং আর্দ্রতা যদি যথোচিত ভাবে থাকে তাহা হইলে ঋতুর শেষের দিকে বায়ুর গতি প্রবল হইলেও বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না। দ্রুতগতিশীল বাতাস যদি শুষ্ক হইত তাহা হইলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু এপ্রিল-মে মাসের বাতাস পূর্বদক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিম হইতে সমুদ্রের বাষ্প লইয়া আসে। ফলে যে যুগ্ম শুষ্ক বাতাস লবণ প্রস্তুতির উপযুক্ত আমরা সব মাসে তাহা পাই না। কাল-বৈশাখীর পর হইতে এই বাতাসের গতি প্রায়ই বাড়িয়া যায়। পিট্টি অবস্থা তাহার রিপোর্টে যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে বায়ুর গতি সম্বন্ধে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই।

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| বোম্বাই—          | ৯'৩ মাইল ঘণ্টায় |
| সাগর—             | ৭'৮ "            |
| পুরী—             | ৮'৭ "            |
| ভাইজাগ (মাস্তাজ)— | ৩'৫ "            |

১৯৩৮ সালে তদানীন্তন বাংলা সরকারের নিকট প্রদত্ত, বর্তমান ল্যাণ্ড কাণ্টমেন্সের কালেক্টর শ্রী ডি. এন. মুখার্জির রিপোর্টে বায়ুর গতি সম্বন্ধে যে হিসাব প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা নৈরাশ্রজনক নহে।

(গড় বায়ুর গতি ডিসেম্বর হইতে মে পর্য্যন্ত)

|         | সাগর | গোপালপুর | মাস্তাজ | পখন  |
|---------|------|----------|---------|------|
| ১৯৩৪-৩৫ | ১০'৭ | ১০'৬     | ১০'৩    | ১১'৪ |
| ১৯৩৫-৩৬ | ৯'৭  | ১১       | ১০'৬    | ১১   |
| ১৯৩৬-৩৭ | ৮'৯  | ৮'৯      | ১১'৬    | ১০'৪ |

নৌপদার নিকটবর্তী গোপালপুর, রামেশ্বরের নিকটবর্তী মাস্তাজ এবং পখন এই তিন কেন্দ্রের উত্তরে ও দক্ষিণে বহু স্থানে লবণ প্রস্তুত হয়। এই সব স্থানে যদি প্রায় সমান গতি-বেগসম্পন্ন বায়ু দ্বারা লবণ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে তাহা হইলে সাগরদ্বীপ অঞ্চলে বা নিম্ন পশ্চিম বঙ্গের সমুদ্রোপ

কূলস্থিত অঞ্চলে লবণ প্রস্তুতি সাফল্যমণ্ডিত হইবে না, একথা মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই।

আর্দ্রতা—আবহাওয়ার মধ্যে আর্দ্রতার প্রভাব লবণ চাষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশী থাকিলে



বালার্চের (ভিজাগাপটম) লবণের কারখানা

বৃষ্টিতে হইবে তাহার আর্দ্রতা বা হিউমিডিটি বেশী এবং সেই ভিজা বাতাসে জমির উপরস্থিত লোণা জল শুষ্ক বা ধনীভূত হইতে বিলম্ব হইবে। আর্দ্রতা মাপিবার জন্ত রিলেটিভ হিউমিডিটি কথিয়া বায়ুর ভিজা অবস্থার পরিমাণ কত তাহাই পদার্থতত্ত্ববিদগণ দেখিয়া থাকেন। ইহা শতকরা হিসাবে ধরা হয়। সাধারণতঃ সমতলভূমিতে বাতাসে শতকরা ৫০।৬০ বা ততোধিক ভাগ জলীয় বাষ্প থাকে, কিন্তু স্থান হিসাবে এবং ঋতু অস্থায়ী ইহা কমে ও বাড়ে। রোদ ও বাতাসের অবস্থার উপরই ইহার হ্রাসবৃদ্ধি অল্পবিস্তর নির্ভর করে। মুক্ত জলকে বাতাস অবিরতই আকর্ষণ করে এবং তাহার ফলে জলীয় বাষ্প ক্রমাগত বাতাসে মিশিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে যখন ভারাক্রান্ত করে তখন সেই বাতাস আর জলকণাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু সেই সময় রোদ তাহাকে সাহায্য করিয়া বাষ্পকে ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিয়া দিতে থাকে এবং তাহাতে তাহার আর্দ্রতা নিম্নতম স্তরে নামিয়া গেলে পুনরায় জমির উপরস্থিত জল আকৃষ্ট হইতে থাকে। অতএব সাধারণ ভাবে আবহাওয়ায় হিউমিডিটি বেশী থাকিলেও স্বর্ষ্যের প্রখর রশ্মি যিতানো লোণা জলকে ক্রমাগতঃ ঘন হইতে বিশেষ সহায়তা করে। নিম্ন বঙ্গে এই রোদ-তাপের অভাব নাই, মাঝে মাঝে অবশ্য বাদলা ও মেঘলা দিবসে ইহা স্নান থাকে, কিন্তু মোটামুটি ভাবে প্রথরোজ্জ্বল রোদ আমরা প্রচুর পরিমাণেই পাইয়া থাকি।

অত্যন্ত লবণ-প্রস্তুতি কেন্দ্রের আর্দ্রতার সহিত সাগর মান-মন্দিরের গড় আর্দ্রতার তুলনামূলক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—

মিলেটিভ-হিউমিডিটি (১৯৪০-৪৪)

|            | জানুয়ারী | ফেব্রুয়ারী | মার্চ | এপ্রিল | মে   | জুন | অক্টোবর | নবেম্বর | ডিসেম্বর |
|------------|-----------|-------------|-------|--------|------|-----|---------|---------|----------|
| বোম্বাই—   | ৭৫°৮      | ৭৩°৮        | ৭৭    | ৭৪°৮   | ৭৫°৮ | ৮২  | ৮১°৬    | ৭১°৮    | ৭০       |
| সাগর—      | ৬২        | ৬১          | ৭৩    | ৮০     | ৭৮°৬ | ৭৮  | ৭৫      | ৬৬      | ৬০       |
| মাদ্রাজ—   | ৮২        | ৮২°৬        | ৮২    | ৭৭     | ৬৮°৬ | ৬৪  | ৮৩°৮    | ৮৮      | —        |
| ভিজাগাপটম— | ৭৭°২      | ৮০          | ৭৭°৮  | ৭৪°৬   | ৭৪   | ৭৫  | ৭৮      | ৭০      | ৭৩       |

তাপমাত্রা—এবার বিভিন্ন অঞ্চলে তাপের পরিমাণ কত পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। নিম্নে পাঁচ বৎসরের গড়পড়তা সবচেয়ে বেশী তাপ কত তাহাই তুলনামূলক ভাবে দেখান হইল।

|          | জানুয়ারী | ফেব্রুয়ারী | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন  |
|----------|-----------|-------------|-------|--------|----|------|
| সাগর—    | ৮১°৩      | ৮৫°৪        | ৯০°৮  | ৯২°৪   | ৯৫ | ৯৫°৬ |
| মাদ্রাজ— | ৮২°৪      | ৮৬          | ৮৮    | ৯২     | ৯৭ | ৯৮   |
| বোম্বাই— | ৮৩°৫      | ৮৪          | ৮৫    | ৮৮     | ৯২ | ৯০   |

তাপের দিক দিয়াও আমাদের সমুদ্রোপকূলস্থ অঞ্চলসমূহ মোটেই লবণ-চাষের অল্পপযোগী নহে। সাধারণ ভাবে সমুদ্র-তীরবর্তী স্থানগুলির উষ্ণতা ও অম্লতা প্রায় সমান আর আবহাওয়াও প্রায় একই রূপ, তবে তাহা অক্ষাংশে অবস্থান

অনুযায়ী পৃথক পৃথক হয়। পশ্চিম বঙ্গের সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চল উত্তরাংশ (north latitude) ২০ হইতে ২৪-এর অন্তর্গত—যাহার মধ্যে পশ্চিম ভারতের কাথিয়াবাজ কচ্ছ পড়ে। মরুভূমি নিকটে থাকায় এবং স্বল্প বৃষ্টিপাতের জন্ত ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের মধ্যে কাথিয়াবাজে সর্বাধিক অধিক সাফল্যের সহিত সাগরজল শুষ্ক করিয়া লবণ প্রস্তুত হয়। কিন্তু বোম্বাইয়ের লবণ-প্রস্তুতি-কেন্দ্রগুলি ১৬ হইতে ২০ উত্তরাংশের মধ্যে এবং মাদ্রাজ কোরমণ্ডল উপকূল ৮ হইতে ২০ উত্তরাংশের মধ্যে পড়ে। দক্ষিণ মাদ্রাজের তিউতিকোরিগই এদিককার মধ্যে লবণ-চাষের সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ স্থান—এখানে ঋতুও যেমন দীর্ঘ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণও তেমনি কম।

## বাংলা টাইপ ও কেস

### শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার

চলিশ বৎসরের উপর হইতে চলিল বাংলা বানান ও টাইপ সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করি। ১৯০৬ সালে এক-এ পরীক্ষা দিয়া সর্বপ্রথম আমাদের চুঁচুড়ার মহামায়া প্রেসে এই বিষয়ে আমার হাতেখড়ি হয়। তখন হইতে-পিতৃদেবকে এই সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে শুরু করি। যেমন, একটিমাত্র 'ষ্ট্রিট' শব্দ ছাপিবার জন্ত বাঙলা কেসের মধ্যে ষ্ট্রি এবং ষ্ট্রী দুইটি চার-বর্ণের জোড়া টাইপ রাখিবার দরকার কি? একই খোপের ভিতরে চার-পাঁচ-ছয়টি করিয়া টাইপ রাখা হয় কেন? ৯ এখনও বাংলা বর্ণ-মালার মধ্যে স্থান পায় কেন? 'হুইটা' ন, 'জুইটা' জ, তিনটা শ, য-ফলা, ব-ফলা, ড, ঢ, য. প্রভৃতির বিশুদ্ধ উচ্চারণ আমরা করি না বলিয়া আমাদের ছেলেমেয়েরা কেহই বানান শিখিতে পারে না। ইহার প্রতিকারের কি কোন উপায় নাই; ইত্যাদি। তারপর কলিকাতার 'বিশ্বকোষ' প্রেসের পরিচালনভার আমার উপরে পড়ে। সেই প্রেসে কাজ করিতে করিতে এই বিষয়ে আমার অনুসন্ধান ও গবেষণা আরো জোরে চলিতে থাকে। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসে দীর্ঘ যৌল বৎসর কাজ করিবার সুবিধা হওয়ার এই সম্বন্ধে অনুশীলন করিবার অনেক সুযোগ পাই।

যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানার চাকরি করিতেছিলাম তখন কয়েকজন বঙ্গুবান্ধবের অনুরোধে বাংলা টাইপ ও কেস সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। আমার তিনটি প্রবন্ধ ১৩৩৯ সালের পৌষ, মাঘ ও চৈত্র সংখ্যার 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আরও সাত-আটটি প্রবন্ধ লিখিলে আমার বক্তব্য শেষ হইত, কিন্তু কি কারণে যে লেখা বন্ধ হইয়া গেল তাহা পরে বলিতেছি।

এই তিনটি প্রবন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

১। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলা টাইপ ও কেসের আমূল সংস্কার ও পরিবর্তন হওয়া একান্ত আবশ্যিক।

২। আমার ধ্রুব ধারণা, বাংলা টাইপ ও কেস যথোপ-যুক্তভাবে সংস্কৃত ও পরিবর্তিত হইলে বাংলা ভাষায় মুদ্রণকার্য অনায়াসে সুসম্পন্ন হইবে, এখনকার অপেক্ষা অনেক কম খরচায় অমুণ্ডিত হইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে বাংলা ভাল টাইপ-রাইটার, মনোটাইপ ও লাইনোটাইপ মেশিন প্রবর্তিত হইলে বাংলার মুদ্রণকার্যে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

৩। বিভাগাগর মহাশয়ের পরে অর্থাৎ প্রায় ৮০ বৎসর হইল বাংলা টাইপ ও কেসের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নাই।

৪। একটি বাংলা কেসের মধ্যে ৪৭৪টি বিভিন্ন প্রকারের টাইপ, ৪৯টি বিভিন্ন চিহ্ন, সংখ্যা, স্পেস প্রভৃতি এবং ৪০টি 'করন' (Kerned) টাইপ। মোট  $৪৭৪ + ৪৯ + ৪০ = ৫৬৩$  প্রকারের রকমারি টাইপ থাকে।

৫। ইংরেজী বর্ণমালায় ২৬টি বর্ণ আছে বটে, কিন্তু টাইপের প্রত্যেক কেসে প্রতি টাইপ বড় (capital), মাঝারি (small capital) এবং ছোট (lower case type)—এই তিন সেট করিয়া থাকে বলিয়া এবং সংখ্যা, ছেদ, স্পেস প্রভৃতি চিহ্নাদি লইয়া ইংরেজী কেসে মোট ১৬০ প্রকার বিভিন্ন টাইপ থাকে।

৬। ইংরেজী কেস অপেক্ষা বাংলা কেসের টাইপ-সংখ্যা সাড়ে তিনগুণ বেশী।

৭। কয়েকটি টাইপের প্রয়োজনীয়তা ও অপ্রয়োজনীয়তা বিষয়ের আলোচনা তাহাতে ছিল, যেমন—

(ক) একই আকারের দুইটি ই কেসের দুইটি স্বতন্ত্র ঘরে থাকে; (খ) ঙ, ঞ এবং ঞ এখনও বাংলা কেসে বিরাজমান; (গ) ১, ১, ১, ১, ১, ১, ১—দুই প্রকার করিয়া থাকে; ২, দুইটি ঞ, ঞ, ঞ, দুইটি ঞ, ঞ প্রভৃতি কেসে থাকে; (ঘ) বাংলা ভাষায় কতকগুলি যুক্তাক্ষর রহিয়াছে যেগুলির প্রয়োগ অতিবিরল অথবা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত যেমন—ঞ, ঞ, ঞ, ঞ, ঞ, ক, ঞ, ঞ, ঞ প্রভৃতি।

৮। চারখানি আলাদা আলাদা কেস লইয়া সমগ্র বাংলা কেস। কম্পোজিটারের সম্মুখে একখানি, কোলের কাছে একখানি, ডান দিকে একখানি এবং বাঁ দিকে একখানি।

|                                  |                             |       |                                  |
|----------------------------------|-----------------------------|-------|----------------------------------|
| বাঁ পাশের<br>১২৮টি সমান মাপের ঘর | আপার<br>১২৮টি সমান মাপের ঘর |       | ডান পাশের<br>১২৮টি সমান মাপের ঘর |
|                                  | লোয়ার                      |       |                                  |
|                                  | ছোট-বড়<br>৩২টি ঘর          | ..... | ছোট-বড়<br>৩২টি ঘর               |

কেসের মধ্যে ঘরের-বা খোপের-সংখ্যা— $১২৮ \times ৩ + ৩২ + ৩২ = ৪৫৬$ ; টাইপ সংখ্যা—৫৬৩; সেইজন্য কোনও কোনও ঘরে দুইটি হইতে ছয়টি পর্যন্ত স্বতন্ত্র টাইপ থাকে, অর্থাৎ ১০৮টি টাইপের নিজের নিজের ঘর নাই—তাহারা প্রত্যেকে জুড় দুই পাঁচ জন আত্মীয়কুটুম্বের সহিত একত্র ঘর করে।

৯। কোলের ৭১টি ঘরের মধ্যে কতকগুলি আকারে ছোট-বড়, নতুবা বাকি ৩৮৪টি আকারে ঠিক সমান। ঘর একরূপ ছোট-বড় করার কারণ এই যে, ভাষার মধ্যে যে টাইপ যে পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, সেই টাইপের জুড় সেই আকারের

ঘর করা হয়; কিন্তু বাংলা কেসের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে।

১০। যে টাইপ যত বেশী ব্যবহারে আসে তাহাকে কম্পোজিটারের হাতের তত কাছে কেসের মধ্যে রাখিতে হয়; যাহাতে অনায়াসে, অতি শীঘ্র ও সহজে কম্পোজিটার সেটকে তুলিয়া লইয়া কম্পোজিং ষ্টিকে বসাইতে পারে। বাংলা কেসের মধ্যে টাইপ-সংস্থাপনের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে।

১১। ভাষার মধ্যে কোন অক্ষরটি সাধারণ পুস্তকাদিতে কি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহা স্মৃতিশক্তিভাবে নির্ণয় হইলে তবে কেসের ঘরের আকার কোনটির কিরূপ হওয়া আবশ্যক, কোন ঘরে কোন টাইপটি রাখা দরকার এবং কোনও নির্দিষ্ট ওজননের এক সাট টাইপ কিনিতে হইলে কোন টাইপটি সংখ্যায় বা ওজনে কি পরিমাণ হওয়া উচিত ইত্যাদি নিরূপিত হইতে পারিবে। বাংলায় এই তিনটি ব্যাপারই আছে মোজে এবং হত ইতি গুরুত্বাবে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

১২। ইংরেজী সাটের নির্দিষ্ট তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইংরেজী ভাষাভাষী সকল জাতির ছাপাখানায় ঐ বাধা তালিকাভুক্ত টাইপ দুই শত বর্ষের অধিককাল হইতে সর্ব-সম্মতিক্রমে সমানে চলিয়া আসিতেছে।

১৩। ইংরেজী লোয়ার কেস দুই সমান অংশে বিভক্ত, কিন্তু ডান দিকের অংশে ২৯টি ও বাঁ দিকের অংশে ২৪টি অসমান ঘর আছে। সমস্ত লোয়ার কেস টাইপগুলি, অর্থাৎ a b c d প্রভৃতি, লোয়ার কেসের বড় বড় ঘরগুলিতে স্থান পাইয়াছে।

১৪। ইংরেজী লোয়ার কেসের যে ঘরটি যে পরিমাণে বড় বাঙ্গালা কোলের কেসের ঠিক সেই ঘরটি সেই পরিমাণে বড়।

১৫। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ e-র ঘরে t, তদপেক্ষা ছোট ঘরগুলিতে c d i m n h u t thick space a r quadrat প্রভৃতির বদলে যথাক্রমে k d t e m n s y t থিক স্পেস অ r এবং কোয়ার্টেট স্থানলাভ করিয়াছে। ইহাদের অপেক্ষা ছোট ঘরগুলিতে b l v f g y এবং p প্রভৃতির স্থানে যথাক্রমে ব ল হ ব গ ও এবং প বিরাজিত। কাজেই বুঝা গেল, ইংরেজী লোয়ার কেসের পূরাপূরি নকল করিয়া বাঙ্গালা কোলের কেস বা লোয়ার কেস তৈয়ার করা হইয়াছে, আর মোটামুটি হিসাব করিয়া বাঙ্গালার যে অক্ষরগুলি বেশী ব্যবহারে লাগে বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেইগুলিকে ইংরেজীর বহুব্যবহৃত টাইপের ঘরে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৬। বাঙ্গালা সাটের কোন নির্দিষ্ট-পরিমাণ তালিকা নাই—ভিন্ন ভিন্ন টাইপ-চালাইকার নিজ নিজ খেয়ালমত বা মজ্জিমাক্ষিক সাটের ফর্দ অমুযায়ী টাইপ যোগান দেন।

১৭। ঘর ও ব্যঞ্জন প্রভৃতি অযুক্ত ও যুক্ত ৪৭৪টি টাইপকে





তারপর আমাদের এই সমিতির কয়েকটি অধিবেশন হয়—বিশ্ববিদ্যালয়গৃহে, রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে এবং শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের বরাহনগরের বাড়ীতে। শেষ অধিবেশনে আমার পরিকল্পিত, সংশোধিত ও পরিবর্তিত বাংলা বর্ণমালা বা টাইপগুলি সভাকর্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথ হাসি-হাসি মুখে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, “আচ্ছা, অজ্ঞর, বিশ্ববিদ্যালয় কি উপযুক্ত লোককে যে-কোন উপাধি দিতে পারেন?” সহসা এইরূপ প্রশ্নের কারণ বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া বলিলাম, “আজ্ঞে হ্যাঁ, তা পারেন—*Honoris Causa*—হিসাবে যে-কোন উপাধি দিতে পারেন।” তিনি গভীরভাবে বলিলেন, “তা হলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে ধরে তোমাকে অক্ষরভট্টবিদ বা ঐ রকমের কোন একটা উপাধি পাইয়ে দেবো।” আমি নতমুখে নিকরাক।

আমি সেদিন প্রথম অধিবেশনের নির্দেশ অনুসারে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি বিষয়ের অংশবিশেষ আঁক কাগজে নুতন অক্ষরে লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ সেগুলি বিশেষ করিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, “বুঝলেম, ছাপার অক্ষরে এই রকম দাঁড়াবে, কিন্তু লেখাও কি সহজ হবে? আচ্ছা, সুনীতি, তুমি একটু লিখে দেখাও তো।” সঙ্গে সঙ্গে সুনীতিবাবু পেনসিল দিয়া খুব তাড়াতাড়ি লিখিলেন—

নহ য়াতা নহ বধু নহ কন্যা সুন্দরী রূপসী

হে নন্দন বাসিনী ড়েবশী।

গোষঠে যবে সংখ্যা (সন্ধ্যা) নামে

শ্রান্ত (শ্রান্ত) দেখে সর্বনাশচল

(সর্বনাশচল) টানি —

দিবধায় এড়িত পদে কংপ (কম্প) বঞ্চে

নয় নেত্রপাতে

আচ্ছা, আমি পারি কি না দেখি—বলিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন—

কিঞ্চিৎ

মমমম মবেটে কিঞ্চিৎ মমম

মমমম মমম দা

লিখিতে লিখিতে বলিলেন—“একটু বাধোবাধো ঠেকছে প্রথম প্রথম, তাই বোধ হয়। এটা চালাতেই হবে।” আমি বলিলাম, “সাধারণে, বিশেষতঃ সাহিত্যিক ও লেখক-মহলে চলবে কি?” তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, “আমাদের বিশ্বভারতী, তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আর প্রবাসী যদি তোমার এই ছক অবলম্বনে ছাপতে শুরু করে, তা হলে সাধারণই বল, আর অসাধারণ সাহিত্যিকই বল ক্রমে এই ছকের মত লিখতে আর ছাপতে বাধ্য হবে।”

শেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণী নিয়ে যুক্তিত হইল,—

The number of different types (excluding mathematical signs, signs of punctuation, signs of reference, spaces, quarters, etc.) now actually employed in Bengali printing is 514 in all. This number can be reduced to 117 only, if the following procedure is adopted:

1. By avoiding all ligature characters (যুক্তাক্ষর—consonant with vowel, consonant with consonant and consonant with consonant as well as vowel) with the following exceptions:—

(a) Retaining ক্ষ ঞ ঞ্ ঞ্ ঞ্ ঞ্ ঞ্ and ক্ষ the faces of which will have to be changed.

(b) Reading ক্ষ and জ

(c) Introducing ঙ্

2. By avoiding the doubling of consonants when joined with reph (রেক).

3. By retaining only one form of each of the following:

১৫৫১ and ৭.

4. By making ি and ী two distinct and independent types, which when joined with consonants will no longer go within the shanks of consonants.

5. By making the following distinct and separate types to be joined generally with consonants and sometimes with vowels:

৬৬৬৬ and ৭

6. By making the following phoras or subscribed consonants distinct and separate types to be joined with consonants:

৮৮৮৮ and ৯

7. By introducing the following new types:

(To represent the short অ sound at the end of a word; it will occupy the position of a decimal

point), (এ জে স্ব ভ র র (to represent বেক) and (to represent the five nasal consonants, viz. ঙ ঞ ণ ন ম)

N.B. It is to be noted that the symbol representing the nasal consonants may be used at the option of the author.

8. By introducing a set of 34 types joined with (হসন্ত-চিহ্ন) :—ক ঙ ঞ ণ ন ঙ্গ etc.

Resolved that the above suggestion made by Mr. Ajar Chandra Sircar be accepted.

তারপর সহসা বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় বসিয়া কাজ করিতেছি, হঠাৎ দ্রুতপদে সুনীতিবাবুর প্রবেশ। তিনি বলিলেন, “আপনার এত দিনের চেষ্টা ব্যর্থ হ’ল। আপনারই লেখা ‘প্রবাসী’র সেই তিনটি প্রবন্ধ অবলম্বন ক’রে আর অক্ষর-সমিতিতে আলোচিত আপনার মুক্তি ও আমাদের তর্কের উপর ভর দিয়ে বাংলা লাইনো

টাইপের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেল—আমি এই মাত্র দেখে এলাম।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “প্রবাসীর লেখা বুঝলাম যেন সাধারণের সম্পত্তি, কিন্তু বুঝলাম না মিটিঙের গুচ তত্ত্ব আর আলোচনাগুলো কি ক’রে প্রকাশ পেল।” মিটিং-এর সভ্যত আমরা চার জন মাত্র। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “কবির ভাষায় বলি, বুঝ লোক যে জান সন্ধান। এ নিয়ে আর খাঁটাখাঁটি করার দরকার কি? কি বলেন?”—“তা বটে, বলিয়া আমি নির্বাক হইলাম—সে দিন আর কাজে মন দিতে পারিলাম না। কয়েক মাস পরেই—বাংলা লাইনো টাইপে দৈনিকপত্র ও সাপ্তাহিকপত্র মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল, প্রবাসীতে আমার লেখা আর বাহির হইল না।

বর্তমান সময়ে কি কি উপায় অবলম্বিত হইলে বাংলা টাইপ ও কেস সুসংস্কৃত হইয়া অধিকতর কার্যকর হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আলোচনা হওয়া সমীচীন।

## আমাদের সংস্কৃত শিক্ষা

### অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

সম্প্রতি রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে সংস্কৃতের দাবি উত্থাপিত হইয়াছে—বাংলার প্রদেশপাল ডক্টর শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ কাটজু প্রমুখ মনীষী\* সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষারূপে নিরূপিত করার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাটজু মহাশয়ের মতে—‘সংস্কৃত ভাষাই’ ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। ইংরেজী ভাষার স্থান সংস্কৃত ভাষারই অধিকার করা উচিত। সংস্কৃত ভাষা দেশের কর্তৃকগুলি প্রধান প্রধান ভাষার ভিত্তি। যে ভাষা মর্যাদার সহিত গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং যাহা সংস্কৃতির সম্বন্ধের উন্নতিকর তাহাই জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত। বাজারে ভাষা জাতীয় ভাষা হইতে পারে না।† ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের চিরন্তন একোয় মূলভিত্তি এই সংস্কৃত ভাষা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘শোচনীয় আত্মবিশ্লেষ ও বহিঃবিশ্লেষের সময়ে ভারতবর্ষে একটিমাত্র একোয় মহাকর্ষ শক্তি ছিল; সে তার সংস্কৃত ভাষা। এই ভাষাই ধর্মে কর্মে, কাব্য ইতিহাস-পুরাণ চর্চায় তার সভ্যতাকে রেখে ছিল বাঁধ বেঁধে। এই ভাষাই পিতৃপুরুষের চিত্তশক্তি দিয়ে

সমস্ত দেশের মেহে ব্যাপ্ত করিছিল এক্যবোধের নাড়ীর জাল। এই এক্যবোধ পরম্পরের মধ্যে উচ্চনীচ ভেদবুদ্ধিকে সংযত করে—বিবেচ ও ঘৃণার ভাবকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ ও অবসর দেয় না। তাই স্বামী বিবেকানন্দের মতে জাতিভেদের ঘনি দূর করিবার—তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায়কে উন্নত করিবার একমাত্র উপায় জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসার। আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের পরিপুষ্টসাধনের দিক হইতেও সংস্কৃতের উপযোগিতা প্রতিপদে উপলব্ধি করা যায়। বিভিন্ন ভাবপ্রকাশের উপযোগী শব্দগঠন সংস্কৃত ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে হুঃসাধ্য। সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক ভাষাকে অপূর্ণ গাঙ্গীর্ঘ্য ও শ্রী ছুযিত করে। রবীন্দ্রনাথ তাই স্পষ্টই বলিয়াছেন—‘এ কথা স্বীকার করতেই হবে, সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল। কী জানে কী ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাষার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে।’ সংস্কৃতের সহিত ভারতের ধর্ম ও সংস্কারের যে ঘনিষ্ঠ যোগ তাহাও সকলেরই সুবিদিত। জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের সমস্ত ধর্মকৃত্য সংস্কৃত মন্ত্রের সাহায্যেই অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে—আমাদের সমস্ত ধর্মশাস্ত্র সংস্কৃতে নিবদ্ধ। সুতরাং সকল দিক দিয়াই সংস্কৃত আমাদের পক্ষে সমস্তে অবশ্য শিক্ষণীয়। আমাদের

\* Journal of Oriental Research, September, 1946, vol. XVI, পৃঃ ৫৮ প্রঃ ইহাতে কাটজু মহাশয়ের দুইটি বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথম বক্তৃতা নিখিল ভারত বিশ্ববিদ্যালয় সংঘের উদ্বোধন বক্তৃতা এবং দ্বিতীয়টি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অভিনাষণ।

† ১৯৪৮, ২৩এ জানুয়ারী বহরমপুর (গজামে) প্রদত্ত বক্তৃতা।

সমাজ ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সহিত সংস্কৃত এমন নিবিড় অঙ্গাঙ্গিতাবে জড়িত যে সংস্কৃত এখন আর কথোপকথনের ভাষা না হইলেও ইহাকে আমরা কোনরূপে মৃতভাষা বলিয়া গণ্য করিতে পারি না—ইহা আমাদের কাছে সজীব ও শক্তি-পূর্ণ।

কিন্তু বাস্তবক্ষেপে সংস্কৃতের এই বহুমুখী উপযোগিতা আজ আমরা কার্যত অহুভব করি না—সংস্কৃতের প্রতি আমাদের মৌখিক শ্রদ্ধা বিশেষ ক্ষুর না হইলেও ইহার প্রতি আমাদের আদর—ইহা শিখিবার জন্ত আমাদের আশ্রয় দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সংস্কৃতশিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে। সংস্কৃত চতুষ্পাঠী বা টোল আজ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। বিত্তশালী লোকের সাহায্যপুষ্ট কিছু কিছু চতুষ্পাঠী যে এখনও নাই তাহা নহে। যে অল্প-সংখ্যক ব্রাহ্মণপণ্ডিত এখনও প্রাচীন ধরণের অধ্যাপনাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যের ব্যবস্থাও তাঁহাদের জন্ত আছে সত্য কিন্তু কেবল চতুষ্পাঠী থাকিলেই ত হয় না। অধ্যয়নক্ষু হাজ কোথায়? সংস্কৃত শিক্ষার উৎসাহ বিধানের জন্ত স্বতন্ত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে—স্বতন্ত্র ব্যক্তি ব্যবস্থা আছে—বিবিধ উপাধি বিতরণের রীতি আছে—প্রতিবৎসর পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষোত্তীর্ণের সংখ্যা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। কিন্তু একটু অহুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এই সব পরীক্ষার্থীর বেশীর ভাগই স্কুল-কলেজের ছাত্র—চতুষ্পাঠীতে নিয়মিত পড়াশুনা করার ইচ্ছাদের অবসর বা প্রয়োজন হয় নাই—বস্তুতঃ খুব কম চতুষ্পাঠীতেই ছাত্রগণ নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করিয়া থাকে—সকৌপরি পরীক্ষোত্তীর্ণের সংখ্যাবাহুল্যের মুখা হেতু। তাহা ছাড়া, চতুষ্পাঠী সম্বন্ধে ঐহাদের সামান্য অজিজ্ঞতা আছে তাঁহারা জানেন প্রতি চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ, বেদ প্রভৃতি বিষয়ে আদ্য ও মধ্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যাই কেবল বেশী নয়, একই ছাত্র হয়ত এক এক বৎসর এক এক ব্যাকরণের বা তজ্জাতীয় বিষয়ের আশু পরীক্ষা দিয়া চতুষ্পাঠীর অন্তিম বজায় রাখিতে সাহায্য করিতেছে—বিশেষ পড়াশুনা করার প্রয়োজনই হইতেছে না। পরীক্ষণীয় বিষয় সমগ্রভাবে না হটুক মোটামুটি পড়াশুনা করিয়া পরীক্ষা দিতেছে এইরূপ ছাত্রের সংখ্যাও চতুষ্পাঠীতে দ্রুত। ফলে, সংস্কৃত শাস্ত্রের গভীর পাণ্ডিত্যের ধারা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতেছে—বংশোদ্ভূত খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিতগণের বর্তমান উত্তরাধিকারিগণ শাস্ত্র-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অস্ত্র বস্তি অবলম্বন করিতেছেন—সংস্কৃতের চর্চা গভীরতা ও ব্যাপকতা হারাইয়া আজ ক্ষুদ্রগভীর মধ্যে আবিল হইয়া উঠিয়াছে। গহন শাস্ত্রকাননে পৃথগ্ৰদর্শকের অভাব বিশেষভাবে অহুভূত হইতেছে—সন্দিগ্ধ বিষয়ে স্বমীমাংসা

করিবার মত লোক আজ দ্রুত হইয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিত-বুলের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সংগৃহীত ও অপত্যবৎ পরিপালিত বিপুল গ্রন্থরাজি এবং তাঁহাদের অলিখিত জ্ঞান-ভাণ্ডার অথহু, অবহেলায় ও অহুশীলনের অভাবে অপহৃত হইতেছে।

স্কুল-কলেজের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইলেও ছাত্রদের সংস্কৃত জ্ঞান বা সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধা মোটেই আশাশ্রয় নহে। ছাত্রেরা সকলে শুদ্ধ বা না শুদ্ধ, বুঝ বা না বুঝ পাঠ্য বিষয়গুলি পরীক্ষার পূর্বে মোটামুটি ভাবে পড়াইয়া দিবার ও মুখ্য বিষয়গুলির বিশেষ আলোচনা করিবার ব্যবস্থা স্কুল-কলেজে আছে। তবে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে ছাত্রদের অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ—ব্যাকরণের গোড়ার কথাও অনেকে জানে না বা জানার দরকার বোধ করে না—দেবনাগরী লিপিতে অনভিজ্ঞ ছাত্রের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। তৎসত্ত্বেও পরীক্ষা ব্যাপারে ঔদার্য্যের ফলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় সংস্কৃত অহুভীর্ণ হইবার দুর্ভাগ্য খুব কম ছাত্রেরই হইয়া থাকে। সংস্কৃত না জানিয়াও কেবল মুলের অহুবাদ ও সাধারণ প্রশ্নের মোটামুটি উত্তর লিখিয়া বি-এ পর্য্যন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন নয় এ কথা ছাত্র-সমাজে সুবিদিত। তাই কয়েক বৎসর পূর্বে পর্য্যন্ত সহজ বলিয়াই অধিকাংশ ছাত্র সংস্কৃতকে পরীক্ষার অহুতম পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করিত। এখন অবশ্য বিষয়ান্তরের আকর্ষণ ও মূল্য বোধের ফলে সহজ হইলেও সংস্কৃতের দিকে আর বেশী ছাত্র আকৃষ্ট হইতেছে না—সংস্কৃতের প্রতি উপেক্ষা ও অনাদর স্কুল কলেজে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

কিন্তু কেবল দ্রবব্যহার বর্ণনা করিয়া, হুঃখের কাহিনী গাহিয়া ত লাভ নাই। এই দ্রবব্যহার প্রতীকারের উপায় কি তাহাই চিন্তা করিতে হইবে—দেশব্যাপী এই দ্রবব্যহার মূল কারণ অহুসন্ধান করিয়া তাহা দূরীকরণের উপায় উদ্ভাবন এবং সম্ভবপর হইলে কার্যতঃ প্রয়োগ করিতে হইবে। অবশ্য এ অহুসন্ধান বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে—সামান্য অহুদাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায় সংস্কৃত পঠনপাঠনের প্রতি এই যে আশ্রয়ের অভাব ইহার একমাত্র কারণ সংস্কৃত বিদ্যার বাজারদরের নিদারুণ স্তম্ভতা। দীর্ঘকাল পরিশ্রমে সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াও একজন পণ্ডিতের পক্ষে নিজ পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য—সংস্কৃত সাহিত্যে সাধারণ জ্ঞান মাত্র অর্জন করিবার দৌভাগ্য ঐহারা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে ত বিশেষ বলিবার কিছুই নাই। নিতান্ত আয়াসসাধ্য উগ্রবৃত্তিই তাঁহাদের অবলম্বন—মিউনিসিপালিটি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বা সরকারী সাহায্য লাভের জন্ত চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে হইবে—বহু আয়াসে

অনেক অনুরোধ-উপরোধে পরীক্ষার্থী ছাত্র জোগাড় করিতে হইবে। অথচ সাহায্যের পরিমাণ অতি সামান্য এবং সে সাহায্য নির্ভর করে প্রধানতঃ যে কোনও পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যার উপর। পূজা-পার্বণাদিতে যাজনিক কার্যের দক্ষিণা বা পণ্ডিত বিদায়ের স্বল্প আরও দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ ধর্ম্মাহুষ্ঠানে সাধারণের আগ্রহাতি-শয্যের অভাব, বিশেষ করিয়া পুরোহিত পণ্ডিতই হউন বা অপণ্ডিতই হউন তাহাতে কাহারও কিছু আসিয়া না যাওয়ার অপণ্ডিত ও স্থল পুরোহিতের প্রাচুর্য। সংস্কৃত পণ্ডিতের এই আর্থিক ছরবছা সংস্কৃত শাস্ত্রাহুষ্ঠানে কোন ছাত্রকেই উৎসাহিত করিতে পারে না। সুতরাং নিত্য নিঃস্ব নিকুপায় না হইলে—কোনরূপে স্থল-কলেজে পড়া চালাইতে পারিলে কেহ সংস্কৃত চতুষ্পাঠিতে পড়িতে যার না। তাই দুঃখের বিষয়, বর্তমান কালে চতুষ্পাঠীর ছাত্র সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত দুঃখী ও প্রতিভাহীন।

সরকারী ব্যয়ে সুপরিচালিত বর্তমান আদর্শের চতুষ্পাঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি বা পণ্ডিতকে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা এই অবস্থার আংশিক উন্নতি হইতে পারে সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রতিবিধান হইতে পারে না। চতুষ্পাঠীর সর্বোচ্চ পরীক্ষার কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষার সমুত্তীর্ণ ছাত্রের মর্যাদা প্রদান করিলেও সংস্কৃত শিক্ষার সর্বজনীন সমাদর দেখা দিবে না। বস্তুতঃ সংস্কৃতের সমাদর বৃদ্ধি ও পাণ্ডিত্য পরিপোষণের উপযোগী পূর্বযুগের সমাজব্যবস্থা আজ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সংস্কৃত ও সংস্কৃতের ধারক পণ্ডিতসমাজের প্রতি জনসমাজের যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহার হ্রাস কারণ ধর্ম্মগত—সেকালে হিন্দুর ধর্ম্ম ও আচারের প্রতি সমাজের অটুট আস্থা ছিল—ধর্ম্মের নিয়ম পালনের জন্ত ধর্ম্মের রহস্য জানিবার জন্ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্যের প্রয়োজন হইত—পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা-নিবেদনের অবকাশ লাভ করিলে অতি বড় ধনী ও মানী ব্যক্তিও নিজেকে সম্মানিত ও গৌরবাবিত বোধ করিতেন। সেকালে সমাজে পণ্ডিতের প্রয়োজন ছিল—তাই পণ্ডিতের সৃষ্টি হইত—শাস্ত্রের নির্দেশ মোটামুটি ভাবে জানিবার আকাঙ্ক্ষা জনসাধারণের ছিল, তাই তাহারা দেবভাষা শিক্ষা করিত। তাহা ছাড়া, তখনকার দিনে সাধারণ হিন্দুর পক্ষে সংস্কৃত বিজ্ঞা ব্যতীত অল্প শিক্ষণীয় বিষয়ও বিশেষ কিছু ছিল না। তাই প্রাথমিক সাধারণ শিক্ষার পরই লোকে চতুষ্পাঠীর শরণাপন্ন হইত এবং সম্পন্ন গৃহস্থমাত্রেই গ্রামে চতুষ্পাঠী রক্ষার ব্যবস্থা করা সামাজিক কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিত। উপনয়ন, বিবাহ, দোল-ছগোৎসব প্রভৃতি বিভিন্ন উৎসব ও ধর্ম্মকৃত্য উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদায় বা সংবর্দ্ধনার যে ব্যবস্থা ছিল—অগণিত ধর্ম্মাহুষ্ঠানে দক্ষিণা ও অত্যাধ বাবদে যে প্রাপ্য ছিল তাহাতে

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে জীবনযাত্রা নির্বাহে বা চতুষ্পাঠী পরিচালনার বিশেষ কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। বরং জমি-জমা তৈজসপত্র ও ভোজ্য দ্রব্যাদির প্রাচুর্যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সংসার ত্রি ও ঐশ্বর্যে ভরপুর থাকিত—দুঃখদৈত্বের লেশমাত্র সেখানে স্থান পাইত না।

পূর্ব অবস্থা আবার ফিরিয়া আসিবে এ সম্ভাবনা নাই। সত্য বটে, আজও হিন্দু আছে, তাহার ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্মাহুষ্ঠান আছে কিন্তু পূর্ব মনোভাব আর নাই। ধর্ম্মাহুষ্ঠানের ঠাট এখনও অনেকটা বজায় আছে—বিশেষতঃ আড়ম্বর বাড়িয়াছে বই কমে নাই—কিন্তু মন্ত্রতন্ত্রের দিকে কোনও আগ্রহ নাই—অহুষ্ঠানের মূলতত্ত্ব বা বুটিনাটির দিকে লক্ষ্য নাই। তাই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরও তেমন প্রয়োজন নাই—তাহার স্থলে প্রয়োজন আছে আমোদ-উৎসবের জাঁকজমকের। এরূপ অবস্থায় সমাজের নিকট হইতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ত্রিহুদ্বিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং কেবল সমাজের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না—একমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবার দিন আর নাই। অর্ধোপার্জনের অল্প উপায়কে উপেক্ষা না করিয়া তাহার জগৎ পূর্ব হইতেই উপযোগিতা অর্জন করিতে হইবে। সংস্কৃত শিক্ষার মুখ্য দোষ—ইহাতে প্রাথমিক পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষারও ব্যবস্থা নাই, ফলে উচ্চতম উপাধিদারী সংস্কৃত পণ্ডিতের পক্ষেও নির্দিষ্ট ধরনের পঠনপাঠন ব্যতীত অল্প কার্যে নিযুক্ত হওয়া সুকঠিন। শিক্ষাব্যবস্থার এই মূলগত ত্রুটি অতি সম্ভব দূর করিতে হইবে। অবশ্য সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়াই ইতিহাস, ভূগোল, গণিতাদি শিক্ষা দেওয়ার নূতন ব্যবস্থা করা অপেক্ষা প্রচলিত সাধারণ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করাই সমীচীন হইবে। সংস্কৃতের ছাত্রগণকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব সংস্কৃতানুবাদে মারফত শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা শতাধিক বর্ষ পূর্বে বিশেষভাবে করা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা চলে না। বস্তুতঃ সংস্কৃত শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে চলিবে না—সংস্কৃত শিক্ষাকে করিতে হইবে সাধারণ শিক্ষার পরিপূরক—ইহা হইবে সাধারণ শিক্ষার অলংকরণ। সাধারণ শিক্ষা কোনরূপে উপেক্ষিত হইলে এই অলংকারের কোনও শোভা বা গৌরব বর্তমান থাকিবে না। ইহার ব্যতিক্রম কখনও পরিদৃষ্ট হইলে তাহা ব্যতিক্রমরূপেই সম্মান ও শ্রদ্ধা পাইবে, তাহাকে নিয়ম বা আদর্শ বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। পল্লবগ্রাহী হইলেও বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অবশ্যকর্তব্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উল্লিখিত ব্যবস্থানুসারে কার্য করিতে পারিলে সংস্কৃত শিক্ষার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে। সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করার সংস্কৃত পণ্ডিতদের দৈন্য অনেকাংশে দূরীভূত



হইবে। অবশ্য এজন্য সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারসাধন করিতে হইবে। সরকারী ব্যয়ে বা সাধারণের বদান্যতায় প্রচুর পরিমাণে আদর্শ চতুষ্পাঠী স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, সংস্কৃত পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন ও মান বৃদ্ধির উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে। উত্তীর্ণ ছাত্রের গুণানুসারে অধ্যাপকদিগের বৃত্তিদান প্রথার বিলোপসাধন করিতে হইবে, টোলগুলি যাহাতে নামমাত্র পরীক্ষা দেওয়ার সহায়ক প্রাণহীন যন্ত্রমাত্র না হইয়া শাস্ত্রানুশীলনের প্রকৃত কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিতে পারে সে দিকে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে এই সংস্কার যতই অপ্রীতিকর ও কষ্টসাধ্য হউক না কেন ইহার উপর দেশের মঙ্গলামঙ্গল প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করিতেছে—দেশের গৌরবময় প্রাচীন সংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত ও অকলঙ্কিত ভাবে যদি রক্ষা করিতে হয় তবে তাহার মূলমন্ত্র এইখানে। মূলকে উপেক্ষা করিয়া—অবাস্তবিক উদ্ভিজ্জের নির্বোধ আক্রমণ ও তজ্জনিত যথোপযুক্ত প্রাণদরসসংস্কারের প্রতিকূলতা হইতে ইহাকে সুরক্ষিত না করিয়া রক্ষকে সঙ্কীর্ণত রাখিবার যে ব্যর্থ প্রয়াস মাঝে মাঝে করা হইয়াছে তাহাতে সুফললাভ ত হয়ই নাই—বরং সমস্ত স্বক্ষই ক্ষীণ ও মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে রক্ষা করিবার জন্ত আজ যদি আমরা আন্তরিকভাবে আমাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ না করি তাহা হইলে অদূরভবিষ্যতে আমাদের পক্ষে এজন্য নিফল অহুতাপ করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকিবে না—পণ্ডিতসম্প্রদায় বিলুপ্ত হইয়া যাইবে—পাণ্ডিত্যের প্রাচীন ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

এ বিষয়ে স্কুল-কলেজেরও যে একটা গুরু কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। স্কুল-কলেজের মধ্যে দিয়াই দেশের জনসাধারণের ভিতরে সংস্কৃত-প্রীতি সঞ্চারিত করিতে পারা যাইবে—দেশের শ্রদ্ধা সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট হইবে। এজন্য প্রচলিত পাঠ্যধারার পরিবর্তন করিতে হইবে। বর্তমানে যে নিয়মে স্কুল-কলেজে সাধারণ সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জাগরিত হইবার বিশেষ কোনও অবকাশ থাকে না—পঞ্চাশতের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কৃতির যে ব্যাপক ও গভীর প্রভাব রহিয়াছে সাধারণ ছাত্রের দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট না হইয়া তাহার চিত্তে বিরুদ্ধ ধারণার সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে। না-বুঝিয়া ব্যাকরণের নিয়ম ও প্রয়োগ কঠিন করা, আজগুবি পদ্যপঙ্কীর গল্প, ধর্মশাস্ত্রের অলৌকিক উপাখ্যান ও হুঙ্কোখ্য আদর্শবর্ণনা রচনার অধ্যয়ন ছাত্রদের মনে অনেক ক্ষেত্রেই একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। পরীক্ষার পদ্ধতি এ বিষয়ে ছাত্রদের মনে কোনওরূপ কৌতূহল উপন্ন করিবার অক্ষম নহে। অথচ বাংলা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ যোগ—জন্ম হইতে-মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন অঙ্গুষ্ঠানে সংস্কৃত ভাষার উপযোগিতা প্রাচীন

ভারতের গৌরবের ইতিহাসের বিভিন্ন নিদর্শন ও সংস্কৃত সাহিত্যের বহুমুখী বিকাশধারার সহিত ছাত্রদের পরিচয় সাধনের ব্যবস্থা-সম্পাদন বর্তমান পাঠ্য ও পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনের সাহায্যে একেবারে হুঃসাধ্য নয়। আর এই পরিচয় সাধনের ফলে সকলের না হউক অনেকের মনে সংস্কৃতির প্রতি একটা শ্রদ্ধা জাগরিত হইতে পারে—আরও জানিবার ও বুঝিবার একটা আগ্রহ সৃষ্টি হইতে পারে। তাহা যদি হয় তবে সেই আগ্রহ পরিতৃপ্ত করিবার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা থাকিবে চতুষ্পাঠীতে। এইভাবে চতুষ্পাঠী ও স্কুল-কলেজের সহযোগিতার ফলে সংস্কৃত বিজ্ঞা দেশের মধ্যে আবার শাখাপল্লব বিস্তৃত করিয়া পরিপূর্ণ শোভায় বিকশিত হইয়া উঠিবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত আমাদিগকে তৎপর হইতে হইবে।

প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে অভিজ্ঞ মনীষীদের সম্মান ও শ্রদ্ধা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস ও মুখ্য আধার পাশ্চাত্য দেশসমূহেও বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়—অথচ গ্রীক ল্যাটিনের সহিত পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক জীবন-ধারার সম্পর্ক নিতান্ত সামান্য। পঞ্চাশতের আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সত্ত্বেও আমরা এখন আর সংস্কৃত পণ্ডিতদের যথোচিত সমাদর করি না। বস্তুতঃ লেখাপড়ার আদর, জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের দেশে এখন পূর্বের তুলনায় অনেক কমিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের রাজা-মহারাজা নবাব-বাদশাহ্ ধনী-জমিদার সকলেই নানাভাবে পণ্ডিতদের অশেষ সম্মান করিতেন—উপাধি, ধনরত্ন, অভিনন্দন সকলই পণ্ডিতেরা অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণে লাভ করিতেন—সমাজে তাঁহাদের স্থান ছিল অতি উচ্চ। প্রবন্ধান্তরে (প্রবাসী, ১৩৪০ কাণ্টিক, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা-৪৪ খণ্ড) তাহার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি। পাণ্ডিত্যের প্রতি আমাদের দেশের সেই প্রাচীন মনোভাব স্মরণ করিয়া, বর্তমান জগতের উন্নতিশীল অস্তিত্ব দেশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাণ্ডিত্যের গৌরব আমাদিগকে সমাজের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুরূপ মর্যাদা যাহাতে প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞানও লাভ করিতে পারে সেদিকে আমাদিগকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এতদিন এদিকে যথোচিত দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ ঘটে নাই—ইচ্ছা থাকিলেও যথোচিত ব্যবস্থা করার শক্তি আমাদের ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পরে দেশের শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারসাধনের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা আমরা অহুতব করিতেছি—এই সময়ে আমাদের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথাও বিশেষভাবে স্মরণ করিতে হইবে, উপেক্ষিত অনাদৃত সংস্কৃত শিক্ষার প্রকৃত মানোন্নতির বিধান করিতেই হইবে।

## “মরণে কি মরে প্রেম”

(আও নাগা প্রণয়কাহিনী)

শ্রীমলিনীকুমার ভদ্র

নাগা পাহাড়ের উত্তর পূর্ব দিকে যে তরঙ্গায়িত পর্বতমালা কনিয়াকদের মূলকের অভিমুখে প্রসারিত তারই একটি শিখরের উপর অবস্থিত মিউবংচকুট নামে নাগাপুঞ্জী। গিরি-সান্নদেশই এই জনপদটির চতুর্দার্শ বীশঝাড় আর পাতলা জঙ্গলে ঘেরা। সেই বনে চরে বেড়ায় গরু মোষ আর শূকরের পাল। গ্রামপ্রান্তে কারুকার্যখচিত কাঠের দ্বারযুক্ত প্রকাণ্ড প্রবেশ-তোরণ; গিরিপাদমূল থেকে ঘনবনের নিবিড়তার ভেতর দিয়ে একটি আকাবাকা রাস্তা বরাবর চলে এসেছে ফর্টকের নোরগোড়া অবধি। সেই তোরণ-দ্বার আজ ভেঙে পড়েছে, ফর্টকটি বিগতগ্রী। আগেকার আমলে এই তোরণ যখন তৈরি হয় তখন এখানকার অধিবাসীরা একটি নরমুণ্ড ছেদন করে বিজয়োল্লাসে মত্ত হয়ে নবনির্মিত দ্বার-পথে গ্রামভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল। এটাই ছিল তখনকার দিনের প্রথা। বহিঃশত্রুর অতর্কিত আক্রমণের হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করার জন্তে তোরণ-দ্বার সকল সময়েই থাকত অবরুদ্ধ। গিরিশিখরস্থিত এই ঘনবসতিপূর্ণ পল্লীটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ছ’টি আও তরুণ-তরুণীর বেদনা-করণ বিয়োগান্ত প্রণয়-কাহিনী। যুগ যুগ ধরে গ্রাম-বৃদ্ধদের প্রমুখ্যে নাগা-নরনারী তাদের এই মহান জাতীয় প্রণয়কথা শুনে আসছে।

সেই স্মরণাতীত কালে মিউবংচকুটে বাস করত চংলী-গোষ্ঠীর একটি জংলী যুবক নাম তার চিন সানাবা, আর তার প্রতিবেশিনী ছিল একটি রূপলাবণ্যবতী তরুণী—নাম ইটিভেন। এদের পরস্পরের মধ্যে ছিল গভীর প্রেম—পরিণয়ের মধ্য দিয়ে এই প্রণয়কে সার্থক করে তুলবার জন্তে ছ’জনেরই মনে জাগল ব্যাঙল বাসনা। নিজেদের সামাজিক প্রথমত চিন সানাবা একদিন নিজ-গোষ্ঠীর মাতস্যর গোছের এক বুড়োর কাছে গিয়ে তাকে বললে—“আমি আজ মাছ ধরতে যাচ্ছি, বিক্রেলে আমার বাড়ীতে এসো।” এই হেয়ালিপূর্ণ কথার তাৎপর্য বুঝতে বুড়োর দেরি হ’ল না। এর মানেই হচ্ছে শ্রীমান কোনো শ্রীমতীর প্রেমে পড়েছেন।...যুবকটি ছড়াতে গিয়ে কিছু মাছ ধরে বাড়ীতে ফিরে এল। বুড়ো আর তার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব তার জন্তে অপেক্ষা করছিল। একটি মাছ সে বুড়োর হাতে দিয়ে দিলে, তার পর তারা সকলে মিলে ইটিভেনের গিড়ালয়ের অভিমুখে রওনা হ’ল। সেখানে পৌঁছে বুড়ো মাছটা ও-তরফের এক জনের হাতে সঁপে দিলে, তার পর তাকে আর বুড়োকে কিছু ‘মধু’ অর্থাৎ ধেনো মদ খেতে দেওয়া হ’ল—বিয়ের সম্বন্ধে কোন কথাই কিন্তু সেদিন হ’ল না। পরদিন সকালে যুবকটি একা আবার ইটিভেনের বাপের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ’ল। তাকে ভাল করে

খাইয়ে দাইয়ে ইটিভেনের বাপ মা ছ’জনে খেতে বসল। চিন সানাবা রক্ত নিখাসে তাদের ভোজন-পর্ব অবলোকন করতে লাগল, কিন্তু যখন দেখলে যে, তারা তার আনা আগেকার দিনের সেই বিশেষ মাছটি ছুঁলেও না, তখন তার মন ভেঙে পড়ল, সে-বুঝলে এ বিয়েতে ইটিভেনের বাপমায়ের সম্মতি নেই। তার সব আয়োজন-ব্যথা।

ইটিভেনের বাপ কোন কথা না বলে নিজের আচরণ দ্বারা একথাই তাকে বুঝিয়ে দিলে যে, তার মত চালচলোহীন গরীবের পক্ষে ইটিভেনকে পত্নীরূপে পাবার আশা বাতুলের কল্পনামাত্র। নিজের অদৃষ্টকে ধিকার দিতে দিতে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চিন সানাবা বাড়ীতে ফিরে এল।

এর পর থেকে ইটিভেনকে কি করে পাওয়া যায় তাই হ’ল তার একমাত্র চিন্তা। কিন্তু ভেবে ভেবে কোন কুল-কিনারা পেল না। ওদিকে, এদের মধ্যে যাতে আর অবাধ মেলামেশার সুযোগ না হয়, সেজন্মে ইটিভেনের বাপ তার মেয়ের ওপর খুব কড়া নজর রাখতে শুরু করলে। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়ল যে, ইটিভেনের দর্শনসুখ থেকেও বৃষ্টি তাকে বঞ্চিত হতে হয়। শেষে একদিন সুযোগ পেয়ে গোপনে ছ’জনে দেখা করলে এবং সলাপরামর্শ করে পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হবার একটা ফন্দি বার করলে।

সেদিনকার পর থেকে রোজই ইটিভেন যখন অশ্রান্ত মেয়েদের সঙ্গে খুব ভোরে জুমের ক্ষেতে কাজ করতে যেত তখন চিন সানাবা মোরাঙের\* মাচার ওপর এসে বসত। ছ’জনে চোখাচোখি হবামাত্রই ইটিভেন তাকে বিশেষ ভঙ্গিতে একটি ইঙ্গিত করত। যেতে যেতে কাঁধের ওপর হাত দিয়ে সে তার পিঠে ঝোলানো বুড়ীটিকে ঠিক করে বসিয়ে নিত। যেদিন সে বুড়ীটিকে ছ’টি আঙুল দ্বারা স্পর্শ করত সেদিন চিন সানাবার মন ভেঙে পড়ত, কেন না এই ইশারা থেকে সে বুঝতে পারত যে সেদিন ইটিভেনের বাপ মা ছ’জনেই ক্ষেতে গিয়ে মেয়ের ওপর চোখ রাখবে। দিনটাই যেন তার মাটি হয়ে যেত। খাওয়া-দাওয়া কাজ-কর্ম কিছুতেই আর সেদিন তার রুচি হ’ত না, সারা দিন সে মোরাঙের মাচার ওপর স্নান মুখে বসে কাটিয়ে দিত; মনটা কিন্তু তার ঘুরে বেড়াত পাহাড়ের ওপরকার জুমক্ষেতের আশেপাশে যেখানকার মাটি ভিক্ষে উঠত প্রিয়বিযুক্ত ক্ষেত্রকর্মরত ইটিভেনের অশ্রুজলে। কিন্তু যেদিন ইটিভেন একটি আঙুল দিয়ে বুড়ীটি স্পর্শ করত সেদিন ইঙ্গিতে তার সমস্ত অন্তর ভরে

\*অবিবাহিত যুবকদের যৌথ শয়নাগার।

উঠত। কেন না একথা তার জানা ছিল যে, সেদিন সে ক্ষেতে যাবে একলা, অথি কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন বাপ-মায়ের পক্ষে সেদিন তার সঙ্গে যাওয়া সম্ভবপর হবে না। সেদিন আনন্দের আবেগে তার নৃত্য করতে ইচ্ছে হ'ত, ভোরের আলো তার কাছে যেন বয়ে নিয়ে আসত এক নুতন বার্তা। এক লাফে মাচা থেকে নীচে নেমে এসে সে তার সঙ্গ ধরত। তারপর ইটিভেনের সঙ্গিনীদের মনে ঈর্ষা জাগিয়ে চিন সানাবা তাকে নিয়ে সরাসরি চলে যেত গিরিগাত্রস্থ নিবিড় জঙ্গলের ভেতরে। পাশাপাশি অবস্থিত বনানীমণ্ডিত সারি সারি পাহাড়ের মালা যেন তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকত; এক পাহাড় থেকে অথি পাহাড়ে, বন থেকে বনান্তরে ছরন্ত আবেগে তারা অকারেণে ঘুরে বেড়াত—মনে হ'ত এই সর্ববাধাবন্ধনহীন স্বচ্ছন্দবনচারী তরুণ-তরুণী ছুটি যেন বিধাতার সৃষ্ট প্রথম পুরুষ ও নারী—কোন অসম্ভবের প্রত্যাশায় হুর্গম গিরিপথে সুরু হয়েছে এদের দুঃসাহসিক অভিযান। এমনি ভাবে কত দিন যে তারা অরণ্য-পর্বতে ঘুরে বেড়িয়েছে তার আর অন্ত নেই।...

সে আজ কতকালের কথা। তারপর কত যুগযুগান্ত অতীত হয়ে গেল, কিন্তু আজও সেই গিরিকান্তারে তাদের স্মৃতিবিজড়িত বহু স্থান, বহু নিখরিরিগি সেই ছুটি আদিম তরুণ-তরুণীর প্রণয়লীলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেদিনকার মত আজও প্রেমিক-প্রেমিকা, চল্লিমিসেনের নিকটবর্তী সেই অভ্রভেদী শৈলশিখরে গিয়ে আরোহণ করে, যেখানে একদা এক বিশাল শিলাপটে পাশাপাশি বসত ইটিভেন আর চিন সানাবা। চিন সানাবা ধরত বাঁকিতে মধুর তান আর ইটিভেন সেই মধুর সুরলহরী শুনতে শুনতে একেবারে তন্ময় হয়ে যেত। বহুক্ষণ রোদে ঘোরাফেরা করার দরুন তাদের কর্ণভূষণে গৌজা পুষ্পগুচ্ছ যখন শুকিয়ে যেত তখন তারা গিরি-গাত্রস্থ কুণ্ডলোর স্ফটিকযুগ্মে নিখিল জলে সেগুলো ভিজিয়ে নিত।... সঙ্গে সঙ্গেই ফুলগুলো আবার তাজা হয়ে উঠে সৌগন্ধ্যে চারদিক আয়োদিত করে তুলত। আজও যদি তুমি চল্লিমিসেন অঞ্চলের গিরিসাহুদেশে বেড়াতে যাও তা হলে স্রবাসিত জলপূর্ণ সেই কুণ্ডলো দেখতে পাবে। সেগুলোতে চিন সানাবা আর ইটিভেনের কর্ণভূষণে গৌজা পুষ্পরেণুর স্নগন্ধ আজও যেন মিশে রয়েছে।...

এমনিভাবে চিন সানাবা আর ইটিভেনের দিন কাটছিল। এমন করে পরস্পরকে কাছে পাওয়ার স্রবোগ তাদের অদৃষ্টে খুব কম জুটত। এক দিনের মিলনানন্দকে স্নান করে দিত এক মাসের বিচ্ছেদ-বেদনা। একমাত্র পরিণয়-বন্ধনই স্থায়ী করতে পারত তাদের মিলনকে, কিন্তু ইটিভেনের পিতামাতার প্রতিবন্ধকতার দরুন এ জীবনে যখন তা সম্ভবপর নয় তখন তাদের নিকট আর বেঁচে থাকার সার্থকতা রইল

না। অনেক ভেবে চিন্তে তারা স্থির করলে যে, আত্মহত্যা করে তারা তাদের ব্যর্থ জীবনের অবসান করবে। তা হলে হয়তো পরলোকে গিয়ে পরস্পরকে তারা একান্তভাবে পেতে পারবে।

কিন্তু এই সমস্রকে কার্যে পরিণত করার পথেও যে ছিল দারুণ বাধা।

ছোটবেলায় তাদের হু'জনেরই বাপ মা তাদের কর্ণভূষণে বেঁধে দিয়েছিল মন্ত্রপুত বনৌষধি। এই ওষধির এমনি গুণ যে এগুলো যতক্ষণ কারুর কানে থাকবে ততক্ষণ হাজার চেষ্টা করলেও তার পক্ষে বহুতে জীবনাবসান করা সম্ভবপর নয়, কেন না যারা অপমৃত্যু ঘটবে থাকে সেই উপদেবতারা এই ওষধিধারণকারীর কেশাও স্পর্শ করতে পারে না। অবশ্য ওষধি খুলে রেখে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তারা হয়তো ইহলোকের সকল আলায়ন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারত, কিন্তু তারা জানত যে, এই ওষধি ধারণ করবার পর খুলে ফেলা মহাপাপ, আর তার শাস্তি হচ্ছে পরকালে অপরিণীত দুর্গতি ভোগ। পরলোকে অনন্ত-কাল কঠোর শাস্তি ভোগ করার চাইতে সংসারে দু'দিন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা শতগুণে শ্রেয়ঃ, একথা ভেবে শেষ পর্যন্ত তারা আত্মহত্যার সমস্র পরিত্যাগ করলে।

একদিন বহুক্ষণ বনেজঙ্গলে ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে তারা একটা নাম না জানা গাছের ছায়ায় এসে বসল। সেই গাছের মগডালে ঝুলছিল অনেকগুলো নিষিক্ত ফল। তাদের হু'জনেরই খিদে পেয়েছিল বেজায়। চিন সানাবা চটপট গাছে উঠে কতকগুলো ফল পেড়ে নীচে নেমে এল, তার পর হু'জনে মিলে সেগুলোর সদ্যবহার সুরু করলে। এত মিষ্টি ফল তারা জীবনে খায় নি। সেগুলো এই প্রণয়িগলের বুভুক্ষু রসনার নিকট যেন অমৃতাস্বাদনবৎ লাগল। ফলগুলো খাবার পর ইটিভেন আর চিন সানাবার মনে কি যেন একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেল। তারা হু'জনের পরস্পরের দিকে নির্বাক ভাবে তাকিয়ে রইল—কি যেন একে অপরকে তারা বলতে চায় অথচ ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। সেদিন শান্ত প্রভাতে সেই রক্ষছায়াতলে নিষিক্ত ফল ভক্ষণকারী ছুটি আদিম তরুণতরুণী একে অপরের একান্ত সন্নিকটে এগিয়ে এল, নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে পরস্পরের বুকে তারা অকোরে অঙ্গবিসর্জন করতে লাগল। পরিপূর্ণ মিলনের মধ্যে যে অনন্ত বিরহবেদনা লুকানো আছে সেই অহুভূতি তাদের মনকে বিষাদে পূর্ণ করে দিলে।

অচিরেই দুর্ঘ্যোগের ঘনঘটাির আচ্ছন্ন হ'ল তাদের ভাগ্যাকাশ। সেদিন ইটিভেনের হয়েছিল মারাত্মক জ্বল, স্নান করবার সময় মন্ত্রপুত ওষধিটি সেই যে সে খুলে রেখেছিল, তার-

পর আর তা পরবার খেয়াল হয় নি। নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণান্তে সেদিন অশ্রুজলে যখন তাদের প্রেমের অভিষেক হয় তখন সকল সন্তাপহারী সর্ববিঘ্ন বিনাশক, সেই ঔষধি তার কর্ণভূষণে বিভ্রমণ ছিল না। গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে এটা নজরে পড়বামাত্র চিন সানাবা ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় আতঙ্কে শিউরে উঠল।

চিন সানাবা যা আশঙ্কা করেছিল তাই হ’ল। দিনকতকের মধ্যেই সাংঘাতিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ইটিভেন তার বাপের বাড়ীতে একেবারে শয্যাশায়িনী হয়ে পড়ল। চিন সানাবা যখন তার অসুখের খবর জানতে পারলে তখন সে যেন একেবারে পাগলের মত হয়ে উঠল। প্রিয়তমার রোগ-শয্যা-পার্শ্বে যাবার উপায় ত ছিল না তার, কেন না ইটিভেনের বাবার কড়া হুকুম—কোন অবস্থাতেই চিন সানাবা যেন তার বাড়ীর চৌকাঠ না মাড়ায়।

এখন কি করে ইটিভেনের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা যায় তাই হ’ল চিন সানাবার একমাত্র চিন্তা। কিন্তু ভেবে ভেবে সে কোনও কুলকিনারা দেখতে পেল না। তার মনে হ’ল এই দারুণ ব্যাধির সময় তার জীবনসর্ব্বস্ব ইটিভেনের কোন কাজে যদি সে না লাগতে পারে তা হলে তার বেঁচে থাকার সার্থকতা কি? ইটিভেন কখন কেমন থাকে সে খবরও তার পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। সারাক্ষণ হুঙ্কিতা ভোগ করতে করতে তার এমন চেহারা হ’ল যে, তা দেখলে পাষাণেরও মায়া হয়।

শেষে ইটিভেনের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যোগ স্থাপনের একটা কন্দি তার মাথায় এল। একদিন গভীর রাত্রে সিঁধ কেটে সে ইটিভেনের ঘরে ঢুকে তার রোগশয্যাপার্শ্বে গিয়ে বসল। ঘরের ভেতরটা চুল্লীর আগুনের আভায়ে ঈষৎ আলোকিত, সবাই গাঢ় নিদ্রায় অচেতন। চিন সানাবা ধীরে ধীরে ইটিভেনের গায়ে মাথা ঘাত বুলাতে লাগল। অতিপরিচিত প্রিয়করস্পর্শে জেগে ওঠে ইটিভেন দেখে শিয়রে বসে আছে চিন সানাবা। একি অভাবনীয় ব্যাপার! নিজের চোখ দুটোকেও বিশ্বাস করতে যেন তার প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। বিশ্বয়ের ষোর খানিকটা কাটলে চিন সানাবাকে সে বললে—“সর্ব্বনাশ! এ কি হুঃসাহস তোমার। শিশুগীর পালাও, বাবা জেগে উঠলে তোমাকে আর আশ্র রাখবে না।” চিন সানাবা চটপট তার হাতে কতকগুলো পাকা ফল গুঁজে দিয়ে বললে—“ইটু, বহু আয়াসে বন থেকে তোমার জন্তে এগুলো খুঁজে পেতে নিয়ে এসেছি। তোমার এ অসুখের সময় তোমার জন্তে কিছু না করতে পারলে আমি হয়তো মরে যেতাম।” একটু থেমে আবার বললে—“ভবিষ্যতে এরকম হুঃসাহস আর করব না, মানে তোমাদের ঘরে আর ঢুকব না। তবে রোজ দুপুর রাতে ঐ সুদৃশ্যপথে তোমার জন্তে কিছু ফল নিয়ে আসব।

তোমার বিছানাটা এমনভাবে দেয়ালের পাশে এখানটায় পাতবে যেন এই গর্তের অস্তিত্ব কেউ টের না পায়। আমি যাবার সময় গর্তের মুখটা বুজিয়ে দিয়ে যাব। আমি রাতে এসে তিন বার গলা খাঁকার দিলে তুমি এই গর্তের ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেবে, ফলগুলো তোমার হাতে দিয়ে আমি সটকাবো।”

এর পর রোজই গভীর রাত্রে চিন সানাবা গর্তের মুখে এসে ইটিভেনকে ফল দিয়ে যায়। সুখানু ফলের চেয়ে শতগুণে মিষ্টি, প্রিয়তমের করাচুলির সেই ক্ষণিক স্পর্শলাভের জন্তে ইটিভেন রোজ রাত দুপুর পর্যন্ত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। ফল আদান-প্রদান কালে পরস্পরের করস্পর্শ তাদের উভয়ের দেহ-মনে জাগিয়ে তোলে পুলকশিহরণ। এমনি ভাবে প্রতি রাতে নীরব ভাষায় ক্ষণিক সান্নিধ্যের ভিতর দিয়ে হয় তাদের অন্তরের ভাব বিনিময়।...ফলগুলো খেয়ে ইটিভেন তার খোসা-গুলো রোজই গর্তের ভেতর ফেলে দিত। কিন্তু একদিন অসতর্কতা বশত একটা ফলের খোসা যে তার বিছানার এক-পাশে পড়ে রইল সে খেয়ালই তার হ’ল না। খোসাটি হঠাৎ ইটিভেনের মায়ের নজরে পড়ল। সে তো অবাক! এটা তার মেয়ের বিছানার পাশে এল কি করে। এগুলো তো ফলে পাহাড়ের একেবারে শীর্ষদেশে গভীর জঙ্গলে। কালেভদ্রে এ জাতীয় ছ’একটা ফল তাদের নজরে পড়ে। সে স্বামীকে নিয়ে গিয়ে খোসাটি দেখালে। দেখে ইটিভেনের বাবার মুখখানা তো একেবারে হাঁড়িপানা হয়ে উঠল, বললে—“ব্যাপারখানা বুঝতে পারলে তো। বাইরে থেকে কেউ রাতে আমাদের অজান্তে ইটিভেনকে ফল দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কার এত বকের পাটা। কেমন করেই বা সে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে ঘরে ঢুকছে। ব্যাপারটা যে বড় হেয়ালিপূর্ণ চেকছে। যাই হোক, আজ থেকে কড়া নজর রেখে এ রহস্যের মীমাংসা করতে হবে।”

সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ইটিভেনের বাবা ঘরের ভেতরকার জলন্ত চুল্লীর অনতিদূরে বিছানাটি বিছিয়ে মটকা মেরে পড়ে রইল। মশালটি সে শিয়রের কাছেই রাখলে। বহুক্ষণ পরে যখন পর পর তিন বার গলা খাঁকারের আওয়াজ শোনা গেল তখন সে উৎকর্ণ হয়ে মশালটি হাতে নিয়ে বিছানায় উঠে বসল, একটু বাদে মনে হ’ল ইটিভেন যেন কি চিবিয়ে চিবিয়ে যাচ্ছে। বড় অদ্ভুত ব্যাপার তো। বুড়োর বিশ্বয়ের আর পরিসীমা হইল না। ক্ষিপ্ৰহস্তে মশালটি জলন্ত অন্ধারে গুঁজে সে ফুঁ দিয়ে জালিয়ে নিলে, তার পর এক লাফে ইটিভেনের বিছানার কাছে এসে দেখলে তার শিয়রের ঠিক পাশেই একটা গর্তের মুখ দিয়ে একখানা হাত উপরে উঠেই এক লহমায় অন্তর্হিত হয়ে গেল।

নিশ্চয় মনে করা যেত যে এটা ভৌতিক ব্যাপার। হাতটি

ভূতের হাত। কিন্তু ভূতের হাতে চিন সানাবার ধাতুনিষ্পিত দস্তানাটি থাকবে কেন? ঐ দস্তানাটি চিন সানাবা চব্বিশ খণ্টাই পরত। দেখতে দেখতে জিনিষটা লোকের এত পরিচিত হয়ে গিয়েছিল যে অন্ধকারেও এটাকে চিনতে তার বেগ পেতে হ'ত না। কোন বহুব্যবহৃত পুরনো জিনিষের উপমা দিতে গেলেই লোকে বলত যেন চিন সানাবার দস্তানা। বুড়োর কাছে এখন ফলের খোসার রস্তু জলের মত সাফ হয়ে গেল। গভীর রাত্রে তার আন্তানায় রক্তপথে দস্তানাপরা হাতের আবির্ভাবের নিগূঢ় তাৎপর্যটি কি তাও বুঝতে তার বাকি রইল না। এই হাতের মালিকটি পাছে না বেহাত হয়ে যায় সেজন্যে ভড়িয়ে গেল জলন্ত মশাল হস্তে রক্তপথে সে নেমে পড়ল। চিন সানাবা কিন্তু ততক্ষণে ছিদ্রপথ অতিক্রম করে বাইরে এসে পগার পার।

এখন ইটিভেনের বাবা দেখলে, চিন সানাবা যে-রকম নাছোড়বান্দা তাতে শেষ পর্যন্ত না একটা কেলেক্সারি বাধিয়ে বসে। এমনিত্তেই তো ব্যাপার অনেকদূর অবধি গড়িয়েছে, এখন অবিলম্বে এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। সোমন্ত আইবুড়ো মেয়েকে নিয়ে এ ভাবে তো আর বাস করা চলে না। তার বিয়ে যদি দিয়ে দেওয়া যায় তা হলে তাকে আর কোন ঋক্তি পোয়াতে হবে না। সে স্থির করলে ইটিভেন সেরে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সাংগ্ৰাটস্থ গ্রামের টিনিউরের হাতে সম্ভ্রদান করবে।

দিনকয়েকের মধ্যেই ইটিভেন সুস্থ হয়ে উঠল। তখন তার বাপ মা তার বিয়ের তোড়জোড় সুরু করে দিলে। ইটিভেন দেখলে, তার সর্বনাশ হতে চলেছে। বিয়ের পর কোথায় কোন্ দূর পাছাড়ের কোলে ভিন্ গাঁয়ে তাকে চলে যেতে হবে—ফলে চিন সানাবার সঙ্গে হবে তার চিরবিচ্ছেদ। বিয়ের পর জীবনে হয় তো আর এক বারও তাকে সে দেখতে পাবে না। যদি তাই হয় তা হলে সে বাঁচবে কেমন করে। কাজেই এ বিয়েতে সে প্রবল আপত্তি জানালে। বাপের হাতে পায়ে ধরে কেঁদে কেটে কাকুতিমিনতি করে বললে—“বাবা, আমায় যার তার হাতে সঁপে দিয়ে না। আমি বরং সারাজীবন আইবুড়ো অবস্থায় তোমার বাড়ীতে থেকে তোমার জুম্ফেতে কাজ করব।”

বাপের মন কিন্তু গলল না, সে তার কথায় কান না দিয়ে বিয়ের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করবার জন্যে একেবারে উঠে পড়ে লেগে গেল। যথাসময়ে বরপক্ষের লোকেরা পাকা দেখবার জন্যে কনের বাড়ীতে এসে হাজির হ'ল, এবং বিয়ের শুভ দিনও যথারীতি অবধারিত হ'ল।

বিবাহ অল্পাধিক দিন হবার কথা ঠিক সেই দিন ঘটল এক শোচনীয় দুর্ঘটনা। ইটিভেনের হ'ল পদখলন—পাপের পথে নয়, গ্রামের পথে। কি কাজে সে এ-পাড়া থেকে ও-

পাড়ায় যাচ্ছিল, হঠাৎ পা পিছলে রাস্তার উপর মুখ খুবড়ে পড়ে গেল। দেহে তার এমন চোট লাগল যে, নিজের চেষ্টায় তার ওঠবার ক্ষমতা রইল না। পথিপার্শ্বে পড়েই যন্ত্রণায় সে কাতরাতে লাগল। সুন্দরী তরুণীর আর্জনাদে বিচলিত হয়ে একজন পথচারী পুরুষ তাকে টেনে তোলবার জন্যে এগিয়ে এল। কিন্তু তার গুরুতার বলিষ্ঠ দেহকে একচুল নড়ানো তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না। অনেকক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে রাস্তার পাশেই বসে পড়ে সে হাঁফাতে লাগল। দেখতে দেখতে ইটিভেনের চারপাশে জীপুরুষের ভিড় জমে গেল, সবাই ভাবতে লাগল এই রূপলাবণ্যবতী যুবতীর দেহ না জানি কত শক্তির আধার। সমবেত যুবকদের মনে তখন শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে এই শক্তিময়ী তরুণীর মন জ্বিতে নেবার জন্তে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগল। এক একজন করে বীরদর্পে এগিয়ে গিয়ে তাকে টেনে তুলবার জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিফলমনোরণ হওয়ায় লজ্জায় অধোবদন হয়ে হয়ে একে একে সবাই সে স্থান পরিত্যাগ করে চলে গেল।

শেষ পর্যন্ত অকুস্থলে এসে উপস্থিত হ'ল শালগ্রাম মাহাবলী চিন সানাবা। এসেই সবল বাহুবন্ধনে বেঁধন করে ইটিভেনকে সে অগ্নায়াসে অবলীলাক্রমে কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিলে।

ইটিভেনের বাপ যখন সকল কথা শুনলে তখন চিন সানাবার ওপর তার মনের বিরূপভাব কতকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হ'ল, সে ভাবলে এই বীর যুবককে জামাই করতে পারলে ভালই হ'ত। কিন্তু তখন টিনিউরের সঙ্গে ইটিভেনের বিয়ের প্রস্তাব অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে, আর তা বাতিল করা চলে না; করলে লোকের কাছে মুখ থাকে না। কিন্তু ইটিভেনকে সঙ্কটজনক অবস্থা থেকে উদ্ধার করে চিন সানাবা তার যে উপকার করেছে সেটার কোনো প্রতিদান না দিলে সে যে তার নিকট ঋণী থেকে যাবে। এখন, ইটিভেনের বাবা কি করে চিন সানাবার ঋণ শোধ করতে পারে তা স্থির করবার জন্তে গাঁয়ের মাভবরদের এক বৈঠক বসল। অনেক সলাপরামর্শ করে তারা পীতি দিলে যে, বিবাহ-অল্পাধিক দিন পরবর্তী আমুং\* অর্থাৎ কশ্মিরিতি দিবস গুলোতে চিন সানাবাকে ইটিভেনের সাহচর্যে সাত দিন থাকবার অধিকার দিতে হবে, তা হলেই নাকি ইটিভেনের বাপ ঋণমুক্ত হতে পারবে।

\*‘আমুং’ তিথি বলতে সেই দিনগুলোকে বুঝায় যখন পূজাপার্বণ বা বিবাহ-উৎসবাদি উপলক্ষে কোন নাগা গ্রামের লোকদের পক্ষে নিজ গ্রামের সীমানার বাইরে কোথাও কাজকর্ম করা নিষিদ্ধ।

আও নাগাদের সমাজে বিয়ের পর নবদম্পতিকে নয় দিন ঘোন-সম্মিলন থেকে বিরত থাকতে হয়। কোন কোন সম্ভ্রদায়ের আও মেয়েরা ইচ্ছা করলে বিয়ের পর কয়েক দিন নিজ নিজ পূর্বপ্রণয়ীর সহিত সম্মিলিত হতে পারে।



ওদের জীবনে লাগল ক্ষণবসন্তের স্পর্শ—দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল যেন একটি দীর্ঘ মধুর মুহূর্তের মত।

তারপর ওদের জীবনে এল চিরবিচ্ছেদের পালা, পরস্পরের সান্নিধ্যে আসবার সুদূরতম সম্ভাবনাও এই প্রণয়িযুগলের আর রইল না।

এই বিচ্ছেদে এদের ভালবাসা কিন্তু তিলমাত্রও হ্রাসপ্রাপ্ত হ'ল না। খণ্ডরবাড়ীর নুতন পরিবেশের সঙ্গে ইটিভেন নিজেকে কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারলে না। দিনরাত উদাস মনে বসে বসে অলুক্ষণ সে শুধু চিন সানাবারই স্মৃতির অন্ধান করত। ফলে ঘর-সংসারের কাজে তার গাফিলি হতে লাগল। খণ্ডর-পরিবারের লোকেদের লাঞ্ছনা-গল্পনায় জীবন তার দুর্ভর হয়ে উঠল।

ভাবতে ভাবতে শেষে সে শক্ত অসুখে পড়ল। অবস্থা তার এমনি সঙ্কটাপন্ন হয়ে দাঁড়াল যে, সকলেরই মনে হ'ল এই রোগশয্যাই হবে তার শেষ শয্যা। অস্তিম শয্যায় অচৈতন্য অবস্থায় সে শুধু চিন সানাবার নামই উচ্চারণ করতে লাগল। জ্বর এ অবস্থা দেখে টিনিউরের মনে জাগল গভীর অলুক্ষণ। সে নিজেকে গিয়ে চিন সানাবাকে ইটিভেনের রোগ-শয্যাপাশে নিয়ে এল। কিছুক্ষণ পরেই প্রিয়তমের কোলে মাথা রেখে ইটিভেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

মেয়েকে শেষ দেখা দেখবার জন্মে ইটিভেনের বাপও জামাইয়ের বাড়ীতে এসেছিল।

চিন সানাবা, ইটিভেনের স্বামী টিনিউর আর ইটিভেনের বাপ—এরা তিন জনেই ইটিভেনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। ইটিভেনের মৃত্যুর পর একই ব্যথায় ব্যথিত এই তিন জন পরস্পরের প্রতি হিংসা ঘেঁষ জোঁধ সবকিছু ভুলে গিয়ে মিলে মিশে তার শেষকৃত্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার আয়োজনে রত হ'ল।

শবদেহকে কাপড়-চোপড়ে মুড়ে বহির্বাটিতে একটা মাচার উপরে রেখে তারা তিনজনে জঙ্গলের ভেতরে চলে গেল কাঠ আনতে।

ঐ কাঠ মাচার নীচে রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। শবদেহ আছে অনেক ওপরে। সেই জলন্ত কাঠখণ্ড-সমূহ থেকে উখিত ধোঁয়ায় শবদেহটি শুকাতে থাকবে। এমনিভাবে দিনের পর দিন ধুমিলপু হয়ে শবদেহ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলে পর সেটিকে প্রাণ্য পথের পাশে নির্দিষ্ট শব-মঞ্চের ওপর নিয়ে গিয়ে সেখানে রেখে দেওয়া হবে। অমুষ্ঠানাদির যাতে কোনো ক্রটি না হয় সেদিকে তিন জনেরই সজাগ দৃষ্টি।

জঙ্গলের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে তারা তিন জনে অবশেষে দৈবচক্ষে সেই গাছটির নীচে এসে হাজির হ'ল যেখানে একদা নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণান্তে ইটিভেন আর চিন সানাবা

নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে পরস্পরের বুকে অশ্রু বিসর্জন করেছিল।

গাছটি মরে গেছে—খসে পড়েছে তার পত্রাভরণ, শুকিয়ে গেছে তার শাখাপ্রশাখায় সঞ্চিত প্রাণরসধারা।

বিগত দিনের স্মৃতিবিজড়িত গাছটির পানে তাকিয়ে চিন সানাবার বুকের ভেতরটা যেন দুঃসহ ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল।

তারা তিন জনে গাছটাকে কোপাতে কোপাতে ভূপাতিত করলে। তার পর বাড়ীতে বয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে সেটাকে তিনটি অংশে বিভক্ত করলে। চিন সানাবা সব চেয়ে বড় খণ্ডটি ঝাড়ে তুলে নিলে। সেই বিরাট কাঠখণ্ডকে যখন সে অবলীলাক্রমে বয়ে নিয়ে চলল তখন সে যে কত বড় শক্তির তা বুঝতে ইটিভেনের বাপের বাকী রইল না। নিজের অবিস্ময়কারিতায় এই শক্তিশালী পুরুষের জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে বলে ইটিভেনের বাপের বড় মনস্তাপ হতে লাগল।

ইটিভেনের অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে চিন সানাবা নিজ বাড়ীতে ফিরে এল। তার নিকট এখন বেঁচে থাকা সম্পূর্ণ নিরর্থক বলে মনে হতে লাগল।

কিন্তু বেশী দিন তাকে হুশিয়ার ভোগ করতে হ'ল না। তাকেও ধরল কালব্যাপিতে এবং ইটিভেনের মৃত্যুর মাত্র ছয় দিন পরে সেও তার অঙ্গমন করলে।

চিন সানাবার বাপ মা শবদেহটিকে ধুমশুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে বহির্বাটিতে মাচার ওপরে রেখে বহু নিম্নে আগুন ধরিয়ে দিলে।

হঠাৎ গ্রামবাসীরা দেখে অপূর্ব দৃশ্য :

কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি ধীরে ধীরে উপরে উঠে দক্ষিণমুখী হয়ে ইটিভেনের শবদেহের নিরস্ত্র অগ্নিকুণ্ডোখিত ধূমপুঞ্জের সহিত গিয়ে মিশল। শেষে মনে হতে লাগল নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ দুটি কালো ছায়ামুষ্টি যেন সুদূর আকাশ-পথে পাড়ি জমিয়েছে।

মেয়েপুরুষ সবাই উর্দ্ধপানে তাকিয়ে রইল অবাক বিস্ময়ে। সবাই বলাবলি করতে লাগল, “ঐ যাচ্ছে ইটিভেন আর চিন সানাবা। এদের প্রেম ছিল ঝাঁটি, তাই তো এরা স্বর্গে চলে গেল!”...

যথাসময়ে চিন সানাবা আর ইটিভেনের বাপ মা শবদেহ দুটিকে গ্রামপথের পার্শ্ব সংকারভূমিতে নিয়ে গিয়ে একই শবমঞ্চের উপর পাশাপাশি স্থাপিত করলে।...

ইটিভেন আর চিন সানাবার প্রণয় গায়ের অনেকেই

\* আওদের মৃতদেহ এমনি ভাবে মঞ্চের উপরে পড়ে থেকে গচে গলে শেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ইন্টার উদ্বেগ করেছিল। বেঁচে থাকতে এরা তাদের কম নাজেহাল করে নি। মরবার পরও এই সব দুশমনরা তাদের জালাতন করতে লাগল।

তুর্কতাক তল্পমন্ত্র জানা এক দুষ্ট ব্যক্তি একদিন সংকার-ভূমিতে এসে ইটিভেন আর চিন সানাবার শরদেহের মাঝখানে একটি বিচালি খাসের আগা রেখে চলে গেল।

সেদিন রাতে ইটিভেন তার বাবাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললে যে, তার-এবং তার প্রণয়ীর মধ্যে দুর্ভিত্তিক্রম্য ব্যবধান রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাটকায় মহীরুহ—তাই তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পারছে না।

পরদিন তার বাবা সংকারভূমিতে এসে তাদের শবমঞ্চ তল্লাস করে তৃণখণ্ডটিকে আবিষ্কার করলে। সেটিকে সেখান থেকে অপসারিত করে সে বাড়ীতে চলে এল।

আর এক দিন অল্প এক দুশমন একটা কাঁপা বাঁশের চোঙ জল দিয়ে ভর্তি করে তাদের দু'জনের মাঝখানে রেখে গেল।

আগেকার মত এবারও ইটিভেন তার বাবাকে স্বপ্নে দেখা

দিয়ে বললে, এক হুস্তর নদী তাকে চিন সানাবার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

তার বাপ এবারও এসে দেখলে তাদের শব-মঞ্চের মাঝখানে পড়ে আছে একটা বাঁশের চোঙ—সেটাকে সে সরিয়ে ফেললে।

এর পর থেকে ইটিভেন আর কখনও স্বপ্নে তার বাপের নিকট আবির্ভূত হয় নি।...

একথা শুনে সবাই বুঝতে পারলে যে, এতকাল পরে যথার্থই তাদের সকল জালা মন্ত্রণার অবসান হয়েছে। নানা দুর্গতিভোগের পর অবশেষে পরলোকে তারা নিরবচ্ছিন্ন মিলনানন্দ উপভোগ করছে। তারা সুখে আছে।

গল্প তো শেষ হ'ল এখন সার কথাটি শোনো। কোনো প্রেমিক-প্রেমিকা যদি পরিণীত হতে কৃতসঙ্কল্প হয় তা হলে ইচ্ছে করলে তুমি তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রতিনিয়ন্ত করবার প্রয়াস পেতে পার, কিন্তু মনে রেখো জোরজবরদস্তি করে তাদের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ সৃষ্টির চেষ্টা শুধু যে অজ্ঞান তাই নয়, এটা হচ্ছে চূড়ান্ত রকমের বোকামি।

## প্রাগৈতিহাসিক নাম-তত্ত্ব

শ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই, তত্ত্বভূষণ

প্রবাসী মাঘ ১৩৫৪ ২য় খণ্ড চতুর্থ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গিরিধারী রায়চৌধুরী মহাশয় “প্রাগৈতিহাসিক বাংলাদেশ” শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্গদেশের কতকগুলি স্থান ও নদীর নামের মৌলিক তথ্যপূর্ণ অর্থ-বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার তথ্যের মূলভিত্তি অষ্ট্রিক জাতি-গোষ্ঠী-এবং তাহাদের ভাষা। প্রাচীন বঙ্গদেশ ও কামরূপ, তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের অধিকাংশ স্থানের উপর অষ্ট্রিক ব্যতীত বড়ো জাতির কৃষ্টির প্রভাবও যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়, এবং অনেকগুলি স্থান ও নদীর নামের মধ্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে আভাস-দিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

‘প্রবাসী’র উপরোক্ত সংখ্যায় “দেবীর বোধন ও বিসর্জন” প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে অষ্ট্রিক জাতি চীন মহাদেশের যে অঞ্চল হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, সেই দেশ খিউচ খিচ বা স্বর্গ নামে অভিহিত হইত। অতাপি উত্তর বঙ্গার অধিবাসীরা চীনদেশকে খিও(চ) বলে। সেই সময় সেই দেশে চাও জাতির প্রাধান্য ছিল বলিয়া সেই দেশাগত লোকেরা চাওখিচ, চোখিচ, জোখিচ এবং পরে সংস্কৃতে জ্যোতিষ নামে পরিচিত হইয়াছিল; এবং তাহাদের দ্বারা অধ্যুষিত

বিভিন্ন অঞ্চল পূর্ব বা প্রাগ জ্যোতিষ, মধ্যজ্যোতিষ এবং উত্তর-জ্যোতিষ নামে অভিহিত হইয়াছিল। কামরূপ, মধ্যপ্রদেশ ও আফগানিস্থানে উহাদের তিনটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, এবং প্রতি অঞ্চলে ভারতবর্ষের প্রথম কেন্দ্র প্রাগ জ্যোতিষের নামানুসারে নগর বা কেন্দ্র স্থাপন করায় মহাভারতে উত্তর-ভারতের অনেক স্থানে প্রাগ জ্যোতিষের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ছোটনাগপুর অঞ্চলের অষ্ট্রিক জাতির সম্প্রদায়বিশেষ নিম্নের জাতির আদি নাম চাওখিচ হইতে চাওখিচিয়াল, চাওখিয়াল, চাওতাল বা সাঁওতাল নামে পরিচিত হওয়া সম্ভব বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

মুন্ড, শব্দের অর্থ দেশ। এই শব্দ চীন, টাই আদি জাতির মধ্যে বর্তমানেও প্রচলিত। আদিতে চীন দেশ হইতে আগত আসামের আহোম জাতির রাজাকে চাওয়া (চা, চো), এবং মজীকে মুং মুন্ড (দেশের প্রধান ব্যক্তি) বলিত।

‘লাও’, ‘লা’ শব্দের অর্থ বিস্তীর্ণ। মুন্ড লাও, মুন্ড লা শব্দের অর্থ বিস্তীর্ণ দেশ। চীনদেশের পশ্চিমে অবস্থিত বিস্তীর্ণ দেশ খণ্ডের মঙ্গোল, বা মঙ্গোলিয়া নামকরণের মূলে এই মুন্ড লাও থাকা সম্ভবপর।

‘খা’ শব্দের অর্থ প্রসবণ, বা হ্রদ; নদী আদির সীমাবদ্ধ জল। যে নদীর জল বার মাস প্রবাহিত হয় না, সেই নদীর নামের পরে বা পূর্বেও ‘খা’ যুক্ত থাকে। চীন দেশে চাই-খা, মেইখা নামক নদী আছে। মণিপুর দেশে ‘লগতাক’ নামক ৮ মাইল দীর্ঘ ও ৫ মাইল প্রস্থ একটি বৃহৎ হ্রদ আছে। এই বিস্তীর্ণ হ্রদযুক্ত দেশের নাম ম্যুঙ-খা-লা। বর্মারা উহাকে “ম্যুঙ-ক্লা” উচ্চারণ করিত। ইহা হইতেই মণিপুরের প্রাচীন নাম মেথলি বা মেকলি দেশ। ‘খা-লা’র তীরবর্তী স্থানের লোক খালা-ছাই (ছাই; ছা=সন্ধান) মণিপুরী জাতির একটি শাখা।

চীন-পর্বতমালাবাসী পার্বত্য জাতিরা নিজেকে লু, চোহ, লাই বলে। বর্তমান মণিপুর দেশ পূর্বে চীন-পার্বত্য জাতির অধিকারে ছিল। তখন এই দেশের অপর নাম ছিল ম্যুঙ-লাই বা ম্যুঙ-লু। অতীতে আসাম ও শ্রীহট্ট কাছাড়ের লোকেরা মণিপুরকে মগলু বা মগলাই দেশ বলে, এবং মণিপুরের অধিবাসীকে মেই-মগলাই অর্থাৎ মগলাই দেশের মানুষ বলে। মি, মেই=মানুষ।

‘লু’ জাতির এক শাখা লু-ছাই অর্থাৎ ‘লু’-র সন্ধান। ইহারা নিজেকে মি-চোহ শব্দ হইতে মি-জোহ বা মিজো বলে। চোহ বা জোহ শব্দ পরবর্তীকালে পর্বত বা উচ্চভূমি অর্থে ব্যবহৃত হইত। সুতরাং মিজো শব্দের অর্থ পর্বত বা উচ্চভূমিবাসী—highlanders।

বডো ভাষায় “হা” শব্দের অর্থ সমতল ভূমি, মাটি। বডু, বড় শব্দের অর্থ প্রচুর, মাই শব্দের অর্থ ধান। প্রচুর ধাতুযুক্ত স্থানের নাম মাই-বাণ্ড বা মাই-বণ্ড—উত্তর কাছাড় পর্বতের মধ্যে কাছারী রাজ্যের প্রাচীন নগর। এখন সেখানে একটি রেল স্টেশন আছে।

প্রচুর সমতল ভূমিযুক্ত স্থানের নাম—হা-বাণ্ড, হা-বণ্ড বা হাবুণ্ড। আসামের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রাচীনকালে হাবুণ্ড রাজ্য ছিল। ইবন-বতুতার ভ্রমণ-কাহিনীতেও হাবুণ্ড রাজ্যের বিবরণ আছে।

বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিযুক্ত স্থানের নাম লা-বাণ্ড বা লা বণ্ড—দার্জিলিংয়ের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র শহর। ঠিক একই অর্থে বাণ্ড লা বা বাণ্ডলা শব্দও সির হইয়াছে।

চীন দেশে সর্বপ্রথম ধাতের চাষ হয়। অগ্নিক জাতিরা কচু, হলুদ আদির সহিত ধাতের চাষও ভারতবর্ষে প্রথম প্রবর্তন করে। উচ্চভূমি খুঁড়িয়া যে চাষ করা হইত তাহার নাম জোহ-মোহ বা জুম খেতি। মোহ শব্দের অর্থ খনন করা। যে অস্ত্র দ্বারা মাটি খুঁড়া হইত, তাহার নাম মোহ-খিউ (কোদাল)।

উচ্চভূমিতে উৎপন্ন এক প্রকার ক্ষুদ্র ধাতের নাম—জোহা (কাটারি ভোগের মত)। বিস্তৃত সমতল ভূমিতে উৎপন্ন

ধাতের নাম—লাহা বা লাহি; অথবা হা-লা বা হালি। হালি হইতে খুব সম্ভব ‘শালি’ শব্দের উৎপত্তি। বহুদেশে যে ধাতকে শালি ধাত বলা হয়, আসামে বর্তমানেও তাহাকে লাহি ধান বলে।

কা-মেই বা কুমাই শব্দের অর্থ মাতা। ক্রিয়াবাচক “খা” শব্দের অর্থ প্রসব করা। খাসিয়াদের মধ্যে এই দুই শব্দ বর্তমানেও প্রচলিত। গৌহাট্টের নীলাচল পর্বতে প্রস্তরগাত্র ভেদ করিয়া নির্গত প্রসবণে অগ্নিকরা প্রতিবৎসর ধাত রোপণের পূর্বে ভূমিদেবী রজহলা হওয়ার উৎসব করিত। ঐ স্থানের নাম ছিল কামেই-খা। ইহারই সংস্কৃত রূপ কামাখ্যা। প্রাচীন অগ্নিক রীতি অনুযায়ী নামে এখনও সেখানে পালিত হয়।

আসামের পণ্ডিত ডক্টর শ্রীযুক্ত বাণীকান্ত কাকতি, এম-এ, মনে করেন, অগ্নিক ভাষার—কামই (দৈত্য), কামইট, (ভূত), কামেট, কামুট, খমচ (স্বত দেহ) আদি শব্দ হইতে কামাখ্যা শব্দের উৎপত্তি সম্ভবপর। কিন্তু ইহা বড়ই কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়।

অগ্নিক জাতির পরে হিমালয় পর্বতের উত্তরস্থ দেশ হইতে “বডো” জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ইহারা প্রথমতঃ কাবুলীওয়ালাদের মত চীন দেশজাত রেশম বস্ত্র পৃথিবীর নানাস্থানে এবং ভারতবর্ষে বিক্রয় করিতে আসিত। ‘ছের’ বা ‘ছেরেছ’ শব্দের অর্থ রেশম বস্ত্র। এই শব্দ হইতেই ‘শাড়ী’ শব্দের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব।

ছেরেছ ব্যবসায়ীরা ছেরাইটিচ, কিরাইটিচ, কিরাডিয়া বলিয়া পরিচিত ছিল। এই শব্দ ভারতবর্ষে ‘কিরাত’ রূপ পরিগ্রহ করে। ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করিবার পর ইহারা সর্বদা পার্বত্য অঞ্চলে বাস করিত এবং রেশমপোকা পালন করিত। এইজন্মই কিরাত জাতি অর্থে পার্বত্যজাতি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এবং অমরকোষকার লিখিয়াছেন—“কিরাতা পর্বতবাসিনঃ।”

বড় শব্দের অর্থ বর্ষ বা বাসভূমি। পরবর্তীকালে যে অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বেশী হইয়া উঠিয়াছিল, সেই অঞ্চলের নাম হয় বড় টি (বৌদ্ধলান্দা) বড়; এবং পরে উহা তিব্বত হইয়াছে। এই ভাবে বিস্তীর্ণ বড় দেশে হোন্ড, কোন্ড, ইলাবড আদি অনেক ঋণ ছিল।

বডো ভাষায় ‘ফিছা’ শব্দের অর্থ সন্ধান। এই শব্দের সহজ রূপ—ছা, ছাই, ছি শব্দের অর্থও সন্ধান। কামাখ্যাভীর্থে উপাসক সম্প্রদায়কে বডোরা খা-ছাই বা খা-ছি বলিত। ইহারাই বর্তমানে খাশি, বা খাশিয়া জাতি। হোরবড হইতে আগত দল হোন্ড-ছাই, বা হোজাই—কাছারী জাতির এক সম্প্রদায়। কোরবড বাসী এক সম্প্রদায় চতুর্থ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ায় কোছার বা কোছা রাজ্য স্থাপন করে।

তাহাদেরই একদল ভারতবর্ষে কোছ বা কোচ নামে পরিচিত হইয়াছে কি না ভাবিবার বিষয়।

অষ্ট্রিক জাতির পৃথিবীতে শত্ৰুদি উৎপন্নের মূলে জী-শক্তির কল্পনা করিত, বড়ো জাতিরা ইহার মূলে পুরুষ-শক্তির কল্পনা করিত। রক্ষ, লতা, শত্ৰুদি পৃথিবী হইতে সোজা ভাবে নির্গত হয়। সুতরাং তাহারা সোজাভাবে প্রোথিত প্রস্তর-খণ্ড, মাটির টিবি, অথবা মনসারক্ষের ডালকে স্বস্তির মূল পুরুষ-শক্তি রূপে পূজা করিত। অষ্ট্রিক জাতির কামাইখার সন্নিকটে এক পর্বতের উপর সেই প্রতীক প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার নাম লুদই-ফায়া। লুদই=পুরুষাধ; ফায়া, ফা=দেবতা। অষ্ট্রিক ভাষায় ‘কা’ জীলিঙ্গ এবং ‘উ’ পুংলিঙ্গ বাচক উপসর্গ। অষ্ট্রিকরা ইহার নাম দিল উ-মাই-লুদই। ইহা ক্রমে উমালুদ, উমানুদ রূপে পরিণত হইয়া সংস্কৃতে উমানন্দে পরিণত হইয়াছে। উমানন্দ কামাখ্যার স্বামী এবং এখনও প্রতি বৎসর কামাখ্যার সহিত তাঁহার বিবাহোৎসব সম্পন্ন হয়।

জুই শক্তিসম্পন্ন প্রবল জাতির জুইটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ এক স্থানে অবস্থিত হওয়ায় এই স্থানের যুক্ত নামকরণ হইল—কামাই লুদইফা। পরে ইহার সংক্ষেপ রূপ হইল—কামলুদ, কামরুদ, কামলু, কামরু; কামলুফা, কামলুফ, কামরুপ। হিউয়েনচাঙের কা-ম-লু-প, কা-ম-লু; অলবেরুনির কামরু; মুসলমান লেখকদের কামরুদ, কামারু লেখার মূল কারণ ইহাই।

ফায়া=পুরুষদেবতা; ফায়া=স্ত্রীদেবতা। ব্রা=প্রধান দেবতা; ক্রই=প্রধান দেবী। ব্রা-ক্রই পরে বুচা বুচী হইয়া শিব-ভূগীতে পরিণত হইয়াছেন।

ভূমির প্রধান দেবতা, এই অর্থে হা-ব্রা। কলিকাতা ভিন্ন আসামের গোয়ালপাড়া, নগাঁও প্রভৃতি জেলাতেও স্থানে স্থানে হাব্রা বাট, হাব্রা বাজার আছে।

হা-খা-লা (লি); বিস্তীর্ণ বর্জলবিশিষ্ট স্থান—হাগালি, হুগালি, হুগলি হইতে পারে। মহাবিশুব সংক্রান্তির সময় পৃথিবীর উর্বরাশক্তি রুদ্ধ করিবার জ্ঞাত আসামবাসীরা যে বিহুগীত গায়, উহার নাম হা-ছা-রোয়েই—মাটির সন্তানের গীত। ইহার বর্তমান রূপ লুহরি বা লুহরি।

ল্যুঙ শব্দের অর্থ গভীর, জ্যোতির্ময়। ‘মা’ শব্দের অর্থ বহু। খা-ল্যুঙ—গভীর হ্রদ বা গহ্বর খারঙ, খরঙ, কুরঙ। বহু গভীর হ্রদ বা পরিখায়ুক্ত স্থান খাল্যুঙমা বা খলঙমা বর্তমানে খরংমা। ত্রিপুরার প্রাচীন রাজবংশের রাজধানী খলঙমা বর্তমানে খরংমা নামে পরিচিত। উত্তর কাছাড় জেলায় হাফলং হইতে ৪০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। বর্তমানেও প্রাচীন রাজবাড়ীবেষ্টিত গভীর পরিখার নিদর্শন রহিয়াছে।

এই ভাবে খা-লা-ল্যুঙ—কাল্যুঙ, কালাল্যুঙ কালিঙ,

কলিঙ্গ সম্ভব কিনা বিবেচ্য। চিন্কা হ্রদ দৃষ্টে এই নাম হইতে পারে।

ঞি=ক্ষুদ্র হ্রদ; ওয়া=আবৃত; বঙ=প্রচুর। প্রচুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদযুক্ত স্থান=ওয়াঙ, আঙ, অঙ, অঙ্গ দেশ। চাও, চোহ, চো=স্বর্গ; মা=প্রধান। স্বর্গের প্রধান দেবতা=চোহমা বা চোম। চীন দেশের চোহমা বা শামা (: hamaism) বর্ম্ম এবং আহোম-দের চোম-দেউ, একই অর্থবাচক। এই একই অর্থবাচক শব্দ হইতে সুস্ম হওয়া সম্ভব।

জ্যোতির্ময় ভূমিদেবতার স্থান হা-কা-ল্যুঙ বা হাফলং। ‘রি’ শব্দের অর্থ পর্বত; মি, মেই শব্দের অর্থ মানুষ। খশ জাতীয় মানুষের অধিকৃত পর্বত—খশ-মি-রি, খশমির বা কাশ্মীর।

পার্বত্য মানুষ এই অর্থে মি-কি (বা গি—সম্বন্ধবাচক) —রি=মিকির আসামের পার্বত্য জাতিবিশেষ। গারো-পাহাড়ের প্রত্যেকটি পাহাড়ের নামের পূর্বে কোনও ব্যক্তির নাম এবং শেষের দিকে ‘গিরি’ শব্দ যুক্ত আছে, যেমন—রংরেং গিরি। ইহা প্রকৃত পক্ষে রংরেং-গি-রি অর্থাৎ রংরেং নামক দলপতির অধিকৃত পর্বত। এখানে গি—সম্বন্ধহৃচক অব্যয়।

মা-হা-রি—বহু পর্বতময় ভূমি=মাহার—মাহর, উত্তর কাছাড় জেলায় একটি স্থান, একটি রেলস্টেশনও সেখানে আছে।

লা.হা-রি—পর্বতময় বিস্তীর্ণ ভূমি=লাহার, লাহর, লাহোর।

লাও-রি=বিস্তৃত পর্বতময় স্থান=লাওর, লাওড়, লাউড়।

লা-রি=ঐ =লার, রার, রাচ।

ব্রা + খা + রি =বারাখার =বরাকর।

অষ্ট্রিক জাতির যে শাখাকে ইংরেজীতে গোল্ড (Gond) বলা হয়, তাহারা নিজেদের গৌড় বলে। ছোট্ট নাগপুর এবং আসামের চা বাগানের মজুরদের মধ্যে অনেক গৌড় জাতীয় মানুষ আছে। গৌড়দের আদি প্রধান কেন্দ্র গৌড় হওয়া সম্ভব।

টিয়েঙ বা টিয়েন্ শব্দের অর্থ রাজ্য। চাও জাতির অধিকার কালে চীন মহাদেশের এক অঞ্চলে ছিন্ (T'sin) বংশের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। পরে ছিন্ বংশ প্রবল হইয়া সমগ্র দেশ অধিকার করার পর ঐ দেশ চীন দেশ নামে বিখ্যাত হয়। আদিতে ছিন্ রাজ্য হইতে আগত অষ্ট্রিক জাতির শাখা ছিন্টেঙ নামে পরিচিত। ইহার পরে জিন্টেঙ, জিন্টিয়া এবং বর্তমানে জৈন্তিয়া নামে পরিচিত, এবং তাহাদের রাজ্যের নাম জিন্তা বা জৈন্তা।

কামাইখা স্থানের সংলগ্ন রাজ্য খঙের নাম কামাইটিয়েন্ বা কামাইতা এবং পরে উহা কমতা নামে বিখ্যাত হয়।

বঙ্গাধিপতি কুমার পালের সেনাপতি কামরূপ রাজ্য জয় করিয়া কামরূপ জেলায় গোহাটির সন্নিকটে রৈতেরগড় নগর স্থাপন করেন এবং রাজ্যের নাম কামতা রাখেন। পরে পূর্বে অঞ্চল ত্যাগ করিয়া তাঁহার বংশধরেরা রংপুর জেলায় রাজধানী স্থাপন করেন, এবং উহার নাম কামতাপুর রাখেন।

অষ্টিক ভাষায়—তু, তুয়েই, তিউ, তয়া এবং বডো ভাষায়—ডি, টি, তি শব্দের অর্থ জল।

লাও-তু=বিস্তৃত জলরাশিপূর্ণ নদী—লাওতু, লুইত, লোহিত; ডি-লাও, টি-লাও, তিলাও—একই অর্থবাচক। এই সব নাম আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছিল; এবং প্রাচীন এত্রে এই সমস্ত নামের উল্লেখ আছে।

ডি-মা-লা=বিস্তৃত রহং নদী—ডিমালা (রংপুর জেলার নদী)।

মা-লা-ডি-হা=রহং ও বিস্তৃত নদীর তীরস্থ ভূমি—মালদহ।

ডি-মা-ছা=রহং নদীর সন্তান—ডিমাছা বা দিমাছা। ঐ নদীর তীরস্থ নগর—ডিমাপুর, দিমাছপুর।

টি-চাও-তিয়েন—বর্গীয় নদীর তীরস্থ রাজ্য—তিচাতা বা তিস্তা। পরে রাজ্যের নাম হইতে নদীর নাম হইয়াছে। অথবা—টি-ছা-তাও=জল-শাবক সিংহ—সিংহ শাবকের ঠায় শক্তিশালী নদী—তি-ছা-তা বা তিস্তা।

পার্বত্য চীন জাতির ভাষায় নাঙ, শব্দের অর্থ-স্বর্ঘ্য বা পূর্ব। নাঙ-ছি—পূর্বদিক; চাঙ-ছি—দক্ষিণ দিক। নাঙ-গা—পূর্বদিক হইতে আগত; নাঙ-দা—পূর্বদিকে গত। পূর্বদিক হইতে আগত মাহুয নাঙ-গা বা নাগা। নাগারা পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ হইতে আসামের দিকে আসিয়াছিল।

‘লিউ’ শব্দের অর্থ মাঠ। চাঙ-ছি-লিউ—দক্ষিণ দিকের মাঠ বা দেশ—চাঙ ছিল। এখনও গ্রীষ্ম কাছাড়ের লোকেরা লুসাই পাহাড়কে চাঙ ছিল বলে।

চাঙ ছিল যাইবার সময় মধ্যপথে যে বন্দর বা স্থান পাওয়া যায় তাহার নাম ছি-লিউ-চাঙ—ছিলাচাঙ, ছিলচাঙ, ছিলচার (বর্তমানে শিলচর)। এখনও আইজল যাইতে হইলে শিলচরে নৌকায় উঠিতে হয়।

গ্রীষ্মকায় চৌধুরী মহাপুত্র মনে করেন যে, প্রাচীন ডবকা রাজ্যই বর্তমান ঢাকা। গ্রীষ্মক চতুর্থ শতাব্দীর সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রস্তরস্তম্ভে কামরূপ-ডবাক-নেপাল-কর্তৃপুত্র—প্রত্যস্ত রাজ্যের নাম আছে। আসামের নগাঁও জেলার যমুনা নদীর তীরে-ডবকা নামক একটি স্থান আছে। ঐ অঞ্চলে প্রবন্ধ-লেখক কর্তৃক অসংখ্য প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপেশ্বর মহাভূতি বর্ম্মার একটি শিলালিপি, এবং ১২২৩ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বম্ভর দেব নামক রাজার একটি শিলালিপিও আছে। শেষোক্ত লিপিতে স্থানের নাম “ডাবেকা” বলিয়া লেখা আছে। সুতরাং আসামের ডবকাই যে প্রাচীন ডবাক রাজ্য ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে ঢেকুর নামক একটি পবিত্র স্থানের উল্লেখ আছে। ঢেকুর প্রাকৃত ঠাকুর (ঠাকুর) হইতে উদ্ভূত। ঠাকুর বংশীয় বৌদ্ধ নৃপতির রাজ্য ঢেকুর। আসামের গোয়ালপাড়া জেলায়ও তাহাদের একটি রাজ্য ছিল। ঐ অঞ্চলকে লোকে এখনও ঢেকুর এবং তৎস্থানবাসীকে ঢেকেয়ী বলে। ঢাকা একদিন বৌদ্ধতান্ত্রিকদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, এবং তখন সেই রাজ্যের নাম ঢেকুর ছিল বলিয়া অনুমান হয়। ঢেকুর হইতে ঢাকা নামকরণ সম্ভবপর।

## সান্ত্বনা

শ্রীতুলসীদাস মুখোপাধ্যায়

লতিকা তরুরে বিরি বলে কানে কানে  
“তোমারে তুমিছে পাখী স্তম্ভুর গানে;  
আমারে করুণা করি দিয়াছ আশ্রয়  
কি দিয়ে করিব সেবা মনে নাহি লয়।

একি শুধু নাগপাশ মম আলিঙ্গন?  
নিভৃত মরম আশা শুধুই স্বপন?”  
তরু বলে, “ওগো লতা খেঁদ কেন তব  
বসন্ত প্রভাতে ফুল দিও নব নব।”



## পাঁচ দিনের ছুটিতে মহাবলেশ্বর

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী

পার্বত্য দেশের উপর আমার একটা স্বাভাবিক টান আছে; তাই বোম্বাইয়ে থাকি অথচ মহাবলেশ্বরে বাই নাই এ কথা মনে হতেই ব্যথা পেতাম। সেইজন্য যখন বন্ধুবর পিটার আত্মাদে এক মাসের ছুটিতে মহাবলেশ্বরে গিয়ে সাদর আস্থান জানালেন তখন এ সুযোগ এক রকম লুফেই নিলাম।

স্থির হ'ল ২৩শে নভেম্বর রাত্রে রওনা হয়ে পরের দিন সকালে মহাবলেশ্বরে পৌছনো যাবে। আমার সহযাত্রীদের মধ্যে একজন পারসী, শ্রীযুক্ত চিচগার, আর একজন খ্রীষ্টান শ্রীযুক্ত ডি মেলে।

পুণায় পৌছলাম ভোর ৫টার সময়। এখান থেকে মোটর-বাসে যেতে হবে মহাবলেশ্বর পর্যন্ত। পুণায় এলেই অতীতের স্মৃতিতে আমার মন ভরে ওঠে। এই সেই পুণা নগর, যেখানে মারাঠা-গৌরব পেশোয়াদের রাজধানী ছিল। কত বীরত্বের, কত চক্রান্তের লীলাভূমি এই পুণা। গৌরবোজ্জ্বল বিগত দিনের সাক্ষীরূপ আছে—মাত্র পেশোয়া-প্রাসাদের শূন্য ভিত্তি আর আছেন পেশোয়াদের আরাধ্যা দেবী পার্বতী। বর্তমান কালেও পুণা নগর্য নয়। দক্ষিণ-ভারতের অত্যন্ত প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র পুণা, এই পুণাই ছিল মহামতি গোখলে আর লোকমাতা বালগঙ্গাধর তিলকের কর্মক্ষেত্র। এখানকার যারবেদা জেল ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই কারাগারেই অনশনব্রতী মহাত্মা-শর্যা-পার্শ্বে ছুটে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কত দেশকন্মীর নিরানন্দ দিনগুলি এই কারাগারীচীরের আড়ালে কেটে গেছে। আবার এই পুণারই উপকণ্ঠে মহামাতা আগা খাঁয়ের প্রাসাদে মহাত্মা গান্ধীর সহস্রাব্দী কব্জরবা আর তাঁর প্রিয় সহচর মহাদেব দেশাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আজও প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে তাঁদের চিতাবেদী মহাত্মাজীর স্বহস্তলিখিত 'হে রাম' আর 'ও' চিহ্ন বৃকে নিয়ে বিরাজ করছে। পুণায় পুণ্যার্থীর ভিড় যদি না-ও হয় দেশপ্রেমিকদের ভিড় হবেই।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই আমরা একটা বাসে চাপলাম। প্রায় ছ'টার সময় বাস ছাড়ল। তখনও চারদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন—পথে যানবাহন বা লোকচলাচল আরম্ভ হয় নাই। প্রায় স্বর্ষ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাস এসে পৌছল একটা গঞ্জের মত জায়গায়। নাম ঠিক মনে নেই, খুব সম্ভব সুরুল। বোম্বাইয়ের তুলনায় এ জায়গাটা অনেক ঠাণ্ডা।

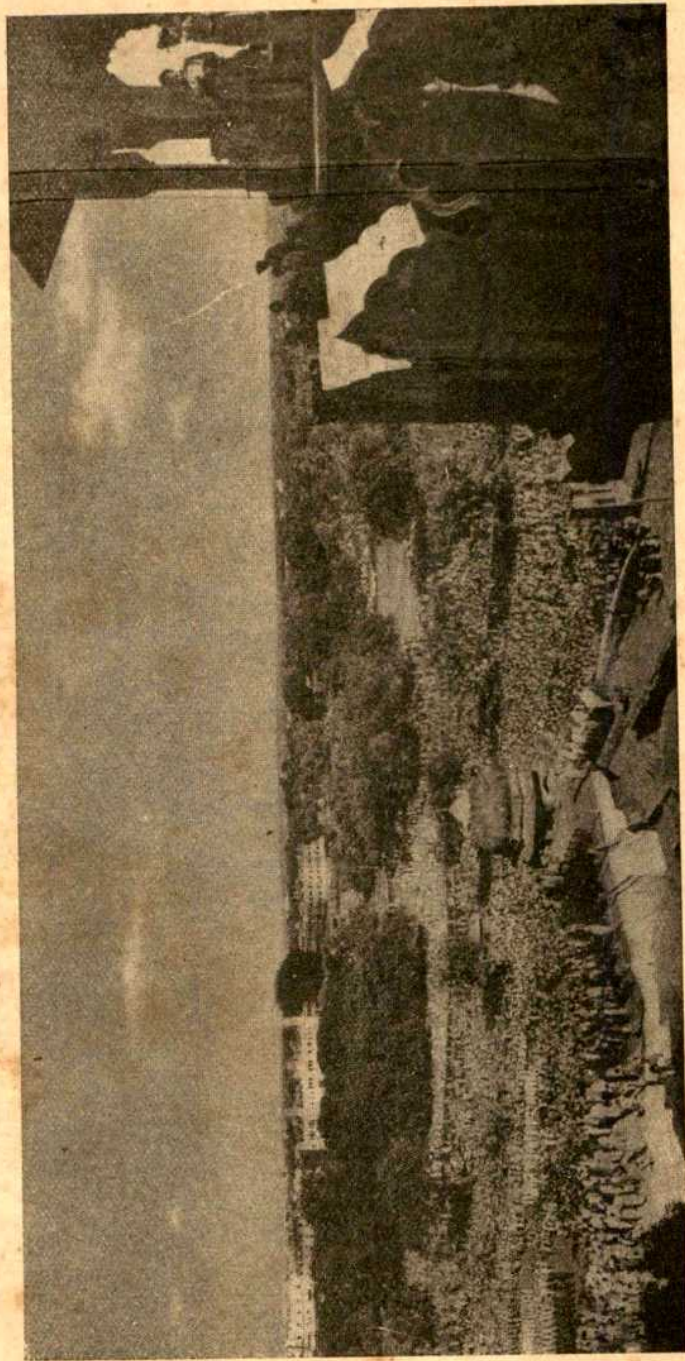
মিনিট পনেরোর মধ্যেই বাস আবার চলতে সুরু করল। রাস্তা একেবেঁকে উঠেছে পাহাড়ের গা বেয়ে, তবে এখনও রীতিমত চড়াই সুরু হয় নাই। পুণা থেকে মহাবলেশ্বর

৭৫ মাইল হলেও একটানা চড়াই নয়—অনেকটা সিঁড়ির ধাপের মত। কিছুদূর চড়াই, আবার খানিকটা প্রায় সমতল পথ। পথ এক জায়গায় টানেলের ভিতর দিয়ে গিয়েছে—নেহাং কম লম্বা নয় টানেলটা। টানেলের ভিতর দিয়ে আগে ট্রেনে গিয়েছি, কিন্তু মোটরে এই প্রথম। একটা নুতন অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল। আরও অনেকগুলি চড়াই পার হয়ে বাই (Wai) বলে একটা ছোট শহরে এসে বাস থামল। উর্দুগামী সপিন পথ সরীসৃপগতি দাক্ষিণ্য শিলঙের পথের কথা মনে করিয়ে দেয়—তবে পাহাড়ের গায়ে সে রকম জঙ্গল নেই। বাই সাতারা জেলায় ১৯৪২ সালের আন্দোলনে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছে।

বাই-এর পরই আবার চড়াই পথ। নীচে সমতল জায়গায় বাইকে দেখা যাচ্ছে ঠিক ছবির মত। এমনিতর নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা পাঁচগণ্ডিতে এসে পৌছলাম।

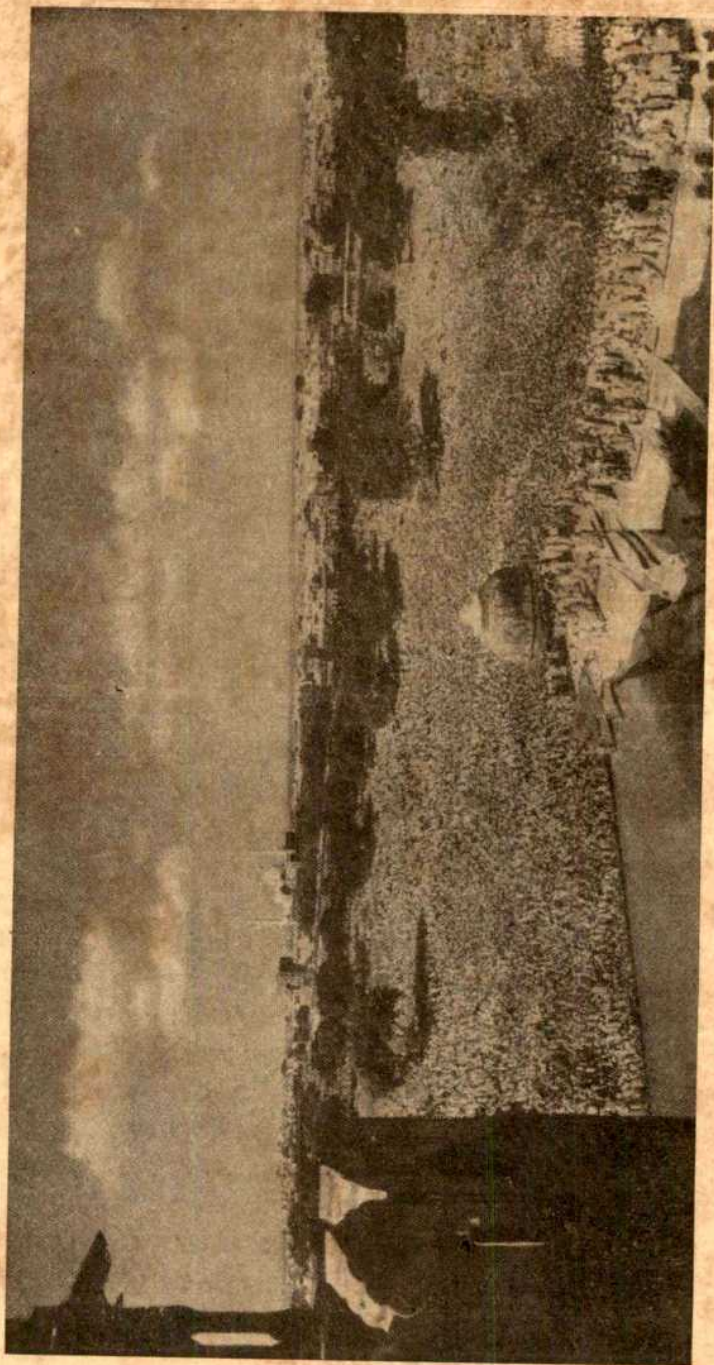
পাঁচগণ্ডি বাই থেকে আট মাইল, দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট শহর। গান্ধীজী মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকতেন। বাস এসে দাঁড়াল ছোট বাজারের মধ্যে বাস আপিসের সামনে। শুনলাম ছাড়তে একটু দেরী হবে। ভালই হ'ল। নেমে একটু হাট-পা ছড়ানও যাবে আর পাঁচগণ্ডির বাজার ঘুরে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও অর্জন করা যাবে। বাজারটি অতি সাধারণ, স্কোয়াশ আর রায়জবেরীর আমদানী প্রচুর। সেদিন রবিবার, স্কলের ছুটি। ছেলেমেয়েরাও ভিড় করে এসেছে বাজারে। কারও কারও হাতে হকি বা ক্রিকেট ব্যাট, বল, গুলতি টিকিনের পাত্র, গল্পের বই ইত্যাদি ছুটির ছপুর্ কাটাবার নানা উপকরণ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হাসিখুশীভরা ছেলেমেয়েগুলিকে দেখে বেশ লাগল।

কিছুক্ষণ বাজারে ঘুরে বেড়িয়ে আমরা বাসে চড়ে বসলাম। যথাসময়ে বাস ছেড়ে দিলে। বাতাসের শৈত্য, লোকজনের গরম পোশাক-পরিচ্ছদ আর হাবভাব থেকে এখন স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে যে হিল ষ্টেশনে এসেছি। আধ ঘণ্টাখানেক পরেই মহাবলেশ্বরের ধরবাড়ী দেখতে পাওয়া গেল। পথের দু'ধারে মাঝে মাঝে অজস্র বুনো গোলাপ ফুটে রয়েছে—গন্ধ নাই, কিন্তু দেখতে অতি চমৎকার। কাছে দূরে পাইনগাছও চোখে পড়ছে মাঝে মাঝে, সিলভার পাইনই বেশী। মহাবলেশ্বরে চুকবার মুখেই একটা সুন্দর ঝিল আছে, লম্বা একফালি জল, যেন পাহাড় আর সবুজ বনের ক্রমে বাঁধান। ছ'চারখানা নৌকাও বাঁধা রয়েছে, যারা জলবিহার করতে চায় তাদের জন্যে। এর পরই



ভারতীয় ইন্ডাস্ট্রি'র স্বাধীনতা লাভ উপলক্ষে ১৫ই আগষ্ট (১৯৪৭) তারিখে দিল্লীর পুরনো জালালকেল্লায় বিরাট জনতা।





স্বাধীনতা দিবসে ( ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ ) তালুকদার পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন

অনেকখানি খাড়াই রাস্তা পার হয়ে প্রায় সাড়ে দশটার সময় বাস গন্তব্য স্থানে এসে থামলে পর আমরা নেমে পড়লাম। সমতল দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে এখানকার আবহাওয়ার কত তফাৎ। এই পার্থক্য অঞ্চলের শীতল বাতাস সমস্ত শরীরকে স্নিগ্ধ করে দেয়। জিনিষপত্র নিয়ে বেরিয়েই দেখি বন্ধু লক্ষ্মী লক্ষা পা ফেলে আসছেন আমাদের প্রত্যাগমন করবার জন্তে। কাছেই বাড়ী, পৌছতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। বন্ধুপত্নী রান্নাঘরে ব্যস্ত, তিনিও হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন আমাদের সাড়া পেয়ে। বাসটি কিন্তু বেশ পেয়েছেন বন্ধুবর। আসবাবসময়ে ছানা বেশ বড় শোবার ঘর, প্রত্যেকটির সঙ্গে বাথরুম, সামনে চওড়া বারান্দা, প্রকাণ্ড উঠান, উঠানের অপর পাশে রান্নাঘর, ভাড়ার ঘর। ভাড়া ৭৫ টাকা। সুনলাম এটা মহাবলেশ্বর ভ্রমণের 'সীজন্' নয় তাই অনায়াসে এত সস্তায় পেয়েছেন। নইলে বাড়ী পাওয়া মুশকিল হয়। যে বাড়ীতে আমরা উঠেছি তার এক সীজনের ভাড়া (মার্চ ১৫—জুন ১৫) ৩৫০ টাকা।

ছপুর বেলা, সবাই বসে ভাবী ভ্রমণের প্রোগ্রাম ঠিক করছি এমন সময় এক চিঠি এল সুসংবাদ নিয়ে—আরও তিন জন অতিথি সন্ধ্যার বাসে আসছেন। তিন জনই মহিলা, ডাকসাইটে (M. D.) ডাক্তার, এক জন আবার নাকি F.C.P.S.। বন্ধু দেখছি ব্যালেন্স অব পাওয়ারের যিয়ারীতে বিশ্বাস করেন। তা করুন ক্ষতি নাই, আমি কিন্তু মনে মনে এম-ডি উপাধিধারিণী তিন জন লেডি ডাক্তারের রাশভারী মূর্তি কল্পনা করে খুব স্বস্তিবোধ করছিলাম না।

সন্ধ্যার বাসের সময় হ'ল, সবাই মিলে ষ্টেশনে গেলাম সন্মানিতা অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্তে। বাস এল, কিন্তু লেডী ডাক্তাররা কই? সামনের সীটে যে তিন জন বসে আছেন তাঁদের চেহারা আর চালচলন দেখে মনে হ'ল তাঁরা লেডী ডাক্তার হতেই পারেন না, কিন্তু তা ছাড়া আর কাউকে দেখছিও না তো। বেশীক্ষণ সন্দেহ-দোলায় ছলতে হ'ল না। বন্ধু আর বন্ধু-পত্নী হাসিমুখে এগিয়ে গেলেন ওই তিনটি তরুণীর দিকে, তাঁরাও নেমে এলেন বাস থেকে, কলহাতে চারদিক মুখরিত করে। 'এঁরাই তা হলে প্রতীক্ষিত লেডী ডাক্তারত্রয়ী। কই ভাবভঙ্গী তো কারুরই সে রকম গুরুগম্ভীর নয়। আর পাঁচটি মেয়ের মতই তাঁরা নূতন জায়গায় আসার আর বন্ধুমিলনের আনন্দে ঝলমল করছেন। বন্ধু আলাপ করিয়ে দিলেন—'এঁরা আমাদের পুরনো বন্ধু ফ্রান্সিস ডি, মেলো, মিল্ল চিচগার আর চক্রবর্তী, আর এঁরা হচ্ছেন ক্রীমতী ম্যারিয়েল ভালাডারেস, কেট উডওয়াডিয়া, আর ফ্রিডা ব্রাগান্সা।' একটু দূরে আর একটু হেসে "হা ডু ডু" করে সবাই বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। নূতন পরিচয়ের আড়ষ্টতা আর লেডী ডাক্তার জীতি কাটতে দেবী হ'ল না।

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্তও মহাবলেশ্বর বোম্বাই লার্টের গ্রীষ্মাবাস ছিল, তা সত্ত্বেও এটা আসলে একটা গওগ্রাম বৈ আর কিছু নয়। স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যা তিন-চার হাজার হবে কিনা সন্দেহ। সুনলাম সীজনের সময় আরও পাঁচ-ছয় হাজার লোক বেড়াতে আসেন এখানে। তখন নাকি জায়গাটা গম্‌গম্‌ করে। স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা কিন্তু মহাবলেশ্বর থেকে পাঁচগণিতে বেশী। মহাবলেশ্বরের অত্যধিক ব্যুপিতাই এর কারণ মনে হয়। পাঁচগণি মহাবলেশ্বর থেকে মাত্র বার মাইল দূর হলেও মহাবলেশ্বরের তুলনায় এখানে ব্যুপিত অনেক কম—বৎসরে ৬০-৭০ ইঞ্চি। সেইজন্তেই স্থূল, স্বাস্থ্যনিরাস ইত্যাদি সবই পাঁচগণিতে।

বর্তমান মহাবলেশ্বর শহর গড়ে উঠেছে মাত্র সোয়া শত বৎসর পূর্বে। মেজর লডউইক ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানে আসেন। এখানকার নিসর্গ-শোভা, আর তাঁর স্বদেশের আবহাওয়ার সঙ্গে এখানকার আবহাওয়ার সাদৃশ্যের জন্ত তিনি তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুদের কাছে এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এর পর ধীরে ধীরে এটা ভারতপ্রবাসী যুরোপীয়দের স্বাস্থ্য-নিবাস আর অবকাশ যাপনের অত্যন্ত প্রধান স্থানে পরিণত হয়। কোম্পানী বাহাদুর এই স্বাস্থ্যকর শহরটির উপর নিরঙ্কুশ অধিকার পাবার জন্ত উত্তোষী হয়ে ওঠেন এবং ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে পেঠাখাণ্ডার বিনিময়ে সাতারার রাজার কাছ থেকে মহাবলেশ্বরের অধিকার পুরোপুরি দখল লাভ করেন। ক্রমে রাজার আর শহর গড়ে ওঠে। ভারতীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম আসেন পারসীরা, যেমন তাঁরা এসেছিলেন তুরাট অঞ্চল থেকে বোম্বাইয়ে। কিন্তু এই শহরের গোড়াপত্তনে চীনাদের অবদানও কম নয়। বোম্বাই প্রদেশের পুণা আর থানা অঞ্চল ছিল অন্তর্ভুক্ত (interned) চীনাদের আটক রাখার জায়গা। সেখান থেকে তাদের আনা হয় মহাবলেশ্বরে। তাঁরাই নূতন নূতন ফলমূল আর শাকসবজীর বাগান তৈরি করে, রাস্তা আর রাস্তার দু'পাশে ঘরবাড়ী নির্মাণপূর্বক শহরের ত্রীসম্পাদন করে। এখনও তাদের স্মৃতি বিজড়িত আছে এখানকার দু' একটা জায়গার আর দু' চারটে পুরানো বাড়ীর সঙ্গে।

মহাবলেশ্বরে হোটেল আর বোর্ডিং হাউস আছে অনেক—গুলি—হিন্দু, মুসলমান, পারসী, ইউরোপীয়, সব রকম। তা ছাড়া বাড়ী আর বাংলোও ভাড়া পাওয়া যায়। তবে এখানে আসতে হ'লে আগে থেকে থাকার বন্দোবস্ত করে আসাই ভাল, হোটেল, বোর্ডিং স্থান না পেয়ে যাত্রীদের অসুবিধায় পড়তে হতে পারে।

পরের দিন সকাল থেকে আমাদের ঘুরে বেড়াবার পালা। এখানে সস্তায় ভাল সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায়—ঘণ্টায় দু' আনা ভাড়া। ঠিক হ'ল আমরা বেশীর ভাগ বেড়াবো সাইকেলেই। ক্রীমতী ম্যারিয়েল আগে কয়েকবার

মহাবলেস্বরে এসেছেন, তিনি আর বন্ধু আজাদে মোটামুটি গাইডের কাজ করবেন। মহাবলেস্বরের অধিত্যকা পশ্চিমে কঙ্কণ উপকূল আর পূর্বে দক্ষিণাপথের মালভূমির মাঝখানে খাড়া দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে। এর উচ্চতা মোটামুটি ৪০০০ থেকে ৪৫০০ ফুট; পশ্চিম দিকটার রুষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশী, পূর্ব দিকে রুষ্টি প্রায় হয় না বললেই চলে। মহাবলেস্বরের বার্ষিক বারিপাত ২৫০-৩০০ ইঞ্চি; ১২ মাইল পূর্বে পাঁচগণিতে ৬০-৮০ ইঞ্চি আরও ৮ মাইল পূর্বে বাই, সেখানে বৎসরে ২০ ইঞ্চির বেশী রুষ্টি হয় না।

মহাবলেস্বরের যে সকল জায়গা থেকে নিসর্গ-শোভা সব চেয়ে ভালরূপে দেখতে পাওয়া যায় সেগুলোকে 'পয়েন্ট' বলে। যাত্রীরা কেউ সাইকেলে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ মোটরে বা পায়ে হেঁটে এই সমস্ত পয়েন্টে গিয়ে নয়নমনের তৃপ্তি সাধন করেন। সহ্যদ্রির দৃশ্য দেখতে হলে মহাবলেস্বরের চেয়ে ভাল জায়গা আর আছে বলে মনে হয় না। এ ছাড়া এখানে কয়েকটা মারাঠা ছুগের ভগ্নাবশেষও আছে।

প্রথমেই আমরা এলফিনষ্টন পয়েন্ট আর আর্থার সীটে যাব স্থির হ'ল। আর্থার সীট বাজার থেকে প্রায় ৮ মাইল। সাইকেলে রওনা হলাম। শুনেছিলাম মহাবলেস্বরে বিযাক্ত সাপ খুব বেশী; মাইলখানেক যেতে না যেতেই দেখি হাত তিনেক লম্বা এক সবুজ রঙের সাপ রাস্তার মাঝে শুয়ে বোম্ব হয় রোজ সেবন করছে। পাঁচ গজ দূরে থেকেও আমি চিনতে পারি নি যে ওটা সাপ। দেখতে সাপের মত হলেও সবুজ রঙের জন্তে মনে করেছিলাম ভালপাতার একটা কালি বা কোনও লতা পড়ে আছে। ইচ্ছে হ'ল সাইকেলটা চালিয়ে দিই জিনিষটার ওপর দিয়ে। আবার কি মনে করে পাশ কাটিয়ে গেলাম। কাছে যেতেই সাপটা হুন্দর ভঙ্গীতে মাথা উঁচু করল। পরে এক জন লোককে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম যে ও সাপের নাক বিষ নাই। আরও কিছু দূর গিয়ে অচ্ছ জাতের আর একটা ছোট সাপ রাস্তার ওপর মরে পড়ে আছে দেখলাম। সঙ্গীরা সব আগে চলে গিয়েছেন। আমি সাইকেলে আর এক জনকে নিয়ে যাচ্ছি বলে পিছনে পড়েছি। ক্ষেত্র-মহাবলেস্বর বা আদি-মহাবলেস্বর পর্যন্ত যাবার পর রাস্তা খুব চড়াই দেখে সাইকেলটা সেখানে রেখে বাকী পথটা হেঁটে যাওয়া স্থির করলাম। এলফিনষ্টন পয়েন্ট সেখান থেকেও প্রায় তিন মাইল। এই ঠাণ্ডাতেও গলদবর্ষ হয়ে যখন এলফিনষ্টন পয়েন্টে পৌঁছলাম তখন চতুর্পার্শ্বের দৃশ্য দেখে পরিশ্রম সার্থক মনে হ'ল। এই পয়েন্ট থেকে সম্মুখে আর আশপাশে দিগন্ত-বিস্তৃত অসংখ্য পর্বতমালা আর উপত্যকার যে দৃশ্য চোখে পড়ে তার তুলনা হয় না। এই ভীষণ অধঃমনোরম দৃশ্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্থান কাল সব ভুলে যেতে হয়। ডান দিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটি ক্ষীণতোয়া নদী একে-

বেঁকে চলেছে অজানার উদ্দেশ্যে—হু'পাশে পাহাড় কেটে বেশ একটু উপত্যকাভূমির মত হ্রষ্টি করে নিয়ে। নদীটির নাম সাবিদ্রী।

এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে এগিয়ে চললাম, আর্থার সীটের দিকে। রাস্তা ডান দিকে বেঁকে চলে গিয়েছে, সঙ্গীরা পথ-নির্দেশের জন্ত তীর-চিহ্ন একে রেখে গিয়েছেন পথের ওপর। এখন আর ক্লাস্তি নাই, নতুন উৎসাহে আবার চড়াই ভেঙে চলেছি।

পথে সাবিদ্রী পয়েন্ট আর ক্যাসল রক পার হয়ে রাস্তার শেষে এসে পৌঁছলাম। সাবিদ্রী পয়েন্ট আর ক্যাসল রক থেকে দিগন্ত-বিস্তৃত ষাট পর্বতমালার দৃশ্য আর পায়ের নীচে অন্তলম্পর্শ খদ চোখে পড়ে। রাস্তা শেষ হয়েছে রাজার থেকে ৭৬ মাইলের মাথায়। এখান থেকে পায়ে হাঁটা পথে যেতে হবে আর্থার সীট ইত্যাদি জায়গাগুলিতে। সঙ্গীদের দেখতে পেলাম না—তবে তাঁদের সাইকেলগুলো পড়ে আছে দেখলাম। একটা সাইকেলকে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে লতাপাতা দিয়ে আঁড়াল করে রেখে তারপরে চিংকার করলাম বারকতক। প্রতিধ্বনি এল ফিরে ফিরে, কিন্তু সঙ্গীদের সাড়া পেলাম না। হাঁটাপথ আছে ছুটো, ছুটিকে গিয়েছে। কোন্টী অনুসরণ করব ঠিক করতে পারছি না—তীরচিহ্নও দেখছি না। অগত্যা ঝাঁকিয়ে পথটা ধরে নীচে নেমে চলতে লাগলাম। সেখান থেকে নীচে তাকালে চোখে পড়ে—হু'পাশে পাহাড় যেন মুখ বাদান করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মাঝখানে দিয়ে সাবিদ্রী বয়ে চলেছে। কিন্তু সেখানেও বন্ধুদের দেখা পেলাম না। তখন সে পথ ছেড়ে আবার উপরে উঠে অচ্ছ পথ ধরে চললাম উচ্চঃস্বরে চিংকার করতে করতে। এবার সাড়া পেলাম—জঙ্গল ভেদ করে, খানিকটা নীচের থেকে। আর বিশ গজ গিয়েই আর্থার সীট। কি ভয়ঙ্কর অধঃ কি হুন্দর জায়গা। পাহাড়ের গা থেকে যেন একটু ছোট কাপিশ বেরিয়েছে, পাঁচ-ছয় জন লোক কোনরকমে দাঁড়াতে পার। লোহার নড়বড়ে রেলিং দিয়ে ঘেরা। পায়ের নীচে প্রায় ৩০০০ ফুট গভীর খদ, বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মাথা ঘুরে যায়। হু'পাশে বাঁহ মেলে আছে ছুটো পাহাড়। আমরা দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছি, এমন সময় সঙ্গীরা হৈ হৈ করতে করতে উঠে এলেন। এক জন স্থানীয় লোককে গাইড নিয়েছেন দেখলাম। তাঁরা আর্থার সীট আগেই দেখেছেন এখন আসছেন 'উইন্ডো' থেকে। উইন্ডো হ'ল আর্থার সীটেরই ঠিক নীচে হু'পাশে নিরেট পাথরের মধ্যে একটা জানালার মত ফাঁক। গাইডকে সঙ্গে নিয়ে আমি চললাম উইন্ডো দেখবার জন্তে, সঙ্গীরা সেখানে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। পিছল পাহাড়ের গা বেয়ে অতি সঙ্গরণে গিয়ে



পৌছলাম সেখানে। সেখান থেকে বাঁ-দিকে, উপরে, নীচে সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায় হাজার হাজার ফুট খাড়া পাথরের দেয়াল, আর সম্মুখে স্তূপপ্রসারিত সাবিত্রী উপত্যকা। ফিরে আসবার পথে কতকগুলো সিলভার ফার্ণের পাতা ছিড়ে নিয়ে এলাম সঙ্গীদের হাতে সাদা উল্কী পরাবার জন্তে। এই ফার্ণের পাতার নীচের দিকে থাকে সাদা চক্কর গুঁড়োর মত একরকম জিনিষ। হাতের উপর রেখে চাপ দিলেই চমৎকার ছাপ ওঠে।

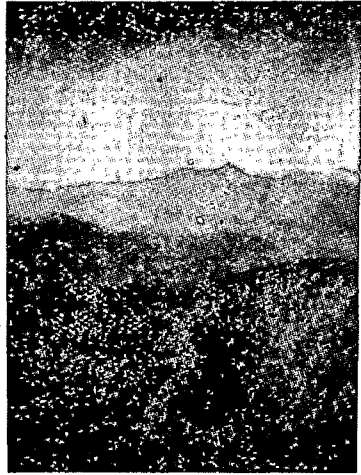
এবার বাড়ী ফেরার পালা। সবাই তৃষ্ণার্ত। গাইড বললে, ‘কাছেই একটা ঝরণা আছে, জল খুব ভাল।’ সঙ্গে বিস্কুট ছিল সেখানে গিয়ে তাই দিয়ে জলযোগ করে উপরে উঠে এলাম। তখন দেখলাম যে, আমরা প্রথমে যে রাস্তা দিয়ে কিছুদূর গিয়েছিলাম সেটা দিয়েও আর্থার সীটে যাওয়া যায়—ছুটো পথ একই জায়গায় মিলেছে। আড়াল-করা সাইকেলটা আবিষ্কার করতে বহুদূর একটুও দেয়ী হ’ল না, বুঝতে পারলাম যে বিংশ শতাব্দীর মেয়েদেরও পেটে কথা থাকে না। সেখান থেকে অন্য সবাই সাইকেলে রওনা হলেন, আর গাইড আমাদের সোজা পথে আদি মহাবলেশ্বরে নিয়ে চলল। এই পথে আদি মহাবলেশ্বর মাত্র দেড় মাইল। পৌছতে দেয়ী হ’ল না। আদি মহাবলেশ্বরও বেশ চমৎকার জায়গা। সময় কম বলে ভাল করে দেখা হ’ল না। আর্থার সীট থেকে সোজা পথে পৌছলাম একটা বড় মন্দিরের পিছনে। শুনলাম এটি ‘উগম মন্দির’; ‘কৃষ্ণা মন্দির’ও বলে এটিকে। মন্দিরের কারুকার্যে কোন বিশেষত্ব নাই। অত্ কখন জায়গা থেকে এনে রেখে দেওয়া একটা কালো পাথরের বেস রিলিফে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি ছাড়া অত্ কোন মূর্তিও নাই। পশ্চিমের দেয়াল হুঁড়ে পাঁচটি নালা দিলে জল ভিতরে এসে প্রথমে একটা বড় কুণ্ডে, তার পর পাথরে তৈরি গোমুখ দিয়ে আর একটা কুণ্ডে পড়ছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, এই পাঁচটা নালা নাকি কৃষ্ণা, সাবিত্রী, কোয়েলা প্রভৃতি পাঁচটি নদীর জল এবং মন্দিরটি কৃষ্ণানদীর মন্দির। মন্দিরের সামনে একটা ধর্মশালা আছে। এখানে আরও কয়েকটি মন্দির আছে, তার মধ্যে একটি মহাবলেশ্বর শিবের মন্দির। এই শিবির নামেই জায়গাটার নাম হয়েছে মহাবলেশ্বর। মহাবলেশ্বর শিবের সম্বন্ধে একটি সুন্দর পৌরাণিক কাহিনী আছে।

এখানে মহাবল আর অতিবল নামে দু’জন রাক্ষস বাস করত। তাদের উৎপাতে স্ত্রী-পুত্রেরা নির্বিলম্বে তপস্চরণ বা যজ্ঞাদি করতে পারতেন না। তাই তাঁরা মহাবল আর অতিবলের নিধনের জন্ত বিষ্ণুকে গিয়ে ধরলেন। বিষ্ণু রাজী হয়ে অতিবলকে মারলেন, কিন্তু বড় ভাই মহাবল ত্যিই মহাবল—বিষ্ণুশক্তিকে তাঁর কাছে হার মানতে হ’ল।

তখন বিষ্ণু মোহিনীমূর্তি ধরে মহাবলকে কাবু করে তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করলেন। মহাবল বর দিতে রাজী হলেন, মোহিনী বললেন—মহাবলকে মরতে হবে। প্রার্থনা শুনে মহাবল অবাক, কিন্তু কথা দিয়ে ত আর কথা ফিরান চলে না। মহাবল মরলেন; কিন্তু আগে কবুল করিয়ে নিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর অতিবল আর মহাবলের স্থতি রক্ষার জন্তে তাঁদের শিবরূপে পূজা করতে হবে। সেই থেকে মহাবলেশ্বর আর অতিবলেশ্বরের পূজা চলে আসছে। শিবরাত্রির সময় এখানে খুব বড় মেলা হয়।

আদি মহাবলেশ্বর থেকে সাইকেল নিয়ে যখন বাসায় ফিরলাম তখন বেলা প্রায় তিনটা।

আহার ও একটু বিশ্রামের পর ‘বস্বে পয়েন্ট’ দেখতে গেলাম। বস্বে পয়েন্ট খুব কাছেই; বাজার থেকে মাত্র দু-মাইল, গবর্নমেন্ট হাউসের পিছনে। সূর্যাস্ত দেখবার জন্তে এখানে প্রতিদিন বহু লোকের সমাগম হয়। বহুদূর সমুদ্রের গর্ভে সূর্যাস্তের দৃশ্য যেমন উপভোগ্য, তেমনি নয়নমুগ্ধকর পাহাড় আর জঙ্গলের দৃশ্য। এখান থেকে কোয়েলা নদীর



১নং চিত্র। স্যাডল ব্যাক

উপত্যকা প্রতাপগড়ের দুর্গ আর স্যাডল ব্যাক পাহাড়ের দৃশ্য সত্যিই মনোরম। (১নং চিত্র)

আর একটি রমণীয় স্থান হচ্ছে ‘লডউইক’ আর ‘সিডনী’ পয়েন্ট। এই পয়েন্ট দুটিও খুব দূরে নয়—বাজার থেকে তিন মাইলেরও কম। এখান থেকেও ফিটজেরাল্ড ঘাটের গা ঘেষে প্রতাপগড় হয়ে মাছাড় যাবার রাস্তা, প্রতাপগড়ের দুর্গ, এলফিনষ্টন পয়েন্ট এই সব চমৎকার দেখতে পাওয়া যায়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে লডউইক সাহেব নাকি এখানেই প্রথম আসেন। সেই স্থানটিকে স্থায়ী করবার জন্তে জায়গাটির নামকরণ করা হয়েছে লডউইক পয়েন্ট, একটা শুভ ও রয়েছে

নজরে পড়ল। এখান থেকে একটু এগিয়েই সিডনী পয়েন্ট, একটা সরু লম্বা পাহাড়ের ফালির শেষপ্রান্তে। লডউইক পয়েন্ট যেন অঙ্গুলীসঙ্কতে নীচের খদ আর সমুখের পাহাড়ের সারি দেখিয়ে দিচ্ছে। পাহাড়ের অঙ্গুলী সদৃশ অংশটি প্রায় দু'ফার্লং লম্বা আর কোথাও আট-দশ ফুট, কোথাও বা কিছু বেশী চওড়া। একটু অসাবধান হইলেই আর রক্ষা নাই, নীচে ২০০০ ফুটের খদ। আমি সাইকেল চড়ে সিডনী পয়েন্ট পর্যন্ত গিয়েছিলাম বলে সঙ্গীদের সে কি ভৎসনা।

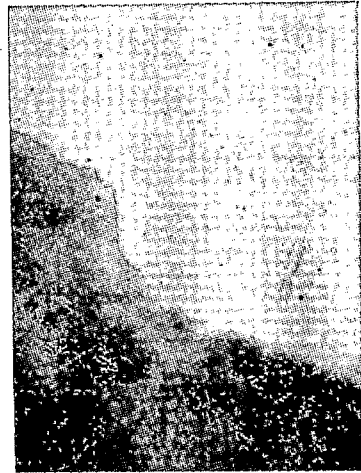
মঙ্গলবার মহাবলেখরের হাটবার। ছপুর পর্যন্ত কেনাকাটা করা হ'ল। লেডী ডাক্তাররা, বিশেষ করে শ্রীমতী কেটি কলা, টমেটো, গাজর ইত্যাদি ভাইটামিনযুক্ত খাদ্যবস্তু কিনে বিতরণ করতে লাগলেন এক পাল ছেলেমেয়ের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে। উঃ, সে কি ভিড়। ওদের চেহারায় নাকি ভাইটামিনের অভাব ফুটে বেরুচ্ছে, সেটা যতদূর সম্ভব পূরণ করে দিতে চান লেডী ডাক্তাররা। শহরেই জন্ম এবং শহরেই এঁরা মানুষ, অবস্থাও সচ্ছল, সত্যিকারের ভারতবর্ষের সঙ্গে এখনও পরিচয় হয় নাই ওঁদের।

মহাবলেখরের মত এত প্রার্থী আমি আর কোথাও দেখি নাই। সবাই যে ভিখারী তা নয়। অনেকে হয় তো কাছাকাছি কোন গ্রামে থাকে, বাজারে এসেছে বিকিকিনি করতে। পথে বিদেশী আগন্তুক দেখলেই 'সাব বখশিশ' অথবা 'বাই বখশিশ' বলে হাতটা বাড়িয়ে দেয়। এটা যেন ওদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। অনেক সময় দেখা যায় 'সাব বখশিশ' বলে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে যে যার পথে চলে গেল।

অপরাহ্নে গেলাম লিঙ্গমালা দেখতে, বাজার থেকে প্রায় চার মাইল দূরে এই জায়গাটা। প্রথম তিন মাইল পাঁচগণির রাস্তা দিয়ে গিয়ে দেখি ডান দিকে একটা কাঁচা রাস্তা বেরিয়ে গিয়েছে লিঙ্গমালার দিকে। লিঙ্গমালা হ'ল মহাবলেখরের "কিচেন গার্ডেন"—সজীর বাগান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে গবর্নমেন্ট এখানে কুইনাইনের চাষের চেষ্টা করেছিলেন। বহু পরীক্ষা আর অর্থব্যয়ের পর অসম্ভব বলে সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়েছে। বাগানের তত্ত্বাবধায়কের বাংলো আর আপিস-বাড়ী এখনও রয়েছে দেখলাম। এগুলো এখন বনবিভাগের কাজে লাগছে। এই বাংলোগুলি ছাড়িয়ে আর একটু গেলেই ভেনিয়া জলপ্রপাত—ভেনিয়া নদী সগর্জনে পাহাড় থেকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। প্রপাতের মুখোমুখি উঁচু পাহাড়ে দাঁড়িয়ে এর সমস্তটা দেখতে পাওয়া যায়। প্রপাতটি সিঁড়ির ধাপের মত। ছ'ধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে তুষার-শুভ্র জলরাশি নীচে গড়িয়ে পড়ছে। যুগ্মের পর যখন জলের তোড় বাড়ে তখন নাকি ধাপগুলো থাকে না।

বুধবার। ঠিক হ'ল প্রতাপগড় দুর্গ দেখতে যেতে হবে।

এই প্রতাপগড়েই শিবাজী আফজল খাঁকে 'বাবনখ' দিয়ে বধ করেন। প্রতাপগড় মহাবলেখর থেকে মাত্র দশ মাইল। ট্যাক্সি একটার বেশী পাওয়া গেল না—অথচ যাত্রী আমরা সাড়ে আট জন। আট জন বয়স্ক আর এক জন বালক। ঠিক হ'ল দু'জন যাবেন সাইকেলে আর বাকী সবাই ট্যাক্সি করে—ভাড়া ২৫ টাকা। শ্রীযুক্ত ডি মেলো আর আমি সাইকেলে গেলাম। ঢালু রাস্তা, দুই ধারে খন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নেমে গিয়েছে পাক খেয়ে খেয়ে। ট্যাক্সির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পৌঁছলাম প্রতাপগড়ের পাদদেশে বাড়া ডাক-বাংলোতে। সেখান থেকে পাহাড়ের প্রায় দেড় মাইল উপরে দুর্গ। (২ নং চিত্র) যারা হেঁটে উঠতে অপারগ তাঁরা ইচ্ছা করলে চেয়ার ভাড়া করে যেতে

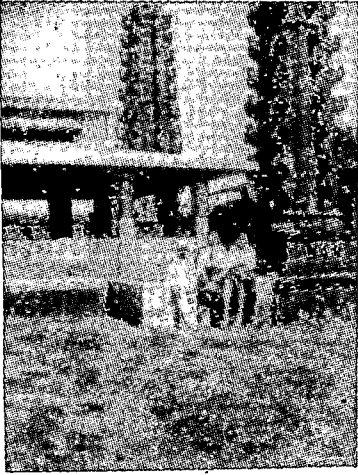


২ নং চিত্র

পারেন—চার জন লোককে ষাড়ে করে নিয়ে যাবে। ভাড়া পরিশ্রমের তুলনায় খুবই কম—চার টাকার মত। আদ্রাদে-পত্নীর পক্ষে হেঁটে উঠা অসম্ভব, তাঁর জুড়ে একটা চেয়ার নিয়ে আমরা হৈ হৈ করে গিরি আরোহণ শুরু করলাম। অপর মহিলারা কিছুদূর গিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে চেয়ারে উঠবেন এই আশায় আরও দু'দল লোক ছুটি চেয়ার নিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সবটা পথ এল। কিন্তু তাদের আশা পূর্ণ হ'ল না। পথ খুব খাড়াই এবং ছরারোহ হলেও মহিলারা অতি সহজেই উপরে উঠে গেলেন। দলের মধ্যে শ্রীমতী ম্যুরিয়েল দুর্গে পৌঁছলেন সকলের আগে প্রায় সবটা পথ ছুটতে ছুটতে। তাঁর উৎসাহ আর সহিষ্ণুতার কাছে পুরুষদেরও হার মানতে হয়। হাসিতে আনন্দে উচ্ছল এই ভদ্রমহিলা পরিচিত অপরিচিত সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি অনার্যাসে আকর্ষণ করতে পারেন। 'পথি নারী বিবর্তিতা' সাবধানীদের এই বাক্য আমাদের

সন্ধিনীদের কারও সম্বন্ধেই খাটে না—শ্রীমতী ম্যুরিয়েলের বেলায় তো নয়ই।

প্রতাপগড়ের দুর্গ দুর্গম্ব হলও দর্শকের মনে বিশ্বয়ের উদ্বেক করে না। তা ছাড়া এই দুর্গের প্রধান প্রবেশ-দ্বার, চার দিকের প্রাচীর আর দুর্গের মধ্যে শিবাজীর আরাধ্যা দেবী ভবানীর মন্দির ছাড়া এখন আর কিছু দ্রষ্টব্যও নাই। মন্দিরটির যথোপযুক্ত সংস্কারের জন্তে বেশ ভালই আছে। মন্দিরের সম্মুখেই হুদীর নাটমন্দির আর তার দুই পার্শ্বে দুইটি স্তম্ভ।



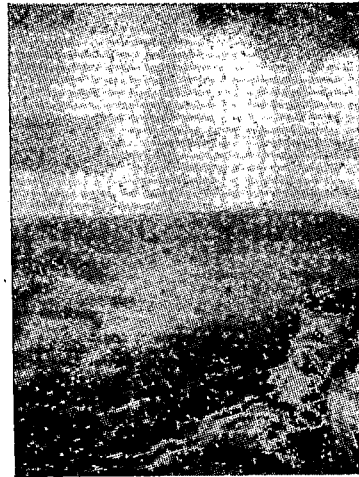
৩ নং চিত্র

(৩নং চিত্র) মন্দির আর নাটমন্দিরের সামনেই যাত্রীদের বিশ্রামাগার। এখান থেকে কোয়েলা উপত্যকা, ফিট্জেরাল্ড আর রদগণ্ডি খাট ছবির মত দেখা যায়। প্রথমেই চোখে পড়ে দুর্গের বাহিরে খানিকটা নীচে প্রায় আধ মাইল দূরে একটু সমতল যায়গা—সেখানে দুটি ঘর। এই সমতল স্থানেই শিবাজী আর আফজল খাঁয়ের সাক্ষাৎ হয়। এখানে আফজল খাঁ আর তাঁর এক জন সহচরের সমাধি আছে। এর পরই চোখে পড়ে ঠিক মন্দিরের সামনে দু'ধারে পাথরের দেয়াল-ঘেরা উঁচু সরু রাস্তার মত একটি স্থান। (৪নং চিত্র)। দুর্গের লোকদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওরই শেষ প্রান্তে উঁচু টিবিটার নীচে আফজল খাঁয়ের মস্তক প্রোথিত হয়েছিল, দেহটা রাখা হয়েছিল নীচের সমাধিতে।

পাহাড়ের উপরের স্নিগ্ধ বাতাসে অল্প সময়ের মধ্যেই ক্লান্তি দূর হ'ল, তখন জঠরাগ্নির সহনজালা অল্পভব করতে লাগলাম। দুর্গের লোকদের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল যে দুধ, ডিম, চা এমন কি চিনিও পাওয়া যেতে পারে। ইচ্ছা করলে তৈরি চাও পাওয়া যাবে। টাকায় দু'সের খাট

দুধ। আর আমাদের পায় কে। উম্মন আর কাঠকুটোও পাওয়া গেল। সন্দের ডাক্তারনীরা আর যাই হোন লেজী তো, কাজেই দুধ ভাল দেওয়া, চা তৈরী আর ডিম সিদ্ধ হতে দেরী হ'ল না। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে ছিল বিছুট, মাখন আর চীজ। মধ্যাহ্নভোজন হ'ল ভালই। তার পর আমরা বেরুলাম দুর্গ প্রদক্ষিণ করতে, সঙ্গে এক জন গাইড। দেখবার বিশেষ কিছুই নাই—চারদিকে খাট পর্বতমালার দৃশ্য এ ছাড়া শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী স্থাপিত হুমান-মূর্তি, কেদারেশ্বর শিব, দু'একটা পুরানো কামান এই সব দেখে প্রাচীরের গা বেয়ে ঘুরতে লাগলাম। গাইড বললে ওদিকে দেখবার আর কিছু নাই, কেউ যায়ও না ওদিকে।

প্রদক্ষিণ...একটু বিশ্রাম—তার পরই প্রত্যাবর্তনের পালা। আদ্রাদে, কেট, ম্যুরিয়েল আর আমি চললাম আফজল খাঁয়ের সমাধি দেখতে, দলের অগ্র সুবাই সোজা নেমে গেলেন নীচে ডাক-বাংলোর দিকে। সমাধিমন্দিরের চারদিকের দরজাই বন্ধ, রক্ষককেও খুঁজে পাওয়া গেল না। সার্শির জানালা, ভিতরটা অবশ্য দেখতে অসুবিধা হ'ল না। পাশা-পাশি দুটি সমাধি সিকের কাপড় দিয়ে ঢাকা। ছাদ থেকে অসংখ্য বাতির গ্লোব আর ঝাড় ঝুলছে, পাখা, ময়ূর-পুচ্ছের চামর ইত্যাদিও আছে। আজ এ স্থান নীরব, জনমানবহীন। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের আর একদিনের ঘটনা কল্পনার চোখে দেখতে লাগলাম। সমস্ত প্রতাপগড় দুর্গ এখান থেকে যেমন স্পষ্ট আর সুন্দর দেখতে পাওয়া যায় তেমন আর কোন জায়গা থেকে নয়।



৪ নং চিত্র

সঙ্গীরা নীচে অপেক্ষা করছেন, কাজেই তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলাম। ডাক বাংলোয় এসে সুবাহু ঠাণ্ডা জল পানের পর

সুখ হ'ল প্রত্যাবর্তনের আয়োজন। কথা হ'ল সাইকেলে ফির-  
বেন কে কে? সবাই এলেন এগিয়ে। কিন্তু এগিয়ে এলেই  
তো হয় না, দশ মাইল খাড়া চড়াই, সাইকেল ঠেলে হেঁটে  
উঠতে হবে। বহু বিতর্কের পর স্থির হ'ল সাইকেল মোটরের  
পিছনে বেঁধে দিয়ে আঁদ্রাদে আর শ্রীমতী ম্যারিয়েল হেঁটে আস-  
বেন। বাকি সবাই আসবেন মোটরে। আমরা সবাই ফিরে  
এসে চা-পর্ব সেরে যখন গল্প করছি তখন বেলা প্রায় চারটা  
—পদচারী ছ'জন এসে পৌঁছলেন। পথশ্রমে তাঁদের গা দিয়ে  
ধাম ছুটছে, চোখ মুখ লাল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মুখের হাসি  
যাত্রার সুরতে যেমন ছিল তেমনি আছে। উপরন্তু আছে  
কাঁধের উপর গম্বাদনের বোঝা—পথে যেখানে যত রকমের  
ফুলগাছ দেখেছেন তার শুধু ফুল নয়—একটা করে ডাল ভেঙ্গে  
নিয়ে এসেছেন। সববে তাঁদের অভিনন্দন জানানো হ'ল।  
গৃহকর্তা গেলেন চা দিয়ে তাঁদের ক্লান্তি দূর করার বন্দোবস্ত  
করতে।

সন্ধ্যাবেলা। রেশনের কেরোসিন তেল ফুরিয়ে গিয়েছে,  
সপ্তাহ শেষ না হলে তেল পাওয়া যাবে না। আমরা  
মোমবাতি জ্বলে তাস খেলছি। হার-জিতের সঙ্গে সঙ্গে  
টকি আর লক্সেল্গেস হাতবদল হচ্ছে বলে আলোর অভাব  
থাকলেও বাড়ীটা নীরব নয়। এমন সময় রেশনিং আপিসের  
এক কর্মচারী এবং আর এক জন ভদ্রলোক এসে উপস্থিত।  
ব্যাপার কি?

‘রেশন-কার্ডে এই বাড়ীর এক জন মহিলা নিজে থেকে ডাক্তার  
বলে প্রকাশ করেছেন, তিনি আছেন কি?’

আমাদের এক জন বলে উঠলেন—এক জন কেন তিন তিন  
জন লেডী ডাক্তার আছেন, M. D., F. C. P. S.—এই সব।  
কাকে চাই আপনাদের?

ভদ্রলোক দুটি তো লেডী ডাক্তারের প্রাচুর্যে আর  
উপাধির বৈচিত্র্যে প্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। রেশন  
আপিসের ভদ্রলোক বললেন—‘দেখুন, আমরা এসেছি ভারী  
বিপদে পড়ে। ‘ইনি’—সঙ্গে ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে—‘আমার  
বন্ধু, অমুক হোটেলের মালিক। এর জী অসুস্থ কিন্তু এখানে  
তো লেডী ডাক্তার নেই। এখন আপনাদের মধ্যে যদি দয়া  
করে কেউ একবার আসেন তবে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব,’  
ইত্যাদি।

ডাক্তাররা তো যেতে রাজী, কিন্তু অসুবিধা এই যে সঙ্গে  
ষ্টেথোস্কোপটা পর্যাপ্ত নেই। সেটা জোগাড় করে আনলেই  
তাঁরা সানন্দে যথাসাধ্য করবেন একথা জানান হ'ল। তখন  
আগন্তুকদের এক জন গেলেন ষ্টেথোস্কোপের সন্ধান, আর এক  
জন বসে গল্প করতে লাগলেন। প্রথমেই প্রশ্ন করলেন—  
মোমবাতি জ্বলেছি কেন। এতে কি আলো হয়?...ও তাই  
নাকি, তেলের অভাবে বাতি জ্বলেছে না। আমি গিয়েই

আমার ওখান থেকে দুটো বাতি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমরা  
মুখে ভদ্রতা বজায় রাখার জন্তে বললাম—তাঁর নিজে  
অসুবিধা করে আমাদের সাহায্য করার দরকার নাই। বাতি  
দিতে চেয়েছেন তার জন্তেই তিনি আমাদের ধন্যবাদাই। তার  
পর যা হয়ে থাকে তাই হ'ল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের  
ঘরে জ্বলল বড় টেবিল-ল্যাম্প। বাতির অভাব ঘুচল—  
আমরা বললাম এটা হ'ল ডাক্তারের ভিজিট।

স্বস্থ্যপ্তিবার। আজ আমরা রওনা হব। আমরা মানে  
ডি মেলো, চিচগার আর লেগরক। স্থির হ'ল সন্ধ্যার বাসে  
সোজা পুণার না গিয়ে আমরা সবাই বেরব সকালের  
বাসে। সমস্ত দিন পাঁচগণিতে কাটিয়ে আমরা তিন জনে  
চলে যাব নেমে পুণার দিকে আর অল্প সবাই ফিরে যাবেন  
মহাবলেধরে। সকাল সাড়ে আটটায় বাস; পিকনিকের  
জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠে বসলাম সবাই। বাস ছেড়ে  
দিলে, একবার পিছন দিকে চেয়ে বিদায় নিলাম—পাঁচ  
দিনের পরিচিত মহাবলেধরের কাছে; মনে মনে বললাম  
‘পুনরাগমনায় চ’। আট মাইলের মাথায় এসে শ্রীমতী  
কেটি, চিচগার আর ডি মেলো নেমে পড়লেন। কাছেই এক  
পারসী ভদ্রলোকের ফল আর ফুলের বাগান আছে, নাম  
Bhillard Estate, সেটা দেখার জন্তে আমরা পাঁচ-  
গণিতে গিয়ে মালপত্র বাস আপিসে রেখে সাইকেলে ফিরে  
আসব ঠিক হ'ল। আঁদ্রাদে-পত্নী আর তাঁর সঙ্গী হিসাবে  
শ্রীমতী ফ্রিডা রয়ে গেলেন পাঁচগণিতে আর আমরা বাকী  
তিন জন তিনখানা সাইকেল ভাড়া করে রওনা হলাম  
Bhillard Estate-এর উদ্দেশে। বাগানটি পাঁচগণি মহা-  
বলেধরের রাস্তা থেকে প্রায় মাইলদেড়েক দূরে। পথে  
মাঝে মাঝে গোলাপের পাপড়ি পড়ে থাকতে দেখে বুঝতে  
পারছিলাম যে ঠিক পথেই চলছি। বাগানে এসে পৌঁছলাম,  
পূর্ববর্তীরা অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্তে। বাগানটি  
বেশ বড়। কচুরীপানা আর পেয়ারা থেকে আরম্ভ করে  
নীল পদ্ম আর আপেল পর্যন্ত দেশী-বিদেশী অনেক রকম ফুল  
আর ফলের গাছের সংগ্রহ আছে সেখানে, মায় তেজপাতা  
আর কপূর গাছসহ। সংগ্রহ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু  
সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হিসাবে উচ্ছৃঙ্খল প্রশংসার মত নয়। বাগানের  
পর্যবেক্ষক সুন্দর বীধানো ভিজিটাস বুক নিয়ে এল। তার  
প্রতি পৃষ্ঠায় সে কি প্রশংসার বহর—গুজরাটী, কন্নড়ী, ইংরেজী,  
মারাঠী নানা ভাষায় লেখা। তবে একটা কথা, বর্ষার  
পর নতুন করে বাগানের আরম্ভ হতেই আমরা এসেছি।  
বসন্তকালে হয়তো জায়গাটা সত্যি ছুর্গে পরিণত হয়।  
শ্রীমতী ম্যারিয়েল বোটানির ডিগ্রীধারিণী। তিনি আমাদের  
সকলের হয়ে হু'লাইন মন্তব্য লিখলেন গোলাপের প্রশংসা  
করে—আমরা সবাই সায় দিয়ে সই করলাম। তখন কে

একজন আমাকে বলে উঠলেন—খাতার মধ্যে বাংলা লেখা নাই, তুমি কিছু লিখে দাও না কেন বাংলাতে। কি লিখি ভাবতে ভাবতে লিখলাম—মুদ্র বাংলাদেশ থেকে এসে জায়গাটা ভালই লাগল—বিশেষ করে পাহাড়ের উপরে প্রফুল্লিত নীলপদ্ম।

আর কিছুক্ষণ বাগান-রক্ষকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমরা রওনা হলাম। বাস কোম্পানীতে গিয়ে খবর পেলাম যে শ্রীমতী সিসি (আত্মদে-পত্নী) আর ফ্রিডা পিকনিকের সব সরঞ্জাম নিয়ে বেরি পর্যাণ্টে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। বেবি পর্যাণ্ট থেকে নীচে ফুফা নদীর উপত্যকা আর বাই (Wai) ঠিক ছবির মত দেখতে।

পাঁচগনি জায়গাটিও বেশ মনোরম। এখানে হিন্দু, পারসী, মুসলমান আর যুরোপীয়দের মধ্যে আলাদা আলাদা হাই স্কুল

রয়েছে দেখলাম। পাঁচগনিতে আমার সব চেয়ে ভাল লাগল শহরের পূর্বপ্রান্তে, পার্কের ঠিক পরেই বিশাল কালো পাথরের পাহাড়টি। খাড়া দেয়াল, উপরটা সমতল, যেন এক অতি বিরাট ভোজের টেবিল পাতা রয়েছে। ওর উপর উঠে যে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় তাতে রসনার তৃপ্তি হয় না এ কথা ঠিক, কিন্তু তার চেয়েও যে তৃপ্তি স্থায়ী—চোখের আর মনের তৃপ্তি—সেটা হয় প্রচুর পরিমাণে।

প্রায় পাঁচটার সময় মহাবলেশ্বর যাত্রীদের বাস এল। পাঁচ দিনের পরিচয়ও যে কত নিবিড় হতে পারে তা অনুভব করলাম বাস ছেড়ে চলে যাবার পর। ছ'টার সময় আমাদের বাস ছাড়ল। যথাসময়ে এসে পৌঁছলাম পুণায়, তার পর বোম্বাইয়ে। দৈনন্দিন কর্মের চাকা আবার ঘুরতে লাগল যথাপূর্ব। নুতনস্থের মধ্যে মনে জেগে আছে পাঁচ দিনের স্মৃতি।

## অবজ্ঞা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নমি অবজ্ঞা, তোমারি আদর সর্বশ্রেষ্ঠ যে  
বনের ফুলকে এমন করিয়া আধারে ফুটাবে কে?  
খরদৃষ্টির আলোক রুদ্ধ করি,  
তব আলোখ্য লও অলক্ষ্যে গড়ি,  
সাগরের তলে মুক্তাকে ভর অতুল মাধুর্যে।

প্রতিভাকে রাখে কণ্টকে বেরি' তোমার আবেষ্টনী  
খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, দূরে সরে যায় তুচ্ছ তাহারে গণি'  
জ্ঞানে—ধ্যানী, জ্ঞানী, সাধু শিল্পীর দল—  
সব সাধনায় তুমি সেরা সম্বল,  
আশীর্বাদে হয়ে আগুলিয়া রাখো উজল মানিক্যে।

আনো 'কবীরের' কুটীর-দুয়ারে কামিনী ও কাকন  
কুণ্ঠিত নাসা, এসে ফিরে যায় সাবধানী লোকজন।  
পরশমণিরে দাঁও কঙ্করে ঢাকি'  
দিতে পথিকের লুপ্ত আঁখিরে ফাঁকি  
'যক্' দিয়া রাখো বর্জনশীল মি ঐশ্বর্য্যেতু।

## ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

প্রথম-রবির উদয়ের ক্ষণে সিঁহর বরণ পূর্বাচল  
তমসা পলায় মুদ্র-দিগন্তরে  
মণি-মুকুতার আল্পনা আঁকে শিশির-সিক্ত ছর্বাদল  
বিহগেরা গাং পুলকিত অন্তরে।  
নুতন প্রভাতে বরণ করিতে সাজিছে প্রকৃতি সুন্দরী  
ধরণীর বৃকে সবুজ আন্তরণ,  
মুহুর পবন পুলকে বহিছে সুবাসিত ফুল-মঞ্জরী  
প্রাণ-মাধুর্য্যে করিছে সম্বরণ।

তমোঘন নিশা ছ'শো বছরের লাঞ্ছনা ব্যথা রিক্ততার  
শত অপমান অধীনতা-শৃঙ্খল—  
শতাব্দী ধরি' বেদনার দাহে আশ্রয়গ্ধ ক্ষোভে সিক্ত মা'র  
পাণ্ডুর গালে তপ্ত নয়ন-জল।

স্বাধীনতা-রবি লোহিত আভায় আধারিমা হ'ল খণ্ডিত  
শতাব্দীভরা বেদনার অবসান,  
গান্ধী-সুভাষ জ্বরলালের মহিমার রাগে রঞ্জিত  
দেশজুড়ে ওঠে স্বাধীনতা-জয়গান।

গৈরিক সাদা-সবুজবক্ষে অশোক-চক্র লাক্ষিত  
বিজয়-কেতনে শোভিত উদ্ধাকাশ  
কত দধীচির আত্মাহুতির—কত পুত-স্মৃতিমণ্ডিত  
'স্বাধীন ভারতে' জাগিল কি উল্লাস।



# সমগ্রতাবাদী বা গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা

শ্রী অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অগ্ৰাঙ্গ শাখার মতই সমগ্রতাবাদী (Gestalt) মনোবিজ্ঞানেরও জন্ম হয়েছিল বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে মনোবিজ্ঞানকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল তার বিষয়বস্তু ছিল সচেতন মন বা চেতনা, এবং তার পদ্ধতি ছিল অন্তর্নিরীক্ষণ (Introspection)। আমার মনে যে সচেতন প্রবাহ চলেছে তারই যথাযথ বর্ণনা হ'ল এই পদ্ধতির মূল কথা। মনোবিজ্ঞানী এলেন, এসে আমাদের বিশেষ কোন একটি কাজ দিলেন। সেই কাজের সময়ে আমার মনের যে অবস্থা আমি উপলব্ধি করেছি, বিনা বিশ্লেষণে ও মন্তব্যে তারই যথাযথ বর্ণনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল এই সময়ের মনোবিজ্ঞান। বিস্তৃত বিশ্লেষণ না করে সংক্ষেপে বলতে গেলে উক্ত মনোবিজ্ঞানের যে বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে এই :—(১) মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হ'ল সচেতন মন ও তার বৃত্তিসমূহ; (২) মনের প্রত্যেক বৃত্তিই কতকগুলি ক্ষুদ্রতর উপাদানের সংযোগে গঠিত। আমাদের প্রত্যয় অনুভূতি ইত্যাদি এক একটি যৌগিক পদার্থ, এবং এদের জানতে হলে বিশ্লেষণ করে ঐ উপাদানগুলিকেই প্রথমে জানতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর নাম হ'ল 'মানসিক রসায়ন আদর্শ' বা 'Mental Chemistry Ideal'। (৩) এর পদ্ধতি হ'ল অন্তর্নিরীক্ষণ। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই মনোবিজ্ঞানের নাম দেওয়া হয় Structural Psychology, বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে অবয়বী মনোবিজ্ঞান। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এর প্রতিবাদ হ'ল, এবং নানা প্রকার গবেষণা ও পরীক্ষার ভিত্তিতে বলা হ'ল যে, প্রথমতঃ মন একটি অবিভাজ্য সক্রিয় পদার্থ, দ্বিতীয়তঃ অন্তর্নিরীক্ষণ দ্বারা শুধু মাত্র চেতনা নিয়েই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না। মনের বাইরে মানুষের কার্য সম্পাদনাকেও এর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এই দুই প্রতিবাদ থেকেই জন্ম নিল আধুনিক মনোবিজ্ঞান। কিন্তু এই প্রতিবাদের ব্যাপারে আবার আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনৈক্য দেখা গেল। তাদের প্রতিবাদের ফলে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও ভিত্তি থেকে নতুন নতুন পদ্ধতিরও সৃষ্টি হ'ল সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞান এদের অন্যতম।

সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানের বিদ্রোহ ছিল প্রধানতঃ জার্মান দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক Wundt-এর বিরুদ্ধে। Wundt বলেছিলেন যে, আমাদের অভিজ্ঞতা সৃষ্ট হয় কতকগুলি উপাদান-সংযোগে। আমাদের প্রত্যেকটি ধারণা অনুভূতি সঙ্গ ইত্যাদি এক একটি যৌগিক বস্তু। অতএব

মনোবিজ্ঞানের কর্তব্য হ'ল এই যৌগিক বস্তুটির উপাদান-সমূহ বিশ্লেষণ করা, এবং পরে লক্ষ্য করা যে কি নিয়মে ও কি ভাবে সেই উপাদানগুলি সংযুক্ত হয়েছে। আগে বিশ্লেষণ-ও পরে সংযোজন—এই পদ্ধতির দ্বারা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন মূল নীতি আবিষ্কার করাই ছিল Wundt-এর উদ্দেশ্য। এই মনোবিজ্ঞানকে সমগ্রতাবাদ আখ্যা দিলে 'ইট ও চূণ সুরকির মনোবিজ্ঞান'। ('Brick and Mortar Psychology')। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার বিভিন্ন উপাদানগুলি যেন ইট, যাকে চূণ সুরকির দ্বারা একত্রে এখিত করে বিশেষ এক অভিজ্ঞতার সৌধ গড়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠল চূণ সুরকি সম্বন্ধে। কি সেই 'চূণ সুরকি' যার দ্বারা উপাদান-গুলি বিশেষ একটা রূপ নিয়ে গড়ে উঠতে পারে?—এই প্রশ্নের কোন সন্তুস্তর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ঠিক এই সময়েই এল আর একটি জিনিষ। Ebbinghaus ও অন্যান্য কয়েকজন পরীক্ষা করে বললেন যে—কোনও সম্পূর্ণ বস্তুর এমন একটি বিশেষ ধর্ম আছে যা নাকি তার উপাদানসমূহ থেকে পুরোপুরি আলাদা। যে-কোন বস্তুর এই বৈশিষ্ট্যটির নাম এরা দিলেন 'সমগ্রতাবাদ' (Gestalt quality)। যেমন সঙ্গীতের কোন একটি সুর নির্ভর করে সুরগ্রামের পর্দার উপর। কিন্তু সুরগ্রামের পর্দাগুলিকে আলাদা করে নিলে সেই বিশেষ সুরটির কোন চিহ্নই সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেন না ঐ সুরটি নির্ভর করে সুরগ্রামের বিশেষ গঠন-পদ্ধতির উপর। ঐ গঠনটি বদলে দিলে একই সুরগ্রাম নিয়েও সুরটি বদলে যাবে। অর্থাৎ সঙ্গীতের এমন একটি স্বতন্ত্র রূপ আছে যাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তা হলে সমগ্রতার এই বৈশিষ্ট্য তার উপাদানের চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয়। এই সত্যটির উল্লেখ করে সমগ্রতাবাদীরা বললেন যে, অভিজ্ঞতার উপাদান বিশ্লেষণ করা মনোবিজ্ঞানের কাজ নয়; তার একমাত্র কর্তব্য হ'ল এই সমগ্রতার নিজস্ব কোন নীতি আছে কিনা এবং কেনই বা বিশেষ অবস্থায় সমগ্রতার বিশেষ একটি রূপ দেখা যায়, তারই অনুসন্ধান করা। কেন না Wundt-এর ব্যবহৃত বিশ্লেষণ পদ্ধতি বর্জন করলেও সমগ্রতাবাদীদের মতে মানসিক ঘটনাসমূহেরও একটি নীতি আছে, যার নাম হ'ল 'সমগ্রতা নীতি' ('wholeness law')। এই নীতিতে বলা হ'ল যে, মানুষ যখন কোন উদ্দীপনে সাড়া দেয়, তখন সেই সাড়া বিচ্ছিন্ন ভাবে আসে না; সে হ'ল সমগ্র পরিস্থিতির প্রতি, সমগ্র শরীরী (organism-as-a-whole) থেকে উদ্ভূত একক প্রতিক্রিয়া। যেমন, এক জন

শিক্ষক বক্তৃতা দিচ্ছেন। তাঁর সামনে যে জিনিষটি রয়েছে তা বিশেষ কোন একটি ছাত্র নয়—সমস্ত ছাত্রসমূহের নির্বিশেষ সংহত একটি রূপ, যার নাম হ'ল ক্লাস। সেই সংহত ও একক পরিস্থিতির একটি বৈশিষ্ট্য আছে, এবং তারই দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষক তাঁর বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই বৈশিষ্ট্যটিকে জানতে হলে যে সুপরিচালিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক গবেষণা আবশ্যিক, একথা সমগ্রতাবাদীরা অস্বীকার করেন না। বরং নানা পরীক্ষার ফলেই তাঁরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

১৯১২ সনে এঁদের শীর্ষস্থানীয় Wertheimer একটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা করেছিলেন। কোন জিনিষের 'গতি' (motion) সম্বন্ধে আমাদের কি করে প্রত্যয় (perception) জন্মে, এই ছিল তাঁর পরীক্ষার বিষয়। তিনি দেখলেন যে আমরা যখন কোন বস্তুকে গতিশীল দেখি, তখন সেই গতি আমাদের নিকট একটি প্রবাহমান একক (continuous whole) রূপে প্রতিভাত হয়ে থাকে, এবং পর পর কতকগুলি বিচ্ছিন্ন বিন্দুর যোগে গতির যে ধারণা তা ভুল। কোন একজন ধাবমান ব্যক্তিকে হয়তো আমরা দেখছি। সে ক্ষেত্রে এ লোকটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ একটি একক গতিই আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। কিন্তু এ সময়ে যদি ক্যামেরা দ্বারা এ লোকটির পর পর কতকগুলি ফটো নেওয়া যায় তা হলে তার হাত-পা ইত্যাদিকে এমন কতকগুলি অবস্থায় দেখা যাবে যা আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি। অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন অংশ-গুলিকে অতিক্রম করে গতির একটি নিজস্ব অস্তিত্ব আছে, এবং তাকেই আমরা দেখে থাকি। বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন অংশগুলি এই প্রকারের দেখার জন্ম অনাবশ্যক। যে-কোন ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনায় মস্তিষ্কের সাড়া দেওয়ায় যদি বলা যায় সংবেদনা (sensation), তা হলে গতিকেও একটি সংবেদনা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। 'সমগ্রতা'নীতির দিকে লক্ষ্য রেখে এইভাবে নানা প্রকার পরীক্ষা করে এরা প্রমাণ করেছেন যে, স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে যে-কোন একটি স্নায়ু বাইরের উদ্দীপনে উত্তেজিত ও সক্রিয় হলেই সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ স্নায়ুগুলিও উত্তেজিত ও সক্রিয় হয়ে উঠে একটি মণ্ডলীর সৃষ্টি করে। এখন, কাজ হ'ল প্রধানতঃ এই উদ্দীপনামণ্ডলীকে নিয়ে। বিচ্ছিন্ন ও স্থানীয় একক উদ্দীপন এখানে অর্থহীন। শারীর-বিজ্ঞানের দিক থেকে এ যেমন সত্য, ঠিক তেমনই সত্য এটি মনোবিজ্ঞানের দিক থেকেও। যখন আমরা কোন বস্তুকে দেখি তখন সাধারণতঃ ছুটি ব্যাপার ঘটে থাকে। প্রথমতঃ, বস্তুটির আকৃতির একটি ছাপ (image) আমাদের চোখের উপর পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, এ ছাপটির একটি অর্থ ও তাৎপর্য আমরা অনুভব করি। একটি মানুষের ছায়া যখন চোখে পড়ে তখন সে শুধু ছায়াই থাকে; কিন্তু তাকে মানুষ বলে চিনি বা জানি মাত্র

তখনই যখন তার সঙ্গে আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক ধারণা আমরা যোগ করে দিই। মনে করা যাক, চোখ খুলেই আমরা দেখছি সাদা একটি পটভূমির উপর কতকগুলি কালো বিন্দু। বিন্দুগুলিকে আমরা বিচ্ছিন্ন ভাবে উপলব্ধি করি না। পরস্পরের মধ্যে বিশেষ একটি যোগসূত্র সমন্বিত বিশেষ একটি সংহত, একক ও অর্থপূর্ণ সমগ্র (coherent whole) রূপে বিন্দুগুলি আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে। সর্বত্র ও সব সময়েই পটভূমির চেয়ে তার উপরকার এই সংহত, সমগ্র রূপটিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন কি মাঝে মাঝে ফাঁক ও বিরতি (gap) বিশিষ্ট যদি কোন একটি আকৃতি (figure) অঙ্কন করা যায়, তা হলেও এ ফাঁকগুলিকে উপেক্ষা করেই আমরা আকৃতিটিকে একটি সমগ্ররূপে দেখে থাকি। এর কারণ হ'ল স্নায়ুমণ্ডলী ও মনের 'সমগ্রতা'-নীতি। এই নীতির ফলে সব কিছুই ফাঁক বা শূন্যতা কিংবা অসম্পূর্ণতাকে তুচ্ছ করা মানুষের একটি বিশেষ প্রবণতা এবং সমগ্রতাবাদীরা মনে করেন যে, এই প্রবণতা মস্তিষ্কের গতিধর্মেরই (dynamics of brain activity) পরিচায়ক। মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যই এই যে কোন অসম্পূর্ণতার মধ্যে সে স্থির থাকতে পারে না। কেননা কোন প্রকার অসম্পূর্ণতা থাকলেই মস্তিষ্কক্রিয়ার সাম্য নষ্ট হয়ে এক প্রকার চঞ্চলতা জেগে ওঠে, এবং এই অসম্পূর্ণতা দূর হলেই আসে সাম্য ও স্থৈর্য।

কোন বিষয়ের প্রত্যয় আমাদের মধ্যে কি ভাবে জন্মে ও প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে কি জিনিষ আমরা পাই; সে বিষয়ে সমগ্রতাবাদীদের মতামত নিয়ে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি। এরই ভিত্তিতে আচরণ সম্বন্ধেও এঁরা যা বলেন তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আচরণবাদীদের উদ্দীপন-সাড়া (stimulus response) মতবাদ এঁরা পছন্দ করেন না। এঁরা বিশ্বাস করেন না যে, কোন আচরণকে শুধুমাত্র উদ্দীপন-সাড়া নীতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। জন্মের মুহূর্ত থেকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন প্রতিক্ষেপ ক্রিয়ার (Reflex action) পুনঃ পুনঃ অল্পবৃদ্ধির ফলে তারাই শেষ পর্যন্ত আমাদের আচরণে দাঁড়িয়ে যায়—আচরণবাদীদের একথা এরা অস্বীকার করেন। অতি শৈশব অবস্থায় আমাদের আচরণের শৃঙ্খলা থাকে অপরিণত, এবং ক্রমাগত আবেষ্টনীর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে সংবেদক (sensory) ও গতিসঞ্চালক (motor) এই দুই দিক থেকেই সূনিয়ন্ত্রিত হয়ে সে সমগ্র শারীরিক একক আচরণ হয়ে দাঁড়ায়। আচরণবাদীদের মধ্যে অনেকের ধারণা ছিল যে, আচরণ সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষার জন্ম আবেষ্টনীর দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কোন প্রয়োজনই নেই। অর্থাৎ আবেষ্টনীকে বাদ দিয়েও আচরণের বিচার ও বিশ্লেষণ চলতে পারে। সমগ্রতাবাদ

একথা স্বীকার করল না। সমগ্রতাবাদীরা বললেন যে, আবেষ্টনীর প্রতি প্রাণীর যে গতিসঞ্চালক ক্রিয়া তাকে পরীক্ষা করব অথচ সেই আবেষ্টনী সম্বন্ধে উদাসীন থাকব, এ ধরনের কথা হাস্যকর। সংবেদন ও প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে সেই আবেষ্টনী প্রাণীর কাছে কি ভাবে প্রতিভাত হয়, অন্ততঃ সেটুকু না জানলে তার কোন আচরণেরই তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করতে পারব না। আচরণ অথবা আবেষ্টনী এর কোন একটিকেই অতীত থেকে আলাদা করা যায় না—কেননা তাদের মধ্যে বিশেষ যোগাযোগ আছে এবং সেই যোগাযোগ থেকেই জন্ম নেয় প্রাণীর একক আচরণ। এই একক আচরণ গোড়া থেকেই বিশেষ এক উদ্দেশ্য-অভিমুখী। অবশ্য উদ্দীপন-সাড়ার মধ্যে যে সংযোগ আছে সেকথা এঁরা অস্বীকার করেন না। এঁরা বলেন, শুধুমাত্র সেই সংযোগের সাহায্যেই মানুষের সমস্ত আচরণের ব্যাখ্যা করা যায় না। একটা উদাহরণ দিয়ে এঁদের একজন এই কথাটা চমৎকার বুঝিয়েছেন। ডাক বাজ্ঞ ফেলবার উদ্দেশ্যে একখানি চিঠি পকেটে নিয়ে আমি বেরিয়েছি। আমার সত্যকৃষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে আমার চারদিকে। কোন জায়গায় একটা ডাক বাজ্ঞ দেখতে পেয়েই তার মধ্যে চিঠিখানা ফেলে দিলাম। এখানে উদ্দীপন হ'ল ডাক বাজ্ঞ; আর তার সাড়া হ'ল পকেট থেকে বের করে চিঠিখানা সেই বাজ্ঞ ফেলে দেওয়া। আচরণবাদীদের মতে অভ্যাসের দ্বারা উদ্দীপন-সাড়ার সংযোগ দৃঢ় হয়। আর, এ কথা সত্য হলে বলতে হয় যে, দ্বিতীয় আর একটা ডাক বাজ্ঞ দেখলেই আমার হাতখানা আপনা থেকেই পকেটের মধ্যে চলে যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না; বরং ও বিষয়ে সাধারণতঃ আমরা ভুলেই যাই। এই যুক্তি থেকে সমগ্রতাবাদীরা বলেন যে, উদ্দীপন-সাড়া-সংযোগকে আমাদের আচরণের ভিত্তি বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না। বরং বলা যেতে পারে যে, এক প্রকার উত্তেজনা (tension) থেকেই আচরণের জন্ম। মস্তিষ্কের ধর্মই এই যে, তার প্রতিটি ক্রিয়া চলে একটি সম্পূর্ণ বৃত্তের আকারে। চিঠিখানা ডাকবাজ্ঞ ফেলে দেওয়াতে সেই বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়ে উত্তেজনার উপশম হয়েছে। এই জিনিষটিকে এরা নাম দিলেন 'শূন্য স্থান পূরণ'—(closing the gap) নীতি। আমাদের আচরণ ইত্যাদির ধর্মই এই যে, তারা সব সময়েই সম্পূর্ণতাপ্রবণ। অর্থাৎ যে-কোন আচরণই অসম্পূর্ণ হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের শান্তি নেই। এই অশান্তির ভাবটাই কণ্ঠের শূন্যস্থান; এবং একেই পূরণ করার দিকে আমাদের স্বাভাবিক ঝোঁক, এবং পূরণ হয়ে গেলে আমরা শান্তি পাই। একদল ছাত্রকে একবার কতকগুলি ছবির নক্সা আঁকতে দেওয়া হয়েছিল। তারা কাজ আরম্ভ করে দিলে, তাদের কাছে গিয়ে তাদের কাজে বাধা দেওয়া হ'ল। পরে

সেই সমগ্র দলটির প্রত্যেককেই সে কি কি করেছে তার বিবৃতি দিতে বলা হয়। ফলে দেখা গেল যে, যাদের কাজে বাধা দেওয়া হয়েছিল তারা নিজ নিজ কাজের শতকরা নব্বই ভাগ সমরণ করতে পারে, অথচ যাদের কোন রকম বাধা দেওয়া হয় নি তারা প্রায় কিছুই মনে করতে পারে না। এর থেকেও 'সমগ্রতা'নীতির সমর্থন পাওয়া যায়। যে-কোন কাজ একবার আরম্ভ হলে তা অসম্পূর্ণ অবস্থায় মাঝখানে থেমে থাকতে পারে না। সে সম্পূর্ণতার দাবি করে। ফলে সৃষ্টি হয় উত্তেজনার—তাকে আমরা ভুলি না। কিন্তু যা শেষ হয়ে গেছে, যার মধ্যে কোন উত্তেজনার অবকাশ নেই, তা আমরা ভুলে যাই।

এই থেকে এসে পড়ে শিক্ষার প্রশ্ন। কোন কাজ আমরা কোন নীতি অনুসারে শিখি, এবং তার বৈশিষ্ট্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর এঁরা দিলেন 'সমগ্রতা'নীতির সাহায্যে। এঁদের মতে শিক্ষার প্রথম কথা হ'ল অভিপ্রায় বা লক্ষ্য (goal)। আচরণবাদীদের মতে আমাদের সমস্ত শিক্ষার মূলই হ'ল 'উত্তম ও ব্যর্থতা' পদ্ধতি (trial and error method)। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা না নিয়ে নিতান্ত আন্দাজের দ্বারা পরিচালিত আমাদের যে-সমস্ত আচরণ দৈবাৎ অভিজ্ঞত সফলতা লাভ করতে সমর্থ হয় তারাই টিকে যায় এবং অন্ত সব ব্যর্থ আচরণ আপনা থেকেই অবলুপ্ত হয়ে যায়। এই ভাবেই গড়ে ওঠে আমাদের জীবন। চিন্তা ও যুক্তি-ক্রিয়ার ব্যাখ্যাও এঁরা দিতে চাইলেন এই দিক থেকে। বললেন, মানুষের উপর পারিপার্শ্বিকের প্রভাব যথেষ্ট; এবং এই প্রভাবের প্রতিক্রিয়াও বহুবিধ। আর, এই প্রভাব ও তার প্রতিক্রিয়াকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠে মানুষের চিন্তা ও যুক্তি—অর্থাৎ চিন্তা এবং যুক্তিও একপ্রকার শারীরিক আচরণ। অতীত দৈহিক আচরণের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, এ ছোটো থাকে শরীরের অভ্যন্তরে, এবং এগুলোকে দেখা যায় না। মোটের উপর নিম্ন স্তরের প্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত সর্বত্রই মূল কথা হ'ল আচরণ—মন ও মানসিক-বৃত্তিসমূহের ভিত্তিও এই আচরণের মধ্যেই। বাইরের জগৎ থেকে উদ্দীপন এসে স্নায়ুমণ্ডলীকে উদ্দীপ্ত করে, ফলে প্রাণীসমূহের মধ্যে দেখা দেয় শারীরিক প্রতিক্রিয়া। আচরণবাদীদের মতে, এই উদ্দীপন ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগেই আমাদের সমগ্র ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত। সমগ্রতাবাদীদের মতে শিক্ষার মধ্যে এই প্রকার কোন যান্ত্রিক পদ্ধতি নেই। কেননা আমাদের আচরণ অসম্পূর্ণ হয় কোন এক বিশেষ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে। নিম্ন স্তরের প্রাণীর মধ্যে এই লক্ষ্য অনেকটা সরল; মানুষের ক্ষেত্রে তা যেমন বহুমুখী তেমনই জটিল। অবশ্য এর থেকে এ কথা মনে করা সঙ্গত হবে না যে, যে কোন একটি শিক্ষার ব্যাপারে একাধিক লক্ষ্য

ধাকে। সমগ্রতাবাদীদের মতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যবস্তুর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ কোন লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে তারই আলোকে সমগ্র পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সামগ্রিক ভাবে শরীরী জীবের যে একক প্রতিক্রিয়ায় লক আচরণ তাকেই এঁরা বলেন শিক্ষা। আর এই শিক্ষার সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি, সমগ্র পারিপার্শ্বিকের ঘটনাসমূহ ও তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ সম্বন্ধে বিশেষ বোধ থেকে জন্মে উপস্থিত পরিস্থিতির সুস্পষ্ট ধারণা বা জ্ঞান। অর্থাৎ উপস্থিত পারিপার্শ্বিক বা পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ ও অর্থ উপলব্ধি করাই হ'ল জ্ঞান, বা অন্তর্দৃষ্টি। সমগ্রতাবাদীরা শিম্পাঞ্জি ইত্যাদি জন্তু নিয়ে পরীক্ষা করে এই অন্তর্দৃষ্টির যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন।

উপরে যে কথা বলা হ'ল তার থেকে বোঝা যাবে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমগ্রতাবাদীরা প্রত্যয়কে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আমরা আগেই দেখেছি, এঁদের মত এই যে, কোন কিছুই আমরা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখি না। সবকিছুই আমাদের প্রত্যয়গোচর হয় বিশেষ এক সংহত ও সমগ্র রূপে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রত্যয়ের এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান। আমার লক্ষ্য এবং বর্তমান পারিপার্শ্বিকের মধ্যে রয়েছে এক বিচ্ছেদ বা ফাঁক। এই বিচ্ছেদ বা ফাঁক পূরণ করে লক্ষ্য ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষ একটি রূপ প্রত্যক্ষ করাই শিক্ষার মূল। মনে করা যাক যে 'ক' ও 'খ' দুটি ছোট বাজ আছে; এবং 'খ'-এর মধ্যে আছে কিছু খাবার। 'ক'-এর রং গাঢ়

লাল, ও 'খ'-এর রং ফিকে লাল। একটি বিভালকে সেখানে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। কিছুক্ষণ পরে বিভালটি যখন জেনে যাবে যে খাবার আছে 'খ'-বাজে তখন সে ঐ বাজটির আশে পাশেই ঘুরতে থাকবে। এই অবস্থায় বিভালটির অনুপস্থিতিতে তার অলক্ষ্যে 'ক'-বাজটি সরিয়ে তার জায়গায় আর একটি 'গ'-বাজ রেখে দেওয়া হ'ল এর রং 'খ'-এর চেয়েও অধিকতর ফিকে লাল। এই বার দেখা গেল যে বিভালটি 'খ'-এর কাছে যাচ্ছে না। যাচ্ছে 'গ'-এর কাছে। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে বিশেষ কোন কিছুর সঙ্গে উদ্দীপন-সাড়া-সংযোগ প্রধান নয়; প্রধান হ'ল পরিস্থিতি সম্বন্ধে চেতনা, ও পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধবোধ। এখানে সেই বোধ হচ্ছে—'একটি আর একটির চেয়ে কম লাল' এই প্রত্যয়।

এই জাতীয় নানা যুক্তি ও প্রমাণ সাহায্যে এঁরা দাবি করেন যে, নিম্নস্তরের প্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত—সামাজিক জীবনে অথবা মানসিক জীবনে সর্বত্রই এঁদের 'সমগ্রতা' নীতি বর্তমান ও কার্যকরী। জীবন ও জগতের সত্য পরিচয় পেতে হলে তাকে অধ্যয়ন করতে হবে এই দিক থেকে। সেই জটিল মনোবিজ্ঞান আলোচনা করতে গিয়ে মানুষের সামাজিক মনোবিজ্ঞানের আলোচনাও আজ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা মানুষ শুধুই মানুষ নয়, সে সামাজিক মানুষ। অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তার বাইরে সমাজ নামে নৈর্ব্যক্তিক বস্তুটির একটি বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র সে, এবং এই বস্তুতর পটভূমিকা ভিন্ন তাকে সমগ্রভাবে জানা সম্ভব নয়। এই হ'ল সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানের বাস্তব মূল্য।

## এক ও একাকী

### শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

জীবনের যাত্রা যবে শুরু হ'ল প্রথম প্রভাতে  
বজ্র পথের মাঝে, বজ্র সবে দেখা'ইল পথ।  
উল্লাসের কলরোলে মনে হ'ল, 'আনন্দ-সম্পদ  
আলোকে পুলকে প্রেমে মেশামেশি দিবসে ও রাত্রে।  
কোথা আঁখ সাধী যারা। জীবনের দূরগামী রথ  
চলিয়াছে ভিন্ন মুখে, রচিতছে দূর ব্যবধান;  
সঙ্গী যারা ক্ষণেকের যুগ হাসি' কোথা ধাবমান  
কেহ নাহি জানে তাহা। প্রসারিত সীমাহীন পথ।

কত কে যে বাসি' ভালো হাতে মোর পরাইল রাধী,  
কারা যেন গেয়ে গেল জীবনের হাসি-ভরা গান,  
কে যেন পথের প্রান্তে থামিল যে নত করি' আঁখি  
সচকিত করি' মোর যৌবনের উজ্জ্বলিত প্রাণ,  
কত পাহ অবিশ্রান্ত করে কত মান অভিমান,—  
সব ভুল, সত্য শুধু—তুমি এক আমিও একাকী।

## সংঘাত

### শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

এমন বিপদেও কি মানুষ পড়ে। অথচ বিয়ের পূর্ব-কথাটা একবারও ভেবে দেখা হয় নি। একটা রঙিন স্বপ্ন এবং মধুর কল্পনায় সারা মন আচ্ছন্ন ছিল।...

বর্তমানে বিপত্তি দেখা দিয়েছে আমার পুত্রকন্যাকে নিয়ে। বেবী, বাপ্পার দৌরাণ্ড্য আমাকে পাগল করে তুলেছে। কোন দিক দিয়েই আমার কল্পনার জীবনের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। মন বিদ্রোহ করতে চায় কিন্তু এমনি মজা যে, ওরা কাছে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালে বুকটা ভরে ওঠে। গলা জড়িয়ে ধরে গালের উপর গাল রাখলে এক অপূর্ণ অহুত্বভিতে দু'চোখ বুজে আসে। মুহুর্তে বিশ্বসংসার বড় সুন্দর হয়ে দেখা দেয়।

কাজের জিনিষ কখনও এক স্থানে খুঁজে পাবার জো নেই। কালির দোয়াত, কাগজের প্যাড যখন-তখন অদৃশ্য হচ্ছে। কাগজ দিয়ে তৈরি হয় শ্রীমান্ বাপ্পার নৌকা, আর কালিতে ছোপানো হয় শ্রীমতী বেবীর পুতুলের কাপড়। ব্যাপারটা ধরা পড়ে শ্রীমানের সরোষ গর্জনে। শুধু নৌকায় তার চলবে না—কাপড়গুলোও চাই। কথারটির সেইখানেই প্রবল আপত্তি। আর এই নিয়েই ওদের ঝগড়ার সৃষ্টি।

মাথায় একটি চমৎকার প্লট দানা বেঁধে উঠেছিল—টিক সময় বুঝেই এই বিদ্র। উঠে আসতে হ'ল। বস্তুতঃ এই দুর্দ্বিনের বাজারে এ ক্ষতিকে নিতান্ত অবহেলার যোগ্য মনে হ'ল না। মেয়ের পিঠে ষা কয়েক বসিয়ে দিলাম। ছেলের পানের রক্ত চক্ষে তাকালাম। তার মুখে গান্ধীর্ষ্য ও মুহু হাসি যুগপৎ খেলা করে চলেছে। আর সেই সঙ্গে আধ আধ কণ্ঠের আহ্বান। আমার গান্ধীর্ষ্য সে বরদাস্ত করতে পারছে না। মেয়েটার চোখ দিয়ে সেই থেকেকেই জল গড়াচ্ছে। নিজেকে বড় দুর্বল এবং অসহায় মনে হ'ল। এবং শেষ পর্যন্ত রাগটা গিয়ে পড়ল জীর উপর। অহুযোগ দিয়ে বললাম, তোমার অতায় প্রণয় পেয়েই ওরা এমন হয়েছে।

আমার আকস্মিক আক্রমণে জী বিস্মিত হলেন, বললেন, অত চোঁচাচ্ছ কেন? হ'ল কি তোমার?

তেমনি উচ্চ কণ্ঠেই জবাব দিলাম, অকারণে চিংকার করছি না। তোমার ছেলেমেয়েরা আমার দেখছি ধরছাড়া না করে ছাড়বে না। 'অসহ' হয়ে উঠেছে।

জী সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, মিথ্যে চোঁচিয়ে না। রাগ করবার অধিকার শুধু তোমার একলাই নেই। কথা নেই, বার্তা নেই, তেড়ে এসেছ, অথচ ব্যাপারখানা যে কি তা আমি জানিইলাম।

ঘটনাটি সংক্ষেপে জীর কাছে বর্ণনা করে গেলাম। তিনি

হেসে উঠে নিতান্ত সহজ কণ্ঠে বললেন, এই কথা। অবুঝ বলেই করেছে। বুঝতে শিখলে আর করবে না।...

তিনি মুহুর্তকাল থেমে পুনরায় বললেন, আচ্ছা দিনে রাতে কতখানি সময় ওদের নিয়ে তোমায় কাটাতে হয় শুনি যে, 'এইটুকুতেই হৈ চৈ শুরু করেছ। সব ছেলে-পিলেরাই এমন করে থাকে, তা বলে তোমার মত এমন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ডও কোথাও চোখে পড়ে না।

জী একতরফা রায় দিয়ে খালাস। কিন্তু ওদের ছোট-বড় নানা উপদ্রব যে আমায় দিন দিন কতরকমে অতিষ্ঠ করে তুলেছে এ কথাটা তাকে বোঝাব কেমন করে।

একটা ঠাণ্ডা রকমের জবাব দেবার জন্ত প্রস্তুত হতেই পুনশ্চ বাধা পেলাম বেবীর করুণ আর্তিনাদে। জী প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে গেলেন এবং অনতিবিলম্বে আমার পাশে এসে দাঁড়াল অশ্রুকলঙ্কিত মুখে শ্রীমান্ বাপ্পা। চোখে মুখে এক অদ্ভুত অসহায় ভঙ্গী করে সে তার মা এবং দিদির বিরুদ্ধে নালিশ জানালে, বাবা...মা...দিদা...কান্নায় ও ভেঙে পড়েছে। কোলে তুলে নিলাম, কিন্তু কান্নার বেগ তার তাতে আরও সহস্র ধারায় ভেঙে পড়ে।

ওর পিঠে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সান্ত্বনার ছলে বললাম, মা আর দিদি কি করেছে বাপ্পা?...

এ প্রশ্নের উত্তর বাপ্পা দিতে পারে না—শুধু বার বার আমার বুকের মধ্যে মুখ ঘষতে থাকে।

এতক্ষণে জীও এসে উপস্থিত হয়েছেন। একবার অপরাধী পুত্রের প্রতি, আর একবার আমার প্রতি দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তিনি অকস্মাৎ জলে উঠলেন, অতায় ত শুধু আমিই করি কিন্তু এটা হচ্ছে কি শুনি।

বিস্মিত হলাম। অর্থাৎ?...

জী বেবীকে আমার সম্মুখে টেনে এনে তার একখানা হাত চোখের সম্মুখে তুলে ধরে আর একবার গর্জে উঠলেন, চেয়ে দেখ তো কেমন করে দাঁত বসিয়েছে জানোয়ার ছেলে।

দেখেছি...জবাব দিলাম, কিন্তু এর মধ্যে আমাকে টেনে আনা কিসের জন্ত?

জী তেমনি উচ্চ কণ্ঠে বললেন, নয় কেন? আমি যখন শাসন করছি, তুমি প্রশ্ন দেবে কেন?...

এটটা হিসেব করে অবশ্য আমি দেখি নি কিন্তু তার জন্ত অত রাগ করবারও কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পেলাম না। তথাপি একবার বাপ্পাকে ধমক দিতে হ'ল। প্রশ্ন আমি কোনমতেই দিতে পারি না। কিন্তু মন জানে নিজেকে কতবড় ছলনা করলাম।



বাগ্না এতক্ষণে আমার কোল থেকে নেমে পড়েছে। সে বার কয়েক আমার এবং তার মার মুখের পানে চেয়ে দেখলে, তার দিদির দংশিত হাতখানাও একবার আড়চোখে দেখে নিলে। তারপর পায় পায় বেবীর দিকে এগিয়ে গিয়ে তার একখানি হাত ধরে আমাদের দুজির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। বেবীর মুখে যেন ঈষৎ হাসি ফুটে উঠেছে মনে হ'ল।

জী বললেন, শাসন করলে না?

জবাব দিলাম, সে অবকাশ পেলাম কোথায়। যেমন শিক্ষা দিচ্ছ তেমনি তো হবে?

এবারে রাগের পরিবর্তে একটি মধুর কটাক্ষ উপহার দিয়ে তিনি খুশীমনে প্রস্থান করলেন।

বেবী এবং বাগ্নার পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। কিছুক্ষণ পূর্বে মেয়েটাকে তাড়না করেছি—কথাটা ভুলি নি। মনটা সেই থেকেই বিমর্ষ হয়ে আছে। যত অভিযোগই আমার থাক না কেন, ওদের ছেলেমাছুষি যাবে কোথায়। বেবী এসে পিঠ ঘেঁষে দাঁড়াল। আদর করে কাছে ডাকলাম। বাগ্নার তা সহ হ'ল না। বেবীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তার স্থান দখল করে নিলে। অথচ ওদের একজনকে বাদ দিয়ে আর একজনের এক মুহূর্তও চলে না। ছায়ার মত একে অপরকে অহুসরণ করে।

বেবী একটু সরে দাঁড়িয়ে হেসে বললে, জান বাবা, বাগ্নাটা বড় হিংস্রটে হয়েছে। আমার জলের গ্লাস, খাবার থালা, বসবার আসন সব নিয়ে খালি ঝগড়া করবে। ছেলেমাছুষি কিনা বুদ্ধি নেই। কথা বলতে পারে না, আবার নালিশ করা চাই। বলে, মা...দিদা...উম্ম...। বেবী হেসে গড়িয়ে পড়ল। উম্ম কি জান বাবা?

ঘাড় নেড়ে জানালাম, মোটেই নয়—

বাগ্না নিঃশব্দে আমার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। আলোচনাটা যে তারই সম্বন্ধে হচ্ছে সেটা সে বিলক্ষণ অহুমান করে নিয়েছে। ওর চোখমুখের স্নিগ্ধ লাজুক ভঙ্গীটা তা আমার জানিয়ে দিলে।

বেবী পাকা বুড়ীর মত পুনরায় হাতমুখ নেড়ে সুর করলে, উম্ম মানে—দিচ্ছে না। বোকা হাবা ছেলে। এত বড়টি হ'ল এখনও কথা বলতে পারে না। জান বাবা, আমি যখন বাগ্নার চেয়েও ছোট ছিলাম তখন থেকেই সব কথা বলতে শিখেছি। সত্যি কথা বাবা...তুমি মাকে জিজ্ঞেস করে দেখো।

বেবীর মুখে ঐ ফুটতে সুর হয়েছে। বাগ্না না দিলে কতক্ষণে বিরাম ঘটবে তা একমাত্র অন্তর্দামী জানেন। এই ভয়ে ওকে নিয়ে আমি কোথাও যেতে চাই না। মাঝে মাঝে বড় অপ্রস্তুত হতে হয়।

বেবী একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে আমি হেসে বললাম,

জানি বইকি মা, আমিও জানি। তোমার মা আমাকেও বলেছেন।

বেবী মহাখুশী। কিন্তু বাগ্না বোধ করি, আর নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে যুক্তিযুক্ত মনে করলে না। সেও মুখ খুললে। শব্দটার অনাবশ্যক একটা টান দিয়ে দীর্ঘতর করে বাগ্না বললে, বাবা আ...

সে তার কচি হাতে আমার থুতনি স্পর্শ করে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। মুখ ফেরাতেই সে তার নিজের গালে হাত দিয়ে বললে, মা...

বেবী পুনরায় হেসে উঠে বলে, মার নামে নালিশ করা হচ্ছে। গাল টিপে দিয়েছে কিনা। জান বাবা, বাগ্নার একটুও লজ্জা নেই। মা বলছিল আমার হাতে ঘাই করে দিতে আর ও চিমুটি কেটে দিলে। কম হুটু মনে করেছে ওকে।

বাগ্না পুনরায় মুখর হয়ে উঠেছে। এবারে সে তার দিদিকে ইঙ্গিতে দেখাল। ওর ভাষা অক্ষুট বলেই প্রতিবাদটা তেমন সহজবোধ্য হয় না, কিন্তু তাই বলে ওর চেষ্টার কোন ভ্রটি নেই। মনে একটা কৌতূহল দেখা দিলে। দিদির বিরুদ্ধে ওর কিসের নালিশ।

বেবীকে জিজ্ঞেস করি, বাগ্না কি শুধু শুধুই...কথাটা শেষ করবার আমি অবকাশ পেলাম না। পুনরায় জীর আবির্ভাব। আমার মুখের কথাটা এক প্রকার কঁড়ে নিয়ে প্রশ্নের জবাবটা তিনিই দিয়ে দিলেন, তোমার মেয়েটিও কিছু কম যান না। জলের ছিটে প্রথমে ওই দেয়—আঁচড়, কামড়টাও তাই ওরই অদৃষ্টে জোটে।

মার অভিযোগে বেবী সঙ্কচিত হয়ে পড়েছে। বাগ্না আমার পাশ থেকে সরে গিয়ে নির্বিকার মুখে তার মার আঁচল ধরে দাঁড়াল।

জী বললেন, ওদের নিয়ে বসে থাকলেই হবে নাকি? বাজার যেতে হবে না?

হেসে উত্তর দিলাম, তোমার হাতে বুঝি আর নতুন কোন কাজ নেই?

জী জলে উঠলেন, বাজার কথা বলো না। দিনরাত তুমিই ওদের আগলে থাক কিনা? বলতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত ছিল।

লজ্জা বোধ করি সত্যিই আমার নেই, নইলে হাসি মুখে পুনরায় বলি কেমন করে, কথাটা তুমি যে ভাবেই বলে থাক, নেহাত মিথ্যে বল নি। তোমার সংসারের জোয়ার কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে অনেক কিছুই ছাড়তে হয়েছে।

জী রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেললেন। বললেন, এটা একটা খুব দামী কথা নয়। কিন্তু বাজার কথা রেখে সত্যিই এবারে ওঠ। বন্ধুদের খেতে বলেছ সে কথাটাও কি আমার মনে করিয়ে দিতে হবে?

বললাম ভুলব কেন—কিন্তু সে তো ওবেলা।

শ্রী বললেন, তা হলেও বাজারটা এ বেলাই করে রাখতে হবে।

উঠতে হ'ল। এর পরে প্রতিবাদ করা যুথ।

বাজার করে ফিরে আসতে সর্বপ্রথম দেখা হল বেবীর সঙ্গে। ও বোধ করি আমার অপেক্ষায় সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে আসতে দেখে একটু এগিয়ে গিয়ে বললে, ভূমি চলে যেতে একটা ভীষণ ব্যাপার হয়েছে বাবা—বাগ্না—

কথাটা পুরোপুরি না শুনেই অচমকা চমকে উঠলাম। কোন কারণই হয়ত নেই। তথাপি মাঝে মাঝে এমন হয়। অকারণ আশঙ্কায় ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, কি হয়েছে বাগ্নার?

বেবী আমার প্রশ্নে একটু বিব্রত কণ্ঠে বললে, বা রে—বাগ্নার কিছু হয় নি ত।—

আশ্বস্ত হলাম। বুকের ভিতরটা তখনও কেমন করছিল। কিন্তু হাসিমুখে বেবীকে বললাম—তা হ'লে তোমার ভীষণ ব্যাপারখানা কি মা?

বেবীর মুখেও হাসি দেখা দিয়েছে। বললাম, দাঁছর সঙ্গে বাগ্না আজ ঘুষোঘুষি করেছে।

তেমনি হাসিমুখেই জবাব দিলাম, এই মাত্র?

বেবী বলে চলল, আর তোমার টেবিলের উপর উঠে একটা বই থেকে ছুটো ছবি ছিঁড়েছে। আর তোমার ফাউন্টেন পেনটা জানলা দিয়ে একেবারে রাস্তায়—

বাজার করা আমার মাথায় উঠেছে। কালো বাজারে দ্বিগুণ মূল্যে কলমটি আমার কিনতে হয়েছে। শ্রী এসে বেবীকে ধমক দিলেন, একটা মিনিট তোমার সবুর সইল না। একটু থেমে তিনি পুনরায় বললেন, সত্যিই বড় ছরছর হয়েছে ছেলেটা। তবু ভাগ্যি কলমটা জখম হয় নি। আর তোমাকেও বলতে হয়, ছেলেপিলের ঘরে কাজের জিনিষ অমন যেখানে সেখানে ফেলে রাখাই বা কেন?

প্রতিবাদ করলাম না। যে আশার বাগ্নী তিনি শোনালেন এতটা শুনবার ভরসা আমার ছিল না। ঘরে বাইরে স্বাভাবিক জীবন যাপন এমন একটা জটিল সমস্যায় এসে আজ দাঁড়িয়েছে যে ভাল কিছু চিন্তা করতেও যেন ভুলে গেছি। শয়নকক্ষে ফিরে এলাম। বেবীও আমার সঙ্গে এসেছে। বাগ্না তখন নিরুপদ্রবে ঘুমাচ্ছে। নিফলক, শুভ্রহৃদয় একখানি মুখ। দেখে বুঝবার উপায় নেই যে ওর ঐ ক্ষুদ্র মস্তকে এতখানি জটিলবুদ্ধির স্থান আছে। অথচ ওর দৌরায়ে সর্কধা আমাদের জন্য থাকতে হয়।

চেমারটা টেনে নিয়ে বসলাম। লেখাটা যদি আজ শেষ করতে পারি। আগামী কাল সাহিত্য-সভায় একটা গল্প পড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। বেবীকে তাঁর মার কাছে

পাঠিয়ে দিয়ে অসমাপ্ত লেখার খাতাটা নিয়ে বসলাম। লেখাটা বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছিল। সহসা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে বাগ্না পেলাম কাপড়ের একপ্রান্তে যুহু আকর্ষণে। নীরবে চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বাগ্না। দৃষ্টি-বিনিময় হতেই যুহু কণ্ঠে ডাকল। এ ডাকের মাধুর্য্যকে অবহেলা করতে পারি না। হাসিমুখে সাড়া দিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলাম। সপ্তমুখে পড়ে আছে আমার অসমাপ্ত গল্পের খোলা পৃষ্ঠা, কোলের উপর শ্রীমান বাগ্না। এর কোন্টা আজ আমার অধিক প্রিয় এটা এক বিরাট সমস্যা আমার কাছে। অনেক ভেবেছি, সমাধান হয় নি। শুধু নিজের অসহায় অবস্থাটাই আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাগ্না আমার হাতের কলমটির প্রতি একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে আমার বুকে মুখ লুকাল। সম্ভবত কিছুক্ষণ পূর্বের অমুগ্ধিত অপরাধটির কথা তার মনে পড়েছে। যুহু কণ্ঠে ডাকলাম—বাগ্না—

বাগ্না মুখ তুললে না, কিন্তু ততোধিক যুহু কণ্ঠে সাড়া দিলে—উম্—

ওর মাথায় সন্নেহে হাত রাখলাম।

বেবী পুনরায় এসে দেখা দিয়েছে। দূর থেকেই সে হাঁক দিলে, বাবা জলদি চলো। মা তোমায় একুণি ডাকছে।

বাগ্নার প্রতি চোখ পড়তেই সে অল্প প্রসঙ্গে এল। বলল, ইস—বাবার কোলে চড়ে বসা হয়েছে। কলম ফেলে দিয়ে আবার আদর কাড়া হচ্ছে। কম ছুটু ভূমি হও নি বাগ্না।

বাগ্নার কোন্ সাড়াশব্দ নেই। শুধু ওর মুখ ঘষার স্পর্শ বুকের উপর অহুভব করলাম। কিন্তু ওদিকে মনোযোগ দেবার অবসর পেলাম না। বেবী আর এক দফা তাগিদ দিলে।

রাত্রের খাওয়া দাওয়া নিয়েই সম্ভবত কোন আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, নতুবা স্নান-আহারের তাগিদ এটা—কোনটাকেই অবহেলা করা চলে না।

সেদিন আমার ব্যক্তিগত কোন কাজই আর হ'ল না। শ্রী রান্নায় ব্যস্ত আছেন। বেবী, বাগ্নার উপর চোখ রাখার ভার দিয়েছেন আমায়। কিন্তু এই ছরছর কাজের চেয়ে আমাকে রান্নার ভারটা দিলে খুশী হতাম।

শ্রী বললেন, শৈলজীবাবু মাছের পাতুরী বেগী পছন্দ করেন বলছিলে না? আর সঞ্জয় বাবু কচি পাঠার ঝোল? হেসে জবাব দিলাম, খবরটা ভূমি ঠিকই পেয়েছ।

শ্রী পুনশ্চ জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু যোগানন্দ বাবু অথবা পঙ্কজ বাবুর কথা ত কিছু বললে না?

প্রশ্ন করলাম, হঠাৎ এ খবরে তোমার আগ্রহ কেন বল ত?

শ্রী বললেন, বাবা খাবেন তাঁদের রুচি মত ব্যবস্থা করতে চাই। থেয়ে ওরা আনন্দ পেলেই আমাদের তৃপ্তি।

কথাটা তিনি মিথ্যে বলেন নি। বললাম, বোগানন্দ বাবু আর পঙ্কজ বাবু ভাল রাত্রার ভক্ত। তা সে যাই হোক।

আয়োজন স্রীমতী আঙ্ক ভালই করেছেন। ঠুঁরাও খেয়ে খুশী হয়েছেন। খাওয়ার তদারক করছিল বেবী। আরস্ত থেকে শেষ পর্যন্ত সে ঘরের একপাশে ঠায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সকলের খাওয়া নিরীক্ষণ করছিল। শৈলজীবাবু তাঁতের ব্যাঘায় খেতে একটু অস্থবিশা বোধ করছিলেন। বেবীকে তাঁরই সম্বন্ধে বেবী কুতূহলী মনে হ'ল। শঙ্কিত হলাম। হঠাৎ আবার কি প্রশ্ন করে বসে। প্রশ্ন অবশ্য শেষ পর্যন্ত করে নি, কিন্তু সকলের খাওয়ার গতি, স্থিতি এবং ইতি সে বেশ ভাল করেই লক্ষ্য করেছে। টের পেলাম কিছুক্ষণ পরে তার মার কাছে বিশদ বর্ণনা দিতে স্তনে।

বেবী তার মাকে বলছিল, জান মা, ঐ যে খুব লম্বা দেহতে, বেশ মিষ্ট করে আস্তে আস্তে কথা বলেন—ঐ যে মস্তবড় গৌফ ধীর, তিনি মাছের পাতুরী খেলেন সবার শেষে, তিনি আবার একগালে খাছিলেন মা।...

একটু ধেমো খানিক দম নিয়ে পুনরায় বললে, কেঁউ কিছু ফেলে দেয় নি মা। বাবাকে বলে, চমৎকার হয়েছে সব কটি রান্না।

লক্ষ্য করলাম স্রী মূখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বেবীকে ধমক দিতে গিয়েও তাই আত্মসম্বরণ করতে হ'ল আর একখানি আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে।

স্রী বললেন, ভ্রমলোক তাঁতের ব্যাঘায় ভাল করে খেতে পারেন নি—আর একদিন ভাল করে ব্যবস্থা কর।

হেসে জ্বাব দিলাম, এ কি তাদের প্রশংসাপত্রের প্রত্যুত্তর নাকি?

স্রী বললেন, তা যাই তুমি বলনা কেন, মোক্ষা কথা হচ্ছে ঐ যে, খেয়ে ধীর তৃপ্ত হন তাদের খাইয়ে আনন্দ পাওয়া যায়।

ঐ স্পষ্ট স্বীকৃতির পরে আর বলবার কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু আমার পাকা মেয়ে বেবীটাকে নিয়ে আমি কি করি বুঝে উঠতে পারছি না। ওর ঐ তীক্ষ্ণ সমালোচনা এবং বিশদ বর্ণনা সেদিন আমার স্রীতিমত বিব্রত করে তুলেছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা একটা সহজ পরিহাসের রূপ নিয়ে পরিসমাপ্ত হয়েছিল।

আর ছেলেটার কথা? সে আর কত বলব। মোট কথা একটি আস্ত ক্ষুদে শয়তান। কি যে ও বোঝে আর কি যে বোঝে না তা আঙ্কও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। শুধু মাঝে মাঝে ডাক ছেড়ে বলতে ইচ্ছে হয়, আর পারি না, আর পারি না।

জীবনের প্রতিটি ধাপে ওরা যদি এমনি করে বিভ্রাট বাধিয়ে তোলে তা হলে আমি যাই কোথা। আমার স্নান-আহার থেকে আরস্ত করে আপিস যাওয়া পর্যন্ত নিরুপস্থব নিরীক্সে ঘটে ওঠে না। স্নানাহার পর্যন্ত কোন রকমে মানিয়ে নেওয়া চলে কিন্তু কাঁধে করে আপিস নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ঘরে ফিরে এসেও এক মুহূর্ত নিরিবিবি থাকবার উপায় নেই। রাত্তা থেকেই পিছু নেবে। অথচ আমার হুঃখের কথা কাউকে বলবার উপায় নেই। সাহিত্যচর্চা মাধ্যম উঠেছে।

স্রীকে বললে, তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। বলেন, এদের চেয়ে তোমার সাহিত্য-চর্চাটা বড় হ'ল বুঝি? যাই বল, তোমার বিয়ে করা উচিত হয় নি।

কোনটা বড়, আর কোনটা ছোট তার বিচার আমি করছি না। কিন্তু এরই নাম যদি সংসারধর্ম হয় তবে ঐ ধর্মকৃত্য আমার না করাই উচিত ছিল। অষ্টপ্রহর শুধু একই চিন্তায় বেতলা পাক খাছি। এক দিকে স্নেহ, অপর দিকে প্রতিষ্ঠা—হৃদিক থেকে আমাকে নিরন্তর টানছে। জীবনের ধোরতর বিপর্যয়ে আমি দিশেহারা হয়ে গেছি।

সংসারের ঐ বহুমুখী পরিবর্তন, তার সুখ, তার হুঃখ, কলহ-স্রীমাংসা, শিশুর কলহাভ, তাদের দৌরাভ্য এর কোন কিছুকেই উপেক্ষা করা চলে না। বরং এর ব্যতিক্রমটাই অস্বাভাবিক। মাহুঘের মনের এটাই যে গোপন শাস্বত কামনা, জীবনধারণের অপরিহার্য অঙ্গ তা টের পেলাম দিন কয়েক পরে।

আপিস থেকে ফিরে এসে কড়া নাড়তে ভৃত্য দরজা খুলে দিলে। একটু বিশ্রিত হলাম। এ কাজট বেবীই নিয়মিত করে থাকে। কোন দিন কোন কারণেই এর ব্যতিক্রম হয় নি। বুকের মধ্যে কেমন উদ্বেগ বোধ করলাম, অথচ ভরসা করে ভৃত্য-কেষ্টকেও কোন কথা জিজ্ঞেস না করে নিঃশব্দে অএসর হয়ে চললাম। সিঁড়ির মুখেও আর একখানি কচি মুখের সাদর আহ্বান কানে এল না। একটা অদ্ভুত অস্থবৃতি আমার ক্ষণকালের জ্ঞান অচল করে রাখলে। কিন্তু পরক্ষণেই অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে নিজের ঘরে এসে উপস্থিত হলাম। সেখানেও এক অথঃ স্তব্ধতা বিরাজ করছে। বেবী একবার চোখ তুলে আমার প্রতি চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে। কথা বলতেও সে আঙ্ক তুলে গেছে যেন। স্রী বাপ্পার মাধ্যম আইস-ব্যাগ ধরে একাগ্র দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে আছেন। একটি বেলার ব্যবধানে আমার নিজের সংসারকেও আর চিনবার উপায় নেই। সব ওলটপালট হয়ে গেছে। সারাদিন পরিভ্রম করে গৃহে প্রত্যাবর্তনের আনন্দ আমার এক মুহূর্তে বিলীন হয়ে গেল। কোথা থেকে যেন ছুঁনি অদ্ভুত

হাত এসে সবলে আমার কণ্ঠ চেপে ধরেছে। একসঙ্গে অনেক কথা চিন্তা করতে গিয়ে বড় অবসর বোধ করলাম। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কি এমন হতে পারে ছেলেটার। বসে বসে আকাশপাতাল ভাবছি। জী এসে নিঃশব্দে পাশে দাঁড়ালেন। বললেন, একবার ডাক্তারবাবুর কাছে তাড়াতাড়ি যাও। জরটা আবার বেড়ে চলেছে।—আমি প্রশ্ন করতে গেলাম। জী বাধা দিয়ে মুহূর্তে বললেন, ডাক্তারের কাছে শুনে নিও। এখন এক মুহূর্ত নষ্ট করো না। যাও।

উঠে দাঁড়লাম। চোখের সামনে কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকেছে। কোন কথাই ওরা বলছে না। আশঙ্কা তাই আরও ছুর্কার হয়ে উঠেছে।

ডাক্তার এলেন, চলে গেলেন যৌনগভীর মুখে। ব্যবস্থাপত্রের জট করেনি নি অবশ্য। জীর আজ আর এক মূর্তি চোখে পড়ল। মমতাময়ী ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। ঘড়ির কাঁটার তাঁর সজাগ দৃষ্টি।

আমার কিন্তু সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।...কোন কাজেই সাহায্য করতে পারছি নে। মন বলে তাতে কাজের চেয়ে অকাজই করে ফেলব। শুধু অদূরে নিঃশব্দে বসে আছি।

বাগ্না তার দিদির বিরুদ্ধে সারা দিনের অভিযোগগুলি

নিয়ে আমার কাছে এসে উপস্থিত হয় নি। বেসীও তার পাণ্টা জবাব দেবার জন্ত ছুটে আসে নি। মোটের উপর আমাকে ওরা সম্পূর্ণ একলা থাকবার অবকাশ দিয়েছে। কতদিন মনে মনে নিরুপদ্রব একাকিত্ব কামনা করেছি—আমার রচনা-চর্চায় ব্যাধাত করায় তাড়না করেছি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আগাগোড়া নিষ্পেক্ষই আমি ঠিকিয়ে এসেছি, নইলে এই মুহূর্তে ঐ শিশুকণ্ঠের কল-হাস্য, নিঃসঙ্কোচ দোঁরায়া, প্রতি কাজে পায় পায় ঘুরে বেড়ানোকেই আমার সমগ্র সত্তা এমন একান্তভাবে কামনা করছে কেন? অসহ হয়ে উঠেছে এই হিমশীতল স্তব্ধতা। এর মধ্যে প্রাণ কোথায়। বৈচে থাকবার সঙ্কীর্ণনীত্বধা কোথায়।

বাগ্নার মুখের প্রতি একাধ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছি। যদি এই মুহূর্তে একবার চোখ খুলে তাকায়। ওর মুখে যদি তেমনি মিষ্টি এক টুকরো হাসি ফুটে ওঠে, আর সেই সঙ্গে একটি অতিপরিচিত আহ্বান।...

শিশুকণ্ঠের ডাক শুনবার জন্তে অন্তরায়া আমার উল্লুখ হয়ে উঠল। কিন্তু কোন সাদা পেলাম না। শুধু দেয়াল-ঘড়িটা রাত দশটার সঙ্কেত জানালে।

## বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

ক্যানাডা

৮ই জাহুয়ারী বুধবার নিউইয়র্ক ত্যাগ করিব। প্রত্যুষে প্রস্তুত হইয়া নীচে আসিয়া হোটেলের পাওনা চুকাইতেছি এমন সময় ওয়েবষ্টার আসিয়া বলিল, তাহার যাওয়া হইবে না। রাজ্যে তাহাকে যে ঐতিহাসিকের কাজ দিয়াছিলাম তাহা সে স্থায় কক্ষে বসিয়া টাইপ করিয়া ভোক্তাদের পর আমাকে দিয়া গিয়াছিল। তারপর তাহার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। সে বলিল, “আপনাকে কাগজগুলি দিয়া ঘরে ফিরিয়া দেখি টাইপ-রাইটার যন্ত্রটি নাই। ম্যানেজারকে ফোনে জানাইলাম। ম্যানেজার যন্ত্রহস্তে নিষ্করণকারী চোরকে ধরিয়া পুলিশে দিলেন। যন্ত্রটি পুলিশের কাছে আছে। বিচার শেষ হইবার পূর্বে পাওয়া যাইবে না। পুলিশের আদেশে আমাকে অজ্ঞ তাহাদের আপিসে বাঁহিতে হইবে। আমি সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া বৈকালের প্লেনে রওনা হইব।” ওয়েবষ্টার বিমানের নগর-কার্যালয় পর্যন্ত আমার সঙ্গে গেল এবং আমাকে বিমানবাগী-গামী বাসে উঠাইয়া দিয়া হোটেল ফিরিল।

লাগার্ডিয়া বিমানবাগী হইতে সকাল-৯টার বিমান উড়িল। নিউইয়র্ক শহরের উপর দিয়া উড়িয়াছি।

আকাশ হইতে নিউইয়র্ক শহরের একটি বিশেষ রূপ দৃষ্টি হয়। ২৫।৩০ তালি বাড়ীর পঙ্ক্তি। মাঝে মাঝে এক একটি বাড়ী যেন আকাশ ছুঁবার জন্ত সহসা উঠিয়া পড়িয়াছে। শহরকে পিছনে ফেলিয়া দ্রুতবেগে ছুটিয়াছি। পরিষ্কার দিন। সুন্দর রোজ উঠিয়াছে। নীচে দিগন্তবিস্তৃত বরফ রাশি তাপহীন উজ্জ্বল দিবালোকে রক্ত-সিকতার মত জ্বলিতেছে। মাঝে মাঝে হ্রদ। হ্রদের জল বরফ হইয়া গিয়া রূপার মত শোভা পাইতেছে। মাঝে মাঝে হিমকর্ণ-স্তূপ বালিয়াড়ির মত দাঁড়াইয়া রক্তগিরির মত মনোজ্ঞ দেখাইতেছে। আকাশ হইতে দেশের এই অদ্ভুত রূপ বড়ই অপরূপ মনে হইতেছে। কৈলাসবিহারী মহাদেব যেন বিশ্বস্তর মূর্তিতে ধ্যানমগ্ন। আবনি, প্লাটিনবার্গ ও মাসেনা নামক তিনটি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া ছপুরে অটোয়ার বিমান বাগীতে নামিলাম। নিউইয়র্ক হইতে আকাশপথে অটোয়ার দূরত্ব ৩৯৮ মাইল। বিমানবাগী হইতে অটোয়ার

নগরী দশ মাইল। হোটেলের যখন পৌছিয়া তখন একটা পনর মিনিট।

হোটেলটির নাম লর্ড এলগিন হোটেল। এলগিন ষ্ট্রীটের উপর অবস্থিত। নতুন হোটেল। খুব বড়। বন্দোবস্ত সবই মার্কিনী ধরণের। অদূরেই অটোয়া নদীতীরে পার্লামেন্ট ভবন ও তাহার দুই পার্শ্বে সরকারী মূল আপিসগুলি অবস্থিত।

অটোয়া নগরী অটোয়া নদীর দক্ষিণ তীরে। নদীটি কিবিক ও অন্টারিও প্রদেশদ্বয়ের সীমানা নির্দেশ করিতেছে। অটোয়া নগরী অন্টারিও প্রদেশে। নদীর ওপারে হাল নগরী কিবিক প্রদেশে।

নদীতীরবর্তী একটি টিলা বা ছোট পাহাড় নদীগর্ভে খানিকটা আগাইয়া গিয়াছে। এই টিলার উপর পার্লামেন্ট ভবন। তাহার দুই হাতলে দুইটি বড় বড় বাড়ী। এই বাড়ী দুইটির মধ্যে সরকারী মূল আপিসগুলি অবস্থিত। বাড়ী দুইটি ঈশ্বরক ও ওয়েষ্ট রক নামে পরিচিত। টিলাটির উপর হইতে অটোয়া নদীর এবং ওপারের হাল সহরের দৃশ্য পরম মনোজ্ঞ। পার্লামেন্ট ভবনটি সুদৃশ্য, নিপুণ স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। ছাত্তের উপর উঁচুনিচু স্তম্ভের চূড়াশ্রেণী। ঘড়ির চূড়াটি সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

পার্লামেন্ট পাহাড়ের পূর্ব পার্শ্ব দিয়া রিডো ক্যানাল অটোয়া নদী হইতে নির্গত হইয়াছে। খালের মুখে বিরাট লোহ-দরজা। ইহাদ্বারা জলের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। খালটি অটোয়া নগরীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বহুদূরে অন্টারিও হ্রদে মিলিত হইয়াছে।

পার্লামেন্ট ভবনের নিকটে খালের ওপারে রেল-কোম্পানী পরিচালিত বিখ্যাত 'ছাটো লভিয়ে' নামক সুদৃশ্য হোটেল। তাহারই সম্মুখে রেল-স্টেশন।

অটোয়া ছোট শহর। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের সেলস অনুসারে এখানে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৫১ জন লোকের বাস।

সমগ্র ক্যানাডার রাজধানী হিসাবেই এই শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া ইহার বিশেষ গুরুত্ব নাই।

নগরটি মার্কিনী পদ্ধতিতে সমান ও সমান্তরাল পথশ্রেণীদ্বারা পরিশোধিত। কিন্তু রাস্তাগুলির নাম বিলিভী রীতিতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নামানুসারেই হইয়াছে। এখানে ইংরেজী ভাষায় মার্কিনী ইডিয়ম ব্যবহৃত হয়। বানান বিলিভী, কিন্তু উচ্চারণ মার্কিনী। ইহার ট্রামকে ষ্ট্রীটকার, লিফটকে এলিভেটর এবং ফুটপাথকে সাইড ওয়াক বলে। ইহাদের জীবনযাত্রার মান মার্কিনী মান অপেক্ষা কিছু নীচ, কিন্তু প্রণালীটি সম্পূর্ণ মার্কিনী। ইহাদের খাওয়াতালিকা ও রন্ধনপ্রণালী সম্পূর্ণ মার্কিনী। হোটেলের আমেরিকান মতই রকমারি খাওয়া দেখিয়াছি। তবে মূল্য নিয়ন্ত্রিত বলিয়া আমেরিকা অপেক্ষা কম—মাত্র খান

তিন পদে সীমাবদ্ধ। প্রতি পদের পরিমাণ আমেরিকা হইতে কম। ক্ষীর-সংযোগে ভাপে সিদ্ধ বৃহদাকার এক একটি আপেল এখানকার একটি উপাদেয় খাদ্য। কোন কোন ফলের রস এখানে আমেরিকার চেয়েও স্বাদুতর। মাছের স্বাদ বাংলার মাছের মত না হইলেও আমেরিকার মাছ হইতে ভাল বলিয়া মনে হইত।

এখানকার শাসনব্যবস্থা মার্কিন-প্রণালী চলিলেও, শাসন-যন্ত্রের কাঠামো বিলাতী পদ্ধতিতে প্রস্তুত। ইংলণ্ডের রাজার নামে সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। বিলাতী পার্লামেন্টের যাবতীয় নীতি ও পদ্ধতি ইহার নিজেদের পার্লামেন্টে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুকরণ করে। আমেরিকায় দেখিয়াছি ইংলণ্ডের নজির কেহ জানেও না, স্বরণও করে না। এখানে সমস্ত আলোচনায় ইংলণ্ডের নজির প্রথমে উত্থাপিত হয়। বিলাতী সভ্যতার সঙ্গে নিজেদের যোগ রাখিবার জ্ঞান ইহার সর্বদা উদ্বিগ্ন। পাছে ধনী ও শক্তিশালী আমেরিকার চাপে ইহার একেবারে মার্কিন বনিয়া যায় এ ভয় ইহাদের মনে সতত জাগরুক। ইংলণ্ডকে ইহার মুক্তহস্তে সাহায্য করিতে সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু ইংলণ্ডের এতটুকু হস্তক্ষেপও ইহার সহ্য করিবে না।

গত যুদ্ধের পর ক্যানাডার এক নবজাগরণ হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ব্রিটিশ জাতি দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। ক্ষমবর্ধমান ক্যানাডা অদূরভবিষ্যতে সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হইবে ইহা অনেকেই মনে করিতেছে। সেজন্য ক্যানাডা আজ চাহিতেছে স্বতন্ত্র নাগরিক অধিকার, স্বতন্ত্র জাতীয় সঙ্গীত। সাম্রাজ্যের নাগরিকত্ব বজায় রাখিয়াও সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির স্বতন্ত্র নাগরিক অধিকারের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তজ্জন্য লণ্ডনে এক সম্মেলন হইয়া গেল। ক্যানাডার স্বতন্ত্র জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনার জন্ম স্থানীয় পার্লামেন্টে একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে।

প্রতিবেশী আমেরিকার অনতিজরমণীয় প্রভাব, ইংলণ্ডের সভ্যতার প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ এবং নবজাগ্রত আত্মপ্রত্যয় ও স্বাভাবিক বোধ—এই ত্রিধারার সংমিশ্রণ আজ ক্যানাডার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সর্বত্র পরিফুট। ক্যানাডার জীবন-নদী আজ এই তিনটি ধারায় পরিপূর্ণ হইতেছে।

ক্যানাডায় অপর একটি লক্ষণীয় বিষয় ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা এবং কৃষ্টির যুগপৎ সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা। ফরাসী ভাষা ও সংস্কৃতি কিবিক প্রদেশেই সীমাবদ্ধ। সেখানকার সরকারী কার্য ও শিক্ষা ফরাসী ভাষায় চলে। স্থানীয় অধিবাসি-গণের ধর্ম ও ব্যক্তিগত আইন ফরাসী কৃষ্টিতে অনুসরণ করে। অল্প সমস্ত প্রদেশে ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী কৃষ্টি, অনুসৃত



হয়। অটোয়া মিউনিসিপ্যালিটির কাজ চলে ইংরেজী ভাষায়। নদীর ওপারে হাল শহরে মিউনিসিপ্যালিটির কাজ চলে ফরাসী ভাষায়। জাতীয় পার্লামেন্টে উভয় ভাষাই চলে। প্রত্যেকটি আইন ছই ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। পর্যায়ক্রমে ইংরেজী ভাষা-ভাষী ও ফরাসী ভাষাভাষী স্পীকার নির্বাচিত হন। সরকারী দপ্তর দুইতে প্রেসনোটগুলি উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। স্টেনোগ্রাফার বা স্ট্রিক্‌লেখকগণের উভয় ভাষায় দক্ষতা প্রয়োজন। প্রতিযোগিতায় ফরাসী ভাষাভাষিগণ স্পষ্টতঃই পিছাইয়া পড়িতেছেন। কিবেক প্রদেশের বাহিরে তাহাদের কোন প্রভাব নাই।

ওকালতি, ডাক্তারী প্রভৃতি ক্ষেত্রে ফরাসী ভাষাভাষিগণের বিশেষ খ্যাতি থাকিলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজী ভাষাভাষিগণই দ্রুত আগাইয়া যাইতেছেন। কিবেক প্রদেশেও বড় বড় ব্যবসাক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষাভাষিগণেরই অনেক বিষয়ে প্রাধান্য। সেখানকার ফরাসী ভাষাভাষিগণের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজী শেখেন। ফরাসী ভাষাভাষিগণ তাহাদের ভাষা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ। তাহাদের শিক্ষাব্যবস্থা, ধর্ম এবং ব্যক্তিগত আইন বজায় রাখিবার জন্ত তাহারা বিশেষ ব্যগ্র। অনেকের মতে এবিষয়ে অতিব্যগ্রতাই ফরাসী ভাষাভাষিগণের পিছাইয়া পড়িবার কারণ। ফ্রান্সের ফরাসী-গণ সপ্তদশ শতাব্দীর পর দ্রুত আগাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহারা সুদূর ক্যানাডায় আসিলেন তাহারা যে কৃষ্টিকে সন্দে করিয়া আনিলেন তাহাকে এত দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া রহিলেন যে তাহাদের অগ্রগতি অসম্ভব ছইয়া পড়িল।

ক্যানাডা আয়তনে ৩৬,৯০,৪১০ বর্গমাইল; অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রায় আড়াই গুণ। ক্যানাডার জনসংখ্যা ১ কোটি ২১ লক্ষ অর্থাৎ ভারতবর্ষের জনসংখ্যার প্রায় ৪০ ভাগের এক ভাগ। দেশের উত্তরাংশ জনশূন্য বলিলেই হয়। জন-বসতি মার্কিন সীমান্তের কয়েক মাইলের মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ। যেতকায় জাতি আটলান্টিক ছইতে সেন্ট লরেন্স নদী দিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিয়াছে। বিরাট হ্রদমালা অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে বসতি বিস্তার করিয়াছে। উত্তরাংশে এখনও শুধু আদিম অধিবাসিগণের বাস বলিলেই চলে। নয়টি প্রদেশ এবং দুইটি টেরিটরি লইয়া ক্যানাডা দেশ। ইহাদের আয়তন ও জনসংখ্যা এইরূপ :

| প্রদেশ বা টেরি-<br>টরির নাম | ভূমি ভাগের<br>আয়তন<br>(বর্গমাইল) | জনসংখ্যা<br>মাইলে জন-<br>বসতির গাঢ়তা |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপ     | ২,১৮৪                             | ৯৫,০৪৭ ৪৩'৫২                          |
| নোভা স্কটিয়া               | ২০,৭৪৩                            | ৫,৭৭,৯৬২ ২৭'৮৬                        |
| নিউ ব্রান্সউইক              | ২৭,৪৭৩                            | ৪,৫৭,৪০১ ১৬'৬৫                        |

| প্রদেশ বা টেরি-<br>টরির নাম | ভূমি ভাগের<br>আয়তন<br>(বর্গমাইল) | জনসংখ্যা<br>মাইলে জন-<br>বসতির গাঢ়তা |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| কিবেক                       | ৫,২৩,৮৬০                          | ৩৩,৩১,৮৮২ ৬'৩৬                        |
| অক্টেব্রিও                  | ৩,৬৩,২৮২                          | ৩৭,৮৭,৬৫৫ ১০'৪৬                       |
| মনিটোবা                     | ২,১৯,৭২৩                          | ৭,২৯,৭৪৪ ৩'৩২                         |
| সাস কাচেওয়ান               | ২,৩৭,৯৭৫                          | ৮,৯৫,৯৯২ ৩'৭৭                         |
| আলবার্টা                    | ৩,৪৮,৮০০                          | ৭,৯৬,১৬৯ ৩'২০                         |
| ব্রিটিশ কলম্বিয়া           | ৩,৫৯,২৭৯                          | ৮,১৭,৮৬১ ২'২৮                         |
| প্রাদেশিক মোট               | ২০,০৩,৩১৯                         | ১,১৪,৮৯,৭১৩ ৫'৭৪                      |
| ইয়কন টেরিটরি               | ২,০৫,৩৪৬                          | ৪,৯১৪ ০'০২                            |
| উত্তর-পশ্চিম "              | ১২,৫৩,৪৩৮                         | ১২,০২৮ ০'০১                           |
| সমগ্র ক্যানাডা              | ৩৪,৬২,১০৩                         | ১,১৫,০৬,৬৫৫ ৩'৩২                      |

জনসংখ্যার শতকরা ৫৪'৩৪ ভাগ শহরবাসী। ক্যানাডার সর্বাপেক্ষা বড় শহর মন্ট্রিয়লে ৯ লক্ষ লোকের বাস। দ্বিতীয় শহর টুরন্টোতে সাড়ে ৬ লক্ষের কিঞ্চিদধিক লোক বাস করে। ইহাদের পরেই অ্যান্ডারবার শহর। সেখানকার অধিবাসীর সংখ্যা পৌনে তিন লক্ষ। লক্ষাধিক লোকযুক্ত আরও ৫টি শহর আছে; যথা উইনিপেগ, হামিলটন, অটোয়া, কিবেক ও উইগসর। উইনিপেগ মনিটোবা প্রদেশে কিবেক, কিবেক প্রদেশে এবং অপর তিনটি অক্টেব্রিও প্রদেশে অবস্থিত। এই সমস্ত জনসংখ্যা ১৯৪১ সালের সেলস অমুখ্যায়ী। বর্তমানে সবগুলি শহরের জনসংখ্যাই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ক্যানাডায় আদিম অধিবাসিগণ জনসংখ্যার মাত্র ১'২৮ শতাংশ, এশিয়াটিক জাতি ৬৪ শতাংশ। বাকী ইউরোপীয় জাতি। তন্মধ্যে ব্রিটিশ বংশীয়গণের অল্পপাত ৪৯'৬৮ শতাংশ এবং ফরাসী বংশীয়গণের অল্পপাত ৩০'২৭ শতাংশ। ইহার পরেই জার্মান বংশীয়গণের স্থান, ইহাদের অল্পপাত মাত্র ৪'০৪ শতাংশ।

গত যুগে ক্যানাডায় উৎপাদন দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৯ সনে দেশের উৎপাদনের এস মূল্য ও নীট মূল্য যথাক্রমে—৫৬৩,০৪,৭৬,৭৪২ ডলার ও ৩১৪,৯১,৭২,৯১৩ ডলার ছিল। ১৯৪৩-এ উৎপাদনের এস ও নীট মূল্য দাঁড়ায় ১২০২,৩৯,৫২,৫০১ ও ৬৩২, ৫৪,৫৮,৩৩৭ ডলার।

নীট মূল্যের ৩৯'২৩ শতাংশ ছিল কৃষি, বন, মৎস্য, খনিজ প্রভৃতি প্রাথমিক উৎপাদন এবং ৬৭'২৭ শতাংশ ছিল শিল্প প্রভৃতি মাধ্যমিক উৎপাদন। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন প্রদেশের উৎপাদনের নীট মূল্যের অল্পপাত ছিল এইরূপ :—

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| অক্টেব্রিও        | ৪১'৪৫ শতাংশ |
| কিবেক             | ২৯'২২ "     |
| ব্রিটিশ কলম্বিয়া | ৮'৯৩ "      |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| সাস কাচেওয়ান           | ৫২৭ শতাংশ |
| আলবার্টা                | ৫০৮ "     |
| মনিটোবা                 | ৪৫২ "     |
| নোভা স্কটিয়া           | ২৩৭ "     |
| নিউ ব্রাউনউইক           | ২১২ "     |
| প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপ | ০৩২ "     |
| ইয়কন ও উত্তর-পশ্চিম    |           |
| টেরিটরি                 | ০১২ "     |
|                         | ১০০০০     |

ক্যানাডার বহির্বাণিজ্যে তাহার কৃষিজাত, জাতব, বনজ এবং খনিজ দ্রব্যেরই প্রাধান্য। গম, বার্লি ও ওট প্রভৃতি কৃষিজাত বস্তু, মাংস, ডিম, মৎস্য, চিহ্ন ফার ও দুগ্ধ প্রভৃতি জাতব বস্তু; কাঠ, এস্বেষ্টম, কাগজ ও কাগজের পাল্প প্রভৃতি বনজ বস্তু, নিকেল, এলুমিনিয়াম, তামা ও জিঙ্ক প্রভৃতি খনিজ বস্তু প্রভূত পরিমাণে এদেশ হইতে বিদেশে চালান যায়। যুদ্ধের সময় এই সমস্ত বস্তুর বাহিরের চাহিদা খুব বাড়িয়া যায়। অধিকন্তু অনেক যুদ্ধসরঞ্জামের কারখানা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে যুদ্ধকালে ইহাদের রপ্তানি পরিমাণে দ্বিগুণ এবং মূল্যে তিন গুণ বাড়িয়া যায়। আমেরিকার মত ইহাদেরও আমদানী অপেক্ষা রপ্তানি অনেক বেশী। ফলে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধোত্তর কালে ধারে মালসরবরাহ করিবার নানারূপ বন্দোবস্ত ইহা-দিগকে করিতে হইয়াছে।

ইহাদের বহির্বাণিজ্যে আমেরিকার স্থান সর্বোচ্চে। তার পরই ইংলণ্ডের স্থান। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা ইহাদের সমগ্র রপ্তানিদ্রব্যের ৭৫.৮ শতাংশ ক্রয় করিয়াছে এবং ইহার নিজেদের সমগ্র আমদানীর ৩৭.২ শতাংশ আমেরিকার নিকট হইতে পাইয়াছে। ঐ বৎসর ইহার ইংলণ্ডের নিকট হইতে পাইয়াছে নিজেদের সমগ্র আমদানীর ৮.৯ শতাংশ এবং ইংলণ্ডকে সরবরাহ করিয়াছে সমগ্র রপ্তানির ২৯.৯ শতাংশ। ফার, ইণ্ডিয়ান ও অস্কিমো লইয়াই তুয়ারময়, উত্তর ক্যানাডা, দক্ষিণ ক্যানাডার প্রদেশগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়। আটলান্টিক তীরবর্তী অঞ্চল, মধ্য ক্যানাডা, প্রিয়ারী অঞ্চল এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল।

নোভাস্কটিয়া, নিউব্রাউনউইক ও প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপ আটলান্টিকের তীরবর্তী নোভাস্কটিয়া কয়লা, আপেল ও মাছের জন্ম বিখ্যাত। হ্যালিফাক্স ইহার প্রধান বন্দর। নিউব্রাউনউইক বনসম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে অনেক পাল্প তৈরির কারখানা আছে। চাষ ও পশু-পালন ক্ষুদ্র প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপের বড় ব্যবসা। ফারের জন্ম শৃগল পালনের একটি সুবৃহৎ কার্ম এই দ্বীপে অবস্থিত। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে যখন আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করিল তখন আমেরিকার অনেক 'রাজভক্ত' নাগরিক আমেরিকার সংশ্রব ত্যাগ করিয়া নোভাস্কটিয়া ও নিউব্রাউনউইকে বসতি স্থাপন করেন।

সেন্ট লরেন্স উপত্যকার ক্লেবক ও অন্টেরিও প্রদেশ লইয়া মধ্য-ক্যানাডা। শিল্প ও বাণিজ্যে এই দুইটি প্রদেশ সর্বোপেক্ষা অগ্রণী। অন্টেরিওর খনিজসম্পদ প্রসিদ্ধ। মধ্য-ক্যানাডাই পূর্বে ক্যানাডা নামে পরিচিত ছিল। এইখানেই ইংরেজ-ফরাসী প্রতিযোগিতা এক সময় তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। এখান হইতেই ইংরেজী ভাষাভাষিগণ ক্রমশঃ প্রিয়ারি অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। মনিটোবা, সাসকাচেওয়ান ও আলবার্টা লইয়া প্রিয়ারি অঞ্চল। এই অঞ্চলে বিভিন্ন শস্তক্ষেত্রে গম, বার্লি, ওট প্রভৃতি প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। সুপিরিয়র, মিশিগান, হুরন, ইরী ও অন্টেরিও নামে পাঁচটি বিরাট হ্রদ এই অঞ্চলে অবস্থিত। তন্মধ্যে মিশিগান হ্রদটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত। অপর চারটি ক্যানাডায়। হ্রদগুলি পরস্পর সংযুক্ত এবং সেন্ট লরেন্স নদীর সহিত মিলিত। সুপিরিয়রের তীরে পোর্ট আর্থার ও কোট উইলিয়াম নামক বন্দর দুইটি হইতে প্রচুর গম এই হ্রদমালা দিয়া প্রিয়ারিযোগে পূর্বাভিমুখে চালান দেওয়া হয়। এই পথ বৎসরে আট মাস খোলা থাকে। প্রিয়ারি অঞ্চলের দিগন্ত প্রসারী প্রান্তর পর্যায়ক্রমে বরফে ও ফসলে ঢাকা থাকে। এখানে দুঃসহ শীতে বরফে সব একাকার হইয়া যায়। মার্চ মাসে বরফ গলিতে শুরু করে। গ্রীষ্মে সমস্ত প্রান্তর শস্তপূর্ণ হইয়া কৃষককূলের মনের সহিত তাল রাখিয়া আন্দোলিত হইতে থাকে। আগষ্ট মাসে হিমসমাগমের ভয়ে ফসল কাটিয়া জন্ম ঘরে তুলিতে হয়। দাম ভাল থাকিলে শীতের প্রকোপ এড়াইবার জন্ম কৃষকগণ সপরিবারে দক্ষিণে বা পশ্চিমে যাইবার আশা পোষণ করে; নচেৎ তুষারের মধ্যে স্ব-গৃহেই তাহাদিগকে শীতঋতু যাপন করিতে হয়।

আলবার্টা প্রদেশে প্রচুর কয়লা ও পেট্রল উৎপন্ন হয়। আলবার্টায় দুইটি জাতীয় পার্ক আছে। শরৎকালে আমোদ-প্রমোদের জন্ম এখানে বহু জনসমাগম হয়। হরিণ ও ভল্লুক এখানকার জঙ্গলে নির্ভয়ে বিচরণ করে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শতসহস্র হ্রদে মাছ ধরা খুব আনন্দদায়ক। এই প্রদেশেই ক্যানাডীয় 'রকি' বা পর্বতশ্রেণীর আরম্ভ। ইহার সৌন্দর্য্য বিশ্ববিখ্যাত।

ইহার পরেই প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্তী ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশ। এখানকার দীর্ঘ ডগলাস ফার বৃক্ষমালা পরম রমণীয়। রকমারি খনিজ সম্পদে প্রদেশটি সমৃদ্ধ। এখানে শীত দুঃসহ নয়; প্রশান্ত মহাসাগরের স্থানীয় মাছ বেশ সুস্বাদু। অভিজাত সম্প্রদায় বিলাতী আচার-ব্যবহারের সবিশেষ পক্ষপাতী। ব্রিটিশ কলম্বিয়া ক্যানাডার মধ্যে বিলাতী আদর্শ দ্বারা সর্বোপেক্ষা অধিক প্রভাবিত প্রদেশ।

অটোয়া পৌছিয়া মধ্যাহ্নভোজনাগ্নে একটু বাহির হইলাম। তাপ শূন্যের নীচে। বাহিরে যাওয়া রীতিমত হুঙ্কার। রাস্তা জনশূন্য। প্রয়োজন না থাকিলে কেহ বাহির

হয় না। বাহির হইলে দ্রুত ট্রাম বা বাসে গিয়া চড়ে। চারি দিকে শুধু বরফ। নদী, খাল, লেক, পার্ক, রাস্তা, ঘাট, মাঠ সব গভীর বরফে ঢাকা। বৎসরে ১০৮ ইঞ্চি বরফ পড়ে। প্রায় সবটাই ৩৮ মাস ধরিয়া পড়িয়া শেষ হয়। প্রায়ই বরফ পড়িতেছে। শহরের রাস্তা পরিষ্কার রাখা কঠিন। প্রশস্ত রাস্তাগুলির সবটা পরিষ্কার রাখা অসম্ভব। মোটর এবং মাল্‌ম চলিবার মত একটু সরু পথ পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা করা হয়। হাঁটিবার সময় হুঁপাশে উঁচু বরফের স্তূপ। কোথাও হাঁটু সমান, কোথাও বা কাঁধসমান উঁচু। তাপ সাধারণতঃ ১০।১৫ ডিগ্রী পর্যন্ত ওঠে; এবং শূন্যের ১০।১৫ ডিগ্রী নীচে পর্যন্ত নামে। ৩০ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিলেই বরফের বদলে বৃষ্টি পড়ে। এ সময় বৃষ্টি কদাচিৎ হয়। বৃষ্টি হইলে পথঘাট বড় খারাপ হয়। সাধারণতঃ বরফ সাদা ধুলার মত রা উজ্জল বোরিকের গুড়ার মত একদম শুকন। কিন্তু তাহার উপর বৃষ্টির জল পড়িবার জমিয়া শক্ত ও পিচ্ছিল হইয়া যায়। একটা শক্ত ও পালিশ বরফের পাতে সকল স্থান আচ্ছাদিত হইয়া যায়। তাহার উপর দিয়া পা টিপিয়া হাঁটা বেশ বিপজ্জনক। একপ জমার বরফ সাফ করাও কষ্টকর। গুঁড়ি বরফ বৃহদাকার যান্ত্রিক পাখার হাওয়া দিয়া উড়াইয়া লরি বোঝাই করিয়া সরাইয়া ফেলা হয়। কিন্তু জমার বরফ গাঁইতি দিয়া কাটিয়া সরাইতে হয়। ছাদে গাছে বৃষ্টির জল পড়িয়া গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে বরফ হইয়া যায়। গাছপালা যে এত নিঃশব্দ হইতে পারে তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না। শরৎকালে ক্যানাডার পুষ্পপল্লবসমৃদ্ধ তরুরাজির অপার ঐশ্বর্যের কথা শুনিয়াছি ও চিত্রে দেখিয়াছি। কিন্তু এ যে নগ্ন নিঃশব্দ রূক্ষকায় উর্দ্ধবাহ সন্ন্যাসীর দল। সম্পূর্ণ স্পন্দহীন ও নিঃসঙ্গ। অনেক কষ্টে অল্প ভ্রমণ করিয়া ছোট্টেলে ফিরিলাম। সন্ধ্যায় ওয়েবস্টার আসিয়া পৌঁছিল।

পরদিন আমার আগমনবার্তা বিজ্ঞাপন করিয়া সকাল দশটায় অর্থ-বিভাগের ডেপুটি মিনিষ্টার ডাঃ ডব্লু. সি. ক্লার্কের সহিত মিলিত হইলাম। আমাদের পরিভাষায় ইনি অর্থ-বিভাগের সেক্রেটারী। ক্লার্ক তাঁহার দুই জন সহকর্মীর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। এক জন ডাঃ এ. কে, ইটন ট্যাক্স বিষয়ে বিশেষজ্ঞ; অপর জন আর. বি. ব্রাইস বাজেট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডে ক্যানাডার প্রতিনিধি। এই বোর্ডে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি ত্রিযুত সুল্লরেশনের সঙ্গে ইহার বিশেষ পরিচয় আছে। এই দিনই পরে রাজস্ববিভাগের ডেভিড. সি. ও. ভি, সি. নার্ডম্যানের সঙ্গে আলাপ হইল। এখানে অর্থ-বিভাগ কর নির্ধারণ করে; রাজস্ব বিভাগ কর আদায় করে।

ক্যানাডিয়ানগণের সৌহার্দ্য অতুলনীয়। ইহার সাদালাপী এবং বিদেশীকে সর্ববিষয়ে সাহায্য করিতে উন্মুখ। ক্লার্ক

আমাকে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া নিকটবর্তী রিডো ক্লাবে লইয়া গেলেন। এখানে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণ মধ্যাহ্নভোজন উপলক্ষে মিলিত হন। আমরা চারি জনে একসঙ্গে খাইলাম। ক্লার্ক, ইটন, এর্থনিকার জাশনাল হারবার বোর্ডের অধ্যক্ষ বি. জে. রবার্ট এবং আমি। ভোজনান্তে বসিবার ঘরে অনেকের সঙ্গে পরিচিত হইলাম। তন্মধ্যে এক জন সপ্ততিবর্ষীয় বৃদ্ধ। ইনি এদেশের বিমানপথ-উন্নয়নের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; ৩০।৩৫-বৎসর পূর্বের কলিকাতায় বার্ন কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

আমার নিকট কলিকাতার বিরাট হর্ম্যমালা ও উপভোগ্য শীতঋতুর কথা শ্রবণে ক্লার্ক যখন বিশ্বয় প্রকাশ করিতেছিলেন তখন বৃদ্ধ আমাকে সমর্থন করিয়া এবং প্রশংসামান কণ্ঠে কলিকাতা নগরীর বিরাটত্ব এবং সৌন্দর্যের বর্ণনা করিয়া ক্লার্ককে বিশ্বিততর করিয়া তুলিতেছিলেন। রবার্টস আগামী সপ্তাহে ভ্যানকুবার বন্দর পরিদর্শনে যাইবেন। আমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ এবং আমাকে সাহায্য করিবার জন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। তিনি ভোজনান্তে আমাকে পার্লামেন্ট-ভবনে লইয়া গিয়া লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়া স্থানে প্রস্থান করিলেন। লাইব্রেরিয়ান বৃদ্ধ। নাম হার্ভি। পরমোৎসাহে তন্ন তন্ন করিয়া সমগ্র লাইব্রেরি ও পার্লামেন্ট-ভবনটি আমাকে দেখাইলেন ও পার্লামেন্টের সমস্ত রীতিনীতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। নীচে তাঁহার নিজের ঘরে লইয়া গিয়া সেখান হইতে ভূমারায়ত অটোয়া নদী ও ওপারের হাল শহরের রমণীয় দৃশ্য দেখাইলেন। তাঁহার সঙ্গে ঘড়ির চূড়ার উপর গিয়া সেখান হইতে শহরের চারি দিকের সুল্লর রূপ দেখিলাম। অটোয়া নদীর পরপারে দূরে গাতিনো পর্বতমালা। সেখানে শীতে কি খেলার সুব ভাল ব্যবস্থা। তিন-চার হাত লম্বা সরু নৌকাক্রীড়া নীচে-চাকায়ুক্ত স্কি-স্লয়ের উপর পা বাঁধিয়া খেলোয়াড়গণ যখন পর্বতশীর্ষ হইতে ঝাড় মশ্ণ বরফের পথ দিয়া পাহাড়ের গা বাহিয়া ষষ্ঠীয় ৪০।৫০ মাইল বেগে নিম্নে অবতরণ করে তখন দর্শকের গাত্র রোমাক্ষিত হইয়া উঠে। স্কি-খেলার ক্যানাডিয়ানগণের বড় নাম। ইউরোপে সুইজার-ল্যান্ড এবং নরওয়েতেও স্কি-খেলার বিশেষ খ্যাতি।

ঘড়ির চূড়ায় ঘড়ির নীচে একটি ঘরে একখানি বড় বই সুরক্ষিত দেখিলাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যত ক্যানাডাবাসী মারা যায় তাহাদের নাম বইখানিতে সুল্লর হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। রোজ এক পৃষ্ঠা করিয়া উন্টান হয়। কবে কোন্ পৃষ্ঠা উন্টানো হইবে তাহা ঠিক করিয়া দেওয়া আছে। এই পৃষ্ঠায় যাহাদের নাম আছে তাহাদের আত্মীয়গণ সেই দিন আসিয়া লেখা দেখিয়া দেশের জন্ত যত প্রিয়জনকে স্মরণ করেন। বৃদ্ধ গদগদ ভাবে স্ত্রী পিতার কথা বলিলেন। তাঁহার

পিতা ব্রিটিশ আর্মিতে ছিলেন; বহু বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন। গীতার প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। তিন-চার বৎসর আগে প্রায় ২০ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি প্রত্যহ গীতা পড়িয়াছেন। স্বপ্নের নিকট হইতে কয়েকখানা বই লইয়া তাঁহার আত্মরিক-তায় মুগ্ধ হইয়া হোটেলের ফিরিলাম, তখন ঘুর ঘুর করিয়া বরফ পড়িতেছিল—শেফালিকা বৃক্ষ হইতে শরতের প্রভাতে যেমন শেফালি ফুল অবিরত করিয়া পড়ে অনেকটা সেইরূপ। কোটি ও টুপি উপর হইতে মাঝে মাঝে বরফ ঝাড়িতে ঝাড়িতে ভূবারাভীর্ণ পথে পা টিপিয়া টিপিয়া হোটেলের পৌছিলাম।

আমেরিকায় যে হোটেলগুলিতে ছিলাম সেখানে খাবার ঘরে প্রত্যেককে বা প্রত্যেক দলকে আলাদা টেবিলে বসাইয়া দেয়। অল্প লোককে সে টেবিলে বসায় না। কাজেই খাবার টেবিলে অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ হয় নাই। এ হোটেল অপরিচিত লোকের সঙ্গে এক টেবিলে খাইতে হয়। ১১ই জানুয়ারী শনিবার প্রাতরাশের সময় ফ্লোরিডার এক ভ্রমলোকের সঙ্গে আলাপ হইল। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে ইঁহার জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। ইনি বলিলেন, “ভারতের প্রাচীন ইতিহাস কিঞ্চিৎ পড়িয়াছি। আধুনিক ইতিহাস জানি না। আপনাদের সঙ্গে ব্রিটিশের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানিবার খুব ইচ্ছা হয়।”

আমি বলিলাম, “আলেকজান্ডারের সময় হইতেই বিদেশীয়গণ ভারত আক্রমণ করিয়াছে।”

ভ্রমলোকটি বলিলেন, “কিন্তু গ্রীকদের ত আপনাদের দশ বৎসরের মধ্যেই বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তাই নয় কি?”

আমি, “হাঁ, ঐ রূপই হইবে। আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলুকাস ভারতসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের হাতে পরাজিত হন।”

ভ্রমলোকটির প্রশ্ন আমার কাছে বড় নূতন ঠেকিল।

গ্রীকেরা দশ বৎসরের বেশী ভারতে থাকিতে পারিল না, ইংরেজ দেড় শত বৎসর থাকিল কিরূপে? আমরা ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পড়ি তাহাতে এ প্রশ্নও নাই, তার উত্তরও নাই।

এ বরফের রাজ্যে আপদমস্তক আবৃত করিয়া বরফ ঠেলিতে ঠেলিতে পথ চলিতে হয়। বাহির হইলেই মনে হয় কতক্ষণে ঘরে ঢুকিব। গৃহমাঝেই কেন্দ্রীয় তাপ-ব্যবস্থা থাকায় ঘরের মধ্যে বিশেষ অসুবিধা নাই। এই ক্ষেত্রে বড় বড় বাড়ী গরম রাখিতে যে ইঞ্জিন চালাইতে হয় তাহাতে মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ডও ঘটয়া যায়। কাগজে দেখিতেছি আমেরিকার কয়েকটি হোটেলের পর পর আগুন লাগিয়া লোক মারা গেল। তাহা লইয়া সে দেশে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। শিকাগোর যে হোটেল আমি ছিলাম সেই ব্লাক্‌ষ্টোন হোটেলের আগুন লাগিবার সংবাদ পাইলাম।

তবে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। আমার ঘরে বসিয়া বসিয়া এলগিন রোডের ভূবারাবৃত দৃশ্য দেখিতাম। ঘুর ঘুর করিয়া বরফ পড়িতেছে—হাওয়া আপিসের পূর্বাভাসের অভ্রান্ততা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। কখন বরফ পড়িবে বা কখন বৃষ্টি হইবে কাগজে ও রেডিওতে তাহা ঠিক বলিয়া দিতেছে। চারি দিক বরফে একাকার। শরতের অটোমায় পুষ্পপল্লবমণ্ডিত প্রকৃতির রঙের খেলা নাকি অদ্ভুত। কিন্তু হিমাবৃত প্রকৃতির আভরণহীন সর্বশূন্য রূপও অপূর্ণ।

১২ই জানুয়ারী রবিবার ইহাদের আট গ্যালারী ও মিউজিয়ম দেখিতে যাই। আট গ্যালারীতে বেশী ছবি নাই। ইউরোপীয় শিল্পীগণের ছবিই বেশী। জনৈক ক্যানাডিয়ান শিল্পী প্রকৃতির শারদীয় রূপ ও শীতের রূপ একত্র প্রদর্শন করিয়া ছবি আঁকিয়াছেন। চিত্রে বিচিত্র পুষ্পপল্লবশোভিত তরুলতার মস্তকে শুভ্র ভূবার সন্নিবেশ সুন্দর দেখাইতেছে। মিউজিয়মটি ছোট; কিন্তু অতীত যুগের প্রস্তরীভূত গাছ ও জানোয়ারের কঙ্কালগুলি দর্শকের বিষম উৎপাদন করে। গাছ পাথর হইয়া গিয়া স্বকীয় রূপ বজায় রাখিয়া পাহাড়ের মধ্যে কিরূপে অন্তর্নিহিত থাকে তাহা দেখিতে খুব ভাল লাগিল। গাছের গুঁড়ি ঠিকই আছে; কিন্তু পাথর হইয়া গিয়াছে। গাছটি নাকি বিশ কোটি বৎসর পূর্বেরকার। অনেক মাছের কাঁটা রহিয়াছে। সেগুলিও পাথর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আকারের কোন পরিবর্তন হয় নাই। এগুলির বয়স পনের-বিশ কোটি বৎসর।

পূর্বের পৃথিবীতে ডাইনোসার নামে এক জাতীয় অতিকায় সর্পীক্ষপ বাস করিত। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত প্রাণীর স্রষ্টি হইয়াছে তন্মধ্যে উহাই নাকি বৃহত্তম ও হিংস্রতম। অন্ততঃ ৬ কোটি বৎসর হইল ইহা পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। কয়েকটি ডাইনোসারের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল এই মিউজিয়মে আছে। একটি কঙ্কাল লম্বায় ত্রিশ ফুট। এই সব প্রস্তরীভূত মাছ, গাছ ও জানোয়ার ক্যানাডার পাহাড় কাটিয়া পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি আধুনিক জানোয়ারের স্মৃতদেহও এখানে রক্ষিত আছে। উত্তর মেরুর ভলুক বা শিয়াল একদম সাদা ও খুব লোমশ। বড় মহিষগুলি ভীষণ। এক রকম গরু দেখিলাম। নাম কস্তুরী গরু (musk ox), সেগুলি কাটিলে নাকি কস্তুরীর মত সুগন্ধ নির্গত হয়। একটি ঘরে নানা রকমের খনিজ পদার্থ সাজান আছে। একটি বেশ বড় হীরক দেখিলাম।

পরদিন ব্যাঙ্ক অব ক্যানাডায় যাইতে হইল। এটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, সম্পূর্ণ সরকারী। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে অর্থ ও করবিষয়ক সম্পর্ক লইয়া কিছুদিন যাবৎ খুব আলোচনা চলিতেছে। এ বিষয়ে অর্থবিভাগের একটি স্থায়ী শাখা আছে। ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ ক্রীম্‌স্টন এই

শাখার কর্ণধার। আশিষটি ব্যাকের বাড়ীতে অবস্থিত। এই শাখার কার্য দেখিবার জন্মই আমাকে এই বাড়ীতে যাইতে হইত। প্রবেশকালে উপরে যাইয়া আমাকে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিতে হইল। সেখানে আগন্তুকদের অভ্যর্থনার্থে যে দীর্ঘকায় ভদ্রলোকটি উপবিষ্ট ছিলেন তিনি নানারূপ আলাপে আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। তিনি বলিলেন, “আমি ডিউক অব কনটের অল্পতম খাস কর্মচারীরূপে ভারতবর্ষে গিয়াছিলাম। ভারতবর্ষ হৃদয় দেশ। সেখানকার রাজত্ববর্গের আর শিকারের তুলনা হয় না। দিল্লীতে অদ্ভুত জাঁকজমক-পূর্ণ যে নাচ দেখিয়াছি তাহা তুলিবার নয়। বিরাট হল। অল্পম তার সজ্জা। সহস্র স্থির বিদ্যুতালোকে গৃহটি সমুজ্জ্বল। রাজত্ববর্গের পোষাকের শোভা বর্ণনাতীত। রিচিত্র রঙ, অসম্ভব চাকচিক্য, মাধব বহুমূল্য মণিমাণিক্য-খচিত পাগড়ি। আলোক-রশ্মিসম্পাতে সেই মণিমাণিক্যসমূহ অদ্ভুত লাভণ্য বিকীরণ করিতেছে। উপরের ব্যালকনী-হইতে দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইতেছিলাম। মধ্য-প্রদেশের জঙ্গলে যে মহাসমারোহ-পূর্ণ শিকারের আয়োজন হইয়াছিল তাহা সত্যই অপূর্ণ। ঐ যাত্রার আমরা সিদ্ধাপুরেও গিয়াছিলাম। সেখানে আমি খুব বড় একটা সাপ মারি। চামড়াটি এখনও আমার কাছে আছে।”

পরের দিন আমি ব্যাক যাইয়া দেখি ভদ্রলোক সমস্ত-রক্ষিত দীর্ঘ চামড়াটি আমাকে দেখাইবার জন্ম সঙ্গে আনিয়াছেন। ভদ্রলোকটি ভারতবর্ষের সুখ্যাতিতে মুগ্ধ। তাঁহার কাছে রাজত্ববর্গ ও শিকার লইয়াই ভারতবর্ষ।

সেদিন রাত্রে খাবার টেবিলে ছুটি ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। একজন ভ্যানকুবার নিবাসী, ষাটুবিভায় সুপণ্ডিত। অপর জন মার্কিন; বহুদিন ক্যানাডার আটলান্টিক উপকূলে বাস করিয়াছেন। ভদ্রলোকদ্বয় পরস্পর পরিচিত। ক্যানাডিয়ান খনিবিজ্ঞা ও ষাটুবিজ্ঞা সংসদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে প্রথমোক্ত ভদ্রলোকটি অটোয়ার আসিয়াছেন। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি ব্যবসায় উপলক্ষে আগত। প্রথম ভদ্রলোকটি বেশ আলাপী। গান্ধীজীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার মুখে গান্ধীজীর বিপুল প্রভাবের কথা শুনিয়া প্রশ্ন করিলেন, “যন্ত্রশক্তির বিরোধী হইয়া আপনারা কিরূপে উন্নতি করিবেন? যন্ত্রশক্তির ব্যবহার ছাড়া লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা অসম্ভব।”

জবাবে বলিলাম, “যন্ত্রশক্তির প্রতি গান্ধীজীর অবস্থা নিঃসন্দেহ দৃষ্টিভঙ্গী আছে। কিন্তু যন্ত্রশক্তির প্রতি গান্ধীজীর বিরোধিতা দ্বারা তাঁহার মহত্বের পরিমাপ করা চলে না। গান্ধীজী ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার জীবন্ত প্রতীক। সত্য ও অহিংসা তাঁহার নিকট নিঃস্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ, সরল এবং প্রাণদায়ক। সম্পূর্ণ সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে ভারতের মত এত বড় একটি আত্মবিষ্মত জাতিকে তিনি স্বাধীনতা-মন্ত্রে

উদ্বুদ্ধ করিয়া সাফল্যের দারদেশে লইয়া আসিয়াছেন। পৃথিবীতে ইহার তুলনা আছে কি?”

ক্যানাডার তথা অটোয়ার কথা উঠিল। আমি অটোয়ার মিউজিয়মের কথা বলিলাম। এদেশের খনিজ ও বন-সম্পদের বিষয়ে আলোচনা চলিল। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি বলিলেন, “এদেশের বনসম্পদের ধ্বংসসাধনই চলিতেছে। সংরক্ষণের বন্দোবস্ত নাই। এদেশের কৃষিও প্রায় খনির মত। সেখান থেকে সম্পদ তুলিয়া লওয়া হইতেছে। সংরক্ষণের কোন চেষ্টা নাই।” ষাটুবিদ আমাকে ভারতবর্ষের খনির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হু-এক কথাই বলিলাম ভারতের খনি সম্বন্ধে ইনি আমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন। কোথারের খনি-খনি সম্বন্ধে ইনি অনেক কথা বলিলেন। নিজ বিষয়ে ইহার বিশেষ দখল। বলিলেন, “আমাদের খনিজ সম্পদ কিরূপ দ্রুতবেগে ক্ষয় পাইতেছে সেই সম্বন্ধে কাল সংসদে আমি একটি প্রবন্ধ পড়িব। কয়লা, লৌহ প্রভৃতি তো অকুরন্ত নয়। যদি নিঃশেষ হইয়া যায়।”

আমি। “অপব্যয় অবশ্য পরিহার্য। তাই বলিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইবার পক্ষপাতী আমি নই। সব ফুরাইয়া যাইতে পারে এই আশঙ্কা এখনই হাত পা গুটাইবার বা নিষেধের উন্নতি-প্রচেষ্টাকে বাহত করিবার বুদ্ধিকে আমি সুবুদ্ধি বলিব না।” প্রথম। “কিন্তু যে ভাবে ব্যয় চলিতেছে তাহাতে ষাটুগুলি ফুরাইয়া যাইবেই। নূতন খনি আবিষ্কারেরও তো একটা সীমা আছে। আপনি মিউজিয়মে যে বিরাটকার ডাইনোসার দেখিয়াছেন তাহারা তো ষাটুভাবেই লুপ্ত হইয়াছে। আমাদেরও তো অল্পকাল গতি হইতে পারে।”

আমি। বিজ্ঞান আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করিবে কেন? বিজ্ঞান দিবে সাহস। আমরা তো জ্ঞানের সীমানায় পৌঁছাই নাই। কোন কোন বৈজ্ঞানিক অল্প কথিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে এতদিন বাদে সূর্যের আলো ফুরাইয়া যাইবে। তাই বলিয়া কি এখনই নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িব?” প্রথম (সোৎসাহে) — “যখন সূর্যের আলো ফুরাইবে তখন ষাটুবিদগণ ষাটুদ্বারা আলোক সৃষ্টি করিবে।”

আমি। “ইহাই তো বৈজ্ঞানিকের মত কথা? সেইরূপ যত দিনে আপনার কয়লা বা লৌহ ফুরাইবে তত দিনে ‘আগবিক’ শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইলেকট্রনের সজ্জা বদলাইয়া এক বস্তুকে অল্প বস্তুতে রূপান্তরিত করাও সম্ভব হইবে।” আমাদের খাওয়া-অনেকক্ষণ শেষ হইয়া গিয়াছিল, ভদ্রলোকটি বলিলেন, “আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। আজ আমরা পৃথিবীর তিন দিকের তিনটি লোক একত্র আহ্বার করিয়া ও নানাবিধ সদালাপ করিয়া পরম পরিতোষলাভ করিলাম। ভ্যানকুবারে গ্রে পয়েন্টে একটি খনিজ দ্রব্যের মিউজিয়ম আছে। আপনি ভ্যানকুবারে গিয়া সেটি অবশ্য দেখিয়া যাইবেন।”

পরস্পর সম্ভাষণ জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।



# রবীন্দ্র-সঙ্গীত-সার—তৃতীয় শতক

শ্রীহিন্দীরা দেবী চৌধুরাণী

রবীন্দ্র-সঙ্গীত-সারের তৃতীয় শতক এবার কিঞ্চিৎ বিলম্বে তাঁর সঙ্গীতভক্তদের কাছে উপস্থিত করলাম। গত দুই বৎসর তাঁর জন্মদিন উপলক্ষেই এই গীতাঞ্জলি নিবেদন করে এসেছি, কিন্তু এ বছর নানা কারণে “যাবার সুরে আসার সুরে” একাকার হয়ে গেল।

আধুনিক গান সম্বন্ধে আমার অনভিজ্ঞতার কথা পূর্বেই স্বীকার করেছি। তাই সে বিষয়ে গ্রামোফোন রেকর্ডকেই আমার প্রধান অবলম্বন করতে হয়েছে এবং রেকর্ডে ওটা যে জনপ্রিয়তার একটা লক্ষণ, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই; রেকর্ড অনেকটা ভোটের কাজ করে। তবু রবীন্দ্র-সঙ্গীত-ভক্তদের কাছে আবার আমার সেই পুরনো আবেদন জানাচ্ছি, যেন এই তিন শতকের ভিতরে যে সকল শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত তাঁদের মতে ধরা হয় নি, তার একটি তালিকা করে আমাদের পাঠিয়ে অদূর ভবিষ্যতে চতুর্থ শতক সংকলন করবার সাহায্য করেন। শান্তিনিকেতন, শ্রাবণ, ১৩৫৫।

পূজা

- ১। অগ্নিবীণা বাজাও তুমি
- ২। তুমি একলা ঘরে বসে বসে
- ৩। অন্তর মম বিকশিত
- ৪। আমার গোধূলি লগন এলো
- ৫। জয় ভব বিচিত্র আনন্দ
- ৬। তিমির ছায়ার খোঁলো
- ৭। তুমি কেমন করে গান করে
- ৮। তুমি নব নব রূপে
- ৯। তুমি যে সুরের আশুন
- ১০। তোমার নতুন করে
- ১১। তোমার আনন্দ ঐ
- ১২। তোমার সুরের ধারা
- ১৩। দাঁড়িয়ে আছ তুমি
- ১৪। দিনের বেলা বাঁশী তোমার
- ১৫। নয়ন তোমাতে পায় না দেখিতে
- ১৬। প্রভু তোমার বীণা যেমন বাজে
- ১৭। বাজাও তুমি কবি
- ১৮। মধুর তোমার শেষ
- ১৯। মনোমোহন গহন
- ২০। যে তরলধানি ভাসালে
- ২১। যে রাতে মোর ছায়ারগুলি-

- ২২। হবে জয় হবে জয়
- ২৩। হে চিরনুতন
- ২৪। ধীরে বন্ধু ধীরে
- ২৫। সবাই যারে সব দিতেছে
- ২৬। আবার যদি ইচ্ছা কর
- ২৭। গানের ঝরণাতলার
- ২৮। বাহিরে ভুল হানবে যখন
- ২৯। আমি যখন ছিলেম অন্ধ
- ৩০। আমি কান পেতে রই

প্রেম

- ১। আমার একটি কথা বাঁশী জানে
- ২। আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল
- ৩। আমি রূপে তোমায়
- ৪। কী রাগিণী বাজালে
- ৫। কে দিল আবার
- ৬। দিনশেষের রাজা মুহূর্ত
- ৭। দিন পরে যায় দিন
- ৮। বড় বেদনার মত
- ৯। বাজিল কাহার বীণা
- ১০। বিদায় করেছ যারে
- ১১। স্বপনে দৌছে
- ১২। মনে রবে, কিনা রবে
- ১৩। কেন সারাদিন ধীরে ধীরে
- ১৪। আজি দক্ষিণ পবনে
- ১৫। আমি চাছি তে এসেছি
- ১৬। রাতে রাতে আলোর শিখা
- ১৭। একলা বসে হেরো তোমার ছবি
- ১৮। এই উদাসী হাওয়ার
- ১৯। কে আমারে যেন এনেছে
- ২০। নিশীথে কি কয়ে গেল
- ২১। ওগো ডেকো না
- ২২। বনে যদি ফুটল কুসুম
- ২৩। আর নাইরে বেলা
- ২৪। আজি গোধূলি লগনে
- ২৫। লিখন তোমার
- ২৬। আমার প্রাণের মাঝে
- ২৭। স্নেহের ছবি রঞ্জন তুমি
- ২৮। ভালবেসে সখি নিভৃত যতনে

## প্রকৃতি

- ১। আজ বারি বরে
- ২। আজি বড়ের রাতে
- ৩। আশেক ঘুমে
- ৪। আবার এসেছে আঘাট
- ৫। আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ
- ৬। এবার উজাড় করে
- ৭। এসো নীপবনে
- ৮। ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে
- ৯। বরা পাতা গো
- ১০। কে রয় ডুলে
- ১১। নিবিড় অমা তিমির হতে
- ১২। বসন্তে ফুল গাঁথল
- ১৩। বাকি আমি রাখব না
- ১৪। বাদল বাউল
- ১৫। বিশ্ববীণারবে
- ১৬। মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
- ১৭। শান্তন গগনে
- ১৮। এসো গো, ছেলে দিয়ে যাও
- ১৯। কত যে তুমি মনোহর
- ২০। বন্ধু রহো রহো সাথে
- ২১। ফাগুনের সুর হতেই
- ২২। দখিন হাওয়া জাগো
- ২৩। আমার বনে বসে
- ২৪। বসন্ত তার গান
- ২৫। নিশীথ রাতের প্রাণ

২৬। চক্ষে আমার তৃষ্ণা

২৭। আঁধার অন্ধরে

২৮। আজি তোমায় আবার

## স্বদেশ

১। আনন্দধ্বনি জাগাও

২। আমাদের যাত্রা হ'ল সুর

৩। ওরে নূতন যুগের ভোরে

৪। একবার তোরা মা বলিয়া ডাক

## বিবিধ

১। আমার নাই বা হোলো

২। তোমার আসন শূন্য

৩। প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়

৪। ওরে সারধানী পথিক

৫। এই তো ভালো লেগেছিলো

৬। সে কোন্ বনের হরিণ

৭। তারায় তারায় দীপ্ত শিখা

৮। এমনি করে যায় যদি দিন

৯। মাটির প্রদীপখানি

১০। মধুর মধুর ধ্বনি বাজে

|          |     |
|----------|-----|
| পূজা—    | ৩০  |
| প্রেম—   | ২৮  |
| প্রকৃতি— | ২৮  |
| স্বদেশ—  | ৪   |
| বিবিধ—   | ১০  |
| মোট—     | ১০০ |

## রাজা রামমোহন ও বর্তমান ভারত

## স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। নবযুগের সন্ধিক্ষণে, ভারতের ইতিহাসের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে তাঁহার আবির্ভাব ঘটে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মোগল সাম্রাজ্য যখন হির-ভিন্ন, ইসলাম সংস্কৃতি ক্রমশঃ অপস্রিয়মাণ, নব বৈদেশিক শক্তির অভিযানে দিগন্ত সন্তপ্ত, আমাদের মাতৃভূমি বিশৃঙ্খল ঘটনাবর্তে তখন মুহম্মান হুইয়া পড়িয়াছিল। তাই ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহনের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ছিল। রোম্যা রোলা বলেন, এই প্রাচীন মহাদেশে নবযুগের উদ্বোধনকারী রাজা রামমোহন ছিলেন অসাধারণ পুরুষ। বাট বৎসরেরও কম, (১৭৭৪-১৮৩০) অল্প পরিসর

জীবনের মধ্যে তিনি প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মবাদ হইতে নবীন ইউরোপের বিজ্ঞান পর্যন্ত অধিগত করিয়াছিলেন।

হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে রামমোহন এক সম্ভ্রান্ত বনবান, গৌড়া ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ কেহ কেহ, রাংলার নবাবের অধীনে কর্ম করিতেন। তাঁহার পিতামহ নবাব সিরাজউদ্দৌলার অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার পিতামহ কোনও নবাব কর্তৃক 'রায়' উপাধিধারী ভূষিত হন। তদরূপে কোলিক উপাধি বন্দোপাধ্যায়ের স্থলে 'রায়' ব্যবহৃত হইত। রামমোহনের পিতৃকুলের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব, এবং মাতৃকুলের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন গৌড়া শাক্ত। তাঁহার

পিতা পুত্রকে অতি যত্নের সহিত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াছিলেন। মাতা তারিণী দেবীর হুনির্মল পবিত্র চরিত্র রামমোহনও উত্তরাধিকারস্বত্বে লাভ করিয়াছিলেন। স্বগৃহে রামমোহন তৎকালীন রাজভাষা ফারসী শিক্ষা করিতেন। তিনি আরবী ভাষাও অধিগত করেন। উক্ত ভাষায় তিনি ইউক্লিড ও এরিষ্টল হইতে আরম্ভ করিয়া কোরান পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যোল বৎসর বয়সে ফারসী ভাষায় এক পুস্তক লিখিয়া তিনি উহাতে হিন্দু পৌত্তলিকতার অসারতা প্রতিপাদন এবং হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতার সমালোচনা করেন। ইহার ফলে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করেন।

তৎকালীন প্রথা অনুসারে অল্প বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু প্রথমা স্ত্রী লোকান্তরিতা হইলে তিনি পর পর দুই বার দারপরিগ্রহ করেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি ইংরেজী, ফ্রান্স, গ্রীক ও লাতিন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

প্রচুর ধনদম্পদ সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন স্থলে কালেক্টর জন ডিগবীর অধীনে কাজ করেন। অতঃপর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। তদানীন্তন গবর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সহায়তায় তিনি সতীদাহ-প্রথার বিলোপসাধন করিতে সমর্থ হন।

দিল্লীর সম্রাট রামমোহনকে ‘রাজা’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সম্রাট রাজা রামমোহনকে রাজদূতরূপে ইংলণ্ড প্রেরণ করেন। হাউস অফ কমন্সের যে চার্টারে ষ্টেট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসায়-সম্বন্ধ হইতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়—সেই চার্টার প্রণয়ন কালের বিতর্কে যোগদানের জন্তই তথায় গমন করেন।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে রাজা চতুর্থ জর্জের রাজ্যাভিষেক দিবসে রামমোহনকে বৈদেশিক রাজদূতের আসন দান করিয়া সম্মানিত করা হয়। রাজা চতুর্থ উইলিয়মের সভাসদগণের নিকটেও তাঁহার পরিচয় প্রদান করা হয় এবং রাজপুরুষগণ কর্তৃক অতীব সম্মানের সহিত তিনি গৃহীত হন। তিনি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, ব্রিটিশ ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি প্রভৃতি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সম্মানে অভিষিক্ত হন।

ইংলণ্ড যাত্রার পথে রামমোহন দুই-এক ঘণ্টার জন্ত উত্তমাশা অন্তরীপে অবতরণ করেন। জাহাজে ফিরিবার কালে একটি দুর্ঘটনা হয়। জাহাজের সিঁড়িট দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন ছিল না। সেইজন্ত উঠিবার সময় তিনি সিঁড়ি হইতে পড়িয়া যান এবং আঠার মাস তাঁহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হয়। জীবনে আর কখনও তিনি সম্পূর্ণভাবে সারিয়া উঠিতে পারেন নাই—একটু ঝোঁড়া হইয়া যান। বেহাম প্রভৃতি ইংলণ্ডের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার বন্ধু ছিলেন। কলিকাতায় ইতঃপূর্বেই উইলসন, কোলক্ক এবং আরো অজ্ঞাত ইউরোপীয় মনীষীগণ

তাঁহার সহিত সখ্যত্বে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। রামমোহনের ইংরেজী জীবনীকার মিস্ এস. ডি. কোলেটের মতে রামমোহন প্রাচীন ইংলণ্ডের হৃদয় হইতে নবীন ইংলণ্ডের অভ্যুদয় প্রত্যক্ষ করেন। নবীন ইংলণ্ড তাঁহার মধ্য দিয়া নব্য ভারতের সহিত পরিচিতি লাভ করে।

রাজা রামমোহনের ইংলণ্ড-গমনের ফল হইয়াছিল অদূর-প্রসারী। ম্যাক্সমুলারের কথায়, “বিদগ্ধ এবং তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা বিশ্বের মিলনরুত্তি সুসম্পূর্ণ করিবার জন্ত রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্য আগমন করেন। অতঃপর এই রুত্ত হইতে বিদ্যাপ্রবাহের জার প্রাচ্য ভাবধারা প্রতীচ্যে এবং প্রতীচ্যের ভাবধারা প্রাচ্যে গমনাগমন করিতে লাগিল। আমাদের কাছে ইহা পুনরায় সেই সনাতন ভাত্তবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিল। তথাকথিত প্রচলিত ধর্মপদ্ধতির স্থলে ইহা আমাদের কাছে সহজ এবং পবিত্র ভাবধারায় মূতন আশার আলোকে উদ্ভূত করিল। অতীত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ যে-কোন প্রাচীন কাহিনী হইতে ইহা আমাদের কাছে অত্যধিক পরিমাণে সত্যলভের দুঃসাহসিক পথের দিকে চালিত করিল।” স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, “আজিকার ভারতবর্ষে যে এতটুকু জীবন, এতটুকু প্রাণম্পন্দন অনুভব করা যায়, এই ম্পন্দন সেই দিন সঞ্চারিত হইয়াছিল, যেদিন রাজা রামমোহন অজ্ঞাত জাতির সহিত মিলিত হইবার জন্ত ভারতের এই একাকিত্বের গভী অতিক্রম করিয়া সমুদ্রপারে যাত্রা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষকে সাহায্য করিবার জন্ত তিনি নানা ভাবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। আমাদের সমুদ্রে তিনি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন।” রাজা রামমোহন ফ্রান্স পরিদর্শন করিয়াছিলেন। আমেরিকায় যাইবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল। কিন্তু সহসা মস্তিষ্ক-পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলে দেহত্যাগ করেন। ইংলণ্ড-গামী ভারতীয়দের পক্ষে ব্রিষ্টল তীর্থক্ষেত্ররূপ। ব্রিষ্টলের আর্গসভেল সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার একটি স্মৃতি-মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃত সমাধিক্ষেত্র ষ্টেপল্টন গ্রোভ হাউসে।

স্মৃতিফলকে লিখিত নিম্নোক্ত অংশটুকুর মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহনের জীবনী ও কার্য্যাবলী অতি সুন্দর ভাষায় সংক্ষেপে বর্ণিত আছে—“ইহার নীচে আজীবন ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসী এবং বিবেকবান এক ব্যক্তির দেহাবশেষ সংরক্ষিত হইয়াছে। আন্তরিক ভক্তির সহিত তিনি তাঁহার সমগ্রজীবন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সহজাত বিপুল মেধাশক্তির বলে তিনি বহু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন; এবং তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অগ্রতম ছিলেন। সামাজিক, ধর্মনৈতিক এবং ইহলৌকিক দিক দিয়া ভারতের উন্নতিকল্পে সতীদাহপ্রথা এবং পৌত্তলিকতা

নিবারণ করিবার জন্ত, ভগবানের মহিমা প্রচার এবং মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্ত তাঁহার অবিরত চেষ্টার কথা তাঁহার দেশবাসী সর্বদা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছে।\*

দীনবন্ধু সি. এফ. এণ্ড্রু তাঁহার ইংরেজী পুস্তকে† যথার্থই বলিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন তাঁহার সমসাময়িকদিগের অনেক উর্দে অবস্থিত ছিলেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পুনর্মিলনের তিনি ছিলেন প্রথম উদগাতা। রামমোহন বাংলা গণের জনক-স্বরূপ। ভারতবর্ষে তিনিই দেশীয় সংবাদপত্রের অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা। সংবাদপত্রকে তিনি স্বাধীনতার সংরক্ষক রূপে বিশ্বাস করিতেন। তাই যখন সরকারী লাইসেন্স ব্যতীত সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া আইন জারী হইল, তখন রামমোহন সুপ্রীম কোর্টে এই আইনের প্রত্যাখ্যার দাবী করিয়া একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। ব্যাকরণ, ভূগোল, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তকের অত্যন্ত আদি প্রণেতা। ভারতের রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিতও তিনি গভীর ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। প্রধানতঃ রামমোহনের সংস্পর্শে আসিয়াই মেরী কার্ণেটের ভারতে আগমন করতঃ ভারতীয় নারীগণের কল্যাণার্থে আপনার কর্মশক্তি নিয়োজিত করেন।

রামমোহন ছিলেন স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক। তাঁহার বন্ধু ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী উইলিয়ম এডাম তাঁহার এই স্বাধীনতাস্পৃহা সর্বদা বলিয়াছিলেন—“তিনি হয় স্বাধীন হইবেন, নচেৎ কিছুই হইবেন না। শুধু কর্মের স্বাধীনতা নহে, চিন্তার স্বাধীনতা—এই স্বাধীনতাপ্রিয়তা ছিল তাঁহার অন্তরের এক স্নাতক আকাঙ্ক্ষা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্ত এই আন্তরিক কামনা, আপনার মানসিক স্বাধীনতায় অপরের বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এই অসহনীয় মনোভাবের ফলেই অপরের স্বাধীনতা রক্ষার দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমন কি, বাহাদুরের সহিত তাঁহার প্রবল মতভেদ ছিল, তাঁহাদের প্রতিও তাঁহার এইরূপ মনোভাব বিজ্ঞান ছিল। স্বেচ্ছাচারী নৃপতির নিকট হইতে নেপল্‌সের অধিবাসিগণ যখন অত্যাচারিত শাসন-তন্ত্র আদায় করিতে ব্যর্থমনোরথ হইল, আয়ারল্যান্ডের জনসাধারণ যখন ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারে পয়র্দস্ত তখন রামমোহনের সহানুভূতি সর্বদা তাহাদের জন্ত উৎসারিত হইত। ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যে তিনি এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তৎকালে উহা ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করিতে বা আলোচনা করিতে পারিতেন না। স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সংবাদ শ্রবণে তিনি উজ্জ্বলিত হৃদয়ে কলিকাতার টাউনহলে এক ভোজ-সভা আহ্বান করেন। রামমোহন বিশ্বাস করিতেন, অপরাপর

সভ্য জাতির ছায় ভারতবাসীরও উন্নতির সুনিশ্চিত সম্ভাবনা আছে। জাতি হিসাবে এশিয়াবাসীরা যে হীনতর এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। এশিয়াবাসীদের বারীভুলত ভাবধারার ফলে মানবজাতির অধঃপতন হইয়াছে, কোনও খ্রীষ্টান এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। তাহার সহিত তর্কপ্রসঙ্গে রামমোহন স্মরণ করাইয়া দেন যে, খ্রীষ্টধর্মের সকল প্রাচীন সাধু ও মহাপুরুষগণ, এমন কি, স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট পর্যন্ত এশিয়ার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে যুগের প্রধান প্রধান প্রগতিশীল আন্দোলনের মূলে ছিলেন রাজা রামমোহন। তৎকালীন বহু সমস্তা তিনি সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার জীবনের প্রধানতম কৃত্য ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন। তাঁহার জীবনের অসমাপ্ত কার্যভার গ্রহণ করিয়া এক শতাব্দীর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ উহার পূর্ণতাসাধন করেন। ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ছিল গৌড়ামি, কুসংস্কার ও অহুসরণ-প্রযুক্তি হইতে দেশবাসীকে মুক্ত করিয়া উদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা।

ধর্মের দিক দিয়া রামমোহন ছিলেন একেশ্বরবাদী হিন্দু। তথাপি সকল ধর্মের সত্যকে তিনি অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতেন। তাঁহার মত ছিল উদার, সার্বজনীন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী প্রভৃতির ধর্মবিশ্বাস সেই সার্বজনীন বিশ্বাসেরই বিভিন্ন রূপমাত্র। কাউন্ট গবলেট ডি আন্‌ভিয়েলা তাঁহার ইংরেজী পুস্তকে\* বলিয়াছেন, “রামমোহন হিন্দুদের মধ্যে বৈদান্তিক, খ্রীষ্টানদের মধ্যে খ্রীষ্ট বিশ্বাসী এবং মুসলমানদিগের মধ্যে আল্লাবিশ্বাসী হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। এই উদারতা তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের মতই গভীর ও সত্য ছিল। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা ব্রাহ্মসমাজের দান।” অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়ম্ বলেন, “তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞানের আলোচনায় রাজা রামমোহনই ছিলেন সর্বপ্রথম প্রকৃত উৎসাহী অনুসন্ধিৎসু। কিন্তু সকল সিদ্ধির উর্দে ছিল রাজার অসাধারণ ধর্মপ্রেমী ব্যক্তিত্ব। তাঁহার জীবনের মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম।” রোমা রোলা বলেন, “প্রাত্যহিক জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখিয়াই রাজা অধ্যাত্মজীবনের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হইয়াছিলেন। দৈহিক এবং মানসিক গঠনে তিনি রাজকীয় ভাবে মণ্ডিত ছিলেন। রামমোহন ছিলেন একাধারে আদর্শবাদী ও কর্মবীর; বিরাট ব্যক্তিত্বশালী, তেজস্বী অশ্বের ছায় প্রতিভা-সম্পন্ন।”

ডাঃ পটভী সীতারামিয়া তাঁহার ইংরেজী পুস্তকে † লিখিয়াছেন, “ভারতের সর্বপ্রথম জাতীয় জাগরণ রাজা রামমোহনের

\*Contemporary Evolution in Religious Thought by Count Goblett D'Alviella.

†History of Indian National Congress by Dr. Pattavi Sitaramyia.

\*Rise and growth of the Congress by C. F. Andrews.

প্রভাবই হইয়াছিল।” টমসন এবং গ্যারেট তাঁহাদের ইংরেজী-গ্রন্থে\* রাজা রামমোহনকে দুইটি বিদেশী জাতির ( ভারত-বাসী ও ব্রিটিশের ) মিলন সংস্থাপকরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই মিলনের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলন সম্ভাটিত হইয়াছিল। রামমোহনের জীবনচরিত লেখক কোলেট তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বলেন, “ইতিহাসে রামমোহন যেন একটি জীবন্ত সেতু। এই সেতুর উপর দিয়া ভারতবর্ষ তাঁহার অপরিমেয় অতীত হইতে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হইতেছে। প্রাচীন জাতিবিচার ও বর্তমান মানবতাবাদ, কুসংস্কার এবং বিজ্ঞান, ষেচ্ছাচারিতা ও গণতন্ত্র, অচল বিশ্বপ্রথা এবং প্রগতি, বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস ও অস্পষ্ট অথচ পবিত্র সত্য ধর্ম্মানুগ ইহাদের পরস্পরের মধ্যবর্তী ছুঁড় ব্যবধানের উপরে রামমোহন ছিলেন খিলানস্বরূপ। স্বজাতিগণের মধ্যে তিনি ছিলেন মধ্যস্থস্বরূপ। বহুপ্রাচীন সংস্কার ও নবযুগের আলোকপ্রাপ্ত চিন্তাধারার দ্বন্দ্ব তিনি একাকী দুঃসহ সাধনার দ্বারা সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছিলেন।” “বিভিন্ন জাতির বিশ্বাস ও সংস্কৃতির মিলনের ফলে যে নবজাগরণ আসিয়াছিল তিনি ছিলেন তাহার প্রতীক-স্বরূপ। এই নবজাগরণের অমুসন্ধিৎসা, প্রাচীন-সংস্কৃতির প্রতি সমালোচনামূলক অথচ শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি এবং বিপ্লবের প্রতি বিজ্ঞোচিত, এমন কি, ভীকৃতাপ্রণোদিত অনিচ্ছার তিনি ছিলেন প্রতিমূর্তি।” কিন্তু রামমোহনের জীবনে আমরা ভারতে যে অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহা পূর্ণ হইয়াছে। তৎপ্রবর্তিত সমগ্র আন্দোলনের মূল শক্তি ধর্ম্ম। বহুস্থানে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সর্বত্র তাঁহার অন্তরের বিশ্বাস তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে। প্রাচীন হিন্দু চিন্তাধারার পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া নূতন ভাবধারার সিকনে এক নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ প্রতিবেশের মধ্যে তাঁহার জীবন সেই প্রাচীন সংস্কৃতি অবলম্বন করিয়াই পল্লবিত হইয়া

উঠিয়াছিল। “রাজা শুধু একজন পাশ্চাত্যমনা ভারতবাসী অথবা ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত কৃত্রিম হিন্দু ছিলেন না; আধ্যাত্মিক রাজ্যেও তিনি ছিলেন একজন ইউরেশিয়ান। আমরা যদি তাঁহার জীবনধারার ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করি, তবে দেখিতে পাইব যে প্রাচ্য চিন্তাধারা হইতে তাঁহার মানস পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্য দিয়া এমন এক স্থলে গিয়া পৌছিয়াছে, যেখানে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অপেক্ষাও বৃহত্তর ও মহত্তর ভাবধারার সৃষ্টি হইয়াছে। আপনার অন্তর-ধর্ম্মের সহায়তায় সর্বত্র তিনি একা রক্ষা করিয়াছেন এবং একাই তাঁহার প্রগতিবাদী আন্দোলনের মূল শক্তি জোগাইয়াছে। ধর্ম্মই তাঁহাকে সকলের সহিত সংযুক্ত করিয়াছিল, সেই সঙ্গে সংযতও করিয়াছিল এবং তাঁহার আন্দোলনের প্রেরণাও প্রসার সাধন করিয়াছিল।” “রামমোহনের জীবন নব্যভারতের নিকট উৎসাহ ও শিক্ষার উৎসহল এবং আদর্শ-স্বরূপ।”

“ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের ভাগ্যে যাহাই থাকুক না কেন, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই যে, তাহার ভবিষ্যৎ রামমোহনের জীবন ও কার্যাবলীদ্বারা বহুলপরিমাণে প্রভাবিত হইবে। শুধু ভারতের ভবিষ্যৎই নহে, আমরা আজ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অপূর্ণ মিলনতীর্থে দণ্ডায়মান। ইউরোপ এবং এশিয়ার উন্নতিশীল মানবসমাজ পূর্বে প্রায়ই বিবদমান ছিল। উভয়েই আজ ধীরে ধীরে সংযত হইয়া মানবকল্যাণের সাগরে মিলিত হইবার জন্ত একসঙ্গে অগ্রসর হইতেছে। প্রাচ্যের রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক সমস্তাবলীর সম্মুখে সর্বোপেক্ষা গুরুতর আন্তর্জাতিক সমস্তাগুলিও অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়। রাজা রামমোহনের ব্যক্তিত্ব এই অনন্ত সমস্তাগুলির সম্মুখে আরও উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়। ভবিষ্যদ্বক্তা না হইলেও তিনি ভবিষ্যতের অসীম সম্ভাবনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করিয়া গিয়াছেন।”

\* Rise and Fulfilment of British Rule in India by Thompson and Garret.

## ভারতবর্ষীয় মুদ্রানীতি

### ত্রিবিমলাকান্ত সরকার

ভারতের মুদ্রানীতি একটি অভিনব পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই নীতির প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে ইহার মূল তথ্যগুলি জানা দরকার। পৃথিবীর বহুদেশে ‘সোনা’ ও ‘রূপা’ দুই-ই মুদ্রার উপাদান হিসাবে বহুকাল যাবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু রূপার দর ক্রমশঃ কমিতে থাকায় এবং দুইটি ধাতুই মুদ্রারূপে একই সময় ব্যবহৃত হওয়ায় নানা বিভ্রাট প্রকট হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে

সম্রাজ্ঞতের অধিকাংশ দেশেই মুদ্রা-হিসাবে রূপার ব্যবহার স্থগিত করা হইল। ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে রাষ্ট্র চলিয়া যাওয়ার কিছুকাল পর হইতেই (১৮৬৪ খ্রিঃ) মোটের উপর ‘রূপা’ই মুদ্রার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হইত অর্থাৎ ‘টাকা’ই চলতি মুদ্রা ছিল, সোনা নয়। কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা (ইংরেজী গিনি) গবর্ণমেন্টের কাছে দিলে তাহাও লওয়া হইত। তখন ১০ টাকা একটি গিনির মূল্য ধার্য



ছিল। ভারতের সহিত ইংলণ্ডের ব্যবসায়িক আদানপ্রদান ত ছিলই, তত্পরি ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের মাহিনা ইত্যাদি দেওয়ার জন্য মোটা টাকার ব্যবস্থা করিতে হইত। যে কারণে বহু দেশে মুদ্রা হিসাবে ‘রূপা’র প্রচলন বন্ধ করা হইল। সেই কারণে এখানেও তাহার ব্যবহারের অল্পবিধা হইতে লাগিল। ‘রূপা’র যে দরে তখন ১০ টাকায় ১ গিনি দেওয়া যাইত, রূপার দর খুব কমিয়া গেলে ‘টাকা’ হয়ত বিশেষ ভাবে নির্ধারিত ১ গিনির ভগ্নাংশ, ধরা যাক, (১/২০ হলে) হইতে দাঁড়াইয়া যাইত। ভারতের উল্লিখিত দেনা পরিশোধকালে, ভারত হইতে গ্রেট ব্রিটেনে যদি ৩ কোটি স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইতে হইত তাহা হইলে ৩০ কোটি টাকার স্থলে ৬০ কোটি টাকা পাঠান দরকার হইত। সুতরাং সরকারের তরফ হইতে অনেক অতিরিক্ত টাকা ‘বাজেটে’ ধরিতে হইত এবং সেই অনুসারে রাজস্বের বা করস্বল্পির ব্যবস্থা করিতে হইত। ‘রূপা’র দরের এই গোলযোগ কিরূপে নিবারণ করা যায় তাহা স্থির করিবার জন্য ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হার্শেল কমিটি নামে একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়। এই কমিটির নির্ধারণক্রমে মুদ্রার উপাদান হিসাবে ও শিল্পের দৃষ্ট্য হিসাবে ‘রূপা’র মূল্য এক রহিল না। যে দ্রব্য মুদ্রার উপাদান, সাধারণতঃ মুদ্রা হিসাবে এবং শিল্প-জব্যের দৃষ্ট্য হিসাবে তাহার মূল্য এক থাকে আর উক্ত দ্রব্য টাকাকালে লইয়া গেলে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে তাহাকে মুদ্রায় রূপান্তরিত করা হয়। এক্ষেত্রে বলা হইল যে, ভারতে স্বর্ণমনিই প্রচলিত হোক, কিন্তু স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন না হইয়া রূপার টাকাই চালু থাকুক এবং তাহার মূল্য বজায় রাখিবার জন্য বিধিগত ব্যবস্থা করা হোক। এই ব্যবস্থার ফলে দাঁড়াইল এই যে, টাকাকালে কি ‘সোনা’ বা কি ‘রূপা’ লইয়া গেলেই মুদ্রা করিয়া দেওয়ার প্রথা উঠিয়া গেল। ১৫ টাকায় এক গিনি অথবা ১ শিলিং ৪ পেনিতে এক টাকা—এই বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় হার ঠিক করা হইল। ১৮৯৮ খ্রীঃ ফাউলার কমিটি নামে আর একটি কমিটি গঠিত হইল এবং সেটির সুপারিশ অনুসারে ভারতে ঠিক স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত না হইয়া একটু ব্যতিক্রমের স্বষ্টি হইল। বৈদেশিক বিনিময়-হার পূর্বের তায় রহিল (১৫ টাকায় সতরেন)। তাহাদের বিধান অনুসারে টাকাকালে ‘সোনা’র টাকা যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ারী হওয়ার ব্যবস্থা বাতিল হইয়া গেল। স্থির হইল যে, দরকার না হইলে অর্থাৎ গবর্ণমেন্টের হাতে প্রচুর সোনা না আসিলে নুতন করিয়া ‘রূপা’র টাকা তৈয়ারী হইবে না এবং রূপার দর অনুসারে খুশীমত টাকা টাকাকালে তৈয়ারী হইবে না। সতরেন আইনতঃ দাবি মিটাইবার মুদ্রায় পরিগণিত হইল। রূপার স্থলে যদি কেবল কাগজের ‘টাকা’ তৈয়ারী করা হইত এবং তাহার একটি ইচ্ছামত মূল্য স্থির করা হইত তাহা হইলে যেমনটি হইত এই নুতন ব্যবস্থায়ও অনেকটা সেইরূপ

হইল—অর্থাৎ ১ টাকায় ৫ শিলিং অথবা ৬ পেনি পাওয়া যাইবে, ইহা ঠিক করাও কিছু অবৈধ হইত না। ‘রূপা’র টাকার প্রচলন ছিল, সুতরাং কাগজের স্থলে ‘রূপা’ই ‘টাকা’র উপাদান হইল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে টাকার ওজন ১৮০ গ্রেন অথবা ১ তোলা নির্ধারিত আছে, তন্মধ্যে ১৬৫ গ্রেন ষাট রূপা দেওয়া হইত। ‘টাকা’কে ইচ্ছামত মূল্য দেওয়া হইল বটে, কিন্তু ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে ১৬৫ গ্রেন ‘রূপা’র মূল্য ১ শিলিং ৪ পেনি অপেক্ষা বেশী হইবে না। কেননা তাহা হইলে লোকে ‘টাকা’ গলাইয়া ফেলিতে পারিবে। যে সময় ‘টাকা’র মূল্য বাধিয়া দেওয়া হইল সে সময় রূপার মূল্য খুবই কমিয়া গিয়াছিল, এবং পূর্বের নিয়ম অনুসারে ‘রূপা’র টাকার মূল্য ১ শিলিং ২ পেনি (১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে) ছিল। সুতরাং সকল দিক হইতে এরূপ মূল্য নির্ধারণ অসমীচীন মনে করা হইল না। একথা সহজেই বুঝা যাইবে যে এরূপ ব্যবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত ‘রূপা’র দর আউল প্রতি ৪০ পেনি অর্থাৎ ৩ শিলিং ৭ পেনি অপেক্ষা বেশী না হয়, ততক্ষণ কিছু গোলমাল হওয়া সম্ভব নয়—তাহা অপেক্ষা বেশী হইলেই লোকে গলাইয়া বিদেশে রপ্তানী করিতে পারে। এই যে মুদ্রামানট ঠিক করা হইল, ইহাকে স্বর্ণরূপ বা স্বর্ণকল্প মান (Gold Exchange Standard) বলা যাইতে পারে। ইহাতে ‘সোনা’ সাধারণতঃ প্রচলিত মুদ্রা হইল না, কিন্তু মুদ্রার ভিত্তিস্বরূপ হইল। শুধু ‘রূপা’র মূল্য পরিকল্পিত মান হইতে বেশী না হইলেই যে ইহাকে চালু রাখা হইবে তাহা নয়, আরও কতকগুলি ব্যবস্থা প্রযুক্ত হওয়া দরকার। ইহা বুঝিতে হইলে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ধরা যাক, ইংলণ্ডে “ক” দল ভারত হইতে কিছু জিনিষ আমদানী করে এবং “খ” দল কিছু জিনিষ ভারতে রপ্তানী করে। তেমনই ভারতে “গ” দল ইংলণ্ডের “ক” দলকে জিনিষ পাঠায় এবং “ঘ” দল ইংলণ্ড হইতে ভারতে জিনিষ আমদানী করে “খ” দলের মারফতে। “খ” দলকে ভারতে টাকা পাঠাইতে হইবে, সুতরাং তাহারা তাহাদের দাবীর বিল কোনও একচেঞ্জ ব্যাঙ্কের নিকট ভাড়াইতে পারে। এই বিল ভাঙানী ব্যাঙ্কগুলি অত্যাশ কাগজপত্র যথা বিক্রীত জিনিষপত্রের দামের তালিকা, (Invoice) তাহাদের জাহাজে পাঠাইবার রসিদ-পত্রাদি (Bill of lading) দেখিয়া ঠিকমত বুঝিয়া সুদের টাকা

১। ইহার অর্থ এই যে, এক দেশের মুদ্রা ‘সোনা’তে পরিবর্তিত না হইয়া অন্য দেশের মুদ্রাতে পরিবর্তিত করা হইবে। মুদ্রা প্রচলন-ব্যবহার কর্তৃপক্ষ—এক্ষেত্রে ভারতীয় গবর্ণমেন্ট—একটি ভাণ্ডার রাখেন যাহা অন্য দেশটির মুদ্রাতে পরিবর্তিত হইতে পারে এবং উক্ত ভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষ ‘সোনা’ দরকারমত কেনাবেচা না করিয়া পরদেশীয় মুদ্রা কেনাবেচা করেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইহা গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রা—পাউণ্ড ষ্টারলিং।

কাটিয়া “খ”-কে পাওনা টাকা দিয়া দিল এবং অজ্ঞাত দরকারী কাগজপত্রের সহিত বিলগুলি ভারতীয় প্রতিনিধির নিকট পাঠাইয়া দিল। যখনই জিনিষগুলি ভারতে পৌঁছিতে পারে জানা গেল, তখনই খবর পাইবামাত্র টাকা ভারতীয় “ব” দল চুকাইয়া দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে মালের রসিদ ইত্যাদি লইয়া বন্দর হইতে (অথবা ঐ ব্যাঙ্কে মাল ছাড়াইবার ক্ষমতা দেওয়া থাকিলে ব্যাঙ্কের গুদাম হইতে) মাল ছাড়াইয়া লইল। ইহাতে “ব” কে কোনও ‘সোনা’র টাকা ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইল না। পক্ষান্তরে এমনি ভাবে “গ” দলও ভারতে বসিয়াই বিনিময়-ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা পাইতে পারে। বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি এইরূপ ব্যবস্থা সহজেই করিতে পারেন, কারণ যাহা একদলকে দিতে হইতেছে তাহা তাহারা অপর দলের নিকট হইতে লইতেছেন এবং একযোগে “ক” ও “খ” ও অপর দেশে “গ” ও “ব” দলকে নিজের নিজের দেশের টাকার দাম দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন—“খ” দলের নিকট বিল লইয়া ভারতে “ব” দলের নিকট টাকা আদায় হইতেছে এবং “গ” দলের নিকট বিল লইয়া ইংলণ্ডে “ক” দলের নিকট টাকা উত্তুল হইতেছে। যদি আমদানীর পরিমাণ উভয়ক্ষেত্রে রপ্তানীর সমান হয় তাহা হইলে সোনা একেবারেই পাঠাইতে হইবে না, কিন্তু যদি আমদানী ও রপ্তানী সমান না হয় তাহা হইলে এক দেশকে অপর দেশে সোনা পাঠাইতে হইবেই। সুতরাং সোনা পাঠাইবার খরচ বাবদ বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি কিছু পাওনা ধরিয় লইবেন। এই হেতু যদি ১ টাকার বিনিময়-হার ১ শিলিং ৪ পেনি হয় তাহা হইলে ভারত হইতে পণ্ডব্য বেনী রপ্তানী হইলে অর্থাৎ ইংলণ্ড হইতে সোনা পাঠান দরকার হইলে ১ টাকার মূল্য, সোনা পাঠানো খরচ পর্য্যন্ত বেনী হইতে পারে এবং ভারত হইতে সোনা পাঠানো দরকার হইলে ১ টাকার মূল্য, সোনা পাঠানো খরচ পর্য্যন্ত কম হইতে পারিবে, সুতরাং ১ টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ ১/২ পেনি হইতে ১ শিলিং ৩ ১/২ পেনি পর্য্যন্ত কমবেশী হইতে পারে। স্বর্ণরূপ মানে সোনার ব্যবহার যত কম করা যায় তাহার ব্যবস্থা ছিল। ১৮৯৯ সালের কমিটি যদিও ‘সোনা’র টাকশালের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। ১৯১৩ সালে চেম্বারলেন কমিশন ‘সোনা’র পরিমিত ব্যবহারে সম্বন্ধই প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুর্কোল্লিভিত: পুরানো ব্যবস্থা অনুসারে সোনার পরিবর্তে টাকা দিতে গবর্ণমেন্ট সকল সময় বাধ্য ছিলেন, কিন্তু টাকার পরিবর্তে সোনা (বিশেষতঃ স্বদেশীয় বিনিময়-ব্যবহারের জন্ত) দিতে সরকারের তরফে কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না। উক্ত স্বর্ণমান ব্যবস্থায়ুক্ত দেশগুলিতে বিনিময়-হার ঠিক রাখিতে হইলে মুদ্রার পরিবর্তে সোনা লইয়া পাঠানোর যেমন সুবিধা এখানে সে ব্যবস্থা রহিল না। ভারত হইতে ব্রিটেনে রেলওয়ে প্রভৃতি নির্মাণের জন্ত যে টাকা

দেনা করা হইয়াছিল তাহার অর্ধ, ব্রিটিশ অফিসারগণের পেনসন প্রভৃতি বাবদ বাৎসরিক প্রায় ৪৫ কোটি টাকা পাঠান দরকার হইত; সুতরাং সাধারণতঃ যে বিনিময়-হার ঠিক করা হইল দেখা গেল তাহা চালু রাখার জন্ত ভারত হইতে ব্রিটেনে রপ্তানী আমদানী অপেক্ষা বেনী হওয়া দরকার; তাহা যদি না হয় এবং সোনা চাহিদামত পাইবার ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহা হইলে বিনিময়-হার টিকিবে কি করিয়া? বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি হয়ত আগাম দিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে ঐ হার যথেষ্ট কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহার ফলে ১ টাকায় ১২ পেনি হইয়া যাইতে পারিত এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও অচল হইয়া যাইত। সোনারও যথেষ্ট ব্যবহার না হয় অথচ বিনিময়-হার ঠিক থাকে এ উদ্দেশ্যে গবর্ণমেন্ট দরকারের সময় নিয়মিত হারে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্ত সোনা বিক্রয়ের পরিবর্তে (Reverse Council Bill) বিপরীত উপায়ে দাবীর আদায়ী কাগজ বাহাতে বিক্রয় করেন তাহার ব্যবস্থা হইল। ২ যখন রপ্তানী বেনী হয় তখন ব্রিটেনে ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্মসচিব (Secretary of State for India) দাবীর আদায়ী কাগজ (Council Bill) সেখানে বিক্রয় করিবেন এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। পূর্ব উদাহরণ মত “ক” “খ”এর রপ্তানী অপেক্ষা বিলাতে বেনী জিনিষ আমদানী করিল। সুতরাং তাহার দামের জন্ত কাউন্সিল বিল সোনা বা সেখানকার প্রচলিত মুদ্রা দিয়া ক্রয় করিয়া ভারতে “গ”এর নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল এবং “গ” তাহা ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট ভান্সাইয়া টাকা পাইল। কাউন্সিল বিল বাবদ প্রায় ৪৫ কোটি টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া গেলে রাষ্ট্রীয় কর্মসচিব ভারতের দেনা পরিশোধকল্পে তাহা ব্যয় করিতে পারেন। তদপেক্ষা বেনী বিক্রয় করিতে হইলে তাহা ভাবী প্রয়োজনে ব্রিটেনের ভারতীয় স্বর্ণভাণ্ডারে জমা থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। অপর পক্ষে যদি ভারতে “গ”এর রপ্তানী “ব”এর আমদানী অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে ভারত গবর্ণমেন্ট টাকার পরিবর্তে রিভার্স কাউন্সিল বিল বিক্রয় করিবেন এবং “ব” তাহা “খ”এর নিকট পাঠাইয়া দিলে ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্মসচিবের (Secretary of State) নিকট ভান্সাইয়া এট্ট ব্রিটেনে সোনা অর্থাৎ জিনিষের দাম পাইয়া যাইবেন। এই নিমিত্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্মসচিবের তত্ত্বাবধানে একটি স্বর্ণভাণ্ডার স্থাপিত হইল। টাকায় রূপার অংশ এবং দাম মুদ্রার তুলনায় খুব কম থাকায় লাভের অংশ হইতে এবং কাউন্সিল বিল বিক্রয় হইতে এই ভাণ্ডারটির সঞ্চিত হইল। এই ভাণ্ডারটি কেবল নব-প্রবর্তিত মুদ্রাবিনিময় হার ঠিক রাখিবার জন্তই খোলা হইল

২। অস্থবিধা না হইলে সন্তরেন বিক্রয় করিতে পারিবেন ইহাও ব্যবস্থা ছিল।

এবং ইহার সঞ্চিত অর্থ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ব্যয়িত হইত না। কেবলমাত্র একবার ১'৬৫ কোটি টাকা রেলওয়ের জন্য খরচ করা হইয়াছিল। ১৯২২-২৩ সাল হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠিত হওয়া পর্যন্ত ৪০ মিলিয়ন পাউণ্ডের অতিরিক্ত অর্থ গবর্ণমেন্টের রাজস্বের সহিত যুক্ত হইত। তাহা হইলে বুঝা গেল এই স্বর্ণস্বরূপ মানের দুইটি প্রধান আবশ্যক উপাদানে ৩ “টাকার” রূপার মূল্য বিনিময়-মূল্য হইতে বেশী হওয়া চলিবে না; ৪ এবং যেহেতু যথেষ্ট “সোনা” আহরণের ব্যবস্থা নাই সুতরাং সাধারণতঃ ভারতের রপ্তানী বেশী হওয়া দরকার। গবর্ণমেন্টের নিকট বিদেশী মুদ্রা বিক্রয় করিবার যথেষ্ট সামর্থ্য না থাকিলে মুদ্রাবিনিময় হার বজায় রাখা সম্ভব নয়।

১৯১৪ সনের বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রথম সর্বট ভাঙিয়া যায়। তখন রূপার মূল্য এত বেশী হইয়া গেল যে “টাকা”য় রূপা ১ শিলিং ৪ পেনি অপেক্ষা বেশী দামী হইল এবং বিনিময়-হার ৩ শিলিং ৪ পেনি পর্যন্ত বাড়িয়া গেল। ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ তখন প্রভূত পরিমাণে কাউন্সিল বিল বিক্রয় করিতেছিলেন এবং ভারতের রপ্তানীকারীদিগকে টাকা দিবার নিমিত্ত প্রচুর রূপার টাকার ব্যবস্থা আমেরিকা হইতে রূপা আমদানী করাইয়া করিয়াছিলেন এবং বিনিময়-হার বাধ্য হইয়া বাড়াইতেছিলেন। এইকাল ১৯২০ সালে বেবিংটন স্মিথ কমিটি বিনিময়-হার ২ শিলিং ৬ পেনি স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু তুর্ভাগ্যবশতঃ রূপার দাম হঠাৎ কমিয়া গেল এবং সমস্ত ব্যবস্থাও ভঙল হইল। পুনরায় হিলটন ইয়ং কমিশন নিযুক্ত হইল, ১৯২৬ সনে উক্ত কমিশনের মতামত প্রকাশিত হইল। ইহার পূর্বে যে মুদ্রামান ছিল তদনুসারে ভারতের মুদ্রাকে গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রাতে যথেষ্ট পরিবর্তনের ব্যবস্থা ছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে ভারতের রাষ্ট্রীয় সচিবের স্বর্ণভাণ্ডার অধিকাংশই কোম্পানীর বা গবর্ণমেন্টের কাগজে লগ্নী করা ছিল। দরকার হইলে ইহা ভাঙ্গানোর অল্পবিধা ছিল না। নূতন কমিশন গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রার সহিত সম্বন্ধ ঠিক রাখিলেন না অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রার পরিবর্তে গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রা দিবার যে রীতি চালু ছিল তাহা বজায় না রাখিয়া নব মুদ্রানীতির প্রবর্তন করিলেন। তদনুযায়ী নির্ধারিত হইল যে, ভারতীয় মুদ্রামান স্বর্ণমানই, কিন্তু প্রচলিত মুদ্রা টাকাই থাকিবে। ঐ টাকাটা রূপায় না হইয়া যদি কাগজের হয় তাহা হইলে, যেমন গ্রেট ব্রিটেনে স্বর্ণমান থাকা সত্ত্বেও “পাউণ্ডের” নোট আছে—তেমনি “টাকা”কে ৮-৪৭ গ্রেন “সোনা” ধরা হইলে ১৩৩৭ টাকায় এক পাউণ্ড (£) হইবে। ইহার ফলে পূর্বোক্ত অল্পবিধাসমূহ আর রহিল

না অর্থাৎ অজ্ঞাত দেশের ছায়, দরকার হইলে টাকার পরিবর্তে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে সোনা কিনিবার ব্যবস্থা হইল—তবে স্থির হইল যে তাহা সাধারণতঃ ৪০০ আউন্স অপেক্ষা কম হইবে না। এই ব্যবস্থা অনুসারে গ্রেট ব্রিটেনের সহিত বিনিময়-হার ১ টাকায় ১ শিলিং ৬ পেনি নির্ধারিত হইল। গবর্ণমেন্ট ১৯২৭ সনের মুদ্রাবিসয়ক আইনে এই নির্দেশ অনুযায়ীই ব্যবস্থা করিলেন, তবে ক্ষেত্রবিশেষে সোনার পরিবর্তে অজ্ঞাত দেশীয় মুদ্রা বিক্রয়-ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হইল। কার্যতঃ কিন্তু ইহা বেশী দিন বলবৎ রহিল না, কারণ ১৯৩১ সনে গ্রেট ব্রিটেনে স্বর্ণমান উঠিয়া গিয়া বিধিবদ্ধ মুদ্রামান প্রবর্তিত হইল। অপর পক্ষে ভারতের সহিত ব্রিটেনের পূর্বোল্লিখিত মুদ্রা ইত্যাদি দেয় টাকা লইয়া একটি অর্থনৈতিক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল বলিয়া কেবল “সোনা” না দিয়া ঐ দেশের মুদ্রা দেওয়াই বেশী সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হইল, কেননা সে দেশের মুদ্রার মূল্য তখন কমিয়া গিয়াছে এবং “সোনা” দিয়া দেনা শোধ করিতে গেলে ভারতের অনর্থক ক্ষতি হইত। এই সমস্ত কারণে ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্বের স্থায় ১ শিলিং ৬ পেনি হারই বহাল রাখিয়া গ্রেট ব্রিটেনের ঠালিঙের সহিত ভারতীয় মুদ্রার সম্বন্ধ স্থাপিত হইল এবং তাহা আইনতঃ বলবৎ হইল।

এখন পর্যন্ত মোটের উপর এই ব্যবস্থাই চালু আছে, কেবল দুই-একটি নূতন বিধি প্রবর্তিত হইয়াছে। ১৯৩৪ সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই দ্বারা গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রা কেনাবেচার ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর বর্তিয়াছে। ভারতেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের “টাকা”র পরিবর্তে “ঠালিং” বিক্রয় এবং ঠালিঙের পরিবর্তে “টাকা” বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। কাউন্সিল বিল বা রিজার্ভ কাউন্সিল বিক্রয়ের প্রথা উঠিয়া গিয়াছে এবং বিক্রীত মুদ্রা সঙ্গে সঙ্গেই লণ্ডনে “বিলি” করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্বর্ণভাণ্ডার এবং তাহার সহিত অজ্ঞাত ভাণ্ডার রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরই অধীন হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দুইটি বিভাগ আছে—একটি ব্যাঙ্কিং বিভাগ ও অপরটি “নোট” প্রচলন বিভাগ। ব্যাঙ্কিং বিভাগই বিদেশী মুদ্রা কেনাবেচার ভার লইয়াছে এবং দরকার হইলে নিয়োক্ত তিন রকমের ভাণ্ডার হইতে টাকা সরবরাহের বন্দোবস্ত করিতে পারে।

(১) বিদেশে লগ্নী করা ঠালিং—ইহা গ্রেট ব্রিটেনেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে লগ্নীকৃত থাকে; (২) ইহা অগ্রচুর হইলে “নোট” প্রচলন বিভাগ হইতে “সোনা” বা ব্রিটেনের মুদ্রার লগ্নী করা কাগজ আগাম লইতে পারে; (৩) তাহাতেও সঙ্কলান না হইলে বিলাতের মুদ্রার ঋণ ভুলিতে পারে।

৫। ঠালিং (অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনের চলিত মুদ্রা বাহা এখনও বিধিবদ্ধ মুদ্রামাত্রই আছে) বিক্রয় করার দর সব চেয়ে কম ১ শিলিং ৫৬ পেনি টাকা প্রতি এবং “টাকা” বিক্রয় দর সব চেয়ে বেশী ১ শিলিং ৬ পেনি টাকা প্রতি।

৩। অধিকাংশই, আর উৎপাদনকারী কাগজে লগ্নীকৃত থাকিত।

৪। ১৯১৮ সালের Pittman Act অনুসারে ২০ মিলিয়ন আউন্স রৌপ্য বিক্রয় করিয়াছিল।

ইতিপূর্বে টাকায় যে ‘রূপা’ থাকিত ১৯৪০ সনে তাহা আরও কমাইয়া দিয়া অর্ধেক রূপা ও অর্ধেক খাদ (২ তোলা বা ৯০ গ্রেন প্রত্যেক অংশে) করা হইয়াছিল। কিছুকাল হইল “টাকা” যে একেবারেই রূপাবিবাক্ত হইয়াছে এ কথা সকলেই জানা আছে। যে কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুদ্রামান ভাঙ্গিয়া যায় এখন সে অবতনের আশঙ্কা আর রহিল না।

গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রার সহিত এইরূপ ভারতের “টাকা”র সম্বন্ধ অনেকের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ দেশীয় বাণিজ্যের তুলনায় অনেক কম, সুতরাং বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সর্ববিধ মুদ্রানীতিই অন্য দেশের মুদ্রানীতির সহিত জড়িত থাকার্তা যে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর এ ধারণা অনেকের মনে বরমূল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর—গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রা-ক্ষতি অপেক্ষা ভারতের মুদ্রা-ক্ষতি অনেক বেশী হইয়াছিল, সুতরাং মোটামুটি হিসাবে এখানকার মুদ্রামূল্য অপেক্ষাকৃত কম হওয়াই ছিল সম্ভব। কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে মুদ্রার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনিতে আবদ্ধ থাকায় তাহা আশামুখ্যারী হ্রাস প্রাপ্ত হইল না। এই নূতন ব্যবস্থায় যাহারা আশ্বাসিত হইতে পারেন নাই, তাহাদের মত এই যে, মুদ্রার মূল্য যদি একান্তই বাঁধিয়া দিতে হয় তাহা চিরকালের জন্য না করিয়া কিছু দিন অন্তর অন্তর তথ্যানুসন্ধান পূর্বক যাহাতে অবস্থা-মুখ্যারী ব্যবস্থা করা যায় সেই দিকে অবস্থিত হওয়া উচিত।

যাহা উক্ত, ভারতও আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডারের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ায় কতগুলি নূতন নিয়মের অধীন হইয়াছে। ভারতকে ঐ ভাণ্ডারে ৪০০ মিলিয়ন ডলার রাখিতে হইয়াছে। ঐ ভাণ্ডারের নিয়ম অনুসারে সদন্ত শ্রেণীভুক্ত দেশসমূহের স্ব-স্ব মুদ্রা থাকা দরকার—সুতরাং এই ব্যবস্থার দরুন ভারতের

মুদ্রাও গ্রেট ব্রিটেনের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিল না—এই নীতি অনুসারে ১৯৩৪ সনের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক্টের ৪০ ও ৪১ ধারা ১৯৪৭ সনে বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। “টাকা”র মূল্য ১৯২৭ সনের মুদ্রাবিষয়ক আইনের ভায়ে “সোনা”র নির্দিষ্ট ওজনের মূল্যের সমান ধরা হইবে এবং তদনুসারে অল্প দেশের মুদ্রার সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকিবে। “টাকা” পূর্বের ভায়ে চলিত মুদ্রাই রহিল, সুতরাং ভারতের পক্ষে আমদানী রপ্তানী করা অপেক্ষা পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে গবর্ণ-মেণ্টের মারফতে বা অল্প লম্বীকরা “কাগজ”পত্রের দ্বারা সোনা কেনাবেচাই সুবিধানক। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারে এইরূপ নানা দেশের কাগজাদি কিনিয়া রাখার ব্যবস্থাও আছে। আগে-রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রা ষ্টালিং (প্রতিবার ম্যুনাধিক ১০ হাজার পাউণ্ড মূল্যের) কেনাবেচা করিতে পারিত; এখন তাহার যে কোনও দেশের মুদ্রা ম্যুনা-ধিক ২ লক্ষ টাকা মূল্যের, ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষমতা রহিল। ইহাতে যদিও আইনের দিক দিয়া কিছু প্রভেদ হইল এবং ভারতের নিজস্ব মুদ্রাও হইল, তথাপি কার্যতঃ বিশেষ তফাৎ হওয়ার সম্ভাবনা কিছুকালের জন্য কম, কারণ গ্রেট ব্রিটেনে ভারতের যে “ষ্টালিং” মজুত আছে তাহা দ্বারা সে অত্যন্ত দেশের মুদ্রা কিনিবার অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত তাহার পক্ষে নূতন করিয়া অল্প দেশের মুদ্রা কিনিবার ক্ষমতালভের বিশেষ সম্ভাবনা নাই। এই ব্যবস্থায় পূর্বোপেক্ষা একটু পৃথক দরে গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রা কেনাবেচা হইবে—সর্বোচ্চ মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি ও সর্বনিম্ন মূল্য ১ শিলিং ৫ পেনি। বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত গবর্ণমেণ্টের বিধি-নির্দেশের ক্ষমতা থাকিবে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

৬। হিষ্টন ইয়ং কমিশনের সুপারিশ ক্রমে ১৯২৭ সনের আইন ও ১৯৩১ সনের গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে।

৭। আমেরিকার এক ডলার সমান এখন ১৫.২৩ গ্রেন থাকে। ৩৩.৮৫২ ‘রুপি’; ডলার ২৫.৮ গ্রেন ‘সোনা’ থাকিত।

## তারা ও আমরা

### ক্রীলরতন দাশ

যুগে যুগে যারা করিল মোদের মুক্তির সন্ধান,  
মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত তারা বিজোহী সন্ধান।  
সাবধানী মোরা সন্ডয়ে যখন প্রচারি শান্তিবাদ,  
অগ্নিমন্ত্রে তাহারা তখন নির্ভীক উদ্ভাদ,  
মোরা যবে খুঁজি আরামশয্যা, নিরাপদ গৃহকোণ,  
শান্তির নীড় স্নেহের কুটির পিতামাতা ভাইবোন,—  
তাহারা তখন ছাড়িয়া স্বজন পথে পথে বাঁধে বর,  
দুর্গম পথে দুর্ঘোষ সাথে চলে যে নিরন্তর।  
আমরা যখন মুক্ত আলোতে বিলাসে আশ্রয়, তাহারা তখন করে যে বরণ অন্ধকারের কার।  
আমরা আরামে ভোগের পাত্র ভরি নানা উপচারে,  
তিলে তিলে প্রাণ তারা করে দান অনাহারে কারাগারে।

মোরা যবে পরি দাসত্ব-বেড়ী, তারা ভাঙে শৃঙ্খল;  
রুদ্ধদ্বারে থাকি যবে মোরা; তারা খোলে অগল।  
মোদের মুক্তি-পাত্রখানিকে ভরে দিতে সুধা-ধারে  
সকল রকমে রিক্ত যে তারা করে দেয় আপনারে।  
মোদের আকাশে দেখিবার আশে নূতন সূর্য-ভাতি  
জাগিয়া তাহারা কাটায় যে কত অমাবসার রাত।  
আমাদের লাগি সোনার ফসল ফলাইতে তারা হায়,  
বক্ষণোপিতে সিন্ধু করে যে উষর মুক্তিকায়।

আমাদের গৃহে জ্বলেছে দীপালি, টুটয়াছে বন্ধন;  
অগ্নিসাধক তারা সে আলোর জোগায়েছে ইন্ধন।  
মোদের ভাগ্য-আকাশে আজিকে নূতন সূর্যোদয়,  
যারা এনে দিল আলোর জোয়ার, গাছি তাহাদের জয়।

## বাংলার শিশু-সাহিত্য

ক্রীতনীগোপাল চক্রবর্তী

এখানকার ছেলেমেয়েরা একবার তাহাদের সাহিত্যসাধায় একজন প্রসিদ্ধ শিশু-সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া-ছিল। তিনি ছিলেন তাহাদের সভাপতি। সভা ভঙ্গের পর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন : উনি কে ? উত্তর দেওয়া হইল : উনি প্রসিদ্ধ শিশু-সাহিত্যিক ক্রীতনী। প্রশ্নকর্তা একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন : শিশু-সাহিত্যিক !

চূলে ত পাক ধরেছে দেখছি, কিন্তু এখনও ওর শিশুত্ব মুচল না। কেবল ওই প্রশ্নকর্তাই নয়, আমাদের দেশের অনেকেরই ধারণা,—শিশু-সাহিত্যিকরাই ক্রমে হাত পাকিলে বড়দের সাহিত্যিক হয়। শিশু-সাহিত্যিকরা রূপার পাত্র, কারণ তাঁহারা শিশুদের জ্ঞান নগণ্য রূপকথা, কবিতা, গল্প—এই সব লেখেন। তাঁহারা যাঁহা লেখেন, তাহাতে খুব পড়াশুনা বা বীশজির প্রয়োজন হয় না ; এক কথায় তাঁহারা বড়দের জ্ঞান লিখিতে না পারিয়াই শিশুদের লেখক হন।

কিন্তু শিশু-সাহিত্য নারিকেলের মত নয় যে, কচিতে উঠা ডাব এবং পরে উঠা খুমায় পরিণত হইবে। শিশু-সাহিত্য চিরকাল শিশু-সাহিত্যই থাকে—উঠা বড়দেরও পাঠ্য হইতে পারে, তবে তাহা ক্রমোন্নতির ফল নয়। প্রকৃত শিশু-সাহিত্য লেখা কৃত্তিকের পরিচয়। শিশুর মন জানিতে না পারিলে কখনও শিশু-সাহিত্যিক হওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের মন ছিল চিরতরুণ, চিরনন্দন, তাই তিনি বৃদ্ধ বয়সেও শিশুদের জ্ঞান সাহিত্য রচনা করিতে পারিয়া-ছিলেন।

শিশু-সাহিত্য যাঁহারা সৃষ্টি করেন, তাঁহারা বড়দের জ্ঞানও যে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিবেন না এমন কোন কথা নাই ; পক্ষান্তরে বড়দের সাহিত্যিক হইলেই যে তিনি অতি সহজে শিশুদের জ্ঞান লিখিতে পারিবেন ইহা মনে করা ভুল।

শিশু-সাহিত্য ও শিশু-সাহিত্যিকদিগের সম্বন্ধে আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত লোকেরও ধারণা সুস্পষ্ট নয়। ইহা অতীব ছুঁৎখের বিষয়।

শিশুই জ্ঞাতির ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যৎ পুরুষের জ্ঞান যাঁহারা সাহিত্য রচনা করেন, তাঁহাদের দায়িত্ব বড়দের সাহিত্য স্রষ্টার দায়িত্ব হইতেও গুরুতর। এইজন্ত ইঁহারা বরণ্য।

শিশুকালে জীবনের আদর্শ, ভাবধারা ও চিন্তা পদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত না করিলে ভাবীরংশীয়েরা দেশকে অবনতির পথেই টানিয়া লইবে। শৈশবে ও বাল্যে প্রতি খণ্ডায় মানবশিশু যাঁহা শিখে, প্রাপ্তবয়স্ক কেহ পূর্ব বয়সেরও তাহা শিখেন না। শৈশবের পেলব মনের বেলাছুমিতে যে চরণ-চিহ্ন পড়ে,

কালের স্তরচাপে ক্রমে উঠা কঠিন শিলাস্তূপে পরিণত হয় এবং পরবর্তীকালে প্রাক-যৌবন যুগের সেই ‘ফসিল’টিকে বহন করা ভিন্ন আর গতান্তর থাকে না। মনীষী রোলান তাই বলিয়াছেন, “...And average man dies at the age of twenty.”

এই বিংশ বৎসরের মধ্যে জীবনকে সে যে দৃষ্টি-ভঙ্গিমায় দেখিল, তাহা ভিন্ন জগতের অপর রূপ তাহার চক্ষে আর পড়িবে না,—এ একটি দৃষ্টিভঙ্গীর রোমহন চলিবে অবশিষ্ট জীবনে।

শিশু-সাহিত্যের বয়স কত ?

সাধারণে উত্তর করিবেন—শিশুর বয়সই বা কত যে তার সাহিত্যের আবার একটা বয়স থাকিবে ? এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বাণীই উদ্ধৃত করা যাক :

“ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মত পুরাতন আর কিছুই নেই। দেশকাল, শিক্ষা-প্রথা অল্পসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত-সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে ; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশুস্মৃতি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন স্নেহময়, যেমন দুঃ, যেমন মধুর ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন-চিরস্থের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির স্বজন, কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজ-কৃত রচনা।”

শিশু-সাহিত্যও এই দিক দিয়া অতি পুরাতন অথচ চির নূতন।

কিন্তু এই দেশের শিশু-সাহিত্য লিপিবদ্ধ হইল কোন্ সময় হইতে ?

বাংলার শিশু-সাহিত্য বলিয়া যাঁহা পরিচিত, তাহা নিতান্ত আধুনিক। অথচ জগতের প্রথম গদ্য শিশু-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এই ভারতবর্ষে, বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশ ও পঞ্চ-তন্ত্রে। বিভাসাগর বাংলা শিশু-সাহিত্যের ভিত্তি পত্তন করেন তাঁর “কথামালায়।”

শিশুদের উষায়ুগে প্রভাত-স্বর্ষের মত কিরণ-সম্পাত করেন শিশুর জননী ; কারণ তাঁর সাহচর্যেই শিশুর সর্বা-পেক্ষা অধিক সময় অতিবাহিত হয়। স্বর্গের নন্দন-চ্যুত এই শিশু-মঞ্জরীটি নূতন করিয়া ধরণীর সঙ্গে রাখীবন্ধন করিতে চায়—নূতন আশা ও রঙীন রথে অজানার পথে তাহার অভি-যান। এই রথের কাঙারী কখনও মাতা, কখনও দিদিমা, কখনও ঠাকুরমা বা ঠাকুরদাদা।



বাংলার শিশু-সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই “ছড়া”-সাহিত্যের কথা উঠে।

ছড়ার উৎপত্তির ইতিহাস লোকচক্ষুর অন্তরালে। কোন ছড়াটির কে রচয়িতা তাহা বুঝিবার জ্ঞান পদকর্তা কোনও উপায় রাখেন নাই। বস্তুত এই সকল ছড়ার যেমন সৃষ্টিও নাই, তেমনি লয়ও নাই। একের মুখ হইতে অপরের মুখে এই ছড়া-গানগুলি ভাসিয়া বেড়াইয়াছে তরঙ্গের মুখে তরঙ্গীর মত, এবং দোলায়িত তরঙ্গীর মতই কণ্ঠ হইতে কণ্ঠান্তরে যাইয়া কালনদীর উত্তাল বীচিভঙ্গকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সমুদ্রের পথে ছড়া-তরঙ্গী চলিয়াছে। এই ছড়াগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ইহার সরলতা ও স্বতন্ত্রতা। সাবলীল ভঙ্গিতে ইহার একের পর আর এক চিত্র আঁকা হইয়া যাইতেছে। স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে মুহুর্তে পূর্ব-গগনে যেমন দিগন্তরেখার লালরঙের সহিত মধ্যাকাশের নীলবর্ণের ঠিক বিভেদ-রেখাটির কোনও ঠিকানা মিলে না, এই ছড়াচিত্রগুলিও সেরূপ স্পষ্টসীমার বন্ধনে আবদ্ধ নহে। যেথায় যেথায় মিলাইয়া যাওয়ার মত এই রঙীন ছবিগুলি একের সহিত অপরটি নিঃশেষে মিলাইয়া যায়। অর্থের বন্ধনে কঠিন পৃথিবীর সহিত ইহার সর্বদা যুক্ত নয়, অর্থভারহীনতা ও অসঙ্গতির যুক্ত পক্ষে ভর করিয়া ধর্মগীর-ধূলিস্পর্শ হইতে বহু উর্ধ্বে উন্মুক্ত উদার আকাশে এই ছড়ার বিচরণ।

“আসন পিঁড়ি পান পিঁড়ি আয় রঙ্গ রাধা,

হলুদ-বনে কলুদ ফুল, তারা নামে টগর ফুল;  
আয়রে তারা হাটে যাই, পান গুয়াটা কিনে খাই,  
কচি কুমড়োর ঝোল,  
ওরে জামাই গা তোলা!”

ছড়াটির বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, কোনও ছড়াটির সহিত কোনও ছড়াটির সামঞ্জস্য নাই; সামান্য শব্দ-সামুদ্র্য অথবা অর্থ-সামঞ্জস্যে এক দৃশ্য হইতে অন্যরাসে অপর দৃশ্যটির আবির্ভাব হইতেছে। হাটে গিয়া সর্বপ্রথমেই পান কিনিয়া খাইতে দেখিলে আমরা যতটা আশ্চর্য্যাব্বিত না হইব, ততোধিক হইব তাহুল ভঙ্গ্যগানে কচি কুমড়োর ঝোলের প্রসঙ্গে; তাহাও যদিবা সহ হয়—ইহার মধ্যে সহসা জামাইয়ের গাজোতোলানের কথা আসিলে কোন স্তরে? এইরূপ অর্থহীন কবিতাটিতে যদি কবি একটু অনুপ্রাসের অবতারণা করিলেন অমনি আসিয়া জুটিল “বটানী” বহির্ভূত এক সৃষ্টিছাড়া শব্দ “কলুদ-ফুল”।

এইরূপ কতকগুলি ছড়া আছে যাহার কোনই অর্থ হয় না; এগুলি সম্পূর্ণ ঘুম-পাড়ানী গান।

“ইচিং বিচিং জামাই ফিচিং

তায় পল্লো মাকড় বিচিং।

মাকড়েরা নড়ে চড়ে;

এলের পাত, চেলের পাত—

ঠাকুর দিলেন জগদাধি!”

এমনই ঘুমপাড়ানী গানের নৌকায় মায়ের কোলে খোঁকাবাবু যখন ধীরে ধীরে স্বপ্নরাজ্যের কুহেলিকায় পাল তুলিয়া নিরুদ্ধেশ যাত্রায় চলিয়াছেন তখন ঐ ছড়ার তরঙ্গিতে যদি অর্থভার চাপাইয়া দেওয়া যায় তবে খোঁকনবাবুর ময়ূরপঙ্খীর তো ভরাডুবি হইবেই।

“প্রাচীন ঋগ্বেদ-ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের স্তবগান উপলক্ষ্যে রচিত—আর মাতৃহৃদয়ের যুগলদেবতা খোঁকাবাবুর স্তব হইতে ছড়ার উৎপত্তি।” (রবীন্দ্রনাথ)

সত্যই যুক্ত-হৃদয় বন্দনাকারিগণ যুগে যুগে এমন ছড়ার ডালি সাজাইয়া যজ্ঞ-দেবতার চরণে অঞ্জলি দিয়াছেন, যে দেবতার মায়েদের শিবপূজার বেলা “ইচ্ছা হয়ে” মনের মন্দিরে আপনার পাদপীঠ রচনা করিয়াছিল। সে স্নেহাঞ্জলির সাহিত্যকল্পে অর্থের কীট বাসা বাঁধে নাই, যুক্তির ক্রন্দ স্পর্শ করে নাই।

তাহার পর ছড়ার মিষ্ট তরলতার মাঝে স্নেহের স্বরটিকে অবলম্বন করিয়া অর্থ দানা বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল। চাঁদামার টিপের পরিবর্তে মাছের মুড়ো, ধানের কুঁড়ো, কাল গরুর দুধ ও দুধ খাইবার বাটি ঘুঘু দিবার প্রস্তাব হইতে লাগিল। “যাহ এত বড় রঙ্গ” নামে যে ছড়াটি প্রচলিত তাহার অর্থসামঞ্জস্য, শব্দ-বৈচিত্র্য ও পরিণতি (climax) লক্ষ্য করিলে এই ছড়াগুলিকে আর প্রলাপ-পর্য্যায় ফেলা চলে না।

“দোল দোল দোলুনি, রাঙ্গা মাধায় চিরুণী

বর আসবে এখনি, নিয়ে যাবো তখনই

কৈদে কেন মরো।

আপনি বুঝিয়া দেখো কার বর করে।”

কবিতার শেষ ছত্রের ইঙ্গিতটিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। আর একটি ছড়ার উল্লেখ না করিয়া এই ছড়া-প্রদর্শন সমাপন করিতে পারিতেছি না।

“ও পারেতে কালো রঙ বস্ত্র পড়ে ঝমঝম

এ পারেতে লকাগাছটি রাঙা টুকটুক করে।

গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।

এ মাসটি থাকো দিদি কৈদে ককিয়ে

ও মাসেতে নিয়ে যাব পাকী সাজিয়ে।”

এই প্রবাসী অজ্ঞাতনারী মূর্খ মেয়েটির প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “সম্প্রতি বাঁহারা বঙ্গভাষার বিস্তৃতি-রক্ষাত্রে ভাষাগত প্রথা এবং পুরাতন সৌন্দর্য্যগুলিকে বলিদান করিতে উত্তম হইয়াছেন, ভরসা করি তাহারাও মাঝে মাঝে স্নেহবশতঃ আয়বিশ্রুত হইয়া ব্যাকরণ লজ্জনপূর্বক ভগিনীকে ভাই বলিয়া থাকেন,...সে হতভাগিনী স্বপ্নেও জানিত না তাহার সেই একদিনের মন্থভেদী ক্রন্দনধ্বনির সহিত এই ব্যাকরণের ভুলটুকুও জগতে চিরস্থায়ী হইয়া যাইবে। জানিলে লজ্জার মরিয়া যাইত।”

বিশ্বের ঘরে ঘরে মাতৃস্নেহের পুণ্য গঙ্গোদকে শিশুদেবতার অঞ্জলিরূপে যে ছড়াগুলির সৃষ্টি হইয়াছে, জগতের সাহিত্যে তাহা সৃষ্টির প্রথম শিশুর মতই অপরিবর্তনীয় পুরাতন, আবার সেই শিশুর মতই নিত্যনবীন। বিশ্বের nursery rhyme হইতে বাংলা ছড়ার এইমাত্র বৈশিষ্ট্য যে, “শিশুদেবতার অতি অল্পত অসঙ্গত অর্থহীন চালচিহ্নের মধ্যেই স্বর্গের দেবতা কখন অলঙ্কিতে শিশুর সহিত মিশিয়া আপনি আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।” (রবীন্দ্রনাথ)

ছড়াসাহিত্যের পরেই রূপকথার আসন, শিশুসাহিত্যের রাজসভায় মঞ্জীর আসনের পরে কোটালের আসনের মত। অসঙ্গতি ও অভাবনীয়াত রূপকথারও প্রধান গুণ। আবার প্রত্যেকটি রূপকথার সহিত প্রত্যেকটির কিছু না কিছু সামঞ্জস্য থাকিয়া যায়। একই রাজপুত্র-রাজকন্যা, মন্ত্রী-কোটাল-সওদাগর-পুত্র, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, পক্ষীরাজের সমাবেশ; একই সুমোরাগীর বাধা ও সুমোরাগীর হিংসায়, একই রাক্ষসের হাঁউ-মাউ-খাঁউ ধ্বনিতে সকল গল্পই পরিপূর্ণ। কিন্তু তবুও সেখানে চৌর্য্যাপরাধের বিরুদ্ধে কেহ পুলিশ, ডিটেক্টিভ মোতায়েন রাখে নাই। “এক যে ছিল রাজা” বলিলে কেহ প্রশ্ন করে না, রাজার কি নাম, কোথায় রাজ্য, কোন্ শতাব্দীর রাজবংশ? কিন্তু এই প্রশ্নহীনতা কোতূহলের অভাববশতঃ নয়—পরমুহুর্তেই প্রশ্ন হয় “তারপর?” এই তারপরের রথ গল্প পক্ষীরাজের মতই উদ্ধাম গতিতে আগাইয়া চলে। সেখানে সর্পদংশনে মৃত মোবারকের পুনর্জীবনের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে উপসংহারে দিদিমাকে ক্লম ধরিতে হয় না; সেখানে আনন্দের মঠ রচনা করিতে হইলে ইতিহাসের পাতা খুলিয়া সন-তারিখ সমেত সম্রাটী বিদ্রোহের বিবরণে মুখবন্ধে সমালোচকের মুখ বন্ধ করিতে হয় না। সেখানে সবাই জানে সোনার কাঠি, রূপার কাঠির গুণ—সবাই জানে রাজকন্যার হাসিতে ফোটে মানিক, কান্নায় ঝরে মুক্তা।

রূপকথার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, যুগে যুগে মানুষ শিশুর রূপ ধরিয়া জননীর কোড়ে ফিরিয়া আসে, বারে বারে একই কাহিনী তাহার স্তনে, সন্ধ্যাপ্রদীপের স্থির শিখাটির পার্শ্বে চুপ করিয়া গালে হাত দিয়া—তাহারা যখন রাজপুত্রের গল্প শুনে তখন অজ্ঞাতসারেই তাহারা রাজপুত্রের সহিত আপনার বৈষম্যটি হারাইয়া ফেলে। আপন মনে তাহারাও যেন রাজপুত্রের মতই পক্ষীরাজের পিঠে নীল আকাশের বুকে অভিযানে বাহির হয়;—অচিনপুরের বন্দিনী রাজকন্যাকে পাষণ্ডকারার বাহিরে আনিতেই হইবে।

“এইটেই হচ্ছে মাহুঘের সব গোড়ার রূপকথা, আর সব শেষের। পৃথিবীতে যারা নতুন জন্মেছে, দিদিমার কাছে তাদের এই চিরকালের খবরটি পাওয়া চাই যে রাজকন্যা বন্দিনী, সমুদ্র হ্রগম, দৈত্য দুর্জয়, আর ছোট মাহুঘটি একলা

দাঁড়িয়ে পণ করছে বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনব।” (রাজপুত্র—রবীন্দ্রনাথ)

সংসারের বুকে বারে বারে মায়ের কোল আলো করিয়া, এমনি রাজপুত্রের দল সাতরঙা আশায় রঙীন মন লইয়া আশ্রয় লয় যেন রামধনু-রঙের প্রজাপতির ঝাঁক। রাজকন্যার সন্ধান মিলে, হয়তো কৃচবরণ কন্যা না হইয়া বাস্তবে মেঘবরণ কন্যাই দেখা দেয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রাজপুত্রের বাধা কিছু কমে না। সামনে থাকে তেমনি সাত-সমুদ্র, স্বপ্নের ঢেউ তোলা সুবিভূত নীল ঘুমের মত, রাক্ষসের দল ঠিকুজি-কুজী-জাত ও বরপণের পাষণ্ড-প্রাচীর তুলিয়া রাজকন্যাকে সুদুর্লভ করিয়া রাখে। তেমনি দুর্লভ্য বাধা উপেক্ষা করিয়া রাজপুত্র অগ্রসর হন, কিন্তু বাস্তবের রূপকথাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় বিয়োগান্ত। সমাজপতি ও অভিভাবকদের হাঁউ-মাউ-খাঁউ-এর মধ্যে রাজপুত্রের ক্ষীণ কণ্ঠের প্রতিবাদ ডুবিয়া যায়, রাজকন্যার হাসিতে মানিক ফোটে না, শুধু কান্নাতেই মুক্তা করিতে থাকে। দক্ষিণারঞ্জনের “ঠাকুর মার খুলি”তে, অবনীন্দ্রনাথের “ক্ষীরের পুতুলে” এমনি রাজপুত্রের কাহিনী শিশু-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

অদ্বুত গল্প বলিতে বলিতে শেষ ছাড়ে আসিয়া সহসা শ্রোতাকে জানান হয় যে “এটি একটি স্বপ্নকাহিনী”, বিশ্বের শিশু-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধারা। এলিসের আত্মবিশ্লেষণে অভিযানে, কঙ্কাবতীর ভ্রমণ-যাত্রায় এমনই স্বপ্নরাজ্যের খবর পাই। “হ-য-ব-র-ল” গল্পও ঐ ভাবে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

সংসারের স্বাভাবিক নিয়মগুলিকে বিপরীত ভাবে দেখিতে শিশুমনের ভারি একটি আনন্দ। ইচ্ছা-ঠাকরণের বরে যখন সুবলচ্ছন্ন সুশীলচ্ছত্রের অহুসরণে “ড্যাং-গুলি” খেলিতে গিয়া ভূশায়া গ্রহণ করেন তখন শিশুর দল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ষাণ্ডি বড়ীর কালনাবাসী দিদি শান্তডীজনের আচরণে আনন্দিত হয় নাই এমপ বাঙালী-শিশু বিরল। কাহিনীর সমাপ্তি বলিয়াই সুকুমার রায়ের “আবোল-তাবোল” সৃষ্টিছাড়া হযবরল ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের লেখাগুলি অমর হইয়া আছে।

ইহার পরই আসে শিশু-সাহিত্যের তৃতীয় ভাগের কথা—কিশোর সাহিত্য। শিশু ক্রমে নিজেই বই পড়িতে শিখিল। পারিপার্শ্বিকের বাস্তবরণে এখন আর সে সেই চিরসরল চিরনবীন শিশুটি নাই। সামান্য বস্তুরওটিকে ধোকা করিয়া ছুঁ খাওয়াইবার মত চিন্তার প্রসারতা ও মনের সারল্য সে হারাইয়াছে। গল্পের ভিতরে আসিয়াছে অর্থের অনুসন্ধান, এ্যাডভেঞ্চারের ইচ্ছা, বাস্তবের দুর্জয়কে জয় করিবার বাসনা। যুগ-শিক্ষার হাওয়ায় সে বুঝিতে শিবিয়াছে রাক্ষস-পরিবেষ্টিত রাজকন্যা কল্পনামাত্র, কিন্তু ক্যানিবলে-ঘেরা আফ্রিকার হীরক-

খনি আরও বাস্তব। পক্ষীরাজের পিঠে বা পুষ্পকরণে এক পদও যাওয়া সম্ভবপর নয়, কিন্তু “বেলুনে পাঁচ সপ্তাহের” মহাদেশ অতিক্রম করা সম্ভব। তাই সেকালে যেমন একই রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র-কোর্টালপুত্রে বিভিন্ন গল্পের স্বজন সম্ভবপর ছিল, একালে তেমনি একই বিমল-কুমার-বাখা-রামহরিয়া, একই রেক ও শ্রিখ নানা গল্পের সৃষ্টি করিতেছে। নূতন শিকার প্রভাবে শিশুদের চিন্তাধারার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে সত্য, তবু “আখির কোণে” সেই গল্পপিপাসু দৃষ্টিটি আজিও সাক্ষ্য দিতেছে, অতীত কালেও যে চাহনি শিশুর চক্ষে ফুটিয়া উঠিত। তাই কিশোর-সাহিত্যে আমরা পূর্ববর্ণিত সেই রূপকথাই রূপকের আবরণে গুলিয়া বাই। এখানে রাজকথা রূপ লইয়াছেন স্বর্ণখনির কিসা “যথের ধনের”। রাক্ষসেরা দেখা দিয়াছে ডাকাতের সঙ্গে, কিসা অসভ্য এ্যাবরিজিনিসদের বেশে।

বাংলার শিশু-সাহিত্যের একটি প্রধান অভাব—অনুবাদ-সাহিত্য। আশ্চর্য্য দ্বীপ, সাগরিকা, অজ্ঞাত দেশ, অজ্ঞাত জগৎ, টমকাকার কুটীর, বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ প্রভৃতি কয়েকটি ভিন্ন অধিকাংশই তৃতীয় শ্রেণীর অনুবাদ হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে বুল গল্পগুলি যে সমাজের—আমাদের সমাজের সহিত তাহার এতই পার্থক্য যে বাঙালীরা, বিশেষতঃ বাঙালী শিশুরা এই সমাজগত বৈষম্যের জন্ত গল্পের বিষয়-বস্তুটিকে অনুধাবন করিতে পারে না। ফরাসী বা রাশিয়ান সাহিত্য হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করা শক্ত নহে, কিন্তু যে-কোনও ইউরোপীয় ভাষা হইতে শিশুবোধ্য বাংলা-ভাষায় পরিবর্তন সাধন অভ্যস্ত কঠিন। “বিন্দের বন্দী”র মত আমূল পরিবর্তন ভিন্ন শিশু-সাহিত্যেরও গতান্তর নাই। অথচ অনুবাদ-সাহিত্যের প্রসার জাতীয় জীবনের উন্নতির পরিচায়ক।

নূতন যুগের নূতন হাওয়ায় সকল অবস্থারই পরিবর্তন হইতেছে। পরিণতদের সাহিত্য, দিনে দিনে পরিবর্তিত হইতেছে। কিশোর-সাহিত্যেও ‘সাইরেন’, ‘বোমা’, ‘ইভ্যা-কুয়ী’র প্রসঙ্গ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শুধু এই মনস্তত্ত্বের যুগে আজও

“ছেলেটির যেমনি কথা ফুটল অমনি সে বললে, গল্প বল।”

দিদিমা বলতে শুরু করলেন, ‘এক রাজপুত্র, কোর্টালের পুত্র, সদাগরের পুত্র—’

গুরুমশাই হেঁকে বললেন, “তিন-চারে বারো।”

কিন্তু তখন তার চেয়ে বড় হাঁক দিয়েছে রাক্ষসটা, ‘হাঁউ-মাউ-বাঁউ’ নামতার ছকার ছেলেটির কানে পৌঁছায় না।”

(গল্প—রবীন্দ্রনাথ)

শিশু-সাহিত্য একটি বিশিষ্ট শাখা মাসিক-পত্রিকা। সর্ব-প্রথমেই “বালকে”র নাম, তার পর ক্রমে সন্দেশ, মোচাক, শিশুসাবী, রঙমশাল, রামধনু, কিশোর-বাংলা শিশু মনের

ধোরাক জোগাইয়াছে। উপেক্ষিকিশোর ও সুরুমার রায় চৌধুরী এ পথের কাঙারী। অধুনা সাপ্তাহিকের বিভাগে ‘আনন্দমেলা’, ‘পাত্তাভি’ প্রভৃতি আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাওয়া বাইতেছে। শিশু-সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন সাহিত্য-সেবীর নাম উল্লেখযোগ্য, কিন্তু “হংসরূপী রাজপুত্র”, “একাদশ সহস্ররজনীর” রচয়িতা হইতে অতি আধুনিক লেখকের সুদীর্ঘ তালিকায় কাহাকে বাদ দিয়া কাহার উল্লেখ করিব। রামায়ণ বাংলার শিশু-সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। সেই কৃত্তিবাস হইতে “শিশু” রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ বা আধুনিক শিশু-সাহিত্যিক কাহার প্রসঙ্গ আনিব এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শিশুদের জন্ত যেমন-তেমন গল্প রচনা এমন কি কঠিন। কিন্তু “সেই যেমন-তেমন ভাবটি পাওয়া সহজ নহে। এইজন্ত ছড়া জিনিষটা যাহার পক্ষে সহজ তাহার পক্ষে নিরতিশয় সহজ কিন্তু যাহার পক্ষে কিছু মাত্র কঠিন তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য।” (রবীন্দ্রনাথ)

তাই নূতন ছড়ার আর সৃষ্টি হইতেছে না। সংসারের দৈনন্দিন কার্য্যে প্রতিমুহূর্ত্তে যুক্তিযুক্ত থাকিয়া যুক্তিহীন গল্প বানাইবার ক্ষমতা আমরা হারািয়া ফেলি। তাই জাপানী বাহিনী আসাম-প্রান্তে সদলবলে উপস্থিত সংবাদপত্রে একথা পড়িয়াও অতীতের কোন নজির ধরিয়া বন্ধ-জননীরা আজিও থোকাবাবুকে ঘুম পাড়াইতেছেন—

“থোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে।”

যুগে যুগে দিগন্তর, আশুতোষ, শিশুভোলানাথের দল বঙ্গমাতার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিতেছে; প্রতিবারেই তাহারা আসিয়া শুনিতেছে বুল বুলিতে ধান খাইয়া গিয়াছে,—সুতরাং বাঁজনা দেওয়া হয় নাই। অর্থনৈতিক এত বড় দুঃসংবাদ শুনিয়াও তাহাদের বিস্ময়ান্বিত হুচিন্তা নাই, পরন্তু পরক্ষণেই আদেশ হইতেছে “গল্প বল।”

আবার সেই আদেশ চিরনবীন চিরপুরাতন গল্প “এক যে ছিল রাজা—”

আবার সেই শিশুকণ্ঠের—“তাপস?”

এই তারপরের পর তার পর গাঁথিয়া বাংলার শিশু-সাহিত্যের যে বিনিম্বতার মালাটি রচিত হইতেছে প্রতি জননীই তাহা শুধু আপন শিশুভোলানাথের কণ্ঠেই দোলাইয়া দেন, অন্তরীক্ষে প্রবীণ ভোলানাথ স্নেহের হাসি হাসিয়া থাকেন।

শিশু-সাহিত্যের উদ্ভব শিক্ষার ভিতর দিয়া নয়, প্রধানতঃ আনন্দের ভিতর দিয়া। কৈদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিছু-কাল পূর্বে তাহার পুণিয়া অভিভাষণে সত্যই বলিয়াছিলেন : রূপকথার ও গল্প বলার যুগ চলিয়া গিয়াছে। একাদশবর্তী পরিবার এখন খুব কমই আছে। কাজেই, ছোটদের রূপকথা ও গল্প বলিবার লোকাভাব। আগে ছেলেমেয়েরা ঠাঠরমা, দিদিমা

কি দাদা মহাশয়কে খিরিয়া সন্ধ্যাবেলা নানা রকমের গল্প, রূপকথা শুনিত ; এখন তার বদলে তাহাদের মাষ্টার মহাশয়ের নিকট নীরস ধারাপাত বা বানান শিক্ষা করিতে হয়।

ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। এইজন্ত শিশু-মনের খোরাক যোগাইবার ভার এখন একমাত্র শিশু-সাহিত্যিকের উপরই পড়িয়াছে এবং স্বাধীন ভারতে সে দায়িত্ব আরও গুরুতর।

## জাতিভেদ

শ্রী নীলিমা সরদার

প্রাচীনকালে যখন হিন্দু সভ্যতা বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিল তখন জাতিভেদ থাকিলেও কদর্যকারী সমাজ-পতিরা ছিলেন না বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি-বর্ণ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলেও কুলগত ছিল না। সকলেই তখন স্ব স্ব গুণকর্মের দ্বারা বিশেষ বিশেষ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইত। ইহা হইতেই প্রাচীন ধর্মব্যবস্থার উদারতা দৃষ্টিগোচর হয়। জন্ম কাহারও উন্নতির অন্তরায় ছিল না। দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে নিষাদপুত্র বলিয়া ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার চরিত্র মননীয় হইয়া উঠে নাই।

যোগ্যতা অনুসারে সকলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি শ্রেণীর অধীন হইত, ফলে প্রত্যেকেই উচ্চবর্ণ লাভের জন্ত উত্তরোত্তর গুণপ্রকর্ষে যত্নবান ছিল। ইহা গণচেতন্য প্রবৃত্ত করিতে কত যে সাহায্য করিত তাহা আমাদের শাস্ত্র-পাঠে উপলব্ধ হয়।

গীতায় ত্রীভগবান বলিয়াছেন—

“চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।” ৪।১।৩

গুণ এবং কর্ম অনুসারে আমি চারিটি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। গুণ এবং কর্মানুসারে চতুর্বর্ণ বিভাগ নিম্নলিখিতরূপ : (১) সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণ ; তাহার কর্ম শমদমাদি। (২) সত্ত্বসংযুক্ত রজঃগুণপ্রধান ক্ষত্রিয় ; তাহার কর্ম শৌর্য্যাদি। (৩) তমঃসংযুক্ত রজঃগুণপ্রধান বৈশ্য ; তাহার কর্ম ক্রয়াদি। (৪) রজঃগুণ সংযুক্ত তমঃপ্রধান শূদ্র ; তাহার কর্ম শুল্কাদি।

অভয়ং সত্ত্বসংযুক্তিঃ নিয়োগব্যবস্থিতিঃ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়ং তপ-আর্জবম্ ॥১

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগো শান্তিরপৈশুনম্।

দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্তং মর্দনং হ্রীষ্যচাপলম্ ॥২

তেজঃ ক্রমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্ত ভারত ॥৩

( গীতা ১৬।১-৩ )

এইগুলি দৈবী সম্পদ। অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণের সম্পদ।

শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জবঃ জ্ঞান বিজ্ঞান আন্তিক্য এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তির্আর্জবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাত্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥

( গীতা—১৮।৪২ )

ইহা হইতেই প্রতীতি হয়, সে যুগের ব্রাহ্মণ কত উচ্চ স্তরের ব্যক্তি। বহু পুরাণাদিতে দেবগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণ-স্বব দৃষ্ট হয়। মহাভারতেও শান্তিপর্বে ভীষ্মের বাক্যে ইহারই প্রতিক্রিয়া :

নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্তাপ্তি বিত্তং

যথৈকতা সমতা সত্যতা চ।

শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমর্জবং

ততস্ততশ্চ পরমঃ ক্রিয়াভ্যাঃ ॥

( শান্তি ১৭।৫।৩৭ )

মহাভারতের বনপর্বে বর্ণিত আছে—অহঙ্কারী নহ্ম অগস্ত্যের শাপে সর্পত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর অগস্ত্যের নিকট শাপনাশের জন্ত কাকুতি মিনতি করিলে অগস্ত্য বলিলেন—

“ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে শাপ হইতে মুক্ত করিবেন।”

পরে যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন কালে নহ্ম বলিতেছেন—

ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্রাজন বেতং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির।

ব্রবীহতিমতিং ত্বাং হি বাঁক্যরত্নমিসীমহে ॥২০

হে রাজা যুধিষ্ঠির, বলুন ব্রাহ্মণ কে ? এবং জেয় কি ?

যুধিষ্ঠির বলিলেন—

সত্যং দানং ক্রমা শীলমানুষংস্তং তপো ঘৃণা।

দৃশ্যস্তে যত্র নাগেজ স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥

হে সর্বশ্রেষ্ঠ ! সত্য, দান, ক্রমা, শীল, অনুশংসতা, তপস্তা এবং ঘৃণা এইগুলি যাহাতে বর্তমান তিনিই ব্রাহ্মণ।

শূদ্রে তু যদবেল্লক্ষণং দিধে তু তন্ন বিততে।

নবৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥২৫

যদ্রেতল্লক্ষ্যতে সর্গঃ রত্নং স ব্রাহ্মণ স্মৃতঃ।

যদ্রেতন্ন ভবেৎ সর্গঃ তৎ শূদ্রমিতি নির্দিশেৎ ॥২৬

শূদ্রের লক্ষণ ব্রাহ্মণে থাকে না এবং ব্রাহ্মণের লক্ষণ শূদ্রে থাকিতে পারে না। হে সর্প, ব্রাহ্মণের লক্ষণ যাহাতে থাকে তিনি ব্রাহ্মণ এবং যাহাতে থাকে না সে শূদ্র। ব্রাহ্মণগুণযুক্ত শূদ্র, শূদ্র নয় এবং শূদ্রগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নয়। শমাদিয়ুক্ত শূদ্রও ব্রাহ্মণ এবং কামাদিয়ুক্ত ব্রাহ্মণও শূদ্র।

সর্প বলিলেন—

যদি তে বৃত্ততো রাজান্ ব্রাহ্মণঃ প্রসমীক্ষিতঃ।

যথা ভগতি তদায়ুজ্ঞান কৃতিবাবদ্রবিভ্যতে ॥৩০

হে আয়ুজ্ঞান, যদি আপনি বৃত্তির দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব নির্ধারণ করেন তাহা হইলে বৃত্তিহীন ব্রাহ্মণের জাতি যথা হইয়া পড়ে।

যুধিষ্ঠির বলিলেন—

জাতিরাজ মহাসর্প মহুয্যত্বে মহাসতে।

সঙ্করাৎ সর্ববর্ণানাং পুষ্পরীক্ষ্যতি মে মতিঃ ॥৩১

হে মহামতি মহাসর্প। এবংবিধ ব্রাহ্মণের মহুয্যত্বই জাতি। কারণ সমস্ত বর্ণের সাঙ্কর্য্য বশতঃ জন্মের দ্বারা বর্ণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ইহাই আমার মত। সর্ব বর্ণের মহুয্যগণ সর্ব বর্ণের জীতে সন্তান উৎপাদন করেন। আরও—বাক্য, মৈথুন, জন্ম এবং মৃত্যু সকল বর্ণের মহুয্যগণেরই সমান। অতএব বৃত্তিদ্বারা বর্ণ নিরূপিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

সর্বসর্কারূপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।

বাত্তৈধুনমুখো জন্মমরণঞ্চ সমং নৃণাম্ ॥৩২

মহুয্য জন্মগ্রহণের পর সংস্কৃত হইলে সাবিত্রীই তাহার মাতা এবং আচার্য্যই তাহার পিতা। সংস্কৃত হইয়া যদি সে ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ না করে তাহা হইলে সংস্কারের পূর্বে সে যেরূপ শূদ্র ছিল পুনরায় সেইরূপ শূদ্রই হয়। সংস্কারের কোনই ফল হয় না। সংস্কৃত হইয়া বৃত্তিযুক্ত ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ হয়, ইহা আমি পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি।

প্রাঙ নাতি বর্জন্যং পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে।

তত্ত্বান্ত মাতা সাবিত্রী পিতা দ্বাচার্য্য উচ্যতে ॥৩৪

কৃত্য্যঃ পুনর্বর্ণা যদি বৃত্তং ন বিদ্যতে।

শঙ্করন্তত্র নাগেজ্জ বলবান প্রসমীক্ষিতঃ ॥৩৬

যত্রোদানীং মহাসর্প সংস্কৃতং বৃত্তিমিথ্যতে।

তদ্ব্রাহ্মণমহং পূর্বমুক্তবান ভুজগৌত্তম ॥৩৭।১৮০

আলোচনার শেষে নহব স্বীকার করিলেন—সত্য, দম, তপঃ, দান, অহিংসা ইত্যাদিই ব্রাহ্মণত্বের সাধক ; কুল কিম্বা জাতি দ্বারা মহুয্য ব্রাহ্মণ হয় না। যথা—

ব্রজ চ ব্রাহ্মণত্বং চ যেন দ্বাহমচুদম।

সত্যং দমন্তপো দানমহিংসা ধর্ম্মনিত্যতা।

সাধকানি সদা পুংসাং ন জাতি ন কুলং নৃপ।

বনপর্ব ১৮১।৪২-৪৩

বর্তমানে ইহার বিপরীত অর্থাৎ কুল অনুসারেই বর্ণ বিচার। ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ, সে ব্যক্তি নিমিত্তচরিত্রই হউন

আর শাস্ত্রজানহীনই হউন। শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণত্বগুণযুক্ত ব্যক্তি বর্তমানে দুর্লভ। কোনও রকমে উপনয়ন-সংস্কারের পরই তিনি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণত্বের জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণত্বগুণযুক্ত ব্যক্তিকে বর্তমান ব্রাহ্মণ-সমাজ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার ত করেনই না, উপরন্তু “ধর্ম্ম গেল” “ধর্ম্ম গেল” বলিয়া রব তুলেন। একবারও চিন্তা করেন না যে অপর কেহ গুণবান হইলে তাঁহার সদগুণাবলী কিম্বা ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইবে কেন? এক ব্যক্তি বিদ্বান হইলে অপর ব্যক্তির বিদ্যা ক্ষীণ হইবে কেন? সঙ্গীর্ণতা এবং ঈর্ষ্যাই আত্ম ব্রাহ্মণজাতির পতনের মূল কারণ। যাহাদের মধ্যে প্রকৃত ব্রাহ্মণের গুণ বর্তমান তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আত্মগোপন করিয়া আছেন। তাঁহারা চেষ্টা করিলে হিন্দুধর্ম্মকে পুনরায় পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন।

পুরাকালে ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত ব্যক্তিই যে ব্রাহ্মণ হইতেন তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদের জাবালা-পুত্র সত্যকামের উপাখ্যান হইতেই জানা যায়। সত্যকাম গুরু নিকট গমন করিলে গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস, তোমার গোত্র কি?” সত্যকাম মাতার নিকট গোত্র জানিতে চাহিলেন। মাতা বলিলেন—“তাত, যৌবনে আমি বহুচারিণী ছিলাম, অতএব আমি জানি না তোমার গোত্র কি ; আমার নাম জাবালা, তোমার নাম সত্যকাম—ইহাই তোমার পরিচয়।

বহুহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে

দ্রামলভে সাহমেয়বেদ

যদুগোত্রন্তু মসি। (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৪।৪।২)

জাবালা তু নামাহমসি সত্যকামো নাম ত্বমসি  
স সত্যকাম এব জাবালো ক্রবীথা।

(ঐতরেয় ৪।৪।২)

অনন্তর-সত্যকাম গুরুকে উপরোক্ত বাক্যই বলিলেন। গুরু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সমিধ আনিতে আদেশ করিলেন। গুরু পৌতম বালকের অকপট সত্যভাষণই তাহার ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণরূপে গণ্য করিলেন। পরবর্তীকালে এই সত্যকাম বিখ্যাত ঋষি হইয়াছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে উপকোশল বিভ্রায় গুরু সত্যকাম শিষ্য উপকোশলকে ব্রহ্মবিজ্ঞা দান করিতেছেন—

“য এবোহক্ষিণি পুরুষোদৃষ্টতে এষ আয়্যোতি হোবাচ।  
এতদম্বতং এতদ্বজা।”

রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের তপোবল দর্শনপূর্বক ক্ষত্রিয়ের বাহুবল অপেক্ষা তপোবলকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া তপস্তা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এ বৃত্তান্ত সর্বজনবিদিত।

বেদব্যাস ধীর-কথা সত্যবতীর পুত্র ; কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব সর্বজনস্বীকৃত। মাতা নীচবংশীয়া হইলেও তাঁহার



ব্রাহ্মণ হইতে বাধা হয় নাই, অবশ্য তাঁহার পিতা ছিলেন পরাশর ঋষি। পরাশর স্বপচকতার সন্তান।

একই পিতার চারি পুত্র চারি বর্ণেরও দেখা যাইত। গুৎসমদ ক্ষত্রিয় বংশজাত। তাঁহার পুত্র শুনক। হরিবংশে দেখা যায় শুনকের পুত্রগণ কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ শূদ্র। ক্ষত্রিয় ভর্গের সন্তানেরাও চারি বর্ণের ছিল। প্রতীপের পুত্র দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক। তন্মধ্যে দেবাপি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

“দেবাপিঃ খলু বাল এবারণ্যং বিবেশ।”

(মহা. আদিপর্ব ৯৫।৪৫)

“দেবাপিঞ্চ প্রববাজ তেষাং ধর্ম্মহিতেশ্চ।

(মহা. আদি ৯৪।৬২)

রাজা সংবরণ হর্যাকতা তপতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র কুরু। মহাতপস্বী কুরু যে স্থানে তপস্তা করিয়া ছিলেন সেই স্থানই কুরুক্ষেত্র তীর্থে পরিণত হয়।

“কুরুক্ষেত্রং স তপসা পুণ্যং চক্রে মহাতপা।”

(মহা. আদি ৯৪।৫০)

ক্ষত্রিয় জনক রাজাও ঋষি হইয়াছিলেন। ব্যাসদেব স্বীয় পুত্র শুকদেবকে ধর্ম্মোপদেশ লাভের জন্ত রাজর্ষি জনকের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা আছে। শুকদেব মনে করিলেন—আমি আজন্ম সন্ন্যাসী আর ধর্ম্মোপদেশ লাভের জন্ত পিতা আমাকে একজন রাজার নিকট পাঠাইতেছেন কেন? শুকদেব জনকের নিকট উপস্থিত হইলে রাজর্ষি তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার মনের সন্দেহ জানিলেন। অনন্তর যখন উভয়ে তত্ত্বালোচনায় ব্যস্ত তখন সংবাদ আসিল রাজধানীকে বেঠন করিয়া অকস্মাৎ সর্কগ্রাসী অগ্নি জলিয়া উঠিয়াছে। শুকদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার অপর কৌশীনট আপনার গৃহাত্যন্তর হইতে আনয়নার্থ বাবিত হইলেন। কৌশীন লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন জনক রাজা তেমনই নিরীকার। তাঁহার স্ত্রী মিথিলা নগরীকে অগ্নি গ্রাস করিতেছে; কিন্তু তিনি কিছুমাত্র বিচলিত নন। অগ্নি নির্বাপিত হইল। তিনি নিজ কৌশিনীসজ্জিতে লজ্জিত হইলেন; এবং রাজর্ষির নিকট আপনার সন্দেহের কথা জানাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

উপনিষদেও দেখা যায় বহু রাজা ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোপদেশ দিয়াছেন। অতএব গুণবিচারেই ব্রাহ্মণও শূদ্র এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইত।

ন যোনি নাপি সংস্করো ন শ্রুতি ন চ সমুত্তিঃ।

কারণানি দ্বিজত্বং বৃত্তমেব তু কারণম্।

সর্কোহয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।

বৃত্তি স্থিতশ্চ শূদ্রোহপি ব্রাহ্মণত্বঞ্চ গচ্ছতি।

(ঐ ২১৩।৫৬, ৫৭)

মহাভারতে বনপর্বের যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিলেন, কিসের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণিত হইবে? যুধিষ্ঠির যাহা উত্তর দিলেন তাহা পুরোহিতব্রাহ্মণ বাক্যেরই প্রতিধ্বনি। যুধিষ্ঠির বলিলেন—

শৃণু যক্ষ কুলং তাত ন স্বাধ্যায় ন চ শ্রুতম্।

কারণং হি দ্বিজত্বং চ বৃত্তমেব ন সংশয়ঃ।

বৃত্তং যত্তেন সংরক্ষ্যং ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।

অক্ষীগবন্তো ন ক্ষীণো বৃত্ততন্ত হতো-হতঃ।

চতুর্বেদোহপি দ্বয়ভূতঃ স শূদ্রাদতিরিচ্যতে।

যোহগ্নি হোত্রপরো দান্তঃ স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ।

(বনপর্ব—৩১২।১০৮, ১০৯, ১১১)

“নিষাদ-স্থপতিং যাক্ষয়েৎ” এই বাক্যের “নিষাদ স্থপতি” শব্দের সমাস নির্ধারণকালে বিশ্বনাথ ভ্রায়পকানন মুক্তাবলীতে বলিয়াছেন—

অতএব নিষাদ স্থপতিং যাক্ষয়েদিত্যত্র ন তৎপুরুষঃ

লক্ষণাপত্তেঃ, কিন্তু কর্ম্মধারয়ঃ লক্ষণাভাবাৎ। ন চ

নিষাদস্ত সঙ্কর-জাতি বিশেষস্ত বেদানান্তিকার্যং

যাজ্ঞানাসম্ভব ইতি বাচ্যম্, নিষাদস্ত বিজ্ঞাপ্রযুক্তোত্ত

এব কল্পনাৎ।

নীলোৎপল এই স্থলে কর্ম্মধারয় সমাসে নীলা ভিন্ন উৎপল এইরূপ অর্থ হইলে এ স্থলে লক্ষণা নাই। অতএব “নিষাদ স্থপতিকে যাজ্ঞন করিবে” এ স্থলে তৎপুরুষ সমাস নহে, কেননা তৎপুরুষ সমাসে লক্ষণা করিতে হয়। শকার্থ সম্ভব হইলে লক্ষ্যার্থ হইতে পারে না। সেইজন্ত ইহা কর্ম্মধারয় সমাস। নিষাদ সঙ্কর-জাতি বলিয়া বেদে তাহার অধিকার নাই, অতএব তাহার যাজ্ঞন অসম্ভব ইহা বলিতে পার না! কেননা, নিষাদ স্থপতিকে যাজ্ঞন করিবে এই বাক্য হইতেই তাহার বিজ্ঞাপ্রযুক্তি মানিয়া লওয়া যাইতেছে।

বর্তমান অবস্থায় নারীও শূদ্রশ্রেণীভুক্ত। ব্রাহ্মণ্যগুণযুক্ত হইলে নারীই বা ব্রাহ্মণ হইবে না কেন? পুরাকালে ইহারও ব্যতিক্রম দেখা যাইত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ে গার্গীকে তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মোপদেশ দিতেছেন—

“এতদৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থলমনবহুস্বম্।”

“এতস্মিন্ যজ্ঞক্রে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ।”

“তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যাদৃষ্টং দ্রষ্টু অশ্রুতং প্রোত্।”

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী ছিলেন—মৈত্রেয়ী এবং গার্গী। আশ্রম ত্যাগ করিয়া বনগমনকালে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সম্পত্তি দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া দুই স্ত্রীকে সমভাবে বণ্টন করিতে উত্তত হইলে গার্গী বলিলেন, প্রভু এই সমস্ত সম্পত্তিতে আমার প্রয়োজন নাই। ইহা একদিন নষ্ট হইবে। আমাকে এরূপ সম্পত্তি দান করুন যাহা কখনও নষ্ট হইবে না। আমাকে আপনার

ব্রহ্মবিজ্ঞান অংশ দান করুন। অনন্তর গার্গীকে ব্রহ্মবিজ্ঞান  
গ্রন্থের উপযুক্ত দেখিয়া যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে ব্রহ্মবিজ্ঞান দান  
করিলেন।

বেদের বহু মন্ত্র নারী কর্তৃক রচিত। সামবেদ সংহিতার  
বহু মন্ত্রের রচয়িত্রী ইন্দ্রমাতৃগণ।

“স্বমিলবলাদপি-মহমো জাত ওজসঃ।

তং সন্ রষণ্ রষেদসি ॥

(ঐন্দ্রপর্ক)

দেবীস্বস্তের মন্ত্রগুলিও নারী রচিত। অন্তঃ গন্ধারি কণা  
বাক্ এই মন্ত্রগুলির রচয়িত্রী—

“অন্তঃ গন্ধা ঋষেহু হিতা বাঙ নারী ব্রহ্ম বিহুসী স্বান্নানমভোঃ।  
অতঃ সা ঋষিঃ।”

গোভিল-গৃহস্থে বিবাহ-প্রকরণে যজ্ঞোপবীতধারিণী কণার  
উল্লেখ আছে।—

“প্রাবতাং যজ্ঞোপবীতিনীমভ্যাদানয়ন্ জপেৎ  
সোমোহদদং গন্ধার্যয়তি।”

(২ প্র পাঠক ১ম খণ্ড ১৯ খন্ড)

অন্যত্রও দেবী যায় পুরাকালে কুমারীগণের যোজ্ঞা বহন,  
বেদ অধ্যয়ন এবং সাবিত্রী বাচন প্রচলিত ছিল। তাহারা  
পিতা পিতৃব্য কিংবা জাতার নিকটই অধ্যয়ন করিত। অপর

**দুর্ভাগ্যাক বহুবিধ**  
**মারাত্মক ব্যাধির বাহন!**

**মারকিট**  
**তরল ও ঝুঁড়া ডিডিটি**

তাহাদের  
নির্মাত প্রাণস্বাতক  
আরসোলা, মশা  
মাছি প্রভৃতিতেও  
কার্যকর  
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে  
প্রস্তুত

**বেঙ্গল কেমিক্যাল**  
কলিকাতা :: বোম্বাই

সকল সস্ত্রান্ত দোকানে  
পাওয়া যায়



## নেতাজীর অনুসরণে :—

বাংলার বিখ্যাত স্নাত ব্যবসায়ী শ্রী অশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও  
তাঁহার “শ্রী” মার্ক স্নাতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিম্নয়োজন। আজকাল  
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ স্নাতের ব্যবহার অত্যাৱশ্যক  
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্নাতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার  
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্নাত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা  
স্নাত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

কাহারও নিকট নয়। তাহার গৃহেই ভিক্ষা করিত। তাহার অঙ্গিন, চীর এবং জটাদারণ নিষিদ্ধ ছিল।—

“পুরাকল্পে কুমারীনাং মোক্ষি বন্ধনমিচ্ছতে ।  
অধ্যয়নঞ্চ বেদানাং সাবিত্রী বচনং তথা ॥  
পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ ।  
স্বগৃহে চৈব কন্যায়া ভৈক্ষ্যচর্যা বিধীয়তে ॥  
বর্জয়েদজিনং চীরং জটাদারণমেব চ ।”

(যমঃ)

“দ্বিবিধাঃ হি জিহ্বা ব্রাহ্মবাদিন্যঃ সপ্ত বধ্বশ্চ ।”

(হারিতঃ)

জী দ্বিবিধ। ব্রাহ্মবাদিনী এবং সপ্তবধু। অতএব জী-পুরুষ-  
রূপেই বা শাস্ত্রাধিকারের তারতম্য কোথায়? জীই হউন বা  
পুরুষই হউন গুণাত্মসারেই বর্ণ বিভাগ হওয়া উচিত।

পিতা চুরি করিয়াছে বলিয়া পুত্রের সাধু হইতে বাধা কি?  
যাহার পিতা কিংবা মাতা চুরি করিয়াছেন তাহার পুত্রকেও  
চুরি করিতেই হইবে কোন্ হীনবুদ্ধি ব্যক্তি এরূপ ব্যবস্থা  
দিবে? নীচ-কর্ম্মে উপদেশ দেওয়া কিংবা প্ররম্ভ করার  
জন্য চোরকে দণ্ড না দিয়া সমাজপতিরই দণ্ডনীয় হওয়া  
উচিত। অপর পক্ষে পিতা গুণবান হইলে পুত্রও গুণ-  
বান হইবেই এরূপ প্রতিজ্ঞা কিরূপে সম্ভবে? অহরহ ইহার  
ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। অতএব সকলেরই জন্য পথ  
উন্মুক্ত থাকুক—যে সাধনার দ্বারা যতদূর অগ্রসর হইবে সে  
ততদূর উন্নত হইবে। যে কেহ ব্রাহ্মণ্য গুণযুক্ত হইবে উদার-  
মতি বিচক্ষণ ব্রাহ্মগণ তাহাকেই জয়মালা দিয়া অভিনন্দিত  
করিবেন। তাহাতেই তাহাদের যথার্থ ব্রাহ্মগণ্য প্রমাণিত  
হইবে, এবং হিন্দু সমাজ এক অখণ্ডরূপে লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার  
করিয়া উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইবে।

## কৃত্তিবাস রচিত

# সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

স্বনামধন্য ব্রাহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

সুবিখ্যাত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকৃষ্ট

অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইল

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রসিদ্ধ অংশবদ্ধিত মূলগ্রন্থ অল্পসারে ৫৮৬ পৃষ্ঠায় হসম্পূর্ণ।  
ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের আঁকা রঙীন যোলখানি এবং এক বর্ণের তেত্রিশখানি শ্রেষ্ঠ ছবি  
আছে। রঙীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিত্রশালা হইতে সংগৃহীত ছবির অনুলিপি। অন্যান্য  
বহুবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্রাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রবি বর্মা, নন্দলাল বসু, সারদাচরণ উকীল,  
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধরন্ধর, অসিতকুমার হালদার, স্বরেন গঙ্গোপাধ্যায়,  
শৈলেন্দ্র দে প্রভৃতির স্থনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত।

অ্যাক্টযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইণ্ডিং মূল্য ১০।।০, প্যাকিং ও ডাকব্যয় ১-

প্রবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতে  
পাইবেন। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে না। গ্রাহক নম্বরসহ সত্তর.

আবেদন করুন! এই স্বযোগ সর্বপ্রকার ছফুল্যের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না।

প্রবাসী কার্যালয়—১২০।২, আপার মারকুলার রোড, কলিকাতা

# বাঁধতরীত শ্রাবতধারা আর গগন বেয়ে আকাশ আর বসুন্ধরা উঠেছে গান গায়



হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

GE 7300—রবীন্দ্র-সঙ্গীত

অচেনাকে ভয় কি আমার

ধনিল আহ্বান

দেবব্রত বিশ্বাস ও

কুমারী গীতা নাহা

GE 7301—রবীন্দ্র-সঙ্গীত

আশুনের পরশমণি

অনেক দিনের শূন্যতা

গৌরী চট্টোপাধ্যায়

GE 7302—রবীন্দ্র-সঙ্গীত

আমার হিয়া মাঝে

ধরা দিয়েছি গো

কালোবরণ দাস ও সম্প্রদায়

GE 7303—জাতীয় সঙ্গীত

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা

পনেরোই আগষ্ট আজ

রেকর্ড নাট্য

মহাত্মা গান্ধী

GE 7295—99

পাঁচখানি রেকর্ডে মহাপুরুষের

জীবনী

বিমল ভূষণ

GE 7304—আধুনিক

নাই বা গেলে এখনি গো

মধু বসন্ত জেগেছিল

ভারাপদ লাহিড়ী

GE 7306—পল্লী সঙ্গীত

ঘর ঘর কইর্যা মল্যাম

বাপরে বাপ জান বাঁচানো হলো দায়

আব্দুল মজিদ তালুকদার

GE 7307—পাকিস্তান-জাতীয়

গাওরে পাকিস্তানের গান

মরুভূমে ফুটল ফুল

ঝর্ণা দেবী

GE 7308—আধুনিক

জাগালে পাওয়ার আশা

যত দূরে থাকো

কুমারী অমিতা রায়

GE 7309—ছেলে ভুলানো ছড়া

ঘুম পাড়ানী মাসি পিসী

আয় আয় আয় আয়

নচিকেতা ঘোষ

GE 7305—আধুনিক

(জানি) আজ তুমি ভুলে গেছ

যে প্রেম নীরবে কাঁদে

## কলস্বিয়া

গ্রাহোফোন কোম্পানী লিমিটেড

কলিকতা বোম্বাই দিল্লী লাহোর করাচী



CB/8/48

# পুস্তক-পরিচয়

**তিন বুদ্ধস্থান**—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বোষ। 'মহাবোধি সোসাইটি, ৪-এ, বঙ্কিম চট্টার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা, ১- মূল্য ১।০ টাকা।

মলাটে 'তিন বুদ্ধস্থান' কিন্তু ভিতরে বইখানি 'তিন বৌদ্ধস্থান' নামে অভিহিত। তক্ষশিলা, রাজগৃহ ও অজন্তার ইতিহাস এবং শিল্পমহিমার কাহিনী গ্রন্থে কীর্তিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের এই তিন বৌদ্ধ তীর্থে গ্রন্থকার ভ্রমণ করিয়াছেন এবং নানী ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক পুস্তকের সাহায্যে তাঁহার প্রত্যক্ষ-দর্শনের অভিজ্ঞতাকে রূপায়িত করিয়া পাঠককে উপহার দিয়াছেন। উত্তর ত্রীকালিদাস নাগ ভূমিকায় বলিতেছেন, "এসিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ আজ নূতন সম্ভাবনায় দীপ্ত, তাই সাধারণ নরনারীদের এই রকম গ্রন্থের সাহায্যে উদ্ধৃদ্ধ করার সময় এসেছে।" খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত সহস্র বর্ষ ধরিয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, পারসীক, গ্রীক, শক, কুষাণ প্রভৃতি সভ্যতার সংমিশ্রণ তক্ষশিলায় ঘটে। ভগবান বুদ্ধের লীলাক্ষেত্র মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহ। রাজগৃহ ও নালন্দার ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভ খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। নিজাম রাজ্যের উত্তর সীমায় অবস্থিত অজন্তার গুহাগুলি অপূর্ব শিল্প, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের নিদর্শন। অজন্তার প্রাচীর-চিত্রাবলী চিরদিন দর্শকের মনে আনন্দ ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিবে। ছাপা ও নামের ভুলগুলি সংশোধন করিলে গ্রন্থখানি পরবর্তী সংস্করণে আরও সুষ্ঠু হইয়া উঠিবে। গ্রন্থকারের বর্ণনা পাঠকের কৌতুহল জাগ্রত করে।

**বিবস্ত্র মানব**—শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০/১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপর ফ্রেডের প্রভাব নিতান্ত অল্প নয়। আজকালকার বাংলা সাহিত্যেও সে প্রভাব কিঞ্চিৎ অনুভব করি, তবে তাহা পরোক্ষ। কিন্তু বর্তমান উপন্যাসখানিতে প্রত্যক্ষভাবে মনোবিজ্ঞানের আমদানি করা হইয়াছে। মানবের মন সামাজিক আবরণে আবৃত। মনোবিদ্যার নিরাবরণ মনের সাক্ষাৎ পাই। এই হিসাবে বিবস্ত্র কথাটি প্রযুক্ত হইয়াছে। লেখক উপন্যাসের নূতন উপকরণ সংগ্রহের অভিপ্রায়ে এই নব-বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। "বিবস্ত্র মানব" বহু মনোব্যাপিগ্রন্থ নরনারীর সমাবেশ করা হইয়াছে। লেখকের প্রচেষ্টায় সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ফ্রেড মনোবিদ্যার গবেষণা স্বরূপ করিয়া মনের গহনতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। নির্জান মনের আবিষ্কার তাঁহারই। কাজেই সংসারের সাধারণ মানুষের মন লইয়া লিখিলেও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস লেখা চলিত। বাহ্যিক মনোবিদ্যার গ্রন্থ এতগুলি চরিত্র একত্র করিলেও গল্পটির আকর্ষণ আছে। মোটামুটিভাবে মানবকে উপন্যাসের নায়ক বলিয়া ধরিতে পারা যায়। গল্পের পরিকল্পনার উপক্ষে অপরিহার্য হইলেও পরিশেষে নায়কের অন্তর্দ্বন্দ্ব পাঠকের মনে একটু অসমাপ্তির স্বাদ রাখিয়া যায়। বিস্তৃত ভূমিকাটি না লিখিলে ভাল হইত। উপন্যাসখানি অভিনবত্বের সন্ধানী পাঠককে আকৃষ্ট করিবে। গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া গ্রন্থকার নাম করিয়াছেন। পৃথ্বীশচন্দ্রের রচনারীতি প্রশংসনীয়।

প্রকাশিত হইল—

ভবানী

মুখোপাধ্যায়ের

জনপ্রিয় উপন্যাস

স্বর্গ

হইতে

বিদায়

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

মনস্বন্দ্যমূলক

\* স্বপ্নগ্রন্থ গ্রন্থ \*

অপূর্ব প্রচ্ছদচিত্র

\* মূল্য ন' সিকা

—রচনা-পারিগাটো, অঙ্গমোষ্টবে প্রত্যেকটি বই অতুলনীয়—

প্রসাদ ভট্টাচার্যের উপন্যাস

ইহাই সত্য ... ৩

আর্তনাদ ... ২।০

জনতার ইজিত ... ২

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

নিঃসঙ্গ ... ৩।০

বিমল মিত্রের গল্পগ্রন্থ

দিনের পর দিন ... ২

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ

ভাঙা বন্দর ... ২

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ

হলুদ পোড়া ... ২

আমিহুর রহমানের গল্পগ্রন্থ

পোষ্টকার্ড ... ২

আশালতা দেবীর উপন্যাস

কলঙ্কের ফুল ... ১।০

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

হৃদয় দিয়ে হৃদি ... ২।০

মধুরাতি জাগর ... ২।০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

ক্রোধ-মিথুন ... ২।০

(২য় সংস্করণ)

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর উপন্যাস

রাতের স্বপন (৩য় সং) ২।০

অসমঙ্গ মুখোপাধ্যায়ের হাসির গল্প

'সকলি গরল ভেল' ২

রাধাচরণ চক্রবর্তীর উপন্যাস

কো-এডুকেশন ... ১।০

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

প্রেম ও প্রয়োজন (যন্ত্রস্থ)

স্বধাংশুকুমার গুপ্তের

বিদেশী শ্রেষ্ঠ গল্প-সংকলন

সেরা লিখিয়েদের সেরা

গল্প (১ম খণ্ড) ... ১

ছেলেদের গাড়বার

বিশ্ব মুখোপাধ্যায়ের

সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায় ১

(Toilers of the Sea)

স্বধাংশুকুমার দাশগুপ্তের

লাসার অভিলাষ ... ৮০/০

বুদ্ধদেব বসুর

কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড ৮০/০

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

ডাকাতের সর্দার ... ৮০/০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

আকাশের আতঙ্ক ... ৮০/০

করলা পারলিমিং হাউস • ৮/১৫, হরি পাল লেন, পো:বিডন স্ট্রিট, কলিকাতা



# মহাজিঙ্কাসা

লুই ফিশারের নাম আজ আর কোনো মহলের কাছেই অপরিচিত নয়, তেমনি অপরিচিত নয় তাঁর 'The Great Challenge' বইটির নাম। 'মহাজিঙ্কাসা' তারই অনূদিত সংস্করণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক তথা সামাজিক বিবর্তন যে গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে আজ পর্যন্ত নানাপ্রকার আকাবাঁকা পথে এগিয়ে চলেছে তার ইতিহাস জানা প্রয়োজন আজ সকলেরই। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ এখনও প্রচুরভাবে প্রচারিত হয়নি। লুই ফিশার অত্যন্ত স্পষ্ট ও নির্দ্বন্দ্বভাবে আলোচনা করেছেন বলে আজকের দিনে এ-বইয়ের প্রয়োজন অপরিহার্য।

বিষয়সূচী : ডানকার্ক ও তারপর,  
আমেরিকার যুদ্ধ ষোড়শান,  
নুতন দৃষ্টিতে ট্যালিন ও হিটলার,  
ভবিষ্যদ্বাণী,  
লিট্‌ভিনভস্‌ ও জোসেফ ই ডেভিস,  
ব্রিটিশ জনগণ ও চার্চিলের ইংলও,  
ভবিষ্যতের আবির্ভাব,  
দক্ষিণ থেকে ভারতে,  
প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের মিলন,  
ভারতের সমস্যা,  
ভারতে ব্রিটিশ শাসন,  
প্যালেস্টাইনে নিরস্ত্র দশদিন।

লুই ফিশার  
প্রথম পর্ব। দাম চার টাকা ॥

পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত হরপ্রসাদ বৌদ্ধধর্ম  
শাস্ত্রীর অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও  
মননশীলতার পরিচয় আধুনিক বাঙালী সমাজের কাছে আজ আর  
নতুন করে দেবার নেই। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তাঁর যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ  
গবেষণা, এতদিন পর্যন্ত তা প্রাচীন সাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠাতেই  
আবদ্ধ ছিলো। সম্প্রতি বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত তাঁর প্রবন্ধগুলোকে একত্র  
সংকলিত করা হচ্ছে এই গ্রন্থে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের প্রতি  
যাঁর সামান্যমাত্রও শ্রদ্ধা আছে, এ গ্রন্থ তাঁর কাছে যে শুধু  
অমূল্য সম্পদ ব'লে বিবেচিত হবে তা-ই নয়, ভারতবর্ষের ইতি-  
হাসের প্রত্যেকটি পাঠকই এ-গ্রন্থকে অপরিহার্য বলে গ্রহণ করবেন।

বিষয়সূচী : বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাহার গুরু কে; নির্বাণ; নির্বাণ  
কর রকম; কোথা হইতে আসিল; হীনযান ও মহাযান; মহাযান কোথা  
হইতে আসিল; সহজযান; বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত; বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল;  
এখনও একটু আছে; উড়িয়ার জঙ্গলে; জাতক ও অবদান, দলাদলি; মহাসাংগিক  
মত; ধেরাবাদ ও মহাসাংগিক; মানুষ ও রাজা। দাম তিন টাকা ॥

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের যে  
গৌরবময় অধ্যায় আজ পর্যন্ত  
বাংলাভাষায় রচিত হয়নি, একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সেন  
সেই অধ্যায়কেই প্রকাশ করেছেন এই গ্রন্থে। অক্লান্ত অমূল্যস্বাসায়  
ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটনে যে আন্তরিকতার পরিচয় লেখক এখানে  
দিয়েছেন, তা তাঁর মতো নিষ্ঠাপরায়ণ ঐতিহাসিকের পক্ষে স্বাভাবিক  
হলেও, পাঠকের পক্ষে বিশ্বাসের বিষয়। এই গ্রন্থে প্রবোধচন্দ্র সেনের  
সার্থক সত্যানুসন্ধানের পরিচয় মিলবে। দাম তিন টাকা ॥

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের  
অচিরপ্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থ প্রাচীন প্রাচী

তিনটি সুদীর্ঘ কবিতা—এশিয়া, ভারতবর্ষ, বাংলা। কবিতা তিনটি  
ইতিপূর্বে যখন প্রকাশিত হয়েছিলো, তখন যারা পড়েছিলেন, তাঁরাই  
জানেন, বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে এ যেমন অভিনব তেমনি  
অনবদ্যও। কাব্যরসিকমাত্রই 'প্রাচীন ও প্রাচী' সংগ্রহ করবেন ॥

পূর্বকাশা লিমিটেড—পি১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩

**রাজকৃষ্ণ রায়**—শ্রীজ্ঞাননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য-সাধক চরিতামালা—৪০। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ রায় পরলোক-গমন করেন। মাত্র ৪৪ বৎসর ব্যাপী জীবনে তিনি যে রচনাসম্ভার রাখিয়া গিয়াছেন তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় আশী। তিনি নাট্যকাররূপেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গল্প, উপন্যাস, খণ্ডকাব্য, গীতিকবিতা, নাটক, প্রহসন, ঐতিহাসিক অভিধান, ইতিহাস প্রভৃতি সকলপ্রকার রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মূল সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের সরল পড়ানুবাদ তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি। বাংলায় গল্প-কবিতার সূচনা তাঁহার রচনাতে দেখিতে পাই। রাজকৃষ্ণ এবং গিরিশচন্দ্র সমকালেই নাটকে ভঙ্গ-অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। এক সময়ে ‘প্রহ্লাদ-চরিত্র’ প্রভৃতি নাটক রঙ্গমঞ্চের এক প্রধান আকর্ষণের বস্তু ছিল। এই বহুমুখী প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলে বাঙ্গালী-নিজেকেই শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে। এখানি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। এ সংস্করণে বহু নূতন উপকরণ সংযোজিত হইয়াছে।

**শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা**

**বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প**—পরিবেশক—শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী। শ্রীগুরু নাইবেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। দাম ২০। ৩ ও ৩ টাকা।

পরিবেশক বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা অধিকৃত রাখিয়া ছোটদের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের গল্পরূপ দিয়াছেন। ল্যান্থস্ টেলস জাতীয় এই ধরণের গল্প বাংলাতে সমাদৃত হইবে বলিয়া মনে হয়। যে সব লেখা

‘ক্লাসিক’এর পর্যায়ে পড়ে তাহাদের সঙ্গে পরিচয় থাকলে জাতীয় সংস্কৃতির ধারা অনুসরণ করিতে পারা যায় এবং বাংলা সাহিত্যের সহিত প্রীতিবন্ধনও গভীর হয়। এই ধরণের প্রয়াসমাত্রই প্রশংসনীয়। এই সংগ্রহে—আনন্দমঠ, কপালকুণ্ডলা, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবী চৌধুরাণী ও রাধারাণীর গল্পরূপ আছে। লেখার সঙ্গে রেখার সংযোগও আছে, এগুলি ছোটদের পক্ষে অপরিহার্য্য।

**তাড়াগড়া**—শ্রীকুমারেশ ঘোষ। রীডার্স কর্ণার, ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। দাম ২০। টাকা।

লেখক জানাইয়াছেন—১৯৩৯ সালের লেখা এই উপন্যাসখানি ছিল বিস্তৃত প্রেমোপাখ্যান। কিন্তু সাহিত্যের বাজারে প্রেমের ছড়াছড়ি দেখিয়া তিনি এটিকে যুদ্ধোত্তর যুগের সমস্তাশূলক (সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি) সামাজিক উপন্যাসে রূপান্তরিত করিয়াছেন।

কিন্তু আধুনিক যুগে প্রেমোপাখ্যান মাত্রই যে পরিত্যজ্য এ বিশ্বাস অনেকের নাও থাকিতে পারে। রসগ্রাহী পাঠক গল্পের মধ্যে সাম্প্রতিক কালের ছবি প্রতিকল্পিত দেখিতে চান—তাহাতে প্রেম এবং সমস্তা কোনটিকেই আধুনিক যুগে হইতে বাদ দেওয়া চলে না। দুই বস্তুর সংমিশ্রণে যে ছবিটি ফুটিয়া উঠে রস-বিচারে তাহা উত্তীর্ণ হইলেই গল্পটি সার্থক হয়। পরস্পর-বিচ্ছাদ ঘটনা মনে রেখাপাত করিতে পারে না।

আধুনিক যুগের সমস্তায় প্রেম কেন্দ্রচ্যুত নয়—তার প্রকাশভঙ্গিটি শুধু বিচিত্র। জীবন-দর্শনের দ্বারা সেই বিচিত্র অনুভূতিকে রসহানি না ঘটাইয়াও প্রকাশ করা সম্ভব।

যাহা হউক, এই উপন্যাসে লেখক গড়িবার ইঙ্গিত যথেষ্ট দিয়াছেন—সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্থ। তবে নূতন লেখার দুর্বলতা তিনি কাটাওয়া উচিত্তে পারেন নাই অর্থাৎ গল্পটিকে সমস্তাগুলির সহিত যুগ্ম ভাবে খাপ খাওয়াইতে

## রূপ ও রূপসী-

রূপের ঐখ্য বিধাতার দান; কিন্তু মানুষ সেই রূপের উৎকর্ষ সাধন করেছে—প্রসাধন-বিজ্ঞানের সমস্ত অমূল্যলব্ধি। সামান্য রূপের অধিকারিণীরাও তাঁদের রূপ প্রস্তুত করে তুলতে পারেন প্রকৃষ্ট প্রসাধনীর নিয়মিত সম্বাহারে। এ বিষয়ে ক্যালকেমিকোর নির্বাচিত প্রসাধনী সম্ভার রূপচর্চা-কারিণীদের বিশেষ সহায়তা করতে পারে।

মার্গো সোপ \* রেণুকা পাউডার  
ক্যাষ্টরল \* লাবণি স্ক্রো ও ক্রীম

ক্যালকাটা কেমিক্যাল



# বীজ, গাছ ও ফুল গ্লোব নার্শরীতেই ভাল

কয়েকটি বাছাই সজ্জী বীজ সবেমাত্র আমদানী হইয়াছে

প্রতি আউন্সের মূল্য

বাঁধাকপি গ্লোব গ্লোবী ২১০, বাঁধাকপি একট্রা আলি এক্সপ্রেস ২১০, বাঁধাকপি মাউন্টেনহেড ড্রামহেড ২১০, ফুলকপি আলি ও লেট স্নোবল ২২, ফুলকপি গ্লোব, বেটার ৪২, চিনেকপি ২১০, ওলকপি ১১০, বীট লাল গোল ১১০ (প্রতি পাউণ্ড ১৮), শালগম ১২, (প্রতি পাউণ্ড ১২২), লেটুস ১১০, মূলা বোম্বাই ১নং লাল ১০ (প্রতি পাউণ্ড ৬), মূলা লাল গোল ১২, টমেটো পারফেকশন ২৬০, পেঁয়াজ বোম্বাই ১০ (প্রতি পাউণ্ড ৬), গাজর আমেরিকান ১০ (প্রতি পাউণ্ড ১৩১), ফ্রেশ বীন ৮০ (প্রতি পাউণ্ড ১১০), সিলেরী ১১০, বেগুন আমেরিকান ২২, মটর আমেরিকান ৮০, (প্রতি পাউণ্ড ১১০), মরশুমী উৎকৃষ্ট ফুল বীজ (একশত বকম) প্রতি প্যাকেট ১০, শশা (শীতের) ৪২।

## দেশী সজ্জী বীজ

প্রতি আউন্সের মূল্য

বেগুন ১২, লতা ২২, উচ্ছে ৮০, করলা ২২, কাঁকড় ফুটি ১০, কুমড়া মিষ্ট ১০, চালকুমড়া ১০, খরমুজা ১০, খেড়ো দিলপছন্দ তিগু ১২, চিচিঙ্গা ১১০, বিজা ১০, টেঁড়ম ৮০, তরমুজ ১০, ধুন্দুল ১০, পামকিন ১১০, তুট্টা ১০, লাউ ১০, শশা ১০, স্কোয়াস ২২, পালম ৮০, শাক আলু ১০, নটেশাক ১০, ডেজোডাঁটা ১০, পুঁইশাক ১০, সীম ১০, বিজা ১২ পাতা ২২।

## অন্যান্য বীজ

প্রতি মণের মূল্য

ধেঁক ৩০২, শণ ৩০২, পাটবীজ ৮০২ (পাটবীজ ১নং স্পেশাল প্রতি সের ৫২)। এখন হইতে অগ্রিমসহ অর্ডার বুক করুন; নতুবা হতাশ হইবেন।

## সুবিখ্যাত চারা ও কলম

আমাদের নির্বাচিত প্রতি ওজনের মূল্য—আম ১৫২, লিচু ১৫২, লেবু ১০২, কমলালেবু ১০২, কলা ১০২, পেয়ারা ৮২, জামরুল ৮২, নারিকেল ১০২, গোলাপজাম ৫২, কাঁঠাল ৪২, কদবেল ২১০, জলপাই ৮২, ডালিম ৮২, আমড়া বিলাতি ৫২, সপেটা ১০২, নারিকেলী কুল ১০২, লকেট ১০২, বাতাবীলেবু ১০২, চাপা ৫২, ম্যাগনোলিয়া ২৫২, জবা ১০২, রজন ১০২, পামগাছ ৮২, ক্রোটন ৮২, বাউগাছ ৮২, লতানে ফুলগাছ ১০২, স্থপারি ২১০, স্থগন্ধি ও বড় জাতীয় গোলাপের কলম ১০২।

## কৃষিক্ষেত্রী পত্রিকার সম্পাদক ও গ্লোব নার্শরীর সভাপতি

শ্রীঅমরনাথ রায়, এফ, আর, এইচ, এস (লণ্ডন) প্রণীত

কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কৃষি-পুস্তক

|                 |     |                      |     |
|-----------------|-----|----------------------|-----|
| ১। বাংলার সজ্জী | ২১০ | ৫। সরল পোলটী-পালন    | ২১০ |
| ২। চাষীর ফসল    | ২১০ | ৬। সরল সারের ব্যবহার | ২১০ |
| ৩। আদর্শ ফলকর   | ২১০ | ৭। মাছের চাষ         | ২১০ |
| ৪। পুষ্পোদ্যান  | ২১০ | ৮। পশু খাদ্যের চাষ   | ২১০ |

ক্যাটলগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—



হাওড়া স্টেশনেও দোকান আছে।

পারেন নাই। দু-একটি চরিত্র যেন অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে, এবং 'সোনার বাঙালী' আবুত্বি অভিনয়টি ভাল হইলেও গল্পের ভার বৃদ্ধি করিয়াছে।

### শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দেশীয় রাজ্যে প্রজা-আন্দোলন—শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পুস্তকালয়, ২৯ রামানন্দ চট্টার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৫২, মূল্য চার টাকা।

ভারতের ইংরেজ আমলের দেশীয় রাজ্যগুলির ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইহাদের মধ্যে সূর্য বা চন্দ্রবংশ হইতে উৎপত্তি দাবি করেন একদল রাজবংশ হইতে ইংরেজের রাজ্যান্তের সময়কার নগণ্য জমিদার, এমন কি ডাকাতের সদার পর্যন্ত রহিয়াছেন। ইংরেজ সময়ে ইহাদের পোষণ করিয়াছিল নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্ত। সংখ্যায় ইহারা ছিল ৬০০ শতের অধিক যদিও উল্লেখযোগ্য বড় রাজ্যের সংখ্যা বেশী নয়। লেখক এই গ্রন্থে কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, উড়িষ্যার রাজ্যগুলি (নয়াগড়, তেনকনাল, তালচের, আটগড়, পল্লহরা, কেএমগড় এবং রণপুর), রাজকোট, ত্রিপুরা এবং কুচবিহার রাজ্যের প্রজা-আন্দোলনের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য এই সকল আন্দোলনের খবর বাহির হইতে খুব বেশী পাওয়া সম্ভব নহে, তবু লেখক যে যথেষ্ট পরিমাণ সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা প্রশংসার্য। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্টের পর হইতে দেশীয় রাজ্যের আমল পরিবর্তন হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ইহাদের সংখ্যা কমিয়া এক-দশমাংশ হইয়া গিয়াছে। কয়েকটা রাজ্য-সমবায় গঠিত হইয়াছে। কাশ্মীরে ও হায়দরাবাদে সংগ্রাম চলিতেছে। ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধে দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণের অবদান নগণ্য নহে। লেখক এই গৌরবময় ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকসাধারণের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। ভবিষ্যৎ সংস্করণে অবশ্য নূতন করিয়া অনেক জিনিষ লিখিতে হইবে। কারণ দেশীয় রাজ্যের সাম্প্রতিক ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের পাঠকগণের নিকট এই পুস্তক আদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

### শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

উদ্বাস্ত—শ্রীদেবদাস ঘোষ। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য ৩।

রামলাল সে যুগের মানুষ। বিরাট দেহ এবং এচণ্ড কর্মশক্তির অধিকারী। রাজসরকারে সামান্য বেতনে চাকুরী করে এবং ছুটি-ছাটী পাইলেই হাঁটপথে গ্রামের দিকে রওনা হয়। পিতৃপুরুষের ভিতর প্রতি তার দুর্নিবার আকর্ষণ। রামলাল স্বোপার্জিত অর্থ মাথাগোঁজার মত একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু তৎসঙ্গেও মনে তার স্বপ্ন ছিল না। তার একান্ত বাসনা ছিল নিজে একখণ্ড জমি ক্রয় করিবে—যে মাটিতে ফলিবে রান্ধা ধান। ধান, খড়, মরাই...হাল হেলে যে গৃহস্থের নাই সে আবার গৃহস্থ কিসের। ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে রামলালের জীবনের কোন আকাঙ্ক্ষাই অতৃপ্ত রহিল না। জমিভরা ফসল, গোয়ালভরা গরু মরাইভরা ধান—পল্লীচাষীর জীবনে যা কিছু কাম্য সবই সে অর্জন করিয়াছে—ভোগ করিয়াছে।

রামলালের পরে সুরু হইল বিহারীলাল, চুনীলাল, শ্রামলাল এবং সর্বশেষে পিয়ারীলালের পালা। শ্রামলালের জীবনের অর্ধেক সে নিরবস্থির স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবার সুযোগ পাইয়াছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের দিক হইতেই বিপর্যয় দেখা দিল এবং সেই বিপর্যয়ের পূর্ণগ্রাসে পিয়ারীলাল সর্বশাস্ত হইয়া গেল। সেকাল এবং একালের মানুষের জীবনযাত্রার পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মাটি ও চাষীদের কেন্দ্র করিয়া উপস্থাস্থানি লিখিত হইয়াছে।

নিরক্ষর চাষীদের কর্তৃত্ব জমির প্রতি যে কি গভীর ভালবাসা একথা লেখক কৃতিত্বের সহিত দেখাইয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠকসমাজে আদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

### শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

পৃথিবীর জাতীয় সঙ্গীত—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

আই-এ-পি. এণ্ড কোং লিঃ। ৮সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা। দাম আট আনা।

ভারতবর্ষ, চীন, ইংলণ্ড, সার্বিয়া, তুরস্ক, আয়লণ্ড, ইতালী, রাশিয়া, বেলজিয়ম, স্পেনেনগ্রে, গ্রীস, জাপান, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া—এই চৌদ্দটি দেশের জাতীয় সঙ্গীতের সংগ্রহ। কয়েকটি বৈদেশিক সঙ্গীতের অনুবাদ মতোজনাথ দত্তের, কয়েকটি গ্রন্থকারের। অনুবাদগুলি সরস এবং হৃদয়গ্রাহী।

প্রভাতী—ডাঃ হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। রায়চৌধুরী এণ্ড কোং, ১১৯ আশুতোষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

কয়েকটি সরল, অনাড়ম্বর গল্প।

বৈজয়ন্তী—নিশিকান্ত। আশ্রম লাইব্রেরী, পণ্ডিতেরি। মূল্য ১৬০।

আধুনিক বাংলা কবিতায় নিশিকান্ত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাহার রচনায় গভীর উপলব্ধি ও আন্তরিক অনুভূতির পরিচয় আছে। ভাষা ও ছন্দ সংযত, বলিষ্ঠ এবং মাঝলীন। 'বৈজয়ন্তী'র সূচনা ভারতের মুক্তিসঙ্গীতে। বর্তমান সভ্যতার আত্মঘাত ও ভাবী যুগ-পরিবর্তনের আভাস অনেক কবিতার মর্মবাণী।

কবিতাবলী—সংস্কৃত ও প্রাকৃত নারীকবিগণ কর্তৃক রচিত। শ্রীমদা চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত। বিদ্যভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিম চৌধুরী স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

মোট ১৫৮টি কবিতার বঙ্গানুবাদ এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে নারীর শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিক অধিকার কিরূপ ছিল, কবিতাগুলি হইতে তাহার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। 'রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণে' গ্রন্থকর্ত্তা ঐ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। মনে হয়, তখনকার জীবন সহজ ও সরল ছিল; তাহা সংসারবিমুখ ও ছিল না, উচ্চ আদর্শবর্জিতও ছিল না। তাহাতে আধ্যাত্মিকতা এবং আধিভৌতিকতার একটা সামঞ্জস্য ছিল। গ্রন্থকর্ত্তার আলোচনা সারগর্ভ এবং অনুবাদ প্রাঞ্জল।

ভোরের পাখি—নিশিকান্ত। এম্. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ। ১ সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৬০।

"নীল অমরার নীড় হতে আজ এসো আমার ঘূলার কুসায়,  
এসো আমার আশার পাখি, আকাশ-চাওয়া বাণী  
স্তব্ধ শৈলশিখর হতে আনো অচল নিখরতায়  
নিরব জ্যোতির সুরের শিখায় জ্বালাও জীবনধানি।"

জীবনের উদ্ভূমবী শিখা অধিকাংশ কবিতাকে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। 'হংসকুপাণ', 'সহর' প্রভৃতি কবিতায় কবি বস্তুরূপের বাথার্থ্যকে উপেক্ষা করিয়া ভাবরূপকে মুক্তি দিতে চাহিয়াছেন। তাহার এই 'ইম্প্রেশনিষ্ট'-ভঙ্গীতে নূতনত্ব আছে।

নৌতুন পৃথিবী—শ্রীসন্তোষকুমার চন্দ। সংস্কৃতি প্রকাশনী। বরিশাল। চার আনা।

বইখানি ছোট, কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়। ইহার কবিতাগুলি ভাবে, ভাষায়, ছন্দে সুমধুর।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়.



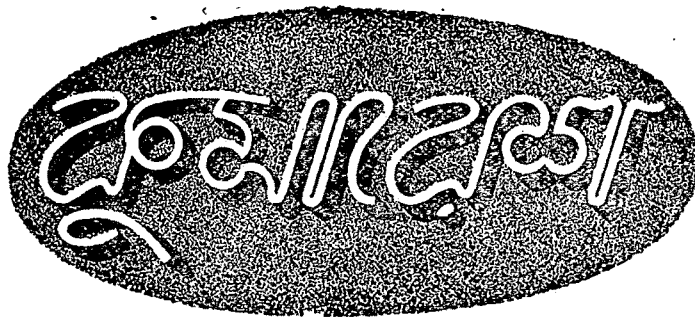
## ‘শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি’

শরতের অরুণ আলোর অঞ্জলির দান নিতে হলে চাই সবল,  
স্বস্থ, নীরোগ দেহ।

অথচ এই ঋতু পরিবর্তনের সময় নীরোগ দেহ অত্যন্ত বিরল।

দেহকে নীরোগ রাখবার জন্ত সবচেয়ে পরিশ্রম করতে হয় লিভারকে।

তাই **কুমারেশ** লিভার ও পেটের সকল পীড়া নিশ্চিতরূপে  
নিরাময় করা ছাড়াও লিভারকে শক্তিশালী করে দেহকে  
নীরোগ রাখে।



দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ এণ্ড কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ  
সালকিয়া :: হাওড়া



**দম্পতি** (৪র্থ সংস্করণ)—শশিকুমার সেন গুপ্ত। প্রাপ্তিস্থান—এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৫ টাকা।

বাংলা-সাহিত্যে যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে ডাঃ শশিকুমার সেনগুপ্তের দম্পতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বস্তুতঃ এই পুস্তকের আগাগোড়া শালীনতা ও ভাষার শুচিতা বজায় রাখিয়া লেখক যে সুরচির পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। যৌন-তত্ত্বের মত জটিল বিষয়ের আলোচনায় পরলোকগত গ্রন্থকার যোগ্য অধিকারী ছিলেন। 'দম্পতি'র উপক্রমণিকা অধ্যায়ে বিশদভাবে এবং পুস্তকটির অন্ত্যন্ত বহু স্থানে দম্পতিক এই কথাই তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, কামশাস্ত্র-আলোচনার মূখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সংযমশিক্ষা। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত আর কোন যৌনতত্ত্ববিষয়ক পুস্তকে সংযমের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। দাম্পত্য-ব্যবহার এবং উপচারাদির কথা বলিতে গিয়া লেখক বিশেষভাবে কামসূত্রপ্রণেতা বাস্তুশাস্ত্রের উপরেই নির্ভর করিয়াছেন। তাঁহার মতে—“বাস্তুশাস্ত্র যে সকল ব্যবস্থা, উপদেশাদি দিয়াছেন তাহাদের মূলতত্ত্বগুলি সর্বকালোপযোগী।” আধুনিক কালে বাঁহারা বাস্তুশাস্ত্রকে খাটো করিয়া পাশ্চাত্য যৌনতত্ত্ববিদদের প্রেষ্ট্র প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন এবং তাঁহার কামশাস্ত্রকে অঙ্গীল বলিয়া নাক-সিটকান, বর্তমান পুস্তকের উপক্রমণিকা অধ্যায়ে তাঁহাদের বিশেষ ভাবে প্রনিধানার্থে। কামসূত্রের উপসংহারে বাস্তুশাস্ত্র বলিয়াছেন “অন্ত শাস্ত্রস্ত তত্ত্বজ্ঞো ভবত্যে জিতেন্দ্রিয় বঃ”—অর্থাৎ এই শাস্ত্রের তত্ত্ব জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। সাধারণ পাঠকের ভ্রান্তি নিরসনের জন্ত লেখক কামসূত্রের ‘ত্রিগর্ভ প্রতিপত্তি’ নামক অধ্যায়টি আগাগোড়া অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। লেখকের পুরাতনের এতি প্রজ্ঞা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এ দুইয়েরই পরিচয় এই পুস্তকে আছে। একজন বিশেষজ্ঞ টিকিংসকের লেখা বলিয়া এই পুস্তকে যৌন-স্বাস্থ্য এবং সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এমন কতকগুলি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে যাহা বাজারে প্রচলিত অন্যান্য যৌনতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে নাই। পুস্তকের ভাষা আত্মোপাস্ত গুরুগম্ভীর, অথচ প্রাঞ্জল এবং বস্তুক বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী। যে সকল দম্পতি ধর্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিগর্ভের সাধনা করিয়া গার্হস্থ্য-জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে চান, শশিবাবুর পুস্তক তাহাদিগকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিবে।

পুস্তকের ৪র্থ সংস্করণ লেখকের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছে।

**নতুন পাঠশালা**—শ্রীবীরেন দাশ। আগুতোষ লাইব্রেরী, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

গান্ধীজী-প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষা বা Basic Education লইয়া আজ দেশের শিক্ষিত-মহলে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। অনেক শিক্ষাবিদ আজ একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছেন যে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় মস্তিষ্কের সহিত হাতের যোগ না থাকায় শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না। অনেক চিন্তাশীল দেশহিতৈষীর অভিমত এই যে, স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের বুনিয়াদকে যদি হৃদয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তাহা হইলে এদেশের গ্রামে গ্রামে বুনিয়াদি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার দিকে রাষ্ট্রপরিচালকদের মনোযোগী হইতে হইবে।

‘নতুন পাঠশালা’র লেখক শ্রীবীরেন দাশ চলচ্চিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। কিছুকাল আগে Basic Education লইয়া একটি Documentary Film বা শিক্ষামূলক চিত্রের গল্প তৈরি করিবার ভার তাঁহার উপর হস্ত হয়। এই সময় বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন মানসে তিনি কয়েকটি বুনিয়াদি শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সেই অভিজ্ঞতা এবং গ্রাম্য পাঠশালা সম্বন্ধে নিজের বাল্যস্মৃতি এ দুটিকে মিশাইয়া তিনি বর্তমান উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছেন। রাঙামাটি গ্রামের জমিদারের ছেলে সুরথ যগ্রামে বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তন করিতে গিয়া

কি দারুণ অতিকূলতার সম্মুখীন হইল এবং শেষ পর্যন্ত কিরূপে সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রমপূর্বক ‘নতুন পাঠশালা’ স্থাপন করিয়া ছাত্রদের প্রকৃতি এবং গ্রামের শ্রী কিরাইয়া দিল এবং ছাত্রেরা কেমন দৃঢ়তার সহিত সত্যগ্রহণ পরিচালনা করিয়া নিজেদের দাবিকে হুপ্রতিষ্ঠিত করিল তাহাই এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। বীরেনবাবু একজন ওস্তাদ গল্প বলিয়ে। কাহিনীটি তিনি এমনি চিত্তাকর্ষকভাবে বলিয়াছেন যে, তাহা পাঠকের মনকে শেষ পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যায় এবং গল্পটি যে উদ্দেশ্যমূলক সেকথা মনেই থাকে না।

উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসকে রসোত্তীর্ণ করা দুঃসাহস ব্যাপার। বীরেনবাবু সেই কঠোর পরীক্ষায় অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। স্বাধীন ভারতে আজ জাতিগঠনমূলক কার্যের দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। এমন সময়ে বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তনে উৎসাহী ব্যক্তিগণ ‘নতুন পাঠশালা’ হইতে কার্যকরী পথার হৃদিস পাইবেন।

**বাংলা বর্ষলিপি**—(১৩৫৫) সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী। সংস্কৃতি বৈঠক ১৭, পণ্ডিতরা প্রেস। মূল্য দুই টাকা।

সংস্কৃতি বৈঠক ১৩৫১ সন হইতে প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে এক এক খণ্ড বাংলা বর্ষলিপি প্রকাশিত করিয়া বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছেন। এই বাংলা ‘ইয়ার বুক’ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বাংলার ঘরে ঘরে বিশেষ সমাদরলাভ করিয়াছে। বর্তমান বৎসরের (৫ম বর্ষ) বর্ষলিপি পূর্ব পূর্ব বার অপেক্ষা হৃসম্পাদিত ও চের বেশী চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। রাজনৈতিক দিক দিয়া ১৯৪৭ সালটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বৎসরেই ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অধীনে ভারত ডোমিনিয়ন জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, বাংলা ও পঞ্জাব বিভাগ ইত্যাদি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয়ে সাধারণ পাঠকদের বাহাতে মোটামুটি জ্ঞানলাভ হয় সেইজন্য সম্পাদকমণ্ডলী বাংলা বর্ষলিপিকে প্রচুর তথ্যসম্ভার সমৃদ্ধ করিয়া টালিয়া নাজিয়াছেন। পুস্তকখানি শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই পক্ষে বিশেষ উপযোগী, তবে সাংবাদিকদের নিকট এরূপ একখানি সময়োপযোগী পুস্তক অপরিহার্য্য বলিয়াই গণ্য হইবে।

প্রবাসীতে প্রথম বৎসরের বাংলা বর্ষলিপির সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা ‘বর্তমানের বিশিষ্ট বাঙালী’ নামক অধ্যায়টির ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছিলাম। বর্তমান বৎসরের বর্ষলিপিতে নামের তালিকা বড় হইয়াছে বটে, কিন্তু মনে হয় যেন এমন কয়েক জন বিশিষ্ট বাঙালীর নাম বাদ পড়িয়াছে এই অধ্যায়ে উল্লিখিত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের পাশে স্থান পাইবার যোগ্যতা যাহাদের আছে।

**শ্রী শ্রীমনসা পূজা ও কথা**—ভক্তিতীর্থ শ্রীউমেশ চন্দ্রবর্তী প্রাপ্তিস্থান, ১২০১২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ আনা।

মনসাপূজা বাংলাদেশের বিশিষ্ট পূজাপার্বণসমূহের অত্যন্তম। বাংলাদেশে এই পূজার বহুল প্রচলন আছে। চাঁদসদাগর ও মনসার কাহিনী পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে বর্ণিত আছে। তদবলম্বনে ময়মনসিংহের নারায়ণ দেব এবং বংশীদাস, বিজয় গুপ্ত প্রমুখ কবিগণ মনসামঙ্গল, মনসার পাঁচালী ইত্যাদি রচনা করিয়াছেন। বর্তমান পুস্তকে ভক্তিতীর্থ মহাশয় মনসাপূজার ধ্যান এবং বাংলা পয়সার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত পদ্মপুরাণের সার সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। বাংলাদেশে ঘরে ঘরে মূর্ত্তি গড়িয়া অথবা ঘট স্থাপন করিয়া মনসাপূজা হয়। এই পুস্তকখানি মনসার ভক্তদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। পুস্তকের ‘প্রাথমিক’ অধ্যায়ে লেখক ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নাগপূজার প্রচলন সম্বন্ধে যে-সকল কথা লিখিয়াছেন তাহা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং গভীর গবেষণাপ্রসূত।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০১২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।



রাধার বিরহ  
 শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

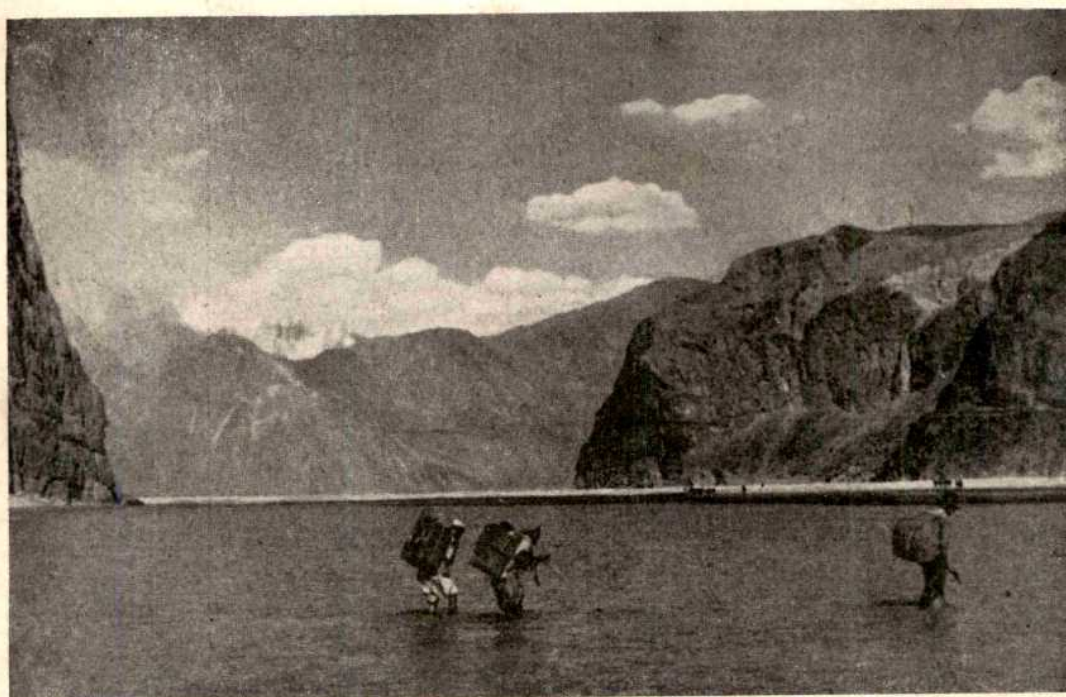
প্রবাসী প্রেস, কলিকতা



উত্তর কাশ্মীরের যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্তী দৃশ্যাবলী



কাশ্মীরের কারাকোরাম পর্বতের বালুকাময় শাইয়ক উপত্যকা



খাপলুর নিকটে শাইয়ক নদী অতিক্রমণ

# প্রবাস

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্  
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

৪৮শ ভাগ  
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৫৫

{ ৩৪ সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ

### রাষ্ট্র রক্ষা

ভারতরাষ্ট্রের পরীক্ষার দিন অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। বাহিরের শত্রু কাশ্মীরে আগুন জ্বালাইয়াছে, হায়দরাবাদে বিরোধের চেষ্টায় উদ্ভাস দিয়াছে ও বিদেশে ভারতের কুৎসার প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ভিতরের শত্রুর একটি দল দেশের সংহতি ও সংগঠনের পথে প্রতিপদে বাধা দিয়াছে। দেশের শ্রমিক কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষের আগুন জ্বালাইয়া, শ্রেণীবিরোধের সৃষ্টি করিয়া সমস্ত গঠনমূলক কার্য অচল করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং দেশের তরুণ ও কিশোরদিগের মন উদ্ভ্রান্ত করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধাম অসংযমের পথে ধ্বংসের মুখে লইয়া গিয়াছে। আর একদল শত্রু—যাহারা অধিকাংশই অতি ঘৃণ্য অর্থপিশাচ—দেশকে দুর্নীতি ও কলুষের পক্ষে নিমজ্জিত করিয়া চুরির পথে নিজেদের অর্থাগমের ব্যবস্থা করিয়াছে। দেশের ভিতরের ও বাহিরের শত্রু পরস্পরের সাহায্যে এইরূপে রাষ্ট্রকে দুর্বল করিয়া আসিয়াছে। উপরন্তু দুঃখের কথা এই যে, দেশের উন্নতির ও রক্ষার ভার যে সকল নেতার উপর দিয়া দেশের লোক এতদিন নিশ্চিন্ত ছিল, তাহাদেরও অধিকাংশই দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থের সন্ধানে দেশকে বলি দিবার আয়োজন করিয়াছেন।

ভারতরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ এইরূপে অনিশ্চিতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। আজ রাষ্ট্রের বিপদ কৌনদিক হইতে আসিতে পারে তাহা কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় দেশের কর্তৃপক্ষগণের উচিত অস্ত্র সকল চিন্তা ছাড়িয়া ঘরের শত্রু দমন ও বাহিরের শত্রুনিপাতের ব্যবস্থায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা। আজ যে সকল লোক বা দল দেশের বিপদের সুযোগে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া দলগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছে, তাহাদের বিধাস-ধাতকতার পথ সবলে রোধ করা, প্রয়োজন। চোরাকারবার ও চোরা চালানের স্রোতে দেশের লোক ডুবিতে বসিয়াছে, যে সকল অর্থপিশাচ উহাতে লিপ্ত তাহাদের কঠোর শাস্তি দিবার ও নির্দয়ভাবে দমন করিবার সময় আসিয়াছে। ঘরের শত্রু বিনাশ ভিন্ন দেশরক্ষার উপায় নাই এবং পিছনে শত্রুর চর ও পক্ষমবাহিনীর দল থাকিতে দেশরক্ষার দল বাহিরের শত্রু ঠেকাইতে সক্ষম হইবে না।

“হায়দরাবাদের দাতপ্রতিধাতে সারা ভারতে আগুন জ্বলিবে”—এই কথা সেদিন মাত্র পাকিস্থানের মুখপাত্রের কাছে আমরা শুনিয়াছি। ইহাতে আমাদের বিচলিত হইবার কোনই কারণ ছিল না যদি না দেশে বিদেশীর পক্ষমবাহিনী ও শত্রুপক্ষের সহায়ক বিপ্লববাদী থাকিত। অস্ত্রবিরোধ যাহারা চাহে তাহারা বিধাসধাতকতার চরম সুযোগের দিনের প্রতীক্ষায় সকল প্রকার আয়োজন করিতেছে। একথা ত সকলেই জানে। কিন্তু প্রতিকারের ব্যবস্থা কি হইতেছে তাহাই আমরা কেহ এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। দেশরক্ষা-বাহিনীতে এক পশ্চিম বাংলার দেড় লক্ষ লোক ভর্তি হওয়া প্রয়োজন, সেখানে দেড় হাজার মাত্র হইলে চলিবে কি করিয়া? যদি এক-একবারে পনেরো হাজার যুবক নিয়মশৃঙ্খলা ও অস্ত্রের ব্যবহারে ছয় মাসেরও “প্রখর শিক্ষা” (intensive training) পায় তাহা হইলেও পাঁচ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশ স্বপ্রতিষ্ঠ হইবে না। আজ প্রয়োজন জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে কৃষক, ছেলে, বাগদী, বাউরি, কৈবর্ত, মাহিয় যুবকের সম্মুখে দেশরক্ষায় আত্মনিয়োগের উজ্জল চিত্র ধরা। আজ উচিত প্রত্যেক যুগ ও শিক্ষিত বাঙালীর ছেলেকে আহ্বান করা যন্ত্রযুগে ও বিমানবহরের কার্যে শিক্ষালাভ করার জন্য। সীমান্তরক্ষী সামরিক পুলিশবাহিনীতে বাংলার যুবশক্তিকে সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া উচিত আজই, এখনই। “সময় নাই, সামর্থ্য নাই, ব্যবস্থা নাই” একথাই ত আমরা শুনিয়া আসিতেছি। এতদিনে ডাক্তার রায়ের মস্তিষ্কে কার্যের সূত্রপাত হইয়াছে ইহাও অতি শুভ লক্ষণ। এখন এই কাজ সবচেয়ে অগ্রসর হইতে থাকে ইহাই আমাদের কাম্য। বাংলার যুব-শক্তির অপব্যবহারের ত চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। নিয়মশৃঙ্খলা বিরোধী উদ্ধাম ছাত্রবৃন্দ নিজেদের ও পরের অনিষ্টই করিতেছে, তাহাদের মধ্যে এখন নিয়মশৃঙ্খলার প্রবর্তন করা নিতান্তই প্রয়োজন, না হইলে তাহাদের সর্বনাশ অনিচিত এবং সেই কারণেই দেশের ভবিষ্যৎও অন্ধকার। বিগত ছয় বৎসরে নানা দুর্ঘোষণা ও দুর্বিপাকের সুযোগে একদল প্রয়োচক ছাত্রদের সর্বনাশ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে-শিক্ষকের আসনে বসিয়া আছে, আবার অনেকে নানা প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক দলের “নেতা”। এই সকল প্রকাশ বা ছদ্মবেশী প্রয়োচকদিগের

হাত হইতে ছাত্রদিগকে উদ্ধার করার বিশেষ চেষ্টা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

চোরাকারবারীর দল দেশের লোকের মন ক্লিষ্ট ও উদ্ভ্রান্ত করিয়া বিশেষ অনিষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চোরা-কারবার বা চোরা চালানী, সরকারী কর্মচারী ও উচ্চতর অধিকারীবর্গের বিশেষ সাহায্য ছাড়া চলিতে পারে না একথা সকলেই জানে। তবে প্রতিকারের ব্যবস্থা হয় না কেন?

### মহম্মদ আলি জিন্না

পাকিস্তান ডোমিনিয়নের গবর্নর-জেনারেল মহম্মদ আলি জিন্না ১৮৭৬ সালে করাচীর এক খোজা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

করাচীতে শিক্ষা সমাপনান্তে ১৬ বৎসর বয়সে মিঃ জিন্না ইংলণ্ডে শিক্ষালাভার্থ গমন করেন। এখানে তিনি দাদাভাই নৌরজীর সম্পর্কে আসেন।

ইংলণ্ডে শিক্ষা সমাপনের পর তিনি ১৮৯৭ সালে বোম্বাইয়ে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তিনি তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯১১ সালে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনেও তিনি যোগদান করেন। ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সংস্কারের ব্যাপারে তাহাকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হয়। সর কিরোজ শা মেটা তাহাকে নিরীচন করেন।

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৩ সালের পূর্বে পর্যন্ত তিনি লীগে যোগদান করেন নাই। ১৯২০ হইতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তাহাকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখা যায় নাই। স্টিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়া তিনি কংগ্রেস ছাড়িয়াছিলেন। মুসলিম লীগেরও তখন জ্বলন। লর্ড আরউইনের আগমনে মিঃ জিন্নার সুদিন দেখা দিল। ১৯২৮ সালে তাহার মতের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। তার পর তাহার ১৪ দফা সর্ব প্রকাশ পাইল।

১৯৩৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করে। তখন হইতেই মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগঠিত করিতে তিনি উত্তেজিত হইলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলে তিনি ‘মুক্তি-দিবস’ ঘোষণা করেন।

কংগ্রেস মন্ত্রীদের কারাবাসের সময় মিঃ জিন্না ব্রিটিশ গবর্নরদের সাহায্যে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ পান।

১৯৪৫ সালে তাহার দরুণই সমিলা আলোচনা ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশ মন্ত্রি-মিশন ১৯৪৬ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে আসিয়া উপস্থিত হন। ১২ই মে তারিখে আলোচনা ব্যর্থ হইবার সংবাদ ঘোষিত হয়।

জুলাই মাসে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলে হাজার হাজার লোকের প্রাণনাশ ঘটে। ১৯৪৭ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে ঘোষিত হয় যে, লর্ড মন্টগুমার্টেন মিঃ জিন্না ও মহাত্মা গান্ধীকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। ১৯৪৭

সালের ৩রা জুন তারিখে ভারতের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ সম্পর্কে ব্রিটিশ পরিকল্পনা ঘোষিত হয়। ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান এই দুইটি ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। মিঃ জিন্না পাকিস্তানের গবর্নর-জেনারেল ও পাকিস্তান গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

### কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের বিগত অধিবেশনের শেষ দিনে (২২শে ভাদ্র তারিখে) ভারত-রাষ্ট্রের প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ সমস্তা সম্বন্ধে দুইটি বিবৃতি দান করেন। দৈনিক সংবাদপত্রে তাহার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে লোকের মনে যে সকল প্রশ্ন আলোড়ন ও হুসিভার সৃষ্টি করিতেছিল তাহার কোন সত্ত্বর পাওয়া যায় নাই। পাকিস্তানের মিথ্যাচার, নিজাম মীর ওসমান আলী খাঁর পৃষ্ঠপোষিত রাজাকারদলের বর্বরতা সম্বন্ধে নুতন কোন কথা বলিবার ও জানিবার নাই। যে মনোভাবের ফলে ভারতবর্ষকে ধি-খণ্ডিত করিয়া পাকিস্তানের জন্ম দিতে হইয়াছে তাহার স্বরূপ কাশ্মীর আক্রমণে ও হায়দরাবাদ রাজ্যের শাসক-গোঞ্জির টালবাহানায় স্বাধ্যালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই মনোভাব যত দিন টিকিয়া থাকিবে তত দিন জাকরউল্লা খাঁয়ের মত লোকের প্যান-ইসলামী গর্জন ও নির্লজ্জ মিথ্যাকথনের শেষ হইবে না। সুতরাং পণ্ডিত নেহেরুর মন্ত্রি-সভার অসীম সত্বনশীলতায় কোন সফল পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না। অনেক সময় মনে হয় এই ব্যর্থপ্রয়াস না করিলে ব্যাপার এত বিপজ্জনক হইয়া উঠিত না।

ত্রিগেডিয়ার ওসমান প্রমুখ বাঁহারা বীরের মত যত্ন বরণ করিয়াছেন তাহাদের জন্ত দুঃখ করিব না, কিন্তু, ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারস্বল্পের যুক্ত-নীতির ফলে যে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার বিপদ ত দেশের লোকে বুঝিতে পারিতেছে না। ভারত-রাষ্ট্রের সৈন্ত-বাহিনীকে আক্রমণাত্মক যুক্ত-নীতি অবলম্বন করিতে দেওয়া হইতেছে না বলিয়াই ত আজ দশ মাসের মধ্যে পাকিস্তানীদের কাশ্মীর হইতে হটাইতে পারা গেল না, এইরূপ একটা অভিযোগ দেশের লোকের মনে অত্যন্ত থাকিয়া আনাগোনা করিতেছে। ভারত-রাষ্ট্রের নাগরিক-স্বল্পের এই সদাশয়তার কারণ কি, এই কথা জানিবার অধিকার আছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে এই অভিযোগ ধ্বনিত হয় নাই কেন, তাহা জানিবার দাবী আমরা করিতেছি।

হায়দরাবাদ-সৃষ্ট সমস্তার প্রসঙ্গে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু বলিয়াছেন :

ভারতের অবস্থায় অল্প কোন দেশ, ভারতের বুকের উপর একটি-রাজ্যের এই-রূপ সজ্জা কিছুতেই বরদাস্ত করিত না। তথাপি বর্তমান ভারত গবর্নমেন্ট আপোষ-মীমাংসার আশায় ধৈর্যসহকারে আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছেন। আমরা অতিরিক্ত মাত্রায় ধৈর্যশীল বলিয়া আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইতেছে। এ অভিযোগ অনেকটা সত্য। এই অভিযোগের উত্তরে পণ্ডিতজী বলিয়াছেন যে, যে ধৈর্য ও সংযমের নীতি, “শান্তিপূর্ণ” আপোষের নীতি অবলম্বন করিয়া



আমরা বিদেশী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি, “পাকিস্তান” ও হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে তাহাই প্রয়োগ করিতেছি; এরূপ না করিলে আমাদের “বহু ঘোষিত নীতিরই ব্যতিক্রম করা হইত।” কিন্তু ভারতরাষ্ট্রের নেতৃবর্গের অমূল্য নীতির বিপদ ত এখানে নয়। বিপদ এই যে তাঁহারা পাকী-নীতির কথাও ভাবিতেছেন এবং জগতের অগ্রাঙ্গ দেশের আচরিত নীতি অবলম্বন করিয়া তাহার ফলাফলের পরীক্ষা করিতেও সাহস পাইতেছেন না। এই দ্বিধাই ভারত-রাষ্ট্রকে ঘরে-বাহিরে বিপন্ন ও অপদস্থ করিতেছে। এই দু-মুখো নীতি বর্জন না করিলে বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

হায়দরাবাদ রাজ্যের সমস্তা সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ঘোষণা করা হইয়াছে। ২৬শে ভাদ্রের সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত-রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন—যদি নিজাম বাহাদুর সেকেন্দ্রাবাদ সেনানিবাসে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বসেন তবে জোর করিয়া তাঁহারা এই রাজ্যে প্রবেশ করিবে। সৈয়দ কাশিম রাজভির গুণ্ডাবাহিনী তাহাতে বাধা দিবে নিশ্চয়ই। ফলে দাক্ষিণাত্যে ডামাডোল বাধিয়া উঠিবে। নিজাম বাহাদুরের পাকিস্তানী পৃষ্ঠপোষকেরা কি তখন চূপ করিয়া থাকিবে? পাকিস্তানের শত্রু যেন এরূপ সুবুদ্ধি না দেয়, ইহাই প্রার্থনা করি। তাহা হইলে কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ সমস্তা একসঙ্গে মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। প্যান-ইসলামী জুজুর পরীক্ষাও এই সঙ্গে হইয়া যাইতে পারে।

### কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরু

গত ২০শে ভাদ্র (১ই সেপ্টেম্বর) ১৯৪৮। ভারত-রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ রাজ্য সম্বন্ধে দুইটি বিবৃতি প্রদান করেন। নিম্নে তাহার বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :

পরিষদের সম্মুখে আমি কতকগুলি কাগজপত্র পেশ করিতেছি এবং সে সম্পর্কে একটি বিবৃতিও দিতেছি। এ সকল কাগজপত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠান-প্রেরিত কাশ্মীর কমিশনের কথা রহিয়াছে। সদন্তরূপে অবগত আছেন যে, এই কমিশন গত দুই মাস বা ততোধিক কাল যাবৎ ভারতবর্ষে এবং কোন কোন সময়ে পাকিস্তানে রহিয়াছেন। কমিশনের সহিত ভারত-সরকারের পত্রালোচনা, কমিশনের একটি প্রস্তাব এবং প্রস্তাবটি সম্পর্কে ভারত সরকারের জবাব সদন্তরূপে আঙ্গ সাকালের সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন। সকল কাগজপত্র প্রকাশিত হয় নাই। কেননা, মাত্র অদ্য সকালেই সেগুলি বিশেষ দ্রুতের সাহায্যে করাচী হইতে পাঠানো হইয়াছে। কমিশন যে কি প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়াছিলেন এবং আমরা

উহার কি জবাব দিয়াছিলাম, সদন্তরূপে সংবাদপত্রে তাহা দেখিয়াছেন। তাঁহারা অবশ্য ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি-চুক্তির কয়েকটি সর্ব আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু পাকিস্তান কার্যতঃ সেগুলি অগ্রাহ্য করিয়াছে। বর্তমান অবস্থায় এ বিষয়ে আমি বেশী কিছু বলিতে চাহি না। উহার একটি কারণ এই যে, কাগজপত্রগুলি সম্বন্ধে অগ্রদূত করিয়া দেখিতে হইবে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, কমিশন তাঁহাদের কর্তব্যাকর্তব্য সম্পর্কে চিন্তা করিতেছেন এবং তজ্জুই এমন কিছু বলা উচিত হইবে না, যাহাতে তাঁহাদের কার্যের ব্যাঘাত হইতে পারে। বাস্তবিক কমিশনের ইচ্ছানুসারেই এ পর্য্যন্ত কাগজপত্রগুলি প্রকাশ করা হয় নাই এবং পার্লামেন্টেও কোন বিবৃতি দেওয়া হয় নাই।

কমিশনের সহিত আলোচনার শুরু হইতেই আমরা পার্লামেন্ট ও দেশবাসীর নিকট প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিতে আগ্রহান্বিত ছিলাম। পরিষদের সম্মতি ছাড়া বা তাঁহাদিগকে না জানাইয়া এরূপ বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে আমরা ইচ্ছুক ছিলাম না। কিন্তু কমিশন এ সকল জটিল আলোচনায় নিযুক্ত থাকাকালে আমাদের গঞ্জে কোনরূপ বিবৃতি দেওয়ার অনুবিধা ছিল এবং বাস্তবিক তাঁহাদেরই অনুরোধে উহা বারবার স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। গতকাল অপরাহ্ন চার ঘটিকায় তাঁহারা করাচীতে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমি বেশী কিছু বলিতে চাহি না, কিন্তু কতকগুলি ঘটনার প্রতি আমি পার্লামেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। সে সকল ঘটনা এই পার্লামেন্ট ও দেশবাসী সবিশেষ অবগত আছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে এমনও দেখা যায় যে, সকলের জ্ঞাত ঘটনা ও সুপ্রমাণিত সত্যকে অস্বীকার করা হইতেছে।

প্রায় এগার মাস পূর্বে কাশ্মীরের এই শোচনীয় ঘটনা আরম্ভ হয়। গত বৎসর অক্টোবর মাসের শেষভাগে পাকিস্তানের মধ্য দিয়া বা পাকিস্তান এলাকা হইতে কাশ্মীরের উপর আক্রমণ আরম্ভ হয় এবং ভারত গবর্নমেন্টের সম্মুখে এক কঠোর সমস্তা দেখা দেয়। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদিগকে সঙ্কল্প স্থির করিতে হয়। আমরা সে সময় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম, এ পর্য্যন্ত তাহাই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি। আমাদের কাছে এবং সমগ্র বিশ্বের কাছে এ কথাটা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, পাকিস্তান গবর্নমেন্ট কেবলমাত্র এই আক্রমণে উৎসাহই দিতেছেন না, সক্রিয়ভাবে সমর্থনও করিতেছেন। পরে ইহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, আক্রমণের ব্যাপারে পাকিস্তানের কেবলমাত্র সমর্থনই নাই—পাকিস্তান আমি উহাতে সক্রিয়ভাবে যোগও দিয়াছে।

কিন্তু গত দশ মাস যাবৎ পাকিস্তান গবর্নমেন্ট উচ্চকণ্ঠে ক্রমাগতই এই কথা অস্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। এ

অবস্থায় আমরা বিষয়টি রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা পরিষদের নিকট পেশ করি।

অত্যন্ত সহজ একটি আবেদন লইয়া আমরা নিরাপত্তা পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমরা বলিয়াছিলাম, পাকিস্তান এলাকার মধ্য দিয়া আসিয়া হানাদাররা কাশ্মীরের শান্তিভঙ্গ করিতেছে। এ ব্যাপারে যথাসম্ভব কম দাবীই আমরা জানাইয়াছিলাম, যদিও উচ্চতর দাবী আমরা উত্থাপন করিতে পারিতাম। আমরা বলিয়াছিলাম, যাহারা পাকিস্তানের মধ্য দিয়া আসিতেছে, পাকিস্তানের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া তাহারা আসিতে পারে না। পাকিস্তান যেন হানাদার দলকে সাহায্য না করে এবং পাকিস্তানের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে আসিতে না দেয়, তজ্জন্ম পাকিস্তান গবর্নেন্টকে অনুরোধ জানাইতে আমরা নিরাপত্তা পরিষদকে বলিয়াছিলাম। অত্যন্ত নরম ভাষায় এই অতি সামান্য দাবী উত্থাপন করা হইয়াছিল। পাকিস্তান এই কথা অস্বীকার করে। নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনাকালে তাহারা কেবলমাত্র উহা অস্বীকারই করে নাই, তাহাদের বিরুদ্ধে একপা অভিযোগ করা হইতেছে বলিয়া ক্রোধ ও বিকোভ প্রকাশ করে। তাহাদের এই অস্বীকৃতি যে মিথ্যা ছিল, আজ তাহারা ই সে কথা প্রকাশ করিয়াছে। কেবলমাত্র ব্যবহারিক-রাজনীতি ও আমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছি, উহার দিক হইতেই ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ নহে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নীতিবর্ধ, সদাচার ও শালীনতার যে সম্পর্ক রহিয়াছে সেদিক হইতেও ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একথা আমি ভাল করিয়াই জানি যে বর্তমান রিখে জনসাধারণের নীতি-বুদ্ধি বা আন্তর্জাতিক নীতি-ধর্মের মান খুব উন্নত নহে—ইহা সত্যই ছুৎখের কথা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাহিরের ঠাট বজায় রাখিতে কিছু শালীনতার পরিচয় দিতে হয় এবং মানদণ্ডও বজায় রাখিয়া চলিতে হয়।

এমন কি, গতকল্য অপরাহ্ন চার ঘটিকার পূর্বে পাকিস্তান পৃথিবীর কাহারও নিকট একবারও স্বীকার করে নাই যে, কাশ্মীরের যুদ্ধে তাহারা কোনক্রমে জড়িত রহিয়াছে। অবশ্য এ বিষয়ে আমাদের হাতে সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত প্রমাণ ছিল। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত রূহং সেনাদলকে কেহই গোপন রাখিতে পারে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও গতকল্য অপরাহ্ন চার ঘটিকা পর্যন্ত—অর্থাৎ এ সকল কাগজপত্র প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত প্রকাশে তাহা স্বীকার করা হয় নাই। পক্ষান্তরে বারবারই অস্বীকার করা হইয়াছে।

পার্লিমেণ্ট স্মরণ রাখিবেন, রূহং পাকিস্তানী সেনাদল আজ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এলাকায় দাঁড়াইয়া ভারতীয় সেনাদলের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। কিন্তু পাকিস্তান এলাকায় কোথাও যুদ্ধ হয় নাই বা ভারতীয় আর্মি পাকিস্তানে প্রবেশও করে নাই। ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।...

কাশ্মীর-প্রসঙ্গ সর্বপ্রথম উত্থাপিত হইলে তিনি মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশ প্রার্থনা করেন। এ বিষয় লইয়া তিনি বহু বার গান্ধীজীর নিকট যান এবং তাঁহার অনুবিধার কথা তাঁহাকে (গান্ধীজীকে) বলেন। সামরিক ব্যাপারে অহিংসার অবতার বিশেষ কোন সহায়তা করিতে পারেন নাই, কিন্তু নৈতিক প্রয়ে তিনি সর্বদাই তাহাদের পরিচালনা করিয়াছেন। এক সময়ে নিজের বা গবর্নেন্টের দায়িত্ব লঘু করিবার উদ্দেশ্যে তিনি মহাত্মা গান্ধীজীর নামোল্লেখ করিতেছেন না। ইহার নৈতিক দিক কিরূপ তাঁহাকে বিব্রত করিয়াছে, ইহা দেখানই এ ব্যাপার উল্লেখ করার কারণ। “ইহাই আমার মনোভাব; জনসাধারণের নিকট আমি তাহা ব্যক্তও করিয়াছি। গত বৎসর অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে আমরা বিমানযোগে কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণ করি; সেই ভাগ্যান্বিত্যমক সিদ্ধান্ত কি ভুল ছিল? এ বিষয়টি আমি শত্রু-মিত্র সকলের নিকট হইতে জানিতে ইচ্ছুক। একটু-আধটু ভুল হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়; কিন্তু ভারত-সরকারের অনুরূপ ব্যবস্থা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। বরং আমরা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে কিঞ্চিৎ মর্যাদাহানি হইত।” পক্ষান্তরে সমগ্র প্রসঙ্গটিই শৃষ্ঠতা ও মিথ্যার ভিত্তিতে রচনা করা হইয়াছে। কাশ্মীরে বিরাট পাকিস্তানী বাহিনী যুদ্ধরত রহিয়াছে বলিয়া সম্প্রতি স্বীকার করায় পাকিস্তান ইতিপূর্বে রাষ্ট্রসম্মেলনের নিরাপত্তা পরিষদে যে-বক্তব্য পেশ করিয়াছিল, তাহার যৌক্তিকতা নষ্ট হইয়াছে।

কমিশনের মূল প্রস্তাব ১৪ই আগষ্ট ভারত গবর্নেন্টকে দেওয়া হয়। ভারত গবর্নেন্ট সম্মত উহার উত্তর দেন।

পাকিস্তান গবর্নেন্টও ১৪ই আগষ্ট কমিশনের প্রস্তাবগুলি পাইয়াছিলেন। ঘটনার চাপে অথবা কমিশনের চাপে গতকল্য পাকিস্তান গবর্নেন্ট কমিশনের প্রস্তাবের একটি উত্তর দেন। তাহারা যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে কমিশনের প্রস্তাব অগ্রাহ করা হইয়াছে।...

পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কোন ইংরেজ কাশ্মীরে যুদ্ধ করিতেছে কিনা এই সম্বন্ধে ত্রীযুত ত্যাগী একটি প্রশ্ন করিলে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, কয়েকজন ইংরেজ পাকিস্তানের হইয়া যুদ্ধ করিতেছে।...

বৎসরাধিক কাল যাবৎ ভারত হায়দরাবাদ গবর্নেন্টের সহিত শান্তিপূর্ণ ও সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এই চেষ্টার ফলে গত নবেম্বর মাসে এক বৎসরের জন্য স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদিত হয়। ভরসা করিয়াছিলাম যে, ইহার পর চূড়ান্ত ও সন্তোষজনক মীমাংসায় পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে না। কিন্তু একমাত্র রাজ্যে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ভারতের সহিত উহার যোগদানের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে। অবশ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিলেও যুক্তরাষ্ট্রের সম্মত-

শাসিত অংশ হিসাবে উহার অধিকার বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইবে না। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্তশাসনশীল অঞ্চাল রাষ্ট্রের মত হায়দরাবাদও সমপরিমাণ ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ইউনিয়নের মহনীয় ভ্রাতৃত্বের সম্মানজনক অংশীদারিত্বই আমরা হায়দরাবাদের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলাম। হায়দরাবাদে কিহা অল্প কোন রাষ্ট্রে বা ভারতের যে কোন প্রদেশে লোকায়ত্ত দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনই আমাদের চিরকালের লক্ষ্য। অত্যন্ত আনন্দের কথা, আমাদের এই অভীষ্ট একমাত্র হায়দরাবাদ রাজ্য ব্যতীত ভারতের প্রায় সর্বত্র পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

এই আধুনিক যুগে এবং ভারতের বৃক্ক যখন নবজ্জিত স্বাধীনতার স্পন্দন জাগিয়াছে, তখন সেখানে একটি রাজ্য এই স্বাধীনতার আদাননাতে বঞ্চিত ও অনন্তকালের জন্ত বৈর-তাত্ত্বিক শাসনব্যবস্থার অধীনে থাকিবে, ইহা আমাদের কল্পনারও অতীত।...

অধিকন্তু আমরা যে সকল নীতি পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছি, তদনুযায়ী আমরা স্বীকার করিয়াছিলাম যে, জনসাধারণের মতামত দ্বারাই হায়দরাবাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইবে। তবে যুক্ত ও স্বাভাবিক আবহাওয়ার মধ্যে এই গণভোট গ্রহণ করিতে হইবে। বর্তমানে হায়দরাবাদে যে বিভীষিকার রাজত্ব চলিয়াছে, তাহা স্বাধীন গণভোট গ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।...

হায়দরাবাদ রাজ্যে যে অন্তঃশক্তি কাজ করিতেছে, উহা ভারতের সহিত মীমাংসার সর্ববিধ চেষ্টা ব্যর্থ করিতে বদ্ধপরিকর। সশস্ত্র রাজ্যাকারগণ কর্তৃক চালিত এই শয়তানী চক্রের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এক্ষণে গবর্নমেন্টের উপর ইহার পূর্ণ কর্তৃত্ব বিরাজ করিতেছে। রাজ্যের সমস্ত সম্পদ সর্বতোভাবে যুদ্ধের জন্ত নিয়োজিত হইয়াছে এবং হইতেছে। রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং দ্রুত অনিয়মিত সৈন্যদল গঠনের অল্পমতি দেওয়া হইয়াছে। বিদেশ হইতে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ আমদানী করা হইতেছে। কতকগুলি বিদেশী কোম্পানী ইহাতে বিশেষ সাহায্য করিতেছে। ভারতের বৃক্কের উপর একটি রাজ্যের এই রণসজ্জা কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। তথাপি বর্তমান ভারত গবর্নমেন্ট আপোষ-মীমাংসার আশায় ধৈর্যসহকারে আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছেন। আরও একটি ব্যবস্থা উহার করা হইয়াছে। তাহা হইতেছে—যতদূর সম্ভব হায়দরাবাদে যুদ্ধসামগ্রী প্রেরণ বন্ধ করার ব্যবস্থা।

হায়দরাবাদে যে সকল সেনাদল গড়িয়া উঠিয়াছে, বিশেষতঃ রাজ্যাকারবাহিনী রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং কখনও কখনও রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া ভারতের এলাকাতেও আক্রমণ চালাইতেছে, তাহার দিন দিন অধিকতর পৈশাচিক

ও আক্রমণাত্মক হইয়া উঠিতেছে। এখানে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার অভিপ্রায় আমরা নাই। কারণ পার্লামেন্টের বর্তমান অধিবেশনের প্রারম্ভে হায়দরাবাদ সম্পর্কে সহকারী প্রধানমন্ত্রী যে 'স্বেতপত্র' পেশ করিয়াছেন, উহাতে এবং প্রকাশিত অঞ্চাল প্রামাণ্য তথ্যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। হায়দরাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তরে রাজ্যাকার ও তাহাদের সহচরদের বিরুদ্ধাচরণকারী মুসলমান ও অ-মুসলমানদের উপর ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের ফলে যে অরাজকতা ও ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা গভীর উত্তেজনার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং হায়দরাবাদের সীমান্তবর্তী ভারতীয় ইউনিয়ন এলাকায় এবং সাধারণভাবে ভারতে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। বর্তমান মুহুর্তে আমাদের প্রধানতম ও সর্বাধিক উত্তেজনার বিষয় হইতেছে হায়দরাবাদ রাজ্যভ্যন্তরে হিংসা ও অরাজকতার এই প্রমত্ত ভাণ্ড।

পরিষদ সদস্যগণ ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, ভারতের ভৌগোলিক কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত এই চরম নিষ্ঠুরতা চলিতে দিতে কোন সভ্য গবর্নমেন্টই পারেন না। কারণ ইহার সহিত শুধু যে হায়দরাবাদের শান্তিপ্রিয় নাগরিকগণের নিরাপত্তা, সম্মান, জীবন ও সম্পত্তির প্রশ্নই জড়িত তাহা নহে, ইহার সহিত ভারতের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রশ্নেরও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। হায়দরাবাদে হত্যা, গৃহদাহ, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের অবাধ ভাণ্ড চলিবে, অথচ ভারতে সাম্প্রদায়িক ঘেম বৃদ্ধি এবং ডোমিনিয়নের শান্তির ব্যাঘাত ঘটবে না, এরূপ আশা করা যুক্ত। এ অবস্থায় পড়িলে পূর্ববর্তী ভারত গবর্নমেন্ট কি করিতেন, তাহা বিবেচনা করার জন্ত পরিষদ সদস্যগণকেই অনুরোধ করিতেছি।

আমরা অতিরিক্ত রাজ্যায় ধৈর্যশীল বলিয়া আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইতেছে। এ অভিযোগ অনেকটা সত্য। সংঘর্ষ এড়াইবার জন্ত কোন প্রকার চেষ্টার ক্রটি করিব না, শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার সর্বপ্রকার চেষ্টা করিব—এই নীতি অনুসরণ করিয়াই আমরা চলিতে চেষ্টা করিয়াছি। অন্তোপায় হইয়াই অল্প কোন পন্থা অবলম্বন করা চলিতে পারে। বিদেশী শাসন শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে নীতি ও আদর্শ আমরা অনুসরণ করিয়াছি, হায়দরাবাদ সম্পর্কে এই কার্যপদ্ধতি অবলম্বন না করিলে ইহা দ্বারা আমাদের সেই বহু ঘোষিত নীতিরই ব্যতিক্রম করা হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার প্রতি দৃষ্টিবিমুগ্ধ হইলে আমাদের চলিবে না এবং এই সমস্ত তথ্য সম্পর্কে আমাদের যে দায়িত্ব আছে তাহাও এড়ান চলে না।

### পাকিস্তান রাষ্ট্রের মতিগতি

সাধারণতঃ আমরা "পাকিস্তান" রাষ্ট্রের কার্য-কলাপ লইয়া সমালোচনা করি না। কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্র যে অত্যাচার আগুনে পুড়িতেছে, তাহার আঁচ আমাদের গায়ে লাগে বলিয়া

এই রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে মত প্রকাশিত করিতে হয়। এমন অন্ধ এই রাষ্ট্রের চালকেরা যে বাহারা তাঁহাদের বন্ধু, বাহারা তাঁহাদের হইয়া নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষণার প্রেরণায় কর্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করিতেও হইতাদের বাধে না। সম্প্রতি নোয়াখালিতে অনুষ্ঠিত এইরূপ একটি অত্যাচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দৈনিক সংবাদ-পত্রে প্রচারিত হইয়াছে। সরদার জীবন সিংহকে গ্রেফতার করার সংবাদে শান্তিকামী ও সাম্প্রদায়িক মিলনপ্রয়াসী অনেকের মনই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে গ্রেফতার করা হইবে এইরূপ একটি খবর অনেক দিন হইতে নোয়াখালি জেলায় প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার সত্যতা পরীক্ষার জন্ত সরদারজী নিজেই গত ১৪ই ভাদ্র তারিখে নোয়াখালি শহরে উপস্থিত হন। সেখানে সংবাদ পান যে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন পরওয়ানা নাই। যাচাই করিবার জন্ত লক্ষীপুর থানায় আসেন এবং এই সংবাদ সেখানে দ্রুত হন। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহাকে সদরে হাজির করা হয়। হাকিম সাহেব জামিন অধীকার করিয়া তাঁহাকে মাইজদী হাজতে পাঠাইয়াছেন।

যে অভিযোগে তিনি আটক হইয়াছেন তাহার বিবরণ এই :—সৌরিন্দ্র দাসী নামে টুমচরের একটি বিবাহিতা জীলোক লক্ষীপুর থানায় ১৫ই ভাদ্র দিনের বেলায় নালিশ দায়ের করে যে তাহাকে তাহার স্বামীর গৃহ হইতে ধরিয়া লইতে কয়েকজন লোক আসে; সে সোরগোল করায় লোকগুলি পলাইয়া যায়। ঐ জীলোকটির বিশ্বাস যে তাহার সরদারজীর দ্বারা প্রেরিত হইয়া আসিয়াছিল। সেই সব লোক যাহারা জীলোকটিকে ধরিতে গিয়াছিল বলিয়া অভিযুক্ত তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জীলোকটি বলিয়াছে যে তাহার বিশ্বাস সরদার জীবন সিংহজীই ঐ লোক পাঠাইয়াছেন, সে সম্পর্কে পুলিশ সরদারজীর সাক্ষাতে কোনও তদন্ত করে নাই। গবর্নেন্ট ইহাতেই সরদারজীকে জেলে বন্দ করিলেন এবং সাক্ষাৎ ভাবে যাহারা অভিযুক্ত তাহার জামিনে খালাস হইয়া আছে।

সরদারজীর জীবন-কথা জানিলে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে চূড়ান্ত সন্দেহের অবকাশ থাকে। এই জীলোকটির জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও কিছু জানিতে হয়। স্বামীর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত কিছু দিন পূর্বে এই জীলোকটি সরদারজীর নিকট আবেদন করে। ইহা লইয়া প্রকাশ্য বৈঠক হয় এবং গ্রামের শ্রান্তবরেরা তাহার স্বামীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরণ হন। পুলিশের সাহায্যে জীলোকটির পিতালয় হইতে তাহাকে স্বামীর গৃহে লইয়া যায়। তার পর এই একাধার।

সরদারজীর জীবন-কথা এই :—ইনি ব্রিটিশ ফৌজভুক্ত হইয়া বন্দী যান ও যুদ্ধকালে অত্যন্ত অনেকের সহিত ইনি

জাপানীদের হাতে বন্দী হন। পরে নেতাজী-সংগঠিত সৈন্যদলে কর্ণেল পদে থাকিয়া “আজাদ হিন্দ ফৌজের” নেতৃত্ব করেন। যখন রেজুন ব্রিটিশ অধিকারে আসে সে সময় নেতাজীর নির্দেশমত আত্মসমর্পণ করিয়া ইনি ব্রিটিশ বন্দী হন। ব্রিটিশ অফিসারেরা তাঁহার চরিত্রগুণে ও বোধ্যাতায় এমনই মুগ্ধ ছিলেন যে রেজুন পুনরধিকার করার পর এই বন্দী কর্ণেলকেই তাঁহার সঙ্গীদের সহিত শহরের শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত করেন এবং অস্ত্রশস্ত্র ফিরাইয়া দেন। রেজুনে তখন অরাজকতা চলিতেছিল। সরদারজীর চেষ্টায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পর বন্দী হিসাবে ইনি দিল্লীর লাল কেল্লায় জীবনযাপন করিতে থাকেন ও পরে “আজাদ হিন্দ ফৌজের” সকলের সহিত ইনিও মুক্তি লাভ করেন।

তার পর নোয়াখালির বর্ধরতার পর গান্ধীজী-প্রবর্তিত কাজে আজ প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া আত্মনিয়োগ করিয়া আছেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তিনি খ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও খ্রীপ্যারীলালজীর সহকর্মীরূপে লোক-সেবা করিয়া যাইতেছেন। মনে হয় শিষ্টের পালন করিতে গিয়া তিনি ছুটী-লোকের চক্ষুশূল হইয়াছেন। “পাকিস্তান” রাষ্ট্রের মজি-মওলীর ও নোয়াখালির হাকিমদের ইহা অজানা থাকিবার কথা নয়। তবুও যে এই বুড়ের উপর অবিচার হইল, তাহা সম্ভব হইয়াছে এইজন্য যে রাষ্ট্রের প্রকৃতি স্বাভাবিক সত্যতা-সম্পন্ন নহে।

### শাসন বিভাগের ব্যয়বৃদ্ধি

ভারত বিভাগের ফলে বঙ্গদেশের আয়তন কমিয়া এক-তৃতীয়াংশ হইয়াছে কিন্তু ব্যয় তদনুপাতে হ্রাস পায় নাই। বরং অবিভক্ত বাংলায় সরকারের ব্যয়ভার বাহা ছিল এখন যেন তার চেয়েও বেশী ব্যয় বাড়িয়াই চলিতেছে। মন্ত্রীদের ভ্রমণ-ব্যয় ইত্যাদি সম্বন্ধে এখন সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ব্যবস্থা-পরিশদের সদস্যদের নানাবিধ কমিটি প্রভৃতিতে নিয়োগ করিয়া এবং দল ঠিক রাখিবার জন্ত কংগ্রেসের প্রভাবশালী সদস্যদের সরকারী পরামর্শদাতা প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত করিয়া পরোক্ষ-ভাবে ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাদের কেহ কেহ “অবৈতনিক”—কিন্তু ভাতা, ভ্রমণ-ব্যয়, সরকারী গাড়ী এবং পোষাবর্গের চাকুরি প্রভৃতিতে এদিকটাও পোষাইয়া যাইতেছে। অবিভক্ত বাংলায় লাটসাহেবের বেতন ছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এবং ভাতা ৯ লক্ষ টাকা। এখন এক-তৃতীয়াংশ বাংলায় তাঁহার বেতন হইয়াছে ৬৬ হাজার এবং ভাতা ছয় লক্ষ। সাক্ষ্যবাদী ৪টি বজায় রাখিয়া দেশবাসীর মনে লাটসাহেবের প্রতি ভীতি সঞ্চারের জন্ত যে বিপুল ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল আজ তাহা টানিয়া চলিবার কোনই প্রয়োজন নাই। সরকারী উচ্চতম পদগুলির সংখ্যা এবং বেতন যে হারে বাড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে জনকল্যাণের জন্ত টাকা বিশেষ অবশিষ্ট থাকিবে না অনেক আগেই তাহা আশঙ্কা করা গিয়াছিল।

এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইয়াছে। কিছুদিন আগে এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে পশ্চিমবঙ্গে টাকার অভাবে জনকল্যাণমূলক অনেক পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হইতে পারে।

গত মাসে আমরা গবর্নেন্টের ফাইনাল বিভাগের কার্য-ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। ইংরেজ এবং লীগ গবর্নেন্ট উভয়েই এই বিভাগটির দক্ষতার বাহাতে অবনতি না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। উপযুক্ত লোক ছাড়া কাহাকেও এই বিভাগে আনয়ন করা হইত না। মুসলিম লীগ আমলে সরকারের সমস্ত বিভাগের উচ্চতম পদগুলিতে হিন্দু সরাইয়া মুসলমান বসানো হইয়াছিল কিন্তু ফাইনাল বিভাগের পুরাতন দক্ষ কর্মচারীদের নড়চড় করা হয় নাই।

ধরচ কি ভাবে বাড়িতেছে তার সামান্য আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইংরেজ আমলে সেক্রেটারিয়েটে ২৭৫০ টাকা বেতনের সেক্রেটারীর পদ ছিল মাত্র ছয়টি। অবিভক্ত বাংলার জন্ম ভারতসচিব এই বেতনে ছয়টির বেশী পদ রাখিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ দিয়া ছিলেন। মুসলিম লীগ গবর্নেন্ট এই নির্দেশ অমান্য করিতে পারেন নাই। ইহার ব্যতিক্রম আরম্ভ হইয়াছে এবার।

বর্তমানে এক-তৃতীয়াংশ বাংলায় ২৭৫০ টাকার সেক্রেটারীর পদও দুই তৃতীয়াংশ কমিয়া হওয়া উচিত ছিল হুইট; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা দ্বিগুণ বাড়িয়া হইয়াছে বারোটি। এত দিন একজন সেক্রেটারী জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং শিক্ষা বিভাগের কাজ করিয়াছেন, এখন কাজ কমিয়াছে কিন্তু আলাদা তিন জন সেক্রেটারী করা হইয়াছে এবং শেষোক্ত দুই বিভাগের সেক্রেটারীদ্বয় প্রত্যেকে পাইতেছেন ২৭৫০ টাকা। এতদিন সমবায় ও পুনর্বাসতি বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন এক জন, বেতন ২৭৫০ টাকা; এবার হইয়াছেন দুই জন—প্রত্যেকের বেতন ২৭৫০ টাকা। ফাইনাল বিভাগে এতদিন ছিলেন এক জন সেক্রেটারী, বেতন ২৭৫০ টাকা; এবার এক জন সেক্রেটারী এবং এক জন স্পেশাল অফিসার বসানো হইয়াছে—প্রত্যেকের বেতন ২৭৫০ টাকা। সেক্রেটারীর বেতন এক ধাপে ৮০০ টাকা হইতে বাড়িয়া ২৭৫০ টাকা হইয়াছে। বর্তমান ফাইনাল সেক্রেটারীকে আর এক জনের দাবী অতিক্রম করিয়া উপরোক্ত পদে বসানো হইয়াছে, ইহাতে কিছু গোল বাধিবার উপক্রম হয়। সম্প্রতি সেই কর্মচারীটির বেতনও ২৭৫০ টাকা করিয়া দিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করা হইয়াছে।

### দুর্নীতির প্রসার

বাংলাদেশে দুর্নীতি যেন ক্রমেই আরও ব্যাপক এবং গভীর হইয়া উঠিতেছে। এতদিন দুর্নীতির প্রধান ক্ষেত্র ছিল পুলিশ, সিভিল সাপ্লাই এবং পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট। আদালতে নীচের দিকে কিছু ঘুম ইত্যাদি চলিত, কিন্তু উপরের দিকে এই পাপ ছিল না। সম্প্রতি আলিপুরের

পাবলিক প্রসিকিউটরের আচরণের বিরুদ্ধে একটি তদন্তে যে সব অভিযোগ আসিয়াছে তাহা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে দুর্নীতি এবার বহু দূরে গিয়াছে।

তদন্তের বিষয়বস্তু ও অভিযোগ এইরূপ :—১৯৪৫ সালে এক দল লোক নৌকাযোগে সামরিক ডিপোয় কিছু মাল সরাইবার সময় ধরা পড়ে। ২২ জন লোক গ্রেপ্তার হয় এবং তাহাদের বিরুদ্ধে বারাকপুর আদালতে মামলা দায়ের হয়। সরকার পক্ষে উপস্থিত হন আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটার। মামলাটির একটি বিচিত্র পরিণতি ঘটে। তিন জন প্রধান আসামীকে রাজসাক্ষী করা হয় এবং আর পাঁচ জনকে আদালতে দোষ স্বীকার করানো হয়। আলিপুরের অতিরিক্ত জজের দ্বারা পাবলিক প্রসিকিউটার উহাদের মধ্যে তিন জনের দণ্ডদেশ মকুব করাইয়া উহাদিগকে জামিন মুচলেকার বাহির করিয়া লয়েন। মূল মামলা তখনও চলিতে থাকে। পাবলিক প্রসিকিউটারকে সরকার হইতে এক জন সহকারী দেওয়া হয় কিন্তু তিনি তাঁহার উপর নির্ভর না করিয়া অননুমোদিত আর এক জন উকীলকে সহকারীরূপে গ্রহণ করেন। ইনি সরকার পক্ষের সমস্ত কাগজপত্র দেখিবার পর আসামীপক্ষের ‘ব্রিফ’ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে পরামর্শ দেন। পাবলিক প্রসিকিউটারের অননুমোদিত সহকারীর আপত্তি সত্ত্বেও এরূপ ঘটে। মামলার গতি এই সময়ে পরিবর্তিত হয়। এক জন মৃতদেহ সাক্ষী খাড়া করা হয় এবং পুলিশ ডায়েরীরও পরিবর্তন ঘটে। সহকারী মহাশয় এই বার তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করেন। মামলার প্রতি গবর্নেন্টের দুর্নীতি-দমন বিভাগের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তদন্তে দেখা যায়, পুলিশ ডায়েরীর যে কপি ডেপুটি কমিশনারের কাছে থাকিবার কথা, তাহাও পাবলিক প্রসিকিউটারের নিকট রহিয়াছে। মামলার যে ডায়েরী উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা সত্য-লিখিত। পাবলিক প্রসিকিউটারের উপস্থিতিতে তাঁহার সহকারী ডায়েরীর প্রতি বারাকপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

দুর্নীতি-দমন বিভাগ সমস্ত ব্যাপারটি সম্বন্ধে তদন্তের আদেশ দেন এবং চব্বিশ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উহার ভার দেন চব্বিশ পরগণার এনকোয়ার্মেন্ট ব্রাঞ্চের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের উপর। তদন্তে ৪৮ জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেন। উৎকোচ দেওয়া হইয়াছে এরূপ তথ্যও উহাতে প্রকাশ পায়। পাবলিক প্রসিকিউটারের বিরুদ্ধে অভিযোগ মূলতঃ এই তিনটি—(১) তিনি দুর্নীতির বনীভূত হইয়া একটি ফৌজদারী মামলার আসামীদের আইনের হাত এড়াইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন; (২) সরকারের বিনা-অনুমোদনে এক জন সহকারী গ্রহণ করেন এবং সেই-উকীল মামলার কাগজপত্র দেখিবার পর আসামী পক্ষ সমর্থন করিলে তিনি তাঁহার নামে রিপোর্ট করেন নাই; (৩) যে মামলা তাঁহার হাতে রহিয়াছে তার পুলিশ ডায়েরী বদল হইয়াছে।



তদন্ত অনেক দূর অগ্রসর হইবার পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একটি ইন্টেরিম রিপোর্ট চাহেন এবং উহা দাখিল করিবার পরই তিনি বদলী হইয়া যান। কিন্তু যাওয়ার আগে ঐ রিপোর্ট সম্বন্ধে তিনি কোন আদেশ দিয়া না যাওয়ার তদন্ত শেষ হইতে পারিতেছে না এবং উহা ধামাচাপা দেওয়ার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। পাবলিক প্রসিকিউটরের বিরুদ্ধে উপরোক্ত তিনটি অভিযোগই অতিশয় গুরুতর। তিনি নির্দোষ হইলে তাহা প্রমাণ হওয়া উচিত এবং অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হইলে তাঁহাকে অপসারিত করা সরকারের কর্তব্য। মাঝপথে তদন্ত বন্ধ হইলে সরকারের ছুনাম হইবে।

### সরকারের আয় বৃদ্ধি

বাংলা-সরকারের আয়বৃদ্ধির একটি বড় উপায় ক্রয়শুল্ক আদায়। মাদ্রাজে ক্রয়শুল্কের হার টাকায় এক পয়সা কিন্তু সরকারের এই বাবদে আয় বৎসরে প্রায় ১৩ কোটি টাকা। বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি প্রদেশেও ক্রয়শুল্ক বাংলার প্রায় দ্বিগুণ আদায় হয়। বাংলায় এক কলিকাতাতেই পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হয় তাহার পরিমাণ ঐ সব প্রদেশের কাহারও অপেক্ষা কম নহে তথাপি সরকারের আয় এত কম হওয়ার কারণ এবার অনুসন্ধান হওয়া উচিত। ইহার প্রধান কারণ দুইটি—প্রথমতঃ, ক্রয়শুল্কের আওতা হইতে অনেক জিনিষ বাদ দেওয়া হইয়াছে; যথা, বাংলার বাহিরে চালানি মাল, জাহাজের সরবরাহ প্রভৃতি। তা ছাড়া বাংলা-সরকার নিজের আদেশ দিয়া অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীকে ক্রয়শুল্কের আমল হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। লীগ আমলেও এরূপ হইয়াছে, এখনও হইতেছে এবং এরূপ এক একটি ক্ষেত্রেই সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান যাইতেছে। ক্রয়শুল্ক বজায় রাখিতে হইলে আইনটি এবার এমন ভাবে বদলানো দরকার যাহাতে ক্ষেতাদের কষ্ট না হয় কিন্তু সরকারের আয় বাড়ে। অত্যাশ প্রদেশ নিজ প্রদেশের বাহিরে চালানি মালের উপর ক্রয়শুল্ক অব্যাহতি দেয় না, বাংলায় এই নিয়ম বজায় রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। ইংরেজেরা বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ২৫টি ভোটের জোরে জাহাজের সরবরাহকে ক্রয়শুল্ক হইতে মুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, ইহাতে বহু টাকা লোকসান হইয়াছে এবং হইতেছে। এটা এবার চাপাইয়া দেওয়া দরকার। যুক্তপ্রদেশ আর্থ এবং বিহার কমলার উপর ক্রয়শুল্ক বসাইয়াছে, কলিকাতায় ঠিক এক্সচেঞ্জ শেয়ারের উপর আমরা অনারসে ক্রয়শুল্ক বসাইতে পারি। ফ্রান্সে এই ব্যবস্থা আছে। একমাত্র এই কর ধার্যের দ্বারা বাংলার আয় বহু কোটি টাকা বাড়িবে। ক্রয়শুল্ক এখন টাকায় তিন পয়সা, তৎসঙ্গেও বাংলার আয় দুই কোটি টাকাও হয় না—ইহা নিতান্ত বিসদৃশ ব্যাপার। উপরোক্ত সতর্কতাগুলি অবলম্বিত হইলে এবং মাদ্রাজের আদর্শে এখানকার ক্রয়শুল্ক আইন সংশোধিত হইলে শুধু টাকায়

এক পয়সায় নামাইয়া দিয়াও আমাদের আয় বহুগুণ বাড়াইতে পারা যায়। আমাদের দেশে ক্রয়শুল্ক আইন এমন হওয়া উচিত যাহাতে গরীব লোক এবং ছোট দোকানদার উহার চাপে না পড়ে। এখন ক্রয়শুল্কের অবস্থা যেরূপ তাহাতে অশিক্ষিত ছোট দোকানদার কেন, বহু দোকানদারের পক্ষে উহার হিসাব রাখা এবং রিটার্ন প্রভৃতি দেওয়া অতিশয় কঠিন এবং ব্যয়সাধ্য। আমরা শুনিয়াছিলাম ক্রয়শুল্ক বিভাগের পূর্ববর্তী কমিশনার শ্রীযুক্ত বহু আইনটির আমূল সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং কিভাবে উহা করা যায় তাহারও ধসড়া করিয়া দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, অত্যাশ মূল্যবান রিপোর্টের স্বায় এটিও ধামা চাপা পড়িয়াছে।

### ক্রয়শুল্ক আদায়ের অব্যবস্থা

ক্রয়শুল্ক হইতে বাংলার রাজস্ব কম হওয়ার দ্বিতীয় কারণ আদায়ের অব্যবস্থা। পণ্যক্রয়ের সময় ক্ষেতারা যে শুল্ক দিয়া থাকে তাহার বোধ হয় এক-চতুর্থাংশও সরকারের কোষাগারে পৌঁছায় না। ক্রয়শুল্ক ঝাঁকি সম্বন্ধে অবাঙালী ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে সিদ্ধান্ত। তাহাদের খাতা হইতে প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করিতে কঠোর পরিশ্রম এবং দক্ষতা প্রয়োজন; ততোধিক প্রয়োজন প্রলোভন জয় করিবার উপযুক্ত সততা। স্তব্ধতা শুধু আদায় নির্ভর করে এই বিভাগের কর্মচারীদের যোগ্যতার উপর।

ক্রয়শুল্ক বিভাগের বর্তমান কর্মচারীদের মধ্যে অনেকের দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। বর্তমানে যিনি এই বিভাগের কমিশনার তিনি চার্টার্ড একাউন্টেন্ট। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে, ৭ বৎসর প্র্যাকটিস করার পর ইনি সমরায় বিভাগে আড়াই শত টাকা বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন। লীগ আমলে ইহার প্রথম উন্নতি ঘটে। গত ক্ষেত্রয়ারী মাসে ইহার আরও উন্নতি হইয়াছে এবং ইনি ক্রয়শুল্ক কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্বে দুই জন ইনকর্পোরেটেড একাউন্টেন্ট এসিস্ট্যান্ট কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহারও কেহই যোগ্যতার বিশেষ পরিচয় দিতে পারেন নাই। একজন এংলো-ইণ্ডিয়ানকেও এসিস্ট্যান্ট কমিশনার নিযুক্ত করা হইয়াছিল; সম্ভ্রতি ইনি ছুর্নীতি দমন বিভাগের কবল এড়াইবার জন্য বিলাতে প্রস্থান করিয়াছেন।

ক্রয়শুল্ক বিভাগের কাজে বিলাতে পাস করা চার্টার্ড এবং ইনকর্পোরেটেড একাউন্টেন্ট অপেক্ষা দেশীয় জি-ডি-এ এবং আর-এ পাস একাউন্টেন্টগণ অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। আয়কর বিভাগেও ঠিক এই ব্যাপার দেখা গিয়াছে। ইহার কারণও আছে। ইনকর্পোরেটেড এবং চার্টার্ড একাউন্টেন্টগণ যে ধরণের বৈজ্ঞানিক হিসাব রাখা পদ্ধতির সহিত পরিচিত, এদেশে মারোয়াড়ী, ভাটিয়া, বাঙালী, বিহারী প্রভৃতির হিসাবের খাতা আদর্শ-সম্মত নহে। এখানে হিসাবের খাতার অঙ্ক এবং ভাষা উভয়ই দুর্বোধ্য এবং ট্যান্স

ফাঁকি দেওয়ার জন্ত খাতায় কারচুপির প্রযুক্তি অত্যন্ত বেশী। সুতরাং কলিকাতায় ট্যাক্স আদায় বিভাগে কাজ করিতে হইলে এই শ্রেণীর খাতা এবং মারোয়াড়ী ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা অপরিহার্য। আয়কর বিভাগ এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। সেখানে মারোয়াড়ী ভাষা এবং খাতা লেখা পদ্ধতি সম্বন্ধে কর্মচারীদের পরীক্ষা লওয়া হয় এবং পাস করিতে না পারিলে সেই কর্মচারীকে চাকুরিতে পাকা করা হয় না। ফলে আয়কর ধরা পড়িতেছে; কিন্তু ক্রয়শুল্ক বিভাগে এই পরীক্ষা প্রবর্তিত হয় নাই। চার্জার্ট বা ইনকর্পোরেটেড একাউন্টেন্টগণ সেখানে এই সব খাতা ভাল করিয়া বুঝিতেও পারেন না, কাজেই এক একজন এসিস্ট্যান্ট কমিশনারের ঘরে হাজার দেড় হাজার ফাইল জমিয়া থাকে। জি-ডি-এ বা আর-এ এসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের বেলায় তাহা হয় না।

বর্তমান কমিশনার মহাশয় চার্জার্ট একাউন্টেন্ট আমদানীর বেশী পক্ষপাতী এবং আমরা সংবাদ পাইতেছি যে প্রত্যেকটি এসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদে বিলাতী যোগ্যতা প্রাপ্ত লোক বসাইবার জন্ত ইনি সুপারিশ করিয়াছেন। ইহাতে আরও ক্ষতি হইবে। কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার পদে বাহারা যোগ্যতা দেখাইয়াছেন তাঁহাদের প্রমোশন দিলে সমগ্র বিভাগের দক্ষতা বাড়িবে। বর্তমানে অজ্ঞাত বিভাগের জায় এখানেও সিনিয়রিটি এবং দক্ষতার স্থলে সিনিয়রিটি এবং তোষাষোড় প্রমোশনের মানদণ্ড রূপে ধার্য হইয়াছে।

ক্রয়শুল্ক বিভাগ ফাইনাল বিভাগের অধীন। বাংলা সরকারের অর্ধাঙ্গের পথ এইভাবে যদি ক্রমশঃ রুদ্ধ করিয়া আনা হয় তবে চাউলের দাম, ময়দার দাম প্রভৃতি সরকারকে বাড়াইতে হইবে এবং তাহা দেখিয়া কাপড়ওয়াল, কয়লা-ওয়াল প্রভৃতিও মূল্য বৃদ্ধির আবদার ধরিলে সরকার তাহাও মঞ্জুর করিতে থাকিবেন, যেমন এখন করিতেছেন। ফাইনাল এবং ক্রয়শুল্ক বিভাগে কয়েকটি উপযুক্ত লোক বসাইলে কিন্তু এরূপ ঘটে না।

### রাজপথে দুর্ঘটনা

কলিকাতার রাজপথে দুর্ঘটনা কিছুতেই কমিতেছে না। ট্রাফিক পুলিশের এদিকে যতটা মনোযোগ দেওয়া উচিত তাহাও দেখা যাইতেছে না। অথচ বঙ্গ বিভাগের পর ট্রাফিক পুলিশের পদ এবং ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এতদিন এক জন ইনসপেক্টরের উপর এই কার্যের ভার ছিল, এবার ইনি প্রমোশন পাইয়া এসিস্ট্যান্ট কমিশনার হইয়াছেন কিন্তু দুর্ঘটনা কমে নাই।

রাজপথে দুর্ঘটনার প্রধান কারণ তিনটি :—লরী, ঠেলা ও গরুর গাড়ী এবং ট্রাম কণ্ডাক্টরদের অসতর্কতা। লরীর গতিবেগ বাধিয়া দেওয়ার একটা নিয়ম আছে কিন্তু উহা প্রতিপালন করা হয় না। বাস-লরী এবং ট্রাম-লরী সংঘর্ষ প্রায়ই ঘটতেছে। ঠেলা এবং গরুর গাড়ী কলিকাতার রাস্তায় এক

মারাত্মক বস্তু। পূর্ণ গতিতে ধাবমান গাড়ী বা ট্রামের সম্মুখ দিয়া ঠেলাওয়ালারা অবলীলাক্রমে তাহাদের গাড়ী পার করিবার চেষ্টা করে; তাহাকে বাঁচাইবার জন্ত হঠাৎ গাড়ী বাধিতে হয় বলিয়া ট্রাম-বাসের যাত্রীদের প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খাইতে হয়, পিছনের গাড়ী বিনা সিগন্যালে অকস্মাৎ বাধিতে না পারিলে ধাক্কা ধায় ও জখম হয়। গরুর গাড়ীতে অতিরিক্ত মাল বোঝাই-এর শাস্তি আছে এবং গরুর দিনে ছুপুর বেলা বলদগুলিকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্ত গরুর গাড়ী রাস্তায় বাহির হওয়া নিষিদ্ধ। ঠেলা গাড়ী মাছুবে ঠেলে; তার বেলায় ইহার কোন নিয়মই নাই। কুড়ি, পঁচিশ বা ত্রিশ মণ মাল বোঝাই করিয়া ঠেলাগাড়ী রাস্তার মাঝখান ছাড়া চলিতে পারে না; কাজেই ট্রাম এবং বাস উভয়ই চলিতে বাধা পায়। ইহাতে কত সময় এবং কত ইলেকট্রিক কারেন্ট অর্থব্যয় হয় তার একটা হিসাব হওয়া দরকার। গরুর গাড়ী এবং ঠেলা গাড়ী রাত্রি দশটা হইতে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত প্রধান রাস্তায় চলিতে পারিবে, অল্প সময় পারিবে না এই নিয়ম করিলে কলিকাতার যানবাহন চলাচল সহজ হইবে, দুর্ঘটনাও অনেক কমিবে।

তৃতীয় কারণ, ট্রামচালনার অসতর্কতা অনায়াসে দূর করা যাইতে পারে যদি কণ্ডাক্টরেরা যাত্রীদের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হয়। ট্রাম হইতে পতনে জখম হওয়া আজকাল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আগে একটা নিয়ম ছিল যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কণ্ডাক্টর বস্তু না দিলে প্রথম শ্রেণীর কণ্ডাক্টর ট্রাম চলাইবার সঙ্কেত করিত না। এখন এই নিয়ম পালিত হয় না এবং অধিকাংশ দুর্ঘটনা ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের উপর দিয়া যায়। জীলোক ও বুদ্ধেরা এ বিষয়ে বেশী জুজুভোগী। নিছক কণ্ডাক্টরদের অসতর্কতার জন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর জীলোক বা বুদ্ধ যাত্রী পড়িয়া গিয়া জখম হইয়াছেন এরূপ অসংখ্য ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং ইহা বহুজনের অভিজ্ঞতা। সামান্য একটু সতর্কতা অবলম্বন করিলেই এটা বন্ধ হইতে পারে। এই সব দুর্ঘটনা বন্ধ করার জন্ত ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নের তরফ হইতেও চেষ্টা হওয়া উচিত এবং ট্রাম কোম্পানীর এ বিষয়ে অগ্রগী হওয়া তো নিতান্ত কর্তব্য। প্রয়োজন হইলে ইহার জন্ত কঠোরতা অবলম্বন করিলেও তাহারা জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিবেন ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

সম্প্রতি বাস চালকগণ কলিকাতার রাস্তায় একচ্ছত্র রাজত্ব স্থাপনের চেষ্টা চালাইতেছে। বাস ধামে রাস্তার মাঝে এবং তার ফলে সর্ব রাস্তার দুই দিকেরই ট্রাম এবং অল্প যানবাহন বন্ধ হয়। ইহার ফলে কলেজ ষ্ট্রীট ইত্যাদি অঞ্চলে চলাফেরা দুঃস্বপ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

### লোক-শিক্ষা

ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতবর্ষের কোটি কোটি মধ্যবয়স্ক

লোকের নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্ত একটি বিরাট পরিকল্পনার উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছেন। এই উপলক্ষে বোম্বা-করা হইয়াছে ১৯৪৯ সাল হইতে তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহারা আশা করেন যে শতকরা ৫০ জন নিরক্ষর লোককে লিখন-পঠন-ক্ষম করা যাইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত যে বিরাট ব্যয় হইবে, কেন্দ্রীয় সরকার তার অর্ধেক অংশ বহন করিবেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত প্রতি প্রদেশে “সাক্স-সাক্স” রব শুনা যাইতেছে। পশ্চিম বাংলার শিক্ষামন্ত্রী একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়া তাহার হাতে উপায় উদ্ভাবন করিবার ভার ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই কমিটি সাময়িকভাবে কার্য্য আরম্ভের জন্ত একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া শুনিতেছি।

ভবিষ্যতের হাতে নানা প্রদেশের পরিকল্পনার অদৃষ্ট ছাড়িয়া দিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে শ্রমিক বিভাগ শ্রীজগজীবন রামের কর্তৃত্বাধীনে একটি পরীক্ষা চালাইতেছে। বিহার প্রদেশের কয়লা খনির অঞ্চলে এই কাজ চলিতেছে।

প্রতি টন (প্রায় ২৭ মণ) কয়লার উপরে ছয় আনা করিয়া একটি কর ধার্য্য করা হইয়াছে; তাহার বাৎসরিক পরিমাণ হইবে প্রায় এক কোটি টাকা। এই ছয় আনা করের অর্ধেক আয় খনি-অঞ্চলে বর্তমান যুগোপযোগী গৃহনির্মাণের কাজে ব্যয় করা হইবে; এক আনার আয় ম্যালেরিয়া নিবারণকল্পে ব্যয় করা হইবে। বাকী দুই আনার আয় শ্রমিক দপ্তরের অধীনে শ্রমিক কল্যাণ-উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইবে।

নারী-শ্রমিকের ভিতর ইতিমধ্যেই কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এই কাজের দায়িত্ব পড়িয়াছে কেন্দ্রীয় শ্রমিক কল্যাণ বিভাগের শ্রীমতী রাধা বার্মা-এর উপর। তিনি তাঁহার সহ-কর্ম্মী নির্বাচন করিবার জন্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া সমুদ্র ধাকেন নাই। বাংলা ও বিহারের নানা সমাজ-সেবা সমিতি-সমূহের কর্ম্মবৃন্দ হইতে তিনি তাঁহাদের নির্বাচিত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ভট্টাচার্য্য উপাধিধারী দুই জন বাঙালী মহিলার উল্লেখ দেখিলাম। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট শ্রীমতী রাধা বার্মা কর্ম্ম প্রবর্তন করেন। দশ-পনের টি কর্ম্মক্ষেত্র বর্তমানে সক্রিয় আছে; “কামিন কল্যাণ কুটীর” নামে এই কেন্দ্রগুলি পরিচিত।

শিশুদের লিখন-পঠন বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্ত “বালমন্দির” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকাল বেলায় তাঁহাদের স্কুলে লইয়া আসা হয়; স্নান করাইয়া ও জলযোগ করাইয়া তাহাদের পাঠ দেওয়া হয়। সহজ শিল্প শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। গরম জামা বুনা, তুলার কাপড়ের কাট-হাঁট; হাতে ও কলে সেলাই, পুতুল প্রস্তুত প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া। গরম জামা বুনার কাজে দশ হইতে বোল বৎসরের মেয়েরা পর্য্যন্ত পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। বয়স্ক স্ত্রীলোকেরা নিজেরা এই নূতন শিক্ষার জন্ত উৎসাহ-বোধ না করিলেও আপন-আপন সন্তান-সন্ততির শিক্ষার জন্ত বিশেষ উদ্যোগ বলিয়া

মনে হয়। তাঁতের প্রচলন করিয়া নূতন উপার্জনের পথ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাঠের কাজও প্রচলন করা হইয়াছে।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান একটা ভাবনার বিষয়। ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস করাইবার জন্ত বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে। খনির মুখে স্নানাগার নাকি সন্দেশের উদ্ভেদ করিয়াছিল। ক্রমে সাবান ব্যবহার সহজ হইয়া উঠিতেছে।

এই-বিবরণ হইতে বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্রতীগণ অনেক ইঙ্গিত পাইবেন। এই প্রদেশে বয়স্ক লোকের শিক্ষা কার্য্যের দায়িত্ব যাহারা গ্রহণ করিবেন কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলের শিক্ষা-সমস্তা সম্বন্ধে নূতন করিয়া তাঁহাদের চিন্তা করিতে হইবে। এই অঞ্চলে ১০১৫ লক্ষ বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ অ-বাঙালী। তাহাদের শিক্ষার জন্ত বাঙালী গ্রামবাসীর পক্ষে প্রযোজ্য উপায় প্রবর্তন করিতে হইবে। কলিকাতা নগরীর নানা নারী সমিতি নাকি বয়স্ক নারীর শিক্ষা সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন। তাঁহাদের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করিতে চাই। প্রায় ৫০৬০ লক্ষ অ-বাঙালী জীবিকা অর্জনের জন্ত পশ্চিম বাংলায় বাস করিতেছেন, তাঁহাদের রীতি-নীতি সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী স্ত্রী-পুরুষের বিশেষ কোন সাফাং পরিচয় নাই। নূতন শিক্ষাদান উপলক্ষে সে পরিচয়ের প্রয়োজন হইবে।

### পশ্চিম বাংলার নদী-নালা

রেল-লাইনের কল্যাণে বাংলাদেশের নদী-নালা বৃদ্ধি গিয়াছে বলিয়া একটি কথা আছে। রাজা দিগম্বর মিত্র হইতে সার উইলিয়ম উইলকিন্স এই অভিযোগ তথ্যাদি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। এই রোগের প্রতিকারের জন্ত আজ পর্য্যন্ত কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারা যায় নাই। দামোদর-মহুৱাক্ষি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পশ্চিম বাংলার বৃষ্টির জলের সদ্য্যব্যহার করা এবং বহা নিবারণ করা। তার ফলে কৃষির উন্নতি হইতে পারে; কৃষিযোগ্য জমি বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্তু গন্ধা-ভাগীরথী-জলঙ্গি প্রভৃতি নদী মজিয়া গিয়া দেশের স্বাস্থ্য ও শস্তের উৎপাদনে যে বিপর্য্য ঘটাইয়াছে, তার প্রতিকার চেষ্টা করিতে হইবে। এইজন্ত কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনার যে কথা আজ দিকে দিকে প্রচারিত হইতেছে; শত শত কোটি টাকা ব্যয়ের বহর দেখিয়া আমরা যত আশ্র-প্রসাদ লাভ করিতেছি; ফলে তাহা আসিবে বহু বিলম্বে; ১০১৫ বৎসরের পূর্বে তার ফলাফল দেখা দিবে না। সেইজন্য আমাদের মনে হয় যে পশ্চিম বাংলার নিজের চেষ্টায় ও শক্তিতে যাহা সাধ্য, তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। এইরূপ একটি বিষয়ের প্রতি নব-প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা—“সংগঠনী”—দেশের লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। এই পত্রিকা-

খানি বসিরহাট মহকুমার নানা সংগঠন প্রচেষ্টার মুখপত্র বলিয়া পরিচিত। এই অঞ্চলের সমস্ত উন্নতি চেষ্টার সঙ্গে পরিচালক-মণ্ডলী জড়িত হইয়া আছেন। পত্রিকার কার্যালয় মছলনপুরে স্থিত; পোঃ আঃ গোবরডাঙ্গা। সহযোগী বলিতেছেন :—

“পশ্চিম বাংলার যমুনা নদী বারাকপুর, বনগাঁ, বারাসত এবং বসিরহাট মহকুমার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ৪০ মাইল দীর্ঘ গঙ্গার এই শাখা নদীটি তাহার ৬৪ মাইল দীর্ঘ ১৩টি উপশাখা সহ সংস্কৃত হইলে ২৪-পরগণার প্রায় ৪০০ বর্গ মাইল জমিতে চাষ-আবাদের সুবিধা হয়। ২৪-পরগণায় চাষ হয় এক্রপ জমির পরিমাণ প্রায় ৮৫০ বর্গ মাইল। এই জিলার ২৫০ বর্গ মাইল আবাদযোগ্য পতিত জমির অধিকাংশই এই যমুনা নদী সংস্কারের উপর নির্ভর করিতেছে। ২৪-পরগণা যে পরিমাণে ঘাটতি এলাকা এবং লোক বসতির ঘনত্ব অত্যন্ত জেলার তুলনায় অধিক তাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দিক হইতে যমুনা নদীর সংস্কার পশ্চিম বাংলার একটা বড় উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবে।”

এই প্রস্তাবকে রূপ দান করা অসম্ভব নয়; ৪০ মাইল লম্বা একটি শাখা-নদীর সংস্কার-সাধন এমন একটা বৃহৎ ব্যাপার নয় যে রাষ্ট্রের সাহায্যের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে। অল্পরূপ কার্য করিদপুর জেলার ত্রিচন্দ্রকান্ত বসুর নেতৃত্বে সম্ভব হইয়াছিল; ২৪-পরগণা জেলায়ও সেরূপ চেষ্টা ফলবতী হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস আছে। পূর্ববঙ্গ হইতে বাহারা এই অঞ্চলে আসিয়া বসতি-স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এ কাজ সহজ। পার্শ্ববর্তী জমির স্বত্ব-স্বামিদের খুঁটিনাট লইয়া যে সমস্তা দেখা দিবে পশ্চিম-বাংলার গবর্নেন্ট তাহা সহজ করিয়া দিয়া অল্প কাজ স্থানীয় উদ্যোগ-শক্তির উপর ছাড়িয়া দিতে পারেন। তখনই আমাদের নব-লব্ধ স্বাধীনতার পরীক্ষা হইয়া যাইবে। বর্তমান যুগে সর্ব ব্যাপারে রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিবার বাতিল হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ব্যষ্টির ও সমষ্টির পক্ষে শুভ নয়। আমাদের বৈশিষ্ট্য যে কণা লইয়া আমরা বড়াই করিয়া থাকি, তার মাহাত্ম্য প্রমাণিত হইবে এখনই। সেই বৈশিষ্ট্য আত্ম-শক্তির প্রতি প্রত্যাবর্তন বলিয়াই আমাদের চিন্তানায়কগণ শুনাইয়া গিয়াছেন। আমরা সেই শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিয়াছি কিনা তাহা এখনই প্রমাণিত হইবে।

### সমবায় প্রথার সার্থকতা

গত ২০শে ভাদ্রের “হরিজন” পত্রিকায় সমবায়ের চমৎকারিতা নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাংলা “হরিজন পত্রিকা”—খানি তাহা অস্বাদ্য করিয়া দিয়াছে। এই প্রবন্ধে ডেনমার্ক দেশে “বিনা রক্তপাতে” কি বিরাট বিপ্লব আনয়ন করা হইয়াছে তাহার বিবরণ আছে।

নেপোলিয়নের আমলে ডেনমার্ক একটা বিশিষ্ট রাজ্য ছিল। শাসনকর্তৃপক্ষ নেপোলিয়নের পক্ষ সমর্থন করায় তাঁহার ভাগ্য-বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে ডেনমার্কের প্রাচীন গৌরব অন্তর্হিত হয়; কতকগুলি মূল্যবান উপনিবেশ (বিক্রিত দেশ) হস্তচ্যুত হয়; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতায় ও জাপানীর রক্ষণ-শক্তির ফলে ডেনমার্কের শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দেয়; “দেশ একেবারে পর্যায়ন্ত ও নষ্ট হইয়া যায়।”

এই নুতন বিপদের আক্রমণ হইতে উদ্ধারের পথ আবিষ্কার করিতে প্রায় ৫০ বৎসর কাটয়া গেল। শিক্ষার ক্ষেত্রে নুতন ভাবধারা প্রবাহিত করিয়া বিশপ (ধর্মযাজক শ্রেষ্ঠ) গুণ্ডভিগ (১৭৮৩-১৮৭২) লোকের মনে নুতন উৎসাহের সৃষ্টি করিলেন। “জন-শিক্ষালয়” এই গণ-জাগরণের অগ্রদূত; গুণ্ডভিগ তার “জনক”।

“..... তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাধারাকে সে দেশের পক্ষে এক রকমের ‘নবী তালিম’ বলা যায়। তাহার সঙ্গে ডেনমার্কের চাষীদের, গরুশূয়ার ও ক্ষেতখামারের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। গুণ্ডভিগের যশস্বী উত্তরাধিকারী কোল্ড তাঁহার গুরুর আরক্ত কর্ম পূর্ণ করেন এবং সমগ্র জাতিতে সমবায়ের বিচিত্র পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সংগঠিত করেন।

ডেনমার্ক চাষের দেশ। সুতরাং সেখানকার চাষী স্বাভাবতই নুতন অগ্রগতির জন্ত ক্ষেতখামার ও গরু-শূয়ারের দিকেই তাকায়। বসন্ত ডেনমার্কের গোমাতাই দেশকে যেমন অনেক জিনিষই জোগাইতেছেন তেমনই সমগ্র জাতিতে নুতন বাণীও শুনাইলেন এবং নব জীবনের পথ দেখাইলেন। ডেনমার্কের চাষী হৃদ্যবাসায়, মাখন ও চিজ (পনির) তৈয়ারী করা, শূকর ও মুরগীর চাষ শুরু করিল; এবং সমবায় ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর অধ্যবসায় সহকারে রাখিয়া ধীরে ধীরে ইংলণ্ডের বাজারে অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে নিজের স্থান করিয়া লইল।

সমবায় আন্দোলন সে দেশে এত বিস্তৃত যে উহাকেই সে দেশের শিল্পনীতি বলা চলে এবং ইহাকে সমাজতন্ত্রের সহিত তুলনা করা যায়। সমগ্র জাতির মধ্যে সমবায় সমিতিগুলি কত বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহা ১৯৩৩ সালের নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি দেখিলে পাঠকগণ স্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবেন :

|                        | সমিতি সংখ্যা | সদস্য সংখ্যা |
|------------------------|--------------|--------------|
| উৎপাদন ও বিক্রয় সমিতি | ২,১৮৯        | ৪,৩১,১৪১     |
| ক্রয় সমিতি            | ২,৮৪১        | ১,৫২,৮৭৫     |
| খাদক সমবায়            | ১,৮২৪        | ৩,৩৫,৯০০     |
| অজ্ঞাত সমবায়          | ৬            | ৭,৪৯,৯৪৬     |
|                        | ৬,৮৬০        | ১৬,৬৯,৮৬২    |

সমিতি স্থাপনে ব্যবসায়ীদের প্রবল বিরোধিতার বিরুদ্ধে চাষীদের লড়িতে হইয়াছিল। আরম্ভের দিকে সমিতিগুলি নষ্ট করিবার জন্ত এই সব ব্যবসায়ী চাষী-দিগকে অধিক মূল্য দিয়া সমবায়-সমিতির প্রতি তাহাদের আকৃষ্টতা ভাঙিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। মহাজনরা একচেটিয়া দর বাধিয়া দেয়। কিন্তু চাষীরা এই সব কান্দ-ফন্দির তোয়াক্কা করে নাই।

সমবায় সমিতিগুলি বহু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ত করিয়াছে, তাহা ছাড়া গণতন্ত্র অভ্যাসের ও শিক্ষার কেন্দ্ররূপে ফলবতী হইয়াছে। অধিকাংশ সমবায় সমিতিতে সদস্যদের যাহার যত টাকার অংশ থাকুক না কেন মাথাপিছু একটি মাত্র ভোট দিতে পারে এই নিয়ম বলবৎ আছে। ইহাতে চাষীরা রাজনীতি ক্ষেত্রেও নিজের গুরুত্ব ও শক্তি বুঝিতে পারিয়াছে। চাষীরা ব্যবস্থা-পরিষদে চুক্তিয়া, বলিয়া কহিয়া সাধারণ লোকের যাহাতে সুবিধা হয় এমন সব আইনের রদবদল করিতে পারিয়াছে। ধীরে ধীরে তাহারা স্বয়ং জমিদারী প্রথা রদ করিয়া তাহার স্থলে সরকারী আয়কুল্যে ছোট ছোট গোলাবাড়ী সৃষ্টি করে। এইভাবে কৃষককে জমির মালিকে পরিণত করিতে পারায় দিনেমার গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি রচিত হইয়াছে। প্রজা হইতে ক্রমশঃ জমির মালিক হওয়ার দিকে এই অগ্রগতি লক্ষ্য করা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ :

| প্রজা চাষী   | মুক্ত মালিক চাষী |
|--------------|------------------|
| শতকরা সংখ্যা | শতকরা সংখ্যা     |
| ১৮৫০ ৪২.৫%   | ৫৭.৫%            |
| ১৯১৯ ৫.৭%    | ৯৪.৩%            |

এই বিবরণী পাঠে একটা সত্য স্পষ্ট হইয়া উঠে যে নিজের পরিশ্রমের ও বুদ্ধির বলে সৃষ্ট মূলধনের সাহায্যে পরদেশের উপর নবাবী না করিবার প্রবৃত্তি দমন করিয়াও একটা জাতি সভ্য জীবন যাপন করিতে পারে। অনেকের নিকট শুনিয়াছি যে ইউরোপ খণ্ডের পর-রাজ্যে নিলোডী দেশগুলিই প্রকৃত প্রভাবে সুখী ও সভ্য। দুষ্টান্ত-স্বরূপ, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও অস্ট্রেল্যান্ডের নাম করা হয়। “হরিয়জন” পত্রিকার প্রবন্ধটি এই দাবি প্রমাণ করিয়াছে।

আমাদের নুতন রাষ্ট্রের শাসক সম্প্রদায় দেশের পুনর্গঠনের উপায় সম্বন্ধে নানা প্রস্তাব ঘোষণা করেন। তাহারা সকলেই গান্ধী-পন্থী বলিয়া প্রচার করেন। গান্ধীজীর মনের আকাঙ্ক্ষা কি ছিল তাহা তাহারা জানেন। তাহারা আদর্শের “রাম-রাজ্যের” প্রতিষ্ঠায় সমবায়-প্রণালী একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। আজ বড় বড় কলনার মধ্যে, শিল্প-বাণিজ্য, সেচের জন্ত বড় বড় বাঁধ প্রতিষ্ঠার মধ্যে, সমবায় প্রণালীর নাম বড় একটা শুনি না। সেই পথেই আমরা চলিতেছি যাহার শেষে পুঁজিপতি ও

শ্রমিকের মধ্যে বিরোধ উগ্রতর হইয়া উঠিবে, এবং রক্তশ্রাবী বিপ্লবে তার মীমাংসা হইবে। আমাদের রাষ্ট্রপালের সাহস করিয়া গান্ধীজীর নির্দেশিত পথে চলিতে পারিতেছেন না।

### ব্রহ্ম-মালয়ে অরাজকতা

প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশে অরাজকতার আবির্ভাবে আমাদের উদ্বেগ হইবার কারণ আছে। লোকমুখে শুনি যে বাঙালী কমুনিষ্ট কর্তৃক পরিচালিত হইয়া ব্রহ্মদেশের বামপন্থী তিনটি দল দেশের শান্তির বিঘ্ন ঘটাইতেছে। এই কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কয়েকমাস পূর্বে নাকি পূর্ব-এশিয়ার নানা দেশের কমুনিষ্ট দলের প্রতিনিধিগণ কলিকাতায় মিলিত হয়, এবং পূর্ব-এশিয়ার দেশসমূহে অশান্তির সৃষ্টি করিবার জন্ত আয়োজন উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দেয়। গত জুলাই মাস হইতে ব্রহ্ম ও মালয় দেশে সেই পরামর্শ অনুসারে অনাচারের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং বাঙালী কমুনিষ্ট দলের যদি ইহাতে হাত থাকে তবে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। নিজের দেশে কোনরূপ পান্তা না পাইয়া যদি বাঙালী কমুনিষ্ট ব্রহ্ম ও মালয়ে হাত পাকাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে, তাহাতে রাজনীতিক মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে না।

ব্রহ্ম ও মালয়ের অরাজকতার পিছনে কাহারো কলকাঠি নাড়িতেছে তাহাই বড় কথা নয়। এই দুই দেশের মধ্যে এমন কোন কারণ আছে যাহার জন্ত এই বিপ্লব আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মদেশের লোকসমষ্টির মধ্যে রক্তের কোন তারতম্য না থাকিতে পারে, ধর্ম্মে কোন পার্থক্য না থাকিতে পারে। কিন্তু বর্ম্মী, সান, কাচিন, চীন এবং কারেনরা রাজ-নীতিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে একতর হইতে পারিতেছে না। ১৯৪১ সনের আদমশুমারি মতে তাহাদের সংখ্যার হার নিম্ন লিখিত হিসাবে পাওয়া যায়—বর্ম্মী—১,১০,০০,০০০; সান—১০,০০,০০০; কাচিন—৪,০০,০০০; চীন—২,৫০,০০০ ও কারেন—১৩,০০,০০০। এর মধ্যে কারেনদের কথাই বেশী শুনা যাইতেছে; তাহারা স্ব-প্রধান একটি রাষ্ট্র চায়; অন্নবিস্তার অত্যন্ত জাতিও এরূপ আশা পোষণ করে। এরূপ দাবি-দাওয়ার সময়স্বর সাধন করা সহজ নহে।

ব্রহ্মদেশে জটিলতা বৃদ্ধির জন্ত চীন ও ভারতবর্ষীয়েরাও কিয়দংশে দায়ী। চীনাদের সংখ্যা মাত্র আড়াই লক্ষ; কিন্তু দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাহাদের আধিপত্য বর্ম্মীদের চক্ষুশূল হইয়া আছে। গত যুদ্ধের সময় তাহাদের অনেকেই জাপানী অত্যাচারের ভয়ে দেশে পলাইয়া গিয়াছিল। এখন আবার ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু পূর্বের প্রাধাণ্য তাহারা আর ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। আর একটা কথা, অতীতে কোন সময় ব্রহ্মের উত্তরাংশ চীনাদের অধীনে ছিল



বলিয়া একটা কিয়দত্তী আছে ; তাহার বলে নাকি এখন চীনারা উত্তর-ব্রহ্মের ৭০,০০০ হাজার বর্গ মাইল দাবি করিতেছে। এই দাবির ফলে চীনা ও বর্মার সম্বন্ধ তিক্ত হইয়া যাইতে পারে।

যুদ্ধের পূর্বে প্রায় ১০ লক্ষ ভারতবাসী চাকুরী ও নানা ব্যবসায় উপলক্ষে ব্রহ্মদেশে ছিল। এদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতীয়দের প্রাধান্য দৃষ্টিকটু হয় ; চেষ্টা সম্প্রদায়ের ১০০ কোটি টাকা দক্ষিণ-ব্রহ্মের চাষের ক্ষমিতে আটক পড়িয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে প্রায় ৫ লক্ষ ভারতবাসী দেশে পলাইয়া আসে ; তাহাদের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ নাকি ব্রহ্মে ফিরিয়া গিয়াছে। এই লোক-সমষ্টির ভবিষ্যৎ লইয়া অনেক অভিযোগ শুনা যায়। একথা ঠিক যে রাজকার্যে ভারতবাসীর স্থান ক্রমশঃ সঙ্গী হইয়া আসিয়াছে, ব্যবসায়-বাণিজ্যক্ষেত্রেও তাহাদের পূর্বের প্রাধান্য থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রায় ৬ লক্ষ ভারতবাসী কি উপায়ে স্বাধীন ব্রহ্মের অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওইয়া লইবেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তাহারা ব্রহ্মদেশকে মাতৃভূমি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু তাহার ফলে তাহার বর্মার সঙ্গে আচার-আচরণে অভিন্ন হইয়া যাইতে পারিবেন, এরূপ আশঙ্কা অমূলক নয়। অতীতে ভারতীয়েরা পূর্ব-এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে ও নানা দেশে এরূপ ভাবে আত্মবিলোপ করিয়াছিল। বর্তমানে তাহাদের সে সাহস ও শক্তি আছে কি ?

এখন মালয়ের কথা। সংবাদ পড়িয়া মনে হয় যে মালয়-বাসী চীনা ক্যামিনিষ্টরাই বর্তমান অরাজকতায় নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রবাসীদের পূর্বজগণ মালয়ে আসিয়াছিল টিনের খনি ও রবারের বাগানে শ্রমিকের কাজ করিতে, যেমন দক্ষিণ-ভারত হইতে এই উদ্দেশ্যে ৬৭ লক্ষ শ্রমিক গিয়াছিল। এই শ্রমিকদের অহসরণ করিয়া আসিয়াছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শ্রেণী, ডাক্তার, উকীল, সরকারী চাকুরিয়া। গত যুদ্ধে যখন জাপানীদের প্রথম দাপটেই ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদের তাসের ঘর হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, তখন এই সকল শোষিত শ্রেণী মাথা উঠু করিয়া দাঁড়াইবার সাহস করিল। “আজাদ হিন্দ সরকারের” কল্যাণে বিশেষ করিয়া ভারতীয় শ্রমিক-শ্রেণী একটা নূতন আত্ম-বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। সেই উৎসাহ ও উজ্জ্বলনা অল্পবিস্তর সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তার লাভ করিল। তাহার ফলে ব্রিটিশ শাসন যখন ব্রহ্মে ও মালয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল তখন পুরাতন প্রভুত্বের নিকট মাথা নোয়াইবার প্রযুক্তি ও প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে। ইহাই হইল ব্রহ্ম ও মালয়ে অরাজকতার গোড়ার কথা।

### ভারত-রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান

ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে

সদাজ্ঞাগ্রস্ত আছেন বলিয়া আমরা তাহাদের অভিনন্দিত করিতেছি। ভারত-রাষ্ট্রের শাসন-বিধানে সাম্প্রদায়িক ভাব বা কর্মপ্রচেষ্টার কোন স্থান নাই ; এই বহু-ধোষিত নীতি সর্বজনবিদিত। সম্প্রতি ভারত-রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্নেন্ট প্রাদেশিক শাসন-কর্তৃপক্ষের নিকট একটি নির্দেশ পাঠাইয়াছেন। ইহা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইলে সম্প্রদায়ের নামে যে রাজনীতিক খেলা খেলিতে গিয়া ভারত-বর্ষ ধ্বংসিত হইয়াছে, তার সম্ভাবনা সংযত বা দূরীভূত হইবে, এই আশা করা যাইতে পারে। গান্ধীজীর হত্যার পর গণপরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ভবিষ্যতে ভারত-রাষ্ট্রে কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইবে না ; সাম্প্রদায়িক উদ্বেগ সাধনের জন্ত গঠিত প্রতিষ্ঠানকে বেআইনী ঘোষণা করা যাইবে এবং কোনরূপ সাম্প্রদায়িক দল বা উপদল গঠন করিতে দেওয়া হইবে না। এই প্রস্তাবকে রূপ দান করিবার জন্ত কেন্দ্রীয় গবর্নেন্ট নির্দেশ পাঠাইয়াছেন যে অতঃপর রাজনীতিক উদ্বেগ লইয়া কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান যদি সরকারের নিকট কোন আবেদন-নিবেদন বা দাবীদাওয়া উপস্থিত করে তবে তাহা সরাসরি অগ্রাহ করা হইবে ; এরূপ প্রতিষ্ঠানের অ-রাজনীতিক কার্যেও কোন সরকারী সাহায্য দেওয়া হইবে না ; এমন কি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত কোন গঠনমূলক কার্যেও সরকারী সাহায্য বা আত্মকূল্য প্রদান করা চলিবে না। এই নির্দেশাবলীর সাফল্য আমরা কামনা করি।

কিন্তু এই সম্বন্ধে আমাদের মনে কতকগুলি জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে যাহা ব্যক্ত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। “সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে”র সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই ; তাহা দেওয়া বোধ হয় সহজ নয়। ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির নামে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান চলিতে পারে যাহা বর্তমান নিষেধাবলীর আওতায় পড়ে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেন্দ্রীয় মোহম্মদান এসোসিয়েশনের (Central Mahomedan Association) নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রতিষ্ঠান ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া পড়ে। নবাব আবদুল লতিফ ইহার প্রতিষ্ঠাতাদের অগ্রতম। তিনি ছিলেন ৩৬০০০ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সতীর্থ। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমান যুগোপযোগী শিক্ষা ও সাধনা প্রবর্তন করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ফলে দেখা যায় যে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ ও গৃহক স্বার্থ-সাধনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার এই প্রতিষ্ঠান সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতার কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়ে, এবং এই প্রতিষ্ঠান কালে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার কর্ণধার রূপে দেখা দেয়। এই সভার নামে সৈয়দ আমীর আলী সর্বভারতীয় জাতীয়তার

বিরোধিতা আরম্ভ করেন, যার পরিণত ফল সর্বভারতীয় মুসলীম লীগ।

সেইরূপ স্বামী দয়ানন্দ-প্রতিষ্ঠিত আৰ্য্য সমাজ রাজনীতিক সম্বন্ধ বিবর্জিত হইয়াও এমন কতকগুলি অবস্থার সৃষ্টি করিল, এমন ভাবোন্মাদনার জন্ম দিল যে পঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমান-শিখের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। অথচ এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে উত্তর-ভারতে শিক্ষা-বিভারে আৰ্য্য-সমাজের দান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে।

রাজনীতি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানও এই ভাবে সমাজের বৃকে ভেদের সৃষ্টি করিতে পারে। সুতরাং আইন-কানুন করিয়া সঙ্গীর্ণতার বিনাশসাধন করা সহজ নয়। গান্ধীজীর সাধনার পরিণতি দেখিয়া অনেক সময় মনে হয় যে শ্রেণীতে শ্রেণীতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেদবোধ ও বিরোধ বিশ্ব-বিধানের অঙ্গ। কিন্তু এই বিধানকে ব্যর্থ করিবার জন্ত মানব-প্রকৃতির চেষ্টারও বিরাম নাই। এই চেষ্টাই মানবপ্রকৃতির মাহাত্ম্যের প্রমাণ ও চিরন্তন পরীক্ষার ক্ষেত্র বলিয়া আমরা গৌরব বোধ করি।

### ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ

ইংরেজের একটা বিধান স্বীকার করিয়া লইয়াই ভারত-বর্ষকে দ্বি-বণ্ডিত করা হইয়াছে। এই বিধান মনে-প্রাণে স্বীকার করিয়া লওয়া কোনও ভারতবাসীর পক্ষে সহজ নয়। সেইজন্ত দেখিতে পাই যে Unity Party নামে একটি দল রাজনীতি ক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছে। এই ঐক্যপ্রয়াসী দলের পরিচয় আমরা জানি না। তাহার নেতৃবর্গ কে তাহাও আমরা জানি না। প্রবর্তক সম্ভের সাপ্তাহিক মুখপত্র “নব সঙ্গ” এই দলের কার্যসূচী সম্বন্ধে যে সংবাদ দিয়াছেন, তাহা হইতে এই প্রতিষ্ঠানের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা আমরা করিতে পারি। এই কর্মসূচীতে শ্রীঅরবিন্দের “বাণী” উদ্ধৃত করা হইয়াছে। নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

“ভারত আজ স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু সে ঐক্য সিদ্ধ করিতে পারে নাই। এক মুহূর্তে ইহাও প্রায় প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, এই মুক্তিলাভের ব্যাপারেই প্রাক-রুটিন-বিজয় যুগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাষ্ট্র লইয়া যে বিশ্বখ্যাময় পরিস্থিতি, তাহাতেই সে আবার নিপতিত হইবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এক্ষণে মনে হইতেছে যে, সম্ভবতঃ এই বিপদ এড়াই যাইবে এবং সম্পূর্ণ না হইলেও, এক বিপুল ও শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান লইয়া যে সাম্প্রদায়িক ভেদ, তাহা যেন এক্ষণে দেশের এক স্থায়ী রাজনৈতিক বিভক্ততায় কার্যময়ী হইয়াও উঠিয়াছে। আশা করা যায় যে, এই সিদ্ধান্তকে শেষ সিদ্ধান্ত বা মাত্র একটি সাময়িক ব্যবস্থা ভিন্ন অথ কিছু

বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। কারণ ইহা যদি স্থায়ী হয়, ভারতের গুরুতর দুর্বলতা ঘটিতে পারে, এমন কি সে চির-পঙ্কু হইয়া যাইতে পারে—এমন কি নূতন আক্রমণ ও বৈদেশিক বিজয়ও অসম্ভব নয়। ভারতের আভ্যন্তরীণ পরিণতি ও উন্নতি বিঘ্নিত হইতে পারে, জাতিপুঞ্জের দরবারে তাহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ ও তাহার ভবিষ্যৎ ভাগ্যও ঝুঁকি বা এমন কি ব্যর্থতায়ও পর্যাবসিত হইতে পারে। ইহা হইতে দেওয়া হইবে না। ভারত-বিভাগ রদ করিতে হইবে। আমরা আশা করিব—ইহা স্বাভাবিক উপায়েই ঘটবে—শুধু শান্তি ও সম্প্রীতি নয়, মিলিত কাজেরও প্রয়োজনীয়তা ক্রমবর্ধিতভাবে যতই উপলব্ধিগম্য হইবে—সমবেত কাজের অভ্যাস ও তদ্বৎসে উপায়-সৃষ্টি যেমন যেমন আমরা করিতে পারিব। এই-ভাবে চরমে এক্য আসিতে পারিবে—সে যে আকারেই হউক—একটা সঠিক আকারের প্রয়োজনীয়তা কার্য-সৌকর্য্য হিসাবে থাকিলেও তাহার মৌলিক সার্থকতা নাই। কিন্তু যে উপায়ে বা যে পথেই হউক, বিভাগ অবশ্যই যাইতে হইবে; এক্য অবশ্যই হইবে—উহা সিদ্ধ করিতেই হইবে—কারণ ভারতের ভবিষ্যৎ মহিমার জন্তই উহার প্রয়োজন।”

এই “বাণী” পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের জাতীয় জীবনের সম্মুখে বহু বিপদ অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। “নূতন আক্রমণ ও বৈদেশিক বিজয়ও অসম্ভব নয়”; ইহা “চির-পঙ্কু” হইয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষের বিভাগ ব্যবস্থা স্থায়ী হইলে এই সব বিপদের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ভারত-বিভাগ রদ করিতে হইবে ইহাই শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ। এই নির্দেশের অনুসরণ করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তৎ-সম্বন্ধে কোন পরিকার ধারণা আমরা এই “বাণীর” মধ্যে পাইলাম না। আশা করা যাইতেছে যে ইহা “স্বাভাবিক” উপায়ে ঘটবে।

### বোম্বাইয়ে ধূমপান নিবারণ আইন

ভীড়ের মধ্যে ধূমপান সাধারণ স্বাস্থ্যের হানিকর এই কারণে বোম্বাই গবর্নমেন্ট কয়েক বৎসর যাবৎ ট্রাম ও বাসে ধূমপান সংঘত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি বঙ্গ সিনেমা-গৃহে ধূমপান আইন করিয়া বন্ধ করা হইয়াছে। ধূমপান যাহারা এদেশে প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাদের এ বিষয়ে একটা প্রথা আছে যে পার্শ্ববর্তী লোকের, বিশেষতঃ মহিলাদের অনুবিধা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা উহা বন্ধ করেন। অপরের অনুবিধা সৃষ্টি করিয়া ধূমপান ভদ্রতার পরিচায়ক নহে। আমরা ধূমপান আরম্ভ করিয়াছি কিন্তু উহার অঙ্গস্বরূপ যে শিষ্টতা রহিয়াছে তাহা মানিয়া লই নাই। আকর্ষণ বোম্বাই

ট্রামে ও বাসে যেখানে অতি কষ্টে দাঁড়াইবার একটুখানি জায়গা মিলে সেখানে ধূস্রজাল বেরূপ অল্পবিধাজনক তেমনই অস্বাস্থ্যকর। ধূমপায়ীরা ইচ্ছা করিলে নিজেরা ইহা বন্ধ করিতে পারেন; ট্রামে বড় জোর আধ ঘণ্টা, এবং বাসে এক ঘণ্টা সময় ধূমপানে বিরত থাকিলে সহযাত্রীদের কষ্ট হয় না। বাস সিডিকেট বাসে ধূমপান বন্ধ করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন; ট্রাম কোম্পানীরও উহা করা উচিত এবং আমরা আশা করি ধূমপায়ী লোকেরা অর্ধ বা এক ঘণ্টা সংযম রক্ষা করিয়া এই চেষ্টা সফল করিবেন, ইহার জ্ঞাত আইনের প্রয়োজন হইবে না। সিনেমা-গৃহে ছুই বা আড়াই ঘণ্টার সংযম সাধারণ দর্শকের পক্ষে স্বস্তির কারণ হইবে।

সিনেমা-গৃহ সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দরকার। সিনেমার সম্মুখে টিকিট-ক্রয়েজ লোকের, বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক বালকদের ভিড় পীড়াদায়ক। ইহা জাতির পক্ষে অকল্যাণের কারণও বটে। অল্পবয়স হইতে আমাদের ছেলেরা লাইনে দাঁড়াইয়া জলঝড় ও অপমান সহ করিতে অভ্যস্ত হইলে তাহাদের ভবিষ্যৎ-জীবনে মনুষ্য বিকাশের পথ রুদ্ধ হইতে বাধ্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছেলেরা সিনেমা-গৃহের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া রাখা সম্পূর্ণ অনাবশ্যকও বটে। ইডেন উদ্যানে গত নিখিল-ভারত প্রদর্শনীতে দেখা গিয়াছে ৩০টি জানালার দৈনিক সাত ঘণ্টা টিকিট বিক্রয় হইলে প্রত্যহ পঞ্চাশ হাজার হইতে ছুই লক্ষ লোককে টিকিট দেওয়া যায়; লাইন বাঁধিবার প্রয়োজন হয় না। সিনেমার এক একটি প্রদর্শনীতে বড় জোর হাজারখানেক দর্শক টিকিট ক্রয় করে; নীচের ছুইটি শ্রেণীর জ্ঞাত পাঁচটি করিয়া জানালার প্রদর্শনীর আগে এক ঘণ্টা করিয়া টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে লাইন দেওয়ার কোনই প্রয়োজন হইবে না। সিনেমা-গুলির এখন পর্যাপ্ত এবং অপ্রত্যাশিত লাভ হইতেছে; এই সামান্য ব্যয় তাহারা অনারামেই করিতে পারেন।

### শিল্প ও সংস্কৃতির প্রাচীন ধারা

সকল যাহাধরই প্রাচীন শিল্প, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া গড়িয়া উঠে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে বাংলাদেশে একটি বিশেষ সংগ্রহের কার্যে নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি জানিতে পারিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের “আন্তর্জাতিক চিত্রশালা” বাংলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতির সরেজমিন তদন্ত করিবার জ্ঞাত ত্রিভুজনাথ ঘটক, এম-এ, কে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি হুগলী জিলার আরামবাগে-কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই বিষয়ে “নির্ণয়” পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিবৃতি পড়িয়া তাহার কাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিলাম। সাধারণের জ্ঞাতার্থে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(১) প্রাচীন মন্দির কোন গ্রামে আছে কিনা ?

এবং সে মন্দিরের গায়ে কোনও শিল্পকার্যের নমুনা আছে কিনা ?

(২) কোনও প্রাচীন মসজিদ আছে কিনা ?

(৩) কোথাও কোনও শিলালিপি অথবা অথ কোনও প্রকারের লিপি আছে কিনা ?

(৪) গ্রামাঞ্চলে কোনও শিল্প আছে কিনা ? থাকিলে কি ধরণের শিল্প ? মাটির, কাঠের, বাতুর, বেতের, পাথরের ইত্যাদি।

(৫) বর্তমানে প্রাচীন শিল্পকারীদের কোনও বংশধর এখনও জীবিত আছে কিনা ? থাকিলে তাহাদের নাম এবং ঠিকানা।

(৬) প্রাচীন পুঁথি (চিত্রিত অথবা অচিত্রিত) পাওয়া যায় কিনা ? তাহার ঠিকানা।

(৭) কাহারও বাড়ীতে পুরাতন কাঁথা অথবা অজান্তেই স্থানীয় শিল্পের নিদর্শন আছে কিনা ?

এইরূপ মাল-মশলা সংগ্রহের উপর বাংলাদেশের একখানি সর্বাঙ্গ-সুন্দর ইতিহাস লেখা নির্ভর করিতেছে। বাংলাদেশের ৭০,০০০ গ্রামে অরক্ষিত ভাবে ও অজ্ঞাতে কত নিদর্শন পড়িয়া আছে, তাহার সীমা-পরিসীমা নাই। এতদিন এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজ নিজ ভাবে প্রাচীন জীবনের নিদর্শনসকল সংগ্রহ করিয়া যাইতেছিলেন; এই নিদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া বাংলার ইতিহাসের উপর আলোকপাতও কিছু কিছু হইতেছিল। কিন্তু যে ব্যাপক দৃষ্টি ও সামগ্রিক চেষ্টা করিলে আমাদের মত “আত্ম-বিশ্বস্ত” জাতির মন ও বুদ্ধি জাগিয়া উঠে, সে রূপ ব্যবস্থা হয় নাই। কিন্তু আজ এখন পর্যাপ্ত সময় আসিয়াছে যখন পুরাতন গদাই-লক্ষ্মী চাল ত্যাগ করিতে হইবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে। একাধ মন লইয়া জাতির প্রত্যেক লোককে পুরাতনকে উদ্ধার ও সংস্কৃত করিতে হইবে, নূতনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। তবেই দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য ঘুচাইবার যে অযোগ-সুবিধা আমরা পাইয়াছি তাহা সার্থক হইবে।

### আন্দামান দ্বীপে বাঙালী উপনিবেশ

একটা সংবাদ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আন্দামান দ্বীপে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাাদের উপনিবেশ গড়িয়া তুলিবার অযোগ দিবার পরিকল্পনা নাকি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন লাভ করিয়াছে, এবং পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রী-মণ্ডলী এই প্রস্তাবের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জ্ঞাত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিবর্গকে আন্দামান দ্বীপে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সংবাদে আমাদের সহযোগিত্বের মধ্যে কেহ কেহ শিহরিয়া উঠিয়াছেন, এবং ইংরেজ আমলের নিষ্ঠুর স্থতির জের টানিয়া এই প্রস্তাব সম্বন্ধে নানা ঠাট্টা-বিজ্ঞপ করিয়াছেন। তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক

নহে ইহা সত্য, কিন্তু আজ আমরা অতি কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন ইহাও বিচার করা প্রয়োজন।

এই সম্ভাবনায় আমাদের মনে নিরবচ্ছিন্ন ভয়ের বা বিরূপ ভাবের উদ্রেক হয় নাই। এই কথা স্বীকার করিবার উপায় নাই যে পশ্চিম বাংলার ২৮,০০০ বর্গ মাইলের মধ্যে পূর্ববঙ্গের সওয়া কোটি হিন্দুর স্থান করিবার উপায় নাই। কেন্দ্রীয় গবর্নেন্ট স্বীকার করিয়াছেন যে বিহার, উড়িষ্যা, কোচবিহার রাজ্য, ত্রিপুরা রাজ্য ও আসামে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদিগের স্থান করিয়া দিবার চেষ্টা তাঁহারা করিবেন। পূর্বতন সাহায্য ও পুনর্বাসতি বিভাগের মন্ত্রী ক্রীষ্ণীশচন্দ্র নিয়োগী গত এপ্রিল মাসে প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যসমূহের গবর্নেন্টের নিকট এই সম্পর্কে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার নকল গত ২৫শে ভাদ্রের “আনন্দবাজার পত্রিকা” প্রকাশিত হইয়াছে। মন্ত্রী মহাশয়ের পত্রের উত্তরে কোন্ গবর্নেন্ট কি বলিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। তবে আসাম গবর্নেন্ট যে এই প্রস্তাব সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি। কেন্দ্রীয় আইনসভার গত অধিবেশনে দত্ত-বিহান মন্ত্রী ক্রীণোপালস্বামী আয়েঙ্গার আসাম গবর্নেন্টের মতিগতির বর্ণনা করিয়াছেন। সেপ্টেম্বর মাসের “মডার্ন রিভিউ” মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

এই সংবাদে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। অহম ভাষা-ভাষী ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ২৫ লক্ষ লোক-সমষ্টির মনোভাব আমরা জানি। এই মনোভাবকে দ্বিচার দিলে পূর্ববঙ্গের বিরাট হিন্দু সমাজের উপকার হইবে না, যদিও এই মনোভাবকে চিনিয়া রাখার প্রয়োজন আছে। ত্রিপুরা ও কোচ-বিহার রাজ্যে কয়েক লক্ষ বাঙালী বাস্তবদ্বারা নূতন জীবন আরম্ভ করিতে পারেন। কংগ্রেসের সংগঠিত নূতন বিধানে পূর্বাচল প্রদেশ—কাছাড়, মণিপুর রাজ্য ও ত্রিপুরা রাজ্য লইয়া ইহা সংগঠিত—এই প্রয়োজনের পরিপোষক হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। মানভূম লইয়া আমাদের বিহারী প্রতিবেশীরা যে খেলা খেলিতেছেন তার ফলে মনে হয় যে বিহারের দরজা খোলা পাওয়া যাইবে না। উড়িষ্যা নাকি ১০ হাজার লোকের জন্ম স্থান সমুদান করিয়া দিতে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বহু লক্ষ বাস্তব্যাগী বাঙালীর সমস্তা থাকিয়া যাইতেছে। সে বিষয়ে আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি না। তাঁহাদের জন্ম স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সেই সম্পর্কেই আন্দামান দ্বীপের নাম উঠিয়াছে। বিমান-পথের যুগে বঙ্গ-উপসাগরের মধ্যস্থিত এই লোক-বিরল দ্বীপপুঞ্জ খুব দূর নয়। তথায় কত লোকের বসতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে অমুসন্ধান করিতে হইবে। ইহার বর্তমান স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ম্যালেরিয়ার কথা শুনা যাইতেছে। এই রোগ দমন করা যায়। আন্দা-

মানের কৃষি-সম্পদের সম্ভাবনা কি তাহাও জানিতে হইবে, এবং এই কার্যের জন্ত পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমাজের নেতৃমণ্ডলের অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে। সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বিলম্ব করা উচিত নহে। পূর্ববঙ্গের হিন্দু যুবকমণ্ডলের নূতন পরিবেশে নূতন জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। তাঁহাদের পূর্ব পুরুষেরা এইরূপ ভাবে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত হইতে নিকরুদ্ধে যাত্রা করিয়া বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন।

### কাকা-সাহেব খাদিলকর

বালগঙ্গাধর টিলকের শিষ্যবর্গের মধ্যে আর একজন মর-জগৎ হইতে চলিয়া গেলেন। প্রথম যৌবনে টিলক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত “কেশরী” পত্রিকায় সাংবাদিক ও রাজনীতিক জীবনে তাঁহার হাতেখড়ি আরম্ভ হয়। বলবন্ত রাও-এর দেহত্যাগের পর তিনি “নব-কাল” নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং তদবধি গত ১১ই ভাদ্র পর্যন্ত পশ্চিম-ভারতের-রাজনীতি-ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি “নব-কালে”র সম্পাদকীয় পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার লেখনী কখনও ক্ষান্ত হয় নাই।

কাকা-সাহেব কেবল সাংবাদিক ছিলেন না। নাট্যকার-রূপে মহারাষ্ট্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। এই বিষয়ে তিনি আর একজন টিলক-পন্থী নরসিংহ চিন্তামণি ফেলকারের সমপর্যায়-ভুক্ত ছিলেন। মহাভারতের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া তিনি ইংরেজ শাসনের অপমান ও যন্ত্রণা নাট্যকারে রূপদান করেন। “কীচকবধ”, “দ্রৌপদী” প্রভৃতি নাটক সেইজন্ত পরদেশী শাসক-গোষ্ঠীর হাতে লাঞ্চিত হয়।

রাজনীতিক জীবনে তিনি টিলক-পন্থী ছিলেন। সেইজন্ত শেষ বয়সে গান্ধী-যুগের সহিত ঋণ ঋণায়িতা লইতে পারিলেন না। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিরোধিতায় শিথিল-প্রযত্ন না হইয়াও তাঁহাকে রাজনীতিক জীবন হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হইল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি গান্ধীজীর চিন্তাধারা ও কর্মধারার প্রতি বিরোধ দেখাইয়া গিয়াছেন। বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে চল্লিশ বৎসর যে বিপ্লবের স্বপ্ন টিলক-পন্থীরা দেখিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাদের উদ্দিষ্ট পথে পরিণতি লাভ করে নাই। ভারতবর্ষের দ্বি-খণ্ডিত মুষ্টি তাঁহাদের আকাজিক ছিল না। সেইজন্ত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টে পরিবর্তন দেখা দিল, তাহা তাঁহাদের মনকে শান্ত করে নাই। এই অশান্ত মন লইয়া কাকা-সাহেব খাদিলকর ভারতবর্ষের জলবায়ু, আলো-বাতাসের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। পরিণত বয়সে তিনি তাঁহার প্রার্থিত লোকে চলিয়া গেলেন। একজন পুরাতন বন্ধুর বিরোধে বাঙালী তাঁহার পুত্র-কন্ঠার উদ্দেশে সমবেদনা নিবেদন করিতেছে।

# সিন্ধুধর্মে জ্ঞী-দেবতার উপাসনা

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

পূর্বের একটি প্রবন্ধে পণ্ডিতসমাজে গৃহীত এই মতের উল্লেখ করা হইয়াছে যে তাম্রযুগে সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচিস্থানে জ্ঞী-দেবতার উপাসনার বহুল প্রচার ছিল। বর্তমান প্রবন্ধে এই মতবাদেরই বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে, সিন্ধুধর্মের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা হইবে না।

আলোচনা আরম্ভ করিবার আগে সিন্ধুধর্মে জ্ঞী-দেবতার উপাসনা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়াছেন তাহার একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইতেছে। উহা হইতে আলোচ্য বিষয়টির একটা সম্পূর্ণ, পরিচ্ছন্ন ধারণা করা সম্ভব হইবে।

মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা ও বেলুচিস্থানের বিভিন্ন স্থাপত্য হইতে বহুসংখ্যক পোড়া মাটির জ্ঞীমূর্তি (terra cotta female figurines) পাওয়া গিয়াছে। এই ধরনের জ্ঞীমূর্তি মেশোপটেমিয়া, মিশর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, এশিয়া মাইনর, দ্বিজিয়ান অঞ্চল ও অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে। এই সকল দেশে এই জ্ঞীমূর্তিগুলি মাতারূপে কল্পিত জ্ঞী-দেবতার (Mother Goddess) অথবা ধরিত্রী দেবীর (Nature Goddess) প্রতিমা। স্বতরাং সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচিস্থানে প্রাপ্ত জ্ঞীমূর্তিগুলি যে দেবীপ্রতিমা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই দেবী-উপাসনার উৎপত্তি হইয়াছিল এশিয়া মাইনরে (আনাতোলিয়ায়)। এশিয়া মাইনর হইতে এই দেবী-উপাসনা মেশোপটেমিয়ায় এবং সেখান হইতে বেলুচিস্থান ও সিন্ধু উপত্যকায় প্রচারিত হইয়াছিল। মতান্তরে এই দেবী উপাসনার উৎপত্তি মেশোপটেমিয়ায়। মেশোপটেমিয়া হইতে ইহা উত্তর-পশ্চিমে সিরিয়া, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি অঞ্চলে এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সিন্ধু উপত্যকায় বিস্তৃত হইয়াছিল। এই দেবী-উপাসনা ভারতবর্ষে আনিয়া-ছিল দ্রাবিড় ভাষাভাষী লম্বামুণ্ড ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর জাতি। ইহাদের সঙ্গে কিছু আর্যেনয়েড গোষ্ঠীর লোক ছিল। এশিয়া মাইনর হইতে যে ভারতবর্ষে এই দেবী উপাসনা আসিয়াছিল (আলোপ্পো-বাগদাদের বাণিজ্যপথ ধরিয়া) তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় দেবী উপাসনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি প্রথা হইতে। এই সকল প্রথা এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, ফিনিসিয়া, বাবিলোন প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। এখনও ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-ভারতে, এ সকল প্রথার কতকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, দেবদাসী-প্রথা, অগ্নি-সংস্কার

ইত্যাদি। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি উপাসনা-পদ্ধতি ও প্রথা ভারতবর্ষে দেখা যায় যাহা প্রাচীন যুগে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে ছিল এবং নিঃসন্দেহে সেখান হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। যথা, গাভীপূজা, সর্প-পূজা, মৎস্যপূজা, বৃষপূজা, স্বজাতীয়া মেয়েদের নিকট বীরত্ব ও সাহস প্রমাণ করিবার জন্য দক্ষিণ-ভারতের কাল্পার প্রভৃতি জাতির মধ্যে ক্রুদ্ধ যুগের উপর লাফাইয়া উঠিয়া তাহার পৃষ্ঠে রক্ষিত বস্ত্র গ্রহণ করিবার খেলা ইত্যাদি।

এই সকল উপাসনা ও প্রথা হইতে প্রমাণ হয় সিন্ধুধর্ম পশ্চিম এশিয়া হইতে আসিয়াছিল। সিন্ধুধর্ম হইতে এইগুলি হিন্দুধর্মে গৃহীত হইয়াছে। তারপর জ্ঞী-দেবতার উপাসনার উৎপত্তি এমন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে হইয়াছিল যাহাতে পিতা অপেক্ষা মাতার প্রাধান্য ছিল অধিক। উত্তর-ভারতের সর্বত্র এককালে এই সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নর্ডিক বা প্রোটো-নর্ডিক গোষ্ঠীর জাতির আক্রমণের ফলে দ্রাবিড় ভাষাভাষী ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠী ক্রমে দক্ষিণ-ভারতে পশ্চাদপসরণ করে। এই সকল প্রথা, উপাসনা প্রভৃতির অনেকগুলি উত্তর-ভারতে অপ্রচলিত হইয়া আসিলেও দক্ষিণ-ভারতে সেগুলির অস্তিত্ব রহিয়াছে। অন্যত্র বলা হইয়াছে পামীরী গোষ্ঠীর জাতির সিন্ধু উপত্যকায় অভিযানের ফলে ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর জাতি উত্তর-ভারত হইতে হটিয়া যায়।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পামীরী গোষ্ঠী ও নর্ডিক বা প্রোটো-নর্ডিক গোষ্ঠীর আক্রমণকারীদেরকে অভিন্ন বলা হইয়াছে। ইহারাই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের কথিত আর্য আক্রমণকারী।

উপরের সংক্ষিপ্তসারে উল্লিখিত প্রত্যেকটি মত প্রসিদ্ধ, সম্মানীয় পণ্ডিতগণের মত। এই সকল মতের মধ্যে সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচিস্থানে প্রাপ্ত জ্ঞীমূর্তি সম্পর্কিত মতগুলির আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমে এই আলোচনা করা হইবে।

সর জন মার্শালের ব্যাখ্যাকে সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচিস্থানে প্রাপ্ত জ্ঞীমূর্তি সম্পর্কিত মতের আলোচনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। একথা পূর্বে একবার বলা হইয়াছে এবং এখানে পুনরায় উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই সকল জ্ঞীমূর্তি যে দেবীপ্রতিমা যুক্তি ও



প্রমাণের সাহায্যে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন একমাত্র সর জন মার্শাল, বাকী সকলে তাঁহার বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিত আবার যুক্তি-প্রমাণ নিরপেক্ষ নিরঙ্কুশ মত প্রকাশের স্বাধীনতায় অভ্যস্ত।

মার্শালের যুক্তিপ্রমাণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তে আসিতে প্রথমতঃ কয়েকটি দেশের প্রাচীন যুগের স্তূপ হইতে প্রাপ্ত সিদ্ধ উপত্যকা ও বেলুচিস্থানের জম্মীতিগুলির অল্পরূপ জম্মীতির উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, এই মূর্তিগুলি যে ঐ সকল দেশে প্রাচীনযুগে পূজিত দেবীমূর্তি তাহা জানাইয়াছেন। তৃতীয়তঃ, এই নজিরে সিদ্ধ উপত্যকা ও বেলুচিস্থানের জম্মীতিগুলিও যে দেবীমূর্তি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। শেষতঃ, ভারতবর্ষে জম্মী-দেবতার উপাসনা যে প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ হিসাবে আধুনিক হিন্দুধর্মে প্রচলিত জম্মী-দেবতার উপাসনার কতকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে মার্শালের প্রধান প্রমাণ evidence of analogy or parallel finds, গৌণ প্রমাণ আধুনিক বা পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সাক্ষ্য। এখানে এই প্রধান প্রমাণের আলোচনা করা হইবে।

আলোচনার আরম্ভে সিদ্ধ উপত্যকা ও বেলুচিস্থানের জম্মীতিগুলি যে দেবীপ্রতিমা এ সম্বন্ধে মার্শালের অভিমত উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

"From their resemblance to one another and the frequency with which they occur, there is no doubt that these female figurines with their elaborate head-dresses and jewellery are sacred images . . . What particular deity these female figurines represent we do not as yet know; but it is probable that she was a goddess with attributes very similar to those of the Great Mother-goddess . . . whose images are found in large numbers at so many early sites in Elam, Mesopotamia, Egypt and Eastern Mediterranean . . . Probably there was one of these images in one of the rooms of every household."

অর্থাৎ, পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য হইতে এবং বহু স্থানে এইগুলি পাওয়া গিয়াছে এই তথ্য হইতে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না যে প্রচুর অলঙ্কার ও জমকালো শিরাবরণে ভূষিত এই জম্মীতিগুলি দেবী মূর্তি। এখনও জানিতে পারা যায় নাই এই মূর্তিগুলি ঠিক কোন দেবীর প্রতিমা; মনে করা যাইতে পারে যে এলাম, মেশোপটেমিয়া, মিশরে এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যে মহাদেবীর বহু প্রতিমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাঁহার যে সকল বৈশিষ্ট্য বা রূপ ছিল এই দেবীরও সেই সকল বৈশিষ্ট্য বা রূপ ছিল। সম্ভবতঃ প্রতি গৃহে একটি কক্ষে একটি করিয়া মূর্তি রক্ষিত হইত।

তারপর মার্শাল বলিতেছেন, পশ্চিম এশিয়ার এই সকল প্রতিমূর্তির সহিত সাদৃশ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা ও বেলুচিস্থান হইতে প্রাপ্ত মূর্তিগুলি যে মহাদেবীর প্রতিমূর্তি অথবা তাঁহার বহু রূপের কোন-না-কোনটির প্রতিমা তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

"Even, however, without the analogy of those images from Western Asia there would be a strong supposition in favour of the examples from Mohenjo-Daro, Harappa and Baluchistan being effigies of the Great Mother-Goddess or one or other of her local manifestations."

এই অনুমানের কারণ স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষের সর্বত্র দেবী-উপাসনা প্রচলিত আছে।

"The worship of the Divine Mother deep-rooted and ubiquitous in India from time immemorial."

ইহার পর তিনি গ্রাম্য দেবীর পূজা, বিভিন্ন মূর্তিতে ও রূপে দেবীর পূজা, অনার্য জাতিদিগের মধ্যে কুলদেবী রূপে জম্মী-দেবতার পূজা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন।

এখন সংক্ষেপে জম্মীতিগুলির বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন।

মার্শাল সিদ্ধ উপত্যকা ও বেলুচিস্থানের জম্মীতিগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর মূর্তিগুলি দণ্ডায়মান, প্রায় নয় জম্মীতি। কটিতে অপ্রশস্ত কটিবন্ধ, গলবন্ধের মত দেখিতে গলায় অলঙ্কার (কলার), লম্বা নেকলেস, কানে ঝুলানো বাটির মত দেখিতে গহনা। শিরাবরণ কতকটা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, কোন কোন মূর্তিতে শিরাবরণের দুই প্রান্ত স্থচালো হইয়া পরস্পরের সহিত মিলিয়াছে। এই শ্রেণীর মূর্তি প্রধানতঃ মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় পাওয়া গিয়াছে। সিদ্ধ উপত্যকার মূর্তিগুলি হইতে বেলুচিস্থানের মূর্তিগুলির বড় পার্থক্য এই যে এগুলি সম্পূর্ণাবয়ব মূর্তি নহে, মস্তক ও দেহের উপরের অংশমাত্র রহিয়াছে। মার্শালের ভাষায় they end in flat base। তারপর বেলুচিস্থানের এই মূর্তিগুলির মধ্যে দুইটি শ্রেণী দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর মূর্তিগুলির মুখ পাখীর মুখের মত স্থচালো (pinched in like a bird's), গলায় লম্বা ও জমকালো নেকলেস, নেকলেসের সঙ্গে পেনডেন্ট আছে। দুই হাত কোমরের অথবা বুকের উপর অথবা নিতম্বের উপর রক্ষিত। এই ধরণের মূর্তিগুলি কুলী ও মেহীতে পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মূর্তিগুলির মস্তকে চূড়াকৃতি শিরাবরণ, গলায় নেকলেস বা বহনরী হার। মুখ চোপা, বিকৃত, ভীষণাকৃতি, কপাল উচ্চ, চোখ কোটরাগত (face flat, horribly grotesque, with high forehead,

cavernous eyes and distorted mouth)। এই কদাকার মূর্তিগুলি চোঁদানী, মুঘলযুগাই ও পেরিয়ানো যুগাই হইতে পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি ব্যতীত পশ্চিম সিদ্ধুর চান্‌হদারো ও লাখিওতে ননীগোপাল মজুমদার কতকগুলি ভাঙা স্ত্রী-মূর্তি পাইয়াছেন। উহাদের মস্তকে জমকালো শিরাবরণ, কান বাটির মত।

সিদ্ধ উপত্যকা ও বেলুচিস্থানের কয়েকটি স্ত্রীমূর্তি একটু পৃথক্‌ শ্রেণীর। গুটি তিন-চার মূর্তি গভিণী স্ত্রীর প্রতি-মূর্তি। কয়েকটি মূর্তি হাতে কোন একটি জিনিস বহন করিতেছে, কাহারও মতে কলস, কাহারও মতে শিশু।

এই সকল স্ত্রীমূর্তির বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। সিদ্ধ উপত্যকার মূর্তিগুলি সাধারণতঃ দণ্ডায়মান ও সামান্য একটু কটি আচ্ছাদন ব্যতীত নয়। বেলুচিস্থানের মূর্তিগুলি নীচে চেন্টা, সহজে বসাইয়া রাখা চলে। বেলুচিস্থানের এক শ্রেণীর মূর্তির মুখ পাখীর মত, মানুষের মত নহে। অগ্র শ্রেণীর মুখও মানুষের মত নহে, অতি বিকৃত ও ভয়াল। কতকগুলি মূর্তির হাত কোমরে বা দুই স্তনের উপর আবদ্ধ। কতকগুলির নাক ও স্তন অস্বাভাবিক বড় (“With a high and exaggeratedly large nose and female breasts.”—A Stein)। অনেকের চোখের জারগায় দুইটি গুটি (pellets)।

সকল স্ত্রীমূর্তির অলঙ্কারের জাঁকজমক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বুকে, গলায়, কানে, হাতে, বাহুতে, চিবুকে প্রচুর অলঙ্কার। অনেকেরই বহনরী হার গলায়, কানে কুমকোর মত গহনা। শিরাবরণের বৈচিত্র্যের যেন সীমা নাই। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, পাগড়ীর মত, বুড়ির মত, উলটানো কলসের মত, ব্যাঙের ছাতার মত, চুড়ার মত, কোদালীর মত নানা রকমের শিরাবরণ (head-dress)।

সিদ্ধ উপত্যকা ও বেলুচিস্থানের স্ত্রীমূর্তিগুলির এই সকল বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পুরাতাত্ত্বিকগণ কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখা যাউক।

বেলুচিস্থানের স্ত্রীমূর্তিগুলির চেন্টা নিম্নাংশ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে এই মূর্তিগুলি সম্ভবতঃ কোন আধারের উপর বসাইয়া রাখা হইত। তারপর বলা হইতেছে যে মূর্তিগুলি কটি পর্যন্ত হইবার তাৎপর্য ধরিয়া দেবী ভূগর্ভ হইতে অর্ধেক বাহিরে আসিয়াছেন। বৌদ্ধ ও গ্রীক ভাস্কর্যের এই ধরণের মূর্তিগুলির সঙ্গে বেলুচিস্থানের এই মূর্তিগুলির তুলনা করা হইয়াছে। সর অরেল ষ্টাইনের মতে they represent a female divinity of fertility, প্রকৃতির উৎপাদিকা শক্তির প্রতীক। বেলুচিস্থানের দ্বিতীয় শ্রেণীর বিকৃত, বীভৎস মুখের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে মার্শাল বলেন যে,

পরিস্কার বুঝা যায় ভয়ের উদ্বেক করিবার জন্য এই ধরণের মূর্তি কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার মত এই যে কালী মূর্তির কল্পনার উৎপত্তি এই মূর্তিগুলি হইতে, prototype of the images of Kali। বেলুচিস্থানের প্রথম শ্রেণীর পক্ষী-চঞ্চুর মত মুখের মূর্তি সম্বন্ধে সার অরেল ষ্টাইনের মত,—

“The archaic treatment and the beaklike nose suggests that the representation of some tutelary deity may be intended.”

ইহার অর্থ, মূর্তিগুলির নির্মাণে ভাস্কর্য-শিল্পজ্ঞানের একান্ত অভাব ও পক্ষীচঞ্চুর মত নাসিকা হইতে প্রমাণ হয় যে এইগুলি গৃহদেবী বা কুলদেবীর প্রতিমা। কিন্তু নাসিকার বিকৃতিকে দেবীত্বের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে অপণ্ডিত লোকের আপত্তি হইতে পারে। হরান্নাতে এই প্রকারের দুইটি ভাঙা মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। গভিণীর অবস্থা যে মূর্তিগুলিতে দেখা যায় সেগুলির কোন magical potency ছিল এইরূপ বলা হইয়াছে। সম্ভান লাভের জন্য এই মূর্তিগুলির পূজা বা অন্যপ্রকারে ব্যবহার হইত। যেগুলি কিছু বহন করিতেছে মনে হয় সেগুলি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ঐগুলি দেবীর মাতৃরূপের প্রতিমূর্তি। বাহিত বস্তকে কেহ শিশু কেহ কলস বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ননীগোপাল মজুমদার পশ্চিম বেলুচিস্থানে যে কয়েকটি ভাঙা স্ত্রীমূর্তি উদ্ধার করিয়াছেন তাঁহার মতে সেগুলি representatives of mother-goddess। সর অরেল ষ্টাইনের মতে দুই শ্রেণীর বীভৎস মূর্তিগুলির কোনটি গৃহদেবী বা কুলদেবী, কোনটি Goddess of fertility বা উৎপাদিকা শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সর জন মার্শালের সহকর্মী এম-এস-ভাট, কে-এন-দীক্ষিত, দয়ারাম সাহনী, সকলের মতেই সিদ্ধ উপত্যকা ও বেলুচিস্থানের স্ত্রীমূর্তিগুলি দেবী মূর্তি। ডাঃ ম্যাকেও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে স্বভাবতঃ সন্দোহ বোধ হয়। কিন্তু স্ত্রীমূর্তি হইলেই তাহা দেবীমূর্তি, পশুমূর্তি হইলেই তাহা উপাস্ত, লম্বা প্রস্তর খণ্ড বা পোড়ামাটির ঢেলা হইলেই তাহা লিঙ্গ, সংক্ষেপে বৈশিষ্ট্যযুক্ত বা বৈশিষ্ট্যহীন যাহা কিছু ভারতবর্ষের প্রাচীন স্তূপগুলি হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশের একটা ধর্মার্থবোধক ব্যাখ্যা কেন দেওয়া হইতেছে তাহা জানিবার কোঁতুহল দমন করা কঠিন। আবিষ্কারের প্রথম উত্তেজনার মুখে যাহা বলা হইয়াছে তাহার প্রকৃত মূল্য যাচাই করিবার সময় হইয়াছে। সিদ্ধ উপত্যকায় এমন অনেক জিনিস পাওয়া

গিয়াছে যাহার ধর্মসম্পর্কিত তাৎপর্য অবিসম্বাদী। এই তাৎপর্য স্পষ্ট, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যার সাহায্য ব্যতিরেকে ইহা স্পষ্ট।

প্রথমে প্রশ্ন উঠে, এই সকল স্ত্রীমূর্তির যে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় যাহা ধর্মার্থবোধক? মূর্তিগুলির গড়নে শিল্পজ্ঞানের অভাব বা আদিমতা (archaic treatment) এবং পক্ষী-চঞ্চুর মত মুখ কি ধর্মার্থবোধক? অলঙ্কারের বাহুল্য, শিরাবরণের বৈচিত্র্য, মূর্তিগুলি বসাইয়া রাখিবার জন্য কটির নীচে চেপ্টা গড়ন, এগুলি কি ধর্মার্থবোধক? মার্শাল যাহাকে symbol of sanctity বা symbol of divinity অর্থাৎ দেবত্বের চিহ্ন বলেন এই স্ত্রীমূর্তিগুলির কোথায় তাহা পাওয়া যাইতেছে? স্ত্রীমূর্তি বলিয়াই কি এগুলিকে দেবীমূর্তি, দেবীর বিভিন্ন রূপের প্রতীকমূর্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে?

মার্শাল অবশ্য তাহা বলেন নাই। তিনি বলেন মেশোপটেমিয়া, সিরিয়া, মিশর, দ্বিজিয়ান অঞ্চল, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশে এইরূপ স্ত্রীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে এবং সেগুলি দেবীমূর্তি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সেগুলি যখন দেবীমূর্তি সিদ্ধ উপত্যকা ও বেলুচিস্থানের স্ত্রীমূর্তি-গুলিও দেবীমূর্তি।

মার্শালের এই evidence of parallel finds-এর যুক্তির ভিত্তি কিরূপ পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

মেশোপটেমিয়া, মিশর, সিরিয়া, আনাতোলিয়া ও দ্বিজিয়ান অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাচীনযুগের দেবী মূর্তিগুলির সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে। এই সকল দেশে প্রাচীন যুগের mother-goddess বা স্ত্রী-দেবতার উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনার স্থান এখানে নাই, শুধু দেবীমূর্তি বা representations of the mother-goddess in art সম্বন্ধে বলা হইবে। যাহাকে অল্পরূপ মূর্তি বলা হইয়াছে তাহা বাস্তবিক কতটা অল্পরূপ তাহা জানা প্রয়োজন।

মেশোপটেমিয়া: এলাম, এরেক, এরিছু, উর-নিনা, নিগ্গর, আগাদে, কিশ, আদাব প্রভৃতি নগর দেবীপূজার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বৃহৎ মন্দিরে দেবীপ্রতিমা পূজিত হইত। এই সকল মন্দিরের ধনসম্পত্তি ছিল প্রচুর। বিভিন্ন নগরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্তি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন। এরেকের মন্দিরে ইস্তার দেবীর নাম ছিল ইম্মা বা নিম্মি, লাগাস ও নিনেভের মন্দিরে তাঁহার নাম ছিল নিনা, আগাদে তাঁহার নাম ছিল আন্নিত, নিগ্গরে তাঁহার নাম ছিল নিনটিলা ইত্যাদি। দেবীকে ক্ষুদ্র জীব জন্তু ও মাতৃশব্দের মূর্তি, সীল, দণ্ড প্রভৃতি উৎসর্গ করা হইত। এই-

গুলিতে ভক্তের নাম, যাহার মদল কামনায় উৎসর্গ করা হইত তাহার নাম খোদিত হইত। ইস্তার বা ইম্মিনি-ইস্তার (Innini-Ishtar) স্ত্রীমো-বাবিলোনীয় ধর্মে প্রধান দেবী, the Great-Mother রূপে পূজিত হইতেন। রণদেবী রূপে বাবিলোনীয় শিল্পে ইস্তার আয়ুধধারিণী, সিংহ বা ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান। প্রাচীন বাবিলোনীয় শিল্পে তিনি উপবিষ্টা, হস্তে গদা বা তরবারি। আসিরীয় শিল্পে তিনি দণ্ডায়মান, হস্তে তীর ও ধনুক। কিশে প্রাপ্ত একটি পোড়া মাটির প্লাকে ইস্তারের শিরাবরণ শৃঙ্গ, দক্ষিণ হস্তে একটি ধাতুর লম্বা দণ্ড; বাম হস্তে একটি ক্ষুদ্র দণ্ড, উহার মাথায় দুইটি সাপের মুখ। রণদেবীরূপে তাঁহার বামপদ সিংহের পৃষ্ঠে রক্ষিত। বাওগুল শব্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। প্রাচীন সীলে তিনি উপবিষ্টা, হাতে শস্ত্রের গুচ্ছ। বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে ইস্তারের মুখে আচ্ছাদন (veil)। নিনা দেবী সিংহাসনে উপবিষ্টা, সিংহাসনের নিম্নে মৎস্তের মূর্তি। নিনহারসাগের মন্তকাবরণ শৃঙ্গ। মাতৃরূপে ইস্তার উপবিষ্টা, ক্রোড়ে স্তন্যপানরত শিশু।

মিশর: মিশরে ক্যানানাইটদিগের দেবী আশ্টার্ট (Ashtart) পূজিত হইতেন। রণদেবীরূপে তিনি সিংহের উপর দণ্ডায়মান। উনবিংশ রাজবংশের আমলে আশ্টার্ট মূর্তি সিংহের উপর দণ্ডায়মান, দেহ নগ্ন বা আঁট পরিচ্ছদে আবৃত, এক হাতে পদ, অপর হাতে সর্প। সিরিয়ার দেবী অনাথ (Anath) মিশরে পূজিত হইতেন। তিনি সিংহাসনে উপবিষ্টা, দক্ষিণ হস্তে বর্শা ও ঢাল, বাম হস্তে পরশু (battle-axe)। কোন কোন মূর্তি ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা, হস্তে পাপিরাস। আইসিস দেবীর হস্তে মশাল, গমের গুচ্ছ, পপি ফুল, সর্প ইত্যাদি। কোন কোন আইসিস মূর্তির বক্ষে শিশু হোরস (Horos) সংলগ্ন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শিশু হোরস ক্রোড়ে আইসিস মূর্তি হইতে গ্রীষ্ম ধর্মের শিশু যিসাস ক্রোড়ে মেরী মূর্তির কল্পনা আসিয়াছে বলা হয় ("Isis with little Horos on her bosom became the model for Madonna col bambino")। সাক্ষ্য গ্রন্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা। প্রাচীন মিশরীয় ধর্মে স্ত্রী ও পুরুষ প্রতীকমূর্তির মন্তকে শৃঙ্গ দেবত্বের চিহ্ন। হাথোর দেবীর মন্তকে গাভীশৃঙ্গ। আইসিসকে গ্রীকগণ ডেমিটার, হেরা ও পারসিকোনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। আইসিসের শিরাবরণে শকুনির প্রতীকমূর্তি। শকুনি মাতৃশব্দের প্রতীক। আইসিসের কোন কোন প্রতীকমূর্তিতে নারীদেহের উপর গাভীর মন্তক। কখন

আবার খ্রী হিপোপটেমাস তাঁহার প্রতীক। নেপথিসের শিরাবরণে শকুনির মূর্তি ও শৃঙ্গ। পপট দেবীর প্রতিমূর্তি ছিল নারীদেহের উপর বিড়ালের মন্তক। স্ব দেবী ও সেচেত দেবীর প্রতিমূর্তি ছিল সিংহী, অগ্নিশিখা উদ্গীরণ করিতেছে। নীথ দেবীর প্রতিমূর্তি ছিল শায়িত গাভী (Cow recumbent or couchant)।

প্রাচীন মিশরীয় ধর্মের মন্দির, দেব ও দেবীমূর্তি এবং ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস প্রচুর রহিয়াছে। প্রাচীন মিশরীয় ধর্মের সঙ্গে মেশোপটেমিয়া, ইথিওপিয়া, সিরিয়া, ফিনিশিয়া, প্যালেষ্টাইন, সাইপ্রাস, ঈজিয়ান অঞ্চল ও গ্রীসের প্রাচীন ধর্মের যোগাযোগ ছিল। এই সকল কারণে মিশরীয় ধর্মের কোন অংশ অপরিচিত নাই। এখানে মিশরীয় ধর্মে খ্রী-দেবতার উপাসনা বা এই উপাসনা সম্বন্ধে মেশোপটেমিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের সহিত সংযোগের বিষয়ে অধিক আলোচনার স্থান নাই। শুধু ভারতবর্ষের সহিত সংযোগের সম্পর্কে বাহা বলা হইয়াছে তাহার সামান্য উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মিশরীয় দেবতা হোরসের উল্লেখ করা হইয়াছে। হোরস সাধারণতঃ ওসিরিস ও আইসিসের পুত্ররূপে কল্পিত। কিশোর দেবতারূপে তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকটি কিশোর দেবতাকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে অহি ও সামতোতি নামে দুই কিশোর দেবতা হোরসচক্রে স্থান পাইয়াছে। পদ্ম ইহাদের প্রতীক। বলা হইয়াছে খ্রীষ্ট জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে এই কিশোর দেবচক্রের উপাসনা ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছিল (Dr. Tiele)। মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের সম্রাট চতুর্থ আমেনোফিস তাঁহার মাতার (Queen Tai) প্রেরণায় একটি নূতন ধর্মমতের প্রচলন করেন এবং মিশরের প্রাচীন জাতীয় ধর্ম লোপ করিয়া দেন। এই নূতন ধর্ম সূর্যচক্ররূপী (Solar disc) আতেনের উপাসনা। এই সূর্য দেবতার জন্য তেল-এল-আমারনাতে তিনি একটি বিরাট সূর্যমন্দির নির্মাণ করেন। তেল-এল-আমারনা প্রসিদ্ধ হইয়াছে প্রাচীন মিশর এবং মিটানী, হিটাইট প্রভৃতি জাতির সম্পর্কের উপর আলোকপাত করিয়াছে এরূপ কতকগুলি দলিল (clay tablets) আবিষ্কারের স্থান বলিয়া। চতুর্থ আমেনোফিসের পিতা ছিলেন বিদেশী। তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে প্রতিমূর্তি দেখিয়া মনে হয় তিনি ইথিওপীয়ান, সেমাইট বা লিবিয়ান ছিলেন না। “For the race and religion we must probably look beyond the horizon of the Egyptian conquests.” মিশরীয় সাম্রাজ্য এই সময় মেশোপটেমিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত

ছিল (খ্রীষ্টপূর্ব ১৬শ শতাব্দী)। তারপর বলা হইয়াছে, “The type is not without an Indian aspect”।

সিরিয়া : সিরিয়ার অনাথ দেবী যে মূর্তিতে মিশরে পূজিত হইতেন তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। অনাথ ও আসর্টাটের একসঙ্গে উল্লেখ পাওয়া যায়। সিরিয়ার কাদেশ দেবী মিশরের হাথোর দেবীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। তিনি সিংহের উপর দণ্ডায়মান, বাম হস্তে বহু মন্তকবিশিষ্ট সর্প, মন্তকে কেশের উপর চক্র ও তাহার দুই দিকে দুই শৃঙ্গ। আতরগাতিশ দেবী নানারূপে পূজিত হইতেন। আসকালনে তিনি মংগ্রকাক্ষারূপে পূজিত হইতেন। পেট্রীয় তাঁহার প্রতীক ছিল প্রস্তরখণ্ড। উহার উপর মাছুষ ও পশুবলি হইত। হিয়েরাপোলিসে তিনি সিংহবাহিনী নারীমূর্তি।

ঈজিয়ান অঞ্চল : এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে গ্রীকদিগের ধর্মের দুইটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। একটি স্তরে খ্রীদেবতা বা দেবী-উপাসনা প্রবল। এই উপাসনা দক্ষিণের ঈজিয়ান অঞ্চল ও আনাতোলিয়া হইতে আসিয়াছিল। অন্য স্তরে পুরুষ-দেবতার উপাসনা প্রবল। ইহা আসিয়াছিল উত্তর হইতে। আরও বলা হইয়াছে যে ব্রোঞ্জ-যুগে ঈজিয়ান অঞ্চলে মূর্তি পূজার প্রচলন হয় নাই।

“The evidence is overwhelming that Bronze Age ritual was aniconic, i.e., the deity was represented in cult by a sacred tree or a pillar or a double axe.”

ঈজিয়ান ধর্মের উপর মিশরের প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে। ঈজিয়ান ধর্মে শুধু দেবীমূর্তি সম্বন্ধে এখানে বলা হইতেছে। প্রধানতঃ সীলে এই সকল মূর্তি দেখা যায়। একটিতে দেবী পর্বতশৃঙ্গে দণ্ডায়মান, দুই পার্শ্বে দুইটি সিংহ। একটিতে দেবী সিংহের পিঠে হাত রাখিয়াছেন। একটিতে দেবীর হাতে বর্শা, একটি সিংহ তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। একটিতে দেবীর ঝঞ্জে পরশু (sacred bipennis)। ইহা ব্যতীত দেবীর দেহ সর্পে জড়াইয়া আছে ক্রীটে এরূপ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। একটি খ্রীমূর্তির কটিবন্ধে তিনটি সাপ জড়াইয়া আছে, আর একটি সাপ মন্তকের পশ্চাৎ হইতে ফণা তুলিয়া আছে। প্যালেইকাষ্টের মন্দিরে একটি খ্রীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার বাহুতে জড়াইয়া আছে তিনটি সাপ, উপাসকগণ নৃত্য করিতেছে এবং নিকটে কয়েকটি স্তম্ভের উপর ঘুঘু বসিয়া আছে। সাপ, ঘুঘু, সিংহ-সিংহী, বাঁড়, গাভী, ছাগল, মাছ—এইগুলিকে অনেক দেবীমূর্তির সঙ্গে যুক্ত দেখা যায়। ফিনিশিয়া, সাইপ্রাস এবং ঈজিয়ান দ্বীপগুলির বহুস্থানে নগ্ন খ্রীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের হাতে ঘুঘু। এইরূপ অনুমান

করা হয় যে প্রতিমা-উপাসনার পূর্বে ঈজিয়ান অঞ্চলে প্রস্তর খণ্ড (baetyls) দেবীর বিগ্রহ রূপে পূজিত হইত।

প্যালেস্টাইনের ক্যানানাইটদিগের মধ্যে প্রস্তরখণ্ড দেবীর বিগ্রহরূপে পূজিত হইত। এই প্রস্তরখণ্ডকে “মাসে-বোথ” বলা হইত।

“In Canaanite temples masseboth (standing stones) rather than images seems to have embodied the mother-goddess.”

মন্দিরে কতকগুলি লম্বা কাষ্ঠখণ্ড দিয়া এই প্রস্তরখণ্ডকে বেষ্টিত করিয়া রাখা হইত। এই কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে আসেরিম (asherim বা totem poles) বলা হইত। এই কাষ্ঠ-গুলি পরে আস্টার্ট দেবীর বিগ্রহ রূপে পূজিত হইত। এই আসেরা (sacred pole or tree trunk) হইতে হিব্রু দেবী আসেরার নাম আসিয়াছে। কেহ কেহ বলেন আস্টার্ট নামের উৎপত্তি আসেরা হইতে। প্যালেস্টাইনে আস্টার্টের মূর্তির কথা পরে বলা হইতেছে।

এশিয়া মাইনর : অনুমান করা হয় খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দে ফ্রিজিয়ানগণ আনাতোলিয়ার কয়েকটি অংশ দখল করিয়াছিল। আনাতোলিয়া দখল করিয়া তাহারা বিজেতাদিগের ধর্ম গ্রহণ করে। এই আনাতোলিয়ার ধর্মের যে সকল লক্ষণ দেখা যায় ঈজিয়ান অঞ্চলে এবং কৃষ্ণ-সাগরের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচলিত ধর্মসমূহের প্রধান লক্ষণগুলি সেইরূপ। আনাতোলিয়ার ধর্মের কথা যখন বলা হয় তখন সাধারণতঃ ফ্রিজিয়ানদিগের অল্পাধিক ধর্মের কথাই বলা হয়। গলিশিয়ার পেসিন্স নগরে ফ্রিজিয়ানদিগের মহাদেবী (Magna Mater) কিবেলের (Cybele) প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল। দেবীর মূর্তি ছিল না, Meteroic প্রস্তরখণ্ড দেবীর বিগ্রহরূপে পূজিত হইত। রোম ফ্রিজিয়া জয় করিলে এই প্রস্তরখণ্ড রোমে নীত হইয়া পালাটিনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফ্রিজিয়ার মহাদেবীর উপাসনা রোমকদিগের মধ্যে প্রচারিত হয়। রোমকগণ কিবেলকে সিরিস, ওপস এবং মাইয়া হইতে অভিন্ন মনে করিত। কিবেলের যে মূর্তি পরবর্তী কালে পূজিত হইত তাহা সিংহাসনে উপবিষ্ট দেবীমূর্তি, পার্শ্বে একাধিক সিংহ।

ফ্রিজিয়ানদিগের অভ্যুদয়ের পূর্বে আনাতোলিয়ার হালিস নদীর উপত্যকায় হিটাইটদিগের বাস ছিল। কার্পাডোসিয়ায় হিটাইটদিগের পূজিত মহাদেবীর নাম মা (Ma বা Mah) ছিল অনুমান করা হয়। বাবিলোনের ইস্তারের একটি নাম ছিল নিন-মা (Nin-Mah) এবং বাবিলোনে এই নামে দেবীর পূজার জন্য এ-মা (E-Mah) নামে পৃথক মন্দির ছিল। পণ্টাস ও কার্পাডোসিয়ায় ইরাণীয় মহাদেবী আনাতোলের উপাসনা প্রচলিত হইলে তিনি এই

প্রাচীন মা দেবীর সঙ্গে মিলিত হইয়া যান। বোগাজ্জ কিউতে দেবদেবীর শোভাযাত্রার খোদিত চিত্রে দেখা যায় ইনি একটি সিংহী বা ব্যাঘ্রের উপর দণ্ডায়মান, হাতে দণ্ড ও পরশু। বোগাজ্জ কিউইর প্রাচীন দুর্গের একটি ফটকে অস্ত্রপাণি দেবীর প্রতিমূর্তি খোদিত দেখা যায়। এই মহাদেবী ব্যতীত বাবিলোনের ইস্তার সারিস নামে আনাতোলিয়ায় ও আর্মেনিয়ায় পূজিত হইতেন। ইয়াসিলিকাইয়ার মন্দিরের প্রাচীর-চিত্রে আর একটি দেবীর উপাসনার প্রমাণ পাওয়া যায়। আরিমা ইহার উপাসনার প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র ছিল। এই দেবীর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে সম্ভবতঃ হিটাইটদিগের আবির্ভাবের পূর্ব হইতে এই দেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল। ইনি কি মূর্তিতে পূজিত হইতেন প্রকাশ নাই।

উপরে প্রাচীন ইরাণে পূজিত আনাতোলের প্রতিমূর্তি সম্বন্ধে বলা হয় নাই। আবিস্তার আনাতোলের বিস্তারিত উল্লেখ আছে। এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে আর্তাজারেক্স নেমন আনাতোলের মূর্তির উপাসনা প্রচলন করেন। বাবিলোন, হুসা, একবাতান, দামাস্কাস ও সাদিসে তিনি মন্দির নির্মাণ করাইয়া আনাতোলের প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। রণদেবীরূপে আনাতোলা চারিটি শ্বেত অশ্ববাহিত রথে আরুঢ়া ও শস্ত্রপাণি। আর্মেনিয়ার প্রেজে (Prez) আনাতোলের স্বর্ণপ্রতিমা পূজিত হইত।

মার্শাল মেশোপটেমিয়া, মিশর, সিরিয়া, ঈজিয়ান অঞ্চল ও এশিয়া মাইনরে, সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচিস্থানে প্রাপ্ত স্ত্রীমূর্তির অনুরূপ দেবীমূর্তি (parallel finds) পাওয়া যাইবার কথা বলিয়াছেন। এই বিস্তৃত অঞ্চলে স্ত্রী-দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল। এশিয়াখণ্ড হইতে এই উপাসনা গ্রীস ও রোমে প্রচারিত হইয়াছিল। স্ত্রী-দেবতার উপাসনার বিভিন্ন অঙ্গ—মন্দির, পুরোহিত, পূজা-পদ্ধতি, আচার, অল্পাধিক, দেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত পশু, পাখী, মংস্ত্র, সর্প প্রভৃতি, দেবীর সজ্জা, অস্ত্রশস্ত্র, বাহন, বিশিষ্ট দেবীগণের উপাসনার বিবর্তন, প্রচার, তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ যে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার কোন উল্লেখ না করিয়া কেবল বিভিন্ন অঞ্চলে পূজিত দেবী কিভাবে শিল্পে রূপায়িত হইয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। এই বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে মেশোপটেমিয়া, মিশর, সিরিয়া, ঈজিয়ান অঞ্চল ও এশিয়া মাইনরে parallel finds-এর প্রমাণ ভিত্তিশূন্য। খ্রীষ্ট জন্মের অনুমান তিন হাজার বৎসর পূর্বে আকাদীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী আগাদের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আলুহিত দেবীর মূর্তি হইতে খ্রীষ্ট জন্মের



পরে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নানা স্থানে পূজিত দেবী-মূর্তির তুলনা করিয়া সিদ্ধ উপত্যকা ও বেলুচিস্থানের খ্রীমূর্তিগুলিকে দেবীমূর্তি বলিয়া মানিয়া লওয়া একেবারে অসম্ভব। সিদ্ধ সভ্যতার সহিত প্রাচীন পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার সংযোগ প্রমাণ করিবার আগ্রহে মার্শাল প্রমুখ পণ্ডিতগণ যে সকল সাক্ষ্যপ্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন সেই সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করিবার পরে অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্যালেস্টাইনের ক্যানান এবং গ্রীসের থেসালীতে কয়েকটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে যাহার সঙ্গে বেলুচিস্থানের পক্ষীচক্ষুর মত মুখের মূর্তিগুলির কিছু সাদৃশ্য আছে। ক্যানানে দেবীর প্রতীক রূপে “ম্যাসেবোথ” প্রস্তরের এবং আসেরিস দণ্ডের উপাসনার কথা উপরে বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া পরবর্তী কালে পূজিত আসটার্ট দেবীর মূর্তিও দেখা যায়। এই সকল মূর্তিতে মিশর এবং বাবিলোনের প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে। এক শ্রেণীর মূর্তির হাতে সাপ জড়াইয়া আছে। আর এক শ্রেণীর মূর্তির মাথায় মিশরের হাথোর দেবীর মত শৃঙ্গ। তৃতীয় একটি শ্রেণীর মাথায় ঘোমটা। এইগুলি ছাড়া কয়েকটি খ্রীমূর্তির কানে প্রকাণ্ড মাকড়ি (ear-ring) এবং ইহাদের মুখ পক্ষীচক্ষুর মত। এই মূর্তিগুলির সঙ্গে থেসালীর কতকগুলি মূর্তির সাদৃশ্যের কথা বলা হইয়াছে। মাইসেনীয়ান যুগের অল্পরূপ মূর্তি (“terra cotta female figurines with bird-like features, crescent arms and columnar bodies”) সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে এগুলি দেবীমূর্তি নহে, এগুলি খেলিবার পুতুল বা দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ বস্তু (toys or votive offerings)। প্যালেস্টাইনের এই শ্রেণীর মূর্তি এবং বেলুচিস্থানের এই শ্রেণীর মূর্তি সম্বন্ধে অন্য প্রকার সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

বেলুচিস্থানের অত্র শ্রেণীর খ্রীমূর্তি এবং সিদ্ধ উপত্যকার খ্রীমূর্তিগুলির সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার পূর্বে একজন পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করা হইতেছেঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শনের ব্যাখ্যা করিবার সময়ে মনুষ্য মূর্তি মাত্রই দেব বা দেবীমূর্তি এরূপ সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক যতক্ষণ না এইরূপ মূর্তির সঙ্গে অলৌকিক কোন লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে, যেমন মূর্তি হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, উহার সঙ্গে বন্যপশু বা সর্পের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক সঙ্গী দেখা যায় অথবা মূর্তিকে পূজা করা বা অশ্রদ্ধা নিবেদন করা হইতেছে। (D. G. Hogarth.)

এই মান হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে দেবমূর্তি বলিয়া যাহা প্রমাণিত হয় সিদ্ধ উপত্যকায় এরূপ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। একটি নীলে খোদিত যে তিনটি মুখ বিশিষ্ট মূর্তিকে (M. I. C. Vol. I, Pl. XXI, 17) মার্শাল শিবের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন সেই মূর্তির অলৌকিক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তিনটি মুখ, সঙ্গী ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি বন্যপশু, যোগাসনে বসিবার ভঙ্গী, এইগুলি দেবত্বের লক্ষণ বলিয়া মনে করা যায়। এই প্রকারের অলৌকিক এবং দেবত্বের পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য আরও বহু মূর্তিতে দেখা যায়। সুতরাং এ অল্পমান সহজে করা যায় যে সিদ্ধ জাতি আপনাদিগের দেবদেবী মূর্তিকে দেবদেবী বলিয়া বুঝাইবার কৌশল উত্তমরূপে জানিত। সিদ্ধ উপত্যকার religious art বেশ উন্নত ছিল পরে দেখা যাইবে। মোহেঞ্জোদারোর বিরাট গৃহাবলী, সাধারণ স্নানাগার প্রভৃতি তাহাদের স্থাপত্যদক্ষতার প্রমাণ; তাহাদের religious art এ আদিমতার পরিচয়কে দেবত্বের লক্ষণ বলিয়া মনে করিবার কোন হেতু নাই।

শিল্পে আদিমতার পরিচয় পাওয়া যায় সিদ্ধ উপত্যকার ও বেলুচিস্থানের কয়েক শ্রেণীর খ্রীমূর্তিতে। এইগুলি সিদ্ধবাসীদিগের রিলিজিয়াস আর্টের দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে করা অযৌক্তিক। তারপর তাহাদের রিলিজিয়াস আর্টে দেবত্বের পরিচায়ক যে সকল লক্ষণ (symbols of divinity) সুপরিচিত এই সকল খ্রীমূর্তিতে সেই সকল লক্ষণের একান্ত অভাব।

প্রমাণের অবস্থা যখন এইরূপ তখন সর জন-মাশালের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং তাহার সহকর্মী ও অপরামর পণ্ডিতের সমর্থন সত্ত্বেও কোন মূর্তিতে এই সকল খ্রীমূর্তিকে দেবীমূর্তি এবং মহাদেবীর বিভিন্ন রূপের মূর্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে সময় ও উদ্যম ব্যয় করিলেও মাশালের নিজের মন সন্দেহমুক্ত ছিল না তাহার প্রমাণ এক স্থানে এই মূর্তিগুলির উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন যে সেগুলি “Votive offerings or less probably cult images for household shrines” (M. I. C. vol. I p. 51.) Votive offerings অর্থ কোন দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ বস্তু। কোন দেবতার উদ্দেশ্যে এই সকল খ্রীমূর্তি উৎসর্গ করা হইত তাহা জানিবার উপায় নাই। তাহা হইলেও রং করা পোড়া-মাটির মনুষ্য, পশু ও পক্ষী মূর্তি দেবস্থানে উৎসর্গ করিবার প্রথা এখনও এদেশে আছে, পূর্বেও ছিল। সুতরাং খ্রী-মূর্তিগুলি সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা একেবারে অযৌক্তিক নহে।

বস্ত্রার, পাটনা, মথুরা, কোশাবতী, ভিটা, তক্ষশীলা ও

অল্প এই প্রকারের পোড়ামাটির স্ত্রীমূর্তি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্তিগুলির মধ্যে যেগুলি primitive type (সর অরেল ঠাইনের archaic) মনে করা হয় সেগুলিকে প্রাচীন বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। Terra cotta সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করিয়াছেন এইরূপ একজন পণ্ডিত বলিতেছেন :

"The 'primitive types' are, however, as frequent at Mohenjo-Daro in the 3rd millennium B.C. as they are in the Ganges, etc., from the Sunga to the Gupta period . . . and their number is not less by today, made as they are by the potters and women in the villages of Bengal, Bihar, etc."

তারপর তিনি বলিতেছেন,

"Female figurines, for instance, with a solid cone for body and with a large circle to stand on (মার্শাল ও সর অরেল ঠাইনের "flat base"-এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) with pinched faces, pellets affixed for the eyes and no mouth marked can be found in the same household where Radha-Krishna figurines of banal prettiness. . . ." (J. I. S. O. A., June-December, 1939).

অর্থাৎ প্রিমিটিভ বা আরকেইক স্ত্রীমূর্তি খ্রীঃ পূর্ব ৩য়

সহস্রকে মোহেঞ্জোদারোতে যেমন দেখা যায় স্তম্ভ ও গুপ্ত আমলে গাঙ্গেয় উপত্যকায় সেইরূপ দেখা যায় এবং এইগুলির সংখ্যা বর্তমান কালেও অপ্রচুর নহে। এইগুলি বাংলা, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলের কুম্ভকার এবং জীলোকেরা তৈয়ারী করিয়া থাকে। ত্রিকোণ দণ্ডের মত (columnar bodies) এই সকল মূর্তির দেহ, নীচের দিকে বৃত্তাকার বাহাতে বসাইয়া রাখা যায়। মুখ সূঁচালো, ছোট চোখ বা গুটি দিয়া চোখ তৈয়ারী হইয়াছে, মুখের রেখা বুঝা যায় না। চটকদার রাধাকৃষ্ণের পোড়ামাটির মূর্তির সঙ্গে এই প্রকারের মূর্তি এক গৃহেই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সুতরাং সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচিস্থানের স্ত্রীমূর্তিগুলি votive offerings না হইয়া সাধারণ পুতুল হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। এইগুলি দেবীমূর্তি ত নহেই, ইহাদের ধর্মসম্পর্কিত কোন প্রকার তাৎপর্ষ আছে কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়।

সিন্ধু উপত্যকার মহাদেবী বা Magna Mater-এর উপাসনার যে প্রমাণ পণ্ডিতগণ দাঁড় করাইয়াছেন সেই প্রমাণের ভিত্তি এইরূপ।

## স্বপ্ন-ভঙ্গ

শ্রীগোপাললাল দে

স্বপ্নাবেশে ছিছ বিরামশয়নে ঘরের কোণে,  
কল্পনাবনে কুসুম ফুটায় আপন মনে, সন্ধ্যাপনে।  
কত যুগ পরে এল স্বাধীনতা স্বপ্নাকারে,  
মোদের জীবনে মোদের নয়নে ছেরিছ তারে,  
রূপখানি আঁকি সব অম্লভূতি মনন সনে,  
লভিতে ছিলাম তারই স্বাদটুকু সন্ধ্যাপনে, পরাণপণে।

হেনকালে এ কি? কে ডাকে কোথায়? লক্ষ করে,  
নরনারী কঁাদে, 'অন্ন কোথায়?' 'মোদের কে রে, বজ্র করে?'  
পুষ্ট অভাবে রোগশ্রিয়মাণ শরীর ক্ষীণ,  
অক্রেম হ'ল যাঁহা প্রয়োজন, লজ্জাদীন,  
অন্নবসন নিরাময় চায় লক্ষ করে,  
ঘুম টুটে যায়, স্বপন মিলায় আঁখির পরে, হতাশ করে।

আবার কে ডাকে? পূর্ববদ? পঞ্চনদী?  
গৃহবিভাঙিত, হত লুপ্তিত, বাঁচিল যদি, রক্তনদী  
পার হয়ে এল, ভগিনী হারান্নে, কতাহারা,  
দস্যু করেছে স্বধর্ম্মিণী, পাগলপারা।

ওরা কঁাদে বলে, 'গৃহধন যাক দস্যু, রোষি'  
জননী ভগিনী কতাহা ফিরাও অন্নর বধি', স্বাধীন যদি।

কান্দীর ডাকে, অত্যাচারিত হায়দরাবাদ,  
ভয়াল গীড়নে সে দেশ শ্মশানে আর্তনাদ, মানে না বাঁধ।  
সহস্র সীতা বন্দিনী কঁাদে রাবণ-ঘরে,  
'কোথা ভগবান, কেবা আমাদের রক্ষা করে?'  
নিফল ক্রোধে শূণ্য তাকাই, রণোন্মাদ,  
বক্ষে আছাড়ে, কান্দীর ছাড়ে মরণ-নাদ, হায়দরাবাদ।

হায় স্বাধীনতা, তোমার বেদীতে দিলাম আনি',  
অন্ধ ছেদিয়া দাতক অস্ত্রে, লক্ষ প্রাণী, ক্ষয় না মানি'।  
আত্মার সার গান্ধী-স্বভাষে,  
নির্ম্মম ঘাতে নিলে অনায়াসে,  
এই বার তব দক্ষিণ মুখে মাঠে: বাণী,  
অগ্নে সন্তোষে, স্তব্ধে সম্পদে, ঐক্য দানি', জাগাও রাণী।

## প্রবাহ

### ত্রিবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ওদের ছুটিতে অত্যন্ত সন্তোষ। স্বাময় এবং মঞ্জুধা। স্বাময়ের বয়স নয়, মঞ্জুধার ছয়।

স্বাময়ের পিতা প্রভুল ভট্টাচার্য্য গবর্ণমেন্ট আপিসের অবসরপ্রাপ্ত কেরাণী। শ-খানেক করিয়া পেন্সন পাইতেছেন। সম্প্রতি দেশে আসিয়াছেন। স্বাময় তাঁর সর্বকনিষ্ঠ।

মঞ্জুধার পিতা জীবানন্দ বন্দোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের মন্ত জমিদার। পদ্মার প্রচণ্ড ভাঙনে তাঁর বহু ক্ষতি হইলেও যাহা আছে তাহা প্রচুর। লোক হিসাবে তিনি ভালই, তবে একটু খেলালী—এই যা তাঁর তিন পুরুষ জমিদার। যদিচ জীবানন্দ একটু একালখোঁষা তথাপি বাপপিতামহের আমলের চালচলন অনেক কিছুই বজায় রাখিয়াছেন। অনাবশ্যক গৌড়ামি কোথাও নাই; না কথার না কাজের। পুত্রকে তিনি বিলাত পাঠাইয়াছেন উচ্চশিক্ষার জন্ত। মেয়েদের লেখাপড়ার প্রতিও তাঁর সজাগ দৃষ্টি। ছুটি মেয়েকে রীতিমত শিক্ষিতা করিয়া তিনি বিবাহ দিয়াছেন। কনিষ্ঠা মঞ্জুধাকেও তিনি এখন হইতেই উৎসাহ দিতেছেন।

প্রভুল এবং জীবানন্দের মধ্যে এক সময় প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। একই গ্রামে পাশাপাশি তাঁদের বাড়ী। একের সামান্য টিনের দোচালা, অপরের প্রকাণ্ড তিন মহল বাড়ী। একের টাকার অঙ্ক গুনিয়া শেষ করা যায় না, অপরে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করেন। অথচ উভয়ে উভয়ের বন্ধু। পরিহাস নয়—সত্য। দীর্ঘ আট বৎসর একসঙ্গে একই স্থলে থাকিয়া প্রবেশিকাধার অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁদের এই আট বছরের অনেক ইতিহাসই জমা হইয়া আছে, কিন্তু অতীত দিনের সে সব পুরাতন কথা লইয়া আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই।

পরীক্ষান্তে জীবানন্দের পিতা তাঁহাকে জমিদারীতে টানিয়া লইলেন। প্রভুল বাহির হইয়া পড়িলেন অন্নচিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশায়। এই সময় হইতেই উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি। কিন্তু মন হইতে কেহ কাহাকেও মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই।

ইহারই মাসকয়েক পরে জীবানন্দকে বিবাহ করিতে হইল। কিন্তু তাঁর পুনঃ পুনঃ ভাগিদে দেওয়া সত্ত্বেও প্রভুল তাঁর নূতন কর্মস্থল হইতে এক পা নড়িতে পারিলেন না। পক্ষে জানাইলেন, তোমার বিবাহে আমার উপস্থিত থাকা উচিত এ কথা আমি বুঝি, কিন্তু পরের চাকরী করিয়া যাদের দিন চালাইতে হয় তাদের ছুঃখ তোমরা বুঝিবে না।

উত্তরে জীবানন্দ জানাইয়াছিলেন, অমন চাকরী তোমার না করিলেও চলিবে। কিন্তু পক্ষকে তোমার জানাইয়া দেওয়া উচিত যে, চাকরী করিতে গিয়াছ বলিয়াই মাথা বিক্রয় করে নাই।

প্রত্যুত্তরে প্রভুল পুনরায় লিখিলেন, কথাটা তোমার মত করিয়া বলিতে পারিলে আমি গর্ববোধ করিতাম, কিন্তু অন্ন-চিন্তার পাপ আমাদের সকল দিক দিয়া পঙ্কু করিয়া রাখিয়াছে। আমার বর্তমান অবস্থা ত তোমার অগোচর নয়।

উত্তরে জীবানন্দ একটু গরম হইয়া লিখিলেন, জমিদার বলিয়া আমার অবিস্থান করিতে পার, কিন্তু বন্ধুত্বের অপমান করিও না। মাসিক এক শত টাকার ব্যবস্থা আমিও তোমার জন্ত করিতে পারিব।

ইহার উত্তরে প্রভুল অত্যন্ত নরম হুরে লিখিলেন, আমিও তোমার কথা সমর্থন করি এবং বলি যে, আমাদের বন্ধুত্বের মাঝে অর্থের সম্বন্ধ টানিয়া আনিও না। ছুটির জন্য আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু ব্যর্থ। অথবা তুমি আমার উপর রাগ করিও না—এ আমার অনুরোধ।

জীবানন্দ নীরব রহিলেন।

বন্ধুর বিবাহে প্রভুল তাঁহার সাধ্যমত উপহার পাঠাইয়াই ফাস্ত রহিলেন। জীবানন্দ পুনরায় তাঁহাকে চিঠি দিয়া উত্তর না করিলেও মনে মনে আহত হইলেন। এবং এই ব্যবহারের পাণ্টা জবাব দিলেন প্রভুলের বিবাহে। গায়ে পড়িয়া—তিনি এমন মাতামাতি হুর করিলেন যে, প্রভুলকে শেষ পর্যন্ত বাধা দিতে হইল।

জীবানন্দ বলিয়াছিলেন, তোমার মত দূরে থাকতে পারি নি বলে তোমার খুশী হওয়া উচিত ছিল। নইলে নষ্ট কর্মবার মত সময় আমারও নেই।

অতীতের এমনি কত ঘটনাই আজও চোখের সন্মুখে দেখা দেয়। এই ত সেদিনের কথা অথচ আজ তাঁরা প্রৌঢ়।

বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। তার পরেই দেখা দিল কর্মজীবনের প্রচণ্ড সংগ্রাম। আজ এখানে কাল ওখানে। উপরন্তু কাঁধে স্ত্রী এবং গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে। জীবনের চূড়ান্ত বৈচিত্র্য। এমনি করিয়াই জীবনের ত্রিশটি বছর কাটাইয়া দিয়া বর্তমানে তিনি দেশে প্রত্যাভর্তন করিয়াছেন। এখানে আসিয়া প্রভুলের সর্বপ্রথমেই জীবানন্দকে মনে পড়িলেও ভরসা করিয়া তিনি তাঁর সহিত দেখা করিতে যান নাই। জমিদার-মাফুষ। তা ছাড়া প্রবাস-বাস কালে বন্ধুর কোন খবরাখবরই তিনি লন নাই। সংসারের সুখদুঃখ এবং

ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া এদিকে চোখ ফিরাইবার অবকাশ তিনি পান নাই, কিন্তু আজিকার এই নিঃসঙ্গতা বার বার বন্ধুকে মনে করাইয়া দিতেছে। এমনি যখন তাঁর মনের অবস্থা তখন জীবানন্দের সাদর আহ্বান আসিয়া পৌঁছিল। প্রতুল ষাঁচিয়া গেলেন।

বৈকালে পুত্র যুগ্মের হাত ধরিয়া তিনি জমিদার-বাড়ীর দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর সে চেহারা বর্তমানে নাই। আধুনিক রুচির স্পর্শে তার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। ভিতরে প্রবেশ করিতে বেগ পাইতে হইল না। যদিচ ছই জন পশ্চিমা দ্বাররক্ষী টহল দিয়া ফিরিতেছিল।

জীবানন্দ বাহির-মহলেই ছিলেন। আর ছিল তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা মঞ্জুশা। একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে একখানি ছবির বই দেখিতেছিল এবং মাঝে মাঝে নানাপ্রকার অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়া পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। সহসা এক আগন্তকের সহিত তারই বয়সী একটি ছেলেকে আসিতে দেখিয়া সেই দিকে পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিল, কারা এসেছে দেখ না বাবা—

জীবানন্দ সোজা হইয়া বসিলেন। কন্যাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন, তোমার জেঠাবাবু, প্রণাম কর। প্রতুলকে কহিলেন, বোস'।

মঞ্জুশা পিতার কোল বেঁধিয়া সঙ্কচিত দৃষ্টিতে যুগ্মের প্রতি মিটমিট করিয়া চাহিতে লাগিল। যুগ্ম একবার পিতার মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়া সহসা জীবানন্দের পায়ের কাছে নত হইয়া প্রণাম করিল। জীবানন্দ তাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া মস্তক চূষন করিলেন। মঞ্জুশা মুখ ভার করিয়া এই অপরিচিত ছেলেটির প্রতি জুড় দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। জীবানন্দ কন্যার মুখভাব লক্ষ্য করিয়া মুহূর্ত্তান্তে কহিলেন, ওর সঙ্গে খেলা করোগে মঞ্জু।

মঞ্জুশা যুগ্মের দিকে একটি অগ্রসর হইয়া আসিল এবং পুনরায় পিছাইয়া গিয়া পিতাকে প্রশ্ন করিল, ও আমার কি হয় বাবা?

জীবানন্দ মুহূর্ত্তের জ্ঞাত চূপ করিয়া থাকিয়া শিশুর মত চঞ্চল কর্তে কহিলেন, তোমার বন্ধু মা-মণি।

পরক্ষণেই তিনি উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া প্রতুলকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন, বুঝলে প্রতুল...তোমার ছেলে এবং আমার মেয়ের এর চেয়ে বড় বন্ধন আর কি হতে পারে ভাই।

প্রতুল নীরব রহিলেন, তাঁর চোখের সম্মুখে তখন তাঁদের বাল্যস্মৃতি ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। সেদিনের সেই জীবানন্দ আজিও ঠিক তেমনটাই আছে, তেমনি ছেলে-মামুষ—তেমনি প্রগল্ভ।

জীবানন্দ পুনরায় কহিলেন, ওকে তোমার ছবির বই দেখাবে না মঞ্জু?

মঞ্জুশা অকস্মাৎ ধূসী হইয়া উঠিল। বাবা কিছু বোঝে না। তার ছবির বই দেখিয়া শুধু হাঁ করে ন। এত আর তার বাবার মত অত বড় নয়...ছেলেমামুষ। তার চেয়ে মোটে একটুখানি ত বড়।

মঞ্জুশা যুগ্মের সন্নিকটে অগ্রসর হইয়া আসিয়া চূপি চূপি জিজ্ঞাসা করিল, এই...তোমার নাম কি বলে না?

আমার নাম? যুগ্ম বলল, আমার নাম যুগ্ম। বাবা আমাকে মিছ বলে ডাকে।

মঞ্জুশা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমার সঙ্গে খেলা করবে? আমার ছবির বই, ময়ূর, খরগোস, বিলিভী ইঁদুর আর মোনিয়া পাখী দেখবে?

যুগ্ম সোৎসাহে সম্মতি জানাইল।

মঞ্জুশা কহিল, সব দেখবে। এফুনি?

যুগ্ম পুনরায় সম্মতি জানাইল।

ধূসীতে মঞ্জুশার ছই চোখ নৃত্য করিতে লাগিল। এক মুহূর্ত্ত তার বিলম্ব সহিতেছিল না।

যুগ্ম এতক্ষণে কথা কহিল, তোমার অনেক পাখী আর খরগোস আছে? সাদা সাদা খরগোস আর লাল লাল মোনিয়া পাখী?

মঞ্জুশা হাত পা নাড়িয়া এক অপূর্ণ ভঙ্গীতে কহিল, অ-নে-ক আছে।

জীবানন্দ এবং প্রতুল উভয়েই হাসিলেন, কথা কহিলেন না।

যুগ্ম মুহূর্ত্তে কহিল, আমার নেই।

মঞ্জুশা কহিল, তুমি নেবে? আমার অনেক আছে। দুটো, পাঁচটা, দশটা। তুমি আগে চলোই না মার কাছে—বলিয়া সে সাগ্রহে যুগ্মের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল। দু'পা অগ্রসর হইয়া পুনরায় হাত-মুখ নাড়িয়া কহিল, আর যদি ছুটু মি না করো তবে একটা মস্ত বড় ডল তোমায় দিয়ে দেব। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মঞ্জুশা পুনরায় কহিল, তুমি ছবির বই ভালবাস?

যুগ্ম সম্মতিস্বচক মাড় নাড়িয়া কহিল, হু-উব।

তারও একটা দিয়ে দেব। মঞ্জুশা বলে, আগে তুমি চলে। আমার খরগোস আর মোনিয়া পাখী দেখতে। এক একটা মুহূর্ত্তের বিলম্ব মঞ্জুকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিতেছিল।

যুগ্ম পিতার মুখের প্রতি চাহিতেই তিনি হাসিয়া সম্মতি দিলেন। হু-জনে ধূসীমনে প্রস্থান করিল।

জীবানন্দ একটি হাই তুলিয়া কহিলেন, তবু ভাল যে তোমার দেখা পাওয়া গেল প্রতুল। ডেকে না পাঠালে বোধ হয় আসতে না?

প্রতুল হাসিলেন।

জীবানন্দ বলিয়া চলিলেন, আজ আমরা প্রোচ, কিন্তু

তোমাৰ মৃন্ময় আৰু আমাৰ মঞ্জুকে দেখে বহু পূৰ্বেৰ কথা আমাৰ বাৰ বাৰ মনে পড়ছিল। এমনি কৰেই হঠাৎ একদিন আমাদেৰ মধ্যও বন্ধুত্ব হয়েছিল। ছেলেবেলায় ছিলাম বন্ধু, তাৰপৰি বয়েসেৰ সঙ্গ সঙ্গ অৰ্থেৰ পাৰ্থক্যটাই হ'ল সবচেয়ে বড় অন্তৰায়। তুমি গেলে সৰে। সেই থেকে আমি নিজেৰে নিজে বছৰি জিজ্ঞাসা কৰেছি, এই যে প্ৰতুল গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে এ কেমন কৰে সম্ভব হ'ল। এৰ অত কোন কাৰণ থাকতে পাৰে কিনা?

প্ৰতুল পুনৰায় হাসিলেন। কিন্তু জীবানন্দ ধামিতে পাবলেন না। বলিয়া চলিলেন, তুমি হেস না প্ৰতুল। এদের এই সখ্যেৰ সূচনা দেখে আমাৰ আজ নতুন কৰে আমাদেৰ অতীতকে মনে পড়েছে। সামান্য কাৰণে মাৰামাৰি, কথা বন্ধ। লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ীৰ পাশ দিয়ে ঘূৰে বেড়ান। একেৰ হয়তো মন গললো...অপৰে দাঁড়াতাম মুখ ঘূৰিয়ে। ঘটনা হিসেবে এৰ কতটুকু মূল্য তাৰ চুলচেরা হিসেব আজ কৰতে বোনা? না। কিন্তু বলতে পাৰ প্ৰতুল, এমনি প্ৰাণবন্ত বস্ত্ৰৰ পৰিবৰ্ত্তে আজ যা পড়ে আছে অল্পভূতিৰ দিক থেকে তা কতটুকু?

প্ৰতুল মুহূৰ্ত্ত কৰ্ত্তে কহিলেন, তুমি বৰাবৰই একটু ভাবপ্ৰবণ। জীবানন্দ অত্মমনস্ক ভাবে কহিলেন, হয়তো তোমাৰ কথাই ঠিক, নইলে আজ পঁচিশ-তিনিশ বছৰ পৰে-দেশে এসেছ অৰ্ধচ ডেকে না পাঠাতে একবাৰ দেখা দেবাৰ ফুৰসত পৰ্য্যন্ত তোমাৰ হয় নি।

প্ৰতুল মুহূৰ্ত্ত হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন, পৰিবৰ্ত্তনটা হ'ল জীবনে একটা স্বাভাবিক পৰিণতি। আমাকে অল্পযোগ দিতে পাৰ, কিন্তু দোষ দেওয়া চলে না। তা ছাড়া শুধু একটা দিকই তোমাৰ চোখে পড়েছে। সব কথা তোমাৰ জানবাৰ কথাও নয়—সম্ভবও নয়। কিন্তু তোমাকে ঠিক আগের মত পেয়ে বুক আমাৰ ভৰে উঠেছে। তুমি এক তিল বদলাও নি।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিলেন, বদলেছি বৈকি। নইলে তোমাদেৰ গাঁড় জীবানন্দ কখনো তাৰ ছেলেকে উচ্চশিক্ষাৰ জন্ত বিলেতে পাঠাতে পাৰত না। মেয়েদেৰ সখ্যেও এতটা উদাৰ হয়ে ওঠা সম্ভব হ'ত না।

প্ৰতুল কহিলেন, ছেলেকে বিয়ে দিয়ে পাঠিয়েছ?

না।...জীবানন্দ কহিলেন, তাৰ দৰকাৰ মনে কৰি নি।

তাকে পুৰোপরি মাহুৰ কৰতেই আমি চাই। প্ৰলোভনকে যদি সে জয় কৰতে না পাৰে সে তাৰ ছুৰ্ভাগ্য।

প্ৰতুল কহিলেন, কাজটো ভাল কৰো নি।

জীবানন্দ কহিলেন, তোমাৰ মতে দানে ভুল কৰেছি। কিন্তু সকলেই ত এক পদ্ধতিতে হিসেব কৰে না ভাই। যদি ভুল কৰে থাকি নিজেৰ কৰ্মফল বলে মেনে নেব। সে বৰং আমাৰ সহ হবে, কিন্তু অনিশ্চয়তাৰ মধ্য আমি আৰ একট

মেয়েকে ডেকে আনতে রাজী নই। তাই ও-কাজ কৰতে পাৰি নি।

জীবানন্দ মুহূৰ্ত্তেৰ জন্ত ধামিয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু এ সব আলোচনাৰ টেৰ সময় পাওয়া যাবে। চল অন্ধৰ মহলে একবাৰ দেখা দিয়ে নদীৰ ধাৰ থেকে একটু ঘূৰে আসি।

প্ৰথম সাক্ষাতের সঙ্কোচ কাটিয়া গেছে। জীবানন্দ এবং প্ৰতুল প্ৰত্যহই একবাৰ কৰিয়া মিলিত হইতেছেন। তাঁরা যেন পুনৰায় তাঁদের অতীতে ফিৰিয়া আসিয়াছেন।

মৃন্ময় তাৰ পিতাৰ প্ৰায় ৰোজকাৰ সঙ্গী। মঞ্জুবাৰ আনন্দেৰ সীমা নাই। মৃন্ময়কে তাৰ খুব ভাল লাগে। বয়সে সে মঞ্জুবাৰ চেয়ে অল্প বড় হইলেও এৰই মধ্য অনেক বই পড়িয়া ফেলিয়াছে। কত ৰাজ্যেৰ গল্প যে ও জানে। শুধু পুতুলখেলাতেই যা ওৰ আপত্তি।

এক দিন মৃন্ময় না আসিলে মঞ্জুবা ব্যস্ত হইয়া উঠে। তাৰ বাবাৰ কাছে বাৰ বাৰ প্ৰশ্ন কৰে। তেওয়ারীকে পাগল কৰিয়া তোলে তাকে মৃন্ময়দেৰ বাড়ী লইয়া যাইবাৰ জন্ত। পুতুলখেলা মঞ্জুবা এক প্ৰকাৰ ত্যাগ কৰিয়াছে। ইদানীং তাৰ গল্প শুনিবাৰ আগ্ৰহই বেনী। বাবা অথবা তেওয়ারীৰ গল্প তাৰ ভাল লাগে না।

তেওয়ারীকে উঠিতে হয়। না উঠিয়া উপায় নাই। এখনি হয়তো অনর্থ বাধাইবে। মৃন্ময়দেৰ বাড়ী আসিয়া মঞ্জুবা রাগত কৰ্ত্তে বলে, তুমি আজ যাও নি কেন?

মৃন্ময় বিজ্ঞেৰ হায়া হাসিয়া কহিল, কেমন কৰে ৰোজ ৰোজ যাই বল। আমি যে স্কুলে ভৰ্ত্তি হয়েছি। মূৰ্খ হয়ে থাকলে ত আৰ চলবে না আমাৰ। বাবাৰ কাছে আবাৰ ৰোজ পড়া দিতে হয় যে।

মঞ্জুবা রাগ কৰে। মৃন্ময় গম্ভীৰ কৰ্ত্তে বলে, তুমি ত পড়তে জান না, তাই রাগ কৰছ।

মঞ্জুবাৰ আত্মসম্মানে আৰ্হাত লাগে। সে জ্ব কুঁচকাইয়া বলে, বা রে ৰোজ আমাকে মাষ্টাৰ মশাই পড়ান যে। আমি ইংৰাজী বইও পড়তে পাৰি। হাসিধ্বনী, প্ৰথম ভাগ ত কৰে শেষ কৰে ফেলেছি। তা জান তুমি?

তাছল্যেৰ হাসি হাসিয়া মৃন্ময় কহিল, ওতো ছোট ছেলেৰাও জানে। জান আমাৰ বইগুলো সব ইয়া মোটা মোটা। দাঁড়াও না এৰ পৰে কত গল্প তোমাৰ শোনাৰ।

মঞ্জুবা কহিল, তোমাৰ কতগুলো বই?

মৃন্ময় গম্ভীৰ ভাবে কহিল, আট-দশখানা হবে।

মঞ্জুবা বিস্মিত ও শ্ৰদ্ধাৰিত হইয়া উঠিল। কহিল, ওতে বুকি খুব ভাল ভাল গল্প আছে?



মুম্বয় হাড নাড়িয়া সাই দিল। মঞ্জুয়ার মুখখানিও উজ্জল হইয়া উঠিল।

দিন চলিয়া যায়। মুম্বয়, খরগোস অথবা মোনিয়া পাখী দেখিয়া এখন আর মুম্বয় ভুগ্ন নয়। পাতালপুরীর রাজকন্ডার গল্পও তাকে এখন আনন্দ দেয় না। তার চেয়ে ইতিহাসের গল্প লইয়া মাতিয়া উঠিতে তার আগ্রহ বেশী।

আকবর বাদশা শুভবুদ্ধি এবং ভ্রাতৃত্ববোধকে মূলধন করিয়া কতবড় বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহম্মদ তোপগলক কেন লোকের কাছে এত অপ্রিয় হইয়াছিলেন... জয়চন্দ্রের পরবর্ত্তপ্রমাণ ভাঙিই পৃথ্বী রাজ এবং শেষ পর্যন্ত স্বজাতির ধ্বংসকে ডাকিয়া আনিয়াছিল... আকবরের সাম্রাজ্যের পাকা বুনিয়াদ আওরঙ্গজেবের গোঁড়া ধর্মবুদ্ধির বেদীমূলে কেমন করিয়া ধ্বংসের স্বচনা করিয়াছিল—এই সব তথ্য লইয়া আলোচনা করিতে আজকাল মুম্বয় আনন্দ পায়। গল্পগুলো মুম্বয় ইদানীং এই সব কাহিনীই মঞ্জুাকে বলিয়া থাকে। মঞ্জুা কখন শোনে কখনও শোনে না। ইহার চেয়ে ভুতের গল্প তার ভাল লাগে।

মঞ্জুাকে দোষ দেওয়া যায় না। খালি অস্ত্রের খননখানি। মাহুশের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা লইয়া শক্তিমানে রাজনৈতিক দাবা খেলার মর্মান্তিক কাহিনী। ইহা লইয়া রাজনীতিবিদেরা চঞ্চল হইয়া উঠিতে পারেন—উৎসাহ দেখাইতে পারেন... কিম্বা কোন গভীর ইঙ্গিত করিতেও পারেন, কিন্তু মঞ্জুয়ার মত একটি অল্প বয়স্ক বালিকা তার কতটুকু বোঝে। কতখানি তার চিন্তাশক্তি। বরং ইহার বীভৎসতায় তার চোখে জল দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মুম্বয়ের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। ইহা লইয়া তার গল্প করিবার অনেক হেতু আছে। সে ইতিহাসের রাজারাজ্ঞাদের সহিত পরিচিত হইয়াছে—তাদের নাজীনক্ষত্র যে ওর জিহ্বাগ্রে এক ধাটা মঞ্জুাকে না জানাইতে পারিলে তার স্বস্তি নাই। তা ছাড়া তার বাবা বলেন যে, বইয়ের বিষয় লইয়া গল্প করিলে পড়া সহজে আরম্ভ হয়।

মঞ্জুা বলে, তোমার ইতিহাসের গল্প থামাও মিছদা। ও আমার ভাল লাগে না। তার চেয়ে তোমার নাজুদার গল্প চের ভাল। আচ্ছা মিছদা তোমার নাজুদাকে একদিন আমাদের বাড়ী নিয়ে এসো না কেন। বেশ আলাপ করে নেব।

মুম্বয় মুখ বাঁকাইয়া কহিল, যা ছুটু ছেলে নাজুদা। ক্লাসজুত সকলকে মেরে ঠাণ্ডা করে দেয়।

মঞ্জুা হাসিয়া উঠিল, কহিল, তোমাকেও মেরেছে বুঝি?

মুম্বয় কহিল, না আমাকে কিছু বলে না। আমি ত আর ছুটু মি. করি না।

মঞ্জুা, কহিল, তা হলে আমিও ছুটু মি. করবো না। তুমি এক দিন নিয়ে এসো কিন্তু। নাজু তোমাদের ক্লাসের মনিটার বুঝি?

মুম্বয় মুখে অশ্রুট নন্দ করিয়া কহিল, ছু... ..

এত কথা পরেও মঞ্জুাকে মুম্বয়ের প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে, সে নাজুকে এক দিন লইয়া আসিবে। প্রতিশ্রুতি পালন করিতেও সে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু জমিদার বাড়ীর নাম শুনিয়াই নাজু চমকাইয়া উঠিল, কহিল, ওরে বাবা। এ খুনে ভোজপুরীর চাবুক খেতে। আমার পিঠ অত সস্তা নয়।

মুম্বয় নাজুর এই অকারণ অভিযোগে বিম্বিত হইল।

নাজু হাত নাড়িয়া কহিল, তুই ও ভোজপুরীকে জানিস নে মিছ তাই বলছিস। আমার পিঠের চামড়া প্রায় তুলে নিয়েছিল আর কি। ভাগ্যিস জমিদার বাবু এসে পড়ে ছিলেন নইলে... নাজু অতীতের কথা আর একবার স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিল। কহিল, হাতে চাবুক, কোমরে ভোজালি।

বিম্বিত কণ্ঠে মুম্বয় কহিল, তোমাকে যদি শুধু শুধুই মারতে এল তবে জমিদারবাবুকে বলে দিলেই পারতে।

নাজু হি হি করিয়া খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া কহিল, শুধু শুধু নয় রে শুধু শুধু নয়। চুরি করতে গিয়েছিলাম। ফুল আর পেয়ারা।

মুম্বয়ও হাসিতে যোগ দিল। কহিল, কিন্তু এখন ত আর চুরি করতে যাচ্ছ না যে ভয় পাচ্ছ। তা ছাড়া মঞ্জু ওর সত্যি খুব ভাল লোক। তুমি না বলে নিতে গেলে কেন? একটু থামিয়া মুম্বয় পুনরায় কহিল, আমি মঞ্জুর কাছে তোমার অনেক গল্প করেছি। মঞ্জু তোমার নিয়ে যেতে বলেছে।

নাজু কহিল, কিন্তু ওদের ভোজপুরীকে দেখলেই আমার বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। ওখানে আমি কিছুতেই যাচ্ছিনে।

মুম্বয় নীরব রহিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন নাজুকে যাইতে হইল—অত্যন্ত ভয় এবং সঙ্কোচের সহিত। বহির্দ্বারে দারোয়ান তার মুখের পানে চাହିতেই নাজুর বুক কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় বৎসর দুই পূর্বে মুহুর্তের দেখা একখানি কচি অপরাধী মুখ সে স্মরণে আনিতে পারিল না। নাজু বাঁচিয়া গেল।

মুম্বয়ের নিকট গল্প শুনিয়া শুনিয়া নাজু সম্বন্ধে মঞ্জুয়ার যে ধারণা জন্মিয়াছিল সে কাছে আসিতে তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। ছোটখাট ছেলেটি। কথা বলে অত্যন্ত মিষ্টি করিয়া। অথচ ক্লাসের মধ্যে সব চাইতে ডানপিটে ছেলে নাকি এই নাজু—ক্লাসের মনিটার। কথায় কথায় মারপিট করিতে নাকি ওর জুড়ি নাই। মঞ্জুা প্রথমত অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কথা কহিতেছিল, কিন্তু বেশীক্ষণ তাহা স্থায়ী হইল

না। মুহুর্তেই ওরা সহজ হইয়া, স্বভাবচাঞ্চল্যে মুখর হইয়া উঠিল।

মঞ্জুশা বলে, তুমি সকলকে অত মারধোর কর কেন?

নাঙ্কু হাসে। কথার জবাব দেয় না।

মঞ্জুশা পুনরায় বলে, মিহুদাকে কখনও মারবে না কিন্তু।

ওরা সকলে মিলিয়া একসঙ্গে হাসে। অগভীর ওদের মন, সবল শ্রুত ওদের অন্তর, তাই ওরা এমন সহজ এবং নির্মল।

ইহার পরে নাঙ্কুর ভয় পাইবার মত কোন কারণ রহিল না। বরং যেচ্ছায় যুগ্মের সহিত প্রায়ই সে মঞ্জুদের বাড়ী আসা-যাওয়া করিতে লাগিল।

৩

কিন্তু এমনি হালকা হাসি-গল্প মান-অভিমানের ভিতর দিয়া জীবনের কয়টা বৎসর আর চলিতে পারে। মঞ্জুশা বড় হইয়া উঠিয়াছে। ওর অনাবণ্ডক চাঞ্চল্য যেন স্থির হইয়া গেছে। যদিও যুগ্মের কাছে তার অহেতুক সন্দোহ নাই, কিন্তু নিজের চলাফেরা হইতে আরম্ভ করিয়া কথাবার্তা পর্যন্ত একটা স্রৃঙ্খল নিয়ম মানিয়া চলে। সকালবেলার স্নিগ্ধ বাতাসের মতই সে মধুর হইয়া উঠিয়াছে। বড় ভাল লাগে। কাছে বসিয়া হাসিগল্পে মাতিয়া উঠিতে মন উন্মুখ হইয়া থাকে। বয়সটা তার এমনি একটা স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

যুগ্ম এবারে বি. এ. দিয়াছে। মঞ্জুশাও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ডিগ্রির মোহ নাই, কিন্তু মানসিক অগ্রগতি আছে—যদিও কল্পনা তার সীমাবদ্ধ। কিন্তু যুগ্ম স্বপ্ন দেখে—দেশের মধ্যে এক জন মন্ত বড় হইয়া উঠিবার স্বপ্ন। এম-এ পাস করিয়া সে বিলাত যাইবে উচ্চশিক্ষার জন্ত। সে মানুষ হইবে। মঞ্জুকে বলে, তোমার দাদার মত আমিও বিলেত যাব মঞ্জু। আমি বড় হবো।

মঞ্জুশা হাসিমুখে কহিল, বিলেত গেলেই বুঝি মানুষ বড় হয়ে উঠে মিহুদা? দেশের যারা বড় তারা সবাই ও দেশে যান নি। তা ছাড়া অনেকে আবার বড় হতে গিয়ে মানুষ হিসেবে ছোট হয়ে আসেন। একটু ধামিয়া মঞ্জুশা পুনরায় কহিল, আচ্ছা মিহুদা, সত্যি করে বলো ত বড় হবার উপকরণ আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে কিসের জন্ত। এ কথা ভাবতে আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত নয় কি?

যুগ্ম হাসিয়া কহিল, এতে লজ্জার কিছু নেই মঞ্জু। যে কারণেই হোক ওদের দেশ আজ সব দিক দিয়েই বহুদূরে এগিয়ে গেছে। নিজেদের এ ক্ষতি পূরণ করতে হলে তাদের দোরে না গিয়ে উপায় কি?

মঞ্জুশা কহিল, তোমার এ যুক্তি নিতান্ত মামুলি মিহুদা। শিক্ষা অথবা সংস্কৃতির কথাই যদি বলো; এ ত পরম্পরের

পরিপূরক। আদান-প্রদানের ভিতর দিয়েই ত এর প্রসার হয়। শিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে তাদের দোর-গোড়ায় গিয়ে না দাঁড়ালে কিসের ক্ষতি।

যুগ্ম তেমনি হাসিমুখেই কহিল, এ শিক্ষার লজ্জা নেই মঞ্জু। এমনি শিক্ষাপাত্র নিয়ে বিদেশের বহু মনীষী এদেশ পর্যটন করে গেছেন তাঁদের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে। আজ পাশ্চাত্যের নব নব আবিষ্কার আমাদের চোখে পরম বিষ্ময়। কিন্তু আমাদের দেশেও রামায়ণ মহাভারত এবং পৌরাণিক যুগে বিজ্ঞান-সাধনায় পিছিয়ে ছিল না। ইন্দ্রজিতের মেঘের আড়ালে যুদ্ধ কিংবা নারদের চৌকিতে আকাশভ্রমণ কোনটাই আজ আর অবিদ্যমান বলে মনে হয় না।

মঞ্জুশা হাসিয়া কহিল, আমার কথাটাই তুমি বলে ফেলেছ মিহুদা। আমাদের বড় হবার বহু অমূল্য সম্পদ নিজের দেশেই ছড়ান রয়েছে। অপেক্ষা শুধু বেছে নিয়ে তাকে রূপ দান করা। একাত্ত সাধনা দিয়ে কি এ কাজ সম্ভব হয় না?

যুগ্ম কহিল, সাধনার গোড়ার কথাটা ভুলে গেলে ত চলে না মঞ্জু। শুধু সাধনায় কিছুই হয় না যদি নিজেকে উপযুক্ত করে তৈরি করা না যায়।

মঞ্জুশা কহিল, আমার মনে হচ্ছে আমরা অনেক বড় ব্যাপারে মাথা গলিয়েছি। উচ্চশিক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা কি পথ হারিয়ে ফেলি নি। কিন্তু এ সব আলোচনা এখন থাক। তার চেয়ে বুল কলকাতায় যাচ্ছ কবে?

যুগ্ম নীরব রহিল।

মঞ্জুশা একটু হাসিয়া কহিল, তুমি বুঝি রাগ করলে? এতে রাগ করবার কিছু নেই। তোমরা নিতান্তই সমুদ্রের জীব, আমরা সাধারণ পুকুরের। ছোটকে কেন্দ্র করেই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাণ। বৃহত্তর মধ্যে হারিয়ে ফেলতে আমরা তাকে চাই না, পারিও না। নিতান্তই সংসারের জীব...বড় বেশী সচেতন...হয়তো বা একটু স্বার্থপরও।

যুগ্ম একটু বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, অর্থাৎ।

মঞ্জুশা হাসিয়া কহিল, অর্থাৎ আকাশের পাখীর চেয়ে আমরা খাঁচার পাখীর মূল্য দিই বেশী। আর কল্পনার চেয়ে বাস্তব সত্যের।

যুগ্ম কহিল, ভাল বুঝলাম না।

মঞ্জুশা কহিল, বুঝে তোমার দরকারও নেই। শুধু এইটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে শহরে গিয়ে আমাদের ভুলে যেয়ো না।

যুগ্ম কহিল, এর আগেও আমার পড়াশুনোর জন্ত শহরে থাকতে হয়েছে মঞ্জু।

মঞ্জুশা কহিল, কিন্তু সেটা মফস্বলের শহর—কলকাতা নয়।

ওখানে পাবে তুমি বহু বহু-বান্ধব...নিত্য নূতন নূতন উদ্ভাদনা। তার ওপর তোমার আবার এগিয়ে চলবার যা প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

মঞ্জুষা মুহু মুহু হাসিতে লাগিল।

মুময় রাগ করিয়া কহিল, তুমি কি ঠাটা করছ নাকি?

মঞ্জুষা মুহু মুহু কহিল, তুমি কি তাই মনে কর মিছদা?

মুময় কহিল, তা করি না বলেই ত তোমায় ঠিক বুঝতে পারছি না। জীবনে সত্য উপলব্ধি যেদিন হ'ল, অতীতের অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলো যখন মহামূল্য হয়ে সভাকে নাড়া দিয়েছে তখন তুমি হয়ে পড়লে দুর্বোধ্য।

মঞ্জুষা তেমনি হাসিমুখে কহিল, এ তোমার মিথ্যা অভিযোগ।

মুময় কহিল, সম্ভবতঃ তোমার কথাই ঠিক। এত তলিয়ে দেখবার মত দৃষ্টির গভীরতা হয়ত আমার নেই, কিন্তু মার তৈরি কারুন্দি চুরি করে এনে আমবাগানে বসে আমবাগা খাওয়া কিংবা পুতুলের হাত মুচড়ে দিয়ে তোমার কান্না শোনা...তোমাদের পেছনের বাগানে বসে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়া, এসব কথা কোন দিনই আমি ভুলতে পারব না। এই সব ছোট ছোট ঘটনাগুলোকে নূতন করে ভাবতে আমার ভারি ভাল লাগে। এর মধ্যে আমি সত্যিকারের জীবনস্পন্দন খুঁজে পাই। সেদিনে যা ছিল নিছক ঘটনা আজ তা জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ।

মঞ্জুষা রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছিল।

মুময় বলিয়া চলিল, খেয়াল হ'ল জলপদ্ম নেব। সাঁতার আমি জানি নে। জলে আমার প্রবল ভীতি। তুমি পড়লে জলে ঝাপিয়ে। আমার জন্মে ফুল তোলা তোমার চাই অথচ সাঁতারে তুমিও অপটু। গেলে ডুবে। ভাগ্যক্রমে তেওয়ারী এসে উপস্থিত হয়েছিল। অনেক সময় আমি আজও ভাবি ছেলেবেলার এই ভালবাসার কথা। তুচ্ছ কারণেও নিজের জীবন বিপন্ন করতে এতটুকু বিধা আসে নি। আর আজ আমরা নিজেদের চিনতে শিখেছি, বুদ্ধির তুল্যদণ্ডে ওজন করে দেখবার স্পৃহা আমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই সহজটাও আজ আর সহজ নয়। আর সেই জন্তেই আমি অতীতকে আঁকড়ে ধরে আনন্দ পাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিবর্তন হয়। আমার জীবন কোন পথে চলতে শুরু করবে তা আমি জানি না, কিন্তু তাকে একটা কাল্পনিক রূপ দিয়ে মাথা ঘামাতেও আমি ভালবাসি না।

মঞ্জুষা কহিল, তোমার এ অভিযোগও অমূলক। ক্ষণকাল ভাবিয়া মঞ্জুষা পুনরায় কহিল, এ তোমার সাহিত্যচর্চার ভাব-বিলাস। তুমি রাগ করো না মিছদা, আমার কি মনে হয় জান? যত রাজ্যের উদ্ভট আর অসঙ্গত খেয়াল তোমার মাথায় বাসা বেঁধেছে। মার কাছে জ্যাঠাইমা সেদিন হুঃখ

করছিলেন, তুমি নাকি পৈতে পর্যন্ত পর না। যার তার হাতের জল খাও। অবশ্য খাওয়ার ব্যাপারে কিছু বলতে যাওয়া ভাল। মানুষের প্রবৃত্তির উপর তা নির্ভর করে। তা ছাড়া আজকের দিনে এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তা বলে যজ্ঞোপবীত সহজে তোমার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

মুময় হাসিয়া কহিল, মা'মিথ্যে বলেন নি। একগাছা সাদা পৈতে আমার আর দশ জনের থেকে আলাদা করে রাখবে তা আমার সহ হয় না। আমাদের রাধু বোষ্টম, হারাণ নাপিত কিংবা কৃষ্ণগোপাল হাড়ি যে ঐ পৈতেগাছটার মহিমার কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে এ আমি সত্যিই বরদাস্ত করতে পারি না মঞ্জু। আমাদের এই জাতিগত রৈষ্য সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে আমাদের কোথায় টেনে এনেছে একবার ভেবে দেখেছ কি? অথচ তারাও আমাদের মত মানুষ। মানুষের দিক দিয়ে হয় তো আমাদের চেয়েও বড়। তোমায় স্পর্শ করলে যদি কাউকে স্নান করতে হয় কিংবা তোমার উপস্থিতিতে যদি কোনো দেবমন্দির জপবিজ্র হয় তা হলে তাদের সহজে তোমার মনোভাব তখন নিশ্চয় খুব প্রীতিকর হবে না। সমাজের বুকুর উপর থেকে এই দুষ্ট ক্ষত আমাদের নিরাময় করতে হবে। মানুষের গৃহদ্বার যেন মানুষের জন্ম চিরদিন খোলা থাকে। জাতিগত পার্থক্যের আবরণ যেন তাদের গতিপথে বড় হয়ে চোখে না পড়ে।

মঞ্জুষা গভীর কণ্ঠে কহিল, তাই বুঝি পৈতেগাছটা বিসর্জন দিয়েছ মিছদা। জানে বুদ্ধিতে বয়সে সবদিক থেকেই তুমি বড়। তোমার যুক্তিতর্কের জোয়ারে আত্মবিশ্বাস, আজন্মের সংস্কার ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু মন তবু বিনা দ্বিধায় সাড়া দেয় না।

মুময় কহিল, সাড়া দেওয়া বহুদিন আগেই আমাদের উচিত ছিল। তা হলে আজ অন্ততঃ একটা স্নান এবং স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে চলাফেরা করতে পারতাম। কিন্তু এ সব কথা আজ থাক মঞ্জু। তোমাকে বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে যেন।

মঞ্জুষা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ তুলিতেই মুময়কে কে যেন অকস্মাৎ চাবুক মারিল, ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল, তোমার হ'ল কি মঞ্জু?

মঞ্জুষা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, কিছু হয়নি ত।

মুময় একটু হুঃখিত ভাবে কহিল, তোমরা সকলেই যদি সমান হও তবে যাই কোথায় বল ত। পৈতেটা সত্যিই আমি খেছায় বিসর্জন দিই নি। নদীতে স্নান করতে গিয়ে খোয়া গেছে। মা বলেন ওটা আমার ইচ্ছাকৃত। বুঝলাম তাঁর কাছে যখন-তখন বক্তৃতা দেবার পরিণতি এটা। কিন্তু মুখে বললাম, তথ্যস্তু। এই নিয়েই গোল বেধেছে। মুময় কিছু সময় নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিল, তোমায় মিথ্যে বলব

না মঞ্জু; যে ব্যাপারটা আকস্মিক একটা ছুটিনার মত ঘটেছে তা যদি আমি খোঁলা মনে নিজে থেকে করতে পারতাম আমিই তা হলে সব চেয়ে খুশী হতাম। কিন্তু এ নিয়ে তুমি এতটুকু বিচলিত অথবা ছুঃখিত হবে জানলে কখনই এ আলোচনা করতাম না।

মঞ্জু যত্ন কণ্ঠে কহিল, ছুঃখিত ঠিক নয় কিন্তু আমার যেন কেমন ভয় করে মিসুদা, দাদার কথা সব শুনেছ কি?

মুন্স একটু বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, তোমার দাদার। না ত।

মঞ্জু কহিল, বলবার মত নয় বলেই কেউ বলে নি। তিনি বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন মেম বউ। উঠেছেন এসে কলকাতার সাহেবপল্লীর একটি ফ্লাটে। মা সেই থেকে বিছানা নিয়েছেন। বাবা কেমন গভীর হয়ে গেছেন। কথাবার্তা বড় একটা কন্ না। মাঝে থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। না পারি জোর করে একটু কথা কইতে, না প্রাণ খুলে একটু হাসতে।

মুন্স যত্ন কণ্ঠে কহিল, তোমার বাবা তোমার দাদা সম্বন্ধে কি বলেন?

মঞ্জু কহিল, কিছু নয়। শুধু দেওয়ানজীকে ডেকে বলে দিলেন, নিম্নক 'পাঁচশ' টাকা করে যেন প্রতি মাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার সম্বন্ধে এই আমার শেষ সিদ্ধান্ত। এর পরে আর তিনি একটি কথাও বলেন নি। এমন কি দাদার নাম পর্যন্ত মুখে আনেন নি। মঞ্জু ধামিল।

মুন্সও চুপ করিয়া রহিল। আজিকার আলোচনার ধারটা কেন যে সহসা এই পথে মোড় ফিরিয়াছিল তাহার এতক্ষণে একটি কিনারা হইয়াছে।

তেওয়ারী হাঁক দিল। মঞ্জু উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, অনেক দিন ত যাও নি। মা তোমার খোঁজ করছিলেন। কাল পার ত একবার যেও। মঞ্জু যত্নের জন্ত ধামিয়া পুনরায় কহিল, আমাকে যে সব কথা বলেছ—যদি কোন দিন কোন কারণে ঐ প্রসঙ্গ ওঠে একটু বুকেছকে জবাব দিও মিসুদা। সকলে হয়তো তোমায় বুঝবে না—ভুল করবে। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আর এক বার আগামী কাল তাদের বাজী মাইবার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তেওয়ারীর সহিত বাহির হইয়া গেল।

পরদিন মুন্স কিন্তু জমিদার-বাজী না গিয়া সন্ধ্যাপ্রান্তে নদীর তীরে বেড়াইতে গেল। ও বাজীর ঘাসরোধকারী আবহাওয়া হইতে তফাৎ থাকাই ভাল। মঞ্জুর দাদাকে সে কোনদিন দেখে নাই, হয়তো কোনদিন দেখিবেও না, তথাপি একটা বিজাতীয় যুগ্ম ওর মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। মঞ্জুর দাদা তার মনে বেশ খানিকটা আলোড়ন তুলিয়াছে। মুন্স অত্মমনস্কের মত পথ চলিয়াছে। এমনি আরও কত দূর যে সে অগ্রসর হইয়া বাইত তাহার ঠিক নাই, সহসা পথের

মাঝে হিরু নাপিতের সঙ্গে দেখা, দাদাঠাকুর যে, যাবেন কত দূর?

আচমকা বাধা পাইয়া মুন্স চমকাইয়া উঠিল, তোমাদের গ্রামে এসে পড়েছি যে হিরু।

হিরু একটু হাসিয়া কহিল, আজ্ঞে না পেছনে ফেলে এসেছেন। একটু আগেই শ্রমশান, এই ভরসন্ধ্যায় আর ওদিক পানে যাবেন না।

মুন্স একটু হাসিয়া কহিল, বড় অত্মমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। চল এক সঙ্গেই এগোই।

হিরু কহিল, চলুন।

মুন্স কহিল, তোমার বাজীর খবর ভাল ত, ছেলেপিলে সব কেমন আছে।

হিরু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, ভাল আর কোথায় দাদাঠাকুর। বুড়ো হয়েছি চোখে তেমন ঠাণ্ড পাই না। লোকজনের তেমন ডাক নেই।

মুন্স কহিল, কেন তোমার বড় ছেলে।

করণ একটুখানি হাসিয়া হিরু কহিল, তা হলে আর ছুঃখ ছিল কি। ইংরিজী ইস্কুলে পড়তে দিয়েছিলাম—তাইতেই কাল হয়েছে। বলে, ফুর হাতে নিতে লজ্জা করে। ধীরে কোম্পানিতে বিশ টাকা মাইনেতে চাকরি করে। এত বোঝালাম যে, ফুর হাতে করে ছ'বেলা ছ'ঘণ্টা ঘুরে এলেই মাস গেলে নিদেন পঞ্চাশ টাকা রোজগার হবে। কে কার কথা শোনে। যতদিন দেহ বইবে বাপের কাজ ক'রে যাব, তারপর যাক না সব ভেঙ্গে। দেখতে ত আর আসব না। হিরু ধামিল।

মুন্স নীরব।

হিরু পুনরায় কহিল, একটু পা চালিয়ে এগোন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সাপ-খোপের অভাব নেই। কাল পরান মণ্ডলের ছেলেটাকে দিয়েছিল প্রায় সাবাড় করে। একটু দেখে শুনে আওরাজ ক'রে যাবেন। হিরু একটা বাকের মুখে অদৃষ্ট হইয়া গেল।

মুন্স নদীতীরের নির্জন পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। পায়ের পাশ দিয়া কি একটা অতি দ্রুত চলিয়া গেল। মুন্স চমকিত হইল। হিরুর উপদেশ স্মরণ হইল। বুকের মধ্যটা কাপিয়া উঠিল। চতুর্দিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। সম্ভবত অমাবস্তার রাত। তিথিনক্ষত্রের হিসাব মুন্স রাখে না। গোয়ালন্দ ধীরে দেখা দিয়াছে। সাচ্চলাইটের তীব্র রশ্মি ইতস্তত ঘুরিয়া ফিরিয়া পথের সন্ধান করিয়া লইতেছে। ধরশ্রোতা পদ্মা উন্নত বেগে ধীরে গায়ে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। ছুরোধ্য উহার ভাষা, কিন্তু নিজের সামর্থ্যানুযায়ী বাধাদানে পশ্চাৎপদ নয়। মাথার উপর দিয়া এক ঝাঁক বাহুড় উড়িয়া গেল। মুন্স পুনরায় চমকাইয়া উঠিল। অদূরে

মহান্মান। পক্ষান্তে কল্পিত ভয়াবহতা, উর্ধ্বে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের চাপা শব্দ, বায়ে জলের উদ্ভূত মাতামাতি, ডাইনে ছোট ছোট বোঁপ আর সমুখে আঁকাবাঁকা সন্ন পথ। যুগ্ম একাকী অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এতটা দূর পথ, বিশেষ করিয়া এদিকে সে ইতিপূর্বে একাকী আর আসে নাই। তরুণের হিরু নাপিতের অযাচিত সতর্কবাণী। ইহা অপেক্ষা মজুখাদের বাড়ী টের ভাল ছিল।

বাড়ী ফিরিতে আজ তাহার অন্তত নয়টা বাজিবে। যুগ্ম লম্বা লম্বা পা কেলিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। মাঝে মাঝে সামান্য শব্দও উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছিল। উদ্ধাম তরঙ্গমালা তীরে আসিয়া ব্যর্থরোধে আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল। দূর নদীবক্ষে ক্ষীণ আলোকশিখা। হয়তো কোন যাত্রীবাহী নৌকা চলিয়াছে। যুগ্ম সবিস্ময়ে দেখিল ঢেউয়ের তালে তালে বারকয়েক দোলা খাইয়া নৌকাখানি তলাইয়া গেল। একসঙ্গে কতকগুলি আঁর্ত চিংকার, তারপর সব নীরব। শক্তিপরীক্ষায় দুর্বলের নিরুপায়তার একটি করুণ মর্মস্পন্দ দৃশ্য।

প্রীমারের পাখার বিরামহীন ছপাছপ শব্দ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। যুগ্ম এক বার কয়েক মুহূর্তের জন্ত থমকিয়া দাঁড়াইল। দূর নদীবক্ষে দৃষ্টি প্রসারিত করিল, কিন্তু স্ফটিভ অন্ধকারে পদ্মার সাদা জলের উচ্ছ্বল নর্তন ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়িল না। যুগ্ম পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিল। অন্ধকারে হ'চট খাইতে খাইতে বড় জোর সামলাইয়া লইল।

যুগ্ম প্রায় প্রায়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। রাধু বোষ্টমের গলার সাজা পাওয়া যাইতেছে। সমুখের ঐ উন্মুক্ত মাঠের এক প্রান্তে তার কুঁড়ে ঘর। রাধু গান গাহিতেছিল—জামা-সঙ্গীত। লোকটির কেমন এক স্বভাব। দিন-রাত বিরাম নাই। বহু বৎসর পূর্বে রাধু নাকি বছর চারেক সংসার-ধর্ম করিয়াছিল। তার পর কোন এক দুর্ব্যাগ-রাত্রির অবসানে সে তার কুঁড়ে ঘরখানির সঙ্গে জী-রত্নটিকেও হারাইয়াছে। তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। শোনা যায় বর্তমানে সে বন্দাবনে আছে। রাধুর কুঁড়ে ঘরখানি আবার হইয়াছে, কিন্তু তার ভাঙ্গা সংসারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অজাবধি করে নাই।

যুগ্মের ইচ্ছা হইতেছিল রাধুকে ডাকিয়া সঙ্গে লয়। এই ঘোর অন্ধকারে পথ চলিতে তার কেমন ভয় ভয় করিতেছিল। আরও খানিক আগে ঐ যে বড় ছাতিম গাছটা মাথা উঁচু করিয়া মুক্তিমান এক শুপ অন্ধকারের মত নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে উহার বহু ইতিহাসই এককালে সে কল্পিত বক্ষে উন্মুখ হইয়া শুনিয়াছে। আজ এতখানি বয়সেও সেই অতীতের কথা ভাবিতে গিয়া যুগ্মের সমস্ত শরীর ভারী হইয়া উঠিল।

যুগ্ম পায় পায় আসিয়া রাধুর কুঁড়ের সমুখে দাঁড়াইল। যুগ্ম কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, বোষ্টমদার গানের গলা আজও ঠিক তেমনি আছে। এই রাত্তার চলেছিলাম তোমার গান শুনে দাঁড়াতে হ'ল।

রাধু বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এত রাতে এই পথে যে দাঁড়াঠাকুর।

যুগ্ম হাসিয়া যুগ্ম কহিল, বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। অজ্ঞানতাবে শঙ্খানের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পড়ে এই বিজাট।

রাধু চমকিত হইল। কহিল, সাহস থাকা ভাল তা বলে ছুঃসাহস ভাল নয় দাঁড়াঠাকুর। ভূত, পেত্নী মানিবে বলে যত বড়াই করি নে কেন রাত বিরেতে ঐ পথে চলতে হবে ভাবতেও হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকে যায়—রাধু থামিল এবং অনতিকাল মধ্যে একখানা পাকা বাঁশের লাঠি ও একটি লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া আসিল। কহিল, চলো একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

রাধুর এই সাধু সংকল্পে যুগ্ম মনে মনে খুশী হইয়া উঠিলেও প্রকণ্ঠে কহিল, তুমি আবার এই রাতে...

রাধু হাসিল, কহিল, শুধু গল্পই শুনেছ, চোখে ত আর দেখ নি। তবে বলি শোন,—চাটুযোদের বড় বাঁশবোঁপের পাশ দিয়ে গেছ কোন দিন? দিনের বেলা যেতেই অনেকে আতকে ওঠে। সেই পথে এমনি এক আধার রাতে একলা চলেছিলাম। হঠাৎ দেখি বাঁশগুলো সব একসঙ্গে নড়ে উঠেছে। অথচ আশপাশের গাছগুলির একটি পাতা পর্যন্ত কাঁপছে না। ভাল করে চোখ চেয়ে দেখি রাত্তা জুড়ে বাঁশগুলো সব শুয়ে আছে। তখন বয়সও ছিল। গায়ে শক্তিও ছিল। হাতের লাঠিগাছা বাগিয়ে ধরে এগিয়ে গেলাম—পথ আমার পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু চোখের সমুখ দিয়ে ছুটে চলে গেল একটা কালো বেড়াল। তার ভাঁটার মত গোল গোল চোখ দুটো অন্ধকারে আগুনের গোলার মত জ্বলছে। হাতের লাঠিটা শক্ত করে চেপে ধরলাম। বেড়ালটা সহসা পঞ্চবটীর গাছগুলোর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভাবলাম-আপদ গেছে। কিন্তু তার পরেই দেখি পঞ্চবটীর অশখ গাছে চৌস দিয়ে দাঁড়িয়ে একটি রোগা বোঁ ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। সঙ্গে সঙ্গে কানের পাশ দিয়ে এক বলক দমকা হাওয়া ছুটে গেল—কাকুর চাপা হাসির হা হা শব্দের মত। তার পরই সব শুদ্ধ। ভাল করে চেয়ে দেখি সে বোঁটিও আর সেখানে নেই। সেই থেকে অন্ধকার রাতে আর ও পথ দিয়ে চলাফেরা করি না।

যুগ্ম মনে মনে ভয় পাইলেও যুগ্মের জোর ছাড়িল না। কহিল, গল্প হিসেবে শুনেতে মন্দ নয়।

রাধু হাসিল। যুগ্ম কণ্ঠে কহিল, তোমাদের মত ছেলে-ছোকরাদের নির্যেই দিন কাটাই আর এ সহজ কথাটা বুঝি নে দাঁড়াঠাকুর। যুগ্মের জোরে আমার উড়িয়ে দিচ্ছ বটে, কিন্তু



নিজের মনের কাছে কি জবাব দেবে শুনি। সেখানে হার তোমার মানতেই হবে। একটু ধামিয়া রাধু বোষ্টম সুর করিল, তা হলে বলি শোন—ঘোষপাড়ার পোড়ো ভিটের গল্প শুনেছ ?

মুখ্য বাধা দিয়া কহিল, তুমি কি জোর করে আমার ভৃত্ত বিশ্বাস করাবে বোষ্টম-দা ?

রাধু বলিল, কিন্তু ঘোষপাড়ার গল্প শুনে তোমার স্বীকার করতেই হবে যে...

মুখ্য হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, আমি এমনিতেই স্বীকার করছি বোষ্টম-দা। দোহাই তোমার, ঘোষপাড়ার কথা এখন থাক তার চেয়ে একখানা রামপ্রসাদী হোক।

রাধু তার লগ্ননের আলোটা ভাল করিয়া উজ্জ্বল দিয়া মুহূর্তে কহিল, পথ চলতে চলতে কি আর ওসব সাধন-ভজন হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল পথ চলিতে চলিতেও রাধুর ভজন গান অনায়াসে চলিতে পারে।

মুখ্য হাসিয়া কহিল, তেমন অশ্রুবিধা হচ্ছে বলে মনে হয় কি বোষ্টম-দা।

মুহূর্তের জন্ত গান ধামাইয়া রাধু উত্তর করিল, হলেই বা করছি কি। পুনরায় রাধুর কণ্ঠে সুর খেলিয়া চলিল।

জমিদার-বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া তাহাদের অলঙ্কণের জন্ত ধামিতে হইল। তেওয়ারীর সহিত রাধুর কুশলপ্রণয়ের আদান-প্রদানের সময়টুকু মাত্র। রাধু পুনরায় চলিতে সুর করিল। আর একটা ঝাঁক পরেই মুখ্যদের বাড়ী। রাধু কহিল, আজ সকাল বেলা এ দিক থেকে ঘুরে গেছি। তোমার দরায় দিন কয়েক চলবে। ভিক্ষে আজকাল আর কেউ দিতে চায় না। পেরেও ওঠে না। ভাবছি কোথাও একটা কাছকর্ম জুটিয়ে নেব। নদীর ওপারে বড় তরফের একটা কারখানা হবে শুনি। এ পারের আরও অনেক যাবে বলছিল। রাধু সহসা ধামিল, কহিল—এবারে তুমি একলাই যেতে পারবে। বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পিছন ফিরিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া গেল। একবার ফিরিয়া চাহিল না পর্যন্ত।

মুখ্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিল। আর সামান্য পথই অবশিষ্ট আছে।

জয়শ

## শিশিরের গান শুনি সারারাত

শ্রীশুনীলরঞ্জন ঘোষ

শিশিরের গান শুনি সারারাত,  
ঝিঁঝিঁ ডাকে হাওয়া ঝিঝিঝি,  
আধ-পাকা ফসলের শিরাতে  
নেশা কাঁপে এই পৃথিবীর।  
ডাকো না এখন তুমি ডাকো না  
হাতে হাত হাতখানি রাখো না,  
কিছু ভালবাসা আর আশাতে  
এসো না ছ'জনে রচি নীড়।  
শিশিরের গান শুনি সারারাত,  
ঝিঁঝিঁ ডাকে হাওয়া ঝিঝিঝি।

জানি না জানো কি তুমি জান না,  
এ-রাত ফিরিয়া বেশী পাব না,  
হয়ত যদিবা পাই, কে জানে  
দৌহারে ছ'জনে আর চাব না।

তখনো এমনি যদি থাকে চাঁদ,  
ধাসের সবুজে ভাসে মিঠে স্বাদ,  
রবে কি পিপাসা নীড় রচিবার  
শুধু ভালবাসিবার ভাবনা ?  
জানি না, জান কি তুমি জান না,  
এ-রাত ফিরিয়া বেশী পাব না।

এখনো ডোবে নি চাঁদ মেখেতে,  
এখনো ফসল আছে ফলিবার,  
আমার যা-কিছু কথা বলেছি,  
তোমার কিছু কি নেই বলিবার ?  
মিছে হোক, তবু কিছু আশা দাও,  
নিমেষ ভরিয়া ভালবাসা দাও ;  
বাতি যে নিভিয়া যায় জ্বেনে কি—  
জোগাবে না তেল তার জলিবার  
এখনো ডোবে নি চাঁদ মেখেতে,  
এখনো ফসল আছে ফলিবার।

# কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গোড়াপত্তন

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

## দায়িত্ববোধের উন্মেষ

১৭৫৭ সনে পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারেই ব্যস্ত ছিল; একমাত্র রাজ্যসংক্রান্ত বিষয় ছাড়া এদেশবাসীর শিক্ষা বা জনকল্যাণমূলক অথ কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর তাহাদের ছিল না। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে গবর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতা-মাদ্রাসার সূচনা, এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে



লর্ড মিন্টো

রেসিডেন্ট জোনাস ডানকান্ বারানসী-ধামে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এগুলি মূলতঃ শাসন ও বিচার-বিভাগের কার্যসৌকর্য্যার্থ হিন্দু ও মুসলমান আইনের ব্যাখ্যাতা এক দল পণ্ডিত ও মৌলবী গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হইয়াছিল।

তখন কোম্পানীর রাজ্যবিস্তার ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার যুগ। এই কারণে কর্তৃপক্ষ ভারতবাসীর সংস্কার বা রীতিনীতির উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা সমীচীন মনে করেন নাই। চার্লস গ্রান্ট একদা কোম্পানীর কর্মচারীরূপে এদেশে ছিলেন; তিনি ভারতবাসীর মধ্যে বাহাতে ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রবর্তিত হয়, তাহার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিলাতে আন্দোলন সূর্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার বা সনন্দে এদেশবাসীর শিক্ষা-সম্পর্কে কোন কিছুই অন্তর্নিবিষ্ট হয় নাই।

ইতিমধ্যে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম

কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়,—বলা বাহুল্য ইহাও শাসন-সৌকর্য্যার্থ।

এই কলেজে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংস্কৃত, বাংলা, আরবী, ফার্সী প্রভৃতি প্রাচ্য বিজ্ঞান পারদ্রুম পণ্ডিতগণের সমাবেশ হইল। বিলাতে হইতে নবাগত সিভিলিয়ানগণ প্রাচ্য বিজ্ঞান মর্মে বুঝিতে লাগিলেন। বড় লর্ড লর্ড মিন্টো (কোল-ব্রুক ও অপর দুই জন কাউন্সিলের সদস্য সহ) ১৮১১ সনের ৩ই মার্চ এদেশীয়দের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির হ্রস্বতা বর্ণনা করিয়া একটি মিনিট স্বাক্ষর করেন।\* বিলাতের কর্তৃপক্ষের ওদাসীত্তের প্রতি কটাক্ষ করিয়া তিনি মিনিটে লিখিলেন :—

“It is seriously to be lamented that a nation particularly distinguished for its love and successful cultivation of letters in other parts of the empire should have failed to extend its fostering care to the literature of the Hindoos, and to aid in opening to the learned in Europe the repositories of that literature.”

লর্ড মিন্টো তাহার মিনিটে নবদ্বীপ ও ত্রিহতে দুইটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এদেশে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে গ্রান্ট ও মিন্টোর দ্বিবিধ আন্দোলনের ফলেই, পরবর্তী ১৮১৩ সনের সনন্দে আপোসমূলক একটি ধারা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল; উহার মূল অংশ এইরূপ :—

“... a sum of not less than one lac of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India, and for the instruction and promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories in India; ... (East India Act of 1813, Sec. 43).

\* “It is a common remark that science and literature are in a progressive state of decay among the natives of India. From every inquiry which I have been enabled to make on this interesting subject that remark appears to me but too well founded. The number of the learned is not only diminished but the circle of learning even among those who still devote themselves to it appears to be considerably contracted. The abstract sciences are abandoned, polite literature neglected and no branch of learning cultivated but what is connected with the peculiar religious doctrines of the people. The immediate consequence of this state of things is the disuse and even actual loss of many valuable books; and it is to be apprehended that unless Government interpose with a fostering hand the revival of letters may shortly become hopeless from a want of books or of persons capable of explaining them.”

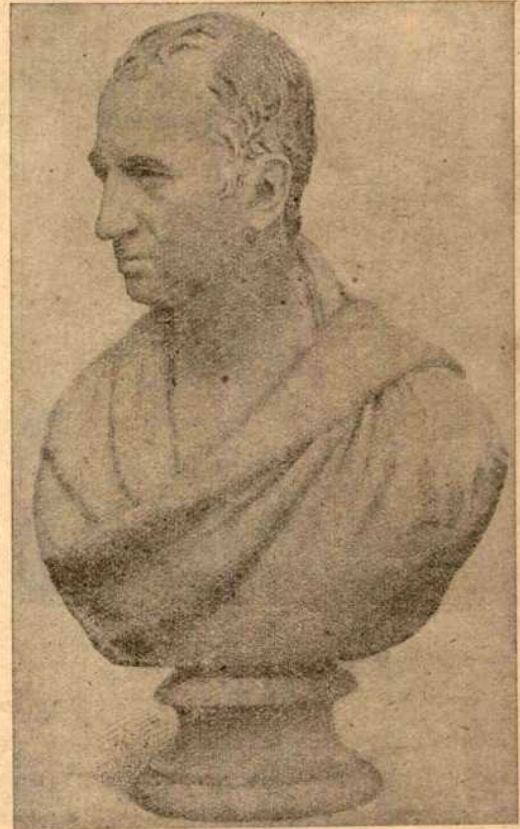
বড়লর্ড মিন্টোর কাউন্সিলে অন্ততম সদস্য প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ কোলব্রুকের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল। প্রাচ্যবিজ্ঞান উন্নতিকল্পে স্বাক্ষরিত এই মিনিটেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায় (Life of H. T. Colebrooke, 1873, p. 283 দ্রষ্টব্য)।

ধারাটি বিশ্লেষণ করিলে দুইটি বিষয় সুস্পষ্ট হইবে ; প্রথমতঃ প্রাচ্যবিজ্ঞান উৎকর্ষসাধন ও পণ্ডিতগণকে উৎসাহ দান, এবং দ্বিতীয়তঃ এদেশবাসীর মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার। কিন্তু পরবর্তী কালে—লর্ড বেঙ্কিনের আমলে প্রাচ্য-বিজ্ঞান পক্ষপাতী এবং ইংরেজী শিক্ষার সমর্থনকারীদিগের মধ্যে, প্রধানতঃ শিক্ষার বাহন লইয়া, যে বিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহাতে লর্ড মেকলে তাঁহার যুক্তির সমর্থনে ধারাটির অপ-ব্যাখ্যাই করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, এই ধারা অমুযায়ী ১৮১৩ সন হইতে পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে এদেশে শিক্ষাবিস্তার সাধনে রাজ-সরকার উল্লেখযোগ্য কিছুই করেন নাই। এদিকে কিন্তু ১৮১৬ সন হইতে হিন্দু-প্রধানগণ স্বজাতীয়গণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে অবহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার। কৰ্ম্মব্যাপদেশে ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ এবং ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব দিন দিন উপলব্ধি করিতেছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহাদিগেরই উত্তোগ ও আহুকুল্যে ১৮১৭ সনের ২০শে জাম্বয়ারি কলিকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কার্যে ব্যক্তিগত দায়িত্বে সুগ্রীম-কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্তর হাইড ইষ্টের, এবং দড়ি-ব্যবসায়ী ডেভিড ছেরারের সহায়তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতি ও প্রচারকল্পে ইংরেজ ও ভারতীয়দের সম্মিলিত চেষ্টায় কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি (ইং ১৮১৭) ও কলিকাতা-স্কুল-সোসাইটি (ইং ১৮১৮) স্থাপিত হইয়াছিল। কলিকাতায় ও মফস্বলে শিক্ষাপ্রচারে মিশনরী-প্রচেষ্টাও শ্রমণীয়; খ্রীষ্ট-মাহাত্ম্য প্রচার তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও ভারতবাসী তাঁহাদের দ্বারা কম উপকৃত হয় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কেবল রাজ্যবিস্তার ও শাসনভিত্তি দৃঢ়ীকরণেই ব্যস্ত ছিলেন। ১৮১৮ সনে মরাঠা-শক্তির পতনের পর তাঁহার। স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া এদেশবাসীর শিক্ষা বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার কতকটা অবসর পাইলেন। লর্ড মিক্টো নবদ্বীপ ও ত্রিছতে যে দুইটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তদমুযায়ী কার্য্য ত হয়ই নাই, পরন্তু ১৮২১ সনে পরবর্তী গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ছেণ্ডিংস বা ময়রার আমলে সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়া নূতন কৰ্ম্মপন্থা অবলম্বিত হইল। গবর্ণমেন্টের জুনিয়র সেক্রেটারী হোরেস হেম্যান উইলসন বুঝাইয়া দিলেন, মফস্বলে দুইটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা না করিয়া, তৎপরিবর্তে কাশী সংস্কৃত কলেজের আদর্শে, কেন্দ্রস্থল কলিকাতায় একটি মাত্র সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিলেই চলিবে; ইহাতে সরকারের পক্ষে এক দিকে যেমন তত্ত্বাবধানের সুবিধা হইবে, অজ্ঞ দিকে তেমনি দূর-দূরান্তর হইতে শিক্ষার্থীরা সহজে এখানে আসিয়া অধ্যয়ন করিতে পারিবে। বড় লাট এই যুক্তি সমীচীন

বোধ করিলেন; তিনি ২১ আগষ্ট ১৮২১ তারিখে একটি প্রস্তাবে কলিকাতা গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের জন্ম বায়িক পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়া উহার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন: “সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চা এই কলেজ-প্রতিষ্ঠার আশু উদ্দেশ্য হইলেও, ক্রমশঃ হিন্দুদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষারও ইহা একটি উপায়ব্রূপ হইবে।”\* ভারতবর্ষের এই অঞ্চলের শিক্ষা-সংস্কার যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান-ভার ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের



হেনরি টমাস কোলব্রুক

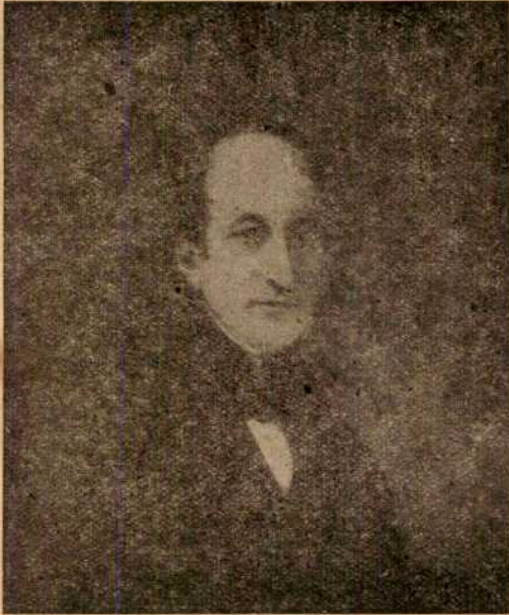
\* “... the immediate object of the institution is the cultivation of Hindu literature. Yet it is in the judgment of His Lordship in Council, a purpose of much deeper interest to seek every practicable means of effecting the gradual diffusion of European knowledge. It seems indeed no unreasonable anticipation to hope that if the higher and the educated classes among the Hindus shall, through the medium of their sacred language, be imbued with a taste for the European literature and science, general acquaintance with these and with the language whence they are drawn, will be as surely and as extensively communicated as by any attempt at direct instruction by other and humbler seminaries.”—Sharp; *Selections from Educational Records*, i. 79.



জুলাই মাসে গঠিত 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইমপ্রুভ-  
শন'-এর উপর অপিত হইল। সদর দেওয়ানী আদালতের  
বিচারপতি জে. এইচ. হারিংটন কমিটির সভাপতি ও এইচ.  
এইচ. উইলসন সেক্রেটারী নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

### কলেজ-মন্দির নির্মাণ

কলেজ-মন্দিরের জমি পটলডাঙ্গা স্কোয়ার বা গোলদীঘির  
উত্তরাংশের সমগ্র জমি (৫ বিঘা ৭ কাঠা) জয় করা হইল।



হোরাম হেমান উইলসন

ইহার মধ্যে দুই বিঘা, কাঠা-পিছু ৫০০ হারে, ডেভিড  
হেনারের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সময়ে হিন্দু  
কলেজ ও হুল সরকারী তত্ত্বাবধানে আসায়, তাহার জমিও  
সংস্কৃত কলেজের সংলগ্ন গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা অবলম্বিত  
হইয়াছিল। কলেজ-মন্দির নির্মাণে সরকার প্রায় এক লক্ষ  
রুড়ি হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। বার্ণ কোম্পানী  
নির্মাণের ভার প্রাপ্ত হন।

১৮২৪ সনের ২৫এ ফেব্রুয়ারি মহা সমারোহে সংস্কৃত  
কলেজ-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর সংস্থাপিত হয়। এই উপলক্ষে  
বিভিন্ন ভাষায় উৎকীর্ণ লিপি সহ যে ষাট-কলকট ভিত্তিপ্রস্তরের  
নিম্নে প্রোথিত হইয়াছিল, তাহার ইংরেজী অংশটি এইরূপ :—

\* উত্তরকালে হিন্দু কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেন্ট প্রেসিডেন্সী কলেজে  
(১৫ জুন ১৮৫৪), এবং জুনিয়র ডিপার্টমেন্ট হিন্দু স্কুলে পরিণত  
হইয়াছিল।

In the Reign

Of His Most Gracious Majesty George the Fourth,  
under the auspices of the RIGHT HONORABLE WILLIAM  
PITT AMHERST,

GOVERNOR GENERAL  
of the  
BRITISH POSSESSIONS  
in India

The Foundation Stone of this Edifice,  
The Hindoo College of Calcutta,  
was laid by

JOHN PASCAL LARKINS, Esq.,  
Provincial Grand Master of the Fraternity of  
Free Masons in Bengal.  
Amidst the Acclamations

Of all ranks of the Native population of this City,  
In the presence of a numerous Assembly of  
the Fraternity and

Of the President and Members of the Committee of  
General Instruction, on the 25th day of February, 1824,  
and the AERA of Masonry, 5824,  
which may God prosper.

Planned by B. Buxton, Lieutenant Bengal Engineers,  
constructed by William Burn and James Mackintosh.\*

কলেজ মন্দির সম্পূর্ণ হইতে প্রায় আড়াই বৎসর সময়  
লাগিয়াছিল। ১৮২৬ সনের ১লা মে সংস্কৃত কলেজ (হিন্দু  
কলেজ ও হুল সহ) নব-নির্মিত গৃহে প্রবেশ করে। কিন্তু  
গৃহপ্রবেশের দুই বৎসর পূর্বে—১৮২৪ সনের ১লা জাহুয়ারি  
হইতে ৬৬ নং বহুবাজারের ভাড়া-বাড়ীতে সংস্কৃত কলেজে  
পাঠারম্ভ হয়।

### রামমোহন রায়ের প্রতিবাদ -

এদেশবাসিগণের শিক্ষার সহায়তাকল্পে বিলাতের কর্তৃপক্ষ  
যে-অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহার দ্বারা হিন্দু পণ্ডিতগণের  
তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জম্ম সরকার কলিকাতায়  
সংস্কৃত কলেজ স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন, এই সংবাদে  
রামমোহন রায় স্বদেশবাসীর তরফে তীব্র প্রতিবাদ  
জানাইয়া ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তৎকালীন বড় লাট  
আমহার্ষ্টকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। তিনি বলিতে

\* *The History, Design, and Present state of the  
Religious, Benevolent and Charitable Institutions,  
founded by the British in Calcutta and its vicinity.*  
By Charles Lushington, of the Bengal Civil Service  
(Dec. 1824), App. p. xxviii.

† রামমোহনের পত্রখানি Sharf-সম্বলিত *Selections*-এ রূপ-  
১০১ পৃষ্ঠায় ও রামমোহন-গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে।  
কলিকাতার লর্ড বিশপ হেবার পত্রখানি বড় লাটের হাতে পৌছাইয়া  
দিয়াছিলেন। ১৮২৪ সনের মার্চ মাসে লিখিত তাহার একখানি পত্রে  
প্রকাশ :—

"Rammohun Roy, a learned native, who has some-  
times been called, though I fear without reason, a  
Christian, remonstrated against the [Orientalist]



চাওয়াছিলেন, সংস্কৃত এতই কঠিন যে, ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতেই প্রায় সারা জীবন কাটিয়া যায়। বহু দিন ধরিয়া এই কারণেই সংস্কৃত ভাষা জ্ঞানের প্রসারের পক্ষে শোচনীয় অন্তরায়।...সংস্কৃত শিক্ষা-প্রণালী দেশকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায়। যে-সকল কার্য্যকর জ্ঞান-বিজ্ঞান, যথা,—গণিত, পদার্থবিজ্ঞা, রসায়ন, শারীর সংস্থানবিজ্ঞা—চর্চা করিয়া ইউরোপীয় জাতিসমূহ পৃথিবীর অত্যন্ত জাতি অপেক্ষা বরণ্য হইতে পারিয়াছে, অভিজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সাহায্যে এদেশবাসীর মধ্যেও যেন সেই প্রকার উদার শিক্ষা-নীতির প্রবর্তন হয়।

বড় লাট রামমোহনের পত্রের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই; তিনি স্বীয় মন্তব্য সহ পত্রখানি জেনারেল কমিটির নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কমিটিও উহা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নাই; কারণ, তাঁহাদের মতে, রামমোহনের ব্যক্তিগত মতই পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে,—জনসাধারণের মত প্রতিফলিত হয় নাই। আমরা বড় লাটের পত্র ও কমিটির মন্তব্য বাংলা-সরকারের দপ্তর হইতে উদ্ধার করিয়াছি; উহা নিম্নে মুদ্রিত হইল :—

#### MEMBERS OF THE GENERAL COMMITTEE OF PUBLIC INSTRUCTION

I am directed to transmit to you for information, the accompanying copy of a representation addressed by Rammohun Roy, to the Rt. Hon'ble the Governor-General in Council, expressing disappointment on the part of himself and his countrymen, at the resolution of Government to establish a new Sanskrit College in Calcutta, instead of a seminary designed to impart instruction, exclusively in the arts, sciences and philosophy of Europe.

2. In furnishing your Committee with a copy of the paper, His Lordship in Council cannot abstain from remarking, that it is obviously written under an imperfect and erroneous conception of the plan of education, and course of study, which it is proposed to introduce into the new College, that the defects and demerits of Sanskrit literature, and Philosophy, are therein represented in an exaggerated light, and that the arguments in favour of encouraging native learning, as well as the positive obligation to promote its revival and improvement, imposed on the Government by the terms of the Act of Parliament, directing the appropriation of certain funds to the object of Public Education, have been wholly overlooked by the writer.

3. The letter of Rammohun Roy is not considered to call for any answer on the part of Government, but it will of course be at the discretion of your Committee

system last year, in a paper which he sent me to be put into Lord Amherst's hands, and which, for its good English, good sense, and forcible arguments, is a real curiosity, as coming from an Asiatic."—(Heber's *Narrative of a Journey* . . . ii. 388).

to address any observations, which you may deem the occasion to require, either to Rammohun Roy himself or to Government.

I have the honour to be, etc.

Persian Office,  
January 2nd, 1924.

(Sd.) A. STIRLING,  
Actg. Depy Persian Secy. to  
Govt. In charge.\*

#### [ THE GENERAL COMMITTEE'S NOTE ON THE ABOVE ]

Under the discretion vested in the Committee with respect to addressing any observations on the letter of Rammohun Roy either to himself or to Government the Committee resolve that it is unnecessary to offer any remarks. The erroneous impressions entertained by the author of the letter are sufficiently adverted to in



রামমোহন রায়

the letter from the Secretary to the Government, but had the views taken in the letter been even less inaccurate the Committee would still conceive it entitled to no reply, as it has disingenuously assumed a character to which it has no pretensions. The application to Government against the cultivation of Hindu literature, and in favour of the substitution of European tuition, is made professedly on the part, and in the name of

\* Copy book of Letters Received and Issued by the General Committee of Public Instruction, 1823-24, pp. 40-42.



the natives of India. But it bears the signature of one individual alone, whose opinions are well known to be hostile to those entertained by almost all his countrymen. The letter of Rammohun Roy does not therefore express the opinion of any portion of the natives of India, and its assertion to that effect, is a dereliction of truth, which cancels the claim of its author to respectful consideration.

Sd. J. H. HARRINGTON,  
President,

General Committee of Public Instruction.\*

রামমোহনের যুক্তিপূর্ণ মত সরকারী-মহলে কেন গ্রহীত হয় নাই, তাহার অত্র পরবর্তী সরকারী চিঠিপত্রে মিলিতেছে। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪ তারিখে গবর্ণর জেনারেলকে লিখিত পত্রে বিলাতের কোর্ট-অব-ডিরেক্টস্ সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠায় সম্মতিদান করিলেও, নিছক সংস্কৃত শিক্ষার উপকারিতা তাঁহার স্বীকার করেন নাই; তাঁহাদের মতে ভারতবাসীর মধ্যে “Useful learning” অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় শিক্ষা) বিস্তারের গুরুত্ব সম্বন্ধে :

“... we apprehend that the plan of the institutions to the improvement of which our attention is now directed was originally and fundamentally erroneous. The great end should not have been to teach Hindoo learning, but useful learning.”

কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, তথা জেনারেল কমিটি, সরকারী-ভাবে এই শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তনে নারাজ ছিলেন। ভারতবাসীর সংস্কারাঙ্গিতে আঁধার লাগিলে পাছে শাসন-শৃঙ্খলা দৃঢ়ীকরণে বিঘ্ন ঘটে, এই আশঙ্কা বরাবরই তাঁহাদের ছিল।

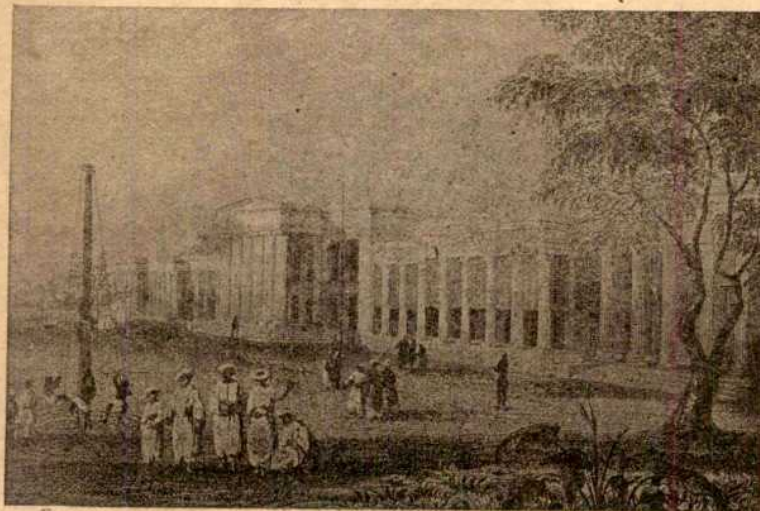
সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠাকালেও তাঁহাদের মন হইতে এই আশঙ্কা যে বিদূরিত হয় নাই, পরবর্তী ১৮ই আগষ্ট তারিখে বড় লাটকে লিখিত জেনারেল কমিটির এই পত্রাংশই তাহা স্মৃতি করিতেছে :—

“The actual state of public feeling is therefore, we conceive, still an impediment to any general introduction of western literature or science, . . .”

### কলেজে পাঠ্যপুস্তক

কলিকাতা গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজে প্রথমে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই সংস্কৃত-সাহিত্যের পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়। ১৮২৪ সনের জাহুয়ারি মাসে পাঠ্যপুস্তককালে যে-সকল অধ্যাপক ও কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র হইতে, বেতনের হিসাব সহ, তাঁহাদের নামের তালিকা দিতেছি :—

|               |                                |         |
|---------------|--------------------------------|---------|
| সেক্রেটারী    | ... উইলিয়ম প্রাইস             | ... ৩০০ |
| ব্যাकरण       | ... হরনাথ তর্কভূষণ             | ... ৪০  |
|               | রামদাস সিদ্ধান্ততর্কপঞ্চানন    | ... ৪০  |
| পানিনি        | ... গোবিন্দরাম উপাধ্যায়       | ... ৪০  |
| অলঙ্কার       | ... কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার     | ... ৬০  |
| কাব্য         | ... জয়গোপাল তর্কালঙ্কার       | ... ৬০  |
| স্থিতি        | ... রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার     | ... ৬০  |
| ছায়          | ... নিমাইচন্দ্র শিরোমণি        | ... ৬০  |
| বেদান্ত       | ... ব্রহ্মমণি দীক্ষিত          | ... ৬০  |
| গ্রন্থাধ্যক্ষ | ... লক্ষ্মীনারায়ণ ছায়ালঙ্কার | ... ৬০  |
| হিসাবরক্ষক    | ... রামকমল সেন                 | ... ৪০  |



কলিকাতা গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ—ইং ১৮৪৭

সেকালের সংস্কৃত কলেজে দ্বাদশ বৎসরের কম বয়স্ক ছাত্রের প্রবেশাধিকার ছিল না। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-সন্তান ছাড়া আর সকলের নিকট কলেজের দ্বার রুদ্ধ ছিল। ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্থিতি ও ছায় শ্রেণীতে ছাত্রগণকে সর্বসমেত ১২ বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইত। ছাত্রগণকে বেতন দিতে হইত না, বরং দরিদ্র ও দুরাগত ছাত্রেরা কলিকাতায় বাস-খরচের জন্ম কিছু কিছু রুতি লাভ করিত। রবিবার কলেজ খোলা থাকিত; প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে প্রতিপদ, অষ্টমী, ত্রয়োদশী, অমাবাসা-পূর্ণিমা ও অমাবাস্য পরবর্তী পাঠ্যনা বন্ধ থাকিত।

\* Minutes of Proceedings of the General Committee of Public Instruction, 1823-1841, Vol. No. 5, pp. 45-48.

কলিকাতা গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে সেক্রেটারী-রূপে প্রধানতঃ একজন সাহেব কলেজের তত্ত্বাবধান

করিতেন, তখন প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ বলিয়া কোন পদ ছিল না। পণ্ডিত ইন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাসাগরই সংস্কৃত কলেজের সর্বপ্রথম প্রিন্সিপ্যাল (২২ জানুয়ারি ১৮৫১)। তাঁহার

আমলে কলেজের বিভিন্ন শ্রেণী পুনর্গঠিত হইয়াছিল; যে-কোন সম্ভ্রান্ত বরের বিন্দু সম্ভানের জন্যই তিনি কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

## গ্রামের স্মৃতি

### শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

আমরা এখন যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া আছি; প্রাচীন যুগ বিদায় লইতেছে, কিন্তু নূতন যুগ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে এখনো প্রতিভাত হয় নাই। আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি সত্য, কিন্তু স্বাধীনতার নির্দিষ্ট রূপ আমাদের কাছে এখনো ধরা পড়ে নাই; বিদেশী গবমেণ্ট গিয়া জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মাত্র। এই সময় সকলের মুন নানা চিন্তায় দোলায়মান; আমাদের স্বাধীনতা, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্পনীতি, শিক্ষা-নীতি কোন্ পথ অবলম্বন করিবে তাহা লইয়া সকলে জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন। নবীন সম্প্রদায় নানাপ্রকার বৈদেশিক মতবাদ বা “ইজম” দ্বারা প্রভাবিত। এখন স্বতঃই প্রশ্ন উঠিবে, আমরা কি পুরাতনকে বাদ দিয়া নূতনকে গ্রহণ করিব, না; পুরাতনকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিব? কেহ কেহ বলিবেন, পুরাতনের ভালগুলি রাখ, নূতনের মধ্যে যেগুলি জাতীয় জীবনের পরিপোষক তাহা গ্রহণ কর। রাশিয়া পৃথিবীর সর্বত্র দ্বারে দ্বারে করাঘাত করিতেছে। মাজবাদ পৃথিবীকে ঢালিয়া সাজিতে চায়। মাজপন্থীরা বলে, পৃথিবীর যাবতীয় পুরাতন “ইজম” বা বাদ পরিত্যজ্য, পৃথিবীকে গড়িতে হইবে এক নূতন আদর্শে। কিন্তু পুরাতনের প্রতি যাহাদের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি আছে, তাহাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, এই নূতন মতবাদের পরীক্ষণের কাল কি শেষ হইয়াছে? আধ্যাত্মিকতার উপর কি জড়বাদ প্রাধান্য লাভ করিবে? মানব-মনের উপর যন্ত্ররাজ কি আধিপত্য করিবে?

বিশেষ যুগকে বা মতবাদকে সমর্থন করা বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের উদ্দেশ্যে নহে, আমরা শুধু প্রাচীন বাংলার গ্রাম্য চিত্র এখানে আঁকিতে চাই। আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন যুগ চলিয়া যাইবে। আজ যারা কিশোর এবং যুবক, যারা নূতন প্রেরণার উদ্ভূত, তাহাদের কাছে বিগত দিনের পল্লী জীবনের একটি ছবি উদ্ঘাটিত করিতে চাই।

ভারতের আগেকার দিনের গ্রাম সম্বন্ধে সর চার্লস মেটকাফ, জবাহরলাল প্রমুখ দেশবিদেশের মনীষিগণ লিখিয়াছেন, ব্রিটিশ আগমনের পূর্বেই ভারতের গ্রাম্য জীবনের প্রাচীন ধারা একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছিল। ইহা কিন্তু

সত্য নয়; ব্রিটিশ আমলেও পল্লীজীবনের বৈশিষ্ট্যের কিছু ছিটা-কোটা রহিয়া গিয়াছিল সেইজন্ত আমরাও প্রাচীন গ্রাম্য জীবনের রূপ কিছু কিছু দেখিয়াছি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও (প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত) বাংলার গ্রামের জীবনধারা পক্ষিল হইয়া উঠে নাই। গ্রামে দারিদ্র্য নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু গ্রামবাসীরা অভাবের তাড়নায় তখন একেবারে সর্বস্বারা হইয়া গ্রামত্যাগ করিয়া অগ্রজ যাইত না। গ্রাম তখন নিত্য উৎসবমুখর ছিল, বারো মাসে তের পার্বণ পূজা, দোলযাত্রা, কবিগান, যাত্রাগান প্রভৃতি নিয়মিত ভাবে হইত, পল্লীর প্রাণরসধারা তখনো শুষ্ক হইয়া যায় নাই। গ্রামের লোকেরা আসাচ্ছাদনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের ধোরাকও পাইত।

তখন যে কারিগর রোজ আট আনা রোজগার করিত, পল্লীজননীর স্নেহকোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া সে এখন দুই-তিন টাকা রোজগার করে। কিন্তু রোজগার বাড়িলে কি হইবে, অভাব তাহার কমে নাই। পল্লীবাসীরা তখন যে স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের মধ্যে দিন কাটাঁইত এখন পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ অধিক রোজগার করা সত্ত্বেও তাহার অভাব-অনটনের অন্ত নাই। এখনকার পরিত্যক্ত, শুষ্ক প্রাণহীন গ্রাম গোল্ডস্মিথের “ডেজার্টেড ভিলেজের” কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ভারতের গ্রাম সম্বন্ধে সর চার্লস মেটকাফ (১৮৩০) লিখিয়াছেন,

“The village communities are little republics having nearly everything they want within themselves: and almost independent of foreign relations. They seem to last where nothing else lasts. The union of village communities, each one forming a separate little state in itself . . . is in a high degree conducive to their happiness and to the enjoyment of a great portion of freedom and independence.”

মুসলমান আমলে গ্রামগুলিতে এক ধরনের আত্মকর্তৃত্ব বিद्यমান ছিল, বস্তুতঃ “ভিলেজ রিপাবলিক বা গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসনের জন্ত গ্রামগুলি অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতাও কতকটা ভোগ করিয়াছে। ইংরেজদের পূর্বে

পাঠান, মোগল, দিনেমার, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ভারতে আগমন করিয়াছে, কিন্তু এামের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব হরণ করিতে পারে নাই। কারুসজ্জ কুটীরশিল্পকে অব্যাহত এবং এামের অর্থনৈতিক কাঠামোকে অটুট রাখিয়াছে। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ভারতে শতকরা ৫৫ জন ছিল কৃষিজীবী, বাদবাকী বেকার ভাগই কুটীরশিল্প দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। বর্তমানে শতকরা ৭৪ জন কৃষিজীবী ১০ কুটীরশিল্প প্রায় ধ্বংসোন্মুখ।

বর্তমান কালে মহাত্মা গান্ধী এামগুলির এই স্বায়ত্তশাসনকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়া ছিলেন যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা থাকিবে এামের লোকদের হাতে। সেজন্য তিনি ছিলেন কুটীরশিল্পের পক্ষপাতী। এই রীতিরই নাম decentralisation অর্থাৎ বিকেন্দ্রীকরণ। ভারত-সরকারের হাতে অর্থাৎ কেন্দ্রে সমস্ত ক্ষমতা না রাখিয়া, তাহা ছড়াইয়া দিতে হইবে এামে এামে; আর শহরে বড় বড় ইণ্ডাস্ট্রি বা কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত না করিয়া এামে এামে ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী এামবাসীরা হইবে। তাহাই হইবে প্রকৃতপক্ষে জনগণের স্বাধীনতা এবং মহাত্মা গান্ধীর এই নীতি অল্পস্বত হইলে ভারতের লক্ষ লক্ষ এামের নবজীবন লাভ হইবে।\*

২

এখন বাংলার পল্লী কি ছিল এবং কি হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য আমার জন্মপল্লীর কথা বলিতেছি। অতীতে আমাদের এাম একটি আদর্শ এাম ছিল। আমাদের এামের নাম আউটসাহী; ইহা পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত বিক্রমপুরের একটি বিশিষ্ট এাম। আজ ইহা পাকিস্থানের ভিতরে। আমাদের পরিবার এই এামে প্রায় ৩০০ শত বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে। আমাদের আদি পুরুষ এই এামে আগমন করেন ১০৬৩ সনে। মোগল আমল হইতে আরম্ভ করিয়া এই সুদীর্ঘ কাল একই বাড়িতে আমরা নিব্বন্ধাটে কাটাইয়াছি। ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষেরা মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার নবাবের অধীনে স্রক্ষ কৰ্মচারী ছিলেন এবং নবাববাহাদুর হইতে পারিতোষিকরূপে ভূমিজমা লাভ করিয়াছিলেন। অতাবধি বংশানুক্রমে আমরা তাহা ভোগ করিয়া আসিতেছি। এই সুদীর্ঘকাল মুসলমান প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমাদের সম্ভাব রহিয়াছে।

বিভিন্ন জাতি, ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত লোকপূর্ণ এামখানি আজ

শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। অধিকাংশ হিন্দুই এাম ত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের এামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঠাগার ও পুস্তকালয়, পোষ্টাফিস, বাজার, পল্লীকল্যাণ আশ্রম (কংগ্রেসের কাজ এবং এামের কুটীর শিল্পের উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত) প্রভৃতি যাহা-কিছু এামবাসীদের সুবিধার জন্য প্রয়োজন সবই আছে; তৎসঙ্গেও এাম আজ লক্ষ্মীশ্রীহীন। পল্লী যাহাদের একান্ত প্রিয় তাহার অশ্রু বিসর্জন করিয়া প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করিয়াছে। এামের প্রাচীনতম পরিবার আমরা এখনও টিকিয়া আছি। ৩০০ শত বৎসরের স্মৃতিবিজড়িত জন্মপল্লী ত্যাগ করা হৃদয়বিদারক। এই দীর্ঘকালের হিন্দু-মুসলমানের সম্ভাব নষ্ট হইল কি প্রকারে? ইংরেজ ভারত পরিত্যাগ কালে আমাদের জাতীয় সংহতিকে কি মর্যাদাস্তিক ভাবেই না বিনষ্ট করিয়া দিয়া গেল।

আমাদের এামে প্রায় হাজারতিনেক লোকের বাস (পূর্বের গণনা অনুসারে)। ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, স্বর্ণকার, গোয়ালী, বারুই, মালী, (মালার্কর), স্ত্রধর, নমশূদ্র ভুঁইয়ালী, মৎস্যজীবী, যুগী, (নাথসম্প্রদায়), শূদ্র, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য প্রভৃতি সকল জাতি ও বর্ণের লোক এখানে রহিয়াছে। হিন্দুরা বাস করে এামের ভিতরে, মুসলমানেরা প্রান্তভাগে। মুসলমানদের ভিতর বাগ্‌জর বলিয়া এক শ্রেণী আছে, তাহারাই হিন্দুদের ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষ্যে ঢোলক বাজায়। আমাদের এামের ঢুলীদের বাদন-নৈপুণ্যের খ্যাতি সমগ্র বিক্রমপুরে এবং বাহিরেও আছে।

মোটের উপর বলিতে গেলে, এামা জীবনের পক্ষে উপযোগী সমস্তই আমাদের এামে বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ আমাদের এাম ছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট। বাহিরের উপর পল্লীবাসীদের নির্ভর করিতে হইত না, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সবই এামে পাওয়া যাইত। সরল জীবনযাত্রার পক্ষে এাম-খানি ছিল আদর্শ স্থান। সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বলিয়া সমাজের সর্বস্তরের অর্থের বণ্টন হইত। সামাজিক ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষ্যে ধোপা, নাপিত, ভুঁইয়ালী প্রভৃতি কতগুলি শ্রেণীকে ডাকা গৃহস্থের অবস্থা কর্তব্য ছিল। ইহারাই গৃহস্থের “বিত্তা” বলিয়া পরিচিত ছিল। উৎসব উপলক্ষ্যে ইহাদের “সিধা” (ডাল, চাল প্রভৃতি), বস্ত্র, টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিতে হইত। জাতিভেদ থাকে সত্ত্বেও সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে একটা ঐতিহ্য সঞ্চিত ছিল। তখন বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিল এক একটা সামাজিক ইউনিট। পূর্বে প্রত্যেকেরই সম্বন্ধ ছিল বিরাট সমাজদেহের সঙ্গে। এামে সকলে সৌহার্দ্যের সঙ্গে বাস করিত বলিয়া এবং এামের সকল স্তরে অর্থের বণ্টন হইত বলিয়া কেহ এাম ছাড়িয়া যাইতে চাহিত না। সকল শ্রেণীর লোকের এামেই রুজি-রোজগারের পথ খোলা ছিল।

\* Principles of A Gandhian Constitution in India  
দি মর্ডার্ন রিভিউ, এপ্রিল দ্রষ্টব্য।



অক্ষয় কর্মকারের কথা মনে পড়িতেছে, ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাহার হাতুড়ির বা শোনা যাইত। বাজারে ছিল তাঁর দোকান। অন্ধকার রাত্রি, পল্লী নিখুম, কেরাসিনের কুণী জ্বালাইয়া সে কাজ করিতেছে। গুরুতর অগ্নি পাড়ে আমাদের বাড়ী হইতে সে দৃশ্য নজরে পড়িত, অন্ধকার নিস্তর রজনীতে হাতুড়ীর ঠকাঠক শব্দ কানে আসিত, বিজুরিত আগুনের ফুলকি রাত্রিকে রহস্যময় করিয়া তুলিত। এমনি কোন এক গ্রাম্য কর্মকারকে লক্ষ্য করিয়া হয়ত ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন; Smith a mighty man is he। আমি এক সময় খোঁজ লইয়া জানিয়াছিলাম, আমাদের গ্রামে ১১টি কর্মকার পরিবার লোহার কাজ করিয়া জবিকা অর্জন করিত। তাহাদের তৈরি দা, কুড়ুল, গজাল প্রভৃতি সারা বৎসর গ্রামবাসীদের চাহিদা মিটাইত। এই রকম সকল শ্রেণীর লোক গ্রাম হইতেই রুটির সংস্থান করিতে পারিত।

পূজা, পার্বণ, উৎসবাদি—আমাদের গ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ৫১৬ খানা প্রতিমা গড়া হইত। ঢাক-ঢোলের বাজে উৎসবের বাড়ী বিধোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের মনে উদ্ভাদনার সঞ্চার হইত। নূতন কাপড় পরিয়া বালক-বালিকাদের আনন্দের আর অন্ত থাকিত না। ছুটির সময় প্রবাসী চাহুরেরা বৎসরান্তে গ্রামের সকলের সঙ্গে মিলিত হইতেন। পূজার সময় পূজাবাড়ীতে গিয়া প্রতিমা দর্শন করিতাম ও বিভিন্ন প্রতিমার তুলনামূলক সমালোচনা করিতাম। পূজামণ্ডপে সমাগত সবাইকে “জলপান” দিয়া আপ্যায়িত করা হইত। জলপান মানে, জলখাবার—বাড়ীতে মেয়েদের তৈরী মুড়ি চিড়ার মোয়া, লাড়ু, নারিকেলের মিষ্টদ্রব্য প্রভৃতি।

আমাদের বাড়ীতে কোন কোন বার মহিষ বলি হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতকটা বীভৎসতা ছিল। নিম্নে বর্ণনা দিতেছি। মহিষ বলির কথা রাষ্ট্র হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূজাবাড়ীতে দর্শকের ভিড় বাড়িতে থাকে। দূর গ্রাম হইতেও লোকেরা দেখিতে আসে। আবালবৃদ্ধবনিতার আগমনে নাটমন্দির ভরিয়া যায়।

মহিষকে প্রথমে স্নান করান হয়; তাহার গলায় ফুলের মালা খুলাইয়া কপালে ভেল, সিঙ্গুর লেপিয়া পুরোহিত তাহার ঘুরে পূজা দেয়। তার পর আরম্ভ হয় বলির আয়োজন। মহিষের গলায় লাগানো হয় কাঁসের দড়ি, চারি পায়ে বাঁধা হয় লম্বা দড়ি, তার পর হাড়িকাঠের কাছে আনিয়া, চারি পাশের দড়ি ধরিয়া হেঁচকা টান দেওয়া হইল; মহিষ ছমড়ি খাইয়া হাড়িকাঠের উপরে পড়িয়া গেল। হাড়িকাঠে গলা প্রবেশ করাওয়া দিয়া হুড়কা জাঁটিয়া দেওয়া হইল। ঢাক, ঢোল তীত্র নিনাদে বাজিয়া উঠিল। একজন বলিষ্ঠ লোক মহিষের পিঠে চড়িয়া

বসিয়া তাহার গলায় কলা মর্দন করিতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় চামড়া নরম হইলে, মহিষের গলা সহজে কাটা যায়। অতঃপর গলার ফাঁস ছই জন লোক শঙ্ক করিয়া টানিয়া ধরিল। তীত্র যাতনায় মহিষ বিরাট শরীর ঝাঁকুনি দিতেছে; হাড়িকাঠ নড়িয়া উঠিল। কয়েক জন লোক চোখা লম্বা বাঁশ লইয়া খোঁচাখুঁচি করিয়া জানোয়ারটার শরীরটাকে যথাস্থানে রাখার চেষ্টা করিতেছে। তীত্র যাতনায় সে চীৎকার করিতেছে, লম্বা জিত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ঢাক তালে তালে বাজিয়া চলিতেছে। এবার পুরোহিত আসিল, মহিষের গলায়-মস্তপুত জল ও ফুল অর্পণ করা হইল। মণ্ডলী (মণ্ডপ শব্দ হইতে, যে পশু বলি দেয়) আসিল বিরাট ঝাঁড়া লইয়া, তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, সম্ভবতঃ দেবীর প্রসাদ, কারণবারি কিছু পান করিয়াছে। সে নতজাহ্ন হইয়া বসিল, ঝাঁড়া উর্ধ্বে উঠিল, ঢাকের বাজনার দ্রুততাল বলির পশুর শেষ মুহূর্ত্ত সূচনা করিতেছে। বিরাট জনতা আঙুলে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছে বলির দৃশ্য দেখিবার জন্ম; কোলের শিশুটি পর্যন্ত উদ্‌গীব। প্রকাণ্ড লোহ অস্ত্রের আঘাতে মহিষ ছিন্নশির হইয়া ভূপাতিত হইল। ঢাকের বাজনার বিশেষ তাল জানাইয়া দিল সব শেষ হইয়া গিয়াছে। বলির শেষে সুর হইল দড়ি ও বাঁশ সংগ্রহ করার জন্ম লোকেরা ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি; এগুলি ঘরে রাখিলে নাকি গৃহস্থের কল্যাণ হয়। জনতা কপালে রক্ততিলক পরিল। গৃহকর্ত্তা মহিষের মাথা মস্তকে তুলিয়া লইলেন, জগজ্জননীকে উপহার দেওয়ার জন্ম। ছিন্নমুণ্ড প্রতিমার সম্মুখে স্থাপন করা হইল। মাথায় জ্বালানো হইল সলিতার প্রদীপ। এক মালসা (মাটির পাত্র) টাটকা উক রক্তও মূর্ত্তির সামনে রাখিয়া দেওয়া হইল।

দুর্গাপূজা ধনীর উৎসব; কিন্তু লক্ষ্মীপূজা ধনী দরিদ্র সকলে করিয়া থাকে। গ্রামে কুমারের তৈরি মাটির সরায় জাঁকা লক্ষ্মীর পটের উপর এই পূজা হয়। কোজাগরী পূর্ণিমার দিনে লক্ষ্মীপূজা হয়। এই পূজা উপলক্ষ্যে এক আনন্দের ব্যাপার ছিল—পাড়ায় বিভিন্ন বাড়ীতে ঘুরিয়া জলপান গ্রহণ করা। আমাদের বাড়ীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেড় শত ছই শত লোক জলপান গ্রহণ করিত। একজ্ঞ বাড়ীর মেয়েরা পূজার কয়েক দিন পূর্ব হইতেই মুড়ি-চিড়ার মোয়া, নারিকেলের মিষ্ট দ্রব্যাদি তৈরি করিয়া হাঁড়ি কসলী ভরতি করিয়া রাখিতেন।

আমাদের গ্রামে কান্তিক পূজা খুব ধুম-ধাম করিয়া হইত। ইহার প্রধান আকর্ষণ ছিল, কান্তিকের দশহরা ও কবিগান। অনেকের মতে কবিগান ছিল যাত্রা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এ ছাড়া আছে, কালীপূজা, দোলযাত্রা, চড়ক সংক্রান্তি, হরগৌরী পূজা, নীলপূজা ও অসংখ্য পূজা-পার্বণ আর দ্রুত উৎসব। গ্রামবাসীগণ কোন-না-কোন আমোদ উৎসব লইয়া সারা বৎসর ব্যস্ত থাকিত।

পুঁথিপাঠ (পশ্চিমবঙ্গে যাহাকে বলে কথকতা) গ্রামের একটি মন্ত্র আকর্ষণ। পার্বতী পাঠকের পুঁথিপাঠের শ্রায় পুঁথিপাঠ আর কোথাও শুনি নাই। আমাদের বাড়ীতে একবার পুরা এক মাস ধরিয়া রামায়ণ পাঠ হইয়াছিল। ভোরে হইত শুধু সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি। অপরাহ্নে রামায়ণের গল্প বলা হইত; মাঝে মাঝে থাকিত গান। পার্বতী পাঠক ছিল সুকণ্ঠ, তাঁহার গল্প বলার ভঙ্গীট ছিল চমৎকার, তরুণি তিনি ছিলেন সুরসিক। মাঝে মাঝে রসিকতা করিয়া সকলকে হাসাইতেন। এই উজ্জল গৌরবর্ণ, দিবা নধর-কাজি পুরুষ শ্রোতাদের একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। পুঁথিপাঠের পরে হইয়াছিল বিরাট মছব; কয়েক হাজার লোককে খিঁচুড়ী, লাবরা (খ্যাঁচ) ও মালপো খাওয়ান হইয়াছিল। নৌকার খোলে রাখা হইয়াছিল খিঁচুড়ী। সমস্ত দিন ধরিয়া চলিয়াছিল বিভিন্ন দলের কীৰ্ত্তন। মুব্বুজ্য পদবীধারী গ্রামের এক কুলীন ব্রাহ্মণ এক দলের নায়কত্ব করিয়াছিলেন। শোনা যায় তাঁহার নাকি সাড়ে বাইশটি বিবাহ ছিল। তাঁর শেষ স্ত্রীটি নাকি খোঁড়া ছিলেন, তাই তাঁহাকে অর্দ্ধেক গণনা করা হইত।

গ্রামে দুর্গাপূজার ও কালীপূজার দু-এক পালা যাত্রা হইত। গোবিন্দ কীৰ্ত্তনীয়া গাহিতেন কৃষ্ণকীৰ্ত্তন। কৃষ্ণকর্মল গোবামীর রচিত বিচিত্র-বিলাস, স্বপ্ন-বিলাস, রাই-উমাদিনী প্রভৃতি পালা গাহিয়া গোবিন্দ কীৰ্ত্তনীয়া বিক্রমপুরে জনপ্রিয় হইয়াছিলেন; আমাদের বাড়ীতে তিনি অনেক পালা গাহিয়াছেন। শেষ পালা গাছেন রাই-উমাদিনী। গোবিন্দ কীৰ্ত্তনীয়ার বয়স তখন ৭০ বৎসর হইবে, নিজে লইয়াছিলেন দ্বিতীয় ভূমিকা। তাঁর সব দাঁত পড়িয়া গিয়াছিল, উচ্চারণ ভাল করিয়া হইত না। কিন্তু এই অবস্থায়ও বিরাট আসর জমাইয়া তুলিয়াছিলেন। পাঁচ হাজার শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার অভিনয় শুনিয়াছিল। অভিনয় এমনি আন্তরিকতাপূর্ণ হইয়াছিল যে, তরুণী দ্বিতীয় ভূমিকা একজন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ অভিনয় করা সত্ত্বেও শ্রোতাদের রসোপলব্ধির কোন ব্যাঘাত হয় নাই। রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহের ছবি তাহাদের মনশ্চক্ষে যেন ভাসিয়া উঠিয়াছিল।

আনন্দ কীৰ্ত্তনীয়া গাহিত রামায়ণ গান; অনেক রামায়ণ গানের পালা আমাদের বাড়ীতে গাহিয়াছে। হাতে চামর লইয়া অল্প নাচের ভঙ্গীতে গাহিয়া বাইত; সঙ্গে থাকিত দোহার। রামায়ণ-গানে একজন বিদূষকও থাকে, বালকেরা তাহার রসিকতায় খুব আমোদ অল্পভব করে। লক্ষ্মণের শক্তিশেল ও রাবণবধ এই দুটি পালা ছিল জনপ্রিয়। রাবণ মৃত্যুবাণে আহত হইয়াছে। রণাঙ্গনে রাম রাবণের মাথা কোলে লইয়া বসিয়া আছেন; মনে পড়িতেছে, যেন রাবণের নিম্নোক্ত গানটি “ও রাম কমল জাঁখি, প্রাণ ত অশ্ব হ’ল আজ আমার, লয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ব ছদকমলে দাঁড়াও দেখি।”—খুব জমিত। আনন্দ কীৰ্ত্তনীয়ার

বাড়ী ছিল আমাদের গ্রামেই, আর গোবিন্দ কীৰ্ত্তনীয়ার বাড়ী ভিন্ন গ্রামে। আজ নিরানন্দ পল্লীতে বসিয়া ভাবিতেছি, কোথায় গেল সেদিন, যেদিন গোবিন্দ কীৰ্ত্তনীয়া ও আনন্দ কীৰ্ত্তনীয়ার পালাগান পল্লীকে আনন্দমুগ্ধরিত করিয়া রাখিত।

লোকনৃত্য—গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বীরভূমের রায়বংশে নৃত্য আবিষ্কার করিয়া স্বরগীষ হইয়া রহিয়াছেন। বিক্রমপুরে—এ রকম কোনো নৃত্য নাই। শুনিয়াছি, প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে মুসলমানেরা লাঠি ও ঢাল লইয়া এক প্রকার নৃত্য করিত; ধনী গৃহস্থদের বাড়ীতে বিবাহ উৎসব উপলক্ষ্যে তাহাদিগকে নৃত্যের জ্ঞান-আমন্ত্রণ করা হইত।

বিক্রমপুরের উল্লেখযোগ্য নৃত্য শুধু কালীকাচ, অর্থাৎ কালীর সজ বা নাচ। নিশ্চয়ি রাজ্যে গ্রামবাসী যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তখন অকস্মাৎ ঢাক-ঢোলের শব্দ জানাইয়া দিলু ঐ কালীকাচ আসিতেছে; আমরা ঘুম হইতে উঠিয়া আঙিনায় আসিয়া সমবেত হইলাম। নাচের দল আসিয়া পড়িয়াছে। মশালের আলোয় সব সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। একজন কালী সাজিয়াছে যুথোস পরিয়া, লম্বা লোল জিহ্বা লব্ লব্ করিতেছে; ঠোঁটের দুই দিকে রক্তের ধারা। গায়ে কালো রং, ওদিকে মা কালীর পরনে কিন্তু হাফ-প্যান্ট, দুই হাতে রক্তমাখা দুই কাঠের তরোয়াল। রাজ্যে ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া ভীতির উদ্বেক হয় বটে। ঢাক-ঢোলের তালে তালে তরোয়াল ঘুরাইয়া যুদ্ধ করার ভঙ্গিতে নাচিতে নাচিতে কালী অঙ্গুর হইতে লাগিল, মশালের আলোয় ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় দেখাইতেছে। বাজনার তালে তালে কালীর সঙ্গে অঙ্গুরের যুদ্ধ চলিতেছে—লড়াই ক্রমেই প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিতেছে। শেষে অঙ্গুরনিধনপূর্ব্বক নৃত্যের পরিসমাপ্তি হইল।

হরগৌরী কাচ—চৈত্র সংক্রান্তির সময় হরগৌরী পূজা উপলক্ষ্যে হরগৌরী নাচ হয়। নাচিয়েরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ঢাল পয়সা ইত্যাদি সংগ্রহ করে। যে মহাদেব সাজে সে ডানহাতে মাগনের (ভিক্ষার) পালা লইয়া ঠায় দাঁড়াইয়া থাকে, গৌরী ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিবের চারদিকে নাচে। মহাদেবের মাথার জটীর ভিতর হইতে টিনের তৈরি গোখুরা সাপ উঁকি দিতেছে। গায়ে সাদা রং মাখানো, প্রচুর রক্তাক্তের মালা গলায় ও হাতে, কাঁধে ঝুলিতেছে শিঙা, বাঁহাতে ত্রিশূল। গৌরীর গায়ে মাখা পিউরি রং, পায়ে ঘুঙুর। ঢাকের তালে তালে নৃত্য চলে। যে মহাদেব সাজে সে নরসুন্দর সম্প্রদায়ের লোক...অন্ত কোন জাতির লোকের মহাদেব সাজিবার অধিকার নাই। এই মহাদেবকে বলা হয় “বালী”। হরগৌরীর পূজার সময় “বালীকে” সন্ন্যাসীর শ্রায় থাকিতে হয়।

নবমী গান—দুর্গাপূজার নবমী দিনে নবমী গান হইয়া থাকে। দশ হইতে বিশ জন এই গানে যোগ দেয়। গায়নদের পায়ে ঘুঙুর বাঁধা থাকে। অধিকারী দাঁড়াইয়া থাকিয়া একখান খাতা



হইতে গানের পদ বলিয়া বায়, আর সকলে সম্বরে গাহিতে গাহিতে নৃত্যচ্ছন্দে রুত্তাকারে ঘুরিতে থাকে—তাহাদের পায়ে বাঁধা ঘুঙুর তালে তালে বাজিতে থাকে। নবমী গানের এক বিশেষ সুর আছে, কীর্তন বা অথ কোন গ্রাম্য গীতি হইতে এ সুর পৃথক। এই গান বাঁধে ও গায় শুধু নমঃশুদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরাই। তাহারা প্রায় নিরক্ষর বলিলেও চলে। সব গানের বিষয়বস্তু হইল উমার দুঃখ—উমা খুশুর-বাড়ী ছাড়িয়া কয়দিনের জন্ত বাপের বাড়ী আসিয়াছেন, আবার খুশুরবাড়ী চলিয়া যাইবেন, ইত্যাদি। বাঙালী নিরক্ষর কবিদের হাতে পড়িয়া উমা একেবারে বাঙালী ঘরের মেয়ে বনিয়া গিয়াছেন। দুটি গানের প্রথম চরণ মনে পড়িতেছে। (১) আজ নিশি না হইতে প্রভাত, উমা নিতে এল শজুনাত, ওগো গিরিরাজ। (২) ভগবতী নায়র যাইবো গো, বাপ ডাইয়ের বাড়ী।

ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্তের নিকট শুনিয়াছি, বরিশালে নবমী গান বাঁধিত এবং গাহিত মুসলমানের। বরিশালে ইহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হিন্দু দেবদেবী লইয়া গান রচনা করিতে ও পূজা উপলক্ষে সেগুলো গাহিতে সেকালের মুসলমানদের কোনও বাধা ছিল না।

মনসা পূজাঃ—বিক্রমপুরে মনসা পূজার খুব প্রচলন; সম্ভবত পূর্ববঙ্গ সর্গসকুল দেশ বলিয়া এখানে ঘরে ঘরে মূর্তি গড়িয়া অথবা ঘট স্থাপন করিয়া এই পূজা হইয়া থাকে। আমাদের বাড়ীতে মনসাপূজা উপলক্ষে খুব ধুমধাম হইত। গোটা শ্রাবণ মাস জুড়িয়া রোজ মনসামঙ্গল পাঠ হইত। বিক্রমপুরে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলই বিশেষভাবে প্রচলিত। জনদশেক লোক পুঁথির চারদিকে গোল হইয়া বসিত ও গাহিয়া যাইত। আরাল-বুজবনিভা সকলে বসিয়া লক্ষ্মীর বেহলার করণ কাহিনী শুনিত।

ফোক আর্ট বা লোক-শিল্প—বাংলার লোকশিল্পের প্রধান কেন্দ্র হইল বীরভূম ও বাঁকুড়া জিলা। আমরা ছেলেবেলায় গ্রামে কিছু পট দেখিয়াছি, আমাদের অঞ্চলে ইহাকে বলিত গাজীর পট। মুসলমানেরা এই পট বাড়ী বাড়ী দেখাইয়া চাল, পয়সা ইত্যাদি ভিক্ষা করিত। বীরভূমের পটুয়ারা মুসলমান। একটা ডাঙার মধ্যে গাজীর পট গুটান থাকে, অল্প অল্প খুলিয়া ছড়া আঁকিত করিয়া চিত্রের বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হয়। পটে একজন ব্যাভ্রাকচ দাড়িওয়ালা মুসলমানের মূর্তি আঁকা আছে—ইনিই গাজী, তাহা হইতেই পটের এই নাম। গাজীর পটের প্রধান বিষয় হইল ব্যাভ্র। ছড়া এই বলিয়া আরম্ভ হইত। “ও কোন গুণে, তড়াইয়া লওরে ভাই গাজীর নামে।” ইহা এখন একেবারে লোপ পাইয়াছে।

ব্রতপার্বণাদি উপলক্ষে আমাদের গ্রামে আলপনার খুব

প্রচলন ছিল। গ্রামের কোন কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পিঁড়ি-চিত্রণেও বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। একরূপ সুন্দর পিঁড়িচিত্র আজকাল বড় একটা দেখিতে পাই না। প্রাচীনরা কারও কাছে শিক্ষা না পাইয়াও নিজে নিজে উত্তমরূপে চিত্র করা শিখিয়াছিলেন। বার মাসই তাদের কাছে এক ভাদা টিনের প্যাটরাতে রং তুলি প্রভৃতি থাকিত। আলপনা, পিঁড়ি-চিত্রাদিতে পারদর্শিতা সেকালে মেয়েদের গুণপনার একটি অঙ্গ ছিল। আজকালকার স্কুল কলেজে পড়া মেয়েদের মধ্যে এই শিল্পের চর্চ্চা ব্যাপক ভাবে হওয়া উচিত। তখনকার দিনে পিঁড়িচিত্র করাইলে চিত্রকরকে মাছ ও এক বিড়া (গোছা) পানি উপহার দিতে হইত। একরূপ উপহার আমাদের বাড়ীতে আসিত।

গলুইয়ার মেলা—আমাদের গ্রামে গলুইয়ার মেলা উপলক্ষে খুব ধুমধাম হইত। সমস্ত বৈশাখ মাস ধরিয়া এই মেলা চলিত। সমগ্র বিক্রমপুরে ইহার খ্যাতি ছিল। সারা মাস বেচা-কেনা চলিত। গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যাদি এখানে প্রচুর পরিমাণে বিক্রী হইত। কৃষি ও কুটিরশিল্প দুইটিকেই প্রচুর উৎসাহ দেওয়া হইত। পুরা এক মাস ধরিয়া এই মেলাকে অবলম্বন করিয়া গ্রাম থাকিত উৎসবমুখর। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মেলায় আসিত, তখন সাময়িক ভাবে পর্দাপ্রথা উঠিয়া যাইত। শিশুরা মেলায় গিয়া কত ফুটি আমোদ করিত। সেই আনন্দমুখর দিনগুলি এখন যন্ত্রেরও অগোচর, সেদিন কি আবার ফিরিবে?

গ্রামের শিক্ষা ও সংস্কৃতি—এক বৃদ্ধ মুসলমান, শাদা-দাড়ি, শাদা লম্বা চুল, সাধুভাব, ছইয়াল অর্থাৎ ঘরামির কাজ করে। একেবারে নিরক্ষর। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম “ও মিয়াভাই, একটু তত্ত্বকথা শুনাও দেখি।” সে বলিল, “আল্লা, ইখর, গড এক, যেমন, মুসলমানেরা কয় পানি, হিন্দুরা কয় জল, আর এংরেজরা কয় ওয়াটার। কিন্তু জল একই।” দুটি ইংরেজী শব্দ কোথাও শিখিয়া থাকিবে। তারপর দেখি একেবারে দার্শনিক আলোচনা শুরু করিয়া দিল। নিরক্ষর দিন-মজুর হইলেও সহজবুদ্ধিতে ধর্মের সার কথাটি সে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। পুঁথিপড়া বিজ্ঞান হার না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাকে একেবারে সংস্কৃতিবর্জিত বলি কি করিয়া?

পঞ্জীর লোকেরা অধিকাংশই নিরক্ষর হইলেও যাত্রা কীর্তন কথকতা প্রভৃতি শুনিয়া তাহারা এক ধরণের শিক্ষা লাভ করিয়াছে, উচ্চ সংস্কৃতির আশ্বাদ পাইয়াছে। আমরা বাল্যকালে রামায়ণ মহাভারতের গল্প মা দিদিমা, ঠাকুরমার মুখে মুখে শুনিয়াছি। বৃদ্ধাদের কাছে রূপকথা ও পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়াছি। একালের শিশুদের প্রধানতঃ পুস্তকের উপর নির্ভর করিতে হয়; আধুনিক কালের মা, ঠাকুরমারা তেমন করিয়া গল্প বলিতে জানেন না।

পল্লীর স্ত্রী-পুরুষ দীর্ঘকাল যাবৎ পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়া তাহা হইতে প্রেরণা, আনন্দ, ধর্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। আজ বাংলার পল্লীর সেই লোকসংস্কৃতির ধারা বিলুপ্তপ্রায়।

পূজা, অন্নপ্রাশন, বিবাহ প্রভৃতি পারিবারিক অস্থ-  
ষ্ঠানের ভিতর দিয়া গ্রামের লোকদের সামাজিক জীবন  
গড়িয়া উঠিয়াছে। আগে ধর্ম্মাহুষ্ঠান, আমোদ-প্রমোদ,  
সকলই সমাজদেহের সঙ্গে ছিল অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত।  
প্রত্যেকটি পরিবার ছিল সমাজের প্রতি স্বকীয় কর্তব্য সম্বন্ধে  
সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন। সমাজনিরপেক্ষ ব্যক্তিস্বাভাব্য  
তখন ছিল পল্লীবাসীর অজ্ঞাত। ইহাই হইল গ্রাম্য সমাজ  
ও সংস্কৃতির মূল তত্ত্ব। বর্তমানে নাগরিক সভ্যতায় ব্যক্তি-

প্রাধান্য উৎকর্ষ ভাবে অভিব্যক্ত। শহরে আন্তরিকতাপূর্ণ  
সামাজিক জীবন নাই; সৈন্যন্যকার সমস্তই বিচ্ছিন্ন টুকরা  
টুকরা এবং স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত।

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর ‘ডিস্কভারি অব ইণ্ডিয়া’  
হইতে একটি মূল্যবান উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গের  
উপসংহার করিতেছি,—

—“A blind reverence for the past is bad and so also  
is a contempt for it, for no future can be founded on  
either of those. The present and the future inevitably  
grow out of the past and bear its stamp, and to forget  
this is to build without foundations and to cut off the  
roots of national growth. Nationalism is essentially a  
group memory of past achievements, traditions and  
experiences and nationalism is stronger today than it  
has been before.”

## পণ্য

### শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

পূজা আসন্ন। সম্পাদকের অহরোধ একটা গল্প দিতে হবে।  
গল্পের বিষয়বস্তুর অভাব বাংলায় নেই, কিন্তু আইন রীচানো  
নিরীহ একটা প্লট কিছুতেই মাধ্যম আসছে না। সম্পাদকের  
হুখানা চিঠি এসেছে, আর পূজার বাজারে কিছু উপার্জনের  
ছরাকাজকা যে মনে না জাগছে তা নয়। ছু’দিকের তাগিদে  
হুধে জল মেশাবার চেষ্টা প্রবল হয়ে উঠছে, তবু নুতন কিছু  
মালমশলা যদি পাওয়া যায় এই আশায় অপেক্ষা করে আছে।  
ইতিমধ্যে পূজার বাজার সারতে বড়বাজার যাবার প্রয়োজন  
ঘটল। একদিন বিকেল বেলায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

হারিসন রোডে সবে পৌঁছেছি—চারদিক থেকে হল্লা  
উঠল—পালাও—পালাও।

আজ কয়েকমাস ধরে এ ব্যাপার নিত্য নিয়মিত না  
হোক প্রায়ই ঘটছে। পৃথিবীর অস্ত্রতম শ্রেষ্ঠ মহানগরীতে  
মানুষের জীবন আর সম্পত্তি নলিনীদলগত জলমিব তরল  
প্রতিপন্ন হচ্ছে। তবু শাস্ত্রবাক্য মেনে জীবনকে ভাগ্যের  
হাতে সঁপে দিয়ে কেউ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। দীনহুঃখী  
মুটেমজুর পথের ভিখারী, যারা আধপেটা খেয়ে ছ’বেলা অদৃষ্টকে  
বিকার দিচ্ছে আর মরণ কামনা করছে—হল্লা উঠলে তারাও  
বায়ুর মুখে ভুলোর মত উড়ে চলে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়।  
বৈশাখী ঝড়ের মত শব্দটা ছড়িয়ে পড়তেই ছ’ধারের দোকান  
ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে গেল। দোকানের মাধ্যম তিন-চার তলা  
বাড়ীগুলোর দরজা-জানালায় কোতুলকীর দল অন্তর্হিত হ’ল—

গাড়িগুলো গতি ফেরালে পাশের গলিতে আর মানুষের সঙ্গে  
উর্ধ্বপৃষ্ঠ ককুদবিশিষ্ট অতিকায় ষাঁড়গুলি গলিতে বা লোহার  
ফটকে ঢুকে পড়ল। মিনিট দুই-তিনের মধ্যে যানবাহন-  
কর্তৃকিত রাস্তাটা প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল।

ভাগো—ভাগো—মিলিটারি আতা হায়।

চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম—যাব কোথায়? যে যার  
বাড়ীর ফটক বন্ধ করে দিয়েছে—দোকানের তলা লাগাবার  
সময় হয় নি যাদের তারা দোরের হড়কো লাগিয়ে দোকানের  
ভিতরে বন্দী হয়েছে—চকগুলোর কোলাপসিবিল গেট হুদুত  
বাহ মেলে মোন প্রতিবাদ জানাচ্ছে—যেতে নাহি দিব।

যাই কোথায়?

কাঁধে হেঁচকা টান পড়ল। আরে শেঠজি শোচতা কাহে,  
আইয়ে ইধার—

তার বলিষ্ঠ বাহর টানে কিছুদূর এসে আশ্রয় পেলাম।  
নিরাপদ নাই হোক—বিপদ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত হয়ত  
দাঁড়িয়ে থাকা চলবে—এমনি আশ্রয়।

রাজপথ থেকে বেরিয়ে যে সরু বাঁকা গলিটা খানিকদূর  
গিয়ে বহু অট্টালিকার গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেছে—তারই  
এক প্রান্তে মাঝারিগোছের একটা বাড়ীর দলিজে আশ্রয়  
পাওয়া গেল। সদর দরজার কপাট ভিতর থেকে বন্ধ—  
কাছেই অহুসমানরত পুলিশ কর্মচারীরা খানিকটা এগিয়ে

এলেই আমাদের দু'জনকে দু'হুতকারী বলে অনায়াসে চালান দিতে পারবে। রাজপথে দু'হুতকারী ঘটল—অথচ প্রহরারত সাজীরা একটুও দু'হুতকারী গ্রেপ্তার করতে পারলে না এমন শোচনীয় মর্শাস্ত্রিক ঘটনা কদাচিত্ হটে। সুতরাং তারা যে এদিকে আসবেই—দু'হুতকারী বৃক্কে সেই প্রতীক্ষাই করতে লাগলাম।

যাই হোক—সজীর পানে চেয়ে দেখলাম এতক্ষণে। মজুরশ্রেণীর লোক। পরনের তেল চিটচিটে ময়লা ছেঁড়া ধুতিখানা হাঁটুর উপর আঁট করে বাঁধা, গায়ে একটা ফতুয়া তার চেয়ে কিছু ফরসা—সেটাও শতছিদ্র আর তার কাঁক দিয়ে মসীকৃষ্ণ ত্বক বাদামী কাগজে ছড়ানো কালির ফোটার মতই শোভমান। দেহের তুলনায় মাথাটা ছোট—আর পায়ের চেটোগুলি জুতার শাসন না মানাতে যেমন বড় তেমনি কুগঠিত ও কর্কশ। হাতে পেশী আছে, মুখে আছে গৌঁক; পালোয়ান না হোক শক্তির চিহ্ন সারা দেহে ছড়িয়ে আছে।

তাকে বললাম, ব্যাপার কি মালুম হায়?

সে বাংলায় জবাব দিলে, মালুম হবে না কেন বাবুজী। একটা লরি যাচ্ছিল—কে ছাদের উপর থেকে বোম্ব গিরেছে।

কাদের লরি?

মালুম নেই। একটু হেসে বললে, লরি যাদের হোক—আমাদের ত হায়রাগি। আচ্ছা বাবুজী, কারা এসব করছে? তামাম হিন্দুস্থান কি বাউরা বনে গেল?

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া মুশকিল। চূপ করে রইলাম।

সে আবার বললে, আমাদের রুজিরোজগার বিলকুল বন্ধ—আমরা কি না খেয়ে মরব? আচ্ছা বাবুজী—না খেয়ে খেয়ে আদমি যদি জানই দিলে তো কি হবে হিন্দুস্থান-পাকিস্থান নিহে।

একে বড় বড় ও দু'হুতকারী সব রাজনীতির তথ্য বুঝাই কি করে। বুঝাতে গেলেও এরা তা বুঝবে না। এদের লজ্জা নিবারণ করে আর পেটের ক্ষিদে মিটিয়ে যারাই প্রভু হয়ে থাকুক না এদেশে—তাতে এদের আপত্তি নেই। এরা মাটিতে শুয়ে আকাশের পানে চেয়ে প্রতাহ বিপ্রাহ করে বলেই বুঝি মাটির মূল্য বা আকাশের দাক্ষিণ্য এদের মনে ছাপ ফেলতে পারে না। তবু এদের মনেও জমছে অভিযোগ। পাথরের অভ্যন্তরে আগুন আছে লুকিয়ে—সে আগুনের সঙ্গে পরিচিত নয় যদিও তবু সময়ের স্রোতে ভেসে আসছে যে লৌহদণ্ড—তার সংঘর্ষ এড়াবার জো কি। এদের আহ্বার-নিজা-পরিভূক্ত মনে চারপাশের ঘটনাগুলি কোন দাগই কাটতে পারে না। কোন কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবের মতই সেগুলি ক্ষণকাল স্থায়ী।

বড় কেন উঠল—কোথায় মিলিয়ে গেল—আবার উঠবে কিনা এ বোধ এদের নেই। দীর্ঘকালের অভ্যাসের এদের পাথর করে দিয়েছে। তবু সময়ের স্রোতে ভেসে আসে লৌহদণ্ড—পাথরের গায়ে আঘাত করে। দীর্ঘ দিনের জড়ত্বের পথ ধরে খুলিঙ্গ দেখা দেয়। এটা প্রাকৃতিক বিপ্লব ছাড়া কি?

বললাম, হিন্দুস্থান চাও না?

লোকটা উৎসাহিত হয়ে বললে, কেন চাইব না।

তবে জান দেবার ভয় করছ কেন?

সে অবাঁক হয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। বললে, বাবুজী, না খেয়ে জান দিলেই কি হিন্দুস্থান আসবে? তা হলে লালাজি শেঠজী—রাজা মহারাজা এদের কি হবে?

জান দেওয়ার অর্থ ও এভাবে নেবে ভাবি নি। বললাম, লড়াইয়ের কথা বলছি।

সে বললে, কার সঙ্গে লড়াই?

কেন—যে দু'হুতকারী—

সে হো হো করে হেসে উঠল। বললে, বাবুজী—দু'হুতকারী হচ্ছে পেট—তাকে কায়দা করবার উপায় যদি থাকে—

উপায় আছে—কিন্তু ছিন্য়ার তথাকথিত সাম্রাজ্যনীতি বা অর্থনীতির ভিত্তি এই ছোট প্রশ্নের সহুত্তর দিতে গেলেই হয় তো টলে উঠবে। সবাইকে সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়ার মানাই কোন কোন অংশের স্বীকৃতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

সময়ের স্রোতের বেগ বাড়িয়ে লোহাকে পাথরের গায়ে সজোর ঠুকে দেওয়া।

বললাম, কেন—যা উপার্জন কর তাতে তোমার পেট ভরে না?

সে হাসলে। বললে, তোমার কি মনে হয় বাবুজী?

ওর পেশীক্ষীত বাহুর পানে চেয়ে রইলাম। না খেতে পেয়ে হাতের পেশীতে যার গুলি ওঠে—কাঁধের কঠিন মাংস ককুদান রুমের কথাই মনে জাগায়—যার চওড়া বৃক্কে শক্তি রেখে দিয়েছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাকে অর্দ্ধাহারী ভাবতে স্বতঃই দ্বিধা হয় না কি?

বললাম, পেট ভরে খানিকটা খেলেই শক্তি বাড়ে না।

ও হাসলে—কোন কথা বললে না। এই সময়ে মনে হ'ল কোলাহলটা গলির মুখে এসে পড়েছে—সাজীরা দু'হুতকারী-দের খুঁজে বেড়াচ্ছে হয়ত।

চাপা গলায় বললাম—ওরা এদিকে এলেই আমাদের ধরে নিয়ে যাবে।

সে উত্তর না দিয়ে এধার ওধার চাইলে। দলিঞ্জের গায়ে ছোট দরজাটি বন্ধ। প্রাচীর উপক্কে ওপিঠে যাওয়া যায়—কিন্তু আমরা তো অপরিচিত। পুলিশে না ধরুক—বাসিন্দারা

গুলিশের হাতে আমাদের সঙ্গে দেবেই। এ যেন মারীচ রাক্ষসের দশা হ'ল। যে দিক দিয়েই হোক—শান্তিরক্ষকের কবলিত হওয়া ছাড়া আমাদের গতানুগত নেই।

সৌভাগ্যক্রমে পায়ের শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। কিন্তু পথে বার হতে সাহস হ'ল না। এতক্ষণে কি আর সাক্ষ্য আইন জারি হয় নি।

আমার সঙ্গী বললে, বাবুজি, আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আপনাদের হাতে রেশ কিছু তো আছেই—আইন টাইন ও সব খাটবে না।

বললাম, এ সব আইন—

সে হাসলে, সব আইনকে মালুম আছে—বাবুজি। আমি বলতে পারি—সিপাই যদি আসত এখানে তো আপনাকে বিলকুল বাদ দিয়ে আমাকেই—

কথাটা পাণ্টে বললাম, আইন ঠেকাবার ইচ্ছে আমার নেই—টাকাও নেই। কিন্তু ধর যদি চব্বিশ ঘণ্টা সাক্ষ্য-আইন জারি হয়—যাব কোথায়?

সে বললে, ঘাবড়াবেন না বাবুজি; রামজী একটা ব্যবস্থা করে দেবেনই।

শোনা গেল পঁচিশ ঘণ্টার জ্ঞান সাক্ষ্য-আইন জারি হয়েছে এ অঞ্চলে—আর সত্য কথা বলতে গেলে রামজীই ব্যবস্থা করে দিলেন। এই গলির গোলকধাঁস ও জানে। কাজেই ওকে অহুসরণ করে যে জায়গায় পৌছলাম তা এ অঞ্চলে অভাবিত বলা অসম্ভব নয়। চারদিকের সোধবেষ্টনীতে বন্দী এমন এক টুকরো জমি ও করোগেট শেডের আশ্রয় কোথা থেকে এল। সে আশ্রয়ে এর সগোত্রীয় বহু লোক রয়েছে।

তারা কোলাহল করে উঠল, আরে ভেইয়া শিউশরণ—কাঁহা ধা?

শিউশরণ সংক্ষেপে নিজের অবস্থিতি জানিয়ে আমার কথা জানালে। বললে, এই বাবুজীকে আরাম করে থাকবার জায়গা দিতে হবে।

আমাকে দেখে ওদের কোলাহল ধামল। একজন খাটিয়ার চিং হয়ে শুয়ে যুহুসুয়ে ভজন গানের একটা কলি ভাঁজছিল—সে তড়াক করে উঠে অভ্যর্থনা করলে। আইয়ে মহারাজ—বৈঠিয়ে।

আর একজন বললে, বাবুজির বহুং তকলিফ হবে এখানে। শেঠজীর গদিতে যদি—

বললাম, না—না তোমাদের সঙ্গে ভালই থাকব, এখানেই ভাল।

খানা-পিনার কষ্ট হবে বাবুজী—শিউশরণ আপত্তি জানালে।

কিছু না—কিছু না—একটা দিন তোমাদের সঙ্গে মিশে—ওরা আর আপত্তি করলে না।

৪

মনে হ'ল—ওদের সহজ সাবলীল জীবনের ধারা খানিক-ক্ষণের জ্ঞান ব্যাহত হয়েছে। আমার মত কেতাহুরন্ত পোষাক-পরা ভক্তলোককে সমীহ করে চলার দায়িত্ব পথের মাঝখানে হয়ত জাগে না, কিন্তু ঘরের সীমানায় তা বুঝি তীব্র হয়ে উঠল। খাটিয়াখানা ছেড়ে দিয়ে খাতির করলে বটে—আবারের তেমন ব্যবস্থা করবে কি করে। দোকান-পাট সব আইনের খোঁচায় বন্ধ হয়ে গেছে—পথে বার হবার উপায় নেই। আর লাল শেঠজীর গদিতেও যাব না আমি—উপায় কি।

অবশেষে শিউশরণ বিনীতভাবে নিবেদন করলে, বাবুজী, আপনি কি সাততু (ছাতু) আর মকাইয়ের রোট খেতে পারবেন? একটু চুড়া দিও যদি পাওয়া যেত।

বললাম, আমার জ্ঞান ব্যস্ত হোয়ো না—শরীরটা ভাল নেই—কিছু খাব না।

সে বললে, বেলা চারটে পর্যন্ত না খেয়ে কখন আদমি থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের ঘরে রসদও নেই কালকের। কাল তো মজুরি হবে না—তামাম দিন দানা-পানি পড়বে না পেটে।

না হোক—ভাতে কিছু আসবে যাবে না, তোমরা খানা-পিনা করে নাও।

একতাল ছাতু পিতলের একটা থালায় ডিকিয়ে মেখে ডেলা পাকিয়ে রাখতে লাগল। উপকরণ গোটাকতক কাঁচা লক্ষা। ছাতুতে মিষ্টি তো নেই—লুনও নেই। আর ক'জনে মিলে ওই চালায়ই এক পাশে দুখানা হুঁট সাজিয়ে কাঠের কুচি দিয়ে আগুন জ্বালালে। একটা লোটায় ভাল চাপিয়ে দিয়ে মকাই কিংবা বজরা জাতীয় কোন দ্রব্যের আটাকে ঠেসে ঠেসে মেখে হাত দিয়ে কুচি পাকিতে লাগল। পরিমাণে তা বেশী নয় দেখে অহুমান করলাম—অতিথির জ্ঞান এই বন্দোবস্ত।

এই সব কাজ করবার সময় ওরা গুন্ গুন্ করে গান গাইছিল। সে গানের সুর ক্রমশঃ উচ্চ গ্রামে পৌছল। ক্রমে ওরা ভুলে গেল—ওদের এই বহু উল্লাস প্রকাশের সাক্ষীরূপ একজন ধোপ-দুরন্ত বাবু ওদের খাটিয়ার আরাম করে চিং হয়ে শুয়ে আকাশের তারা আর সময়ের টেউ-গুনছে। প্রথমে রামনাম জাতীয় ভজন গান সুর হয়েছিল—পরে ত্রীরাশিকার প্রেম-নিবেদনে তা প্রসারিত হ'ল; ক্রমশঃ গ্রাম্যনীতিভূষ্ট পরকীয়া প্রণয়-প্রশস্তিতে তা পরিণতি লাভ করলে।

গোটা দলটাই অবশেষে অকুণ্ঠ গীতিবিভারে সহজ হয়ে উঠল।

খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে ভাবছি—এমন পরিবেশে অব্যবহৃত দারিদ্র্য আকর্ষণ করে থেকে প্রাণভরা উল্লাস ওদের আসে কোথা থেকে? কাল মজুরি ছুটবে না—ঘরে নেই আটা বা ছাতুর সংস্থান, চারদিকের দোকানপাট বন্ধ—কোথাও যে ধার মিলবে তেমন আশাও নেই—অথচ আজ এই সন্ধ্যাবেলায় একবারের জন্তও সে কথা ভাবছে না ওরা। ওদের চারপাশে বিহ্বতালোকে উদ্ভাসিত যে প্রাসাদশ্রেণী মাথা উঁচু করে প্রচুর হাঙে আইন-শৃঙ্খলাকে অবজ্ঞা করেছে তারই তালে তাল রেখে ওরাও কি বেপরোয়া হয়ে উঠল। আশ্চর্য্য এই যে, প্রচুর সমৃদ্ধিতে উপচেপড়া ওই প্রাসাদ ওদের মনের অভাববোধকে উদ্দীপ্ত করতে পারছে না। প্রাসাদকে ওরা প্রাকৃতিক সৃষ্টি হিসাবে সহজ ভাবেই মেনে নিয়েছে—যেমন সমতল মাটি ফুড়ে ওঠে পাহাড়—বনে জলে আগুন আর নীত গ্রীষ্ম বর্ষা আসে পালা করে নিয়মিতভাবে।

শব্দের সংঘাতে চিন্তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কোথা থেকে ছুটে ঢোলক কোঁচাও করেছে ওরা। বেগুরো গানের সঙ্গে তাই পিটছে বেপরোয়া ভাবে। মনে হচ্ছে পৃথিবীতে প্রলয় আসন্ন।

এ উল্লাস কিন্তু বেশীক্ষণ চলল না। পাশের দোতলার একটি জানালা খুলে গেল—তীব্র বিজলী আলোর রেখা ওদের দলকে বিদ্ধ করে বিক্রমে হয়ে উঠল তীক্ষ্ণ। মোটা বাজ-খাঁই গলার ধমক ওদের একতানের বুক তীরের মত বিধল। অকস্মাৎ সত্য হ'ল নিশ্চয়।

খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে আকাশের গানে চেয়ে আবার ভাবনার স্বপ্নকে টেনে আনবার চেষ্টা করছি—শিউশরণ এসে ডাকলে, বাবুদী থানা তৈয়ার।

থানা। না না, তোমরা খেয়ে নাও গে—আমার খিদে নেই।

না বাবুদী—অতিথি আপনি—দেওতা। আপনি না

খেলে—। ওর মুখে আঙুর ফুটে উঠল। অমরোদ উপেক্ষা করতে পারলাম না।

উপকরণ সামান্য, রুচিবোধের কথাও নয়, আর এই নোংরা পরিবেশ ও বাবার তৈয়ারীর প্রণালীতে মনটা খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। কোন রকমে দুখানা রুটি উদরস্থ করে উঠে পড়লাম। ওরা একটু অবাক হ'ল।

আহার অন্তে খাটিয়া আশ্রয় করলাম। ঘুম এল না। নানা চিন্তা এলোমেলো ভাবে মস্তিষ্কে জেঁে আঘাত করতে লাগল। এদের জীবনের মধ্যে আচার-আচরণের সামঞ্জস্য খুঁজে বার করতে চেষ্টা করলাম। শিউশরণকে নিয়ে একটা গল্পও তো লেখা যায়। আজকাল এদের নিয়ে গল্প লেখা কত না সহজ! এদের জন্ত আমার মনে এইমাত্র বেশ খানিকটা সহানুভূতির বাষ্প জমে উঠেছে—মনটা দরদে নরম হয়ে উঠল। চার পাশের প্রাসাদের উপচে-পড়া বিলাসের ধারা এদের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে—এরা শান্ত উদাসীন। এদের কারও কারও মনে এই অপব্যয় প্রশ্ন তোলে না কি? মনের অভাববোধের হিংসাত্মক জ্বালায় এদের চোখের কোণে কি অভিযোগ-উজ্জ্বল স্কুলিঙ্গ দেখা দেয় না?

শিউশরণকে ডাকলাম।

ও ব্যস্ত হয়ে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, বাবুদী খটমল আছে?

হেসে বললাম, না—বসো। উঠে বসলাম খাটিয়ার উপর।

ও কিন্তু আমার পাশে বসলে না—মাটিতে বসে পড়ে আমার মুখের পানে চাইলে।

ওকে জিজ্ঞাসা করলাম ওর ঘর-সংসারের কথা—ওর উপার্জন—ওর হুংকটের পরিমাণ।

ও কৃতার্থত্বের মত বিগলিত চিত্তে আমার প্রশ্নমালার উত্তর দিয়ে গেল। একবারও সন্দেহ করলে না—ওর ভুচ্ছ ঘর-সংসার সুখহুংকট অভাব-বেদনার উপকরণ নিয়ে আর এক জন বিলাসী মানুষ নিজ উপার্জনের পথটি প্রশস্ত করে নিচ্ছে।

## স্বপ্নো নু মায়া নু—

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

এ আনন্দগীতিগুঞ্জ মুখরিত রাস্তা,  
হৃৎকেননিত এই বাসক-শয়ন  
পুষ্পাস্ত্রত, এ উতল সঘন স্পন্দন  
যুগ্মহৃদয়ের, এই চম্পক-সৌরভ,  
দূরগত বাঁশরীর যুগ্মহৃদ-তান,—  
একি সত্য? একি স্বপ্ন? একি মরীচিকা?  
কোন প্রজ্ঞালিকের এ বুদ্ধি কুহক—  
যাবে টুটে এই মায়াবজ্রের শেষে,—

জাগিবে যখন তুমি অগ্নি মায়াবিনী,  
কালি প্রাতে সম্বরয়া শিথিল অঞ্চল,  
হেলাইয়া হুবক্ষিম কল্পগ্রীবাখানি  
মন্দাকিনী-সিকতার কলহংসীসম  
নব্র নেত্র শ্রোণিভার-অলসগমনা  
নিত্যগৃহকর্ম লাগি' কুচিত কুঠায়?



# রাণী দুর্গাবতীর বাঙালী সভাপত্তি

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাঙালীর আত্মবিশ্বাসের একটি ‘মুখ্যভিত্তিক’ নিদর্শন অদ্য বাংলার শিক্ষিত সমাজের আলোচনার ক্ষেত্রে সর্বদা উপস্থাপিত করিতেছি। ঐতিহাসিক যুগে যে সকল হিন্দু রমণী বীরপত্নী এবং বীরপ্রসবিনী রূপে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সমুদ্রযুদ্ধে অপূর্ণ বীরত্ব দেখাইয়া অক্ষয় বর্গ লাভ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে গড়মণ্ডলের অধিরাজী প্রাচীনস্মরণীয় রাণী দুর্গাবতী সর্বশ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। তুর্গবতী দুর্গার সাক্ষাৎ মূর্ত্তিবৎ এই বীররমণীর বীরত্বকাহিনী নানা গ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্কাপেক্ষা প্রামাণিক বিবরণ আকবর-নামার প্রাপ্ত হওয়া যায় (ইংরেজী অনুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৩-৩২৪)। সর্কাপেক্ষা বিদিত তাঁহার জীবনকালের মূল স্রুজ অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

নন্দাদার উত্তরভীরে ক্ষুদ্র “গঢ়া” রাজ্য অতি পূর্বে গোড়-রাজাদের সম্পত্তি ছিল। শেষ গোড়রাজা নাগদেবের কন্যা “রত্নাবলী”কে বিবাহ করিয়া সম্রাটমূল রাজপুত্র ক্ষত্রিয় “মাদব রায়” ৪১৫ বিক্রম সম্বতে (৩৫৮ খ্রিঃ) রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার অধস্তন ৪৮ পুরুষ রাজা সংগ্রামসাহি (খ্রিঃ ১৪৮০-১৫৩০) দ্বীয় পরাক্রমে ব্রহ্মদেশ জয় করিয়া ৫২টি পুত্রক রাজ্যের সমাবেশে বিশাল রাষ্ট্র গড়িয়া তুলেন। গঢ়ানগরীর উপকণ্ঠে “সংগ্রাম-সাগর” ও তাহার তটবর্তী ভৈরবের মন্দির তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কথিত আছে, উক্ত মন্দিরে জনৈক শৈব সন্ন্যাসী রাজ-শোণিতে শিবের অর্চনা মানস করিয়া গভীর নিশীথে সংগ্রাম সাহিকে মন্দিরমধ্যে আনয়নপূর্বক বলি দেওয়ার ব্যবস্থা করে, কিন্তু লুক্কায়িত শাণিত অস্ত্রে রাজাই কোশলে তাহাকে বলি দিতে সমর্থ হন এবং রুধিরতপ্ত দেবতার ত্রিমুখ হইতে বর ও নির্দেশ পাইয়া অপরাধের শক্তিদ্বারা রাজ্যবিস্তার করিয়া পরম সৌভাগ্য লাভ করেন। সংগ্রামসাহির প্রধান পুত্রবধু স্বনামধন্য রাণী দুর্গাবতী এবং তাঁহার সভাপত্তি বাঙালী কবি পদ্মনাভই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। দুর্গাবতীর আদেশে রচিত “দুর্গাবতীপ্রকাশ” নামক স্মৃতিগ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণের পর “গঢ়া” নগরীর উজ্জ্বল এবং কৃত্তিবর্ণ বর্ণনা (৮-১৮ পর্য্যন্ত) ১১টি শ্লোকে নিবদ্ধ আছে; তৎপর ১৯-২৫ শ্লোকে সংগ্রামসাহির কীর্ত্তি খ্যাপিত হইয়াছে। সংগ্রামের পুত্র দলপতি (১৫৩০-৪৮ খ্রিঃ) তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে আত্ম-মানিক ১৫৪৪ সনে “মহোবা” রাজ্য সসৈন্ত আক্রমণ করিয়া পরাজিত রাজা শালিবাহনের কন্যা দুর্গাবতীকে ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে বিবাহ করেন। তৎকালে দুর্গাবতীর অনামা সৌন্দর্যের

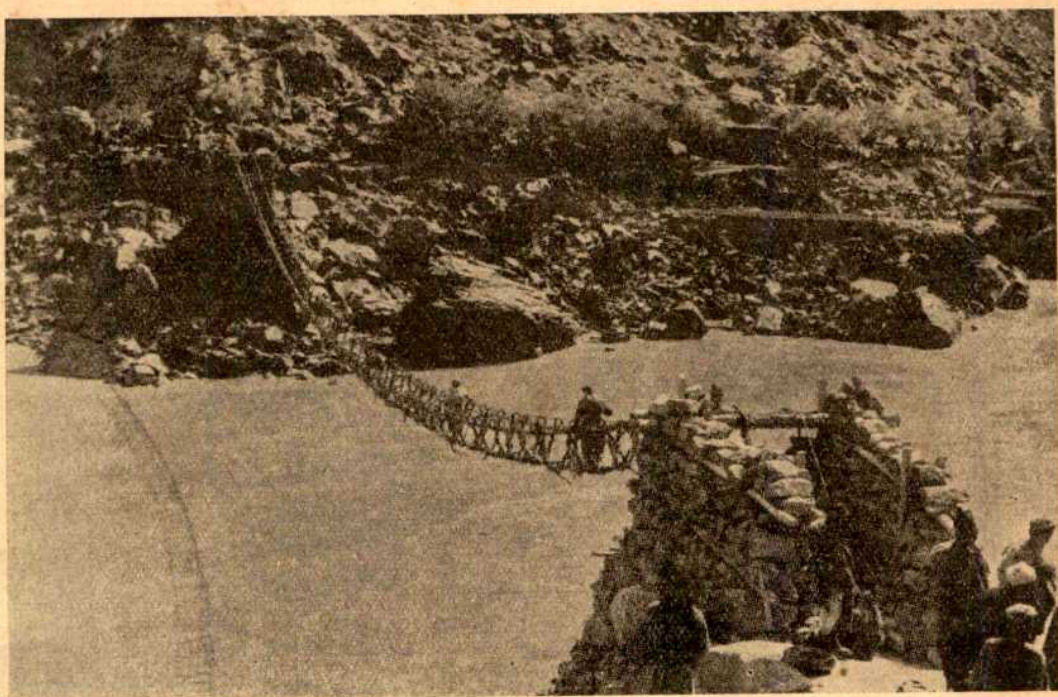
কথা উত্তর-ভারতের রাজমণ্ডলীতে প্রচারিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে রাজা দলপতির সৌন্দর্য্যবীৰ্য্য এবং অসাধারণ বপুঃসৌন্দর্যের কথা জাত হইয়া স্বয়ং দুর্গাবতীও তাঁহার অনুরাগী হইয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে চন্দেলবংশীয় রাজা শালিবাহন কুলমর্যাদায় নিকৃষ্ট গঢ়াধিপতির হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে অস্বীকার করেন। অগত্যা দুর্গাবতীরই ইচ্ছিতক্রমে দলপতি ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এই স্মরণীয় বিবাহ-ঘটনার অব্যবহিত পরে দলপতির মন্ত্রী “চুড়ামণি পাঠক” ৪ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ঐশ্বর্য্যমুচক “বাজপেয়” যজ্ঞ সম্পাদনপূর্বক “বাজপেয়ী” উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অধস্তন বংশধরগণ এই উপাধি দ্বারাই পরিচিত হন।

দুর্গাবতীর দাম্পত্যজীবন ৪ বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। দলপতির মৃত্যুকালে দুর্গাবতীর শিশুপুত্র বীরনারায়ণের বয়স মাত্র ৩ বৎসর ছিল।\* শিশু রাজপুত্রের প্রতিনিধিত্বপে রাণী দুর্গাবতী (১৫৪৮-৬৪ খ্রিঃ) ১৬ বৎসর অতি যোগ্যতার সহিত রাজত্ব করেন এবং তাঁহার খ্যাতিপ্রতিপত্তি ও বিপুল ঐশ্বর্যের কথা সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। এই ঐশ্বর্য্যই তাঁহার কালস্বরূপ হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বসচিব অধর কিছুকাল দিল্লীর রাজদরবারে দৌত্যকাৰ্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু মোগল সেনাপতি আসফ খাঁ কর্তৃক রাজ্য আক্রমণ তিনি প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। এই আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য যে কেবল বিজয় নহে, পরন্তু রাণীর সমস্ত কোষাগার লুণ্ঠনেচ্ছা তাহাতে সন্দেহ নাই।

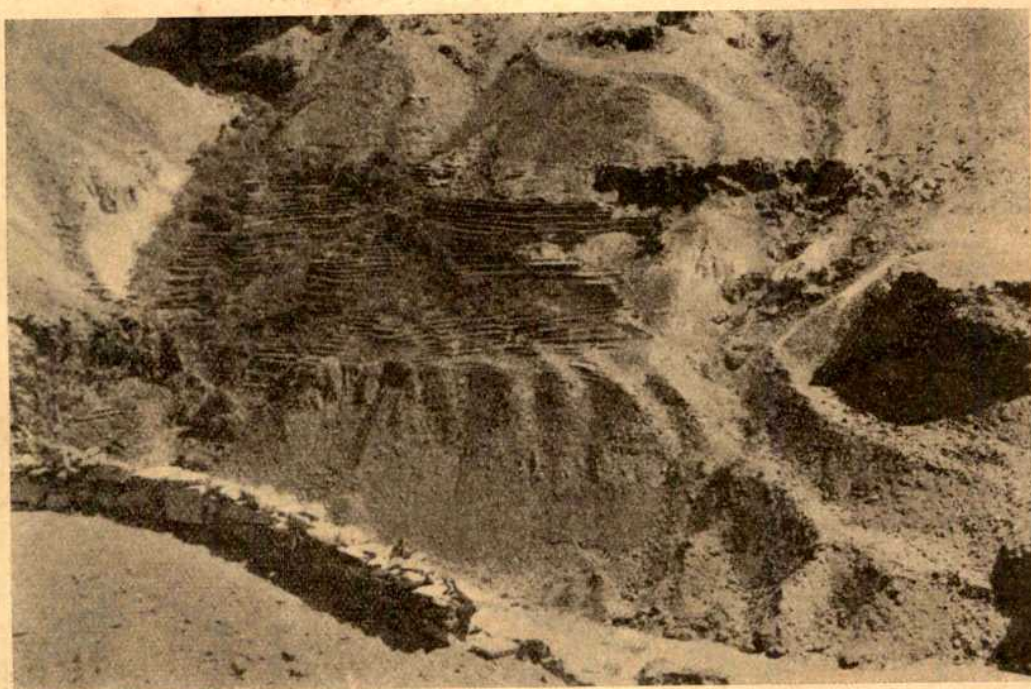
১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম ভাগে † আসফ খাঁ ৬০০০ অশ্ব-সৈন্য, ১২০০০ পদাতি সৈন্য ও কামানাদি সহ রাজ্য আক্র-

\* আকবর-নামায় দলপতির মৃত্যুসময়ে বীরনারায়ণের বয়স ৫ ছিল বলিয়া লিখিত আছে (পৃ. ৩২৬)। গঢ়ানগরীর নিকটে রামনগরে দলপতির ভ্রাতা এবং বীরনারায়ণের পরবর্ত্তী রাজা চন্দ্রসাহির প্রপৌত্র হৃদয়েশ্বরের পত্নী রাণী হৃদরী ১৭২৪ বিক্রমসম্বতে বিষ্ণুআদিপুত্র-দেবতার মন্দিরে যে প্রস্তরলিপি যোজনা করেন তাহার ১৮ শ্লোকে বীরনারায়ণের বয়স ৩ বলিয়া লিখিত আছে (*Asiatic Researches*, XV 1825. p. 439)। বিখ্যাত ঠগী কমিশনার স্লীমান সাহেবের গড়মণ্ডলের ইতিহাসে (*J. A. S. B.*, 1837, pp. 621-48) শেবোক্ত মতই সমর্থিত হইয়াছে, p. 627। স্লীমানের লেখাই এ স্থলে আমাদের প্রধান উপজীব্য।

† আসফ খাঁর আক্রমণের তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়—কোন মতে (*Elliot*, vol. v p. 169) ৯৬৮ হিজরি, অর্থাৎ ১৫৭১ হিজরি। আমরা আকবর-নামায় পাই, আকবরের “নবম” রাজ্যাব্দে (অর্থাৎ খ্রিঃ ১৩৩১-১৫৬৪ তারিখের পর) এবং ৯৭১ হিজরি সনে (অর্থাৎ ১৫৬৪ তারিখের পূর্বে) গড়মণ্ডল রাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল।

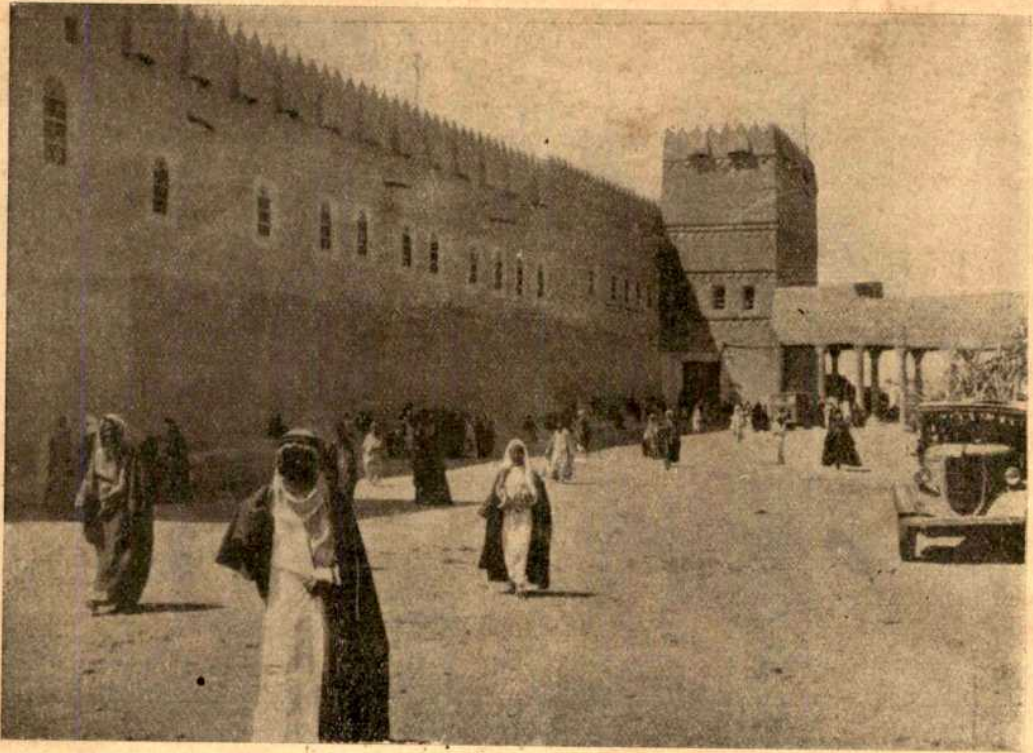


সিঙ্গু নদীর উপর একশত গজ দীর্ঘ দড়ির পোল

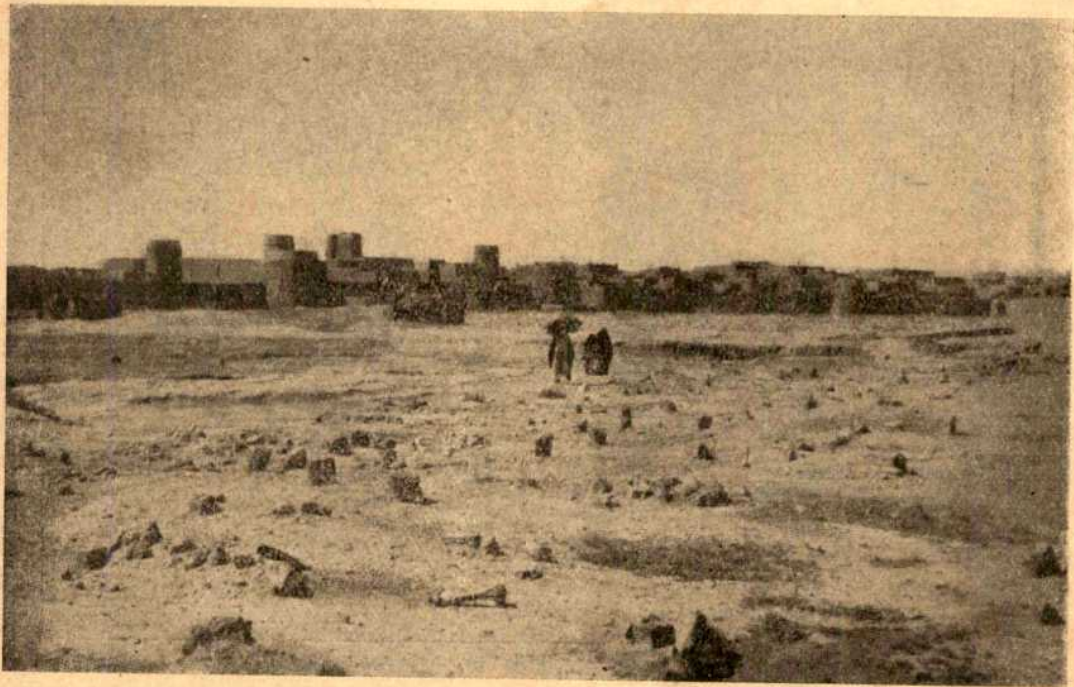


সিঙ্গুর তীরবর্তী পাহাড়ের উপর পল্লীগাম





সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে নৃপতি ইবন সৌদের রাজপ্রাসাদ



রিয়াদের প্রাকারাদি বেষ্টিত মরুপ্রান্তর

মণ করিলে রাণী স্বয়ং সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। প্রথম যুদ্ধে রাণীর সৈন্যদল পরাজিত হয় এবং ক্রমশঃ পশ্চাদপসরণ করিয়া তিনি এক সর্বাঙ্গ গিরিসঙ্কটে সৈন্যসমাবেশ করেন। এ স্থলে প্রথম দিনের যুদ্ধে মোগল সৈন্য শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে রাণী স্বয়ং গজারোহণে গিরিসঙ্কটের সমুখ ভাগে অগ্রবীরত্ব দেখাইতে গিয়া হঠাৎ চক্ষুতে বাণবিদ্ধ হন এবং রাজপুত্র বীরনারায়ণও আহত হইয়া শত্রুর অগোচরে স্বদূর চৌরাগড় দুর্গে অপসারিত হন। বাণটি স্বহস্তে তুলিতে গিয়া ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু মারাত্মক বেদনা অনুভব করিয়াও রাণী পশ্চাদপসরণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। কথিত আছে, গিরিসঙ্কটের পশ্চাতে একটি শুষ্কপ্রায় গিরিনদী ভাগ্যবিপর্যয়ে হঠাৎ অল্পক্ষণ মধ্যে প্রবল স্রোতে ভরিয়া গিয়া সৈন্যদের পশ্চাদপসরণ-পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। মাছত পুনঃ পুনঃ রাণীকে হস্তিপৃষ্ঠে নদী পার হইয়া যাইতে অস্বরোধ করে, কিন্তু তিনি যত্নপূর্ণ করিয়া সমুখযুদ্ধ পরিত্যাগ করেন নাই। অবশেষে অপর একটি বাণ আসিয়া যখন তাঁহার কণ্ঠদেশে বিদ্ধ করিল এবং শত্রুসৈন্য আসিয়া তাঁহাকে প্রায় মিরিয়া ফেলিল, তখন মাছতের একটি ছুরিকা লইয়া তিনি নিজ বক্ষোদেশে বসাইয়া দেন। তাঁহার অস্ত্রোষ্টিভূত্যা পরে এই যুদ্ধক্ষেত্রেই সম্পাদিত হইয়াছিল এবং তাঁহার আশানোপরি এখনও পথচারিগণ ক্ষটিকের মালা স্থাপন করিয়া এই বীররমণীর স্মৃতিপূজা করিয়া থাকে। তাঁহার আশানের পার্শ্বে দুইটি প্রস্তরখণ্ড দৃষ্ট হয়। সাধারণ লোকের ধারণা যে এই যুদ্ধকালীন রাণীর দুইটি যুদ্ধপট প্রস্তরে পরিণত হইয়া আছে এবং গভীর নিম্নে এখনও নাকি এই পটহের ধ্বনি পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা শুনিতে পায়।

বিজয়ী আসফ খাঁ অবিলম্বে চৌরাগড় অবরোধ করিলে বীরনারায়ণ নিহত হন এবং রাজাস্তঃপুরিকারা জ্বরব্রত অবলম্বন করিয়া ভয়ানক হয়। ভয়ানকপের মধ্যে আসফ খাঁ দুইটি বালিকাকে জীবিত পাইয়াছিলেন, রাণীর এক ভগিনী এবং বীরনারায়ণের এক বাগদত্তা পত্নী। যে বিপুল ঐশ্বর্য আসফ খাঁর করতলগত হয়, তন্মধ্যে এক শত কলস স্বর্ণমুদ্রা এবং রাণীর গীলখানার অবশিষ্ট প্রায় ১০০০ হস্তী উল্লেখযোগ্য। গড়মণ্ডলের রাণীর গুপ্তধন আবিষ্কারের লোভ এখনও নিঃশেষ হয় নাই, সাধারণের বিশ্বাস রাণী পূর্বেই ধনরত্নের বিশিষ্টাংশ সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

দুর্গাবতীর স্মৃতিরক্ষা : জব্বলপুরের উপকণ্ঠে “রাণীতাল” নামক বিশাল দীর্ঘিকা রাণী দুর্গাবতীর নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। রাণীর এক দাসীর অস্বরোধক্রমে দীর্ঘিকা খননকারীরা প্রত্যহ কার্যশেষে প্রত্যেকে এক এক কোদাল মাটি স্থানবিশেষ হইতে তুলিয়া লয় এবং তাহাতেই অপর একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘি খনিত হইয়া যায়, নাম “চেরীতাল”। দুর্গাবতী ঠিক ৪০০ বৎসর পূর্বে—১৫৪৮ সনে—স্বহস্তে রাজ্যভার

এহণ করিয়াছিলেন। জব্বলপুরের দুর্গাবতীর রাজ্যপ্রাপ্তির চারিশতাব্দী পূরণ উপলক্ষ্যে এ বৎসর একটি অনুষ্ঠান কল্পিত হইলে তাহা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়রমণীর স্মৃতিপূজার স্বত্ত্বাচন-রূপে স্বাধীন ভারতের মর্যাদাজ্ঞান উদ্ধৃত করিবে, এবং ১৯৬৪ সনে সমারোহে এই পূজার সমাপ্তি দ্বারা একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সমুচিত গৌরব লোকসমক্ষে কীর্তিত হইতে পারে। আশা করি এ বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

দুর্গাবতীর বিজ্ঞোৎসাহিতা : মধ্যভারতের নৃপসমূহ তৎকালে সংস্কৃতজ্ঞ-পণ্ডিতগণের আশ্রয়স্থল ছিলেন। মিথিলায় প্রবাদ আছে, দারভাঙ্গা রাজের আদিপুরুষ “মহেশ ঠাকুর” চারি সহোদরের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। স্ত্রোষ্ঠ সহোদর “মহাদেব” (ঠাক নাম “ধেবঠাকুর”) গড়মণ্ডলের অধিপতির আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, তৎকনিষ্ঠ বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা ভগ্নরথ (=মেঘঠাকুর) “বস্তুরা”ধিপতির এবং তৎকনিষ্ঠ দামোদর “রতনপুর”-রাজের আশ্রয়ে যান (S. N. Sinha—Hist. of Tirhut, p. 215)। ধেবঠাকুরের পৃষ্ঠপোষক নিঃসন্দেহ সংগ্রাম-সাহি ছিলেন। কথিত আছে, মহেশ ঠাকুরের বিধাত শিষ্য “রঘুনন্দনদাস” (যাঁহার গুরুদক্ষিণা হইতে দারভাঙ্গার জমিদারী বৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ) রাণী দুর্গাবতীর ব্যবহারে অসমুদ্র হইয়া বস্তুর-রাজের প্রসাদ-লব্ধ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দুর্গাবতীর রাজধানীতে যাইয়া প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। আমাদের অহমান হয় রঘুনন্দনের সহিত দুর্গাবতীর তৎকালীন সভাপণ্ডিতের বিচারিয়য়ে সংঘর্ষ হইয়াছিল এবং বিচার-ফল রঘুনন্দনের অসমুদ্র হয় নাই। রাণী দুর্গাবতীর এই সভাপণ্ডিত তৎকালে ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ মহাভাষ্যপক ছিলেন এবং রাণীর জায় তাঁহারও যশ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই ভারতবিক্রম মহাপণ্ডিতের সমগ্র কীর্তিকথা এবং তদ্রূপিত গ্রন্থাক্ষর সমাক্ষর পরিচয়াদি একটি প্রবন্ধে বিবৃত করা সম্ভব নহে। আমরা অতি সংক্ষেপে তাঁহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

দুর্গাবতী-প্রকাশ : “গঢ়া” নগরীর অধীশ্বরী রাণী দুর্গাবতীর “নির্দেশে” পদ্মনাভ মিশ্র সাত খণ্ডে বিভক্ত এক রিরাট স্মৃতিগ্রন্থের রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম খণ্ড “সময়ালোক” মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে; লঙ্কনে, বিকানীরে এবং কলিকাতায় প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। শেখোজ প্রতিলিপি হইতে পুস্পিকাট সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল :—

“ইতি শ্রীমদ্রিষ্য-গদ্যপদ্যহৃদ্যবিদ্য-বিদ্বৎ শ্রীমানন্দ সন্দোহ—

† এ সম্বন্ধে মৈথিল পণ্ডিতদের মধ্যে নিম্নলিখিত মনোহর শ্লোকটি প্রচারিত আছে,—

প্রাতঃভাষ্যতি পদ্মিনীপরিবৃত্তে বিধু তমঃশঙ্করা  
দিকচক্রং চকিতং মুখৈব চতুরং চক্ৰি স্বমুখীকসে।

শ্রীমদ্বস্তরভূমহেশ্বরবদনাজোজপ্রদোদয়ঃ

আয়াতে রঘুনন্দনে গজঘটাঘটারবঃ জয়তে।

কন্দযশোরবিন্দুসন্দর্ভ-সম্ভাবিতনিবিলভুবনকাদম্বর্যাঃ স্বযাক-  
করনিকরপ্রৌঢ়তরপ্রতাপপ্রভাবপটিম-পাটিতাতিবিকট প্রতীপ-  
রাজোরণ্টকপাটখাটীয়া নিরবধি স্তব্ধভারবিতরণ কৃতার্থী  
কৃতার্থি-সার্থীয়াঃ মহারাজাধিরাজ-দলপতিপ্রেষতাঃ ত্রিহুগা-  
বত্যাঃ প্রকাশে ত্রিংশসিদ্ধবজ্রবাহিলাসোদয়দূরীকৃতনিঃশেষ-  
দেশপ্রভরবিভাধি ভোমাজ্ঞানপঙ্ক-পরমপ্রতিষ্ঠিত-সমিশ্রত্রীবলভ-  
জ্ঞানজ-বিজয়ত্রিগর্ভসংভব সকল শাস্ত্রারবিন্দপ্রদ্যোতনভট্টাচার্য্য-  
মিশ্রত্রিপদ্মনাভকৃতে সময়ালোকে প্রথমঃ প্রচারঃ পূর্ণঃ ॥ সংবৎ  
১৬২১ সময়ে পৌষষুদি ২ ভোমে ॥” (২৩১-২ পত্র)

অর্থাৎ—হুগাবতীর যশোগান তৎকালে সমগ্র পৃথিবীর  
ভারতীকে সমুদ্র করিয়াছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার প্রতাপ রবি-  
কিরণ সদৃশ ছিল এবং তাঁহার স্বর্ণদানের সীমা ছিল না।  
এছকার পদ্মনাভ মিশ্র সর্বশাস্ত্রে প্রবীণ ছিলেন বলিয়া তাঁহার  
বিচিত্র উপাধি ছিল “সকলশাস্ত্রারবিন্দপ্রদ্যোতনভট্টাচার্য্য”।  
তাঁহার পিতা বলভদ্র ও মাতা বিজয়ত্রী—বলভদ্র গঙ্গাভীরে  
বসিয়া সকল দেশের ছাত্র পড়াইয়া পরমপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন।  
প্রতিলিপির লিপিকাল ১৬২১ বিক্রমসংবৎ (৫ ডিসেম্বর ১৫৬৪  
মঙ্গলবার) হুগাবতীর স্বর্ণপ্রাপ্তির মাত্র কয়েক মাস পরবর্তী।  
লেখক কানীওয়ানী কায়স্থ-ত্রীবাহুদেব—বড় অক্ষরে অত্যুৎকৃষ্ট  
লেখা। গ্রন্থারম্ভে পদ্মনাভ ৫৬ শ্লোকে মঙ্গলাচরণ, গঢ়ানগরীর  
বর্ণনা, সংগ্রামসাহি প্রভৃতির স্তুতি এবং গ্রন্থের বিবরণ  
দিয়াছেন। ৩২-৩৭ শ্লোকে ত্রীবীরসাহি নৃপতির যুদ্ধযাত্রাদির  
যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় তাহাতে বুঝা যায়, গ্রন্থরচনাকালে তাঁহার  
পূর্ণ যৌবন, অর্থাৎ অল্পমান হয় আসক খাঁর আক্রমণের অল্প  
পূর্বে ১৫৬৩ সনে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ৩৮-৪৬ শ্লোকে  
রাজমাতা “সাম্রাজ্যলক্ষ্মী”ধরুণা হুগাবতীর বর্ণনা অতীব  
কবিত্বপূর্ণ ও মনোহর। একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

সংগ্রামবিজয়ং বীক্ষ্য যত্না দলপতিজিয়াঃ।

মত্তমুগমুগান্ত্যং হুগায়াঃ সমরে জয়ম্ ॥৪৬

ইহা নিঃসন্দেহ যে হুগাবতীর শৌচনীর পরাভবে এই  
বিরাট গ্রন্থের রচনা বন্ধ হইয়া যায়—প্রথম খণ্ডের প্রথমংশ  
মাত্র রচনা করিয়া পদ্মনাভকে আশ্রয়ান্তর সন্ধানে বহির্গত  
হইতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু অতি অল্পসময় মধ্যেই  
গ্রন্থের রচিত অংশ কানী অঞ্চলে প্রচার লাভ করিয়াছিল।  
কানীর তৎকালীন পণ্ডিতদের নেতৃস্থানীয় সুবিখ্যাত নারায়ণ  
ভট্টের পুত্র শঙ্কর ভট্ট “দৈতনির্ঘণ” গ্রন্থে হুগাবতী-প্রকাশের  
উল্লেখ করিয়াছেন (Annals B.C.R.I., III, p. 71)।

হিন্দুর জাতীয়তাবোধ : হুগাবতীকে অবলম্বন করিয়া হিন্দুর  
জাতীয়ভাব কিরূপে মধ্য-ভারতে উদ্ভূত হইয়াছিল গঢ়ানগরী  
বর্ণনার দুইটি শ্লোকে পদ্মনাভ তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন :—

ভাষ্যপ্রভেব কমলোল্লসনৈকভুলিঃ

ইন্দোঃ কলেব কুমুদং পরিণীলয়ন্তী।

যুদ্ধিং গতে যবনবারিনির্ধো ধরায়্যং

শাখেব যাক্ষয়দট্য ভুভা বিভাতি ॥(৯)

(যে গঢ়ানগরী স্বর্ঘ্যরশ্মির দ্বারা কমলোল্লসনের অর্থাৎ লক্ষ্মী-  
বস্ত্রের স্থল, চন্দ্রকলার দ্বারা যাহা কুমুদের অর্থাৎ পৃথিবীর  
আনন্দের বিকাশক, ধরাতলে যবন-সমুদ্রের বুদ্ধিপ্রাপ্তিতে  
যাহা মাদ্রিয়া অক্ষয়বটের পল্লবশাখার দ্বারা বিরাজমান)।

যাং হৈন্দবীসৃষ্টিরভূৎ প্রপন্ন তুরুক্ষভীতাবনিরক্ষণায়।

তন্ত্রা খিলং শঙ্করমুষ্টিমধ্যাং রাহোভিন্না চাক্ষমসীকলেব ॥(১০)  
(চন্দ্রকলা রাহুর ভয়ে যেমন অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিয়া  
শিবের মাথায় আশ্রয় নেয় তেমনি তুরুক্ষভীত পৃথিবীকে রক্ষার  
জন্ত “হৈন্দবী সৃষ্টি” গঢ়ানগরীতে আশ্রয় লইয়াছিল)।

হুগাবতীর পরাজয়ে কেবল একটি রাজ্যের স্বাধীনতা মাত্র  
বিনষ্ট হয় নই, হিন্দুজাতির রাষ্ট্রচেতনার একটি উল্লেখযোগ্য  
উন্মেষ অক্ষুরে বিনষ্ট হইয়াছিল। পুরাকালে রাজারা অহমেধ  
যজ্ঞ করিয়া রাষ্ট্রসমৃদ্ধি সূচনা করিতেন; হুগাবতীর পরিণয়ের  
পর “মহারাজাধিরাজ” দলপতি নর্যদাতীয়ে রাজমন্ত্রীদ্বারা  
সমারোহে রাষ্ট্রসমৃদ্ধিসূচক “বাজপেয়” যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া  
ছিলেন (J. A. S. B. 1837, p. 630)।

জগদগুরু বলভদ্র মিশ্র : পদ্মনাভের পিতা একজন  
অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন : হুগাবতী প্রকাশের পিতৃবন্দনা  
শ্লোকটি উল্লেখযোগ্য :—

তর্কাস্তোদ্ধার্কভাসো নিরুপমকবিতাকৈরবেন্দুপ্রকাশঃ

সাংখ্যাসংখ্যাতসংখ্যাঃ কণ্ঠহুগুমতপ্রাক্সলোদোষভাজঃ।

বেদান্তপ্রান্তবাচঃ কণিষ্ঠগণিতবিদঃ কর্মকাণ্ডপ্রবীণাঃ

শিক্ষা যেষামনেকে বয়মিহ মনসা তান্ গুরুগানমামঃ ॥(৫০)

(অর্থাৎ বলভদ্রের অধ্যাপনার বিষয় ছিল তর্কশাস্ত্র,  
সাহিত্য, সাংখ্য, বৈশেষিক, বেদান্ত, মহাভাষ্য এবং কর্মকাণ্ড)।

খণ্ডনপরাক্রম গ্রন্থে পদ্মনাভ আত্মপরিচয় দিয়াছেন  
“ত্রিভুগদগুরু-মিশ্র-বলভদ্রাশ্রজ্ঞ”। বলভদ্রের অধ্যাপকজীবনের  
পরম প্রতিষ্ঠাসূচক “জগদগুরু” বিশেষণ পদটি প্রণিধানযোগ্য।  
বলভদ্রের এক ছাত্র “ভাস্কর” গুণরত্নাবলী নামক গ্রন্থের শেষে  
চারিশ্লোকে গুরুস্তব করিয়াছেন। বলভদ্রের জীবদ্দশায়  
রচিত এই শব্দের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

যেষাং নিভান্তং রসনাগ্ররঙ্গে পরম্বতী তাণ্ডবমাতনোতি।

সদর্পবিদ্বজ্জনবন্দন্যান্ নমাম্যহং তান্ বলভদ্রমিশ্রান্ ॥

হুগাবতী প্রকাশের উদ্ধৃত অংশের ভাষা হইতে মনে হয়  
উক্ত গ্রন্থরচনাকালে বলভদ্র জীবিত ছিলেন। বস্তুতঃ আইন্-  
ই-আকবরী গ্রন্থে (Blochmann, vol. 1, pp. 537-47)  
আকবরের রাজত্বকালীন ভারতবর্ষের প্রধান ৩২ জন হিন্দু  
পণ্ডিতের মধ্যে বলভদ্র মিশ্রের নাম পাওয়া যায় (I. H. Q.  
xiii, p. 35)। তালিকাটি আকবরের অভিষেককালে  
রচিত হইয়াছিল বলিয়া অস্বাভাবিক কারণ আছে।



তৎকালে বলভদ্র অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহার ছাত্র-রচিত গুণরত্নাবলী গ্রন্থের লিপিকানই ১৫৭০ সম্বৎ (১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দ)। বলভদ্রের পাণ্ডিত্যের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার রচিত গ্রন্থমালার একটি তালিকামাত্র এখানে সঙ্কলিত হইল :— তর্কভাষার টীকা, তর্কিকরক্ষার টীকা, প্রমাণ-মঞ্জরী টীকা, সপ্তপদার্থী টীকা, দ্রব্যাকিরণাবলীপ্রকাশটীকা (বলভদ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা) এবং বৌদ্ধাধিকারপ্রকাশটীকা (অনাবিষ্কৃত, পদ্মনাভের সেতুটীকায় পৃ. ৩৭৮ উদ্ধৃত)। এই সকল গ্রন্থে পাওয়া যায় বলভদ্রের পিতার নাম ছিল বিষ্ণু-দাস মিশ্র ত্রিপাঠী এবং মাতার নাম মাদ্বী (মাদবী নহে)। সপ্তপদার্থী টীকা বলভদ্র সন্দর্ভের প্রারম্ভে (এই টীকা মুদ্রিত হইয়াছে) তিনি মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন—“মদ্বা চুড়িপদম্বনং”; ইহার সহিত পূর্বোক্ত দুর্গাবতীপ্রকাশের পুষ্পিকায় “ত্রিদেশ-সিদ্ধবন্ধুরবাগবিনাসোদয়—” বিশেষণ পদ সংযুক্ত করিলে সন্দেহ থাকে না যে তিনি কাশীবাসী ছিলেন।

পদ্মনাভের গ্রন্থাবলী :—পদ্মনাভ তাঁহার বিচিত্র উপাধি সার্থক করিয়া নানা শাস্ত্রে বহুতর গ্রন্থ রচনা করেন। ভারত-বর্ষের সর্বত্র তাঁহার গ্রন্থের প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শাস্ত্রানুসারে বিভাগ করিয়া তাঁহার গ্রন্থমালার তালিকা প্রদত্ত হইল।

(১) কাব্য বীরভদ্রচম্পু—রাণী দুর্গাবতীর স্বর্ণপ্রাপ্তির পর পদ্মনাভ বিপন্ন হইয়া অস্ত্র রাজ্যের আশ্রয়ে গিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার নূতন আশ্রয়দাতা বৃন্দেনবংশের বশেলবংশীয় মহারাজাধিরাজ রামচন্দ্রের পুত্র যুবরাজ বীরভদ্রদেবের স্তুতি-স্বরূপ এই চম্পুকাব্য ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও কাব্যাদি রচনা করিয়াছিলেন যাহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। শরদাগমে তিনি স্বরচিত বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(২) অলঙ্কার :—চন্দ্রালোক টীকা শরদাগম, ইহাও বীর-ভদ্রের আদেশে রচিত (কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে)। সেতু-টীকার একস্থলে (পৃ. ৮২) তিনি স্বরচিত আরও পাঁচটি অলঙ্কার গ্রন্থের নাম করিয়াছেন—অলঙ্কারভাস্কর, কাব্যপ্রকাশ-প্রকাশ, কাব্যপ্রকাশখণ্ডন, একাবলীবিবরণ ও মনোরমা—সবই বিলুপ্ত। কমলাকরভট্ট রচিত কাব্যপ্রকাশটীকায় (পৃ. ৩১ ও ৩৩, কানী সং) পদ্মনাভের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৩) স্মৃতি দুর্গাবতীপ্রকাশ ও প্রায়শ্চিত্তপ্রকাশ। শেখোজ গ্রন্থের বঙ্গাক্ষরে প্রতিলিপি রাণাঘাটের এক ব্রাহ্মণ-গৃহে আবিষ্কৃত হইয়াছিল (L. 2121 পত্রসংখ্যা ৮৪) এখন সব নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

(৪) বেদান্ত : খণ্ডন পন্নাক্রম অর্থাৎ খণ্ডন খণ্ড খণ্ডের টীকা, কলিকাতায় এবং আলোয়ারে প্রতিলিপি আছে।

(৫) তায়বৈশেষিক : তৎকালে নব্যতায়ই প্রতিভাবিনাসের

লীলাস্থল ছিল এবং পদ্মনাভ ইহার বহুবিধ টীকা রচনা করিয়া তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। এযাবৎ আবিষ্কৃত গ্রন্থরাজির নাম—কণাদরহস্য (স্বরচিত কারিকার ব্যাখ্যা, কারিকাংশ অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে), কিরণাবলীভাস্কর (দ্রব্যখণ্ড মুদ্রিত), বর্দ্ধমানেন্দু (ছুটি—একটি দ্রব্যপ্রকাশের টীকা, অপরটি তায়নিবন্ধপ্রকাশের টীকা), সেতু (মুদ্রিত, বৈশেষিক ভাষ্য টীকা), তায়কন্দলী টীকা, তায়লীলাবতী টীকা, মণিপরীক্ষা (প্রত্যক্ষ ও অহুমান খণ্ড) এবং পক্ষধরোদ্ধার (প্রত্যক্ষ ও অহুমান খণ্ড)। এতদ্ভিন্ন শব্দপরীক্ষা, প্রত্যক্ষখণ্ড-ভূষণবিভাস (কণাদরহস্যে উদ্ধৃত) প্রভৃতি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সকল গ্রন্থ আলোচনা করিলে সন্দেহ থাকে না যে তিনি তাঁহার সময়ে পণ্ডিত-সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে চতুর্থ বিভাগে যে ১৫ জন হিন্দুর নাম আছে তন্মধ্যে বলভদ্র মিশ্র বর্ষ, সুবিখ্যাত বিজ্ঞান-নিবাস নবম এবং জ্যোতির্বিদ নাম শুধু “ভট্টাচার্য্য”—এই ভট্টাচার্য্য পদ্মনাভ হইতে অস্তিত্ব বলিয়া আমরা অহুমান করি। দুর্গাবতীর তায় দুর্গাবতীর সভাপণ্ডিতের নামও দিল্লীতে কীর্তিত হওয়ার কথা। পদ্মনাভও বহুস্থলে নিজেকে শুধু “ভট্টাচার্য্য” বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। যথা, শরদাগমের প্রারম্ভে :—

ক্রিয়তে তত্ত নিদেশাং চন্দ্রালোকে প্রকাশোহয়ম্।

শরদাগম ইতি বিদিতো “ভট্টাচার্য্যোণ” যত্নতঃ ॥

(৭ম শ্লোক, পৃ. ২)

অতঃপাশ্চ যথা :—

যতাজ্জয়া বিধন্তে “ভট্টাচার্য্যঃ” শুভাং টীকাং।

ইরিরিহ কুর্মাভতরঃ শম্ভাং দিশতু প্রভোক্তব্যম্ ॥

(৩য় পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৯)

দিল্লীর রাজদরবারে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে পিতা-পুত্রের উভয়ের নামোল্লেখ একটা অসামান্য ঘটনা বটে।

পদ্মনাভ বাঙালী ছিলেন : তাঁহার গ্রন্থমধ্যে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তদ্বারা প্রমাণ হয় যে, পদ্মনাভ বাঙালী ছিলেন। সংক্ষেপে কারণগুলি উল্লিখিত হইল।

(১) পদ্মনাভ বহুস্থলে (সেতু, পৃ. ৪৩, ৮০) লিখিয়াছেন তাঁহার পিতার গুরু ছিলেন “প্রগল্ভ ভট্টাচার্য্য।” বলভদ্র স্বয়ং দ্রব্যপ্রকাশের টীকায় লিখিয়াছেন :—

“মদ্বা তর্কবিচারচক্রমণঃ ত্রীমংপ্রগল্ভভাণ্ডুরোঃ

সিদ্ধান্তং পরমং মূনেরপি মনঃ সৌধ্যায় যঃ কল্পতে।

(২য় শ্লোক)

এই প্রগল্ভ বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন “লাহিড়ী” বংশীয় নরপতি মহামন্ত্রের পুত্র ছিলেন, যদিও তিনি কাশীতে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিয়াছিলেন (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৭, পৃ. ৬২-৭৭; ১৩৫৩, পৃ. ১০-১১)। তাঁহার বংশধর উত্তর ও পূর্ববঙ্গে

সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত অবস্থায় এখনও বিজ্ঞান আছেন। পদ্মনাভ বহু গ্রন্থে প্রগল্ভ-মতের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত স্পষ্টভাবে সূচনা করিয়াছেন—“ইহা স্থল উদাহরণ-রূপ উদ্ধৃত হইল।

“তুষ্ণোস্ত তেন স কৃতী স্মৃকৃতী প্রগল্ভ।”

(খণ্ডনপরাক্রম, ১৫৯২ পত্র)

“অত্রক্রমঃ...ইতি স্বকীয়ং প্রগল্ভভক্তিনিবন্ধনং পস্থানম্।”

(পক্ষধরোক্তার, অনুমান, ৭৪১১ পত্র)

প্রগল্ভ পক্ষধরমিশ্রের সমকালীন কিম্বা কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী। তখন গোড়-মিথিলার মধ্যে নব্যভাষ্যের চর্চায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। কোন মৈথিল পণ্ডিতের পক্ষে, বিশেষতঃ বলভদ্র পদ্মনাভের স্থায় প্রতিভাশালী অতিপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে, সে যুগের গোড়ীয় পণ্ডিতের শিরোমণি অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সুতরাং পদ্মনাভ মৈথিল ছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে (*Hist. of Trihut*, p. 155) তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে।

(২) বর্দ্ধমানেন্দু গ্রন্থে (দ্রব্যপ্রকাশ টীকায়) একস্থলে (২১১ পত্রে) “অন্যং প্রথম পরম গুরবঃ শ্রীশ্রীমানভট্টাচার্য্যাস্ত” বলিয়া এক ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত হইয়াছে। অর্থাৎ বলভদ্রের প্রথম গুরু ছিলেন শ্রীমান। প্রগল্ভের স্থায় শ্রীমানও বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং তৎকালীন একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। (*Introduction to Purusottamas Paribhasa vritti etc.*, p. 16-18)। বলভদ্রও সুতরাং গোড়দেশীয় এবং সম্ভবতঃ বারেন্দ্র শ্রেণীয় ছিলেন।

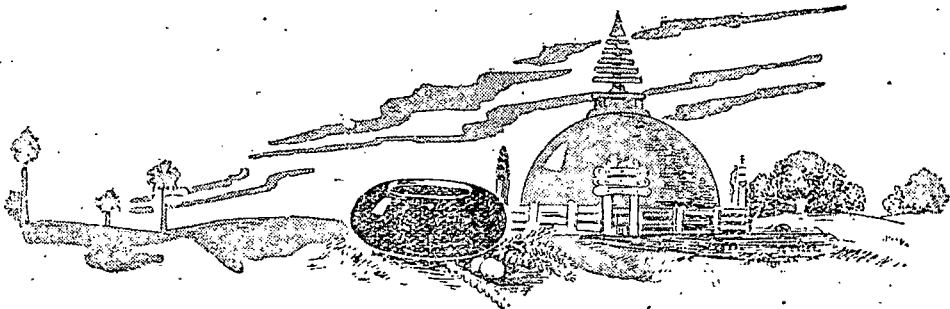
(৩) বর্দ্ধমানেন্দু গ্রন্থে “তৈরভুক্তান্ত” বলিয়া একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত এবং খণ্ডিত হইয়াছে। কণাদরহস্যে বৈশিষ্ট্য-পদার্থ প্রকরণে স্বরূপ সংবন্ধের লক্ষণ বিচারে স্পষ্টতর বচন দৃষ্ট হয়। “নাভঃ, তৈরভুক্তমতাস্থগ্রহোপি গোড়ীয় রাক্ষাস্ত বিরোধঃ।\*\*\* অত্র তৈরভুক্তাঃ...ইতি পক্ষধর পক্ষাবলম্বিনঃ সর্কেপি সর্কেকবাক্যাত্মা বদন্তি। অত্র শ্রীপ্রগল্ভমুখারবিন্দ-নির্গলদমলবচন মকরন্দ সংদর্ভোপজীবিনাং ধ্বনিঃ...” (১৫১১ পত্র) তৈরভুক্ত অর্থাৎ মৈথিল মতের খণ্ডন এবং গোড়ীয়-

রাক্ষাস্তের প্রতি এইরূপ স্থূললিত ভাষায় পক্ষপাত প্রদর্শন কোন মৈথিলের লেখনী হইতে কল্পিত কালেও বাহির হইবে না।

(৪) পক্ষধরোক্তারের অনুমানখণ্ডের অপর একটি বচন হইতেও পদ্মনাভের গোড়ীয়ত্ব সূচিত হয় :—“এবং চ মিলিত-ঘটদ্বয়ং ন পদার্থান্তরং কিন্তু ঘটাবেব, তত্র চ বাবদ্বিশেষাভাবঃ প্রত্যেকায়ত্ত্বিধর্ম্মাদিত্যি সার্কভৌমভাবিতং নামানুসঙ্গপভাবিত-মেব।” (২৮১১ পত্র)। বিখ্যাত গোড়ীয় গ্রন্থকার বাসুদেব সার্কভৌমের প্রতি এতটা মতানুসৃত্য ঐ যুগে কোন মৈথিলের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

(৫) বাচস্পতিমিশ্রের তীর্থচিন্তামণিগ্রন্থের অন্তর্গত “গয়াপ্রকাশ” প্রকরণের একটি প্রতিলিপি কলিকাতা রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। গ্রন্থশেষে (২৫১২ পত্রে) লিপিকারের পরিচয় এই :—“ত্রিযুতশ্রীবলভদ্রমিশ্রাণাং স্বকীয়পুস্তকমিদম্। লিখিতং ত্রিযুতশ্রীচক্রবর্ত্তিনা শ্রীবলভদ্র-মিশ্রাণামর্থে প্রয়াগমন্ডলে ॥” এই বলভদ্র পদ্মনাভের পিতা হওয়াই সম্ভব এবং তদীয় শিষ্য যদুনাথ চক্রবর্ত্তী “মন্ত্ররত্নাকর” ও “আগমকল্পবল্লী” নামক তান্ত্রিকনিবন্ধের রচয়িতা হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থের বাংলার বাহিরে লিখিত হইয়াছিল বুঝা যায়, নতুবা বঙ্গাক্ষরের পরিবর্তে নাগরাক্ষর ও কান্নীরাক্ষর অনুলিপি দেখা যাইত না (*Tantra MSS.*, R. A. S. B., I, pp. 347-53, 393-95)। মন্ত্ররত্নাকরে যে সকল গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তন্মধ্যে আগমকল্পক্রম ও সুন্দরীরহস্যবৃত্তি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের রচনা। এতদ্বারা যদুনাথ এবং বলভদ্রও বারেন্দ্র শ্রেণীয় ছিলেন বলিয়া অনুমান করা চলে ॥

বাঙ্গলার বাহিরে বাঙালী প্রতিভার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু জগদগুরু বলভদ্র মিশ্র ও তৎপুত্র পদ্মনাভের গ্রন্থমালা একসময়ে ভারতের সর্বত্র যেরূপ আদর লাভ করিয়াছিল তাহার তুলনা নাই। অথচ আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে এই অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন বিদ্বৎগোষ্ঠীকে বাঙালী বলিয়াই জানা যায় নাই; সমুচিত স্মৃতিপূজা হওয়া ত দূরের কথা।



## বিমান ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

একদিন কাগজে আলাস্কা আমেরিকার যুদ্ধবিষয়ক গবেষণার কথা পড়িলাম। আগামী যুদ্ধে আমেরিকা যে উত্তরমেরুর পথে ইউরোপ হইতে দ্রুত আক্রান্ত হইবে সে বিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ। উত্তরমেরুতেই রাশিয়া ও আমেরিকার সংযোগ-স্থল। কত নীচে কিরূপ যুদ্ধ চালাইয়া যায় ইহাই গবেষণার বিষয়। গবেষণার ফলে নাকি দেখা গিয়াছে যে শুষ্ক ডিগ্রী পর্যন্ত তাপে পূর্ণোত্তম যুদ্ধ চালাইয়া যায়। শূন্যের নীচে যখন তাপ নামিতে থাকে তখন প্রতি ডিগ্রীতে মানুষের দুই শতাংশ করিয়া পটুতা হানি হয়। এই হারে তাপ শূন্যের ৫০ ডিগ্রী নীচে নামিলে মানুষ একদম অকর্মণ্য হইবার কথা। কিন্তু শূন্যের ৬০ ডিগ্রী নীচে পর্যন্তও মানুষ কোনমতে যুদ্ধ চালাইতে পারে। তাপ তারও নীচে নামিলে মানুষের পক্ষে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ানও অসম্ভব হয়। সে তাপে নিঃশ্বাস লইলে ফুসফুস জমিয়া যায়। কাজেই তখন যুদ্ধ অসম্ভব।

সেদিন আর, বি, কুড়ির (R. B. Curry) আপিসে যাই। ইনি পারিবারিক ভাতার (Family Allowance) ডিরেক্টর। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এ দেশে পারিবারিক ভাতা আইন পাস হয়। এই আইন অনুসারে এ দেশের প্রত্যেক শিশু ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিম্নলিখিত হারে রুতি পায়।

| বয়স       | মাসিক হার |
|------------|-----------|
| ৬ বছরের কম | ৫ ডলার    |
| ৬ হইতে ৯   | ৬ ডলার    |
| ১০ হইতে ১২ | ৭ ডলার    |
| ১৩ হইতে ১৫ | ৮ ডলার    |

চতুর্থ সন্তানের পর ভাতার হার কমিয়া যায়। প্রথম সন্তানের হার প্রতি স্তরে এক ডলার কম। ষষ্ঠ ও সপ্তম সন্তানের হার দুই ডলার কম। অষ্টম সন্তান-ও তৎপরবর্তী সন্তানের হার তিন ডলার কম।

প্রতি মাসে শিশুর মাতার নামে ভাতা পাঠান হয়। ১৬ বৎসরের অনধিক বয়সের শিশুর সংখ্যা প্রায় ৩৪ লক্ষ। ভাতার জন্ম কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ষিক ব্যয় ২৫ কোটি ডলার। ধনী-নিধন-নির্ধীশেষে সমস্ত মাতাই বাড়ী বসিয়া এই ভাতা পান। সমস্ত শিশুর জীবনারম্ভে সুযোগ-সমতা প্রতিষ্ঠাই এই ভাতার উদ্দেশ্য। বর্তমানে এ দেশের যুদ্ধ লোকের অল্পপাত বাড়িয়া যাইতেছে যত্নের হার কমিয়া যাইতেছে। ১৯৩১ হইতে ৪১ পর্যন্ত দশকে যখন বাণিজ্যিক মন্দা চলিতেছিল তখন জন্ম-হার ও আগন্তুক সংখ্যা উভয়ই কমিয়া গিয়াছিল। ৬০ বৎসর এবং তদধিক বয়স্ক লোকের অল্পপাত ১৯২১ সালে ছিল

হাজারে ৭৫'১, ১৯৩১ সালে হাজারে ৮৩'৯ এবং ১৯৪১ সালে হাজারে ১০২'১। অনেকে মনে করেন এই দীর্ঘায়ু দেশে যুদ্ধের ভরণ-পোষণের জন্য সরকার যথেষ্ট বন্দোবস্ত করিতে-ছেন না।

একদিন বঙ্গীয় বয়স্কাউট এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরূপে নিউইয়র্কের বয়স্কাউট কর্তৃপক্ষের পরিচয়-পত্র লইয়া ক্যানাডার বয়স্কাউট আপিসে উপস্থিত হইলাম। কমিশনার মেজর জেনারেল স্প্রাই এবং ভদীয় সহকারী ডব্লু, এল, কুরিয়ে আমাকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিলেন। স্প্রাই যুবক, তাঁহার দেহ যেমনি উন্নত তেমনি সুকী। তিনি নানারূপ সদালাপে আমাকে আগ্রহিত করিলেন। তিনি ইটালীর রণক্ষেত্রে ভারতীয়দের সঙ্গে পাশাপাশি যুদ্ধ করিয়াছেন—সে কথা সোৎসাহে বলিলেন। কুরিয়ে প্রৌঢ় বয়স্ক। মানচিত্রের দিকে তাকাইয়া কলিকাতা হইতে অটোয়া কত দূর তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমি বলিলাম, জ্যামিতির ভাষায় কলিকাতা ও অটোয়ার দূরত্ব ১৮০ ডিগ্রী। এখন এখানে অপরাহ্ন ৩টা; কলিকাতায় এখন রাত ৩টা। আমাকে আগ্রহিত করিতে উভয়েই ব্যস্ত। কি করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না, নিজেদের কাজকর্মের কথা বলিলেন। শেষে বলিলেন, “এক দিকে ইংলণ্ডের রক্ষণশীলতা অপর দিকে আমেরিকার বৃহৎ বাণিজ্যিক ধরণ। আমরা এক মধ্য পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছি।” ইহাদের সমস্ত পুস্তক ও পত্রিকাদি কলিকাতার বয়স্কাউট আপিসে পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আমিও কলিকাতা বয়স্কাউটের পুস্তকাদি এখানে নিয়মমত পাঠাইবার জন্য তাঁহাদিগকে অমুরোধ করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলাম।

অটোয়ার অবস্থানকালে একদিন কাগজে পড়িলাম আমেরিকার জর্জিয়া রাষ্ট্রে দুই প্রতিদ্বন্দী গবর্নরের মধ্যে রীতিমত হৃদয়ুদ্ধ উপস্থিত। আর্নল্ড জর্জিয়ার গবর্নর। সাধারণ নির্বাচনে তালিমাজের নিকট তিনি পরাজিত হন। কর্তব্য-ভার গ্রহণের তারিখের পূর্বেই তালিমাজ যত্নমুখে পতিত হন। তখন জর্জিয়ার আইন-পরিষদ তালিমাজের পুত্রকে গবর্নর নির্বাচিত করেন। একটু আইন-যটিত কুট তর্ক লইয়া তখন মধ্য অনর্থ উপস্থিত হয়। আর্নল্ড এই নির্বাচনকে বে আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন। তালিমাজ-পুত্র গবর্নরের বাড়ী চড়াও করিয়া আর্নল্ডকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ফিরিয়া যান। পরদিন আর্নল্ডের অল্পস্থিতিতে তালিমাজ-পুত্র বাড়ীটি দখল করিয়া লন। আর্নল্ড ফিরিয়া আসিয়া দেখেন বাড়ী

বেদখল। তখন একটা বাহিরের ঘরেই টেবিল পাতিয়া বসিয়া বোষণা করিলেন যে তিনিই গবর্ণর—তালমাজ নন। উভয় পক্ষই চৈতাইয়া বাজী মাং করিবার চেষ্টা করিলেন। তালমাজ দখল করিয়া বসিয়াছেন। কাজেই প্রথম যুদ্ধে তাঁহারই জয় হইল। কয়েকজন নাগরিক তালমাজ-স্বাক্ষরিত আইনের বিরুদ্ধে পৃথকভাবে মামলা রুজু করিলেন। আদালতগুলির পরস্পর বিরোধী রায় বাহির হইল। তখন সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের হইল। সুপ্রীম কোর্টের রায় বাহির হইবার পূর্বেই আমি ক্যানাডা ত্যাগ করি। এই সময় আমেরিকার আরও একটি ঘটনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিলবো নামক জনৈক সেনেটরের নামে নালিশ হয় যে তিনি যুদ্ধকালে কণ্ট্রীকি বিতরণ করিয়া নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। সেনেটের একটি কমিটি এই বিষয়ে তদন্ত করিয়া ঘটনা সত্য বলিয়া রিপোর্ট পেশ করিল। তখন বিলবো সেনেটে বসিবার অযোগ্য এই বলিয়া একটি প্রস্তাব আলোচনার্থ উপস্থিত হইল। বিলবো ডিমোক্রটিক পার্টির লোক। তাঁহার পার্টি তাঁহাকে সমর্থন করিবে কিনা এই বিষয়ে কয়েক দিন আলোচনা চলিল। সেনেটে তখন বিতর্ক চলিতে লাগিল। অবশেষে বিলবো নিজেই পদত্যাগ করিয়া আলোচনা পরিসমাপ্ত করিলেন।

ক্যানাডার অডিটর জেনারেল ওয়াটসন সেলার অমায়িক ব্যক্তি। তিনি এক দিন আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন, “যুদ্ধের সময় কয়েকটি কাজ ক্যানাডা ও আমেরিকা একত্র সম্পাদন করে। হিসাব আমরাও রাখিয়াছিলাম, আমেরিকারও রাখিবার কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমেরিকা আমাদের হিসাবই গ্রহণ করিল।” ভদ্রলোক কথাগুলি বলিয়া কিঞ্চিৎ গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, “হয়ত হিসাব ও অন্যায় কয়েকটি বিষয়ে ব্রিটিশ বা ক্যানাডীয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড উচ্চতর। কিন্তু তথাপি আমেরিকা কণ্ঠস্বাক্ষর্যে যে সর্ববিষয়েই সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে তাহাতে কোন সংশয় নাই; কিরূপে এরূপ হয় তাহাই ত চিন্তার বিষয়।”

ডাঃ ব্রার্ক ও ডাঃ ইটনের সহায়তায় আমার কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহাদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইতে হয়। ডাঃ ইটন এক দিন তাঁহার ভারত-প্রবাসী ভগিনীর কথা উত্থাপন করিলেন। বলিলেন, “আমার ভগিনী মাদ্রাজে একটী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। তামিল ভাষা বলিতে ও লিখিতে পারে। স্কুলের মেয়েদের প্রতি তাহার অসীম স্নেহ। সেবার দেশে আসিয়াছিল। মেয়েরা তাহাদের সুখছুংখের কথা তাহাকে লিখিয়া জানাইত। মেয়েদের চিঠি হাতে করিয়া তাহাকে বহুবার অশ্রুবিসর্জন করিতে দেখিয়াছি।”

ধামিয়া বলিলেন, “বাইবেলে একটি লাইন আছে, ‘পৃথিবীর সর্বত্র আমার কথা প্রচার কর।’ এই লাইনটি উপরই

যত মিশনারী প্রচেষ্টার প্রতিষ্ঠা। এই লাইনটি পড়িয়াই আমার ভগিনী মিশনারী জীবন বরণ করিয়া লইয়াছে।”

নিউইয়র্কে একটি মহিলা বলিয়াছিলেন তাঁহার ভগিনী মৈমনসিংহের গারো পাহাড়ে মিশনারী জীবন যাপন করেন। অটোয়ার পারিবারিক ভাতা ডিরেক্টরের এক আত্মীয়্যও নাকি মিশনারী ব্রত গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে আছেন।

২৩শে জাহুয়ারী বৃহস্পতিবার অটোয়া ত্যাগ করি। সকাল পৌনে নয়টায় হোটেল ত্যাগ করিলাম। রেডিও হইতে সংবাদ প্রচারিত হইল, এখন তাপ শূন্যের ১৫ ডিগ্রী নীচে। সর্বশুল্লা রাজধানীর মধ্য দিয়া মোটরে চলিয়াছি। শহর ত্যাগ করিয়া প্রান্তরে পড়িলাম। ছ’ঘরে শুপাকার বরফ, পরিষ্কার আকাশ, তাপহীন উজ্জল স্বর্্যালোক তাহার উপর প্রতিকলিত হইয়া অপরূপ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। স্বর্্যালোক চন্দ্রালোক অপেক্ষাও যুহ ও শীতল, কিন্তু অত্যন্ত পরিষ্কার। চন্দ্রালোকে একটি রহস্য সৃষ্টি করে; রহস্যময়ী প্রকৃতিতে আরও রহস্যময়ী করিয়া তোলে। কিন্তু এ যেন মনে হইতেছে শুভ্র প্রকৃতির অন্তস্তল পর্যন্ত পরিষ্কার দেখিতেছি। সওয়া নয়টায় বিমান-বাটিতে পৌঁছিলাম, বিমান তক্ষুনি উড়িল। ১০টায় মন্টিয়াল বিমান-বাটিতে পৌঁছিলাম। হোটেলে পৌঁছিছে ১১টা বাজিল। হোটেলের নাম কুইন্স হোটেল। অটোয়া হইতে মন্টিয়াল বিমান পথে ৯৪ মাইল। মন্টিয়ালে তখন তাপ শূন্যের পাঁচ ডিগ্রী নীচে।

মন্টিয়াল সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরে অবস্থিত ক্যানাডার বৃহত্তম শহর, বন্দর ও পোতাশ্রয়। জাহাজ আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে সেণ্ট লরেন্স নদী দিয়া এখানে আসে। নদী শীতকালে জমিয়া যায়। তখন ৪ মাস জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকে।

মন্টিয়াল একটি দ্বীপ। লম্বায় ২৭ মাইল; পাশে ১২ মাইল। জনসংখ্যা বর্তমানে শহরে ১১ লক্ষ, বৃহত্তর মন্টিয়ালে ১৫ লক্ষ। শহরটি কিবেক প্রদেশে অবস্থিত। কিবেক প্রদেশের প্রায় সমস্ত লোকই ফরাসী ভাষাভাষী। তবে মন্টিয়ালে ফরাসী না জানিয়া ইংরেজী জানিলে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। হোটেল, আপিস, দোকান, বাস প্রভৃতিতে সকলেই মোটামুটি ইংরেজী বলিতে পারে। শহরের জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ ফরাসী ভাষাভাষী, ৭৫ শতাংশ রোমান ক্যাথলিক এবং এক লক্ষ ইহুদি।

শহরটি সুন্দর। ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারগণের শহরগঠন-নৈপুণ্য ও সুরুচি সর্বত্র পরিস্ফুট। মন্টিয়াল পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম ফরাসী শহর বলিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণ গৌরব অনুভব করেন। রবিবার বাসে করিয়া শহর ঘুরিয়া আসিলাম। নবগতগণকে শহর দেখাইবার জন্ত এই

বন্দোবস্ত। চালক যান্ত্রিগণকে সব দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিতেছে। শহরের মধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড়ের উপরে সুন্দর সুন্দর বাড়ী। একটি পাহাড়ের উপর হইতে সেণ্ট লরেন্স নদী ও শহরের হিমায়িত দৃশ্য সুন্দর দেখাইতেছিল। এখানে লোকের ধর্মপ্রবণতা সহজেই চোখে

পড়ে। অনেক গীর্জা। অনেক পাজী। পাজীদের শিকার জন্ত প্রকাণ্ড একটি কলেজ আছে। একটি গীর্জার নাম 'নোত রদাম'—প্যারিসের 'নোত রদাম' গীর্জার অনুরূপে তৈরি। ভিতরে গিয়া কিছুক্ষণ বসিলাম। তখন একটি স্তবগান হইতেছিল। স্তম্ভা পবিত্র বোধ করিলাম। গীর্জাটি নদীর তীরে। অদূরে যেখান হইতে জাহাজ ছাড়ে সেখানে খুব উঁচুতে মাতা মেরীর একটি মূর্তি আছে। মাতা মেরী হাত বাড়াইয়া সমুদ্র গমনোন্মুখ নাবিকগণকে আশীর্বাদ করিতেছেন। বার্ষিকপ্রবর ভাই আঞ্জের মূর্তি শহরের সর্বত্র বিরাজমান। ইনি 'মন্টিয়লের অলৌকিক পুরুষ' নামে পরিচিত।

নানা দিগদেশাগত আর্ড-মরনারীর রোগ ও শোক নিবারণে ইনি সিদ্ধবাক ছিলেন। ইনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। অল্প বয়সে মাতৃপিতৃহীন হইয়া মুচি, মিজী, কৃষক প্রভৃতি নানা কাজে জীবনের ২৩ বৎসর যাপন করিয়া মন্টিয়ল শহরে মাউন্ট রয়াল পাহাড়ের নীচে 'নোত রদাম' কলেজের দারোগান নিযুক্ত হন। এইখানে তাঁহার ধর্মজীবন আরম্ভ হয়। তিনি প্রেরণা অনুভব করেন যে তাঁহাকে এই পাহাড়ের উপর সেণ্ট জোসেফের একটি মন্দির নির্মাণ করিতে হইবে। আজ উচ্চ গম্বুজযুক্ত প্রকাণ্ড ও সুদৃশ্য মন্দির পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া উন্নত মস্তকে সেণ্ট জোসেফের ভক্ত ভাই আঞ্জের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ৯২ বৎসর বয়সে ভাই আঞ্জ দেহত্যাগ করেন।

মন্টিয়লের মোমের পুতুলের মিউজিয়ম একটি বিশেষ দর্শনীয় বস্তু। যীশুর জীবনকাহিনী এবং খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রথমাবস্থার কাহিনী লইয়া নানা ঐতিহাসিক দৃষ্টাবলী মোমের পুতুল দিয়া তৈরি করিয়া সাজান রাখিয়াছে। দৃশ্যগুলি জীবন্ত। ভাই আঞ্জের একটি প্রতিমূর্তি এখানে আছে। বহু মন্টিয়ল-বাসী তাঁহাদের প্রিয় আঞ্জের জীবন্ত বিগ্রহ বলিয়া এই মূর্তিকে ভুল করিয়াছেন। রোমের পোপ, রাজা যথ জর্জ, সেনাপতি আইসেনহাওয়ার এবং মণ্টগোমারীর মূর্তি এখানে তৈরি করিয়া রাখা হইয়াছে। যীশু তাঁহার পিতার সহিত মিজীর কাজ করিতেছেন, রোমান সার্কাসে খ্রীষ্টানগণকে হিংস্র জন্তুর সম্মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। রোমান ক্যাটাকম্বের অত্যাচারপীড়িত নবদীক্ষিত খ্রীষ্টানগণ তাহাদের প্রোজুল ধর্মবিধা লইয়া পরস্পর মিলিত হইতেছেন—এই সমস্ত জীবন্ত দৃষ্টাবলী যেমন চমকপ্রদ তেমনই সঙ্গম ও ভক্তির উদ্দীককর।

স্বৈতকার্যগণের সহিত এদেশের আদিম অধিবাসি-ম সজর্বে কয়েকটি দৃশ্যও রাখিয়াছে।

কিবেক প্রদেশের রাজধানী কিবেক শহর। কিবেক শহর এখান হইতে পূর্বদিকে, সেণ্ট লরেন্স নদীর পারেই অবস্থিত। ইহাই ছিল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসীদের প্রধান আড্ডা। পলাশী যুদ্ধের দুই বৎসর পরে ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি উল্ফ ফরাসীগণকে পরাজিত করিয়া কিবেক দখল করেন। এই যুদ্ধে উল্ফ নিহত হন। কিন্তু ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই যুদ্ধের ফলেই ক্যানাডা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিজয়ী ইংরেজ ফরাসীদের আইন, আচার, ব্যবহার বা ধর্মগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিল না। ফলে ফরাসীগণ ক্রমশঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইল। তবে ইংরেজী ভাষাভাষী ও ফরাসী ভাষাভাষীগণের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব রহিয়া গেল। আমেরিকার পণ্যসম্ভার বহন করিবার জন্ত এক সময়ে হডসন ও সেণ্ট লরেন্স নদীর মধ্যে রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হডসনেরই জয় হইল। নিউইয়র্ক উঠিয়া গেল। মন্টিয়ল অনেক নীচে পড়িয়া রহিল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ-ফরাসীর অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা রাজ-নৈতিক মীমাংসা হইল। সেই বৎসর ক্যানাডা 'ডোমিনিয়ন' বলিয়া স্বীকৃত হইল। ইহাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটসের' স্বত্বপাত। কতক দ্রুতবর্ধমান আমেরিকার ভয়ে, কতক ইংলণ্ডের নীতি পরিবর্তনের ফলে এবং কতক ক্যানাডার অর্থনৈতিক ঐক্যের তাগিদে এই ইংরেজ-ফরাসীর রাজনৈতিক মিলন ও 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটস' সম্ভব হইয়াছিল। ক্রমশঃ ক্যানাডিয়ানগণ উভয় সমুদ্র পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়া নূতন নূতন প্রদেশ গঠন করিয়াছে। আটলান্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত রেল-লাইন প্রতিষ্ঠা করিয়া একা ও উন্নতির পথ অগ্রসর করিয়াছে। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়া ইহাদের শক্তি ও একতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফরাসীগণ আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতায় পিছাইয়া পড়িয়াছেন এবং কিবেক প্রদেশেই সীমাবদ্ধ রহিয়া গিয়াছেন।

মন্টিয়লের বিক্রয়-কর আপিসের অধ্যক্ষ মসিয়ে জে, আর, বুঙ্কেয়ার সাহায্যে আমার কাজ সুস্থ ভাবে সম্পন্ন হইল। এক দিন কিবেক নগরী হইতে মসিয়ে শ্রদ্ধা আমার তত্ত্বাবধান করিতে আসিলেন। ইহাদের আইন ও নিয়মাবলী ইংরেজী ও ফরাসী উভয় ভাষায়ই ছাপা হইতেছে। একই বইয়ের এক দিক দিয়া ইংরেজী, অপর দিক দিয়া ফরাসী। দরকার মত ঘুরাইয়া নিলেই হইল। আপিসের কর্মচারিবৃন্দ এখানে প্রায় সকলেই ফরাসী ভাষাভাষী।

আমার হোটেল ছিল শহরের কেন্দ্রস্থলে। সেণ্ট লরেন্স নদী অদূরে। ক্যানাডিয়ান শাশুড়াল রেলের নূতন কেন্দ্রীয় ষ্টেশনও নিকটে। এ শহরের ট্রামগুলি সুদৃশ্য। ছোট ছোট পাহাড়সমাকীর্ণ শহরের মধ্যে ট্রামে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে



বেশ লাগিত। শীত অটোয়া হইতে কিঞ্চিৎ কম। মাঝে মাঝে ২৫ কি ৩০ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠে আবার শূন্যের নীচে নামিয়া যায়। ফলে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। তখন পথ চলা বিপৎ-সঙ্কুল হয়। হোটেলের লাউঞ্জে অনেক সময় বসিয়া থাকিতাম, লোক আসিয়া টুপি, কানঢাকনী, কোর্ট, জুতাঢাকনী প্রভৃতি খুলিয়া, বরফ ঝাড়িয়া যথাস্থানে রাখিয়া খাইতে বসিতেছে। খাবার পর গল্পাদি করিয়া চলিয়া যাইতেছে। ঘরের বাহিরে ও ভিতরে যেন পৃথক রাজ্য। বাহিরে মার্শের বর্ষের মত পোষাক, জড়পুঙ্খ আকৃতি। ঘরের ভিতরে আসিয়া তাহাদেরই চিক্ণ সজ্জা, তরল-লাজ এবং হাস্য-প্রস্তুতি মুখপদ্ম। কথাবার্তা বেশীর ভাগই ফরাসী ভাষায়। কোন কোন রমণী তাহার বালক পুত্র কিংবৎ ইংরেজী জানে তাহা সগৌরবে বলিতেছেন।

এই সময় আবহাওয়া অনিশ্চিত বলিয়া বিমানে যাতায়াতও কিঞ্চিৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। এই অনিশ্চয়তার ফল আমি দুই বার ভুগিয়াছি। একবার শিকাগো যাইবার সময়। দ্বিতীয় বার সেণ্ট পল হইতে নিউইয়র্ক যাইবার সময়। আমাকে এই ফেব্রুয়ারী ভ্যানকুবারে অষ্ট্রেলিয়াগামী বিমানে উঠিতে হইবে। কাজেই আমাকে যথাসম্ভব অনিশ্চয়তা পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। রেল হইতে বিশ্ববিখ্যাত 'ক্যানাডিয়ান রকি' দেখিবার লোভও ছুঁইবার। এই উভয় কারণে মন্টিয়ল হইতে ভ্যানকুবার রেলই যাইব মনস্থ করিলাম। ১লা ফেব্রুয়ারী শনিবার রাত্রি ৮টা ৩০ মিনিটের ও আমি ক্যানাডিয়ান রেলওয়ের ভ্যানকুবারগামী ট্রেনে মন্টিয়ল ত্যাগ করিলাম।

মন্টিয়ল হইতে ভ্যানকুবার রেলপথে ২৯৩০ মাইল। যাইতে ৮৮ ঘণ্টা সময় লাগে। ১লা ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৮টা ৩০ মিনিটের মন্টিয়ল ছাড়িয়া এই ফেব্রুয়ারী সকাল ৯টা ৩০ মিনিটের ভ্যানকুবার পৌছিবার কথা। পথে তিন বার ঘড়ির কাঁটা ১ ঘণ্টা করিয়া পিছাইয়া দিতে হয়। এইরূপে তিন ঘণ্টা সময় লাভ হয়। সেইজন্য স্থানীয় সময়ের হিসাবে যদিও এই সময়ের মাপ ৮৫ ঘণ্টা, বস্তুতঃ ইহা ৮৮ ঘণ্টা। পথে দুর্ব্যোগ বশতঃ সেদিন গাড়ী ১১ ঘণ্টা বিলম্বে পৌছাইল। আমি এই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৮টা ৫ মিনিটে ভ্যানকুবার পৌছিলাম।

গাড়ীর মধ্যে বন্দোবস্ত বেশ ভাল। আমি যে কামরাটিতে ছিলাম, সেটার উপরে নীচে ২৪টি বার্থ। দিনে বার্থগুলি গুটাইয়া সোফায় পরিণত করা হয়। ক্লাব গাড়ী ও খাবার গাড়ী সুসজ্জিত। খাদ্য ভাল। এই দীর্ঘ রেলপথ তৈরি ক্যানাডার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। এই রেলপথই ক্যানাডাকে একা এবং উন্নতি দিয়াছে। এখনও বোধ হয় এই পথ লোকসানে চলে। ঐশ্বর্যকালে মধ্য ক্যানাডায় বনে ও শতসহস্র হুদে ভ্রমণ, শিকার ও প্রমোদার্থ বহু জনসমাগম হয়। আলবার্টার ক্যাস্পারে ভ্রমণকারীদের স্বচ্ছন্দ বিহারের

জন্ত এক বিরাট পার্ক আছে। 'ক্যানাডিয়ান রকি'র বহু-বিস্তৃত সৌন্দর্য দেখিতেও বিশ্বের লোকসমাগম হয়। এই সমস্ত ভ্রমণকারীর জন্ত রেল কোম্পানী সর্ববিধ সুবিধা দেন।

২রা ফেব্রুয়ারী রবিবার কেব্রিয়ল ষ্টেশনের কাছাকাছি প্রভাত হইল। দিনমান অক্টোবর ও প্রদেশের মধ্য দিয়াই চলিলাম। এই অঞ্চলের কাছাকাছি অনেক কাগজের কল। অক্টোবরীয়ের উত্তর সীমানায় সোনা, নিকেল ও তামার খনি আছে। গাড়ী দ্রুতবেগে চলিয়াছে। পাহাড় আর বন আর তার মধ্যে শত শত হ্রদ। গাছের মধ্যে স্প্রুস, পাইন, পপলার ও বার্চ ই প্রধান। স্প্রুস ও পাইনের পাতা পড়ে নাই। ইহার চিরসবুজ। হিমশব্দকে সজ্জিত। যেন স্বাভাবিক গ্রীষ্মাস তরুশ্রেণী। অস্ত্রাঙ্গ বৃক্ষ নিঃশব্দ, নগ্ন। হ্রদ-গুলি বরফে ঢাকা। মাঝে মাঝে বরফের ফাঁকে ফাঁকে স্বচ্ছ জল দেখা যাইতেছে। ষ্টেশনগুলিতে লোকজন নাই। দেশ জনশূন্য। মাঝে মাঝে বনবিভাগের আগিস। কোন পশু-পক্ষীও দৃষ্টিগোচর হয় না। সব বরফে ঢাকা।

৩রা সোমবার সকালে উইনিপেগের নিকটবর্তী হইতেছি। উইনিপেগে পৌছিলাম বেলা পৌনে বারটায়। রৌদ্র উঠে নাই। বরফ পড়িতেছে। ঝড়ে বরফ উড়িয়া যাইতেছে। এই ষ্টেশনে জু বদল হইবে। অনেক যাত্রী এই ষ্টেশনে নামিয়া গেল। আমরা মাত্র ৫ জন যাত্রী এক কামরায় রহিলাম। নুতন কণ্ঠাক্তর আসিয়া বলিলেন, বাহিরে আবহাওয়া খুব খারাপ। অনিশ্চিতকালের জন্ত গাড়ী এখানে থাকিবে। বাহিরে তাপ শূন্যের ২৮ ডিগ্রী নীচে। প্লাটফর্মে নামিয়া দেখি বাহিরে দাঁড়ান অসম্ভব। বেশ জোর ব্লিজার্ড চলিতেছে। ইঞ্জিনের উপর বরফ পড়িয়া গলিয়া আবার জমিয়া যাইতেছে। এইরূপে ইঞ্জিন শুষ্ক জটাজুটমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইলাম। ৭ তারিখে আমার ভ্যানকুবার ত্যাগ করিবার কথা। ৬ তারিখে বিমান আপিসে আমার বুকিং পাকা করিতে হইবে। কাজেই গাড়ীর ভ্যানকুবার পৌছাইতে ২৪ ঘণ্টার বেশী দেরী হইলে আমার বিমান ধরাই হইবে না। পরবর্তী বিমান ১৫ দিন পরে ছাড়িবে। তাহাতেও স্থান জুটবে কিনা সন্দেহ। আবহাওয়ার হাত এড়াইবার জন্ত বিমানে না আসিয়া রেল আসিলাম। রেলও আবহাওয়ার হাতে রক্ষা নাই। পূর্ব দিন নাকি ইয়কন টেরিটরীর একটা বিমান-ঘটিতে তাপ শূন্যের ৮৩ ডিগ্রী নীচে নামিয়াছিল। একটি যুবক সাংবাদিক আমাদের কামরায় আসিয়া উঠিলেন। আবহাওয়ার নানাবিধ খবর দিলেন। আমাকে দেখিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খুব উৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। আমি বিলাতে বা আমেরিকায় শিপিং নই, অথচ বিশুদ্ধ ইংরেজী বলিতেছি দেখিয়া প্রশংসমা-

বলিলেন, “আমাদের ইংরেজী শিখিতে কলিকাতা যাওয়া উচিত।” তিনি আশ্বাস দিলেন যে গাড়ীর কিছুতেই ২৪ ঘণ্টার বেশী বিলম্ব হইবে না।

বৈকাল ৬টা ১৫ মিনিটে গাড়ী ছাড়িল। টেরেণ্টে হইতে একটি গাড়ী ভ্যানকুবার যাইতেছিল। আর একটি প্যাসেঞ্জার গাড়ীরও উইনিপেগ হইতে এডমন্টন যাইবার কথা। তিনটি গাড়ী একত্র জুড়িয়া দিল। হিমাবৃত পথে সমুপগে গাড়ী চলিতে লাগিল।

দুই দিকে সমতল দেশ। দিগন্ত বিস্তৃত ও বরফাচ্ছন্ন শূন্য প্রান্তর। কদাচিৎ দুই-চারিটা গাছ দেখা যায়। মাঝে মাঝে রালিয়াড়ির মত বরফ সুপ। আকাশ পরিষ্কার হইয়া জ্যোৎস্না উঠিল। জ্যোৎস্নালোকে হিমাবৃত প্রান্তর বেশ দেখাইতেছিল। রাত্রি ১০টার ঘুমাইলাম।

পরদিন ৪ঠা মঙ্গলবার। সুন্দর রোদ উঠিল। সর্বশুদ্ধ প্রকৃতি রোদ্রে চক্‌চক্ করিতেছে; শুধু জনশূন্য প্রান্তর। দুই-একটা ঘোড়া কোথাও দেখা যায়। দূরে দূরে দুই-একটা ছোট বস্তি চোখে পড়ে। গমের দেশ অতিক্রম করিতেছি, এখানে গমের ঋতু খুব ছোট; অক্টোবর হইতে মার্চ পর্যন্ত জমি বরফে ঢাকা থাকে, বাকী কয়েক মাসের মধ্যে সব কাজ শেষ করিতে হইবে। শীতে চাষার কোন কাজ নাই, শুধু গরু বাছুর রক্ষা করে ও প্রচুর মাখন তৈরী করে। যুদ্ধের সময় ইহারাই ইংরেজকে বহু মাখন ও চীজ দিয়াছে, এখনও দিতেছে। বেলা ১০টার পর সাস্কাটুন ষ্টেশনে পৌঁছলাম। নদীর পারে শহর। নদী জমিয়া গিয়াছে। রোদ্রে এডমন্টন শহর অতিক্রম করিবার পর ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাতে ‘রকি’ অঞ্চলে চলিয়া আসিয়াছি।

এই বুধবার প্রত্যুষে জাগ্রত হইয়া এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম, দুই পাশে উঁচু পাহাড় মাঝে গাড়ীর পথ। সব বরফে ঢাকা; চিরসবুজ বৃক্ষমালা শ্রেণীবদ্ধভাবে হিমন্তবক হস্তে দণ্ডায়মান। বকল-সর্বশূন্য বৃক্ষগুলি করকোড়ে উদ্ধনেদ্রে দাঁড়াইয়া আছে। ইহাদের সংখ্যা অল্প। একটি ছোট গিরিনদী বরফ ঠেলিয়া ছুটিতেছে। স্বর্ষ্য সর্বোচ্চ পাহাড়গুলির মাধ্যম স্বর্ণ-কিরণ ঢালিতেছে। উপরে সুন্দর নীলাকাশ; তাহাতে দেববালাগণ দুই-একখানা সাদা মেঘের ভেলা ভাসাইয়াছেন। চারিদিকে এক অদ্ভুত রক্ত ও শোভা। তাহার মধ্য দিয়া গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। ক্রমে সব স্বর্ষ্যালোকে প্লাবিত হইল। এত আলো, তবু রহস্য যায় না। মন সমস্ত পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অদ্ভুত অন্তরঙ্গতা ও একাত্মতা বোধ করিতেছে। ক্লিয়ার ওয়াটার ষ্টেশন হইতে একটি নদী আমাদের সঙ্গী হইল। নদী আঁকিয়া-বাঁকিয়া পাহাড়ের ভিতর দিয়া পথ করিয়া চলিয়াছে। হিমাবৃত নদীর কঁাকে কঁাকে স্বচ্ছসলিল—তরুণীর প্রসন্ন নয়নের মত দেখাচ্ছে। কোথাও প্রশান্ত উপত্যকার মধ্য দিয়া যাইতে

যাইতে মন উদারতা ও প্রসন্নতা লাভ করিতেছে। আবার কোথাও নিবিড় বনাবৃত সঙ্গী গিরিপৃথের মধ্যে মন যেন প্রকৃতির বক্ষস্পন্দন অনুভব করিতেছে। কোথাও তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মত পাহাড়-সন্নিবেশ। কোথাও পাহাড় সোজা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। পিছনে কিছুই দেখা যায় না। কোথাও পাহাড়-গাত্র খুব ঢালু হইয়া ক্রমশঃ যেন আকাশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কোন কোন পাহাড়ের গায়ে কোন গাছ না থাকায় বরফে রূপার পাহাড়ের মত দেখাইতেছে। এই-রূপে রক্তগিরিপরিবেষ্টিত প্রকৃতির লীলাকুঞ্জের মধ্য দিয়া লীলাময়ীর কবোক্ষ স্পর্শ অনুভব করিতে করিতে চলিয়াছি।

কাম্লুপ্‌স্‌ ষ্টেশন হইতে পাহাড় নীচু হইতে সুরু হইল। তখন বেলা ১১টা। বেশ রোদ উঠিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার, তাপ শূণ্যের উপরে ১০ ডিগ্রী হইবে মনে হইতেছে। দুই দিকে উঁচু পাহাড়, বৃক্ষশূন্য, অতএব হিমাবৃত ও রক্তশুভ্র। মাঝখান দিয়া নদী ছুটিয়াছে, আমরাও ছুটিয়াছি। নদী কখনও বামে, কখনও ডাইনে যাইতেছে। নদী এখন প্রশান্ত ও হিমযুক্ত। মহাসাগর নিকটে, তাই নদী ক্রান্ত ত্যাগ করিয়া হিমবাধা ঠেলিয়া দ্রুত পদ-সঞ্চারে ছুটিতেছে। আমরাও নষ্ট সময় পুনরুদ্ধার মানসে অভিসারিণীর অলুগামী হইয়াছি। প্রায় পৌনে তিনটায় ভ্যানকুবার হইতে ১৪৭ মাইল দূরবর্তী ফল্‌স্‌ ক্রীক ষ্টেশনের নিকট শোভা নবতর রূপ পরিগ্রহ করিল। ডাইনে দূরে একটি আকাশচুম্বী পর্বতশিখরের হিমশীর্ষ অন্ত-গামী স্বর্ষ্যকিরণ প্রতিফলিত করিয়া ক্ষণতরে গ্রীষ্মকালীন কান্দনজঙ্ঘার আভাস দিতেছিল। দুই ধারে উচ্চ রক্তশুভ্র গিরিশ্রেণী। নদীকে তখন আমরা অন্ততঃ নয় বার অতিক্রম করিয়াছি এবং নদী আমাদের ডাইনে। রেল আঁকিয়া-বাঁকিয়া সাগর-গামিনী নদীর অলুগামী হইয়াছে। রক্তশুভ্র গিরিগোদ্রে চির-সবুজ বৃক্ষশ্রেণী রৌপ্যভূষণে মরকতমণিমালার মত দেখাইতেছিল। দিনমান সৌন্দর্য্যপানবিভোর চক্ষুর্দ্বয়ের উপর ক্রমশঃ সন্ধ্যার অঙ্কার ঘনাইয়া আসিল। বাহিরের অপরিমেয় সৌন্দর্য্যরাশি সঙ্গে সঙ্গে চিরতরে অন্তরে মুদ্রিত হইয়া গেল। প্রায় পৌনে ছয়টার সন্ধ্যা হইল। তখন নদী প্রশান্ত এবং মন্দগতি হইয়াছে। নদীর পার দুইটিও ক্রমশঃ প্রশান্ত হইতেছে। পাহাড় নদী হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। রাত্রি ৮টা ৫ মিনিটে প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্তী ভ্যানকুবার ষ্টেশনে নামিলাম।

পথে মন্টিয়ল হইতে ২৪১৭ মাইল দূরবর্তী লুসার্ন ষ্টেশন সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতম। ইহার উচ্চতা ৩৬৫০ ফুট। ক্যাস্পারের উচ্চতা ৩৪৭০ ফুট। ক্যাস্পারের উত্তরে মাউন্ট রবসনই ‘রকির’ উচ্চতম শৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা ১২৯৭২ ফুট। ডাইনোসার ও অজাভ জীবজন্তুর যে প্রস্তরীভূত কঙ্কাল অটোয়ার মিউজিয়মে দেখিয়াছি তাহা এই ‘রকি’ পর্বতমালার মধ্যেই প্রাপ্ত।

দক্ষিণে জেজার নদী ও উত্তরে বুরাউ ইন্লেটের মধ্যে ড্যানকুবার শহরের বড় ও প্রধান অংশ অবস্থিত। বুরাউ ইন্লেটের উত্তরে উত্তর-ড্যানকুবার এবং তাহার পশ্চিমাংশের নাম পশ্চিম-ড্যানকুবার। শহরের পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। বুরাউ ইন্লেট মহাসাগরের একটি বড় খাড়া। বুরাউ ইন্লেটের দক্ষিণ তীরে পোতাশ্রয়। ইন্লেটের মুখে একটি স্থল্যাংশ দক্ষিণ-ড্যানকুবারের উপর অনেকটা বাংলা ৫-এর মত খাড়া হইয়া প্রায় উত্তর-ড্যানকুবারের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে। অন্তর-টুকু অপ্রশস্ত; তাহার উপর সেতুদ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ-ড্যানকুবার সংযুক্ত হইয়াছে। এই সেতুটি সু-উচ্চ। নাম লায়নস্ গেট সেতু। সমস্ত জাহাজ এই সেতুর নীচে দিয়া ইন্লেটে প্রবেশ করিয়া প্রোতাশ্রয়ে যায়। এই বাংলার ৫-আকৃতি অংশে সেতু পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিরাট ষ্ট্যানলী পার্ক। দক্ষিণ-ড্যানকুবার ক্রমশীর্ণায়মান হইয়া পশ্চিমে মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই ত্রিভুজাকৃতি অংশের সমুদ্রতীরবর্তী গীর্ধ বিন্দুর নাম গ্রে পয়েন্ট। এইস্থানে ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। বাংলার ৫-আকৃতি অংশের দক্ষিণ-ড্যানকুবারস্থ ভূমির কাছে একটি ছোট খাড়ির স্রষ্ট হইয়াছে। ইহার নাম ফল্‌স ক্রীক। ইহার উপর একাধিক সেতু আছে। আমি যে হোটেল উঠিলাম উহার নাম হোটেল ড্যানকুবার। হোটেলটি রেলওয়ে-পরিচালিত। খুব বড় হোটেল। ক্যানাডার মধ্যে এই হোটেলটিই নাকি সবচেয়ে ভাল। এখানে ভাল কাঁকড়ার সালাদ খাইয়াছিলাম।

ষ্টেশন হইতে হোটেল আসিবার পথে বরফশূন্য পথ দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ বোধ করিলাম। বহু দিন একপ ধিম-মুক্ত প্রশান্ত পথ দেখি নাই। শীতও এখানে অনেক কম। মনুষ্যকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলে না।

৬ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সকালে প্রথমেই মাল লইয়া অষ্ট্রেলিয়ান হাশনাল এয়ারওয়েজের আপিসে উপস্থিত হইলাম। মাল ওজন করাইয়া জমা দিলাম। টিকিট কিনিয়া বুকিং পাকা করিয়া ব্যাঙ্কে গিয়া কিছু অষ্ট্রেলিয়ার টাকা কিনিলাম। ইন্লেটের তীরবর্তী নগর্যাংশে খানিকটা ঘুরিলাম। ইহাই শহরের বাণিজ্যপ্রধান অংশ। হোটেল ড্যানকুবার এই অংশেই অবস্থিত।

বৈকালে ট্যাক্সিযোগে দ্রুত শহরটি দেখিয়া লইবার মানসে বাহির হইয়া পড়িলাম। পোতাশ্রয়ের ধার দিয়া চলিয়াছি।

বামে লষ্টলেগুন ও ডাইনে বাইচল্লাব রাখিয়া ষ্ট্যানলী পার্কে উপনীত হইলাম। পার্কটি বিরাট, তরুভাজিসমিবেশে সুশোভন। বহু দিন এত পাতায়ুক্ত গাছ দেখি নাই। এখানে একটি খুব বড় গাছ শুধু বাকুলের উপর দাঁড়াইয়া আছে। গাছটির পরিধি ৬৫ ফুট। পুরীধামের সিদ্ধবকুলের কথা মনে পড়িল। তবে এ গাছটি কিছুদিন হইল মরিয়া গিয়াছে। পার্কের প্রান্তে লায়ল গেট সেতুর গোড়ার উপনীত হইলাম। সেতুটি সু-উচ্চ ও সুদৃঢ়। তাহারই পার্শ্বে প্রসপেক্ট পয়েন্ট। ওপারে পর্বতসঙ্কুল পশ্চিম-ড্যানকুবার। বামে ইন্লেটের মধ্য দিয়া দিগন্তপ্রসারী প্রশান্ত মহাসাগর দেখা যাইতেছে। দৃষ্টি রমণীয়। তার পর সাগরপার দিয়া ৫-আকৃতি অংশ প্রদক্ষিণ করিয়া ফল্‌স ক্রীক পার হইয়া মেরিন ড্রাইভ ধরিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়া গ্রে পয়েন্টে উপনীত হইলাম। সম্মুখে অকুল প্রশান্ত মহাসাগর, উত্তরে পশ্চিম-ড্যানকুবারের হিমকিরিটিনী গিরিশ্রেণী অন্তগামী সূর্য্য-কিরণে চক্‌চক্‌ করিতেছে। সীমা এখানে বাঁধন ছাড়াইয়া অসীমে মিশিয়াছে। দেহবন্ধ মন এখানে অনন্তের আভাসে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। দিগন্ত মেঘাচ্ছন্ন। সূর্য্যাস্ত দেখিবার আশা নাই। হোটেল ফিরিলাম। পাহাড় ও সমুদ্রে ঘিরিয়া শহরটিকে পরম রমণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

এ শহরে কয়েক জন ভারতীয় (পঞ্জাবী) স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। কাগজে দেখিলাম ভারত-সরকার ক্যানাডিয়ান সরকারের নিকট ইহাদিগকে পূর্ণ ক্যানাডিয়ান সিটিজেন রূপে মানিয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছেন। খবরের কাগজগুলি অনুরোধটিকে মোটামুটি সমর্থন করিয়াছে।

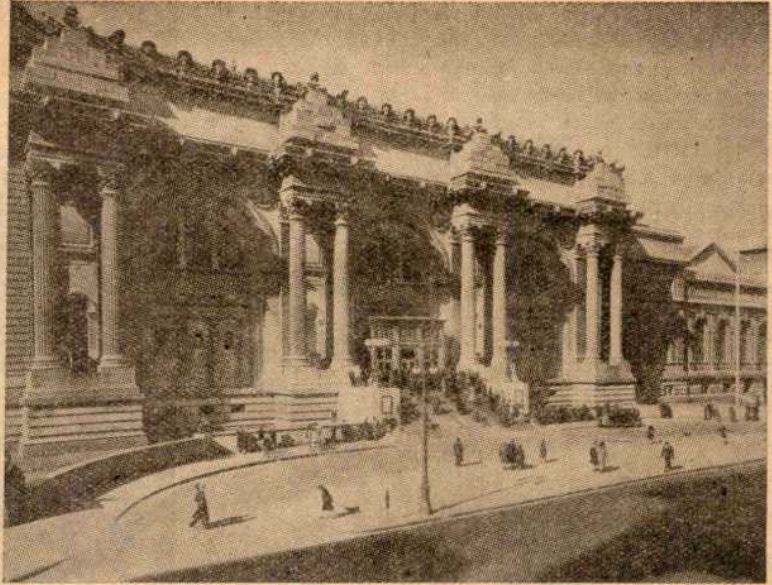
৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে বিমান কোম্পানীর গাড়ী যাত্রীদের লইতে হোটেল আসিল। “ওয়েবষ্টারের সঙ্গে অনেক দিন ঘুরিয়াছি, আজ বিদায়ের পালা। ওয়েবষ্টার বলিল, “আপনি কাল প্রশান্ত মহাসাগরের উপর উড়িবেন আর আমি আবার সেই পুরাতন ট্রেনে-পুরাতন ওয়াশিংটনে ফিরিব।” আমি বিদায় লইয়া বলিলাম, “ওয়েবষ্টার, এতদিন তোমার কাছে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। পথে তোমার অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিব।” সোয়া আটটায় হোটেল ত্যাগ করিয়া ৮টা ৪০ মিনিটে বিমান-খাটিতে পৌঁছিলাম। ১০টা ১৫ মিনিটে বিমান উড়িল।





দেয় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এদেশের শিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে শুরু হয়েছে। এই যুদ্ধের ফলে শিল্পীদের মনে যে বেদনা-বোধ জাগ্রত হয়ে উঠল, সে মাহুষের জন্তই বেদনা, সেই বেদনার রূপই ফুটে উঠেছে তাঁদের তুলির রেখায়।

শিল্পীর এই বেদনা তাঁর শিল্পের মাধ্যমে জনসাধারণের মনে সঞ্চারিত হচ্ছে, তাই চিত্রশিল্পের সঙ্গে জনসাধারণের প্রাণের গভীর যোগাযোগ স্থাপিত হতে চলেছে। আর্টকে জনকল্যাণের কাজে লাগানো হচ্ছে, প্রাণাণাণ্ডার কাজেও। অগণিত জনসংঘ যেন সেই সব চিত্রে, সাহিত্যে, গানে কথা কয়ে উঠেছে। আর্টিষ্টরা বুঝতে শুরু করেছেন যে, এ যুগের শিল্পকলা যদি সাধারণ মাহুষের রসবোধকে জাগ্রত করতে পারে তবেই তার সার্থকতা।



আমেরিকার পৃথিবী-বিখ্যাত আর্ট-গ্যালারী মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্ট



ওয়াশিংটনের রাজপথে দৈনিক চিত্রশিল্পীদের একটি প্রদর্শনী। গত যুদ্ধের সময় এমনি বহু প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় জনসাধারণের সঙ্গে আর্টের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে।

এ যুগে চারুকলার সঙ্গে জনসাধারণের যে যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে, সে কথা বোঝা যায় চিত্র-প্রদর্শনীর জনপ্রিয়তা দেখে। ইতিপূর্বে চিত্রপ্রদর্শনীর এমন জনপ্রিয়তা ছিল না, কিন্তু যখন শিল্পীরা গণ-জীবনের মহাসমুদ্রে অবগাহন করলেন, তখন সাধারণ মাহুষের মনে শিল্পবোধ জেগে উঠতে দেরি হ'ল না। মস্কো আর্ট গ্যালারী (রাশিয়া), স্টেট গ্যালারী (ইংলণ্ড), হাশনাল আর্ট গ্যালারী (আমেরিকা) প্রভৃতি শিল্পকলা-কেন্দ্রে এ যুগের আর্টের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি লন্ডনের কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান (দি রয়্যাল একাডেমি, দি নিউ ইংলিশ আর্ট ক্লাব, দি রয়্যাল সোসাইটি অব ব্রিটিশ আর্টিষ্টস) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান অনেকগুলি চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। সেগুলো জনসাধারণের মনে যে শিল্পবোধ জাগ্রত করতে অনেকটা সহায়ক হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। ভারতবর্ষে এ ধরনের চিত্র-প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা আছে। না হ'লে জনসাধারণের অন্তরের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা শিল্পীর সৃষ্টিতে কেমন করে ফুটে উঠবে? আর যে শিল্পে সাধারণ মাহুষের প্রতিচ্ছবি নেই, সে শিল্প এ যুগের শিল্পরসিকদের নিকট সার্থক সৃষ্টি বলে গণ্য হবে না, সেই শিল্প যুগোপযোগী উচ্চাঙ্গের শিল্প বলে পরিগণিত হবে না।



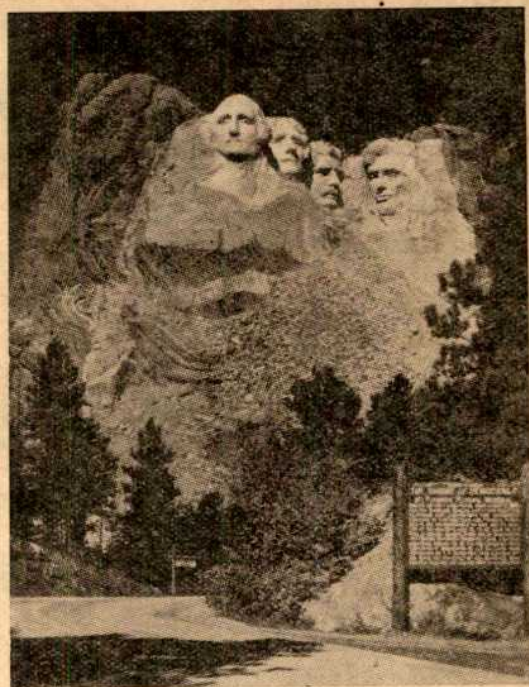
age : while the restless experimental artists, always seeking new formulae, found himself in danger of becoming less and less comprehensible to the men in the street. In his search for new modes he tended to concentrate on the means and to forget the ends. New style emerged which seemed all important to the artists. But the man in the street, far from recognising their importance, complained that the new styles were a barrier between himself and the artist's message. He even began to suspect that the artist had no message. The cry went up that art was becoming divorced from life. The critic, hearing this cry and distressed at ever-widening gap between the art and people, began to exert himself as he had never done before."

(Art for Everybody)



আমেরিকার একজন বিমানবাহিনীর দৈনিক-শিল্পীর  
অঙ্কিত রেখাচিত্র

বস্তুতঃ আর্টের ক্ষেত্রে এই যুগান্তরকারী পরিবর্তনের আভাস শুধু ইংলণ্ডে নয়, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের বহু দেশেই দেখা দিল। ইতিপূর্বে আর্টের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ প্রায় ছিল না বললেই চলে, একটি বিশেষ অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা



আমেরিকার সুবিখ্যাত জাতীয় শিল্পের নিদর্শন মাউন্ট রাসমোর স্মার্মাল মেমোরিয়াল পাহাড়ের পাথর কূঁড়ে আমেরিকার জাতীয় নেতাদের মূর্তি (জর্জ ওয়াশিংটন, টমাস জেফারসন, থিয়োডর রুজভেল্ট ও আব্রাহাম লিংকন) খোদিত করেছেন এ যুগের ভাস্কর-শিল্পী

ছিলেন আর্টের সমর্থকার। যাদের বলা হয়েছে common man in the street, তারা আর্টের কোন ধার ধারত না। কিন্তু সে গম্ভী অতিক্রম করে এ যুগের শিল্পকলা বহু আয়াসে বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা এড়িয়ে গণ-জীবনের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল এবং জনসাধারণ তাকে বরণ করে নিতে দ্বিধা করলে না।

একথা মানতেই হবে যে, আমাদের দেশে এতকাল জন-সাধারণের সঙ্গে আর্টের সম্বন্ধ ছিল অতি ক্ষীণ। অভিজাত সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয় কয়েকজনই ছিলেন আর্টের পৃষ্ঠপোষক। আর্টের প্রশংসা ও সমালোচনা তাঁদেরই ডুইংক্রমে ছিল সীমাবদ্ধ। কখনও ছ-একটি চিত্র-প্রদর্শনীতে সেই সব অভিজাত শিল্পী ও শিল্প-সমালোচকদের দেখা মিলত। অধিকাংশ শিল্পীই গতানুগতিকতার অহুর্ভবন করে নব্যযুগের নূতন টেকনিক ও ভাবধারাকে পরিহার করেই চলে-ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের দেশেও হাওয়া ফিরেছে। অতীত দেশে যেমন গণ-আন্দোলনের ঢেউ এসে তার শিল্প-জগতের রূপান্তর সাধন করেছে, ভারতবর্ষেও তার ব্যতিক্রম হয় নি; যদিও এই পরিবর্তন ব্যাপকভাবে এদেশে এখনও দেখা



বিচিত্র, রামধনুর মত বর্ণাঢ্য, সেই রকম আর্টও নানা ক্ষেত্রে ও ভিন্নমাত্র লীলাচঞ্চল।

কিন্তু সমাজ-জীবনে শিল্পীর যে দায়িত্ব আছে তা তাঁর বিমূর্ত হ'লে চলে না। তাঁর দায়িত্ব রূপস্বপ্নের দায়িত্ব। যদিও এখানে একটি গুরুতর সমস্যা আছে; শিল্পীর দায়িত্ব আছে সমাজ ও দেশের প্রতি, কিন্তু সে দায়িত্বভার কি করে শিল্পী গ্রহণ করবে তাঁর স্বপ্নের স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে সমাজ ও দেশের নামে আত্মোৎসর্গ করে? সেটা তো শিল্পীর স্বাধীনতাস্বরূপ হবে না। আসল কথা শিল্পীর স্বপ্নের ক্ষেত্রে অবাধ মুক্তি চাই—সমাজ-সচেতন শিল্পী হ'লে তাঁর স্বপ্ন মাহুষের ছবি আপনা হতেই মুক্তির গান গেয়ে উঠবে।



এক নৌ-সৈনিক-শিল্পী অঙ্কিত রেখাচিত্র

যে শিল্পী সমাজ-সচেতন এবং মানবতার পূজারী, তাঁর শিল্পস্বপ্নের আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহান হবার কোন কারণ নেই। সাধারণ মাহুষের সুখ-দুঃখের আশা-বেদনার প্রতি-চ্ছবিই তাঁর ছবিতে ফুটে উঠবে। সজ্জ শিল্পীর পরিবেশ এবং শিল্পবোধ তাঁকে তাঁর স্বপ্ন সর্বদা সচেতন করে তুলবে।



আমেরিকার প্রাচীর-চিত্রশিল্পের নিদর্শন। গৃহসজ্জার পরিকল্পনার এ যুগের শিল্পীরা এই বিশেষ ধরনের আর্টকে কাজে লাগিয়েছেন

কিন্তু দেখতে হবে যে, যেন কোন বিশেষ ছাঁচে শিল্পীর মন ঢালাই না হয়, অথবা কোন নির্দিষ্ট মতবাদ অনুসরণ করে তাঁর শিল্পস্বপ্ন গতাহুগতিক না হয়ে পড়ে।

"Nobody advocates that an artist should be pressed into the straight-jacket of rigid conformism . . . To preach liniency amounts to pleading for the artists' degradation as a thinking person, as a responsible member of the community. It means either the mass-production of Dolls' Houses as homes for our contemporary artists or to show them as their ideal prototype the Vicar of Bray."

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এই আদর্শসংঘাত গত মহাযুদ্ধের পর থেকেই শুরু হয়েছে। ইংলণ্ডের চিত্রশিল্প যুদ্ধের পর একটি বিশেষ বাক নিয়ে ভিন্নমুখী হয়ে পড়ে। ইউরোপের অসংখ্য দেশেও আর্টের সাধনা চলতে থাকে ঠ ডিওর বাইরে জনতার হাটে। গণ-জীবনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটতে থাকে। এক দিক দিয়ে বিচার করলে একে একটি বিরাট পরিবর্তন বলা যায়, (বিপ্লব বলা ঠিক হবে না) এবং সে পরিবর্তন প্রতিটি শিল্পীকে সমাজসচেতন করে তোলে। ইউরোপের অসংখ্য দেশে ও ইংলণ্ডে চিত্রশিল্পের ধারা কোন্ পথে প্রবাহমান, তা নিম্নের উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যাবে,—

"During the period between the last war and the present one the visual arts throughout Europe were in a ferment. In particular, they were split into two camps, the experimental and the academic: and the gap between the two was no less wide in Britain than on the Continent. The reactionary, academic artist continued to use a set of formulae that yearly became none obsolete and less filled to express the spirit of his



# এ যুগের শিল্পকলা

শ্রীরঞ্জিত সিংহ

আমাদের দেশের সমাজ-জীবনে শিল্পীরা যে এখনো যোগ্য মর্যাদা লাভ করতে পারেন নি তার কারণ অজ্ঞাত দেশের



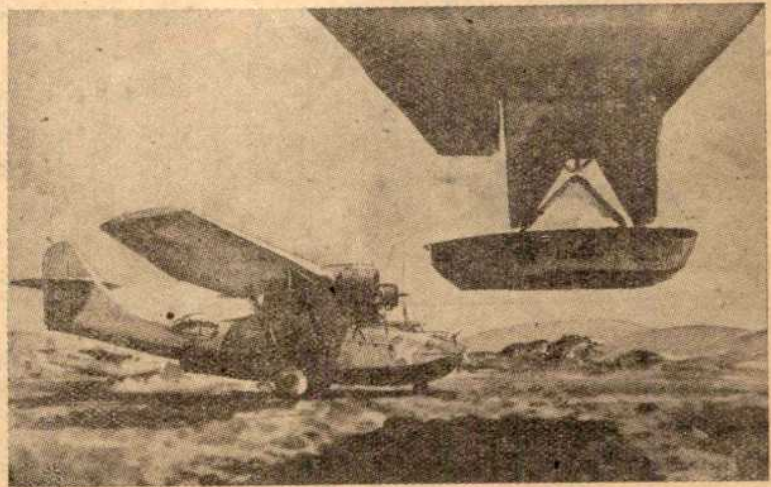
এ যুগের নতুন স্থাপত্যের একটি অতিআধুনিক নিদর্শন।  
আমেরিকার একটি বিজ্ঞান-কেন্দ্রের নির্মাণ-কলা

মত শিল্পকলার উপযুক্ত সমাদর করতে এখনো আমরা শিখি নি। আমাদের শিল্পীদের মর্যাদা ও সম্মান বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, সাধারণতঃ তাঁরা জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের গভীর জগতে বাস করেন এবং সেই কারণেই জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ক্ষীণশ্রোতা নদীর মত ক্রমবিলীয়মান। অজ্ঞাত জীবিকাশ্রমী শিল্পীদের কথা বাদ দিলেও চিত্রশিল্পীদের সম্পর্কে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গণ-জীবনের বাইরে একটি নিজস্ব জগৎ ও পরিবেশের ভিতর চিত্রশিল্পী সৃষ্টিকর্মে আত্মনিয়োজিত থাকেন, সেখানকার তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। চিত্রশিল্পী ছাড়া আছেন আলোকচিত্রশিল্পী, ডাক্তর,

রেখাচিত্রশিল্পী, কাচুনিষ্ট প্রভৃতি। এঁদের প্রত্যেকেরই স্বকীয় একটি অতি পরিচিত জগৎ আছে—সমাজে বাস করেও কখনও কখনও এঁরা নিজ নিজ শিল্পীমনের খেলালে এক স্বপ্নলোকে বিচরণ করতে থাকেন। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে শিল্পীর খেলালে গড়া মনোজগতের সম্পর্ক অতি অল্পই।

বহির্জগতের সঙ্গে মনোজগতের এই যে সংঘাত এটাই হচ্ছে শিল্পীমনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব। আজকের দিনের শিল্পীর পক্ষে এ দুয়ের সমন্বয় সাধন করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে সর্বপ্রথমে যে প্রশ্নটি মনে আসে, সেটা হচ্ছে—আর্টের জন্ম আর্ট, না জীবনের জন্ম আর্ট? আপন খেলালখুশীমত চিত্র-শিল্পীর তুলির রঙ রামধনুর মত ক্যানভাসের ওপর আত্মপ্রকাশ করবে, না এমন ছবির ব্যঙ্গনা কুটে উঠবে যার সঙ্গে মানুষের জীবনের ঘনিষ্ঠতর সঙ্গ আছে। আর্টের জন্ম আর্ট, অর্থাৎ নিছক আনন্দের জন্ম আর্ট—এ কথাটির সুর-এই শতাব্দীতে শুদ্ধ হয়ে গেছে। এ যুগের শিল্পকলা মুখ্যতঃ ষ্টুডিওর ভিতরে আর আত্মপ্রকাশ করে না। শিল্পীও যেহেতু একজন সামাজিক জীব, সেইজন্ম তাঁর শিল্পসৃষ্টি এ যুগের সমাজ-জীবনের ছাপ নিয়ে আসে—যে সমাজ-জীবন জনসাধারণের সুখ-দুঃখ-আশা-নিরাশায় বৈচিত্র্যময়।

আর্ট কোন বিশেষ রীতি বা পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কোনও ধরাবাঁধা নির্দিষ্ট পথেই যে তাকে চলতে হবে তাও নয়। আর্ট বহুবিচিত্র, আর্টের উদ্দেশ্য সৃষ্টির আনন্দ। জীবনের সঙ্গে এখানেই তার যোগাযোগ। জীবন যেমন বহু-



আমেরিকার এক সৈনিক-শিল্পীর আঁকা জল-রঙের ছবি। ওয়াশিংটনের একটি প্রদর্শনীতে ছবিখানি যথাযোগ্য প্রশংসা লাভ করে

## ভাবপ্রবণতা না রোগপ্রবণতা

শ্রীবিজয়কেতু বসু

রোগপ্রবণ বাঙালীর ভাবপ্রবণ বলিয়াও একটা পরিচিতি আছে, কিন্তু সাধারণ বাঙালী আজ ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে বিধ্বস্ত হইয়া বাস্তববুদ্ধির সন্ধানে উন্মূখ। অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা এতই অস্বাভাবিক যে তাহা কোন জাতির বৈশিষ্ট্য হইতে পারে না। বাঙালীরও এই দোষ তাহার জাতীয় জীবনে আগন্তুক ব্যাধি মাত্র। সুস্থ বাঙালীর আসল রূপ—সে দৃঢ়চিত্ত, তীক্ষ্ণ বিচারক্ষমতাসম্পন্ন এবং কর্মঠ। বহুসংখ্যক বাঙালী ক্ষীতপ্লীহ হইলেও যেমন প্লীহাক্ষীতিটাই বাঙালীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য হইতে পারে না, তেমনি ভাবপ্রবণতা বাঙালীর মধ্যে যত মূলভই হউক না কেন সেটি তাহার স্বাভাবিক মানসিক বৈশিষ্ট্য নহে। চিন্তাশীলতা ও কর্মঠতা দুই দিকেই বাঙালী তুল্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। নব্যজ্ঞান তাহার চিন্তাশক্তির অপূর্ণ নিদর্শন, বিশালবুদ্ধি বঙ্কিমের স্বল্প দৃষ্টিপাতে ভূত ভবিষ্যৎ আলোকিত, কর্ম্ম বিবেকানন্দের সৃষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব ভারতের সর্বত্র এমন কি দেশান্তরেও প্রসরণশীল। অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা যদি বাঙালীর জন্মগত না হয়, লব্ধগুণ মাত্রই হয় তবে তাহার কারণ কি? প্রতিকারই বা কি?

কিছু ভাবপ্রবণতা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এবং তাহার নিদর্শনস্বরূপ অজ্ঞাতকরণরসের চর্চ্চা নেহাৎ অপ্রত্যাশিত নহে, কিন্তু যখন কেবল করুণ রসের উপরেই পক্ষপাতিস্থ দোষা যায় তখন তাহাকে রসপ্রিয়তা না বলিয়া রোগ বলাই সমীচীন। এই রোগের মূলে আছে পরের নিকট হইতে সহানুভূতি-প্রাপ্তির হীন লৌপুতা। যখন প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে, কাব্যে, অভিনয়ে, রাজনৈতিক বক্তৃতায় কেবলই দৈনন্দিন জীবনের লাঞ্ছনার কাহিনী পল্লবিত ভাষায় প্রকাশ করি তখন এই সব লাঞ্ছনার প্রতিকার চিন্তা অপেক্ষা পাঠক বা দর্শকবর্গের সহানুভূতি আকর্ষণের উদ্দেশ্যই তাহাতে বেশী থাকে। এই সব লাঞ্ছনার প্রকৃত প্রতিকার বা প্রতিষেধ পুরুষকারের আশ্রয় লওয়ার মধ্যেই বস্তুত আছে, কিন্তু দুর্বল মন যখন পুরুষকার আশ্রয় করিতে নিশ্চেষ্ট এবং নিজের দুর্বলতা স্বীকার করিতেও অসম্মত তখন সে সরলতা ছাড়িয়া নিজের সঙ্গেই ছলনার আশ্রয় লয় এবং ভাবপ্রবণতার আবরণে নিজের অক্ষমতা গোপনের চেষ্টা করে। এই ভাবপ্রবণতার মাত্রা আরও বেশী নজরে পড়ে যখন দেখিতে পাই একজাতীয় অক্ষমের দল রবীন্দ্রনাথের বা মহাত্মা গান্ধীর অনুকরণে বিশ্বপ্রেমের নামে বিহ্বল হয়। বিশ্বশুদ্ধ যাহাকে লাঞ্ছিত করিতেছে এবং যে অসহায় ভাবে সেই অপমান পরিপাক করিতেছে তাহার পক্ষে

বিশ্বপ্রেমের সাঙ্গুনা সহজেই চিত্তাকর্ষক হয়। অনভ্যাসের দুরূহ যাহারা জন্মাবধি শ্রমবিমুখ ও তাহার ফলে যাহারা স্বভাবতঃই উত্তমস্থান নিরুৎসাহ তাহাদের পক্ষে স্বকীয় চেষ্টার মধ্যে আনন্দ পাওয়া শক্ত, তাই পরের কৃতিত্ব আশ্রয়সাং করিবার লোভ তাহাদের হইয়া থাকে। পরকে আত্মীয় না করিলে, পরের কৃতিত্ব নিজের মনে করিয়া সাঙ্গুনা পাওয়া যায় না, তাই এখানে প্রেমের প্রয়োজন এবং বিশ্বপ্রেমের দোহাই দিয়া আমরা অনেক সময় বিদেশী কৃতি পুরুষের কীর্তিতে গৌরব-বোধ করার আশ্রয়প্রসাদ পাই। প্রভারণাবুদ্ধি হইতেই এই জাতীয় বিশ্বপ্রেমের উৎপত্তি। অনেক সময় পরের কৃতিত্ব নিজের গৌরববোধের আশ্রয়প্রসাদ খুব স্পষ্ট বোকা যায় না, একটু প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে এবং উত্তেজনার আবরণে ঢাকা থাকে। স্বসমাজে আশ্রয়প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের ব্যর্থতার পর নিজের অক্ষমতা খালনের জন্ত স্বসমাজের দুর্নীতি কীর্তনে ও বিদেশী সমাজের সুব্যবস্থার প্রশংসায় উত্তেজিত হওয়া বিরল নহে। স্বসমাজে বিপ্লব সৃষ্টির কল্পনা যাহারা করে তাহাদের অনেকেই এই শ্রেণীর ভাবপ্রবণদের একটা অংশবিশেষ।

বাঙালীর ভাবপ্রবণতার মূলে যেমন সহানুভূতি ঘাট্টা ও সাঙ্গুনালিপ্সার মোহ আছে, নিজের অক্ষমতা গোপনের চেষ্টা আছে তেমনি শ্রমবিমুখতাও আছে। পরিশ্রমের কথা উঠিলেই ভুলিতে পাই—খেটে কি লাভ? কার জন্ত খাটব? আমরা খাটব আর অপরে তার মুনাফা ভোগ করবে। খেটে কিছু হবে না, উন্নতির সব পথই বন্ধ যতদিন না উপরওয়ালারা সরছে। এই জাতীয় আক্ষেপের মধ্যে সামান্য দুঃখকে অনেক সময় অস্বাভাবিক বড় করা হয়। পরিশ্রমের যে পুরস্কার আমরা আমাদের জাঘ্য প্রাপ্য বলে মনে করি, হয়ত অনেক সময় প্রবলতর উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অজায় ব্যবহারে তাহা হইতে বঞ্চিত হই, কিন্তু ইহার প্রতিকারে যদি কর্ম্মচেষ্টা হ্রাস করি তবে তাহা মোটেই স্বাস্থ্যকর হইবে না। এই দুঃখবন্ধার প্রতিকার পরিশ্রম বাড়ান। পরিশ্রম কমাইয়া জায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা—নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করার মতই করুণ। পরিশ্রম কমাইলে অজায়ের যোগ্য প্রতিবাদ করা হইল মনে করিয়া যে কাল্পনিক সাঙ্গুনা পাওয়া যায় তাহার চেয়ে আমাদের বাস্তবিক ক্ষতি অনেক বেশী হয়। শ্রমবিমুখতার পিছনে আবার আর একটি মনোভাব আছে—মনোবিচার ভাষায় তাহাকে বলা হয় “ফ্লাইট মেকানিজম”—মানে পলাইয়া কোন বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা। পরিশ্রম কমাইলে শারীরিক কষ্ট এবং প্রবঞ্চিত হওয়ার মানসিক দুঃখ এই

দুইটিকেই এড়ান যায় বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে প্রতিকূল ভাগ্যকে সব সময়ে পলাইয়া এড়ান যায় না। যে বনে একটি মাত্র বাঘ, সেখানে পলাইয়া বাঘকে এড়ান সম্ভব, কিন্তু যেখানে চতুর্দিকে বাঘের বাস সেখানে বাঁচিতে হইলে বাঘের সঙ্গে লড়িতেই হইবে, তাহা যত কঠিনই হউক না কেন। যদি মনে করি পরের জন্ত খাটিয়া লাভ নাই, তবে যাহাতে নিজেদের লাভ হইতে পারে বলিয়া মনে করি অন্ততঃ সে দিকেও খাটা উচিত। যদি সব সময়েই প্রতিবন্ধকের কথা বড় করিয়া দেখি তবে বুঝিতে হইবে তাহা হল মাত্র, আন্তরিক নয়।

দীতার মূল উপদেশ সঙ্গ ও ফল ত্যাগ করিয়া সর্ব কৰ্মের অনুষ্ঠান। ইহা যে কেবল আদর্শবাদ তাহা নহে, ইহার ব্যবহারিক মূল্যও আছে। আমরা সাধারণতঃ বুঝি সাকল্য বা ব্যর্থতা যে-কোন কাজেরই পরিণতি। প্রথমটিতে আসে সুখ ও তৃপ্তি, দ্বিতীয়টিতে আসে অবসাদ ও গ্লানি—এ পূর্ণাঙ্গ অস্বীকার করিবার কিছু নাই; সুতরাং কলাকলে সমবৃত্তি হওয়া নিছক আদর্শবাদ ও অকেজো উপদেশ মনে হওয়া সম্ভব। তবে যদি বুঝি যে, কোন কাজের কোন বিশেষ ফলটাই তাহার পরিণতি নয় তখন দেখিব কাজ সুরু হওয়ার আগে এবং ফলোদয়ের পরেও অবিচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রসঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায়। পাণ্ডবের পাশা খেলার পরাজয় কিংবা প্রতাপ-সিংহের হলদিঘাটের পরাজয় অথবা আধুনিক যুগে ইংরেজের ডানকার্কের পরাজয় এককভাবে দেখিলে ব্যর্থতাই, কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে তাহার পর আবার কুরুক্ষেত্র হইয়াছিল, দেওয়ীরের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং নর্মদাগির উপকূলে দ্বিতীয় ফ্রন্ট সুরু হইয়াছিল। ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে একটি ঘটনাকে আমরা তাহার পূর্ববর্তী কয়েকটি ঘটনার পরিণতি আখ্যা দিই।

আমাদের মনকে এই তথাকথিত পরিণতিতে আবদ্ধ না রাখিয়া যদি ঘটনাপ্রবাহের অবিচ্ছিন্নতার দিকে ফিরাই তবে দৃষ্টিভঙ্গীর এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিবে। তখন দেখিতে পাইব সাকল্যে যে সুখ কেবল পরিশ্রমেও তাহা রহিয়াছে। খেলার সময় কিছু কিছু আমরা ইহা অনুভব করি এবং তখন যদি কেহ বলে জয়পরাজয়ের প্রশ্ন বাদ দিয়া খেলোয়াড়ী মনোভাব লইয়া খেলা উচিত তখন তাহার প্রতিবাদ করি না। গুরু-দায়িত্বপূর্ণ কাজের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। কেবল খেলার যেমন আনন্দ আছে শুধু কাজেরও তেমনি আনন্দ আছে।

ভাবপ্রবণতার দুই ব্যাধিকে তাড়াইতে হইলে নিজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া পরিশ্রমের অভ্যাস স্থাপ্তি করা দরকার। অভীষ্টসিদ্ধির জন্ত সকল পরিশ্রমই সার্থক। যতই বিরক্তিকর হউক বিরক্তি চাপিয়া রাখিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে। এই বিরক্তিও অবশ্য রোগের অন্ততম লক্ষণ, ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। শিশুদের মধ্যে যাহাতে এই রোগ সংক্রামিত না হয় তাহার জন্ত তাহাদের সামনে বস্তুদের নিজেদের ভাবোচ্ছুক সংযত রাখিয়া কৰ্ম্মতৎপরতাই দেখান সমীচীন। শিশু-সাহিত্যের মধ্যে যাহাতে ভাবপ্রবণতার বাহুল্য না থাকে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ছুঃখের বিষয়, বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে দেশপ্রেম, সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি শিখাইবার ছলে শিশুদের ভাবপ্রবণতাই বেশী শিক্ষা দেওয়া হয়। ভাবপ্রবণতা যখন স্বাভাবিক গতির মধ্যে থাকে তখন ব্যবসায়িকতা বুদ্ধির উন্নতি হয় ও নানা রকম উদ্ভাবনী ক্ষমতারও বিকাশ পায়। বাঙালীর মধ্যে যখন এই ব্যবসায়িকতা বুদ্ধি তীক্ষ্ণতা লাভ করিবে তখন তাহার অন্তর্নিহিত উদ্ভাবনী ক্ষমতাও সম্যক বিকশিত হইবে এবং ঈশিত সাকল্যও করায়ত্ত হইবে।

## কোথা আলো?

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সুখ্য আজ যেথো ঢাকা। আসিয়াছে দিন,  
আসে নি আলোক তবু; রাত্রি অবসান,  
অক্রান্ত এখানে কিন্তু বিহ্বলের গান;  
অরুণের আভা হ'ল অন্ধকারে লীন।  
নীরব রহিয়া গেল প্রভাতের বীণ,  
সাড়া জাগালো না সুরে আলোর আহ্বান,  
সুপ্তোখিত—উঠিল না উচ্ছ্বসিত প্রাণ,  
লুপ্তজ্যোতি জীর্ণ ধরা হ'ল না নবীন।  
আনিবে নবীন উষা নূতন বারতা,  
শুনিব জগতে নব জীবন-স্পন্দন,  
সে কি হ'ল স্বপ্ন আর কল্পনার কথা?  
রুদ্ধ উৎস করিল না বিমুক্ত-বন্দন।  
কোথা আলো, কোথা আলো? এল স্বাধীনতা,  
এল দিন, এল না কো নব-জাগরণ।

## পূর্ণ স্বাধীনতা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

অল্পে সুখ নাই, বহু, অল্পে সুখ নাই,  
দূরান্তরে স'রে যায় মনের সীমানা,  
সেখানে গিয়াছে মিশি জানা ও অজানা,  
পথ হয় না কো শেষ যত চলে যাই।  
চেয়েছি স্বাধীন সভা, আজ কারে চাই?  
কি যে চাই—সে চাওয়ার নাই কো ঠিকানা,  
আশা আর কল্পনার কে করে নিশানা?  
অল্প নয়, আরো চাই, শুধু জানি তাই।  
অপূর্ণ যা—মনে আনে অতৃপ্তির স্বাদ,  
মাছুষ বাধারে কবে-করিয়াছে ভয়?  
এস বহু, কেন মিথ্যা বাদ-বিসম্বাদ,  
একত্রে করিতে হবে সব বিদ্র জয়।  
পূর্ণ হবে স্বাধীনতা, পূর্ণ হবে সাধ,  
জাতির জীবন হবে অজয়, অক্ষয়।



# ভারতবর্ষীয় মুদ্রানীতি

শ্রীবিমলাকান্ত সরকার

পূর্বে মুদ্রা বিনিময় হার লইয়া অনেক মতান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। হিলটন ইয়ং কমিশনের নিয়োগকাল হইতে প্রায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত কেহ কেহ বলিতেন এই হার অত্যন্ত উচ্চ অল্পপাতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে সুতরাং ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পক্ষে তাহা খুবই ক্ষতিকর। অপর দল মোটের উপর বলিল যে, এই হার বৈদেশিক বাণিজ্যের সামগ্র্যস্তের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দেশীয় মুদ্রামূল্যেরও কিছু অল্পবিধা উৎপাদন সে সময় করে নাই সুতরাং তাহাই ঠিক ছিল।

যাহা হউক, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় পরিস্থিতি অল্প রকমের হইয়া গেল। তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে যুদ্ধের জন্ত দ্রব্যাদি ভারতে ভারত গবর্ণমেন্টকে ক্রয় করিতে হইয়াছিল। ভারত গবর্ণমেন্টও বহু টাকার দ্রব্যাদি এই জন্ত ক্রয় করিয়াছিলেন। অতীত দেশে নোট ছাপাইলেই “টাকা” হয়। ইচ্ছা করিলে ত গবর্ণমেন্ট “নোট” ছাপাইয়াই ব্যয় নির্বাহ করিতে পারেন কিন্তু তাহার দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি ও অতীত অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য এরূপ দেখা দেয় যে তাহা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে বিশেষ আবশ্যক বলিয়া নোটের বদলে তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ব্যয়সাপেক্ষ “টাকা” তৈয়ারী করিয়া ব্যয় নির্বাহ করা হইতে লাগিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে কিন্তু ইহার পরিবর্তে “টালিং” পাওয়া গিয়াছিল এবং তাহা গ্রেটব্রিটেনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে মজুত রহিল। ভারতে সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি খুব প্রকট হইল। ১৯৪৫ সালে গ্রেটব্রিটেনের জিনিষপত্রের সাধারণ মূল্যের শতৈকিক সংখ্যা প্রায় ১০০ স্থলে ১৬৬ হইয়াছিল, ভারতে ১৯১৪ সালের তুলনায় সম্ভবতঃ ২৪৭ হইয়াছিল। অর্থাৎ প্রায় তিন গুণ বাড়িয়াছিল। যদিও এখানে আলোচনার অবকাশ নাই তাহা হইলেও বলা যায় যে “টাকার” সংখ্যা বাড়িলে কাহারও কাহারও মতে জিনিষপত্রের সাধারণ মূল্য বাড়িয়া যায়—কিন্তু এখন প্রতিষ্ঠিত মত হইতেছে যে তাহা প্রত্যক্ষভাবে না হইয়া পরোক্ষভাবে অতীত কতকগুলি সর্বের ব্যবস্থা না থাকিলেই হইয়া থাকে। মুদ্রাসংখ্যা যদি বাড়ে কিন্তু অযথা লভ্যাংশ যদি না বাড়ে সুতরাং সাধারণ উপার্জন যদি বাড়িয়া যায় এবং উৎপাদন বাড়ে তাহা হইলে মোটের উপর জিনিষের সাধারণ মূল্য জিনিষ তৈয়ারীর যুক্তিসংগত খরচের সমানই হয় এবং মুদ্রাস্ফীতি হয় না। অপরপক্ষে তাহা না হইলে মুদ্রাস্ফীতি হইয়া থাকে। যে ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি হয় না সে ক্ষেত্রে খরচপত্র বাদ দিয়া আয় যদিই বা

বেশী হয় তাহা পুনরায় আবার লগ্নীকৃত করা উচিত। সুতরাং তাহাতে দেশের ও দেশের উপকার হয়, সাধারণ উপার্জন বাড়ে ও জিনিষপত্রের উৎপাদনও বাড়িয়া যায়। এখানে দুই চারিটি কথা বলা, দরকার। পুরাতন মনীষীদিগের মত অহুসারে মুদ্রার বিনিময় কার্য ছাড়া বিশেষ আবশ্যকতা ছিল মনে হয় না। অবাধ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আছে এই কাল্পনিক অহুমানের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সামঞ্জস্যও প্রতিষ্ঠিত আছে এইটাই প্রচলিত ধারণা ছিল। কয়েকজন মনীষীর মতে মুদ্রার অর্থনৈতিক স্বতন্ত্র স্বপ্নের একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে। ইহাদের কাহারও কাহারও মতে মুদ্রার সংখ্যা ও ঠিকমত ব্যবহার ভিত্তির উপরেই সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠিত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই মত এত অদূরপ্রসারী যে তাহার বলন ঠিকমত বিধান হইলে অযথা দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইবে না; মজুরের বেতন, খাজনা, ব্যবসায়ীর প্রাপ্য লাভ ও মুদ্রা জায্যমত

১। Keynes—

$$II = \frac{E}{O} + \frac{I - S}{O};$$

II = জিনিষের মূল্য (সাধারণ), I = নতুন লগ্নীকৃত মূলধন সকল রকমের (ইহার মধ্যে পুরাতন মূলধন ও হিসাব আছে মনে হয় যদিও Treatise তাহা পরিকার নয়)

S = সকল রকমের উদ্ভূত জমা।

O = সকল রকমের উৎপন্ন দ্রব্য।

E = সকল উপার্জন।

উদ্ভূত টাকা ও লগ্নীকৃত মূলধন একই হইলে অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য হয়। তাহা হইলে সাধারণ মূল্য—সকলের উপার্জন (খাজনা, ব্যবসায়ীর লাভ, মুদ্রা ও বেতন) বিভাজিত উৎপন্ন দ্রব্যের সমান হইবে। ইহাতে সামঞ্জস্য হয়।

যদিও মোটের উপর এই মত প্রকাশ করিয়াছেন তথাপি মনে হয় পরের পুস্তকে ব্যবসায়ীর লাভ স্বতন্ত্র যে আলোচনা করেন তাহাতে ব্যবসায়ের ক্রম ঠিক এরূপ রাখেন নাই। সাধারণ বৃদ্ধিতে মনে হয় উপার্জনকারীরা একই ব্যবসায়ের অধীনস্থ (vertical) নয়, বিভিন্ন ব্যবসায়ের horizontal সহিত সংশ্লিষ্ট সুতরাং মূল্য (II) কিসি বৈশী সহিত উপার্জনের সামঞ্জস্য হচক বৃদ্ধি না হইলে কল্যাণ হইবে কি? Keynes পরের পুস্তকে উৎপাদনের কথাও বলিয়া সাধারণ মূল্যের কিসি বৈশী রূপ ইহা অপেক্ষা পরিকার। যাহাই হউক, পুরাতন অর্থনীতিবিদগণের গ্রন্থ অবাধ প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব না ধরিলে ব্যবসায় বাড়িয়া গেলই কি সাধারণ উপার্জন বাড়িলে বিশেষতঃ চড়া বাজারে এবং বেকার সমস্যা কমিবে? এমনও ত হইতে পারে, সুযোগলাভকারীরা বেশী উপার্জন করিবে এবং অস্ত্রের হয় বেকার থাকিবে বা অল্প উপার্জন করিবে?



বণ্টন হইবে এবং সমাজে অর্থনৈতিক অকল্যাণ থাকিবে না। ইহা সাধারণতঃ তিনটি তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনও শিল্পব্যবসায় আয় উৎপাদনকারী মূল লব্ধীকৃত হইলে জব্যাদির উৎপাদন যে পরিমাণ বাড়িবে (ক) লোকের সাধারণ ভোগ করিবার জন্ত জব্যাদিও সেই পরিমাণে ক্রয় করা উচিত, এইরূপ হইলে জব্যাদির উৎপাদনও বাড়িবে এবং মজুর ব্যবসায়ী ইত্যাদির আয়ও সেই অনুসারে বাড়িবে। (খ) সাধারণতঃ মূলধন সেই পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে লব্ধীকৃত হইতে থাকিবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিল্পব্যবসায়ীরা লভ্যাংশ বাড়াইতে পারে এবং তাহা বাজার স্তরের সমান হয়। (গ) সমাজের—সমস্ত আয় উৎপাদনকারী মূলধনের প্রান্তিক মুনাফা মূলধন সৃষ্টির প্রান্তিক অল্পবিধার সমান হওয়া কর্তব্য এবং এই মুনাফাকে যুক্তিযুক্ত স্তরের হার বলিয়া ধরিলে সাধারণ বাজারের স্তরের হার তার সহিত পরিশেষে সমান হওয়া উচিত। যে বাজারের স্তরের হার বলা হইল তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা নিয়মিত হয়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে অর্থনৈতিক সামঞ্জস্যের জন্ত মুদ্রার ক্ষমতা কত অধিক; কারণ সেই অনুসারেই ব্যবসায়ীরা অর্থ লব্ধীকৃত করিতে পারিবে এবং সেইমত উপরি-উক্ত অজ্ঞাত তত্ত্বগুলির সহায়তায় বেকার-সমস্যা, উপার্জন-সমস্যা ও সাধারণ মূল্য-সমস্যা সমাধান করিতে পারিবে। বলা বাহুল্য, যাহারা এই কথা বলেন তাহারাও বুঝেন যে ইহা সকল সময় কার্য্যতঃ ফল দর্শায় না। যে ধনিকরা মূলধন লব্ধীকৃত করেন তাহাদের দল মুনাফা পাইতেই ব্যস্ত সুতরাং অজ্ঞাত জব্য উৎপাদন বা ক্রয়ের জন্ত বিশেষ দরকার বোধ করেন না। মূলধন যে লব্ধীকৃত করিয়াই যাইবেন তাহার মানে নাই, যে পর্য্যন্ত তাহার লাভ সব চেয়ে বেশী হইবে

সেই পর্য্যন্ত টাকা খাটাইলেই তাহার সুবিধা। সাধারণ মজুর ইত্যাদির আয় বেশী বাড়িল না, জব্যাদি উৎপাদন খুব বেশী হইল না—অথবা মুনাফা বেশী হইল। ইহাও হইতে পারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মূলধন লব্ধীকৃত করিয়া যাওয়া হইবে এবং সেই অনুসারে এক মজুর ইত্যাদি দলের মুনাফা বাড়িয়া গেল, জব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি হইল না। দুই ক্ষেত্রেই বাটী মুদ্রাস্ফীতি হইল।

মুদ্রাস্ফীতি হইলে সাধারণতঃ মহাজনরা খুব লাভের আশা করিয়া থাকেন সুতরাং খুব “টাকা” লব্ধীকৃত করিয়া যান। কিছুকাল পরে দেখা যায় মূলধনের উপার্জন শক্তি যাহা আশা করা গিয়াছিল তাহা নাই এবং উৎপাদন শক্তি হ্রাস হইয়াছে ধরা পড়িলে তাহাদের মনে ভ্রাসের সঞ্চার হয় এবং অহেতুক উৎকণ্ঠার “টাকা” সকল ফিরাইয়া লইতে চাহেন; ফলে ব্যবসায় ক্ষেত্রে সব ওলটপালট হইয়া যায়—অথবা খুব সাবধানে থাকিতে পারিলে “মন্দা” আস্তে আস্তে বাড়িতে থাকে এবং সুবিধাজনক পরিস্থিতি না হইলে এই “মন্দা” ধনীভূত হয়। পরে আবার অবস্থা আস্তে আস্তে ফিরিতে ফিরিতে ব্যবসা-বাণিজ্য ফাঁপিয়া উঠে। কেহ কেহ বলেন এই রীতি স্বাভাবিক; কেহ কেহ বলেন তাহা নহে কোনও বিশেষ পরিস্থিতির ফলের জগ্গেই ব্যবসায় ক্ষেত্রে এইরূপ হয়। বর্তমান ভারতবর্ষে দেখা যাক অবস্থা কি? কোনও এক মনীষী পূর্ব উল্লিখিত পথে অজ্ঞ এক অর্থনীতিবিদের ( ভারত-গবর্নমেন্ট সংশ্লিষ্ট ) মতানুযায়ী অনুশীলন করিয়া সাধারণ আয়—ও সাধারণ মূল্যের সম্বন্ধ নিরূপণ দ্বারা—অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য তিক করেন।<sup>১০</sup> এই অনুমানদ্বারা নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি অনু-ধাবনযোগ্য।

| ১৯১৪ সাল                        | ১৯৩০-৩১ | মুদ্রাস্ফীতি<br>বা মন্দার চিহ্ন | ১৯৪৭ সাল | প্রভেদের<br>পরিমাণ         |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|----------|----------------------------|
| সাধারণ মূল্যের                  |         |                                 |          |                            |
| শৈতনিক সংখ্যা—১০০               | ১০৯     |                                 | ২১৪      |                            |
| সাধারণ আয় খাদ্য পরিমাণাদির     |         | $\frac{1}{100} \times 100$      |          | $\frac{1}{100} \times 100$ |
| মূল্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত—১০০ | ১২৯     | $= 8.9\%$                       | ২৮২      | প্রায় ১০৪                 |

২। তিনটি তথ্য হইতেছে Propensity to consume, Marginal Efficiency of Capital ও Rate of Interest। স্তরের হার আয় উৎপাদনকারী মূলধনের প্রান্তিক মুনাফার সহিত সাধারণতঃ সমান হইবার কথা কিন্তু বাজারের গতি বর্তমান যে মূলধন আছে তাহার ভবিষ্যৎ লাভ কি রকম হইবে সেই দিকে যায় এবং তৎপরতাও সেই রূপ হয়। চড়া বাজারের সময় লোকেরা বেশী মূলধন খাটাইতে চায় কারণ মনে করে বেশী লাভ হইবে। এইরূপ মূলধনের মুনাফার সহিত ও “টাকা” চাহিদার সহিত মুদ্রার সংখ্যা ও হ্রদ জড়িত।

৩। ইহা খুব নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয়। কারণ জীবিকা নির্বাহের খরচায় শৈতনিক সংখ্যা (Cost of living index number) এবং উপার্জনের শৈতনিক সংখ্যা একেবারে এক নয় কেবল আন্দাজে তুলনা করা যায় মাত্র। ইহা ব্যতীত পূর্বেই বলিয়াছি যদিও Keynes এর মত এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয় কিন্তু তাহার পরের পুস্তকে উৎপাদনের পরিমাণের উপরও জোর দিয়াছেন মনে হয়। (Of. General Theory of Employment Interest and Money).

এদেশের জিনিষের মূল্য সেই অনুসারে যদি বাড়িয়া যাইত তাহা হইলে বিদেশ হইতে আমদানী বাড়িত এবং সামঞ্জস্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইত। কিন্তু এক্ষেত্রে দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়া গেল 'সোনা' আমদানী করিয়া নয়। প্রকৃতপক্ষে গ্রেটব্রিটেনে যে 'ষ্টার্লিং' (প্রায় ১২০০ মিলিয়ন পাউণ্ড) জমা আছে, সেই অনুপাতে "টাকা"র সংখ্যা বাড়ান হইল। এই টাকা কাগজের টাকার দ্বারা সামান্য রূপার উপর মুদ্রিত "রূপেয়া"। তাহার দ্বারা বৈদেশিক মাল আমদানী করিয়া পুনরায় মুদ্রা পরিমাণের সামঞ্জস্য করা সম্ভব নয় কারণ ঐ 'ষ্টার্লিং' 'সোনার' দ্বারা বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী করিতে অপারগ। গ্রেট ব্রিটেন তাহা বন্ধকী রাখিয়া আমেরিকা হইতে 'সোনা' বা স্বর্ণকণ্ঠ "বৈদেশী" মুদ্রা সরবরাহ করিলে উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা অনেক বৈদেশী দ্রব্য আমদানী করিয়া মুদ্রাস্ফীতির লাঘব ঘটাইবার সুবিধা করিতে পারেন এইরূপ কাহারও কাহারও মত মনে হয়। সম্ভ্রতি ১৬০ মিলিয়ন পাউণ্ড তিন বৎসরে পাওয়া যাইবে জানা গিয়াছে। আলোচ্য পরিস্থিতির পক্ষে ইহা সুবিধাজনক হইতে পারে।

(৩) কলিকাতায় যে অর্থনৈতিক কন্ডেনসেশন হইয়া গেল সেখানের এই মত মনে হয় যে টাকা প্রচুর করা উচিত নয়। অনেকে বলেন যে মুদ্রাস্ফীতির লাঘব ঘটাইতে হইলে ব্যাঙ্কের সুদের হার বাড়ান উচিত তাহা হইলে 'টাকা' আগাম ব্যাঙ্ক হইতে লোকে লইবে না এবং অত্যন্ত কাগজ-পত্রাদির মূল্য বৃদ্ধিত হুদ অনুসারে কম হইয়া যাওয়ায় ব্যাঙ্কগুলি ও সাধারণ লোকেরা কাগজেই বেশী "টাকা" লগ্নীকৃত করিবে সুতরাং টাকার সংখ্যা কমিয়া যাইবে। একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ বলেন মুদ্রাস্ফীতির এইরূপ দাওয়াই ক্ষতিকর—ইহাতে অনেক আয়—হঠাৎ মন্দা পড়িয়া যাইতে পারে এবং ভালর স্থলে খারাপ হইতে পারে। এখন অনেকে বলেন যে 'সুদের' যে এই ক্ষমতার কথা বলা হইয়াছে ইহা অতিরঞ্জিত এবং ব্যাঙ্কের সুদ কমিবেশী করিয়া খুব বিশেষ ফলবান্ হওয়া যায় না। যদি-ই টাকার সংখ্যা কমিবেশী করিতে হয় তাহা লভ্যতার ও সেই অনুসারে সরবরাহের উপর নির্ভর করে। ৫ বাহাই হটক বর্তমানে অনেকের মত এমন কি 'টাকা' আটকাইয়া রাখিয়াও টাকার পরিমাণ কম করার পক্ষে। অপর পক্ষে অনেকের মত 'টাকা' সস্তা করা হিতকর।

(৪) তবে ইহাতে দেখা দরকার যে, টাকা কেবলই যেন

বাড়িয়া না যায় এবং মুদ্রাস্ফীতির হারও সেই অনুসারে না বাড়ে। চীনে একটি ডলারের মূল্য আমেরিকার ডলারের তুলনায় অতীব নগণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেজন্য গবর্ণমেন্ট গুলির আয় যেন ব্যয় অপেক্ষা সাধারণতঃ বেশী না হয় ইহা দেখা দরকার। অথচ এ সময় রাষ্ট্র-বিভাগ, ভিন্ন রাষ্ট্র হইতে আগতদের ব্যবস্থা জন্ত শান্তিশৃঙ্খলা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির জন্ত খরচাও কম নয়।

(৫) বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে স্বদেশের ঘাটতে ক্ষতি না হয় সে জন্ত বৈদেশিক সামঞ্জস্যকল্পে মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য যেন অতীব বেশী না হয় সেটাও দেখা দরকার। একজন মনীষী বলেন যে, যদি আমরা স্বদেশীয় ব্যবস্থাতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সামঞ্জস্য আনিতে পারি তাহা হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি আকাজকা এবং নানারূপ প্রতিযোগিতা করার দরকার থাকে না। তথাপি বলা উচিত, এই বৈদেশিক বাণিজ্য সামঞ্জস্যের জন্ত এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত যে 'সোনা' পাঠাইতেও না হয়, 'সোনা' আমদানী করিতে না হয়। এই সামঞ্জস্যের জন্ত যে সমস্ত দ্রব্য লইয়া বৈদেশিক বাণিজ্য হয় তাহাদের দরের শতৈকিক সংখ্যার পরিবর্তন একই রূপ হওয়া উচিত এবং দুই দেশের সুদের হার এক রূপ থাকা উচিত। যখন সাধারণ মূল্যের (বিশেষতঃ বৈদেশিক বাণিজ্য দ্রব্যের) শতৈকিক সংখ্যাতে প্রভেদ হয় তখন মোটামুটি হিসাবে ধরা যায় বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় হারেও তফাৎ হয় এইরূপে হইলে অর্থাৎ বিনিময়-হার তফাৎ করিতে দিলে স্বদেশে অর্থনৈতিক কোনও গোলমাল হয় না অথচ সামঞ্জস্য ফিরিয়া যাইতে পারে। যদি অস্বাভাবিক কোনও কারণে বা অন্য মেয় কোনও ঘটায় তাহা না হয় তাহা হইলে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্ত অন্য দেশের মূল্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া হার পরিবর্তন করাই সমীচীন। বৈদেশিক সুদের হার স্বদেশের সুদের হার অপেক্ষা তফাৎ হওয়া উচিত নয়। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে ভারতের সুদের হার (ত্রৈমাসিক লেন-দেনের) ০.৫০% (বার্ষিক), বিলাতে—০.৫১%, এবং আমেরিকায় ০.৯৫%। বিলাতের সহিত মুদ্রা বিষয়ক বাণিজ্যের সম্পর্ক এখনও বেশী ধরিলে বুঝা যায় হুদ কমিবেশীর দরকার নাই। বৈদেশিক বাণিজ্য-ঘটিত দ্রব্যের মূল্যের হার না জানা গেলেও সাধারণ মূল্যের হারের অবস্থা এইরূপ—

|      | ভারত | বিলাত | আমেরিকা |
|------|------|-------|---------|
| ১৯৩৭ | ১০০  | ১০০   | ১০০     |
| ১৯৪৭ | ২৯৪  | ২০৮   | ১৯৩     |

৫। Variable Reserve Ratio ও অত্যন্ত উপায় বেশী উপযোগী। "availability" (লভ্যতা) ব্যাঙ্কগুলির বিচারের উপর নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট অত্যন্ত ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের মোট ধনাত্মক জমার কি অনুপাতে সোনা জাতীয় নির্ভরযোগ্য দ্রব্য রাখিতে হইবে তাহার নির্দেশ দিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে অনেক সময় দেওয়া হয় (Variable Reserve Ratio)।

দ্রব্যাদির মূল্যের হিসাব দেখিতে গেলে মনে হয় ভারতের বিনিময় হারের হ্রাস করা যাইতে পারে। তাহাতে জিনিষ-পত্রের রপ্তানী বাড়িতে পারে এবং অর্থগম হইতে পারে কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্য সমস্ত দেশের বাণিজ্যের তুলনায় অল্প হেতু

এই মাপকাঠিতে মুদ্রাস্ফীতির বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে ইহা স্বল্প বিচারের যথার্থ মাপকাঠি নয়। উৎপাদন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে আর একটু পরিষ্কার বুঝা যাইতে পারে।

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| মাসিক উৎপাদন                    | ১৯৪৭ সালে মার্চ মাসে |
| ১৯৩৮-৩৯                         | উৎপাদন               |
| সুতার বস্ত্রাদি ৭৬'৬৮ (মিলিয়ন) | ৭০'০৩ (মিলিয়ন)      |
| পাউণ্ড                          | পাউণ্ড               |
| চিনি ১৬০৫০০০ (হন্দর)            | ৪৮৪৪০০০ হন্দর        |
|                                 | (জাম্বারী মাসে)      |
| কয়লা ২০৬৮০০০ (টন)              | ২৪০৬০০০ (টন)         |
| গম ১৩৫৪৪৫০ (মণ)                 | ১২০৪৫৪০ (মণ)—        |
|                                 | ১৯৪৬ মার্চ মাসে      |

কেরাসীন ৩'২ মিলিয়ন গ্যালন ১'০৯ মিলিয়ন গ্যালন  
ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে অধিকাংশ আবশ্যক দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৯ সালের তুলনায় খুব বেশী বাড়ি নাই। তাহা হইলে আমরা যে কথা পূর্বে বলিয়াছি—  
যদি এমন অবস্থা আসে যখন সাধারণ উপার্জনাদি বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং সাধারণ দ্রব্যের মূল্যও বাড়িয়াছে অথচ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় এক—তখন বুঝিতে হইবে মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছে। এই বিশেষ মাপকাঠি হইতে বুঝা যায়—  
মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছে।

গবর্ণমেন্ট কাগজের দাম যদি ধরা যায় তাহা হইলে দেখা যায় ১৯৩৫-৪২ সালের ঋণ ১০২½ দরে সঞ্চিত হইয়াছে কিছুকাল পূর্বে এবং ১৮৯৬-৯৭ সালের অপরিশোধনীয় ঋণের কাগজের ৯৯ টাকা দর পাওয়া গিয়াছে সুতরাং দেখা যাইতেছে—সে বাজারও বিশেষ মন্দা নহে।  
অপর পক্ষে ইহা সকলের নিকট প্রায় বিদিত যে ১৯৪৬ সালের কলিকাতার দাঙ্গার পর অত্যাধিক কাগজ কেনা-বোচার বাজারে মন্দা আসিয়াছে। কখনও একটু উন্নতি হয়, তবে অধিকাংশ সময়েই খুব চাপা ও সতর্কতার ভাব প্রকট।  
সুতরাং কাগজের বাজারে মন্দা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত বলা হইতেছে।

সুদ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বোম্বাই-এ কিছু দিন পূর্বে ব্যাংকগুলি সামান্য দিনের জমার জন্য ১ই শতকরা সুদ দিতেও রাজী ছিল, অবশ্য তাহাদের নিকট ঋণ লইয়া খাটান'র বাজারে বেশ তৎপরতা ছিল। সুদের হার হইতে বুঝা যায় মুদ্রাস্ফীতির সমস্ত উৎপাদনমূলক ব্যবসাতে 'টাকা' খাটান'র যে চাহিদা থাকে তাহাতে মন্দা পড়িয়াছে।

সুতরাং আমার ধারণা এখনও মুদ্রাস্ফীতি আছে এবং তাহার সম্বন্ধে সজাগ থাকা উচিত। এই সময়েও যে তৎপরতা দেখা যায় সে বিষয়ে সম্ভবত কমতি পড়িয়াছে। কাগজের

বাজারে যে মন্দার ভাব দেখা যায় তাহা ব্যবসায়ের স্বাভাবিক ঠাণ্ডামার'র খেলার' চিহ্ন বলিয়া মনে হয় না, ইহা রাষ্ট্রনৈতিক ও অত্যাধিক পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সৃষ্টি। মন্দার দিকে যে গতি দেখা যাইতেছে সেই সম্বন্ধে ও অত্যাধিক সম্বন্ধে সতর্ক হইলে উহা কাটিয়া যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমার বুদ্ধিতে যাহা সমীচীন মনে হয় তাহা বলিতেছি।

(১) একজন বিখ্যাত মনীষীর মত এই বলিয়া মনে হয় যে মুদ্রাস্ফীতি এবং সেই সময় বাজারের তৎপরতা বেশী হইবার পর যে মন্দা আসে তাহার প্রধান প্রতিবেশক হইতেছে বিধিবদ্ধ ভাবে 'টাকা' খাটান এবং বিধিবদ্ধভাবে খরচ বাড়ান। এইজন্য সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় গবর্ণমেন্টকে কিছু কাজ করা দরকারই হয়। সে তরফ হইতে বিধিবদ্ধভাবে 'টাকা' খাটান হইলে লোকেরা নিয়মিত ভাবে টাকা খাটাইয়া যাইবে এবং বেশী মুনাফা আশা করিবে না সুতরাং অথবা টাকা খাটাইবে না এবং হঠাৎ লোকসান ঘটাইয়া মন্দা আনিবে না। অপর পক্ষে যাহাতে এই টাকা লোকে খাটাইতে পারে সেজন্য ব্যবসায়ের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা থাকে দরকার সুতরাং সেই সেই দ্রব্যের জন্য ধনীদেব বেশী খরচ করা উচিত। ইহাতে ক্রমশঃ উৎপন্ন দ্রব্য বাড়িবে। লব্ধীকৃত টাকা কমিবে এবং উৎপাদনের সহিত বেকার সমস্যা কমিবে ও সাধারণ আয় বাড়িবে। বর্তমান ভারত গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে আর্থিক সমবায় একটি গঠিত হইয়াছে যাহার মারফত ও সাহায্যে বিধিবদ্ধ ভাবে টাকা লব্ধীকৃত হইতে পারে। মূলতঃ পদ্ধতি অনুসারে গবর্ণমেন্ট তরফ হইতে কিছু কিছু—শিল্প ব্যবসায়াদি চালাইবার বন্দোবস্তও হইতেছে। ইহা বিধিবদ্ধ ভাবে বর্ধিত হারে হইলে যদিও মন্দার দিকে বাজারের গতি থাকে তাহা সংশোধিত হইতে পারে।

(২) যদিও বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্বন্ধে অধিক কথা বলা আবাস্তর হইতে পারে তথাপি 'পোলিং' সম্বন্ধে একটা কথা বলা যাইতে পারে। গ্রেট ব্রিটেনের তরফ হইতে যখন যুদ্ধের সময় প্রচুর দ্রব্যাদি ভারত হইতে গিয়াছিল তাহার মূল্য 'সোনার' যদি পাওয়া যাইত এবং মোটামুটি হিসাবে

৪। 'খরচ' (prosperity to consume) বাড়াইবার ব্যবস্থা কিরূপে হইবে বলা কঠিন। উক্ত মনীষীর মত যতদূর বুদ্ধিতে পারি তাহা এই—  
যাহারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র তাহারা সাধারণ খরচ তাহাদের আয়ের তুলনায় অনেক বেশী করিয়া থাকেন অপর পক্ষে ধনীরা তাহা করেন না। সুতরাং বেশী লোক ধনী না হইয়া সে ধন যদি সকলের মধ্যে বণ্টিত তাহা হইলে এই খরচ বাড়ি সম্ভব। অপর পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে জন্ম ব্যবসায়াদিতে নৈপুণ্য ও সামাজিক কার্যাদির ভারের সামঞ্জস্য (decentralisation) যাহাতে ব্যাহত না হয় সেটা দেখা দরকার। এইজন্য প্রচুর করে বন্দোবস্ত না করিয়া মরণান্তর সম্পত্তি পক্ষান্তরের সময় কর ধার্য করা ও 'সুদ' বিধিবদ্ধ করার তিনি পক্ষপাতী। ভ্রমাদির ন্যায় আনন্দদায়ক বা পুষ্করী খনন প্রভৃতি জনহিতকর কার্যে খরচ করা সমীচীন।

সহস্রাব্দে আভ্যন্তরিক অর্থনৈতিক বিপ্লব কিছু না হওয়াই সম্ভব। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে শতকরা দশ পর্য্যন্ত বিনিময় হার তফাৎ করা যায়। মুদ্রাবিনিময় হার লইয়া প্রভূত বাদানুবাদ পূর্ব্বে হইয়াছে এবং এ প্রবন্ধে তাহার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া ছাড়া বিশেষ না বলাই সমীচীন। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের মতে মুদ্রাবনমন করিলে রপ্তানী বাড়িতে পারে এবং মুদ্রাস্ফীতিও বাড়িতে পারে, ইহা ঠিক নয়। অল্পদিনের ব্যবস্থা হইলে এদেশে লগ্নীকৃত 'টাকা' বিদেশে চলিয়া গিয়া মুদ্রাস্ফীতির হ্রাস করাই সম্ভব। বর্তমানে ক্রায়ে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৬) পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির জন্ত আশঙ্কা বা রাষ্ট্রিক গোলাযোগ ইত্যাদি জন্ত এবং সুবিধা বুঝিয়া লাভের জন্ত মজুত করা ও 'কালোবাজার' প্রচলন জন্ত সাধারণ মূল্যের দর বৃদ্ধি হওয়া অনেক সময় স্বাভাবিক। অনেক বিশিনিষেধ উঠিয়া যাওয়ায় ইহা বাড়ি কিছু স্বাভাবিক নয়। মন্দার সময় জিনিষ অনেক সময় বাড়তি হইয়া জমা থাকে কিন্তু যেমন অল্প বিষয় সম্পর্কে পূর্ব্বে বলিয়াছি যদিও মজুতের দিকে নজর বাড়িয়া থাকিতে পারে তাহা ব্যবসাগত মন্দার জন্ত না হওয়াই সম্ভব। অনেকের মত ইহা স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে এবং কঠিন আইন দ্বারা প্রতিরোধ করা উচিত। বাংলাদেশে এ সম্বন্ধে একটি আইন হইতেছে জানা গিয়াছে। ইহার দ্বারা মূল্য বৃদ্ধির এই রোগের উপশম হইতে পারে।

(৭) মুদ্রাস্ফীতির সহিত টাকা লগ্নী করা (investment) ও টাকা জমানোর (saving) সম্বন্ধ যথেষ্ট আছে। কেবল নূতন জন্ম টাকা হইতেই টাকা লগ্নী করা হয় না, ব্যাঙ্কের নিকট ধার করিয়া অথবা পুরানো অথবা জমা টাকা (hoards) হইতে খাটান হয়। সুতরাং ইহা হইতে নূতন নূতন কারবারও যেমন বেশী হয় সেই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়া যায়। যদি খাট টাকা জমান (savings) বেশী হয় তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতি বেশী হয় না। আমাদের ক্ষেত্রে তাহা হইলে এই মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের জন্ত টাকা জমান বেশী হওয়া ভাল। কিন্তু তাহার মধ্যে অনেকগুলি সর্ভ থাকি দরকার। অনেকের মতে জমান টাকা ভারতে কম নাই। তাহা অনর্থক আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। সুতরাং এই বন্ধ করা টাকা যাহাতে বাহির হইয়া আসে তাহা দেখা দরকার এবং যাহারা আয়ের তুলনায় বেশী খরচ করে—যেমন অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ব্যক্তিরা—তাহাদের টাকা জমান তেমন দরকার।

দরিদ্র ব্যক্তিদের টাকা জমাইতে হইলে তাহাদের খরচ যাহাতে কম তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। সুবিধামত করের ব্যবস্থা (যেমন sales tax) করিলে কিছু কিছু দ্রব্যের ব্যবহার কমিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ মদ্যপান নিষিদ্ধ করিলে অনেক ক্ষেত্রে অথবা খরচ কমিতে পারে। তৃতীয়তঃ কো-অপারেটিভ স্টোরস প্রভৃতি কম লাভে স্থায়ী মূল্যে জিনিষ-পত্রের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে খরচ কমিয়া টাকা জমিতে পারে। যাহারা ধনী এবং বহু টাকা জমাইয়াছেন বা জমাইবেন তাহাদের স্থায়ী জমা বাদ দিয়া বাকী টাকা যাহাতে লগ্নীকৃত করেন তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। এজন্ত যাহারা অজ্ঞতাগ্রস্ত কারণে টাকা জমাইতেছেন তাহাদের অজ্ঞতা যাহাতে দূর হয় সেইমত চেষ্টা করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ লগ্নী করার জন্ত অনিশ্চয়তা বা ভয়ের কারণ যাহাতে না থাকে সেইরূপ চেষ্টা করিলে সুবিধা হয়। অথবা জমান টাকার বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযান করা যাইতে পারে।

একটি কথা—ইংলণ্ডের অধ্যাপক মার্শাল প্রভৃতি ঠিক করিয়াছিলেন মোট ধন-সম্পত্তির মূল্যের একটি বিশিষ্ট অংশ টাকা হিসাবে থাকে এই মতের ভিত্তিতে সম্ভবতঃ টাকা কমানোর ব্যবস্থার কথা উঠিতেছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দিক হইতে সমীচীন ভাবে ব্যবস্থা করিয়া কমান যাইবে কিনা ভবিষ্যতে ঠিক হইবে, তবে এইট বলা যাইতে পারে যে কেবল আর্থিক ব্যবস্থার উপর বিশ্বাস করিলে সম্ভবতঃ এবিষয়ে টাকার মূল্য বৃদ্ধি (overvalue) করিয়া সংখ্যা কমানিয়া দিলে সফল লাভ হইতে পারে। বিদেশী দ্রব্যের চাহিদা ও আমদানী বাড়িয়া অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিপ্লব নিবারণ করিতে পারে।

এই প্রবন্ধ রচনার জন্ত নিম্নলিখিত পুস্তকাদির সাহায্য লওয়া হইয়াছে—

1. Keynes, *General Theory of Employment, Interest and Money*, and *Treatise on Money*;
2. Bernstein, *Money and the Economic System*;
3. *Encyclopaedia Britannica*;
4. *Statistical Bulletin of the United Nations*;
5. P. N. Banerji, *A Study on Indian Economics*;
6. Jathar and Beri, *Indian Economics*;
7. J. C. Sinha, *Indian Currency Problems*;
8. B. P. Adarkar, *Indian Monetary Policy*;
9. Rao, *Post-war Rupee*;
10. Ganguli, *Whither Rupee*;
11. S. K. Basu, *Recent Banking Developments Commerce, Statesman* প্রভৃতি পত্রিকা;
12. Haberlar - *Prosperity and Depression*.
13. U. Hicks - *Public Finance*. ইত্যাদি।

# আধুনিক শব্দগঠনে প্রাচীন সংজ্ঞার উপযোগ

করণ, মহাকরণ, করণিক

অধ্যাপক ত্রিভুগোমোহন ভট্টাচার্য্য

ইতিপূর্বে অল্প পারিভাষিক শব্দের আলোচনা এসঙ্গে লিখিয়াছিলাম—

"In old Sanskrit literature *karana* or *adhikarana* implies an office. If 'office' is translated as *karana*, the 'Secretariat' which is the highest Government office may quite fittingly be called *mahakarana*, and a clerk working in the *karana* will be *karānika*."

অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে অফিসের নাম পাওয়া যায় 'করণ' বা 'অধিকরণ'। অফিসকে যদি 'করণ' বলা হয়, তবে সরকারের সর্বাধিকার বড় অফিসটি হইবে 'মহাকরণ' আর 'করণের' কর্মী কেরানী হইবেন 'করণিক'।

এই প্রবন্ধে করণ, মহাকরণ ও করণিক পদের প্রয়োগ ও শব্দার্থ বিচার করিয়া চলিত ভাষায় উহাদের উপাদেয়তা নিরূপণ করিব।

## ১। করণ (ত্রিকরণ, অধিকরণ)

বহু সংস্কৃত গ্রন্থ, বিভিন্ন তান্ত্রশাসন ও নানারূপ মন্ত্রাঙ্কুরের প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, গণনকর্ম, লিখনকর্ম, বিচারকর্ম—সকল প্রকার কর্মের স্থানকে প্রাচীনকালে 'করণ' বা 'অধিকরণ' বলা হইত। কু ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে ল্যুট প্রত্যয়ে 'করণ' পদ নিষ্পন্ন হয়—অর্থ কর্মস্থান। পদটির অপর অর্থ লেখক, আর এক অর্থ লেখ্য (দলিল)।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে 'স্বজ্ঞাবার সন্নিবেশ' বর্ণনায় দেখা যায়—বাসকক্ষের দক্ষিণদিকে কোশাগার, শাসন-করণ ও কার্য-করণের স্থান নির্দিষ্ট থাকিত।

প্রাচীন টীকাকার মাধবঘোষা শাসন-করণের প্রতিশব্দ দিয়াছেন 'অক্ষপটলম্', কার্য-করণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'ব্যবহারাদিনিরীক্ষণশালা'। ৩ মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী ত্রিমূল্য টীকায় এই ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়াছেন এবং টীকার এক স্থানে অক্ষপটলের অর্থ লিখিয়াছেন 'কর্ম্মস্থানদেশ' অর্থাৎ কার্যালয়। ৫ অর্থশাস্ত্রের অনুবাদক মহামহোপাধ্যায় গ্রামশাস্ত্রী ৬ এবং প্রসিদ্ধ প্রাকৃতভাষিক ভগবানলাল ইন্দ্রজী ৭ উভয়েই করণের ইংরেজী করিয়াছেন *département*।

টীকা-ব্যাখ্যা-অনুবাদ ছাড়িয়া দিলেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কৌটিল্য উল্লিখিত পংক্তিতে কর্মস্থানের প্রতিশব্দরূপেই করণ পদের প্রয়োগ করিয়াছেন।

নারদস্মৃতি অনুসারে করণের এক অর্থ বিচারকর্মের স্থান। ৮ পরাশরমাত্রেয় করণে এই পদের প্রতিশব্দ আছে 'কর্ম্মাধিকরণে'। ৯ বৃহস্পতিস্মৃতি ১০ এবং শুক্রনীতিসারে ৩১

করণের অনুরূপ অর্থ পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কার্যালয় ও বিচারালয় অর্থে করণ পদের প্রয়োগ পূর্বে প্রচলিত ছিল।

করণের মত 'ত্রিকরণ' এবং 'মহাকরণ' শব্দও প্রাচীন। দাক্ষিণাত্যের হয়সাল রাজ্যের 'পঞ্চপ্রধানের' মধ্যে একজন অমাত্যের পদবী ছিল 'ত্রিকরণাধিকারী'। ১২ গঙ্গরাজত্বের তান্ত্রশাসনে একজন কর্মচারীর পরিচয় পাওয়া যায় 'ত্রিকরণ হেগগড়ে'। ১৩ চম্পক শ্রেষ্ঠিকথানক নামক জৈনগ্রন্থে 'ত্রিকরণাধ্যক্ষ' নামে একটি পদের উল্লেখ দেখা যায়। ১৪ ইন্দ্রবর্মারামের রামগঞ্জ তান্ত্রশাসনে প্রদত্ত কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নাম-সূচীতে এক জনের পদবী আছে 'মহাকরণাধ্যক্ষ'। ১৫

শাব্দ দেবকৃত সঙ্গীতরত্নাকরের মুখবন্ধ শ্লোক ১৬ ও সমাপ্তি-বাক্য ১৭ হইতে জানা যায় যে, গ্রন্থকারের পিতা সোচল যাদববংশীয় ভিন্নম, জৈত্রপাল ও সিন্ধব এই তিন জন রাজার রাজত্বকালে (১১৮৭-১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) দেবগিরি রাজ্যের 'ত্রিকরণাধিপ' ছিলেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রকার হেমাদ্রি তাঁহার চতুর্ভাগচিন্তামণির প্রারম্ভে আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন যাদবরাজ মহাদেবের 'ত্রিকরণাধিপ' বা 'ত্রিকরণপ্রভু'। ১৮ উক্ত গ্রন্থের সমাপ্তিবাক্যে তিনি মহাদেবের 'সমস্তকরণাধীশ্বর'রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ১৯

সমসাময়িক (১২৭২ খ্রীষ্টাব্দ) থানা তান্ত্রশাসনে হেমাদ্রি স্বয়ং বলা হইয়াছে যে, মহাদেবের পরবর্ত্তী রাজা রামচন্দ্রের রাজত্বকালেও এই 'মন্ত্রিচূড়ামণি' সমস্ত করণের আধিপত্য গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান ছিলেন। ২০

উল্লিখিত স্থলগুলিতে করণ শব্দে রাজকীয় কার্যালয় ছাড়া আর কি বুঝাইতে পারে? এসকল স্থলে করণের অর্থ যে দলিল নয়, তাহা হেমাদ্রির আশ্রিত গ্রন্থকার-বোপদেবের উক্তি হইতে প্রমাণিত হয়। বোপদেব তাঁহার যুক্তাফলে হেমাদ্রিকে 'গণকাগ্রণী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ২১ যুক্তাফলের টীকা কৈবল্যদীপিকায় গণকাগ্রণীপদের অর্থ করা হইয়াছে 'দেশ ও কোষের আয়ব্যয় লেখকগণের নামক'। ২২

হেমাদ্রি যে খ্রীষ্টীয় ১২শ শতকে দেবগিরি রাজ্যের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা সুবিদিত। বোপদেবের উক্তি অনুসারে মন্ত্রী হেমাদ্রি 'গণকাগ্রণী' ছিলেন। হেমাদ্রির নিজের সাক্ষ্য অনুসারে তিনি 'ত্রিকরণাধিপ' ছিলেন। উভয় পদের তাৎপর্য্য বিচার করিলে মনে হয় যে, হেমাদ্রি ছিলেন



দেবগিরি রাজ্যের রাজকীয় কার্যালয়ের সর্বাধক্ষ অর্থাৎ বর্তমান যুগের 'প্রধান-কর্মসচিব'। করণাধিপ পদ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন—

"This office seems to have been that of Chief Secretary or one who wrote and issued all orders on behalf of his master and kept the state record."

করণাধিপ শব্দে যে করণের প্রধান কর্মচারীকে বুঝাইত তাহাতে সন্দেহ নাই, এই করণ শব্দ যে কার্যালয় অর্থে প্রযুক্ত হইত তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে।

'করণের' মত 'অধিকরণের' অর্থও কার্যালয়। ত্রিমূল্য টীকায় অর্ধশাস্ত্রের 'সর্বাধিকরণাধিপ' পদের ব্যাখ্যা আছে 'সর্বোচ্চ কর্মস্থানানাম'। ১২৪ বহু মুদ্রাচিহ্নেও কার্যালয় অর্থে অধিকরণ শব্দের প্রয়োগ পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীনকালে বিভিন্ন প্রকারের কার্যালয়ে এই সকল মুদ্রাচিহ্ন ব্যবহৃত হইত। গুপ্তযুগের কয়েকটি মুদ্রায় ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ আছে 'কুমারামাত্যাদিকরণশ' অর্থাৎ কুমারামাত্যের অধিকরণের [মুদ্রা]। ১২৫ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার ইংরেজী অনুবাদ দিয়াছেন "(the seal) of the office of the Kumaramatyā"। ১২৬ বিভিন্নকালের বিভিন্নমুদ্রায় আরও নানাপ্রকার অধিকরণের নাম পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই সকল 'অধিকরণ' ছিল এক একটি কার্যালয় (office)। ১২৭

নানারূপ প্রমাণ আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীনকালে করণ ও অধিকরণ উভয় পদই কখনও কার্যালয় অর্থে, কখনও বা বিচারালয় অর্থে ব্যবহৃত হইত। কালক্রমে অধিকরণশব্দ বিচারালয় অর্থে নিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। ১২৮ 'সর্বাধিকরণ' বলিলে কেবল বিচারালয়ই লক্ষিত হইয়া থাকে। এইজন্ত বর্তমান সময়ে সাধারণ কার্যালয় অর্থে 'করণ' শব্দের ব্যবহারই অধিক সঙ্গত মনে হয়। শব্দটি স্থগম ও স্থল্লাক্ষর, স্তবরাং সন্তত (constant) প্রয়োগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে। সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে করণিক, মহাকরণ প্রভৃতি সম্পর্কিত শব্দগুলিও গ্রহণ করা চলিবে।

## ২। মহাকরণ

করণের অর্থ বিচার প্রসঙ্গে একাধিকবার ত্রীকরণের উল্লেখ করিতে হইয়াছে। হয় ত সে যুগে রাজ্যের প্রধান করণকে ত্রীকরণ বলা হইত। বর্তমানকালে Secretariat-কে 'মহাকরণ' নাম দেওয়া অসঙ্গত হইবে না। এ নামটিও যুক্তাক্ষর হীন এবং স্মৃতিবোধ্য।

## ৩। করণিক (কারণিক, করণী)

প্রাচীনকালে যাহারা 'করণের' কাজ করিতেন, তাহাদের নাম ছিল 'করণিক'। কীলহরন্ সাহেব এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকায় করণ পদের অনুবাদ করিয়াছিলেন "Writer of legal documents"। ১২৯

কোন কোন স্থলে 'করণিকের' স্থলে 'কারণিক' নাম পাওয়া যায়। ১৩০ অর্ধশাস্ত্রের টীকায় মঃ মঃ গণপতি শাস্ত্রী করণিকের প্রতিশব্দ দিয়াছেন 'গণনাধিকৃত'। ১৩১ অনুবাদে মঃ মঃ শ্যাম শাস্ত্রী পদটির ইংরেজী করিয়াছেন এক স্থলে "superintendent of accounts", ১৩২ আর এক স্থলে "officer"। ১৩৩ ; কিন্তু ইহার পরবর্তী বাক্যের অনুবাদে লিখিয়াছেন "any clerk"। ১৩৪

বাণভট্টের হর্ষচরিতের আখ্যায়িকায় দেখা যায় যে, কোন এক গ্রামের অক্ষপটলের কর্তা করণিকগণের সহিত রাজার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৩৫ হর্ষচরিতের অনুবাদকগণ (E. B. Cowell এবং F. W. Thomas) করণীর ইংরেজী প্রতিশব্দ দিয়াছেন clerk। তাহারা এই পদটির সঙ্গে হিন্দী 'কিরানী' শব্দের তুলনা করিয়াছেন। ১৩৬

রুমাই পণ্ডিতের বাংলা শৃঙ্গপুরাণে লেখক অর্থে 'করি' শব্দের প্রয়োগ আছে। ১৩৭ শব্দটি সংস্কৃত 'করণী' বা 'করণিকের' অপভ্রংশজ কিনা তাহা বিবেচনার যোগ্য।

বিভিন্ন শিলালিপি ও তাম্রশাসনে 'করণিক' নামে এক শ্রেণীর কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৩৮ গাংড়বাল লিপিতে করণিক ও কায়স্থ (লেখক) সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৩৯ একখানি তাম্রশাসনের লেখক নিম্নের নাম লিখিয়াছেন "করণিক ত্রীবীক"। ১৪০ আর একখানি শাসনে লেখকের নাম দেওয়া আছে জল্‌হণ। পরিচয়ে লিখিত আছে যে, এই লেখক ছিলেন করণিক-বংশোদ্ভব, বিদ্বান্ এবং গুণে চিত্রগুপ্তোপম। ১৪১ পুরাণবর্ণিত প্রসিদ্ধ লেখক চিত্রগুপ্তের সত্ত্বিত তুলনা দেখিয়া অসুখান হয় যে, করণিকবংশীয় জল্‌হণ নিজেও একজন প্রসিদ্ধ লেখক (=করণিক) ছিলেন।

ইন্ডার ঘোষের রামগঞ্জ তাম্রশাসনে 'মহাবলাধিকরণিক' নামে একজন 'অধিকরণিক' কর্মচারীর উল্লেখ আছে। ১৪২

তাম্রশাসনে আর একজন কর্মচারীর নাম পাওয়া যায় 'কুলকরণিক'। ১৪৩ মহারাষ্ট্রে কুলকরণিকগণ সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখনও যারাসীদিগের মধ্যে 'কুলকরণিক' পদবী বিরল নয়। উক্তর ত্রীমুরেরজনাথ সেন লিখিয়াছেন যে, কুলকরণিকগণ কখন কখন 'গ্রাম্য লেখক' নামে অভিহিত হইতেন এবং পূর্বে ভূমি সংক্রান্ত গণনাকার্য করিতেন। ১৪৪

এ পর্যন্ত যে সকল প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে তাহাতে নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রাচীনকালে লেখককে এবং বিশেষ করিয়া দলিল বা হিসাব লেখককে 'কারণিক' 'করণী' বা 'করণিক' বলা হইত। বর্তমান কালে করণিক পদটি ক্লার্ক অর্থে বাংলায় বেশ চলিতে পারে। ইহাতে যুক্তাক্ষর নাই। করণের (office) সহিত ইহার শব্দসাম্য এবং অর্থ সম্পর্ক দুইই অক্ষুণ্ণ। প্রচলিত কেরানী শব্দের সঙ্গে 'করণিকের' উচ্চারণসাম্য আছে, অথচ কেরানীর সহজাত অপকর্ষধ্বনিটি নাই। ১। পদটির উপাদেয়তা বিষয়ে এ সকল বড় যুক্তি।

১। "The Making of the Technical Terms," *Calcutta Review*, March, 1948, p. 143.

২। অর্থশাস্ত্র ১০।১—“দক্ষিণতঃ কোশশাসনকাৰ্য্যকরণানি।”

৩। অর্থশাস্ত্র, লাহোর সংস্করণ, ২য় খণ্ড, নয়চন্দ্রিকা, ১৭০ পৃঃ—

“কোশ ইতি রত্নাদিহানম্। শাসন-করণম্ অক্ষপটলম্। কাৰ্য্যকরণং ব্যবহারাদিনিরীক্ষণশালা।”

৪। অর্থশাস্ত্র, ত্রিবেদ্যাম সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, ১০৪ পৃঃ।

৫। অর্থশাস্ত্র, ত্রিবেদ্যাম, ১ম খণ্ড, ১৪৩ পৃঃ—“অক্ষপটলং তত্তদাক্ষাণাং সত্ত্বয় স্ব স্ব কৰ্ম্মানুষ্ঠানদেশম্”। গণপতি শাস্ত্রী এখানে অক্ষপটলের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়াছেন এইরূপ—“অক্ষপটলে অক্ষাণাং দ্রব্যাণাং পটলে গণন-পুস্তকলেখনাদি কৰ্ম্মানুষ্ঠানদেশে।” তাহা হইলে অক্ষপটলের অর্থ হইল সাধারণভাবে কাৰ্যালয় এবং বিশেষভাবে গণন-কাৰ্যালয় ও পুস্তকলেখন-কাৰ্যালয়।

৬। R. Shamasastry, *Arthasastra*, English translation, 3rd Edition, p. 391.

৭। Bhagavan Lal Indraj, *Indian Antiquary*, Vol. XII, p. 22.

৮। অসহায়-ভাষ্য সহিত নারদস্মৃতি (Ed. Jolly) ২।১৮—

রাগাদীনাং যদেকেন কোপিতঃ করণে ( ৭ঃ ) বদেৎ।

অসহায়-ভাষ্যে ব্যাখ্যা আছে—“করণম্ আগতা” অর্থাৎ বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া।

৯। পরাশরমাতব্য, ব্যবহারাদ্যায় ৫৪ পৃঃ।

১০। (ক) বৃহস্পতি স্মৃতি ( বড়োদা সংস্করণ ), ১।৭৩—

যে চারণচরাস্তেষামরণ্যে করণং ভবেৎ।

(খ) বৃহস্পতি ( বড়োদা ), ৪।২—

যে তু তিষ্ঠন্তি করণে তেষাং সভৌবিভাবনা।

১১। শুক্রনীতি ( সভাসদন প্রেস সংস্করণ ) ৪।৬৫৪

১২। A. P. Karmarkar, *Cultural History of Karnataka*, p. 68 উক্তব্য।

১৩। *Epigraphia Carnatica*, VI, kp. 14, 37.

১৪। জিনকীর্তি বিরচিত চম্পকশ্রেণীকথানক ( Ed J. Hertel, *ZDMG*, LXV, 1911 )

১৫। N. G. Majumdar, *Inscriptions of Bengal*, Vol. III, p. 153 (I. 13)

তাম্রশাসনের এই পংক্তিতে ‘মহাকরণাধ্যক্ষের সঙ্গে ‘মহাক্ষপটলিকের’ নামও আছে। মনে হয়, মহাকরণাধ্যক্ষ ছিলেন, Superintendant of the Chief Office অথবা Chief Superintendent of Offices, আর মহাক্ষপটলিক ছিলেন ‘Chief Keeper of Records’.

১৬। তত্ত্বাভূতনয়ঃ প্রভুতবিনয়ঃ শ্রীসোঢ়লঃ প্রোঢ়বীষে ন শ্রীকরণ-প্রবুদ্ধবিভবঃ ভুবনভঃ ভিল্লমম্। আরাধ্যাখিললোকশোকশমনী কীর্তিঃ সমাসাদিতা জৈব্রে জৈরূপদং ত্বধায়িমহতী শ্রীসিজ্ঞে শ্রীরাপি ॥ দঙ্গীত-রত্নাকর ১।৫

১৭। ইতি শ্রীমদনবিনোদ-শ্রীকরণাধিপতি-শ্রীসোঢ়লনন্দননিঃশঙ্ক-শাস্ত্রদেববিরচিত্তে দঙ্গীতরত্নাকরে...সমাপ্তঃ।

১৮। (ক) যন্ত শ্রীকরণাধিপঃ স্বয়ময়ং হোমাদ্রিঃ স্মৃতিঃ পুরঃ—চতুর্বর্গ-চিন্তামণি, ব্রতখণ্ড, রাজপ্রশস্তি।

(খ) মহাদেব ইতি খ্যাতো রাজ রাজেব ভূতলে। তত্ত্বাস্তি নাম হোমাদ্রিঃ সর্বশ্রীকরণপ্রভুঃ। চতুর্বর্গচিন্তামণি, ১ম খণ্ড, ৬৬ ও ১৩৩ত প্লোক।

১৯। ইতি শ্রীমহাভারতবিজ্ঞান শ্রীমহাদেবন্ত সমস্তকরণাধীশ্বরঃ...

২০। সমস্তকরণাধিপতিভাসঙ্গীকূর্বাণে চ.....মাত্রচূড়ামণৌ হোমাদ্রৌ *Epigraphia Indica*, vol. iii, p. 202

২১। “হোমাদ্রিগণকাগ্রণীঃ”—মৎস্পাদিত মুক্তাফল, ২ পৃঃ।

২২। “গণকেষু দেশকোষোন্নয়নব্যয়ে” লিখৎস্ব অগ্রণীমুখ্যঃ—মুক্তাফল, কৈবল্যদীপিকা টীকা, ৩ পৃঃ। কৈবল্যদীপিকা স্বয়ং হোমাদ্রির নামে প্রচলিত, কিন্তু বোপদেবের রচিত। এ বিষয়ে মুক্তাফলের Introduction, viii উক্তব্য।

২৩। *Early History of the Wekkan*, 3rd Edition, p. 202.

২৪। অর্থশাস্ত্র, ত্রিবেদ্যাম, ১ম খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ—“ততঃ সর্বাধিকরণানাং করণীয়ং...”। ইহা ছাড়া অর্থশাস্ত্র ৪।৯—“সর্বাধিকরণ রক্ষণম্” এবং বিকৃশ্মতি ৭।১৩—“রাজাধিকরণে” উক্তব্য।

২৫। J. ph. Vogel অধিকরণের অর্থ করিয়াছেন office।—*Annual Report of the Archaeological Survey of India*, 1903-4, p. 107 fn.

২৬। *Age of the Imperial Guptas*, p. 72.

২৭। বলাধিকরণ, উপরীকাধিকরণ, বিনয়স্থিতিস্থাপকাধিকরণ, রণভাগাণাধিকরণ, দণ্ডগণাধিকরণ, কোটিবোধিষ্ঠানাদিকরণ, বারাক-মণ্ডলাধিকরণ, বৈশালাধিষ্ঠানাদিকরণ, ধর্ম্মাসনাধিকরণ, শামাহর্ববিষয়াধিকরণ, আয়ুক্তকাধিকরণ প্রভৃতি অধিকরণের নাম বিভিন্ন মুদ্রাটিকে উৎসর্গ দেখা যায়। এসকল অধিকরণের অর্থ যে কাৰ্যালয় সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে প্রমাণ-প্রয়োগ আলোচিত হইয়াছে—

R. D. Banerji, *Age of the Imperial Guptas*, pp 74-76, 88, 92, 95;

Pramod Lal Paul, *Early History of Bengal*, p. 146;

R. G. Basak, *History of North-Eastern India*, pp. 309-312.

২৮। নালন্দা ও বৈশালীর ঐতিহাসিক উপকরণের মধ্যে নগাধিকরণ, ধর্ম্মাধিকরণ ও ধর্ম্মশাসনাধিকরণের নামযুক্ত তিনটি মুদ্রাটিক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ এগুলিকে স্থানীয় বিচারালয়ের মুদ্রাটিক বলিয়া মনে করেন।

A. S. Altekar, *New History of the Indian People*, Vol. VI, The Vakataka-Gupta Age, p. 287: “The seals . . . were obviously the seals of courts of justice . . .”

মুচ্ছকটিক ( ৯ম অঙ্ক ) এবং দশকুমারচরিতে ( ৪০, ৮ ) বিচারালয় অর্থে অধিকরণ শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়।

২৯। *Epigraphia Indica*, Vol. I (Syadoni Inscription), p. 166; Vol. II (Harsha Inscriptions), p. 129.

করণের এক অর্থ দলিল ( লেখা )। হুতরাং দলিল লেখক বা দলিল-রক্ষকে করণিক নাম দেওয়া অসঙ্গত নয়।

৩০। [ক] অর্থশাস্ত্র ২।৭ ( মহীশূর সংস্করণ, ৬৪ ও ৬৫ পৃঃ ) “কারণিকস্তাপ্রতিব্রতঃ...”

[খ] নারদস্মৃতি ( Jolly ); ২।৪২ অসহায়ভাষ্য—“রাজ্যকারণিকানাম্...”

৩১। অর্থশাস্ত্র ( ত্রিবেদ্যাম ) ১ম খণ্ড, ১৪৮ পৃঃ শ্রীমূল্য টীকা “কারণিকস্ত গণনাধিকৃতস্ত”। ১৫০ পৃঃ “কারণিকস্তাপ্রতিব্রতঃ” এই মূল্য ব্যাখ্যাংশের ‘অপ্রতিব্রতঃ’ পদটির শ্রীমূলায় অর্থ করা হইয়াছে “পুস্তকেষু অলিখতঃ”। ইহাতে বুঝা যায় যে কারণিকের কাজ ছিল ‘পুস্তক লিখন’ অর্থাৎ ‘খাতা লেখা’।

৩২। *Arthasastra*, English translation, 3rd Edition, p. 63, I. 19.

৩৩। *Ibid.*, p. 64, I. 20.

৩৪। *Ibid.*, p. 64, l. 24.

৩৫। গ্রামাঙ্কণটলিকঃ সকল করণিপরিব্রজঃ...—হর্বচরিত, ৭ম উচ্চাস ২য় অনু।

৩৬। "The village notary appeared with his whole retinue of clerks."—*Harsa-Charit* translated into English, p. 198.—পাদটীপগী "Karani cf. Hindi: kirani."

৩৭। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত শূন্য পুরাণের বারমাসি প্রকরণে (৬৯-৭৩ পৃঃ) বারংবার ধামাত করির নাম আছে। গ্রন্থ-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু করির অর্থ লিখিয়াছেন "লেখক, করণিক" (১৪৭ পৃঃ)।

৩৮। (ক) *Epigraphia Indica*, Vol. XII, p. 17—

ভানু নামে একজন 'পটুবুদ্ধি করণিক' এই প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন।

(খ) *Ibid.*, Vol. XX, p. 44—

এই শিলালিপিতে স্বামিদত্ত নামে একজন 'প্রথিত করণিকের' নাম আছে।

(গ) *Ibid.*, XX, Appendix, p. 52, No. 35—

এই লিপিতে চাহড় নামে এক করণিক ব্রাহ্মণের দানের বিষয় লিখিত আছে।

(ঘ) কোন্সেরিরাঙ্গপুরম্ উনামহেশ্বরের মন্দিরে প্রাচীরোৎকীর্ণ লিপিতে 'করণিক' কর্মচারীদিগের উল্লেখ আছে।

*South Indian Inscriptions*, Vol. III, Pt. III, p. 277.

৩৯। *Epigraphia Indica*, Vol. VIII, p. 152, n. 3.

৪০। *Epigraphia Indica*, Vol. VIII, p. 153:

লিখিত: চেদং তাম্রপট্টকং করণিক-ঠকুর ত্রীবীৰীকেনেতি।

৪১। *Epigraphia Indica*, Vol. VIII, p. 153:

করণিকোদগতো বিদ্বাংশিত্রযুক্তোগ্রামো গুণৈঃ।

যশসে জল হৃণঃ ত্রীমানলিখিতাক্রকং মুদা।

৪২। N. G. Majumdar, *Inscriptions of Bengal*, Vol. III, p. 153, l. 15:

কিন্তু মুচ্ছকটিক (৯ম অঙ্ক) প্রভৃতি গ্রন্থে বিচারক অর্থে 'অধিকরণিক' শব্দের প্রয়োগ আছে।

৪৩। *Epigraphia Indica*, Vol. XV, Sudi Inscription, p. 91.

৪৪। *Administrative Systems of the Marathas*, p. 144:

"The second officer was Kulakarni, occasionally styled in very old records as the *gramyalekhaka*. Kulakarni most probably is a compound of the words *kula* and *karani* and originally meant an officer in charge of accounts relating to village lands."

## বঙ্গ ও বঙ্গা

### শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আমি হই বঙ্গ ভূই সাধী বঙ্গা

ভূই জনে মিলে চল চাহে আজ মন যা,—

পৃথিবীটা দলি চল, সপ্তপাতালতল,

স্বমেরুর 'পর যাই খুঁড়ি আর গর্জাই

রক্তেতে টক্ টক্ স্রষ্টীটা রঞ্জা ;

ভূই সাধী বঙ্গা।

তুরন্ত ভীমবেগে চল ছুটে অস্থির

ভেঙে গেছে স্বপ্ন রে মেকী স্বপ্নস্বপ্নির

ভাঙ সব প্রগতির পন্থার শৃঙ্খল

তিস্তিভী দেবদারু তালগাছ শালকে,

জঙ্গল সমাজের ওরা সব ঘুমখোর

বঙ্গায় গর্জিয়ে বল মহাকালকে,—

শত দুর্গন্ধের পচামহুবংশের

চাই আজ ধ্বংস হিংসার কংসের

উন্মাদ ছুটে যাই চল চায় মন যা,

আয় সাধী বঙ্গা।

চাই আজ প্রতিশোধ দক্ষিণ মলয়ার

কুহ কুহ কোকিলের চন্দের জ্যোৎস্নায়,

দুঃস্থের শোষণের অর্থের সম্মোগে

মজলিস পেতে যারা করিয়াছে রোশনাই,—

তাদের মৃত্যু চাই জলে হু হু অন্তর,

অতিধনদন্তে ক্ষীত যারা মন্থর ;

গর্জিয়া কড় কড় তাদের শীর্ষে গড়

পাপের ধ্বংস কর আজ রণরঙ্গ ;

কাঙালের দল শুধু থাকবে না নগ্ন

বঙ্গায় করে দে রে সবারে উলঙ্গ।

ক্ষীত সব দন্তকে করি আয় চৌচির

কম্পি' উঠুক আজ আসন বিরিকির,

উন্মাদ গণদেব নাড়ে ঐ শুঁড় তার

আজ সব মুক্তির চাই ছাড়পত্র,

পড়ি আমি বন্ বন্ ভূই চল সন্সন্

শয়তান শোষণের করে নিশিচি রে

সর্বস্বারার শিরে তোলা রাজছত্র।

রাফস মিলগুলো-আয় করি থানখান

ধ্বংসের লাগি প্রাণ করছে রে আনুচান,

দন্তের খুঁটিগুলো একেবারে উপড়িয়ে

ভণ্ডের থুংনিকে ষাড় ধরে খুবড়িয়ে

হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ, নাচ ভীম বঙ্গা,

দেবে সব পিশিয়ে ধূলি মাঝে মিশিয়ে,

মাহুঘের মহাপাপ হাংকার সম্ভাপ

আর কত সই বল সঙ্গী গো বঙ্গা,

এ পাপের ক্ষমা নাই দয়া নাই মায়া নাই

গুঁড়িয়ে দে চল যাই বেথা খুশী মন্ যা'।

কড় কড় গুম্ গুম্ ভাঙ সব হুম্ হুম্

টান্ স্বপ্নিগুণ্টা রক্তেতে রঞ্জা,

আমি হই বঙ্গ, ভূই সাধী বঙ্গা।

## দেশের ভবিষ্যৎ

শ্রীযত্ননাথ সরকার

এই ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগস্টে স্বাধীন ভারতের এক বৎসর বয়স পূর্ণ হইল। এই সন্ধিক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া একবার দেখা যাক আমাদের গত বৎসরে কি লাভলোকসান হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে কি দশা হইবে, ও তাহার জ্ঞান কিরূপে প্রস্তুত হইতে হইবে।

ভারতবর্ষকে অনেকগুলি প্রদেশে ভাগ করা হইলেও তাদের মধ্যে এমন কোন অলংঘ্য পর্বত নদী বা মরুভূমি নাই, যাহাতে স্বাভাবিক সীমানা গঠন করে এবং শত্রুর আসিবার পথে বাধা দিতে পারে। এরূপ প্রকৃত সীমানা ইউরোপ ও আমেরিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আছে; ভারতে এক বিস্তৃত ছাড়া আর কোন প্রাকৃতিক বাধা নাই। ভারতবর্ষ ভূগোলিক এই অসুবিধা হইতে এড়াইতে পারে না। ভারতের কোন প্রদেশই একা বিদেশীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না; কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের সমস্ত জনবল, অর্থবল দিয়াই ভারতের প্রদেশগুলির সাময়িক রক্ষা সম্ভব হয়। অর্থাৎ ভারতের অঙ্গগুলি হ্রৎপিণ্ডের সঙ্গে সর্বদাই যেন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা থাকে। প্রাদেশিকতা, পার্থক্য ভাব সকল প্রদেশের মৃত্যুর কারণ হইবে।

সুতরাং প্রাণ বাঁচাইবার জন্ত ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ ও দেশী রাজ্য অপর সবগুলির সঙ্গে এক দেহের বন্ধনে বাঁধা থাকিবে, পরস্পর সাহায্য করিবে; কিন্তু এই একতা সম্ভব হইতে হইলে সব প্রদেশকেই সব বিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাধীন হইতে হইবে; স্থানীয় মান-অভিমান, স্বার্থ ও বিদেশী-বিদ্বেষ ত্যাগ করিতে হইবে, প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় অধিকার পর্যন্ত অনেক দিকে ক্ষুণ্ণ করিতে হইবে। আর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টও সর্বদা প্রদেশে প্রদেশে সফর করিয়া, এবং প্রাদেশিক নেতাদের ঘন ঘন দিল্লীতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া, নানাবিধ সর্বভারতব্যাপী কনফারেন্স ও কমিশনের অধিবেশন ঘটাইয়া, প্রদেশগুলিকে বুঝাইয়া দিবে যে তাহারা এক পিতার সন্তান, এক ঘরের ভাই; সকলেরই স্বার্থ এক।

কিন্তু এই একীকরণ কাজটি বড় কঠিন। সমস্ত প্রদেশ ও দেশী রাজ্যগুলি ভারত গবর্ণমেন্টের সহিত মিলিত হইল এবং তাহার সার্বভৌম শক্তি মানিয়া লইল, এইরূপ ঘোষণা মাত্র করিলে চলিবে না; এই সমস্ত খণ্ড দেশের লোককে গলাইয়া এক ছাঁচে ঢালিতে পারিলে তবেই ভারত এক

নেশন হইবে। এই প্রকাণ্ড দেশটির এপার হইতে ওপার পর্যন্ত সর্বত্র এক মনোভাব ও জীবনপ্রণালী কিরূপে স্থাপিত করা যায়? সমস্ত প্রদেশ ও ভূতপূর্ব স্বাধীন ষ্টেটগুলি জুড়িয়া এক শাসনপদ্ধতি, এক সরকারী ভাষা, এক রকম শিক্ষার ব্যবস্থা এবং এক প্রদেশ হইতে অত্র প্রদেশে অবাধে যায় ও কার্য করে এরূপ শাসক, শিল্পী এবং পরিচালক স্থাপিত করিয়া তাহাদের আবশ্যিক অধিকার দিতে হইবে। এইরূপ আন্তরিক একীকরণ এখন আদর্শ মাত্র বলিয়া দেখায়, কিন্তু যদি আমরা এই আদর্শ ভুলি অথবা ইহাকে কার্যে পরিণত করিতে বিলম্ব বা আপত্তি করি, যদি আমরা কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে এরূপ কোন শক্তিকে বাধা দিয়া স্ব-স্ব-কোণের স্বাধীনতাকে অল্পসরণ করি, যদি আমরা প্রাদেশিক অহঙ্কার ও স্বার্থ লইয়া উন্নত হই এবং পরদেশী—অর্থাৎ অত্র প্রদেশীয় ভাইদের “খেদাইতে” কোমর বাঁধি, তবে শুধু আমাদের নিজ প্রদেশটির নহে, বৃহৎ ভারতরাষ্ট্রেরও মৃত্যু অনিবার্য। প্রকৃত জাতীয়তা ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতাকে চাপিয়া মারিবে, নচেৎ আমাদের নব “স্বাধীনতা” লোপ পাইবে।

ব্রিটিশ যুগের ভারতবর্ষের মাপের দিকে তাকাইলে দেখা যায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের শাসিত অংশ এক লাল রঙ্গের, আর অসংখ্য দেশী রাজ্য ভারতের দেহের উপর বসন্তের দাগের মত কাল কাল ছড়াইয়া আছে। সমস্ত ভারতের জমির এক-তৃতীয়াংশ দেশী রাজ্য ছিল। এগুলির সংখ্যা প্রায় ছয় শ; তাহার মধ্যে হায়দরাবাদ, মহিশূর, গোয়ালিয়ার, জয়পুর, উদয়পুর প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র বেশ বড়, কিন্তু অধিকাংশই অতি ক্ষুদ্র, কাহারও কাহারও সীমা এক বর্গ মাইল এবং প্রজা পাঁচ-ছ শ মাত্র। অথচ এই ছয় শত ষ্টেটের প্রত্যেকটি ইংরেজের শাসনের বাহিরে, প্রত্যেকটি আইনের চক্ষে যেন বধে বা বান্ধলার লাট-শাসিত প্রদেশের সমান অধিকার-ভোগী। কাথিবাড় উপরীপে ২২,০০০ বর্গ মাইল স্থানে ৪৪৯টি স্বাধীন রাজ্য ছিল, অর্থাৎ গড়ে ৫×১০ মাইল জমির এক একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা ছিল। কিন্তু ভারত স্বাধীনতা পাইবার এক বৎসরের মধ্যে একমাত্র হায়দরাবাদ ছাড়া আর সব ষ্টেট যুক্ত-ভারতের সঙ্গে মিলিয়া হয় আমাদের নূতন প্রদেশ সৃষ্টি করিয়াছে (ইউনিয়ন); নতুবা আমাদের পূর্ব কোন প্রদেশের সঙ্গে গা মিলাইয়া নিজ নিজ পৃথক অস্তিত্ব লোপ

করিয়াছে (মার্জার, যেমন উড়িষ্যার খুদে রাজগুলি)। তাহারা সকলেই স্বাধীন ভারতের প্রগতি, বল ও প্রজা-  
শক্তির অংশীদার হইয়াছে, তাদের অধিবাসীজন জনতন্ত্রের  
অধিকার পাইয়াছে, ঠিক আমাদের মত। এখন একমাত্র  
হায়দরাবাদ রহিয়াছে এই নব-জাগরণের বাহিরে, ইহার  
শাসন feudal anachronism অর্থাৎ সেকলে অত্যাচার-  
মাত্র। ভারতের বক্ষ হইতে এই কুষ্ঠচিহ্ন কবে দূর  
হইবে?

আমাদের স্বাধীনতার প্রথম বর্ষের এই অনির্বচনীয়  
লাভ, যাহা ইংরেজ দু শ বছরেও সম্পন্ন করিতে পারে  
নাই; চেষ্টাও করে নাই।

ইতিহাস দেখাইতেছে যে জগতের সব বড় দেশই এত  
বড় হইয়াছে এই উপায়ে। প্রথমে দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ-  
গুলি এক রাজার অধীনে আসে, তাহাতে ভৌগোলিক  
অর্থাৎ বাহ্য একতার সূত্রপাত হয়। পরে সেই  
একতাকে পাকা ও স্বফলপ্রদ করা হয় সব দেশবাসীর  
মধ্যে সমান শিক্ষা, এক শাসন এবং এক সামাজিক জীবন  
ও চিন্তার ধারা প্রচলিত করিয়া; প্রাদেশিক বিশেষত্ব,  
জাতিভেদ, এবং সেকলে মনোবৃত্তি কোন রাষ্ট্রের লোকদের  
সংঘবদ্ধ করিতে দেয় না, তাহারা জাত থাকিয়া যায়, নেশন  
হয় না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, এবং আমেরিকার  
যুক্তরাজ্যের—ছোটখাট দেশের মধ্যে সুইজরলণ্ড ও ইটালীর  
অতীত ইতিহাস এই সত্যই প্রমাণ করিতেছে।

১০৬৬ সালে নর্মান বিজয়ের পূর্বে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রে  
ওয়েলস, স্কটলণ্ড ও আয়ারলণ্ড যুক্ত ছিল না, এবং ঐ সংকীর্ণ  
ইংলণ্ডটুকুর মধ্যে জেলায় জেলায় সামন্তগণ নিজ স্থানীয়  
প্রাধান্য স্থাপন করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিত। সেইজন্য  
যখন নর্মানী হইতে উইলিয়ম আসিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ  
করিলেন, তখন রাজা হারল্ড রাষ্ট্রের আংশিকমাত্র শক্তি  
লইয়া তাহার বিরুদ্ধে খাড়া হইতে পারিলেন, এবং যুদ্ধে  
হারিলেন। কিন্তু নর্মান অধিকারে দু' এক শতাব্দীর মধ্যে  
সমস্ত ইংলণ্ডকে এক রাজার অধীন করিয়া, শাসন-পদ্ধতি  
এক ছাঁদে ঢালিয়া, ক্রমে ওয়েলস ও আয়ারলণ্ড জয় করিয়া  
এমন একটি প্রবল রাষ্ট্রশক্তি সৃষ্টি করা হইল যে, ঐ ক্ষুদ্র  
স্বত্বদ্বীপ নিজের প্রায় ছ'গুণ বড় ফ্রান্স দেশকে পরাস্ত  
করিল।

আবার ফ্রান্সও প্রথমে অনেকগুলি পৃথক স্বাধীন  
জেলায় বিভক্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে অতি কম জেলাই  
প্যারিস নগরের রাজার অধীন ছিল। কিন্তু একাদশ লুই  
অসীম ধৈর্য, চালাকি এবং পরিশ্রমে ফ্রান্সের বেশী অংশই  
এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত করিলেন। চতুর্দশ লুই (১৬৬০-

১৭১৫) ফ্রান্সের শাসন কেন্দ্রীভূত করিলেন, সামন্তদের  
বলহীন করিয়া প্যারিস নগরীর গবর্নমেন্টকে দেশময়  
প্রচলিত করিলেন। সর্বশেষে আসিল ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব  
(১৭৮৯); তাহা সমস্ত ফরাসী দেশ ও জাতিকে গলাইয়া  
একেবারে এক ছাঁচে ঢালিল। তাহার আগে ফ্রান্সের  
প্রদেশগুলি নিজ নিজ পৃথকতা, প্রাদেশিক গর্ব, রীতিনীতি,  
এমন কি ভাষার পৈচ ও রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। এখন  
(১৭৯০ সালে) প্রদেশগুলি ভাঙ্গিয়া নূতন সীমানায় প্রায়  
সমান সমান বিভাগ সৃষ্টি করা হইল; "প্রদেশ" (Province)  
নামটি পর্যন্ত দূর করিয়া, সেখানে বিভাগ (Department)  
নাম দেওয়া হইল, এবং তাহার মধ্যে উপ-বিভাগগুলি সৃষ্টি  
করা হইল নূতন নামে। এইরূপে সম্ভ্রমে প্রাদেশিক  
সংকীর্ণতা দূর করিয়া, সমস্ত ফরাসী নেশনকে এক রাষ্ট্র,  
এক অধিকার, ঠিক এক ধরণের শাসন-পদ্ধতি দিয়া, যেন  
অত কোটি সমান-উর্দ্বীপরা সৈন্ত সৃষ্টি করা হইল। আর  
প্রাচীন বিভিন্ন স্থানীয় আইন বাতিল করিয়া একই বিস্তৃত  
নূতন আইন *Cole Napoleon*, সমস্ত দেশবাসীকে আইনের  
চক্ষে সাম্য দান করিল। এই সাম্যের জোরে, এই একী-  
করণের ফলে ঐ যুগের ফরাসী সৈন্ত সমস্ত ইউরোপ জয়  
করিতে পারিল—তাহারা সত্যই গর্ব করিত যে মস্কো  
হইতে কেডিজ পর্যন্ত প্রত্যেক ইউরোপীয় রাজধানীতে  
তাহারা নিজের ঘোড়া বাঁধিয়াছিল।

জার্মানীর অবস্থা ঠিক ভারতবর্ষের মত ছিল। ঐ  
দেশে ১৮০৩-৬ এর আগে চার শ' খণ্ডরাজ্য বা স্বাধীন  
প্রতিষ্ঠান ছিল, অথচ উহার আকার ভারতের সিক্রিও  
কম। সবার উপরে সার্কভৌম শক্তি ছিলেন অষ্ট্রিয়ার  
সম্রাট, তিনিই এই সব ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীনতা ও  
অত্যাচার-শক্তি রক্ষা করিতেন, দেশের একীকরণ এবং  
প্রজাদের বল ও রাষ্ট্রীয় অধিকার দিবার পথে এই অষ্ট্রিয়ার  
সম্রাটই চিরদিন বাধা ছিলেন। বিজয়ী নেপোলিয়ন সেই  
সেকলে অষ্ট্রিয়ান সার্কভৌম শক্তিকে ভাঙ্গিয়া নব্য  
জার্মানীর একীকরণ, স্বাধীনতা ও শক্তির জনক হইলেন।  
ঐ সব ক্ষুদ্র রাজ্য ও স্বাধীন শহর দূর করিয়া, জার্মানীর  
প্রদেশের সংখ্যা চার শ' হইতে এক শ'র কম করা হইল;  
এখানেও আমাদের স্বাধীন ভারতের মত merger and  
union দ্বারা। ইহার ফলে জার্মানীর ম্যাপ বদলাইয়া গিয়া  
এক অপূর্ণ একতা ও সরলতা লাভ করিল। নেপোলিয়নের  
মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বিসমার্কের নীতিতে এই  
একীকরণের কাজ সম্পূর্ণ হইল এবং তাহার ফলে সমস্ত  
ইউরোপ মহাদেশে জার্মানী অজেয় শক্তি, জানে যেন শিল্পে  
সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল। কিন্তু এই একীকরণ শুধু ম্যাপের



রং বদলাইয়া হয় নাই। নেপোলিয়ন যে *Code Napoleon* ফ্রান্স দেশে প্রচলিত করেন, তাহারই অনুসরণ করিয়া জার্মানী এক নূতন রাজনৈতিক সংস্কার কার্যে পরিণত করিল; কৃষকেরা আর দাস রহিল না; মধ্যযুগের অন্ধবিশ্বাস ও কুশিক্ষা দূর করিয়া, শাসনপদ্ধতি হইতে নবাবী চাল উঠাইয়া দিয়া জার্মানজাতকে এক নব জীবন দেওয়া হইল। সর্বশেষে সব ভূতপূর্ব প্রদেশের সেনাদের প্রাসীয়ান শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে উন্নত এবং এক ছাঁচে ঢালা হইল। তবেই ১৮৭০-৭১ সালে ফ্রান্স জার্মানীর পদতলে পড়িয়া গেল। বীজ হইতে ফল হইল।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যও প্রথমে ১৩টি প্রদেশ লইয়া রাষ্ট্র গঠন করে (১৭৮৩), ইংলণ্ডের আধিপত্য ত্যাগ করিয়া স্বাধীন হয়। কিন্তু অনেক বর্ষ ধরিয়া এই খণ্ডগুলি (States) কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের হাত বাঁধিয়া রাখিয়া নিজ নিজ প্রাদেশিক স্বাধীনতা ও স্বত্ব চরমে তুলিয়া দিয়া, সব রকম আধুনিক সংস্কারে বাধা দিত। এজন্ত দাসত্বপ্রথা উঠাইবার চেষ্টায় ঐ যুক্তরাজ্যে পাঁচ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ হয়। তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক মরে। কিন্তু ঐ নররক্তের মূল্যে দেশ এখন এক হইয়াছে, কেন্দ্র এখন সার্বভৌম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আর সেই গৃহ-যুদ্ধের শেষ (১৮৬৫) হইতে এ পর্যন্ত আমেরিকার রাজনৈতিক জীবনের রোখ ফিরিয়াছে, জনমত ক্রমেই প্রবলভাবে চাহিতেছে যে সব ষ্টেটের (অর্থাৎ খণ্ডের) ক্ষমতা খর্ব করিয়া কেন্দ্রের হুকুমে, কেন্দ্রের কর্মচারী দিয়া, এবং Federal Supreme Court বা কেন্দ্রীয় হাইকোর্টের সমনের জোরে, প্রত্যেক ষ্টেটের মধ্যে নূতন সংস্কার, নূতন বিধি চুকাইতে হইবে, বাহাতে সমস্ত ইউনাইটেড ষ্টেটস যেন আভ্যন্তরিক একতা লাভ করিতে পারে, এক সঙ্গে কদম কদম পা ফেলিয়া বর্তমান যুগের সর্ববিধ উন্নতির ভাগী হইতে পারে। ইহাই আমেরিকার ইতিহাসের শিক্ষা। আর, ভারত কি ঘুমাইয়া রহিবে?

[এ বিষয়ে বেশী জানিতে হইলে Fisher's *Napoleonic Statesmanship*; Germany এবং J. Bryce's *American Commonwealth* নূতন সংস্করণ দেখুন।]

নবীন ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রথম কর্তব্য এই যে আমাদের অজ্ঞ দাসভাবাপন্ন সেকলে দেশী রাজ্য এবং কয়েকটি পিছে পড়া ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশের প্রজাদের শিক্ষা দিয়া, রাজনৈতিক অধিকার স্বেচ্ছাভাবে চালাইতে অভ্যস্ত করিয়া, নিয়মাত্মবর্তিতার অভ্যাস জন্মাইয়া, তাহাদের রাস্তাঘাট কল-কারখানা, স্কুল ও ডাক্তারখানা বাড়াইয়া, তাহাদিগকে খুব অগ্রসর কয়টি প্রদেশের সমকক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে।

যেন তাহারা সকলেই এক ক্লাসের পাঠ্য বুঝিতে পারে, এক পরীক্ষা দিতে পারে। তবেই তাহারা যে ভারত-রাষ্ট্রের নাগরিক এই কথা সার্থক হইবে।

যেমন বিলাতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে backward areas বা পিছে পড়ে-থাকা গ্রামগুলিকে বিশেষ চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে সরকার কর্তৃক উন্নত করা হয়; ভারতে রাজনীতির ক্ষেত্রেও তেমনি প্রায় সব দেশী রাজ্য (বরোদা ও মহীশূর বাদে) এবং কয়েকটি অর্দ্ধশিক্ষিত প্রদেশকে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের চেষ্টায়, অর্থে এবং হুকুমে নাবালকের মত প্রতিপালন করিয়া আর সকল ভারতীয় নাগরিকের সমকক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। সেই সেই স্থানে যেই স্থানীয় লোকদের শিক্ষা এবং রাস্তাঘাট কলকারখানার উন্নতি সন্তোষজনক হইবে, অমনি বাহিরের (অর্থাৎ কেন্দ্রের) কর্মচারীদের সরাইয়া স্থানীয় লোক ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টের হাতে তাহার ভবিষ্যৎ ছাড়িয়া দিতে হইবে, অর্থাৎ কোর্ট অব ওয়ার্ডস-সরিয়া যাইবে, এষ্টেট খালাস হইবে! একমাত্র কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টই এই কাজ করাইতে পারে, কারণ তাহার শক্তি অসীম। স্বরণ রাখিতে হইবে যে এই শিক্ষা দিবার কাজ স্থানীয় অধিবাসীদের মনে অত্যন্ত অপ্রীতিকর, সর্ববিধ বাধা আহ্বান করে। কেন্দ্র হইতে প্রেরিত শিক্ষক, জজ, পুলিশ কর্তা, যানবাহন-ডিরেক্টর, যন্ত্রনির্মাতা, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রভৃতি সকলেই ঐ সব পিছে পড়ে-থাকা প্রদেশ ও ভূতপূর্ব দেশী রাজ্যে গিয়া ঈর্ষা, হুর্নাম, গোপনীয় বাধা, অন্ধ আন্দোলন বৃকে পাতিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে। কেন্দ্রের সর্ববিধ সমর্থন এবং ভারতের সব-প্রদেশের খাটি দেশভক্ত ও নিঃস্বার্থ জ্ঞানী মাননীয় লোকদের প্রকাশ্য ও অবিরল প্রচার ভিন্ন এই শিক্ষা সম্ভব হইবে না। সংবাদপত্রগুলিও যেন টাকা অপেক্ষা দেশকেই বড় দেখে।

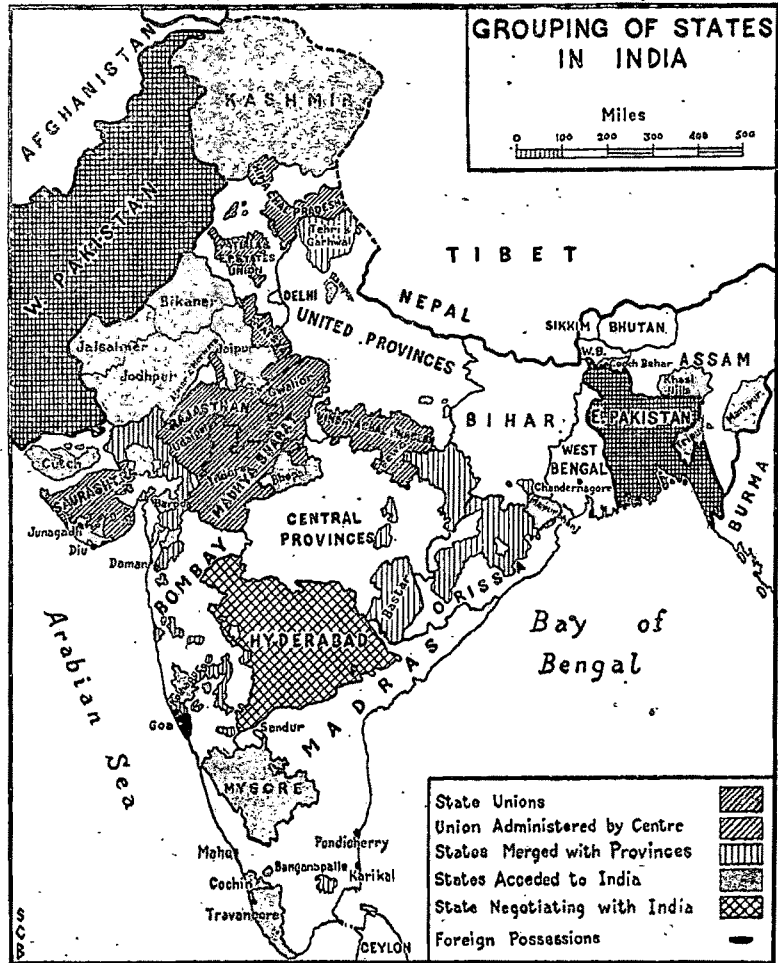
শাসন ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতের প্রদেশগুলির একীকরণে কয়েকটি প্রণালী মানিয়া লওয়া উচিত। প্রথম অনেকগুলি নানা শ্রেণীর দক্ষ কর্মচারী অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রদেশের বাছবিচার না করিয়া সমস্ত ভারতের মধ্যে যেখানে সেখানে বদলী হইবার নিয়ম করিতে হইবে, বাহাকে অল-ইণ্ডিয়া সার্ভিস বলে, কিন্তু তাহার ব্যাপ্তি অনেক বাড়াইয়া প্রায় শাসনযন্ত্রের প্রত্যেক বিভাগেই এই-রূপ উদারনীতি অনুসরণ করিতে হইবে। যেন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট বা স্থানীয় দল এই সব পরদেশী কর্মচারীর জীবন বিষময় ও নিফল করিয়া তুলিবার সুযোগ না পায়; এ জন্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টকে কড়া ও সজাগ হইতে হইবে। এই সব বাহির হইতে আমদানি-করা বিশেষজ্ঞ কর্মচারী সেখানে গিয়া যেন নিজ দেশে আছি এরূপ অনুভব করে।

যেমন আমাদের কেন্দ্রীয় সৈন্যদল যেখানেই মোতায়েন থাকুক না, সব সুবিধা ও সাহায্য পায়।

এইটি করিতে হইলে ইংরেজী ভাষায় কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ-পত্র ব্যবহার, দুই প্রদেশের মধ্যে কথাবার্তা এবং প্রত্যেক প্রদেশে কয়েকটি করিয়া ইংরেজী-মাধ্যমে স্কুল ও কলেজ রাখিতে হইবে এবং তাহাতে যে কোন ছাত্রকে ভর্তি হইতে অধিকার দিতে হইবে। যেমন কেথি জ. সিনিয়র ও জুনিয়র পরীক্ষার জন্য সমস্ত ভারতময় একই ধরনের ইংরেজী স্কুল থাকায় ভারতীয় সৈনিক কর্মচারী, রেলের বা ডাকের উচ্চ অফিসার ইত্যাদি বদলী হইবার ফলে কলিকাতা হইতে আগ্রা গেলে তাহাদের সন্তানেরা কোন অসুবিধায় পড়ে না। এটা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আমার তিনটি দৌহিত্র তাহাদের সৈনিক পিতার বদলীর সঙ্গে সঙ্গে স্কুল বদলানতে কোন ক্ষতিবোধ করে নাই। আরও যখন ইংরেজীর মাধ্যমে Cambridge Senior পরীক্ষা রক্ষা করিতে

হইবে, তখন ঐ পরীক্ষার পর উচ্চতর পড়িবার জন্য ইংরেজী মাধ্যমের কলেজও প্রত্যেক প্রদেশে রাখিতে হইবে; লক্ষ্ণৌ ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী পর্যন্ত হিন্দী মাধ্যমে চালাইবার নিয়ম হইলে এই সব ভ্রাম্যমাণ কর্মচারী পরিবারের জন্য ইংরেজীতে পড়ান ইউনিভারসিটি রাখিতে হইবে। এটা গা জোরের কথা নয়। বিষয়বুদ্ধি দিয়া দেশের এই কার্য হাসিল করিতে হইবে।

ইংরেজী ভাষার প্রতি এই অন্ধ বিদ্বেষকে যদি আমাদের নেতারাও প্রশ্রয় দেন, তবে তাহার ফল বিষময় হইবে। ইংরেজী ভাষা বিদেশীর দাসত্বের চিহ্ন নহে, এটা সমস্ত ইউরোপ, দক্ষিণ-আমেরিকার অনেক স্থানে (উত্তর-আমেরিকার ত কথাই নাই), ডচ ইন্দোনেশিয়া ভরিয়া প্রচলিত, যদিও সেখানে ইংরেজ কখনও রাজনৈতিক প্রভুত্ব করে নাই,



সেখানকার কোটি কোটি অধিবাসী সুবিধার জন্যই এই “বিদেশী” ভাষা-পড়ে ও লেখে, এ ভাষা ভিন্ন বাণিজ্য চলে না। এইজন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানীতে কেইসরের আজ্ঞায় ইংরেজী ছিল স্কুলে বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা। তিনি কি ইংরেজের গোলাম ছিলেন? তাহার প্রজাগণ কি ইংরেজের চাকরি খুঁজিত? একটু স্থির ভাবে টাইমস্ পত্রিকার এই কথাগুলি (১২ জুন ১৯৪৮-এর) ভাবিয়া দেখুন—

“Millions of people in Europe and Asia speak our language with fluency and precision. As travel becomes swifter and commoner the need for easy communication of minds will grow. English is the *easiest* language to learn . . . It is the nearest of all languages to the rank of a *world-speech*, and is more likely than any other to fulfil the world's need . . . One of the most delusive of popular superstitions is the belief that its language is a nation's soul.”



(নাটিকা)

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

পরলোকের পথ, পথের ছ'পাশের গাছে অজস্র ফুল ফুটেছে।  
যে মেয়েটি ফুল তুলছে তার নাম উষা। পথ দিয়ে আসে  
প্রকাশ, উষার কাছাকাছি এসে একটু দাঁড়ায়, আড়চোখে  
তাকায় উষার দিকে—ভাল লাগে তার দাঁড়াবার ভঙ্গীটি—  
আরো একটু দাঁড়িয়ে দেখবার ইচ্ছে হয়—কিন্তু দাঁড়ায় না—  
আন্তে আন্তে চলে। হঠাৎ ফিরে দাঁড়ায় উষা, লক্ষ্য করে  
প্রকাশের ভাবটা, মুখ টিপে হাসে, ফুল গাঁজে ধোঁপায়, তার  
পরে ডাকে প্রকাশকে—

উষা—দেখুন, একটু দাঁড়াবেন।

প্রকাশ—(থমকে দাঁড়িয়ে) আমাকে ডাকছেন?

উষা—হ্যাঁ।

প্রকাশ—(সম্ভরণে একটু দাঁড়িয়ে)—কেন?

উষা—(ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে) আমাকে কেমন দেখাচ্ছে  
বলুন তো।

প্রকাশ—(অপ্রস্তুত ভাবে) আপনাকে।

উষা—হ্যাঁ আমাকেই, বলুন কেমন দেখাচ্ছে।

প্রকাশ—(মাথা নীচু করে) সুন্দর।

উষা—ভাল করে চেয়ে দেখুন—রেখা ও রং দুটোই লক্ষ্য  
করবেন।

প্রকাশ—(একবার সচকিত দৃষ্টিপাত করে) সুন্দর।

উষা—(হঠাৎ হেসে উঠে) ও বুঝছি, আপনি নবাগত।  
পরলোকে কতদিন এসেছেন?

প্রকাশ—এই কয়েক দিন।

উষা—পার্শ্ব ভাবটা তাই এখনও কাটে নি, তাকিয়ে  
দেখুন, লজ্জা পাবার কিছু নেই।

প্রকাশ—(সাহস সঞ্চয় করে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা)

হঠাৎ উষা এক পা এগিয়ে এসে সবিস্ময়ে—

উষা—তুমি, তুমি কি প্রকাশ!

প্রকাশ—(আশ্চর্য হয়ে) আপনি কি আমাকে চেনেন।

উষা—(আরো কাছে এসে) প্রকাশ!

প্রকাশ—হ্যাঁ, আমি প্রকাশ।

উষা—(প্রকাশের কাঁধের উপর হাত রেখে) কেমন  
আছে?

প্রকাশ—ভাল আছি, কিন্তু আপনি কে?

উষা—(একটু হেসে) আমি কে।

প্রকাশ—(হাসবার ধরণটি দেখে চিন্তে পেরে) তুমি!

উষা—হ্যাঁ, আমি।

প্রকাশ—উষা!

উষা—বল।

প্রকাশ—আশ্চর্য্য, কত বদলেছ তুমি।

উষা—তুমিও অনেক বদলেছ—দেখেই তোমাকে চিনতে পারি নি।

প্রকাশ—(কাছে এসে) এ তুমি সেই আঠার-উনিশ বছরের উষা, বিয়ের সময়কার।

(হৃৎজনে হৃৎজনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে)

উষা—এসো, গাছের নীচে বসি, তোমার কথা শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।

(হৃৎজনে গাছের নীচে বসে)

উষা—কেমন করে এখানে এলে?

প্রকাশ—মোটর এক্সিডেন্ট।

উষা—একই কথা, কলেরা, টাইফয়েড, মোটর চাপা।

প্রকাশ—মোটর চাপা নয়, মোটর উণ্টে। রাঁচি থেকে আসতে পথে আমার মোটর উণ্টে যায়, তাতেই—

উষা—তোমার মোটর।

প্রকাশ—কিনেছিলাম।

উষা—(সবিস্ময়ে) ঠ্যা, মোটর কিনেছিলে। তা হলে অবস্থা খুবই ফিরেছিল।

প্রকাশ—হ্যাঁ, সেই যে ছোটনাগপুরের জমিটা—

উষা—যেটার জেজে একটি একটি করে আমার সব ক'খানা গয়না তুমি বেচেছিলে, যে মরুভূমির উপরে তুমি কল্লনার প্রাসাদ গড়তে, ছোটনাগপুরের সেই সর্বনাশা জমিটার কথা কি আমি ভুলতে পারি।

প্রকাশ—হ্যাঁ, সেই জমিটাই শেষে—

উষা—তোমার ধ্বংসের কারণ হ'ল—তা তো জানি।

প্রকাশ—না, সেইটাই শেষে উন্নতির কারণ হ'ল, জমির দাম এমন ছ হ করে বেড়ে গেল যে—

উষা—(হেসে) যে তুমি রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেলে। এত স্থল রহস্য তো তুমি আগে করতে না।

প্রকাশ—রহস্য মোটেই নয়—সত্যি কথাই বলছি।

উষা—(আশ্চর্য্য হয়ে) সত্যি বলছ। কিন্তু তখন আমি চলে এসেছি।

প্রকাশ—কিন্তু তুমি তখন চলে এসেছ?

উষা—বড়লোক হবার কত যে কল্পনা দিনরাত চলত, মনে পড়ে?

প্রকাশ—মনে পড়ে—দারিদ্র্যের মাঝখানে বসে ঐখন্ডের স্বপ্ন দেখতাম।

উষা—তবু স্বপ্ন তো সত্য হ'ল।

প্রকাশ—হ'ল—কিন্তু একটু দেরি—

উষা—(হেসে) কিন্তু একটু দেরি

প্রকাশ—সব বিষয়েই যেন ঐ একটু দেরি—যখন যেটি চাও তখন সেটি পাবে না।



“কত বদলেছ তুমি”

উষা—যখন পাবে তখন আর তার তাগিদ নেই—  
আশ্চর্য্য।

(হৃৎজনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে)

উষা—(হেসে) একটা ভারি মজার কথা ভাবছি।

প্রকাশ—বলে ফেল।

উষা—আমি যদি বড়লোক হতাম তা হলে কি করতাম।

প্রকাশ—বল কি করতে?

উষা—অথও অবসর পেয়ে আমার কবিমন স্বজনশীল হয়ে উঠত—

প্রকাশ—সহজ ভাষায় হেঁসেলে ঢোকবার হাদ্যামা না থাকলে—সারাদিন কেবল কবিতা লিখতে—এই তো?

উষা—আর তুমি সেই কবিতার খাতা গুড়িয়ে চায়ের জল গরম করতে এবং—

প্রকাশ—এবং সেই জলে যে চা তৈরি হ'ত তাতে থাকত বর্ষার গন্ধ, শরতের আশ্বাদ, বসন্তের বর্ণ, আর তা পান করে মাহুষ দেখত—

উষা—দুঃস্বপ্ন, জীর চরিত্রে সন্দেহ করত—

( হৃৎকেনে একসঙ্গে হেসে ওঠে )

উষা—মনে পড়ে আমার কবিতার খাতাটা। খুঁজে বার করবার তোমার অশেষ প্রয়াস, আর তাকে লুকিয়ে রাখবার আমার অবিরাম চেষ্টা। কবিতার ভাগি ভাল তাই এক দিনও সে তোমার হাতে পড়ে নি।

প্রকাশ—পড়লে ?

উষা—উঃ—তা আমি কল্পনাও করতে পারি না।

প্রকাশ—কিন্তু তোমার কল্পনাশক্তিকে আমি বরাবরই প্রশংসা করেছি। কলকাতা শহরে হাইকোর্ট খুঁজে বার করা তবু কঠিন, কিন্তু ১৪৪ বর্গফুট জায়গার মধ্যে তোমার কবিতার খাতা খুঁজে বার করা—

উষা—সত্যি বলছ ? তবে তুমি খাতাখানা হাতে পেয়েও নষ্ট কর নি ? তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা যে ভয়ানক বদলে যাচ্ছে।

প্রকাশ—সেই একটু দেরি—

( হৃৎকেনে হেসে ওঠে )

উষা—সত্যি করে বল আমার কবিতা তোমার কেমন লাগতো ?

প্রকাশ—খুব ভাল লাগতো।

উষা—( আশ্চর্য হয়ে ) তবে লিখতে গেলে অত আপত্তি করতে কেন ?

প্রকাশ—আমি নিজে লিখতে পারতাম না বলে।

উষা—ব্যাপারটা কি এতই সহজ ! এই নিয়ে কত প্রভাতের প্রসন্নতা, কত সন্ধ্যার শান্তি নষ্ট হয়েছে—সত্যিই কি এত সহজ !

প্রকাশ—আমিও তাই ভাবছি।

উষা—হয়তো দূরে সরে এসেছি বলে সহজ মনে হচ্ছে।

প্রকাশ—হয়তো পৃথিবীর আবহাওয়ার সংস্পর্শে এসে সহজ বিষয়গুলো রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

( হৃৎকেনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে )

উষা—আমি মরে যাবার পর তুমি কি আবার বিয়ে করেছিলে ?

প্রকাশ—আমাকে কি অত বোকা মনে কর ?

উষা—বিয়েটা কি বোকামি ?

প্রকাশ—নিশ্চয় বোকামি, তবে ও বোধটা হয় অবিজ্ঞি বিয়ে করবার পরে।

( হৃৎকেনে একসঙ্গে হেসে ওঠে )

উষা—বিয়ে করা হয়তো বোকামি কিন্তু তোমার মতে প্রেমে পড়াটাও কি বোকামি ?

প্রকাশ—অর্থাৎ তুমি জানতে চাও আমি বিয়ে করি নি বটে, কিন্তু প্রেম করেছি কিনা ?

উষা—( হেসে ) হ্যাঁ—তাই।

প্রকাশ—( একটু ইতস্তত করে ) করি নি আবার করেওছি।

উষা—পৃথিবীর গন্ধ এখনও একটু আছে দেখছি। হেঁয়ালি ছেড়ে দাও, পরলোকে ওটা অচল।

প্রকাশ—হেঁয়ালি তো নয়, কথাটা আমি খুলেই বলেছি—বিশেষ করে তুমি মরে গেলে প্রেম করিনি, তার আগে থেকেই করেছি।

উষা—( অবাক হয়ে ) বল কি ! আমি বেঁচে থাকতেই তুমি আর কাউকে ভালবেসেছ ? আমি বুঝছি সে কে। বেলাকে আমি বরাবর সন্দেহ করেছি।

প্রকাশ—ভুল করলে, বেলা নয়, সে চামেলি।

উষা—চামেলি, শিলঙের চামেলি ?

প্রকাশ—তুমি বেলায় দিকটার যত সচেতন ছিলে, চামেলির দিকটার ছিলে তত অচেতন, আর সেই স্বযোগে আমি—

( হৃৎকেনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে )

উষা—তোমার যকৃতের রোগটা তা হলে—

প্রকাশ—যোল-আনা মিথ্যা নয়, তবে ওরই অজুহাতে কয়েকবার শিলং যাত্রায় করেছি।

উষা—তাই যখন শিলং থেকে ফিরে এসেছ তখন যকৃতের চেয়ে হৃৎপিণ্ডের উন্নতিটাই বেশী লক্ষ্য করেছি।

( হৃৎকেনে একসঙ্গে হেসে ওঠে )

প্রকাশ—কিন্তু একটা কথা—

উষা—কি, বল।

প্রকাশ—তোমাকে ভালবাসতাম সবচেয়ে বেশী।

উষা—তার প্রমাণ।

প্রকাশ—চামেলির প্রেম তোমার কাছে নিরন্তর গোপন রাখবার চেষ্টাটাই তার প্রমাণ।

উষা—ওটার অর্থও হতে পারে।

প্রকাশ—কি সেটা ?

উষা—লুকিয়ে প্রেম করবার মধ্যে একটা বিপদ আছে।

প্রকাশ—তা আছে।

উষা—বিপজ্জনক কাজে লোকের আনন্দ সম্বন্ধিক।

প্রকাশ—এটা কি তোমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছ !

( উষা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়—হৃৎকেনে )

একসঙ্গে হেসে ওঠে )

প্রকাশ—বল কি উষা, তুমিও।

উষা—( হেসে ) আমিও।

প্রকাশ—আমি জানতাম উষা, আমি জানতাম, আমার দৃষ্টি এড়িয়ে তুমি যেতে পার নি। আমার অন্তর রমেশকে কোন দিনই বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারে নি। তোমাকে



খুশী করবার স্থল প্রচেষ্টাকে আমি বারে বারে ধরে ফেলেছি।  
আমার ভিতরে কে একজন রমেশকে দেখিয়ে বলেছে  
“সাবধান”।

উষা—তোমার ভিতরের সে এক জন ভাগ্যিস প্রভাতকে  
দেখিয়ে বলেনি ‘সাবধান’।

প্রকাশ—তার মানে ?

উষা—তার মানে আমি রমেশকে ভালবাসতাম না, ভাল-  
বাসতাম প্রভাতকে।

প্রকাশ—এখন একটু একটু বুঝতে পারছি।

উষা—আরও বললে আরও বুঝতে পারবে।

(ছ’জনে একসঙ্গে হেসে ওঠে)

প্রকাশ—জ্যোৎস্না রাত্রে প্রভাতের লেখা একটা গান  
তুমি গাইতে—মনে পড়েছে।

উষা—তুমি গান ভালবাসতে বলেই গাইতাম।

প্রকাশ—কার ভালবাসার খাতিরে গাইতে সেটা বলা  
কঠিন। মনে পড়েছে গান গাইবার পরে তোমার কেমন ভাবান্তর  
হ’ত,—ছই চোখ আলোয় ভরে উঠত, মনে হ’ত যেন তুমি  
স্বপ্নাতুরা—তোমাকে কত সুন্দর দেখতাম, ভারতাম কত ভাল-  
বাস তুমি আমাকে। তখন যদি জানতাম যে আমার বুকের  
কাছে বসে তুমি স্বপ্ন দেখছ আর একজনের, তা হলে—

উষা—(হেসে) তা হলে তুমি পাণীয়সী বলে চীৎকার  
করে আমাকে পদাঘাত করতে আর আমি মাটিতে পড়ে মূর্ছা  
যেতাম।

(ছ’জনে একসঙ্গে হেসে ওঠে)

উষা—কিন্তু জীবনের শেষের দিকটায় তোমাকেই ভাল-  
বেসেছিলাম—কি রহস্যময় পৃথিবী। (দূরে, আকাশে

পৃথিবীকে দেখিয়ে) ঐ যে মেঘ আর কুয়াশা ঢাকা এহটা ঘুর-  
পাক খাচ্ছে এটে পৃথিবী—ওখানে সবই যেন অস্পষ্ট—দিনের  
পাশে রাত, আলোর পাশে ছায়া।

প্রকাশ—(পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে) ওখানে পরিষ্কার  
কিছু দেখবার উপায় নেই, পরিষ্কার কিছু জানবার উপায় নেই,  
ওখানে যেন একদল ছেলেমেয়ে লুকোচুরি খেলছে—ভারি  
মজা।

উষা—স্থল জিনিষগুলো তো অস্পষ্টই, স্থল জিনিষগুলো যেন  
আরও অস্পষ্ট, এই যেমন ভাব, ভাষা। কথা আছে, কিন্তু তার  
মানে নেই। ভালবাসা কথাটার মানে বলতে পার ?

প্রকাশ—ভালবাসা মানে প্রেম।

উষা—আবার প্রেম মানে ভালবাসা, এই তো ? এর  
চেয়েও স্পষ্টতর মানে আর কি হয় না ?

প্রকাশ—দাঁড়াও, ভেবে দেখি। ভালবাসা মানে চাওয়া,  
কাউকে সম্পূর্ণভাবে চাওয়া।

উষা—আবার ভালবাসা মানে দেওয়াও হতে পারে,  
সম্পূর্ণভাবে দেওয়া।

প্রকাশ—এক বারও ভালবাসা যায়, আবার বহু বারও  
ভালবাসা যায়।

উষা—এক জনকে ভালবাসা যায়, আবার বহু জনকে  
ভালবাসা যায়। কিন্তু যাই বল পৃথিবীতে কিছু জানা কিছু  
না জানা নিয়ে ছিলাম বেশ।

প্রকাশ—বেশ।

(ছ’জনে একসঙ্গে হাসতে থাকে)

পটক্ষেপ

## বাঙালীর গান

শ্রীশান্তি পাল

মুক্তির ডাক আমরা দিয়েছি সকলের আগে  
আচার বর্ন ভাঙিয়া করেছি জয়,  
নুতন যুগের শুভ সূচনায় আমরা দেখেছি  
সকলের আগে প্রথম স্বর্ঘ্যোদয়।  
রাষ্ট্র—শক্তি—সাধন—ক্ষেত্রে  
ফাঁসীর মঞ্চ কারার বেত্রে,  
হুর্ঘ্যোগ ভরা জুগ্ম পথে—  
আমরা এনেছি বিপ্লবে বরাভয়।

আমাদের জয়-যাত্রা হয়েছে গুরু—  
আমাদের শিরে নব দায়িত্ব গুরু—  
মহাভারতের মহাবেদীমূলে  
দিয়েছি অধ্যাদি-জবাবুলে  
জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কৃষ্টি-কলার  
আমরা করেছি তাহারে মহিমায়।

# মহাচীনের যুগ-সন্ধি

অধ্যাপক শ্রীমুখাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

তাতার জাতীয় মাঞ্চুগণ ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে চীন অধিকার করিয়া চিং বা মাঞ্চুরাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে। মহাচীনের এই বিজেতৃত্ব প্রথমতঃ মাঞ্চুরিয়ার অন্তর্গত কিরিন প্রদেশে বাস করিত। মুরহাচি চীনের প্রথম মাঞ্চু সম্রাট। ১৬৬২ সালে তাঁহার দেহাবসানের পর সম্রাট কাংহি (১৬৬২-১৭২৩) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার রাজত্বকালে চীনের সর্বত্র মাঞ্চু কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় ফরমোসা দ্বীপও চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কাংহির রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয়। কাংহির পৌত্র কিয়েন লুং-এর (১৭৩৬-৯৬) রাজত্বকালে ছোটখাট আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহসত্ত্বেও সাম্রাজ্যের শান্তি, শৃঙ্খলা বা সমৃদ্ধি বিশেষ ব্যাহত হয় নাই। পূর্ব-তুর্কিস্থান জয় করিয়া তিনি ব্রহ্মবিদ্রোহ দমন করেন এবং তথায় স্বীয় কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। নেপালের গুর্খাগণ তিব্বত আক্রমণ করিলে তিনি সেই আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তিব্বতে মাঞ্চু অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তী সম্রাট কিয়াকিং-এর রাজত্বকাল হইতে সাম্রাজ্যের অবনতি আরম্ভ হয়। শাসন-ব্যবস্থা ক্রমশঃ কলুষিত হইয়া পড়ায় সাম্রাজ্য-সৌভাগ্য ভিত্তি দিনের পর দিন শিথিল হইতে লাগিল।

এদিকে ক্যাংচেনে অবস্থিত বৈদেশিকগণের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল এবং উত্তরোত্তর তাহাদের বাণিজ্যের ত্রিভুজি ঘটিল। কিন্তু নানাপ্রকার সরকারী বিধিনিষেধের ফলে পদে পদে ইহাদিগের ব্যক্তিগত স্বাভাবিক ক্ষমতা এবং মর্যাদাবোধ আহত হইত।

১৭২৯ সালে চীনে প্রথম অহিফেন-দুসপান নিষিদ্ধ হয়। ১৭৯৬ সালে পূর্বাশিয়া কঠোরভাবে অহিফেন সেবন নিষিদ্ধ হইল। ১৮০০ সালে প্রচারিত এক রাজকীয় আদেশপত্রে বলা হইল যে অতঃপর কেহ চীনদেশে অহিফেনের চাষ করিতে অথবা বিদেশ হইতে অহিফেন রপ্তানি করিতে পারিবে না।

সম্রাট টাঙকোয়াং (১৮২০-৫০) শাসন-ব্যবস্থা এবং রাজদরবারের দ্বীর্ণতা দূর করিয়া সাম্রাজ্যের শক্তি-বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার অজ্ঞাত সংস্কার-প্রচেষ্টার মধ্যে অহিফেন-ব্যবসায় বন্ধ করিবার চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীনে সর্বপ্রথম অহিফেনের আমদানি হয়। তখন কেবলমাত্র ঔষধ হিসাবেই ইহা ব্যবহৃত হইত। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ বণিকদের চীনে আগমনের পর হইতে চীনদেশে প্রথম অহিফেন-দুসপানের প্রথা প্রচলিত হয়।

প্রথম প্রথম বিভবানু অবসরভোগী সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রধানতঃ অহিফেনের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে চীনে প্রচুর পরিমাণে অহিফেন পাঠাইতে আরম্ভ করে। সমাজের সর্বস্তরেই এই সময় হইতে অহিফেন সেবন প্রচলিত হয়। ফলে সমগ্র জাতির দেহ এবং মনের গুরুতর অবনতি সন্নিবিষ্ট হইতে থাকে। চীন সরকার যখন অহিফেনের অপকারিতা বুঝিতে পারিয়া ইহার আমদানি নিয়ন্ত্রিত করিতে সচেষ্ট হইলেন, তখন ইংরেজ বণিকগণ এক অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভারতবর্ষ হইতে চীনগামী জাহাজের খোলে অহিফেন বোঝাই করিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। এই সমস্ত জাহাজ চীনে পৌছিয়া তীর হইতে বহু দূরে বন্দর-সীমানার বাহিরে নোঙ্গর করিত। খোলে বোঝাই অহিফেন পরে গোপনে দেশের অভ্যন্তর-ভাগে চালান দেওয়া হইত। ইহার ফলে দেশী এবং বিদেশী চোরাকারবারীরা বেশ কাঁপিয়া উঠিল।

১৮৩৯ সালে সম্রাট টাঙকোয়াং অহিফেনের গোপন আমদানি বন্ধ করিবার জন্ত লিন-সি-সু-কে হাই কমিশনার নিযুক্ত করিলেন। ক্যাংচেনে আসিয়া কাঁচাভার গ্রহণ করিয়াই তিনি সমস্ত বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিলেন এবং ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ও অজ্ঞাত সমস্ত বিদেশীয় বণিককে গৃহ-বন্দী করিয়া দাবি করিলেন যে ইহাদের নিকট যত অহিফেন আছে সমস্ত তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। বৈদেশিক বণিকগণ প্রাণের দ্বায়ে ২০,২১ বাস্ক অহিফেন চীন কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। কর্তৃপক্ষও ইহার সমস্তটা নষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া চীন এবং ইংলণ্ডের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাহাই কুখ্যাত প্রথম অহিফেন যুদ্ধ। এই যুদ্ধে চীন হারিয়া যায়। ১৮৪২ সালে যুদ্ধাবসানে নান্‌কিং সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। পরাজিত চীন প্রবল প্রতিপক্ষের সমস্ত দাবি মানিয়া লইল। ইহারই ফলে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে চীনের অবস্থা আমূল পরিবর্তিত হইয়া গেল।

নান্‌কিং-এর সন্ধি অল্পদূরে মাঞ্চু সরকার বৈদেশিক বণিকগণের যে অহিফেন নষ্ট করিয়াছিলেন তাহার মূল্য এবং যুদ্ধের ব্যয় বাবদ ইংরেজদিগকে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হইলেন। ইহার পর হইতে আজ পর্যন্ত চীন যখনই কোন আন্তর্জাতিক যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে, প্রত্যেক বার বিজেতাকে যুদ্ধের জন্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইয়াছে।

প্রথম অহিফেন যুদ্ধ চোখে আঁচুল দিয়া দেখাইয়া দিল

চীন কত দুর্বল, কত অভঃসারবিহীন।<sup>১</sup> অহিফেন-যুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে অত্যাচার আন্তর্জাতিক যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্ত চীনকে বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের নিকট অনেক টাকা ঋণ করিতে হয়। ঋণ পরিশোধ করিবার জন্ত সরকারী আয় বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল। এই উদ্দেশ্যে যাবতীয় বিদেশাগত পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করা হইল। শুল্ক বিভাগ প্রথম হইতেই বিদেশীয়, বিশেষ করিয়া ইংরেজ কর্তৃত্ব পরিচালিত হইল। এই সময় বিদেশাগত সমস্ত পণ্যমূল্যের উপর শতকরা মাত্র পাঁচ টাকা হারে আমদানি-শুল্ক ধার্য করা হইল। এই ব্যবস্থার ফলে চীনে বৈদেশিক পণ্যের আমদানি হ্রাস করিয়া বাড়িয়া যাওয়াতে দেশের কুটির-শিল্প এবং অর্থনৈতিক সংগঠন একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। চীনের শিল্পোন্নতির পথ বিঘ্ন-সঙ্কুল হইয়া পড়িল এবং আন্তরিক অর্থনীতিক জীবনে ঘোরতর বিপর্যয় দেখা দিল।

বৈদেশিক বণিকগণ পূর্বে কেবলমাত্র নান্‌কিং বন্দরে বাণিজ্য করিতে পারিতেন। প্রথম অহিফেন-যুদ্ধের পর অত্যাচার কয়েকটি বন্দরে ইহাদের বাণিজ্য করিবার অধিকার স্বীকার করিতে হইল। এই বন্দরগুলিকে সন্ধি-বন্দর (treaty port) অর্থাৎ সন্ধির ফলে উন্মুক্ত বন্দর বলা হয়। ১৮৪২ সালের সন্ধির ফলে ক্যান্টন, এময়, নিংপো, ফুচো এবং সাংহাই বন্দরে বৈদেশিকগণের বাণিজ্যাদিকার স্বীকৃত হইল। হংকং ইংরেজদিগকে দিয়া দেওয়া হইল। কোন কোন সন্ধি-বন্দরে ইহার পর আন্তর্জাতিক উপনিবেশ স্থাপিত হইল। এই সমস্ত উপনিবেশে যাহারা বাস করিতেন তাহারা বহুলাংশে চীনের সরকারী শাসন-ব্যবস্থার কর্তৃত্বমুক্ত ছিলেন। প্রায় প্রত্যেক সন্ধি-বন্দরেই বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রের নিজস্ব এলাকা ছিল। এই সমস্ত এলাকাতে বৈদেশিক আইন প্রচলিত ছিল। কোন চীন নাগরিক বৈদেশিকদিগের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা করিলে প্রতিবাদীর দেশে প্রচলিত আইন অনুসারে তাহার বিচার হইত। চীন-প্রবাদী বৈদেশিকগণের এই অধিকার, 'রাইট অব এক্সট্রাটেরিট-রিয়ালিটি' (Right of Extraterritoriality) নামে অভিহিত হইত। ইহারই ফলে চীনে বৈদেশিকগণের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বহুল পরিমাণে বর্ধিত হয়।

১৮৪৩ সালে ইংলণ্ডের সহিত চীনের আর একটি সন্ধি

হয়। এই সন্ধি অনুসারে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে চীন-সরকার একটি নতুন বিধান মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। এই বিধানই সর্বজননির্দিষ্ট "most favoured nation clause"। ইহার তাৎপর্য এই যে একটি বৈদেশিক রাষ্ট্র চীনে যে সুবিধাভোগ করিবে সেজন্ত সমস্ত জাতিকেই সেই অধিকার দিতে হইবে।<sup>২</sup>

১৮৪৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত চীনের যে সন্ধি হয় তাহাতে আমেরিকা এই বিধানের সুযোগ গ্রহণ করে। এই নীতি প্রয়োগের ফলে চীনের অস্তিত্ব রক্ষা পাইল সত্য, কিন্তু ইহার জন্ত তাহাকে মূল্য দিতে হইল বড় বেশী।<sup>৩</sup>

সম্রাট সিংফেং-এর (১৮৫১-৬১) রাজত্বকালে মহা-চীনের শাসন-ব্যবস্থা আরও কলুষিত হইয়া পড়িল। দেশময় অন্তর্বিপ্লবের আগুন জলিয়া উঠিল। এই সমস্ত অন্তর্বিপ্লবের মধ্যে টাইপিং বিদ্রোহই (১৮৫০-৬৪) সর্বাপেক্ষা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। সামন্ত-শক্তির ধ্বংসসাধন করিয়া সামন্ত-তন্ত্রের অবসান ঘটানো এই বিদ্রোহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় কৃষকদিগের উপর নিদারুণ অত্যাচার চলিতেছিল। সুতরাং সম্রাটের মেরুদণ্ড-স্বরূপ কৃষকসম্প্রদায়ই প্রধানতঃ টাইপিং বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল।

এই বিদ্রোহের নেতা হুং সিউ-চুয়ান্ বেশী লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই। হুং-এর অননুভবিত কর্মক্ষমতা এবং দূরদর্শিতা বহুলাংশে তাহার শিক্ষার অভাব পূর্ণ করিয়াছিল। প্রথম জীবনে তিনি খ্রীষ্টীয় প্রচারকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। অত্যাচারী মাফু-রাজবংশকে বিভাঙিত করিয়া "শান্তিময় স্বর্গীয় রাজ্য" (Piny tien kno or peaceful kingdom of Heaven) স্থাপন করিবার জন্ত জনসাধারণকে তাহার পতাকাভালে সমবেত হইতে তিনি

১। "This subjected the Chinese to another new principle: that any privilege won from them by any foreign country could be equally enjoyed by all our foreign countries."—*The Making of Modern China* by Owen and Eleanor and Latimore, p. 117.

২। "The clashing interests of the Western powers did not allow any one of them . . . take over China completely. Since the Peking Government was the agent responsible for giving equal terms to all the co-operating contenders, all had an interest in its continued existence. If this was very expensive insurance, it also eliminated certain risks. There is no doubt that, in the long run, it preserved a certain minimum of China's sovereignty, even though the great Chinese leader Sun Yat-sen was to remark somewhat bitterly that instead of a colony or semi-colony, it made the country a 'hypo-colony'—a colony for every one."—*The Unfinished Revolution in China* by I. Epstein, p. 20.

৩। "The effect of this break-through was cataclysmic. It immediately exposed the fact that China not only had ceased to be the 'centre of the world' and the greatest fortress in Asia, but on the contrary was powerless against the fate that had overtaken India."—*The Unfinished Revolution in China*, by I. Epstein, p. 19.

আহ্বান করিলেন। লক্ষ লক্ষ কৃষক ছং-এর আহ্বানে সাড়া দিল। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হইতেও কেহ কেহ এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন। অনেক সুযোগ-সন্ধানী ভাগ্যবশীও বিদ্রোহীদের দলপুষ্টি করিয়াছিল। কোয়ানটুং এবং কোয়াং-সির অজ্ঞাত অখ্যাত কয়েকটি গ্রামে টাইপিং বিদ্রোহের সূচনা হয়। ১৮৫২ সালের বসন্তকালে বিদ্রোহী-বাহিনী কোয়াং-সি হইতে হুনান প্রদেশের ভিতর দিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইল। অল্পকালের মধ্যে চাংসা ব্যতীত সমগ্র হুনান, ইয়োচো, হসিয়াং এবং উচাং বিদ্রোহীদের পদানত হইল। অতঃপর টাইপিং-বাহিনী ইয়াংসি নদীর তীর ধরিয়া অগ্রসর হইল। ইহার চলার পথে যে সমস্ত জনপদ পড়িল তাহা লুণ্ঠিত এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। জমিদারদিগের জমিতে অধিকার-সূচক বাবতীর দলিলপত্র বিদ্রোহীরা ধ্বংস করিয়া ফেলিল (তুলনীয়—ইংলণ্ডের কৃষক বিদ্রোহ, ১৩৮১ সাল)। নান্‌কিং অধিকার করিয়া ছং সিউ-চুয়ান সেইখানে সচোজাত টাইপিং সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করিলেন। ইহার পর কিছু দিনের জুড় টাইপিং বাহিনীর পূর্বাভিমুখে অগ্রগতি বন্ধ রহিল। কিন্তু উত্তরে পিকিং অধিকার করিবার জুড় অভিযান প্রেরিত হইল। সমস্ত বাধা পদদলিত করিয়া টাইপিং বাহিনী বিজয়-গর্বে টিয়েনটসিন বন্দরের অনতিদূরে শিবির স্থাপন করিল। তখন বিদ্রোহের প্রাথমিক বেগ নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই টাইপিং বাহিনী দক্ষিণে ছটয়া আসিতে বাধ্য হইল (১৮৫৪)। এদিকে টাইপিং বিদ্রোহের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিপ্লবী শক্তিসমূহ সক্রিয় হইয়া উঠিল। ১৮৫৪ সালে বিশাল মাঞ্চু সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশেও কেন্দ্রীয় সরকারের নিঃসপত্ত কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইত না।

ঠিক এই সময়েই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আবার বেশ ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছিল। ক্যান্টনের শাসনকর্তা ইয়েও-মিংচিনের অতুহ্যত নীতিতে তত্ত্ব বৈদেশিক বণিকগণ অনেক দিন হইতেই অসন্তোষিত বোধ করিতেছিলেন। ১৮৫৬ সালে তিনি 'এরো' নামক একখানা বিলাতি জাহাজ হইতে কয়েকজন জলদস্যুকে গ্রেপ্তার করেন। ক্যান্টনের ইংরেজ রাজদূত এই আচরণের জুড় ইয়ের নিকট প্রতিবাদ জানাইলেন এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করিলেন। ক্ষতিপূরণ দেওয়া দূরের কথা, ইয়ে ইংরেজ দূতের প্রতিবাদের কোন উত্তর পর্যন্ত দিলেন না। ইহারই ফলে দ্বিতীয় অফিফেন-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সম্মিলিত ইং-ফরাসী বাহিনী ক্যান্টন এবং পেইছো নদীর মোহনাতে অবস্থিত টাকুর দুর্গশ্রেণী অধিকার করিয়া টিয়েনটসিন অভিমুখে অগ্রসর হইল। কালবিলম্ব না করিয়া আত্মরক্ষায় অক্ষম মাঞ্চু সরকার ইংরেজ এবং তাহার মিত্র ফরাসী, রুশীয় এবং আমেরিকানদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সমস্ত

সন্ধি টিয়েনটসিনের সন্ধি (Treaties of Tientsin, 1858) নামে খ্যাত। সন্ধির সর্তাহুসারে পিকিং বৈদেশিক দূতাবাস স্থাপনের ব্যবস্থা হইলেও কার্যতঃ ১৮৬০ সালের পূর্বে কোন দূতাবাস স্থাপিত হইতে পারে নাই।

— ১৮৬০ সালে নান্‌কিং হইতে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে টাইপিং বাহিনীর অভিযান আরম্ভ হইল। সূচো এবং হাংচো প্রথমতঃ বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়, পরে হাংচো পরিত্যক্ত হয়। পশ্চাদপসরণের পূর্বে টাইপিং সৈন্যদল হাংচোর ৭০,০০০ জন অধিবাসীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। সাংহাই অধিকার করিতে যাইয়া বিদ্রোহী বাহিনী বৈদেশিক-শক্তিপুঞ্জের নিকট হইতে বাধা পায়। ১৮৬২ সালে ইংরেজ সৈন্যাদ্যক্ষ ক্যাপ্টেন চার্লস ই. গর্ডন—ইতিহাসে ইনি চাইনিজ গর্ডন নামে সুপরিচিত—সাংহাইয়ের বৈদেশিক বাহিনীর অধিনায়কত্বের ভার গ্রহণ করেন। নগরের পর নগর হইতে বিদ্রোহীদেরকে বিতাড়িত করিয়া গর্ডন অবশেষে সূচো অধিকার করেন। ইহার পর তিনি পদত্যাগ করিলেন। ১৮৬৩ সালের মধ্যেই টাইপিং বিদ্রোহের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায়। মাঞ্চুবাহিনী নান্‌কিং পুনরধিকার করিল। ছং সিউ-চুয়ান আত্মহত্যা করিলেন।

পঞ্চদশ বর্ষব্যাপী টাইপিং বিদ্রোহের ফলে ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী এগারটি প্রদেশ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ইহার ফলে ২০,০০০,০০০ নরনারীর জীবনান্ত হয়। এই বিদ্রোহ একাধারে ভূখানী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কৃষকদিগের এবং মাঞ্চু কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মহাচীনের জাতীয় অভ্যুত্থান। বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের মধ্যে কেহ কেহ প্রথমে টাইপিং বিদ্রোহের সমর্থক হইলেও শেষ পর্যন্ত বৈদেশিকগণের সাহায্যেই এই বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছিল। বৈদেশিকগণ যখন বৃত্তিতে পারিলেন যে বিদ্রোহীগণ তাঁহাদের হস্তে ক্রীড়নক হইতে সম্মত হইবে না তখন তাঁহারা টাইপিং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মাঞ্চু সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ছং সিউ-চুয়ান বৈদেশিক সাহায্যের প্রত্যাশী ছিলেন না। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ নিরপেক্ষ থাকিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন।

মহাচীনের গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাসে টাইপিং বিদ্রোহ একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করিল। ইহা চীনের সর্বশেষ

১। "The Anglo-French intervention against the Taipings was further sped by the unwillingness of the latter to compete with the Manchuo for the post of foreign tool. Hsin-chuan, the "Heavenly king," did not ask for European assistance, only for European neutrality. He showed no interest in London's offers to act as "honest broker" between the warring parties, saying that if he had to deal with the Emperor, the individual will be well-fed and well-clothed."—*Taiiping China*, by I. Epstein, p. 26.

কৃষক-বিদ্রোহ এবং সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক বিপ্লব। চীনের রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক জীবনে এই বিদ্রোহ এক অভিনব বিপ্লবের সূচনা করিল। যে দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে মহাচীন নবজন্মলাভ করিয়াছে, তাইপিং বিদ্রোহ সে সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়। আজ পর্যন্ত এই সংগ্রামের উপর সমাপ্তির যবনিকা পড়ে নাই।

চীনের অর্থনৈতিক জীবনে তাইপিং বিদ্রোহীগণই সর্বপ্রথম সমবায়নীতি এবং সাম্যের আদর্শকে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের ভূমি-সংক্রান্ত বিধান ইহার প্রমাণ রহিয়াছে।

তাইপিং বিদ্রোহের পরবর্তী ২০ বৎসরকাল চীনের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটে নাই। এই সময়ের মধ্যে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। ১৮৬৭ সালে বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে চীন হইতে মিঃ বার্লিংগেমের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বিদেশে প্রেরিত হয়। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফলোদয় হয় নাই। ১৮৭০ সালে টিয়েন্টসিনে একটি ভীষণ দাঙ্গা হয়। এই দাঙ্গার ফলে টিয়েন্টসিনের ফরাসী-পরিচালিত অনাধ আশ্রম এবং গির্জা ভস্মীভূত ও বহু ফরাসী-নাগরিক হতাহত হয়। এই সময় ইউরোপে ফ্রান্সের সহিত জার্মানীর যুদ্ধ (Franco Prussian War, 1870) চলিতেছিল। সুতরাং চীনের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অবসর ফ্রান্সের ছিল না। পরে অবশু চীন-সরকারকে এই দাঙ্গার জন্ত প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল।

১৮৮০ সালে ফরাসীগণ কর্তৃক মাঞ্চু সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত টংকিন আক্রান্ত হওয়ায় চীন এবং ফরাসী দেশের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। পরবৎসর ফুচো বন্দরে ফরাসী-নৌবহর কর্তৃক চীনের নৌ-বহর বিধ্বস্ত হয়। ফরাসী-বাহিনী অতঃপর ফরমোসা অধিকার করিতে গিয়া বিফলমনোরণ হইয়া ফিরিয়া আসে। ১৮৮৫ সালে স্বাক্ষরিত একটি সন্ধির ফলে টংকিনে ফরাসী অধিকার স্বীকৃত হইল।

মাঞ্চুগণ চীনের ভাগ্যবিধাতা হওয়ার কিছুদিন সহস্র বৎসর

পূর্বে ৬৬৭ সালে চীন কোরিয়া অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু কোরিয়াতে চীনের কর্তৃত্ব কোন দিনই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এদিকে প্রতিবেশী জাপানেরও বরাবরই কোরিয়ার উপর চোখদৃষ্টি ছিল। জাপান সুযোগ পাইলেই মধ্যে মধ্যে কোরিয়া আক্রমণ করিত। ১৮৭৬ সালে এই রকম একটি আক্রমণের পর কোরিয়া জাপানের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিতে বাধ্য হয়। পিকিং সরকারের আদেশে সমস্ত বৈদেশিক জাতিই এখন হইতে কোরিয়াতে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করিল।

আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্ত ১৮৯৪ সালে মাঞ্চু সরকার কোরিয়াতে সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। জাপ সরকারও কোরিয়ার স্বাধীনতারক্ষার (৭) উদ্দেশ্যে সৈন্ত পাঠাইলেন। ফলে চীন এবং জাপানের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। স্থলযুদ্ধে সর্বত্র জয়লাভ করিয়া জাপ-বাহিনী চীনা সৈন্যকে কোরিয়া হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। জলযুদ্ধেও চীনা সৈন্ত সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়। ইয়ালু নদীর যুদ্ধের পর পোর্ট আর্থার জাপানের হস্তগত হইল। ১৮৯৫ সালের ১৭ই এপ্রিল সিমোনোসেকিতে চীন এবং জাপানের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধি দ্বারা চীন জাপানকে সুদূর প্রাচ্যে সর্বপ্রকারে অত্যাচার বৈদেশিক রাষ্ট্রের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। জাপান চীনের নিকট হইতে যুদ্ধের ব্যয় বাবদ প্রচুর অর্থ পাইল। লিয়াওটুং উপদ্বীপ ফরমোসা এবং পেঙ্কাডোরস দ্বীপমালা জাপ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। পরে রুশিয়া, ফ্রান্স এবং জার্মানী এই ত্রি-শক্তির-চাপে পড়িয়া জাপানকে অর্থের বিনিময়ে লিয়াওটুং-এর উপর দাবি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

১৮৯৭ সালে সানটুং প্রদেশে দুই জন জার্মান দেশীয় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাঙ্কক নিহত হন। এই হত্যার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ চীনসরকার জার্মানীকে কিয়াওচাও ইজারা দিতে বাধ্য হন। ইহার পর সুদূর প্রাচ্যে শক্তি-সাম্য রক্ষা করিবার অজুহাতে রুশিয়া, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স যথাক্রমে পোর্ট আর্থার, ওয়েইহেইওয়েই এবং কোয়াংচোওয়ানের ইজারা পায় (১৮৯৮)। ইহাদের দেখাদেখি ইটালিও চেকিয়াং-এ সুন-মেন উপসাগরের ইজারা দাবি করিয়া বসিল। কিন্তু এই দাবিতে কর্পপাত করা হয় নাই।

এই সময়ই মাঞ্চুসাম্রাজ্যের পতন ঘটিতে পারিত। যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী অব স্টেট মিঃ হে ঘোষিত মুক্তদ্বার এবং অধিকার-সাম্যের নীতির জন্তই এই অবশুস্তাবী পরিণতি সন্মত হয় নাই। এই নীতি অনুসারে একটি বৈদেশিক রাষ্ট্র চীনে কোন অধিকার লাভ করিলে অতঃ সমস্ত রাষ্ট্রকেই সেই অধিকার দিতে হইত। মুক্তদ্বার নীতির ফলে চীন কোন জাতিবিশেষের উপনিবেশ না হইয়া আন্তর্জাতিক উপনিবেশ

১। "Having fields, let them cultivate together, and when they get any rice, let them eat it together . . . so that everyone may share and share alike . . . As soon as the harvest arrives, every vexillary (lowest Taiping administrative official) must see to it that the twenty-five parishes under his charge have sufficient supply of food, and what is over and above he must deposit in the public granary . . . Then the sovereign will have sufficient to use and all the families, in every place, will be equally provided for, while every individual will be well-fed and well-clothed."—Taiping Land Laws.



পরিণত হইল। ১। এই নীতি এবং আন্তর্জাতিক অসম সন্ধিসমূহ বহুলাংশে চীনের সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ করিয়া বৈদেশিক রাষ্ট্রপুঞ্জকে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার ভাগ্যবিধাতা করিয়া তুলিয়াছিল।

১৮৯৪-৯৫ সালের জাপয়ুদ্ধ যেরূপ একদিকে চীনের অস্ত্রসারশুভতা প্রমাণ করিল, তেমনিই অপর দিকে আবার চীনের সংস্কারপন্থীদিগকে সক্রিয় করিয়া তুলিল। সো-শুং-টাং, সোং-ক্যুও-ফান প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ মাঝুসাম্রাজ্য এবং শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দৌর্বল্য দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সো-শুং-টাং ইয়াকুং বেগের নেতৃত্বে পরিচালিত সিংকিয়াং-এর উইগুর বিদ্রোহ এবং চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমানদিগের অত্যাচার বিদ্রোহ দমন করিলেন। এই সমস্ত কর্মচারী বৃত্তিতে পারিলেন যে বিদেশীয় শত্রুর আস হইতে চীনকে রক্ষা করিতে হইলে তাহাকে সর্বপ্রকারে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে। এই সময়েই চ্যাং সি-টুং চীনের সর্বস্বত্ব ইম্পাটের কারখানা স্থাপন করেন। সো-শুং-টাং ল্যান্চোতে একটি কাপড়ের কল স্থাপন করিলেন।

“ভরুণ চীন দল” বিশ্বাস করিত যে আশুল সংস্কার ব্যতীত মাঝু সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা যাইবে না। এই দলের অন্ততম নেতা কাং ইউ ওয়েই জমশঃ সম্রাট কোয়াংসুকে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন এবং সংস্কারে আস্থাবান করিয়া তুলিলেন। ফরমানের পর ফরমান জারি করিয়া বিদ্রোহ-গতিতে শাসন-ব্যবস্থার শত-বর্ষাধিক কাল সঞ্চিত যাবতীয় গলদ দূর করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই প্রচেষ্টাই ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলন মাত্র তিন মাসকাল স্থায়ী হইয়াছিল। সম্রাটের মন্ত্রিগণ নীজই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সম্রাট সিংয়েংফেং-এর মাতা জু-সি—ইনি ‘এম্প্রেস ডাওয়েজার’ নামে সমধিক পরিচিতা, এই সময় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কর্মহীন জীবনযাপন করিতেছিলেন। রাজ্য-শাসনকার্যে তিনি আবার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ

করিলেন। তাহার প্রভাব এবং প্রচেষ্টার সংস্কারের বেগ মন্দীভূত হইয়া অবশেষে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। সংস্কার আন্দোলনের বহু সমর্থক বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। সম্রাট কোয়াংসুকে জীবনের বাকী ১০ বৎসরকাল বন্দী করিয়া রাখা হইল।

জাতি-মানসের পুঞ্জীভূত অসন্তোষবহি কিন্তু নির্বাপিত হইল না। ১৯০০ সালে এই অসন্তোষ বজ্রার বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ করিল। ‘ই-ছো’ নামে একটি গুপ্ত সমিতি এই বিদ্রোহ পরিচালিত করে। ‘ই-ছো’ কথাটির অর্থ ‘ভায় এবং ঐক্য সমিতি’ এবং ‘মুষ্টিযুদ্ধ অনুশীলন সমিতি’ এই দুই অর্থই হইতে পারে। এই বিদ্রোহের পশ্চাতে কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না। বিদেশীয়গণকে চীন হইতে বিতাড়িত করিয়া জাতীয় গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এই বিদ্রোহের অন্তর্ভুক্তি ছিল। বজ্রারগণ মাঝু-দিগকেও বিদেশীয় বলিয়াই মনে করিত। প্রকৃত প্রস্তাবে মাঝু রাজবংশ বিদেশাগতই ছিল।

জু-সির কৌশলে বজ্রারগণ তাহাদের মাঝু বিরোধী-নীতি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র পাশ্চাত্য-জাতিসমূহকে চীন হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মাঝু দরবার বলিতে লাগিল যে Foreign Devil অর্থাৎ বিদেশীয় শত্রুতানদিগকে বিতাড়িত করিতে না পারিলে চীনের দুঃখ-রজনীর অবসান হইবে না। কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদিগকে সর্ব-প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ক্যান্টনের শাসনকর্তা লি হাং-চাং এবং নান্‌কিং-এর শাসনকর্তা লিউ কুন-ই প্রথম হইতেই সরকারী নীতির বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

পিকিং এবং টিয়েন্টসিন বজ্রারগণের হস্তগত হইল। বজ্রার-বাহিনী কর্তৃক অতঃপর পিকিংয়ের বৈদেশিক দূতাবাস অঞ্চল অবরুদ্ধ হইল। আট সপ্তাহ অবরোধের পর সম্মিলিত ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, রুশীয়, ইটালীয়, অষ্ট্রিয়, আমেরিকান, এবং জাপানবাহিনী পিকিংয়ের উদ্ধারসাধন করে। জু-সি ছদ্মবেশে পিকিং হইতে পলায়ন করিয়া সিয়ানফুতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পলায়নকালে তিনি বন্দী সম্রাটকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ভুলেন নাই। ইহার পর পিকিং লুণ্ঠিত হইল। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণ ইত্যাদি কিছুই বাকী রহিল না। বজ্রার বিদ্রোহকালে পিকিং সম্মিলিত শক্তি-পুঞ্জের আচরণ ইতিহাসের একটি কলঙ্ক-মলিন পৃষ্ঠা। ১।

১৯০১ সালে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। বহিরাগত-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অনেকেই চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। পিকিং হইতে টিয়েন্টসিন পর্যন্ত যাবতীয় রক্ষণ-ব্যবস্থা—

১। “A colony of all nations which had merchantships to send to China and gun-boats to accompany them.—*The Making of Modern China*, by Owen and Eleanor Latimore, p. 117.

“The Open Door did not propose a cessation of imperialistic demands on China; they merely registered a claim of ‘me loo’ . . . . The practical effect of this arrangement was to halt the process of cutting China up into colonial possessions. There developed, instead a uniform procedure of presenting joint international demands to the Chinese Government.”—*Ibid*, pp. 121-22.

১। “It was not a reputable page in the history of either East or West.”—*A Short History of Chinese Civilisation*, by Tsui Chi, p. 239.

প্রাচীর, দুর্গ ইত্যাদি ভূমিসং করা হইল। চীন বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জকে ৬,৭৫০,০০০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ এবং অস্ত্র নানাবিধ সুবিধা প্রদান করিতে সম্মত হইল। বজ্রার বিদ্রোহের পর চীনের সার্বভৌমিকতা আরও ক্ষুণ্ণ হইল। রাজধানী পিকিং এবং পিকিং হইতে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত রেলপথের উভয় পার্শ্বে বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হইল।

বজ্রার বিদ্রোহ দমন করা হইল সত্য, কিন্তু যে জাতীয়তাবোধ ইহার জনক তাঁহাকে ধ্বংস করা গেল না। রাজদরবারে সংস্কারপন্থীদের প্রতিপত্তি দিনের পর দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। ১৯০৩ সালে সরকারী শিক্ষা-বিভাগ স্থাপিত হইল। পরীক্ষা-গ্রহণবিধির আমূল সংস্কার করা হইল। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গড়া হইল। ১৯০৬ সালে সম্রাটের মন্ত্রি-পরিষদ অধুনিক নীতিতে গঠিত হইল। শাসন-ব্যবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কিন্তু হইল না। ফলে জনসাধারণের অসন্তোষ না কমিয়া দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিল। সর্বত্র বিপ্লব-বহি প্ররম্বিত হইতে লাগিল।

বজ্রার বিদ্রোহ প্রথম দিকে সমভাবে মাঝু এবং অস্ত্র বহিরাগত বিরোধী হইলেও পরে মাঝু শাসনের দৃঢ়তা সম্পাদন এবং অস্ত্র বিদেশীয়দিগের বিতাড়ন ইহার উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১ বিদ্রোহের পর হইতে মাঝু শাসনের অবসান ঘটানো বিপ্লবীদের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। ২ এই সময়ে যে সমস্ত ছোট-খাট গণ-অভ্যুত্থান হয়, তাহার সবগুলিকেই কঠোর হস্তে দমন করা হইল।

বজ্রার বিদ্রোহের ফলে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ চীন সম্পর্কে তাঁহাদের চিরচরিত নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে চীন যত দুর্বলই হউক না কেন সরাসরি চীন জয় করিবার চেষ্টা করিলে বিপদ অবশ্যস্তাবী। ৩ এখন হইতে তাঁহারা মাঝু দরবারের মধ্যস্থতায় শোষণকার্য চালাইতে লাগিলেন। জু-সি-ও বিদেশীয়দিগের অঙ্গুত মিত্ররূপে তাঁহাদিগকে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহারা ই সহায়তায় বজ্রার বিদ্রোহের পলায়িত নেতৃবৃন্দকে ধরিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ১৯৪৬ সালে জাপান সম্রাট হিরোহিতোও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এই রকমভাবে নীতির পরিবর্তন করিয়াছিলেন।

১৯০৮ সালে অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে সম্রাট কোয়াংসু এবং জু-সির মৃত্যুর পর মাঝুবংশের শেষ সম্রাট পুয়ান-চুং সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স পাঁচ বৎসর। চার বৎসর পর ১৯১২ সালে চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাচীন এক নবযুগে উত্তীর্ণ হইল।

**জানপোনা বহুবিধ**  
**মারাত্মক ব্যাধির বাহন!**  
**ম্যাবিকিট**  
**তরল ও গুঁড়া ডিডিটি**

তাহাদের  
নির্মাত প্রাণস্বাতক  
আরসোলা, মশা  
মাছি প্রভৃতিতেও  
কার্যকর  
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে  
প্রস্তুত  
**বেঙ্গল-কেমিক্যাল**  
কলিকাতা-১০ নোয়াহাট

সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে  
পান্ডরা মাঝ



## মাতৃমন্দির

২৬-এ, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

গর্ভাবস্থায়, নিরাপদে থাকা, প্রসব এবং

শিশু রক্ষার সুব্যবস্থা করা হয়।

মানদা দেবী, লেডী সুপারিন্টেন্ডেন্ট

১। "Safeguard to dynasty, exterminate the reigener."

২। "Drive out the Ching, restore the Ming."

৩। "It taught Western powers that weak though he country was, it might explode disastrously if they ried to make it an India."—The Unfinished Revolution in China by I. Epstein, p. 33.

## আলোচনা

“বাঙলা নবলিপি”

শ্রীকরালীকুমার কুণ্ডু

বর্তমান বৎসরের আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি মহাশয় “বাঙলা নবলিপি” বিষয়ে যে স্মৃতিস্তম্ভ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন, আজ দেশের নানা দিকে নানা বিষয়ে যখন স্বাধীনতার প্রথম উন্মেষের ফলে নুতন কর্ত্ত্বপ্রচেষ্টা জাগ্রত হয়ে উঠছে ঠিক সেই সময় সর্বপ্রথম সর্বপ্রধান রূপে “শিক্ষা” সম্পর্কে সম্পূর্ণ আলোচনা এবং আলোচনার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করে তোলা একান্ত আবশ্যক। কাজেই, এই আলোচনাটি অসমাপ্ত না রেখে বাঙালী শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাদরদীগণ যাতে আপন আপন বহুচিন্তিত মত প্রকাশ করেন এবং একটি সুষ্ঠু সিদ্ধান্তে উপনীত হন সেই আকাঙ্ক্ষায় আমার দীর্ঘকাল পোষিত চিন্তা-ধারাটি নিবেদন করতে চাই।

বিজ্ঞানিধি মহাশয় যে ভাবে বিষয়টি আলোচনা করেছেন তা ব্যাপক এবং সম্পূর্ণ। ইহা বাদপ্রতিবাদ আলোচনা চরক প্রভৃতির সুযোগ দিবে। আমি এই বিষয়টি দুটি বিভাগে

আলোচনা করতে চাই—যাহা সহজে মীমাংসা করা সম্ভব ও উচিত এবং যাহা দীর্ঘ আলোচনা এবং পরীক্ষার পর গ্রহীত হবে। প্রথমটি আমার বর্তমান আলোচনার বিষয়।

অবাঙালীরা বলেন, বাঙালী আমরা নাকি শরীরে দুর্বল, ব্যবসায় অপটু। একদা শিক্ষায় আমরা অগ্রসর ছিলাম একথা তারা স্বীকার করেন না—অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু আমাদের আজ স্বীকার করতে হবে এবিষয়েও আমরা পিছিয়ে পড়ছি এবং পিছনে ফেলবার জুই বাঙলার বাহিরের বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার সাধ্যমত চেষ্টা করছেন। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে; সেজ্জ্ব প্রথম দরকার শিক্ষাকে সহজ ও সবল করা। এই পটভূমিকায় আমার আলোচনা প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ।

প্রথম বর্ণপরিচয়। আজও ঋ, ৯ সমান ভাবে প্রথম ভাগে প্রচলিত। ৯ উঠছে না কেন? সমগ্র বাঙলা-সাহিত্যে কোথাও এর ব্যবহার নাই। এই ৯ ওঠাবার জুই আলোচনা অনাবশ্যক, অথচ “প্রথম ভাগ” হতে ওঠাবার কোন নির্দেশ কেহ দেন নাই।

ঋষি, ঋণ, ঋতু তিনটি শব্দের জুই একটি অক্ষর রাখা

## নেতাজীর অনুসরণে :—

বাংলার বিখ্যাত স্মৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার “শ্রী” মার্কী স্মৃতির নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিম্প্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ স্মৃতির ব্যবহার অত্যাৱশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্মৃতির যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্মৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা স্মৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

রই বাড়াবাড়ি। এই একটি অক্ষর চেনবার এবং লেখবার শিশুদের সময় এবং শ্রমের কিরূপ অপচয় ঘটে। রিষি, রিতু লিখলে দোষ কি?

তাহার পরং। ৭ এর পরিবর্তে ৬-র চলন বহুক্ষেত্রে হ। সর্বক্ষেত্রে চালাবার অল্পবিধা কি? ৭ এর কি মার যখন 'ত' আছে?

৭র পর বানান-লেখা। ক্ এর নীচে উ-কার দিলে ক্ হবে গ, র, শ, হ প্রভৃতির নীচে উ-কার না দিয়ে উহাকে কেন পরিণত করতে হবে কেন? ঐরূপ উ-কার সম্পর্কে। এই গুলি লিখতে শিখতে চিনতে শিশুদের কি না পরিশ্রম হয়। র-ফলা সম্পর্কেও ঐ একই বক্তব্য। নিয়ম করতে ই, উ-কার বা র-ফলা প্রভৃতি যখনই যা যোগ করতে সকল সময় একই নিয়মে চলবে, যেমন কু, শূ, হুর ইত্যাদি।

কোন কোন সময়ে ব্যঞ্জনাক্ষর যোগের সময়ও একটি নতুন এর সৃষ্টি হয়। এটা পরিত্যাগ করতে হবে। যেমন, লে=হলে—কিন্তু লেখা হয় স-এর নীচে একটি হ 'বক্তব্য' লেখা কি ভাবে হয়? ক-ত এ একটি নতুন স্রু সৃষ্টি করা হয় কেন? ন এর নীচে ও দিয়ে 'কিন্তু' কেন?

মার মনে হয় এইগুলি বা এইরূপ অজ্ঞাত বিষয় মনের জন্ম দীর্ঘ সময় ব্যয় করা শিশুদের প্রতি অত্যাচার

মাত্র। আমার মতে রাঙলা সরকারের এখনই "শিশুশিক্ষা" বিষয়ক নতুন আইন প্রণয়ন করা কত বা। তাহা প্রয়োজ্য হবে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের উপর। এই আইনমতে শিশুদের শিক্ষার সময় রুখা এবং ব্যর্থ কসরত করা দণ্ডাই বলে গণ্য হবে।

জটিল বিষয়গুলি—যেমন লিপি রোমান, দেবনাগরী, অথবা বাঙলা হরকে হবে কিনা, যুক্তাক্ষরগুলি ভেঙে ভেঙে পর পর লেখা হবে কিনা—ইত্যাদি মীমাংসা পরে হলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু যে সহজ মীমাংসা এখনই হওয়া বিধেয় তা অবিলম্বে করা সমীচীন মনে হয়।

## মফঃত্বলে বসিয়া কলিকাতার দরে বই কিনুন

যে কোনও প্রকারের এবং বিভিন্ন প্রকাশকের নাটক, নভেল, ধর্মগ্রন্থ, ভ্রমণকাহিনী, ব্যবসায় বাণিজ্য, চিকিৎসা ও আইনের পুস্তকাদি, স্কুল-কলেজের ও উপহারের জন্য যে কোনও ভাষায় দেশী ও বিলাতী ভাল ভাল পুস্তক আমরা সবদে কলিকাতার দরে সদর সরবরাহ করিয়া থাকি। লিখিলে লাইব্রেরী ও উপহারের জন্য নানাবিধ নতুন নতুন পুস্তকের সম্ভান বিনামূল্যে দিই। অর্ডারের সহিত মূল্যের অর্দ্ধাংশ দিলেই সমস্ত পুস্তক ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। প্যাকিং, সরবরাহ ও ডাকমাস্তুল স্বতন্ত্র। লিখুন :

কুণ্ডু পাব্লিসিটি সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া

(পাব্লিকেশন এণ্ড বুক-সেলিং ডিপার্টমেন্ট)

১৪৬নং আমহার্ট স্ট্রিট, কলিকাতা—২

## রূপ ও রূপসী-

রূপের ঐশ্বর্য বিধাতার দান; কিন্তু মানুষ সেই রূপের বর্ক সাধন করেছে প্রসাধন-বিজ্ঞানের সহজ অশুশীলনে। মানুষ রূপের অধিকারিণীরাও তাঁদের রূপ প্রস্তুতি করে লতে পারেন প্রকৃষ্ট প্রসাধনীর নিয়মিত সাহায্যে। এ বিষয়ে ক্যালকেমিকোর নির্বাচিত প্রসাধনী সম্ভার রূপচর্চা-কারিণীদের বিশেষ সহায়তা করতে পারে।

মার্গো সোপ \* রেণুকা পাউডার

ক্যাষ্টরল \* লাবণি স্ক্রো ও ক্রায়

লকার্টা কেমিক্যাল



## “বাংলার শিশু সাহিত্য”

### ত্রীনন্দিনী চট্টোপাধ্যায়

ডাক্তার ‘প্রবাসী’তে বাংলার শিশুসাহিত্য বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলাম—এ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

লেখক লিখিতেছেন “শিশু-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা মাসিক পত্রিকা। সর্ব প্রথমেই বালকের নাম, তার পর ক্রমে সন্দেশ, মোচাক, শিশুসাপ্তাহী, রঙমশাল, রামধনু...”

লেখক তুলিয়া গিয়াছেন যে, ‘সন্দেশ’ প্রভৃতি কাগজের জন্মের বহু পূর্বে, সম্ভবত ‘বালক’রও পূর্বে প্রমদাচরণ সেনের “সখা” পত্রিকার জন্ম হয়। ‘বালক’ বাংলা ১২৯২ সালে প্রকাশিত হয় এবং ‘সখা’র সম্পাদক প্রমদাচরণ সেনের মৃত্যুই হয় বাংলা ১২৯২ কিংবা ১২৯৩ সালে। কাছাকাছি সময়ে ‘সখা ও সাধী’ নামে শিশুদের আর একটি কাগজ দেখা দেয়। বাংলা ১৩০২ (ইং ১৮৯৫) সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে এবং জগদীশচন্দ্র প্রভৃতির উৎসাহে ‘মুকুল’

প্রকাশিত হয়। ছেলেদের এই কাগজেই প্রথম রঙীন ছবি প্রকাশিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন ‘মুকুল’র প্রথম সম্পাদক। তাঁহার শিশুপাঠ্য কবিতা সেকালের শিশুদের আনন্দের বনি ছিল। এ বিষয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী দ্রষ্টব্য। মুকুল দীর্ঘজীবী হইয়াছিল এবং উচ্চদের কাগজ ছিল। উপেন্দ্রকিশোর, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র ইহার লেখক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

“অধুনা সাপ্তাহিকের বিভাগে আনন্দমেলন” প্রভৃতির উল্লেখ লেখক করিয়াছেন। সাপ্তাহিকের বহু পূর্বে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মাসিক পত্র ‘প্রবাসী’তে ‘ছেলেদের পাতভাড়া’ শিশুদের আনন্দ পরিবেশন করিয়াছে।

লেখক অল্পবাদ-সাহিত্যে স্বথলতা রাওয়ের Grim’s Fairy Tales-এর অল্পবাদের উল্লেখ করিতে পারিতেন। তাহা প্রথম শ্রেণীর রচনা। শাস্তা দেবীর Bror Rabbit-এর গল্পের অল্পবাদ ‘ছদ্দাছদ্দা’ কোন্ শ্রেণীর জানি না। তবে ইহার তিন-চার সংস্করণ ছাপা হইয়াছে।

## কৃতিবাস রচিত

# সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

স্বনামধন্য ত্রীনন্দন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

সুবিখ্যাত কৃতিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকৃষ্ট

অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইল

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রসিদ্ধ অংশবজিত মূলগ্রন্থ অনুসারে ৫৮৬ পৃষ্ঠায় সুসম্পূর্ণ! ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের আঁকা রঙীন বোলথানি এবং এক বর্ণের তেজস্বিনী শ্রেষ্ঠ ছবি আছে। রঙীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিত্রশালা হইতে সংগৃহীত ছবির অঙ্কলিপি। অন্যান্য বহুবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্রাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রবি বর্মা, নন্দলাল বসু, সারদাচরণ উকীল, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধ্রুঙ্কর, অসিতকুমার হালদার, স্বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র দে প্রভৃতির সুনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত।

জ্যাকটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইন্ডিং মূল্য ১০।০, প্যাকিং ও ডাকব্যয় ১।

প্রবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতো এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতো পাইবেন। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে না। গ্রাহক নম্বরসহ সত্বর আবেদন করুন! এই স্বযোগ সর্বপ্রকার দুর্মূল্যের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না।

প্রবাসী কার্যালয়—১২০২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা



# পুস্তক - পার্যায়

অগ্নিসংস্কার (প্রধুমিত বহি ও ভস্মাবশেষ) —

স্রনায়ণ রায়। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫১২ মোহনবাগান পুলিকাতা। মূল্য প্রতি খণ্ড ৪০ টাকা।

এই উপন্যাসের পটভূমিকায় আছে ইতিহাসখ্যাত আগষ্ট-বিপ্লব। র রাজনৈতিক মতবাদ ও সমাজ-অধীকৃত সমস্যা লইয়া কাহিনী উঠিয়াছে এবং তারও গভীরে আছে নর-নারীর চিরন্তন বৃত্তিগত সর্বোপরি আছে আগষ্ট-বিপ্লবের দিনে লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতি। অবশ্য কাহিনী-রচনার পক্ষে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুবিধা বোধ হই-ই আছে। মনের কল্পনা-প্রসার না থাকিলে বিভিন্ন ঘটনা ধারক মূল কেন্দ্রে লগ্ন করিয়া কাহিনীতে কৌতুহল ও রসসংকার সহজসাধ্য নয়। একমাত্র কবির দরদী মনই সাধারণ বস্তুপুঞ্জ ও ঘটনাকে ধুলিজঞ্জালের সঙ্গে মিশাইয়াও নিখিলের মানসলোকে অনায়াসে স্তম্ভিত করিতে পারে; সার্বজনীনতা না হোক, বহুজনের চিত্তরঞ্জনক্ষমতা যায়ত।

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে স্মৃতিদ্বার মত একটি অতিসাধারণ মেয়ের যে কালো মেঘ ছায়া বিস্তার করিয়াছে তাহারই তলায় দুই বিভিন্ন ধরনের টানিয়া আনিয়া লেখক কাহিনীগত বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছেন। কান একটি মতবাদকে প্রাধান্য দিয়া তিনি ব্যক্তিগত মমতাকে বাক্য করেন নাই। সেইজন্য নানা সমস্যার তরঙ্গে গল্পটি হারাইয়া যায়। এই কৃতিত্বের মূল রহিয়াছে বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী, যাহা ব্যক্তিগত স্মৃতির সঙ্গে ভাবকল্পনার যোগসাধন ঘটাইয়াছে।

উপন্যাসখানি দুইটি স্বদীর্ঘ খণ্ডে (প্রধুমিত বহি ও ভস্মাবশেষ) সমাপ্ত। দীর্ঘ উপন্যাসে একটি থাকার বিচিত্র নহে, কিন্তু গল্পকে বাঁচাইয়া রাখার সেগুলি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। যেমন, ঘটনা-সংস্থানে মাঝে শৈথিল্যের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তর্ক-আলোচনা বা সাধারণ পক্ষপাত স্থানে স্থানে অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়াছে; এগুলি সংক্ষিপ্ত হইলে উপন্যাসখানি আকারে কিছু কমিত। ইহা সত্ত্বেও স্বদীর্ঘ কাহিনীটি যে সিকদের চিত্ত আকর্ষণ করিবে এ কথা অকুণ্ঠিত ভাবে বলা যায়।

সুন্দরপট স্মৃতিত।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান না হিন্দু — ডাঃ শ্রীমন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়। হীন সাহিত্য সংঘ, ৪নং স্ববলচন্দ্র লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৩২, মূল্য আনা।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় নূতন বঙ্গ গঠনের সময় বাঙালী হিন্দুর দাবি বলিষ্ঠ ও ভাষায় প্রচার করিয়া জনমত গঠনে সহায়তা করিয়াছিলেন। ন পুস্তিকায় তিনি 'হিন্দু' নামের সার্থকতা, ঐতিহাসিকতা ও গোয়বের নানা দিক্ দিয়া আলোচনা করিয়াছেন। দেশ, জাতি, ধর্ম, তীর্থ, ও সাহিত্য, ইতিহাস ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, একান্তবোধ, মত ও খ্রীষ্টান এবং মুসলমান সম্প্রদায় প্রভৃতি নানা দিক দিয়া বিষয়টি দৃষ্টে আলোচিত হইয়াছে। লেখকের সহিত আমরা একমত যে, হিন্দুর দেওয়া 'ইণ্ডিয়ান' নাম আমাদের গ্রহণীয় নহে। হিন্দু বলিতে 'ঈশ্বর' ও 'ধর্ম' উভয়ই বুঝায়, এজন্য অহিন্দু ভারতীয়দের এ নামে আপত্তি। লেখক প্রস্তাব করিয়াছেন যে, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতীয়-কই হিন্দুহানের অধিবাসী বলিয়া হিন্দুহানী নামে অভিহিত করিলে সর্ববাসীসম্মত হইবে এরূপ বলা চলে না, কারণ যে-কোন ভাবেই হিন্দু রাখিলে এক দল লোকের আপত্তি হইতে পারে। আদ্যবাসীহানের বাসী যদি 'আদ্যগান' বলিয়া পরিচিত হইতে পারে তবে হিন্দুহানের

অধিবাসী 'হিন্দু' বলিয়া পরিচিত হইতে কি আপত্তি, আমরা বুঝিতে পারি না। জাতিতে আমরা সকলেই 'হিন্দু', ধর্মে কেহ 'হিন্দু', কেহ 'মুসলমান' কেহ বা 'খ্রীষ্টান' ইত্যাদি হইতে পারে। আমাদের বিশ্বাস 'হিন্দু' নাম এই অর্থে প্রয়োগ করিতে পারিলেই এদেশের লোকের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া 'হিন্দু' নাম কেবল ধর্মার্থে ব্যবহার করিলে ভবিষ্যতে 'পাকিস্তানের' মত নূতন নাম গজাইয়া বহু বিরোধ ও অশান্তির সৃষ্টি করিতে পারে। হিন্দু জাতির দেশ বলিয়া এ দেশের নাম হিন্দুহান, এবং এই হিন্দু জাতির নামকরণ হইয়াছে সিন্ধু নদ হইতে। ইহার সহিত ভারতের সনাতন ধর্মসমূহের সম্পর্ক পরোক্ষ এবং প্রকৃত প্রস্তাবে খ্রীষ্টীয় বা মুসলমান ধর্মের মত 'মিলিজিয়ন' অর্থে 'হিন্দু' ধর্ম বলিয়া কোন ধর্ম নাই, এই হিন্দু শব্দট ব্যাপক অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। এই পুস্তিকার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

সমাজ-দর্শন — শ্রীরণজিৎকুমার সেন। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৮বি, থামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৬৪, মূল্য ১।

দার্শনিক প্রবন্ধের বই। লেখক মানব-প্রকৃতির দ্বৈত জটিলতা, আত্মসর্বস্বতা, জগতের বৃহত্তর মঙ্গলের মধ্যে সংঘাত, বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার মানবের আত্মিক বিকাশ ও উন্নতির অন্তরায় সম্পর্কীয় বিষয়-গুলি গভীর চিন্তাশীলতার সহিত হৃদয়ের ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ পুস্তকের পাঠক-সংখ্যা যতই বাড়িবে ততই বুঝিব দেশে চিন্তাশীল পাঠক সৃষ্টি হইতেছে। লেখক আদর্শবাদী। অনেক মনীষীর রচনা হইতে বাক্য সংগ্রহ করিয়া তিনি তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শ লেখক কামনা করেন তাহা লাভ করিবার পথ কাহারও পক্ষে বলিয়া দেওয়া সহজ নহে। আদর্শ হয়ত চিরদিনই আদর্শ থাকিয়া যাইবে, কিন্তু আদর্শের অনুপ্রেরণায় পথ চলাই মানুষের কর্তব্য। এই কর্তব্যের নির্দেশ মহাপুরুষগণ যুগে যুগে মানুষকে দিয়া গিয়াছেন। জীবনের বহুরূপে ইহাই সামাজিক জীব মানুষের অপরিহার্য পাথের। উষ্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তিকার একটি হৃদয় ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ভারতীয় সভ্যতা — শ্রীব্রজহৃদয় রায়, এম-এ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। লেখক 'বৈশিষ্ট্য', 'ইতিহাসের ধারা', 'আধ্যাত্মিক তত্ত্ব', 'নৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি' এবং 'বিদেশী সভ্যতার সংঘাত' ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পাঁচটি প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। লেখা চিন্তাপূর্ণ, ভাষা স্থানে স্থানে আড়ষ্ট।

অতুলকৃষ্ণ চৌধুরী প্রণীত

## চন্দ্রায়ণ

আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক আন্দোলনের অব্যর্থ যুগ্মযোগগুলি লেখক তার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা হতে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন, বর্ণনা তাই জীবন্ত হয়ে উঠেছে, আশা করা যায় তরুণ-তরুণীদের জীবনযাত্রাপথে ইহা সকল রকমে সহায়তা করবে।

উন্নত পরিকল্পনা ও ভঙ্গীতে লিখিত ও ছাপা—মূল্য দেড় টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—কমলকৃষ্ণ চৌধুরী প্রকাশক

১০০নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯

**সাহিত্য সম্বন্ধে**—শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাশ। দ্বিতীয় সংস্করণ। চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৩৫০।

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য এখনও নবীন। আলোচনা-পদ্ধতিও হৃষ্ট ভাবে বিবিকল্প হয় নাই। এ অবস্থায় বর্তমান গ্রন্থের উপযোগিতা যথেষ্ট। আর্ট, সাহিত্য, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প এবং প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য, সমালোচনার রীতি, গল্প সাহিত্য, ক্লাসিক ও রোমান্টিক, বস্তুতত্ত্ব ও ভাবতত্ত্ব, ষ্টাইল বা বাণীভঙ্গী, গল্পকথিতা, হাস্যরস, সাবলিমিটি, মিষ্টিসিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিষয় লেখক সংক্ষেপে সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তত্ত্বজিজ্ঞাসু সাহিত্যসেবী মাত্রেরই এ সকল বিষয়ে মোটামুটি ধারণা থাকা আবশ্যিক। গ্রন্থখানি সাধারণ পাঠক এবং ছাত্রদের উপকারে লাগিবে।

**কাগজের নৌকা**—শ্রীমদ্বৈধ ঘোষ। আই, এ, পি, কোং লিমিটেড, ৮ সি. রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিট, কলিকাতা। আড়াই টাকা।  
লেখক শুধু নিপুণ গল্পকার নহেন, তিনি জ্ঞানী ও ভাবুক। আলোচ্য প্রবন্ধগুলিতে কোথাও গল্পের, কোথাও কবিত্বের আমেজ লাগিয়াছে। নিত্যন্ত অলস নীলাম্বলে ভাসানো কাগজের নৌকা এগুলি নয়। খেয়ালের কোঁকে লেখা হইলেও অনেক গড়াশনার এবং চিন্তার পরিচয় এগুলিতে আছে। 'বানর ও বাবুই পাখী'তে প্রবন্ধকার দেখাইয়াছেন, আদিম সভ্যতাকে বুঝিবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া কিরূপে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা নির্বিকার অন্ধ বিবেচ্য প্রণোদিত হইয়া তাহার ক্ষয়সাধন করিতেছে। "কিরে চল মাটির টানে" প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক মত উদ্ধৃত করিয়াই তিনি বলিয়াছেন, মাটিকে উপেক্ষা করিলে আমাদের কল্যাণ হইবে না; ট্রাক্টার-ব্যবহারে মাটির উর্বরশক্তি কমিয়া যায়; যন্ত্রজর্জরিত অতিকায় নগরী শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। লেখক গান্ধীজীর আদর্শের অনুসারী। কিন্তু তাঁহার অনুসরণ ভাবপ্রবণতা মাত্র নহে, তাহা বিচার-বুদ্ধিপ্রণোদিত।

**ভাষণ**—শ্রীমদ্বৈধরঞ্জন রায়। সরস্বতী লাইব্রেরী। সি ১৮-১৯ কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ১৫০।

কবিতাগুলি সহজ সরল ও সাবলীল। 'পরীর' কবিতায় আছে কোমল স্বপ্ন, 'অভিযাত্রিকে' উদ্ভাত গান্ধীর্ষ্য—দুটিতেই ভাব ও ভাবার উপর লেখকের অনায়াস অধিকার প্রকাশ পাইয়াছে।

**অনুবাদ চতুষ্টয়**—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়। চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এণ্ড কোং। মূল্য আট আনা।

এই বইখানি পড়িয়া কয়েকটি বিখ্যাত ইংরেজী কবিতার ভাবের সহিত বাঙালী পাঠক সহজে পরিচিত হইতে পারিবেন। ইহাতে আছে রবার্ট ব্রাউনিঙের Andrea Del Sarto, Lazarus, A Grammarian's funeral এবং ফ্রান্সিস টমসনের The Nouad of Heaven-এর অনুবাদ।

### শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

**বাঘ-সিংহের লড়াই**—শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী। সেনগুপ্ত এণ্ড কোং। ২১, নবীন রুড লেন কলিকাতা। দাম ১৫০।

আমাদের দেশের যে সব বীর যুবক দেশের মুক্তির জন্ত নিজের জীবন পাত করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদেরই কয়েকজনকে কেন্দ্র করিয়া ছোটদের উপযোগী সহজ সরল ভাষায় পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। ইহাকে ঠিক জীবনী বলিলে ভুল করা হইবে। বাঘা যতীন, চিত্তপ্রিয়, নীরেশচন্দ্র, জ্যোতিষচন্দ্র ও মনোরঞ্জন—এঁদের জীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া পুস্তকখানিকে উপন্যাসের ছায় চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিবার

প্রয়াস আছে। ছোটদের মনকে সাহসী এবং সজাগ করিয়া তুলি হইলে এই ধরণের সত্য ঘটনার চিত্র তাহাদের চোখের সম্মুখে আঁ দেখাইবার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। বাংলার ছেলেরা ভীক, অকর্মণ্য অপবাদ আমাদের আত্মবিশ্বাসকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে। অথচ দেশেরই ছেলে, বাঘা যতীন, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন প্রভৃতি সংখ্যায় সূঁ হইলেও পুলিশবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করিয়া আত্মবলি দিয়াছে। প্রভাতবাবুর বিষয় নির্বাচন, ভাষা, এবং ঘটনা-সংস্থান প্রশংসা প্রচ্ছদপট মনোরম।

**খেলনা**—শ্রীজ্যোতিরিল নন্দী। পূর্বাংশ লিঃ, পি ১৩ গণেশ এভিনিউ। কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

গল্পের বই। সাটট গল্প ইহাতে স্থান পাইয়াছে—নদী ও সমুদ্র, সন্ধান, সিংহরাশি, সমতল, খাকী ও খেলনা।

গল্পগুলি বিভিন্ন পটভূমিকায় লিখিত। ছোট গল্পের আর্ট লেখ আয়ত্ত্ব থাকায় প্রত্যেকটি গল্পই রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। বিশেষ করিয়া এ দ্বিতীয়, পঞ্চম ও শেষ গল্পটি মনে স্থায়ী রেখাপাত করে।

প্রথম গল্পে এক রহস্যময়ী নারীর উদ্ভাস, আবেগ, তার উদ্দাম এবং হাসি ও অশ্রুর আত্মপ্রকাশ মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

শেষ গল্পটি আমাদের দেশের তথাকথিত বড়লোকের ব্যয়বিল একটি কাহিনী। একটি অনাথ আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া গল্পটি রা শিক্ষার যথার্থ প্রয়োজনে অর্থব্যয় করিতে এই সকল ধনী ব্যক্তি অনুদার এই কথাটাই গল্পের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠকসমাজের তৃপ্তি করিতে সক্ষম হইবে।

### শ্রীবিভূতিভূষণ

**রবিঠাকুর (নাটক)**—ডাঃ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টা প্রকাশক—বীণা লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য টাকা।

দীর্ঘ পথ ভ্রমণের পর তৃষ্ণার্ত পথিকের কাছে এক পাত্র পানীয় যেমন পরম কাম্য, গতানুগতিক এবং অপটু আধুনিক বাংলা নাট্য হাতেও এই ধরণের একখানি কিশোর-নাটকের প্রকাশও পাঠকের বিশ্রামকর এবং চিত্তচমৎকারী। 'রবি-ঠাকুর', 'ইন্দ্রলুপ্ত-সংবাদ' পাঁচটি নাটিকা এই সংকলনে স্থান পাইয়াছে। কবিগুরু দর্শনা এক কিশোর-চিত্তের আকৃতিকে কেন্দ্র করিয়া 'রবি-ঠাকুর' দীর্ঘ নাটিকা লেখক রচনা করিয়াছেন তাহা যে-কোন সিদ্ধহস্ত নাট্যকারে বিশ্বাসের উদ্রেক করিবে। 'রীতিমত গৃহ-প্রবেশ' নাটিকায় সম্প্রা গৃহ-সমস্তার রূপটি চমৎকার ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। "ইন্দ্রলুপ্ত-সংবাদ" চিকিৎসা-বিভ্রাটের চিত্রটি পরম উপভোগ্য। এমন প্রাণ খুলিয়া হাসি স্বযোগ সহজে মিলে না। মেলাড্রামা সৃষ্টি না করিয়াও অতি সাধারণ ও মনোবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া কিরূপ রস-গভীর ও হাস্তোজ্জ্বল নাটক করা সম্ভব—আলোচ্য নাট্য-সংকলনই তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সংলাপ সরল, কিন্তু তীক্ষ্ণ এবং সতেজ। বাংলা নাটকের যা প্রধান দোষ—সেই বাহুল্য কোথাও নাই—অথচ একটা অনাড়ম্বর এবং অনাবশ্যক অলংকারিত সহজ রচনা-সৌন্দর্য্য এবং বাগ-বিভূতিতে প্রতিটি নাটিকা স্বাক্ষর করিতেছে। নাটকীয় ঘটনা-সৃষ্টির জন্ত কোথাও প্রাণান্তকর ব্যর্থপ্রয়াস নাই—অথচ প্রতিটি 'সিচুয়েশন' স্বাভাবিক কিন্তু নাটকীয় রসে অসাধারণ হইয়া পাঠকের চিত্তরঞ্জন করে। সম্ভবত আলোচ্য পুস্তকই লেখকের প্রা প্রকাশিত নাট্য-সংকলন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার সমুচিত হইবার কে কারণ নাই। সহজাত নাট্যরচনা-ক্ষমতা লইয়াই তিনি কলম ধরিয়াকে—আপনার শক্তির লীলা-সৌন্দর্য্যেই তিনি পাঠক-সাধারণের চিত্ত

# মহাজিজ্ঞাসা

ফিশারের নাম আজ আর কোনো  
কাজেই অপরিচিত নয়, তেমনি  
চিত্রিত নয় তাঁর 'The Great  
Challenge' বইটির নাম। 'মহাজিজ্ঞাসা'  
অনূদিত সংস্করণ। আন্তর্জাতিক  
রাষ্ট্রনৈতিক তথা সামাজিক বিবর্তন  
এত মহাবুদ্ধির সমন্বয় থেকে আজ পর্যন্ত  
প্রকার আকাংক্ষা পথে এসিয়ে  
ছে তার ইতিহাস জানা প্রয়োজন  
সকলেরই। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই  
গ্রন্থ এখনও প্রচুরভাবে প্রচারিত  
নয়। লুই ফিশার অভ্যন্তরীণ ও নির্ধর্ম-  
আলোচনা করেছেন বলে আজকের  
এ-বইয়ের প্রয়োজন অপরিহার্য।

সূত্রী: ডানকার্ক ও তারপর,  
আমেরিকার মুক্ত যোগদান,  
নতুন দুইতে ঠালিন ও হিটলার,  
ভবিষ্যৎবাদী,  
নিউক্লিয়ার ও মোসেস ই ডেজিস,  
ব্রিটিশ জনগণ ও চার্চিলের ইংলণ্ড,  
ভবিষ্যতের আবির্ভাব,  
দক্ষিণ থেকে ভারতে,  
আজ ও পাশ্চাত্যের মিলন,  
ভারতের সমস্যা,  
ভারতে ব্রিটিশ শাসন,  
প্যালেস্টাইনে নিরুপেক্ষ দশদিন।

লুই ফিশার

পর্ব। দাম চার টাকা ॥

পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত হরপ্রসাদ  
শাস্ত্রীর অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও

## বৌদ্ধধর্ম

মননশীলতার পরিচয় আধুনিক বাঙালী সমাজের কাছে আজ আর  
নতুন করে দেবার নেই। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তাঁর যে পাত্রিতাপূর্ণ  
গবেষণা, এতদিন পর্যন্ত তা প্রাচীন সাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠাতেই  
আবদ্ধ ছিলো। সম্প্রতি বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত তাঁর প্রবন্ধগুলোকে একত্র  
সংকলিত করা হয়েছে এই গ্রন্থে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি  
ধার সামান্যমাত্রাও শ্রদ্ধা আছে, এ গ্রন্থ তাঁর, কাছেই যে শুধু  
অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে তা-ই নয়, ভারতবর্ষের ইতি-  
হাসের প্রত্যেকটি পাঠকেই এ-গ্রন্থকে অপরিহার্য বলে গ্রহণ করবেন।

বিষয়বস্তু: বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাহার গুরু কে; নির্দোষ; নির্দোষ  
কর বরুণ; কোথা হইতে আসিল; হীনযান ও মহাযান; মহাযান কোথা  
হইতে আসিল; সহজযান; বৌদ্ধধর্মের আশ্রয়; বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল;  
এখনও একটু আছে; উড়িয়ায় লঙ্গলে; জাতক ও অবদান; দলদলি; মহানাজিক  
রত্ন; ধেরবাদ ও মহানাজিক; মাহু ও রাজা। দাম তিন টাকা ॥

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের যে  
গৌরবময় অধ্যায় আজ পর্যন্ত

## ধর্মবিজয়ী অশোক

বাংলাভাষায় রচিত হয়নি, একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সেন  
সেই অধ্যায়কেই প্রকাশ করেছেন এই গ্রন্থে। অক্লান্ত অহুসন্ধিসূর্য  
ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটনে যে আন্তরিকতার পরিচয় লেখক এখানে  
দিয়েছেন, তা তাঁর মতো নিষ্ঠাপরাহণ ঐতিহাসিকের পক্ষে স্বাভাবিক  
হলেও, পাঠকের পক্ষে বিশ্বাসের বিষয়। এই গ্রন্থে প্রবোধচন্দ্র সেনের  
সার্থক সত্যানুসন্ধানের পরিচয় মিলবে। দাম তিন টাকা ॥

তিনটি সুদীর্ঘ কবিতা—  
এশিয়া, ভারতবর্ষ, বাংলা।

## প্রাচীন প্রাচী

কবিতা তিনটি ইতিপূর্বেই যখন প্রকাশিত হয়েছিলো, তখন  
যারা পড়েছিলেন, তাঁরাই জানেন, বাংলা কাব্যসাহিত্যের  
ইতিহাসে এ যেমন অভিনব তেমনি অনবদ্য। কাব্য-  
রসিকমাজেই সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের এই নবতম কাব্যগ্রন্থ  
'প্রাচীন প্রাচী' অবশ্যই সংগ্রহ করবেন। দাম দেড় টাকা ॥

পুর্বাংশ। লিমিটেড—পি১৩, গণেশচন্দ্র এডভান্স, কলিকাতা ১৩

করিতে পারিবেন। আলোচ্য মাকলনই পাকা নাট্যপ্রতিষ্ঠার উচ্চ  
 দায়িত্ব বহন করিতেছে। আমরা নাট্যোন্নয়নী এবং স্বল্প পাইকগণকে  
 এই রচনাব্যবস্থার মাকলনধারি পদ্ধতি প্রেরিত অর্থরোধ করিতেছি।  
 আর লেখকের নিকট আমাদের অনুরোধ যে, চিকিৎসা-বাধ্যতার চাপে যেন  
 তিনি নাটক রচনার ক্ষমতা না হারান, কারণ নিজের সহজাত শক্তির জোরেই  
 তিনি আপনাদের প্রাণা গোঁড়বের আসন লাভ করিতে পারিবেন।

श्रीरामशङ्कर गोशुक्ला

জানোয়ারের ছড় — ক্রীড়ানিষ্ঠ বল। আগুতান লাইব্রেরী,  
এক কালঙ্গ পোয়াং, কলিকাতা। মুদ্রা দুই টাকা।

শিশুর মানসিক প্রবন্ধিকাশের পথ্যায় এমন এক সময় আসে যখন সে মহাহেতব প্রাণীর আচরণে আকৃষ্ট হয়, প্রাণীদের যত্নসম্মত কথা, বহির কথা, বিব্রতকথ্য কথা শুনিতে ভালবাসে। শিশু তাহাদের নিজের পরিচিত পরিবেশে বাহ্যিককালে আশেপাশে দেখিতে পায় না বাহ্যিকের সঙ্গে মনিক্রিয়ায় মিশিতে পায় না অথচ বাহ্যিকের কথা পায় কতিপ দূর হইতে অথবা জ্বলন্ত বস্তু, প্রাণীদের প্রতি তাহার কৌতুহল বাড়িয়া উঠে। এই কৌতুহল অবলম্বন করিয়া শিশুকে নূতন জ্ঞান ও আনন্দের বাজা নাইয়া যাওয়া যায়। শিশুমনোবিদ সাইরী জেনেন কৌতুহল জাগ্রত করা ও পরিভূত করা শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রথম পদ্য।

আমোচ্য পুস্তকখানিতে জানোয়ারেরা খোঁকাপুসুর সঙ্গে 'ভাব-জমাতে' যানিয়াছে। হুমিওরবাব সিংহ খাব, আনুসক, কুমীর, শিঙাণ, জিবাণ প্রভৃতির মধ্যে হস্তা নিচা তাহাদের প্রকৃতি ও স্বভাবের বৈশিষ্ট্য শিশুর পক্ষে সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। বুদ্ধিকারবজিত সরল মনোবশ ভাবায় লেখা কবিতাগুলি শিশুরা জানকের সহিত পড়িবে। মেসি হুল্লর কাগজে বড় বড় লম্বের রঙিন কবিততে ছাপা, পাতার পাতায় ছবি, বাঁদাই ও প্রচ্ছদপত্র চমৎকার, এক কথাই শিশুদের মনের মত বই। ইহা একই সঙ্গে তাহাদের জ্ঞান ও আনন্দ বুদ্ধির উপকরণ স্বরূপ হইয়াছে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ্র

চারি ধাম ভ্রমণ—(উত্তরবঙ্গ, কোনার বদরী ও পঞ্চপতিমাণ)  
 প্রকাশক—প্রভুনাথ, ছোটপাড়ায়। প্রকাশক—প্রভুনাথ, ছোটপাড়ায়, বহুবান্দ।  
 ২৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১০।

ফৌজদার-বরদীনার সম্মুখে বহু পুস্তক বাহির হইয়াছে, বেপালার পক্ষপত্তিমাণ নথ্যকের কেহ কেহ লিখিয়াছেন। আলাচীয়া দ্বারে পাথর নোকাণ্ড ও অরণ্যের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাজনিত কনোহর বর্ণনা বিশদ্য বলাই বটে, কিন্তু দাবারদার-তীর্থদাতার পক্ষে এই পুস্তকের উপযোগিতা প্রকৃত হইবে, কারণ ইহাতে তীর্থদাতার জাতব্য বাবতীর সংবাদ, পথের স্থাবর-অস্থাবর ও সমস্ত স্রষ্টব্য স্থানের স্থানটি বর্ণিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হই-  
নাছে, অদর্শক-রী ও তীর্থদাতার পক্ষে ইহা পণ-প্রদর্শকের কাজ করিবে।

প্রতিবাদী—মাকিশোরীমোহন ঘোষাল। বৈষ্ণবগণি সুবক-  
গণিতিক কবিত্ব প্রকাশিত। মুদ্রা ১৮।

এই মূর কাব্যেই অল্প পরিসরের মধ্যে কবি মানব-জীবনের উৎপত্তি, ক্রমাবিকাশ ও প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে মহামানবের বিরূপ মহান পূর্ব-বিশ্বের উৎপত্তি-সংক্রান্ত সাহিত্যছেন। অনন্ত শূন্য সূর্য্যাসান জীহারিকা-ময় জগৎ হইতে যেমন এই বিচিত্র চন্দ্রের সর্বজন জগৎ-সুখ হইয়াছে, মানবজীবনের ত্রেহনি প্রথমে উদ্ভবসিদ্ধি ও জ্ঞানতাপ্ত মূর ব্যক্তিীবনের বিন্যাসই সম্ভা হইতে নিজের মধ্যে অনন্ত-জীবনের অনন্ত-সম্ভাবনা উপলব্ধি

করিয়া যখন মূল মহামানবের জন্ম-পারাব পণে অভিব্যক্তি  
হাবের সম্মুখে এই পটভূমির মহামানবের অস্তিত্ব উ  
অনুভূতিগত মানব মূল ধরনের পলা পরিভাষা করিয়া মহা  
উদ্ভাসে আশ্রয়ের পণে ব্যক্তি করিয়া নিজেই মার্কস সকল জীব  
ইহাই প্রকৃতির সত্যকে বহু বর্নিত হলে বাস্তব করিয়াছেন। 'দে  
অন্য হইতে মতো, তখন হইতে প্রকৃতিতে, মতো হইতে অন্য  
পণে 'অভিব্যক্তি' মূল-মানবের জন্ম হইল। পাঠক পুস্তকখানি  
গেহণা ও আনন্দ লাভ করিবেন।

বিজ্ঞান

নিভাকর্ষ স্বত্বব্যবস্থা সংগ্রহ—ঐশ্বর্যভোগ

যাকরণ-প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি ও অন্তর্ভুক্ত। প্রথম খণ্ড—পু  
 বিত্তীয় খণ্ড—নিত্যকর্ম ও ভোক্তাবি। প্রকাশক—শ্রীশিবেন্দ্র  
 তাঁণ্ড-মুদ্রিত। ৩৯, তালপুকুর রোড, বেলিঘাটা, কলিকাতা।  
 ১৯৬১-৬২

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিবিধ ধর্ম কথায় সম্পাদকের সম-  
স্বাদ্যে ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবহার দ্বারা সম্বন্ধিত হ-  
দ্বিতীয় খণ্ডে হিন্দুর প্রতিদিনের অনুষ্ঠানের সম্বন্ধে অর্থাৎ পূজার পদ্ধ-  
তি, কতকগুলি দ্ব্যাদ, প্রণাম এবং ও সম্বন্ধিত সমিবেশিত হইয়াছে।  
গ্রন্থের অনেক বিবিধ বিশেষতঃ প্রায়শ্চিত্ত ও অশৌচ বিবিধক নাম-  
—বস্ত্রবান সমাজে অচল, হস্তবান গোড়ালি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করার  
প্রয়োজন ছিল না। সাধারণের দিক দিয়া দ্বিতীয় খণ্ডবানি অ-  
উপযোগী। খুটিনাটি জিজ্ঞাস্যকর্ম অপেক্ষা প্রার্থনা ও ভক্তির দিকে  
উপরে আকর্ষণ বেশী। আধুনিক চিন্তাধারা ও মাত্রের অনুকূল এ-  
গ্রন্থের অভাব হিন্দুর ধর্মগ্রন্থে নাই। সেগুলি সম্বন্ধিত ও বাগ্যক  
অচারিত হইয়া থাকে। গ্রন্থের কথা, আলোচ্য খণ্ডে এইরূপ  
কিছু কিছু আছে। উক্ত অংশের আকর্ষণে উক্ত গ্রন্থকে  
হয় নাই কেন বুঝিলাম না।

ଅନିଷ୍ଟାହରଣ ଚକ୍ର

सञ्जन—श्रीमद्विही नारायण महाराज पादलिखित । ७  
 देवगिर, कलिकाठा २२, बुध दिन टीका छटि आना ।

এতকালের নামটি অপরিচিত। সেইজন্য পৃথকখানি পাঠ্য-  
উপকরণে বোধ করি নাই, কিন্তু দু'চার পৃষ্ঠা পরিভার পরই সে নামের  
চিত্তাকর্ষক বর্ণনাসঙ্গীতে মুগ্ধ হইলাম। সত্যন রেখা-স্বরের বহনকারী  
শে বাড়াবাড়ি দেখা যায়, কর্তব্যানু পৃথকখানি জানা হইতে পরে কা-  
উপক্ৰামটিকে প্রাগতিশীল বাস্তবৈতিক চিন্তাধারার সহিত  
পরিচয়ের ছাপ রহিত। এখানে মাকী নীর দর্শন ও কামানীজ  
পক্ষপাতও প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু প্রচার কাহাজ পক্ষমতাবে  
বলিয়া থাকিলেও রসবোধ কোথায় পীড়িত হয় না। উপক্ৰামের  
মোটামুটি এই—

সদীপ্ত প্রেম জীবনের বিধবা পত্নী অশ্রুজল ভরিয়ে  
 বিধিকৃত হৃদয়প্রকণ্ঠে প্রেরণ করিলেন। বিমরসাতল আবেগে তাঁর  
 অঙ্গবঙ্গসেই শেখর হাড়িয়া চলিয়া গেল। তারপর গোপনে চলিল  
 বৈদিক কাণ্ডকলাপি। বৈদিক জাতেশ্বর অন্তর্যমিত্রী জগৎ  
 হইল তার পরিচর্য। কিন্তু বিবাহের পর বিপুল্য তাহার কল্যাণ  
 নাতিল। বহিল আর জগৎ বহিঃকৃত শইতে দিল্লির কল্যাণ  
 পরিবারের অঙ্গপূরে নদীপ গভীর নবো জিলে জিলে শুকাইয়া শেষে  
 প্রাণত্যাগ করিল। জগৎ হৃদয় পূর বিধিকৃত নিকা পত্নী



ਭਾਖਾਭਾਖਾ, ਕੋਭਾਖਾ ਲਿ:



অপরিস্ফুট ভাষায় ভরিয়া উঠিল, সে অনুভব করিল তারার সকল শক্তি নিঃস্পৃহিত হইয়া গিয়াছে। শেষে সেদিন জমিদার-সহায়ত্বের অত্যাচারে নিপীড়িত চাষীরা তাহাকে নিজেদের মধ্যে ডাক দিল সেদিন আবার সে নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। এক সন্তান সমবেত চাষীদের দিকে চাহিয়া সে মনে মনে বলিল—“কে বলে জয়া আনাকে নিঃস্পৃহ করে রেখে গিয়েছে। তোমরাই ত আনার অজয় শক্তি, দুর্দিনের অক্ষয় বাহুবল।” লেখিকা প্রাণ চালিয়া উপস্থানস্থানি লিখিয়াছেন। ইহাতে কৃষক-মজুর রাজ সম্বন্ধে লম্বা লম্বা লেকচার নাই, আছে আন্তরিকতার স্পর্শ আর দয়। সেই দয়ন চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

বিখ্যাত, খননভা, প্রশান্ত, অমরা এই চারিটি চরিত্রই বেশ কুটিয়াছে। জয়ার জীবনের শোচনীয় ট্রাজেডি মনে গভীর রেখাপাত করে। আদর্শ আর বাস্তবের বিরোধ মানুষের সমগ্র সমাজকে যে কিরূপ বিপর্যস্ত করিয়া দেয়, জয়ার চরিত্রের শোচনীয় পরিণতির ভিতর দিয়া লেখিকা তাহাই বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কুটিয়া তুলিয়াছেন।

### শ্রীমলিনীকুমার ভদ্র

পরম ধর্ম—খ্রিস্টি ধর্মী শ্রীমলিনীকুমার বন। দি বুক কোম্পানী লিমিটেড, ৪৩ বি, কলেজ রোড, কলিকাতা। ২০- পূ., মূল্য ৩/-।

এই গ্রন্থ গ্রীক-আরাধনার সহিষ্যকীর্ণের পরিপূর্ণ। হিন্দুধর্ম বহু সম্ভাব্যবস্তু হইলেও সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তই এক অস্বীকার্য পরম সত্যের কথা ঘোষণা করিতেছে। শ্রীমন্তপবতের দ্বারা দেবী ভাগবতাবিও নামরূপ ভেদরূপে আত্মীয় ইষ্টের তত্ত্ববিশ্লেষণ এবং দৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তৃক বর্ণিত ভরপুর। বর্তমান সময়-যুগে সাম্প্রদায়িক তার 'পরম ধর্ম' জাতীয় গ্রন্থে থাকি অব্যাহার। গ্রন্থকার স্বয়ং পাশ্চাত্য জগতে ঘুরিয়াছেন, পাশ্চাত্য মনীষীদের চিন্তাধারার আলোচনাও কতক করিয়াছেন, কিন্তু বসন্তের কাম-

কাকনত্যাগী শক্তিউপাসকের কথা বোটেই না ভাবিয়া 'ক' উপাসক' শীর্ষক (৭১ পৃ.) একশ পৃষ্ঠা পুস্তি এবং 'শক্তি পরম নহে' শীর্ষক (৭৩ পৃ.) একত্রিশ পৃষ্ঠা পুস্তি আলোচনা করে চরিত্রান্ত বোঝা করেন—“পরমরূপ ক্রম-হর শক্তি কৈয় সম কৃষকের অন্তিম বহনস্ত সত্য সিদ্ধান্ত। বৈষ্ণব শাস্ত্রে যৌক্তিক করেন, 'যা কৃষ্ণ সৈব ব্রহ্মা ত্রান বা ব্রহ্মা কৃষ্ণ এব ন'। কৃষকের অধীন (৭২ পৃ.) ইত্যাদি আলোচনার ভেতরান ও পরম ধর্মের অনুপস্থিতি। 'শাস্ত্র ভব রোগের নিদান গ্রন্থ' আলোচনার পর 'ধর্মশাস্ত্র প্রচারিত ধর্ম পরম ধর্ম নহে' ইত্যাদি আলোচনা হইয়াছে, ইহাতে পূর্বোক্ত শাস্ত্র কি ধর্মশাস্ত্র হইবে? শ্রীমন্তপবত নিচয় ধর্মশাস্ত্র, ১১ পৃষ্ঠার আলোচনা শাস্ত্রের প্রচারিত ধর্ম পরম ধর্ম নহে বুঝিতে হইবে, কিন্তু ধর্মের পূর্ণ বিকাশকল্পী শীর্ষক 'আলোচনা' (৪৯ পৃ.) আবার এই ভাষ্যবত কি ধর্মশাস্ত্রবিশিষ্ট বস্তু কোন গ্রন্থ? শাস্ত্র ধর্মজ্ঞানের যথার্থ অধিকারী সত্যজ্ঞতা ধর্মিকণে গীত হইয়াছে।

'বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে-আরতে তথা।

আরাধ্যস্তে চ নমো চ হস্তি সর্গস্ত্র গ্রীষ্মস্ত।'

এর পরে আর অবশ্য কল্পনার কোন সার্বভৌম আছে কি? সকল উপাসনাই বেদবিরহিত না হইলেও (৭৩ পৃ.) তুলনী ও পৃথক ইষ্টরূপে ভজনা করিয়া পরম সত্য ভাঙে ধন্য হইয়াছেন, জনদের সংখ্যাও ভক্তিরাঙ্গো দেয়, কাজেই বেদবিরহিত নয় বলিয়া চিত্তে সন্দেহ বা নিকটমাত্র আগাইবার চেষ্টার পরিবর্তে ইষ্টনিষ্ঠা চেষ্টাই পরমধর্মবিরহিত হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীউমেশচন্দ্র

## দেশ-বিদেশের কথা

### পরলোকে শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ

বাংলার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার বিগত ২২শে জুলাই মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। হেমেন্দ্রনাথ ময়মনসিংহ জেলার গচিহাটি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি শৈশবকাল হইতেই চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের শিল্পীসমাজে হেমেন্দ্রনাথ সুপরিচিত। ঠেঙ-চিত্রাঙ্কনে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। বর্ণসংযোজন-মাদুঘো, প্রতিচ্ছতির অপূর্ণ লাবণ্যবিকাশ-নৈপুণ্যে হেমেন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রশিল্পীমণ্ডলের মধ্যে অতুলনীয়। বস্তুতঃ চিত্রশিল্পের নানা বিভাগেই তিনি প্রকীর দৈশিষ্ট্য ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী চিত্রাঙ্কণে যাহারা বিশেষ ব্যাতিলাভ করিয়াছেন হেমেন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

প্রথম জীবনে তিনি কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর শিল্পপ্রদর্শনীতে বহু বার প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন। তাঁহার কতিপয় ব্যাতন্যামা শিল্পী-বন্ধুর সহযোগে কলিকাতা হইতে তিনি *The Indian Academy of Art & Silpe* নামে ইংল্যান্ড ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। প্রবন্ধগোবিন্দ ও চিত্রমাধুর্য এই ইংল্যান্ড পত্রিকা পাশ্চাত্য দেশেও বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। পাতিয়ালার

ভূতপূর্ব প্রবাসী মহারাষ্ট্র হেমেন্দ্রনাথের শিল্প প্রতিভা পাইয়া তাঁহাকে রাষ্ট্রশিল্পীর পদে নিয়োগ করি ভারতের রাজস্ববর্গের অত্র চিত্র অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রকৃত বর্ষ ও খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন।



হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০/২ আপার সারকুনার রোড, কলিকাতা